Cu lo -H04301-29- P23185

শবরীর প্রতীক্ষা—যৌবনে।

চিত্রকর শ্রীনন্দলাল বসু।

চিত্রাধিকারিণী শ্রীমতী মীরা সেনের সৌজন্যে।

শবরীর প্রতীক্ষা—প্রৌঢ় ব

P23185

বিষয়-সূচী

অনিবার্য (কবিতা) —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬৩
অনিদ্রা-চিকিৎসা (সচিত্র) ... ১৫৯
অন্তরের অন্তরে (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণলাল বসু, বি এ ৩৮৮
অন্ধসভা (কবিতা)—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ... ৫১৫
অশ্রু ও হাসি (কবিতা)—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ... ৩৫
আবিষ্কার [illegible] (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকান্ত
[illegible] এ ... ৪৩৬
আলো ও ছায়া (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র
চক্রবর্তী ... ৪২৫
আমেরিকার [illegible] নেয়ে ... ১৩৬
[illegible] (সচিত্র) —শ্রীপ্যারী
[illegible] ৫৩
[illegible] (সচিত্র) ... ১৫১
[illegible]—শ্রীনরেন্দ্রনাথ
[illegible] ২৯৪
আলো (গল্প)—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ ... ১৬৫
আলোকের [illegible] (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ...
আলোচনা— ১৮, ১৯১, ২৯১, ৩৯৬, ৫৯২
আলো ও আমরা (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী, বি-এ
২৫৭, ৩৩৩, ৪০৯
ইন্দো-কোম্পানি বাহাদুরের (সচিত্র) ... ২৭৯
ইংরেজ উপনিবেশিকদের আদিকালের কথা—
অধ্যাপক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সরকার, এম-এ ... ৭৮৭
ইস্পাত [illegible] (সচিত্র)— ... ২৭৯
[illegible], শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ... ৯
উদ্ভিদ-অভিধান (কবিতা)—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ২৪৯
[illegible] (সচিত্র)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৮২
এক ও অনেক—অধ্যাপক নগেন্দ্রকুমার রায়,
বি-এসসি ৫০৯
কবির কি দুঃখ নাই (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৭২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র
রায় ৫৮১
কাশ্মীর-কাহিনী (সচিত্র) ... ২৫৭
কাশ্মীরী নারী (সচিত্র) ... ৪৩৮
কুয়াশা ৬১, ১৬৩, ৩৮৬, ৭৭৭, ৫৪২
কুয়াশা (গল্প)—শ্রীজলধরকুমার মল্লিক ... ২২৬
কেমন [illegible] (সচিত্র) ... ১৫৯
কোন্ [illegible] (সচিত্র) ... ১৬১
[illegible]—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৯৩
কুকুরের ভুল ছাঁটা (সচিত্র)
কুমীরের গাড়ী (সচিত্র)—
কুষ্ঠরোগ—শ্রীরাগানুজ কর
কূর্ম-অবতার (সচিত্র)
কোন্ পথে?—রায় বাহাদুর অধ্যাপক
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ বিদ্যানিধি ...
কোমর-ঘড়ী
কৌতুক রসের মৌলিকত্ব ও বিশ্লেষণ—
অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
এম-এ, পি এইচ-ডি
কৌন্সিলের সভ্যরা কি দেশের সেরা?
কংক্রিটের ঢালাই-করা বাড়ী (সচিত্র)
ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহজ উপায়
খাওয়ার সময় খুসি থাকো (সচিত্র)
খাদ্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার (কবিতা)
খাঁটি দুধ চিনিবার সহজ উপায়
খেজুর-গাছ (সচিত্র)
গোয়ারাড় নগরের নাম ও অবস্থান (সচিত্র)
শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়
গণেশ ঠাকুরের তুলসী—শ্রীচারুচন্দ্র বসু, বি-এ
গল্প বদল—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গাছে দোঁয়া দেওয়া (সচিত্র)
গাছের আলো—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিদ্যারত্ন
গান (কবিতার)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গৈরী আওয়াজ—শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু
চারা রোপণ করিবার কল—ই হরমা সিংহ
চাষের কাজে জীবাণু (সচিত্র)
চাষের কারখানা (সচিত্র)
চাঁদমারি হাউই (সচিত্র)
চাঁদের পূর্ণগ্রহণ দেখা যায় কেন? (সচিত্র)
চিত্র-পরিচয়—শ্রীজলধর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
চিনির গাছ (সচিত্র)
চিরন্তনী (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা দেবী, বি-এ
১৮, ২৭৭, ৩৫৭
চিরস্থায়ী গালের কাল (সচিত্র)
চুরুটের বাক্স (সচিত্র)
চেনা-চেনা (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি

[illegible] ... ৪৮৬
[illegible] সবচেয়ে মোটা ছেলে ... ৯১
[illegible] সমস্যা—ডাক্তার সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এসসি ... ১১৭
[illegible] সমস্যা—শ্রীভোলাচরণ সেন ... ৩৭৯
[illegible] সমস্যা"—শ্রীসত্যচরণ পাল ... ৪৮৪
[illegible] সমস্যা ও আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার ... ৪৮৩
পাণ্ডিত্যের সমস্যা ও আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব ... ৩৮০
"প্রতিভেদ সমস্যা" (সম্পাদকের মন্তব্য সহ)—শ্রীসত্যচরণ পাল ... ২৯১
আপানীদের আর্য্যামির ঝোঁক (সচিত্র) ... ১৪১
আবহাওয়া বিভবায় (সচিত্র) ... ১৫৭
আত্মরক্ষার পরি-কৌশল (সচিত্র) ... ৫১৭
আবন-মরুক (কবিতা)—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ১৮৯
আয়ু-শরীরে চামড়ার অঙ্গ কি কি (সচিত্র) ... ১৬৩
আড়া ছেলে (সচিত্র) ... ৩৫৮
আমিতির রেখা ও বিন্দু আঁকা কি অসম্ভব? ... ৩৪৪
আমানি কাঠ—শ্রীসুষমা সিংহ ... ১৬২
আমরক্তের জন্মকথা (সচিত্র) ... ৫৩৬
টাকাকড়ির আরম্ভারী (সচিত্র) ... ১৫৮
ঢ্যাঙা আর বেঁটে হওয়ার কারণ (সচিত্র) ... ৪৩৭
তালের গুড় (কষ্টিপাথর)—শ্রীঅনাদিবিহারী রায় ৬৪
টেবিলে নজরবন্দী খেলা (সচিত্র) ... ১৬১
দক্ষতা-শূন্য দরজা (সচিত্র) ... ৩৬৪
দীনতমা ঋষি দাসকন্যা উশীজের পুত্র নহেন—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব ... ৩৮০
দীর্ঘায়ু—শ্রীসুষমা সিংহ ... ৪৪৩
দুঃখের সুখ (কবিতা)—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ৫৩১
দুগ্ধবতী ছাগী—শ্রীসুষমা সিংহ ... ৬৬২
দুঃখোটা অঙ্ক (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৫৭৯
দুঃখ রঙন-গল্প—শ্রীনবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৪২
দুরবীণ বাছুর (সচিত্র) ... ২৭৮
দুর্ঘটনার বর্ম্ম (সচিত্র) ... ১৬২
দুই হাজার বছরের পাঁজি (কষ্টিপাথর)—শ্রীপাঁচুগোপাল দাস, এম-এসসি, বি-টি ... ১৬৭
দেশী ও বিদেশী—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ ... ৭৬
ধোপী কাপড় বিক্রেতাদের ঠিকানা—শ্রীশশাঙ্কভূষণ কর ... ৪৮৪
নারী ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ... ২৯৬
নানা কথা—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ও শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ৮৬, ১৭৭, ২৮৪, ৩৮৮ ৪৭১, ৫৭৩
পাকস্থলীর নৌকা (সচিত্র) ...
পাখীর রেশের মাফলার—অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল শীল, এম-এ ... ৩১৮
পুনঃ (কষ্টিপাথর)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭১
ধূমকেতু (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ২৬৭
নখের সখ (সচিত্র) ... ১৬৭
"নখের সখ"—শ্রীপরেশচন্দ্র সান্যাল ... ৪৮৫
নটরাজ শিব (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ ... ১২৩
নরবলি—অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বোষ, এম-এসসি ৫১১
নাছোড়-বান্দা (কবিতা)—"বনফুল" ... ৬৩
নারিকেলের ভেলা (সচিত্র) ... ৩৫১
নিম্ন শ্রেণীকে উচ্চ জাতিতে উন্নয়ন—কর্ণেল শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর ... ৩৮৫
নূতন গ্রহ ... ৩৬১
নোবেল পুরস্কার এবং নাটকীয় প্রতিভা (সচিত্র) ৫৫
পচাগাছের আলো—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৫১১
পঞ্চশস্য— ৯১, ১৫৭, ২১৬, ৩৫৭, ৪৩৭, ৫৩৬
পাণ্ডিত্য-সমস্যা—ডাক্তার সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এসসি ... ৩২৪
পুতুল নাচ (সচিত্র) ... ৩৬৩
পুরানো চিঠির ফাইল (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ... ৩৩২
পুরুষের স্ত্রীভূমিকা অভিনয় (সচিত্র) ... ৩৪৪
পুরের উপর খাল (সচিত্র) ... ১৫৮
পুস্তক-পরিচয়—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এলি; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ইত্যাদি— ১১৬, ২১২, ২৮১, ৩৯৪, ৪২৫, ৫৭৯
পৃথিবীর ঠিকুজী (সচিত্র) ... ৯৫
পোষা গরিলা—শ্রীসুষমা সিংহ ... ৪৪২
প্রাচীনকালে ধর্ম্মঘট (সচিত্র) ... ৫৩৫
প্রাচীন ভারতে পার্লামেণ্ট—শ্রীকাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, এম এ (অক্সফর্ড), ব্যারিষ্টার ১২৩
প্রাবৃট-পূর্ণিমার গান (কবিতা)—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ৩৭৭
পাঁউরুটির ছাঁচের ফুল (সচিত্র) ... ২৭৯
পাঁচশত বৎসরের পুরাতন টাইপ (সচিত্র) ... ২৮
পেপে বড় করিবার উপায় ... ১৬৪
ফুল (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৩৬৫
বই ছাপা আবিষ্কার—ইন্দ্রপ্রকাশের রায় ... ৩৭৮
"বই ছাপা আবিষ্কার"—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ... ৫৭৯
বঙ্গসাহিত্যে নারীসমস্যা (কষ্টিপাথর)—শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, এম-এ ... ৩৬৪
"বরিশাল গান"—বাঙ্গালাভাষার অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদি

সূচীপত্র।

[illegible] ... ১২
[illegible] (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ... ৩১৬
[illegible] (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ... ১৬৮
[illegible] (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ... ৩৭৮
[illegible] (সচিত্র) ... ১৫৭
[illegible] (কবিতা)—শ্রীঅমিয়কান্তি ... ১৬৬
[illegible] (কষ্টিপাথর) ... ১৬৭
[illegible] (সচিত্র)—[illegible] ... ৩৩১
[illegible] (সচিত্র) ... ৪৬০
[illegible] ও তরুণ সঙ্ঘ—শ্রীযুক্ত ... ৩৭৬
[illegible]—শ্রীযুক্ত ... ১৩৪
[illegible] (কষ্টিপাথর)—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীশিবেশ্বর তর্করত্ন ... ৩৮৮
[illegible] (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত ... বি-এ ৪২, ১৮৭, ২৬৬, ৩৭৬, ৫৫৭, ৫৬৫
[illegible] (কবিতা)—"বনফুল" ... ৪২১
[illegible] (সচিত্র) ... ৩৫২
[illegible] (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ... ৩৮১, ৪৭৭
[illegible] (সচিত্র)—নগেন্দ্রনাথ সিংহ ... ৪২৬
[illegible] (সচিত্র) ১০১, ১৯৫, ২৯৭, ৩৯৭, ৪৯৯, ৫৯৯
[illegible] (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ ... ১৭০
[illegible] (সচিত্র) ... ২৮০
[illegible]—শ্রীসুষমা সিংহ ... ৩৫২
[illegible] (সচিত্র) ... ৩৫৮
[illegible] (সচিত্র) ... ২৭৮
[illegible] ১০৭, ১৯৩, ২০৪, ৫০১, ৫৫৬
[illegible]—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি টি ... ১২৭
[illegible] (সচিত্র) ... ১৬২
[illegible]—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন ... ৩৭৭
[illegible] (গল্প) ... ৩৩৮
[illegible]—রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ... ৪৫৮
[illegible] (সচিত্র) ... ২৭৪
[illegible] (কষ্টিপাথর)—শ্রীযুক্ত ... ৬২
[illegible]—রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র ... ৩১৮
[illegible] (সচিত্র) ...

[illegible] ... ৫৭
[illegible] অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত ...
ভাদ্রের উষা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ...
ভাসিয়ার আশ্চর্য্য শক্তি (সচিত্র)
ভাসের অনুবাদক—শ্রীযুক্ত ...
ভিন্ন জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের বিবাহ—শ্রীযুক্ত ... শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বেদান্তশাস্ত্রী, এম-এ
মরমী কবি—শ্রীজয়ন্তীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মল্লিকাকুমারী (কবিতা)—শ্রীসরোজেন্দ্র ...
মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ছিলেন?—শ্রীযুক্ত ... ভট্টাচার্য্য
"মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ছিলেন?"—শ্রীযুক্ত ... শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভিরোধান ...—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
মাঘের ঘরে আড়িপাতা (সচিত্র)
যাদবী (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
যাদুঘরের ঘোড়া-রোগ (সচিত্র)
যাযাবর—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি
যামিনী (গল্প)—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ
যিশুখৃষ্টের রাজধানী কায়রো (সচিত্র)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
যুক্তি (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টবর্ত্তী
যুগের যন্ত্র (কষ্টিপাথর)
মেঘনাদবধের সাব্‌মেরিন (সচিত্র)
মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতট—শ্রীযুক্ত ...
মোটা কাপড়—শ্রীবিজয়চন্দ্র সেন
মোটা কাপড়—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়
মোহ (কবিতা)—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
যজ্ঞ-প্রসবিনী ও ... শ্রীসুষমা সিংহ
যৌবন (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
রাজসের দেশ (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত ... ব্যারিষ্টার
রাতকাণা—শ্রীসুষমা সিংহ
লম্বা চুল—শ্রীঅমলেন্দুচন্দ্র মৈত্রেয়
লাইব্রেরী—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, ... আই-ই
ল্যাম্প-পোষ্টের ফুলসজ্জা (সচিত্র)
শরদীয় প্রতীক্ষা—শ্রীযুক্ত ... বি-এল
শরৎ (কবিতা) অধ্যাপক শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ বি-এল
শিকারী বিড়ালের গোঁফ
শিবঠাকুরের চিকুনি (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত ... গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ

[illegible] (কষ্টিপাথর)—শ্রীহাসিত-
কুমার হালদার ... ৩৮২
[illegible] ও আমেরিকা (ছোটগল্প)—শ্রীমানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৪৫৮
[illegible]প্রভুর তিরোভাবের সময়—শ্রীভূধরচন্দ্র দাস ২৯৩
সহীহারা (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী, বি-এ ... ৫৪২
সংস্কার—অধ্যাপক শ্রীযুবলীধর বন্দ্যো-
পাধ্যায়, এম-এ ... ২৪২
সংযমন (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৫৬৯
সমান দৃষ্টি (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৪৮৬
সাধারণতঃ (কবিতা)—"বনফুল" ... ৪৫৫
সাধারণ পাঠাগারে কবি-শিক্ষা (সচিত্র) .. ৯১
সাধু সঙ্গ (কবিতা)—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ... ২৮৫
সাবান ব্যবহারে মশলা দূর হয় কেন ... ৫৪১
সাহিত্য ও সমাজ (কষ্টিপাথর)—শ্রীঅভয়মান দাশগুপ্ত ৬৮২
সুইডেনের শিক্ষাপ্রণালী (সচিত্র)—শ্রীপ্যারী-
মোহন সেনগুপ্ত ... ৪৯
সুকেশী (সচিত্র) ... ২৭৩
সুদীর্ঘ নিদ্রা—শ্রীসুষমা সিংহ ... ৩৬২
সুবুদ্ধি (কবিতা)—"বনফুল" ... ১৯২
[illegible] (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়[illegible] ... ২৮৫
সূর্য্যগ্রহণ—শ্রীবিমলাপ্রসাদ রায় ... ২৮৩
সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলা—শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় ... ১৮৩
সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—
শ্রীবিনোদবিহারী রায় ৩৮৩
"সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা"—
শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেন .. ৩৮৫
সেলাইএর কল (গল্প)—শ্রীনীহারবালা দেবী ... ১৭৫
সোজা থাক (সচিত্র) .. ২৭৭
সৌন্দর্য্যের কথা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত . ২
স্বদেশ-প্রীতি (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৬৮৯
স্বাস্থ্যতত্ত্ব—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু .. ৫৮৭
সোঁদাল ফুল (কবিতা)—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ... ২৭৬
হাতকাটা চিত্রকর (সচিত্র) ... ৩৫৭
হাতে লেখা বাইবেল ... ৫৮৫
হাসি (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৪৪৯
হিজলীধন মণ্ডলীর প্রদর্শনীর বিবরণ (সচিত্র) ... ৬৯
হীরার ইতিহাস (সচিত্র)—জহুরী ... ২৫৭
হেক্টর (গল্প)—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ৪৪৯

চিত্র-সূচী

অনুষ্ঠীবাক্রান্ত পচা ঘাসপাতার চাপড়ার সাথে
ফুলের গাঢ় সাধারণ চাষের গাছের গেড়-
গুণ পড় হইয়াছে ... ৩৩১
অভিকায় শামুক ও তাহার ডিম ... ২৭৮
অনিদ্রার প্রতিকার ... ১৫৯
আয়োর মাথা .. ৫৩
আফ্রিকান জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বানরের প্রতিবাসী
হইয়া ডাক্তার গার্ডনার ... ৩৪২
আবিসিনিয়ার গড় ... ১৮৩
কলের বীণাবাদিনী ও তার নির্ম্মাতা ... ৫৫৮
কংক্রিটের অখণ্ড বাড়ী ... ২৩
কায়রো মিউজিয়মে রেহবানীর মূর্ত্তি ... ১৮৬
কায়রোর পিরামিড ও স্ফিংক্স .. ৮৮৭
কারবারে বাঙালী ... ৬৮
কুমীর-টানা গাড়ী ... ২৭৫
কুলিনান্ হীরক—অনার্জ্জিত অবস্থায় .. ২৮৭
কুলিনান্ হীরক—কাটার পর দ্বিতীয় বৃহৎ খণ্ড ... ২৫৮
কুলিনান্ হীরক—কাটার পর বৃহত্তম খণ্ড ... ২৫৭
কুহু (খঞ্জন)—শ্রীকৃষ্ণসাথ গুপ্ত ... ২১৬
কূর্ম্ম-অবতার ... ১৬১
"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"—শ্রীঅনীন্দ্রকুমার বন্দ্যো-
পাধ্যায় ... ৪১৫
ধনির কাজে বাঙালী ... ৬৫
খাওয়ার সময় চুপ থাকো ... ৫৭১
খাটের ভিতর বন্দুকধারী .. ১৫৮
খেফ্রেনের প্রতিমূর্ত্তি .. ১৮১
খেলনা সহর ... ২৫
গভীর খাইতে না পাওয়ার কুফল ... ৬৭
গভীর খাইতে পাওয়ার সুফল ... ৮৯
গাছে লাগার উন্নতি ... ২১১

[illegible]	৫০৩
[illegible]	৫৩৯
[illegible]	২৭১
[illegible]	৮২
[illegible]	১৮৪
[illegible]	৩০১
[illegible] অধ্যয়নের ঘর	৯১
[illegible]	৫৩৮
[illegible]	৩৬২
[illegible]	৩৬৩
[illegible]	৫৩২
[illegible]	৩৬০
[illegible]	৩৬৫
[illegible]	৩৬৫
[illegible]	৫৫১
[illegible]	১৫২
[illegible]	৫৪০
[illegible] নাম বিলাতী	৩১২
[illegible]	৩০৮
[illegible]	৫৩৭
[illegible]	৬৬৫
[illegible]	১৫৮
[illegible]	১৬০
[illegible]	৩৪৫
[illegible]	৫২৮
[illegible]	৪২৮
[illegible]	৪৩০
[illegible]	৪৩১
[illegible]	১৬১
[illegible]	৩৬৫
[illegible]	৫৭১
[illegible]	৩০৮
[illegible]	১৮৫
[illegible]	১৮৩
[illegible]	৪৩২
[illegible]	১৬০
[illegible]	১৫৪
[illegible]	৫২

[illegible] হীরা	১
[illegible]	
গণের আলোর ঘর	
[illegible] টা হীরা	
পরীক্ষাগারে জীব-সৃজন	
পরীক্ষাগারে জীব-সৃষ্টির উদ্যম	
পাখনোড়া উড়ো-গাড়ী ও উহার আবিষ্কারক	
পালঙ্কের বিবর্তন	
পাউরুটির গায়ের ফুল	
পাঁচটি নামী ও দামী হীরা	
পাঁচশত বৎসরের পুরাতন টাই	
পিঁপড়ের ছেঁড়া বাসা জোড়া	
পিঁপড়ের বাসার জন্য [illegible] জোড়া [illegible]	
পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের ছবি	
পুরীর নিম্ন শ্রেণীর মানুষ	৫
পুরীর নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ী ঘর	৬
পুলের উপর থাম	১
পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় কেন ?	৯
পৃথিবীর ঠিকুজি	
পোকাদের আশ্চর্য্যকর বর্ম্ম	
প্রকাণ্ড চুলট	
প্রজাপতি-দূত (রঙীন) — শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও তাঁর [illegible]	
ফোনোগ্রাফ রেকর্ডে জিমের গলা কেমন করে [illegible]	
রেকর্ডে নিজের গলা এবং [illegible] নিয়ে	
জিমের বিস্ময়—জিম সমস্ত [illegible] পড়ে	
রেকর্ডে নিজের গলা শুনি [illegible]	
ব্যাঙাচি-কুলের চুলকাটা চুলুর	
ব্যাঙ্ক-নোট জাগিয়া [illegible] [illegible] [illegible]	
বড়পণ গণ্ডার কুমার	
"বর্ষা এসেছে তার দেখার দেখা" [illegible] প্রাচীর চিত্র হইতে	
বাতাস-কলে চালের কাজ	
বাতাসে ফোটানো আবিসের ছবি	
বিধবার ভাবলম্বনের উপায়	
বিভিন্ন ফেশ্‌র মোগড় ম ভুবন	
বিভিন্ন দেশের শিক্ষার অবস্থা	
বিভিন্ন প্রদেশের শ্রীশিবের চুলের	
বিরাট কচুগাছ	
বিষ্ণুমূর্ত্তি	
বুকের মাথা	
বুকের মাথা [illegible]	

[illegible]	... ৮৭১	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	... ১১৭
[illegible]হন ও সিংহবাহিনী দেবদেবীর মূর্ত্তি	... ৫৫৩	রাজাবাহাদুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহজী ও শ্রীযুক্ত চৈতন সিং	... ৯৩৫
[illegible]ম উপাখ্যান বা খুলকমণি	... ১৫৯	রোগের সংক্রমণ নিবারণের উপায়	... ৭১
[illegible]ড়ের বা যশম মণি	... ৩৫৯	লালা লজপত রায়	... ৫৯৮
[illegible]লের নীচে তাঁবু খুলাইয়া সেটাকে পোকার-মত গাছের উপর টানিয়া লাগানো হইতেছে	৩৫৯	ল্যাম্প্-পোষ্টের ফুলমালা	... ৬১৩
[illegible] মাছ	... ৬৩৮	বধূর প্রতীক্ষা—(ক) যৌবনে (রঙীন্), (খ) প্রৌঢ় বয়সে (রঙীন্), (গ) বৃদ্ধাবস্থা (রঙীন্)—শ্রীনন্দলাল বসু	১
[illegible]তিক ফুল	... ১৬২	শিকার প্রতিযোগিতা-মুসলমান দৌড়	... ৭১
[illegible]বিসন্ধের যাথা	... ৫৬	শীরদাঁড়া সোজা রাখ ও ঘড়ি	... ১১৩
[illegible]তের মেয়েগাড়ী	... ২৭৪	শিশুর প্রাণ রক্ষার উপায়	... ৬৬
[illegible]ছা ঘরে আড়ি পাতার জলটুঙ্গি	... ২০৮	শ্রীমতী ম্যাক্লিন—দূরদর্শিতা ও আশা হারায় ভূষিত	... ২৫৫
[illegible]লা-বিদ্যাপীঠের চারজন মহিলা গ্রাজুয়েট	... ৬০৪	সবচেয়ে লম্বা চুল	... ২৭৩
[illegible]লিনা-পুরুষদের নৃত্য	... ৫২৯	সুইডেনের একটি স্কুল-বাড়ী	৪৯
মালিনা স্ত্রীলোক	... ৫৫০	সুইডেনের স্কুলের কারিগরি ক্লাস	৪৫
[illegible]নীরা স্বদেশী ওয়াটার-প্রুফ পরিয়াছে	... ৫৩১	সুইডেনের স্কুলের ক্লাস ঘর	৫০
মাছুষের ঘোড়া-রোগ	... ৪৩৯	সুইডেনের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার পর ছুটি	৫১
[illegible]য়ের ফক্সিবিক্রেতা ফেরিওয়ালা	... ১৮৭	সুইডেনের স্কুলের ব্যায়ামঘর	৫১
[illegible]রের খলিফাদের সমাবিস্তম্ভ	... ১৮২	সুকেশী শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	... ২৭৯
[illegible]নের প্রাচ্য নারী	... ১৮৪	সুসির পড়ার ঘর	... ৩৯৬
[illegible]সমুদ্রের সব্‌মেরিন্	... ৪৪৩	সুসির বানান লেখা	... ৩৯৬
[illegible]পের জাতীয় ও আর্য্য জাতীয় লোকের অক্ষিপেশী	... ৪৪১	শ্রীরোগীরা কাঠ কাটিতেছেন	... ৪৩১
যক্ষ্মারোগীদের ব্যায়াম	৪৩২	হাতকাটা চিত্রকর, মুসির নাম ক্রাসোঁয়া ফেলু	৩৫৭
যক্ষ্মারোগীদের ভ্রমণ	... ৪৩২	হাতকাটা তরুণ আমেরিকান চিত্রকর	... ৩৫৮
[illegible]বদ্বীপ ও শ্যামদেশের প্রাচীনকালের পুতুল-নাচের পুতুল	... ৩৬১		

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

অজয়নাথ ঘোষ—		অমৃতলাল শীল, এম-এ, অধ্যাপক—	
বই ছাপা আবিষ্কার	... ৪৮৬	মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময়	... ১৭২
অতুলচন্দ্র রায়—		দ্রাবিড় দেশের রামায়ণ	... ৬১৮
সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলা	... ৪৮৩	অশ্রুমান দাসগুপ্ত—	
অনুকূলচন্দ্র বসু—		সাহিত্য ও সমাজ (কষ্টিপাথর)	৩৮৫
"গৈবী আওয়াজ"	... ৪৮৪	অসিতকুমার হালদার—	
অনুকূলচন্দ্র মৈত্রেয়—		শিল্পে সাময়িক প্রভাব (কষ্টিপাথর)	... ৩৮২
গঙ্গা তুল	... ৩৭৯	উপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, অধ্যাপক—	
অন্নদাশঙ্কর রায়—		ভারতের বিদেশী বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময়	... ২২১
বই ছাপা আবিষ্কার	... ৩৭৮	কালীপ্রসাদ জয়সওয়াল, এম-এ, (অক্সফোর্ড), বার-য়্যাট-ল—	
অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী—		প্রাচীন ভারতে পার্লামেণ্ট	... ১২১
মরণী কবি	... ৪৮৯	কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ—	
[illegible]—		চেনা-চেনা (কবিতা)	...
[illegible]	... ১৩৯		

ধূমকেতু (কবিতা) .. ২৩০
পুরানো টিউন বাইল (কবিতা) .. ৪৩২
হরপ্রসাদ বসু, বি-এ
ঈশ্বরের ওভারটাইম (কবিতা) .. ৩৮৭
হরবিহারী গুপ্ত, এম-এ, অধ্যাপক—
বঙ্গসাহিত্যে নারী সমস্যা (কষ্টিপাথর) .. ৩৮৪
হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
বিদ্যাসাগর প্রতিভার (গল্প) .. ১৭১
গোকুলচন্দ্র নাগ—
নাগিনী (গল্প) ... ৩৩
আলো ও ছায়া (গল্প) .. ১৬৫
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন—
[illegible] ... ২৯৩
[illegible] ... ৩৭৭
গোপীকৃষ্ণ মিত্র—
ভাবের উদয় (কবিতা) .. ১৯৫
[illegible] (কবিতা) .. ২৬২
[illegible] (কবিতা) .. ২৮৫
[illegible] (কবিতা) .. ৪৩৫
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ—
[illegible] .. ২৫
[illegible] (উপন্যাস) ৪২, ১৮৭, ২৬৬, ৩৬৬, ৪ ৯, ৫৬৫
[illegible] ৮৬, ১৭৭, [illegible], ৩৮৯
[illegible] .. ৯৮
[illegible] .. ৫৫০
[illegible], বেতারের বৈঠক, চিত্র-পরিচয় ইত্যাদি।
জগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—
[illegible] ... ৩৭৮
[illegible] ... ৪৫৮
জগেন্দ্রনাথ [illegible]—
[illegible] ... ১৯১
জগদানন্দ রায়—
[illegible] .. ২২৬
জগদিন্দ্রনাথ মজুমদার—
আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ ... ২৯৪
জাতিভেদ সমস্যা ও আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ .. ৪৮৩
জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ, রায় সাহেব—
[illegible] .. ৭৬
[illegible]—
[illegible] .. ৫৮২
[illegible]—
[illegible] (সচিত্র) .. ৩২৮
[illegible]—
[illegible] ... ২
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, [illegible] ডিরেক্টর—
নটরাজ শিব (সচিত্র)
অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি (সচিত্র) ১৩২
নিবারণচন্দ্র রায়—
কালিদাস কি বাঙালী? .. ১৩৩
নীহারবালা দেবী—
সেলারের কল (গল্প) ৯৪
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—
সুইডেনের শিক্ষাপ্রণালী (সচিত্র) ৮
আমেরিকার ভারতশিল্প (সচিত্র) ৩৯
জীবনরহস্য (কবিতা) ৭
উড়ুক্ষু বরিষণে (কবিতা) ৫৯
দেশের কথা ৬
দুখের সুখ (কবিতা) ৯১
পঞ্চপত্র, পুস্তক-পরিচয় প্রভৃতি
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি-এস্‌সি, সি-টি—
জাতিভেদ-সমস্যা ১৯৭
পাতিত্য-সমস্যা
এখন ও তখন
প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ—
সুরের সাথে (কবিতা) ৭
পাঁচুগোপাল দাস, এম-এস্‌সি, সি-টি—
দুহাজার বছরের পাঁজী (কষ্টিপাথর)
বঙ্কিমচন্দ্র সেন—
আলোকের ফুঁড়ি (কবিতা)
বনফুল—
নাছোড়বান্দা (কবিতা) ...
বিয়ের ফুল (কবিতা)
সাধারণতঃ (কবিতা)
বনমালী চক্রবর্ত্তী, বেদান্ততীর্থ, এম-এ, [illegible] ভিন্ন জাতীয় বরকন্যার বিবাহ
বসন্তকুমার চৌধুরী— বন্ধু
বিনোদবিহারী রায়—
সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ..
বিমলাংশুপ্রকাশ রায়—সূর্য্যগ্রহণ ..
বৈকুণ্ঠনাথ দেব—
দীর্ঘতমা ঋষি দাসকন্যা উর্বশীর পুত্র [illegible]
জাতিভেদ সমস্যা ও আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—
গঙ্গারাঢ় নগরের নাম ও অবস্থান (কষ্টিপাথর)
ভূষণচন্দ্র দাস—
শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময়
মণিকান্ত হালদার—
বাতাসের গান (কবিতা) ..

...ন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
মহাকবি কালিদাস কি বাঙালী ছিলেন ? ... ৩৩
বেতালের বৈঠক ... ১৯৩
বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুর, কর্ণেল—
নিম্ন শ্রেণীতে উচ্চ জাতিতে উদ্গম ... ৩৮০
...শচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—
পুস্তক-পরিচয় ... ২৮৫
সাম্যবাদ ... ৪১৩
বৈদিক সমিতিতে নারীর স্থান ... ৫২৭
...রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, অধ্যাপক—
সমাজ সংস্কার ... ২৪২
...নেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ—
বিধবার একাদশী (কষ্টিপাথর) ... ৩৮৮
...গোপালবাবু মুখুজ্জে—
শিবরের রাজধানী কায়রো (সচিত্র) ... ১৮০
...রেন্দ্রনাথ ঘোষ—নরবলি ... ৫১৩
...রেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ,
রায় বাহাদুর, অধ্যাপক—
মরিশাস দ্বীপ ... ৫৮
কোন্ পথে ? ... ২১৩
ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ... ৩৭৮
ভগ্নকুটীর (সমালোচনা) ... ৫৫৮
...ি রাও পণ্ডিত—
হাঙ্গরের দেশ (সচিত্র) ... ৫২৮
...রেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
গল্প বল ... ১
সাধবী (কবিতা) ... ৫৮
বিদ্যাতরঙ্গীর পত্র (কষ্টিপাথর) ৩৮১, ৪৭৭
...ন (কষ্টিপাথর) ... ৪৭৯
...ক্র সেন—মোটা কাপড় ... ৫৮৫
...রেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—
মোহ (কবিতা) ... ১৭৩
মুক্ত (কবিতা) ... ২৫৯
বাঁশি (কবিতা) ... ৩৪০
ফুল (কবিতা) ... ৩৪৭
সলজ্জ দৃষ্টি (কবিতা) ... ৪৮৬
দু-ফোঁটা অশ্রু (কবিতা) ... ৫৭৯
...মোহন কর—
দেশী-কাপড়-বিক্রেতাদের ঠিকানা ... ৪৮৫
কুষ্ঠ রোগ ... ৪৭৯
...রচন্দ্র সান্যাল—"নবের সখ" ... ৪৮৩
শান্তা দেবী, বি-এ—
চিরন্তনী (উপন্যাস) ১৭, ১৪২, ২৩০, ৩১৪, ৪৪৭, ৫১৯
শীতলাচরণ সেন—
...ক্রিয়া-সমস্যা ... ৩৭৯
...ক্রিয়ার্থে হাড়ি ... ৪৮২
সত্যচরণ পাঠি—
"জাতিভেদ সমস্যা" ২৯২, ৪৮৪
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—
বধূবোধন (কবিতা) ... ৩৭
সন্ধ্যাগমন (কবিতা) ... ৪৬৯
একটি তামিল কবিতা ... ৪৮২
ছন্দহিন্দোল (কবিতা) ... ৪৮৬
স্বদেশ-প্রীতি (কবিতা) ... ৪০৭
মল্লিকুমারী (কবিতা) ... ৫৩৬
করিবার কিছু নাই (কবিতা) ... ৫৭২
সর্দ্দার নিহাল সিংহ — ... ৩৮৯
বিদায়ে ভারতীয় চিকিৎসক (সচিত্র) ... ৪২৬
সীতা দেবী, বি-এ—
আলোর আড়াল (গল্প) ২৫৭, ৩০৩, ৪২১
মরীচিকা (গল্প) ... ৫৩২
সুধাংশুশেখর মজুমদার—
"মহাকবি কালিদাস কি বাঙালী ছিলেন ?" ... ৩১
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ—
দেওয়ালী (গল্প) ... ৫৫১
পঞ্চপত্র, পুস্তক-পরিচয় প্রভৃতি
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক—
কৌতুক রসের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব ... ৭৫৭
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—
পচাগাছের আলো ... ৩৯
সুরেন্দ্রমোহন বসু—
স্বাস্থ্যভঙ্গ (কষ্টিপাথর) ... ১৮২
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—
উড়ো চিঠি ... ৯
আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম (কবিতা) ... ৪২৯
সুরেশচন্দ্র চৌধুরী—
যৌবন (কবিতা) ... ১৪২
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
বাংলার নতুন সাহিত্য ও তরুণ সম্প্রদায় ... ৩৭৬
সুরেশচন্দ্র রায়—
"মোটা কাপড়" ... ৪৮৯
সুষমা সিংহ—পঞ্চপত্র ৩৬২, ৪৪২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই, মহামহোপাধ্যায়,
লাইব্রেরি ... ১১৯
হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—
অনু ও ভুনু (কবিতা) ... ৩৭
বর্ষাচিত্র (কবিতা) ... ৫৭৯
অন্ন-সমস্যা (কবিতা) ... ১
...বেন্দ্রকুমার নরকার, এম-এ, অধ্যাপক—
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদি [illegible]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৫ম ভাগ
৯ম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩২৭

গল্প বল

ছেলেটির পরনে লাল ফুটুস জামা সে বললে, "গল্প বল।"

দিদিমা বলতে সুরু করলেন, "এক মাছপুক্তুর, সেটিতে এক পুক্তুর, মাঝারের পুক্তুর—"

বুদ্ধবাবা হেসে বললেন, "তিন-চারে বারো।"

কিন্তু তার চেয়ে বড় ঠীক দিয়েছে রাক্ষসটা, "হাড় মাড় খাই—" নামভাব তার ছেলেটির কানে পৌঁছয় না।

বাক্ষসিনীটি তারা ছেলেদের ঘরে বন্ধ করে গম্ভীর ভাবে বললে, "তিন চারে বারো এটা হল সত্য যার মাঝপুক্তুর, সেটিতে এক পুক্তুর, সওাগরের পুক্তুর—ওটা এক দিয়ে, অমনি—"

ছেলেটির ঘরে সেই নানাচিত্রের সমুদ্র বেরিয়ে গেছে, সাঁতরিয়ে পার টিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার সিঁড়ি-পৈঠে পাড়ি দিতে থাকে, কিন্তু সেখানে ছেলেটির ছুটে পালি পায় না।

তিনি মনে করে এটা নিছক গল্প নয়, বেতের ছোটে এটা তোমার করা চাই।

বুদ্ধবাবা এই গল্পটির শেষে চুপ করে গেলেন। কি আর সে চায় না, এক ধাম ও আর মানে। কে [illegible] বুঝে বললেন। তিনি মনে করে দিলেন [illegible] কাবাগের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাড়ি-কাটা [illegible] বললেন, ইতিহাসে এর কোনো [illegible] পথে ঘাটে, সে কথা তিন চারে বারো।

তডক্ষণে হনুমান [illegible] ইতিহাস তার মনে কিন্তুতেই খাড়া [illegible]

পাঠশালা থেকে ইস্কুল থেকে [illegible] মনকে ঘুটঘুটে সোজা করা চলতে থাকে। [illegible] তোমাকে করা যাক, ঐ বাটুকু [illegible] "গল্প বল।"

গল্প থেকে দেখা যায়, শুধু [illegible] বয়সেই মানুষ গল্পপোকা হয়। [illegible] মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে [illegible] গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল [illegible] গেছে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে [illegible] গল্পের নেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার [illegible] শোধন করতে না পারলে মানুষকে [illegible] করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারবানা-ঘরে [illegible] জল থেকে মাটি নড়তে লেগে [illegible] পলদ্ধর্ম, পাপভারাকুল। [illegible]

থাকে থাকে গাথা হচ্চে;—চারদিকে মালমসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনো-মতে মনে করা যেতে পারত না যে তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমানুষী আছে। তখনকার কাণ্ডকারখানা যাকে বলে "সারবান্"।

তারপরে যখন সুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখী। কেউবা মাটিতে বাসা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দনৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউবা আকাশে ডানা মেলে সূর্য্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে সুরু হল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিকর্ত্তার কারখানার উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সবক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এতদিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেচে তাঁর বিজ্ঞানে, কারু শিল্পে, এইবার তাঁর সুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখীর জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা; সুখদুঃখ রাগবিরাগ, ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত! ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছায়, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্ত্তন! নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরপর দেখা হতেই প্রশ্ন এই, কি হল হে, কি খবর, তার পরে? এই "তার-পরের" সঙ্গে "তার-পরে" বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্চে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুয়ে মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে রামের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়; যে-রাজপুত্র সাতসমুদ্র-পারে সাতরাজার ধন-মাণিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য; আর সেই ভক্তিবিমুগ্ধ হনুমানের গন্ধমাদন বীজের কথাও সত্য যে-হনুমান গন্ধমাদনকে উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে নি। এই মানুষের পক্ষে আয়ুধের যেমন সত্য, দুর্য্যোধনও তেমনি সত্য। কোন্‌টার প্রমাণ বেশি, কোন্‌টার প্রমাণ কম সে হিসাবে সত্য নয়, কেবল গল্প হিসাবে কোন্‌টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌন্দর্য্যের কথা

সৌন্দর্য্য জিনিষটি কোথায়—বাহিরে না ভিতরে, জিনিষে না মনে? প্রথমতঃ বোধ হয় জিনিষটাই সুন্দর, সুন্দর বলিয়াই তাহা সুন্দর হইয়া দেখা দেয়। গোলাপ নিজেই সুন্দর, তাহার সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করি মাত্র; জ্যোৎস্নার ধবলতা সুন্দর, উষার অরুণিমা সুন্দর, সন্ধ্যার রক্তরাগ সুন্দর—তাহারই ছাপ আমার মনের উপর পড়ে, তাই তাহাকে দেখিতে পাই। সৌন্দর্য্যকে আমি সৃষ্টি করিতে পারি না; সৌন্দর্য্যকে দেখিতে, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি মাত্র। ঐ যে অসংখ্য তারকাখচিত সুনীল আকাশগুপ, ঐ যে লজ্জানীলপ্রবসনা যন্থরগমনা উদ্ভিন্নযৌবনা মেদিনী—ইহাদের যে সৌন্দর্য্য তাহা কি আমার খেয়ালের উপর নির্ভর করে? উহারা ত নিজের ধর্ম্মে, নিজের ঐশ্বর্য্যে, নিজের মহত্ত্বে মহনীয়, আমি শুধু পূজারী মাত্র। সৌন্দর্য্য জিনিষেরই মধ্যে, জিনিষেরই গুণ, উহা আমার বাহিরে; আমি, আমার মন নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট দ্রষ্টা ভোক্তা।

কিন্তু তাই কি? সৌন্দর্য্য যদি হয় বস্তুগত, তবে মানুষে মানুষে সুন্দরবস্তু সম্বন্ধে এত মতানৈক্য কেন? একজন দেখে এক জিনিস সুন্দর, আর-এক জন দেখে আর-এক জিনিষ সুন্দর। আবার একজনের কাছে যাহা সুন্দর, আর-একজনের কাছে ঠিক তাহাই কুৎসিত। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে কালো চুল, কালো চক্ষু সুন্দর; ইউরোপবাসীর দৃষ্টিতে সুন্দর কিন্তু নীল চক্ষু, সোনালী চুল। আবার নীগ্রোবাসীর কাছে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা যে ছোট ছোট বাঁকা বাঁকা পা, চেপ্‌টা নাক আর টেরা চোখ, আর্য্যজাতির কাছে তাহাই কুৎসিতের চরম। নিগ্রো-

সুন্দরী যে সৌন্দর্যের গরবে আঁটিয়া পড়েন, বনসুন্দরী তাহার বীভৎসতায় হয়ত মূর্চ্ছাই যাইবেন। দক্ষিণ-দেশবাসী ভালবাসেন সুস্পষ্ট আলোছায়া, গভীর রংএর বিচিত্র খেলা, পরিস্ফুট রেখা; উত্তরের মানুষ পছন্দ করেন কুয়াসা-ঢাকা ছবির ধূসর একাকার। জাতিতে জাতিতে যেমন, একই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও সেই-রকম ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ। কেহ উপাসক চন্দ্রাকৃতি মুখের, কেহবা ডিম্বাকৃতি মুখের; কেহ চাহেন তন্বী শ্যামা, তাহারও আবার তরুণ-অরুণবর্ণাভা। তুমি হয়ত শরৎরাত্রির পূর্ণিমার সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া আছ, আমার কাছে কিন্তু বর্ষার ঘোর অমানিশার মত সুন্দর আর কিছুই নয়।

ইহাতে প্রমাণ হয় এই কথা, সৌন্দর্য্যের কোন বস্তুগত সার্ব্বভৌমিক মানদণ্ড নাই। যে-রকম শিক্ষাদীক্ষার, যে-রকম আবহাওয়ার মধ্যে দিয়া মানুষ বা জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই অনুসারে তাহার সৌন্দর্য্যবৃত্তিও তৈয়ারী হইয়াছে। ভিতরের এই সংস্কারের মিল যতখানি ও যে-হিসাবে, সেই হিসাবে ও ততখানি মাত্র সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মানুষের মতের বা রুচির ঐক্য। বাহ্যবস্তু প্রত্যেকের ধাতুগত বিশেষত্ব বা সেন্সেরই উপর নির্ভর করে। এক একটা জাতি অর্থাৎ এক একটা আবহাওয়া এক একটা শিক্ষাপদ্ধতি (culture), এক একরকম রূপণা (typeএর) মানসজগৎ বা চিত্ত-রূপণা সৃষ্টি করিয়াছে; তাই দেশে দেশে এক এক ধরণের সৌন্দর্য্যের বিচার গড়িয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিও তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি ও শিক্ষার ফলে সৌন্দর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড তৈরি করিয়াছে—ব্যক্তির এই মানদণ্ড কোথাও তাহার দেশগত বৃহত্তর রুচিকেই অনুসরণ করিয়াছে বা সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে, কোথাও বা আর-এক দেশের শিক্ষাদীক্ষাজাত সৌন্দর্য্যকে অনুসরণ করিয়াছে, কোথাও বা তাহা ব্যক্তির নিজস্ব খামখেয়ালের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। আমি অপর লোকের বা অপর দেশের রুচি সম্বন্ধে সুস্থ যাহা তাহাকে ততটুকু মাত্র সুন্দর দেখি [illegible] রুচির সাথে খাপ খায়—অনভিষ্টটুকু অসুন্দর বোধ করি বলিয়াই আমার প্রাণ কিছুই সাড়া পায় না। [illegible], সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম রুচিরই প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি—সম্পূর্ণ নূতন [illegible] অদ্ভুত বলিয়াই তাহা সুন্দর দেখি। [illegible] বিপরীত গতি, একই তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া [illegible] ইহাতে যাহা বলিতেছিলাম তাহাই প্রমাণিত হয় [illegible] সৌন্দর্য্য বাহিরের কিছু নয়, তাহা ভিতরের [illegible] তত্ত্বের সারকথা হইতেছে কবির কথায়—

আমি মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।

বাহিরে যে জিনিষটা পাই তাহা সৌন্দর্য্য [illegible] একটা গড়ন, উপকরণের একটা সমাবেশ। [illegible] গড়ন, এই সমাবেশ সুন্দর বা কুৎসিত হইয়া [illegible] দেখে তাহার দেখিবার ভঙ্গীর তারের মধ্যে [illegible] দিয়া। চুল কালো বা সোনালী হয়, চুলের মধ্যে [illegible] বর্ণপরমাণু তাহার দরুন, কিন্তু তাহা সুন্দর কি কুৎসিত হইবে তাহা নির্ভর করে আমার সংস্কার আমার রুচি আমার [illegible] বা না লাগার উপর। [illegible] এ দার্শনিক তর্ক অবশ্য তোলা [illegible] তাহার প্রয়োজন নাই)। ভারতীয় বিদুষী [illegible] কাঠামোর—যে রেখা যে বর্ণ যে ছন্দবিন্যাসের সহিত [illegible] সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রকটিত করিয়া থাকেন, ইউরোপীয় শিল্পী সে রকমে করেন না, হয়ত তাহাকে বুঝিবেনই [illegible] কি তাহাকে সৌন্দর্য্য নাম দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন [illegible] আশ্রয় করিবেন আর-একরকম রূপকাঠামো [illegible]

কিন্তু সৌন্দর্য্যের আধার সম্বন্ধে [illegible] কি রকম গড়ন হইলে জিনিষটি সুন্দর দেখা যায়, [illegible] কাহারও সহিত কাহারও মিল না থাকিলেও [illegible] এক এই মূল-সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে, 'সুন্দর' এই [illegible] মধ্যে। এখন প্রশ্ন এই যে সৌন্দর্য্যের মূল [illegible] বা ভাব যাহা সকল মানুষে, তাহাদের [illegible] প্রকাশভঙ্গিমার ভিতরে, সমভাবে বর্ত্তমান, সে [illegible] কি? সে পদার্থটি যে কি, তাহা বুঝাইতে [illegible] জানি না, কারণ সকল সংজ্ঞার জিনিষই ব্যাখ্যার [illegible] অতীত। আমরা প্রথমে চেষ্টা করি এ [illegible] নয়, তাহা বুঝাইতে, সেইটুকু বুঝিলে উল্টা দিক [illegible] বোধহয় অনেকটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সৌন্দর্য্যবোধের তিনটি ধাপ বা স্তর আছে; সচরাচর আমরা তিন রকমে জিনিষের সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। জিনিষ সুন্দর হইতে পারে প্রথমতঃ চোখে ভাল লাগার জন্য, দ্বিতীয়তঃ প্রাণের ভাল লাগার জন্য, তৃতীয়তঃ বুদ্ধির ভাল লাগার জন্য। সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড, এই তিন রকম ভাল লাগার একটু বিশ্লেষণ আমরা করিতে চাই।

প্রথম চোখের ভাল লাগা। চোখে পড়ে জিনিষের বাহ্যিক রূপ, চোখ দিয়া শুধু যখন দেখি তখন পাই রেখা ও রেখাবিন্যাস; তখনকার ভাল লাগা বা সৌন্দর্য্য-বোধ হইতেছে আমার চোখের পর্দ্দা বা স্নায়ু আর তাহার উপর বাহিরের ঐ রেখার আঘাত, এই দুইএর একটা মিল সঙ্গতি। এই সঙ্গতি যত ঘনিষ্ঠ যত স্পষ্ট যত ফুট, বাহিরের রেখাবিন্যাস, জিনিষের রূপ, জিনিষটাই তত ভাল বোধ হয়, তত সুন্দর হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু মানুষ কেবলই চক্ষু নয়, কেবল চক্ষু দিয়াই সে জিনিষ দেখে না, দেখিতে পারে না! চক্ষু দিয়া আমরা যতই দেখি না কেন, চক্ষুর দেখাকে ন্যূনাধিক পরিমাণে বদ্‌লাইয়া ফেলে, রূপ-সৌন্দর্য্যকে রঙিন করিয়া তোলে আমাদের প্রাণের ভাল লাগা।

প্রাণের ভাল লাগা চোখের ভাল লাগার এক স্তর উপরে বা ভিতরে। চক্ষুতে ভাল লাগে জিনিষের স্থির অঙ্গ-রেখা, প্রাণে ভাল লাগে জিনিষের যে গতি যে ছন্দ। চক্ষু দিতেছে রূপ কাঠামো আর প্রাণ দিতেছে রঙ। প্রাণ হইতেছে আমার সমস্ত আধারের স্নায়ুমণ্ডলীর একটা স্পন্দনধারা, আমার বাসনা আবেগ ইচ্ছার এক সম্মিলিত আবেগ। আমার প্রাণের তালে তাল মিশাইয়া যে জিনিষের প্রাণ চলিয়া চলে অথবা আমি যে জিনিষটিকে বোধ করি আমার প্রাণের ছন্দে ছন্দিত, তাহা হয় আমার কাছে প্রিয়, সুতরাং সুন্দর। এ-ক্ষেত্রে বাহিরের আকার, উহার জ্যামিতিক রূপ আমার চোখে লাগে না; কিন্তু সে রূপ সে আকার সুন্দর দেখি, কারণ আমার প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য তাহার মধ্যে পাই এক খাদ্য এক পানীয়।

তারপর বুদ্ধির ভাল লাগা। বুদ্ধির দ্বারা আমরা পাই জিনিষের তত্ত্ব; তত্ত্বগ্রাহী হইয়া যখন আমরা জিনিষের স্তুতি করি, তখন সে জিনিষ আর-এক ধরণে সুন্দর হইয়া দেখা দেয়।

বর্ষার আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ যখন ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে ছড়াইতে থাকে, তখন তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকি; সুন্দর দেখি তাহাদের বাহ্য রূপ, তাহাদের সুবলয়িত রেখা-বিন্যাস—কালিদাসের যক্ষও যেমে প্রথম দেখিল উহার 'বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়' রূপ, দৈহিক সৌন্দর্য্য। তারপর তাহাকে আরও সুন্দর দেখিলাম যখন তাহার নিবিড় স্নেহের কৃষ্ণতায়, তাহার চলন গতিভঙ্গে আমারই প্রাণের আশা-নিরাশার, প্রতীক্ষা বেদনার ছায়াখানি প্রতিফলিত বোধ হইল; আমারই মতন সেও বুঝি বিরহী, ছুটিয়াছে চলিয়াছে তাহার প্রিয়-সকাশে। অথবা আর-একভাবেও ইহাকে সুন্দর দেখি, যখন উপলব্ধি করি সে ধরিত্রীর বুক জুড়াইতে চলিয়াছে—শীর্ণা নদীকে আপীন করিয়া, কেতকী কদম্ব ফুটাইয়া, শিখিনীকে নৃত্যপর করাইয়া, কৃষকবধূগণের চিত্ত হর্ষে ভরাট করিয়া; যখন বুঝি তাহার কি শক্তি, কি প্রভাব—যখন প্রাণে তাহার গুণমুগ্ধ।

প্রথমতঃ শরীরের রূপের সৌন্দর্য্য; এই চোখে-দেখা সৌন্দর্য্যতে মুগ্ধ হইয়াই শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গড়িয়া কেবা অঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা।

তারপর যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিহ্বল হইয়া বলি—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর

সেটি হইতেছে প্রাণের কামনার রূপে সৌন্দর্য্য। আর সুজনের পিরীতি লাভ করিয়া যখন বলি.

হামারি গৌরব কুহুঁ যাচায়লি
[illegible] টুটায়ব কে—

গুণ দেখিয়া যখন ভালবাসি তখন প্রেমাস্পদের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখি তাহা হইতেছে মনের বুদ্ধির পাওয়া সৌন্দর্য্য।

জাগ্রত চেতনায় এই তিনের সমন্বয়ে, কুমারীর নিজের

মানস নিলিত, নিখিলের সকল সুন্দর দেখে নিত [illegible]। তাই ইহাদের তৃপ্তি সৌন্দর্যের সবখানি নিঃশেষ করে না, চিরন্তন মূল রহস্যটি ব্যক্ত করে না। সৌন্দর্য্য যে আমাদের আরও এক গভীরতর স্তরে যাইয়া আঘাত করিতেছে; সেইটিই যেন উৎস, সেখান হইতে উঠিয়া সব প্রাণে দেহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই নিগূঢ় ইঙ্গিত দিকে যাইয়া শ্রীরাধিকা যেন পারিয়া উঠিতেছেন না, ব্যর্থ হইয়াই বলিতেছেন—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

এই নিগূঢ় অনুভবেই ভরপুর হইয়া গৌরী বলিতেছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

ইহা চোখের দেখা বেশার সৌষ্ঠব নহে, প্রাণের পাওয়া দিয়া নিঙ্কুষিত সাম্যাতরঙ্গ নহে, মনের খুব গুণাবলী নহে, ইহা হইতেছে অন্তরাত্মার 'ভাব'. ইহাকে যখন সৃষ্টি করে—

কুল শীল ধরম না শুনয়ে দিয়াগী না রহে
প্রীতিক দিয়ারে।

ইহাই উপনিষদের অতিআত্মপ্রিয়ের সেই প্রিয়, সেই রসো বৈ সঃ সেই যে যা আরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।'

চক্ষু দিয়া যতক্ষণ দেখি, প্রাণ দিয়া যতক্ষণ অনুভব করি, বুদ্ধি দিয়া যতক্ষণ বুঝি, ততক্ষণ যে সৌন্দর্য্য পাই তাহা নিরাকার ব্যক্তিগত জিনিষ অথবা একান্ত ব্যক্তিগত না হইলেও সেই হইতেছে পরিবর্ত্তনীয় পরিণামী— variable quantity—তাহা চিরন্তন সত্যটি নহে। মানুষে মানুষে চোখের দৃষ্টি-ভঙ্গিমায়, প্রাণের গতি-ভঙ্গিমায়, মনের আদর্শ-পরিকল্পনায় নিত্যকালই ফুটিয়া উঠিতেছে। দেশে দেশে যুগে যুগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এইজন্য সৌন্দর্য্য বোধে সৌন্দর্য্য হইতে সত্যটাই বিশেষ ভাবে দেখা যায়, সেই জন্যই বিরুদ্ধটি লোকায়। যতক্ষণ আমরা এই তিনের কোনো একটি দিয়া দেখি ততক্ষণ সৌন্দর্য্য আমার নিজেরই মনের, চক্ষুর বা আমার চোখের প্রাণের মনের অঞ্জন প্রলেপ দেওয়া।

কিন্তু তবুও মানুষের কেন মনে হয় সৌন্দর্য্য তাহার ভিতরে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা আকাঙ্ক্ষার [illegible] কিছুই নির্ভর করে না, আপন স্বতন্ত্র [illegible] প্রীত, আমি শুধু দেখি, রসোপলব্ধি করি, তাহার [illegible] গড়িতে চেষ্টা করি মাত্র? ইহার কারণ, সৌন্দর্য্য চোখের প্রাণের মনের সৃষ্টি নহে, সৌন্দর্য্য [illegible] ধর্ম্ম; আমার মধ্যেই নিহিত সেই নিগূঢ় [illegible] যাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতেছে [illegible] প্রাণ দিয়া মন দিয়া জিনিষের রূপের [illegible] ও গুণের মধ্যে তাহারই এক এক [illegible] করিয়াছে। আপন বিশেষ দৃষ্টি বিশেষ [illegible] জ্ঞানের প্রণালী দিয়া তাহারই সন্ধানে গেছিলে তাহাকেই আমাইয়া আনিতে চাহিয়াছে।

এইখানেই বিশ্বমানবের এক্য, এইখানেই [illegible] দেশকালপাত্রাতীত সার্ব্বভৌমিকতা। [illegible] প্রাণ ভিন্ন, মন ভিন্ন, কিন্তু তাহার আত্মা [illegible] কেন বিশ্বপ্রকৃতিরও সেই এক আত্মা। [illegible] আমা দিয়া যতখানি দেখি, 'রসো বৈ সঃ' যে তাহা [illegible] যতখানি জিনিষকে রসান্বিত দেখি, আমার চক্ষু [illegible] বা মন বা এই তিনের সমবায় যতখানি 'ভাবের' [illegible] পারিয়াছে, ততখানি সৌন্দর্য্য হইতেছে আমার [illegible] নহে কিন্তু বস্তুরই নিজের ধর্ম্ম; তখন [illegible] যে গঠন যে ভঙ্গিমা দিয়াই দেখি না কেন, সে [illegible] যে গুণে ভরিয়া আমি জিনিষকে সৃষ্টি করি না [illegible] হইবে ইহাদের অতীত সেই সর্ব্বমূলাধার [illegible] প্রতিকৃতি।

চাঁদ সুন্দর তাহা সুডোল বলিয়া নয়, তাহাতে [illegible] আছে বলিয়া নয় বা তাহা জিনিষের [illegible] নিজেই সুন্দর বলিয়া তাহার এসকল [illegible] চাঁদে যখন দেখি অনুভব করি চাঁদের [illegible] চন্দ্রও তাহার ভিতরকার আনন্দ ও রসসত্ত্বা [illegible] সুন্দর, আর-সব সেই সৌন্দর্য্যেরই অবলম্বন [illegible] মাত্র। সেই জন্যই জিনিষের প্রকৃত সৌন্দর্য্য [illegible] পারি তখন সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারি না কি [illegible] তাহার সৌন্দর্য্য—তাহা জিনে [illegible]

উঠিতেছে। আত্মায় যে সুন্দরত্ব তাহার প্রকৃতিই হইতেছে অনির্ব্বচনীয়তা।

সকল মানুষই সৌন্দর্য্যের পূজক। বিশ্বের মধ্যে আপনার মধ্যে সে একটা নিগূঢ় নিবিড় সুন্দরকে উপলব্ধি করিতেছে। তাহা কি সে জানে না, তাই কখন উহাকে বাহ্য রূপের সাথে, কখন লীলায়িত প্রাণতরঙ্গের সাথে, কখন বা বিচিত্র গুণাবলীর সাথে মিশাইয়া ফেলিতেছে; নিজের যে বৃত্তিটি প্রবল তাহারই সহায়ে উহাকে একান্ত অনুরঞ্জিত করিয়া ধরিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্য হইতেছে আরও ভিতরকার বস্তু, আমার ব্যক্তিগত জাতিগত বা সমাজগত সকল মানদণ্ডকে তাহা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে বিশ্বেরই ভিতরকার কথা, সুতরাং তাহার আছে একটা বিশ্বজনীন সত্তা। এ সত্তা বিশ্বজনীন তাই অনির্ব্বচনীয়, ইহার প্রকাশের ধারা অনন্ত; কিন্তু সকল প্রকাশের ধারার মূল্য হইতেছে ঐ গোড়ার বিশ্বজনীন অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্ম সত্তার সম্পর্কে।

'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ' বলিয়া সকল রুচির মর্য্যাদা নাই। রুচি ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই, দেশে দেশে কালে কালে পাত্রে পাত্রে তাহা এক এক ধরণের হইবেই; কিন্তু যে রুচি যতখানি সেই মৌলিক রসের অভিজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে, যতখানি 'আত্মনস্তু কামায়' করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে, ততখানিই তাহা সত্য তাহা পূর্ণ তাহা সার্থক। উপলব্ধির হিসাবে যে যতখানি এই আত্ম-সৌন্দর্য্যকে দেখিতেছে তাহা দেহ প্রাণ মন যে ধারাকে আশ্রয় করিয়াই হউক না কেন—সেই তত সুন্দর সৌন্দর্য্যকে দেখিতেছে; সৃষ্টির হিসাবেও দেহের প্রাণের বা মনের যে-কোন বেলার মধ্য দিয়া যে যতখানি ঐ আত্মসৌন্দর্য্যকেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সে সৌন্দর্য্যকে তত সুন্দর করিয়া গড়িতেছে।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য আমার ভিতরেও নয়, আমার বাহিরেও নয়—তাহা আছে এমন জায়গায় যেখান হইতে সে আমার ভিতর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে। সুন্দর আমার একান্ত কল্পনা নয়, তাহা শুধু মানসসৃষ্টি নয়, তাহা খাপ্‌ছাড়া পোসখেয়াল নয়; তাহা যে কোন-কিছু সত্যপ্রতিষ্ঠানের উপর দাঁড়াইয়া নাই, তাহা নয়। আকাশের কোলে যেঘচূর্ণের মত সে যে ঘুরিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, শেষে মিলাইয়া যাইতেছে বা জলের উপর শৈবালদলের মত কেবলই ভাসিয়া ভাসিয়া ছড়াইয়া যাইতেছে তাহাও নয়। আমার কল্পনা, আমার মানসসৃষ্টি বা আমার খেয়ালস্তবক তাহার সুচিক্কণ মৃণালদণ্ড প্রসারিত করিয়া দিয়াছে অন্তরের কোন গভীরে, কোন বিশ্বভূমিরই উপর ভর করিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই নিবিড় নিরেট স্থিতিকে সরাইয়া লও অথবা সংযোজক সূত্রটি কাটিয়া ফেল, দেখিবে মানসকুসুম বিবর্ণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আর সে অলক্ষ্য প্রতিষ্ঠানে সার যত, মৃণালদণ্ড সতেজ যত, বিশ্ব-আত্মা হইতে যতখানি রস সে টানিতে পারিয়াছে ততখানিই আমার কল্পনা ও খেয়াল সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(২)

আর্টে, কবির কাব্যে, শিল্পীর শিল্পে আমরা দেখি এই চেষ্টা, অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে অন্তরাত্মার সৌন্দর্য্যকে ফলাইয়া ধরা। বাহিরের গড়ন উপকরণ ভঙ্গিমা সমস্তই শিল্পী প্রয়োগ করেন ঐ মূল উদ্দেশ্যের প্রয়োজন অনুসারে। এসকল হইতেছে নিমিত্ত অবলম্বন—symbol মাত্র; হাতের কাছে সকলের জানা যেসব symbol আছে তাহা স্বীকার করিয়া সেগুলিকে ইচ্ছামত সাজাইয়া গুছাইয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া শিল্পী আপন কার্য্যোপযোগী করিয়া লন। গ্রীক শিল্পী বাহ্য প্রাকৃত জগৎ হইতে তাঁহার symbol তুলিয়া লইয়াছেন, ভারতীয় শিল্পী কল্পনাজগৎ হইতে (সূক্ষ্ম জগৎ বলিব কি?) তাঁহার symbol আহরণ করিয়াছেন—কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য একটা অন্তরাত্মার নিগূঢ় বিশ্বপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। যিনি এই জিনিষটি যতখানি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার symbol তত significant—অভিব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ—তাহা তত সুন্দর। আর যে রূপে এই অভিব্যঞ্জনা যতখানি নাই তাহা ততখানি কুৎসিত।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শিল্পীর সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একথা সত্য হইলেও ভগবানের সৃষ্ট জগৎ-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও কি একথা বলা যাইতে পারে? ভগবান যখন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তাহাকে পূর্ণ অভিব্যঞ্জনায় ভরপুর করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য কথায়, জগতে

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা অন্তরাত্মা আছে সেই অন্তরাত্মার সৌন্দর্য, সেই অন্তরাত্মার সৌন্দর্যে প্রত্যেক জিনিসই পরম সুন্দর। এই দিক দিয়া যদি দেখি তবে কুৎসিত বলিয়া কোন জিনিস নাই, থাকিতে পারে না; কুৎসিত কোথাও যদি কিছু দেখি, সব জিনিষকে সম্যক ভাবে সুন্দরই না দেখি, তবে বলিতে হইবে আমার প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ নাই, আমার রসানুভূতি পরিমার্জিত পরিসিদ্ধ নয়। বৃদ্ধা হউন কুমারী হউক, বৃদ্ধ হউক, রোগগ্রস্ত হউক, বাঘের বাপার হউক আর শূকরের খোঁয়াড় হউক, ধর্ম হউক বা অধর্ম হউক, কিছু আসে যায় না, সবই সমান সুন্দর। সৃষ্টির সবই যদি সুন্দর তবে কুৎসিতের ধারণা মানুষের কোথা হইতে আসিল? ঋষিরা বলিতেছেন, রসের মূর্তি সেই সুন্দর পুরুষ সদা মনোনাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। তবে কি তাহা সত্য নয়? কেন ও তিনি নাই, কোথাও তিনি কম আছেন, কোথাও বা তিনি বেশী আছেন?

না তাহা নয়, অন্তরাত্মার সুন্দর পুরুষ যিনি তিনি সর্বত্র সমভাবেই বর্তমান। বৃদ্ধও সুন্দর, রোগগ্রস্তও সুন্দর, শূকরের খোঁয়াড় সুন্দর, নরক সুন্দর, ময়ূর সুন্দর, কিন্তু বাঘও সুন্দর। তবে সুন্দর বলিয়া কতকগুলি বিশেষ জিনিষ বা বিশেষ ধরণের উপর মানুষের যদি পক্ষপাতিত্ব দেখি, তবে বলিব সেই সব জিনিষ সেই-সব ধরণ হইতেছে তাহাদের সহজ ও যোগ্যতম অবলম্বন বা প্রতীক (symbol)। এই সহজ কেন বলিলাম আর সেকথাই বা কেন বলিলাম তাহার ব্যাখ্যা দিতেছি।

নিজে নিজে সব জিনিসই সুন্দর, যে জিনিস যে ভাবে আছে নিজের দিক হইতে অর্থাৎ অন্তরাত্মার সেই ভাগবত সৌন্দর্যের দিক হইতে সে জিনিস সেই ভাবেই পরম সুন্দর। এই হইতেছে পারমার্থিক সৌন্দর্য—তোমার আমার এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই এখানে নাই, যদি থাকে তবে সে ইহা নয়। কিন্তু আর-একটি ব্যবহারিক সৌন্দর্য—সৌন্দর্য যখন একটা সম্বন্ধের মধ্যে আসে তখন যে তাহাকে সুন্দর বলিয়া বোধ করে—ইহা আমার, আমার ব্যক্তিগত বা [illegible] ব্যক্তির মধ্য দিয়া যখন যে ভাবে সে পারমার্থিক সৌন্দর্য রঞ্জিত হইয়া দেখা দেয়। ব্যক্তি বা ব্যষ্টির বিশেষ সত্তা সেই অনির্বচনীয় নিভৃততম সত্তার মধ্যে লীন হইয়া যায় না, পৃথক থাকিয়া তাহারই লীলা, যন্ত্র বা মুকুর দাঁড়াইয়াছে। তাই এখানে হাঁ ও না, ভাল ও মন্দ ও কুৎসিতের কথা উঠে।

মানুষ একই তুরীয় সৌন্দর্যকে দেখিতেছে। তুরীয় সৌন্দর্যের প্রতীক বা symbol সে আছে নিজের চক্ষু প্রাণ ও মনের বিশেষ বিশেষ ধর্মের। চক্ষু প্রাণ ও মন নিজ নিজ দাবি ও প্রয়োজন মত কতকগুলি জিনিষকে কতকগুলি ধরণকে বর্জন করে, কতকগুলিকে গ্রহণ করে। গ্রহণ করে তাহারই সহায়ে তুরীয় সৌন্দর্য সুন্দর হইয়া আর বর্জন করে যাহা তাহার মধ্যে তুরীয় সৌন্দর্য হইয়া দেখা দেয়। পূর্বে মানুষ যাহা প্রাণ ও মন যাহা সুন্দর বলে, সে সেই সৌন্দর্য নহে, বরং উহারা প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিপন্থী! একথা সত্য হইলে [illegible] সহায়েই আবার মানুষ আত্মার সৌন্দর্য দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। চক্ষু প্রাণ ও মনের যখন একান্ত করিয়া দেখি, ইহাদিগকেই সর্বেসর্বা আসল জিনিষটি ভুলিয়া যাই, তখনই কেবল প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতে পাই না, দেখি সৌন্দর্যের ছায়া কিন্তু ইহাদের দাবি যখন যথাযথ হয়, তুরীয়ের [illegible] লইয়া যখন ইহাদের মধ্যে নামিয়া আসি, তখন প্রাণে ও মনে সেই দিব্য সৌন্দর্যেরই সংস্পর্শ রূপ দেখিতে পারি, শুধু শুনিতে পাই, পিয়ানো পারি, কিন্তু ইহারা এক নূতন মূর্তিতে নূতন ভাবে আসিয়া ধরা দেয়। সেখানেই মানুষ সুন্দর; সৌন্দর্যের যদি এই রকম একদেশিত্ব লওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা হয় তবে তাহা এই যে মানুষ শুধু তুরীয় বৃত্তির সহায়ে তুরীয় সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট নয়, মানুষের পুরুষকার তুরীয় বৃত্তির সহায়ে যে তুরীয় সৌন্দর্যকে [illegible] করিতেছে তাহাকে চক্ষু প্রাণ ও মনের খাতির

নানা সামঞ্জস্যে মিলাইয়া ধরিয়া, আপন আপন বিশেষ রুচির রঙ দিয়াই তাহার একটা বিশেষ বিগ্রহ রচিয়া তুলিয়া। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য আগে দেখিতে হইবে, কারণ তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের উৎস, একথা গোড়ায় স্বীকার্য্য। আরও স্বীকার করিব দেহ প্রাণ ও মনের একটা অবস্থায় এই অধ্যাত্ম জিনিষটি আবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা স্বীকার করা যায় না যে দেহ প্রাণ ও মনের সকল অবস্থাই হইতেছে অধ্যাত্মের পরিপন্থী; দেহ প্রাণ ও মনের যেসকল সহজ স্বাভাবিক দাবি, তাহার ঠিক বিপরীত দাবির মধ্যেই অধ্যাত্মের প্রতিষ্ঠা। দেহ প্রাণ ও মনের যাহা তৃপ্তিকর নহে তাহাই একমাত্র হইতে পারে আত্মার তৃপ্তিকর এ কথা কোন কোন অধ্যাত্মবাদীর দল বলিয়া থাকেন বটে, আমরা কিন্তু তাহা মানিয়া লইতে রাজি নাই। আমরা বলি, প্রাকৃত মানুষ তাহার প্রাকৃত দেহ প্রাণ মন লইয়া সৌন্দর্য্যের যেসকল রূপ নির্দ্ধারণ করিতেছে, আধ্যাত্মিক মানুষ মোটের উপর সেই-সকল রূপকেই তাহার অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যের রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে; অন্য প্রকার, সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের রূপক সৃজন করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক, বৃথা কষ্টকল্পনা।

তারপর আর-এক কথা, সৌন্দর্য্য দেখা এক জিনিষ আর সৌন্দর্য্যকে পাওয়া আর-এক জিনিষ। যে সৌন্দর্য্যকে দেখি তাহা হইতেছে আত্মার সৌন্দর্য্য, তাহা সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান; কিন্তু যে সৌন্দর্য্যকে পাই তাহা হইতেছে দেহের প্রাণের মনের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মার যে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্যকে আমরা এই দুইভাবেই উপলব্ধি করিতে চাই। কিন্তু মানুষ-হিসাবে সৃষ্টজীব-হিসাবে শেষোক্ত সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। পুরুষের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তাহা নিত্য চিরন্তন সনাতন বিকারশূন্য, প্রকৃতি এই সৌন্দর্য্যকেই যুগের পর যুগে মানুষের ক্রমোন্নত ক্রমপরিলব্ধ বৃত্তির—দেহ প্রাণ মনের মধ্য দিয়া, ইহাদের বিশেষ বিশেষ ধারাকে অবলম্বন করিয়া সুপরিস্ফুট সুপরিণত হইয়া উঠিতেছে। শক্তির দিক দিয়া সামর্থ্যের দিক দিয়া প্রকৃতি যেমন দুর্ব্বলকে পঙ্গুকে সরাইয়া দিয়া ক্রমে বীরকে সমর্থকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে—অথচ দুর্ব্বলের মধ্যে পঙ্গুর মধ্যে ব্রহ্ম বা ভগবান যে নাই তাহা নহে; সেই রকম সৌন্দর্য্যের দিক দিয়াও প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটা প্রেরণা চলিয়াছে, দেহের প্রাণের মনের লক্ষিত কুৎসিতকে বর্জ্জন করিয়া, ইহাদের অভিরুচি-নির্ম্মিত বিশেষ রূপের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর জাগ্রত হইতে জাগ্রততর বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করিতে। ——— করার মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে, সন্দেহ নাই; সে সৌন্দর্য্যের দ্রষ্টা আমরা হইতে পারি ও হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যৌবনের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য মানুষ জীবনে তাহারই সাধক হইবে। বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল আলোড়ন ও ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আর-সকল-রকম শুদ্ধি ও বিকারের সাথে সাথে চলিয়াছে একটা æsthetic katharsis, তাহা ভিতরের সেই পুরুষের সেই মহান্ আত্মারই সৌন্দর্য্য বা রসবিকিরণ।

এই হিসাবে চক্ষু দিয়া মন দিয়া প্রাণ দিয়া আমরা ——— বিশেষ বিশেষ রূপের বা সৌন্দর্য্যের যে বিশেষ বিশেষ গড়ন দিয়া থাকি তাহারও সত্যতা ও সার্থকতা আছে। সৌন্দর্য্যকে বুঝিতে ও ধরিতে গিয়া মানুষ যে এই রকম বাহ্যিক প্রকরণকে আশ্রয় করিতে স্বতঃই চায়, তার আসল ভিতরের কারণ হইতেছে এই বাহ্যকে পরিশুদ্ধ করিয়া উহার মধ্যে সেই তুরীয় সৌন্দর্য্য আপনাকে ব্যক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। আর এইজন্য বাহ্য যেসব রূপ বা গড়ন বা ধরণ দেয়, মানুষের যাহাদিগের উপর স্বাভাবিক অনুরাগ সেসকল সেই তুরীয় স্বরূপ সৌন্দর্য্যের যোগ্য উপযুক্ত বিগ্রহ বা symbol।

এই তুরীয় বা অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যবোধকে হারাইয়া শুধুই যখন চক্ষুর বা প্রাণের বা মনের দাবি ও খেয়াল অনুসারে আমরা সুন্দরকে খুঁজি, সুন্দরকে পাই, তখন সে সুন্দরের মধ্যে অনেকখানি খাদ মিশিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাত্মের সহযোগে যখন ভৌতিককে শোধন করিয়া লই, তখন ভৌতিকের যাহা থাকে সেটুকু খাঁটি জিনিষ। মুক্ত পুরুষের বাহ্যিক আচরণও যে বদ্ধের আচরণ হইতে একেবারে বিভিন্ন হইবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তঃ—

সেইরকম সৌন্দর্য্যের প্রাকৃত মানদণ্ড অস্বীকার করিয়া ত্যাগ করিয়াই যে সৌন্দর্য্যের অধ্যাত্মসংজ্ঞা পাইতে হইবে এমনও কোন প্রয়োজন নাই।

দেশকালপাত্র অনুসারে সৌন্দর্য্যের আধার বিভিন্নরূপে কল্পিত ও অনুভূত হইয়াছে, সত্য কথা; তাই বলিয়া ইহারা যে কেবলই সংস্কারের বা অভ্যাসের ফল, তাহাও স্বীকার করা যায় না। রূপকল্পনা, মানুষের অধ্যাত্ম পুরুষের, তাহার চৈতন্যের যে সোক বা প্রতিষ্ঠান (status of consciousness) তার স্বভাব ও ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; সংস্কার বা অভ্যাস এই নিগূঢ় ভাব ও ধর্ম্মের দূরাগত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, কোথাও ইহার ইঙ্গিত শুধু দিতেছে, কোথাও বা ইহাকে সে বিকৃত করিতেছে; ইঙ্গিত যতটুকু ততটুকু সংস্কার বা অভ্যাস অসম্পূর্ণ, বিকৃতি যতটুকু ততটুকু ভুল বা মতিভ্রম। কিন্তু ব্যক্তিগত বা বাহ্যগত খেয়ালই তাহার সব কথা নয়। অধ্যাত্মের সেই চিন্ময়লোক বা ব্যক্তি ব্যষ্টি বা গোষ্ঠীর পক্ষে এক হইয়াছে, উহাদের রূপকল্পনা সকল সংস্কার ও অভ্যাসের মধ্য দিয়াই এলোমেলো হইয়াও কেমন একটা ঐক্য লাভ করিয়া উঠিতেছে। সুপ্রাচীন 'পেগান' ভাব (pagan conception) এক সময়ে জগতের ছিল সৌন্দর্য্যের সাধারণ মানদণ্ড (standard); ইদানীন্তনকালে একটা মিষ্টিক ভাবে (mystic conception) জগতের সৌন্দর্য্য বোধ আসিয়া হইতে চলিয়াছে। সৌন্দর্য্য যদি শুধু বাহিরেই থাকিত তবে ইহা সম্ভব হইত না; আর যদি শুধু ভিতরে মনেই থাকিত তাহা হইলেও ইহা সম্ভব হইত না।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

আলোকের কুঁড়ি

আমার আঁধারে ওহে আলোর ভিখারী!
কেন কাঁদ? ওরে ভোর আলোকের কুঁড়ি;
যে সুখের হিঁড়ি কালো আবরণ
তা দিয়ে ভোর দলগুলি খুলিবে যখন।
মরি, মরি, সে মাধুরী ধরিবে কি চোখে?
আমার আঁধার রাত্রি যেন নিকষের বুকে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

উড়ো চিঠি

জানুয়ারী ১৯, [illegible]

অমর,

এবার তার তোমায় বড় চিঠি লিখতে বসেছি। [illegible] কয়েক দিন হ'ল আমার মনের চারপাশে এক জমাট আলসেমি জড় হয়েছে আর সেই থেকে মনে দেহে এমন একটা চাঞ্চল্য এসে একটা বোঝা গেছে যে কেবল বুনো ঘোড়ার মতো ছুটে বেরুতে হচ্ছে। কিন্তু লোকটা আমি নিঃস্বার্থপর কিনা, তাই [illegible] সাপ্তাহিক পত্রসাহিত্যে হাতে কলমে না পড়ে তা আমার দৃষ্টি আছে। তাই এইসঙ্গে আর একখানি [illegible] পাঠালুম। চিঠিখানি লেখা আমার পাদরী-[illegible] এখন কাশীবাস করছেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের [illegible] মানুষ। এখন বয়েস প্রায় আশী। কিন্তু তাঁকে দেখতে—কিছুতেই বলবে না যে তাঁর বয়েস তাঁর বয়েস কেবল তাঁর চুলে। একটি [illegible] সারা গায়ে একটু কোথাও চামড়া কুঞ্চিত দেখলে মনে হয় সত্যযুগের মানুষ। তাঁর লেখা পড়লেই বুঝবে বিষয়টা কি। ইতি

তোমার [illegible]

ডিসেম্বর ২৭, ১৯১

অশান্ত,

কত দেখলুম কত শুনলুম, বয়েস [illegible] সেই সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে [illegible] দেশের ওপর দিয়ে কালের চক্রটা এমনি বিরাট [illegible] চলে' গেল যে তা অন্ধি অন্ধেরও চোখে পড়ে, [illegible] কারারও কানে লাগে।

সেই সেকাল, যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রথম [illegible] ইংরেজি সাহিত্যের স্বাধীনতার বাতাসে বিদ্রোহের [illegible] কার পুরস্কারটা যখন উকি মারবার মতো [illegible] সরে গেল—তখন উকি মারার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] লোকের চোখ একেবারে ঝলসে গেল—ভিতরে

কেউ বুঝলে না, বাইরে থেকেই ভাব্‌—তাইত ঐ যে ওরা অমন হাসিমুখে মোজা মাথা তুলে সাত সাগরে সর্পে বিচরণ করছে—সে ঐ যে ওরা কোট-প্যাণ্টালুন পরে বলে', কাঁটা-চাম্‌চেতে টেবিলে বসে' খায় বলে', ইংরেজি কথা কয় বলে'। আমরা সেদিন কেউ ভাব্‌তে পারিনি যে কোট-প্যাণ্টালুন যে আমাদের এমন করে' দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার কারণ কোট-প্যাণ্টালুনের ছাঁট-কাট নয়—তার কারণ এই যে ঐ কোট-প্যাণ্টালুনের ভিতরে এমন একটা মানুষ আছে যা নির্ভুল ভাবে জীবন্ত। আসলে আমাদের মন হরণ করেছিল সেই ভিতরের জীবন্ত মানুষটা, কিন্তু আমাদের বাইরের দৃষ্টি কোট-প্যাণ্টালুন পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগল না। তাই সেদিন আমরা ঘুণাক্ষরে মনে করতে পারিনি, যে, আমাদের এই ধুতি চাদর পাঞ্জাবী জিনিষটাই মোহন হয়ে দেখা দেবে যদি সেসব এমন মানুষদের শরীর ঘিরে থাকে যাদের সারা শরীর থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসছে—যাদের চোখে আলোর ঝলক, ঠোঁটে জীবনের রাগ, নাসারন্ধ্রে সারা আকাশের বাতাস—যাদের শির উঁচু, বাহু সবল, চরণে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা। তাই সেদিন বাংলার যা, বাঙালীর যা, সব বিলিতি মাপকাঠিতে না মাপলে আর চলল না—বিলিতি তরজমায় না দাঁড় করাতে পারলে আর মন উঠল না। সেদিন মাইকেল হলেন মিল্টন—বঙ্কিম হলেন স্কট্‌—রবীন্দ্রনাথ হলেন শেলী। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে এই যে মাইকেলও মিল্টন নন বা শেলীও রবীন্দ্রনাথ নন্‌।

তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তোমাদের ঐ বাংলা দেশটাতে হঠাৎ একটা কি হয়ে গেল তাকে ভেল্কিই বল আর তোমবাজিই বল আর miracleই বল—রাতারাতি একেবারে সব বদ্‌লে গেল! সমাজে মহাত্মা যাঁরা অন্তগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সাধনা ভিতরে ভিতরে চলছিলই,—সে সাধনার ফল ভিতরে ভিতরে জমা হয়ে উঠছিলই—জাতির অন্তরে অন্তরে কোথায় কোন্‌ গুপ্ত শক্তি সবার অলক্ষ্যে ওমরে ওমরে মরছিল—তাকে আজি সোজা স্পষ্টভাবে আঘাত করবামাত্র তা একেবারে সহস্রফণা অনন্ত নাগের মতো গর্জ্জে উঠল। তা দেখে আঘাত করেছিলেন যাঁরা তাঁরা ত অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হলেনই,—সারা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল—বাঙালী নিজেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত না হয়ে পারল না।

সেদিন থেকে সব উল্টে যেতে সুরু করল। নিজের দিক্‌চক্রবালে নিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরে এসে পূর্ব্বাচলের গগনে স্থাপিত হ'ল—আবিষ্কার করলুম পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের ওপরের আকাশ যে ডোবা সূর্য্যের রক্তলালিমে জবার মতো লাল হয়ে ওঠে তার চাইতে পূর্ব্বাচলের সোনা ভোরের সোনার আলোয় আমাদের জীবনের সঙ্গে জীবনের আশীর্ব্বাদ বেশী জড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিলে হ'ল—অক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের পরকে হিংসে করতে শিখিয়েছিল, শক্তি অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা ফিরে এল—বুঝলুম যে দেশী বটগাছটা বৈ ঘরে থাকার তার কারণ এ নয় যে তা বিলিতি ওকগুলি হতে পারেনি—তার কারণ হচ্ছে এই যে তা মাটি থেকে আকাশ বাতাস থেকে আপনার প্রচুর জীবনীশক্তি সংগ্রহ করতে পারেনি।

সে যা হোক্‌ মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, যে, ধারে কিনে জাতীয় মনটা কোট-প্যাণ্টালুন ছেড়ে ধুতি-চাদর পরল। তখন জান ত গুরুমারা বিদ্যে—একদিন আমরা যেমন যা-কিছু তারই বিলিতি তরজমা করতুম—সোয়ানা হয়ে তেমনি আবার বিলিতি যা-কিছু তারই দেশী তরজমা আরম্ভ করে' দিলুম। তাই দেশ passive resistanceএর তরজমায় সত্যাগ্রহকে পেল। কিন্তু আগে যেমন বলেছি, মাইকেল মিল্টন্‌ নন্‌ বা শেলী রবীন্দ্রনাথ নন্‌, তেমনি সত্যাগ্রহও passive resistance নয়। তুমি প্রশ্ন করতে পার কিসে নয়? ও-দুয়ের একই আরম্ভ একই সাধনা একই সিদ্ধি—তবে ও-দুয়ে কি প্রভেদ? বলছি—শোন।

কর্ম্মক্ষেত্রে—practical fieldএ—ও দুয়ের যে কেমন চেহারা দাঁড়ায় সে-সম্বন্ধে আমার কোনোই সন্দেহ পড়ে যায়নি। আমি যে-কথাটা তোমাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই, যে, ঐ যে passive resistance আর সত্যাগ্রহ ও-দুয়ের পিছনে দুটো বিভিন্ন রকমের মন আছে, দুটো বিভিন্ন রকমের মানস জগত আছে—ঐ দুটি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে দুটি বিভিন্ন রকমের—mental attitude থেকে এবং যে কারণে ও-দুটোর জন্ম দুটো বিভিন্ন রকমের

mental attitude থেকে সেই কারণে এ-দুয়ের মধ্যে একটা তফাৎ রাখতে বাধ্য।

এ-তফাৎ নেই তফাৎ যে-তফাৎ আছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে—ইয়োরোপে ও এশিয়ায়—ইংলণ্ডে ও ভারতে। এ-তফাৎ যে কি তা তোমায় আমি আঁক কষে বা জ্যামিতির থেন্ বা থরেম্ এঁকে বুঝিয়ে দিতে পারব না—তবে এ-বিষয়ে তোমার একটু ধারণা জন্মিয়ে দেবার মতো একটা উদাহরণ আমার মনে এখন আসছে। এ-তফাৎ যেটা এ-তফাৎ আছে ইয়োরোপের ও ভারতের দারিদ্র্যে। ইয়োরোপের দারিদ্র্য তার slumএ slumএ কদর্য্য রূপ দেখা দেয়—আর ভারতের দারিদ্র্যের চেহারা পর্ণকুটীর আর প্রাঙ্গণে সুখী তুলসীবৃক্ষ। ইয়োরোপের মানুষ দারিদ্র্যের মাঝে হয়ে ওঠে পশুর সামিল, ভারতের মানুষ তার দারিদ্র্যের মাঝে ভগবানের দিকেই মুখ ফেরায়। দুটি রোগই বলবে দেদিন আর নেই—আজ এ দেশেও slum গড়ে উঠছে! সত্যি—কিন্তু সে ইয়োরোপীয় সভ্যতার হাওয়ায় ও মুনফিবিজ্ঞানীর।

ইয়োরোপের কিংবা ভারতের জীবনের দোষ আমি চিহ্নিত করছি—তার দোষ তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি। এই রকম রাষ্ট্রনৈতিক ইয়োরোপ যেখানেই দাঁড়াতে না পারে সেখানেই পড়ে হয়ে যেতে পারে। সে যা হোক, ওই রকম একটা ইয়োরোপের বিরুদ্ধে passive resistance বলে একটা জিনিষ আমরা প্রয়োগ করছি। passive resistanceএর "passive" শব্দটা মাত্র—এর আগল শব্দটা হচ্ছে "resistance"। passive resistanceএর passive ভাব দেখে ইয়োরোপের লোকেরা চোখ, তার মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছেই। ইয়োরোপের সে রক্তচক্ষু চোখ ধাঁধিয়ে দিতে বা মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রশস্ত কপাটে ঘা মেরে ভেঙে ফেলতে হলে ইয়োরোপকে অন্ততঃ হাজার বছর তপস্যা করতে হবে—তার প্রকৃতি বদলে যায়। ইয়োরোপের অন্তরিন্দ্রিয়ের নাম ওনলে কেমন যেন লাগে—তাকে বুঝে ফেলাই চৈতন্যের প্রমাদ বলে। ইয়োরোপের জন্ম জ্ঞানের সঙ্গে অসীম কল্পনা—সেই জন্যে ইয়োরোপের মধ্যে একটা অন্ধ অকূল নিবিড় বেদনার দুঃস্বপ্ন উত্তরীয়—যে দুঃখ নিজের নয়—জগতের। দুঃখকেই বরণ করবার, বরণ করবার, বহন করবার শক্তি আপনাকে সত্য করে তুলেছে যেখানে সেখানে সে গ্রহের সভ্য আসন।

সেই কারণেই তোমাকে এই কথাটা বলি যে ইয়োরোপের passive resistance চলতে পারে, কিন্তু সত্যাগ্রহ নয়। আসলে ইয়োরোপের resistanceকে যে দুর্বলের বল বলা যায় সেটা ইয়োরোপের মনে বলের যে ধারণা আছে সেই ধারণা! এবং সে ধারণা হিসেবে ইয়োরোপীয় শক্তিকে কেবল বাইরের দিক থেকেই দেখে ভারী ভারী কামান, ডুবুজকে ঝুড়িকে বন্দুক একশ'-কুড়ি বার ছুড়তে পারে এমন বাইফেল, দু'শ'-চল্লিশ মাইল যেতে পারে এমন এরোপ্লেন। মানুষের অন্তরের শক্তি বাইরে যে আর কি অনুবাদিত করেছে সেই বাইরের দিকেই ইয়োরোপের বিশেষ দৃষ্টি। তাই ইয়োরোপের সৈন্যের যোগ ইঞ্চি কামান যা তিন মাইল দূরে একটা শেল ফেলে পনের-ফুট ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের প্লেটকে অক্লেশে ভেদ করে যেতে পারে ইয়োরোপের মনে এ-কথা সহজ ভাবে জাগে যেটা মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে যাকে ঐ লোহা ভেদ করতে পারেই না—যদি বা পারে তা হলে মুহূর্ত্তেই জোড়া লেগে যায়। একদিন খ্রীষ্ট যে সাক্ষোপাঙ্গ ফ্রান্সে যা করেছিল, আর ও ফ্রান্স রাশিয়ায় যা করেছিল—অষ্ট্রিয়া ইটালি যা করেছে ও-ডায়ার ও অ-সার ডায়ার সেদিন যা করে পিছলে সর্ব্বত্র ইয়োরোপের ঐ বাহ্যবেধ ভাবে যে লোহার গোলা চালিয়ে মানুষের করা যায়—যে-দুষ্টির যন্ত্রণা যে কামানের ছাপ্পান্ন ফুট লম্বা চোঙ্ গর্ভের বড়।

কিন্তু আমাদের যন্ত্রণা অন্য রকম। যা বাহুবল বা অস্ত্রবলের দ্বারা একেবারে নাশ

শক্তির আমাদের দ্বিতীয় স্থানে। এই আত্মবলের কাছে বাহুবলকে পরাজয় মান্‌তেই হবে—তবে ধীরে ধীরে তিলে তিলে। এই সত্য সত্য বলেই আমাদের আশা—নইলে চারিদিকে তাকিয়ে যে জিনিসটা দেখ্‌বে সেটা হচ্ছে একটা কেবল অসম্ভবতার রাজ্য।

আমার ওপরের ওই কথা আমাদের old style philosophy বলে' ভ্রূকুঞ্চিত করে' থেক না—কেননা আমি জানি যে তোমাদের নবীনের দলের আমাদের যা-কিছু পুরোনো তাকেই উড়িয়ে দেবার দিকে একটা ঝোঁক আছে। আমি অবশ্য সেটাকে অমঙ্গল বলে' মনে করিনে, কেননা যদি সমাজ বাস্তবিকই জীবন্ত হয়ে ওঠে তবে ঐ উড়িয়ে দেওয়াতে আমাদের পুরোনো যা-কিছু সত্য তাকে সত্য করে' ফিরে পাবার সম্ভাবনাই বাড়্‌বে। কারণ সত্যকে সত্যি সত্যি অভিনন্দিত কর্‌তে পারে সেই মন যে-মন মুক্ত। কিন্তু যে-মন কোনদিন সত্যকে বিচার কর্‌বার অবসর বা শক্তি পায়নি সে-মন সত্যকে বহন কর্‌তে পারে বটে—কিন্তু সে চিনির বলদের মতো অর্থাৎ তাতে তার দাসত্বই বাড়ে কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। সত্য জীবন্ত, যখন মন জীবন্ত। সেদিন কার মুখে শুন্‌লুম কে বল্‌ছিলেন যে পলিটিক্সে absolute wisdom বলে' কিছু নেই। পলিটিক্সে absolute wisdom বলে' কিছু আছে কি না জানিনে, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে absolute truth-এরও কোন মূল্য থাকে না যখন তা এমন একটা মনের ওপরে এসে পড়ে যে-মনের হাঁ-নাও নেই নড়-চড়ও নেই। আবার অন্য একটা জিনিস দেখ। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে কিন্তু আমরা কবির যে লাইনটা রাতদিনই আওড়াই সে লাইনটার কবিত্ব যে কতখানি তা আর অবশেষে তেমন মনে লাগে না। তেমনি যে-সমস্ত সংস্কার জাতীয় মনের গায়ে অত্যন্তভাবে সংলগ্ন তাদেরও তেমন ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। এই কারণেই তোমাদের নবীনের দলের যে পুরোনো যা-কিছু তা থেকে নিজেদের আল্‌গা করে' নেবার ঝোঁক সেটাকে আমি অমঙ্গলের মোটেও মনে করিনে। চাই কেবল সচলতা, জীবন্ত ভাব, স্বাধীন গতি। তারপর আর কোনো ভয় নেই। Blood must tell—রক্ত বলের চাইতে ধর্ম্মই—সমাধের চাইতেও। ঐ রকম আল্‌গা হয়ে গেলেই যে সবাই তোমরা একবারে সাহেব হয়ে যাবে আর বাংলাদেশ একটা কালো ইংলণ্ডে পরিণত হবে এ যাঁরা মনে করেন তাঁদের মতো জ্ঞান আমার নেই। তবে এ-কথা ঠিক যে তোমরা আর বশিষ্ঠ বাল্মীকিও হুবহু হয়ে উঠ্‌বে না। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে তোমরা ইংরেজি পড়েছ বা তোমাদের পুরোনো যা-কিছু সে-সবেরই পিছনে একটা প্রকাণ্ড স্পষ্ট জিজ্ঞাসাচিহ্ন টিপ্‌ দিয়ে দেখ্‌তে সুরু করেছ। তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে সেটা ছিল ত্রেতাযুগ আর এটা হচ্ছে কলিকাল। যদি কেউ বলেন যে আমরা আর সংস্কৃত বাক্য কই না, বাংলা কথা বলি, সুতরাং সে-যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঋষিদের বংশধরের দাবীর অধিকার আমরা হারিয়েছি—তবে সেটা কেমন হাসির কথা হয় বল ত? সে-কালে আট বছরে মেয়ে বিয়ে দিত, এ-কালে দিচ্ছে পনেরোয় সুতরাং তোমরা সব জাত হারিয়েছ; সে কালে "বটন"-টারই চল ছিল, এ-কালে মুর্গিটারও আমদানি হল,—সুতরাং তোমরা সবাই ম্লেচ্ছ; সে-কালে রাধাকৃষ্ণেরই গান গাওয়া হত, এ কালে সাগরের সঙ্গীতও লেখা চল্‌ল, সুতরাং বাঙালীর বাঙালীত্ব আর রইল না;—এ-যুক্তিগুলিও ঠিক তেমনিই হাসির কথা। কারণ এ-দুয়ের পিছনে একই মতলব। সেটা হচ্ছে মানুষের সমাজকে "তাসের বাড়ী" করে রাখা। কিন্তু সেটা অসম্ভব, কেননা সৃষ্টির তা মতলব নয়।

কিন্তু সে যাই হোক্, তাই বলে' আমি শক্তি সম্বন্ধে উপরে যা বলেছি তা যদি একেবারে উড়িয়ে দাও—তবে ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। তবে এই দাঁড়ায় যে মানুষের আত্মার চাইতে মন বড়, মানুষের মনের চাইতে তার হাতের পেশী বড়, সে পেশীর চাইতে তার কাঁধের বন্দুকটা বড়। তা যদি সত্যি হয় তবে কি ভীষণ অবস্থা মনে কর। তবে আজ যারা ইসোরোপে মোটা মোটা চোখা চোখা পেয়েক-বসান এমিউনিশান বুটের তলে পড়ে আছে তাদের অনন্ত ভবিষ্যতেও কোন আশা নেই। কিন্তু অশান্ত, সান্ত্বনার কথা এই যে তা সত্য নয়। কিন্তু তা যে সত্য নয় তা ইসোরোপে race consciousness প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পারে

না। তা নাই পারত তবে ইয়োরোপের ইতিহাসের ভিন্ন এক চেহারা আমরা দেখতে পেতুম বলে' অন্ততঃ আমার বিশ্বাস।

কিন্তু ভুল বুঝো না। আত্মবলকে আমি উঁচুতে স্থান দিচ্ছি বলে' বাইবেল যে কেবলই সয়তানের একটা খাসা এ-ধারণা তোমার নয়। কিন্তু সে কথা এখানে টেনে আনব না। টেনে আনলে এ চিঠিখানা এমনি জটিল হয়ে উঠবে যে তা ভুমি মারাত্মক রকমের ভুল বুঝবে হয়ত। সে-কথাকে একদিন বিশদ করে বলব যখন তোমার তাম আয়ত্ত পাবে—অবশ্য যদি ততদিন বেঁচে থাকি।

আমার এইখানে আমি তোমাকে আমার একটা অনেক দিনের দেখা স্বপ্নের কথা বলব। সেটা হচ্ছে এই যে উইলিয়াম আর্চার সাহেব "Barbarian barbarism, barbarous" বলে' চীৎকার করে' মরছি গলা ভাঙুক না কেন এই ভারতই ক্রিশ্চিয়ান ইয়োরোপের চেহারাখানি সভ্যতার একটা জিনিস গ্রহণ করবার অন্তত চেষ্টা করছে যা সভ্যতার উঁচু স্তরের কথা—কেননা তা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথা। ইয়োরোপের politics বল, commerce বল, industry বল, এর পিছনে আছে মানুষের যুযুৎসু আত্মা। বলছি না যে সবারই বুদ্ধ হতে বলে বা হওয়া সম্ভব, কিন্তু race consciousness বলে' একটা জিনিস আছে। ইয়োরোপের এই race consciousness যেখানে মানুষের প্রথম পৃষ্ঠা—সিধা প্রথম পৃষ্ঠা নয়, তা একেবারে হাঁপানী নভেলের রঙ্চঙ্গা মুড়ানো পাতা, মানুষটির ভিতরের পৃষ্ঠাগুলো তার কবে বন্ধই হয়ে গেছে। সে পৃষ্ঠাগুলো খুলবার কথাও ইয়োরোপের মনে আসে না। যদি বা ওঠে তবে তা commerce ও industry, কতটা সুবিধা বা অসুবিধা হবে তারই হিসেবে। আমার বিশ্বাস পাতাগুলো মানুষকে খুলতেই হবে—commerce-এর মোনা-রূপোর হিসেব করে নয়—মানুষের হিসেব নিয়ে, কেননা ঐ যে মানুষের সত্য। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ থেকে আরও বৃহতে মানুষকে খোঁজাই মানুষের সার্থকতা, তার আত্মার তৃপ্তি। মানুষের আত্মার চিরন্তনের দাবী যে ইয়োরোপের কানে পৌঁছাচ্ছে না তার কারণ জগতের কিনারায় যে সে আজ দেখছে—ইয়োরোপের বাহিরে সমস্ত পৃথিবী যে আজ ইয়োরোপকে ঈর্ষা করছে। আজ সমস্ত অশক্ত পৃথিবীর অন্তরের মর্মর-ধ্বনি বহন করে' চলেছে।

কিন্তু এই কথাটা কোনোদিনও ভুলে যাও না গ্রহীতার মধ্যে যোগ্য অযোগ্য আছে—দাতারও তেমনি যোগ্য অযোগ্য আছে। যে কারণে একমাত্র তারই যে শক্তিমান। পৃথিবীতে যে বঞ্চিত করতে পারবে তখনই যখন সে হবে শক্তিমান অন্তরে। শক্তিমান কেবল ভিতরেই নয়—বাহিরেও। সহরে বড় বড় অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে মোটমোট যত বড় বড় লোকই দেখ না কেন, যে মনের জগতে অধিকাংশ লোকই যাকে বলে তারা বাইরে খোলা চোখে স্পষ্ট না দেখলে কিছু সেই জন্যেই বলছি যে শক্তিমান হ'তে হলে বাহিরে দুই-ই। কেননা, তুমি শক্তিমান বলতে ঘরে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না বলে সব পঞ্চমুখে উপবাসের মহিমা কীর্তন সুরু করে সেটা শোনাবেই বা কেমন আর কেরে বা কেমন। কিন্তু যাক্ সে-সব—বলছিলুম কথা।

বলছিলুম ইয়োরোপের শক্তির ধারণার কথা। রোপের শক্তির ঐ ধারণার দিক থেকে সভ্যতাই দুর্বলের বল। কিন্তু যে মুহূর্তে ইয়োরোপ ধারণাকে মন থেকে খারিজ করে' দিয়ে ধারণার দিক থেকে দেখবে, তখনি দেখতে দুর্বলের হাতের বল নয়—তা হয়ে পারে আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমানের। এ-ই শক্তি দুঃখকে বহন করবার শক্তি বড় ভেবে দেখ—মানুষের সমস্ত—তার দেহ অহঙ্কার প্রতি মুহূর্তে সজ্ঞানে অজ্ঞানে দুঃখকে দিচ্ছে—যেখানে দুঃখ যেখানে কষ্ট সেখানেই তার সংগ্রাম। তার মন প্রাণ বরণ করবার বিপক্ষে। এমনি তার সহজ প্রবৃত্তি

যতদিন তার এই সহজ প্রকৃতির ওপরে না উঠেছে ততদিন তার পক্ষে দুঃখকে বরণ করে' নেওয়া অসম্ভব—সত্যাগ্রহ তার হাতে হয়ে উঠ্‌বে দু'ধারী তলোয়ার—দু'দিক দিয়েই যাতে সে কাটা পড়্‌বে।

মানুষের কাঁধের বোঝা আর মনের বোঝা এ-দুয়ের ঠিক উল্টো নিয়ম। মানুষের কাঁধের বোঝাটা যত বড় তার ভারও তত বেশী। কিন্তু মানুষের মনের বোঝা সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যত বৃহৎ হতে থাকে তার ভারও তত লঘু হয়ে আস্‌তে থাকে। মনে নিজের বোঝা বওয়া সব চাইতে কঠিন। আত্মীয়-স্বজনের বোঝা বওয়া তার চাইতে সোজা, দেশ বা সমাজের বোঝা বওয়া আরও সহজ, বিশ্বের বোঝা বওয়া তার চাইতেও সহজ। এর কারণ মানুষ যতই সংকীর্ণতাকে তাড়াচ্ছে ততই সে আপনার ছোট আমিকে হারাচ্ছে—আর যা কিছু অশক্তি নিরানন্দ, তা ঘিরে আছে মানুষের এই ছোট আমিটিকে। আর এই ছোট আমিটিই হচ্ছে মানুষের সহজ প্রকৃতির দেবতা। যে দেবতা মনে করে যে সে-ই হচ্ছে এই বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রটা।

তাই এই কথাটাকে স্পষ্ট করে' মনে রেখ যে যতদিন মানুষ তার এই ছোট আমিটাকে তার সহজ প্রকৃতিকে অতিক্রম না করেছে ততদিন সে দুঃখের দানকে বরণ কর্‌বার সাহস বা বহন কর্‌বার শক্তি লাভ কর্‌বেই না। সত্যাগ্রহেও তার অনধিকার—এই অনধিকারে হাত দিলে উল্টো ফল হতে বাধ্য।

তাই আমরা দেখ্‌তে পেলুম পাঞ্জাবী কাণ্ড। সত্যাগ্রহের পিছনে এ-কথাটা ছিল না যে আমরা আমাদের শত্রুকে সমস্ত মন প্রাণ আত্মার আগ্রহ দিয়ে আঁকড়ে থাক্‌ব আর বিপক্ষ শক্তি আমাদের দুধ ভাত খাইয়ে আমাদের সেই শক্তিকে পুষ্ট কর্‌বে। ঐ উপায়ে যে কোনো শক্তি পুষ্টিলাভ করে না সে-কথাটা এখানে নাই তুল্‌লুম। কিন্তু যে কথাটার সম্ভাবনাকে প্রায় নিশ্চয় জেনে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই যে বিপক্ষ শক্তি এই সত্যাগ্রহের শক্তিকে নত কর্‌বার জন্যে আমাদের মনের ওপরে প্রাণের ওপরে দেহের ওপরে যত প্রকার দুঃখকেই জমা করে' তুল্‌বে কিন্তু তবুও আমরা সেই সত্যকে বহন কর্‌বারই আনন্দে সে-সকল দুঃখকে বরণ করে' হিমাদ্রির মতো অচল অটল দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। তাতে উদ্দেশ্য সফল যদি নাও হত, অন্ততঃ সেই সত্যাগ্রহের আনন্দ থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌ত না—যে-আনন্দই হচ্ছে সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্য পাওনা। সত্যের এই রূপ আছে বলেই, এই আনন্দ দেবার ক্ষমতা আছে বলেই শিখ তার শিকির সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটাও দিতে ইতস্ততঃ করে না—এবং তার ভিতরেই সে অমৃত খুঁজে পায়। বিসর্জ্জনে বড় আনন্দ আছে বলেই তা বড়। নইলে কেবল নীতিশিক্ষা পড়ে' কে আত্মত্যাগ কর্‌ত?

কিন্তু বজ্র যখন পড়্‌ল তখন আমরা কি দেখ্‌লুম? দেখ্‌লুম, যে নিক্ষিপ্ত বজ্র একদিন ফিরে গিয়ে নিক্ষেপকারীকেই ভস্ম কর্‌বে, তা দিকে দিকে আগুন ধরিয়ে দিলে। মানুষ আঘাত যখন পায় তখন আঘাতকারীকে তার সুদসুদ্ধ ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা না করা যে কত কঠিন! বিশেষতঃ সেই আঘাত যখন হয় কেবল অহঙ্কারের আঘাত।

বিরোধকে ক্ষমা দিয়ে ভূষিত কর্‌তে, ক্রোধকে অক্রোধ দিয়ে জয় কর্‌তে পারে কে? যে স্বর্গের দেবতা। অর্থাৎ যে আঘাতকারীর চাইতে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ। অন্যায়কে ক্ষমা করে' চলে কে? পথের বুভুক্ষু কুকুর। অর্থাৎ যার প্রকৃতই অন্যায়কে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ঐ দেবতা হবার মতো কোন্ শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা গিয়েছি? অন্যায়কে এতকাল আমরা কুকুরের মতোই বহন করে' এসেছি। হঠাৎ সেই অন্যায়কে যে আজ আমরা দেবতার মতো ক্ষমা দিয়ে বরণ কর্‌ব তার জন্যে কোন্ সাধনা আমরা করেছি? কোন্ তপস্যার ভিতর দিয়ে আমরা গিয়েছি? দেবতা যখন আমরা প্রকৃতই নই তখন সেই দেবতার মতো সাজ পরে' রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলে যাত্রাদলের দেবতার মতো রাতজাগাই সার হবে, অথচ কোন দিক দিয়েই অমৃত মিল্‌বে না—আর বিরোধ যখন কঠিন হয়ে উঠ্‌বে তখন সেই নকল দেবতার রঙ্ পরচুলো সব খসে' পড়্‌বেই আর তখন বেরিয়ে পড়্‌বে হয় সেই বুভুক্ষু কুকুরের করুণ কাতর আর্ত্তনাদ, নয় ক্রুদ্ধ

[illegible] তাই আমরা দেখতে পাই, গান্ধীজী আজ।

এইখানে সত্যাগ্রহের সঙ্গে সবার চাইতে বড় একটা আমাদের [illegible] সেটা হচ্ছে সত্যাগ্রহের [illegible] মানুষ পরিবর্তন হয়ে দেবতা হয়ে দুঃখের দানবকে [illegible] নিজে তার মধ্যেই সে আনন্দ খুঁজে পায়—কিন্তু সত্যাগ্রহ কেবল সেইখানেই ত আরম্ভ করা হয় নি। এর পিছনে যে একটা কথাকাক্ষা আছে। নিষ্ক্রিয় শক্তি যদি দুঃখের মন্থন দিয়ে অশ্রুসাগর মন্থন আরম্ভ করে' দেয় তবে সেই মন্থনে যে বিষ যে ধূম যে অগ্নি নির্গত হয়ে সমস্ত দিক দিক চারিদিকে যাবে সেই ধূমের মাঝে অগ্নির মাঝে হলাহলের মাঝে পরাজয় স্বীকার না করে' আত্মস্থ হয়ে অচল অটল দাঁড়িয়ে থাকলেই যে আমরা শত্রুর [illegible] কিছু লাভ করব তার মানে কি? তার মানে কি এই যে দুঃখ দান করে' আনন্দের যে হাসি হাসবে তার বিপরীতে বীর দান করতে আসবে তার নিষ্ঠুরতা কি? যে যেখানে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছেন—তাঁর বিষাণ ঘন ঘন ঘটাপালে চন্দ্র সূর্য ঢাকা পড়েছে তার ডিমি ডিমি বাদ্যে—সপ্ত ক্ষুধা করাল জ্বলে ওঠার দিকে দিকে কুলুপ খুলে খুলে উদ্গিরণ করে' দিচ্ছে সেখানেই যে আবার বরাভয়করা মাতৃরূপিণী আবির্ভাব হবে তার অর্থ কি? ঐ কথাকাক্ষা থেকেই না সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়েছিল? কিন্তু সত্যাগ্রহের সুরুটাতে ভিতর দিয়ে ঐ ফল যে হবেই তার মানে কি? অর্থ হয়, তার মানে আছে, বলতে পারি।

সত্যাগ্রহকে আশ্রয় করে' কেবল দুঃখকেই বরণ করে' করে' চললে যে সত্য, অধিকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে সেটা হচ্ছে এই সৃষ্টি একটা নিগূঢ় কারণে—সৃষ্টির যে কোনটি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই এই কথাটি হচ্ছে এই যে এই সৃষ্টির হাজার বিচিত্রতার [illegible] একটি নিগূঢ় ঐক্যসূত্র আছে।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্রতার অন্তরাল দিয়ে একটা ঐক্যের [illegible] বিচিত্রতা যত বিচিত্র, ঐক্য তত গভীর, আর বিচিত্রতা যত কম, ঐক্য তত [illegible] এই মানুষ আর পাথরের মাঝে যে ঐক্য তা অতি সূক্ষ্ম অতি গুপ্ত বলে নিষ্ঠুর—মানুষ আর [illegible] ঐক্য তার চাইতে কম সূক্ষ্ম—মানুষে [illegible] আবার তার চাইতে স্থূল—আমার মানুষে [illegible] মাঝে ঐক্য তার চাইতেও স্পষ্ট।

[illegible] এই বিচিত্রতা গড়েছে [illegible] বহির্প্রকৃতি। দেশভেদে কালভেদে স্বভাব-বর্ণভেদে কর্মভেদে মানুষে মানুষে এই বিচিত্র পার্থক্য পুষ্টিলাভ করেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের ভিতরকার সেই ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়নি—সেটা কেবল গুপ্ত হয়ে আছে। সত্যাগ্রহের সমস্ত দৃষ্টি সেই গুপ্ত স্থানটি প্রতি লক্ষ্য সেই গুপ্ত স্থানটিকে আঘাত করে'। কিন্তু এ আঘাত বাইরের আঘাত নয়, অন্তরের আঘাত। [illegible] দুঃখের আঘাত নয়, দুঃখের আঘাত।

প্রত্যেক মানুষের নিগূঢ়তম অন্তরের [illegible] মিলন বেদী আছে বলেই সত্যাগ্রহের [illegible] নির্যাতনের অন্তরের ঐ মিলন বেদী [illegible] —প্রেমের দীপদানে দীপ আলা হয়ে [illegible] ধূপ দেওয়া হয়ে—পূজারি সেই [illegible] মালী সেই যজন কুসুম চয়ন করে [illegible] সেই মিলন বেদী একেবারেই পূজাহীন হয়ে [illegible] তুমি আমি সবাই আজও আপন জনের [illegible] হয়ে উঠি।

কিন্তু আপন জনের দুঃখে ব্যথিত হয়ে [illegible] আয়ারল্যাণ্ডের রিপাব্লিকের মানবের [illegible] করিনে—কারণ আমি যে আমার [illegible] একটা অহঙ্কারের বিরাট কবচ দিয়ে [illegible] কেবল অহঙ্কারই নয়—ধর্ম সংস্কার [illegible] convention ইত্যাদির ইট চুন সুরকি [illegible] চারপাশে গেঁথে তুলেছি। তাই ইংরেজের দুঃখে [illegible] দুঃখ বোধ করে, কিন্তু কালা নেটিভের দুঃখে [illegible] কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে। সত্যাগ্রহের [illegible] কেননা সত্যাগ্রহের বিশ্বাস যে মানুষের ওই [illegible] কবচ যতই দুর্ভেদ্য লোক না কেন, তার [illegible]

সংস্কারের দেয়াল যতই উঁচু হোক না কেন, তার আপনার অন্তরের অনুভূত দুঃখের উপর্য্যুপরি আঘাতে সে কবচ ছিন্ন করা যায়, সে দেয়াল বিদীর্ণ করা যায়। তখন সমস্ত বাহ্য আচ্ছাদনের অবসানে সত্য মানুষটি সত্য মানুষের [illegible] মানুষ মানুষের সত্য-অধিকার নিজ প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে বাধ্য—তখন অবিচারের অবসান হতেও বাধ্য।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি যে আমার এই কথাগুলো তোমার কাছে হেঁয়ালী-হেঁয়ালী ঠেকছে। সুতরাং এইখানে তোমায় আমাদের একটা অতি ঘরোয়া উদাহরণ দিচ্ছি যা আমাদের বাঙালী পরিবারে সদা-সর্ব্বদাই ঘটে থাকে।

ছোট্ট ছেলেটি মায়ের কাছে আব্দার ধরেছে। মা কিন্তু সে আব্দার রক্ষা করতে নারাজ। ছেলে ওম্‌নি মুখ ভার করে' বসে' রইল—খাবে না। মা ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন ছেলের আব্দার মঞ্জুর।

এখানে ব্যাপারটা কি হয়? ব্যাপারটা হয় এই যে সন্তানের না-খাবার যে দুঃখ তাই মাতৃমনে গিয়ে এমনি ভাবে আঘাত করে যে মাতার তা অস্বীকার করে' থাকবার উপায়ই নেই। এ-ক্ষেত্রে এ-আঘাত অতি শীঘ্র অতি সহজে গিয়ে করে। কেননা সন্তানের সঙ্গে মাতৃমনের যে একত্ব তা অতি সহজ অতি স্পষ্ট। সন্তান যে ভিতরের ঐ কথাটা জেনে উপবাস-প্রতিজ্ঞা করে তা নয়। কিন্তু যে প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করে' তার অবশেষে জয়লাভ হয় সেটা হচ্ছে ঐ।

মা ও শিশুর মাঝে অন্তরালে অন্তরালে এই যে ব্যাপারটি সংঘটিত হয় সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠানেও ঠিক ঐ ব্যাপারটিই ঘটবার আশা। অবশ্য অত সহজে বা অত শীঘ্র নয়। সত্যাগ্রহীর ওপরে যতই নির্য্যাতন হবে ততই তার জয়লাভের সম্ভাবনাও বাড়বে। নির্য্যাতনকারীর মধ্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও মানুষের অবশিষ্ট থাকে তবে ঐ নি[illegible]ভনের দুঃখ তার অন্তরে প্রতিফলিত হয়ে একদিন-না-একদিন তার মাঝে তার পূর্ণ মানুষটিকে আসল মানুষটিকে বড় মানুষটিকে মিলনের [illegible] মানুষটিকে জাগিয়ে তুলবেই—তখন মানুষ মানুষের দুঃখ বুঝবে, মানুষ মানুষের অধিকার আপনার প্রাণে অনুভব করবে, তখন মানুষের ওপরে প্রভুত্বের অধিকার ত্যাগ করার দুঃখের চাইতে তাকে তার [illegible] থেকে বঞ্চিত করার দুঃখ বড় হয়ে উঠবে—তখন আর মানুষকে তার সত্য-অধিকার শান্ত করবার জন্যে শোণিতপাত করতে হবে না। এই হচ্ছে সত্যাগ্রহের ভিতরকার আসল জয়লাভের প্রণালীটি—অর্থাৎ তোমরা ইংরেজিতে যাকে বলবে—How it should work out.

কিন্তু খেয়াল করবে আমি বলেছি যে "নির্য্যাতনকারীর মধ্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও মানুষের অবশিষ্ট থাকে—"; কিন্তু মনে কর যদি ইংরেজ জাতির মধ্যে প্রত্যেক মানুষটি এক একজন জেনারেল ডায়ার হয় তবে—? তবে সত্যাগ্রহের সফলতা সন্দেহজনক। কেননা জেনারেল ডায়ারের মতো মানুষের মধ্যেকার-বড় মানুষটি এমনি মৃত যে জেনারেল ডায়ারের মৃত্যু না হ'লে আর তার জীবনলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। জানই শয়তানের কাছে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করা চলে না—আমাদের ভাষায় আছে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। মানুষের দুঃখে ব্যাঘ্র ব্যথিত হয়ে উঠবে এই মনে করে' যদি তার সাম্‌নে আত্মবলিদানের জন্যে প্রস্তুত হও তবে তাতে বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য অতি সন্তুষ্টচিত্তে জিহ্বা কণ্ডুয়নই করবেন—আর তার মনে যে ধর্ম্মভাব উঠবে সেটা ম্যাথু-কথিত সুসমাচার নয়। কিন্তু সুখের কথা এই যে ইংরেজ জাতিটার প্রত্যেক মানুষটিই এক-একজন জেনারেল ডায়ার নয়—এই আমার বিশ্বাস।

অনেক বকেছি এইখানেই আজ থাম্‌লুম। এক ঝাঁকা পেয়ারা কুল ও ফুলকপি পাঠালুম প্রাপ্তিসংবাদ দেবে। ইতি।

তোমার অতি প্রাচীন

ঠাকুরদাদা।

চিরন্তনী

(১)

কার্ত্তিকের শেষ-পাট ভরা উঁচু পাঁটিল ছাড়াইয়া উঠিতে সূর্য্যদেবের তখনো একটু দেরি ছিল। দিনের আলোয় কাপ্সা বেলের ঘনঘটা দেখা যায়। ঘউনি-মাঝিটার পায়ে। নিত্যিরা গিয়াছে, নবির আগো পোষাক-আশাক এবং পাটা বেশী দিতে না পারিলেও, মাড়াল হইয়াই আলো-আঁধারে রাত থাকিতে অফিস যাওয়ার তাগিদ দিতেছিল। কার্ত্তিক শেষের বোবাঘোষে শীত একটু একটু পড়িয়াছে; কাজেই অন্ধকারের অবশিষ্ট আয়ুটুকু মোরা মধ্যে কাটিতেছে। যাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দিনের শেষ হইতে চায় না, তাহাদের কাজ নিয়া কাহারও উপরে নাই; বেচারা মাঝি পুরানো নৌকা আলিয়া নীভার্ড প্রকৃতির ঘুম ভাঙা এবং অবেলার রুগণের কাছে আপনাকেই সাঁপিয়া দিয়াছে।

মেয়েদের নিদ্রা যাথায় কাছে লালাজো প্রদীপ শিখুর ও দিনাজাই লইয়া করুণা অনেকক্ষণ উঠিয়াছে। বাড়ীতে ছোট যারা তাহারা তিন ভাই বোন ছইজ; মেঝ বোন দুটি ভোর না হইলে কোনোদিন উঠিত না, আজ সেইজন্যে উঠিলে করুণার কাজকর্মের অনেক সুবিধা হয়। কাজলা জালিয়া কাজ করা তিন তাহার গন্ধে করে; কিন্তু পাঁচ-ছয় টেবিল-আলমারিতে ঘরখানি সঙ্কীর্ণ বলিয়া আলো এত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে যে সে আলো দিয়ে ছুটি মিটের বালক-বালিকার শিয়রে কেরোসিনের আলো আলিয়া রাখা করা যায় না। ভাই-বোনদের স্বাস্থ্যহানির ভয়ে করুণা তোরাসে কাজের জন্য সরিষার তেলের প্রদীপ সাজাইয়া রাখিত। গত কালকার হিসাবপত্র লিখিয়া রাখে কি, দুরিয়া বসের আয়না, টেবিল, চেয়ার দইএর ধুলা, এগুলি তুলার ঢোকানো যায়, মেয়েদের গায়ে সাবানের ফোয়া, সবগুলি একসঙ্গে ঝাড়িয়া মুছিয়া। করুণা পড়ার ঘরের অবশিষ্ট সারিয়া গত কালের নিভানো প্রদীপ এবং চিমনি করিয়া রাখিল। সবগুলি নিয়া মনে মনে একটু হাসিল। এমনি করিয়া তাহার আর ছিল না, তাই মনের মোচড় সংগ্রহ করিয়া [illegible] বিছানা ছাড়িয়া উঠিত। করুণা [illegible] ঘরের পাশের মস্ত [illegible] চর্চ্চা করিতে যাইবার আগে [illegible] এবং কোণে চেকুকাটা হলুদে [illegible] দুটো বুকের কাছে ভুলিয়া [illegible] গায়ের কাপড়ের ভিজন দিয়া [illegible] একটা আর আলগা [illegible] যাইতেছে। ছোট [illegible] সেখানে আগাগোড়া [illegible] স্তূপছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। [illegible] এই ছোট মানুষ দুটির মানদে [illegible] ভূতের ভয়ে ঘেরা তাহার সেই সিমেন্টকৃত [illegible] বাগানটিতে চলিয়া গেল।

বারান্দার পূর্ব্বদিকের লাল মেটে [illegible] রাঙা টালীঢাকা চিলে কোঠা [illegible] কিরণ-অঞ্জলি যখন করুণার [illegible] পড়িল, তখন বই মুড়িয়া সে আবার ঘরে ঢুকিল। প্রথম গরম হাওয়ার স্পর্শে তখন বই [illegible] হইয়াছে। করুণা বই দুখানা টেবিলের উপর [illegible] দিয়া অরুণার গায়ে ধরিয়া নাড়া দিয়া ডাকিল, [illegible] ওই, আজ যে ঘরে রোদ উঠে গড়ল, কখন্ যাবার জন্য তুলবি? আজ আমি [illegible] দেব ভেবেছিলাম। তুইও যে আজ ভাগি [illegible] বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছিস্!

অরুণা গায়ের চাদরটা ফেলিয়া দিয়া [illegible] চুলুচুলুসুদ্ধ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে [illegible] বসিল।—"দিদি, রোদ উঠে [illegible] সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, আর একটু [illegible] ওঠাতে! মেজদায়, [illegible] একখানা লাল বেনারসী শাড়ী পরে আমি [illegible] হলে একরাশ বড় বড় টবকটে [illegible] সিনিয়নের মালা দিচ্ছি। বাড়ীটা [illegible] জন্যে। সেটা যেন আমাদের [illegible] মোক সোনার মতো.....”

দিদি হাসিয়া বলিল, "নে, নে, ঢের হয়েছে। সোনা রূপো সোনারঙ্গী পণে ঘাটে গড়াচ্ছে কিনা! অত ঐশ্বর্য্য ভোগাদি আজও হয়েছে, কালও হয়েছে। এখন একতলায় ঠাণ্ডামেজেতে ঘরে পেটপুজোর জোগাড় করবে চল।"

রূপের অনন্ত ঐশ্বর্য্য হারাইয়া দুঃখিতমনে দরিদ্রের ঘরের অরুণা তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছিয়া দুঃখিত মনে ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাঁটাইতে ছুটিল। কোমল গোলাপ-ফুলের বদলে কঠিন মাটির আবর্জ্জনা তুলিতে তুলিতে তাহার মোহ টুটিয়া গেল।

করুণা ছোট খাটখানির দিকে তাকাইয়া বলিল, "থাক্ আজ আর আমি রণুকে তুলছি না। দেখি একদিন পরীক্ষা করে ও কতক্ষণ ঘুমোতে পারে।"

দুই বোনে দোতলার সব অন্ধকার সিঁড়ির উঁচু উঁচু ধাপ বাহিয়া নীচের আরো অন্ধকার রান্নাঘরে চলিয়া গেল। শীতকালে সে ঘরে রোদ কোনো দিন পড়ে না, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের বিরাম নাই। করুণা রান্নাঘরের শিকল নামাইতে গিয়া দেখিল শিকল ফেলা। বিস্মিত নেত্রে অরুণার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ওকি ভাই অরু! কাল কি আমি রাত্রে ঘরের শিকল তুলে যাইনি? তবে ত এতক্ষণে বেয়াল কুকুর ঢুকে যা কিছু ছিল সব খেয়ে গেছে।"

অরু বলিল, "আহা, কাল আমিই ত নিজে-হাতে শিকল বন্ধ করেছি। আর যদি কুকুরে খাবার খেয়ে দিয়ে থাকে ত বেশ ভালই ত। আজ তা হলে ঠিক আধসের বাবুদী আনাতে হবে কিন্তু।"

করুণা কথার উত্তর না দিয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া দেখিল যে-ভাইটির ঘুম ভাঙাইতে তাহাকে প্রতিদিন পুরা আধঘণ্টা উচ্চ সপ্তকে তীব্র মধুর নানা ভাষায় সাধনা করিতে হয়, যাহাকে আজ ছুটির দিনে ঘুমের পরীক্ষা করিতে সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শ্রীমান রণেন্দ্র রান্নাঘরের মেজেটির উপর বসিয়া একটা আস্ত পাঁউরুটি দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া পরম তৃপ্তির সহিত কামড়াইয়া খাইতেছে। তাহার কোলের উপর বড় একটা কলাই-করা বাটিতে একবাটি চা। দিদিকে দেখিয়া রণুর চোখেমুখে একসঙ্গে উল্লাস ও লজ্জা ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সমস্ত রুটিটা বাটিতে ডুবাইয়া এক কামড়ে প্রায় আধখানা গালে পুরিয়া বসিল। করুণা জ্র কুঁচকাইয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "রণু, তোমার এই কীর্ত্তি! আমি ভাবলাম মেজে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন! এমন যাঁদর ছেলে! রাতারাতি লুকিয়ে এসে সব খাবার চরা হচ্ছে?"

রণু গাল ফুলাইয়া বলিল, "তোমরা যে আমায় কিছু খেতে দাও না। পাতলা পাতলা রুটি আর আধ পেয়ালা চা খেয়ে আমার দু মিনিটেই আবার খিদে পায়।"

অরুণা বড় বড় চোখ ঘুরাইয়া শাসনের সুরে বলিল, "হাঙরের মত সব যে একলা গিললে, এখন বাড়ীর আর কাউকে বুঝি কিছু খেতে হবে না? তোমার পেটে সব ঝুলোলে ত পরের পেট ভরবে না।"

রণু রুটি চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "হুঁ, আমি বুঝি তাই বলেছি? তোমরা দাও না বলেই ত রাত্তিরের জন্যে পাশ-বালিশে চাদর ঢাকা দিয়ে ফাঁকি দিয়ে এসে খেয়ে দিয়েছি। দাও না পয়সা, সব্বাইকার খাবার এনে দিচ্ছি। দেখলে ত আমি কত খেতে পারি, কাল থেকে বেশী করে খাবার রেখো।"

অরুণা বলিল, "দিদি, দাও পয়সা; খাবার আনতে রণুকে কিছু দেব না, বেশ হবে। যেমন সব খেয়ে গিয়েছিল, এখন তাকিয়ে থাকবে, আমরা খাব।"

করুণা উপরের ঘর হইতে পয়সা আনিয়া বলিল, "অরু, তুমি দিন দিন ভারী দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ। খিদে পায় ত আগে বললেই পারতে।"

রণু সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া পয়সার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এই কটা যাত্র! লক্ষ্মীটি ভাই, আর চারটে দাও, লবঙ্গলতিকা আমার সবাইকার একটা একটা।"

দিদি বলিল, "ওইতেই আনতে যা। গোদামশায়ের খাবার আমি করে দিচ্ছি। অরুর জন্যে কাবুলী আনিস তোর যা খুসী নিজের জন্যে আনতে যা। আমি আজ এখন খাব না। আমার জন্যে কিছু আনবার দরকার নেই।"

রণু নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। করুণা দাঁড়ায়ের সিন্দুক খুলিয়া মুঠি করিয়া মাপিয়া চালের একটু সরু লইয়া মাজিতে বসিল। অরু কাছে আসিয়া বলিল

দিদি, আর ঝুড়ে দাও না। বাজারের খাবারের ঝুড়ি তুমি আর আনিও না।"

দিদি খুসী হইয়া বলিল, "বলছি ত আমার দরকার যথেষ্টই আছে, কিন্তু নিজের জন্য পয়সা খরচ করিবে না। আর বেশী বলি ও কোনো লাভ নাই, বাপের দিদির জেদ সহজে ভাঙে না। সে কথায় উত্তর দিলে না, কিন্তু কাজটা ঠিক নিজের ইচ্ছা-মতই করিল। কাজেই করুণা অন্য উপায় চিন্তা করিবার জন্য আপনার নিজের ভাঙাকালীন গৃহকর্ম সারিতে গেল।

করুণাদের ভেড়ী নামক ডাঙ্গার অধিবাসী বিভিন্ন পরিবারের ও আশেপাশের বাড়ীর বি-বৌধুনীরা একে একে আসিয়া বড় আড়া দিয়া বিকালটার সূচনা করিতে লাগিল। তাহাদের নীচের জলার ইটা জলের কল লইয়া বাড়ীর ঝি পরিবারের বি ও সদ্গৃহিণীরাও বচনবিন্যাসে নিজ নিজ চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ঘাটের ঘাট ও গামছা হইতে বাড়ীর আণ্ডা বাচ্চা বুড়ো বুড়ী সকলেই স্নানের ছলে প্রথম প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য আর অপরাপর সকলের তীর্থযাত্রীর মত লাভ দিয়া রথা হইতে লাগিলেন। একজনায় যে এক মুহূর্ত্ত কি অপেক্ষা করে সে বিলম্বে আগন্তুককে পিছনে ফেলিয়া নিজের আগমন জানাইয়া ঘর দখল করিয়া লইবে। গিন্নীদের হুকুম তামিলের কাজ ফামাইয়ের দেহাই দিয়াও যাহারা কর্ম্মপ্রবণ বলাইতে না পারিয়া অন্যান্য বাড়ীর অক্লেশ সহায় লইয়া। টিনের বাল্‌তে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ভাসাইয়া উড়ে মোয়ালা বাড়ী বাড়ী দুধ বেচিয়া গিয়াছেন।

পাশাপাশি চারখানা রান্নাঘরের কয়লার ধোঁয়া দুরন্ত ছেলেদের দিয়া আটকাইয়া মারিবার চেষ্টায় ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ঢুকিয়া, শেষে নিরুপায় ক্রোধে শূন্যে মিলাইয়া গেল। ঝি-বৌদের ঝগড়ার বহর বৃদ্ধি করিতে করিতে সন্ধ্যের আঁধার ঘনাইয়া আসিল। রামাধরের প্রতিদিনের মত আজও একটু একটু করিয়া গতি বাড়িয়া উঠা সংসারীদের ব্যস্ততার মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

করুণা আর অরুণা ক্রমাগতই বলিতে লাগিল, রণুর এখনও দেখা নাই কেন? মোটে ঘর বাঁটাইতে গিয়াছে দেখিয়া করুণা ডিটের লেপ তোষক লইয়া শুকাইতে দিতে চলিল। এমন সময় উচ্চকণ্ঠে "বাবি ঝর ঝর তর বাদরে" গাহিতে গাহিতে খালের দিক হইতে রণু ঘরে ঢুকিল। অরুণা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, রণুকে দেখিয়া ঝাঁজের সহিত বলিল, "কাঠফাটা রোদে বাড়ি ঝরাতে কোথায় গিয়েছিলি? ঘর থেকে একবার যদি বেরিয়েছিস ত আর তোর টিকিরও দেখা পাওয়া ভার।"

রণু উৎসাহিত ভাবে বলিল, "ঘরে একবার এলুম না! নাগবাড়ীতে কে যেন এসেছে।" দুই বাড় দোলাইয়া কথার মর্য্যাদাটা একটু বাড়াইয়া রণু বলিল, "উঃ কি রকম সব জিনিস! কত লোকজন, মোটরকার, গাড়ী, চেয়ার, টেবিল, বই আর কত বড় বড় কুকুর, কত ফুলগাছের টব, আরো কত কি—ওঃ তুমি জান না ছোড়দি, কি সুন্দর পেয়ারা। নাগীদিদের বাড়ীতেও অমন নেই। সে-রকম চোখেই দেখনি কোনো কালে। মোটরকারটা এ গেলে ক্যা চাল দিয়ে আসি—কি বলব!" রণু যতটা সম্ভব বাড় ও বুক ফুলাইয়া দুইহাতে মোটর বার ভঙ্গি করিয়া নিজের পটুতা দেখাইয়া দিল।

মাঘ আট-নয় মাস ধরিয়া ঐ নূতন নাগবাড়ীর একটু করিয়া করুণাদের চোখের সামনেই গড়িয়া উঠিয়া মাস খানেক হইল তাহার বড় বড় সব্জ খড়খড়ি যাখিয়া আলো-বাতাসের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্গাপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার যেমন ভার সব রূপ, সব ভূষণই তাহের চোখে কণা, ঐ প্রাসাদের মত সুন্দর লাল বাড়ীখানা প্রথমে মনের এক কোণে এতদিন ঘৃণা পড়িয়া ছিল। চোখে বাড়ীটা দেখিত বটে কিন্তু কখনও সহজে বাড়ী ও মানুষে অনেক দেখিয়াছে যেখানে নিজের রূপ কি গুণ তাহাকে একটা প্রতিষ্ঠা। কি বিশেষত্ব পায় নাই, সেখানে মানুষের প্রাণে গুণে ভার মানুষের চোখে আর-সব-কিছুই খোলে ইটা

পেলেও মানুষ কখনো মানুষের চোখে সহিয়া যায় না। পথের ট্রামের শব্দটা অনুক্ষণ কানের কাছে হুঙ্কার দিয়াও যেমন নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে পথের ধারের মানুষকে আর বিশেষ করিয়া সচেতন করিয়া তুলিতে পারে না, ওই লাল বাড়ীখানা প্রহরীর মত চোখের সাম্‌নে দিবারাত্রি দাঁড়াইয়া থাকিয়াও করুণাদের মনে আজকাল আর কোনো ছায়া ফেলিত না।

বাড়ীতে লোক আসিয়াছে শুনিবামাত্র তাহার সম্বন্ধে সকলের চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিল। যাহার এতবড় প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়ী, এত ঐশ্বর্য্য, সে লোকটা কি রকম জানিবার জন্যই তাহার বাড়ী ও জিনিষপত্র ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা অরুণার প্রবল হইয়া উঠিল। উনানে চাপানো ভাতের হাঁড়ির জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল, সেদিকে না তাকাইয়া চালের বাসন রান্নাঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া অরুণা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছাদের দিকে ছুটিল। দিদিকেও এমন নূতন ব্যাপারের সংবাদ হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে সময় নষ্ট করে কে? অরুণা ছুটিতে-ছুটিতেই চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি, ও দিদি, দেখে যাও, লাল বাড়ীটাতে কে একজন মস্ত বড়লোক এসেছে।"

দিদি ছাদেই বিছানা শুকাইতে দিতেছিল, অরুণার ডাকে বাড়ীর যে যেখানে ছিল, হাতের কাজ সারিয়া একে একে ছুটিয়া আসিল। ছাদের পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে পা দিয়া উঁচু হইয়া সবাই মুখ বাড়াইয়া লাল বাড়ীর নবাগতের যতটুকু সম্ভব পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, বড় মেয়েরা গায়ের আঁচল চার-পাঁচ পাট করিয়া মাথায় দিয়া দেখিতে লাগিল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বড়দের শাড়ী কি হাতের তলা দিয়া গলিয়া তাহাদের ছায়ায় কোনো রকমে নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দেখার চেয়ে ওই কাজেই তাহারা তখন ব্যস্ত বেশী।

লোকটি যেই হউক, বড়লোক যে নিশ্চয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। নূতন সুর্কি-ঢালা লাল রাস্তার উপর মস্ত বড় একটা ঘোর সবুজ মোটর-কার। গাড়ী-বারাণ্ডার তলায় বড় বড় আল্‌মারি, টেবিল, গদি-দেওয়া চেয়ার, আবলুস ও চন্দন কাঠের আলিকাটা পর্দা, লোহার সিন্দুক, প্রভৃতি ভারী জিনিষে দড়ি বাঁধিয়া রাস্তার মত ঝাঁকা-মুটে মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিয়াছে। কি উপায়ে জিনিষগুলাকে সহজেই উপরে তোলা যায় সে-বিষয়ে প্রত্যেকেই গলা আহির করিয়া উপদেশ দিতেছে, এবং মহোৎসাহে মাথার গামছাও কসিয়া বাঁধিতেছে, কিন্তু কাজে কিছুই বেশীদূর অগ্রসর হইতেছে না। সবুজ বনাতের পোষাকের উপর তক্‌মা লাগাইয়া দুটা চাপরাসি মুরুব্বিচালে ঘরে বাইরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং উলবুক মুটেদের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিচিত্র ভাষায় গালি পাড়িতেছে। একটা উড়ে চাকর ঘরে ঘরে সমস্ত পার্শী খড়খড়ি খুলিয়া ঝাড়ন দিয়া সেগুলো মুছিতেছে।

অরুণা অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। করুণা বলিল, "অত উঁকি মেরে কি দেখ্‌ছিস?"

অরুণা আঙুল বাড়াইয়া একটা ঘরের দিকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ্‌ছ না, ঝিনুকের কাজকরা ফ্রেমে বাঁধানো কত বড় একটা আয়না। রোদ লেগে কি-রকম ঝল্‌মল্ করছে। বাড়ীর গিন্নি নিশ্চয় খুব সুন্দরী। বাঁদরের মত মুখ অমন আয়নায় কেউ দেখে না বোধ হয়।"

ত্রিতলের অধিবাসিনী শৈলজা-সুন্দরী ছেলের রোদে-পোড়া গরম মাথাটা হাত দিয়া আড়াল করিয়া বলিল, "গিন্নির ত কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেবল ত কাঁচের আল্‌মারি বোঝাই বই, শিকলে বাঁধা কুকুর, আর হাতীর মত বড় বড় টেবিল। জোড়া খাটও নেই, ছেলের ঠেলা গাড়ীও নেই, শিলনোড়া হাতা বেড়ি খুন্তি কিচ্ছুই নেই।"

অরুণা বলিল, "বড়লোকের বউ বুঝি হাতা বেড়ি খুন্তি নিয়ে বেড়ায়? আর ছেলে হয়ত এখনো হয়নি।"

শৈলজা বলিল, "তুই যে দেখ্‌ছি এরি মধ্যে সব বুঝে নিয়েছিস্। আমরা বাপু বড়লোকের বউ নই, হাতা বেড়ি নইলে মেয়ে-মানুষের চলে না-ই আমাদের বিশ্বাস।"

একটা কাশ্মীরী গালিচা টানিতে টানিতে পশ্চিম দিকের ঘরে একটা লোক আসিয়া দাঁড়াইল।

অরুণা বলিল, "কি চমৎকার কাজ করা! পদ্মফুলের মত পা নইলে ওর উপর হাঁটলে মানায় না।"

[illegible], পিসিমা, ভোর বোনের ত ভাই [illegible] কলেজের মত পা [illegible], পাঠশে যে ওই বাড়ীর গায় [illegible] ওদের ঘুল ঘুচিয়ে যেতাবে। তুই নিজেই বা কোন্ [illegible], ঝাঁকরা তুইই যা। ওরে ওই দেখ্‌লে বাড়ীর কর্ত্তা বোধ হয় [illegible]সছে।"

ছাট কোট পরিহিত ৩০।৩৮ বৎসর বয়সের এক যুবক [illegible] ভদ্রলোক ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটির [illegible] বর্ণ, মাথায় চুল পাৎলা, দুই এক জায়গায় ক্ষুরের [illegible] এক আধ গাছা চুল খাড়া হইয়া উঠিতে চায়। [illegible] উপর চেহারা সুশ্রী বলা চলে না, কিন্তু মুখের ভাব [illegible] মধ্যে কেমন একটা কর্ম্মী শক্তি আছে প্রথম দর্শনের [illegible] দৃষ্টি যাহা এড়ায় না। পালিচার উপর তাহারই উপযুক্ত [illegible] পায়ের শব্দ শুনিয়াই পালিশ করিতেই লোকটির [illegible] মন দেখা গেল।

অরুণা সবিস্ময়ে চেয়ে বলিল, "ওমা, এ যে [illegible] ভাই! তাতে এ বার কলেজ টাকপড়া। আমার [illegible] মুটুকে বিদ্যি বুঝি জলি হয় হবে? তা ছাড়া ওর [illegible] বছর ছেলেপিলে।"

করুণা বলিল, "তুমি ভাবনা ভোর এখন না ভাবলেও চল্‌বে। চল্ এখন নিজের চরকায় তেল দিবি চল্।"

লীলা বলিতে বলিতে অরুণা নিজেদের ঘরের দিকে [illegible] ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "এই দেখ আমাদের [illegible] কার্পেট, [illegible] সিমেন্টের তালি দেওয়া [illegible] বাহার খুলেছে! ও বাড়ীর লোকদের নেমন্তন্ন করা [illegible] আমাদের হয়, চক্ষু লজ্জায় পড়ে যায়।"

(২)

করুণার বাবা হরিহরবাবু তারিণীকান্ত পূর্ণ যৌবনে যখন [illegible] স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত "ছেদ্দা" আখ্যা লাভ করিলেন, তখন সেই [illegible] উপাধি আনুষঙ্গিক অন্যান্য লাভের চেয়ায় তাঁহাকে [illegible] হইতে হইয়াছিল। বাড়ী ছাড়িয়া পরাণের [illegible] ভোঁতাদের ঘরে দোরে উঠানে ছ ইঁট [illegible] ও ছড়া কাঁটা বুষ্টি হইতে থাকিল যে ভাইয়া [illegible] ছাতার নীচে রাখিয়া অনায়াসে একটা দ্বিতীয় ছাতায় [illegible]

[illegible] করা চলিত। আজি [illegible] কর্ম্ম উপলক্ষে তারিণীর ত প্রবেশ নিষেধই ছিল, তাঁহার কাকা জ্যাঠা দাদাদেরও পংক্তিতে [illegible] বেগ পাইতে হইত। তারিণীকান্তের স্ত্রী [illegible] প্রহর স্বামীনিন্দা শুনিয়া সভীর মত প্রাণপণে [illegible] তর্জ্জন গর্জ্জন ও অশ্রুবর্ষণের বন্যায় পড়িয়াই [illegible] তুলিলেন। বাড়ীর বাৎসরিক দুর্গাপূজার [illegible] প্রণাম না করিয়া যখন তিনি দুঃসাহসে চুড়ান্ত [illegible] তখন ক্রোধে অধীর বড়দাদা অভ [illegible] করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। [illegible] কান্তের একগুঁয়েমি দেখিয়া পাড়া-প্রতিবেশী [illegible] স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আত্মীয় [illegible] এত নির্য্যাতনেও নিজের খেয়াল ছাড়িবে না।

তারিণীকান্তের পিতার শ্রাদ্ধের দিনে যে [illegible] হইল, তাহাতে তাঁহাকেও বিচলিত না করিয়া ছাড়ে [illegible] সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলী একবাক্যে মত প্রকাশ [illegible] তারিণীর গৃহে তাঁহারা জলস্পর্শ করিবেন না [illegible] জলস্পর্শ না করিলে পিতার স্বর্গচ্যুতি নিশ্চিত [illegible] বহা বিব্রত। ধর্ম্ম আগে কি বারা আগে, যে [illegible] দিবে? পিতাকে নরকস্থ হইতে দেখিয়া [illegible] প্রাণে কনিষ্ঠের যাদবচন্দ্রে জড়াইয়া পড়িয়া [illegible] তারিণীর ডাক পড়িল। দাদা বলিলেন, "ভ [illegible] পিতার অনন্ত নরক কামনা কর?"

তারিণী বলিলেন, "আমার পিতার [illegible] কোনো গতি হয় ত অনন্ত স্বর্গলাভই হবে।"

দাদা বলিলেন, "তোমার মনে ভক্তি [illegible] করবার সময় এখন আমার নয়। পিতৃদায় [illegible] কর না, কিন্তু আমার মাথার উপর কি যন্ত্রণা [illegible] পাচ্ছ। তুমি আমায় উদ্ধার না কর্‌লে এ যাত্রা [illegible] পার পাওয়া শক্ত।"

তারিণী বলিলেন, "আমাকে কি করতে হবে [illegible]

দাদা মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন, "[illegible] কতক কোথাও ঘুরে এস, আর হবে কি?"

দাদা যে তাঁহাকে বাড়ী ছাড়িয়া চিরকালের [illegible] যাইতে বলিয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু পুরুষ [illegible]

P2E185

তাঁ বাড়ীতে পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ হয়, তারিণী পুত্র হইয়া সেখানে আর ফিরিতে পারিবেন এমন আশা তাঁহার ছিল না।

অপমানে পীড়িত ও অভিমানে বাথিত হৃদয় জুড়াইবার স্থান তাঁহার মিলিল না। পত্নী মনোমোহিনী স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে নির্ব্বাসনে তাঁহার অনুসরণ করিলেন না, তিনি আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া বাড়ীতেই রহিলেন।

বাড়ী ছাড়িয়া একবস্ত্রে তারিণীকান্ত যে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার অগস্ত্যযাত্রা। মনোমোহিনী মৃত্যুশয্যায় স্বামীর দর্শনকামনা করিয়াছিলেন মনে মনে; মুখ ফুটিয়া ভাসুরদের কাছে আর্জ্জি পেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শেষ দিনে বড় জাকে বলিয়া গেলেন, "আমার মুকুলকে তার বাপের কাছেই পাঠিয়ে দিও।"

কুসুমের জ্যাঠা বলিলেন, "বৌমার মৃত্যুকালের কামনা আমাদের পূর্ণ করাই উচিত। না হলে পরলোকে শান্তি পাবে না।"

জ্যাঠাই বলিলেন, "ছোট বৌ সতী লক্ষ্মী, সেকি আর একটা মেয়ের দায় আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যাবে?"

কুসুমের ভার শীঘ্র শীঘ্র নামাইয়া সতীর কামনা পূর্ণ করিতে তাহার জ্যাঠা-মহাশয় রেলভাড়া খরচ করিয়া তাহাকে পিতৃসন্নিধানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

"বিধর্ম্মী" তারিণীকান্ত নিজ মত অনুসারে কন্যাকে "বিধর্ম্মী"র হাতেই দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনটি পুত্র কন্যা লইয়া বিধবা কন্যা আবার তাঁহার ঘরে আসিয়াই সংসার পাতিল। শোকসন্তপ্তার নূতন সংসার বাঁধিয়া উঠিতে না উঠিতে মৃত্যু তাঁহাকে পতির পাশে ডাক দিয়া লইয়া গেল। অসহায় বৃদ্ধ বয়সে এই নাতি-নাতিনীগুলিকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার মাথায় লইয়া তারিণীকান্ত শোকের আগুন চাপা দিয়া রাখিলেন।

পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি অগাধ না হইলেও অল্প স্বল্প যাহা কিছু ছিল, তারিণীকান্তের ভাগ্যে তাহার কণা মাত্রও জোটে নাই। সামান্য ত্রিশ টাকা মাত্র পেন্‌সনের উপর নির্ভর করিলে সংসার চলে না; কাজেই জীর্ণ শরীর লইয়াই তাঁহাকে খুচরা কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইত। আজ তিন বৎসর হইল করুণা পুত্রের স্থান লইয়া উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই এতদিনে বৃদ্ধ তারিণীকান্তের অবসর মিলিয়াছে।

যে মেয়ে-ইস্কুলে করুণা ত্রিশটাকা মাহিনায় ত্রিশ চল্লিশটি শিশুর অক্ষরপরিচয় ও বানান শিক্ষার ভার লইয়াছিল, করুণা সেই ইস্কুলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত।

সোমবার সকালে দুই বোনে চর্কীবাজির মত ঘুরপাক খাইয়া ঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া খানিকটা আগুনের মত ভাত তরকারি ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে গিলিয়া গাড়ী চড়িয়া সরস্বতীর বন্দনা করিতে চলিয়া গিয়াছিল। মুখে আসন মনে হাঁড়ির ভাতডাল যতটা পারে পাতে চালিয়া খানিকটা সেবোতে ছড়াইয়া খানিকটা উদরস্থ করিয়া এবং খানিটা বারাণ্ডায় সমাগত কাকসভায় বিতরণ করিয়া পাড়ার ইস্কুলে পড়িতে গিয়াছিল! বাড়ী ছিলেন শুধু বৃদ্ধ তারিণীকান্ত। তেতলা বাড়ীর দোতলার দুইখানি ঘর ছিল এই পরিবারের সম্বল। বাড়ীখানায় বাকী ঘরগুলিতে তাঁহাদেরই কাছাকাছি কিন্তু একটু স্বচ্ছল অবস্থায় দুইটি পরিবার ভাড়া লইয়াছিলেন। করুণারা তিন ভাইবোন যে ঘরে থাকিত, তাহার পাশের একটি ঘরে একরাশ ভৌগোল দর্শনের বই লইয়া তারিণীর দিন কাটিত। তাঁহার না ছিল বন্ধু না ছিল সঙ্গী। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার করিয়া তিনি পরিচিত সকলের খোঁজ করিতে বাহির হইতেন। বন্ধু বলিতে যতখানি অন্তরঙ্গ মানুষ বোঝায় তা তাঁহার ছিল না। তিনি পরিচিতদের বাড়ী গিয়া কুশলপ্রশ্ন করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। অনেককে তাঁর বাড়ীতে আসিতে নিমন্ত্রণও করিতেন, কিন্তু তাহারা আসিলে করুণা-অকরুণার জিম্মায় ফেলিয়া দিয়া নিজে দর্শনগ্রন্থের আড়ালে আশ্রয় লইতেন। আতিথ্যের ত্রুটি তাঁর অসহ্য; কিন্তু নিজে সে বিষয়ের কোনো ভার লইতেও তিনি অপারগ। করুণার সাধ্যে যতটুকু কুলাইত সে তাহার ত্রুটি করিত না, অরুণা অতিথির চিত্তবিনোদনের ভারটা সাগ্রহে তুলিয়া লইত, কারণ খাটিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া তুষ্ট করার চেয়ে গোলগল্পে মন খুসী করাটাই তাহার আসিত ভাল।

সেদিন বৈকালে ছুটির পর বইখাতা হাতে করিয়া বাড়ী ঢুকিয়াই অরুণা বলিল, "দিদি, লালবাড়ীটার কথা দাদামশায়কে কাল বলা হয়নি, না? কলকাতা সহরে উনি না চেনেন এমন লোক ত যেলা ভার। খবর নিলে বোধ হয় জানা যেত কার বাড়ী।"

সাদা রঙের কাপড়ের-ছাঁট-জোড়া-দেওয়া ধুয়াটা গুমাইয়া ঘরে ঢুকিয়াই করুণা বলিল, "পাশের ঘরে কে মে? দাদামশায়ের ঘরে আজ আবার কার আবির্ভাব হল?"

অরুণা অতিথির চোখ ধরা পড়িবার ভয়ে খাটের উপরের ছড়া কাপড়গুলো তুলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার তলায় ঠুসিয়া দিল। দীনুর ঝাপ্‌টা দিয়া টেবিলটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বই কয়খানা গুছাইয়া রাখিল। করুণা ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইল, যার কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলার চিহ্ন দেখা যায় কি না। অরুণা স্নানের পর এলোচুলই পড়িতে যাইত। দায়-সারা রকমের প্রসাধন সারাদিনের পরিশ্রম ও শ্রান্তিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমনভাবে অভ্যাগতের কাছে কি করিয়া যায়? অরুণা মটপট চুলগুলা চিরুণী দিয়া প্রায় অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া মাথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইল, মুখে এক ঝাপ্‌টা জল দিয়া ছুটিয়া পাশের ঘরে ঢুকিতে গিয়া পিছাইয়া আসিয়া বলিল, "ও ভাই, অচেনা পুরুষমানুষের গলা। এঘরে নিশ্চয় যাবে না। দাদামশায় না ডাকলে যাব না।"

ইস্কুলের পর বাড়ী আসিয়া পোষাকী কাপড়-চোপড়গুলা খুলিয়া ফেলিয়া ঘরোয়া-রকম সাজসজ্জা করিয়া করুণাকে গৃহকর্ম্মে লাগিয়া যাইতে হইত। এই তরুণ বয়সেই অবসর ও বিশ্রামের আনন্দ তাহাকে ভুলিতে হইয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক কাজের পর আর এক কাজ যেন তাহার পিছনে তাড়া করিয়া ফিরিত। ভোর হইতে না হইতে দোকানবাজার চিন্তা, তাহার পাড়ি যাইতে না যাইতে ইস্কুলের গাড়ীর ফেলিয়া যাওয়ার ভয়, গাড়ীতে উঠিয়া ক্লাসের পাঠ দেখিয়া লওয়া, ইস্কুলের ছুটী ছাটা অবসরে খাওয়া দেখা, আবার বাড়ী ফিরিয়াই সংসারের কাজ। এমনি হুড়ো-তাড়ার মধ্যেই করুণার দিন কাটে। করুণা এখনও ছেলেমানুষ। তার যখন কাজ করিতে ইচ্ছা করে, যখন মনটা অন্য কোনো অবসরে ছুটিয়া যাইতে চায়, তখন সে মনকে বাঁধিয়া রাখিতে জানে না বলিয়া পারে না, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে পর-মুহূর্ত্তের কাজ মনে করিয়া উঠিবার মত মন তাহার এখনও হয়নি। কাজে মন লাগুক আর না লাগুক কাজ তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে, একথা করুণা সর্ব্বদা জাগিত। দিনের মধ্যের ক্ষণিক অবহেলা তাহার সমস্ত দিনটাই বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিবে, এবং ফলে যে অশান্তি নিশ্চয়ই জাগিবে, একথা করুণা বলিয়াই কাজের শৃঙ্খল ভাঙিয়া নিমেষের মুক্তি বাঁধনে ধরা দিত না।

বাড়ীতে নূতন কে অতিথি আসিয়াছে, ভাহার চিন্তাতেই বিভোর। কোনো-রকমে উঁকি মারিয়া চেহারার সন্ধান লওয়া, কান পাতিয়া তাহার কথা ধরা, এইসব অতি প্রয়োজনীয় কাজে রাত বিকালের জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়াই করুণা রান্নাঘরে উনান ধরাইতে গিয়া দেখিল, কয়লা আসে নাই; কাজটা ফেলিয়া রাখিলে করুণার চেতনা হইত, কিন্তু তাহাকে চেতনা দিতে দিদি আসিয়া চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় তুলিলে, হয়ত মহাশয়ও অতিথির জন্য খাবার আনিতে বলিতেন। ভাঁড়ারের সামান্য জিনিষ কয়টা করুণা দিয়েই করিয়া লইল। অরুণা যতক্ষণ নেয়ে থাকিত, প্রতিদিনই সেই সময় চুলটা বাঁধিয়া আসিত; অরুণা নীচে নামে নাই, চুল বাঁধা আর হইল না।

আজিকার অতিথিটি যে কোথা হইতে অকস্মাৎ আসিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও করুণা তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। লোকটি নিশ্চয়ই ভাহার অপরিচিত। এরকম জোর দিয়া কথা বলিতে বন্ধুদের মধ্যে কাহাকেও ত সে শুনে নাই। একেবারে হাঁসিয়াদার খাল গায়ে দিয়া সচরাচর এ বাড়ীতে যে ব্যক্তি আসে না। কথাবার্ত্তাও যা বলিতেছে, তাও কোন্ আদি কালের। বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার যে যোগ নাই, সবই অতীতের কথা। করুণা ভাবিল, উপন্যাসের অজ্ঞাতনামা ধনী কুটুমের মত তাহারও কোনো ধনী কুটুম্বের আবির্ভাব হইল। চরিতার্থতায় তার মন পুলকিত হইয়া উঠিল। যদি সত্যই তাই বলি হঠাৎ সে শোনে, এই কোটরের ঘর ছাড়িয়া কালই তাহাদের কোন্ এক অট্টালিকায় যাইতে

ও সুন্দর ভবনে চলিয়া যাইতে হইবে, এইসব মোটা কাপড়, সস্তা আসবাব, আর তুচ্ছ আহার ধনীর আত্মীয়ের আর শোভা পাইবে না, এখনি এ দরিদ্রের সংসার ভাঙিয়া ফেলিয়া যাইতে হইবে! অরুণার মন তাহাদের এ দুঃখের সংসারের ছোটখাট সুখগুলির মায়া এক নিমিষে কাটাইতে পারিল না, কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহের মত যে একটা আনন্দের প্রবাহ তাহার শিরায় শিরায় খেলিয়া গেল, তাহা আর-একটু স্থায়ী হইবার অবসর পাইলে ওসব বন্ধন অনায়াসে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত।

তারিণীকান্ত পাশের ঘরে মানুষ হাঁটাচলার শব্দ পাইতেছিলেন। তাঁহার মত মানুষ যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত একলা অতিথি-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন এই আশ্চর্য্য। এইবার হঠাৎ ডাক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অরুণা, অবিনাশবাবুর জন্যে জলখাবার নিয়ে এস!"

দাদামশায়ের ডাক শুনিয়া অরুণার মনে পড়িল, জল-খাবারের কোনো আয়োজনই ত করা হয়নি! ইস্কুলের ফেরতা বাড়ী আসিয়া ক্ষুধায় নাড়ী যে-রকম চোঁ চোঁ করে তাহাতে ও-কথাটা মনে করাইয়া দিবার জন্য অন্য লোকের কোনো দরকার হইত না। কিন্তু আজ তার হইয়াছিল কি? অরুণা লজ্জিতভাবে হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া নীচে ছুটিয়া পলাইল।

দিদিকে তাহার কাজে ব্যস্ত দেখিয়া অরুণা তাড়া-তাড়ি খানিকটা ঘি বাহির করিয়া বলিল, "ও ভাই দিদি, খানকতক লুচি কি পরোটা বেলে দাও দেখি; দাদামশায় অবিনাশ-বাবুর জন্যে খাবার চাইলেন। তুমি বেলে দাও, আমি ভেজে নি।"

দিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অবিনাশ-বাবু আবার কে লো?"

অরুণা আগুনের উপর কড়া চাপাইতে চাপাইতে বলিল, "কি জানি কে? খুব শাল দোশালা গায়ে দিয়ে এসেছে। চিনি বলে ত মনে হল না।"

শাল দোশালা যাহার অঙ্গে তাহাকে নিতান্ত যা'-তা' গাইতে দেওয়া যায় কি করিয়া! ভ্রান্ত দুই বোনে অগত্যা খাবারের একটু বিস্তৃত আয়োজনে লাগিয়া গেল। তারিণী-বাবু দেরী দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া নীচে আসিয়া বলিলেন, "খাবারটা নিয়ে তোমরা দুইবোন চট্‌পট্‌ উপরে এস।"

খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া তারিণীকান্তের ঘরে ঢুকিতেই করুণার চোখে পড়িল, সেই লালবাতীর হ্যাট-কোটধারী অধিনায়কটি, কেবল পোষাকটা দিশী। এই অবিনাশবাবু! লোকটির কি তীব্র চাউনি। যাহাকে যেন সম্মোহন করিয়া ফেলিতে চায়। প্রথম সাক্ষাতে কোনো মানুষ অমন স্পষ্টভাবে মুখের উপর চোখ তুলিয়া তাকাইয়া থাকিতে পারে, করুণা তাহা জানিত না। কিন্তু কেন জানি না, ও-রকম কটমটে চাউনি দেখিয়াও করুণার রাগ হইল না। লোকটার মধ্যে নিশ্চয়ই কেমন কি একটা আছে।

তারিণী বলিলেন, "এই যে করুণা। অবিনাশ তোমার মনে পড়ে কি? তুমি যখন বিলেত যাও, তখন ও ত দশ বছরের।"

এইরকমভাবে উল্লেখ করাতে করুণা অবিনাশকে খাড়া নমস্কার না করিয়া পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে গেল।

অবিনাশের তীব্র দৃষ্টি একটু কোমল হইয়া আসিল। সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তপস্বিনী গৌরীর মত একটি মেয়ের দীর্ঘ ক্ষীণ তনু তাহার পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্তদিনের শ্রান্তিতে তার রক্তহীন শুভ্র মুখ তপঃক্লিষ্টার পাণ্ডুর বর্ণের মত দেখাইতেছিল। মেয়েটির অঙ্গে কোনো আভরণ নাই। বেশভূষার মধ্যে মোটা জামা ও শাড়ী। রুক্ষ এলো চুল কপালে বুকে পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবিনাশ কেমন যেন সঙ্কোচে 'থাক্‌ থাক্‌' বলিয়া পা সরাইয়া লইল। লজ্জিতা করুণা অগত্যা হাত দুইখানা কোলের কাছে জড়ো করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ লক্ষ্য করিল করুণার হাতেও কোনো অলঙ্কার নাই। সিঁথিতেও সিঁদুর নাই বটে, কিন্তু শাড়ীর পাড় ত বেশ চওড়া। একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে যাথার ঘোমটার লেশমাত্র চিহ্ন না রাখিয়া বিবাহিতা রমণীর আসাটা অত্যন্তবিরুদ্ধ, তাছাড়া তারিণীর কথাবার্ত্তাতেও বোধ হয় করুণার এখনও বিবাহ হয় নাই। কুমারী কন্যার এরকম বেশভূষা সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই। অবিনাশের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। করুণার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর প্রসাধনের কোনো ব্যর্থ চেষ্টা যে উঁকি দিতেছে না, তাহা অবিনাশ

এক বলিতেই বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়া তাহার কারণ খুঁজিতে মনোযোগপূর্বক ভাবিতেছিল। কদমার চুলের রং ঘোলাটে একটু হাল্কা, গায়ের রংও বেশীরকম সাদা। সেজন্যই প্রথম দর্শনে তাহাকে একটু অতিরিক্ত রকম সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। তাই অবিলাশ ভাবিতেছিল, কলিকালে শাঁখারীর ঘরে এ তপস্বিনীর উদয় কোথা হইতে?

ঝিলিমে এতক্ষণ করুণাকে দেখিয়া অরুণাও অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিয়াছিল কিন্তু বিলি এই ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে, নাকি ঠোঁটের ভঙ্গিতেই তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে কাহারই প্রণতায় বিশেষ মনোযোগ হয় নাই। তবু ভদ্রতা ভুলিল না যে নীরবেই একবার করুণাকে ভালোরূপ করিয়া নিরীক্ষণ তাহাও সমাপ্ত করিয়াছিল। মাথার উপরে কার্ণিশের ঝাঁওয়ার মতিয়া রইয়া উঠিয়াছিল; তেল-চপচপে কালো কোঁকড়া চুল পিছন দিকে তুলিয়া রবারের বাঁধন দিয়া পিঠের উপর দুলিতেছিল। ভারের লেশমাত্রও নাই, প্রাচুর্য্যের কোনো চিহ্ন কিছু না, কিন্তু শিল্পীর হাতের নিপুণ রেখা-চিত্রের মত এমন একটা সুষমা ছিল, যেটা আপনা আপনি হয় না। মেয়েটির চোখে মুখে কৌতূহল ও চাঞ্চল্য যেন খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

করুণা আসিয়া সেদিনকার মত দুই বোন বিদায় লইল। ফটকে বিজেদের মত দুই পা দিবার আগেই করুণার লম্বা হাতের মোচড়ানি দিয়া বলিল, "এই, ওকে এমন করে ভয় দেখাতে গেলি কেন? তোমায় আমায় আমাকেও ত ভয় হয়।"

করুণা বলিল, "তা কি করব? কত কথা যে!

অরুণা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ইঃ ভারি বড় রে! বাবামশায় ত দিদি বলে ডাকছিলেন। তোর মত চুলে ঝুঁটিকে ত কেউ বলেনা।"

করুণা বলিল, "যা, তুই যে ঠিক দাদামশায়ের বয়সী হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ছেলেমানুষ বাপু, আমার অত কথা ভোর হয় না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

গণেশ ঠাকুরের কুলজী

সকল কর্ম্মের আরম্ভে যে দেবতার নাম [illegible] করিতে হয়, যিনি কর্ম্মের সিদ্ধিদাতা ও [illegible] জ্ঞানবুদ্ধিদাতা বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস, সেই [illegible] ও কুলজীর সন্ধান করিয়া তাঁর কুলের কথা [illegible] ভালো। এত যে ক্ষমতা তাঁর, তাহা তাঁর আভিজাত্য [illegible] বংশে জন্মের জন্য অথবা হঠাৎ ব্রহ্মলোক হইতে [illegible] একটু খবর রাখা কর্ত্তব্য। যাঁকে পূজা করিতে হয় [illegible] কুলশীল জানিয়াই পূজা করা উচিত।

প্রত্যেক দেবতারই উদ্ভবের একটা ইতিহাস [illegible] দেবতারা ত মানুষেরই মানসী সৃষ্টি। যে মানুষের [illegible] সভ্যতা বুদ্ধি বিদ্যা ও চিন্তাশীলতা যেরূপ অবস্থায় [illegible] মনঃকল্পিত দেবতার আইডিয়াও তদ্রূপ হইয়াছে। মানবজাতি প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির [illegible] বিভিন্নরূপে প্রকাশকে দেবতা কল্পনা করিয়া [illegible] তখন সূর্য্য চন্দ্র ঝড় বৃষ্টি বন্যা তাদের দেবতা। [illegible] সঙ্গে হিংস্র ও উপকারী জন্তু—পশু ও পক্ষী, সরীসৃপ [illegible] জলচর—তাদের কাছে পূজা পায়। সেই প্রথম অবস্থায় মানুষের যা-কিছু রোগ ক্ষতি বিপত্তি ঘটে, তার জন্য বাহিরের কোনো শক্তির উপর আরোপ করে। এমনি নানা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে বুদ্ধি ও চিন্তার উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের দেবকল্পনাও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

সমাজের নিম্নস্তরের বহু লোকেরা যতগুলি কল্পনা [illegible] দেবতার সৃষ্টি করে, সমাজের উচ্চস্তরের বিদ্যাবুদ্ধি [illegible] অল্প লোকেরা সেইগুলিকে বিচারতর্কে সংস্কৃত করিয়া তার মধ্যে অর্থ ও সামঞ্জস্য দিবার চেষ্টা করে। এই [illegible] ফলে ক্রমশঃ শাস্ত্র রচিত হয়। কিন্তু অল্প লোকের [illegible] শাস্ত্র বহু লোকের কল্পিত বিশ্বাসে বারম্বার পরিবর্ত্তিত [illegible] চলিতে বাধ্য হয়, নতুবা অল্পের শাস্ত্রকে বেশী [illegible] গ্রাহ্য করে না, প্রামাণ্য মনে করে না। এমনি করিয়া [illegible] দিকে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের নিয়ন্তা [illegible] জানিয়া যেমন পরমেশ্বরের ধারণা সমাজে উদ্ভূত

সঙ্গে সঙ্গে আবার নানা দেবতা উপদেবতা প্রভৃতিও সেই সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।

ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। (১০০০ খ্রীঃ পূঃ—অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল। ২০০০—২৪০০ খ্রীঃ পূঃ—রমেশ দত্ত)। "বেদসংহিতা ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্ম্মের আদিম অবস্থা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক দ্বিতীয় অবস্থা, কল্পসূত্র ও স্মৃতিসংহিতা তৃতীয় অবস্থা, এবং পুরাণ ও তন্ত্র চতুর্থ অবস্থা প্রকটন করিতেছে।" সমুদায়ে চার বা পাঁচ বেদ—ঋক্, সাম, কৃষ্ণ যজুঃ, শুক্ল-যজুঃ, ও অথর্ব্ব। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অথর্ব্ব সকলের শেষে রচিত। ঋগ্বেদ রচিত হওয়ার পর সমাজের নব নব কল্পনা বিধিবদ্ধ করিবার জন্যই ঋগ্বেদের কথারই সঙ্গে নূতন কথা জুড়িয়া জুড়িয়া অপর বেদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ এই দেখিতে পাই যে "সামবেদ সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক এবং অথর্ব্ববেদীয় সংহিতারও অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বিনিবিষ্ট আছে। সায়নাচার্য্যও এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।" (ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা।)

ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রাচীনতম শাস্ত্র হইলেও তাহাও একই সময়ের রচনা নহে; তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মত ও বিশ্বাস সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

সে যাই হোক, গণেশ ঠাকুরের সন্ধানে আমাদের যাত্রা সুরু করিতে হইবে ঋগ্বেদ হইতেই। ঋগ্বেদে গণপতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি বৃহস্পতিকে অভিহিত করা হইয়াছে—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥
(দ্বিতীয় মণ্ডল, ২৩ সূক্ত, ১ম মন্ত্র)

এই জ্ঞানদাতা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি গানকারী গণ দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন—

স মৃষ্টভা স কবতা গণেন
বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতিরন্নিয়া হব্যসূদঃ
কনিক্রদদ্বাবশতীরুদাজৎ॥ (৪, ৫০, ৫)

এইজন্য বৃহস্পতির নাম গণপতি।

ঋগ্বেদে আবার ইন্দ্রকেও গণপতি বলা হইয়াছে। (ঋ ১০ ম,—১১২ সূ—৯ মন্ত্র)

বেদে মরুদ্‌গণ রুদ্রের 'গণ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গণ যাঁর ইঙ্গিতে পরিচালিত তিনি গণপতি। সুতরাং রুদ্রও গণপতি। ঐ গণদিগের মধ্যে কারো ষণ্ডমুণ্ড, কারো বা অন্য জন্তুর মুণ্ড, কারো বা মুণ্ডই নাই—কবন্ধ দেহ। সুতরাং গণেশের কবন্ধ দেহে বৃহৎ পণ্ডর মুণ্ড সংযোগ করিয়া তাঁকে গণপতিত্বে প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মধ্যে এই মরুদ্‌গণের কথাই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বলিতে পারা যায়।

প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ভাগ প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভাগের অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন। মন্ত্র-সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সঙ্কলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা প্রস্তুত হইয়াছে; যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাজসনেয়ী সংহিতা, ও অথর্ব্ব-সংহিতা। ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা-ভাগের ভাষ্য স্বরূপ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (চতুর্থ খণ্ড, অভিষ্টব মন্ত্র, প্রথম পটল)—বৃহস্পতিকে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতি ও গণপতি নাম ব্যবহার করিয়াছে।

বেদের ভাগবিশেষের নাম আরণ্যক। ইহা অরণ্যে রচিত ও বানপ্রস্থাশ্রমীর বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য অরণ্যে গীত হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে আমাদের গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখানে গণেশের গায়ত্রী দেওয়া হইয়াছে—"তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ।" আরণ্যক রচনার কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দী। যাজ্ঞিকী উপনিষৎ কিছু অপ্রাচীন হইলেও খ্রীষ্টপূর্ব্বের (৪৮০ খ্রীঃ পূঃ) রচনা বলিয়া আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সুদূর কালেই বক্রতুণ্ড দন্তী গণেশ ঠাকুরের রূপটি লোকের কল্পনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গণেশের নামটি তখনো কায়েমী হয় নাই!

রুদ্র শব্দে রুদ্রের ভাবযুক্ত ভূত বুঝাইত। অথর্বশির-উপনিষৎ রুদ্রকে অনেক ভূতের সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সেইসকল ভূতের মধ্যে বিনায়ক একটি। বিনায়ক মানে বিশিষ্ট নায়ক, সুতরাং তাহা গণপতির সঙ্গে সমার্থক বলিয়া গণপতি ও বিনায়ক একই

বাক্তি নাম হইয়া থাকে, কিন্তু এই বিনায়ক গণপতি একই—এরা দুই ভিন্ন দেবতা নহেন।

গৃহ্য ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের পর সূত্র। সূত্রের অপর নাম ধর্মশাস্ত্র। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক রচিত সংহিতা ধর্মসূত্র হইতে সঙ্কলিত। মানবগৃহ্যসূত্রে বিনায়কের বিবরণ আছে (২।২৬)। কিন্তু এই বিনায়ক ভূতগণের নায়ক; সর্ব্বদা মানুষের অনিষ্ট করিবার সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত; সেই অনিষ্টকারক ভূতগণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহার গণপতিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা মানুষের মনে জাগে। তার ফলে গণপতি বা গণেশের পূজার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। পূজা পাইয়াও যে প্রথম প্রথম গণেশ বিঘ্ন করিতে ছাড়িতেন না, তাহা তাঁর বিশেষ বিঘ্ননায়ক প্রভৃতি নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়।

সূত্র হইতে সংহিতা সঙ্কলন করা হয়। সংহিতা সূত্রের কাল অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের মতে ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব—৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। সংহিতাকারদের মধ্যে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীন। যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবতঃ ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের লোক। তিনি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে লোকদিগের কর্ম্মবিঘ্ন উৎপাদনের জন্যই ব্রহ্মা ও রুদ্র বিনায়ককে গণদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন।—

বিঘ্নকর্ত্তৃন্ কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ।
গণানাং ত্বাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা॥ (১৭৭)

এই গণেশ বিনায়কের কুদৃষ্টি পড়িলে লোকের কতরকম দুর্ভোগ ঘটিতে পারে তাহা বর্ণনা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে—

লেনোপহতো রাজন্ ব্রহ্মণাদি নিবোধত।
ধর্ম্মেহপ্যাগ্রহস্তস্য জড়ং, মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি॥
ব্যায়ামব্যবহারেষু ক্রব্যাদাংস্তাধিগোহতি।
অত্যাহারৈর্গদৈর্যুক্তঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে॥
ভজতশ্চ তথা গ্রাম্যং মন্যতেহনুগতং পরৈঃ।
বিদ্যা বিত্তং চ, সংসীদত্যনিমিত্ততঃ॥
জ্যেষ্ঠো ন লভতে রাজ্যং রাজ্ঞশ্চাপ্যনন্দনঃ।
কুমারী ন লভেদ্ ভর্ত্তারং, অপত্যং ন চ গর্ভিণী॥
আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়ত্ব, ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
ন বিন্দতে নরঃ সম্যক্, কৃষিঞ্চৈব কুরুতে বলাৎ॥

বিঘ্নেশের কুদৃষ্টি যার উপর পড়ে সে যখন দেখে যেন সে জলে ডুবিয়া যাইতেছে, মস্তকের চীর ও কাষায়-বাস-পরিহিত (মৌঞ্জ) সাবধানে যে কোপীন দুটির উপর চড়িয়াছে এবং অত্যন্ত গর্দ্দভ যুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছে, যেন সে ছুটিতেছে ও কাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে; সে বিমনা হইয়া থাকে, তার বুদ্ধি বিকল হয়, সে বিনা কারণে দুঃখিত বোধ করে; বিদ্যা থাকিলে পড়িলে রাজার ছেলে হইয়াও রাজ্য হইতে বঞ্চিত হয়, ধনলাভ ঘটে না, গর্ভিণী হইয়াও সন্তানবতী হয় না, শিষ্য শিক্ষক হইতে পায় না, শিষ্য অধ্যয়নের সুবিধা করিতে পারে না, বণিক বাণিজ্যে লাভবান্ হয় না, এবং কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য পায় না।

এর পরে গণেশের কুদৃষ্টি খণ্ডনের জন্য অনেক গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লিঙ্গ পুরাণেও বলা হইয়াছে যে শঙ্কর দেবতাদের অনুরোধে দৈত্যাদিগের বিঘ্ন করিবার জন্য বিঘ্নরাজ গণপতিকে সৃজন করেন। মৎস্য পুরাণে বিনায়কচতুর্থী ব্রতবিধানে ও স্কন্দপুরাণে বিঘ্নশান্তি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার (উত্তর পর্ব্ব, ৩৬) কথাগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত ও পরিকল্পিত হইয়াছে। শিবপুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে মৌদ্গল্য পীড়াদানের জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণেরা গণেশের আরাধনা করিয়া তাঁকে ঋষির বিঘ্ন উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

গণ মানে যেমন ভূতপ্রেতপিশাচ, তেমনি গণ মানে সাধারণ লোক—The Mass, the People। যিনি দেবতা তিনিও গণেশ। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকের শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সকল-প্রকার উপদ্রব ও অমঙ্গলের কারণ ভূতপ্রেতের দৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়। তাদের উচ্চ কল্পনাশক্তি না থাকাতে তারা সেই অমঙ্গলকারী অপদেবতারই পূজা করে, ভয়ে যাগ যজ্ঞ ভক্তি করে। এই গণেশ যে শূদ্রদের দেবতা এবং সেই গণেশের পূজা করে সে যে হীন তৎসম্বন্ধে স্মৃতি বিধান দিয়া রাখিয়াছেন।

বিপ্রাণাং দৈবতং বিষ্ণুঃ, ক্ষত্রিয়াণাং তু ভাস্করঃ।
বৈশ্যানাং তু ভবেদ্ ব্রহ্মা, শূদ্রাণাং গণনায়কঃ॥

যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ "গণানাঞ্চৈব যাজকাঃ" তাদের নানা বিগর্হিতাচার, অপাঙ্‌ক্তেয়, বিজাধম এবং নরব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এতান্ বিগর্হিতাচারান্ অপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বান্ উভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥ (৩।১৫০)

মনু অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের মতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের এবং ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে।

মূল রামায়ণ ও মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব্ব কাল

হয় না হইলেও খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী, হয়ত দশম শতাব্দী, পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে নব নব রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া চলিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মূল রামায়ণে গণেশের উল্লেখ কোথাও নাই। অপ্রাচীন উত্তর কাণ্ডের স্পষ্ট-স্বীকৃত প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গে গণেশ নাম একবার আছে, কিন্তু শিবকেই সেই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রাবণ শিবকে স্তব করিতে করিতে একস্থলে বলিতেছেন—

"গণেশো লোকপালশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাযাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ॥"

মহাভারতের অনুক্রমণিকা-পর্ব্বাধ্যায়ে গণপতি জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠরূপে ব্যাসদেবের লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছেন দেখিতে পাই।—

"ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিতপূরকঃ
তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসো যতঃ দ্বিজঃ।
পূজিতস্তোপবিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদানয
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়কঃ॥—৭৫—৭৭।

কিন্তু মহাভারতের এই অনুক্রমণিকা যে মূল মহাভারতের অন্তর্গত ও সমকালের নয় তাহা মহাভারতেই স্বীকৃত হইয়াছে (আদি পর্ব্ব, ১ম অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)। তাহা না হইলেও, মহাভারতের অনুক্রমণিকা অন্তত ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আগের রচনা (ম্যাক্‌ডোনেল)।

মহাভারতের অন্য এক জায়গায় গণেশ্বর ও বিনায়ক নামের উল্লেখ আছে।—

এতে দেবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বভূতগণৈশ্বরাঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্বলোকানাং গণেশ্বরবিনায়কাঃ॥
অনুশাসন, ১৫০, ২৪।২৫।

বেদে প্রথমে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা বলিয়া একই দেবতার তিন স্বরূপ কল্পনা করা হয়; পরে একাদশ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ বলিয়া তিন-এগার ভেত্রিশ দেবতা নির্দ্দিষ্ট হন; পরে সেই তেত্রিশ তেত্রিশ-কোটি হইয়া উঠিয়াছে এককেই বহুরূপ জানাইবার রূপক হইতে। মহাভারতে বেদ-স্বীকৃত তৃতীয় স্তরের তেত্রিশ জন দেবতাকেই গণেশ্বর বলা হইয়াছে, কোনো একটি বিশেষ দেবতাকে নহে। কিন্তু মহাভারতে যে তেত্রিশ জন গণেশ্বর বিনায়কের নাম আছে, তাঁরা কেউ বৈদিক দেবতা নন, তাঁরা গ্রামনী অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতা, "যোগভূতগণাকথা"।

এইসব গ্রাম্য অপদেবতা প্রায়ই ক্ষেত্রপাল হয়। বরাহপুরাণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন গৌরী গণেশ শিব কার্ত্তিকেয় আদিত্য ও মাতৃগণ সকলেই ক্ষেত্রপাল—তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্ব্বাঃ (১৭।৩৪)। সেইজন্য গণেশের মুখ শস্যধ্বংসকারী শ্রেষ্ঠপশু হাতীর মতন, এবং তাঁর বাহন কৃষির শত্রু মূষিক। লক্ষ্মী, যিনি কৃষিসম্পদ, তাঁর বাহন মূষিকের ভক্ষক পেচক। স্কন্দপুরাণে আছে—গণেশ হস্তে অঙ্কুশ মুষল দাড়িম্ব পরশু ধারণ করিয়া থাকেন; ঐ সমস্তই কৃষি ও পশুপালনের অস্ত্র; সুতরাং এই-সমস্ত উপকরণ গণেশকে কৃষির দেবতা বলিয়াই সূচিত করিতেছে।

শিব-দুর্গাও আদিতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদেরই দেবতা ছিলেন, তাহা তাঁদের নাম ও রূপ হইতেই কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়—শিব গিরিশ, পশুপতি, জটাধারী, শ্মশানবাসী, দরিদ্র; দুর্গা পার্ব্বতী। শিব ও পার্ব্বতী বহুবার ব্যাধ কিরাত ভিল্ল শবর ও শবরীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বহু পুরাণের বিবিধ উপাখ্যানে দেখা যায়। দুর্গোৎসবের নাম শবরোৎসব, সেই উৎসবে অশ্লীল বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা দেবীর প্রীতি অর্জ্জন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে (কালিকা পুরাণ)। শিবদুর্গাও ক্ষেত্রপাল, এইজন্য কৃষিসম্পদের চিহ্নস্বরূপ নবপত্রিকা দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ। বাঙালীর হাতে শিবদুর্গা একেবারে কৃষক গৃহস্থ সাজিয়াছেন; তাঁরা কখনো বা কাপাস বুনিয়া তাঁতির মতন কাপড় বুনেন, কখনো বা শাঁখা বেচিবার জন্য ফেরিওয়ালা হন (শিবায়ন)।

এই শিবদুর্গা পরে গণেশের পিতামাতা হইয়া পড়েন। শিবদুর্গা যখন নিম্নস্তর হইতে বেগ লাভ করিয়া সমাজের উপরের স্তরের লোকদের বাধ্য করিয়া দেবতা বলিয়া স্বীকার করাইতেছিলেন এবং তাদের উচ্চ কল্পনায় ক্রমশ সংস্কৃত হইয়া মহাদেবের ও মহাশক্তির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন গণেশও উচ্চ স্তরে স্বীকৃত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ গণেশের বহুবিধ জন্মবিবরণ ও উপাখ্যান হইতে পাওয়া যায়।

স্কন্দপুরাণের মহেশ্বর খণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে এই উপাখ্যানটি আছে—

গণেশ যে শিবেরই পুত্র তা না জানিতেন গণেশ, আর না জানিতেন শিব। কাজেই "গণেশের বহুকাল অজ্ঞানাবস্থায় প্রাদুর্ভাবকাল শিববিরোধী ছিলেন।" তার ফলে [illegible] প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য শিব ও গণেশের [illegible] হয়; তাতে শিব গণেশের মুণ্ড ছেদন করেন। তখন শিবশক্তি পার্ব্বতী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, শিবকে গণেশের প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তখন শিবশক্তির অনুরোধে শিব, পতিপুত্রের কবন্ধ দেহে গজমুণ্ড যোজনা করিয়া তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দান। তখন স্থির হইল শিব ও গণেশ অভেদ, এবং মহেশ ঠাকুরও ঠেকিয়া এই জ্ঞান লাভ করিলেন যে "এই চরাচর সমস্ত লোক শিব ও শিবশক্তি যোগেই সংশ্লিষ্ট।" সেই হইতে গণেশকে সম্মানিত ও পূজা [illegible] করিবার জন্য শিব সর্ব্বকার্য্যের [illegible] গণেশের অর্চ্চনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই উপাখ্যানটির একটু রূপান্তর দেখা যায় শিবপুরাণে। শিব তাঁর গণ লইয়া নানাস্থানে বিচরণ করিতেন, পার্ব্বতী একাকী অরক্ষিত গৃহে থাকিতেন। নিজের পাহারার জন্য পার্ব্বতী একদিন কাদা দিয়া একটি পুতুল গড়িয়া তাতে প্রাণসঞ্চার করিলেন ও তাকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। পুতুলের উপর হুকুম হইল কাহাকেও পার্ব্বতীর গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না; শিবগণ লইয়া ফিরিয়া আসিলে সেই প্রাণবান পুতুল তাঁকেও বাধা দিল। কাজেই শিবের সঙ্গে পুতুলের যুদ্ধ। ফল—শিব কর্ত্তৃক পুতুলের মুণ্ডচ্ছেদ। পার্ব্বতী খবর পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত। ভবানীভ্রূকুটিভঙ্গে ভীত হইয়া নন্দীকে তাড়াতাড়ি পাঠাইলেন—যার হয় একটা মুণ্ড আনিয়া জোগাও, সেইটা জুড়িয়া পুতুলটাকে বাঁচাই, নহিলে আর রক্ষা নাই। নন্দীটা ভূত, বানরমুখ, খাটাশখুনি; সামনে পাইল একটা মুমূর্ষু হাতী, তারই মাথাটা কাটিয়া আনিল; আর ভূতনাথও কালবিলম্ব না করিয়া কাটা মাথাটাই জুড়িয়া পুতুলকে আবার জীবন্ত করিয়া দিলেন, তাতে যে পার্ব্বতীপুত্রের শ্রী কেমন হইল সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি দেখিয়া পার্ব্বতীর হর্ষবিষাদ হইল, কোপশান্ত হইল না। তখন তাকে গণাধিপের পদে অভিষিক্ত করিয়া সকল দেবতার পূজার আগে পূজা নির্দ্দেশ করিয়া মহাদেবীর ক্রোধ হইতে কোনো রকমে নিষ্কৃতি বাঁচিলেন।

এই দুই আখ্যায়িকা হইতে এই বুঝিতে পারি শিব ও গণেশ অপরিচিত দুই সমাজের দেবতা, এবং একের দেবতাকে অপরের দ্বারা স্বীকার করিতে অনেক আপত্তি ও বাধা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। প্রাথমিক বৈরিতা শেষে এই রফায় নিষ্পত্তি হইয়াছে যে উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক পাতাইয়া দেওয়া। কিন্তু পিতা যিনি তিনি ত পুত্র অপেক্ষা পূজ্যতর, ইহাতে শিবেরই প্রাধান্য রহিয়া গেল। এই ব্যবস্থা পত্যদের মনঃপূত হইল না, তারা আপত্তি করিতে লাগিল। সেই বিরোধও মিটাইবার চেষ্টা পুরাণে দেখিতে পাই।—

লিঙ্গপুরাণ বলেন দৈত্যগণের বিঘ্ন উৎপাদনে স্বয়ং শঙ্কর উমাগর্ভে সুরেশ্বর গণপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুরপতিগণ সেই অভীষ্টপ্রদ গণেশরূপী [illegible] করেন (১০৪-১০৫ অধ্যায়)। এই পুরাণে গণেশের [illegible] বা গুণের কোনো বর্ণনা নাই। গণেশ যে মহেশ [illegible] করিয়া গণেশের হাতীর মাথাতেও ছটা আছে [illegible] হইয়াছিল। গণেশের ৫১ নামের মধ্যে ধীমান্ [illegible] যুক্তী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃকেতরঃ (ভরতের [illegible] টীকায় রাঘবভট্ট)। স্কন্দপুরাণে কপর্দী [illegible] নামও গণেশকে দেওয়া হইয়াছে।

গণেশ ও মহেশ এক শ্রেণিভুক্ত [illegible] ও শৈব সম্প্রদায়ের বিরোধ নিষ্পত্তি হইল, [illegible] উক্ত দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বৈষ্ণব ও শাক্ত [illegible] বিরোধ বাধে। তখনি তারও সুমীমাংসা [illegible] হরিহরমূর্ত্তি, হরগৌরীমূর্ত্তি কৃষ্ণকালীমূর্ত্তি [illegible] কল্পনায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের গণেশখণ্ডে আছে [illegible] গণেশরূপে জন্মগ্রহণ করেন—গণেশের [illegible] তবজন্ম। প্রথমে গণেশ 'দুঃখ নিষ্পন্ন [illegible] বিনিন্দিকম্'; শনির দৃষ্টিতে সেই মাথা [illegible] গজমুণ্ড সংযোজিত হয়।

বরাহ মৎস্য ও স্কন্দ পুরাণেও আছে যে গণেশ জন্মাবধিই গজমুণ্ড নন; প্রথমে

প্রদীপ্তাস্যো মহাদীপ্তঃ কুমারো ভাসয়ন্ দিশঃ।
পরমেষ্ঠিগুণৈর্যুক্তঃ সাক্ষাদ্ রুদ্র ইবাপরঃ॥

বরাহপুরাণের মতে গণেশ মহাদেবের হাস্য হইতে সমুৎপন্ন হন। কিন্তু

উমানিমেষনেত্রাভ্যাং তম্ অপশ্যত ভামিনী।
ত্বং দৃষ্ট্বা কুপিতো দেবঃ স্ত্রীস্বভাবক্ষকলং তথা॥
সত্বা কুমাররূপন্তু শোভনং মোহনং দৃশাম্।
ততঃ শশাপ ত্বং দেবো গণেশং পরমেশ্বরঃ॥
কুমার গজবক্ত্রস্ত্বং প্রলম্বজঠরস্তথা।
ভবিষ্যসি তথা সর্পৈর্ উপবীতগতির্ভবম্॥ বরাহ ২৩ অধ্যায়

শিব স্বীয় পত্নীকে এই হাস্যসমুৎপন্ন কুমারের শ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইতে দেখিয়া শাপ দিয়া তাঁকে কুৎসিত করেন।

অন্য পুরাণে এই কবন্ধ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেওয়া হইয়াছে। পার্ব্বতীর অত্যন্ত সাধ যে একটি ছেলে হয়। একদিন তাঁর অঙ্গরাগের সময় তাঁর দাসীরা যে গাত্রমল তোলে তাহা দিয়া পার্ব্বতী একটি পুতুল গড়িতে আরম্ভ করেন। তখনো পুতুলের মাথা গড়া হয় নাই, শিব সেখানে আসিয়া পড়িলেন ও সেই পুতুল দেখিয়া বলিলেন—'তোমার বড় পুত্র পাইবার সাধ, ঐ পুতুল তোমার পুত্র হোক।' দেববাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। যেমন বলা অমনি ফলা—কবন্ধ পুতুল জীবন্ত হইয়া উঠিল। তখন অগত্যা তার ধড়ে হাতীর মাথা জুড়িয়া দেওয়া হইল।

বামনপুরাণে পার্ব্বতীর গাত্রমল হইতেই একেবারে গজাননের জন্ম, কবন্ধ দেহে গজমুণ্ড সোজনার ব্যাপার নাই (৫৪ অধ্যায়)।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলেন—পার্ব্বতী পুত্রলাভের জন্য ব্যস্ত হইলে মহেশ্বর পার্ব্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাহাই পরিহাসচ্ছলে পার্ব্বতীর কোলে দিয়া বলিলেন—এই তোমার ছেলে। অমনি দেববাক্য ফলিয়া গেল; বস্ত্রাঞ্চলই জীবন্ত শিশু হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই শিশুর মাথা উত্তর দিকে ছিল বলিয়া খসিয়া গেল এবং তখন তার স্থানে গজমুণ্ড জোড়া হইল। রক্তবস্ত্র হইতে দেহ উৎপন্ন বলিয়া গণেশ রক্তবর্ণ। কিন্তু তন্ত্রের মতে—দন্তাঘাত-বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং—দন্তাঘাতে বিদারিত শত্রুশরীরের রক্তে অনুলিপ্ত বলিয়া গণেশ রক্তবর্ণ।

বরাহ, মৎস্য, অগ্নি, শিব, ভবিষ্য, বামন ও গরুড় পুরাণে গণেশের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই তাদের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে পার্থক্য অধিক।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত সুপ্রভেদাগমতন্ত্রে গজবক্ত্র গণেশের জন্মের বিবরণ পুরাণ হইতে স্বতন্ত্র। শিব-পার্ব্বতী হিমালয়-সানুতে ভ্রমণ করিতে গিয়া গজমিথুন দেখিয়া নিজেরাও গজরূপ ধারণ করিয়া বিহার করেন ও তার ফলে গজবক্ত্র পুত্রের জন্ম হয়। (৪৩ পটল)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে যে কার্ত্তিক জ্যেষ্ঠ, গণেশ কনিষ্ঠ। কার্ত্তিক গণেশ দুজনেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া আগে আমি বিবাহ করিব বলিয়া বাবার কাছে আব্দার ধরেন। শিব বলিলেন, যে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া আগে ফিরিতে পারিবে তারই আগে বিবাহ হইবে। কার্ত্তিক দ্রুতগামী ময়ূরবাহনে উড়িয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন; কিন্তু মূষিকবাহন গণেশ পিতামাতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহ দাবী করিলেন। শিব কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গণেশ বলিলেন—"পিতামাতা সর্ব্বতীর্থময়; তাঁদের আমি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।" এইরূপে গণেশ ফাঁকি দিয়া আগে বিবাহ করেন, এবং কার্ত্তিক কুমারই রহিয়া যান। এখন আগে বিবাহের নজিরে গণেশই জ্যেষ্ঠ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইয়াছেন।

কার্ত্তিকেয় বা স্কন্দও আদিতে বিঘ্নকারক গণপতি ছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব্ব, স্কন্দ উপাখ্যান)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বহুস্থানে বলা হইয়াছে শিব ও স্কন্দ এক অভিন্ন। স্কন্দপুরাণে কুমারনাথ চোরের দেবতা, তিনি চোরশাস্ত্র রচনা করেন। কালীও চোর-ডাকাতের দেবতা "এবং নানা-ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজিতা সর্ব্বদস্যুভিঃ।" চৈতন্যভাগবতের কাল পর্য্যন্ত কালী দুর্গা চণ্ডী চোরের উপাস্য দেবতা ছিলেন দেখিতে পাই।

গণেশের কবন্ধদেহে যখন গজমুণ্ড সংযোজিত হয় তখন সেই গজমুণ্ডে দুটি দন্তই ছিল। একদা পরশুরাম শিবদুর্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৈলাসে গিয়া হরপার্ব্বতীর ঘরে ঢুকিতে গেলে দ্বারবান গণেশ পরশুরামকে

[illegible] তখন পরশুরাম গণেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গণেশ পরশুরামকে শুঁড়ে জড়াইয়া [illegible] ভূতলে ভ্রমণ করাইয়া [illegible] সপ্ত সমুদ্রে চুবাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন। ক্রোধান্বিত পরশুরাম তখন গণেশের প্রতি পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শৈব অস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য গণেশ একটি দন্তে সেই অস্ত্রের আঘাত গ্রহণ করেন এবং সেইখানে সেই দন্ত খসিয়া পড়ে (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশ খণ্ড)। মতান্তরে এই ঘটনার নায়ক পরশুরাম নহেন,—রাবণ। কেহ কেহ বলেন রাবণ যে গণেশের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন তাহা কোন রকম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নয়; তাঁর পাশা খেলার পাশুটি ও গুটি করিবার জন্য রাবণ গণেশের একটি দাঁত ভাঙিয়া লইয়াছিলেন। আবার কেউবা বলেন খেলা নিয়ে করিতে দুই ভাইয়ে কাড়াকাড়ি হওয়াতে কার্ত্তিকেয় গণেশের একটি দাঁত ভাঙিয়া দ্যান।

ভাঙের কারণ আরও ভিন্ন রকম। এক সময়ে গণেশের ভক্তেরা গণেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর লাড়ু খাওয়াইয়াছিল। লাড়ুবোঝাই লম্বোদর মূষিক ইঁদুরের পিঠে চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। ইঁদুর কোরা লাড়ুবোঝাই লম্বোদরকে কষ্টে বহন করিয়া যাইতেছিল; তার উপর পথে এক সাপ দেখিয়া ইঁদুর ভড়কাইয়া উঠিল; তাতে গণেশ ঠাকুর টলিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁর লাড়ুবোঝাই পেটটি ফাটিয়া গেল। গণেশের ফাটা পেট হইতে যত লাড়ুগুলা সব বাহির হইয়া পড়িতেছিল; গণেশের first aid to the wounded জানা ছিল, অমনি চট করিয়া সাপটিকে ধরিয়াই পেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ফেলিলেন, যেমন করিয়া চাষারা খড় দিয়া ফাটা কুঁড়ে বাঁধে। তাহা দেখিয়া দেবতারা বিদ্রূপ করিয়া হাস্য করেন; গণেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বেয়াদব দেবতাদের মারিবার মতন কোনো অস্ত্র হাতের কাছে না পাইয়া নিজেরই একটা দাঁত উৎপাটন করিয়া দেবতাদের প্রহার করেন। সেই হইতে দাঁতটি তাঁর হাতের অস্ত্র হইয়া আছে। এবং সাপটি [illegible] উপবীত। (সুপ্রভেদাগমতন্ত্র।)

[illegible] দাঁতটি পাইয়াছিলেন পৃথিবী দেবীর নিকট হইতে পরশুরামের উপহার। গণেশের জন্মদিনে পরশুরামই এই উপহার দিয়াছিলেন—

সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণদোহনীং।
জপমালাং দদৌ ব্রহ্মা, ইন্দ্র গজবরং মদৌ।
পদ্মং পদ্মাবতী প্রাদাদ্, ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ হরঃ।
বৃহস্পতির্ব্বজ্রসূত্রং, পৃথ্বী মূষিকবাহনম্।
বরাহ পুরাণ।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে গণেশের হাতের ইন্দ্রের হাতীর দাঁত, গণেশের জন্মদিনে ইন্দ্রের উপহার।

আগে বহুগণপতি ছিলেন—শিব, গণেশ, [illegible] নন্দী, কালভৈরব, বিরূপাক্ষ, কুবের, সবাই গণেশ-গণপতি। নারসিংহ পুরাণের ২৬ অধ্যায়ে [illegible] স্তব আছে তাতে গণপতিকে ভববক্ত্র মুখ্য [illegible] হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণ বলেন—বহু গণপতি [illegible] মিলিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। শব্দরত্নাবলীতে জটাধর-বচনে পাই—

আদিত্যা বিশ্ববসবস্তথৈতা ভাস্করানিলাঃ।
মহাত্মাত্মিকসাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ।

শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট ৫০ জন [illegible] নাম করিয়াছেন; বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রে ৫৪ জন [illegible] ধ্যান ও স্তব আছে।

এইসব নানা গণপতির রূপ মর্য্যাদা ও গুণ [illegible] একস্থানে সম্মিলিত ও এক দেবতায় পর্য্যবসিত [illegible] বর্ত্তমান গণেশের উদ্ভব হইয়াছিল মোটামুটি [illegible] হইতে জ্ঞানী বৃহস্পতির গুণ গণেশে সংক্রান্ত আরোপিত হইয়া গণেশ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

ক্রমশ লোকের দেবকল্পনা [illegible] হইলে বিঘ্নেশ গণেশ বিঘ্নবিনাশন হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্রের ন্যায় সাহিত্যের ভিতর দিয়াও গণেশ [illegible] আবির্ভাব ও প্রভাব অনুসরণ করিতে পারা যায়। [illegible] পঞ্চম শতাব্দীর রচনা; তার আরম্ভ হইয়াছে বন্দে [illegible] প্রণাম করিয়া, কিন্তু সেই দেববর্গের মধ্যে গণেশ [illegible] নাই। বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম শতাব্দীর কোনো কবির কোনো গ্রন্থে গণেশের [illegible] যায় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র [illegible]

দেবতার নাম করিয়াছে, কিন্তু গণেশের নাম করে নাই। বাণভট্ট ও ভবভূতি ৭ম শতাব্দীর কবি। বাণভট্টের কাদম্বরীতে গণেশের উল্লেখ আছে; সাহিত্যে এই প্রথম তৃতীয়মুণ্ড গণপতির সহিত সাক্ষাৎ; কিন্তু এখানে গণপতি গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি গণদিগের সহচর মাত্র, স্বাধীন দেবতা নহেন। ভবভূতির মালতীমাধবে সর্ব্বপ্রথমে গণেশের পূজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।—

নান্দী

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া,
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্ত্তিক-ময়ূরে,
ফণিপতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ তুলি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউন রক্ষক।—

মালতীমাধব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

যেসব পুরাণে গণেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখি সেগুলি সবই দাক্ষিণাত্যে রচিত। ভবভূতিও দাক্ষিণাত্যের কবি। এখনও দাক্ষিণাত্যেই গণপতির পূজা ও প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। গণেশের মহিমা বৃদ্ধির জন্য দ্রাবিড় দেশে অথর্ব্ববেদের অনুকরণে একখানি ছোট বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তার নাম গণেশাথর্ব্বশীর্ষ। ইহা ৮ম শতাব্দীরও পরের রচনা। এইসব নানাকারণে মনে হয় গণেশ ঠাকুরের প্রথম জন্ম দক্ষিণ দেশেই।

গণেশের মূর্ত্তি কবে হইতে গঠিত হইয়া পূজিত হয় তাহা বলা যায় না। বেদ-সংহিতায় দেব-প্রতিমা ও স্বতন্ত্র দেবমন্দিরের কোনো প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে গণেশের উৎপত্তিও হয় নাই।

মনুসংহিতা রচিত হইবার (২০০-৪০ খৃঃ) পূর্ব্বে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ উহাতে দেবপ্রতিমা ও দেবল ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দেবলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে (৩।১৫২ এবং ৯।২৮৫)।

পৌরাণিক যুগে গণেশ পূজ্য হইয়া উঠিলেও বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরাণে গণেশ প্রভৃতির পূজা হীন বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

সৌরস্য গাণপত্যস্য দৈবতস্য ভূমিমানিনঃ
শাক্তস্য বৈষ্ণবো বাপি নৈবেদ্যং পরিবর্জয়েৎ।
সদ্য বিবর্দ্ধয়েৎ দৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ।
ন যাচ্যা প্রার্থনা তেভ্যোঽন্যেভ্যো দ্রব্যমেধ্যবৎ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১০০ অধ্যায়।

বৈষ্ণব ব্যক্তি সৌর গাণপত্য দৈব শাক্ত প্রভৃতির দেওয়া ভক্ষ্য অন্ন ও সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন এবং তাঁদের কাছে প্রার্থনাও করিবেন না ও তাঁদের দ্রব্য অশুচি মনে করিয়া পরিহার করিবেন।

এইরূপ পরসম্প্রদায়বিদ্বেষ ও ধর্ম্মকলহ অন্যান্য পুরাণেও অল্পবিস্তর আছে; এমন কি বেদ সম্বন্ধেও পক্ষপাত দেখা যায়—

সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ।
ঋগ্বেদোদেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচিধ্বনিঃ॥

মনুসংহিতা, ৪ অধ্যায়, ১২৩-১২৪ শ্লোক।

সামবেদের শব্দ কানে গেলে ঋক্ যজু পাঠ বন্ধ করিবে—ঋগ্‌বেদ দৈব, যজুর্ব্বেদ মানুষ-সম্বন্ধীয়, এবং সামবেদ পিতৃপুরুষ সম্পর্কীয়—সুতরাং তাহা ভূতের ব্যাপার, এবং সেইজন্য তার ধ্বনি ভুতুড়ে বলিয়া অশুচি।

এইরূপ বিবাদের মধ্য দিয়া সকল ধর্ম্মমতকেই প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে। গণেশও নির্ব্বিবাদে পূজা আদায় করিতে পারেন নাই।

সে যাই হোক, সর্ব্বপ্রাচীন গণেশমূর্ত্তি যাহা দেখা যায় তাহা নেপালে পশুপতিনাথ শিবমন্দিরের উত্তর প্রাচীরে; ঐ মন্দির অশোকের কন্যা চারুমতী খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে নির্ম্মাণ করান। উহার প্রাচীরগাত্রের গণেশমূর্ত্তি মন্দিরের সমকালে বা পরবর্ত্তীকালে গঠিত তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। (Archæological Survey of Mayurabhanja—N. N. Bose)।

এলোরা গুহামন্দিরের দুই স্থানে করিবদন গণেশের মূর্ত্তি আছে (Cave Temples by Fergusson)। এলোরার গুহামন্দির ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হয়।

যোধপুরের উত্তর-পশ্চিমে ২২ মাইল দূরে ঘাটিয়ালা নামক স্থানে একটি স্তম্ভগাত্রে চারিটি গণপতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভটি ৮৩২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত (Ep. Ind, Vol. IX, p. 277)।

ভবিষ্যপুরাণ পার্জিটার সাহেবের মতে ৭ম শতাব্দীর রচনা, তবে উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত পরবর্ত্তী রচনা যে আছে অন্য কোনো পুরাণে নাই। সে যাই হোক, ঐ পুরাণে দেখা যায়, বিনায়কের নৃত্য মন্দির তখনো রচিত

হয় নাই, বিনায়ক চতুর্দ্দশী যম ব্রাহ্মণদের সুপরিচিত হইতেছে।

বৌদ্ধরা তন্ত্রিক হইয়া উঠিবার পর বহু হিন্দু দেবদেবীকে নিজেদের দেবমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয় এবং নিজেদের দেবমূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেসব মূর্ত্তিও গড়িতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে প্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার অনেক পরে তাঁহারই অনুচররূপে তাঁর মূর্ত্তির পার্শ্বচর হিন্দুদেবমূর্ত্তি গঠিত হয়। কিন্তু ললিতবিস্তর বলেন যে বুদ্ধদেবের জন্মের সময় তাঁকে গণেশ স্কন্দ শিব প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। প্রাথমিক বৌদ্ধ যুগের একটি মূর্ত্তিতে দেখা যায় বিঘ্নহর গণপতি বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের চিতা নির্ব্বাণ করিতে নিযুক্ত আছেন (Assistant au nirvana du Cakyamuni.—A. Foucher, L' Iconographie Bouddhique)। অপর একটি বৌদ্ধ নিদর্শনে [illegible] বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-সময়ে মূষিক-বাহন গণেশ, ময়ূরবাহন কার্ত্তিক, বৃষভবাহন শিব ও গরুড়বাহন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন।

[illegible] reconnait assistant parmi les personnages accessoires de scenes de la vie du Buddha, Ganesa sur son rat, Kumaraya sur son paon, Indra sur son éléphant, Civa sur son taureau, etc.—A. Foucher, L' Iconographie Bouddhique.

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সকল দেবতার মন্দিরে গণেশের পূজা হয়, গণেশের স্বতন্ত্র মন্দির বড় একটা দেখা যায় না। চট্টগ্রাম নবদ্বীপ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে গণেশের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের গণেশের নাম বিনায়ক, তান্ত্রিকরা সেই নামকে উচ্চারণ করে বিনায়ক। কিন্তু ইহার দেশে গণেশের ভিন্ন স্বতন্ত্র মন্দির গঠিত হয় না।

হুসেনশাহী আমলে গৌড়ে শৈব কৌমার প্রভৃতি [illegible] প্রচলিত ছিল (নগেন্দ্রনাথ বসু), কিন্তু গাণপত্য মতের [illegible] কোন সন্ধান জানিতে পারা যায় না।

গণেশের ভক্তরা হিন্দু প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করাতে [illegible] মন্দিরে গণেশের পূজা সর্ব্বদেবতার অগ্রে হইয়া থাকে। তিনি বাহ্য ধর্ম্মের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, এবং গাণপত্য মতও বিস্তৃত ও প্রবল হয় নাই।

[এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত পুস্তক ও [illegible] সাহায্য পাইয়াছি:—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; গণেশ—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন ১৩১০); [illegible] ত্রৈলোক্যসুন্দর ত্রিবেদী (বঙ্গদর্শন ১৩১০); গণেশ জন্ম—ঐ চন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন ১৩১০); ঠাকুর পূজার ইতিহাস [illegible] চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী ১৩১১); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়; Encyclopaedia of Religion and Ethics; Religious of the Hindus—H. J. Wilson, Elements of Iconography—T. Gopinatha Rao; L' Iconographie Bouddhique—A. Foucher; Archaeological Survey Mayurbhanj—Nagendranath Basu, etc.]

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মালিনী

প্রভাতের আলো দেবশিশুদের মুখের হাসি নিয়ে বাড়িয়ে ছুটে এসে পুষ্প-পাত্রের ওপর বিছিয়ে লুটিয়ে পড়ল। যূথী-চামেলির মুখে [illegible] হয়ে গেল। মুগ্ধ কাল ভ্রমরের দল, [illegible] এগিয়ে আসতেই মালিনী বিরক্ত হয়ে বলল—'এখানে ওরা তোমাদের নয়, ফের।' ভ্রমরেরা [illegible] কান্নার সুরে বলল—'ওরা যে আমাদেরই, পায় হাত। মালিনী হাতে নেড়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে বলল—'[illegible] নয়, ওরা তোমাদের নয়, ফের।' ভ্রমরের দল হতাশ হয়ে ফিরে গেল, কিন্তু কান্নার সুরটি তারা রেখে গেল [illegible] ফুলের গন্ধে আকুল হাওয়ার বুকে।

হিমশীতল জলের কণা ফুলের ওপর ছিটিয়ে [illegible] বলল—দেখ্ মেখালি, তুই যেন মানুষের চোখের জল। [illegible] যখন ঝরে, তখন বুকখানিকে চূর্ণ করেই ঝরে, কিন্তু [illegible] ঝরতেই শুখিয়ে যায়। তোরাও [illegible] তেমনি [illegible] কারোও দেখবার অবসর দিস্ না! চেয়ে দেখ তবে [illegible] দিকে। ওরা ঝরে, ওরা শুখায়, কিন্তু ওদের [illegible] হাসি অতীতের স্বপ্ন হয়ে গন্ধটুকুর বুকে [illegible] থাকে, স্বপ্নের এক কণাও হারিয়ে যায় না। আর মাধবী, তুই কোন দিনই তার কথা কয়েও বলিস না; মানুষের তোর মত স্বভাবের অভাব নেই। তারা সবাই [illegible]

পাতুক দিন কাটায়, ব্যথা আনন্দ তাদের বুকে গুপ্ত উৎসের মত তরঙ্গ তোলে, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ কারো চোখে পড়ে না। তুই থাকিস্ তেম্‌নি করেই নিজের কান্না হাসি সুখ দুঃখ নীরবে। তাই তুই আছিস্ কি নেই, তা কারো মনে থাকে না। চেয়ে দেখ্ ত ঐ গোলাপের দিকে। লক্ষ হিয়ার হাসি যেন রূপ ধরে ফুটে উঠেছে! তাই সবাই সেই হাসিটুকু বুকে নেবার জন্য পাগল। ওর নিশ্বাসের আঘ্রাণ নিতে গিয়ে, ওর মুখে চুমা না দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। কি তৃপ্তি ঐ হাসিতে লুকিয়ে রেখেছে ও!—কিন্তু তুমি কে গো? তুমি ত আমার বাগানে-ফোটা ফুল নও! তোমায় ত কোন দিন দেখিনি! চোখে ও কি পরেছ, কাজল? না!—চোখের পাতা, অত কালো! তোমার ঠোঁটদুটি যে গোলাপকেও হার মানাল! কি চমৎকার হাতের আঙুলগুলি! রাঙ্গা রুলীদুটি বেশ মানিয়েছে। গায়ে ও কি পরেছ—আলতা? না, অমনিই রাঙ্গা ওদুটি! কে তুমি গো আমার ঝুম্‌কো-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে?

সে বল্‌ল—আমি চাঁপা। তোমার ঐ বাগানের পশ্চিম দিকের মাঠের পারেই আমাদের বাড়ী। আমি ইন্দুলেখার মেয়ে। আমায় চিন্‌তে পারছ না?

মালিনী চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে যেমন করে ফুল-গুলির সঙ্গে কথা বল্‌ছিল তেম্‌নি করেই বল্‌ল—না! কি করে চিন্‌ব? কুঁড়িটি যখন ফোটা-ফুল হয়ে যায় তখন তার রূপ চোখদুটিকে এমন করে ভরিয়ে তোলে যে সেই কুঁড়িবেলাকার রূপের স্মৃতির দিকে তাকাবার কথা আর মনে থাকে না। তুমি কি সুন্দর হয়েই ফুটেছ চাঁপা!

চাঁপা মালিনীর মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের পাতায় অশ্রুকণা, শিশিরমাখা পদ্মপলাশের মত! মুখে ম্লান হাসির রেখা, বড় করুণ!

মালিনী অবাক হয়ে বল্‌ল—ওকি! ব্যথায় অশ্রু ত তোমার চোখদুটির জন্যে হয়নি! ও বিষাদমাখা হাসি ত তোমার মুখে থাকবার নয়!

চাঁপা হাত বাড়িয়ে বল্‌ল—ঐ মালা-ছড়াটার দাম কত নেবে?

মালিনী বল্‌ল—ঐ সবার বড়টা? ওর দাম একটাকা চার আনা।

চাঁপার মুখের হাসিটুকু আরো ম্লান হয়ে গেল। সে বল্‌ল—কিন্তু আমার কাছে ত অত পয়সা নেই।

মালিনী একটু হেসে বল্‌ল—তাহলে এক কাজ কর না কেন; ঐ পয়সা দিয়ে কিছু ফুল কিনে নিয়ে যাও।

চাঁপা বল্‌ল—না না! ঐ মালা, ওটাই আমার চাই।

মালিনী বল্‌ল—কিন্তু ওটা নেবার মত ক্ষমতা ত তোমার নেই।

চাঁপা বল্‌ল—তবু ওটাই যে আমার চাই। শুধু ফুলে হবে না।

মালিনী বল্‌ল—কি হবে না?

চাঁপা বল্‌ল—পূজো।

মালিনী বল্‌ল—কিন্তু পূজো ত সকলে ফুল দিয়েই করে থাকে?

চাঁপা বল্‌ল—আমার ঠাকুরের পূজো শুধু ফুলে হবে না, মালা চাই।

তার চোখ হতে জলের ফোঁটা তারই হাতের ওপর পড়ে গেল।

মালিনী চাঁপার কাছে সরে এসে বল্‌ল—মালা দিয়ে মানুষ মানুষকে পূজো করে চাঁপা, ঠাকুরকে নয়।

চাঁপা মালিনীর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে এনে বল্‌ল—আমার ঠাকুরকে যে মানুষের মধ্যেই পেয়েছি।

এইবার মালিনীর স্বপ্নভরা চোখে জল ছাপিয়ে উঠ্‌ল। সে ছুটে গিয়ে মালাটি এনে চাঁপার হাতে দিয়ে বল্‌ল—এই নে, এই নে বোন। আরো চাস্? আচ্ছা, এটাও নে। আর ও-ফুলগুলো নিবি? ভারি মিষ্টি গন্ধ ঐ চামেলির, নিয়ে যা সব, আমার ঢের আছে। কি হবে আমার এত ফুলে?

চাঁপা ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—না না আমার এত ফুলের দরকার নেই। শুধু এই মালাটিতেই হবে। কিন্তু এর দাম যে দিতে পারছি না, কি করে নেব?

মালিনী বল্‌ল—কাজ নেই আমার দামে। তুই শুধু ওটা দয়া করে নিয়ে যা, বড় খুসী হব। আচ্ছা, দে তোর চার আনা পয়সা। ফুল বেচে এত তৃপ্তি জীবনে পাইনি।

চাঁপা মালিনীর গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—আমার পূজো ব্যর্থ হবে না, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে তা জেনেছি।

[illegible] করে তোর পায়ের ধুলো নিয়ে যাব। এখন যাই?

মালিনী তার চিবুকের স্পর্শ আঙুল দিয়ে মুখে নিয়ে বলল—আর কোন।

শ্বেত চন্দন-মাখান থালা বাড়িয়ে দিয়ে রাজকন্যার দাসী মালিনীকে বলল—রাজকন্যার মালা দাও।

বনমাগরের জলে নিয়ে ফুলদুলের মালা পরিতে মালিনী বলে—মালা পৌঁছেছে।

অবাক হয়ে দাসী বলল—পৌঁছেছে! কে নিয়ে গেল? কোথায়—

মালিনী বলল—ঠাকুরের গলায়।

বিরক্ত হয়ে দাসী বলল—তুমি কি পাগল হলে না কি! রাজকন্যা ত এখনও পূজোয় বসেননি?

মালিনী বলল—একজন দুঃখীর মেয়ে পূজা করেছে। তার পূজোতেই সবার পূজো সাঙ্গ হয়েছে।

দাসী রেগে বলল—বললেই ত হয় মালা তৈরি হয়নি। এত বেলাতে তোমার এখন কি করি—রাজকন্যাকে কি বলব?

মালিনী তেমনিই শান্তকণ্ঠে বলল—বোলো, ঠাকুর মালা পেয়েছেন।

দাসী ফিরে গেল। মালিনী গেল তার ফুল-বাগানে, জলের ঝারি আর ধবধবা হাতে নিয়ে দিনের কাজে।

দিনের আলো নিভে গেছে। সন্ধ্যাতারার দুখানি ছবি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। শিরীষগাছের পাতা গুলি ঘুমেভরা চোখের মত বন্ধ হয়ে গেল। জোনাকির আলো জ্বলে আর নিভছে। তারই তালে তালে ঝিল্লী ডেকে উঠছে, যেন সাজোক-পরীদের পায়ের নূপুরের ধ্বনি। মালিনী আপনার ঘরে একটি রক্তকরবীর গুচ্ছ হাতে নিয়ে বসে ছিল। মাঝে মাঝে সেটিকে চোখে কপালে বুলিয়ে নিচ্ছিল। বাইরের অন্ধকার হতে কে ডাকল—দিদি।

মালিনী তাড়াতাড়ি ঘর হতে বেরিয়ে এসে বলল—আয় বোন আয়। আমি তোরই জন্যে বসে আছি।

চাঁপা এসে মালিনীকে প্রণাম করল। মালিনী একখানি আলোর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—হাঁ, ঠিক, আমি দেখতে চেয়েছিলাম। আশীর্বাদ করি এই [illegible] লেগে থাক্ তোর মুখে চিরদিন।

চাঁপা বলল—তোমার মালা আমার এই [illegible] এনে দিয়েছে। এর জন্যে তোমায়—

চাঁপার মুখে হাত চাপা দিয়ে মালিনী বলল—থাক্। আমায় আর ওসমস্ত শোনাতে হবে না। তোর পূজোর কথা বল্।

চাঁপা বলল—তোমার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে [illegible] টিকে আমি যত্ন করে পদ্মপাতা দিয়ে ঢেকে সন্ধ্যাবেলা পূজো করব বলে। কিন্তু তোমার মালার ফুলও শুকিয়ে যায়নি! কি দিয়ে মালা গেঁথেছিলে?

মালিনী বলল—ও তোর হাতের স্পর্শ পেয়েছে নি। তারপর কি হল বল্।

চাঁপা বলল—দিনের আলো যখন [illegible] গেল, ঠাকুর আমার ঘরে এলেন। [illegible] দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে আসনে এনে বসালাম। মালাটি হাতে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলাম। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম।

মালিনী বলল—মালাটি পরিয়ে প্রণাম করতে গেলি?

চাঁপা বলল—হাঁ, কিছুই আর মনে হইল না। সে মালাটি তাঁর বুকের দুপাশ দিয়ে নেমে এসে কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মালিনী চাঁপার মুখখানি নিজের মুখের কাছে এনে বলল—কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল?

চাঁপা বলল—হাঁ, আর সেই যে গোলাপের কুঁড়ি [illegible] মালার মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছিলে, সেই সেটি ফুটে উঠেছে!

মালিনী চাঁপারই প্রতিধ্বনি করে বলল—ফুটে উঠেছে!

চাঁপা বলল—তিনি সেই মালাটি নিজের গলা [illegible] খুলে নিয়ে—

মালিনী বলল—ওকি চাঁপা, কাঁদছিস্ কেন? আমার বুকের ওপর মাথা রেখে বল্।

চাঁপা ভারি আস্তে আস্তে বল্‌ল—আমায় গলায় পরিয়ে দিলেন।

মালিনী তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল—তোর গলায় পরিয়ে দিলেন! তারপর?

চাঁপা হেসে বল্‌ল—তারপর আর আমি বল্‌তে পারব না।

মালিনী বল্‌ল—তোর সুখের কথা শুধু আমায় শুনতেও দিবি না—চাঁপা?

চাঁপা দু'হাত দিয়ে মালিনীর মাথাটি ধরে তার ডান্ গালের উপর ঠোঁট রেখে বল্‌ল—তিনি আমার মুখের উপর মুখ রাখ্‌লেন।

কোটা-ফুলের গন্ধ মেখে দম্‌কা হাওয়া ঘরের ভিতর হতে এসে দীপশিখাটিকে ব্যস্ত করে তুল্‌ল। চাঁপা বল্‌ল—কিন্তু তুমি ত আমার তোমার কোন কথাই বল্‌লে না ভাই?

মালিনী হেসে বল্‌ল—যার মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা! আমার আবার কথা কি? আমার কাজ শুধু মালা-গাঁথা, সুখের অধিকার আমার নেই, তাই আমার কথাও কিছু নেই। কিন্তু তুই রোজ এমনি করে আমার কাছ থেকে মালা নিয়ে যাস্। ভারি সুখী হব।

চাঁপা বল্‌ল—না-না, আর মালা দরকার হবে না, এবার আমার এই হাত দু'টিই তাঁকে বাঁধতে পারবে।

চাঁপা চলে গেছে। নিরালা ঘরে বসে আপনার মনে মালিনী বল্‌ল—চাঁপা বলে গেল, আর মালা চাই না। এবার তার হাত দুটিই তাঁকে বাঁধতে পারবে। ওর হাত দুটি সার্থক হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু আমার এ যে বোঝা হয়ে রইল। এর ভার যে আর বইতে পারি না। আমি ভেবেছিলাম অন্যের পূজোর অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়ে আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে পারব। এও তোমার সহ্য হল না! ঠাকুর আমার, এখানেও তুমি পথ আগ্‌লে এসে দাঁড়ালে! 'আর মালা চাই না' ঐ একটি ইঙ্গিতেই জানিয়ে দিলে আমাকে প্রয়োজন নেই! কিন্তু আমার যে প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের দুঃখ সইব কি করে?

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

মহাকবি কালিদাস কি বাঙালী ছিলেন?

১। মহাকবি কালিদাস তাঁহার গ্রন্থমধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষ আরম্ভ করিয়াছেন, ১লা আষাঢ় "মেঘদূত" লিখিয়াছেন, এবং আষাঢ়ের অন্তিম দিবসে গুপ্তধন উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভারতের নানাস্থানে নানা ঋতুতে বর্ষ আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা দেশেই মাত্র গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্ষ আরম্ভ ধরা হয়। বাঙ্গালা দেশে মাত্র সৌর পার্থিব নাক্ষত্র মাস গৃহীত হয়, তাহা ভিন্ন ভারতের অন্যত্র চান্দ্রমাস বা সৌর রাশিগত মাস গৃহীত হয়। সৌর নাক্ষত্র মাস বা ১লা আষাঢ় বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতে অন্যে ব্যবহার করে না।

২। মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনার সময়, রঘুর রাজধানী যে কোথায় ছিল, তাহা বর্ণনা করেন নাই। তিনি তাহার অপর সমুদয় পুস্তকের নায়কদের বাসস্থানের উল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রঘুবংশের রাজারা যে কোথায় রাজ্য করিতেন, তাহা রঘুর দিগ্‌বিজয় সমাপ্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, নানা জনপদ আক্রমণ করিয়া ও জয় করিয়া, মহোদধির উপকণ্ঠস্থিত তালীবনশ্যাম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তালীবনশ্যাম দেশ আক্রমণও করিলেন না এবং জয়ও করিলেন না। তৎপার্শ্ববর্ত্তী সুহ্ম ও বঙ্গ আক্রমণ করিলেন ও জয় করিলেন। তৎপশ্চাৎ ভারতের সমুদয় জনপদ জয় করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষ জয় করিলেন। তাহার পর এত বড় জয়শ্রী লইয়া, তিনি কোন্ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন তাহার উল্লেখ নাই। এরূপ স্থলে সুহ্ম ও বঙ্গের নিকটবর্ত্তী তালীবনশ্যাম দেশ তাঁহার জন্মভূমি হইতে পারে কি না?

৩। পুরুষের আচার ব্যবহার সত্বর পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার যুগযুগান্তেও পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহা বহুজনবিদিত। কালিদাসের কবিতা নারীগণ, একখানা সাড়ী পরিতেন, আলতা পায়ে দিতেন, কলসী কাঁখে করিয়া জল আনিতেন, বিবাহে এয়োস্ত্রীরা মেয়েকে চালিটা কদলী-গাছের মধ্যস্থ পিঁড়ের উপর দাঁ

করাইয়া স্নান করাইতেন, কন্যার হাতে তর্পণ করা করাইতেন, এবং বাসর-ঘরে মাটিতে বিছানা পাতিয়া ঘরের সহিত কৌতুক করিতেন। তাঁহারা পুষ্পশয্যায় শয়ন হইতেন, গর্ভাধান-ঘাটি খাইতেন, গুরুজনের চরণধূলি লইতেন, এমন কি পুরুষেরা পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর পাদাভিবন্দন করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই তিনটি কারণে মাত্র, মহাকবি কালিদাসকে নব্য বলিয়া প্রমাণিত করা যায় কি না?

শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।

ভাসু ও কুন্তু

স্বপ্ন আচ্ছন্ন দীনে ভ্রমিয়াছে ব্রাহ্মণের নারী
প্রভাতে ভ্রমিয়া ফুল ফিরিতেছে বাড়ী।
হেনকালে কোথা হতে—একি কাণ্ড একি অনাচার!—
ঘুঁটে দিয়া রাজপথে ক্ষুদ্র এক ডোমের কুমার!
ঘৃণাভরে শুচিবতী নাম করি উচ্চারণ
ভ্রমিয়া ফুলের ঝুড়ি পুনঃস্নানে করিলা গমন।

বিষাদে কহিলা বৃক্ষ, সম্বোধিয়া গর্ভস্থ অঙ্কুরে—
যে বলিস, তোরে ছুঁয়ে, জাতি ফুল সবি গেল দূরে।
হিন্দু যবে গর্ভধরা ধরিত্রীর পবিত্র মৃত্তিকা—
যে ধান্য দিতেছি আমি তাহাতেও জীবের জীবিকা।
ব্রাহ্মণে গড়িয়া ব্রহ্ম, মূর্ত্তিমান দেবতার রূপে,
ভকত আনিত পূজা,—নাদানন্দ ফুলে গন্ধে ধূপে।
আমার বিল্ব পত্র অর্চিত করিত সাধুজন
ললাটে তিলক-চিহ্ন, ভক্তি ভিন্ন বিচিত্র কেতন!
তখন ছিলাম আমি, বরণীয় বরণীয় অতি;
দুর্ভাগ্যে দুর্দ্দিনে হায় আরম্ভিল আমার দুর্গতি!
ভ্রমিয়া মথিয়া দেশে, পাবর্ত্তিয়া চক্রের আঘাতে
পড়িয়া ভূমিতে, ফুটি, ছোড়াইল দূর করিবারে!
কেহ ছুঁইত না, কেহ ফুলে নিত যবে নারী—
ব্রাহ্মণ মহান্ ধন্য অতি ক্ষুণ্ণ কিছু না বিচারি
তাঁর পদে, তাঁর শিরে, রে পতিত, ঘাতিনাশা বীর,
তোর সহবাসে পাবি ডোম-স্পর্শে জাতির শরীর।

কুন্তের কাহিনী শুনি, অম্বু কহে গম্ভীর নিনাদে—
রে কুম্ভ, দাম্ভিক, ছি ছি, তোর সাথে নাহি বিবাদে
জীবের জীবন আমি, সিন্ধুরূপে, ধরিত্রীর মাঝে—
ধরিত্রীর পালয়িত্রী,—পিতরিয়া সহে লোকে!
সরসী-সরিৎ-রূপে মেঘরূপে বরষিয়া সুধা
ফলে শস্যে পূর্ণ করি, তৃপ্ত করি তৃষিত বসুধা।
হিন্দু মোর বিন্দুবারি দ্বন্দ্ব বিনা ভাবে নারায়ণ;
ধূর্জ্জটি জটিল শিরে গঙ্গারূপে করেন ধারণ
আপনাতে গহন করি শুদ্ধ কত অশুচি মানব;
সতত সহস্র কণ্ঠে সুরনর ঘোষিছে গৌরব।
সরসী, সরিৎ, সিন্ধু, যেথা কেন না নামি নিঃসঙ্কোচ
অসঙ্কোচে স্নান করে, এক ঘাটে, একত্র সমাজ।
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেচ্ছ, সেথা কোনো নাহি ব্যবধান
নাহি ঘোচে পবিত্রতা, অক্ষুণ্ণিয়া মরলের ত্রাণ;
কিন্তু একি মনস্তাপ, ওরে তুচ্ছ মাটির কলসী,
লভিলায় জাতিভেদ, কি কুক্ষণে তোর মাঝে পশি!

এইরূপে চলিতেছে অম্বু সহ কুম্ভের কলহ
দুজনার দোষ-গাথা দুজনে ঘোষিয়ে অহরহ!
ওগো বৈজ্ঞানিক, ওগো নদীয়ার স্মৃতিপারাবার,
তোমরা বিচার কর, কার দোষে কাহার পতন!

শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

তিনজাতীয় বরকন্যার বিবাহ

(সমালোচনার উত্তর)

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে মল্লিকা "তিন জাতীয় বরকন্যার বিবাহ" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ সালের অগ্রহায়ণ পৌষমাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজে" শ্রীযুক্ত সংক্রমাৎ বাবুর মহাশয় উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; ঐ প্রতিবাদের নাম 'অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত"। ঐ প্রতিবাদের প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-বিরোধী যে-সকল কথা আছে, তাহার কিছু আলোচনা করিতেছি।

বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে ভিন্ন-জাতীয় বরকন্যার বিবাহকে [illegible] করিবার চেষ্টা একটা নূতন শুরুতর ব্যাপার। [illegible] শাস্ত্রপাঠীদিগের মধ্যে যথার্থ মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে। [illegible] আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত না হইতে [illegible] পারি নাই। প্রত্যুত, প্রতিবাদের ফলে বহুতর আলোচনা হইবে, উহাতে সত্য প্রচারের সুবিধা হইবে, এইরূপ মনে করিয়া [illegible] ও প্রতিবাদকারীর অভিনন্দন করিতেছি।

প্রতিবাদী মহাশয় বলেন (ব্রাহ্মণসমাজ—অগ্রহায়ণ, ৮৯ পৃ) "আমরা ক্ষত্রিয়া বিবাহের ইতিহাসে প্রায়ই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বরূপে দেখিতে পাই। বর্ত্তমানেও যেমন বৃদ্ধকালে পরিণয়ের প্রয়োজন হইলে, প্রায়ই সমান ঘরে কন্যা সংগ্রহ হয় না, বৃদ্ধ বরকে অনন্যোপায় হইয়া নিম্নঘরে কন্যা সংগ্রহ করিতে হয়, এবং নিম্নঘরের লোক কুলীন পাইবার জন্যই প্রায় সেইরূপ বরে কন্যাদানে সম্মত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বিবাহের ইতিহাস ঠিক্ সেইরূপ দেখা যায়।"

এই কয়েক পংক্তিতে, প্রতিবাদীর কলম হইতে, হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে, একটি সুবিদিত সত্যের অর্দ্ধাংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সত্য এই যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন, স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন না। এই বিষয়ে, ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "ধর্ম্ম, সমাজ, ও স্বাধীন চিন্তা" পুস্তিকায়, এইরূপ লিখিয়াছিলাম—

"মন্বাদি স্মৃতি ও মহাভারতাদি ইতিহাসে যে জাতিভেদ দেখা যায়, তাহা এখনকার অযৌক্তিক নির্দ্দয় জাতিভেদের নহে। ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্মচ্যুতের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণেরা অবাধে ক্ষত্রিয়াদির রাজ্য ভাগ উদরসাৎ করিতেন। কেবল শূদ্রের হাতে খাওয়াটা তত চল ছিল না। এই শূদ্রেরা বর্ত্তমান কায়স্থ বা নবসায়কদের পূর্ব্বপুরুষ নহেন। কায়স্থ নবসায়ক প্রভৃতি প্রধানত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তান। এখন যেমন একই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশজ শ্রোত্রিয় ও বংশীয়, এই তিনভাগে বিভক্ত, তখনকার সমাজে সেইরূপ একই জাতি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন, ক্ষত্রিয়েরা মধ্যম কুলীন, বৈশ্যেরা অধম কুলীন ছিলেন; শূদ্রেরা ছিলেন বংশজ। কাজেই পরস্পরের হাতে খাইলে জাতি যাইত না এবং অনুলোমক্রমে বিবাহও চলিত। এখন যেরূপ কুলীনেরা বংশজের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, তখনও সেইরূপ ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। বিশেষ, এখন কুলীনেরা যদি বংশজে কন্যা দেন, তবে তাঁহাদের কুলীনত্ব লোপ পায়, কিন্তু তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে কন্যা দিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব যাইত না, কেবল সেই কন্যার গর্ভজ সন্তান এক হীনজাতি হইত এই মাত্র। কুলীন ও বংশজ যদি এক জাতি হয়, তবে দ্বাপরের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যে কার্য্যত এক জাতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? দ্রৌপদীর হাতে না খাইতেন কে? বস্তুত জাতির বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ অর্থে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। প্রাচীন কালের মত যদি ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন হয়েন, যদি তাঁহারা অবাধে ক্ষত্রিয়ের রাজ্যভাগ খান, তবে কয়জনে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করে?" (১৩১৭ সালের সংস্করণ ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা)।

উচ্চজাতীয় বরে নিম্নজাতীয় কন্যা প্রদানের বহু উদাহরণ ১৩২৬ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে দিয়াছি। তদ্ভিন্ন আরও উদাহরণ দিতেছি। চণ্ডালী অক্ষমালা ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠের, এবং শার্ঙ্গী বা চটকা জাতীয় জরতী (?) মন্দপাল মুনির পত্নী ছিলেন (মনু ৯।২৩)। অবশ্য এই চটকা উড়িতে-সমর্থ পক্ষী নহে। প্রাচীন আর্য্যেরা কোন-কোনও জাতীয় মনুষ্যকে বানর, পক্ষী, ভল্লুক প্রভৃতি নাম দিতেন। তাহা না হইলে, ভল্লুকের কন্যা জাম্ববতী কুকুরের স্ত্রী হইতেন না এবং শাঙ্গ নামক মনুষ্য তাঁহার পুত্র হইতেন না। এখনও হাতী, নাগ প্রভৃতি উপাধিধারী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মনুষ্যই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ২২৮—২৩৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে মন্দপাল জন্মান্তরে পক্ষী হইয়া জন্মিয়া, পক্ষিকন্যা জরতী ও লপিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এটা মন্দপাল কথার অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। মনুর বচনের সহিত এই মহাভারতীয় গল্পের ভেদের সঙ্গতি নাই। বশিষ্ঠের অন্ত্যজা পত্নী অরুন্ধতী যে তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিতেন, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার মন্ত্রে যোগ দিতেন, একথা নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব খুব প্রাচীনকালে নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীও স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিতে পারিতেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যাও করিতেন। পরে যখন জাতিভেদের কঠোরতা বাড়িয়া গেল, তখন নিম্নজাতীয় ভার্য্যাকে স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা হইতে বঞ্চিত করা হইল।

ভৃগুপ্রোক্ত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে (৩।১২) আছে—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ (হবরাঃ)।

দ্বিজদের প্রধান বা ধর্ম্মবিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্ত। কামত বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই সকল নীচ জাতি (অর্থাৎ বক্ষ্যমান ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রিকা) ক্রমশ প্রশস্ত।

ধর্ম্মবিবাহে সবর্ণা গ্রহণ প্রশংসার বিষয়, অর্থাৎ অনুলোমক্রমে অসবর্ণাও গৃহীত হইতে পারে। কামবিবাহে ("অগ্রবিবাহে" বিপরীত) শূদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহার পর বৈশ্যা, তারপর ক্ষত্রিয়া। এই বিবাহ এবং পত্নীর মৃত্যু প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কারণ বশত অপ্রশস্ত বিবাহ, এই উভয়ই ধর্ম্মবিবাহ। প্রথম ধর্ম্মবিবাহের পর, শাস্ত্রে পুনর্বিবাহের যে সকল কারণ আছে তাহা না ঘটিলে, যদি কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চান, তবে সেই বিবাহ কামবিবাহ। ধরুন যেন কোনও ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নীরূপে সবর্ণা গুণবতী পত্নী আছেন, এখন তাঁর যদি এই পত্নীতে মন না উঠে, তবে তিনি যে বিবাহ করিবেন সেটী কামবিবাহ। এইরূপ স্থলে, শূদ্রা বিবাহ করাই শ্রেয়স্কর, বৈশ্যা বিবাহ মধ্যমকল্প, ক্ষত্রিয়া বিবাহ অধমকল্প। এইরূপ স্থলে ব্রাহ্মণীর বিবাহ নিষিদ্ধ। যে যুক্তিবলে কামবিবাহে সবর্ণা নিষিদ্ধ হইয়াছে ঠিক সেই যুক্তির বলেই কামবিবাহে অনন্তর-নিম্নজাতীয় কন্যা (এ স্থলে ক্ষত্রিয়া) খুব প্রশস্ত হইতে পারে না; বহুত অনন্তর-নিম্নজাতীয় কন্যা অপেক্ষা একান্তর (ব্রাহ্মণের বৈশ্যা) নিম্নজাতীয়া কন্যা প্রশস্ততর এবং ব্যত্যস্ত নিম্নজাতীয় কন্যা প্রশস্ততম।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি—এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণের প্রথম ধর্ম্মবিবাহেও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা নিষিদ্ধা নহে, তবে সবর্ণা বিবাহ উহাদের চেয়ে ভাল বটে। অধিকন্তু এই বিধান পৈঠীনসির বচনে দেখিতে পাই—

"ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্তমঃ স্যুঃ।" "অলাভে কন্যায়াঃ ব্রাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াং বা ইত্যেকে।"

"সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্যকল্প।" সজাতীয়াকন্যা না পাইলে, ব্রাতকব্রতের আচরণ করিবে, অথবা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা (কোথাও কোথাও নহে) শূদ্রা বিবাহ করিবে। যম ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিতঃ।
"সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্যকল্প।"

এই-সকল স্পষ্ট বিধানের দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে, দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে, অসবর্ণ বিবাহ অপ্রশস্ত ছিল, নিষিদ্ধ ছিল না। ইহার পরবর্ত্তী কালে (বোধ হয় গৌতমীয় যুগে) প্রথম বিবাহে অসবর্ণা নিষিদ্ধ হইয়াছে।—যথা—

ক্ষত্রবিট্ শূদ্রকন্যাসু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্ বিবাহা ক্বচিদেব তু॥
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

---

* অগ্র=প্রধান (নানার্থসংক্ষেপ, ৩৫ পৃ)। দারকর্ম=বিবাহ (মেধাতিথিধৃত বচন "বিবাহনং দারকর্ম্ম পাণিগ্রহণমিতি")। প্রশস্ত=প্রশংসনীয় বা শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে নাই। তাহার ব্রাহ্মণী বিবাহ করা উচিত। ব্রাহ্মণী বিবাহের পরে, কোনও গৌণও বিশেষ অবস্থায়, সজাতিগণ-বিবাহ করিতে পারে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে উপাখ্যানেই শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১০৩—১০৫ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ), তাহা কেবল কোনও ব্যক্তির বা পরিবারের ব্যবহারের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু ঐ গল্পটি যে সময়কালে পাঠ করিলে দেখা যায় যে তৎকালেও ক্ষত্রিয়ের প্রথম বিবাহে ইচ্ছা গ্রহণ সম্বন্ধে লোকে নিতান্ত অচল ছিল না। তাহা যদি হইত, তবে না গল্পের বিভা, এইরূপ সহজ প্রণয়ের মীমাংসার জন্য, মহাকবি ভবভূতিকে ডাকাইয়া আনিতেন না। "প্রথম বিবাহে কন্যা পাণিগ্রহণ করায়, ও ঐরূপ করিলে জাতিনাশ হয়" এই মত তখনকার ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচারিত হইতেছিল। তাহা না হইলে, এই কথা বলা মাত্র মহাপাত্র হইতে পরিব্রাজকের আপিসের দরকার হইত না। এই সহজ কারণে প্রতিবাদী মহাশয়ের নিম্নলিখিত মতটি গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

"যে-সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে উক্ত আছেন, তাঁহারাও পূর্বে ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধর্মপত্নী করিয়া পরে অনন্যোপায় হইয়া এইরূপ করিয়াছিলেন।" "অনন্যোপায় হইয়া" যে প্রবীণ বয়সে বিপত্নীক ব্রাহ্মণগণও যে প্রবীণ বয়সে বিপত্নীক হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (ভারতী সংখ্যা, ১৩২ বঙ্গাব্দ, ৫৯ পৃষ্ঠা।)

অবশ্য বর্তমান কালে এইরূপ হইত, কিন্তু প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। তাহা নিশ্চিত, মহাদিতে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুপুরাণে যে সৌভরি উপাখ্যান আছে, তাহাতেও কে বুঝা যায় যে, সৌভরি প্রথম বিবাহেই ক্ষত্রিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধর্মপত্নী করিয়াছিলেন। উপাখ্যানে আছে—

নৃপাদ্ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্ময়াৎ।
জাতঃ সুতোঽথ নির্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধি দ্বিজঃ।
যোনসম্ভবাচৈব পর্যাপ্তসুবোধদঃ। ২৩ শ্লোক।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলাম (প্রবাসী ৩২৬, বৈশাখ, ৪১ পৃষ্ঠা) যে "বেদান্তর্হ" কথাটির অর্থ "বেদান্ অর্হ" বা বেদ-পাঠের অধিকারঃ উপনয়ন সংস্কৃতির পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য এরূপ অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। "বেদ+অর্হঃ" এইরূপ অর্থ করিলে কি দোষ হয়, তাহাও দেখাইয়াছিলাম। প্রতিবাদী মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন "এই তদ্ধিত অর্থ কোন্ ব্যাকরণের সম্মত?" তিনি বিদ্বান্, কাজেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইতেছে। নতুবা এইরূপ ব্যাকরণ-ঘটিত বিচারে এ প্রবন্ধে করিতাম না। এইরূপ প্রয়োগ পাণিনীয় ব্যাকরণ, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ, জৈনেন্দ্র ও সংক্ষিপ্তসারের সম্মত। কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি (২।৩।৬৫ এই সূত্রের বিবৃতি ভট্টোজিদীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে লিখিয়াছেন "অয়ং তোয়ং পিবতীত্যত্র কর্তরি কৃতি সম্বন্ধে ষষ্ঠী"। সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা তত্ত্ববোধিনীতে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতীত্যেতদনিত্যম্ তথাচ বাহ্যৈ মোদমস্মৈ ইতি চতুর্থ্যাপি ৬) প্রয়োগঃ সঙ্গচ্ছতে।" পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তি, সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব, হৃষীকেশের মুগ্ধবোধ-বৃত্তি, গোয়ীচন্দ্রের কলাপ-চন্দ্র, দুর্গাদাসের সুবোধা, রামতর্কবাগীশের মুগ্ধবোধ-টীকা, সংক্ষিপ্তসারের মূল সূত্র এবং বৃত্তিতে এইরূপ কথা আছে। অতএব "এইরূপ পদ ও ব্যাকরণ নাই" এইরূপ অবধারণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশের কারণ নাই। ব্যাকরণ-ঘটিত বিচারে এইরূপ প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। ইহা বলা হইল; কিন্তু বেদইউরোপীয় যে গিয়ের্সো এইরূপ ন্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভারতের আদি পর্বের ১৩৬ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণহোঽস্মি ভ বিদি।

এখানে যেরূপ "অর্হঃ" এই কৃদন্তের যোগে ষষ্ঠী বা হইয়াছে, সেইরূপ "বেদানাম্ অর্হঃ" না বলিয়া "বেদান্" বলা যাইতে পারে। বেদব্যাস ঋষি, উপনয়ন অতএব বেদব্যাস যখন "গাম্ অর্হঃ" লিখিয়াছেন তখন "বেদান্ অর্হঃ" লিখিতে পারেন। কেবল বেদব্যাস কেন, "তদর্হম্" এই সূত্রে "অর্হ" এই কৃদন্ত পদের যোগে দ্বিতীয়া দিয়াছেন। অতএব বেদান্ অর্হ এইরূপ প্রয়োগ বৈধ ও পরিগৃহীত।

মহাভারতের বঙ্গবাসীয় সংস্করণে (কলিকাতা, সন্ধান এবং কুম্ভকোণাম্ ব্যাসাচার্য্যের সংস্করণে (কুম্ভকোণম্ ১৯), এই "স্বাম্ অর্হঃ" এই পাঠ আছে। মৎস্যসংস্করণে মহাভারতের অধ্যায়টি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুণার ভাণ্ডারকর পণ্ডিতেরা যে-সকল হস্তলিখিত পুথি দেখিয়া সংস্করণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইখানিতে "স্বাম্ অর্হঃ" পাঠ আছে। অতএব এ-পাঠের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। ও আনন্দাশ্রমে প্রকাশিত হরিবংশপুরাণে 'স্বাম্ অর্হঃ' দেখা হইয়াছে। উহা পাণ্ডিত্যাভিমানদর্পলালসচেতা পণ্ডিতের নয় সন্দেহ নাই। অপিচ যাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন যে, এখানে 'স্বাম্' এইরূপ বলাতে অপেক্ষা "স্বামর্হঃ" (বা "তবার্হঃ") এইরূপ বলা সঙ্গত সমীচীনতর।

ন্যায় প্রবন্ধের এই অংশের আরও দোষ দেখাইয়া প্রতিবাদী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মহাভারতের ভৃগুনারদ-সংবাদে 'যে দ্বিজাঃ ক্রূরতা ইত্যাদি বচনে ম্লেচ্ছযবনাদিকেও দ্বিজ বলা হইয়াছে।" মহাভারত শান্তিপর্বের ১৮৮।১৮৯ অধ্যায় জাতিভেদ সম্বন্ধে একটি প্রধানযোগ্য স্থল। উহা ভৃগুনারদ-সংবাদও বটে। কিন্তু ম্লেচ্ছদিগকে "দ্বিজ" বলা হয় নাই, "অদ্বিজ" বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ॥ ১৭
পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ যত্তদাচারচেষ্টিতাঃ॥ ১৮

যাঁহারা পরব্রহ্ম ও সৃষ্ট জগৎ জানেন না তাঁহারা অদ্বিজ (অদ্বিজ)। তাঁহাদের মধ্যে নানাস্থানে যত নানা জাতি আছে, যথা—পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত * এবং বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি; তাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহারা যেমন তেমনই আচার-ব্যবহারের নিয়ামক। (কালীসিংহের অনুবাদ এবং প্রকাশিত বর্দ্ধমানের রাজবাটীর অনুবাদ, উভয়ই ভুল)। 'অদ্বিজাঃ'ই প্রকৃত পাঠ। প্রামাণিক টীকাকার নীলকণ্ঠ পাঠ ধরিয়াই অর্থ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ঐ সকল অদ্বিজদিগকে পিশাচ রাক্ষস ম্লেচ্ছাদি নামে বলা হইয়াছে। বঙ্গবাসীর সংস্করণে এবং কুম্ভকোণের সংস্করণে যে তিনখানি হস্তলিখিত পুথিতে অদ্বিজাঃ পাঠ (অদ্বিজ চিহ্ন) আছে।

এ-বিষয়ে আরও একটি বক্তব্য আছে। কোনও

* লক্ষ করিবেন যে পিশাচ রাক্ষস প্রেত এ সমুদয়ই ম্লেচ্ছ শ্রেণী।

দ্বিজেরা শূদ্র বা ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছেন (দ্বিজাঃ ম্লেচ্ছতাং গতাঃ) বলা এক কথা (যেমন মনু ১০।৪৩), আর অমুকের ঔরসে অমুকীর গর্ভজাত-সন্তান দ্বিজ, এইরূপ বলা আর এক কথা। উশনার শ্লোকে ক্ষত্রিয়+বিবাহিতা-ব্রাহ্মণীর সন্তানকে দ্বিজ বলা হইয়াছে; তাহাদের দ্বিজত্ব গিয়া শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে বা সম্ভাবিত দ্বিজত্ব তাহাদের প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—এইরূপ বলা হয় নাই। অতএব "দ্বিজঃ" পদ দেখিয়া সূতদিগকে বেদে অধিকারী মনে করিয়া কোনও ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

মাননীয় প্রতিবাদী মহাশয় এই প্রকরণে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ আমার নিকট অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। বস্তুত তিনি কোন্ ভাবে, কোন্ উপক্রমে, কি কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

প্রতিবাদী মহাশয় লিখিয়াছেন (ব্রাহ্মণসমাজ ১৩২৬, পৌষ ১৩৯ পৃ)—

"গৌতম বলেন 'প্রতিলোমজাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ' (৪।২৫) প্রতিলোমজ জাতেরা ধর্ম্মহীন, অর্থাৎ ইহাদের ধর্ম্মাধিকার নাই.....বিষ্ণু বলেন ইহাদের কোনও ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই—

ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহানাং শুদ্ধিকারণম্ ॥১৩।১৮

এই সিথনটি ভুল না হইলেও, বড় অসাবধানতার ফল (বিরুদ্ধমতিকৃৎ)। সাধারণ পাঠক ইহার যে অর্থ করিবেন, তাহা ঋষিদের সম্পূর্ণ অনভিমত; হয়ত সে অর্থ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়েরও অভিপ্রেত নহে। প্রতিলোমজাতদিগের "ধর্ম্মে অধিকার নাই" এবং "গোব্রাহ্মণহিতার্থে মৃত্যুমাত্রই" তাহাদের "উদ্ধারের উপায়," ইহা শুনিয়া সাধারণ পাঠক মনে করিবেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হীনতর জাতির প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ছিলেন। "প্রতিলোমজাঃ ধর্ম্মহীনাঃ" ইহার শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ এইরূপ হইবে—

"প্রতিলোম জাতেরা বৈদিক সংস্কার ও বৈদিক যাগযজ্ঞে অধিকারী নহেন।"

কুল্লূক ভট্ট বলিয়াছেন প্রতিলোমজাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ ইতি গৌতমে সংস্কার-নিষেধাৎ। গৌতম-বচনের ধর্ম্ম=বৈদিক সংস্কার ও যজ্ঞাদি। ইহা ছাড়া, সর্ব্ববর্ণসাধারণ ধর্ম্ম আছে। মেধাতিথি বলিয়াছেন—

প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনা অন্যত্র অহিংসাদিভ্যঃ।

অহিংসা সত্য প্রভৃতি (মনু ১০।৬৩) ছাড়া অন্য ধর্ম্মে প্রতিলোমদের অধিকার নাই। ব্রাহ্মণাদি-সমস্ত-মানব-সাধারণ এই অহিংসাদি কি কি তাহা মনু বলিয়াছেন, যথা—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥১০।৬৩

অহিংসা, সত্য, চৌর্য্যাভাব, শৌচ এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—মনু বলিয়াছেন ইহারা চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥১।১২২

এ ধর্ম্মগুলিতে যে চণ্ডালেরও অধিকার আছে, তাহা মিতাক্ষরায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে। অপরার্ক এই শ্লোকের টীকায় ব্যাস ও বৃহস্পতির বহু বচন উদ্ধার করিয়া সর্ব্বমানবসাধারণ ধর্ম্ম কি কি, তাহা বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শান্তিপর্ব্বের ২৯৩ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের ৩য় অংশের ৮ম অধ্যায়ে, ব্রহ্মপুরাণের ২২২ অধ্যায়ে, এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ৩।১।১৯ শ্লোকে এই সাধারণ ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিবাদী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিষ্ণু বলেন ইহাদের কোনও ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই।" ইহা ভুল, কেন না, বিষ্ণুস্মৃতির ২য় অধ্যায়ে আছে—

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া ॥১৬।
আর্জ্জবমলোভশ্চ দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে ॥১৭

অবশ্য এ শ্লোক বিষ্ণুস্মৃতির ষোড়শ অধ্যায়ে নাই, এবং সেইজন্য প্রতিবাদী আশঙ্কা করিয়াছেন যে প্রতিলোমদের জন্য বিষ্ণু কোনও ধর্ম্মকর্ম্মের বিধান করেন নাই।

চণ্ডালাদিরও বিধি নিষেধ আছে, উহাদেরও ধর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত আছে, এই কথা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ীরাই জানেন, কেননা স্মার্ত্তদের অবশ্যপাঠ্য প্রায়শ্চিত্তবিবেকের প্রথমেই ঐ কথা আছে। কাজেই এ বিষয়ে বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন। এইখানে আরও একটি কথা আছে। এই-সকল ধর্ম্ম তুচ্ছ ধর্ম্ম নহে। ইহারাই ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ (মিতাক্ষরা ৩।৬৬)। গৌতম দয়া ক্ষমা অনসূয়া শৌচ প্রভৃতিকে আত্মগুণ নাম দিয়া, উহাদিগকে চত্বারিংশৎ সংস্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন (৮ম অধ্যায়)। অতএব, "অন্ত্যজদের অন্য ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই, কেবল গো-ব্রাহ্মণ বালক ও স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য মরাই ইহাদের একমাত্র নিস্তারের পথ" এইরূপ বলা অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, হিন্দুশাস্ত্রের মতে, গোব্রাহ্মণ স্ত্রী বালকের জন্য মরা সকলের পক্ষেই পুণ্যের কার্য্য।

শ্রীযুত কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় গৌড়ের ব্রাহ্মণ সমাজের ১৪১-পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রমতে সূত জাতি বেদবাহন, ধর্ম্মে অনধিকারী, তাহাদের কর্ম্ম অশ্বসারথ্য। এই ঘোড়ার সহিস রথের চালক দ্বিজ হইবে? ধর্ম্মবক্তা হইবে? গোব্রাহ্মণ-হিতার্থে মৃত্যু মাত্রই যাহাদের উদ্ধারের উপায়, সে আবার ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে?"

এখানে শাস্ত্রমতে না লিখিয়া, লেখা উচিত ছিল, "অনেক শাস্ত্রের মতে"। সব শাস্ত্রে এইরূপ কথা নাই। উশনার স্মৃতিও শাস্ত্র, কিন্তু উহাতে স্পষ্টই আছে যে, সূত দ্বিজ এবং ধর্ম্মের অনুবোধক। মোট কথা এই যে, সকল মুনির সকল বিষয়ে ঐকমত্য নাই—নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ঋষিদের যে মতভেদ হয়, তাহা শাস্ত্রপাঠীরা জানেন। মনুদ্ধৃত শ্লোকগুলির রচয়িতা উশনা ঋষির মতে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে তদীয় পরিণীতা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান দ্বিজ এবং ধর্ম্মানুবোধক, আর বৈধ্যোৎপন্ন ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণীর পুত্র রথকার অদ্বিজ। বিষ্ণুনার ধর্ম্মপ্রশ্ন বা সূত্রে আছে "ক্ষত্রিয়াদ্ বিপ্রকন্যায়াং মন্ত্রবন্ধাতঃ সূতঃ প্রতিলোমেষু মুখ্যোঽয়ং মন্ত্রহীনোপনীতো দ্বিজধর্ম্মহীনঃ। অস্য বৃত্তিঃ ধর্ম্মানুবোধনং রাজ্ঞোঽশ্বসংস্কারশ্চ। ভারদ্বাজ মন্ত্রহীনজো রথকারো দ্বিজত্ববিহীনঃ শূদ্রকৃত্যোঽশ্বানাং গোমণ্ডাদি-পরিচর্য্যাজীবী। (ত্রিবেন্দ্রাম—১৯১৬)। ইহা উশনার মতের সমর্থকও বটে, অংশত বিরুদ্ধও বটে। এ সেই অতি প্রাচীন কালের কথা, যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সামাজিক ভেদ তত বেশী ছিল না। সূতেরা পুরাণবক্তা হইয়া থাকেন। "ভিন্ন জাতীয় বর-কন্যার বিবাহ" প্রবন্ধে সন্দেহ করিয়াছিলাম যে হয়ত বা এই পুরাণবক্তা সূত ও ক্ষত্রিয়া+ব্রাহ্মণীর পুত্র সূত একই। ঐরূপ সন্দেহের কারণ এই ছিল যে কৌটিল্য বলিয়াছেন "পৌরাণিকস্তু সূতঃ"—অর্থাৎ এই সূত ও পুরাণের বেত্তা ও বক্তা সূত অভিন্ন নহে; পক্ষান্তরে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত ক্ষত্রিয়ের সন্তান সূতই পৌরাণিক (মহাভারত ১৩।৪৮।১০)। প্রাচীনকালে এইরূপ একটা কিংবদন্তী ছিল যে, পৃথুর সময় পৌরাণিক সূতের উৎপত্তি হইয়াছে। বেণের

যে পুরুষকে নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিলেন (পৃথুর পূর্ব্বে কন্যা সাধারণতঃ ঋষি-পরিকল্পিত ছিল না), তখন তাঁহার যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঔরসে ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানকে এই যজ্ঞে [illegible] (ইহা) এবং তাহাদিগকে পুরাণের সূত, এবং বাজসনেয় সংহিতা-কর্ত্তা করিলেন। পরবর্ত্তীকালে যখন প্রতিলোম বিবাহ খুব নিন্দিত হইল, তখন বলা হইল যে, "পৃথুর যজ্ঞের সোমরসে বাঁহাদের পবিত্র হাত হইতে পুরাণ-বক্তা সূতের জন্ম; ক্ষত্রিয়া + ব্রাহ্মণীর [illegible] ঔরসজাতীয় সূত এবং এ পৌরাণিক সূত এক নহে।" কৌটিল্যের সময়ের সূত মত এই সময়ের। উশনা ও বিশ্বকর্মার [illegible] বহু পূর্ব্বের। উভয়ের সময়ের আগের কোনও কোনও গ্রন্থের মতে সূত বৈশ্যাবাহন, অভিষিক্ত; কোনও কোনও শাস্ত্রের মতে সূত নিম্ন এবং পরীক্ষিতোপেক্ষ। প্রতিবাদী মনিবাহেন যে মনুতে প্রক্ষিপ্ত পাঠ "ধর্ম্মাদ্ধনে হরঃ"। যীবানন্দ বিদ্যাসাগরের কলিকাতার সংস্করণে অনুযোগে আছে। আনন্দাশ্রমের সংস্করণে সহ [illegible] অপনীত হইয়াছে। পাঁচখানি বহি দেখিয়া ঐ সংস্করণ করা হইয়াছে। কিন্তু "অনুরোধক" বা অন্য কোনও পাঠ আমাকে দেখা হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানীতে মুদ্রিত বিবাদার্থসূত্রেও "অনুরোধক" পাঠ আছে। অতএব এখানে ঐ পাঠই গুরু।

[illegible] মিত্রবাবু মহাশয় লিখিয়াছেন—"দেবযানী ব্রাহ্মণ-কন্যা ক্ষত্রিয়া ভার্য্যার গর্ভজাতা, সুতরাং জাত্যতঃ ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা" (১৩০ পৃঃ)। কেন্দ্র তিনি লিখিলেন কিরূপে? তাঁহার মতে তো ব্রহ্মা+ক্ষত্রিয়ার সন্তান=মূর্দ্ধাবিষিক্ত, এবং মূর্দ্ধাবিষিক্ত ক্ষত্রিয় হইতে উচ্চতর জাতি। যদি তাহাই হয়, তবে ক্ষত্রিয় মূর্দ্ধাবিষিক্তে বিবাহ করিলে অবশ্য প্রতিলোম দোষ হইবে। আমার মতে, এ বিবাহ প্রতিলোম বিবাহ, কেননা দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ, মাতা ঊর্জ্জস্বতী * ক্ষত্রিয়া (ঊর্জ্জস্বতী প্রিয়ব্রতের কন্যা ছিলেন, পৌত্রী নহে)। অতএব দেবযানী ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ (বৌধায়ন ১।৯।৩)। এইজন্যই দেবযানী নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণী যে ক্ষত্রিয়ের পরিণেতা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিবাহে এবং তাহা হইতে অনন্তরজাত অনুলোম সন্তান পিতৃবর্ণ হইত, মাতৃবর্ণ বা পিতৃবর্ণাপেক্ষা নিকৃষ্টবর্ণ হইত না। মনুসংহিতাতেও একপই আছে (১০।৫-৭)। বিষ্ণু স্মৃতিতে "অনুলোমাসু মাতৃজাঃ" আছে। ইহা পরবর্ত্তী কালের বিধান। যযাতি-দেবযানীর সময়ে এবং তাহার পরে, দেবযানী অতি সহজেই নিজকে ব্রাহ্মণী বলিয়া পরিচয় দিয়া, যযাতিকে বিবাহে রাজি করাইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করার কারণ কি? তিনি কি তাঁহার পিতার জাতি জানিতেন না? অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে দেবযানী-যযাতির সময়ে ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়ার কন্যা ব্রাহ্মণী হইতেন। কারণেই

> যৌবন-রক্ষার্থায় বিশুদ্ধোৎপাদিতান্ সুতান্।
> সমুদ্দিশ্যেব তান্ হ পাঞ্চজন্যোবিগর্হিতান্ ॥১০।৬

এই মনুবচনের যে অর্থ করিয়াছি তাহা দেবীভাগবতের [illegible] কথাতে পরিষ্কার হইতেছে। আসল কথা এই যে [illegible] ও তাহা কালের জন্য লিখিত, এইরূপ মনে করিলে [illegible] হইবেই। মনে হয় জাতিভেদ ইহা ভিন্ন [illegible], পরস্পর আদান-প্রদান বিবাহ সন্তান দ্বারা নিন্দিত ব্রাহ্মণ হইতেন (যযাতি-দেবযানী এই সময়ের লোক), তাহা পর [illegible] নীচ এবং ক্ষত্রিয় চেয়ে উচ্চ জাতি হইতেন (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৬); ও পরবর্ত্তীকালে ক্ষত্রিয় হইতেন; তাহারও পরে অর্থাৎ বর্ত্তমানের ঐরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। জাতিভেদ যদি হিন্দুধর্ম্মের [illegible] তবে বলিতে হয় যে হিন্দুধর্ম্মের ক্রমেই [illegible] জাতিভেদ ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে।

আমি লিখিয়াছিলাম—"কলিতে অসবর্ণাবিবাহের কোনও [illegible] প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই। যদি এটা একটা মস্ত পাপ [illegible] পাপ হইত, তবে উহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত থাকিত।" এ [illegible] প্রতিবাদী মহাশয়ের মন্তব্য পাঠ করিয়াও আমার মত [illegible] পারি নাই। যদি তর্কস্থলে স্বীকারও করা যায় যে, কলিতে এ বিবাহে পাপ হয়, তথাপি ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। বড় [illegible] সমাজে চলে, কিন্তু আইন তার [illegible] ফেলে আইনটাই যেন একটা শুষ্কতর অন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম ও আইন (religion, morality and law) এক [illegible]

শ্রীযুক্ত কাব্যমাংখ্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন যে "অশ্বমেধে দক্ষিণা দিতে হয়," এবং পরীক্ষিতের পর "কোনও [illegible] সাম্রাজ্য হয় নাই," অর্থাৎ কেহই সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজা [illegible] কাজেই পরীক্ষিতের পর, অশ্বমেধ যজ্ঞ বন্ধ হইয়াছে। [illegible] দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্য, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রভৃতি যাঁহারা [illegible] এদেশে হইয়াছিল, উহাদের সবগুলিই পরীক্ষিতের [illegible] অবশ্য গজরাট বা সার্ব্বভৌম অর্থ যদি লওয়া যায় [illegible] সপ্তসমুদ্রযুক্ত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একজন রাজা" হয়, তবে [illegible] মহাশয়েরই জয়। কিন্তু তাহা হইলে, রাবণও সম্রাট ছিলেন কেন না, রাবণ তাঁহার অধীন ছিলেন না; অথচ শেষের [illegible] করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও সমস্ত পৃথিবীর রাজা ছিলেন না। [illegible] বর্ত্তমান ভারতবর্ষ এবং তৎসন্নিহিত দেশগুলিই হিন্দু গ্রন্থে [illegible] পৃথিবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই-সকলের অধীশ্বর [illegible] তাঁহাকে সম্রাট ও সার্ব্বভৌম বলিত। সমুদ্রগুপ্তের প্রতিজ্ঞা [illegible] মেধের প্রকৃত শাস্ত্র জানিতেন না, অথবা সমুদ্রগুপ্ত টাকা না [illegible] প্রণালীর অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করার কারণ নাই।

অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা দিতে হয়, [illegible] (১।১৩।৪৩—৫০) এবং মহাভারতে (১৪।৩।১৭; ৪।৮৯।১) [illegible] কিন্তু এস্থলে পৃথিবী অর্থ সমগ্র পৃথিবী নহে। যে [illegible] রাজ্য ছিল (অবশ্য তাঁর মণ্ডলের হইতে হইত, তাহাই [illegible] বিস্তীর্ণই ছিল), তাঁহার ততটুকু দান করিলেই পৃথিবী দান [illegible] এই পৃথিবী দানটা ক্রমে একটা "কথার কথা"র মধ্যে দাঁড়াইয়া [illegible] প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণেরা রাজ্যপালনে অক্ষম ও অনধিকারী [illegible] এবং রাজ্যভোগে তাঁহাদের প্রবৃত্তিও ছিল না (রামায়ণ ১।১৩।৩৩) [illegible] কাজেই তাঁহারা রাজ্য গ্রহণ করিয়া উহা যজমানকে ফিরাইয়া [illegible] এবং ঐ রাজ্যের মূল্য স্বরূপ সুবর্ণাদি যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিত। তবে এইরূপ "দান" চলিত কেন? ইহাতে একটা [illegible] হইত। অশ্বমেধযাজী অশ্বমেধের পর হইতে, সাম্রাজ্যকে [illegible] বা ট্রাষ্ট স্বরূপ ভাবিতেন; তখন হইতে তাঁহার [illegible] রাজা তবতি ন কামকরণায় ভূঃ; তিনি নিজের [illegible] দিতে [illegible] দিতেন না। এই সেদিন, শিবাজী তাঁহার গুরুকে রাজ্য দান [illegible] তাঁহারই অহি স্বরূপ রাজ্য পালন করিতেন। বলে শিবাজী [illegible] সমর্থই ধর্ম্মোত্তর ছিল। শিবাজীর অভিষেক বৃত্তান্ত [illegible] করিয়াছেন যে, তিনি কখনও হৃষীকেশ [illegible]

---

* ঊর্জ্জস্বতীর [illegible] মতানি, দেবযানীর অবনী ঊর্জ্জস্বতী বা ঊর্জ্জস্বতী [illegible] আছে। এ বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

অত্যাচার হইতে দিতেন না; কোরাণগ্রন্থের বা মোসলমান মসজিদের অপমান করিতেন না। এইরূপ সুফলের আশাতেই তাৎকালিক সমাজ পৃথিবী-দক্ষিণা রূপ একটা 'ভান' (fiction, formality) প্রশ্রয় দিতেন। পৃথিবী দানের নিখিলদৃষ্ট উদ্দেশ্য রাজ্যদান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে

সাধারণ সংস্কৃতে পৃথিবীদান অর্থে সমগ্র পৃথিবীদান তো নহেই, সমগ্র রাজ্যদানও নহে। বহু হিন্দু রাজারা ভূমি দান করিয়া উহার চৌহদ্দি দিয়া প্রদত্ত জমী কোনও ভবিষ্যৎ নৃপতি বাজেয়াপ্ত না করেন এই অভিপ্রায়ে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি শাসনে উৎকীর্ণ করাইয়াছেন—

বহুভি র্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য স্তস্য তদা ফলম্॥

অর্থাৎ এক রাজা যে জমী দান করেন, পরবর্ত্তী রাজারা যদি সেই জমী সরকারে বাজেয়াপ্ত না করেন, তবে তাঁহাদেরও ঐ জমীদানের ফল হয়। এই শ্লোকদ্বারা ভবিষ্যৎ নৃপতিদিগকে বলা হইতেছে যে, তোমরাও মদত্ত জমীদানের ফলভাগী, অতএব তোমরা ঐ জমী পুনর্গ্রহণ করিও না। এখানে যেমন "বসুধা" অর্থ জমী বা ভূমি, সমগ্র পৃথিবী নহে, সেইরূপ অশ্বমেধের দক্ষিণায় পৃথিবী দান ও অশ্বমেধ-যাজীর রাজ্যদান সমগ্র পৃথিবীদান নহে।

পরম পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" গ্রন্থে বহু যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, অগ্নিপ্রবেশ, যতিধর্ম্ম, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কোনও কোনও উপপুরাণে নিষিদ্ধ হইলেও উহারা কলিযুগে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে (১৩০২ সনের সংস্করণ ১৩৪—১৪০ পৃষ্ঠা)। এই স্থানটি পূর্ব্বে পড়া থাকিলে, মদীয় প্রবন্ধের উদাহরণসম্পৎ আরও বাড়াইয়া দিতে পারিতাম।

আমি লিখিয়াছিলাম "প্রতিলোম বিবাহ ক্রমে নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিল।" প্রতিবাদী মহাশয় বলেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও প্রতিলোম বিবাহ একটা বিবাহ মধ্যে গণ্য ছিল না, ইহা শাস্ত্রানুশাসননিষিদ্ধ একটা সংযোগ মাত্র" (ব্রাহ্মণসমাজ, পৌষ, ১৩১ পৃষ্ঠা)। কি দুক্ষণেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখা হইয়াছিল, বিধবা বিবাহ বিবাহই নহে, উহা পুরুষান্তর গ্রহণ মাত্র। এ দুর্ভাগ্য দেশে কু একবার আসিলে, সে ত সহজে যায়ই না, অপিচ ক্রমে পুষ্টি লাভ করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে যথার্থ দুঃখ অনুভব করি। আমাদের শাস্ত্র এমন হীন নয়, যে, উহার সমর্থনের জন্য আঁটাল গালাগালি আবশ্যক। সুখের বিষয় বঙ্গবাসীর প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে এসকল স্থান পায় নাই।

প্রতিলোম বিবাহ যে সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজে একটা বিবাহ বলিয়া গণ্য হইত, তার একটা অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। বল্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ অমরকোষের একখানি টীকা ১০০২ শকাব্দে লিখিয়াছেন। উহার নাম টীকাসর্ব্বস্ব। ঐ টীকাসর্ব্বস্ব ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ টীকায় লেখা আছে যে শূদ্র মাগধ বৈদেহক প্রভৃতি প্রতিলোমজেরা বিবাহোৎপন্ন ও অবিবাহোৎপন্ন উভয়ই হইতে পারে। তবে অবিবাহোৎপন্নেরা বিবাহোৎপন্নদের চেয়ে গর্হিত। কেবল চণ্ডাল বিবাহোৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বানন্দের মতে শূদ্র কোনক্রমেই ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে পারে না, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ করিতে পারে। উশনার ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং বিষ্ণুর সূত্রে যে বিবাহোৎপন্ন ও গূঢ়োৎপন্নের কথা আছে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। গূঢ়োৎপন্ন সূতদের নাম হইতে রথকার উশনা ও বিষ্ণু। মনু প্রভৃতি যে সূতকে বেদবাহন বলিয়াছেন ও যাহাদের ব্যবসা অশ্বসারথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারা এই গূঢ়োৎপন্ন সূত বা রথকার। বিবাহোৎপন্ন সূতেরা দ্বিজ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানযুক্ত ছিলেন।

শ্রীকালীপদ বেদান্তভীর্থ।

বিয়ের ফুল

(১)

কলিকাতার এক একটা গলির ভিতর ছোট্ট একখানা বাড়ীর ছোট্ট একটা ঘরের পাশে ছোট্ট একটুখানি খোলা চাতাল; কলিকাতার বাসাড়েদের ভাষায় এই চারহাত চৌকা চাতালটুকেই ছাত বলে। কূপের তলা থেকে উপর দিকে তাকাইলে যেমন মনে হয়, ঘেঁসাঘেঁসি চারিপাশের উঁচু উঁচু বাড়ীর দেয়াল-ঘেরা এই চাতাল বা ছাতটুকু হইতে উপর দিকে তাকাইলে তেমনি মনে হয়—যেন আকাশ লম্বা সরু চোঙায় এক দিকের ছিদ্রে তার একটি নীল চোখ পাতিয়া উঁকি মারিতেছে। এই ছোট্ট চাতালের উপর গুটিকয়েক ফুলগাছ ত্রিশঙ্কুর মতন তেশূন্যে সৎসাহসের যত্নে মাহারা শিশুদের মতন টবের উপর বসিয়া মাথার উপরকার একফালি নীল আকাশের দিকে ফুলের হাসিমুখে তাকাইয়া থাকে; এই তেসাঁধির ঝিরঝিরে আলো বাতাস খুব বেশী আসিতে পায় না,—আশে পাশের মতন সাত দেয়ালে ধাক্কা খাইয়া টলিতে টলিতে বাতাসের ঝলক মাঝে মাঝে ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া গাছগুলির পল্লব-অঙ্গকে একটু দোলা দিয়া ফুলের হাসিমুখে চিবুক ধরিয়া একটু আদর করিয়া যায়; সূর্য্যদেবের রথ থেকে ঠিক-দুকুর বেলা তাঁর রূপালি উত্তরীয়-প্রান্ত মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গাছগুলির উপর দিয়া একটুখানি লুটাইয়া যায়; আর তাতেই কৃতার্থ গাছগুলির আনন্দ ধরে না, ফুলের হাসিতে তাদের মুখ ঝলমল করে,—যেন ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মা-মরা মরণাপন্ন শিশু মৃত্যুশয্যায় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে একটু আদর একটি নূতন খেলনা পাইয়া মরণকে হাসিয়া ভুলিতেছে। গাছগুলি মাতা ধরণীর বক্ষচ্যুত, পিতা আকাশের স্নেহবঞ্চিত ও ভাই বাতাসের সঙ্গহারা হইয়া থাকিলেও তাদের মুখে ফুলের হাসির বিরাম ছিল না তাদের ধাত্রীর প্রাণঢালা যত্নে।

গাছগুলি যার যত্ন পাইয়া সকল রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাসিমুখে সুখের প্রলাপ ফুটাইয়া তুলিত, সেই মেয়েটিও ছিল তাদেরই মতন জগতের সহিত সম্পর্কবর্জিত টবে-আঁকানো ফুলগাছেরই মতন। যে ঘরের পাশে

ছাদটি সেই ঘরের যে ভাড়াটে, থাকে অচেনা অজানা সনাতনীয় নেহাৎ মধ্যবিত্ত ঘরে। তার নাম সেবা, বয়স আঠারো-উনিশ, চেহারা বাঙালী সাধারণ মেয়েরা যেমন হইয়া থাকে—আকর্ষণীয় নয়, কুৎসিতও নয়—রংটা যেন কাকজোৎস্নার মতো। গড়ন ছিপছিপে অথচ গোলগাল, তাই তাকে একটু লম্বা মনে হয়; ওরই মধ্যে চোখ দুটি ডাগর টানা টানা ভাসাভাসা টিকলো, ঠোঁট দুখানি পাতলা, নাকের ডগাটি আকাশের দিকে ছুঁচলো ঈষৎ উল্টানো, গালে পাতা দুখানি পাতলা, এ সবের উপরে ছিল তার মুখে একটি ছোট্ট মিষ্টি চঞ্চলতা, ঠোঁটে ছিল হাসি, হৃদয়ভরা ছিল মমতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বভাব ছিল বলিষ্ঠ, আর অভ্যাস ছিল নিটফাট; তাই তাকে দেখিলেই মনে হইত—বাঃ! চমৎকার! সে খড়্‌কে-ডুরে শাড়ীই পরুক কি মিলে কড়াপেড়ে শাড়ীই পরুক, সব তাতেই তাকে মানাইত সুন্দর, আর সে শাড়ী ব্লাউজ জুতা টিনটিন রং ও ঢং মিল করিয়া পরিতে জানিত বলিয়া অল্পেতেই তার বেশ পরিপাটী হইয়া উঠিত। তার মন ছিল কালের ফলের রকম রকম ফুলের। তাই সে গোটা কয়েক টবে ফুলগাছ রোপিয়া ছাতটাকে বলিত বাগান। সে ইচ্ছা করিয়াছিল—বিলাতে ছাদ বাগানের চলন আছে; তাই তার এই মুস্কিল; কিন্তু এইটুকু আয়গায় ঐ কটি গাছের ফুলে তার ফুলবাগানের শখের আকাঙ্ক্ষা ভরিত না।

ফুলবাগানের আকাঙ্ক্ষা মিটিবার তার সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। সে জন্মিয়াছিল মীরাটে, বড় হইয়াছিল কোয়েটায়; পৈতৃক বাড়ী যে ছিল কোথায় তা সে ঠিক জানিত না; তার আপনার বলিতে কেউ কোথাও নাই,—অনাথা মাকে বলে। শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিলেন তার মামা—ছিলেন কমিশেরিয়েটের সামান্য কেরাণী; অত্যন্ত গরিব মানুষ, দুঃখিনী মাওড়া মেয়ে আদরযত্ন পায় এমন ভাগ্যোদয়ের সুযোগ কিনিবার মতন ধনের সঙ্গতি তার ছিল না; বেশী লোকের হাতে মেয়ে ফেলিয়া দেওয়ার চেয়ে মেয়ে লাইবড় থাকে সেও ভালো মনে করিয়া তিনি কোন পাত্র-তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন নাই; তিনি মরিয়া গেলে অনাথ মেয়ে যাতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে এ ভাবে থাকিয়া নিজের খরচ নিজেই উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারে এমন শিক্ষা কোয়েটার এক ক্রিশ্চিয়ান মেমের কাছে সে শিখাইতেছিলেন।

বাবার মৃত্যু হইলে সেবা কলিকাতায় এক চাকরী সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে; লইয়াছে স্কুলের কর্ত্রীর পরিচিত আনন্দবাবুর বাড়ী একখানি ঘর ভাড়া লইয়া এবং আহারেরও ব্যবস্থা ঐ ভদ্রলোকেরই সংসারে খরচ দিয়া। ছাতটুকু পাইয়াছিল কাউ; এই ছাতটুকু পাইয়া সেবা বর্ত্তিয়া গিয়াছিল; এইখানে টবে সে গোটাকতক ফুলগাছ লাগাইবার সুযোগ পাইয়াছিল; এই ছাতটুকুকে সে করিয়াছিল তার বাগান।

সেবার শৈশবেই সে মাতৃহারা হইয়াছে, তার বাবা চলিয়া যাইতেন আপিসে; একলা দিন কাটিত এক সাহেবের বাগানের পাশের বাড়ীতে সেখানে বাবা মেয়ে আগ্‌লাইবার জন্য ঐ বাড়ীতে ছোট্ট খাট কিছু দিবার চুক্তি করিয়া পাইয়াছিল বাসা। শৈশবে ফুলের সঙ্গে বড় হইয়া সেবার মনে যে ফুলের টান হইয়াছিল তাহা তার স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মীরাট হইতে কোয়েটায় গিয়াও মিশন-হাউসের বাগানের মধ্যেই সেবা স্থান পাইয়াছিল এবং ভার শিক্ষয়িত্রীর কাছে থাকিয়া তার শৈশবের ফুল প্রীতি বাড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল; মেয়েমানুষ জন্মই সেবার স্বভাব হইয়া ছিল কিছুটা সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগী ও সেবাপরায়ণ, তার মনের মধ্যে এই একটি বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—যেমন করিয়া হোক তার একটি বাগানবাড়ী চাই। কিন্তু মেয়েস্কুলের নীচু ক্লাসের মাষ্টারী করিয়া সে আশা মিটিবার সম্ভাবনা নাই; তাই তার মনে সঙ্কল্প ছিল কোনোমতে টাকা জমাইয়া প্রাক্টীস করিতে হইবে। সে আনন্দ-বাবু ও সুমেন বাবুর ছেলে লইয়া স্কুলের ছুটির সময় হাসপাতালে বেড়াইতে শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে।

উদ্ভিদের মধ্যে যেমন পদ্ম ও কচু পাখীদের মধ্যে হাঁস তাতীয়ের মধ্যে

জলে ডুবিয়া থাকিয়াও ভিজে না, তেমনি মানুষের মধ্যেও এমন লোক দেখা যায় যারা শৈশবে হইতেই দুঃখের মধ্যে মানুষ হইলেও দুঃখ তাদের মনকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে না। সেবার ছিল এই-রকমের প্রকৃতি। সে ছেলে-বেলা হইতেই মৃত্যুর শোক ও অভাবের সঙ্কোচের মধ্যে থাকিয়াও হইয়াছিল সদানন্দময়ী, চঞ্চল, বচনবিন্যাসপটু মুখরা; অথচ শোকের ও অভাবের ছায়ায় তার চরিত্রের আবেগ ও উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ মধুর ও নিতান্ত পরের প্রতিও আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল; ইহাতে সে যেমন অতি সহজে পরের সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিত, তেমনি অতি সহজে নিজেও অপরের প্রিয় হইয়া উঠিত।

সেব স্কুল হইতে বাসায় আসিয়া তার ছাত-বাগানের গাছে ঝাঁঝরী ঝারি করিয়া জল দিতেছিল; টবে-টবে মর্ত্যমী ফুলের বিচিত্র বাহার হাজার প্রজাপতির পাখার মতন দেখাইতেছিল; বিরহিণীর প্রণয়বেদনার মতন বড়-বড় গোলাপের গন্ধে বাতাস মদির হইয়া উঠিয়াছিল; তারই মাঝখানে বৃক্ষসেচনরতা সেবাকে যেন বসন্তলক্ষ্মীর মতন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

বুড়া আনন্দ-বাবু নিজের ঘরে ইজি-চেয়ারে শুইয়া বই পড়িতেছিলেন; ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ পাইয়া চোখ তুলিয়া সেবাকে ফুলের বনে বনদেবীর মতন, কণ্ব মুনির আশ্রমে শকুন্তলার মতন, পুষ্পস্তবকনম্রা লতার মতন আনত হইয়া বৃক্ষপরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া বুড়ার চোখ দুটিও সৌন্দর্য্য-দর্শনের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি বইখানির পড়িবার জায়গায় আঙুল রাখিয়া বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সেবার বাগানের ধারে তাঁর জানলার কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন—কি ভাই, শকুন্তলার বৃক্ষসেচন হচ্ছে?

সেবা একটু লোজা হইয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—হাঁ দাদামশায়।

আনন্দ-বাবুর বয়স সত্তর উৎরাইয়া গিয়াছে; রং তাঁর কালো হইলেও বড়-বড় সাদা চুল আর দাড়িতে তাঁকে একটি সৌম্য শ্রী দিয়াছিল; তার উপর তাঁর শান্ত কোমল স্বভাব, সরস রসিক স্নেহমধুর হৃদয়, জ্ঞানলাভের আগ্রহ, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁকে ইলিসাভার বহু লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। সেবা এ বাড়ীতে আসিয়াই আনন্দ-বাবুকে দাদামশায় বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং রসিক বৃদ্ধ এই নবলব্ধ নাৎনীটিকে নিজেরই নাৎনীর মতন ভালোবাসিয়াছেন।

আনন্দ-বাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—শকুন্তলার যে কেবল ভূতের বেগার খাটা হচ্ছে তাই, দুষ্মন্ত ত একবারও উঁকি মারলে না।

সেবা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—কাজ নেই আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি, যে বিয়ে করে স্ত্রীকার করতে ভয় পায়, আবার উল্টে স্ত্রীকে অপমান করে।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—Twentieth Century'র দুষ্মন্তরা আগের চেয়ে একটু bold আর gallant হয়েছে বোধ হয়।

সেবা হাসিয়া বলিল—বোধ হয় রকমের অনিশ্চিতে লিপ্ত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—তা বল্লে কি হয় ভাই? এই LIFEটির তিনভাগই যে LIE আর পূর্ব্বেরটা IF! তোমার বাগানে এত ফুল ফুটেছে, কত প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে ফুলের ঘটকালি করছে, তোমার বিয়ের ফুল কবে ফুটবে ভাই? প্রজাপতির ডানার রং মনের গায়ে কি লাগেনি?

সেবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না দাদামশায়, যার খেটে খেতে হয় তার মনে রংচং লাগবার অবসর কোথায়? বিয়ের বিলাসের সখ নিষ্কর্ম্মাদেরই হয়।

আনন্দ-বাবু জানলার উপর হাতের ভর রাখিয়া বলিলেন—কিন্তু ভাই, আমার যে ভয়ও হয়, লোভও হয় যে আমার এমন রূপেগুণে লক্ষ্মী নাৎনীটি যদি চুরি যায় ত সে চুরিটা না হয় আমিই করি।

সেবা হাসিয়া বলিল—কে চুরি করবে দাদামশায়? রুক্মিণীহরণ সুভদ্রাহরণ হয়েছিল যখন দেশে পুরুষ ছিল; চুরি করতেও ত উদ্যোগ সাহস চাই? চুরি যান ইচ্ছে করলেও চুরি যাবার যো নেই এদেশে। যার সঙ্গে চুরি যাব তার বোচকা বেঁধে ট্যাক্সি ডেকে জোগাড় কোরে দিতে হবে আমাকেই। হয়ত ট্যাক্সিতে চোড়ে চোর যেতে যেতে ভ্যাঁ তোর কেঁদে। যদিই বা সেই চোর [illegible]

পর্যন্ত যদি যান, তা হলে তিনি বরপণের বাকী লোকে ট্যাক্সি-ভাড়াটা চাইবেন, কিংবা গাঁটরীটি নিয়ে বেমালুম চম্পট দেবার চেষ্টা করবেন।—দেশে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের মতন চোর যখন নেই আর আমার চুরি যাবার ইচ্ছেও নেই, তখন নির্ভাবনায় থাকতে পারেন দাদামশায়।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—নির্ভাবনা হতে পারছি কৈ ভাই বোথের ভেতর আসল রূপ দেখে।

সেবা হাসিয়া বলিল—বুড়ো বয়সে অত লোভ ভালো নয় দাদামশায়, ঠাকুরুণদিদি তখনে আপনাকে আদর করবেন না।

আনন্দ-বাবুর স্ত্রী মোহিনী হাসিতে হাসিতে আনন্দ-বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—সতীকে খোঁটার ভয় করিসনে ভাই, তুই তোর ঠাকুরদাদার সঙ্গে আদর কর।—ওঁর বুড়ো হয়েছি, আমি আর ওঁকে আদর যত্ন করতে পারিনে। বুড়োর সঙ্গে বুড়ীর ভাবটাও মিস্ ভাই; সতীন মেলে হিংসে করিসনে।

সেবা হাসিয়া বলিল—এ বয়বয়ে আমার মন নেই ঠাকুরুণদিদি। যে আমাকে ফুলের বাগান না দিতে পারবে তাকে আমি গাঁথলেও ফুলের মালা দিচ্ছি নে।

মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—তবে তুই একটা উড়ে মালীকে বিয়ে কর্।

সেবা হাসিয়া বলিল—তাই করব ঠাকুরুণ-দিদি; শুনেছি মালীর কাছে থেকে ফুল ভালোবাসতে শিখেছি, উড়ে মালী যদি ফুলের বাগানে রাখে তবে তাকেই ভালো বাসতে শিখব।

আনন্দ ঔদার্যের সোনার কৌটার ভিতর থেকে মৈত্রীর মতন, সতীর ঝাঁপির ভিতর থেকে মাতৃর মতন, হৃদয়ের ভিতর হইতে অনাথার জীবনের অতীত স্মৃতির দুঃখ ঘোলা তুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়াই আনন্দ-বাবু ও মোহিনী বিচলিত হইয়া পড়েন। মোহিনী কথা চাপা দিবার জন্য বলিলেন—যা তো মালীবৌ, এখন বাগান রেখে খাবে চল, কোন্ সকালে খেয়ে গেছ—খিদে পায় না?

সেবা মজার বারিস্টা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—এই যাই ঠাকুরুণ-দিদি, অভ্যেস ত হয়ে যেত, আপনার বক্তৃতাটাই ত মাটি করে এসে আমার সেবা করিয়ে দিলেন।

আনন্দ-বাবু হাসিয়া বলিলেন,—তোর [illegible] নাও ভাই—উমেশের বা আর ঘণ্টা এখন [illegible] আবার আসবে কিন্তু.....

সেবা ঘাড় বাঁকাইয়া চোখে হাসিল। [illegible] হাসিমুখে জানলা হইতে সরিয়া গেলেন। বাহিরে [illegible] মোহিনী আনন্দ-বাবুকে বলিলেন—বনগ্রাম [illegible] এসেছে—সুমতি-দিদি লিখেছেন, বীরুর [illegible] সাঁতারের বাজি খেলতে।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—ও! তবে একদিন এসে জেঠিমাকে উপদ্রব করে যাবে। [illegible] কিছু খাবার-টাবার করিয়ে রেখে দিয়ো.....

সেবা গাছে জল দেওয়া সারিয়া [illegible] ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে নিজের নাম শুনিয়াই বলিল কি দাদা-মশায়? কার জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে? বরের জন্যে? কেউ শুভদৃষ্টি করতে আসছে?

আনন্দ-বাবু হাসিমুখে পাড় নাড়িয়া না জানাইয়া বলিলেন—না ভাই, তার এই [illegible] দিয়েছি। আগে যদি তোমার চিত্তরঞ্জন [illegible] করতাম। সে তোমায় একটা বেশ মজার যৌতুক দিয়ে তোমার মালঞ্চের মালার [illegible]

আনন্দ-বাবুর এক মরা মেয়ের [illegible] দিদিমার কাছে মানুষ হইতেছিল; মোহিনী তাদের মানুষ করিতে পারিতেন না। [illegible] ঢুকিয়াই দেখিল ছোটটির দুই [illegible] গড়াইতেছে এবং তার বড়টির [illegible] করিতেছে। সেবা ছোট মেয়েটির নাম [illegible] আনন্দ-বাবুর কথার জবাব দিল—পরের [illegible] দাদামশায়। যার বিয়ে নেই সে [illegible] লোক যতদিন না ওঠে ততদিন আপনার বাগানেরই গলায় আমি মালা পরাব।

মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা সে [illegible] কেউ এসে তোর মনের বাগানে বিয়ে [illegible] তখন কি করিস্ দেখা যাবে।

সেবা আনন্দ-বাবুর নাতনী দুটির [illegible] তুলিয়া ও বড়টির হাত ধরিয়া [illegible]

যাইতে যাইতে হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া গেল—উঁহুঁ! যার বাগানে ফুল ফোটে না, সে আমার মনেও ফুল ফোটাতে পার্‌বে না।

মোহিনী ডাকিয়া বলিলেন—ওলো! কোথায় চল্‌লি আবার? খেয়ে যা।

ঘরের বাহির হইতেই সেবা বলিয়া গেল—কণার খোস খুইয়ে মলম লাগিয়ে আস্‌ছি ঠাক্‌রুণদিদি।

(২)

নবগ্রামের জমিদার ভারত-বাবু ছিলেন আনন্দ-বাবুর বন্ধু। ভারত-বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হীরক এখন জমিদারীর মালিক; হীরকের মার নাম সুমতি; হীরকের অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, তার স্ত্রীর নাম রমা। হীরক ধনীর একমাত্র পুত্র হইয়াও সচ্চরিত্র, বিদ্বান, পরোপকারী, সৎকর্ম্মে আগ্রহান্বিত; তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর, কিন্তু তার মুখখানি ছিল এখনো কিশোর তরুণ বালকের মতন সুকুমার, তার স্বভাবও ছিল বালকের মতন চঞ্চল আনন্দময়; তার প্রকৃতি ছিল আবেগময়,—একটু প্রতিবাদেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত, আবার পরক্ষণেই অনুতপ্ত হইয়া লোকের কাছে নম্র হইয়া পড়িত; কলসভা তার কাছে প্রশ্রয় পাইত না—কলেজে পড়িবার সময় দৌড়ঝাঁপ খেলায় যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তার ঝোঁক এখনো দস্তরমত ছিল—সে দেশের মধ্যে সাঁতারে ক্ষিপ্র, দৌড়ে দ্রুত, ক্রিকেট হকি ফুটবল টেনিস খেলায় দক্ষ, হাডুডুডু লাফালাফি খেলায় ওস্তাদ এবং সে একজন পালোয়ান রাখিয়া কুস্তির কসরৎও আয়ত্ত করিতেছিল। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ ব্যায়াম ও নিরলস কর্ম্মে সুগঠিত বাহুল্য-বর্জ্জিত মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল—দেহের গঠন ও রেখা-বিন্যাস যেন ভাস্করের মানসপ্রতিমার মতন সুঠাম সুসমঞ্জস। পুরুষের মতন বলিষ্ঠ দেহে কিশোরের মতন আবেগময় অথচ সরল কোমল ও রমণীর মতন রমণীয় মুখখানি দেখিলে তাকে ভালো না বাসিয়া থাকা অসম্ভব মনে হইত, তাই সে তার পরিচিত মাত্রেরই প্রিয়।

হীরক বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় সাঁতারের বাজি জিতিতে কলিকাতায় গিয়াছে; আজ তার নবগ্রামে ফিরিয়া আসিবার কথা। তাই মা সুমতি নিজে ছেলের ভালোবাসা খাবার গোকুল-পিঠে ও পাটি-সাপ্‌টা তৈরি করিয়া রসে ফেলিতেছিলেন, আর বধূ রমা তাঁর কাছে বসিয়া জোগাড় করিয়া দিতেছিল। সুমতি কাজ সমাপ্ত করিয়া একখানি রূপার রেকাবিতে চারখানি পাটি-সাপ্‌টা ও গুটি-আষ্টেক গোকুল-পিঠে সাজাইয়া রেকাবি তুলিয়া বধূর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন—বৌমা, গরম-গরম খেয়ে দেখ ত মা কেমন হয়েছে।

রমার সুন্দর মুখখানি আনন্দে ও লজ্জায় আরো সুন্দর হইয়া উঠিল, সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—আমিই আগ খাব মা, তা কি হয়?

সুমতি হাসিয়া বলিল—বেশ হয় মা, বেশ হয়। তুমি হীরুর আগে খেলে হীরু সুখীই হবে।

রমা সুখের লজ্জায় লাল হইয়া মাথা নত করিয়া বলিল—আপনার জন্যে আগে তুলে রাখুন.....

সুমতি হাসিয়া বলিলেন—আমার মা আগে খেলে আমার পরে খেতে কিছু দোষ হবে না মা, তুমি খাও ত।

রমা আর আপত্তি না করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। খাইতে খাইতে হাসি-মুখ তুলিয়া রমা বলিল—বিয়ের পর যখন এখানে আসি মা, তখন আমার এক দিদি আমায় যে ভয় দেখিয়েছিল!

সুমতি রমার কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কৌতুকে উৎসুক হইয়া বলিলেন—কিসের ভয় মা?

রমা আনন্দে ও লজ্জাতে মিশাইয়া হাসিয়া বলিল—সেজ্‌দি বলেছিল—শ্বশুরবাড়ী নয় ত রে, যমের বাড়ী! এই যে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী ছাড়ছ এই কান্না আর ছাড়বে না।

সুমতি হাসিয়া বলিলেন—তোমার দিদিকে তার শাশুড়ী বুঝি খুব যন্ত্রণা দ্যায়? অনেক শাশুড়ীই ঐ রকম, তাদের মনে থাকে না যে এককালে তারা বৌ ছিল—আবার বৌএরা শাশুড়ী হলেও ঐ-রকম বৌ-কাঁটকী হয়। কিন্তু তুমি যে আমার হীরুর বৌ, হীরু যে তোমায় খুব ভালো-বাসে। আমি কি তোমার মনে একটুও কষ্ট দিতে পারি মা? সে কষ্ট যে হীরুর মনে লেগে ফিরে এসে আমার মনেই লাগ্‌বে! বলিতে বলিতে সুমতির চোখ দুটি ছলছল করিতে লাগিল।

স্বামীর সে কোহিনী এই কথা শাশুড়ীর মুখে শুনিয়া সুখে ও লজ্জায় রমা আর কথা বলিতে পারিল না, সে মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। সুমতি বলিলেন—হীরুর আসবার সময় ত উৎসবে গেল; আজ আর এলো না বোধ হয়। এমন ছেলে যে একখানা চিঠিও দিলে না।

স্বামী আজ আর আসিবে না হয়ত এই আশঙ্কায় রমার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল, তার চোখ ছলছল করিয়া জলে ভরিয়া আসিল, সে মাথা নত করিয়া খাইতেই লাগিল—কোনো কথা বলিতে পারিল না।

সুমতি একটা মীট-সেফের ভিতর খাবারগুলি তুলিয়া রাখিতেছেন, হীরক পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। রমা মুখ তুলিয়া স্বামীকে দেখিতে পাইতেই তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিয়া হাতে ওঠাইয়া রাখিল। হীরক কোনো ইসারার বারণ করিল, রমা যেন কোনো রকম করিয়া তার আগমন মাকে জানাইয়া না দ্যায়। হীরক মাঙুলের উপর ভর করিয়া সন্তর্পণে গিয়া মার দুই চোখ চাপিয়া ধরিল মা ছেলের ছেলেমানুষী বেশ ভালো করিয়াই চিনিতেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন—হীরু এলি?

হীরক মার চোখ ছাড়িয়া সোজা হইয় দাঁড়াইয়া বলিয় উঠিল—হীরু এল আমনি টের পেয়ে গেছে। এক দিনও কি মন করতে নেই ও-পাড়ার মটরা এসে চোখ টিপে ধরেছে!

ছেলের ছেলেমানুষী খেলাতে খুসী হইয়া সুমতি বলিলেন—আমার হীরুর হাতের স্পর্শ যে আমি চিনি; মটরা বোলে ভুল হবে কেন? কলকাতা থেকে কোন্ গাড়ীতে আসবি কিছুই লিখিস্‌নি, গাড়ীও পাঠাতে পারিনি। কিসে এলি?

হীরক প্রফুল্লমুখে মার কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া মার কথা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোমার ছেলে কি মা এখনো হাঁটতে শেখেনি, না সে খোঁড়া? এক কোশ রাস্তা বৈ ত নয়, আধঘণ্টায় মাড়িয়ে চোলে এলাম!—এ দুপুর রোদ্দুরে আছে কি জন্যে?

ছেলের গৌরবে সুখী হইয়া মা বলিলেন—ঈশ্বরের কি কৃপা যে তিনি তোমায়

হীরক গর্ব্বিতভাবে বলিল—জিতে এলাম! মেডেল পেয়েছি।

হীরক পকেট হইতে একটা ছোট বাক্স বাহির করিয়া ঢাকনা খুলিয়া মার হাতে দিল; সুমতি সন্তানের গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন—মেডেল ত সুন্দর, এ হার গেঁথে বৌমার গলায় পরিয়ে দিস।

হীরক অপাঙ্গে একবার পত্নীর দিকে চাহিল, ঠিক সেই সময় রমাও আড় চোখে ঘোমটার ফাঁক দিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল; সেই চকিত দৃষ্টির সুখে ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া হীরক বলিল—বৌমা ত কেবল বৌমা আর বৌমা? কতক্ষণ থেকে কোরে খাওয়ানো হচ্ছে ওঁকেই—আর আমার পেট চোঁ চোঁ করছে তার খবরই নেই।

হীরক উঠিয়া গিয়া স্ত্রীর সামনে বসিয়া ভাবে খাবার তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রমা তাহার স্বামীকে উচ্ছিষ্ট তুলিয়া খাইতে দিয়া শিহরিয়া মৃদু ভৎর্সনায় খুব আস্তে বলিয়া উঠিল—ওকি!

সুমতি হাসিতে হাসিতে আরো খাবার তুলিয়া পাতে দিতে দিতে বলিলেন—আহা ওর মুখের দিকে চেয়ে খাচ্ছিস কেন? তোর জন্যেও খাবার বেড়ে রেখেছি খেতে পারিস খা না।

হীরক স্নেহের ভৎর্সনা করিয়া বলিল—তোমায় আগুন-আঁচ লাগাতে বারণ করেছে, কে বলেছিল ঢের খাবার করতে? কথা শোনা হয় কিনা বলো ত?

সুমতি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—নে, আর বাবার মতন বকতে হবে না, খা। আমি ফল ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।

হীরক রমার মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—কলা-বৌ, ঘোমটা খোলো। বৌ-কথা ও

রমা স্বামীর হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—ছি, কি বেহায়াপনা করো? এখুনি মা এসে পড়বেন।

হীরক চোখ দুটি বাঁকা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—মা ছেলের মরদ গোনেন—তাঁর ফিরতে দেরী হবে ক্ষমতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাহির হইতে সুমতির গলা শোনা গেল—বামা, দু গেলাস জল নিয়ে যা ত মা, হীরু আর বৌমা থাচ্ছে।

রমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া হাত গুটাইয়া বসিল; হীরক গম্ভীর হইয়া অনেকগুলা গোকুল-পিঠা মুঠি করিয়া মুখে পুরিয়া হাসি রোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তার মুখের চোখের প্রত্যেক রেখায়-রেখায় হাসি আঁকা হইয়া গিয়াছিল। সুমতি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—বৌমা, তুমি হাত গুটিয়ে বোসে থেকো না মা; তা হলে ঐ ডাকাত তোমায় কিছুই খেতে-দেবে না; যা পারো কেড়ে-কুড়ে নিয়ে খাও।

পিঠে-ভরা মুখে হীরক বলিল—তা বলতে হবে না মা, ঘোমটার তলে বেশ মুখ নড়ছে।

রমা চট্ করিয়া অপাঙ্গে একবার শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া লইয়া হীরকের হাতে চিমটি কাটিয়া দিল। হীরক একটু আহত হইয়া উঃ করিয়া উঠিল। সুমতি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রে?

হীরক অপ্রস্তুত হইয়া কটাক্ষে রমার দিকে চাহিয়া ঘোমটার যে কোণটা রমার দিকে সেই কোণে একটু হাসিয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মতন বলিল—পিঁপড়ে মা!

সুমতি ছেলের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় পিঁপড়ে রে?

হীরক মাথা নীচু করিয়া বলিল—পিঠের সঙ্গে।

সুমতি তখনো না বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—টাট্‌কা পিঠেতে পিঁপড়ে এল কোত্থেকে?

রমা ঘোমটার ভিতর হাসি চাপিবার চেষ্টায় থুকথুক করিতেছিল। হীরক আর মিথ্যা বলিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল—এই যে সাম্‌নে খুদি পিঁপড়েটি পিঠের সঙ্গে আমায় দিয়েছ।

সুমতি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া খাবারগুলি গুছাইয়া তুলিতে লাগিলেন; খাবার তুলিতে তুলিতে হীরক আসিয়া পড়াতে খাবার তখন তোলা হয় নাই। অর্দ্ধসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিতে করিতে সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে, আনন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলি?

হীরক বলিল—গিয়েছিলাম মা। জ্যাঠামশায়েরা এখন আস্‌তে পারবেন না—তাঁদের একটি নাৎনী জুটেছে—তাকে একলা রেখে আস্‌তে পারবেন না।

সুমতি বলিলেন—নাৎনী ত রিমঝার মেয়ে দুটি—রেণু আর কণা? বাছোড় কচি মেয়েদের কোথায় রেখে আস্‌বেন? তাদের নিয়ে আস্‌তেই ত বোলে দিয়েছিলাম। তুই বলিস্‌নি?

হীরক বলিল—এ নাৎনীটি ওঁদের আপনার কেউ নয়, একজন ভাড়াটে, ওঁদের সংসারেই খরচ দিয়ে থাকে খায়। মেয়েস্কুলে চাকরী করে।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখেছিস তাকে? কেমন, কতবড়টি সে?

হীরক বলিল—আমি ত দেখিনি তাকে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন সে স্কুলে গিয়েছিল। মেয়েটি বোধহয় খুব ভালো—জ্যাঠামশায় আর মেঠিমার মুখে ত প্রশংসা ধরছিল না।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়েটির বিয়ে হয়নি এখনো?

হীরক বলিল—বিয়ে হয়নি বোধ হয়—কারণ ওঁরা বলছিলেন, আমার বিয়ে হয়ে না গেলে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেন।

কথাটা বলিয়াই হীরক চোখ বাঁকা করিয়া পত্নীকে একটি দৃষ্টির খোঁচা দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়েটির নাম কি? আপনার লোক কেউ নেই বুঝি?

হীরক হাসিয়া বলিল—তা ত জানিনে মা—আমি ত সেসব জিজ্ঞাসা করিনি। এর পরে যখন যাব তখন জিজ্ঞাসা কোরে আস্‌ব না হয়।

হীরকের কথা শুনিয়া সুমতি হাসিতে লাগিলেন; ঘোমটার ভিতর রমার মুখও হাসিতে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

এমন সময় হীরকের ছেলেবেলাকার খাস খানসামা লোকনাথ আসিয়া খবর দিল—ম্যানেজার-বাবু একবার দেখা করতে চাচ্ছেন।

হীরক উঠিয়া পড়িয়া বলিল—বস্‌তে বল্, যাচ্ছি।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুইডেনের শিক্ষাপ্রণালী

ইউরোপের বড় বড় দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল যদি ছোট দেশগুলি দেখা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে সেই ছোট দেশগুলিতেও আমাদের বিপুলকায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা শিক্ষা কত অধিক উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে। ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত দেশই আপনাদের ভাগ্য আপনারা গড়িয়া তুলিতেছে। লোভী ও অর্থ-পিপাসু বলিয়া আমরা ইউরোপকে যত-কিছু দোষ দিই না কেন, সে যে তার প্রত্যেক সন্তানকে আপনার শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের

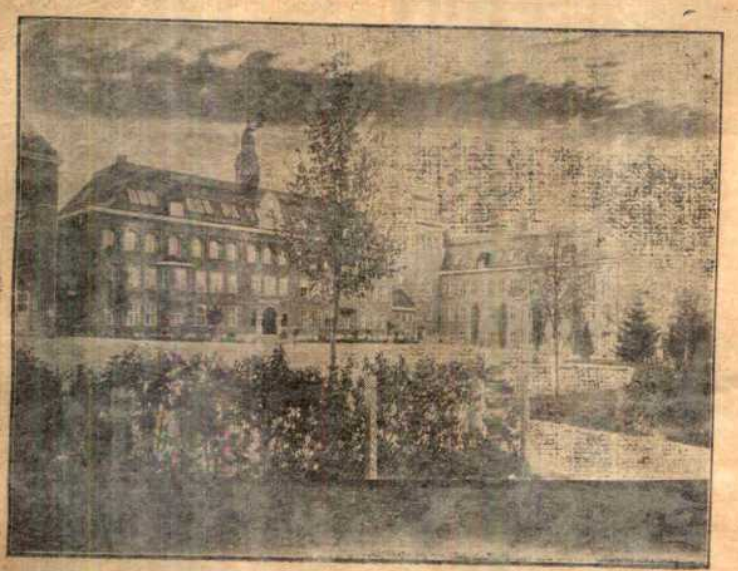

সুইডেনের একটি স্কুল-বাড়ী।

উপর সু-প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছে তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। আমরা এ-বিষয়ে যে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের সুখ ও উন্নতির সহিত আমাদের সুখ ও উন্নতির খুব অল্পই সম্বন্ধ। তাই আমরা অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে অন্ধ হইয়া থাকিলেও তাঁদের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁদের কিছু আসিয়া না গেলেও আমাদের যে বিশেষ আসিয়া যাইতেছে তাহা আজ আমরা প্রাণে মনে অনুভব করিতেছি। এই বিপুল বিস্তৃত অজ্ঞতার হাত হইতে আমাদিগকে বাঁচিতেই হইবে। আমাদের আপামর সাধারণের উন্নতির জন্য আমাদিগকে এখন এমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও চেতনা লইয়া জাগিয়া উঠিতে হইবে যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার ন্যায্য দাবীর সমক্ষে শাসকের অন্যায় ঔদাসীন্য কুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। সমস্ত ভারতবর্ষ ত দূরের কথা, আমাদের বাংলা দেশ অপেক্ষাও আকারে ছোট ইউরোপের সুইডেন দেশের শিক্ষা কত ব্যাপক ও উন্নত তাহা দেখিলেই আমাদের অবস্থা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

সুইডেনের শিক্ষার স্বরূপটিকে অল্প কথায় বুঝাইতে হইলে এই বলিতে হয় যে সেখানকার শিক্ষার মূল কথা পদার্থ-জ্ঞান ও মৌলিক চিন্তার উন্নতি-সাধন; আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই জ্ঞান ও চিন্তাকে বস্তু-সমবায়ে বুঝাইয়া দেওয়া। সর্ব্বাঙ্গীন উচ্চশিক্ষা সুইডেনে খুব আদৃত। শিক্ষা বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতে আমাদের শাসকসম্প্রদায় যেমনি কাতর জনসাধারণও অধিকাংশই অক্ষম বলিয়া তেমনি কাতর। এ বিষয়ে সুইডেনে কিন্তু উভয় পক্ষেরই বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। দেশের বিস্তৃতির তুলনায় সুইডেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সেখানকার সু-প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিও সংখ্যায় কম নয়। এখানকার যুবকরা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় খুব মনোযোগী। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুইডেন যে-জ্ঞানলাভ করিয়াছে তার জন্য অনেকদিন হইতে ইউরোপের মধ্যে তার বেশ খ্যাতি আছে। শুধুই প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নহে, বর্ত্তমানে সুইডেন একটি সকল বিজ্ঞানের অধ্যয়নের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার শব্দ-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ধর্ম্মযাজকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় সুইডেনের নানাস্থানের লোকে লিখিতে পড়িতে শিখে। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এক আইন অনুসারে দেশের লোককে সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিবার আয়োজন ও

সুইডেনের স্কুলের একটি ক্লাস-ঘর।

ও বস্তুগত শিক্ষা প্রদান করা। রাজ-সরকার হইতে বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি গঠিত আছে, তার কাজ বিদ্যালয়-সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ানো।

শিক্ষক গঠনের জন্য সরকার হইতে শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী শিক্ষককে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে হয়; তবে তাঁরা বিদ্যালয়ে কাজ পান। বর্ত্তমানে এইরূপ শিক্ষাগার সুইডেনে পনেরোটি স্থাপিত হইয়াছে। তাদের মধ্যে নয়টি পুরুষ-শিক্ষকদের জন্য ও ছয়টি স্ত্রী-শিক্ষকদের জন্য। ইহা ছাড়া স্ত্রী-শিক্ষকদের আরো দুইটি বেসরকারী

চেষ্টা আরম্ভ হয়। এইরূপে ধর্ম্ম-প্রচারকদের হাত হইতে শাসন-সম্প্রদায়ের হাতে শিক্ষার ভার চলিয়া আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা মন্দগতিতে অগ্রসর হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে। নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে এবং শিক্ষাকে অবশ্যশিক্ষনীয় করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একটি আইন জারি হয়,—তাহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে কয়েকটি গ্রামের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং তাহাতে একটি করিয়া শিক্ষক রাজ-বিভাগ হইতে নিযুক্ত হইবে। এখন আবার আইন হইয়াছে যে প্রয়োজন অনুযায়ী আরো কাছাকাছি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হইবে। ছোট ছোট বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য এখন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে। এই উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কাজ—ছাত্রদিগকে সামাজিক

সুইডেনের স্কুলের কারিগরী ক্লাস।

পরীক্ষাগার আছে। এই পরীক্ষাগারগুলির পঠনীয় বিষয় শেষ করিতে চার বৎসর লাগে। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়—ধর্ম্ম-তত্ত্ব, দেশীয় ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জীব-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থ-নীতি, বিদেশী ভাষা (জর্ম্মন বা ইংরেজী), উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, গুরুগিরি, অঙ্কন, সঙ্গীত, উদ্যান-পালন, সুয়েড্ বা হাতের

কাজ, ব্যায়াম, ক্রীড়া ইত্যাদি। প্রত্যেক আগারে একটি চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। তিনি স্বাস্থ্য বা শারীরিক উন্নতি সাধনে যত্নবান। মুখে-মুখে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর কাজ।

সুইডেনের স্কুলের ব্যায়াম-ঘর।

বাধ্য করিয়া শিক্ষা দিবার আইন থাকাতে সুইডেনে প্রত্যেক গৃহের পিতামাতা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য। প্রত্যেক বাড়ী হইতে ছেলে-মেয়েরা পড়িতে আসিতেছে কি না তাহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে দেখিতে হয়। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে পড়িবার বয়স সাত

সুইডেনের স্কুলের ছেলেমেয়ের পরীক্ষার পর ছুটি।

হইতে চৌদ্দ বৎসর। যেসব গরীব পিতামাতা বা অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণে অক্ষম, চার্চ্চ হইতে সে-সব ছেলে-মেয়েদের পোষণের ব্যবস্থা আছে। যে-সব ছেলে দুষ্ট-প্রকৃতির ও যারা সহপাঠীদের স্বভাব খারাপ করিতে পারে তাদের সংশোধনের জন্য আলাদা বিদ্যালয় আছে, সেখানে তাদের লইয়া যাওয়া হয়। এই-সব ছেলেদের সেখানে আট মাস স্বভাব সংশোধনের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যায়াম করা ও খেলার ব্যবস্থা ত আছেই, তা ছাড়া দাঁত পরিষ্কার রাখা এবং নিত্য স্নান করাও তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্তর্গত। দরিদ্র পিতামাতার ছেলেদের সু-খাদ্য দেওয়া হয়। বিদ্যালয়েই স্নানের ঘর থাকে,—ছেলেরা গরম জলে স্নান করে এবং শুশ্রূষাকারীরা তাদের দেহ পরিষ্কার করিয়া দেয়; তাদের কাপড়-চোপড় গরম বাষ্পে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। বড় বড় সহরে বিদ্যালয়েই সমস্ত ছাত্রের আহারের ব্যবস্থা থাকে। ষ্টকহল্‌ম সহরে আবার কেবল দুপুরের নয়, সকালের খাবার অবধি দেওয়া হয়।

সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা ছুটির সময় ছাত্রদের পরিচর্য্যা। বড় বড় অবকাশে রুগ্ন ও কৃশ ছাত্রদের সহরের বাহিরে গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। সে-কাজের ভার লইয়াছেন কতকগুলি বেসরকারী সমিতি। এক-একটি দল গড়িয়া ছাত্রদের লইয়া যাওয়া হয়, সঙ্গে থাকেন একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী। এক-একটি দলে সাধারণতঃ ত্রিশটি করিয়া ছাত্র থাকে। তাদের পরিচর্য্যার জন্যও সঙ্গে দু চার জন লোক থাকে। এজন্য, হয় সমিতির নির্দ্দিষ্ট

গৃহ ব্যবহৃত হয় কিম্বা বনের ধারে বা সমুদ্রের তীরে কোন বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। ছাত্ররা সেখানে পুষ্টিকর খাবার পায়, খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া বেড়ায় ও সমুদ্রে স্নান করে। সময়ে খাওয়া, সময়ে বেড়ানো, সময়ে খেলাকরা ও সময়ে শোওয়া—এইসবের দিকে শিক্ষকরা দৃষ্টি রাখেন। তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য উন্নত ত হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে সময়-নিষ্ঠতা ও সু-অভ্যাস শিক্ষা পায়।

সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুইডেনে ব্যবস্থার অভাব নাই। বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠাগার আছে। তাহা হইতে সাধারণকে বই পড়িতে দেওয়া হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহল্‌ম সহরে ষোলটি এইরূপ পাঠাগার ছিল,—তাতে সর্ব্বসমেত বই ছিল ৪৩ হাজার।

হাতের কাজ বা স্লয়েড শিক্ষা সুইডেনের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। এ প্রণালী ইউরোপের মধ্যে সুইডেনেই প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেবল পুঁথি পড়িয়া আর পুঁথি উল্‌টাইয়া যে কি ফল তাহা আমরা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। পড়িয়া পড়িয়া মন বোঝাই করিতে লাগিলাম, অথচ কার্য্যতঃ কিছু করিতে হইলেই আমাদের চক্ষু স্থির! হাতে-কলমে কাজ শিখানোর পক্ষে সুইডেনের স্লয়েড-পদ্ধতি একেবারে অভিনব। সেখানকার শিক্ষকদের টেবিল চেয়ার বাক্স প্রভৃতি তৈরী করিতে শিখিতে হয়। সমস্ত সাধারণ বিদ্যালয়েই এ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার দুইটি ধারা আছে, এক-একটি শিখিতে দেড় মাস লাগে। ধাতু হইতে নানা জিনিষ তৈরী করা, খেলার সর্দ্দার বা শিক্ষক হওয়া, রান্নায় ও ব্যায়ামে দক্ষ হওয়া, অঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠন করিতে পারা, বাগান পরিচর্য্যা করা—এই-সমস্ত স্লয়েড শিক্ষার অঙ্গ। শীতকালে সূচের কাজ ও বুনন কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্ররা এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। অপর লোককে বৎসরে দিতে হয় ২১৲ টাকা; আর বিদেশী শিক্ষার্থীদের দিতে হয় ৪২৲ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দেওয়া হয় ও আলোচনা করা হয়। অনেক বিদ্যালয়ে কার্ডবোর্ড ও ধাতুর জিনিষ এবং কাঠে মূর্ত্তি কোঁদাই প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্লয়েড পদ্ধতির উদ্দেশ্য যে কেবল সূত্রধর গড়িয়া তোলা তাহা নহে; ইহার উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি প্রদান করা, তাদের শৃঙ্খলা ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় শিক্ষা দেওয়া,—যারা যাতে পদার্থ ভাল করিয়া দেখিতে ও চিনিতে শিখে হাতকে তার প্রকৃত কাজে ব্যবহার করিতে পারে, কোন কাজকেই হীন না মনে করে, হাতের কাজকেও অবহেলা না করে; আর এইসঙ্গে পুস্তকের একপেশে বিদ্যার সহিত দৈহিক উন্নতির যাতে সামঞ্জস্য ঘটে। ছাত্ররা যেমন-তেমন করিয়া এ সব জিনিষ তৈরী করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে না। তাদের কাজ সু-কৃত ও সুন্দর হওয়া চাই। তাদের তৈরী-জিনিষ গৃহেও যেন ব্যবহার করা যায়। ইহাতেই ছাত্রদের এসব কাজে মনোযোগের আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহের সম্বন্ধ সংযুক্ত হইয়া উঠে। এইরূপে স্লয়েড বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে আপনাদের মৌলিক ভাবগুলি কার্য্যে প্রকাশ করিতে পারে তারই অবসর দেওয়া হয় এবং তারা দেখিতে ও ভাবিতে শেখে। ভাবের বদলে বস্তুকে সাম্‌নে ধরিয়া, ব্যাখ্যার বদলে কাজে স্পষ্ট করিয়া দেখানো,—ইহাতে ছেলেরা আপনা হইতেই ভাবিতে শেখে ও নিজেদের চিন্তাকে কার্য্যে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয়। এ শিক্ষা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত, গড্ডলিকা-প্রবাহের মধ্যে সায় দিয়া যাওয়া নয়। সুইডেনের এই স্লয়েড-পদ্ধতি বাস্তবিকই সুন্দর ও স্বভাবের অনুবর্ত্তী।

সাধারণ লোকদের শিক্ষার জন্য পাঠাগারের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইসব পাঠাগারে যে-সব বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হয় তাহাও উল্লেখযোগ্য। রাজসরকার হইতে এবং সাধারণ হইতে লোকশিক্ষার জন্য অর্থ-সাহায্য ও বিধি-ব্যবস্থা আছে। সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সামাজিকতা শিক্ষা ও পৌরকর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়, আর তাদের ইচ্ছা ও স্বাতন্ত্র্য-অনুযায়ী কাজ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। মনুষ্য-জাতির সেবা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়। তবে এ-সব শিক্ষার মূলে থাকে দেশের প্রীতি উদ্বোধন, এবং তার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন, তার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, তার আধ্যাত্মিক ও আর্থিক উন্নতি, প্রভৃতির প্রতি লোকের কৌতূহল উদ্বুদ্ধ করা।

বর্ত্তমানে সুইডেনে ৪৮টি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় আছে, তাদের অধিকাংশই কিন্তু সহরের বাহিরে। সেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ নাই এবং সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। সেখানে নানা বিষয় পড়িতে হয়, বক্তৃতা শুনিতে হয়, কৃষিবিদ্যা শিখিতে হয়। স্ত্রীলোকদের শিক্ষনীয় বিষয়—রন্ধনকার্য্য, ফল পাকানো ও রক্ষা করা, এবং নানা রকমের শিল্পকার্য্য। ছাত্রীরা এইসব বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া নিজেরা একটি সমিতি গঠিত করে, এবং বক্তৃতা শুনিয়া ও সাধারণের হিতকর বিষয়ে আলোচনা করিয়া সময় কাটায়। অনেক বিদ্যালয়ে গৃহ-রক্ষা ও গৃহ-পালন সম্বন্ধে বড় বড় লোকে বক্তৃতা দেন, তাহাতে পুরানো ছাত্ররা, সাধারণ লোক ও শিক্ষকরা যোগ দেন। ইহা ছাড়া কৃষকদের ও কৃষকপত্নীদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যাবেলা পড়াইবার বন্দোবস্তও আছে। সাধারণের হিতার্থে সুন্দর সুন্দর কৌতুককর বক্তৃতা দেওয়া হয়। তাহাতে বস্তুবিদ্যা, নূতন ভাব, নূতন সংবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এ-সব বক্তৃতার অনেক কেন্দ্র আছে। বৎসরে বারো হাজার বক্তৃতা ন্যূনপক্ষে হইবেই। রাজসরকার হইতে এজন্য বাৎসরিক ব্যয় হয় ২২৫০০০৲ টাকা। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া লোককে নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই বৃহৎ ব্যয়। আর আমাদের দেশে রাজসরকার শিক্ষার জন্য জনপ্রতি এক আনা মাত্র খরচ করেন!

এইবার সাধারণ পাঠাগারের কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। বড় বড় বক্তৃতা-কেন্দ্রের সহিত পাঠাগারগুলি সংশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রাজসরকার পাঠাগারগুলিতে বই কিনিবার জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য করেন। বিনা পয়সায় সাধারণে সেখান হইতে বই পড়িতে পায়, কিছু জামিন দিতে হয় মাত্র। সাধারণ বিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালক সমিতি কর্ত্তৃক লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং পাঠ্য-সম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সাধারণে জানিতে চাহিলে তাহা বলিয়া দিতে তাঁরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও চেষ্টিত থাকেন।

ক্ষুদ্র দেশ সুইডেনের শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিতে করিতে দুঃখে ও ক্ষোভে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে আমাদের ভাগ্যহীন বিপুলকায় দেশ আজ অজ্ঞতার কী গভীরতায় ডুবিয়া রহিয়াছে! আমাদের রাজসরকার আমাদের অর্থ আমাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেন না; এজন্য তাঁদের কাছে কৃপাভিক্ষা করিতে আমরা আর প্রস্তুত নহি, আমাদের অর্থের উপর আমাদের দাবী আমরা জানাইতে চাহি।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

আমেরিকায় ভারত-শিল্প

আমাদের শিল্পকলার প্রতি আমাদের তেমন মমতা না থাকিলেও বিদেশীদের কাছে তার যথেষ্ট আদর আছে। সুদূর আমেরিকার সূক্ষ্মশিল্পের মিউজিয়ামের বিবরণীতে গান্ধারের গ্রীসীয়-বৌদ্ধ প্রস্তরমূর্ত্তির বিবরণ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে

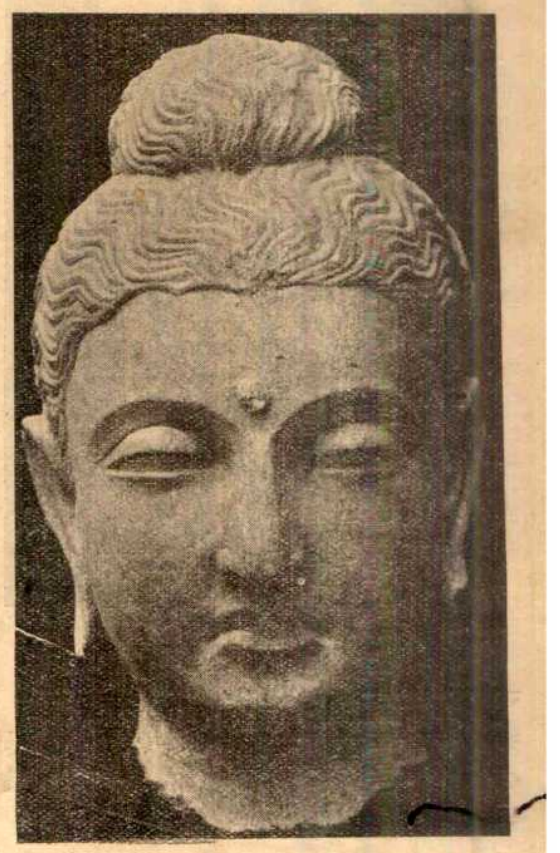

বুদ্ধদেবের মাথা।
গ্রীক-ভারত মিশ্র পদ্ধতির গান্ধার শিল্প (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)।
মার্কিন রাজ্যের বষ্টনের চারুশিল্পের মিউজিয়ামে আছে।

প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রীসীয়-বৌদ্ধ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত বুদ্ধের একটি মস্তক ডাক্তার ডেন্‌ম্যান রস্ এই মিউজিয়ামে প্রদান করিয়াছেন। মস্তকটি প্রায় আস্ত এবং গান্ধার শিল্প-পদ্ধতির যে লক্ষণ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের সংমিশ্রণ—তাহা ইহাতে খুব প্রস্ফুট। মুখের রেখা ও আকৃতি সুসমঞ্জস, ভাব কোমল এবং কোঁদাই ও গঠন সু-কৃত। মুখটির মোটামুটি ভাব দীপ্ত হইলেও স্ত্রীজনোচিত এবং শক্তিহীন। মুখটিতে গঠনের চাতুর্য্য এবং ভাবব্যঞ্জনার অভাব। গান্ধারের এই ভাস্কর্য্য যে অশোকের প্রভাবে গঠিত নয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গুপ্ত যুগের যে-সমস্ত বুদ্ধের

বুদ্ধদেবের মাথা—পাশ-ফেরানো।

মস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা গান্ধার যুগের মূর্ত্তি যথেষ্ট দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। এমন কি পরবর্ত্তী যুগের শিল্প-কলায় যে দক্ষতা দেখা যায় গান্ধারীয় শিল্পীর কাজে তার অভাব।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই—প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি এই গান্ধারের পদ্ধতিরই। খ্রীষ্টের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায় না, কেবল কতকগুলি

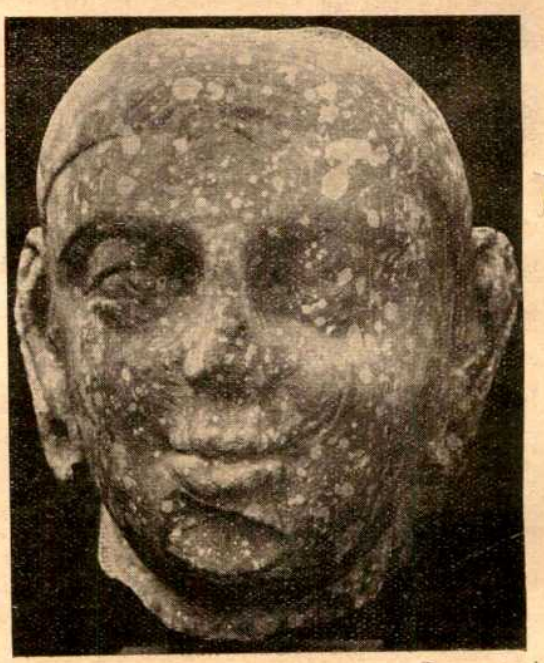

বুদ্ধদেবের মাথা।
গুপ্ত সময়ের—৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীর।
মথুরা শিল্পপদ্ধতির নমুনা।

প্রতীকের মধ্যে বুদ্ধের অস্তিত্ব আছে। ইন্দোশীথীয় রাজাদের সময় যে গান্ধার-কলার চর্চ্চা হয় এবং পশ্চিম এসিয়া হইতে আনীত শিল্পীদের ভাস্কর্য্যের মধ্যে প্রচুর গ্রীক ভাস্কর্য্যরীতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাদেশিক রোমীয় কলার বৌদ্ধ প্রতিরূপ বলা যাইতেও পারে। কতকগুলি মূর্ত্তি পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে পাশ্চাত্য প্রভাব এত বেশী বিদ্যমান যে ফরাসী পণ্ডিত ফুশে এই ভাস্কর্য্যের মূলে গ্রীসের প্রভাব আছে বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাহাতে যে ভারতীয় ভাবের অভাব তাহা স্বীকার করা যায় না। কেননা বুদ্ধের যে-মূর্ত্তিটির কথা আমরা পূর্ব্বে বলিলাম তাতে যে ধ্যান-তন্ময়তা ও আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠতার পরিচয় রহিয়াছে তাহা ত সম্পূর্ণ ভারতীয় জিনিষ।

আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তিটির মধ্যে বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের যে-সব বিশেষত্ব লক্ষিত হয় তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই উষ্ণীষের আলোচনা করা যাক্। আবিষ্কৃত সমস্ত

বৌদ্ধ মূর্ত্তিতেই এই উষ্ণীষ বিদ্যমান, ইহা সেকালের একটি দৈহিক লক্ষণ বলিয়া গণ্য ছিল। মূর্ত্তিতে এই উষ্ণীষ কখন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মে। উষ্ণীষ অর্থে আগে মাথার উপর উচ্চ ব্রহ্মতালু বা চুলের গ্রন্থি বুঝাইত না, পাগ্‌ড়ি বুঝাইত। কোনও শিশুর মাথা যদি জন্মাবধি পাগ্‌ড়ির আকারের হইত তাহা হইলে জ্যোতিষীরা স্থির করিতেন যে সে-শিশু ভবিষ্যতে মহাপুরুষ হইবেন।

বিষ্ণুমূর্ত্তি।
গুপ্ত সময়ের—৫ম শতাব্দীর।

এ-সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ফরাসী পণ্ডিত ফুশের মত এই যে গান্ধার ভাস্করেরা বুদ্ধের মস্তক একেবারে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত মুণ্ডিতকেশ করিয়া গড়ে নাই, ভারতীয় রীতি অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের মত ঝুঁটি রাখিয়াছে। কিছুকাল পরে বৌদ্ধ ভাস্করদের কাছে এই রীতি বিসদৃশ লাগে, এবং চুল রাখা ও না-রাখা এই দুইর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এই সামঞ্জস্য ছোট ছোট দক্ষিণাবর্ত্ত কোঁকড়া চুলে পরিণত হয়; ইহাও মহাপুরুষের একটি লক্ষণ বলিয়া

বুদ্ধদেবের মাথা।
গুপ্ত সময়ের।
ডাক্তার কুমারস্বামীর সংগ্রহ।

বিবেচিত। এবং চুলের এইরূপ প্রচলন প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একচেটিয়া। এইরূপ প্রচলন হইতে ক্রমে ক্রমে খোঁপার আকার ও তাহা হইতে এই উষ্ণীষ আসিয়াছে। ফুশের মতে গান্ধার কলায় এরূপ উষ্ণীষ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহাও সত্য যে অনেক গান্ধার-মূর্ত্তির মস্তকে কেবল মাত্র একটি শিখা বা ঝুঁটি দেখা যায়। কিন্তু ফুশের অভিমত সব জায়গায় সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, কেননা এমন অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কোঁকড়া চুল উষ্ণীষের অপেক্ষা বড় হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। উষ্ণীষ বলিতে পরে যাহা বুঝাইত ভাস্করেরা এ-সব স্থলে যে তাহাই অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। উষ্ণীষের যে প্রচলন ফুশে পরযুগের বলিয়া মনে করেন তাহা গান্ধারে পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। খুব সম্ভবতঃ উষ্ণীষ স্থাপনের প্রথা বুদ্ধ-

বোধিসত্ত্বের মাথা।
মধ্যযুগের—১০ম শতাব্দীর।

মূর্ত্তির একটি প্রাচীনতম লক্ষণ। আর যে বুদ্ধমস্তক লইয়া আলোচনা হইতেছে তাহাতেই ইহা স্পষ্ট বিদ্যমান যে গান্ধারে উষ্ণীষের প্রচলন পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই মস্তকটির ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে ঊর্ণা বা সংযুক্ত রোম রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঊর্ণা ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তিতে টিপের ন্যায় একটি উচ্চ বৃত্তাকার ধারণ করিয়াছে, যেন সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের একটি সাধন। কোন কোন মূর্ত্তিতে এই ঊর্ণার জায়গায় দামী উজ্জ্বল পাথর বসানো হয়, যেমন পুরীর জগন্নাথমূর্ত্তির কপালে আছে। ভারতের অনেক মেয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কপালে বৃত্তাকার টিপ বা টিক্‌লি পরে ও শিব প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মাথায় যে তৃতীয় চক্ষু দেখা যায় তাহার মূলে বোধ হয় এই ঊর্ণার প্রচলন।

এই বুদ্ধমস্তকটির আর-একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার কানের তলাকার পাতা লম্বা করিয়া ঝোলানো। ইহাতে শিল্পীর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই। এখনকার কালেও ভারতের অনেক জায়গায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক কানে এমন ভারি মাকড়ি পরে যে কান তলার দিকে ঝুলিয়া যায়। সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হইবার আগে এরূপ মাকড়ি নিশ্চয়ই পরিতেন। তাই কান ঝুলিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

বষ্টনের মিউজিয়ামে গুপ্ত যুগের কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তিও সংগৃহীত আছে। প্রথম—একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি, ডাক্তার ডেনম্যান রস্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। দ্বিতীয়—আর-একটি বুদ্ধ মস্তক, শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। বুদ্ধমস্তকটিতে

অপ্সরার মাথা।
মধ্যযুগের—১০ম বা ১১শ শতাব্দীর।

মথুরার ভাস্কর্য্যের প্রভাব বর্ত্তমান। ইহা বেলে পাথরে তৈরী এবং কতকগুলি কালো কালো চিহ্ন-যুক্ত। ইহার নাক ও গাল নষ্ট হইয়া গেলেও, যে গুপ্ত-ভাস্কর্য্য সময়ে সময়ে গ্রীসীয় কলার সমকক্ষ, তার শক্তিমত্তার পরিচয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। গুপ্ত যুগ সাধারণতঃ খৃষ্টের পরে তিন শতাব্দী হইতে ছয় শতাব্দীর মধ্যে ধরা যাইতে পারে। এই মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর, বা তার কিছু আগেকার। ইহাতে উষ্ণীষের কোন গোলযোগ নাই, চুল সাধাসিধা ধরণে তৈরী।

তারপর বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা। ইহার তিনটি মস্তক,—

মাঝেরটি মানুষের, তান-দিকেরটি সিংহের এবং বাঁ-দিকেরটি শূকরের। মাঝের মাথাটিতে একটি বড় মুকুট, কানে মাকড়ি গলায় হার ও হাতে বালা আছে। বাঁ কাঁধের উপর একটি সরু হার, সেটি বোধ হয় যজ্ঞোপবীতের চিহ্ন। পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীতের প্রচলন ছিল না, পরে হয়। পরের মূর্ত্তিতেই তাই ইহা বর্ত্তমান। পূর্ব্বে বিশিষ্ট লোকেরা, বিশেষতঃ যাঁরা সমাজের মঙ্গলকাজে ব্রতী থাকিতেন তাঁরা, কাঁধে উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। এই উত্তরীয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইত আবার তিনটি কাজে—দেবপূজা, পিতৃসেবা বা তর্পণ আর অতিথি অভ্যর্থনার সময়। যাঁরা প্রায় সব সময়েই সৎ কাজে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁরা অনবরত এই উত্তরীয়ের ভার বহন করা বোধ হয় সুবিধাজনক বোধ করিলেন না। তাই উত্তরীয়ের বদলে মন্ত্রপূত করিয়া কয়েকগাছি সূতা তাঁরা ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পরে উপবীতের প্রচলন হয়। অগে-কার ব্রাহ্মণেরা যে সর্ব্বদাই উপবীতী থাকিতেন না তার প্রমাণ মাণিকচন্দ্রের গান গোপীচন্দ্রের গান ময়নামতীর গান প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পুস্তকসকলে ইহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। আমাদের পুরানো মূর্ত্তিতে উপবীতের অভাব ও দশম শতাব্দীর পরে যে-সব মূর্ত্তি গঠিত হয় তাতে উপবীতের প্রচলন দেখা যায়। সিংহলে অন্তল ও বজ্রপাণির মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা এ-বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। প্রাচীন দেবতাদের ও রাজাদের মূর্ত্তিতে উপবীতের বদলে সোনার হারের প্রচলন দেখা যায়; আর সন্ন্যাসীদের গলায় কেবল সূতার গ্রন্থি। যজ্ঞোপবীতের ব্রহ্মগ্রন্থি হারের থামি হইয়া উঠিয়াছিল।

মূর্ত্তিটির অন্যান্য গহনার মধ্যে দুই হাতের উপরদিকে একটি করিয়া ভারি রত্ন-খচিত হার। ইহা বোধ হয় বন-মালা পরিধান নির্দ্দেশ করিতেছে, বিশেষতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণের মথুরার প্রভাব ইহাতে বিদ্যমান। মূর্ত্তিটির চার হাত। কোমর হইতে নীচের দিকটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এই রকমের বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং কাশ্মীর ও বুরু হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত বৌদ্ধ দেবতা মরীচির (যিনি উদীয়মান সূর্য্যের প্রতিনিধি) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মরীচিরও তিনটি মস্তক, তার মধ্যে একটি শূকরের মুখ বিষ্ণুর বরাহ-অবতারত্ব এবং সিংহমুখ নরসিংহ-অবতারত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। কিম্বা তিনটি মুখ সূর্য্যের প্রাভাতিক, মাধ্যাহ্নিক ও আপরাহ্নিক তিন মূর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। কেননা সূর্য্যের সহিত বিষ্ণু দেবতার ঘনিষ্ঠতা খুব নিকট—বেদে বিষ্ণু সূর্য্যেরই উপর নাম ছিল।

মূর্ত্তিটির কাঁধ বিস্তৃত ও কোমর সিংহের মত—সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে গঠিত। দেহ মাংসবহুল, দৃঢ় ও সুগঠিত। গুপ্তযুগের অন্যান্য প্রভাবও ইহাতে বিদ্যমান। কলা এবং প্রতিমা-নির্ম্মাণ-বিদ্যার ইহা একটি চূড়ান্ত উদাহরণ।

ডেন্‌ম্যান রস্ সাহেবের প্রদত্ত বুদ্ধ-মস্তকটি সম্ভবতঃ বিহার কিম্বা বাংলা দেশে দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহার মাথায় ছোট ছোট কোঁকড়া চুল, কিন্তু মাথার অন্যান্য ভূষণের পারিপাট্য দেখিলে ইহাকে বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয় না, বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে (অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে) ভারতীয় ভাস্কর্য্য আপনার পূর্ব্ব গৌরব ও উদ্দীপনা হারাইতে বসিয়াছিল, কেবল প্রতীক-প্রতিমায় তার বিকাশ হইতেছিল। এইরূপ খর্ব্বতা সত্ত্বেও বর্ত্তমান বুদ্ধ-মস্তকটি দেখিলে বুঝা যায় যে মহাযুগের শিল্পীরা ধর্ম্মাত্মা লোকের প্রদীপ্ত মূর্ত্তি গড়িতে তখনও দক্ষ ছিল। মস্তকটির কয়েক স্থান নষ্ট হইলেও তাতে কারুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার ভাব সুস্পষ্ট।

বষ্টন মিউজিয়ামে আনন্দ-কুমারস্বামীর প্রদত্ত একটি ভগ্ন অপ্সরা-মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ইহার মুখটি যৌবনশ্রী-পূর্ণ, শান্ত ও ভরাট; মাথার চুল পরিপাটি রকমে সজ্জিত, মাঝে মাঝে ফুল বসানো; হাত দুটি মাথার উপরে উত্তোলিত যুক্ত—প্রেমপ্রকাশের পরিচায়ক। নবম বা দশম শতাব্দীর স্ত্রী মূর্ত্তির এবং বিশ্বকর্ম্মায় প্রকাশিত আনন্দ-কুমারস্বামী কর্ত্তৃক বিবৃত গোয়ালিয়রের স্ত্রী-মূর্ত্তির সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এটি সম্ভবতঃ দশম বা একাদশ শতাব্দীতে গঠিত, এবং সম্ভবত পূজ্য দেব-মূর্ত্তি নহে, বরং কোনও দেব-মন্দিরের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।

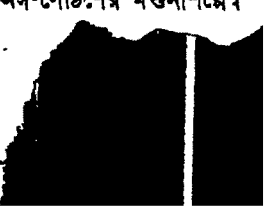

মাধবী

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন দিনের স্রোতে,
এসে হেসেই বলে, যাই যাই যাই।
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে—
না, না, না;
নাচে তাই, তাই, তাই।

আকাশের তারা বলে তারে—
তুমি এস গগন-পারে,
তোমায় চাই চাই চাই।
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে—
না, না, না;
নাচে তাই, তাই, তাই।

বাতাস দখিন হতে আসে,
ফেরে তারি পাশে পাশে,
বলে আয় আয় আয়।
বলে নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়।
বলে পূর্ণ শশির রাতি
ক্রমে হবে মলিন ভাতি,
সময় নাই নাই নাই।
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে—
না, না, না;
নাচে তাই, তাই, তাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

"বরিশাল গান্।"

"বরিশাল গান্,"—এই নাম লিখিতে লজ্জা হইতেছে। দেশের লোক দেশে বসিয়া যে শব্দ শুনিয়া থাকে, তাহার দেশী নাম নাই। বরিশাল-নিবাসী দুই চারি শিক্ষিত লোককে দেশী নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। দেশী নাম নাই! ইহাতে বুঝিতেছি, আমরা কেমন চোখ-কান বুজাইয়া, আমার দেশ, আমার দেশ, বলিয়া থাকি!

বহুকাল পূর্বে, কটকে আসিবার বৎসর কয়েক পরে, মধ্যে মধ্যে আমি রাত্রে দূরে কামানের গুড়ুম্ শব্দের মতন এক শব্দ শুনিতে পাইতাম। কিসের শব্দ? বিবাহে আতসবাজির বস্ ফোটার? তখন কটকে একদল সেনা থাকিত; তাহাদের বন্দুকের আওয়াজ? কামানের? কিন্তু তত রাত্রে কেন বন্দুক বা কামান ছোঁড়া হইবে? কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না। তখন "বরিশাল গান্" ব্যাপারও জানিতাম না। কটকের দক্ষিণ পার্শ্বে কাঠজুড়ী নামক এক নদী আছে। গ্রীষ্মে প্রায় শুখাইয়া যায়, বর্ষায় পুরিয়া উঠে। এই নদীর পাষাণ-বাঁধা বাঁধে আমাদের বেড়াইবার জায়গা। এই বাঁধে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার পর গুড়ুম্ ধ্বনি অনেকবার শুনিতাম। তখন নদী কূলে কূলে ভরা থাকিত। সে ধ্বনি কিসের, কোথা হইতে আসে, তাহা এক ইঞ্জিনিয়রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কটক হইতে আট নয় মাইল দূরে দক্ষিণপশ্চিমে নরাজ নামক স্থানে পাহাড় আছে। সে পাহাড়ের পাথর কাটাইয়া বাড়ী ও সাঁকো করিবার পাথর আনা হইত। ইঞ্জিনিয়র বলিয়াছিলেন, পাথর কাটাইবার ধ্বনি। উত্তরে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। কারণ বর্ষাকাল সন্ধ্যার পর পাথর কাটাইবার হেতু কি? আর যখন গভীর রাত্রে, কখনও বা ভোরের সময়, সে ধ্বনি শুনিয়াছি, তখন এমন উত্তর বিশ্বাস হইত না। পরে "বরিশাল গানে"র কথা পড়ি। আমার মনে হইয়াছিল, এই কটকী গুড়ুম্, বরিশালী গুড়ুমের ভাই হইবে। কত বাঙ্গালী ও ওড়িয়া ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাঁহারা বলিতেন, কই কিছু শুনি নাই। কদাচিৎ কেহ বলিতেন, হাঁ শুনিয়াছি। এই পর্যন্ত। মনে হয় না, পরে পরে থাকিয়া থাকিয়া দুই-তিনবার শুনিয়াছি। এমন ঘটে নাই, সকর্ণ শিক্ষিতের নিকট আছি, একবার শুনিয়া আবার শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উৎকর্ণ থাকিতে বলি। ফলে, কাহাকেও শোনাইতে পারি নাই।

গত মাসের প্রবাসীর পাতা উল্টাইতে গিয়া "বরিশাল গান্" মনে হইল। মনে হইবার বিশেষ কারণ, গত ফাল্গুন মাসের শেষ দুই সপ্তাহ গুড়ুম্ শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি। দিনের বেলা কখনও শুনি নাই। লোকের কোলাহলে দূরাগত ক্ষীণ ধ্বনি শুনিবার কথা নহে। কিন্তু সন্ধ্যার একটু পরে কাঠজুড়ী নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিয়াছি। রাত্রি ৯টার সময় শুনিয়াছি। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাতে ১টা ২টার সময় দুতলায় শুনিয়াছি, ভোর ৪টা ৫টার সময়েও শুনিয়াছি, স-বাত রাত্রে শুনিয়াছি। নির্বাত রাত্রেও শুনিয়াছি। প্রায়ই একটি বার, কদাচিৎ ১৫।২০ মিনিট পরে আর-একবার। সকল বারেই মনে হইয়াছে, দক্ষিণ-দিক্ হইতে ধ্বনিটা আসিয়াছে, সর্বদা ঠিক দক্ষিণ নহে, দক্ষিণ হইতে পূর্ব দিকে ২৫।৩০ অংশের মধ্যে। সে দিকে সমুদ্র, ৪০।৫০ মাইল দূরে। কিন্তু এক-একবার কেন? সকল সময় নয় কেন? বর্ষাকালে যখন নদীর সহিত সমুদ্রের যোগ পূর্ণভাবে ঘটে, তখন সাগরধ্বনি স্পষ্ট শুনিবার কথা।

কয়েক বৎসর পরে একবার দুই মাস পুরীতে ছিলাম। সমুদ্রের তালে তালে গর্জ্জন দিবা-রাত্র শুনিতাম। একবার কিন্তু ঘরে গিয়াছিলাম। সেখানে কটকের গুড়ুম স্পষ্ট ও উচ্চ শুনিতে পাই। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নিয়ত কিন্তু ক্ষীণ গর্জ্জনের মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের ধ্বনি পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছিলাম। ইহা এমন জানা পড়িয়াছিল যে, একবার শুনিয়া আর-একবার শুনিব মনে করিয়া বসিয়া থাকিতাম। পুরীর সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া এই উচ্ছ্বাসের ধ্বনি বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু দেখিতাম, তটের দিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে, সমুদ্র-দিকে হটিয়া যাইতেছে, কদাচিৎ সম্পূর্ণ পশ্চাৎগত হইতে না হইতে অগ্রগামী তরঙ্গ আসিয়া পড়ে। তখন দুই বিমুখী তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে জলরাশি শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া ভাসিয়া পড়ে। যে উচ্ছ্বাসের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই।

আমার অনুসন্ধান ও অনুমান এইখানেই সমাপ্ত। কিন্তু কটকের গুড়ুম যে উচ্ছ্বাসের ধ্বনি, তাহা মনে হইয়াও হয় নাই। কারণ, তখন "বরিশাল গানের" কথা পড়িয়াছি, সেটা যে এত সহজে ধরা পড়িবে, তাহা কল্পনাতেও আসে নাই। কটকে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইলে হয় ত সে দিকে মন যাইত। কিন্তু আমার এখনও মনে হয়, বিনা বিচারে উচ্ছ্বাসের উহনা (guess) পরিত্যাগ করিয়াছি। তখন অনুসন্ধানে লাগিলে কি করিতাম, বলি। প্রথমে ধ্বনিটার দিক্ নির্ণয়ে বসিতাম। ওড়িষ্যার নানাস্থানের বন্ধুবর্গকে শুনিতে বলিতাম; কখন, ও কোন্ দিক হইতে শুনিয়াছেন, তাহা লিখিয়া রাখিতে বলিতাম। ঘড়ী দেখিয়া সময়ও লিখিতে বলিতাম। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধান ভুলিতে দিতাম না। দুই তিন বৎসর পরে, তাঁহাদের লিখিত দিক্ ও কাল মিলাইয়া, ভূকম্পের কেন্দ্র নির্ণয়ের তুল্য, গুড়ুমের একটা স্থান অনুমান করিতাম। কাজটা যত সোজা মনে করিতেছি, তত হইত না। কারণ বন্ধু হউন, শ্রদ্ধালু হউন, ভূতের বেগার খাটিবার লোক পাওয়া যায় না।

গুড়ুম শব্দ অনিয়ত; কারণটাও অনিয়ত, আকস্মিক। তথাপি ইহার তিনটি মাত্র স্থান হইতে পারে। (১) আবহে, (২) সাগর-তরঙ্গে, (৩) সাগর-তলের ভূস্তরে। আবহে কারণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আবহের গতিকে কখনও শুনি, কখনও শুনি না, এমন বলিলেও আবহে উৎপত্তি বলিতে পারি না। কখনও মনে হয় নাই, শব্দটা উপর হইতে আসিয়াছে, কিংবা নব দিক্ হইতে আসিয়াছে। মনে পড়ে, একবার বর্ষাকালে কাঠজুড়ী তীরে দাঁড়াইয়া বোধ হইল যেন পশ্চিম হইতে, নয়াজের দিক্ হইতে আসিল। কিন্তু তখন ভুলানী, অভিনিবেশ না থাকিলে শব্দের দিক্ নির্ণয় ঠিক হয় না। সাগর-তলের ভূ-স্তরে কারণ থাকিলে ভূমির কম্পন হইবার কথা। ইহার নির্ণয় নিমিত্ত একটা সোজা ধরণের ভূ-কম্প-লেখন যন্ত্র (Seismograph) নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হইত। শব্দের কাল ও দিক্ এবং এই যন্ত্রের লেখ দেখিয়া ভূ-স্তরের বিচলন, বা অবসর্পণ (sliding) কি না, তাহা হয় ত জানিতে পারা যাইত। অবশ্য ভূস্তরের বিচলনও অসম্ভাবিত নহে। বঙ্গসাগরের দহ, এবং উহার উত্তর তটের অস্থিরতা, এরূপ-বিচলনের অনুকূল মনে হয়।

যাহা হউক উহনা ও কল্পনায় কাজ নাই। এ বিষয় কিছুমাত্র জানি না, ইলিয়ট সাহেবের প্রদত্ত পুরস্কারের নিবন্ধও পড়ি নাই। এই অঞ্চলেও যে মধ্যে মধ্যে একপ্রকার অজ্ঞাত শব্দ শুনি, তাহাই জানাইবার নিমিত্ত লিখিলাম। যাহারা এদেশে শুনিতে চান, তাঁহারা মনে রাখিবেন, ঘরে বসিয়া দিনের বেলা শুনিতে পাইবেন না। আমি শুনিয়াছি, রাত্রে, সায়ং হইতে প্রাতঃসন্ধ্যা পর্য্যন্ত, হয় উন্মিশ্লোলা ভূ-তল হইতে, নয় নিস্তব্ধ বিস্তীর্ণ স্থান হইতে। কাঠজুড়ী নদীর বাঁধ হইতে দক্ষিণে দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত ফাঁক। বোধ হয়, এই কারণে সেখানে সন্ধ্যার একটু পরেও শুনিতে পাইয়াছি।

আর এক কথা। মেঘনাদ বলিয়া মেঘনা, না, মেঘবর্ণা বলিয়া মেঘনা? মেঘনাদ ব্যুৎপত্তি ধরিলে কারণ জিজ্ঞাসা চাপিয়া রাখা হইবে। ইতি

পুনশ্চ,

উপরের পত্র লিখিবার পর কটকী গুড়ুম মনে রহিয়াছে। আজ (১৭ চৈত্র, ৩০ মার্চ) ভোর ৫টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে গুড়ুম শব্দ পুনঃপুনঃ শুনিয়াছি। কিন্তু শব্দটা দীর্ঘ। প্রথমে মনে হইয়াছিল, মেঘের গুড়ুগুড়ানি। আকাশে মেঘ ছিল। কাল ও পরশু মেঘগর্জ্জন বৃষ্টি বাত্যা ও বজ্রধ্বনি পুনঃপুনঃ হইয়াছিল। গত রাত্রিও প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল। সবিশেষ শুনিবার নিমিত্ত বিছানা ছাড়িয়া নিকটে কাঠজুড়ী নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বোধহয় পনর ষোল বার শুনিলাম। এতদিন কাহাকেও শোনাইতে পারি নাই। আজ সকালে পাঁচ-ছয় জনকে শোনাইয়াছি। সকলেই প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, দক্ষিণ আকাশে মেঘের শব্দ, কিন্তু পরে তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। সেই এক দিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল। কটকের দক্ষিণে পুরী, সোজাসুজি ৪৬ মাইল। কিন্তু শব্দটা পুরীর দিক হইতে না আসিয়া একটু পূর্ব্বদিক হইতে আসে। কাঠজুড়ী নদী সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। সেই নদীর মুখ কটক হইতে ৫০ মাইল। মনে হয় যেন সেই নদীর মুখের নিকট হইতে শব্দ আসে।

যদি সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের ধ্বনি হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ বাত্যার দিনে শুনি না কেন? আজ কেনই বা শব্দ দীর্ঘ হইল। দিনের মধ্যে অনেকবার এই কথা মনে হইয়াছে। বৈকালে এক পশলা শিল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর আমার পাঠগৃহে বসিয়াছি, আবার গুড়ুম শুনিতে পাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, সকালের মতন দীর্ঘ নহে। আরও আশ্চর্য্য এক গুড়ুমের চারি পাঁচ সেকেণ্ড পরে আর-এক গুড়ুম স্পষ্ট শুনিতে লাগিলাম। কাঠজুড়ী নদীর তীরে কলেজের ৭।৮ জন ছাত্র ছিল। তাহাদিগে শব্দ শুনিতে ও শব্দের দিক আনুমান করিতে বলিয়া একজনকে আমার এক বরিশালী বন্ধুকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইলাম। তাঁহাকে আমার পাঠগৃহে শব্দ শোনাইলাম। মনে করিয়াছিলাম তিনি বরিশালে শোনা শব্দের সহিত মিলাইয়া লইবেন। কিন্তু তাহা হইল না; তিনি বহুকাল পূর্ব্বে বর্ষাকালে বরিশালে শুনিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। ইতি

কটক। চৈত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পচা গাছের আলো।

গত পৌষের প্রবাসীর পঞ্চশস্য মধ্যে 'পচা গাছপালার আশ্চর্য্য আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতা" সম্বন্ধে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃত ব্যাপারটি 'প্রবাসী মারফতে' চিহ্নিত করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ খুব ভাল করিয়াই এই তথ্যটা দিতে পারিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিকজগতে বাঙ্গলা ভাষার তত্ত্বটা আজ এখনও হয় নাই। আমি বিশেষজ্ঞ না হইয়াও যাহা-কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় অনেকের কিছু কৌতূহল মিটিতে পারে।

হুকারের (Sir J. D. Hooker) 'হিমালয়ান্ জর্ণাল্‌স্'এ পচা গাছের আলো সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিতে পারা যায়। একবার দার্জ্জিলিং-এ যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীর কাছাকাছি যে-সব

মধ্যে বর্ষাকালে তিনি প্রায়ই এইরূপ আলো দেখিতেন; এবং মাঝে মাঝে আশ-পাশের লোকেরা তাঁহার নিকট উজ্জ্বল পচা কাঠ পাঠাইয়া দিয়া আলোর কারণ জিজ্ঞাসা করিত। হুকারের মতে ঐ পচা কাঠগুলাতে একরকম 'fungus' জন্মায় এবং তাহার সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় শাখা প্রশাখা বা 'mycelia' পচা কাঠের ভিতরে প্রবেশ করে। এই পচা কাঠের টুক্‌রা ভিজে মাটির উপর পড়িয়া থাকে ও রাত্রিকালে ইহারই 'মাইসিলিয়া' স্থির ভাবে জ্বলে। পচা কাঠে জীবন্ত fungus যে এই আলোর কারণ তাহা অণুবীক্ষণের যুগে সহজেই বুঝা যায়। হুকারও ৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, 'I have observed it (অর্থাৎ পচা কাঠ) occasionally circumscribed by these black lines which are so often seen to bound mycelia on dead wood (Himal. Journ. p. 397). Fungus-এর জীবনী-শক্তি যতদিন সতেজ থাকে ততদিন এইরূপ আলোর জোর কমে না; কিন্তু ঐরূপ পচা কাঠের উপর মদ ঢালিয়া দিলে, আগুনের আঁচ দিলে বা শুকাইয়া ফেলিলে আলো আর দেখিতে পাওয়া যায় না;—কারণ বোধ হয়, এরূপ করিলে fungus-গুলা মরিয়া যায় বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই fungus-এর বিষয়ে হুকার আর কিছু সন্ধান দিয়া যান নাই।

এইরূপ আলো বিকরণ করিবার ক্ষমতা fungi-বংশীয় অনেক উদ্ভিদের আছে। অনেক 'ব্যাঙের ছাতার' কেবল 'ছাতা' হইতেই আলো বাহির হয়; যেমন অ্যাগারিকস্-অলিয়েরিয়স বা অ্যা-গার্ডনেরাই বা অ্যা-ইগ্‌নীয়স,—এগুলি সচরাচর ব্রেজিল বা অষ্ট্রেলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যা-মেলস্ নামের একপ্রকার 'ব্যাঙের ছাতার' 'ছাতা' হইতে আলো না বাহির হইয়া কেবল তাহার মাইসিলিয়া হইতেই আলো বাহির হয়। একটা 'ব্যাঙের ছাতা' কিছু মাটি সুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিলে সেই মাটির ভিতরে ভিতরে সাদা সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় কতকগুলি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়; এই সুতাগুলির নাম 'মাইসিলিয়াম' এবং এই উদ্ভিদ-শরীরের ইহাই প্রধান অংশ; যেটাকে আমরা 'ছাতা' বলি সেটা বংশবৃদ্ধির একপ্রকার কৌশলমাত্র। সব সময়ে এই 'মাইসিলিয়া' শুধু-চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে উজ্জ্বল পচা কাঠের একটু টুক্‌রা অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে খুব সম্ভব 'মাইসিলিয়া' দেখিতে পাওয়া যাইবে। শুধু যে 'অ্যা-মেলস্'-এর মাইসিলিয়া আলো বিকিরণ করিতে সমর্থ তাহা নহে; 'আর্মিলেরিয়া' বা 'হাইফলোমা' গণের কোনও কোনও জাতির মাইসিলিয়াম-ও অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো দেয়।

রেভারেণ্ড বার্কেলে একবার একটা খুব উজ্জ্বল কাঠের গুঁড়ি দেখিতে পাইয়াছিলেন; গুঁড়ির একটু অংশ পাঁচখানা কাগজ দিয়া মোড়াতেও তিনি আলোর উজ্জ্বলতার উনিশ-বিশ দেখিতে পান নাই; আলোটা নাকি এতই উজ্জ্বল ছিল। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তিনি একজাতীয় fungus-এর প্রাণাঙ্কুর (protoplasm) দেখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশে অ্যা-মেলসের থাকাই বেশী সম্ভব; কারণ লুড্‌ভিগের মতে সাধারণতঃ ২৫°—৩০°তেই ইহার আলো বেশ উজ্জ্বল হয়। এইরূপ fungus-এর দরুণ কাঠ বা ঘাস ত দূরের কথা, মাটি পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বোধ হয়।

আলোর তথ্যটার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক-মহলে বিশেষ কিছু মতভেদ নাই। অক্‌সিজেন না থাকিলে fungi আলো বিকিরণ করিতে পারে না, জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক বিশক ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক তুলাস্‌নে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তুলাস্‌নের মতে উজ্জ্বল fungi-এ একটা কিছু বিশেষ জিনিষ আছে যা অন্যান্য উদ্ভিদে নাই; এই 'বিশেষ জিনিষে'র সহিত বায়ুর অক্‌সিজেনের রাসায়নিক যোগ হওয়ার ফলে যে শক্তির স্ফুরণ হয় তাহাই আলোর রূপে আমাদের চোখে পড়ে। এই বিশেষ জিনিষটা যে কি, তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। কাঠ পুড়িলে যেমন আলো বাহির হয়, সেইরূপ এই বিশেষ জিনিষের সহিত অক্‌সিজেনের রাসায়নিক যোগ হইলে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষায় fungi-এর শরীর পুড়িয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এইরূপ আলো বাহির হয়।

প্লুগের (Pfluger) ও ভিনেস (Vines) পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন যে আলোর সহিত ফস্ফরস বা ফস্ফরস-মিশ্রিত অন্য কোনও জিনিষের সংশ্রব নাই। Fungus-এর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতা শেষ হয়; ইহার কারণ কি? প্রকৃতির রাজ্যে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণাঙ্কুরের ভাঙা-গড়া চলিতেছে; প্রাণাঙ্কুর গঠনে যে শক্তির আবশ্যক হয়, সেই শক্তির স্ফুরণ হয় তাহারই decomposition-এ। অধ্যাপক ভিনেস (S. H. Vines) তাঁহার Lectures on Physiology of Plants-এ লিখিয়াছেন যে এই শক্তিরই কিয়দংশ আলোর রূপে আমাদের চোখে পড়ে—We can only conclude that a portion of the energy set free in the destructive metabolism of the protoplasm is evolved as light.

শুধু fungi যে আলো বিকিরণ করিতে সক্ষম, তাহা নহে; উদ্ভিদ-জগতের নিম্নতম স্তরের কতকগুলা গাছ (moss বা শেওলা ইত্যাদি) বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু পচা কাঠের বা পাতার মধ্যে fungi-র থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গাছপালাহীন মাটির অংশ যদি আলো দেয় তবে তাহাতে উজ্জ্বল fungus থাকিতে পারে। 'সবজায়গায় সব পচা জিনিষ ভিজলে অমন আলো দিতে পারে না'—তাহার কারণ এই যে সব পচা জিনিষেই উজ্জ্বল fungus জন্মায় না। "গাছপালা বা ঝোপ-ঝাড়ের নীচে" মাটি বেশী স্যাঁতস্যাঁতে হওয়ার দরুণ সেইখানেই fungus বা moss জন্মাইবার সুবিধা বেশী; সেজন্য সচরাচর ঐরূপ আলো গাছপালার নীচেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষার উপর দখলের ও পারিভাষিক শব্দের অভাবে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারিলাম না। Hutchinson's Popular Botany Vol. I (১৩৭-১৫২ পৃষ্ঠায়) এবিষয়ে সুন্দর সচিত্র বিবরণ আছে; তাহা ছাড়া Dr. Phipson-এর Phosphorescence নামক গ্রন্থও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। সাধারণ পাঠক এ দুখানি বই হইতে অনেক জিনিষ শিখিতে পারেন।

বেনারস। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

নাছোড়বান্দা

(সংস্কৃত হইতে)

ঘরের গৃহিণী ও দেশের জমিদার,
কোলের ছোট ছেলে, ভিখারী দরোজার,
আছে কি নাই তার করে না পরোয়াও,
কেবলি মুখে বুলি, "দাও গো দাও দাও!"

"বনফুল।"

কষ্টিপাথর

দ্বন্দ্ব—

(আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশ)

আমাদের পড়া এক জায়গায়, বিদ্যালয় আর-এক জায়গায়; প্রয়োজনের খাতিরে গৃহের সঙ্গে শিক্ষার এই বিচ্ছেদ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে, সুতরাং এই বিধানকে কোনো-মতেই আমরা চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারিনে। আমাদের বলতেই হবে যে, শিশুশিক্ষার সমস্যা মানুষের মধ্যে ঠিকমত সমাধান করা হয় নি, তাই স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হয়েচে। পাখীর ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষীমাতার কাছেই তার প্রথম শিক্ষা পায় —সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সেই কান্নার মধ্যেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েচে।

শুধু শিক্ষা নয়। কর্ম্মের সঙ্গে গৃহের এই বিচ্ছেদ আরো প্রবল। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কর্ম্মীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কর্ম্মের যোগ নেই। এতে মানুষের দারুণ পীড়া। মাটি থেকে গাছকে উপ্‌ড়ে নিলে তার যে দশা হয় এতে মানুষের সেই দশা হচ্চে। সে শুকিয়ে যাচ্চে, তার মানসিক শক্তির সঙ্কীর্ণতা এবং জড়তা ঘটচে, তার নিজের স্বাভাবিক জীবন বলে কিছুই আর বাকি থাকচে না। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা অধিকাংশ মানুষকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে ছিন্ন করে আনচে।

স্বস্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে অধিকার সে আজ কেবল সেই অল্প কয়জন পায় যাদের অর্থ আছে। সেই অল্পসংখ্যক মানুষের জন্যে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে খর্ব্ব করচে—আধুনিক সভ্যতার লক্ষণই এই। এ সভ্যতা মানুষকে মানে না; বস্তুকে, পণ্যকে, কার্য্যপ্রণালীকে মানে। বস্তুত এটা দাসত্বের যুগ। যেখানে কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মীর আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, যেখানে স্বভাবের সঙ্গে কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মীর আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, সেখানে স্বভাবের সঙ্গে কর্ম্মের যোগ ছিন্নভিন্ন, সেখানেই দাসত্ব। সেই দাসত্ব আজ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। ইংরেজ জাতি বলে, তারা দাসত্বপ্রথা দূর করেচে। সে কথাটা স্থূলভাবে সত্য। আংশিকভাবে অল্প কয়েকজনের যে বিশেষ-একরকমের দাসত্ব ছিল, সেইটেই তারা দূর করেচে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতিই এমন হয়ে দাঁড়িয়েচে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরদাসত্ব না করলে সে সভ্যতা চলেই না। যে-সমস্ত উপকরণ তার অত্যাবশ্যক, তার পরিমাণ অতি বিপুল; তাকে যথাসম্ভব সুলভ করাও চাই; এই দ্রব্য উৎপাদন-এবং সংগ্রহ-চেষ্টায় মানুষের নেই অবকাশ অল্প হয়ে গেছে যে অবকাশে তার স্বাধীন ইচ্ছা আশ্রয় পায়, যে অবকাশে তার স্বাভাবিক আত্মীয়-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা।

প্রবৃত্তির দাস পশু বাহ্যপ্রাকৃতিক নিয়মের শাসনে পশু একান্ত চালিত; মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই পশুবিভাগও আছে। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব এই বিভাগের ঊর্দ্ধে; যেখানে সে কর্ত্তা, সে মুক্ত, সেখানে সে আধ্যাত্মিক মানুষ। বর্ত্তমান সভ্যতায় সেই আধ্যাত্মিক মানুষের সঙ্গে সাংসারিক মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেচে।

এই সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে মানুষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনেক কম জানত, অনেক বিষয়ে তার অন্ধসংস্কার ছিল, এ সমস্তই সত্য। কিন্তু সংসারের সঙ্গে আত্মার বিরোধ তখন এত ভয়ঙ্কর ছিল না। আজ সংসারভার অত্যন্ত প্রকাণ্ড হয়ে উঠেচে। মানুষের প্রয়োজনের জটিলতা অতিশয় পরিমাণে বেড়ে ওঠাতে সকল দিকে তার আয়োজন দুঃসাধ্য হয়েচে। এমন কি আমোদ-আহ্লাদ খেলাধূলার উপকরণ পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য।

জীবনযাত্রার উপকরণ যখন দুর্ম্মূল্য এবং তা সংগ্রহ যখন কষ্টসাধ্য হয় তখন সে সম্বন্ধে মানুষের অহঙ্কার খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সেইজন্যে উপকরণবানের আত্মাভিমান আগেকার দিনের চেয়ে এখন অনেক বেশি হয়েচে। যে অভাব মোচন মানুষের অত্যাবশ্যক তার জন্যে তাকে যত বেশি প্রয়াস পেতে হয় না,—কিন্তু "আমি ধনী" এই অহঙ্কারটাকে আত্ম-কালকার দিনে ভাল করে ব্যক্ত করবার উপযুক্ত ধন অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু এই ধনী বলে জানাবার আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ লোকেরই মনে জাগরূক; সেইজন্যে এই আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় মানুষ এমন কর্ম্মের বন্ধন গ্রহণ করে যে বন্ধনে তার জীবনের সমস্ত অব-কাশটাকে ধন-নিষ্কর্ষণের জাঁতার সঙ্গে ঘানীর সঙ্গে পশুর মত বেঁধে রাখে।

সংসার আজকাল এত অত্যন্ত বেশি দাবী করে বলেই মানুষের বেশির ভাগ শক্তি তার নীচের তলায় তার আপিস-ঘরেই খাটে। অর্থাৎ তার অহং-এর দরবারেই তার দিন যায়। তার উপরের তলায় যে অধ্যাত্ম-নিকেতন আছে সেখানে তার যাতায়াত অসম্ভব হয়ে উঠেচে। সংসারটাই দলে দলে সমস্ত মানুষকে প্রবল টানে টানচে বলেই যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন [illegible] বিশেষের পক্ষে কথার-কথা হয়ে উঠচে [illegible] প্যারী।
তুলনায় সংসারের ধনমান যে তুচ্ছ এ-কথা মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলবার শক্তি কর সমাজের অধিকাংশ লোকে মিলে যে জিনিষটাই ব্যক্তিবিশেষের কাছে মহামূল্য সংগ্রহের দ্বারা সকল লোকের কাছে প্রবল প্রবর্ত্তনা। আজকালকার দিনে [illegible] সেই অত্যন্ত বেশি দাম পেয়েচে তখন আত্মার দিকে তাকিয়ে ক'জন বলতে পারে, যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

এই কারণেই আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সাংসারিক জীবন-যাত্রার বিচ্ছেদ আজ এতই কঠিন হয়েচে। সেইজন্যে দাসত্বের নীচের তলা থেকে উপরের তলায় যেতে মানুষ এত বেশি শ্রম অনুভব করে। কেননা ব্যবহারের অনভ্যাসে সিঁড়িটা হয়েচে জীর্ণ। এতে করে মানুষ ছোট হয়ে গেচে।

য়ুরোপে যুদ্ধ যারা করছিল তারা ক্লান্ত হয়েচে। তারা বলচে, এই সংসারটার পরিবর্ত্তন দরকার। তারা বলচে স্বদেশের একত্ব স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যের অত্যন্ত রেষারেষি, এতে কল্যাণ নেই। দলটাকে আরো বড় করতে হবে। কয়েকটা প্রবল জাতি মিলে একটা আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে তোলা যাক্। কিন্তু এত বাইরের কথা। সেই আন্তর্জাতিক সংঘ কাকে প্রকাশ করবে? মানুষের শক্তিকে, না মানুষের আত্মাকে? এই প্রশ্নের সত্য উত্তরের উপরেই সব নির্ভর করবে।

আত্মার ধর্ম্ম ত্যাগ করা, লোভ তার ধর্ম্ম নয়, কেননা তমসঃ পরস্তাৎ তার আশ্রয়। সেই আত্মা এখনকার দিনে সভ্যতার স্থূল আবরণে আবৃত হয়ে রয়েচে—লোকালয়ে তাকে আমরা দেখতে পাচি না। এইজন্যে মানুষের আত্মপরিচয় হচ্চে না। [illegible] আপনার মর্য্যাদা হারিয়ে যা'-তা'-নিয়ে মারামারি করচে।

এই আত্মাকে প্রকাশের ভার কোনো সম্প্রদায়ের উপর নয়, আমাদের প্রত্যেকের উপর। যে এ'কে প্রকাশ করবে সে কেবল নিজের পথকে আলোকিত করবে না, সমস্ত মানুষকে সাহায্য করবে; মানুষ সবচেয়ে বড় ভুল ভুলেচে, আপনাকে ভুলেচে, তার

ভুল ভাঙিয়ে দেবে। সবাই যখন "চাই" "চাই" বলে নিদারুণ হয়ে উঠেচে তখন আপন অন্তরের আনন্দ থেকে বলতে হবে, "চাই না।" সেই "না" শূন্য "না" নয়, সেই না পরিপূর্ণ কল্যাণে। সেই "না"-এর আসন ভরপুর করে বসে আছেন তিনি যাঁকে আমরা নমস্কার করে বলি "নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

য়ুরোপের মধ্যযুগকে অন্ধযুগ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নাম সত্য নয়। নিশ্চয়ই সে যুগে অন্ধকার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তখনকার মানুষ সেই অন্ধকারকেই চরম বলে স্বীকার করে নেয়নি। তারা বলেছিল "অন্ধকার থেকে আলোকে যাব।" তারা অনুভব করেছিল এই অন্ধকারের বাইরে আলো আছে। সেই আলোর লক্ষ্যই মানুষের শেষ লক্ষ্য। যেটার মধ্যে জড়িত হয়ে আবৃত হয়ে আছি সেটাকে বিদীর্ণ করে ছাড়িয়ে যেতে হবে এই কথাটা তখনকার মানুষ অনুভব করেছিল। তাই আপনার আবরণের সঙ্গে তখনকার মানুষের একটা লড়াই শেষ পর্য্যন্ত থামেনি। তখন মানুষ দারিদ্র্যব্রত নিতে প্রস্তুত হয়েছিল আত্মার সম্পদকে সত্য করে জান্‌বার জন্যে। তখন টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তিকে সকলের চেয়ে বড় মান দেওয়া হয়নি। তখন রাজাকে মাথা হেঁট করতে হয়েচে তাদের কাছে যারা রাজত্বকে প্রাহ্য করেনি।

আজ মানুষ গৌরব করে বলচে আমাদের এই ডিমক্রেসির যুগ, আমাদের আজ সকলেই রাজা। অবশ্য এ কথাটা ছোট নয়। মানুষের অধিকার যেদিক থেকে যতই বড় হোক্ ততই ভাল। কিন্তু তবু 'ততঃ কিম্'! একজন রাজার জায়গায় দশ বিশ কোটী রাজা নিয়েই কি পৃথিবীর চরম সার্থকতা? প্রভুত্বই কি সবচেয়ে বড়? মুক্তি কি তার চেয়ে বড় নয়? এই যে সব লক্ষ লক্ষ প্রভুরা মিলে বাণিজ্যের কলুষে পৃথিবীর দেশবিদেশকে কলঙ্কিত করচে, স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতিকে সুগভীর, গূঢ় মিথ্যার চোরাবালির উপর গড়ে তুলতে বাচ্চে, আর পরস্পর হানাহানি করে ভ্রাতৃরক্তের ভীষণ বন্যায় ধরণীকে অপবিত্র করচে—এই যে সব যুথবদ্ধ লুব্ধতা ও হিংস্রতার কীর্ত্তিকলাপ, এটা এক প্রভুর না হয়ে বহু প্রভুর কৃত বলেই কি মস্ত গৌরবের বিষয়?

প্রভুত্ববান বহু পুরুষের হুহুঙ্কারে আকাশ আলোড়িত, কিন্তু মুক্ত পুরুষদের নির্ম্মল প্রশান্ত জ্যোতি আজ লোকালয়ে দেখা যায় না? আজ ঝড়ের আকাশে মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে বিদ্যুৎ হান্‌চে, কিন্তু সপ্তর্ষিকে দেখিনে কেন? ধ্রুবতারা কোথায়? আজ মৃতমাংস নিয়ে সব গৃধ্র শকুন মাতামাতি করচে, কিন্তু অমৃতের বার্ত্তা নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষ কই আসে?

বহুলক্ষ রাজা আমাদের যা না দিতে পারে, একজন মুক্ত পুরুষ জগৎকে তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে পারে—এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি বর্ত্তমান যুগ তার শ্রদ্ধা হারিয়েচে বলেই আজ শক্তির সাধনা পণ্যের সাধনা নিয়েই প্রভুত্ব-অধিকারদৃপ্ত ডিমক্রেসি মেতে রয়েছে; মুক্তির সাধনাকে এ যুগ বিস্মৃত হয়েচে। এই সাধনার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ভার ভারতবর্ষ কি আজ নিতে পারে না? মানুষের অহমিকা আজ বড় বড় নাম ধরে মানুষকে অভিভূত করচে। সেই অভিভূতি থেকে ভারতবর্ষ আপনাকে যদি বাঁচাতে পারে তাহলে সমস্ত মানুষকে বাঁচাবার পথ সে বের কর্‌বে। আর কিছু নয়, মানুষের আত্মাকে সে যদি মানুষের সমস্ত কিছুর চেয়ে বড় বলে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে পারে তা হলেই সেই সত্য-শ্রদ্ধার জোরে সে অসাধ্যসাধন করতে পারবে। কেননা আত্মার শক্তি সকল শক্তির চেয়ে বড়, বিনা অস্ত্রে দেশকে এবং কালকে সে জয় করে, শৃঙ্খলে তাকে বন্দী করে না, মৃত্যু তাকে নিহত করে না, দারিদ্র্য তাকে দীন করে না, এবং অগ্নিশিখার গায়ে যেমন পঙ্কলেপন অসম্ভব তেমনি কোনো অসম্মান তাকে বাহির থেকে স্পর্শ করেও কলঙ্কিত করতে পারে না।

(শান্তিনিকেতন, চৈত্র)

ভারত-ইতিহাস-চর্চ্চা—

ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কেন নহে তাহার কারণ আছে।

প্রত্যেক জাতির এক-একটি সাধনার বিষয় আছে। সেই মূলগত সাধনটি লইয়াই সেই জাতির সকল লোক আঁট বাঁধে। নর্ম্মানে স্যাক্সনে মিলিয়া ইংরেজ যখন এক হইয়া গেল, যখন তাহাদের মধ্যে সমাজভেদ রহিল না, তখন তাহাদের মধ্যে একটা বড় ভেদ রহিল—রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ। সেই ভেদ যখন একান্ত থাকে তখন রাজার খেয়ালের জন্য প্রজাদের দুঃখ ও ক্ষতি হইতে থাকে। সেই ভেদ বিলুপ্ত করিয়া রাজশক্তিতে নানা প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য সাধনের ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাস। অর্থাৎ ইংলণ্ডের যে সমস্যা প্রধান ছিল সেই সমস্যার সমাধান লইয়াই তাহার ইতিহাসের পরিণতি ঘটিয়াছে।

ইংরেজি ইস্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্ট্রীয় ধারার পথই খুঁজিতে থাকে। খুঁজিয়া না পাইলে বলে ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা যেখানে।

প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই-সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা আচার ধর্ম্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর-একদিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধন-চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কি করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্যসাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে; আজও তাহার সমাধান হয় নাই।

য়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের ইতিহাসে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের কিছু মিল আছে, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। সেখানে য়ুরোপের নানাস্থান হইতে নানাজাতি মিলিতেছে। কিন্তু তাহারা একই বর্ণের, সুতরাং তাহাদের মিলনের বাধা সুগভীর নহে। তাহা ছাড়া, য়ুরোপের সকল উপজাতির মধ্যে সভ্যতার রূপভেদ নাই। নিগ্রোদের সমস্যার কোনো ভাল মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত সেখানে হয় নাই বলিয়া কেবলি দুঃখ অত্যাচার অবিচারের সৃষ্টি হইতেছে, ইহাতেই মনুষ্যত্বের পীড়া ঘটে। এই পীড়া দুর্ব্বল সবল উভয়কেই স্পর্শ করে। তাহা ছাড়া এসিয়াবাসীদের সম্বন্ধে শুধু আমেরিকায় নহে য়ুরোপের সকল উপনিবেশেই বিরোধ চলিতেছে। এসিয়াবাসীকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিলে এই বিরোধ দেশের বাহিরে গিয়া কালক্রমে আরো প্রবল হইয়া জমিতে থাকিবে এবং একদিন ইহার হিসাব-নিকাস করিতেই হইবে। আমেরিকার ইতিহাসে আর-একটা ব্যাপার দেখিতে পাই তাহাকে ঐক্যসাধন না বলিয়া একাকারীকরণ বলা যায়। যে-কোনো জাতীয় লোক আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস

করিতে আসে ভাষায় আচারে, ব্যবহারে তাহাকে সম্পূর্ণই আমেরিকান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় দিক হইতে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মানবসভ্যতার দিক হইতে ইহাতে ক্ষতিই ঘটে। সৃষ্টতত্ত্বে যে পরিণতিপ্রক্রিয়া দেখি তাহাতে একাকারত্ব আরম্ভে দেখা যায়, কিন্তু বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে একের মধ্যে বিভাগ ও সেই বিভাগের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ হইতে থাকে। যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে একাকারত্বই একান্ত আবশ্যক বলিয়া ধরা হয়, তবে বলিতেই হইবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঐক্যের আদর্শ নহে। ইহাতে একপ্রকার স্বাধীনতার লোভে মানুষের গভীরতর স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক বলি দেওয়া হয়। সমস্যার ইহা প্রকৃত সমাধান নহে বলিয়াই ইহাতে জগতে এত নিগূঢ় দাসত্ব ও ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে।

ভারতবর্ষে নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে। অবশ্য বিদেশী রাজা যখন হইতে ভারতে আসিয়াছে তখন হইতে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য্য বাধা পাওয়ায় আর-একটি অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। এই জন্যই ইংরেজ যাহাকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে ভারতে সেই ইতিহাস মুসলমান অধিকারের পরে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এমন নহে যে বিদেশী রাজত্বের পর হইতে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে পূর্ব্বের চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হইয়াছে, আমাদের দুরূহ সমস্যায় আরো একটি নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকাতেই অন্য দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত খাটিতেছে না। আমরা অন্য দেশের নকলে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ করিয়া দেখি নাই; অনেকটাই অস্পষ্ট আছে এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়িয়াছে। বিশেষত যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্ম্মতন্ত্রমূলক সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কুয়াশার মত আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে। যেটুকু গোচর হইয়া উঠিতেছে তাহা বিদেশী ঐতিহাসিকদেরই চেষ্টায়।

কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাসের জন্য চিরদিনই কি এমন করিয়া পরের মুখ তাকাইয়া থাকা চলিবে?

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্য্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক-ধর্ম্মবন্যায় ভাসিয়াছিল—শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্ম্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তারপরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ এবং হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য্য ও অনার্য্য এক গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসঙ্গত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসঙ্গতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্ব্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে পদেপদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়,—যাহা কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের যে সম্প্রদায়ের উপরে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের হৃদয়ের দিকটা প্রধানতা। শ্যাম চীন জাপান জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই জন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মত হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানাজাতির নানা নিম্নাধর্ম্ম মন্ত্রতন্ত্র ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের নিজেরই বিশুদ্ধস্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণজনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে, ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলা যেমন তারা দেখা যায় না, তেমনি বৈদিককালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানাজাতির সংমিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা যাহা নিতান্ত অনার্য্য তাহাকে আর্য্যবেশ পরাইবার প্রয়াস,—ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

অতএব, ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান বৌদ্ধপুরাণকল্পের অনুশীলন করিতে হইবে।

(শান্তিনিকেতন, চৈত্র) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতিথি—

একটি সত্য আছে, সেটি মানুষের অন্তরতম। বোধ করি, সেই জন্যেই তাকে আমরা ভুলে থাকি। বাইরের নানা টানে নানা দিকে আমাদের বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সকলের চেয়ে অন্তরের এবং কাছের কথাটিতে আমাদের মন যায় না।

সে কথাটি এই,—আমাদের জীবনের দ্বারে একজন অতিথি আছেন।

একদিকে তিনি দেবেন আর আমরা নেব, এর সামঞ্জস্য খুঁজতে হলে, আরেকদিকে আমরা দেব আর তিনি নেবেন এইটুকু থাকা চাই, নইলে দানের ভারে আমরা নেমে পড়ব। তাই তিনি আমাদের দ্বারের কাছে এসে অপেক্ষা করেন; নিজের কর্ত্তৃত্বরাজ্যে যেমন প্রভুরূপে থাকেন তেমন ভাবে নয়, আমাদের কর্ত্তৃত্বের সংসারে অতিথিরূপে আমরা তাঁকে কতটুকু জায়গা ছেড়ে দিই, তাঁর জন্যে আমাদের কতটুকু সেবার আয়োজন, সেইটুকুতেই আমাদের হৃদয় থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সত্য হয়।

সেইজন্যেই যেমন বলচি, পিতা নো বোধি, তুমি যে পিতা এই

বোধ আমাকে দাও, তেম্‌নি করেই আমাকে প্রার্থনা কর্‌তে হবে, তুমি যে আমার অতিথি এই বোধ আমাকে দাও। পিতার বোধ হচ্চে তাঁর কাছ থেকে পাবার; অতিথির বোধ তাঁকে দেবার।

যখন ভালবাসি তখন দেওয়াতে আর বাধা থাকে না। এই যে অতিথি আমাদের ঘরে আশ্রয় চেয়েচেন, আর বলেচেন, তোমার সম্পদ তুমি একলা ভোগ কোরো না, আমাকেও স্মরণ কোরো। তবু পারিনে দিতে; সব জায়গাই আমার "আমি" জুড়ে থাকে, আমার সব শক্তিই এই "আমি"র দাবী মেটাতেই ব্যাপৃত। তাঁকে দাঁড় করিয়েই রাখি। এমন কেন হয়? প্রেম নেই বলে; দিতে তাই আনন্দ নেই। তাই কেবলি বলি, তুমি বসো, আমার সময় নেই, আমার অনেক কাজ।

সংসারে সত্য হব এবং সংসারকে সত্য কর্‌ব, এইটে হল মানব-জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন কর্‌বার জন্যেই আপনাকে প্রত্যহ বল্‌তে হবে, "সকলের চেয়ে বড় যিনি তিনি অন্তরের মধ্যে এসেচেন, ছাড় সব ছোট কথা ছোট বাসনা।" বল্‌তে হবে, "সকলের চেয়ে প্রিয় যিনি তিনি হৃদয়ে এসেছেন, আপনার স্বার্থকে আনন্দে তাঁর কাছে বিসর্জ্জন কর।"

সংসারে প্রতিদিন যদি বলি, আমিই আছি, আমার মধ্যে আমার চেয়ে বড় কেউ নেই, তাহলেই বড় সত্যকে বাদ দিয়ে সংসারটাকে দেখি, তাহলেই ওজন ঠিক থাকে না, তাহলেই বিপদ বাধে, তাহলেই সবচেয়ে বড় ঠকা ঠক্‌তে হয়।

যিনি বিশ্বের অধীশ্বর তিনি আমার অতিথি হয়ে এসেচেন, আমার জীবনে এইটেই সবচেয়ে বড় সত্য কেন? কেননা, এইখানে দুই সত্যের মিলন হয়েছে—একটা হচ্চে তিনি বড়, আরেকটা হচ্চে আমিও ছোট নই।

একরকম বড় আছে সে অভিভূত করে, আমার সব কেড়ে নিয়ে জবরদস্তি করে; সে যত বড়ই হোক তার কাছে নত হওয়া তার কাছে আত্মাবমাননা। কিন্তু এ ত তা নয়। তিনি সকলের চেয়ে বড় হয়ে আমাকে চাইলেন। তাতে তিনিও বড় রইলেন, আমাকেও বড় কর্‌লেন। যিনি কর্ত্তৃত্ব করেন, তিনি এইখানে আমার কর্ত্তৃত্ব মানেন। আমি ভুলে থাকি, তাঁকে ফিরিয়ে দিই, কিন্তু তিনি দরজা ভাঙেন না, অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, আমি এসেচি তোমাদের হৃদয় নিতে; খাজনা নিতে নয়।

এই যে সূর্য্য, এ সমস্ত সৌরজগতের অধিপতি। এই পৃথিবীকে সে বেঁধেচে তার নিজের সঙ্গে। সকালে পূর্ব্ব দিগন্তে যখন সূর্য্য দেখা দেয়, যখন তার করাঘাতে অন্ধকারের কপাট খুলে যায়, তখন পৃথিবী পুলকিত হয়ে অনুভব করে সমস্ত সৌরমণ্ডলের সূর্য্য বিশেষভাবে তারই আপন হয়ে তার দ্বারে অতিথি। তাই আনন্দে সে তার ফুলের সাজি সাজিয়ে ধরে, তার নহবতে প্রভাতী সুর বাজিয়ে দেয়। এই পূজায় তার নিজের মহিমা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়।

এই সকালে সূর্য্য পৃথিবীর দ্বারে এল, সে ত প্রভুভাবে এল না, আনন্দের সুর বাজিয়ে এল। পৃথিবী যদি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন না কর্‌ত, যদি বন্ধ থাক্‌ত তার ঘর, তাহলে কি অমঙ্গলই হত, চারিদিকে কি অন্ধকার, কি নিরানন্দ।

এম্‌নি করেই অসীম পুরুষ প্রত্যেক মানুষের আত্মার দ্বারে তারই বিশ্বের অতিথি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বল্‌চেন, আমি যে প্রভু সেই কথাটি ভুলে যাও, মনে রাখ আমি একান্তভাবে তোমার, আমাকে গ্রহণ কর। আমি জোর কর্‌ব না, আমার সৈন্যসামন্ত আনিনি, আমি তোমার সমান হয়ে এসেচি। তাঁর এই কথাটি যদি মন দিয়ে শোন্‌বার সময় করে নিতুম, তাহলে সব টানাটানি কাড়াকাড়ি শান্ত হয়ে যেত, আনন্দে সমস্ত চিত্ত গান গেয়ে উঠ্‌ত, বল্‌ত, এস, সবই তোমার।

মানুষের আমিত্ব আপনাকেই মেনে সার্থক হয় না, আপনার চেয়ে বড়কে মেনে সার্থক হয়। যতক্ষণ এইটি সে না-মানে ততক্ষণ নিজের সবচেয়ে বড় অধিকার সে পায় না। তার সবচেয়ে বড় অধিকার হচ্চে আত্মদানের অধিকার। যতক্ষণ তার দেবার কৃপণতা, ততক্ষণ আপনার উপর তার পূর্ণ অধিকার নেই। তাঁকে যখন সত্য করে আপন অতিথি বলে মানি, সেই অধিকার পাই। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে বলি, আমার ধনজনমান সব তোমার হোক্‌। তখন আমার ইচ্ছার উপর আমার চরম কর্ত্তৃত্ব হয়, তখন আমি ইচ্ছে করেই বল্‌তে পারি "আমি সব দিলুম।"

এই যে আমার "আমি" বিশ্বের সকলের উপরে মাথা তোল্‌বার জন্যে ব্যস্ত, চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলেই এর স্পর্দ্ধা স্বীকার করেচে, "হাঁ, তুমি খুব বড়।" এই যে বড়, এই যে খুব বড়, এ'কে আনন্দে নত হয়ে বল্‌তে হবে, "আমি কিছুই না।" সেই আতিথ্য-সৎকারের মহা দিনটির জন্যই দুঃখ পেয়ে আঘাত পেয়েও সকলে এ'কে মেনে নিচ্চে। যদি সে দিন না আসে, যদি আপনাকে দেবার অধিকার না পাই, তবে সে বড় দুঃখ—শুধু একা আমার নয়, সকলের।

নোট্‌কে ভাঙাতে পার্‌লে তবেই যেমন তার অর্থ, তেম্‌নি আমার "আমি"কে ভাঙাতে পার্‌লে তবেই তার অর্থ পাব। নোট্‌টাকেই যদি শেষ বলে জানি, যদি সেটাকে নিয়ে কাগজের নৌকো বানিয়ে খেলা করি, তা হলে সেটা হল ফাঁকি। "আমি"কে নিয়ে তেম্‌নি যদি খেলা করে যাই, তাহলে তার থেকে তার সত্যকে পাওয়া গেল না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকি রয়ে গেল। আমাদের জীবনের যিনি অতিথি তাঁর সেবার আয়োজনের জন্যে ঐ আমিটাকে ভাঙাতে হবে, ওকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে তবে ওকে সার্থক করতে হবে। এ হলেই যা দিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী পেলুম। সেই অনেক বেশী পাবার ব্যবস্থা আছে। বীজকে যদি সঞ্চয় না করে রোপণ কর্‌তে পারি, তাহলে যেমন বীজের অহমিকা বীজের কৃপণতা বিদীর্ণ হয়ে তার চেয়ে যে অনেক বেশী সেই উদ্‌ঘাটিত হয়, তেমনি আমার সেই অতিথি তুমার কাছে আপনাকে দিয়ে ফেল্‌লে তবেই এর পরিপূর্ণতা কঠিন আবরণকে বিধা করে ফেলে অন্ধকার থেকে আলোকে প্রকাশিত হয়।

সেই প্রকাশের জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও, আমার আপন হতে তোমাতে নিয়ে যাও। সেই জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, হে আবি, আমার কাছে আবির্ভূত হও—অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমার যে প্রকাশ সেইটে যেন অপ্রকাশিত না থাকে, অতিথিকে যেন না-দেখে ফিরিয়ে না দিই। যদি সেই প্রকাশ আমার কাছে মোহের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে, রুদ্র, শোকদুঃখ অভিঘাতে বাধা ভেদ করে তোমার দক্ষিণ মুখ আমার জীবনে অবারিত কর, এবং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌; তাহার দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর। দুঃখ হতে রক্ষা করা নয়, তোমার প্রকাশের বাধা হতে রক্ষা কর, হে রুদ্র, দুঃখের দ্বারাই রক্ষা কর।

শান্তিনিকেতন, চৈত্র। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তালের গুড়—

আমাদের দেশে তাল-গাছ প্রচুর জন্মায়। ইক্ষু-গুড় ও খেজুর-গুড় অপেক্ষা তালের গুড় মূল্যবান ও ইহার মিছরি বাজারে ৪০।৫০ টাকা দরে বিক্রয় হয় এবং বিশেষ উপকারী। এ দেশে অনেক স্থানে খেজুর-গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে তাল-গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি খেজুর-গাছ হইতে যে পরিমাণ

গুড় পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা একটি তাল-গাছ হইতে অনেক বেশী পরিমাণ গুড় পাওয়া যায়। তালের গুড়ের আস্বাদন খেজুর-গুড়ের ন্যায়, তবে খেজুর-গুড় অপেক্ষা ইহার রং অতি পরিষ্কার এবং খেজুর-গুড়ের ন্যায় ইহার গুড় শীঘ্র নষ্ট হয় না। খেজুর-রসের ন্যায় ইহার রসও ব্যবহার করা চলে, খেজুর-রস অপেক্ষা ইহার রস সুমিষ্ট এবং উপকারী। ইহার গুড় প্রস্তুত করা অতি সহজ, অনেকটা খেজুর-গুড়ের ন্যায়।

তাল-গাছ দুই জাতীয়। যে গাছ হইতে তাল হয় তাহাকে এখানে চলিত ভাষায় ফলন্ত গাছ (অর্থাৎ স্ত্রী গাছ) কহে এবং যে গাছ হইতে তাল জন্মে না তাহাকে এঁড়ে গাছ (অর্থাৎ পুং গাছ) কহে; এই উভয় জাতীয় গাছ হইতেই রস বাহির হয়। যাহারা তালের রস বা তাড়ি ব্যবহার করে তাহারা গাছ হইতে কিরূপে রস বাহির করিতে হয় বিশেষ জানে, বোধ করি সকলেই গাছ হইতে রস বাহির করা দেখিয়াছেন। এক একটি গাছ হইতে প্রতিদিন অন্ততঃ দশ সের রস পাওয়া যায়। এমন অনেক গাছ দেখা যায় যাহা হইতে অর্দ্ধ মণ পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। প্রত্যেক গাছ হইতে অন্ততঃ দুই মাস কাল প্রত্যহ রস পাওয়া যায়, অর্থাৎ যতদিন মোচা শেষ না হয় ততদিন রস পাওয়া যায়। প্রত্যহ একই জন লোকের দ্বারা গাছ ছেলান উচিত এবং মোচা ছিলিবার সময় গাছের উপরে খুব সাবধানে সুস্থ ভাবে থাকা দরকার, নচেৎ গাছের বাখ্‌রা ও মোচাগুলি বেশী রকম চাপ পাইলে বা নড়িয়া গেলে শুকাইয়া যাইয়া রস কম পড়ে বা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

প্রতিদিন বৈকালে অর্থাৎ সন্ধ্যার পূর্ব্বে হাঁড়ি দিয়া অতি প্রত্যুষে রস সংগ্রহ করিতে হয়, কারণ রসে রৌদ্র পাইলে অম্ল হইয়া গুড় নষ্ট হইয়া যায়; এবং যত শীঘ্র সম্ভব গুড় প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। রস অম্ল হইলে গুড়ে মাত্ বেশী হয়। রস স্বভাবতই একটু অম্ল হইয়া থাকে, তজ্জন্য রসে চুনের জল খাওয়াইয়া অম্লতা নষ্ট করিতে হয়; এবং ইহার দ্বারা গুড় অতি পরিষ্কার হয়। ইহার গুড় ইক্ষু- বা খেজুর-গুড়ের ন্যায়ই প্রস্তুত করিতে হয়। রস প্রথমতঃ পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়, পরে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার গুড় অতি পরিষ্কার এবং সারপূর্ণ হইয়া থাকে।

ইহার এক সের রস হইতে অর্দ্ধ পোয়া গুড় পাওয়া যায়—তাহা হইলে একটি গাছ হইতে দৈনিক /১। পাঁচ পোয়া গুড় পাওয়া যায়। ইহার মূল্য খুব কমপক্ষে ১০৲ টাকা মন দরে গুড় বিক্রয় হইলে ।/০ পাঁচ আনা। গুড়-প্রস্তুত- মজুরী ইত্যাদি খরচ একটি গাছে এক আনার বেশী নহে। তাহা হইলে দেখা যায় প্রতি গাছে দৈনিক ।০ চারি আনা হয়। এইরূপ দুই মাসে প্রতি গাছে ১৫৲ আয় হইবে। ইহা একটি আশাতীত আয়। ইহাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না, বরং প্রথম বৎসর যে গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা হইবে, আগামী বৎসর তাহা হইতে ক্রমশঃ রসের পরিমাণ অধিক পাওয়া যাইবে।

(ভূমি-লক্ষ্মী, পৌষ) শ্রীঅনাদিকিঙ্কর রায়,
সেক্রেটারী, নানুর শাখা-কৃষিসমিতি।

হিতসাধন মণ্ডলীর প্রদর্শনীর বিবরণ

দুর্ভিক্ষে, বন্যায় ও অন্যবিধ জলপ্লাবনে, ঝড়ে, মারীতে, ও গ্রামদাহে বঙ্গের যেখানে লোক বিপন্ন হয়, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী সেখানে সাহায্য প্রেরণ করেন। অন্যান্য প্রকারেও মণ্ডলী সমাজের হিত করিয়া থাকেন। কি প্রকারে ও কতদিকে সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়, প্রদর্শনী দ্বারা লোককে তাহা বুঝান, মণ্ডলীর অন্যতম কাজ। এইরূপ প্রদর্শনী ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে মণ্ডলী কলিকাতায় প্রথমে খুলিয়াছিলেন। তাহার পর বঙ্গের আরও অনেক জায়গায় ইহার দ্রষ্টব্য চিত্র ও নক্সাগুলি দেখান হইয়াছে। কলিকাতায় যে প্রদর্শনী হয়, তাহার বিবরণ ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হইয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আখ্যাপত্র, ভূমিকা, বিজ্ঞাপন ও সূচী ছাড়া, প্রবাসীর মত পাতার ৩৩ পৃষ্ঠা লেখা, এবং তদ্ভিন্ন আর্টপেপারে সুমুদ্রিত ৩২ খানি ছবি আছে। সমস্ত জিনিষটি সুন্দর হইয়াছে। মূল্য একটাকা। কলিকাতা মেয়ো হস্পিটালে ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের নিকট পাওয়া যায়। যাঁহারা মণ্ডলীর প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্মারকস্বরূপ রিপোর্টখানি রাখিলে সুখ ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন; যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদের ইহা পাঠ করা আরও বেশী দরকার। আশা করি, একটি বাংলা রিপোর্টও বাহির করা হইবে।

প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—স্বাস্থ্য, লোকদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, শিশুমঙ্গল, সমাজতত্ত্ব, ও বিবিধ। স্বাস্থ্যবিভাগে, সাধারণ ও শিশু-মৃত্যুর হার; সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ ও নিবারণ; এবং খাদ্য ও পেয় সম্বন্ধে নানা অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হয়; তদ্ভিন্ন মাদকদ্রব্য সেবনের অপকারিতাও প্রতিপাদিত হয়। লোকদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধীয় বিভাগে, গ্রামের আবশ্যক ও গৌরব, পণ্য-শিল্প, কৃষি, এবং সমবায় সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য কথা জানান হয়। শিক্ষা বিভাগে, শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের

বিধবার শিক্ষা
লেখা পড়া শিখাও
সেলাই শিখাও
সংবাদ পত্র পাঠ
পশমের কাজ
ক্রুশের কাজ
গ্রামের মেয়েদের পড়াইতে পারে
গ্রামের রোগীদের সেবা করিতে পারে

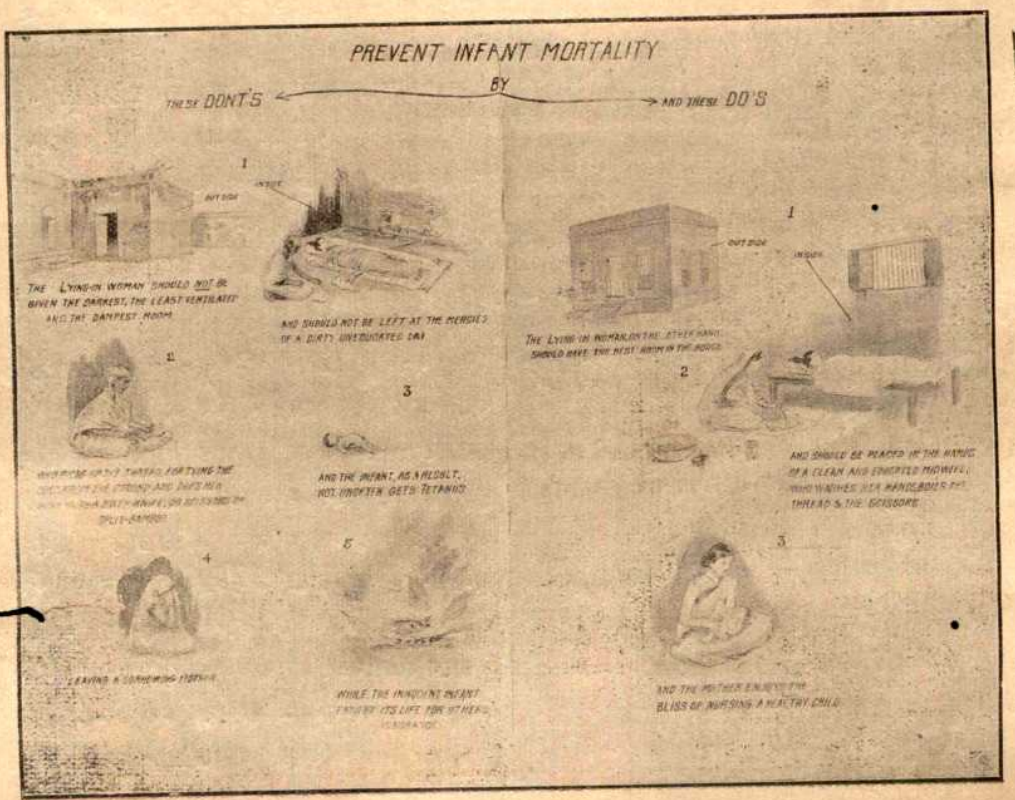
PREVENT INFANT MORTALITY
BY
THESE DONT'S
AND THESE DO'S
OUT SIDE
INSIDE
THE LYING-IN WOMAN SHOULD NOT BE GIVEN THE DARKEST, THE LEAST VENTILATED AND THE DAMPEST ROOM
AND SHOULD NOT BE LEFT AT THE MERCIES OF A DIRTY UNEDUCATED DAI
AND THE INFANT, AS A RESULT, NOT UNOFTEN GETS TETANUS
THE LYING-IN WOMAN ON THE OTHER HAND SHOULD HAVE THE BEST ROOM IN THE HOUSE
AND SHOULD BE ATTENDED BY A CLEAN AND TRAINED MIDWIFE,
AND THE MOTHER ENJOYS THE BLISS OF NURSING A HEALTHY CHILD

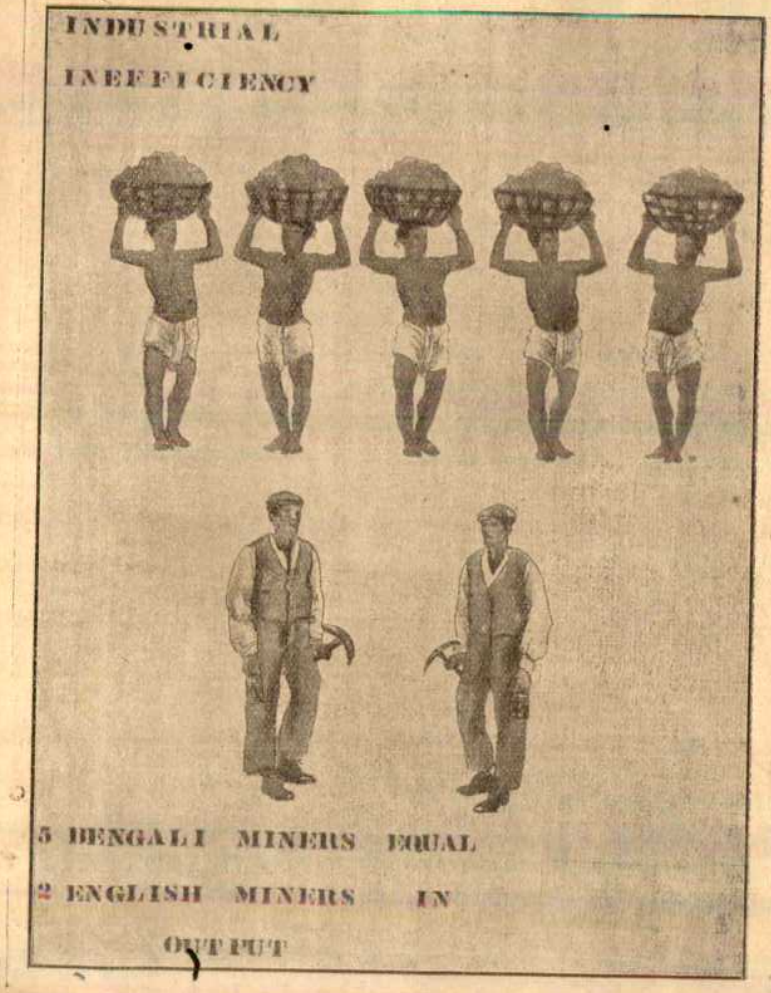
INDUSTRIAL
INEFFICIENCY
5 BENGALI MINERS EQUAL
2 ENGLISH MINERS IN
OUTPUT

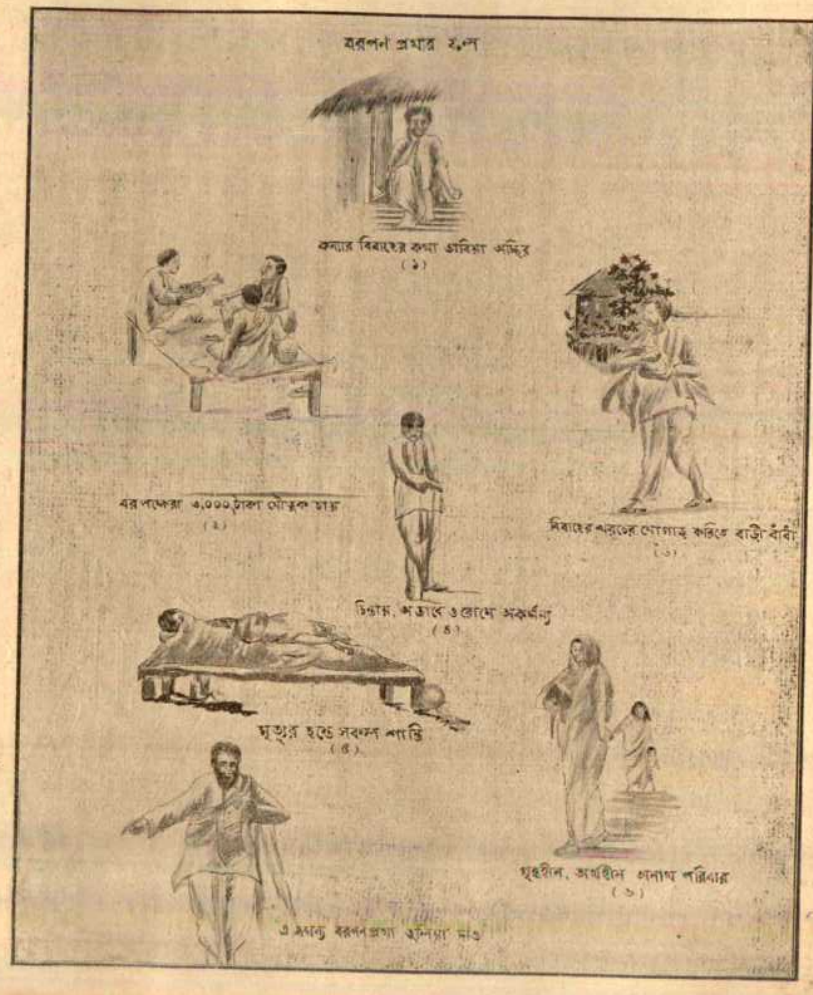
বরপণ প্রথার ফল
কন্যার বিবাহের কথা ভাবিয়া অস্থির
(১)
বর পাইবার ৩,০০০ টাকা আনুষঙ্গিক ব্যয়
(২)
বিবাহের পরিচ্ছদ যোগাড় করিতে বাড়ী বাঁধা
(৩)
চিন্তায়, শোকে ও দুঃখে অকর্মণ্য
(৪)
মৃত্যুর হস্তে সকল শান্তি
(৫)
গৃহহীন, অর্থহীন অনাথ পরিবার
(৬)
এ সমস্ত বরপণ প্রথা তুলিয়া দাও

WHERE IS THE BENGALI?

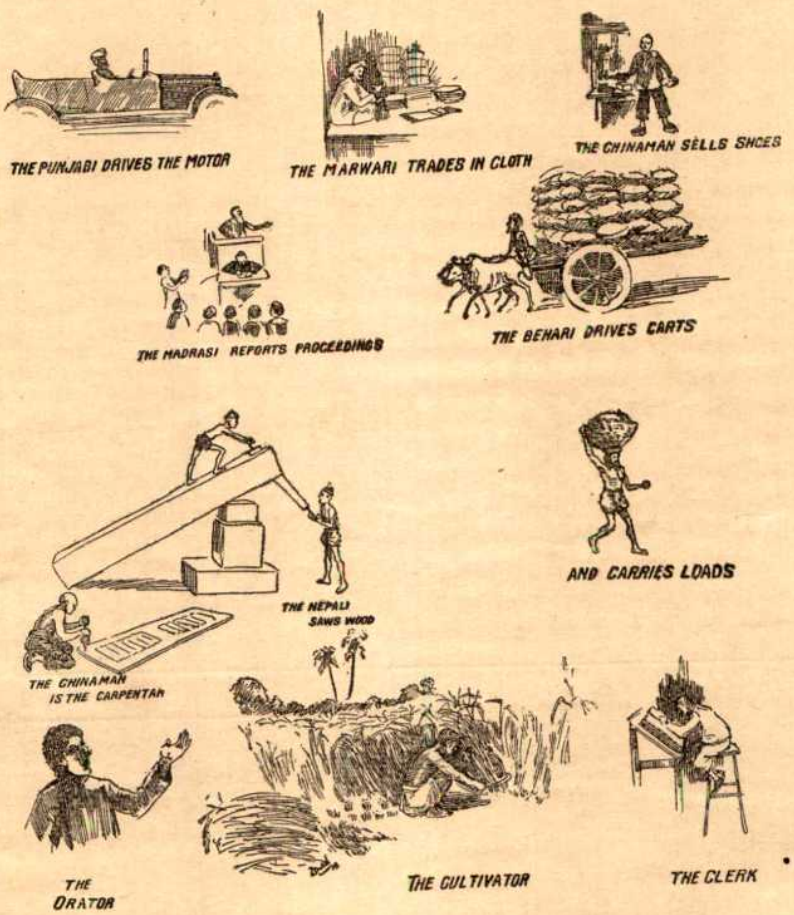

তুলনা, এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের তুলনা নানা-বিধ ছবি ও নক্সা দ্বারা করা হয়; এবং বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার, জাতির এবং পুরুষ ও নারীর শিক্ষার অবস্থা দেখান হয়। শিশুমঙ্গল বিভাগে শিশুর দৈহিক মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে, এবং সুশিক্ষা কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হয়। সমাজতত্ত্ব বিভাগে কলিকাতায় ও অন্যান্য বড় বড় সহরে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ার কুফল প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। বিবিধ বিভাগ দশটি উপবিভাগে বিভক্ত।

স্বাস্থ্যবিভাগের নানা তথ্য হইতে জানিতেছি, যে, (ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিয়া) জাপানে লোকসংখ্যার হাজারকরা বার্ষিক জন্মসংখ্যা ৩২·৮, মৃত্যুসংখ্যা ২০·৮, উদ্বৃত্ত বাঁচিয়া থাকে ১২ জন; ভারতবর্ষে জন্মে ৩৮·৫, মরে ৩৪·২, বাঁচিয়া থাকে ৪·৩। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে মধ্য-প্রদেশ ও বেরারের জন্মসংখ্যা সর্ব্বাধিক, ৪৭·৯; মৃত্যু-সংখ্যা সর্ব্বাধিক পঞ্জাবে, ৩৬·৩; উদ্বৃত্ত বাঁচিয়া থাকে সর্ব্বাধিক আজমীরে, ১৭·৭। বঙ্গের অবস্থা অতি ভীষণ; এখানে জন্মে ৩১·৬, মরে ৩২·৮, উদ্বৃত্ত থাকে না এক জনও, লোকক্ষয় হয় বৎসরে হাজারকরা ১·২ জন। এই অঙ্কগুলি ১৯১৫ সালের। পরেও অবস্থা বিশেষ ভাল হয় নাই। বঙ্গের মত দুরবস্থা আর কোন প্রদেশের নহে।

আর-একটি নক্সায় দেখান হয় যে মানুষের গড়পড়ুতা আয়ুষ্কাল সুইডেনে ৫০·৯, বৎসর ফ্রান্সে ৪৫·৭, ইংলণ্ডে ৪৯·১, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলে ৪৯·১, ভারতবর্ষে ২৩·৬।

ILL-FED COW
LEAN CHILD
WEAK MAN

WELL-FED COW
HEALTHY CHILD
STRONG MAN

LITERARY PERCENTAGES

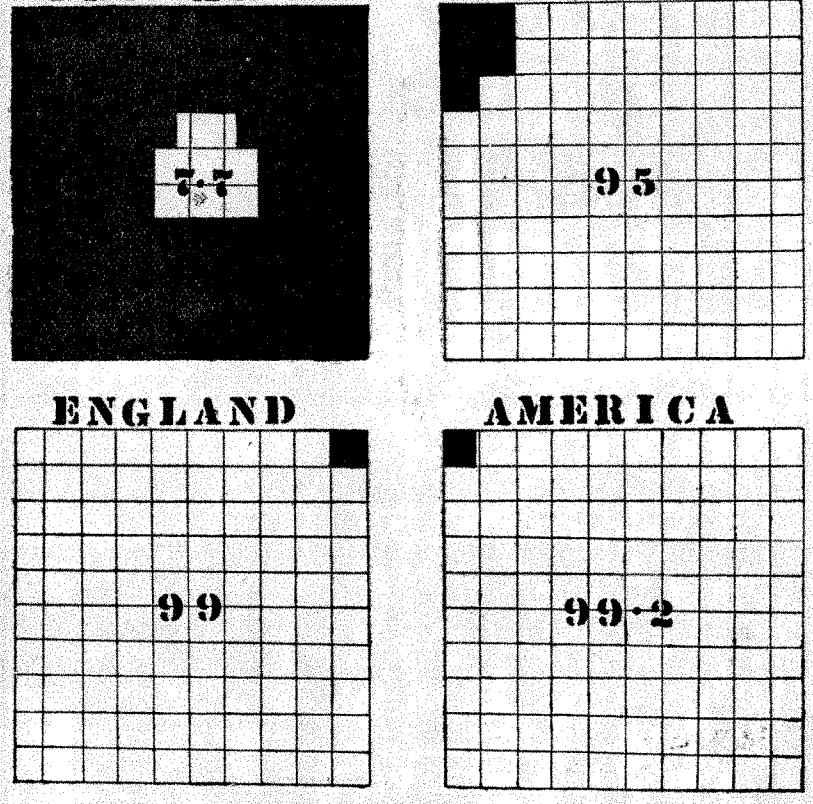

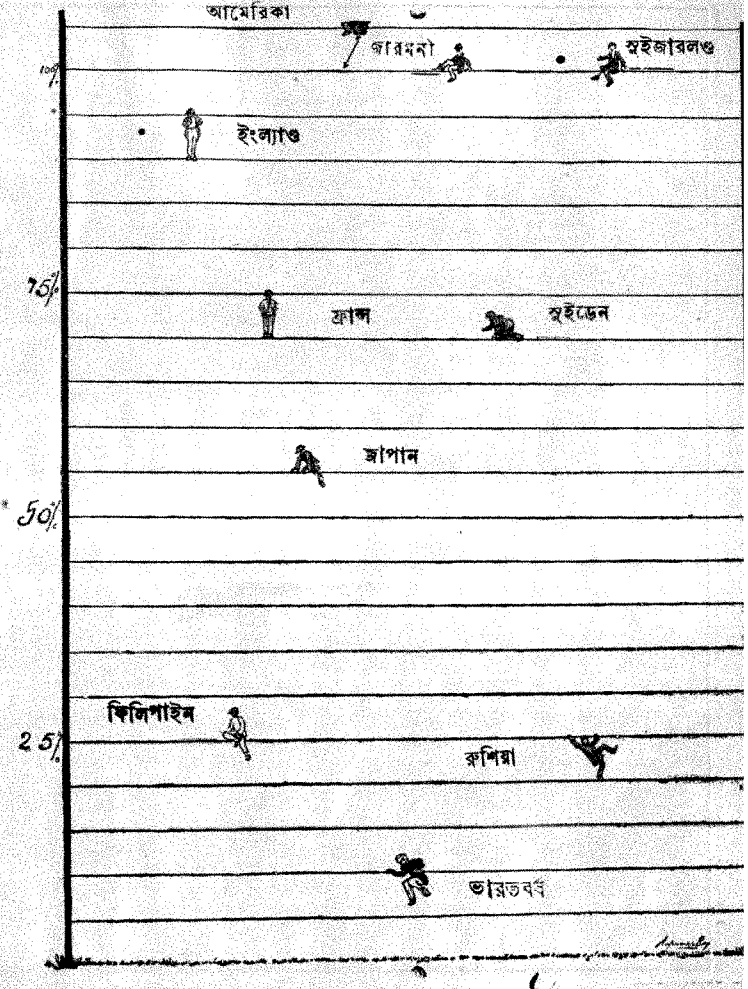

TRAVANCORE
5%
BENGAL
1%
BARODA
1%

ANTI-INFECTION ALLIES
FRESH AIR FROM OPEN WINDOWS.
FIRE: BOILING GERMS.
SQUARE CLEAN TEETH
AND SOUL CHEERFULNESS;
SUNLIGHT GERM-KILLER
EXERCISE IS HEALTH'S BEST ALLY
MEAT-SAFE
COVER
(AGAINST FLIES)
CLOSE CUT NAILS
GIVE NO QUARTERS TO DIRT.
MOSQUITO NET
(DEFENCE AGAINST MOSQUITOES)
PLAIN WHOLESOME FOOD

THE COMPETITION for LITERACY.

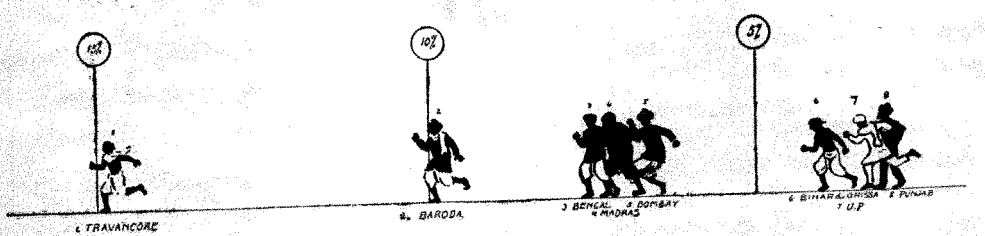

কলিকাতার হাজারটি শিশুর মধ্যে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ৬৭৫টি এবং আর্ম্মানী ষ্ট্রীট ও রাধাবাজার অঞ্চলে ৫০৫টি মারা যায়। লণ্ডন কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বড় সহর, সেখানে শিশুমৃত্যু হাজারকরা ১০০।

শিশুর ও অধিকবয়স্ক লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়ও নানা চিত্রে প্রদর্শিত হয়। সমুদয় রিপোর্টটির চুম্বক দিবার স্থান নাই। আমরা বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর অক্লান্তকর্ম্মা সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের সৌজন্যে যে ছবিগুলি মণ্ডলীর ব্লক হইতে ছাপিতে পারিতেছি, তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি।

(১) বঙ্গে ৪৫ লক্ষ বিধবা আছেন। ইহাঁদিগকে কি প্রকারে স্বাবলম্বিনী করা যায়, তাহার কতকগুলি উপায় এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) সদ্যোজাত শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে হইলে কি কি করা উচিত নহে, এবং কি কি করা উচিত, তাহা এই ছবিতে দেখান হইয়াছে।

(৩) এই ছবিতে বরপণ প্রথার কুফল দেখান হইয়াছে।

(৪) পাঁচজন বাঙালী খনির মজুর যত কাজ করে, দুজন ইংরেজ খনির মজুর তাহা করে, এই ছবিতে এই তথ্যটির প্রতি দ্রষ্টাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে। কেন এমন হয়?

(৫) এই ছবিতে দেখান হইতেছে যে, লাভের কত কাজ ও কারবার বাঙালীর হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। পঞ্জাবী মোটর চালায়, মাড়োয়ারী কাপড় (ও অন্য অনেক জিনিষ) বেচে, চীনা জুতা বিক্রী করে ও নিপুণ ছুতারের কাজ করে, মান্দ্রাজী শ্রুতিলেখক সভায় বক্তৃতা লিখিয়া লয়, বেহারী গাড়ী চালায় ও মোট বয়, নেপালী কাঠ চিরে, (উড়িয়া পাল্কী বহে, জলের কল প্রভৃতির কাজ করে); ইত্যাদি। বাঙালী বক্তৃতা করে, চাষ করে, ও কেরানীগিরি করে। অনেক জেলায় আবার চাষের জন্য অন্য প্রদেশ হইতে মজুর আমদানী করা হয়; এবং কেরানীগিরিতেও মান্দ্রাজীরা খুব ভাগ বসাইতেছে।

(৬) (৭) গাভীকে ভাল করিয়া খাওয়ান, এবং খাইতে না দেওয়ার, সুফল ও কুফল যথাক্রমে এই দুটি ছবিতে দেখান হইয়াছে।

(৮) এই ছবিতে চারিটি দেশের নিরক্ষরতা ও লিখন-পঠন-ক্ষমতা তুলনা করা হইয়াছে। কাল চৌকাগুলি নিরক্ষরতা এবং শাদা চৌকাগুলি লিখন-পঠন ক্ষমতার সূচক।

(৯) কতকগুলি দেশের শিক্ষার অবস্থা একটি সিঁড়ির দ্বারা দেখান হইয়াছে। ভারতবর্ষ সকলের নীচের ডাণ্ডাটিতে, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডল সর্ব্বোপরি।

(১০) ইহা স্ত্রীশিক্ষার অবস্থামূলক; বঙ্গে শতকরা ১ জন, বড়োদায় শতকরা ২ জন, ত্রিবাঙ্কুড়ে শতকরা পাঁচ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে।

(১১) রোগের সংক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহার কতকগুলি এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১২) শিক্ষার প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। এই দৌড়ে ত্রিবাঙ্কুড় জিতিয়া সকলের আগে চলিয়াছে।

ভারতে উৎপন্ন শর্করা, ও শর্করার খরচ

ইক্ষুর আদি জন্মস্থান নিঃসন্দেহ নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ কিম্বা পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্য কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পুরাকালে ইহার চাষ আরম্ভ হয়, এবং তথা হইতে ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়। ইহা কোথাও বন্য অবস্থায় জন্মে না। যে যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া, আল্‌ফঁস্ দ্য কাঁদল্ (Alphonse de Candolle) তাঁহার চাষের "উদ্ভিদ্‌সমূহের উৎপত্তি" (Origin of Cultivated Plants, p. 158) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, যে, ইহার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ, কোচিন-চীন, বা মালয় দ্বীপপুঞ্জ; এবং তিনি মনে করেন, যে, প্রথম প্রথম ইহা বাংলাদেশ হইতে কোচিন-চীন পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে জন্মিত। প্রাচীনকালে ইহার উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি এইরূপ হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ইক্ষুর চাষের অবস্থা ভাল নয়। এখানকার আকের চেয়ে অনেক ভাল জা'তের আক অন্য কোন কোন দেশে জন্মে, এবং আক হইতে রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় চিনি প্রস্তুত করিবার ভারতীয় প্রণালীও অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং অপচয়ের কারণ।

৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবিতে দৃষ্ট হইবে, সমগ্র পৃথিবীতে যত জমীতে আকের চাষ হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক জমীই ভারতবর্ষে। সমস্ত পৃথিবীতে ৫৮ লক্ষ একর (এক একর মোটামুটি বঙ্গের তিন বিঘার কিছু বেশী) জমীতে আকের চাষ হয়, ভারতে সাড়ে সাতাশ লক্ষ একর জমীতে আক জন্মে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে কাঁচাগুড় ৩৩ কোটি মণ জন্মে, ভারতবর্ষে জন্মে কেবল মাত্র ৮ কোটি মণ। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, ভারতের আকের চাষের প্রণালী, আকের জা'ত, এবং আক হইতে গুড় ও চিনি উৎপাদনের প্রণালী অন্যান্য দেশের মত উৎকৃষ্ট হইলে এদেশে অন্যূন ১৬ কোটি মণ গুড় জন্মিত। এই-সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাও ছবিতে আর-এক উপায়ে দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রতি একর জমী হইতে কাঁচাগুড় ৩০।৩৩ মণ, কিউবা দ্বীপে চিনি ৬০।৭০ মণ, যবদ্বীপে চিনি ১০০।১২৫ মণ, এবং হাওয়াই দ্বীপে চিনি ১১০।১৪০ মণ পাওয়া যায়। আমাদের নিকৃষ্টতা বুঝিতে হইলে মনে রাখা চাই, যে, আমাদের দেশের অঙ্কগুলি কাঁচা গুড়ের, অন্য দেশের পরিষ্কার চিনির। ইহার মধ্যে আশার কথা এই, যে, যবদ্বীপে ১৮৬০ সালে প্রতি একর হইতে ৪৪ মণ চিনি পাওয়া যাইত। আকের চাষে ও চিনি উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া তথাকার চাষী ও ব্যবসাদারেরা যেমন ক্রমশঃ উহার পরিমাণ বাড়াইয়াছে—১৮৮০ সালে ৫৬ মণ, ১৯০০ সালে ৯৩ মণ এবং ১৯১৮ সালে ১০০।১২৫ মণ পাইয়াছে—তদ্রূপ ভারতবর্ষেও চেষ্টা করিলে কতকটা বাড়িতে পারে। জলবায়ু প্রভৃতির পার্থক্য বশতঃ আমরা ঠিক্ অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হইতে না হইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের দেশ এত বড় যে প্রতি একরে পরিমাণটা সামান্য বাড়িলেও মোট বৃদ্ধি খুব বেশী হইবে। উন্নতি করিতে হইলে দুই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, (১) আকের চাষের উন্নতি, (২) আক হইতে রস নিষ্কাশন ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্টতম যন্ত্র ব্যবহার ও প্রণালী অবলম্বন। চাষের উন্নতি করিতে হইলে ভাল জা'তের আক জন্মাইতে হইবে, এবং চাষের সার, চাষের প্রণালী প্রভৃতিরও উন্নতি করিতে হইবে। বীজ হইতে উৎপন্ন চারা ব্যবহার না করিলে আকের উৎকর্ষ সাধন করা যায় না। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ প্রদেশের কোইম্বাটুরে একটি পরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তথায় বীজ হইতে আকের চারা জন্মাইয়া তাহা উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে পাঠাইতেছেন। এ পর্য্যন্ত ইহার ফল উৎসাহজনক মনে হইয়াছে। এই প্রবন্ধের ছবি ও ম্যাপ ঐ পরীক্ষা-ক্ষেত্রের পুস্তিকা দেখিয়া প্রস্তুত করান হইয়াছে।

৭৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মানচিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে আকের চাষ অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী জমীতে হয়, এবং গুড়ও বেশী হয়। তাহার পর বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যা, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, ও মধ্য প্রদেশ। দেখ যাক

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কত একার জমিতে আক চাষ হয় ও তাহা হইতে কত গুড় উৎপন্ন হয়।
(১ একার=৩ বিঘা জমি)।

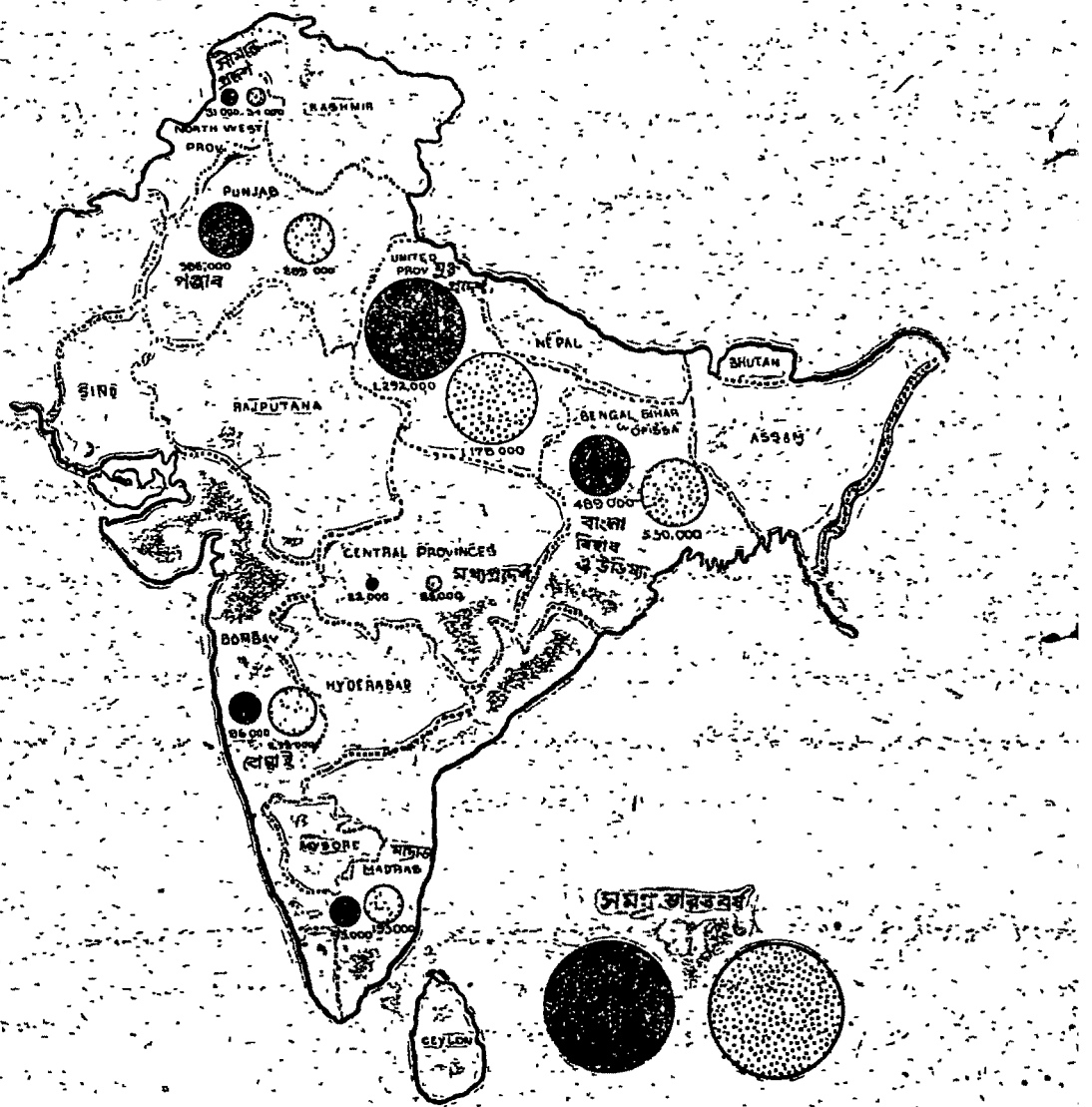

কালো চাকতিগুলি আক চাষের জমির পরিমাণ ও ছিট চাকতিগুলি উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ বুঝাইতেছে।

বৃত্তগুলি দ্বারা কত জমীতে আকের চাষ হয় তাহা দেখান হইয়াছে, এবং বিন্দুচিহ্নিত বৃত্তগুলি দ্বারা উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। মানচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, যে, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে আকের চাষ হয়ই না, এবং অন্য অনেক প্রদেশে উহার চাষ খুব বাড়িতে পারে। বাংলায় আকের চাষ খুব বাড়িতে পারে। এখানে আকের চাষ খুব প্রাচীন। এখানে ইহার উন্নতি ও বিস্তৃতি খুব হইতে পারে। এই বিষয়ে এগ্রিকাল্‌চার্যাল জর্ণাল অব্ ইণ্ডিয়া নামক দ্বৈমাসিক পত্রের মার্চ্চ সংখ্যায় মুদ্রিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য :—(১) The Development

পৃথিবীর নানান দেশের আঁক চাষের জমি ও উৎপন্ন গুড়ের তুলনামূলক পরিমাণ।

১৯১৮ সালে যত জমিতে চাষ হয়। | ১৯১৮ সালে যত গুড় উৎপন্ন হয়। | কোন দেশে কত গুড় উৎপন্ন হয়। | জাভাদ্বীপে কেন বছর যত গুড় এক একর জমির ভাঁক হইতে উৎপন্ন হয়।

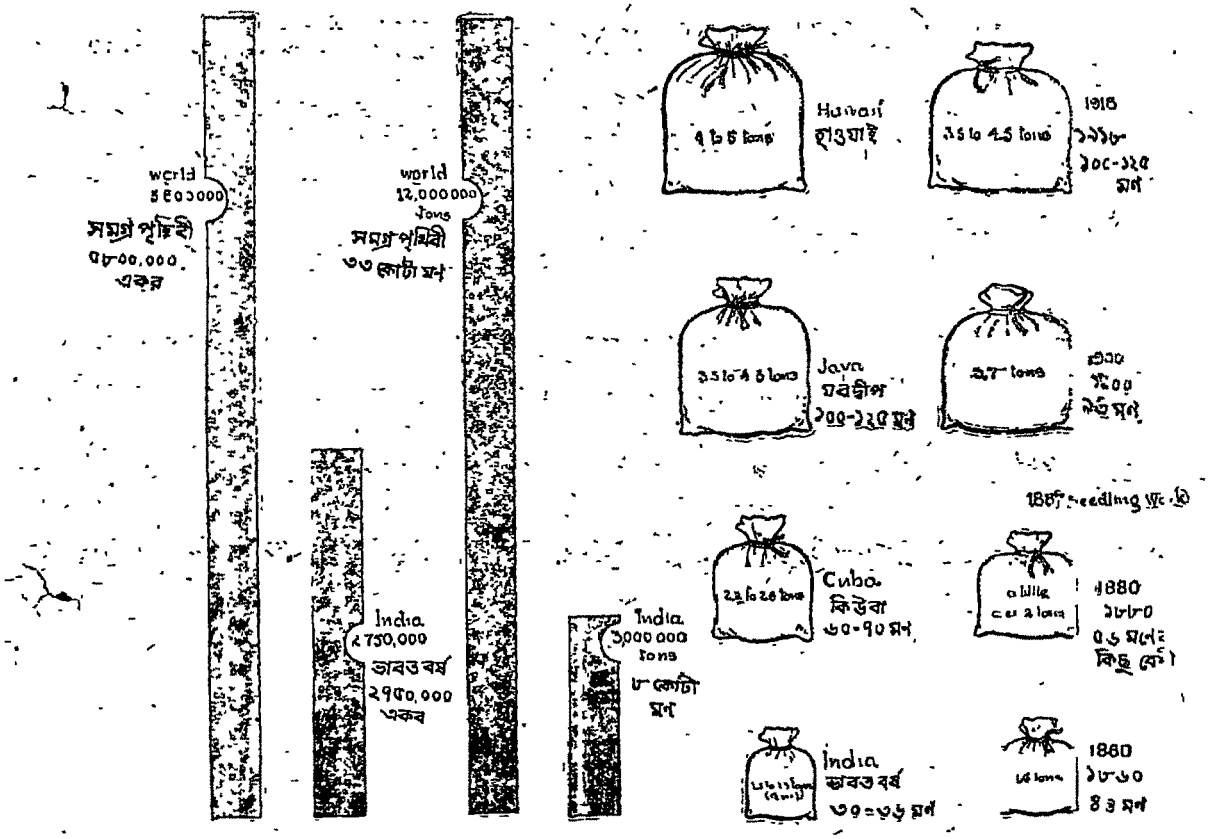

of Cane-planting by the East India Distilleries and Sugar Factories, Ltd. (২) Packing Seed Sugarcanes for Transport. (৩) The Growth of Sugarcane. (৪) What the Tucuman Experiment Station has done for the Argentine Sugar Industry. (৫) The World's Sugar Supplies. (৬) The British Empire Sugar Research Association. ৩রা এপ্রিল তারিখের নিউ ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত The Sugar Problem শীর্ষক প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

আন্দাজ করা হইয়াছে যে, ১৯০৮ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড়ে প্রতি বৎসর পৃথিবীতে ১৫৮৫০০০০ টন (১টন প্রায় আটাশ মণের সমান) গুড় চিনি খরচ হয়। তন্মধ্যে আমেরিকার ইউনাইটড্ ষ্টেট্‌সে হয় ৩৪০০০০০, ব্রিটিশভারতে ২৮৩০০০০, গ্রেট ব্রিটন ও আয়ার্লণ্ডে ১৮০০০০০, জর্মেনীতে ১৪৬০০০০, রুশিয়ায় ১১৮০০০০, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে ৬৭০০০০ এবং ফ্রান্সে ৬৪৩০০০। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা খুব বেশী, সুতরাং ভারতীয়েরা জনপ্রতি খুব কম গুড় চিনি খাইতে পায়। জনপ্রতি চিনির খোরাকে বিলাতের লোকেরা প্রথমস্থানীয়, তারপর আমেরিকার লোকেরা। উহারাই ধনী জাতি। ভারতবর্ষে উৎপন্ন গুড় ও চিনির মোট পরিমাণ অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে বেশী, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে আমাদের খরচের পরিমাণের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা প্রতি একরে ৩৬ মণের পরিবর্ত্তে ৪৫ মণ

গুড়চিনি উৎপন্ন করিতে পারি, কিম্বা আকের চাষ মোট ২৭৫০০০০ একর জমীর জায়গায় ৩৪৩৭৫০০ একর জমীতে করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিদেশ হইতে গুড়চিনি আম্‌দানী করিতে হইবে না।

ইউরোপে এবৎসর ষাট লক্ষ টন চিনির দরকার হইবে, কিন্তু উৎপন্ন হইবে ত্রিশলক্ষ টন। বাকী কিউবা, যবদ্বীপ, আমেরিকা, জাপান, প্রভৃতি দেশ হইতে আম্‌দানী করিতে হইবে। কিন্তু এইসব দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে; ইংরেজরা এইজন্য ভারতবর্ষে আকের চাষে পূর্ব্বেকার চেয়ে বেশী মন দিয়াছে। ইহা একদিকে যেমন সুলক্ষণ, তেমনি আকের চাষটা দেশী লোকদের হাত হইতে উহাদের হাতে গিয়া পড়িবার খুব সম্ভাবনা আছে। কারণ, উহাদের টাকার জোর বেশী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বেশী, কার্‌খানা চালাইবার-জ্ঞান ও অভ্যাস বেশী, এবং রাজশক্তির সাহায্য উহারা অপেক্ষাকৃত সহজে পাইতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জমীদারেরা এবং ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায় সময় থাকিতে এদিকে নজর দিলে ভাল হয়। পরে হায় হায় করিতে না হয়।

দেশী ও বিদেশী

[মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ]

আমরা জাতীয় জীবনের এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েছি। আমরা পল্লীর আনন্দে বিভোর ছিলুম—আজ কোন্ মহাশক্তি টিকি ধোরে আমাদেরকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন করেছে। আমাদের ঘরের স্নিগ্ধ প্রদীপটি নিবু-নিবু, বাইরের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে শুধু,—এখনও আমরা তা' করায়ত্ত করতে পারিনি। এইবার বাইরের সংঘর্ষ এসে পড়েছে। যাঁরা দোরে খিল দিয়ে বাইরের এই বন্যা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চাইছেন, তাঁরা পারবেন না। প্রবাদ আছে মিসেস পার্টিংটন আট্‌লান্টিক সাগরকে তাঁর কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হোতে দেখে ঝাঁটা হাতে তার গতিরোধ করতে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁরা প্রাচীন পাততাড়ি বগলদাবায় কারে নিজকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাইবেন তাঁরা তা পারবেন না—কিছুতেই পারবেন না। একটা সামঞ্জস্যের দিন এসেছে। কিছু ছেড়ে দিতে হবে—কিছু কিছু বাইরে থেকে নিতেও হবে।

এই বন্যায় আমাদের সব তলিয়ে না যায়—সেই দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। এখনও খুব ভরসার কারণ পাওয়া যায়নি। জাতীয় জীবনের একটা কলরব শোনা যাচ্ছে মাত্র; এ কি নব জাগরণ, না অন্তিম চীৎকার? আমরা শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই পরায়ত্ত হয়ে পোড়ে আছি। আমরা এখনও নিজকে চিন্‌তে পারিনি। যেদিন আমরা নিজের শক্তি বুঝ্‌তে পারব, সেদিন আমাদের জীবনের ভরসা হবে।

ধরুন আমাদের চিত্রশিল্প। রবিবর্ম্মার "গঙ্গার অবতরণ" একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র; এই আলেখ্যে শিবঠাকুর ঠিক সাহেবের মত দু পা ফাঁক কোরে কোমরে হাত দিয়ে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন এই মাত্র মুখ হোতে চুরুটটি পোড়ে গেছে। দেশীয় লোক কি প্রতীক্ষার ভাবে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়ান না? রবিবর্ম্মা পুণায় কি তা দেখেন-নি? তবে এই উৎকট ভঙ্গীর অনুকরণ করতে গেলেন কেন? শকুন্তলা-বিদায়ের ছবি আর-একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর এঁকেছেন। তাতে দেখ্‌তে পাবেন—কণ্বমুনি পাদ্রীর মত বেশ পোরে পাদ্রীর ভঙ্গীতে শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করছেন। আমার বন্ধু শশীকুমার হেশ ইটালীতে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা কোরে দিগ্‌গজ চিত্রকর হোয়ে ফিরে এসে "কর্ণকুন্তী" নামক একখানি চিত্র আঁকলেন। ঠিক মেম-সাহেব সাড়ী পোরে গালে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বোসে আছেন, তাঁকেই আমাদের কুন্তী বোলে মেনে নিতে হবে। অনেক নবীন চিত্রকরের হাতের আঁকা ছবি দেখেছি; তাঁরা কিছুতেই সাহেবের মুখের হাসি, তাঁদের দাঁড়াবার, কথা বল্‌বার ভঙ্গী ভুল্‌তে পারেন না, বাঙ্গালী নর-নারী আঁক্‌তে গিয়ে সেই সকল বিদেশী ভঙ্গীর রেখা ছবির মুখে চোখে ফুটে ওঠে। চারদিকে দেশীয় লোকের মধ্যে বাস কোরে তাঁদেরই একজন হোয়ে আমরা যে কতটা আত্মবিস্মৃত হোতে পারি, তা আর কি বল্‌ব। অবনীন্দ্র-বাবুর স্কুলের কোনো কোনো চিত্র-কর বোসে বোসে তুলি ঘোষে ঘোষে ছবি নকল করছেন; দেশীয় যারা রক্ষা কোরে যাচ্ছেন—প্রাচীন

নর্ত্তন-ভঙ্গী, মুদ্রা, এবং হাত পা আঁকবার প্রাচীন রীতি অনুসরণ করতে চাচ্ছেন—কিন্তু বাঙ্গালী জাতি সেই বহু পূর্ব্বের রীতিতে আঁকা ছবি দেখে বুঝতে পারছে না এগুলি ঠিক তাদেরই ছবি, না বিদেশের। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনের যতটা প্রতিচ্ছায়া ছবির উপর পড়বে, ছবি ততটা জীবন্ত হবে। বাঙ্গালী-জীবন লক্ষ্য করবার মত চক্ষু কয়জনের যে এদেশে আছে তা' জানি না। গগন-বাবু তাঁর বিরূপবজ্র রহস্য করতে গিয়ে কতকগুলি ছবিতে বাঙ্গালীজীবনের কিছু আভাস দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জীবনে কি ভাল কিছুই নেই যা' থেকে চিত্রকর প্রেরণা পেতে পারেন? এখুনি কি প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, আরতির ধূপ-ধুনোর গন্ধ বাতাসে মিশে গেছে? বাঙ্গালী-জীবনের যে প্রেমের বন্যায় নদীয়া শান্তিপুর ভেসে গিয়ে তা' বিশ্বকে প্লাবিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল, সে প্রেমের বন্যা কি একবারে থেমে গেছে?

—বাঙ্গালী চিত্রকর, চোখ খুলে নিজের চারদিক্ দেখে ছবি আঁকতে শেখ, ছবি দেখে আর কতকাল ছবি আঁকবে, কতকাল আর সস্তাদরের বিলাতী ছবি দেখে নকল করবে? জাপানী চং এমন কি মোগলাই শিল্প-কলা দেখে আমরা খানিকটা বিস্ময় বোধ করতে পারি, কিন্তু তাতে আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটবে না। র‍্যাফেল মাইকেল-এঞ্জেলোকে চিত্রশালা হোতে দূর কোরে দিতে হবে না,—যে দেশের যেটি ভাল তা' আয়ত্ত করতে হবে বই কি। কিন্তু আমরা ঘর যেন না ভুলি, আমাদের সুখদুঃখ যা আমাদের কাছে বড়—তা' যেন তুচ্ছ করতে না শিখি। ম্যাডোনার মুখ নকল না কোরে নিজের মায়ের মুখ দেখে আঁকলে ছবি আঁকা সার্থক হবে। ম্যাডোনা হোতে যশোদা ও মেনকা বরং, দেশে অনেক কাছে, তাঁদের ভাব বাঙ্গলা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, এবং আমাদের কুঁড়েঘরে সে রসের জীবন্ত ধারা এখনও বয়ে যাচ্ছে!

একথা বোধ হয় বলা যায় যে বাঙ্গালীর মত সুকুমার ভাবের চর্চ্চা ভারতের অন্যান্য জাতিরা অল্পই করেছেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এদেশের অন্যত্র আছে কি না আমি জানি না। উদাহরণ-স্থলে দানকেলি-কৌমুদীর একটি স্থানের উল্লেখ করছি। প্রথম শ্লোকটির জীব-গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যাটি পাঠ করুন; দেখবেন "কিলকিঞ্চিৎ" ভাবটি কি অপূর্ব্ব ভাবে চোখের কাছে ধোরে দেওয়া হয়েছে! শ্লোকটিতে মান, লজ্জা, অশ্রু ও হাসিতে মিশে চক্ষের চাউনি কি আশ্চর্য্য জটিল মনস্তত্ত্বের আভাস দেখাচ্ছে! কবি প্রেমিকার চাউনিটিকে ফুলকলির সঙ্গে উপমা দিয়ে গেছেন, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলেননি; এই প্রচ্ছন্ন তুলনায় নায়িকার চাউনির কি সুন্দর ও গূঢ় অর্থ ধরা পোড়ে গেছে! নায়কের অসতর্কতায় নায়িকা লোকজনের মাঝে কতকটা অপ্রতিভ হোয়ে পড়েছেন—তখন তাঁর চাউনিটি কেমন হোয়েছে কবি বলে যাচ্ছেন—কতকটা রাগ ও গঞ্জনাশীল ভঙ্গীতে চোখ রক্তিম হোয়েছে, যেন পাড়ির উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে; ভয়ে ও লজ্জায় চোখে জল এসেছে, যেন এক বিন্দু নীহার কুঁড়ির উপর টলটল করছে; নায়কের অসতর্ক আহ্বানে তিনি ক্রুদ্ধা হোয়েছেন কিন্তু তা' রোধ করবার শক্তি হৃদয়ে নেই, এজন্য সেই চাউনি সাড়া দিচ্ছে না এবং দিচ্ছেও, যেমন কোরে মুখের কলিটি হাওয়ার জোরকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, অথচ সেই জোরে শেষে ধরা দিয়ে আস্তে আস্তে দল খুলে প্রস্ফুটিত দেখায়। "স্তবকিনী" শব্দটি হোতে চাউনির নানা গভীর রস এই ভাবে নিঙড়িয়ে বার করা হোয়েছে। একটি চোখের ইসারা যে ভাব-জগতের কতটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য দেখাতে পারে—তার পরিচয় এই শ্লোকটিতে আছে। রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বই পড়লে পাঠকের চোখের সাম্নে ভাবের এক নূতন রাজ্য খুলে যাবে। চৈতন্যদেবের চোখের চাউনিতে শত শত স্বর্গীয় ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তা' থেকে রূপ-গোস্বামী এই-সকল তত্ত্ব বুঝেছেন। পদকর্ত্তারা তাঁদের লেখনী-মুখে সেই-সকল তত্ত্ব প্রচার করেছেন। লেখনী যা' পেরেছে তুলি কি তা পারে না? একজন বৈষ্ণব কবি লিখেছেন—"নায়িকার চোখদুটি স্থির ভ্রমরের মত—যেন মধুতে মত্ত হোয়ে আছে উড়তে পারছে না।" প্রেম-বিভোর চোখের আবেশ বুঝাতে এর চাইতে সরস ভাষা কোথায় জুটবে? "মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার" চোখের এই ভাব কি তুলিতে ফোটে না? তা' না হলে বঙ্গে যে স্বর্গের মানুষ এসেছিলেন, সেই চৈতন্যদেবকে চিত্রকর জগতের সাম্নে

একে দেখাবেন কি কোরে? তাঁর দিব্য চোখের চাউনি কি আমরা এত শীঘ্র ভুলে গেলাম? অন্যত্র কবি অপাঙ্গ-দৃষ্টির কথায় লিখেছেন "কালো তারা চোখের এক কোণে এসে পড়েছে—যেন ইন্দীবরের মাঝ থেকে হাওয়ায় জোর কোরে ভ্রমরটিকে ঠেলে এক কোণে এনেছে।" এই অপাঙ্গ-দৃষ্টি কি ছবিতে আঁকা যায় না? "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই"—এই ছত্রে কবি প্রেমিকের যে নীলস্নিগ্ধ চাউনির ইঙ্গিত দিয়েছেন তা' কবি হোতে চিত্রকরই বেশী স্পষ্ট কোরে দেখাতে পারেন। চোখের দৃষ্টির study বাঙ্গলা কবিরা যে-রকম কোরে গেছেন, সেরকম অন্য কোথায়ও তো দেখিনি; তার পাশে বাঙ্গলার চিত্রকর চুপ্‌টি কোরে বোসে আছেন, যেন তিনি তাঁদের কেউ নন্। ভাবের বৈচিত্র্য চোখে মুখে ফোটাবার মত মালমস্‌লা বাঙ্গালীর সাহিত্যে বাঙ্গালীর ঘরে অনেক আছে। তা' নিয়ে চর্চ্চা কর্‌লে বাঙ্গালী চিত্রকর প্রথম শ্রেণীর আসন অনায়াসে দখল কর্‌তে পারেন। সে পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা গ্রীক আদর্শের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও নরদেহে স্নায়ুর সমাবেশ বিস্ময়ে হাঁ কোরে দেখ্‌ছি। গঠনের যে পূর্ণতা আমাদের নেই, তা' নিয়ে হতাশ ভাবে নিজ জাতিকে ধিক্কার দিচ্ছি। অথচ সূক্ষ্মতর ভাবের সৌন্দর্য্য, যাতে আমরা জয়ী হয়েছি, সেটি কাছের জায়গা থেকে আবিষ্কার কর্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কেবল শরীরের গঠন ও হাত-পায়ের ভঙ্গী নকল কোরে কি হবে? আগমনী গান থেকে, রামপ্রসাদের ভাব থেকে—এখনও নরনারীরা এদেশে যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও স্নেহ দেখিয়ে থাকেন তা থেকে তুলি জীবন্ত রস গ্রহণ করুক। এইটি বিশেষ কোরে জান্‌তে হবে, যে আমরা সুকুমারবৃত্তিগুলিকে তপস্যার রাজ্যে নিয়ে পৌঁছিয়েছি। অন্য কোনো জাতি সেই মাত্রায় তাদের চর্চ্চা করেননি। এই তপস্যার জিনিষটা তুলির রেখায় অভিব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লে, জগৎ তা দেখে মুগ্ধ হবে। আমাদের ঢাকার মস্‌লিন,—আমাদের মনোহরসাই গান—একান্তভাবে বঙ্গের নিজস্ব—তা হারিয়ে ফেলে যদি আমরা ৪৯এর থান বুনে কৃতিত্ব দেখাই কিম্বা অর্‌গানের গানের নকল করি—তা'হলে আমাদের জোরের জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হয়। এসকল বাইরের পাওয়া জিনিষ যে আমরা একবারে ছেড়ে দিয়ে বস্‌ব—তা বল্‌ছি না। হয়ত নিত্যকার দর্‌কারের জন্য সেসকল সাজসরঞ্জামেরই দিকে বেশী লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে—কিন্তু আমাদের শিল্পসাহিত্যের তুঙ্গ মণিমন্দির ভেঙ্গে ফেল্‌লে—যেন উষার কপাল থেকে অরুণরাগ মুছে ফেলা হবে। যা' কিছু এ দেশের গৌরবের, তার জন্য বড় একটা স্থান রেখে শেষে বাজারের হিসেব-নিকেশের ফর্দ্দ প্রস্তুত কর্‌তে হবে।

বিদেশী লোকের প্রশংসার একটা মূল্য আছে, কিন্তু তাকে মনের ভিতর বাড়িয়ে ভাবা উচিত নয়। ধরুন, আমাদের ঠাকুর-দেবতার পূজো—এর সঙ্গে বঙ্গীয় নর-নারীর কতখানি অশ্রুজল, কতটা উৎকণ্ঠা, কত নিশি-জাগরণ, ধন্না দেওয়া, উপবাস করা এবং চন্দন ঘষা ও শঙ্খধ্বনি হোতে আরম্ভ কোরে, চামর ব্যজন ও আরতির কথা আমাদের মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় জড়িত হোয়ে আছে—এগুলি জাতীয় চিরন্তন তপস্যার সামগ্রী। এই তপস্যাকে চিত্রে বা সাহিত্যে উজ্জ্বল কোরে দেখাতে পার্‌লে, জগৎবাসী আমাদের তপস্যায় বিশ্বাস কর্‌বে, নতুবা দেবদেবী আঁক্‌তে গিয়ে যদি তুমি জাতীয় পূজার ভাবটি ছেড়ে দিয়ে উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে যাকিছু একটা গোড়ে তোল এবং যদি সেই সস্তা কল্পনার কতকটা বাহাদুরী থাকে—তবে হয়ত ভিন্নদেশবাসী লোকেরা সাময়িক ভাবে তার পক্ষপাতী হতেও পারেন। তাঁদের যা ভাল লাগে তাই যদি চেষ্টা কোরে গড়্‌তে থাক,—তবে হয়ত বিশ্ব-সভ্যতার এক কোণে স্থানলাভ কোরে দাঁড়াতে পেরেছ বোলে একটা দর্পও হোতে পারে। কিন্তু তুমি যে পর্য্যন্ত নিজেকে আবিষ্কার কোরে নিজের মূলধন ব্যয় কর্‌তে না পেরেছ সেপর্য্যন্ত তুমি এই শিল্প-সাহিত্যের রাজ্যে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন পাবে না। তাই একান্তমনে তোমার বিশেষত্ব কি, তোমার তপস্যা ও শক্তি কোথায় তা' আবিষ্কার কর্‌তে চেষ্টা কর। নতুবা আফিসেও তুমি কেরানী, শিল্প-সাহিত্যেও তুমি কেরানী—নকল ভিন্ন তোমার অন্য কাজ নেই; তোমার চিরকালই তা'হলে একটা নিম্নের পংক্তিতে স্থান হবে। যে জাতির মঠধারী এখনও জগৎগুরু বোলে স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তার আর গৌরব তা'হলে রইল কি? একটা সাড়া পোড়ে গেছে, জগতকে আমাদের জিনিষ দেখাতে

হবে, কিন্তু নিজের ঘরের জিনিষ ফেলে বাইরের নকলনবিশী করলে সার্ব্বজনীনত্ব লাভ হবে না—পৃথিবীর প্রত্যেক বড় প্রতিভার উপর তার দেশের ও জাতির যে শীল-মোহরটি আছে সেটি খুইয়ে ফেলে কেউ বড় হননি, বাল্মীকিও নয়, সেক্‌স্‌পীয়রও নয়। আমাদের সাহিত্যও নকলনবিশগণের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ, ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি লেখকগণ তাঁদের সমাজের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান করতে দাঁড়িয়েছেন। সেগুলি তাঁদের সত্যকার প্রশ্ন। বহু শতাব্দী যাবৎ স্ত্রীপুরুষের অবাধ সামাজিক মেলামেশায় যেসকল জটিলতা তাদের নরনারীর সম্পর্কের প্রশ্নকে ঘিরে ধরেছে—য়ুরোপীয় লেখকগণ নানারূপে সেই সমস্যার মীমাংসা করতে চেষ্টিত হয়েছেন। সেদেশে একটি সুন্দরী ও গুণশীলা রমণী যদি গায়িকা, নৃত্যকুশলা, বা বাক্‌চতুরা হন, তবে সমাজ তাঁর সেই-সকল গুণ উপভোগ করতে দাবী রাখে। তাঁকে সামাজিক অনুষ্ঠানে নেচে, গেয়ে, বাক্‌কৌশল দিয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করতে হয়। সময়ে সময়ে সেই রমণীর উপর সমাজের দাবী ও সহানুভূতি অগ্রগণ্য হোয়ে তদনুপাতে স্বামীর দাবী অস্বীকৃত হতে পারে। কখনও কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামাজিক দাবী ও সহানুভূতির ফলে তিনি স্বামীকে ডিঙিয়ে মার্জ্জনা এমন কি প্রশংসাও লাভ করছেন। যেমন মোনাভানার চরিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সে দেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ একনিষ্ঠ হবার পক্ষে অনেক সময় সামাজিক প্রথা-বশতঃই কিছু কিছু অন্তরায় জুটে যায়। সুতরাং ইব্‌সেন, বার্ণার্ড-শ, বা টলষ্টয় যেসকল চিত্র এঁকেছেন—তা তাঁদের দেশের খাঁটি চিত্র। নরনারী-সম্পর্কের প্রশ্ন তাঁদের চোখের সামনে বিচিত্ররূপে জটিল হোয়ে উঠেছে, তার মীমাংসা তাঁরা অবশ্যই করবেন

কিন্তু আমাদের দেশে কি স্ত্রীপুরুষের সমস্যাটা ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়েছে? আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা ও সংযম আছে, তা কি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি না? যেসকল প্রেম-সমস্যার সন্ধি-স্থলে কোনো কোনো লেখক তাঁদেরকে এনে দাঁড় করাচ্ছেন, তার বীভৎসতা কি আপনারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন না? আমাদের পারিবারিক জীবন কি সত্যই এই উৎকট প্রেম-লীলার অভিনয়-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই যে শত শত হিন্দু গৃহস্থ চারিদিকে আছেন, তাঁদের কোনো বাড়ীতে কি এই-সকল দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে? না, বিলাতী সাহিত্যে যা কিছু পেয়েছি, আমাদের এখানে দেশের নাম কোরে যেমন কোরে হোক তার লীলাটা দেখাতে হবে—এই নকলবাজী না করলে আমাদের লেখক-জীবন মিথ্যা হোয়ে যাবে? কোনো লেখক ছাগলের মুণ্ড নরদেহে কিছুতেই জোড়া না দিতে পেরে মুসলমানী নায়িকার আমদানী কোরে মনের সখ্ মিটিয়েছেন—কিন্তু তাতে কোরে মুসলমানেরা ভারি চোটে গেলেন। আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের পারিবারিক জীবনটাকে আশ্রয় কোরেই এই প্রেমের তাণ্ডব খেলাটা কোনো কোনো লেখক খুব জমিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সেই-সকল ভদ্র পরিবার যে এইরূপ দুর্নীতি প্রশ্রয় দেন, এটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। হিন্দুজাতির নিগূঢ় প্রীতি প্রত্যেক সৎপরিবারের মজ্জাগত। সে পরিবার গোঁড়া হিন্দু হোন্ বা ব্রাহ্ম হোন, এবিষয়ে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধুদের তরফ থেকে তাঁদের সমাজের প্রতি এই অসম্মানকর গ্লানির আরোপের কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না। আমরা শুনতে পাচ্ছি ক্ষণিক উত্তেজনা—যার ফলে জীবন একবারে নষ্ট হয়ে যায়—সেই উত্তেজনার নাম নাকি রস্—সেই উত্তেজনার নাম প্রেম, সেই উত্তেজনা-জনিত স্বেচ্ছাচার দেখানই আর্ট। এই শ্রেণীর লেখকগণ কেবল হাঁক্‌ছেন ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ, হোক্ না কেন তা তাজমহল—ওগুলি পুরাণো আদর্শ—এখন ওসকল রেখে কি হবে? হোক না তা নিষ্ঠা, লজ্জা, বিনয়—ওসকল প্রাচীনদের মতে সদ্‌গুণ; এখনকার গুণ হবে—স্বেচ্ছাচার, যা খুসী মনে হবে তাই সেই ভাবের দরিয়ায় গা ঢালা। কিন্তু এটি যদি সত্যই আমাদের দেশ চাইতো, তবে কুড়ুল হাতে কোরে আমিও তাদের দলে ভিড়ে যেতুম। কিন্তু যেদেশে স্ত্রীলোকেরা 'মা' ভিন্ন অন্য ডাকে বাইরের লোককে সাড়া দেন না, সে দেশে এ সমস্যা আসেনি, একথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি। এইসকল লেখক এদেশীয় নারী-প্রকৃতিতে এরূপ কল্পিত অসংযম আরোপ কোরে তাঁদের মা-বোনদের অপমানিত

করছেন। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যাঁরা এই বিলাতী নকল চালাচ্ছেন—তাঁরা তাঁদের মা-বোন্‌দের হাতে তাঁদের রচিত বইগুলি দিয়ে দেখ্‌বেন তাঁরা সেইসকল পুস্তক পোড়ে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করেন কি না। তাঁদের মন্তব্য আগে নিয়ে তারপর বই প্রকাশ কর্‌বেন।

পারিবারিক স্নেহ ও প্রেম আমাদের জাতীয় তপস্যা। বিলাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে তর্ক উঠেছে। যেসকল জাতি বিরাট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যাঁরা কথায় কথায় আর্কটিক সমুদ্রের শেষ দেখ্‌তে প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে চোলে যান, গোলকণ্ডা হোতে সুরু কোরে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানোডা পর্য্যন্ত সমস্ত রত্নখনির প্রতি যাঁরা অভিনিবিষ্ট, সহস্র প্রকারের বিচিত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও যান দ্বারা যাঁরা সমুদ্রতল আলোড়ন কর্‌ছেন, আকাশকে রাজ-পথে প্রবর্ত্তিত কর্‌ছেন; ঘরে বোসে থাক্‌বার তাঁদের অবসর কোথায়? পারিবারিক সম্পর্ক তাঁদের নিকট খুব উঁচু হোতে পারে না—উহা শুধু কর্ত্তব্যের আকার ধোরে তাঁদের চোখে পড়ে—উহা তাঁদের জীবনের প্রেরণা বা তপস্যা নয়। কিন্তু বাৎসল্য ও দাম্পত্য এখনও বাঙ্গলার তপস্যার সামগ্রী। তার উপরে ঘা দিলে আমাদের যেটা এখনও একমাত্র তীর্থ, তার পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে—অন্যকোনো দিক থেকে যে সে ক্ষতিপূরণ হবে—তার তো সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-জীবনের সারাদিনের ক্লান্তির পর জুড়োবার যে স্থানটি আছে, তার মাঝে অ্যানা ক্যারেনিনা গুইনিভিত বা মনাভানাকে দাঁড় করালে যে দুঃসহ অভিশাপ আস্‌বে তাতে কোরে বাঙ্গালীর কুঁড়েঘরখানি জ্বোলে পুড়ে খাক্ হোয়ে যাবে। আপনাদের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ আপনারা নিজেরা না পোড়ে, কিম্বা কোনো ভাল লোকের নিকট গল্পটি কেমন তা' না জেনে অন্তঃপুরে কোনো গল্পের বই পাঠাবেন না। যে সংযম ও শুচিতা হিন্দু-রমণীর নিজস্ব, এই গল্প-গুলি তা দস্যুর মত অপহরণ কর্‌বে। আর্ট এবং রসের নাম দিয়ে ভারতচন্দ্র যা করেছিলেন, এই গল্পলেখকগণ অন্যভাবে তাও ছাপিয়ে উঠেছেন। ভারতচন্দ্রের শিষ্য তখন বাঙ্গলায় বিস্তর জুটেছিল, বিদ্যাসুন্দরের দেখাদেখি "কামিনীকুমার" "জীবনতারা" প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়েছিল—সেইসকল লেখকগণ শারীরিক সুখ-লিপ্সার একটা উৎকট অবতারণিকা করেছিলেন। এ দেশ হোতে সে রুচিবিকার গেল কিরূপে? পেনালকোড্ তা' দমন কর্‌তে পারেনি। আমার বিশ্বাস আমাদের নারীচরিত্রে যে স্বাভাবিক লজ্জা ও নিবৃত্তি আছে, তা' নিজকে প্রকাশ কোরে এই-সকল লেখক-প্রক্ষিপ্ত কালিমার মিথ্যা অপমান থেকে আত্মরক্ষা কোরে এসেছে। এখনকার লেখকেরাও এই যে বিদেশী নকল চালাতে চাচ্ছেন—আমার বিশ্বাস তা এ দেশে দাঁড়াবে না। এ ভাবের অসংযম আমাদের সমাজে নেই, তা' উড়ে এসে কিছুতেই আমাদের অন্তঃপুর অধিকার কর্‌তে পারবে না। ভারতচন্দ্র ও তাঁর অনুকরণকারীদের রচনায়ও ছিল রস, তার মধ্যেও ছন্দাদি ও শব্দচয়নের এরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল যে, সেগুলি সাহিত্যিক আর্ট-বর্জ্জিত বোলে যদিও বা কেউ এ যুগে উড়িয়ে দিতে চান—সে যুগে যদি কেউ সেরূপ বল্‌তে সাহসী হোতেন তবে পাণ্ডাদের হাতে তাঁদের অনেক-রকম দুর্গতি হোত, একেবারে টিকি ধোরে টানাটানি পোড়ে যেত। কারণ সেইসকল লেখক সে যুগের পাণ্ডিত্যে বড় কম ছিলেন না। আমাদের দেশ একনিষ্ঠ প্রেম ও বহু-মনোরঞ্জনী লালসা এ দুয়ের প্রভেদ বিলক্ষণ জানে—সীতাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য ঘোরতর যুদ্ধ হোয়েছে, কিন্তু শূর্পনখার নাক কান কাট্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা হয়নি। কোন্ রস ভ্রমরের পেয় এবং কোন্ রস্ মক্ষিকার পেয়, সে-সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। 'রস' কথা শুনেই আমাদের রসনেন্দ্রিয় আর্দ্র হোয়ে উঠ্‌বে না। নগ্নতাই যদি আর্ট হয়, তবে পোষাক-পরিচ্ছদের পাছে আধুনিক কালে এত খরচ-বাহুল্য হচ্ছে কেন?

আমার বক্তব্য এই যে, বিলাতী বই পোড়ে পোড়ে সেই নকলে এ দেশে যাঁরা গল্প লিখ্‌ছেন—তাঁরা আমাদের সমাজের ছবি দিচ্ছেন না। বিলাতী সমাজের প্রশ্ন আমাদের প্রশ্ন নয়। যখন ফরাসী বিপ্লব খুব জোরে চল্‌ছিল তখন টিপু সুলতান দেখাদেখি নিজেকে "সিটিজেন্ টিপু" বোলে পরিচয় দিয়ে কাগজপত্র সেইরূপ দস্তখৎ কর্‌তেন! আধুনিক লেখকগণ সেইরূপ একটা কিছু অভিনয় কর্‌ছেন। পূর্ব্বেই বলেছি এই ক্ষেত্রে সাহেবদের প্রশংসাবাদে আমাদের কিছু

আস্‌বে যাবে না, তাঁরা যে বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তার একটা সুর যদি আমরা এখান থেকে ধরি, তা তাঁদের অবশ্যই ভাল লাগ্‌বে—তোতা-পাখীর মুখে হরিনাম শুনে যেরূপ হরিভক্তরা বাহবা দিয়ে থাকেন। কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে সে সুরটা আমাদের নিজের সুর, না একটা বেসুরো বিলাতী আম্‌দানী? কেউ হয় ত বল্‌বেন—এইসকল সমস্যা এখন জগতের সমস্যা হোয়ে দাঁড়াবে, ভবিষ্যতে সমাজ যা হবে এ তার পূর্ব্বাভাস; কিন্তু আমাদের সমাজে যে কখনও এ সমস্যা আস্‌বে তা যাঁরা ঘর-গেরস্থালি কর্‌ছেন তাঁরা বলুন, তার কোনো আভাস পাচ্ছেন কি না। শুধু কয়েকজন পুরোমাত্রায় বিদেশী ঢংএ গড়া ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারে যদি কিছু অভিনয় হোয়ে থাকে তা' সমস্ত বাঙ্গালী জাতির নামে চালাবেন না। বাঙ্গালী রমণীরা তার কোনো খবর রাখেন না, তা জান্‌তে চান্ না—আপনারা পর্দ্দা সরিয়ে সেই খবর তাঁদের দিচ্ছেন কেন,—এই আমার জিজ্ঞাস্য। আমাদের সমস্ত সমাজ থেকে একটা ধিক্কার-বাণী উঠে এই স্রোত থামিয়ে দেওয়া উচিত। যদি ধর্ম্ম-মূলক পুরাণ-কথা-গুলি এ দেশে এখন লেকেলে হয়ে থাকে, তবে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে ঢের-ঢের সত্যিকার সমস্যা এসে পড়েছে, তা' নিয়ে বেশ গল্প ও কাব্য লেখা চল্‌তে পারে—সেইসকল প্রশ্নের সমাধান আমাদের দেশ প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট চাইছেন। যাঁরা বিলাতী বইএর চরিত্রগুলি না দেখে এ দেশের জীবন্ত চরিত্রগুলি দেখ্‌ছেন—তাঁরা জানেন এখনকার উপন্যাসগুলির অধিকাংশই নিজের ঘরের পাশ কাটিয়ে বাইরের কথা নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে। মূলকথা নিজে চোখে দেখে লেখার একটা শক্তি আছে, তা সহজে অর্জ্জন করা যায় না, তা হোতে একখানি তৈরী বই থেকে প্লট ও চরিত্রের ছায়া নিয়ে তাড়াতাড়ি কুড়ি ফর্ম্মার একখানি বই লিখে প্রেসে দেওয়া সহজ।

প্রত্যুত স্ত্রীজাতির অবাধ প্রেম এখন আমাদের সমস্যা নয়। বাঙ্গলার পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরে দেখুন—বাঙ্গালী জীবনের কোন্‌গুলি গুরুতর প্রশ্ন?

প্রথম প্রশ্ন—উদরান্ন সংস্থান। কবি ও ঔপন্যাসিক কর্ম্মের মন্ত্র শিখিয়ে এই প্রশ্নের সমাধান কর্‌তে পারেন কি? বাঙ্গালী ভদ্রলোকশ্রেণী যে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছেন, —এখানে আমাদের মহা করুণার ক্ষেত্র; জলন্ত শ্মশানের বিভীষিকা। কোন্ কবি বা জ্ঞানী আজ আমাদেরকে বাঁচ্‌বার পথ দেখাবেন?—ভাবী নিরবচ্ছিন্ন আঁধার আকাশে কেউ কি একটি তারার আলো জ্বালিয়েও ত্রাণের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কন্যা-দায়। শক্তিমান্ লেখক নারী-জাতির স্বাবলম্বন, কৌমার্য্য-ব্রত এবং অর্জ্জনোপায়ের কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে আসন্ন বিপদ হোতে স্বজাতিকে উদ্ধার করার পথ আবিষ্কার করুন।

তৃতীয় প্রশ্নও সেই প্রথম প্রশ্নটির অন্তর্গত—দারিদ্র্যের ফলে আমাদের সন্তানদের অকালমৃত্যু, নানা রোগ-শোক, কুললনার আত্মহত্যা অথবা গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন। বঙ্গদেশের ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ দেখ্‌লে গা শিউরে উঠ্‌বে।

সাহিত্য শুধু একটা রস নিয়ে থাক্‌বার কথা নয়। যে সময় আমাদের দেশ কর্ম্ম সম্বন্ধে মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, নিতান্ত অভাব ও দৈন্যপীড়িত জাতির যা হোয়ে থাকে—সেই হিংসা দ্বেষ, আসন্নমৃত্যু কোনো জীবের সম্মুখীন গৃধ্র ও শকুনীর ন্যায়, পরস্পরকে আরো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছে, বিলাতের নকল কর্‌তে গিয়ে পল্লীবাসীরা পর্য্যন্ত বিলাতের সামগ্রীর দিকে ঝুঁকেছে, অথচ কোনো নিকট-আত্মীয় অনশনে নগ্নদেহে পথ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ কর্‌ছে সে দিকে দৃষ্টিপাত নেই—এই সময়ে আমরা রসিক সেজে বিলাতী-প্রেমের পালাটা গেয়ে আসর জমাবার চেষ্টা কর্‌ছি। শুনেছি, কোনো নবাব শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গানের অবশিষ্টাংশ গেয়ে নেবার একটু অবকাশ চেয়ে নিয়েছিলেন—আমরা বিদেশী ভাবে এমনই মসগুল হয়ে গড়েছি যে, ঘরের বিপদ্‌কে বিপদ্ বলেই মনে কর্‌ছি না।

চতুর্থ সমস্যা,—নিপীড়িত জাতিদিগের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা। আমাদের প্রাচীন শুচিতা নেই, অথচ তার দর্পটি আছে। অনেক হিন্দুই ছদ্মবেশী,—জাতিত্বটা মুখোসে দাঁড়িয়েছে। মুখোসটা ঋষিমুনিদের—কিন্তু ভিতরটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মুখোস পেরে আমরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভয় দেখাচ্ছি, ও নিজেরা যথেচ্ছাচার

কোরে পরের সহিত বৈষম্যের রেখা জোর কোরে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা তারা কি কোরে সইবে? সুতরাং সকল জাতির মধ্যেই একটা বিদ্রোহের শিখা জ্বোলে উঠ্‌ছে। আমাদের জাতিগত এই বৈষম্য ক্রমশঃ জটিল হোয়ে উঠ্‌ছে, ও পল্লীর পাড়ায় পাড়ায় বিদ্বেষের জ্বালার সৃষ্টি কর্‌ছে। কবি ও ঔপন্যাসিক আমাদের সমাজের এই সমস্যা হোতে নানারূপ প্লট্ সংগ্রহ কোরে কি ভাবে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হোতে পারে তা' দেখিয়ে দিতে পারেন।

৫ম সমস্যা,—আমাদের সন্তানেরা শ্রদ্ধাবিহীন হোয়ে পড়্‌ছে। জাতীয়তাই হোক কিংবা পারিবারিক আদর্শ হোক,—শিশুকাল হোতে যদি কেউ আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে চায়, কোনো নিয়মের নিকট মাথা হেঁট না কোরে, নিজের অপরিপক্ক বুদ্ধিকেই প্রধান মনে কোরে কিম্বা কোনো দলে ভিড়ে, যে স্থানে অবনতি জানালে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেই স্থানে হঠকারিতার সঙ্গে উপস্থিত হয়—তা' হলে সমাজের ভিত ধ্বসে পড়্‌বে। এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে বালকেরা নির্ম্মম এবং সর্ব্বপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত হয়ে পড়্‌ছে। এই দুর্ব্বিনয়ের মধ্যে ভাবী ধ্বংসের ছায়া দেখ্‌তে পেয়ে শিউরে উঠ্‌তে হয়। সেদিন একজন উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূষণস্বরূপ তরুণ অধ্যাপক আমাকে প্রকাশ্য ভাবে বল্‌লেন, "আমি ধর্ম্ম মানি না, ঈশ্বর মানি না!" নিশ্চয়ই কপট ধার্ম্মিকের থেকে সত্যবাদী চরিত্রবান্ নাস্তিককে আমরা উচ্চ আসন দিতে বাধ্য, কিন্তু আমাদের তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বড় স্পর্দ্ধা কি কোরে এল! এই দেশে না "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুণা" এ পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়েছে, এই দেশের বহুস্থানের মাটী ভক্তিমান্ নরনারীর শ্রদ্ধানত কপালের স্পর্শলাভ কোরে তীর্থে পরিণত হোয়ে আছে—এ দেশে এ নাস্তিকতা কোথা থেকে এল? পৃথিবীর ইতিহাস পড়্‌লে দেখা যায়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরপ্রেমই সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে প্রত্যেক জাতির জীবনে কাজ করেছে। যীশু যে শক্তি দিয়ে গেছেন—সেই শক্তি সমস্ত জগতে এখনও কাজ কর্‌ছে। যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে বোলে সে শক্তির উৎস যে শুকিয়ে গেছে, এরূপ যেন কেউ মনে না করেন। সেদিনও যীশুর দ্বিতীয় অবতার কাউণ্ট টলষ্টয় জীবনব্যাপী তপস্যা দ্বারা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে গেছেন। মধ্যযুগে র‍্যাফেল মাইকেল-এঞ্জেলো প্রভৃতি শত শত চিত্রকর —ম্যাডাম্ গায়োঁ, সিয়েনা-ক্যাথারিন্ আর এরেস্‌মাস, প্রভৃতি শত শত সাধু সেই ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ দ্বারা য়ুরোপকে সভ্যতার উচ্চ হোতে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছেন; মার্টিন্ লুথার ধর্ম্মকে সুনির্ম্মল কর্‌তে চেষ্টা পেয়ে যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত কোরেছিলেন—শিক্ষিত য়ুরোপ এখনও সেই স্বাধীন চিন্তা হোতে প্রেরণা লাভ কর্‌ছেন। আরব হোতে মহম্মদ ধর্ম্মবলে পৃথিবীর যুগ উল্টে দিয়েছেন, আর মহাবীর, বুদ্ধ, চৈতন্য এ দেশের অফুরন্ত ধর্ম্মভাবের নব নব প্রেরণায় জন্মলাভ কোরে পৃথিবীকে উদ্ধার কোরে গেছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মন্দির, সর্ব্বত্র ভজনাগার, সর্ব্বত্র তীর্থ—এইসকল স্থান হোতে কবিতার গঙ্গাস্রোত, চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের পারিজাত-কুসুম, নীতির বিশুদ্ধ ফুলমালা,—তপস্যার দুর্জ্জয় শক্তি, সান্ত্বনা ও আশার অভয়বাণী—মানবজাতির নিকট নিরবধি আস্‌ছে, তাই আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী ঘর বাসযোগ্য হোয়েছে। হঠকারী আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা কোরে বাল্যকাল হোতে সেই মহাশক্তিকে প্রতিরোধ কর্‌তে গেলে জীবনটা তাসের ঘরের মত একটু জোরে হাওয়া বইলেই ভেঙ্গে পড়্‌বে। এই নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের সমস্যা আমাদের সমাজে এসেছে,—এই সমস্যায় পোড়ে অপর জাতির যাদের বহুবিধ সদ্‌গুণ আছে, তারা হয় ত বা সাম্‌লে নিতে পার্‌বেন; কিন্তু আমাদের ভরা যে একেবারে ডুব্‌বে—তার কোনো সন্দেহ নেই। কবি ও ঔপন্যাসিক এই সমস্যা কি ভাবে পূরণ কর্‌তে চান,—তা দেখ্‌তে চাই।

তার পর দেশের বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ গেছে, দোল দুর্গোৎসব যায়-যায়—মন্দিরগুলি ধ্বসে পড়্‌ছে, মহোৎসব নামে মাত্র পর্য্যবসিত, যে আনন্দধারায় উচ্চ-নীচ এক সময়ে ডুবে যেত—দেশের সে আনন্দ কোথায়? দুর্গোৎসবে দোলোৎসবে হরির লুটে যে অজস্র আনন্দ ও ভক্তি ছিল—তা আর-কোনোরূপে আমরা পাচ্ছি কি? মাঘোৎসবে মুষ্টিমেয় লোকের আনন্দ,—বায়স্কোপ, থিয়েটার ব্যয়সাধ্য—তার শিক্ষা অনেক সময়ই অহিতকর—এখনকার

উপযোগী কোরে কি আনন্দ সমাজকে দিতে পারা যায়, তা কে ভাব্‌ছেন?—প্রত্যুত যে রস জাতীয় জীবনকে পোষণ করে, তা হোতে আমরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হচ্ছি, যে রস সুরার ন্যায় সমাজকে ধ্বংস করে, তাই বিদেশ হোতে আমদানী করা হচ্ছে।

এইরূপ শত শত প্রশ্নের মধ্যে আমরা কর্ম্মবিমূঢ় হোয়ে বোসে রয়েছি। বাঙ্গালী-জীবন পড়া মুখস্থ কোরে সেই পড়া আওড়াতে-আওড়াতেই অবসান হোয়ে যাচ্ছে! স্কুলে বই পড়া কি ছবি আঁকা, আবার বই দেখে বই লেখা ও ছবি দেখে ছবি আঁকা, আফিসে সাহেবের লেখা দেখে লেখা—সমস্ত বঙ্গদেশটা একটা বিরাট কেরানীখানায় পরিণত হোয়েছে! আমাদের লেখকদের মধ্যে যাঁদের কথা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই লেখার বেশ ক্ষমতা আছে, তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় বড়, প্রতিভায় বড়, অথচ অনেকেই সম্মুখ না দেখে দূরটা দেখেন; এখন যেন মনে হয় কাছের জিনিষটা দেখার মত শক্ত কিছু নেই। কাছের বিপদটা দেখ্‌লে—তার প্রতিকারের চেষ্টা কর্‌তেই হবে—কতকটা উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ কর্‌তেই হবে—এই চেষ্টার দুরূহতা দেখেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক—তাঁরা নকল করাটাই সহজ মনে করেছেন, —পরনীতির যে একটা মোহ ও নূতনত্ব আছে, অনায়াসে তা' দিয়ে চম্‌কিয়ে দিতে পার্‌লেই সহজে খ্যাতিটা আয়ত্ত হোতে পারে, কারু কারু এরূপ প্রতিষ্ঠা-লিপ্সাও যেন আছে বোলেই বোধ হয়।

সম্প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হোয়েছে। এই ব্যবস্থায় আমাদের যে মহোপকার হওয়ার সম্ভাবনা হোয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

এ পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলাসাহিত্য সম্বন্ধে খুব কমই খবর রাখ্‌তেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যটা যদি হাজার বছরের পুরণো হোয়ে থাকে, তবে এর ৯৫০ বছরের বিবরণ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা ৯৯ জনই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা দয়াপরবশ হোয়ে বাঙ্গলা-সাহিত্যের কিছু চর্চ্চা কর্‌তেন, তাঁরা কাছের জিনিষটা, যার অনেকটাই বিলাতী নকল, তা' এত বড় কোরে দেখ্‌তেন, যে, গোড়াকার খবরটার যে কিছু মূল্য আছে তা স্বীকার কর্‌তেই কুণ্ঠিত হতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার রামমোহন রায় এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তক বোলে মনে কর্‌তেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ঠাকুরদেবতার প্রতি বীতস্পৃহ হোলেন, কথকতা কীর্ত্তন ও প্রাচীন যাত্রা মেয়েদের জিনিষ মনে কোরে তা হোতে আল্‌গা হোয়ে গেলেন। কৃত্তিবাস কাশীরাম কবিকঙ্কণকে মুদির দোকানের মেটে প্রদীপের পাশে স্থান নির্দ্দেশ কোরে নিশ্চিন্ত হোলেন; চৈতন্যদেবকে মুচি-মুদ্দফরাসের ঠাকুর মনে কোরে তাঁকে আপনার জন মনে কর্‌তে কুণ্ঠিত হোলেন; কেবল সেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন, বাইরন; কেবল টেনিসন্, ব্রাউনিং, শেলী; কেবল বার্নার্ডশ, মেটারলিঙ্ক, ইউজিন স্যু। এই পাঠই পাঠ,—বিলাতী থিয়েটারই আমোদের স্থান—দেশ কোথায় পোড়ে রইল দেশের জিনিষ দেখে শুনে তার পর তা অগ্রাহ্য কর্‌লে কথা থাকে না। কিন্তু সে জিনিষ দেখ্‌লেন না, শুন্‌লেন না, নাক সিঁট্‌কে বিদায় কোরে দিলেন,—যেমন ভাবে কোনো কোনো শিক্ষিত হঠকারী যুবক তার মা বাপকে অগ্রাহ্য করে, পিতৃপুরুষের পূজার স্থানকে ঘৃণা করে, তেমনই ভাবে প্রাচীন সাহিত্যকে বর্জ্জন কর্‌লেন। কিন্তু কালো চামড়াটা ত বদ্‌লান যায় না, আর পিতৃপুরুষ হোতে পাওয়া মাটীর বৃত্তিও যে দেশীভাবের অনুকূল—বাইরে ঘুরে 'বা-হ-বা' কর্‌তে কর্‌তে হয়রান হোয়ে শেষে শিশু যেমন তার মায়ের আঁচল খোঁজে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আজ তেমনই কোরে মায়ের ডাক শুনেছে, তারা যেন ধাত্রীর কাছ থেকে মায়ের কোলে এসে পড়ছে, এমনই তাদের আনন্দ! দেখুন গিয়ে কি আগ্রহ সহকারে তারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ময়নামতীর গান পড়ছে, কত টীকা টিপ্পনী কোরে তারা দেশের ইতিহাসের হারানো খেই সেই-সকল বইয়ের মধ্য থেকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌ছে, বৈষ্ণব মহাজনদের পদ পোড়ে তারা বিলাতী কবিতায় যা পায়নি সেরূপ আনন্দ পেয়ে, যা ছাই পাঁশ বোলে ফেলে দিয়েছিল, তার মধ্যে যেন মাণিক খুঁজে পেয়ে আহ্লাদিত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক গৃহদ্বার হোয়ে পড়ছেন! যে-সকল চিন্তাশীলতার দুরূহ উত্তুঙ্গ

শিখরে উঠ্‌তে অভ্যাস হয়নি, যা এতদিন সহজ হোতেও সহজ মনে কোরে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল—সেই পথে এসে বিস্ময় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আর-সকল বিষয়েই শত শত নোট-বুক ও টীকা টিপ্পনী বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার টীকা টিপ্পনী অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ে মিলে মিশে নূতন কোরে কর্‌তে হচ্ছে। ঘরের ছেলে যেন ঘরে ফিরে এসেছে, এ হোটেলের রান্না নয়, এখানে নিজেদের রান্নাবান্না নিজেদের কর্‌তে হবে, তার মত মিষ্ট ও সুস্বাদু কি আছে।

প্রথম ভয় হোয়েছিল বাঙ্গলায় এম-এ পড়্‌তে দুজন একজন ছাত্রই জুটবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই প্রথম বৎসরেই ৩২ জন ছাত্র হোয়েছে। তা' ছাড়া পলিতকেশ প্রবীণ গ্রাজুয়েট দলের মধ্যে অনেকে non-collegiate ছাত্র হোয়ে পরীক্ষা দেবেন বোলে কোমর বেঁধেছেন—তাঁদের কি উৎসাহ!

বাঙ্গলায় এম্-এ দিতে হোলে প্রাকৃত পালীর ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে আর ১২টি ভাষার মধ্যে কোনো একটি জান্‌তে হবে। সেই ভাষাগুলি হচ্ছে ওড়িয়া, মৈথিলী, আসামী, হিন্দী, গুজরাটী, তেলুগু, তামিল, মরাঠী, মলয়ালম, কন্নাড, সিংহলী এবং উর্দ্দু। এই ভাষা-গুলির প্রত্যেকটির জন্য একটা সামান্য বৃত্তির সংস্থান আছে; সেই লোভে প্রত্যেক ভাষারই অন্ততঃ একটি কোরে ছাত্র আমরা পেয়েছি। আর সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দ্বাদশটি ভাষা শেখাবার যোগ্য দ্বাদশটি অধ্যাপকও পাওয়া গেছে। এ বছর যতগুলি ছাত্র পাওয়া গেছে, ভবিষ্যতে তার চাইতে ঢের বেশী ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা। গড়পড়্‌তা একটা হিসাব ধর্‌লে আর পাঁচ বছরের মধ্যে খুব সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় হোতে আড়াই শত ছাত্র বার হবেন, যাঁরা সমষ্টিগত ভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জান্‌বেন। এখন ভারত-ইতিহাস আবুল ফাজল প্রভৃতি কৃত রাজনৈতিক বিবরণ, বিদেশী ভ্রমণকারীদের অতি অল্প বিবৃতি এবং যুদ্ধজয়-পরাজয় ও ভূমিদানসূচক কয়েকখানি তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি হোতে সংগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু দেশের, লোকসমাজের, দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস অতি সামান্যই আমরা পেয়েছি। সেই ইতিহাস প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে আত্মগোপন কোরে আছে। এই আড়াই শত শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা পাঁচটি বৎসর পরে ভারত-ইতিহাসের, ভারত-সাহিত্যের, ভারত-ভাষাতত্ত্বের নূতন যুগ আরম্ভ হবে। বিদেশী পণ্ডিতগণ তখন ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্বের জন্য আমাদের মুখাপেক্ষী হবেন, এখন যেমন আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী হোয়ে আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার এই নব-অভিযান একটা প্রকাণ্ড দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বাভাস দিচ্ছে। এর মূল্য যে কতটা তা এখন নিরূপণ করা অসম্ভব। এ বিদেশী আপেল নয়, আমরা সত্যই নেংড়া ও ফজ্‌লী আমের চারা বুনেছি। আমাদের নূতন বাগানের যিনি মালী সেই আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী শক্তির আশ্রয়ে এই নবীন তরুটি আমাদের কল্পতরুতে পরিণত হবে এই আশা কোরে আমরা বোসে রয়েছি।

কিন্তু আপনারা শুনে দুঃখিত হবেন, বাইরের উৎসাহ অভাবে এই উদ্যম শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আধুনিক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের সেবা কোরেই আমরা যা কিছু কৃতিত্বলাভ করেছি। আজ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিজয়ী হোয়ে আমাদের এই ভাষাকে জগতের চক্ষে উজ্জ্বল কোরে দেখিয়েছেন। কিন্তু দেশীয় লোকের উৎসাহ কই? বাঙ্গলার জন্য এক কপর্দ্দকও কেউ দিচ্ছেন না। আমরা দাঁড়াব কোথায়? বিজ্ঞানের আকাশ-কুসুম এখনও অনায়ত্ত—কিন্তু আশায় প্রলুব্ধ হোয়ে দাতাগণ লক্ষ লক্ষ টাকা সেই দিকে ঢাল্‌ছেন। কিন্তু যা পাওয়া গেছে তার মূল্য আপনারা বুঝ্‌বেন না। একমাত্র কাশিমবাজারের মহারাজা এবং জমিদার গোপালদাস চৌধুরী সামান্য টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ দিকে হিন্দী ও মৈথিলী, যা এখনও মূল পরীক্ষার বিষয় হোয়ে দাঁড়ায়নি, তার জন্য সেইসকল দেশ হোতে প্রায়ই দশ হাজার, বিশ হাজার টাকার দান আস্‌ছে।—বাঙ্গলার জন্য কেউ দাঁড়াচ্ছেন না। যাঁরা ধনী—তাঁরা কিছু কর্‌ছেন না—আমাদের দীনা বঙ্গভাষা তাঁর ধনী সন্তানদের নিকট হাত পেতে আছেন আপনারা ৩০০০। ৪০০০।৫০০০।১০০০০ যা' কিছু তুলে দিতে পারেন, তাতে আমরা কৃতার্থ হব। পড়াবার পুস্তকগুলি টীকাটিপ্পনী সুদ্ধ ছাপাবার খরচ জুটছে না; অধ্যাপকগণ যতটা সম্ভব স্বার্থত্যাগ কর্‌ছেন, কিন্তু এইভাবে কত কাল চল্‌বে?

আজ আমি আমার জননী বঙ্গভূমির পক্ষ হোতে আমাদের মায়ের কাছে শেখা ভাষার জন্য আপনাদের কাছে দাঁড়াচ্ছি, এতে আমার অপমান নেই, লজ্জা নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলায় এম্-এর ভার আপনারা গ্রহণ করুন, তা না হোলে কে করবে? আমাদের যে ভাষা মা শিখিয়েছিলেন, যে ভাষা আমাদের মুখে যখন প্রথম স্ফুটিত তখন আমাদের মা তা অমৃত জ্ঞান কোরে শুনতেন—তাঁর কান জুড়িয়ে যেত; সেই মায়ের দান, সেই মায়ের কানের অমৃতের মর্য্যাদা আপনারা করবেন—এইটি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। একবার কৌতূহল-পরবশ হোয়ে আমাদের নবগঠিত বাঙ্গলা ক্লাসটি গিয়ে দেখুন,—আপনাদের আনন্দ হবে। ছেলেরা কি অপূর্ব্ব উৎসাহে পড়ছেন—তাঁরা অপরাপর শিক্ষা-প্রকোষ্ঠকে ধাত্রীগৃহ নাম দিয়েছেন—এবং বাঙ্গলার ক্লাস-ঘরটিকে মাতৃমন্দির বোলে জেনেছেন। এইখানে যে শিক্ষা হচ্ছে, তাতে কোরে আমাদের দেশের ইতিহাস নূতন কোরে লিখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর-একটি শাখা আছে, তাঁরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বার করছেন। দুঃখের বিষয় সেই ইতিহাসটা একবারে মাটীচাপা পড়ে গেছে, অনেক খুঁড়ে পাথর ও মুদ্রা বার কোরে সেই ইতিহাসটিকে উদ্ধার করতে হবে। কোনো কোনো স্থানে, যথা সুন্দরবনে, সেই ইতিহাস জানবার জন্য বাঘ ও অপরাপর শ্বাপদের কিবর খুঁজতে হবে। কিন্তু সে অর্থ কোথায়?

সম্প্রতি সিংহল দেশের শিক্ষাকমিশনের সদস্য ফ্রেজার সাহেব কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি সেই দেশের কোনো কলেজের অধ্যক্ষ, তিনি সেই দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে রীতির প্রবর্ত্তন কোরেছেন—আমার মতে তাই প্রকৃত রীতি। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে বলেছেন,—"বৎসরের কয়েক মাস তোমরা বাইরে থাকবে, নিজের চোখ মেলে নিজের দেশকে দেখবার জন্য।" একদলকে বললেন, "তোমরা তোমাদের গাঁয়ের আশেপাশে কতকগুলি স্থান নির্দ্দেশ কোরে একটা গণ্ডী ঠিক কোরে নাও,—সেই গণ্ডীর ভিতরে যত-রকম রূপকথা, প্রবাদ-বচন, চলিত কথা আছে তা সংগ্রহ কোরে এনে সে-সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হও.—যাদের লিখিত সন্দর্ভ আর-সবার চাইতে ভাল হবে তারা গুণানুসারে পুরস্কার ও স্কলারসিপ্ পাবে।" আর একদলকে বললেন,—"তোমরা যেখানে পুরাণো মন্দির, স্তূপ এবং পুরাণো কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, তোমাদের গাঁয়ের আশপাশ থেকে তার একটা তালিকা তৈরী কোরে সেগুলি ভাল কোরে খুঁজে, ভগ্নকীর্ত্তির খোদিত লিপি, ভগ্ন দেবগণের বৃত্তান্ত এইসকল দেখে শুনে বার কোরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক।" এই ভাবে পুরাণো হাতে-লেখা পুঁথি, দেশের ঐতিহাসিক কথা—সংক্ষেপ বিবরণই তন্ন তন্ন কোরে খুঁজবার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রদের নিয়োগ করেছেন। পল্লীতে পল্লীতে বারমাসে যে তের পার্ব্বণ হোয়ে থাকে, তা' জানবার জন্যও তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। যারা এইভাবে ঐতিহাসিক তত্ত্ব কতকটা আয়ত্ত কোরে ফেলেছে,—তাদের তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে এ দেশের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ দেখবার জন্য নিয়োগ কোরে থাকেন। তারা ঘুরে ঘুরে তাজমহল দেখছে, পুরীর মন্দির দেখছে, অজন্তা, কোণার্ক ও মাদুরা মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন,—"জাতীয় শিক্ষা, নিজের দেশের ইতিহাস, এ যে না জানলে—তার আর কি শিক্ষা হলো?" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "বিশ্ব-বিদ্যালয় কি এই শিক্ষা-পদ্ধতির অনুমোদন করেছেন?" তিনি হেসে বললেন,—তাঁরা তাঁর কলেজটি প্রথমতঃ disaffiliate করার ভয় দেখিয়েছিলেন, ক্রমাগত তাঁকে সতর্ক কোরে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিলাতের বাঘাল অর্থাৎ স্কট্ জাতীয়—তাঁর গোঁ তিনি কিছুতেই ছাড়েন নি। অবশেষে তাঁর কলেজ যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত তাঁরা হয়রান হোয়ে গেছেন, এমন কি, তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী তাঁরা ধীরে ধীরে গ্রহণ করছেন। এই হোয়ে থাকে। পুরাণো অলিগলির অন্ধকার-পথ ভেঙ্গে যাঁরা রাজপথ গড়বেন, তাঁদের পায়ে লোক-বাধার কাঁটা বিঁধবেই—তাঁরা সে-সকল গ্রাহ্য করলে পৃথিবীটা ত চিরকালই পিছিয়ে পোড়ে থাকত।

আমাদের দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণ না কোরে বিদেশী শিক্ষা-তরুর মূলে জলসেচন করলে তার যে ফল দাঁড়াবে—তা কুফল হবে নিশ্চয়। আমরা কি সাঁওতাল না ভীল যে, আমরা নূতন কোরে সভ্যতার পাঠ সুরু কোরে দেব?—এটা

পেণ্টালুন পোরে ও সোলাহাট্ মাথায় দিয়ে একবারে চেহারা বদ্‌লিয়ে ফেল্‌ব? দশহাজার বছরের তপস্যার ফল আমরা; এই দশ হাজার বছরের স্মৃতি মুছে ফেল্‌লে আমাদের প্রবীণতার কি রইল? সভ্যতার ইতিহাসে তা'হলে যে আমরা বালক হোয়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ কোর্‌ব! এখন আমরা দেশের ইতিহাস পরের মুখে শুন্‌ছি, দেশের সাহিত্য পরের চোখ দিয়ে দেখ্‌ছি।—রামায়ণের তত্ত্ব ওয়েবারের মুখে শুন্‌ছি,—মহাভারত সম্বন্ধে হপ্‌কিন্স্ কি লিখেছেন তাই জান্‌তে উদ্‌গ্রীব হোয়ে আছি। আমাদের সম্বন্ধে বাইরে কে কি বলেন, তা জান্‌বার অবশ্য আমাদের দর্‌কার আছে—কিন্তু আমাদের সর্ব্ব-প্রথম দর্‌কার আমাদের কি আছে, তা নিজেদের জানা। আমরা কয়জনে সমগ্র বাল্মীকির রামায়ণখানি কিংবা সংস্কৃত মহাভারতখানি পড়েছি? অথচ সংস্কৃতে এম্-এ পাশ কোরে ওয়েবার ও ম্যাক্‌স্‌মুলার সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হোয়ে উঠেছি।

নিজের দেশের শিক্ষার বর্ণপরিচয় না হোতেই আমরা বিলাতে গিয়ে শিক্ষালাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এই জন্যই দেশের যা' কিছু তার উপর অবজ্ঞার ভাবটি নিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ। এই জন্য যাঁরা তথাকথিত শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা নিজেদের আদর্শ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে বোসেছেন; দশমীর দিন আমরা যেরূপ দুর্গা-ঠাকুরুণকে বিসর্জ্জন দিয়ে থাকি—সেইভাবে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। আর যাঁরা নূতন শিক্ষায় ততটা অগ্রসর হন্‌নি—তাঁরা বাহিরের আলো ও হাওয়ার রন্ধ্র একবারে বন্ধ কোরে ঘরখানিকে অচলায়তন কোরে রেখেছেন।

এই দুর্দ্দিনে ভারত-লক্ষ্মীকে আমরা উদ্বোধন কর্‌ছি। তাঁর করুণাবলে ও প্রসন্নদৃষ্টিতে যেন আমরা দেশের প্রতি অনুরাগ ফিরে পাই। তাঁর পায়ের আল্‌তার দাগ দেখে-দেখে যেন আমরা ঘরের পথ চিনে চল্‌তে পারি। তাঁর শুভ ঘট যেন ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারি, তাঁর নৈবেদ্য ও চন্দনার্দ্র-পুষ্প নিয়ে যেন আমরা সমস্ত জাতি সম্মিলিত হোতে পারি। দেশকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কোরে যেন আমরা দেশহিতৈষীর ছদ্মবেশ পোরে সভাসমিতিতে গিয়ে চীৎকার কোরে করতালির চটা-পট শব্দে কানে তালা না লাগাই। যে-সকল প্রাচীন আচার রীতি-নীতি এখনকার কালের উপযোগী নয় তা' ঝরা-ফুলের মত খসে পড়ুক; আর যা আমাদের সার জিনিষ,—তা যেন, কাঠুরে যেরূপ মাণিক পেয়ে ঢেলা বোলে ফেলে দিয়েছিল, সে ভাবে ফেলে না দিই। গোপাল উড়ে বড় খেদেই গেয়েছিলেন—"কাঠুরে এক মাণিক পেল, ঢেলা বোলে ফেলে দিল—অভিমানে কাঁদ্‌ছে মাণিক মহাজনে টের পেল না।" আমরা বিদেশ হোতে অনেক নেব, কিন্তু স্বদেশকে ছাড়্‌ব না, বরং নিজের দেশকে আগে পেয়ে পিতৃপুরুষগণের চিরন্তন সাধনার ধূলি মাথায় মেখে বাইরে হোতে কি আন্‌তে পারি সেই অভিযানে বার হব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

দেশের কথা

বাঙালীর দুঃখের হাহাকার ঘুচিতে চায় না।—ইহা বাঙালীর মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়, আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয়ের বাধা। বাঙালার এই দুঃখের প্রতিকার অনেকখানিই যে বাঙালীর হাতে তাতে কোনো সন্দেহ নাই; চাই কেবল উদ্‌যোগ।

বাঙ্গালীর দুঃখ কেন?—না খাইয়া এ দেশের লোক মরিবে না ত মরিবে আর কারা? এদেশের ধোপারা আর কাপড় কাচে না, নাপিতেরা আর ক্ষৌরী করে না, বিদেশীয়েরা আসিয়া উহাদের ব্যবসায় জুড়িয়া বসিয়া কত সহজে পেটের ভাত, পরণের কাপড় জোগাড় করিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়াও কাহার চোখ ফুটে না। চাকর-বাকরের স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে উড়িয়া মালিরা। চাল ডাল, ঘি ময়দা প্রভৃতি দামী-দামী জিনিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঘরের কোণেই যে-সমস্ত অল্প-মূল্যের শাকসব্জী লতা পাতা জন্মায় তাহাও বিক্রয় করিয়া পয়সা লুটিয়া লইতেছে বিদেশী লোকেরা। এসব কাজগুলিকে এখন আর ছোট বলিয়া ঘৃণা করিলে বাঙ্গালী ক্রমশঃই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে, কোন আইনের এমন সাধ্য নাই যে তাহাকে রক্ষা করে।

দোষ কি কেবল এক পক্ষের? মাড়োয়ারী খাবারের দোকান পাইলে আমরা বাঙ্গালী ময়রার দোকানের কাছ দিয়া ঘেঁসি না, হিন্দুস্থানী ধোপা নাপিত পাইলে বাঙ্গালী ধোপা দিয়া কাপড় কাচাই না ও বাঙ্গালী নাপিত দিয়া ক্ষৌরী হইও না। কিন্তু মাড়োয়ারী কিম্বা হিন্দুস্থানীরা না কামাইয়া ও না কাপড় কাচাইয়া অঙ্গলী হইয়াও থাকিবে, তবু বাঙ্গালী ধোপা নাপিত ডাকে কি? না খাইয়া মরিলেও বাঙ্গালী ময়রার দোকানের খাবার স্পর্শ করে কি?—বাঙ্গালীর ন্যায় এমন স্বজাতিদ্রোহী জগতে আর কে আছে?—খুলনা।

ইহা সত্য ও চিন্তার বিষয় যে বাংলায় বাঙালী সকল ক্ষেত্র হইতে হটিয়া যাইতেছে। এর কারণ—বাঙালীর স্বজাতিদ্রোহিতা নয়,—বাঙালী-চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব, শ্রমকুণ্ঠা, সততার অভাব, কথা রক্ষায়

অমনোযোগ। বাঙালী চাকর অপেক্ষা ভিন্নদেশী চাকর খাটে বেশী, ফাঁকি দেয় কম; বাঙালী ধোপা নাপিত অপেক্ষা অন্যপ্রদেশী ধোপানাপিত অধিকাংশই স্বীয় ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া পটু, তারা কথা রাখে, তৎপর; বাঙালী ময়রারা খাবারের দাম সমান রাখিয়া উপাদানের দাম চড়িলে খাবারে ভেজাল দিয়া পোষাইয়া লইতে চেষ্টা করে, অন্যপ্রদেশী ময়রারা সহজে ভেজাল দিতে চায় না, তাদের ধর্ম্মে বাধে। বাঙালী ময়রার মধ্যে প্রসিদ্ধ ভীমনাগ ও নবীন ময়রা উপকরণের দাম চড়া-নামার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেশের দাম বাড়ান কমান, সন্দেশ খারাপ করেন না; তাই তাঁদের দোকানে ক্রেতার অভাব নাই। প্রত্যেক কারিগর যদি জাত-ব্যবসায় বলিয়াই নিজেকে অশিক্ষিতপটু মনে না করিয়া নিজের ব্যবসায় ভালো করিয়া শিখিয়া তার পরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্ম ভাবিয়া সততার সহিত খাঁটি জিনিসের কারবার করে তবে ক্রেতা বেশী দাম দিয়াও তাদের কাছ থেকে জিনিস কিনিতে আগ্রহই প্রকাশ করিবে। ক্রেতা যে পয়সা খরচ করে তার বদলে ষোল আনা খাঁটি জিনিস সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে; যেখানে সে ঠকে সেখানে স্বজাতিপ্রীতিও তাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। বাঙালীর এই চরিত্রগত ত্রুটি সংস্কার করিয়া যিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁর সফলতা নিশ্চিত। এই ত্রুটি যতদিন সংশোধন না হইবে, ততদিন দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে না।

দুর্ভিক্ষে ব্যয়।—গত বৎসর বজেটে দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের জন্য ১ কোটী ৬২ লক্ষ বরাদ্দ ছিল; ইহার ভিতর ৩৪ লক্ষ টাকা খরচই হয় নাই। অথচ "হা অন্ন" রব ত লাগিয়াই আছে!—জ্যোতি।

দুর্ভিক্ষের জন্য বরাদ্দ টাকা সব খরচ হইবার অবসরই ঘটিল না! অথচ যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ টাকার উপর একুশ কোটি টাকা বেশী খরচ হইয়া গেল! এবং আমাদের দেশে বিদেশী সাহেবরা যেসব বিভাগে মোটা মোটা মাহিনায় চাকরী করে, তার বেতনের হার বৃদ্ধি করা হইল!

স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা—ভারতবর্ষের সিবিলিয়ানগণ যে পরিমাণে বেতন পাইয়া থাকেন পৃথিবীর আর-কোনও দেশের ঐ-প্রকারের কর্ম্মচারীগণের তত বেতন নাই। সংস্কার আইন অনুসারে কার্য্য চালাইবার পর তাঁহাদের কর্তৃত্ব হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। তখন তাঁহাদের বেতন সম্বন্ধেও অসুবিধা ঘটিতে পারে। তাই সময় থাকিতে তাঁহারা নিজ-নিজ বেতন বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। ভারত-সচিব সম্প্রতি ইঁহাদের যে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন তাহা দ্বারা বার্ষিক প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। কোন্ বিভাগের উক্ত কর্ম্মচারীগণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

ভারতীয় সিবিল সার্ভিস	৩৬০০০০৲
ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস	২৫০০০০৲
ভারতীয় এডুকেশন সার্ভিস	১০০০০০৲
ভারতীয় ফরেষ্ট সার্ভিস	৪৫০০০০৲
ইম্পিরিয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং	১০০০০০৲
জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগ	১০০০০৲
বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস	২০০০০৲

শাসন সংস্কার ব্যপদেশে ভারতের ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ নানা প্রকার আব্দার করিতেছেন। মিঃ মণ্টেগুও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সকল-প্রকার আব্দারই মঞ্জুর করিতেছেন —চারুমিহির

তেলা মাথায় তেল ঢালা চলিতেছে! অথচ যাদের মুখের অন্ন পরিধানের বস্ত্র বিদেশীর কবলগত তারা ভিক্ষা হইতেও বঞ্চিত থাকিয়া দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া হয় মরিতেছে নয় অপকর্ম্ম করিতেছে।—

গত সপ্তাহে বঙ্গদেশে ২০টি ডাকাতি হইয়াছে। দুর্ম্মূল্যতা ইহার কারণ নহে কি?—যশোহর।

জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম—এক জায়গার পূরণ করিতে হইলে অপর জায়গায় হরণ করিতে হয়। দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের সংস্থানও না রাখিয়া যে অর্থ রাজস্ব করে দেয় তাহা হইতে ব্যবস্থা হইতেছে যারা ধনী তাদেরই আরও বৃদ্ধির! এরকম অন্যায় অসঙ্গত অস্বাভাবিক নির্ম্মম ব্যবস্থা আর কতদিন চলিবে ও আমরা আর কতদিন সহ্য করিব?

দেশের ধন যাতে দেশ হইতে বাহির হইয়া না যায় এবং দেশী লোকেরই আয়ত্তে থাকে তার যেমন চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য ও অধিক উৎপাদনের দ্বারা দেশের ধনপরিমাণ বৃদ্ধি করিতেও হইবে এদিকেও বাঙালীর উদ্‌যোগী ও তৎপর হইতে হইবে।

বাঙ্গালীরা করে না কেন?—ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসের ১৮ই তারিখে কমার্স ও ইন্ডষ্ট্রী বিভাগের ৩২২৭ নম্বর বজ্ঞাপনে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, খুলনা বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় লবণ তৈয়ারীর অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার এক ইংরেজ কোম্পানী ব্যতীত আর কেহ লবণ তৈয়ার করিবার উদ্‌যোগ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট লবণ তৈয়ার করিতে দেন না, সকলেই এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেন। কিন্তু এখন ত আর গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী যদি লবণ তৈয়ার করিতে মনোযোগী না হন, তবে বড় লজ্জার বিষয় হইবে।

—সঞ্জীবনী

ভারতবর্ষের খনিজসম্পদ যা কিছু আহৃত হইতেছে তার অধিকাংশই বিদেশীর দ্বারা। খনিজ পদার্থ ব্যয় না

হ্রাস হয়; সুতরাং বিদেশী যত আত্মসাৎ করিতেছে তত দেশ দরিদ্র হইতেছে। এদিকে দেশী লোকের সতর্ক হইয়া দেশের সম্পত্তি নিজেরাই না আগ্‌লাইলে দারিদ্র্য বাড়িবে বই ঘুচিবে না। যে-দেশের তিন দিকে সমুদ্র, সে-দেশে নুন বিদেশ হইতে আনিয়া কিনিয়া খাইতে হয়—বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদের কুটুম্বপ্রীতির ব্যবস্থার ফলে। এখন কোথাও যদি সেই ব্যবস্থায় একটু আধটু ফাঁক পাওয়া যায় সেই সুযোগ দেশবাসীর হেলায় হারানো উচিত নয়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান; কৃষির উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন ও প্রচার করা উচিত। জগতের মধ্যে যত জমিতে আকের চাষ হয় তার অর্দ্ধেক এই ভারতে; তা ছাড়া বাংলা দেশে খেজুরে চিনিও হয়; আমাদের দেশে তাল নারিকেল গাছও প্রচুর, তাল নারিকেল গাছ হইতেও রস করিয়া চিনি পাওয়া যাইতে পারে; এত চিনির উপাদান থাকিতেও ভারতের চিনির উৎপাদন জগতের মধ্যে চতুর্থ স্থানীয়। এই ব্যবসায়েরও উন্নতি করার চেষ্টা উচিত।

চিনির কাজ শিখিবার বৃত্তি।—জাভায় চিনি প্রস্তুত করিবার কাজ শিখিবার জন্য কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান যুবককে মাসিক বৃত্তি দিয়া জাভায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। উপস্থিত দশজন গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েটকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়া পাঠান হইবে।—বীরভূমবার্ত্তা। ডায়মণ্ড-হারবার-হিতৈষী।

চিনিপ্রস্তুত প্রণালী।—পল্লীবার্ত্তায় প্রকাশ, বনগ্রাম সব্‌রেজেষ্টারী আফিসের নিকটবর্ত্তী স্থাননিবাসী তকব্বর মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি পাটা-শেওলা দ্বারা খেজুর গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। আপাততঃ এক শত মণ গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এই ব্যক্তিকে সাধারণের উৎসাহ দান করা উচিত।—কাশীপুরনিবাসী।

কৃষি ছাড়া বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের দ্বারাও দেশে ধনরক্ষা ও ধনবৃদ্ধি করিতে হইবে।—

ম্যাচফ্যাক্টরী।—কুমিল্লায় একটি এক্‌সপেরিমেণ্টাল ম্যাচফ্যাক্টরী খোলা হইয়াছে। শীঘ্রই উহার তৈয়ারী দেশালাই বাজারে বাহির হইবে। কালীকচ্ছের স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আবিষ্কৃত কল দ্বারাই দিয়াশিলাই তৈয়ারী হইতেছে।—সম্মিলনী।

দেশের অভাব অভিযোগ বুঝিবার ও বুঝিয়া প্রতিকারের উদ্‌যোগ আয়োজন করিবার জন্য দেশের নরনারীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয়।—

উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়—পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলের স্মৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে একটি উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:—পাবনা দৌলতপুর গ্রামে গত সনের মার্চ্চ মাসে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়টি অতি উন্নত এবং বিশিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ডিরেক্টার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। আগামী ১৯২১ সাল হইতে পরীক্ষা দিতে পারিবে। —সুপ্রভাত।

দেশের হিতসাধনের জন্য কর্ম্মকুশলীর শক্তি, ধনীর অর্থ, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ত্রিবেণীসঙ্গমে মিলিত করিতে হইবে। যেসব মহাপ্রাণ দাতা দেশহিতে আপনাদের সামর্থ্য নিয়োগ করিতেছেন তাঁরা দেশের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্জ্জন করিতেছেন।—

দানের মত দান—আশুগঞ্জের ব্যবসায়ী শ্রীজগন্নাথ মদনগোপাল ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে একটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ২০,০০০৲ হাজার টাকা এবং যতদিন তাঁহাদের কারবার আশুগঞ্জে থাকিবে ততদিন বৎসর ১০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই দানের জন্য শ্রীযুত জগন্নাথ মদনগোপালকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।—ত্রিপুরা গাইড—চাকা গেজেট।

দ্বারবঙ্গের মহারাজার দান।—পাটনায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে দ্বারবঙ্গের বদান্য মহারাজা বিহার গবর্ণমেণ্টের হস্তে পাঁচলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—জ্যোতি।

দান।—মুক্তাগাছার জনপ্রিয় ও দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহার কুড়িখাই পরগণার অন্তর্গত ভৈরব থানার অধীনে ২৩ খানি গ্রামের বাত্যাপীড়িত ও অনশনক্লিষ্ট প্রজাগণের মধ্যে ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন।—জ্যোতিঃ।

সৎকার্য্য।—বরিশালের অশ্বিনী-বাবু বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলে ১৮০০ জোড়া কাপড়ের বরাত দিয়াছেন। ঐ কাপড় তিনি যে দামে পাইবেন, সেই দামেই বিক্রয় করিবেন। তাহা হইলে ৪/০ জোড়া কাপড় বেচা চলিবে। অনেক সুবিধা হইল। জেলায় জেলায় ধনীলোকে যদি এই ব্যবস্থা করেন, তবে গরিবের বড় উপকার হয়।—বীরভূমবাসী।

দান।—লালগোলার দানশীল রাজা রাও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি-আই-ই কান্দী গ্রামে হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য দুইটা পান্থনিবাস নির্ম্মাণকল্পে পঁচিশহাজার টাকা দিতেছেন, প্রয়োজন হইলে আরও দিবেন।—এডুকেশন গেজেট।

চাঁইবাসার উকীল শ্রীযুত রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিউড়ি ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে আঠার হাজার টাকা দান করিয়াছেন। —রায়ত।

দান—উড়িষ্যার শোণপুর রাজ্যের মহারাণী সাহেবা কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজে এম-এ শ্রেণী খুলিবার জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এম-এ শ্রেণীর উড়িয়া ছাত্রদের উড়িয়া ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্যও মহারাণী সাহেবা ৫২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে উড়িয়া ভাষার অধ্যাপকের বেতন বাবদে বৎসরে ১৮ শত টাকা খরচ করা হইবে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

রাজা কালানন্দ সিংহ এবং মাননীয় রাজা কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে ২০ হাজার টাকা দিয়া ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি ইউনিভার্সিটি রিডারশিপ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাকী ৫ হাজার টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থনীতি সম্বন্ধে পুস্তক ক্রয় করা হইবে। —রায়ত।

বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি দান।—জেলা ২৪পরগণা থানা বাদুড়িয়ার এলাকাধীন মজারদিঘী-গ্রাম-নিবাসী মুন্সী বাছতুল্লা আহম্মদ ও মুন্সী ক্রামতুল্লা-আহম্মদ সেরপুর পোলের হাটের নিকট বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে কিছু জমি দান করিয়াছেন। বোর্ড হইতে বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যালয়টি ঠিক মধ্যস্থলে হওয়াতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। মুন্সীদ্বয় নিজ ব্যয়ে পদ্মাবতী নদীর উপর পোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের অনেক সদ্ব্যয় আছে। ভগবান ইহাঁদের কল্যাণ করুন।—চব্বিশপরগণা-বার্ত্তাবহ।

সৎকার্য্যে দান।—বরাহনগরের শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী পাল মহাশয় বরাহনগরের একটি সাধারণ রাস্তা পাকা করিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটিতে ৬০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই রাস্তার নাম হইবে বনবিহারী পাল লেন।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

শিবনাথ শাস্ত্রী মেমোরিয়াল ফণ্ড।—স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে এক তহবিল গঠিত হইয়াছে। লর্ড সিংহ এই তহবিলে সম্প্রতি তিন সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

স্যার আর্চ্চি বার্কমাযার কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের জন্য একালীন পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা রয়েল টর্ফ ক্লাবের সেক্রেটারীগণও ঐ স্কুলে ৫ শত টাকা দিয়াছেন।

হাওড়ার শ্রীযুত যুগলকিশোর দত্ত মহাশয়ের পরিচারিকা শ্রীমতী রঙ্গাবণদাসী কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ে ৫০০৲ দান করিয়াছে। শ্রীমতী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাসে মাসে ২৲ ১৲ টাকা করিয়া জমাইয়া এই মহৎ দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে ধনীবৃন্দের চক্ষু ফুটিল হৃদয়ের কারণ হইবে।—যশোহর।—এডুকেশন-গেজেট।

সকল দানের চেয়ে এই মহীয়সী পরিচারিকার দান শ্রেষ্ঠ দান। যার অবস্থা আবেষ্টন শিক্ষা শক্তি যত হীন তার সৎকার্য্যের মূল্য তত অধিক। এই মহিলার সৎকীর্ত্তি দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

আর-একটি কীর্ত্তিমান যুবকের কীর্ত্তিকাহিনী পড়িয়া আমরা চমৎকৃত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। ইনি বিবাহের পণের টাকা পান নাই বলিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। পিতা-মাতার শোক, বিধবা বালিকা পত্নীর দুর্দ্দশা, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য—সকল-কিছু তুচ্ছ হইয়া গেল পণের লোভের কাছে। এঁর মৃত্যুর কারণ দুই পত্রে দুরকম প্রকাশ।—

যুবকের আত্মহত্যা।—বাবুরাম ঘোষের লেনের এক যুবক বিবাহের পণের টাকা না পাওয়ায় আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে তাহার পিতা কন্যাপক্ষের নিকট হইতে সে ৫০০৲ টাকা আদায় করিয়াছে, ঐ টাকা পিতা তাহাকে না দেওয়ায় মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করিল। মাত্র একমাস পূর্ব্বে হতভাগ্য যুবকের বিবাহ হইয়াছে।—এডুকেশন-গেজেট।

কলিকাতা বাবুরাম ঘোষের ষ্ট্রীটের শ্রীমান মতিলাল সাহা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। কারণ কনের বাপ নির্দ্দিষ্ট পণ দিতে পারে নাই। শ্বশুর জন্ম হইয়াছে বটে।—চাকাপ্রকাশ।

এই যুবকটি তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যা করিয়া নিজের পরিবারের ও সমাজের যে ক্ষতি করিয়া গেল, সেই ক্ষতি হইতে বঙ্গসমাজ শিক্ষা পাইলে তার মৃত্যু সার্থক হইতে পারে। পণপ্রথার বিষে কত পরিবার কতরকমে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তবু লোভ ঘুচিতে চায় না। কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। যার এমন সামগ্রী আয়ত্তে আছে যা বেচিয়া থোক অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাকে পরার্থের দোহাই দিলেই সে যে অর্থলোভ ত্যাগ করিতে পারিবে এমন সাত্ত্বিক স্বভাব সকল মানুষের এখনো হয় নাই। ছেলের বাপ বলিতে পারেন—যে লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুতা দূরে থাকুক, জানাশোনা পর্য্যন্ত নাই, তার টাকা দিতে কষ্ট বা অসুবিধা হইবে তাতে আমার কি? আমার সোনার চাঁদ ছেলে আছে, তার বদলে আমার সোনার চাঁদ চাই। তুমি দিতে পারো বহুৎ খুব—তুমি স্বাগত। না দিতে পারো পথ দ্যাখো। তোমাকেই আমার চাওয়া চাঁদ দিতেই হইবে এমন কথা ত আমি বলি নাই। যে পারিবে দিতে সেই লইবে এইটুকু মাত্র আমি বলিয়াছি। এই সোনার চাঁদের লোভে উদ্বাহুরিব বামনঃ তুমি যদি প্রাংশুলভ্য ফল পাইবার জন্য দুঃখ নিজের সাধে পাও ত আমি কি করিতে পারি?' ছেলের বাপের এই কথায় দোষ দিতে পারা যায় না। ছেলেও বলিতে পারেন—'যখন আত্মীয়তা হইবে, পত্নীর সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রীতি হইবে, তখন তাঁর পিতামাতার প্রতিও মমতা ও দরদ দেখানো যাইবে। এখন যাকে চিনি না, চোখে দেখিয়াছি কি দেখি নাই, তার জন্য আমার মাথাব্যথা কেন? আমারও ত একটা দাম আছে। আমার মতন গুণনিধি যে লইবে সে তার মূল্য দিবে না? না দিতে পারে আমাকে না চাহিলেই ত পারে।' বাজারে দ্রব্যের দাম চড়ে পড়ে চাহিদা ও জোগানের কমি-বেশীতে। কনের বাপের গরজ যখন প্রবল ও বরের বাপের গরজ যখন মগ্নচৈতন্যে সুপ্ত, তখন পণ দেওয়া ও লওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু কনের বাপ যদি জোর করিয়া বলিতে পারেন—কামম্ আমরণম্ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি, তবে বরের বাপেরও গরজ জাগ্রত হইয়া উঠিবে; তখন তিনি আর পণ চাহিতে পারিবেন না। কন্যা যদি যৌবনের সৌন্দর্য্যে ও শিক্ষায়

ভূষিত হইয়া সুপাত্রকে স্বাভাবিক নিয়মে মুগ্ধ আকৃষ্ট করিতে পারেন তবে মিথুনধর্ম্মের গরজে পাত্রই কনের প্রসন্নতার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে বাধ্য হইবে। কন্যাদিগকে বরণীয় সাধনলভ্য করিয়া তুলিতে হইবে তাঁদের শিক্ষায় জ্ঞানে স্বাধীনতায় মণ্ডিত করিয়া, কবির বাক্য সার্থক করিতে হইবে—ন রত্নম্ অন্বিষ্যতে, মৃগ্যতে হি তৎ—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া ফিরে না, লোকেই রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্বেষণ করে।

ত্রিবাঙ্কুরে নারীজাতির অধিকার।—ত্রিবাঙ্কুরের রাজার বয়স ৬৩ বৎসর। তাঁহার আদেশে ৩১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমূলম ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতকাল পুরুষেরা ঐ সভার কয়েকজন সভ্য নির্ব্বাচন করিতেন। বর্ত্তমান বৎসর হইতে নারীগণ সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজের জয় হউক।

ভারতমহিলা-হিতৈষী।

স্ত্রীলোকদের এইরূপে স্বাধিকার দেওয়া সকল প্রদেশের লোকেরই কর্ত্তব্য। সংস্কৃত রাষ্ট্রসভায় সভ্যনির্ব্বাচনের অধিকার প্রত্যেক প্রদেশে নারীরা পাইয়াছেন ইহা আমরা দেখিতে চাই। এর জন্য এখন থেকেই নারীরা চেষ্টা করুন; বিনা চেষ্টা ও উদ্‌যোগে কিছু লাভ হয় না—ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

দেশের কথা সংগ্রহ করিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তার নমুনা স্বরূপ শ্রীহট্ট জেলার ইন্দেশ্বর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী ও চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারীর সম্মানভূতিক কার্য্যচালক উৎসাহশীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহচৌধুরী মহাশয় জেলার একটি তথ্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা আমরা এখানে মুদ্রিত করিলাম।—

শ্রীহট্ট জিলার কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

পরিমাণ	লোক সংখ্যা। হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট	প্রতিহাজারে শিক্ষিত পুরুষ	স্ত্রী
৫৪৪৩ বর্গমাইল	১০৯৮৯৫০	১৩৬৪৭৩৯	৮৯৮২	২৪৭২৬৭১	২৮	৬

নাম।	সংখ্যা।	নাম।	সংখ্যা।
কুষ্ঠ নিবাস	১	বয়ন বিদ্যালয়	নাই
অন্ধ বিদ্যালয়	নাই	ডাক্তারি স্কুল	নাই
মূকবধির বিদ্যালয়	নাই	আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়	নাই
আতুর আশ্রম	নাই	সার্ভে স্কুল	নাই
পাগলা গারদ	নাই	শিক্ষকের ট্রেনিং স্কুল	নাই
নৈশ বিদ্যালয়	১	অনাথ আশ্রম	১
শিল্প বিদ্যালয়	নাই		

শ্রীহট্টের সবডিভিসনগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়।

সবডিভিসনের নাম।	শ্রীহট্ট উত্তর	দক্ষিণ	হবিগঞ্জ	করিম-গঞ্জ	সুনাম-গঞ্জ
থানা ও আউট-পোষ্ট	৯	৫	৭	৪	৬
গ্রাম	২৪৭০	১৬৪৩	২৫২৫	১৫৬৫	২৫৭৩
ডাক্তারখানা	১১	১০	৮	১২	৮
সমবায়-সমিতি ও ভাণ্ডার	৫০	৩৩	৩	২৬	১
প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	৫০৩	৪৭৫	৬০৪	৪৩৪	৩৩৫
পরিমাণ (বর্গমাইল)	৮৬৪	১০৬৪	৯৯৯	১০৬৬	১৪৫০

গত পাঁচ বৎসরের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

	১৯১৪	১৯১৫	১৯১৬	১৯১৭	১৯১৮
ইং সন					
কত বর্গমাইলে এক চিকিৎসালয়	১০০	১১১	১১১	১১১	১১১
গড়ে কত লোকের জন্য এক চিকিৎসালয়	৫৫৭৯০	৫০৪৬২	৫০৪৬২	৫০৪৬২	৫০৪৬২
প্রত্যেক রোগীর জন্য ঔষধের ব্যয়	৭½ পাই	৯ পাই	৯ পাই	৮½ পাই	৯৷৷ পাই
„ মোট ব্যয়	৵২½ „	৵০	।০	৵৩½ „	৵১ „

বিভিন্ন দেশে প্রতি ব্যক্তির শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয়।

দেশের নাম।	ব্যয়।	দেশের নাম।	ব্যয়।
আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ	২৲	নরওয়ে	৩৸/৩
সুইজারলেণ্ড	১০।০	ফ্রান্স	৩৷৵০
অষ্ট্রেলিয়া	৮৷৵০	অষ্ট্রিয়া	২।/১০
কানাডা	৭৷৵০	স্পেন	১৷৵০
স্কটলণ্ড	৭৵১০	ইটালি	১৵১০
জার্ম্মেনী	৫৵০	সাইবেরিয়া	৸৵০
আয়র্লণ্ড	৪৸/০	জাপান	৸৵০
ইংলণ্ড	৪৸১০	রুষিয়া	।৵১০
সুইডেন	৪৵০	ভারতবর্ষ	/০
বেলজিয়ম	৪৲		

বিভিন্ন দেশের গড়পড়তা প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয়।

দেশের নাম।	টাকার সংখ্যা।	দেশের নাম।	টাকার সংখ্যা
কানাডা	৭৫০৲	ফ্রান্স	৪১৭৲
আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ	৫৮৫৲	জার্ম্মেনী	৩৩৩৲
ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও আয়র্লণ্ড	৫৫৫৲	ভারতবর্ষ	৩০৲

আদর্শ গ্রামে কি কি চাই।

১। বিদ্যালয় ২। চিকিৎসালয় ৩। পানীয় জল
৪। গো-গ্রাসের ভূমি ৫। সমবায় ঋণদান-সমিতি ৬। সমবায় ভাণ্ডার
৮। ডাকঘর ৮। পল্লী-সমিতি।

প্রত্যেক জেলার উদ্যোগী পুরুষেরা এইরূপ তথ্যতালিকা প্রকাশ ও প্রচার করিলে দেশের সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে ও চোখ খুলিবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

সাধারণ পাঠাগারে কৃষিশিক্ষা—

গতানুগতিকতার বাঁধা পথ ছাড়িয়া বিলাতের যে ইস্কুলগুলি সাহস করিয়া একটুখানি বিশিষ্টতার পথে চলিয়াছে তাদের মধ্যে আউণ্ডেলের ইস্কুলটি একটু বিশেষ করিয়া নাম করিবার মতো। এই ইস্কুলের যাঁরা কর্ত্তা গুরুগিরিই মাত্র তাঁদের কাজ নয়;—দেশের জ্ঞানস্পৃহাকে রাশ-ছাড়া করিয়া এঁরা যে পথে স্বাধীনভাবে চালাইয়া দিয়াছেন, আশা করা যায় সে পথে এর পর অনেকেরই চলাফেরা সুরু হইবে।

এবারকার লড়াইয়ে বিলাতের লোকদের একটা শিক্ষা যা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে তা এই, যে, কোনোকারণে যদিই দৈবাৎ বাহিরের জগতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিচ্ছেদ স্থায়ী হয়, তবে তাকে রাশিরাশি গিনি এবং ব্যাঙ্ক-নোট আগ্‌লাইয়া বসিয়া অনাহারে শুকাইয়া, ককাইয়া মরিতে হইবে। তখনকার দিনে সারিসারি কলের চিমনি যে ধুম উদ্গিরণ করিবে তাতে দুর্ভিক্ষের করাল চেহারাটা একটুকুও ঢাকা পড়িবে না। সেইজন্যই আজকাল কৃষির দিকে সে দেশের হুঁসিয়ার লোকদের নজর পড়িয়াছে। যেহেতু সেটা ভারতবর্ষ নয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টও নিশ্চেষ্ট হইয়া নাই, বিষয়টা যে কত জরুরি, কি যে তার গুরুত্ব তা তাঁরাও উপলব্ধি করিয়াছেন। যে-সমস্ত উৎসাহী লোক নানাপ্রকারের গবেষণামূলক পরীক্ষাদি দ্বারা ফসলের উন্নতি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে তাঁদের সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে এই বিভাগে চল্লিশটি গবেষণা-বৃত্তি বরাদ্দ করা আছে, এবং অনতি-বিলম্বে এই সংখ্যা বাড়িয়া দেড়শতে পৌঁছিবে! কেবল ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সেই বারোটি কৃষি-কলেজ বর্দ্ধিত হারে গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য পাইবে।

তবে আউণ্ডেল ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যা করিয়াছেন তার জন্য তাঁরা কিছু আর গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের চোখ ফুটিবার আগেই তাঁরা ইস্কুলের সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদেরকে কৃষি এবং কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় শিখাইবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া পুরা-দস্তুর সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করিতে থাকেন। সাধারণ লোকে নূতনের মধ্যে পড়িলে কি করিবে, কোন্ দিকে যাইবে তার হদিশ পায় না, অচেনাকে গোড়াগুড়ি তাদের ভারি একটা ভয় থাকে বলিয়া সামান্য একটি জিনিষকে ডাইনে হইতে বাঁয় সরাইয়া রাখিতেও তাদের হাত কাঁপিয়া যায়, নয়ত বেপরোয়া বনিয়া সবকিছুকে ঘোলাইয়া তছনছ করিয়া বসিয়া থাকে। এঁরা কিন্তু যা কিছুতে হাত দিয়াছেন তাকেই সুন্দর সুষ্ঠু করিয়া করিয়াছেন, কোথাও ত্বরা-জনিত এতটুকু ত্রুটি ঘটিতে পায় নাই, এবং গবেষণার কাজও যা হইয়াছে সেগুলো খেলো দায়-সারা মতন নয়, দস্তুরমতন উঁচু দরের।

কিন্তু কেবল কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয় বলিলে এমনও মনে হইতে পারে যে ছেলেদেরকে মাঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সেখানে তারা নিজেরাই জামার আস্তিন গুটাইয়া ক্ষেতের কাজে নামিয়া পড়ে, অথবা চাষা লোকদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া চোখে দেখিয়া চাষবাসের কাজ শিখে। 'কৃষি' বলিতে এই বিংশ শতাব্দীর দিনে যা বোঝায় ঐরকম করিয়া সে-কৃষির সম্বন্ধে আদপেই কারো চোখ ফুটিতে পারে না। সেইজন্যই এরা বাইরে খোলামাঠে মাটি চষিয়া যতটুকু শিখে তার চেয়ে বেশী শিখে দুয়ারদেওয়া গবেষণাগারের ঘরে; কেবল চোখে দেখিয়া নহে, সঙ্গে সঙ্গে গভীর চিন্তা এবং পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা।

বস্তুত এই ইস্কুলে যে কৃষিবিজ্ঞান শিখানো হয় সেটা ফলিতবিজ্ঞান শিখাইবার খুব বড় একটা আয়োজনের একটি অচ্ছেদ্য অবিভাজ্য অংশ। এই ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে কারুর কৃষিব্যবসায়ে যদিই তেমন সুবিধা হইয়া না উঠে তবে ইঞ্জিনিয়ারী, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে তার পর্য্যাপ্ত পরিচয় থাকার দরুন জীবনের কোনো-না-কোনোদিকে সে একটা-না-একটা সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেই। আর যারা কৃষিকেই অবলম্বন করিয়া থাকিবে, বিংশ শতাব্দীর কৃষির কথা বলিতেছি,—ঐ সমস্ত বিষয়ে দখল থাকা ত তাদের পক্ষে অপরিহার্য্যই হইবে। আউণ্ডেল ইস্কুলে এই ফলিতবিজ্ঞান শিখাইবার ব্যবস্থা এমনই চূড়ান্ত রকমের যে তেমন ব্যবস্থা বিলাতের আর একটি ইস্কুলেও নাই—আমেরিকার Rural School বা পাড়াগেঁয়ে ইস্কুলগুলিতে কতক কতক আছে, আমাদের দেশের বেশীরভাগ কালেজগুলিতেই নাই।

জ্ঞানচর্চ্চার নানান্ দিক্ দিয়াই বর্ত্তমান যুগে প্রাণীতত্ত্বকে দেখিবার, তার লাগাল ধরিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রকৃতিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি তামাম বিদ্যার আসরে জীবতত্ত্বের আজ ডাকের পর ডাক পড়িতেছে। ডারুইন্, হাক্সলি, ওয়ালেশ, প্যাস্তিউর প্রভৃতির ঐকান্তিক সেবাপরায়ণতার ফলে সব-

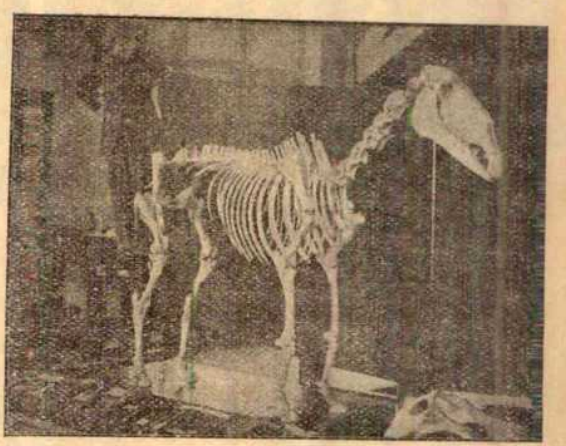

চাষের স্কুলে ঘোড়ার অস্থি-সংস্থান
এবং খুরের নানাবিধ নাল অধ্যয়নের ঘর।

আসরে সব-উপরে তার আসন। এই ইস্কুলের কর্ত্তারা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া ইস্কুলের অবশ্য-শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির মধ্যে জীব-তত্ত্বকে তার যোগ্য স্থান দিয়াছেন। তা ছাড়াও পর পর কতগুলি বিশেষ শ্রেণীতে এই জিনিষটিকেই আদত বলিয়া শিখানো হইতেছে। জীবতত্ত্বের ল্যাবরেটরিটিতে অণুবীক্ষণ, ডিম ফুটাইবার তা'-কল, breeding cage বা আঁতুড়-খাঁচা, সামুদ্রিক ও অন্য রকমের জন্তুজ জীব ও উদ্ভিজ্জ জীয়াইয়া রাখিবার পাত্রাদিরও জোগান পুরাদস্তুর রহিয়াছে। ইহারও উপর ইস্কুলসংলগ্ন বিস্তীর্ণ একটি বাগানে আছে,—অ্যাল্‌পাইন অরিকুলা, জেন্টিয়ান্ প্রভৃতি পাহাড়ে গাছপালা, ছায়ার কাঙাল রকমারি ফার্ণ্ বা পালঙ্, খোলা আলোহাওয়ার পক্ষপাতী পিঙ্ক্, প্যান্‌সি, আইরিস্, মারগারাইট এবং আরো রকমবেরকমের মরসুমি ফুলের গাছের ঝাঁক, নালা-ডোবার শ্যাওলা পানা, পেঁকো জলার ধারের নলখাগ্‌ড়ার বন, সাগরপারের তরুগুল্ম, আর নানা ধরণের লতার বিতান।

ইস্কুলের ছেলেদের সমাজসেবায় মন লওয়াইতে তাদের দিয়া সেই জেলার ক্ষেতখামারগুলি জরিপ করানো হইতেছে, সেগুলি লইয়াই নানারকম পরীক্ষার কাজও চলিতেছে। আশেপাশেকার চাষীদের সুবিধার জন্য শস্যবীজ, মাটি, প্রভৃতি বাছাইয়ের কাজও ছেলেরাই করিতেছে। তাদের চাষসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া বেদুরস্ত হইয়া গেলে সেগুলোকে মেরামত করিয়া দিয়া আসে এরাই, আবার এরা না হইলে সে তল্লাটে কারো ঘোড়ার খুরে লোহার নাল পরানো হয় না। অথচ সে দেশের কৃষিকাজের সব বিভাগেই কল চালানোর রেওয়াজ সুরু হওয়া সত্ত্বেও ঘোড়াকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াও চলিতেছে না, কোনোদিন চলিবে কি না তাই বা কে বলিতে পারে? এই-সব কারণে ছেলেরা নিজের হাতেই ঘোড়ার হাড়ের সঙ্গে হাড় জুড়িয়া একটি সম্পূর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি খাড়া করিয়া ঘোড়ার শরীরের গড়ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান বিষয়ে সরাসরি রকমের জ্ঞানলাভ করে। তারই নীচেকার ভিত্তিপটের উপর থাকে থাকে নানা রকমের নাল সাজাইয়া রাখিয়া প্রত্যেকটির উপর নাম লিখিয়া দেওয়া হয়, ছেলেরা তাই দেখিয়া এবং নালগুলিকে হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া খুব অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে সেগুলিকে

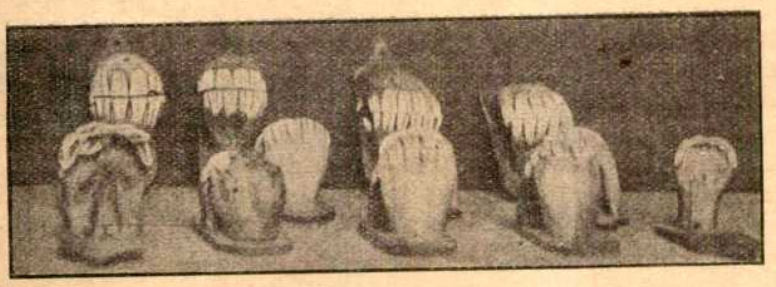

ঘোড়ার দাঁত—বিভিন্ন বয়স ও রোগ চিনাইবার জন্য।

চিনিয়া ফেলিতে পারে। খুরে নাল ঠুকিয়া পরাইতে যে কয়েক রকমের পেরেকের ব্যবহার আছে এ-সমস্তের সঙ্গে তারও একটি সংগ্রহ থাকে, আর থাকে ঘোড়ার নানাবয়সের নানাধরণের দাঁতের পাটির সংগ্রহ। সেগুলির সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচিত হইয়া ছেলেরা ইহার পরদাঁত দেখিয়া কেবল যে ঘোড়ার বয়সই ধরিয়া দিতে পারে তা নয়, ঘোড়ার দাঁতের অনেক রকমের অসুখ অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধেও তাদের চোখ খুলিয়া যায়।

কিন্তু গবেষণাগারের বদ্ধঘরজায় যত রকমের কাজ তারা করে তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি এবং দরকারি যেটি সেটির কথা এখনও মোটে বলাই হয় নাই।

ফসলের শত্রু অসংখ্য। তার মধ্যে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি কতগুলির উপর কৃষকের হাত নাই, যেগুলির উপর আছে তার মধ্যে শলভ বা পঙ্গপাল এবং সেই স্বভাবাপন্ন নানাজাতি পোকামাকড় প্রভৃতির উপদ্রবই হয় সবচেয়ে ভয়াবহ। এটা জানিয়াই ইস্কুলের উপরওয়ালারা গবেষণাগারে রাজ্যের যত পোকামাকড় আনিয়া জড়ো করিয়াছেন। সেখানে নাই—ফসলের শত্রু এমন কোন পোকাই নাই। এই ইস্কুলের শিক্ষার্থীরা সেগুলির আকৃতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সকল রকমের তথ্য গোড়া হইতেই জানিয়া রাখে বলিয়া যখন কোনো ক্ষেতে পঙ্গপাল পড়ে তখন তাদেরকে অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতে হয় না। সেগুলি কোন্ জাতীয় পঙ্গপাল সেটুকু নির্ণয় করিতে পারিলেই সেগুলিকে সবংশে নির্ম্মূল করিবার কাজটাও সেইসঙ্গে সহজ হইয়া আসে—এবং ওটুকু নির্ণয় করাও যে তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ হয় না, সে-কথা ত বলাই বাহুল্য।

এক মাটিতে একই ফসলের আবাদ বারবার না করিয়া পাঁচবার পাঁচ রকমের ফসল করিলে সে মাটি সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। প্রত্যেক পাঁচ বছর পর পর আবার নূতন করিয়া ফসলগুলিকে উল্টিয়া করিবার ব্যবস্থা। এই পাঁচ বছরের ফসল-পরম্পরার কাজ, ছেলেরা একত্রে একই বৎসরে যাতে দেখিতে পারে সে উদ্দেশ্যে পাশাপাশি পাঁচটি ক্ষেত লইয়া পয়লা, দোসরা করিয়া একই সঙ্গে পাঁচ বৎসরের ফসল পাঁচটিতে করা হয়, বৎসরান্তে পাঁচটিরই ফসলের অদলবদল হইয়া যায়। কেবল ইহাই নয়, যত রকমের ফসল সচরাচর করা হইয়া থাকে তার সবগুলিকেই জন্মাইবার ব্যবস্থা একটি মাঠে ভাগে ভাগে করা হয়। সেও আবার নাম-রাখা মতন নমঃ নমঃ করিয়া নয়, পরিপাটি এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রকমে। তাছাড়া যব, গম, আলু প্রভৃতি ফসলের সম্পর্কে সার প্রভৃতি লইয়াও নানারকমের পরীক্ষা চলিয়া থাকে।

এই ভাবে ছেলেদেরকে কেতাবী বিদ্যার চক্‌চকে এক-একটা চাপ্‌রাশ পরাইয়া জীবনসংগ্রামের ঘূর্ণি-হাওয়ার মধ্যে ঠেলিয়া বাহির করিয়া না দিয়া, জীবনের বিশেষ একটি ক্ষেত্রে তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ হইয়া বাঁচিবার মতন সত্যিকারের যথেষ্ট পুঁজি হাতে-কলমে পাওয়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা এই ইস্কুলটিতে করা হইয়া থাকে। একটা নেশন্ বা জাতির উন্নতি অবনতি কৃষিচর্চ্চার সঙ্গে যে কত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত সে কথাটার আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশেরই বহুলসংখ্যক ছেলেমেয়ের রুচি এবং ক্ষমতা দিয়া বিচার করিলে, কৃষিশিক্ষাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সেইহেতুই সত্যিকারের শিক্ষা। বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধে তরুণ মনের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা, তন্নতন্ন করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব জিনিষকে দেখিবার আগ্রহ এবং শক্তি, যা-কিছুকে চোখে নূতন লাগে তাহাকেই জুটাইয়া জড়ো করিবার প্রবৃত্তি, গবেষণাগারে অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিতে পারিবার কৌতুক-মিশ্রিত গর্ব্ব, এ সমস্তের সঙ্গে খোলা আলো-হাওয়ার আনন্দ এবং উদ্দীপনাভরা মুক্তি মিলিয়া কৃষিশিক্ষাকে ছেলেমেয়েদের কাছে এমন লোভনীয় করিয়া তোলে যে তারা মনের ষোল-আনা অনুরাগ এ'কেই অর্পণ করিতে এতটুকু ইতস্তত মাত্র করে না। এবং এই শিক্ষারীতিতে বড় বড় কথার বুকনি বেশী আওড়াইতে না শিখিয়াও যে তাদের সমস্ত মনোবৃত্তিগুলি খোলা আলো-বাতাসের নীচেকার চারাগাছের মতোই সুন্দর সতেজ স্বাস্থ্য লইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সে লাভটাই কি কম করিয়া ধরিবার?

কংক্রিটের ঢালাই-করা বাড়ী—

কংক্রিটের তক্তা জুড়িয়া বাড়ী এবং গাড়ী তৈরির সংবাদ প্রবাসীর পঞ্চশস্য বিভাগে আগে আগে দেওয়া হইয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় জাহাজের খোলের জখম তাড়াতাড়ি কংক্রিটের তালি লাগাইয়া চমৎকার সারাইতে পারা গিয়াছিল। এবার খবর পাওয়া গিয়াছে জোড়াতাড়ার ফ্যাসাদে আদপেই না গিয়া গলানো কংক্রিট ছাঁচে ঢালিয়া একসঙ্গে গোটা অজোড় অখণ্ড এক-একটি বাড়ী তৈরি করিবার পদ্ধতি নামজাদা

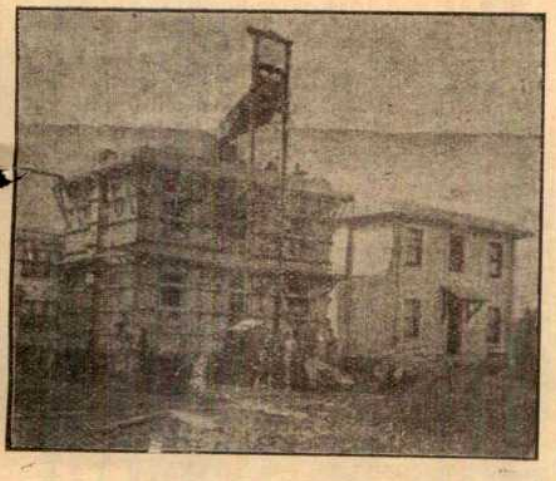

অখণ্ড কংক্রিটের বাড়ী—দশ দিনে তৈরী।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসন আবিষ্কার করিয়াছেন। নিউ-জার্সির ইউনিয়নে এই ধরণে চারকামরাওয়ালা চোদ্দটি দোতলা বাড়ীর নির্ম্মাণের কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, ফিলিপ্‌স্‌ বর্গে পঁচিশটি চারকামরাওয়ালা এবং পঞ্চাশটি ছয়কামরাওয়ালা দোতলা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

গোড়াতে মাটী খুঁড়িয়া খুঁটী এবং ভিত ঢালাই করিবার ব্যবস্থা। তার উপর শক্ত মজ্‌বুত কাঠের কাঠামো খাটাইয়া উপর হইতে গলানো কংক্রিটের স্রোত ঢালা হইতে থাকে। স্রোত ক্রমাগত ঢালা হওয়া চাই, কোথাও এতটুকু যতি পড়িলেই গোড়ার টুকু জুড়াইয়া গিয়া বাকীটুকুর সঙ্গে বেখাপ্পা হইয়া পড়িতে পারে। নিতান্ত যদি থামিতেই হয় এক-একটি তলার কাজ শেষ হইলে থামিবার ব্যবস্থা। গলানো কংক্রিট ঢালিতে আরম্ভ করিবার আগেই কপাট চৌকাট কড়ি বরগা প্রভৃতি আর যা-কিছু সমস্তকে ছাঁচের গায় ঠিক ঠিক মতো বসাইয়া লইতে হয়।

কাঠামোটিকে ভাগে ভাগে খুলিয়া লওয়া যায় এবং খুলিয়া লওয়ার কাজ যাতে সহজ হয় সেজন্য ছাঁচের তক্তাগুলিকে আগেভাগেই gray leadএর স্তর লেপিয়া পিছল তেলতেলা করিয়া দেওয়া হয়। একটা বাড়ীর কাজ শেষ হইয়া গেলে সেটাকে যেখানে খুসি বহিয়া লইয়া গিয়া আবার আরেকটি বাড়ী তৈরির জন্য খাটাইতে পারা যায়। এই রকম করিয়া একেবারে হুবহু একই ধাঁচের বাড়ী একটি মাত্র ছাঁচ হইতে যতটা খুসি গড়া চলিতে পারে।

১ ভাগ বিলাতি মাটি, ৪ ভাগ পরিষ্কার খস্‌খসে বালি, ৪ ভাগ শক্ত কয়লাভস্মের গুঁড়া—৬৫ ঘন গজ পরিমিত। আর ১০০০ পাউণ্ড বা ১২৷৷০ মণ পরিমিত লোহালক্কড়।—এই হইল মালমশলা। কাঠামো খাড়া করিতে সময়—তিন দিন, কংক্রিট ঢালাই করিতে ৮ ঘণ্টা, সেগুলি জুড়াইয়া চাপ বাঁধিতে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা,—সবসুদ্ধ ধরা যাক্‌ এক সপ্তাহ। লোক দরকার দশজন, অগত্যা এগারো জন।

সাধারণ স্থপতিদের ইটের পর ইট গাঁথিয়া তৈরি বাড়ী হইতে এই বাড়ীগুলি মজ্‌বুত এবং স্বাস্থ্যকর বেশী, কিন্তু তৈরি করিতে খরচ অল্প, ঝক্‌মারি অল্প, সময় অল্প। তবে কেবলমাত্র একটি বাড়ীর জন্যই একটি ছাঁচ গড়িবার প্রয়োজন হইলে অবশ্য বেপরিমাণ খরচ পড়িয়া যাইবে। এক ছাঁচে অন্ততঃ দশটি চার ঠুকুরীওয়ালা এবং পনেরোটি ছয়-কুঠরীওয়ালা বাড়ী তৈরি করিবার সুবিধা করিতে পারিলে তবে সস্তায় হইল বলিতে পারা যাইবে। সুতরাং দশে মিলিয়া না হইলে, কারবারের দিক দিয়া না দেখিলে এই উদ্ভাবনা অকেজো। কিন্তু ওসব দেশের লোকে এমন কাজ খুব কমই করে যা দশজনে মিলিয়া মিশিয়া করে না। দশের সম্মিলিত শক্তিতে কাজ সুন্দর হয়, সহজ হয়, আবার যেসব জিনিস একজনের কাজে লাগিয়া অকেজো হয় না অথচ তার কাজ ফুরাইয়া যায় সেগুলি পরপর অন্যদের ব্যবহারে আসিতে পারে বলিয়া সকলের পক্ষেই সেটা সুবিধার কথা হয়।

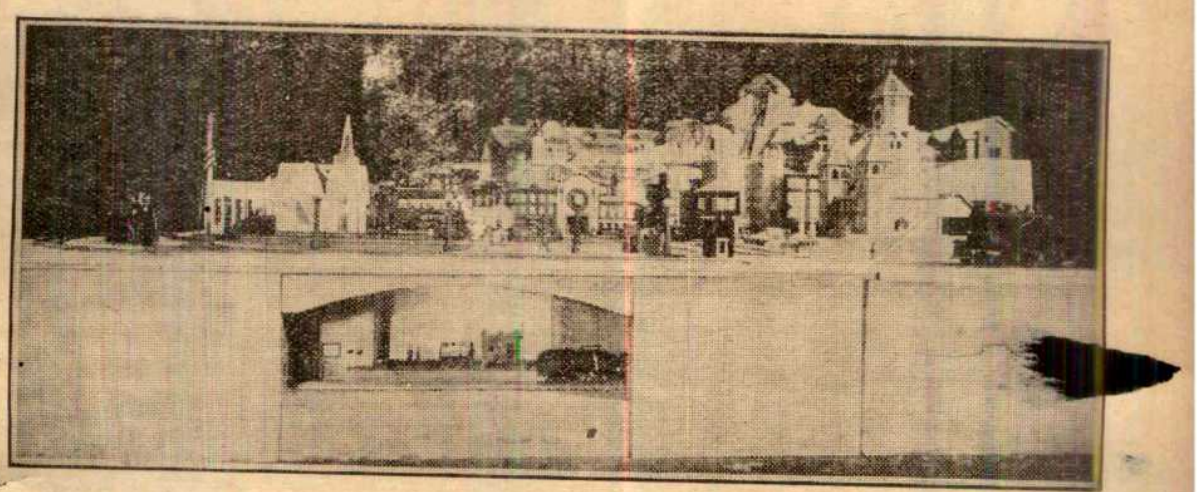

খেলনা শহর। মাটির তলার রাস্তা পর্য্যন্ত আধুনিক শহরের কোনো খুঁটিনাটি বাদ পড়ে নাই।

খেলনা-সহর—

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন শিশুপ্রকৃতির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। দেখা গিয়াছে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান শিশুর রুচিকে এতটুকুও পরিমার্জ্জিত করিতে পারে নাই; কারিগরি, চাকচিক্য, অর্থব্যয় প্রভৃতি কোনো-কিছুরই তার চিত্তের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা নাই; তার মনের রং দেশালাইয়ের খালি বাক্সটির উপর পড়িয়া সেটিকে দুনিয়ার

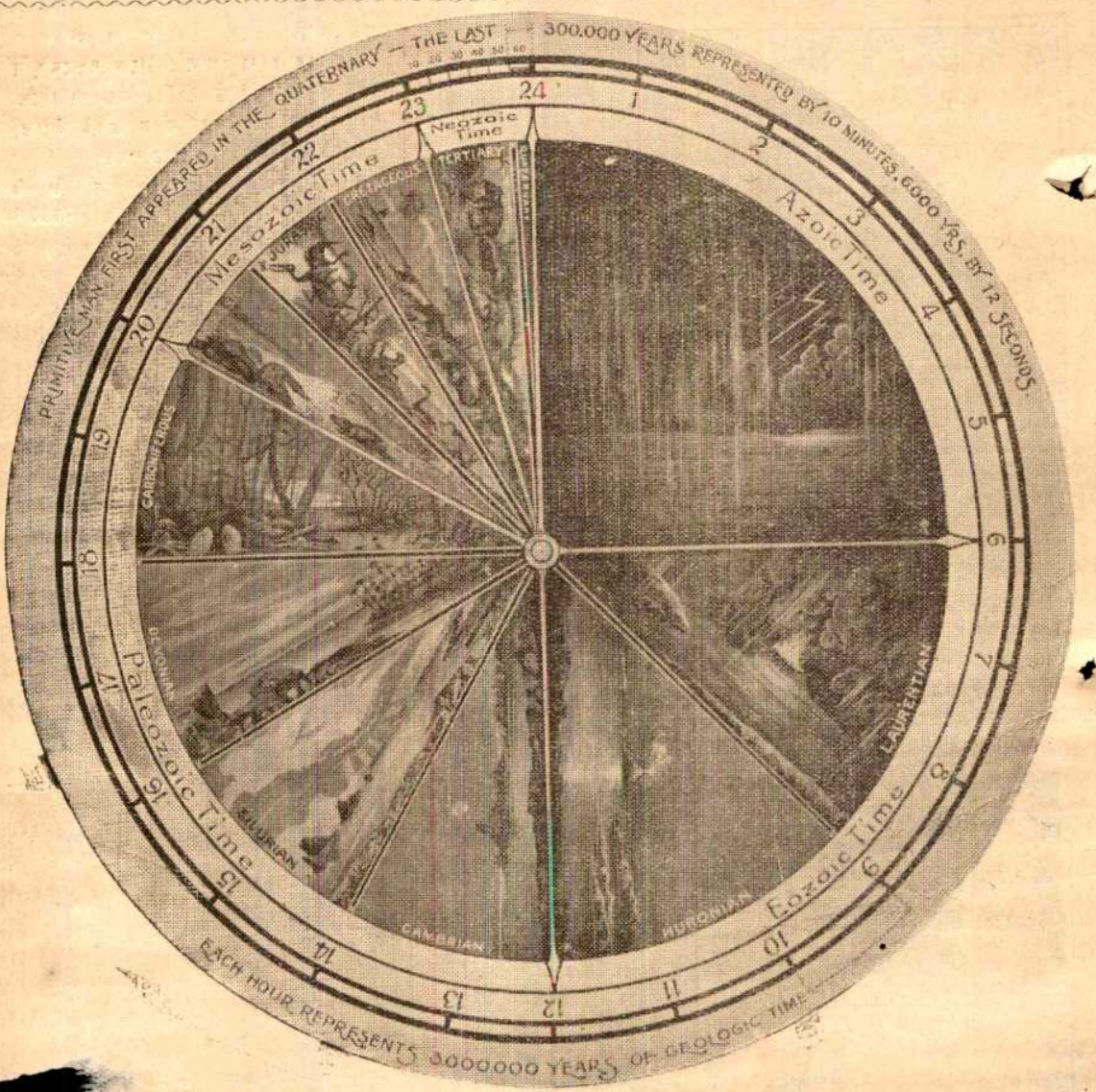

পৃথিবীর ছবিকুঞ্জী।

মূল্য খেলনাটি হইতেও স্পৃহনীয় সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। তবু তার রুচিকে এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগের অনুরূপ করিয়া তুলিবার দিকে তার বাপ-মাদের অফুরন্ত চেষ্টার ত্রুটি দেখা যাইতেছে না।

আমেরিকার নিউ ইয়র্কে কিছুদিন আগে একটি খেলনা-সহর বিক্রির জন্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।—আধুনিক সহরে যাহা-কিছু না হইলে চলে না, মাটির নীচেকার টিউব রেলোয়ে পর্য্যন্ত, তার সমস্ত এই সহরটিতে আছে। একটি চাঁদোয়ার ঘেরের উপরে নানা রকম করিয়া আলোক ফেলিবার কায়দায় কখনো দিনের প্রখর জ্যোতি, কখনো সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, কোনো সময় বা রাত্রির ঘন অন্ধকার রচনা করিয়া মানুষের তৈরি রাস্তাঘাট, রেলগাড়ীর আনাগোনা, চলন্ত ট্যাক্সি মোটর ট্রামগাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আদ্যিকালের বুড়া কাল-পুরুষকেও শিশুদের মনের রাজ্যের রঙীন্ পোষাক পরাইয়া এই সহরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

সহরটিতে নাই এমন জিনিষ খুব কম আছে। এর যে রাস্তাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র সেগুলিতে সভ্যজীবন যাপনে যেসমস্ত জিনিষ অপরিহার্য্য তার সবকিছুরই দোকান আছে; কাপড়-চোপড় টুপি, নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র, মনোহারি সখের জিনিষ, ওষুদবিষুদ প্রভৃতি সবকিছু সে দোকানগুলিতে পাওয়া যায়।—রাস্তার মোড়ে মোড়ে গাড়ীর ভিড় নিয়মিত করিবার জন্য ট্রাফিক্ কনষ্টেব্‌ল্, শান্তিরক্ষার জন্য অশ্বারোহী পুলিশের দল, আলোকিত রঙ্গবিজ্ঞপ্তির পাটা বা bill boards এবং রঙ্গালয়, লীলাচঞ্চল বৈদ্যুতিক আলোকের ফোয়ারা সম্বলিত পার্ক বা উদ্যান, পুলিশ এবং আগুন-নিবানো দমকল-ওয়ালাদের ঘাঁটি, "অভ্রংলিহ", ব্যাঙ্ক ও সরকারি পুস্তকাগার, ট্রেনের পৌঁছা-ছাড়া

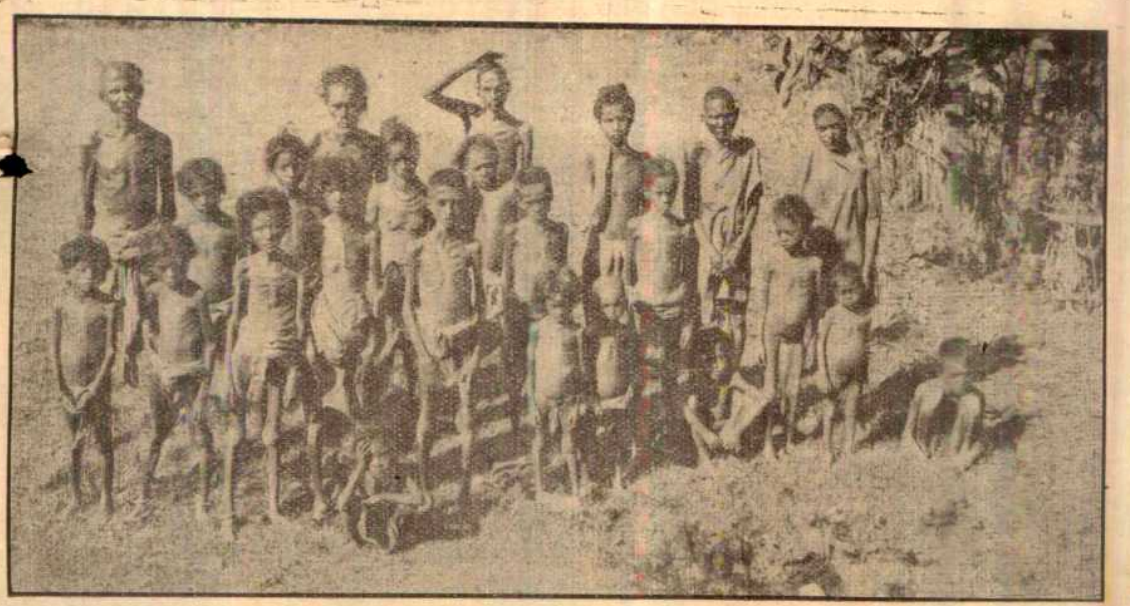

পুরীর কতকগুলি নিরন্ন মানুষ।

জমাইবার সবুজ এবং লাল চাকতিওয়ালা সব্-ওয়ে বা মাটির নীচেকার পথ প্রভৃতি খুঁটিনাটি কোনো জিনিষকেই ভোলা হয় নাই। এসমস্তের সীমানা ছাড়াইয়া মাটি উঁচু হইতে হইতে ক্রমে পশ্চাতের পাহাড় এবং তার পর দূরদূরান্তের পর্ব্বতগুলিতে গিয়া মিলাইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে সহরটা নির্জ্জীব নিঃসাড় নয়। এক্স্প্রেস্ ট্রেনগুলি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দিব্যি সুনিয়মে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেছে, তারপর আবার ছুটিয়া দূরের পর্ব্বতগুলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। জমাদার ঘণ্টা নাড়িয়া গাড়ীর আসন্নতা প্রচার করিতেছে, মুটেরা আরোহীদের মোটমাট্ রি তুলিতেছে নামাইতেছে। রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার প্রবাহ অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী-ঘরে অলিতে-গলিতে হাজারো বাতি জ্বালা হইতেছে। মোটের উপর সহরে জীবনকে তার সমগ্রতায় হুবহুভাবে দেখানো হইয়াছে এবং সে সবটুকু জুড়িয়াই ব্যস্ততা।

এমন ছেলেও আছে হয়ত যার কাছে এই অপূর্ব্ব জিনিষটি একেবারেই ভালো লাগিবে না, কিন্তু ছেলের বাবাদের মধ্যে এমন কত জন থাকা সম্ভব যাঁরা এটিকে একবার চাক্ষুষ করিতে চান না?

স. চ.

পৃথিবীর ঠিকুজি—

আমাদের এই নবযৌবনা পৃথিবীর বয়সের হিসাব ও তার জন্ম থেকে বৃদ্ধির ইতিহাস তারই বুকের স্তরে স্তরে লেখা হইয়া আছে। এই শ্যামলা বসুমতী চিরদিনই যে জীবধাত্রী ছিলেন না, এবং চিরযুগ ধরিয়া যে একই রকমের জীব তাঁর অঙ্কের দুলাল হইয়া থাকে নাই, এ তত্ত্ব ভূপঞ্জরের পরতে পরতে লেখা আছে। মানুষ ত মাতা ধরণীর সেদিনকার কোলের ছেলে।

কিন্তু ধরিত্রীর বয়সের সেদিন মানে কত লক্ষ বৎসর! পৃথিবীর কোলের খোকা মানুষের পরমায়ু বড় জোর—নরা গজা বিশে শর—১২০ বছর। কিন্তু পৃথিবীর বয়স হইয়াছে মোটামুটি ৭ কোটি ২০ লক্ষ বৎসর!—আর এই ত তার সবে যৌবন।

ভ্রূণ অবস্থায় পৃথিবী ছিলেন দ্রবময়ী। তখন শুধু টলটলাটল জল —আর তার উপর অবিশ্রাম ঝড়বৃষ্টির উপদ্রব লইয়াই ছিল পৃথিবী। তারপর জলের তলায় মাটির পলি পড়িয়া থিতাইয়া জলের আধার সৃষ্টি হইল এবং তার অন্তরের তাপের উচ্ছ্বাস ও আলোড়নে পাতালের মাটি জলের উপর মাথা তুলিয়া উঠিল। তখন আবার তৃতীয় যুগে মাটির বুকে জীবন আবির্ভূত হইল এবং চতুর্থ যুগে সেই জীবন হইতে উদ্ভিদ্ আর স্থলজলচর অতিকায় জীবের সৃষ্টি হইল। তারপর পঞ্চম যুগে আমাদের এখনকার পরিচিত জানোয়ারদের, সবশেষে মানুষের আবির্ভাবের পালা।

এই যে একএকটা যুগ—এর বয়সের হিসাব লক্ষ লক্ষ বছর গণনায়। মানুষের নিজের পরমায়ু স্বল্প, সে অনন্তের ও ব্রহ্মের সন্তান হইলেও তার কারবারের পুঁজি অল্প—সে অল্প লইয়া থাকে বলিয়া অগণ্য সংখ্যার একটা স্পষ্ট আন্দাজ ও ধারণা সহজে করিতে পারে না। যদি তার বুদ্ধির ধারণার আয়ত্তগম্য পরিচিত কোনো [illegible] সঙ্গে বৃহৎ ব্যাপারকে তুলনা করিয়া তার সম্মুখে বৃহৎকে ধারণা করিতে তার কঠিন বোধ হয় না।

মানুষের সময়ের হিসাব করে তার ঘড়ী। চব্বিশ ঘণ্টা [illegible] রাত্রি ও একদিনে, ঘড়ীর চাকাপানা ডালার উপর দিয়া ঘড়ীর ছো কাঁটাটা দুইবার সমস্তটা ঘুরিয়া আসে। পৃথিবীর ইস্তক-নাগাদ বয়সটাকে যদি মানুষের ঘড়ীর চব্বিশ ঘণ্টার আঁকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে তার এক ঘণ্টায় ভূবয়সের ৩০ লক্ষ বৎসর কাবার হয়। এই রকমে ১২ টা থেকে আরম্ভ করিয়া ৬টা পর্য্যন্ত পৃথিবীর শৈশব, ৬টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত পোগণ্ড ১২টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত কৈশোর, ৮টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত তারুণ্য, তারপর তার যৌবন সবে ১ ঘণ্টা হইল হইয়াছে।

পৃথিবীর বয়স নানা মুনির নানা অনুমানের গড়পড়তা করিয়া ৭২০ লক্ষ বৎসর হয়। তাহা হইলে পৃথিবীর বয়সকে ঘড়ীর ঘণ্টা হিসাবে এই রকমে ভাগ করা যায়—

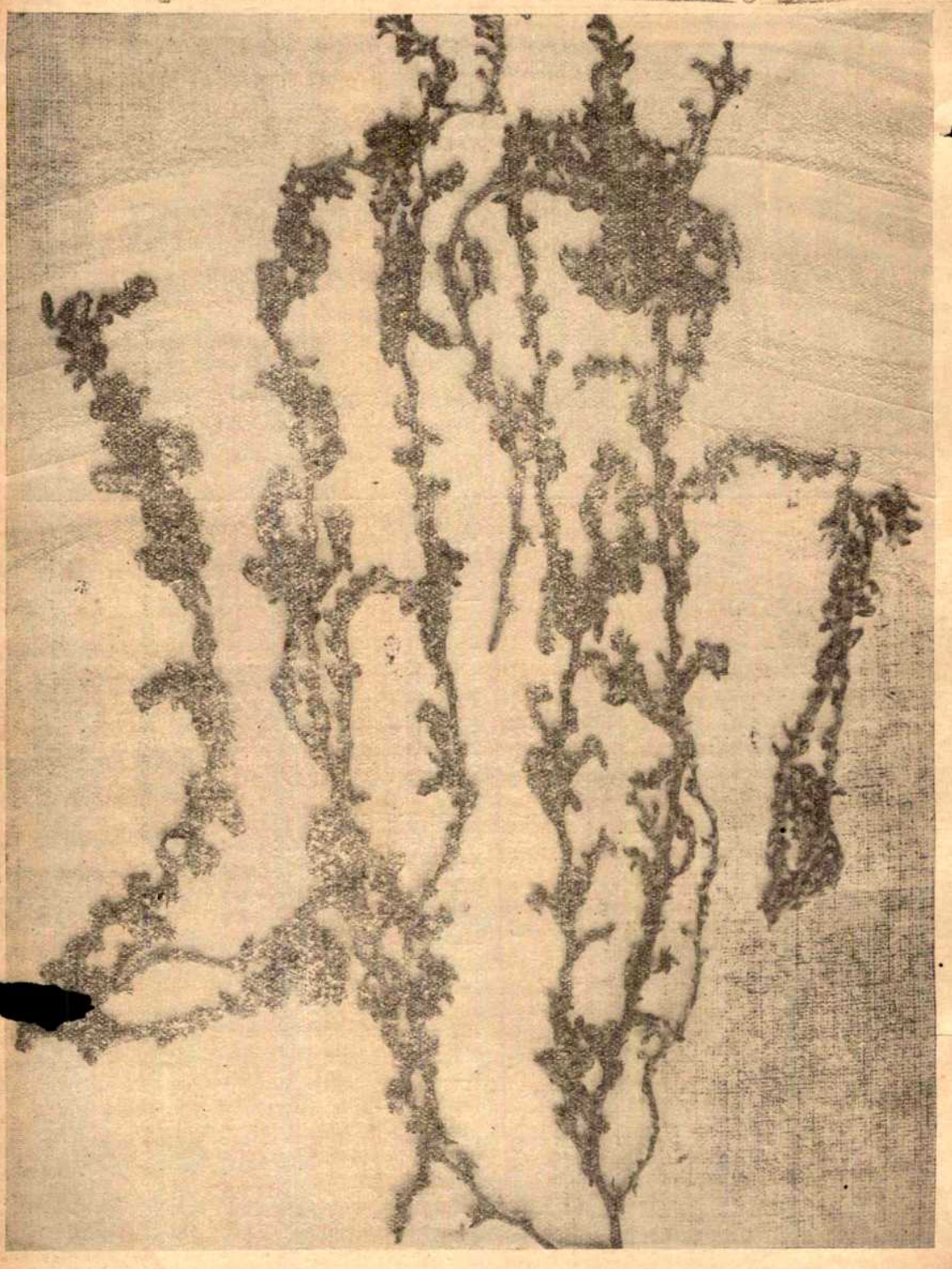

দুর্ভিক্ষবশতঃ এই ঘাস পুরীর নিরন্ন লোকদের প্রধান খাদ্য হইয়াছে ; তাহাও আবার গ্রীষ্মের আধিক্য প্রযুক্ত এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

(১) শৈশব,—প্রাবনের বুগ—৬ ঘণ্টা—১ কোটি ৮০ লক্ষ বৎসর।
(২) গোণ্ড,—অগ্ন্যুৎপাতে মাটির মাথা তোলার যুগ—৩ ঘণ্টা—১ কোটি ৮০ লক্ষ বৎসর।
(৩) কৈশোর,—জল খিতাইয়া ও মাটি জুড়াইয়া প্রাণ-পদার্থের প্রথম আবির্ভাবের যুগ—৮ ঘণ্টা—২ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর।
(৪) তারুণ্য,—অতিকায়দের যুগ—৩ ঘণ্ট—৯০ লক্ষ বৎসর।
(৫) যৌবন,—নবযুগ—১ ঘণ্টা—৩০ লক্ষ বৎসর।

নূতন যুগে আমাদের পরিচিত প্রতিবেশী অন্য প্রাণীদের পরে মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে আজ পাঁচ লক্ষ বৎসর। উপরকার হিসাবে ভূ-দিবসের সঙ্গে তুলনায় তার পরিমাণ দশটি মাত্র মিনিট! আর মানুষ কালের মানুষ হইয়া উঠিয়া ইতিহাসে তার কালকর্মের হিসাব টুকিয়া রাখিতেছে যে সময়টুকু তারও কি পরিমাণ করিতে হইবে? তার পরিমাণ বারো সেকেণ্ড! চ।

জগতের মধ্যে সবচেয়ে মোটা ছেলে—

সভ্যতার উন্নতির দিনে নূতন কিছু করা বা নূতন কিছু বওয়ার একান্ত দরকার। মানসিক বলে না পারি শরীরের প্রাচুর্য্যেও যদি নাম করিতে পারা যায় সে ত মন্দ কথা নয়। লিসেস্টার সহরের লেমি ম্যাসন নামে একটি পনেরো বছরের ছেলে ঐ শেষোক্ত কাজে বেশ নাম কিনিয়াছে। কেবল বুদ্ধির ভারীত্বে লোককে হারাইলে চলিবে না, শরীরের ভারীত্বে লোককে ছোট করিতে হইবে। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া এই মহাকায় বালকটি আপনার কলেবরটি দিনের পর দিন সুপুষ্ট করিতে কোনই ত্রুটি দেখায় নাই। ছেলেবেলা হইতে শরীরের সাধনা করিতে করিতে ইনি যখন পনেরো বছরে পদার্পণ করিলেন তখন ইঁহার শরীরের ওজন হইল সাড়ে পাঁচমণেরও কিছু বেশী, বুকটি চওড়া হইল ৬৪½ ইঞ্চি, কোমর ৬৯ ইঞ্চি, বাহু ২৩ ইঞ্চি, এবং উরু ৩৮ ইঞ্চি। আরো কয়েক বৎসর কাটিলে তিনি যে পৃথিবী-মাতার তোলকে আলো করার পরিবর্ত্তে বিশেষভাবে পীড়িত করিয়া তুলিবেন তাহা বোধ হয় পৃথিবী-মাতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি ইতিমধ্যে বালকটিকে ভগবানের স্বর্গের প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শুনা যায় বালকটি নাকি বেশ প্রফুল্ল ও সুখী ছিল। তার মেজাজ ও নরম ছিল। আর এই বপুর উপর মেজাজ গরম হইলে তার বাপ-মাই বা পারিয়া উঠিতেন কি করিয়া? কিছুদিন আগে ইস্লিংটনের জগৎপ্রদর্শনীতে লেমি ম্যাসনকে দেখানো হইয়াছিল। শরীরের বিপুলতায় এই বালকটি পৃথিবীর মধ্যে ছিল সর্ব্ব-প্রথম। তার মৃত্যুতে এখন আমেরিকার একটি আট বছরের ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু দুনিয়াটা এত বড় জায়গা যে এই নির্ব্বাচনই যে ঠিক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। কেউ কেউ বলিতেছেন যে শরীরের বিপুলতায় এ দুজনকেই হার মানাইয়াছে পেন্সাবাদাম-আখ্রোটের মুলুকের কাবুলি তোন এক ছেলে।

প্যারী।

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম! অনির্ব্বচনীয়!
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ!
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান!
সন্দেহী সে ভাবছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায় বিফল নরলোকে,
চর্ম্ম চোখের আর্শী হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে স'রে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে।
বীভৎস দুঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠছে মুহু কেঁপে,
হাস্‌ছে যেন ভৈরবী ভৈরবে;
ভয়ের মেঘে ঝাপ্‌সা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু! হরো 'মা ভৈঃ' রবে।
প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপে করো তাদের নত;
দম্ভাসুরের দম্ভ কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত।

* * *

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা! তিন ভুবনের রাজা!
ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে;
মৃত্যু যাদের করবে ধুলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে!
মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
স্পর্দ্ধাভরে পূজার করে দাবী।
জীয়ন্-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,
দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি।
যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আসুরিয়া,
খাল্‌দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
কই বাবিলন, আরব, ইরাণ? কই মালিডন, রয় কিনা রয় ভুঁয়া
ঐক্-পাথীদের জয়দ্‌গবের লাজ!
কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি
মহাসোনা, সুখদ্রা আজ কার?
যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি
সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার?

প'ড়ে আছে অচিন্ দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—
ঝাঁজ্‌রা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,
পর্ত্তুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ্-গোলা
ফিলিপিনায় পিন্ পুঁতে ঠিক যেন।
কোথায় মায়া-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর জোড়া?
ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে?
হারিয়ে গতি ধাবন্-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চুপে।

* * *

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোকপাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—
ওগো প্রভু! ওগো জগৎ-স্বামী!—
প্র-নব গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্ত্তনা;
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি'।
সকল প্রাণে জাগুক রাজা; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা;
জগৎ-জয়ের যাক্ থেমে তাণ্ডব,
ঘুচাও হে দেব! নিঃশেষে এই মানুষ-জাতির মানুষ-পেষণ পেশা—
চিরতরে হোক্ সে অসম্ভব।
দেশ-বিদেশে শুন্‌ছি কেবল রোজ রাজাসন পড়ছে খালি হ'য়ে—
সেসব আসন দখল কর তুমি,
মালিক! তোমার রাজধানী হোক সকল মুলুক এ বিশ্বনিলয়ে
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্তভূমি।
তোমার নামে নুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা
ঋজু হ'য়ে তোমার আশীর্ব্বাদে,
তোমার যারা নকল, রাজা! তাদের সাজা আস্‌ছে নেমে সোজা
যুগান্তেরি ভীষণ বজ্রনাদে।
অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জ্বল্‌ছে মহামণি
কর মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা;
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্‌ছে মুকুল গণি,
কমল-বনে আস্‌ছে নবীন দিবা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শবরীর প্রতীক্ষা

রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডে (৭৪ অধ্যায়ে) এই উপাখ্যানটি আছে যে পম্পাসরোবরের সন্নিহিত মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে এক শবরী তপস্বিনী আশ্রয় লইয়াছিলেন। শবরী ভারতের আদিম অধিবাসী কোল ভিল সাঁওতাল শ্রেণীর অনার্য্য ম্লেচ্ছ হীন জাতি। এই শিক্ষাদীক্ষাহীন অন্ত্যজ জাতির একটি মহিলার আর্য্য ঋষির আশ্রমে আসিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। যাদের আর্য্যরা ধর্ম্মহীন ও ধর্ম্মবহির্ভূত মনে করিয়া কোনো রকমের ধর্ম্ম-পালন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—বেদ পাঠ করিলে যাদের প্রাণদণ্ড, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জিহ্বা ছেদন, বেদমন্ত্র শ্রবণ করিলে যাদের কানে গলা সীসা ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা,—যাদের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ব্রাহ্মণের সেবা, সেই অনার্য্য শূদ্র জাতির একটি মহিলা মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, জগতির গতি ভগবানকে দেখিতে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া। মতঙ্গ ঋষি দেহত্যাগের সময় তাপসী শবরীকে বলিয়া গিয়াছিলেন—

আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্।

যিনি আত্মার আনন্দ, যিনি রাম, তিনি তোমার এই পুণ্য আশ্রমে একদিন আসিবেন। সেই দিন হইতে শবরী ঋষিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাম আসিবার প্রতীক্ষায় পথের পানে চাহিয়া সঙ্কল্প করিলেন—

এবার তোমার আশাপথ চাহি
বোসে রব খোলা দুয়ারে।

খোলা দুয়ারের গোড়ায় শবরীর আশা-মুকুল দল মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। এই বিকাশের প্রতীক্ষায়-পথ চাহিয়া শবরীর যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

রাম যে কখন্ কবে আসিবেন তার ত ঠিক নাই—কিন্তু তিনি আসিবেন নিশ্চয়—অতএব পূজার আয়োজন ত সতত প্রস্তুত রাখা চাই। তাই তিনি রামকে নিবেদন করেন—

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
　　গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
　　তোমার করপদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল কোরে
　　অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে,
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধোরে,
　　তোমার এবার সময় কখন্ হবে?

শবরী তাঁর অন্তরে অনুভব করেন—

সে যে আসে আসে আসে দিন রজনী!
　　শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি!

তাঁর পায়ের শব্দ যে দিকে দিকে নিত্যনিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে—

পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোঁটা,
উসুখুসু শব্দটুকুন
　　কোটর-মাঝে কীটের খেলার,
কত আভাস আসা-যাওয়ার
ঝরঝরানি হঠাৎ হাওয়ার,
বেণুবনের ব্যাকুল বার্ত্তা
　　নিঃশ্বসিত জ্যোৎস্নারাতে!
ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ,
কত ঋতুর কত ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল
　　নীড়ে গাওয়া গানের সাথে।

শবরী তাঁর চক্ষে দেখেন আর ভাবেন—

আয় ইয়ার, ভুয়ে ন যায় ভুল—
পাত-পাতমে তু-ই রঙ্গিলে, তু-ই রঙ্গিলে ফুল!
বন্ধু আমার তোমায় চেনার না হয় যেন ভুল—
পাতায় পাতায় তুমিই রঙিন, তুমিই রঙিন ফুল!

যে আশা যৌবনে ছোট ছিল, প্রৌঢ় বয়সে তা দুয়ারের মাথায় পুষ্পিত শাখা বিস্তার করিয়াছে।

প্রতিক্ষণের প্রতীক্ষায় প্রৌঢ় বয়সও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধার মৃত্যু আসন্ন হইয়া আসিতেছে, তখনো তাঁর এক বাসনা, এক সাধনা, এক প্রতীক্ষা—

এনে ফুলের ডালা
গেঁথে তুলব মালা।
　　সাজাব তায় যূথীর হারে,
গন্ধে ভোরে দেবো তারে,
　　করব আমি আরতি তায়
　　নিয়ে দীপের থালা।

তাঁর সকল কাজ সকল চিন্তা আচ্ছন্ন করিয়া আছেন সেই আগন্তুক রাম—যিনি পতিতকে ঘৃণা করেন না, যিনি পাষাণী পতিতা অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছেন যিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, যাঁর সখা বানর সুগ্রীব, যাঁর শ্রদ্ধায় জটায়ু-পক্ষীর স্বর্গলাভ হইয়াছে। শবরীর মনের মধ্যে নিরন্তর গুঞ্জন করিতেছে—

আমি　　তোমার লাগি কুসুম তুলি,
　　বসি তরুর মূলে,
আমি　　সাজিয়ে রাখি ডালি।—

কারণ ঋষি বলিয়া গিয়াছেন—আগমিষ্যতি তে রাম—তোমার রাম আসিবেনই আসিবেন।

মৃত্যুর দ্বারেও অমৃত দেবতার ভোগের জন্য শবরী আহরণ করিতেছেন ফল—ফুল যে অপেক্ষায় অপেক্ষায় ফল হইয়া পড়িয়াছে। ফুলের বুকের ফল চয়ন করিতে করিতে শবরী অনুভব করিলেন অপেক্ষিতের আগমন। বৃদ্ধার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, দৃষ্টি উৎসুক হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—

বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
　　নব মিলনের সাজে?

বিরহী রাম আযৌবন-প্রতীক্ষমাণা বিরহিণী শবরীর পুণ্য আশ্রমে পদার্পণ করিয়া তাহা পুণ্যতর করিলেন। তখন শবরী আনন্দের আঘাতে দিব্যধামে যাইতে যাইতে বলিলেন—

অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্ তব সন্দর্শনান্ময়া।
অদ্য মে সফলং জন্ম, গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ॥
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়ান্ লোকাংস্ ত্বৎ প্রসাদাদ্ অরিন্দম।

তোমার চক্ষু আমার উপর পতিত হওয়াতেই আমি পবিত্র হইয়াছি, আমার জন্ম সফল, তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, আমার স্বর্গ পাওয়া হইয়া গিয়াছে।

ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ।
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্ তীরসম্ভবম্ ॥

হে পুরুষোত্তম, আমি শিক্ষাদীক্ষাহীন বন্য, পম্পাতীরের বনে বনে যে ফল-সঞ্চয় করিয়াছি এতদিন, তাহা তোমারই জন্য, তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করো—আমার তপস্যা সফল হোক হে ফলদাতা।

তখন রাম শবরীকে বলিলেন—অর্চ্চিতোঽহং ত্বয়া ভদ্রে, গচ্ছ কামং যথাসুখম্—হে ভদ্রে, তোমার অর্চ্চনা আমি গ্রহণ করিলাম, তোমার পরলোকযাত্রা সুখকর ও অভিলষিত হোক!

তখন শবরীর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হইল—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দররেশে এসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই কর্ম্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার।

চারু।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর ছাপা হইবে। কোনো উত্তর ২০০ কথার বেশী হইলে ছাপা হইবে না, প্রশ্নকর্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; সুতরাং যিনি এমন প্রশ্ন করিবেন যার উত্তর দীর্ঘ হওয়া সম্ভব, তিনি প্রশ্নের সঙ্গেই নাম ঠিকানা-লেখা টিকিট-দেওয়া খাম পাঠাইবেন। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁর উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাই ছাপা হইবে; উপর নামগুলির উল্লেখ মাত্র থাকিবে যদি তাঁদের নাম প্রকাশে আপত্তি না থাকে। যাঁদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁরা প্রশ্ন বা উত্তর পাঠাইবার সময় কাগজের উল্টা পিঠে নাম ঠিকানা লিখিবেন; অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রশ্ন বা উত্তর মাসের ১৫ তারিখের আগে না পাইলে পর মাসের কাগজে ছাপা না হইতেও পারে; স্থানাভাবে যেসব প্রশ্নোত্তর একমাসে ছাপা না হইবে তাহা পরমাসে ছাপা হইবে।]

জিজ্ঞাসা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে পারি নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিলে অনুগৃহীত হইব।—

১। মাথার ঘোল ঢালা দণ্ডরীতির শাস্ত্রনির্দ্দেশ কি?

২। মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের সময় গণেশ পাখোয়াজ বাজান। একথা কোথায় আছে?

৩। দুর্গা বা চণ্ডী শঙ্খচিল শ্বেতকাক বা শ্বেতমাছির রূপ ধারণ করেন। কোনো পুরাণে তন্ত্রে এর সন্ধান মেলে কি?

৪। জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান পুণ্যজনক, কার নির্দ্দেশে?

৫। শিবের নিকটে শঙ্খধ্বনি ও বিষ্ণুকে চামর ব্যজন প্রশস্ত ও পুণ্যপ্রদ।—কে বলিল?

৬। দুর্গা বা চণ্ডী "দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈল নারায়ণে"—কবে ও কিসে?

৭। দক্ষিণপ্রয়াগ কোন্ তীর্থ? কোথায়?

৮। ধানদুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হয়—কার মতে ও তার তাৎপর্য্য কি?

৯। রাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য সচ্ছিদ্র কলসীতে জল আনার উপাখ্যানের মূল কি?

১০। শ্রীমন্ত সদাগর নানা কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ কোষ জ্যোতিষ ইত্যাদির সঙ্গে পাঠ করিয়াছিলেন—'নাগাস্ত যোগাস্ত আদি পড়ে শাস্ত্র নানাবিধি' নাগাস্ত যোগাস্ত কি?

১১। যাত্রার সময়—
শুকান ডালেতে বস্যা কু-বোলয় কাউ (কাক)।
যোগিনী নাগয়ে ভিক্ষা আধখান লাউ॥
বামে সর্প দেখিলেন।
এর সংস্কৃত শাস্ত্র কি ও বচন কি?

১২। ঈশানের মেঘ অমোঘবর্ষণ কার মতে?

১৩। 'কামনা করিয়া সাগরে মরণ'—কোনো কামনা করিয়া সাগরে আত্মহত্যা করিলে পরজন্মে তাহা সুফল হয়।—কে বলিল?

১৪। দেবতার লোচনে নিমেষ নাই,—কোথায় পাওয়া যায়?

১৫। কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়,—কে বলিল?

১৬। "না করিলু প্রেমভক্তি এই হেতু এ পঞ্চ দুর্গতি।"
পঞ্চদুর্গতি কি কি? কার মতে?

১৭। বরবধূ বিবাহ করিয়া বাড়ীতে আসিতেই "অবনীতে তৈল ঢালে"—কেন? তাৎপর্য্য কি?

১৮। "ত্যজে যিনি (শিবিরাজা) নিজ বংশ
কেবল বিষ্ণুর অংশ,
জীব নামে বংশের আখ্যান।—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
এই উল্লেখের বিশদ বিবরণ কোথায় পাওয়া যায়?

১৯। মুখ থেকে পান ও খাবার খসা অলক্ষণ।—কে বলিল?

২০। তোরণে কলার গাছ রোপন মাঙ্গল্য।—কার উক্তি?

২১। কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দান পুণ্যজনক।—কার নির্দ্দেশ?

২২। তাল বেতাল—দুটিই কি পৌরাণিক? বেতালের নাম পুরাণে পাই, তাল সঙ্গে জুটিল কোথা হইতে?

২৩। "বিষ্ণুরক্ত আইল গায়ে চামরী আঁচলা।
গঙ্গার সমে যার মার ধনের সয়ালা॥"—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

এই গল্পটির বিশদ বিবরণ কোনো বাংলা পুঁথিতে বা লৌকিক প্রচলিত গল্পে পাওয়া যায় কি ?

২৪। "বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
যাগুলীর প্রতিদ্বন্দী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এর গল্পটি কোথাও লিপিবদ্ধ বা লোকমুখে প্রচলিত আছে কি ?

২৫। ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্য যাত্র করিয়া অজয় দিয়া গঙ্গা বাহিয়া উড়িষ্যার উপকূল দিয়া সিংহলে যান ; পথের কতকগুলি গ্রামের নাম দেওয়া আছে—তার কতক গঙ্গার ধারে বর্দ্ধমান হুগলী নদীয়া ২৪-পরগণা জেলায়, কতক মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায়, কতক "দ্রাবিড়ের দেশে"। নিম্নলিখিত গ্রামগুলির সংস্থান কোথায় ?—

খিসমার, মহেশপুর, বেতড়, বাগ্দন, কালীপাড়া, হিমাই, হেতেগড়, মদনমল্ল, বীরখানা, কলাহাটী ধূলিগ্রাম, অঙ্গারপুর, সঙ্কেতমাধব, বালিঘাটা, বাণপুর, সীতাখালি হাড়খাল, চন্দ্রকূট পর্ব্বত, বানাঘাট, মুড়িকা, হুসনপুর, দৌলতপুর, পাঙ্গবাড়া, কুলীনপাড়া, কুত্তরপুর, ভাস্কর, বাকসা, বেলেড়া, হাটার, চরকি, অঙ্গারপুর, সেনালিয়া, নবগাঁ, বাগুনকোলা, মণ্ডলঘাট, রিসিপাট, নবাসন, সাগড়া, কালীপাড়া, চুয়াইগুহা, সুবর্ণপুর, সীতাখালি, হাড়খাল, কুচিনান, কোত্তরনগর, কোদালিয়া, চন্দ্রশল্য দ্বীপ, আবর্ত্তন দ্বীপ, মল্লহরির দ্বীপ, পাঞ্চজন্য দ্বীপ।

২৬। ধনপতি উজানি হইতে গৌড় যাইবার পথে পাইয়াছিলেন—শীতলপুর, কলাহাট, বড়ুলখালি, সিমূলি বালিঘাটা, রায়খাল, রাজপুর, আউটবেক, জিমুহানি।

এই জায়গাগুলির বর্ত্তমান অবস্থান কোথায় ও নাম কি ?

২৭। গন্ধবণিক সমাজের মধ্যে পাই—ফতেপুর, পাঁচড়, কারখি, সাঁকো।

এসব গ্রাম কোন্ জেলায় কোথায় ?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুলিল রে পিঞ্জর-দুয়ার

রে বিহঙ্গ, খুলে গেল পিঞ্জর-দুয়ার,
অসীম প্রয়াণ-পথ, আকাশ উদার,—
প্রভাতের পারে পারে,
পাপিয়ার সুর-ধারে
ভরে ওঠে বারে বারে গানের জোয়ার।
আলোক-ইঙ্গিতে ধেয়ে,
বায়ুর নিমন্ত্রণ পেয়ে
উঠিবে ও ডানা বেয়ে শকতি আবার।
গতি পেলে মনোরথ,
কে কারে দেখায় পথ ?
সাথে ধায় এ জগৎ, সাথে গায় তার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরীতে দুর্ভিক্ষ।

শ্রীক্ষেত্র পুরী জেলার প্রধান সহর। সহরটিকে পুরী বলে। এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির অবস্থিত। এই জেলায় প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অন্নকষ্ট চলিতেছে। এখন উহা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পরিণত হইয়াছে। প্রায় ১৫০ বর্গ মাইল জায়গার অধিবাসীরা বিপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় সমস্ত জেলা অনাবৃষ্টি হেতু দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। অনাবৃষ্টির পর জলপ্লাবন হয়। বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস স্বয়ং প্লাবিত স্থানগুলি দেখেন। প্লাবনের জল প্রায় এক মাস ছিল। ইহাতে লোকদের অশেষ দুর্গতি হয়। ক্ষেতের ধান সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও কোথাও অল্পসংখ্যক লোকে রবিশস্য যাহা আর্জাইয়াছিল, তাহাও পরে বৃষ্টিতে ধুইয়া লইয়া যায়। উপর্য্যুপরি এইরূপ প্রাকৃতিক উৎপাতে বিস্তর লোককে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় করিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সামান্য পরিমাণ তাগাবী ঋণ ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হয় নাই। লোকে অন্নকষ্টে পড়িয়া খাটিয়া খাইতে রাজি আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কোন কোন জায়গায় কয়েক মাসের জন্য গবর্ণমেণ্ট "টেষ্ট ওয়ার্কস্" খুলেন ; কিন্তু মজুরীর অল্পতা এবং দৈহিক দুর্ব্বলতা বশতঃ বেশী লোকের এসব কার্য্যক্ষেত্রে কাজ করিতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কতকগুলি গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। বেসরকারী লোকদের চেষ্টায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া গঠিত জেলা সাহায্য-সমিতির প্রদত্ত সাহায্য মোটেই যথেষ্ট হয় নাই।

আমরা গত অক্টোবর মাসে যখন পুরী গিয়াছিলাম, তখনই লোকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও স্বকর্ণে শুনিয়াছি। এখনকার অবস্থা কি আর বর্ণনা করিব ! গত জানুয়ারী মাসে তোলা একটি ফটোগ্রাফ হইতে যে ছবি প্রস্তুত করাইয়া ৯৫ পৃষ্ঠায় ছাপিতেছি, তাহা হইতেই সহৃদয় লোকে অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। আর একটি ছবি (৯৬ পৃঃ) একরকম ঘাসের। ইহাই অনেকদিন হইতে লোকদের প্রধান খাদ্য হইয়াছিল,

কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ এখন ইহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস ইহা বিহার-ওড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

যিনি যত বেশী পারেন, সাহায্য করুন। নিম্নলিখিত তিনজনের কাহাকেও টাকা পাঠাইলেই হইবে :—

(১) বাবু জগবন্ধু সিংহ, দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটীর সভাপতি, পুরী।

(২) বাবু গোপবন্ধু দাস, সত্যবাদী, সাক্ষীগোপাল পোষ্ট-আফিস্, জেলা পুরী।

(৩) বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, ভারতভৃত্য-সমিতির সভ্য, পুরী।

ফটোগ্রাফটি এবং ঘাসগুলি গোপবন্ধু দাস মহাশয় পাঠাইয়াছেন।

সমস্ত বালকবালিকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় কে দিতে পারে ?

বুদ্ধিমান দেশহিতৈষীরা সমুদয় বালকবালিকাকে বিনাব্যয়ে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা পাইবার সুযোগ দিতে চান। এইরূপ সুযোগ দিতে পারিলে বেতনবাবদে ছাত্র-ছাত্রীদের অথবা তাহাদের পিতামাতা বা অপর অভিভাবক-দের কোন ব্যয় হইবে না বটে, কিন্তু শিক্ষক প্রভৃতির বেতন এবং অন্যান্য খরচ গবর্ণমেণ্টকে বা অন্য কোন পক্ষকে দিতে হইবে। সমুদয় ব্রিটিশভারতে এরূপ সুযোগ দিতে হইলে বার্ষিক ব্যয় কত হইবে, তাহা মোটামুটি স্থির করা কঠিন নহে।

১৯১১ সালের সেন্সস অর্থাৎ লোকসংখ্যা-গণনা অনুসারে ব্রিটিশভারতে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের বালকবালিকার মোট সংখ্যা ৩,৪২,১৪,১৬২ ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা, কিছু বাড়াইয়া, মোটামুটি সাড়ে তিন কোটি ধরা যাক্। ভারতবর্ষের ১৯১৭-১৮ সালে শিক্ষার অবস্থা ("Indian Education in 1917-18") সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টের ২৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যে, প্রাথমিক শ্রেণীগুলির প্রতি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাব্যয় গড়ে বার্ষিক ৫।/১১। ইহা কিছু বাড়াইয়া মোটামুটি ৫৷৷০ টাকা ধরা যাক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, বৎসরে মোট সওয়া উনিশ কোটি টাকা খরচ করিলে ভারতবর্ষের সাড়ে তিন কোটি ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের বালকবালিকাকে বেতন না লইয়া শিক্ষা দেওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, এত টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে ? আমরা বিশ্বাস করি, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই এই টাকা আগেও দিতে পারিতেন, এখনও পারেন তাহার কারণ বলিতেছি।

গত মাসের প্রবাসীর ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, যে ১৯১৯-২০ সালের যুদ্ধব্যয় ১৯১৯ সালের মার্চ্চমাসে বজেটে ৬৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক ব্যয় হইয়াছে ৮৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এত ব্যয় হইবে গবর্ণমেণ্টের আগে তাহা জানা ছিল না। অথচ, এক পয়সা দু পয়সা নয়, একুশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়া গেল, এবং এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য টাকার যোগাড় গবর্ণমেণ্ট সহজেই করিতে পারিলেন। পারিলেন, এইজন্য, যে, গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধব্যয়টা অত্যাবশ্যক মনে করেন। তেমনি, গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের সমুদয় বালকবালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করিতেন, তাহা হইলে এই মহাকার্য্যের জন্যও উনিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে পারিতেন।

যুদ্ধবিভাগের ব্যয় কিরূপ ভয়ানক বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, তাহা জানিলে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, যে, ভারতশাসক ইংরেজরা শিক্ষার বিরোধী না হইলে বৎসরে সওয়া উনিশ কোটি টাকা খরচ করা খুব সহজ হইত। ১৮৮৪-৮৫ সালে যুদ্ধবিভাগের ব্যয় ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ছিল, ১৯১৯-২০তে ৮৫ কোটি ৩৩ লক্ষ হইয়াছে; অর্থাৎ ১৮৮৪-৮৫ অপেক্ষা গত বৎসর ৬৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালে ৩৩ কোটি, ১৯১৬-১৭ সালে ৩৭ কোটি, এবং ১৯১৭-১৮ সালে ৪৫ কোটি টাকা যুদ্ধবিভাগের জন্য ব্যয় হয়। সুতরাং এই কয়েক বৎসর আগেও সর্ব্বাধিক যত ব্যয় হইয়াছিল, গত বৎসর তদপেক্ষা ৪০ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯২০-২১ সালের জন্য যুদ্ধব্যয় ৬০ কোটি ধরা হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে, যে, গত বৎসর যত যুদ্ধব্যয় হইয়াছিল, এবার তার চেয়ে ২৫ কোটি কম খরচ হইবে

অনুমিত হইয়াছে। এই ২৫ কোটি টাকা ত শিক্ষার জন্য দেওয়া যাইতে পারিত। তাহার খুব সোজা উত্তর ইংরেজ আম্‌লাদের জিবের আগায় রহিয়াছে—"টাকা নাই।" কিন্তু যদি মনে করুন, রুশিয়ার বল্‌শেভিক্‌রা বা অন্য কেহ ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ একটা সত্য বা মিথ্যা হুজুক উঠে, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ৬০ কোটিতে যুদ্ধ-বিভাগের ব্যয় সংকুলন হয় কি না; যদি না হয়, তাহা হইলে তখন টাকাটা কোথা হইতে আসিবে? যেখান হইতে বা যে উপায়ে আসিবে, সেইখান হইতে বা সেই উপায়ে অবৈতনিক সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের যোগাড় হয় না কেন?

অনেকে মনে করেন এবং বলিবেন, কোন শত্রু দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে, তখন ত আর খরচের ভয়ে চুপ করিয়া থাকা যায় না; সুতরাং যুদ্ধের ব্যয়ের অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতার সহিত অন্য কোন ব্যয়ের তুলনা করা যায় না, কেননা শত্রুর আক্রমণ নিবারণ যেমন জরুরী কাজ, এমন জরুরী আর কিছু নয়। তাহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু যুদ্ধবিভাগের সমস্ত ব্যাপারটাই যে রহস্যাবৃত। বাস্তবিক কেন যে যুদ্ধ ঘটে, তাহার কিছুই আমরা জানি না; বাস্তবিক কোন শত্রু ভারত আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়ায় যুদ্ধ হয়, না যুদ্ধারম্ভের অন্য কারণ আছে, সেবিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। তার পর, যুদ্ধবিভাগে যত ব্যয় হয়, তাহার একটা খুব বড় অংশ অপব্যয় ও চুরি, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কমিসারিয়েট বিভাগের হঠাৎ বড়মানুষদের ইতিহাস ইহার অন্যতম প্রমাণ। অপব্যয় ও চুরি নিবারণ করিলে, যুদ্ধও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে হইতে পারে। এসব কথা শুনিবার পরও যদি কেহ না বুঝেন যে যুদ্ধবিভাগের ব্যয় কমান যায়, এবং ঐ মিতব্যয়িতা দ্বারা দেশের সমুদয় বালক-বালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, তাঁহাকে আমরা দেখাইতে চাই, যে, আর-এক উপায়ে অবৈতনিক সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে।

শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা যেমন জরুরী কাজ, দেশের লোককে অজ্ঞ রাখিয়াও প্রধানতঃ বিদেশী বণিক্‌দের সুবিধার জন্য বার্ষিক রাজস্ব হইতে কোটি কোটি টাকা রেলওয়ের জন্য খরচ করা, সেইরূপ জরুরী কাজ, ইহা কোন ন্যায়পরায়ণ বুদ্ধিমান্ লোক বলিতে পারেন না। অথচ রেলওয়ের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতেছে দেখুন।

১৯০৭ সালে বজেটের সমালোচনা করিতে গিয়া ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় বলেন—Time was, not long ago, when the Government never thought of spending more than four or five crores a year on railway;" "অনেক দিন আগে নয়, এমন সময় ছিল, যখন গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের জন্য বৎসরে ৪।৫ কোটি টাকার বেশী খরচ করিতে চাহিতেন না।" তখন ত দেশটা উচ্ছন্ন যায় নাই। আর এখন ১৯২০-২১ সালে রেলওয়ের জন্য সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে আগেকার সময়ের চেয়ে এখন যদি ২৬।২৭ কোটি টাকা বেশী রেলওয়ের জন্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবৈতনিক সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কেন ১৯ কোটি টাকা দেওয়া সম্ভব হয় না? কারণ আর কিছুই নহে; রেলওয়ে বিস্তার করায় ইংরেজদের স্বার্থ আছে; শিক্ষা বিস্তারে তাহাদের স্বার্থ নাই,—বরং তাহারা মনে করে শিক্ষা-বিস্তারে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে ১৯০৭ সালের আগে এক সময়ে রেলের জন্য বৎসরে ৪।৫ কোটির বেশী খরচ হইত না বলিয়াছি। ১৯০৭ সালেই বজেটে সাড়ে তের কোটি টাকা রেলের জন্য বরাদ্দ করার বিরুদ্ধে গোখলে মহাশয় মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এই ১৩।০ কোটি বর্ত্তমান বৎসরের ৩১।০ কোটি অপেক্ষা ১৮ কোটি কম এই ১৮ কোটি টাকা পাইলে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের সমুদয় বালকবালিকার শিক্ষা হইতে পারে। রেলওয়ে অপেক্ষা শিক্ষা যে বেশী প্রয়োজনীয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রেলওয়ে বিস্তার না হইলেও মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত ও সংরক্ষিত হইতে পারে; শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না।

সত্য বটে আজকাল রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ১৯১৭-১৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ শত ষাট কোটি টাকা মূলধন রেলে খাটাইয়া তবে এখন

এই আয় হইতেছে। এত টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিক্ষিততম দেশসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইত, এবং ভারতীয়দের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ ভারতের ও জগতের অশেষ কল্যাণের কারণ হইত। পক্ষান্তরে, রেলের দ্বারা কোন কোন দিকে সুবিধা হইয়া থাকিলেও, গবর্ণমেণ্টের রেলওয়েবিস্তার নীতির গোখলে-কৃত নিম্নমুদ্রিত সমালোচনা খণ্ডন করা যায় না—

"The English mercantile classes have been conciliated by undertaking the construction of Railways on an unprecedentedly large scale—programme following programme in breathless succession—sometimes inspite of the protests of the Finance member—a policy which, whatever its advantages, has helped to destroy more and more the few struggling non-agricultural industries that the country possessed and throw a steadily increasing number on the single precarious resource of agriculture."

তাৎপর্য্য—অভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে বিস্তারের বিরাট ব্যবস্থা দ্বারা ইংরেজ বণিকদিগকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু উহার জন্য সুবিধা যাহাই হউক উহা দ্বারা, দেশের শিল্প যা কিছু বাকী ছিল, একে একে সমুদয় নষ্ট হইতেছে এবং সমস্ত লোকে চাষের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে, যদিও তাহার আয় যথেষ্ট ও নিশ্চিত নহে।

রেলওয়ে দ্বারা দেশের খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী, ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি এবং মহামারীর সংক্রামকতা বিস্তারেরও সাহায্য হইয়াছে।

রেলওয়ে হইতে এখন যে লাভ হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে ইহাও জানা দরকার, যে, ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত উহাতে গবর্ণমেণ্টের ৫২ কোটি টাকা লোক্‌সান হইয়াছিল। ১৯০৯ সালে স্যর দীনশা ওয়াচা দেখাইয়াছিলেন যে ৬০ বৎসরের পর রেলওয়ে হইতে মূলধনের শতকরা মোটামুটি এক টাকা মাত্র লাভ হইতেছে; ১৮৪৮ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত ৫২ কোটি টাকা লোক্‌সান হয়, এবং ১৮৯৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত ১১ কোটি টাকা লাভ হয়, অর্থাৎ ১৯১০ পর্য্যন্ত ১১ কোটি টাকা লাভ হয়, অর্থাৎ ১৯১০ পর্য্যন্ত মোট লোক্‌সান ৪১ কোটি টাকা হয়। এখন যে লাভ হইতেছে, তাহা মালের ও যাত্রীর ভাড়া বাড়াইয়া ট্রেনের সংখ্যা কমাইয়া, এবং তৃতীয় ও মধ্যশ্রেণীর যাত্রীদিগকে গুড়ের পায়া কিম্বা পশুর মত বোঝাই করিয়া।

আমাদের এইসব কথার অনুবাদ পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ উনিশকোটি টাকা দিয়া ফেলিবেন, এরূপ কোন দুরাশা আমাদের নাই। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই দেখান, যে, গরীব ভারতের যেরূপ রাজস্ব আছে, তাহা হইতেই সমুদয় বালক-বালিকাকে বিনা-বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়; তাহার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রয়োজন নাই, ট্যাক্স বাড়াইবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব নাই বলিয়াই অর্থ থাকিতেও আমরা অর্থাভাবে নিরক্ষর জাতিদের মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছি। সেই জন্যই, এক একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে-সব আইন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কোনটিতেই গবর্ণমেণ্ট সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন না, যদিও মর্জি অনুসারে কিছু সাহায্য করিতে পারেন। এই কারণে, আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া ট্যাক্স দিতে হইতে পারে। যেমন করিয়াই হউক, দেশের অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে।

জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের একটি সুফলের দৃষ্টান্ত

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে যথাসময়ে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্যই আমেরিক উহাদের ভার লইয়াছেন, আমেরিকানরা বরাবর এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। এখন ফিলিপিনোরা আমেরিকাকে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতে বলিতেছেন। তাঁহারা দেশের কাজ কিরূপ চালাইতে পারেন, তাঁহাদের প্রদত্ত তাহার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি একটি। ১৯১২ সালে তথায় ৩০০০ বিদ্যালয় ও ৪৪০০০০ ছাত্রছাত্রী ছিল। ১৯১৮ সালে স্কুলের সংখ্যা ৪৭০০ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৭৫০০০ হয়। অর্থাৎ ছয় বৎসরে স্কুল এবং ছাত্রছাত্রী দেড়গুণেরও উপর বাড়িয়াছে। কত বৎসর সমুদয় ফিলিপিনো বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ফিলিপাইন ব্যবস্থাপক সভা (উহার সমুদয় সভ্য ফিলিপিনো) সাড়ে চারিকোটি টাকার উপর, প্রায় পাঁচ কোটি টাকা, বরাদ্দ করিয়াছেন। ফিলিপিনোদের সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের লোকসংখ্যা ২৪ কোটি ৫২ লক্ষ। এদেশে শিক্ষাসম্বন্ধে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত উন্নতি দেখাইতে হইলে একশত কোটি টাকার উপর বরাদ্দ করা দরকার। কিন্তু আমরা ১৯ কোটিও পাই না।

এরূপ মনে হইতে পারে, যে, ভারতবর্ষে কোন কাজের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করা অসম্ভব ; কিন্তু তাহা অমূলক। কর্ত্তার ইচ্ছায় সব কর্ম্মই হয়। আমরা যুদ্ধের সময় গরীব গ্রেটব্রিটেনকে "স্বেচ্ছায়" দেড়শত কোটি টাকা "দান" করি নাই কি ? অবশ্য এই "দান" কার্য্যটা ধার করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। আমরা দেশের কর্ত্তা হইলে, এবং ধার করা একান্ত আবশ্যক মনে হইলে, নিশ্চয়ই শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি করিবার নিমিত্ত দেড়শত কোটি টাকা ধার করিতে পশ্চাৎপদ হইতাম না।

ফিলিপিনোরা সংখ্যায় এককোটি হইয়াও, শিক্ষার সাধারণ ব্যয় ছাড়া আরও প্রায় ৫ কোটি টাকা শিক্ষার উন্নতির জন্য কি প্রকারে ব্যয় করিতে পারে, আর আমরা সংখ্যায় ২৪ কোটি হইয়াও প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনিক ও অবৈতনিক করিবার জন্য ১৯ কোটি টাকা ব্যয় করিতে কেন পারি না, তাহার একটি কারণ অবশ্য এই যে ফিলিপিনোদের আত্মকর্তৃত্ব আছে, আমাদের নাই ; কিন্তু উহাই একমাত্র কারণ নহে। আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিলেও প্রথম প্রথম ফিলিপিনোদের মত মাথাপিছু ৫ টাকা শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে আমরা পারিব না। কারণ, আমেরিকান্‌দের শাসনকালে ফিলিপিনোদের কোন শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হয় নাই, অধিকন্তু নূতন শিল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বাণিজ্য বাড়িয়াছে, কৃষির উন্নতি খুব হইয়াছে, এবং আমেরিকান্‌রা ফিলিপাইন্সে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, কোন না কোন প্রকার বৃত্তিশিক্ষা তাহার অঙ্গীভূত। সুতরাং ফিলিপিনোদের খুব ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশশাসনকালে ভারতের চিরাগত অর্থকর শিল্পগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার জায়গায় সে পরিমাণে নূতন শিল্প প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কৃষি শিখাইবার ব্যবস্থা না থাকার মধ্যে, বাণিজ্যের অধিকাংশ পরহস্তগত, শিক্ষা প্রধানতঃ এরূপ যাহাতে রাজকার্য্যের সাহায্যার্থ কেরানী, ডেপুটী, মুন্সেফ ও উকীল সৃষ্ট হয়, এবং তজ্জন্য দেশ গরীব হইয়া আছে, ধন উৎপাদনে আমাদের সামর্থ্য কম।

কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।

দেশের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইংরেজ। তাঁহাদের যে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার জন্য কত টাকা লাগিবে, তাহার একটা তালিকা "দেশের কথা"য় উদ্ধৃত হইয়াছে। সিবিলিয়ানদের বেতন বৃদ্ধির জন্যই ৩৬ লক্ষ টাকা লাগিবে। ঐ তালিকাটি সমুদয় ভারতবর্ষের। শুধু বাংলা দেশে উচ্চপদস্থ বিলাতী ও দেশী কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ কত টাকা খরচ বাড়িবে, মাননীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করেন। উত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যে, সব বিভাগের বৃদ্ধির অঙ্ক "প্রাপ্তব্য" (available) নয়, কিন্তু কাছাকাছি কতকগুলি টাকার পরিমাণ দেওয়া যাইতেছে ; ইত্যাদি। ইহাতে অনেক লাখের ও হাজারের দেখা পাই। ব্রজেন্দ্রকিশোর বাবু আরও জানিতে চান, যে, কলিকাতায় এবং প্রত্যেক জেলার সদরে স্থিত আফিসসমূহে নিযুক্ত আমলা ও কেরানীদের বেতনবৃদ্ধির একটা কিছু আন্দাজী তালিকা গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন কি ? তাহার উত্তর, "না"। অতি চমৎকার ব্যবস্থা! প্রথমে বেতন বাড়িল অতি-মোটা মাহিনার ইংরেজদের, তাহার পর বাড়িল মোটা মাহিনার হাকিম বাবুদের, অনেক হেড্‌মাষ্টারেরও পদোন্নতি হইয়াছে, কিন্তু কেরানীদের অদৃষ্ট এখনও অজ্ঞাত। যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা ইহার ঠিক বিপরীত। যদি ক্রমশঃ সকলেরই বেতনবৃদ্ধিই করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে পেয়ার ঝাড়ুদার পিয়াদা চাপ্‌রাসী চৌকীদার ও কনষ্টেবলদের বেতন বাড়া উচিত ছিল। তাহার পর অল্পবেতনের কেরানী ও শিক্ষকদের। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সিবিল সার্জ্জন প্রভৃতির বেতন অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় খুব বেশী আছে। উহা বাড়া কোন মতেই উচিত ছিল না। ঐসব কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বেতনে যোগ্য দেশী লোক পাওয়া যায়। ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ্ সবজজ প্রভৃতিরও বেতন যাহা আছে, গরীব দেশের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। জাপানীদের আয় মাথাপিছু ভারতীয়দের চেয়ে বেশী ; এবং লোকসংখ্যা ও আয়তনের অনুপাতে জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা ধনী দেশ। কিন্তু তথাকার প্রাদেশিক বা স্থানিক গবর্ণরের ৪৫০০।৪১০০। ৩৭০০ ইয়েন বার্ষিক বেতন পান। এক ইয়েন প্রায় ১৲ টাকার সমান। সুতরাং এই গবর্ণরদের সর্ব্বোচ্চ বেতন বার্ষিক ৬৭৫০ টাকা বা মাসিক ৫৬২৷৷০। আমাদের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটীরা এর চেয়ে বেশী বেতন এখনই

পান। জাপানী স্থানিক গবর্ণরদের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৫৫৫০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৪৬২৷৷০। মধ্যশ্রেণীর অনেক ডেপুটী এই বেতন পান। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক বিচারবিভাগের কর্ম্মচারীরা মোটের উপর জাপানী জজদের চেয়ে কম বেতন পান না। জাপানের জেলাকোর্টগুলির জজদের সর্ব্বনিম্ন বেতন বার্ষিক ৩০০০ টাকা, সর্ব্বোচ্চ বার্ষিক ৫৫৫০ টাকা। জাপানী আপীল-আদালতের জজদের সর্ব্বনিম্ন বেতন বৎসরে ৩৭৫০ টাকা এবং সর্ব্বোচ্চ ৭৫০০ টাকা। জাপানী সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেতন বৎসরে নয় হাজার টাকা, অন্য জজদের বেতন বৎসরে ৬৩০০ টাকা। জাপানী দোকানদার, বণিক্, কারখানার মালিক বা পরিচালক, প্রভৃতিরা অবশ্য ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী রোজ্‌গার করে। জাপানী রাজকর্ম্মচারীরা সম্ভবতঃ দেশের কাজ করিতেছি মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প আয়েই সন্তুষ্ট হয়। আমাদের দেশে এখন ইংরেজরা প্রভু এবং ইংরেজরাই প্রধান রাজকর্ম্মচারী; এই হেতু তাহারা নিজেদের বেতন খুব বাড়াইয়া লইয়াছে। তার সঙ্গে অত্যন্ত বেশী প্রভেদ ভাল দেখায় না বলিয়া—এবং কতকটা শিক্ষিত লোকদিগের মুখ বন্ধ করিবার জন্যও বটে—দেশী কর্ম্মচারীদেরও বেতন বেশী রাখা হইয়াছে। তা ছাড়া, ইংরেজশাসনের আগে হইতেই এ দেশে রাজকর্ম্মচারীরা দেশের ধন অতিরিক্ত মাত্রায় শোষণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক জাপানে রাজকর্ম্মচারীদের যেরূপ বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাই স্বাভাবিক। আমরা ইহা বলিতেছি না যে আমাদের দেশী সরকারী অধ্যাপক, ডেপুটী, মুন্সেফ এবং সব্‌জজদের কোন অভাব নাই; কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে, যে-দেশের অধিকাংশ লোক জন্ম হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে দেশে ইহাঁরা যে বেতন পান, তাহাই যথেষ্ট।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের বেতন বাস্তবিক কম ছিল। তবে, ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের দয়া বা ন্যায়বুদ্ধির অস্তিত্বের প্রমাণ না পাওয়ায়, যে ৪।৫ বৎসর ধরিয়া দেশে অন্নকষ্ট বস্ত্রকষ্ট খুব বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে ইহার কোন প্রমাণ না পাওয়ায়, ঠিক্ যখন শিক্ষা দেশী মন্ত্রীর হাতে যাইবার সময় আসিতেছে তখনই গবর্ণমেণ্টের দয়া ও ন্যায়বুদ্ধি উথলিয়া উঠায় এবং শিক্ষকদের বেতন বাড়াইয়া শিক্ষা-বিভাগের ব্যয় বাড়াইয়া দেওয়ায়, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে, এই বেতনবৃদ্ধিটি খাঁটি দয়া বা ন্যায়পরায়ণতার কাজ নহে; ইহার মধ্যে কূটনীতি আছে। দেশী মন্ত্রী যদি শিক্ষাবিভাগের ভার পান, অথচ শিক্ষা-বিভাগের বরাদ্দ সব টাকাটা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা আগে হইতেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি কি দিয়া শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করিবেন?

আমাদের শিক্ষকেরা জাপানী শিক্ষকদের বেতনের হার জানিলে আশ্বস্ত হইবেন কি না বলিতে পারি না। জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়-সকলের শিক্ষকদের উচ্চতম বেতন মাসিক ১৯৫ টাকা, নিম্নতম বেতন ১২ টাকা। মধ্য শ্রেণীর নর্ম্মালবিদ্যালয় সকলে ১৯১৫ সালে গড়ে বেতন ছিল মাসিক ৭২ টাকা, মধ্যশ্রেণীর নর্ম্ম্যাল বালিকা-বিদ্যালয়ের গড় মাসিক ৬৭৷৷০ টাকা, মধ্যশ্রেণীর বালক-বিদ্যালয়ের গড় ৭০৷৷০ টাকা, বালিকা-বিদ্যালয়ের গড় মাসিক ৫৭, গার্হস্থ্য বিদ্যা শিখাইবার বালিকাবিদ্যালয়ের গড় মাসিক ৪৮ টাকা। সম্ভবতঃ এই-সমস্ত বেতন এখন কিছু বাড়িয়াছে।

কারখানার মজুরদের বেতন ও ধর্ম্মঘট।

যে-সব কারখানায় মজুররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তথায় প্রায় এরূপ দেখা গিয়াছে, যে, কারখানার মালিকরা আপনা হইতে শ্রমজীবীদের বেতন যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইয়া না দেওয়াতে ধর্ম্মঘট হইয়াছে, এবং ধর্ম্মঘটের পর তাঁহারা প্রথম প্রথম শ্রমীদের দাবী অগ্রাহ্যই করিয়াছেন। শেষে কিন্তু ওই দাবী অনেকটা গ্রাহ্য করিতেই হইয়াছে, তবে ধর্ম্মঘট থামিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, কারখানার আয় হইতে শ্রমীদের মজুরী বাড়ান সম্ভব ছিল, অথচ বাড়ান হয় নাই। ফলে অনেক জায়গায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে এবং অনেক মজুরের প্রাণ গিয়াছে। যাহাতে মানুষ মারা যায়, এরূপ স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য, ও ন্যায্য বেতনবৃদ্ধি করিতে বিলম্ব অতি গর্হিত।

জাম্‌শেদপুরে ধর্ম্মঘটকারী শ্রমীরা বরাবর শান্ত ব্যবহারই করিয়া আসিতেছিল। তখন যদি স্যার্ দোরাব তাতা

ও তাতা লৌহ ইস্পাত কারখানার অন্যান্য পরিচালকগণ আসিতেন, তাহা হইলে বিনা রক্তপাতে সব গোলমাল মিটিয়া যাইত। তাঁহারা সেই আসিলেন, বিবাদও মিটিল, কিন্তু আসিলেন রক্তপাতের পর। যখন হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদার, ইন্দুভূষণ সেন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি শ্রমীদিগকে ঠাণ্ডা রাখিয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মন দিলে গরীব লোকদের প্রাণ যাইত না।

বাস্তবিক কারখানার দ্বারা যে ধন উৎপন্ন হয়, শ্রমীরা বেতন বাবদে তাহার যে-অংশ পায়, তাহা তাহাদের ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা কম এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও মানবোচিত জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কাজেই বিবাদ ও ধর্ম্মঘট অনিবার্য্য। মূলধনী ও শ্রমীদের বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্টের সমুদয় প্রদেশে কতকগুলি সালিসী-সমিতি (arbitration board) অবিলম্বে স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারখানার মালিকদেরও অনেকগুলি কর্ত্তব্য আছে। শ্রমীদের যথেষ্ট বেতন-দেওয়া ত উচিতই, অধিকন্তু লাভের অংশও তাহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রমীদের লাভের অংশ পাওয়া (profit-sharing) পাশ্চাত্য অনেক কারখানায় প্রচলিত আছে। কারখানার অংশীরা (share-holders) যেমন পরিচালক (directors) নির্ব্বাচন ও অন্যপ্রকারে কারখানার কাজের উপর পরোক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব করেন, শ্রমীদিগকেও তদ্রূপ অধিকার কতকটা দেওয়া উচিত। এই অধিকারের সুব্যবহার করিতে হইলে শ্রমীদের শিক্ষার প্রয়োজন। কারখানার মালিকরা তাহার ব্যবস্থা সহজে করিবেন মনে হয় না। দেশ-হিতৈষীদের এদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

গৃহস্থের চাকরচাকরানী।

গৃহস্থের চাকরচাকরানীদের মধ্যে অনেকেই আগেও বাজারের পয়সা হইতে ও অন্য উপায়ে কিছু কিছু "উপরি রোজগার" করিত, এখন দুর্ম্মূল্যতার দিনেও করে। ইহা যাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বেতন কিছু বাড়াইয়া দিলেও, সে অভ্যাস না যাইতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট বেতন প্রদান ভৃত্যদের অসাধুতা নিবারণের যে একটি উপায়, তাহার সন্দেহ নাই। বাংলার ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন, ক্লাইবের আমলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়ায় ক্রমে ক্রমে তাহাদের ঘুষ লওয়া প্রভৃতি দোষ কমিয়া যায়। গৃহস্থের চাকরচাকরানীদের বেতন আগেকার চেয়ে কিছু বাড়িয়াছে বটে; তাহা তাহাদের দাবীতে। এখন যদি ন্যায়পরায়ণ লোকেরা অনুসন্ধান করিয়া ঠিক্ করিয়া দেন, যে, কত বেতন না হইলে তাহাদের চলিতে পারে না, তাহা হইলে সহৃদয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরাও তাহা দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। দরিদ্র গৃহস্থদের চাকরচাকরানী অনেক স্থলেই নাই, না রাখাই ভাল।

চাকরানীদের যথেষ্ট বেতন না পাওয়ার সহিত, দু চারিটা পয়সা চুরি করা অপেক্ষাও গুরুতর সামাজিক দুর্গতির সম্বন্ধ আছে। আমরা মধ্যে মধ্যে কাগজে পড়িতে পাই, যে, পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে কোন কোন কারখানা ও দোকানে যে-সব স্ত্রীলোক কাজ করে, তাহারা যথেষ্ট বেতন পায় না, এবং তজ্জন্য কেহ কেহ দুশ্চরিত্রতা দ্বারা উপার্জ্জন করে; বেতন বাড়াইয়া দিতে বলিলে কোন কোন মনিব নাকি পরিষ্কার ইঙ্গিত করিয়া রোজগারের দ্বিতীয় পন্থা জানাইয়া দেয়। আমাদের দেশেও যে প্রকারান্তরে নারীর এই দুর্গতি রহিয়াছে, তাহা আমাদের অনেকের চোখে পড়ে না। কলিকাতা ও অন্য কোন কোন বড় সহরে যে-সব স্ত্রীলোক চাকরানী ও রাঁধুনীর কাজ করে, তাহাদের অনেকের চরিত্রভ্রংশ প্রলোভন ও প্রবৃত্তির তাড়নায় হয় ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে মজুরী যথেষ্ট নহে বলিয়া কেহ কেহ রোজগারের দ্বিতীয় উপায়, পাপপন্থা, পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না? এ বিষয়ে কেহ সাক্ষাৎভাবে অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। কেহ যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অনুসন্ধানের ফল সর্ব্বসাধারণের গোচর হইলে সুফল ফলিবে। বড় বড় সহরে সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে ব্যাধি ও পাপে অনেকের দেহ ও আত্মা জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহার সহিত চাকরানীদের অযথেষ্ট বেতন জড়িত। ইহা সকলেই জানে, যে, কলিকাতায় অনেক চাকরানী, চাকর এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির পাচক-পাচিকাদের ন্যায়

অবৈধ সম্বন্ধ আছে। চাকরানী ও পাচিকারা অধিকাংশ স্থলে বিধবা। কয়েকটি প্রথা ও আইন প্রচলিত হইলে ইহাদের মঙ্গল, ও সামাজিক কল্যাণ হইতে পারে, নতুবা নহে। (১) চাকর-চাকরানী-পাচক-পাচিকাদিগকে যথেষ্ট বেতন প্রদান; (২) ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন; (৩) হিন্দু পুরুষ ও নারী যে-কোন জা'তের হউক, তাহারা অবিবাহিত হইলে কিম্বা তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী জীবিত না থাকিলে, তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ হইবে, এইরূপ আইন প্রণয়ন। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অবৈধ সম্বন্ধ হইতেছে, বিধবার এবং ভিন্ন জা'তের স্ত্রীপুরুষের সন্তানও হইতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে সামান্য যে-অংশ বাঁচিয়া থাকে তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। এইরূপ সম্বন্ধকে বৈধ করিলে, এত জীবহত্যা ও শিশুমৃত্যু হয় না, এবং যে-সব সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তাহারা ঘৃণিত হয় না; অধিকন্তু তাহাদের পিতামাতারাও সাধু গৃহস্থের মত জীবন যাপন করিবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, নিজেরা কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হয় না, ও অপরকেও ব্যাধিগ্রস্ত করে না।

রাজনৈতিক জাতিভেদ এবং দুরকমের চরমপন্থী।

ইংরেজশাসনকালের আগে কি ছিল, সে বিষয়ে গবেষণায় এখন প্রবৃত্ত হইব না। ইংরেজশাসনকালে দেখিতেছি, আগে ছিল হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষি ও ঝগড়া। আপাততঃ কিছুদিন হইতে রাজনৈতিক কারণে ইহা কমিয়াছে,—যদিও কোথাও মুসলমানেরা গ্রাম্য ইউনিয়ন, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোক্যাল-বোর্ড, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, এবং সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দাবী বিন্দুমাত্রও ছাড়েন নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘনিষ্ঠতর হইবে এবং তখন মুসলমানগণ আলাদা প্রতিনিধি চাহিবেন না, এরূপ আশা আছে। যাহা হউক, যদি অন্ততঃ গোবলি-উপলক্ষে দাঙ্গাও আর ভবিষ্যতে না হয়, তাহাও পরম লাভ বলিয়া মনে করিব। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া যেমন কমিয়াছে, তেমনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিদের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলিতেছে। এসকলের উপর আবার এক রাজনৈতিক জাতিভেদ দেখা গিয়াছে। পুরাকালে যেমন এক সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এখন তেমনি, নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে দলাদলি, গালাগালি, বিবাদ চলিতেছে। গোঁড়া নরমপন্থী গরমপন্থীদের কাহাকেও কাহাতেও ভাল দেখিতেছেন না, গোঁড়া গরমপন্থী নরমপন্থীদের কাহাকেও কাহাতেও ভাল দেখিতেছেন না। শেষে কি মুখ-দেখাদেখি পংক্তিভোজন একাসনে উপবেশনও বন্ধ হইবে? ইহা অতি দুর্লক্ষণ। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, রাজনীতিতেও তেমনি অনেক বিষয়ে মতভেদ স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। তাই বলিয়া নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে কোন বিষয়েই মতের মিল হইতে পারে না, কোন কাজেই তাঁহারা সম্মিলিত চেষ্টা করিতে পারেন না, ইহা মনে করা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভবে যাঁহাকে দলাদলির ভাব অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই অন্ধতা নরম গরম দুই দলেই দেখা যাইতেছে।

গত ৭ই এপ্রিল ভারতসভাগৃহে লর্ডসিংহ ও বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সম্মানার্থ এক অপরাহ্ণ সম্মিলনের আয়োজন হয়। তথায় ইহাঁরা দুজনে বক্তৃতা করেন। বেঙ্গলীতে দেখিতেছি, লর্ড সিংহ বলেন, যে, "personally he was against the Moderates cooperating with the Extremists"; "তিনি নিজে নরমপন্থীদের গরমপন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিবার বিরোধী।" এরূপ কথা একটুও বিজ্ঞজনোচিত ও দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে। লর্ড সিংহ দেশের লোকদের সঙ্গে মিশিয়া দেশের রাজনৈতিক বেসরকারী কোন অনুষ্ঠানে সম্ভবতঃ জীবনের মোট এক বৎসর সময়ও ব্যয় করেন নাই, বলিয়াই, এমন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতে পারিয়াছেন। এই যে সেদিন পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়ে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট, নরমপন্থী ও গরমপন্থী সকলে পরস্পরের সহযোগিতা করিলেন, এসম্বন্ধে লর্ড সিংহ কি বলেন? এরূপ এবং ইহা হইতে ভিন্নজাতীয় আরও অনেক সহযোগিতার ক্ষেত্র ও উপলক্ষ মিলিবে, যাহাতে সহযোগিতা না করাটাই অন্যায় ও অধর্ম্ম হইবে। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে

সকলকে লর্ড সিংহের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে বলিতে পারি।

নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে প্রভেদটা যে খুব গুরুতর রকমের, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। তাহার মধ্যে একটি, পঞ্জাবে সামরিক আইন-প্রয়োগকালীন এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ও অবস্থার তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক বেসরকারী কমিশন নিয়োগ। এইটি ও অপর দৃষ্টান্তগুলি এরূপ যে সে সম্বন্ধে নরমপন্থীদের মধ্যেও কিছু কিছু মতভেদ আছে। যাহা হউক, উপদ্রব ও অত্যাচারের সরকারী তদন্ত সন্তোষজনক না হওয়ায়, তদন্ত করিবার জন্য বেসরকারী কমিশন পঞ্জাবের কমিশনের আগেও একাধিক বার বসিয়াছে। নরম-পন্থাদলের অন্যতম নেতা বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এইরূপ কমিশনে সভ্যের কাজ করিয়াছেন। ভারতসভায় বক্তৃতা করিবার সময় লর্ড সিংহের এসব কথা মনে ছিল কি?

নরমপন্থী দলের লর্ড সিংহ যেমন সহযোগিতা-বিষয়ে চরমপন্থী কথা বলিয়াছেন, গরমপন্থী দলের একজন সভ্যও মেদিনীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে ঐরূপ চরমপন্থী কথা বলিয়াছেন। গরমপন্থাদল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কেন হইতে চান, এইরূপ প্রশ্ন হওয়ায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র-লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া কাগজে দেখা যায়:—

"They would be able to make a hell of the lives of the Moderate Council members by perpetual opposition. It was an incumbent duty on them. They had been asked to be reasonable and sensible. The speaker asked them to be insensible and violently unreasonable in their detestation of slavery and in their love of country."

তাৎপর্য্য—তাঁহারা অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার গরমপন্থী সভ্যেরা সকল সময়ে বিরোধিতা করিয়া নরমপন্থী সভ্যদের জীবনকে নরকবাসে পরিণত করিতে পারিবেন। ইহা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। গরম-পন্থীদিগকে সুযুক্তির অনুসরণ করিতে ও বিবেচক হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। বক্তা (জিতেন্দ্রবাবু) তাঁহাদিগকে (গরমপন্থীদিগকে) দাসত্বের প্রতি ঘৃণায় এবং স্বদেশের প্রতি প্রীতিতে অবুঝ ও অবিবেচক এবং প্রচণ্ডরূপে অযৌক্তিক হইতে অনুরোধ করেন।

জিতেন্দ্র-বাবু যাহা বলিয়াছেন, অক্ষরে অক্ষরে তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত, এরূপ ধরিয়া লওয়া হয়ত ঠিক্ হইবে না; কারণ বাগ্মীরা অনেক সময় কথার স্রোতে এবং ঝোঁকে যাহা বলে ঠিক্ তাহার বিপরীত কথা বলিবার প্রলোভনে, এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত নহে, কিম্বা যাহার সদর্থ হয় না। দাসত্বকে ঘৃণা করিবার জন্য, স্বদেশকে কায়মনোবাক্যে প্রীতি করিবার ও তাহার সেবা করিবার জন্য একটুও অবুঝ অবিবেচক হওয়া বা অযৌক্তিক ব্যবহার করা দরকার বলিয়া আমরা মনে করি না। যাঁটি দেশভক্তকে যখন দেশ ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণও দিতে হয় এবং তিনি প্রাণ দেন, তখনও তিনি একটুও অবুঝ অবিবেচকের মত অযৌক্তিক আচরণ করেন না।

যাহা হউক, আমরা দেখাইতে চাই, যে, যেমন লর্ড সিংহ মনে করেন, গরমপন্থীদের সহিত সহযোগিতা করা যায় না, জিতেন-বাবুও তেমনি মনে করেন, যে, গরম-পন্থীরা কেবল সার্ব্বকালিক বিরোধিতারই যোগ্য, তাঁহাদের সঙ্গে কোন ক্ষেত্রে কোন কালে সহযোগিতা করা চলে না। অধিকন্তু, তিনি তাঁহারই দেশমাতার সন্তান গরমপন্থীদের জীবনটা নরকবাসের তুল্য করিতে ব্যগ্র। আমাদের মনে হয়, যিনি যখন যে বিষয়ে যে পরিমাণে দেশের কল্যাণ করিতে চাহিবেন, তাঁহারই সহিত তখন সেই বিষয়ে সেই পরিমাণে সহযোগিতা করিতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত অন্য দিকে, যিনি যখন যে বিষয়ে যে পরিমাণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দেশের অনিষ্ট করিতে চাহিবেন, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে আমাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত। এই প্রকারে আমরা সরকারী, নরমপন্থী, গরমপন্থী, সব রকম লোকের স্থলবিশেষে সহযোগী স্থলবিশেষে বিরোধী হইতে পারি। অবশ্য কোন একটা দলের সর্ব্বথা সমর্থন বা অনুসরণ বা সর্ব্বদা বিরুদ্ধাচরণ ইহা অপেক্ষা সোজা কাজ কারণ, তাহাতে ভাবিবার বুঝিবার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না।

সহযোগিতা সম্বন্ধে ভূপেন্দ্র-বাবুর মত।

ভারতসভা-গৃহে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—"could not be denied that the Extremis had also rendered valuable services to t' country," "ইহা অস্বীকার করা যায় না যে গরমপন্থীরা

দেশের খুব হিত করিয়াছেন।" তিনি ইহাও বলেন—"he was in favour of co-operation with the Extremist party when it was necessary and desirable and when the interests of the country demanded it;" "যখন গরমপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় এবং যখন দেশের স্বার্থ উহাই চায়, তখন তিনি উহার পক্ষে।" ইহা বিজ্ঞের মত কথা। তাঁহার এই কথাগুলি অমৃতবাজার পত্রিকা ও ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে বাহির হইয়াছে, বেঙ্গলীতে দেখিতে পাই নাই।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ব্রিটিশশাসিত ভারত ত্যাগ করিয়া পণ্ডিচেরী চলিয়া যাইবার আগে স্বদেশবাসীদিগকে "কর্ম্মযোগিন্" কাগজে যে শেষ চিঠি লিখিয়া যান, তাহা হইতে ভূপেন্দ্র-বাবু কিয়দংশ পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায়, জিতেন্দ্র-বাবু যেরূপ গবর্ণমেণ্টের সদা-বিরোধিতার সমর্থন করিয়াছেন, অরবিন্দ-বাবু তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। আমরা ঐ চিঠি হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি।

The Nationalist principle is the principle of "No control, no co-operation." Since all control has been refused and so long as all control is refused, the Nationalist party preaches the refusal of co-operation as complete as we can make it. But it is evident that if, for instance, the power of imposing protective duties were given to a popular and elective body, no serious political party would prefer persistence in commercial boycott to the use of the powers conceded. Or if education were similarly made free of official control and entrusted to a popular body, as Lord Reay once thought of entrusting it, no sensible politician would ask the nation to boycott that education.

ভারতীয়দের যোগ্যতা সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রবাবুর মত।

ভূপেন্দ্র-বাবু ইহাও বলেন—"They were now given more than they wanted and as much as they deserved. Were they now fit for complete self-government? No." অর্থাৎ "আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম আমাদিগকে তদপেক্ষা বেশী, এবং যতটা পাইবার আমরা যোগ্য তাহা, দেওয়া হইয়াছে। আমরা কি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইবার যোগ্য? না।" এখানে প্রথম বাক্যের "আমরা" মানে নরমপন্থী দল; কারণ গরমপন্থীরা যাহা চাহিয়াছিলেন, তদপেক্ষা বেশী পাওয়া দূরে থাক্, তাহাও পান নাই। গরমপন্থীরা চাহিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ অগ্রসর প্রদেশগুলিতে সকল বিষয়ের ভার দেশী মন্ত্রীদিগকে দেওয়া হউক, অর্থাৎ তথায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হউক; তাঁহারা নূতন ভারতশাসন-আইনে, ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (personal liberty), সভা করিয়া স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ (free speech), মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (free press), এই-সব বিষয়ের অধিকার ঘোষণা (declaration of rights) অন্তর্নিবিষ্ট করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। নরমপন্থীরাও কি তাঁহাদের প্রার্থিত সব-কিছু পাইয়াছেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁহারা সমগ্রভারতের গবর্ণমেণ্টে অন্ততঃ একটা কোন বিষয়ের ভার দায়িত্ববিশিষ্ট দেশী মন্ত্রীর (responsible ministerএর) হাতে দেওয়া হয়, এইরূপ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন ভারতশাসন-আইনে সেরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং কি অর্থে নরমপন্থীদের আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনার অধিক, পূর্ণ হইয়াছে, খুলিয়া না বলিলে তাহার আলোচনা করা যায় না। অবশ্য, কোন কোন বিষয়ের কোন কোন উপরিভাগে নরমপন্থীদের প্রার্থনা অপেক্ষা যেমন কম দেওয়া হইয়াছে, তেমনি কোন কোন উপ-বিভাগে হয় ত কিছু বেশী দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর ভারতের কোনও রাজনৈতিক দল প্রার্থিত অধিকার অপেক্ষা বেশী অধিকার পাইয়াছেন, আমাদের ধারণা এরূপ নহে।

ভূপেন্দ্র-বাবু বলিতেছেন, দেশের লোকেরা যতটুকু অধিকার পাইবার যোগ্য তাহা তাহারা পাইয়াছে, এবং তাহারা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য নহে। এ বিষয়ে আমাদের মত অন্যবিধ; তাহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। আবার সংক্ষেপে বলি।

উপনিষদে আছে, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন না, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই তিনিও জানেন না, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছেন ও জানেন নাই, তিনিই জানিয়াছেন।

ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্মের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তিনি আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞাতও নহেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতও নহেন।

দেশের কাজ চালাইবার যোগ্যতা, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের যোগ্যতা, সম্বন্ধেও এই-প্রকার কথাই বলিতে হয়। পৃথিবীর কোন জাতিই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করে নাই, কোন জাতিই সম্পূর্ণ অযোগ্যও নহে। কাজ করিতে করিতেই যোগ্যতা বাড়ে। যাহারা এক দিকে অযোগ্য, তাহারা অন্যদিকে যোগ্য। এক জাতি, যোগ্য বলিয়া গণিত জাতিদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে অযোগ্য হইলেও, অন্য কোন কোন বিষয়ে হয় ত যোগ্যতর। এক একটি দেশের মধ্যে যেমন কোন কোন গৃহস্থ নিজেদের কাজ খুব ভাল চালায়, অপর কোন কোন গৃহস্থ তত ভাল না পারিলেও নিজের ঘরকন্না ও বিষয়ের ভার হইতে বঞ্চিত হয় না, যতটা ভাল পারে, ততটাই চালায়, তেমনি পৃথিবীতেও কোন জাতিকেই স্বদেশের কাজ চালাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। অবশ্য কোন পরিবারের কর্ত্তা ও অন্য সব প্রাপ্তবয়স্ক লোক পাগল হইলে, কিম্বা পরিবারে কোন সাবালক সমর্থ লোক না থাকিলে, কিছুকালের জন্য তাহাদের বৈষয়িক ভার অন্য সমর্থ লোকের উপর অর্পিত হইতে পারে; যেমন নাবালক বা ঋণজালজড়িত অক্ষম জমিদারদের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে যায়; কিন্তু তাহাও কিছুকালের জন্য, পুরুষানুক্রমে নহে। আমাদের সমুদয় জাতিটা শতাব্দী অতিক্রম করিয়া পাগল বা নাবালক রহিয়াছে বা থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যেমন কঠিনতম বিষয় শিখিতে ও তাহাতে দক্ষতা লাভ করিতে কোন প্রকৃতিস্থ মানুষের ২৫।৩০ বৎসরের বেশী সময় লাগে না, তেমনি রাষ্ট্রীয় কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতেও উহার বেশী সময় কোন জাতির লাগে না। জাপানীরা, ফিলিপিনোরা, কিউবানরা, ঐরূপ সময়ের মধ্যে স্ব স্ব দেশের কাজ চালাইবার যোগ্য হইয়াছে। আমাদের অতীত ইতিহাসে আমরা উহাদের চেয়ে কম সভ্য বা কম কৃতি ছিলাম না; এখনও যেদিকে সুযোগ হইতেছে সেই দিকেই কৃতিত্ব দেখাইতেছি। আমরা এখনও নাবালক আছি মনে করিবার কারণ নাই।

বস্তুতঃ সবজাতিই সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে অধিকারী। অবশ্য মানবপ্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় সব জাতিকে স্বাধীন করিয়া দিলে, অল্পদিনের মধ্যেই কতকগুলি জাতি আবার পরাধীন হইয়া পড়িবে, ইহা স্বীকার্য্য; কারণ শ্বাপদ জাতিরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে এবং তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এই কথাগুলি পড়িবামাত্রই অনেকে বলিবেন, "তাহা হইলেই প্রমাণ হইল, যে, কতকগুলি জাতি স্বাধীনতার যোগ্য নহে।" তাহার উত্তরে আমরা বলি, ডাকাতরা অনেক গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যায়, এবং উত্তরপশ্চিমসীমান্তে গৃহস্থদেরও ধরিয়া লইয়া যায়। তাহা দ্বারা কি ইহাই প্রমাণ হয়, যে, ঐ গৃহস্থেরা ডাকাতদের দাস হইবার এবং তাহাদের দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হইবারই যোগ্য?

আরবদিগকে এখন ইংরেজ ও ফরাসীরা স্বাধীনতার যোগ্য মনে করিতেছেন। আর্ম্মানীদিগকেও তাহাদের দেশে স্বাধীন করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই উভয় জাতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুর্কদের অধীন ছিল। ইহারা একমাত্র নিজ বাহুবলে স্বাধীনতার অধিকার অর্জ্জন করে নাই, এবং ইউরোপীয় মিত্রশক্তিদের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও পারিবে না। ইহারা সভ্যতায় মিসরের বা ভারতের লোকদের চেয়ে উন্নত নহে। অথচ ইংরেজ ইহাদিগকে স্বাধীনতার যোগ্য মনে করেন, মিশরের লোকদিগকে স্বাধীনতার এবং ভারতের লোকদিগকে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য মনে করেন না। তাহার কারণ এই, যে, স্বাধীনতার স্বরাজের বা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্যতার কোন মাপকাঠি নাই; প্রবল শক্তিশালী জাতিরা নিজেদের স্বার্থ অনুসারে কাহাকেও যোগ্য কাহাকেও অযোগ্য বলেন। আরবরা ও আর্ম্মানীরা ইংরেজের শত্রু তুর্কের অধীন ছিল, অতএব তাহাদিগকে স্বাধীনতার যোগ্য মনে করিলে ইংরেজের কোন ক্ষতি নাই; মিশরের ও ভারতের লোকেরা ইংরেজেরই অধীন, তাহাদিগকে তাহাদের দাবী মাফিক যোগ্য মনে করিলে ইংরেজের ক্ষতি আছে, অতএব তাহারা অযোগ্য, বাস্তবিক ইহা ছাড়া আর কোন সত্য যুক্তি এই-সব যোগ্যাযোগ্য বিচারের মধ্যে নাই।

পৃথিবীতে অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, সভ্য, নানা প্রকার

স্বাধীন জাতি আছে। দেশের কাজ চালাইবার শক্তিতে আমরা ইহাদের প্রত্যেকের চেয়ে হীন নহি। সভ্যতম দেশের লোকেরাও রাষ্ট্রীয় কার্য্যে খুব গুরুতর ভুল করে, সে-সব দেশেও সাংঘাতিক দলাদলি দাঙ্গা মারামারি কাটাকাটি, গবর্ণমেণ্ট ওলটপালট এবং কোথাও কোথাও রাষ্ট্রবিপ্লবও হয়; অথচ তাহারা পরাধীনতারই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীন বলিয়া গণিত কোন কোন জাতি নিজের শক্তিতে স্বাধীন হয় নাই, তাহারা ও অন্য অনেক স্বাধীন জাতি প্রবল জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও পারে না। সুতরাং, ইহা সত্ত্বেও, এই ক্ষুদ্র স্বাধীন জাতিরা যদি স্বাধীনতার যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসনেরও অযোগ্য বিবেচিত কেন হইব বুঝিতে পারি না। সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইলে আমরা ভুলচুক করিতে পারি, টাকার অপব্যয় ও চুরি হইতে পারে, এমন কি রক্তপাতও হইতে পারে; কিন্তু এখনও ভারতের ইংরেজ রাজপুরুষেরা গুরুতর ভুলচুক করে, কোটি কোটি টাকা অপব্যয় ও ক্ষতি হয়, বিস্তর সরকারী টাকা চুরি হয়, রক্তপাত সরকারী বেসরকারী উভয়বিধ লোকের দ্বারা খুব হয়। বস্তুতঃ এই-সব ব্যাপার স্বাধীনতম আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রেও হইয়া থাকে। আমরা ধীরভাবে এই-সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি, যে, আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এখনই সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। অধিকন্তু আরব ও আর্মানীদের স্বাধীনতার যোগ্যতার পশ্চাতে ইউরোপীয় মিত্রশক্তিদের যে আনুকূল্য ও রক্ষণ-প্রতিশ্রুতি উহ্য রহিয়াছে, আমরা কিছুকালের জন্য তাহা পাইলে আমরাও পূর্ণ স্বাধীনতার যোগ্য বিবেচিত হইতে এবং তাহা রক্ষা করিতে পারি।

কয়েকটি প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স।

বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই, পঞ্জাব, বাংলা ও সিন্ধুপ্রদেশে রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সাড়ে চারি কোটির উপর, পঞ্জাবের লোকসংখ্যা প্রায় দু কোটি, বোম্বাইপ্রদেশের লোকসংখ্যাও প্রায় দু কোটি, এবং সিন্ধু উপপ্রদেশের লোক-সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের মেদিনীপুর অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা চারিশতের বেশী হয় নাই, বোম্বাইয়ের কন্‌ফারেন্সের শোলাপুর অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা দুহাজার সাতশত হইয়াছিল, পঞ্জাবের কন্‌ফারেন্সের জালন্দর অধিবেশনে ষোলশত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, ক্ষুদ্র সিন্ধুদেশের কন্‌ফারেন্সের সক্কর অধিবেশনে ৯৭৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এইপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙালীর কিরূপ উৎসাহ, তাহা ঐ সংখ্যাগুলি হইতেই অনুমিত হইবে। মেদিনীপুরের কোন দোষ নাই, মেদিনীপুর যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন।

বঙ্গীয় কন্‌ফারেন্সে নূতন ভারতশাসন-আইন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়, আমরা স্থূলতঃ তাহাতে সায় দিতে পারি; আমরাও মনে করি না, যে, আইনটি সন্তোষজনক বা তদ্দ্বারা ভারতীয়দিগকে প্রদত্ত অধিকার যথেষ্ট হইয়াছে। তবে, আমরা disappointing কথাটি ব্যবহার করিতে চাই না, কারণ আইনটি সন্তোষ-জনক হইবে, এ আশা আমরা কোনো কালেই করি নাই। মেদিনীপুরে যে-সব প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন কাগজে তাহার সকলগুলি একত্র মুদ্রিত দেখি নাই। সুতরাং কি হওয়া উচিত ছিল, অথচ হয় নাই, তাহা বলিতে পারিতেছি না। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইতেছে, এক স্বদেশী-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ছাড়া আমরা স্বয়ং যাহা করিতে পারি এরূপ কোন বিষয়ে প্রস্তাব ধার্য্য হয় নাই। তবে, ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না; সমস্ত প্রস্তাবগুলি পাইলে বলিতে পারি। যে-সকল বিষয়ে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, সবগুলিই প্রয়োজনীয়, দু-একটি মাত্র দায়ে পড়িয়া করা। প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলির ভাষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, যে, আমরা যেমন প্রার্থনা করিতে চাই না, তেমনি "demand" কথাটিরও প্রয়োগ করিতে চাই না; কারণ দাবী আদায় করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই; আমরা শুধু বলিতে চাই, কি হওয়া উচিত। রাজনৈতিক কারণে যাঁহারা কারারুদ্ধ বা অন্তরায়িত হইয়াছিলেন, এখন খালাস পাইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা যথোচিত কর্ত্তব্য করি

নাই; কন্‌ফারেন্স ইঁহাদের কথা ভুলিয়া যান নাই। যাঁহারা এখনও আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের কথাও কন্‌ফারেন্স ভুলেন নাই।

পঞ্জাবের কন্‌ফারেন্সে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, যে, নারীদিগকেও ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক। বাংলা দেশের কন্‌ফারেন্সে এরূপ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই। বাঙালী মহিলারাও চুপ করিয়া আছেন।

বাংলা দেশের নানাবিধ খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ কাঁচা মাল হইতে আমরা স্বয়ং কি প্রকারে আমাদের ব্যবহার্য্য অনেক প্রকার পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি, তাহার আলোচনা করিবার জন্য আমরা অনেক দিন হইতে সম্মিলিত হই নাই। ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কন্‌ফারেন্স এবারও হয় নাই। অথচ দেশের দারিদ্র্য দূর করা এখন জীবনমরণের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সেই এ-সব বিষয়ের কিছু আলোচনা হইলে ভাল হইত, তাহা অনঙ্গতও হইত না। রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত ইহার সম্বন্ধও আছে; স্বদেশী সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ধার্য্য করায় তাহা স্বীকৃতও হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতটবর্ত্তীস্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার কথা উত্থাপন করিয়া, এবং কন্‌ফারেন্সের সভাপতি মৌলবী ফজলল্ হক্ কৃষিবিভাগের কার্য্যের আলোচনা করিয়া, ইহা প্রকারান্তরে মানিয়া লইয়াছেন। বাংলার মস্‌লেম্ লীগের দিনাজপুর অধিবেশনে গৃহীত দুটি প্রস্তাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লীগ একটি প্রসঙ্গে বলেন, যে, নানাপ্রকার শিল্প দ্বারা কি প্রকারে বঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; এবং লীগ আশা করেন গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই কাজে হাত দিবেন। আর-একটি প্রস্তাবে লীগ গবর্ণমেণ্টকে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, যাত্রী ও মাল যাতায়াতের সুবিধাবৃদ্ধির জন্য এবং জমীর উন্নতির জন্য, খননাদি উপায়ে দেশের নদীগুলির উন্নতি করিতে অনুরোধ করেন।

দুটি গুরুতর বিষয় কন্‌ফারেন্সের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ হইতে যত প্রকারে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তাহার কতক অংশ ভারত-গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, কিয়দংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে দেওয়া হয়। নূতন ভারত-শাসন-আইন অনুসারে কাজ হইবার আগে নূতন করিয়া এই রাজস্ব-ভাগ হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের এখন দেখা উচিত, যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট কোন প্রদেশ হইতে অন্যায়রূপ বেশী টাকা না লন। কোন কোন প্রদেশের "মান্যগণ্য" কোন কোন লোক বলিয়াছেন, হয়ত গবর্ণমেণ্টেরও ধারণা তদ্রূপ, যে বাংলাদেশ হইতে, ইহার আয়তন লোকসংখ্যা ও ধনের অনুপাতে, ভারতগবর্ণমেণ্ট কম টাকা লইয়া আসিতেছেন। আমাদের ধারণা বাংলা-দেশকে কোন অনুগ্রহ করা বা রেহাই দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, কন্‌ফারেন্স এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া, বঙ্গদেশ হইতে ন্যায়তঃ কত লওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিলে ভাল হইত (অবশ্য যদি তাহা না করা হইয়া থাকে)। এ বিষয়ে ভারতসভা, বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স্ এসোসিয়েশ্যন, প্রভৃতি, নিজ নিজ মত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। কাগজে তাহা বাহিরও হইয়াছে। মডার্ণ রিভিউ কাগজেও এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

অন্য গুরুতর বিষয়টি ইংলণ্ডের পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষীয় টাকার আপেক্ষিক মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়ের হার ঘটিত। এই বিষয়টি আমরা অনেকেই বুঝিতে চেষ্টা করি না। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা বলেন, বিলাতে ভারত-সচিব ও এখানে গবর্ণমেণ্ট যে-দরে যে-পরিমাণে, যে-ভাবে ইণ্ডিয়া কৌন্সিল্ বিল্ ও রিভার্স কৌন্সিল্ বিল্ বিক্রী করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদ্দ্বারা ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের অনেক কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে এবং এখনও আরও হইতেছে। এ-বিষয়ে বোম্বাইয়ে বৃহৎ সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজের নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে, বঙ্গে তাহা হয় নাই। বঙ্গের কোন কাগজেও ইহার যথোচিত বিশদ আলোচনা হয় নাই। মডার্ণ রিভিউ মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতট।

বাঙালীরা যখন যে জেলায় একত্র সম্মিলিত হন, তখন দেশের ধনবৃদ্ধির পক্ষে সেই জেলার বিশেষ কি উপযোগিতা আছে, তাহা আলোচিত হইলে ভাল হয়। মেদিনীপুর জেলার একদিকে সমুদ্র। এই জেলার অন্তর্গত তমলুক পুরাকালে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এখানে অনেক জাহাজ লাগিত ও এখান হইতে অনেক জাহাজ বিদেশে যাইত। তমলুকের অবস্থান ও অবস্থা এখন আগেকার মত নাই, কিন্তু সমুদ্র এখনও মেদিনীপুর জেলার এক সীমা হইয়া রহিয়াছে। সমুদ্রকে রত্নাকর নাম বৃথা দেওয়া হয় নাই। ইহা বাণিজ্যের প্রধান উপায়; বাঙালী সেকথা কি ভুলিয়াই থাকিবেন? সমুদ্র হইতে লবণ ত পাওয়া যায়ই, আরও কত কি জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা কেন হয় না? জাপানীরা সমুদ্র হইতে এক-প্রকার উদ্ভিদ্ পাইয়াছে যাহা তুলার সঙ্গে মিশাইয়া তাহারা কাপড় খুব সস্তা করিতে পারিবে। আমরা সমুদ্র হইতে উদ্ভিজ্জ প্রাণিজ কোন-প্রকার সম্পত্তিই আহরণ করিতে পারি না কেন? পরম হন যে স্বাস্থ্য, তাহাও সমুদ্রতটবর্ত্তী নানা স্থানে লাভ করা যায়। আমরা এখন চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে সমুদ্রতটে কিছুকাল বাস করিতে চাহিলে পুরী অপেক্ষা নিকটতর স্থান পাই না। অথচ কাঁথির নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক একটি ছোট গ্রাম বা সহর নির্ম্মিত হইতে পারে। একাই এ-কাজ করিতে সমর্থ ধনী বাংলা দেশে আছেন, অথবা দশজনে মিলিয়া কোম্পানী বাঁধিয়াও একাজ হইতে পারে। ইহাতে লাভ আছে। শুনিতে পাই, ইতিমধ্যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের একজন বড় ইংরেজ কর্ম্মচারী ও এক ইংরেজ হোটেলওয়ালা কাঁথির নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরে স্থান নির্ব্বাচন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা কিছু করিলে আমরা তখন তাঁহাদের প্রসাদভিখারী হইব। তার চেয়ে ভাল জায়গা বাছিয়া আমরাই কেন একটি গ্রামের পত্তন করি না? প্রথম হইতেই উহা যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যকর প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত হউক।

মেদিনীপুরে সমাজসংস্কার-সভার অধিবেশন।

বহুকাল পরে, মেদিনীপুরে, সমাজসংস্কার-সভার অধিবেশন হওয়ায় আহ্লাদিত হইয়াছি। সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিভাষণটির সহজ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। বাংলা দেশের অনেক জায়গা হইতে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই ঝাভেরভাই পটেল মহাশয়ের হিন্দুবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ হইতেছে। যাঁহারা প্রতিবাদ করিতেছেন তাঁহারা সকলে আইনটি কি ও উহার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন কি না, সন্দেহ। অনেক জায়গায় প্রচার করা হইয়াছে শুনিয়াছি যে এই আইন জোর করিয়া ভিন্ন জা'তের বরকন্যার বিবাহ দিবার জন্য বিধিবদ্ধ হইতেছে। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। ভিন্ন জা'তের বর-কন্যা স্বেচ্ছায় বিবাহ করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ হইবে, এই আইনে কেবল তাহারই বিধান করা হইতেছে। অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আইনটির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি-গুলির খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, যে, ইহা শাস্ত্রবিরোধী নহে; বরং ইহা পাস্ না হইলে উন্নতি-শীল হিন্দুদের অভিযোগের কারণ ঘটিবে, এবং শৈব, বৈষ্ণব ও অন্য যে-সব হিন্দু সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহের অনুমোদন করে এবং যাহাদের মধ্যে এরূপ বিবাহ এখনও প্রচলিত, আইন পাস্ না হইলে তাহাদেরও অভিযোগের কারণ হইবে। আইন দ্বারা সমাজসংস্কার করা ভাল নয়, এই আপত্তির বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে, অনুমতিমূলক (permissive) আইনের বিরুদ্ধে ইহা খাটে না। যাঁহারা Eugenics বা সৌজাত্যবিদ্যার দোহাই দিয়া আপত্তি করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ঠিক্ই বলিয়াছেন, যে, ঐ বিজ্ঞান অনুসারে শুধু ভিন্ন ভিন্ন জা'ত (caste) কেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতি (race)র মধ্যেও বিবাহ আবশ্যক। সমাজসংস্কার-সভায় পটেলবিলের সমর্থক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার অন্যান্য প্রস্তাব-গুলিও সর্ব্বাংশে অনুমোদনীয় এবং সময়োপযোগী হইয়াছিল।

জালিয়ানওয়ালা-বাগ স্মৃতিমন্দির।

অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা-বাগে যে-সকল নিরপরাধ লোকের দেশের জন্য প্রাণ গিয়াছে, তাহাদের স্মৃতি রক্ষা ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে ঐ স্থানটি ক্রয় করিয়া তাহাতে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব স্থির হইয়াছে। ইহার জন্য দশ লক্ষ টাকা চাই। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেকের চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য। কয়েকদিন আগে কাগজে দেখিয়াছিলাম বোম্বাইয়ে তখনই তাড়াই লক্ষ টাকার উপর চাঁদা উঠিয়াছে, এবং পঞ্জাবে প্রায় দুই লক্ষ উঠিয়াছে। কলিকাতাতে কিছু উঠিয়াছে কিন্তু তাহা কত জানি না। বাংলা দেশের বাহিরের কোন কাজে টাকা উঠার জন্য বাংলা দেশ বিখ্যাত নহে।

রৌলট আইন, প্রেস্ আইন, প্রভৃতি।

গত ৬ই এপ্রিল হইতে এক সপ্তাহকাল, জাতীয় কল্যাণার্থ চাঁদা দান ও সংগ্রহ, নির্দ্দিষ্ট দিনে উপবাস, সভা করিয়া রৌলট আইন প্রভৃতি নিরীহ আইনের প্রতিবাদ,—এবম্বিধ কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া স্থির হয়। তদনুসারে নানাস্থানে চাঁদা উঠিয়াছে, সভাও হইয়াছে। রৌলট আইন রদ হওয়া যে চাইই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা থাকিতে কোন একাগ্রচিত্ত দেশহিতকামী কর্ম্মী, বক্তা ও লেখক আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারেন না। এরূপ কেহ যদি অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ না হন, তাহা এজন্য নহে, যে প্রত্যেক নিরপরাধ ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু এইজন্য যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার স্বাধীনতা লোপ করা এখন আবশ্যক মনে করেন না কিম্বা এখন তাহা করা অসুবিধাজনক। প্রেস আইন প্রত্যেক সম্পাদক প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নিত্য অপমানকর। এই আইনে পরোক্ষভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, সম্পাদক প্রকাশক ও মুদ্রাকরেরা বদ্‌মায়েস জাতীয় জীব, তাহাদের নিকট হইতে জামিন না লইলে তাহারা অপরাধ করিবে। যাঁহাদের নিকট হইতে জামিন লওয়া হয় নাই, তাঁহারা ও অপমানিত; কারণ তাঁহাদিগকে দয়া করিয়া রেহাই (exemption) দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই আইন মানুষের ভাব ও চিন্তার প্রকাশে বাধা দেয়, এই জন্য চিন্তাতেও বাধা পড়ে। ইহা মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশ্যন আজকালকার সময়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইহার প্রয়োগে অনেক নির্দোষ লোক বিনা বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে, এখনও ইহা দ্বারা যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া দণ্ডিত করা যায়।

এই সমস্ত আইন অবিলম্বে রদ হওয়া উচিত।

তুর্ক-সাম্রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার।

যে-সকল কারণ দেখাইয়া তুর্ক সাম্রাজ্যকে অঙ্গহীন ও ক্ষুদ্র করিবার এবং তুরস্কের সুলতানকে রাষ্ট্রীয়শক্তিহীন করিবার ও তাঁহাকে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, সেগুলি সত্য হইলে, ঠিক্ ঐরূপ কারণে জার্ম্মেনী, বুল্‌গেরিয়া, রুমেনিয়া প্রভৃতির প্রতিও ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত ইহা আমরা আগে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি।

তুর্কদের বিরুদ্ধে একটা কথা এই বলা হয় যে, উহাদের শাসনাধীন দেশে কোন উন্নতি হয় না, দেশ উচ্ছন্ন যায়। ইহার সত্যমিথ্যা স্থির করা কঠিন; কারণ আমাদিগকে তথ্য জানিতে হয়, ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ খ্রীষ্টিয়ান লেখকদিগের খবরের কাগজ ও বহি হইতে। অন্য দেশের ও জাতির রাজনৈতিক লেখকদের মত তাহাদের মধ্যেও নিরপেক্ষ সত্যবাদী লোকের সংখ্যা বেশী নহে। যাহা হউক, একটা বিষয়ে খ্রীষ্টীয় লেখকদের বহি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে, তুর্কশাসনকে যত মন্দ বলা যাইতেছে, উহা তত মন্দ নহে। বিষয়টি শিক্ষা। "১৯১৭-১৮ সালে ভারতীয় শিক্ষা" (Indian Education in 1917-18) নামক সরকারী রিপোর্টের ৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যে, ঐ বৎসর ব্রিটিশভারতের সমস্ত অধিবাসীর শতকরা ৩২৬ জন কলেজ বিদ্যালয় ও পাঠশালায় শিক্ষা পাইতেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের নিউ হেজেল এন্যুয়েল (*The New Hazell Annual*) নামক বার্ষিক পুস্তকের ৫৯৬ পৃষ্ঠায় আছে যে তুর্ক-সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ১,৩৪,৮১,০০০, এবং ৫৯৭ পৃষ্ঠায় আছে যে তথায় ছাত্রসংখ্যা ১৩,৫০,০০০। তাহা হইলে ঐ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের

শতকরা ১০ জনেরও অধিক শিক্ষাধীন। অতএব তথায় শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিশভারতের তিন গুণেরও বেশী, এবং ইটালী, গ্রীস্, স্পেন, পোর্টুগ্যাল ও রুশিয়া অপেক্ষাও উহা বেশী।

স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী।

টাউনহলে স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা হইতে নূতন কিছু শিখিয়াছি, ভাল করিয়া দেখিবার ও জিজ্ঞাসা করিবার সময় থাকিলে তার চেয়ে অনেক বেশী শিখিতে পারিতাম। প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে এরূপ প্রদর্শনী দীর্ঘকাল খোলা থাকিলে অনেক উপকার হয়। ইহা সত্য, যে, দারিদ্র্য, ভাল খাইবার পরিবার ঘর করিবার সামর্থ্য না থাকা, রুগ্নতার ও শিশুমৃত্যুর ভীষণ আধিক্যের প্রধান কারণ; কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানা ও তাহা পালন না করা এবং সূতিকাগারের শোচনীয় অবস্থাও যে প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ হইলে কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতি ধনী মাড়োয়ারীদের বাসস্থানগুলিতে শিশুমৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত না। দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত; কিন্তু স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াইবার, সূতিকাগৃহের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টাও হওয়া চাই। যদি কেহ স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করিতে চান, সূতিকাগৃহের অবস্থা ভাল করিতে বলেন ও তাহার পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে এই বলিয়া চীৎকার করা উচিত নয়, যে, "যেহেতু দারিদ্র্য রুগ্নতার ও শিশুমৃত্যুর আধিক্যের প্রধান কারণ এবং তুমি তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছ না, অতএব তোমার প্রদর্শনীটা বাজে, অনাবশ্যক, অকেজো, ভুয়ো, ইত্যাদি। এ-কথাও ভোলা উচিত নয় যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে মানুষ শ্রম করিতে পারে, ও রোজ্‌গার করিয়া দারিদ্র্য দূর করিতে পারে।

প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমাদের একটা প্রস্তাব এই যে ইহার ছবিসমূহে লিখিত নাম ও বিবরণ যতদূর সম্ভব বাংলায় হওয়া চাই। এরূপ প্রদর্শনী সব সহরে ও গ্রামে খোলা সম্ভবপর নহে। এইজন্য প্রদর্শনীর প্রধান প্রধান ছবি প্রভৃতির বড় বড় হাফটোন ব্লক করাইয়া তাহা ছাপিয়া বর্ণনাসহ এল্‌বাম্ বা ছবির বহির আকারে অল্পমূল্যে বিক্রী করিলে লোকের উপকার হইবে।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর যে-সব ছবি ছোট আকারে এবার প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনেকগুলির মূল ছবি টাউনহলের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়

সরলা—শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত, মহলানবীশ। কলিকাতা, বিজন-বাসিনী পুস্তকালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম ১৷৷০ টাকা।

একখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার চরিত্রগঠনের মামুলি নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করিয়াছেন। এক একটা আকস্মিক ঘটনায় নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু অত সহজে মানুষের স্বরূপ বোঝানো যে সম্ভব হয় না—সেটা তাঁর জানা উচিত ছিল। তাঁর নায়ক ও নায়িকাকে তিনি আদর্শ পুরুষ ও রমণী করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু যাঁরা আদর্শস্থানীয় হইবেন তাঁরা কেবলি যে নূতন-নূতন বিপদে পড়িয়া যুদ্ধ করিতে-করিতে চলিবেন এমন ত হয় না। সংসারের নানা ছোট বড় কাজে আমরা তাঁদের মহত্ত্বের ক্রম-পরিণতি দেখিতে চাই। আলোচ্য নায়ক-নায়িকার জীবনে এই ক্রম-পরিণতির ধারার অভাব। তাছাড়া গ্রন্থকার নায়ক-নায়িকার চরিত্রের ভালোরকম গোড়াপত্তন না করিয়াই একেবারে তাদের মহত্ত্বের উচ্চ-ভূমিতে উন্নীত করিতে চান। এটাও স্বাভাবিক নহে। শেষভাগে বহুদিন-বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার ও অন্যান্য চরিত্রগুলির একত্র মিলন অদ্ভুত ভাবে ঘটিয়া উঠিয়াছে। মোটকথা উপন্যাসখানি শক্তিহীন ও অসঙ্গত। গ্রন্থকারের ভাষায় ও উপমায় অনেক দোষ আছে। সত্যানন্দ।

হোমিওপ্যাথিক সরল শিশু-চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রণীত। ৩৯।১ বীডন রো, কলিকাতা। এক টাকা।

শিশুর ভ্রূণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সর্ব্বপ্রকার উপদেশ ও রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধ এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বাংলার শিশুমৃত্যু ভারতের মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—জগতের মধ্যে ত কথাই নাই। প্রত্যেক মার কর্ত্তব্য শিশুপালনের নিয়ম ও শিশুচিকিৎসা জানা। আগেকার মায়েরা নানাবিধ টোটকা ঔষধ জানিতেন; বর্ত্তমান বংশীয়দের মায়েরা তাহা ভুলিয়াছেন। সুতরাং ঘরে ঘরে গোটাকতক সুলভ হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও একখানি শিশু-চিকিৎসার বই রাখিলে অনেক ডাক্তার-খরচ বাঁচিয়া যাইবে ও শিশুরাও বাঁচিতে পারিবে।

নূতন উপনিবেশ—দময়ন্তীকথা ও সতুর মা রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১ ক্লাইব রো, কলিকাতা। ছয় আনা।

ছোট ছেলেদের গল্পের বই—সচিত্র। পদ্মপুকুরে কচুবনে সোনা-ব্যাঙের উপনিবেশের রঙ্গভরা মজাদার কাহিনী। ছেলেরা পড়িলে আনন্দিত হইবে। মুন্সীরাক্ষস।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রজাপতি-দূত।

চিত্রকর শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

U Ray & Sons, Calcutta.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

২য় সংখ্যা

জাতিভেদ সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশের কথা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্টে আগ্রহাতিশয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথা অবতারণা করবার আগে আপনাদের সম্মুখে তা থেকে দুই এক ছত্র পাঠ করছি;—

"In Bengal while our mind is highly imaginative and our intellect peculiarly subtle, our actual social life is wholly circumscribed by conventional custom, and completely fettered by artificial rules. This divorce of our actual life from the life of our ideas has made us a race of neurasthenics. In addition it is destroying our intellectual power. At present we are too often content merely to imagine and almost never really to achieve. Our only hope lies in true university education. It must awaken in us a real sense of incependence in both thought and action."

কমিশন বলেন বাঙালীর ছেলে দোটানায় পড়েছে; তার ঘরে একরকম, বাহিরে ঠিক তার উল্টা। বাস্তবিক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের ঘরে এবং বাহিরে এত তফাৎ, তার চিন্তা ও কার্য্যে এত পার্থক্য, ভাবরাজ্য ও কর্ম্মরাজ্যের ব্যবধান এরূপ সুস্পষ্ট ও সুগভীর যে এই অসামঞ্জস্যের ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে। কলেজে জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়নকালে বাঙালী যুবক বুঝেন পৃথিবীর ছায়া-সম্পাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে; এদিকে বাড়ীর ভিতর এসে দেখেন আয়ীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে গঙ্গায় স্নান ক'রে এসেছেন—কেন না সূর্য্যদেব রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন! আমাদের পুঁথিতে বিদ্যা একরূপ, আর সমাজগত ব্যবহার ভিন্নপ্রকার। এরূপ কপটতায় আমরা অতি অল্প বয়স থেকে অভ্যস্ত হয়ে আসছি ব'লে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে বাহিরের ঠাট বজায় রাখতে আমাদের তেমন ঠেকে না—দ্বিধাবোধ হয় না। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা গ্রহণ করি, সামাজিক ব্যাপারে প্রায় তার বিরুদ্ধাচরণই ক'রে থাকি। কিন্তু এরূপ বিরোধ আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যুক্তি যা স্বীকার করে, হৃদয় যা গ্রহণ করতে চায়, চিরাচরিত ও গতানুগতিকের চাপে সেই চিন্তা ও ভাবকে যদি আমরা জীবনযাত্রাকালে বধ ক'রে চলি, তবে বাহিরের চলাফেরা বজায় থাকলেও বাস্তবে আত্মহত্যাই ঘটে! আমি অন্যত্র এই একই কথা বলেছি যে মানসিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা একসঙ্গে হওয়া চাই। এর মধ্যে একটিকে চেপে অন্যগুলির কথা প্রচার করবার প্রয়াস বিফল হবে, তাতে জাতির কল্যাণ হবে না। কারণ জাতীয় উন্নতি অর্থে একটা বাঁধা-ধরা কিছু বুঝায় না,—বুঝায় সকলদিকে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় জীবনের অবাধ বিকাশ ও প্রসার।

স্বীকার করতেই হবে যে জাতিভেদ প্রথার ভীষণ

বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, অধঃপাতে গেছি; এতই অধঃপাতে গেছি যে আবার ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে—বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটাকে—বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত ব'লে প্রমাণ না ক'রে আর ছাড়ছি না। আমরা বলি "আমরা হিন্দু—আধ্যাত্মিক জাতি, ঘোরতর spiritual; আর য়ুরোপীয়েরা জড়বাদী, বড় material; —তবু caste কোথায় নেই মশাই—এই জাত মেনে চলা? ইংলণ্ড ও আমেরিকার ধনী কি দীন দরিদ্র প্লিবিয়ানের মেয়ে বিয়ে করেন, না তার সঙ্গে একসঙ্গে আহারাদি করতে সম্মত হন? তা যখন চলে না তখন আর আমাদের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায়?" Things which are equal to the same thing are equal to one another যুক্তি এমনই চমৎকার! বংশগত জাত আর অবস্থাগত জাত যে এক নয় তা এইটুকু বল্‌লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে—বিশেষ বংশে জন্মের উপর কারো হাত নেই, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন মানুষ চেষ্টার দ্বারা করতে পারে। দরিদ্র ধনী হয়ে উঠ্‌লেই য়ুরোপ-আমেরিকায় তারা কুলীন হয়ে পড়ে; দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়ে সার্ বা লর্ড উপাধি অনেকেই পেয়েছেন এবং তাঁরা সমাজে অভিজাতদের সমকক্ষ হতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নীচু জাত হাজার তপস্যা কর্‌লেও এখন আর পূর্ব্বকালের মতন উচ্চজাত ব'লে গণ্য হতে পারে কি?

যাহোক এসব কথা ছেড়ে সমস্যাটিকে একটু তলিয়ে দেখতে হবে; তুলনা ক'রে দেখতে হবে য়ুরোপের জাতিভেদ ও আমাদের দেশের জাতিভেদের মধ্যে বাস্তবিক কোন মূলগত পার্থক্য আছে কি না, এদেশের মত য়ুরোপে জাতিভেদ মানুষকে বংশের পর বংশ ধ'রে ক্রমাগত ঘৃণা ক'রে, পেষণ ক'রে তাকে চেপে, দেবে, কোণঠাসা ক'রে, চিরকালের জন্য হীন ক'রে রেখেছে কি না, তার আত্মসম্মানজ্ঞান প্রায় লুপ্ত ক'রে দিয়ে সর্ব্বপ্রকারে তাকে খর্ব্ব করেছে কি না, হৃদয়হীন ভাবে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে কি না।

একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাক্। মনে রাখ্‌বেন আজকালকার এই "জাতিভেদ" কথাটা আমরা সৃষ্টি করেছি, এটা পুরাতন নয়, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ মাত্র নেই। সে-সকল পুস্তকে বর্ণভেদ বর্ণাশ্রম প্রভৃতির কথা দেখা যায়। গীতায় আছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতা পড়্‌লে তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি তখন আর্য্যদের দেবতা ছিলেন। আর্য্যেরা প্রার্থনা করতেন,—"হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমাদের প্রচুর সোমরস প্রদান করেছি, পান ক'রে প্রসন্ন হও—এবং কৃষ্ণকায় অনার্য্য দস্যু বধ কর।" অনার্য্যেরা কৃষ্ণকায় ও কদাচারী ছিল। আর্য্যেরা ছিল সভ্য এবং গৌরবর্ণ। এদেশে তখন জাতিভেদের মূলে ছিল বর্ণভেদ। আর্য্যেরা যখন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে উত্তর-ভারতের নদীবহুল সমতলক্ষেত্রে ক্রমে বসতিবিস্তার করতে লাগ্‌ল, তখন কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধ্‌ল এবং পরাজিত হ'য়ে তারা একে একে পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে। ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা তাদের বংশধর। আমেরিকাদেশেও এইরূপ ঘটনা ঘটেছে। পরাক্রান্ত য়ুরোপীয় জাতির সংঘর্ষণে ও আওতায় রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি হীনজাতি টিক্‌তে না পেরে, বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করেছে।

যে দেশে বর্ণভেদ ছাড়া জাতিভেদের অন্যকোন ভিত্তি ছিল না, সে দেশে এই হাজার-রকম জন্মগত জাতির উৎপত্তি কিরূপে হ'ল? নানাজাতিতে বিভক্ত বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজটিকে বিধাতা কি ঠিক এইরূপেই তৈরী ক'রে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে দ্যুলোক থেকে ভূলোকে নামিয়ে দিয়েছেন, অথবা এই ভূলোকেই এইরূপ জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে? যে হিন্দুসমাজে আদৌ জাতিভেদ ছিল না সেই সমাজ ক্রমে "স্পৃশ্য" "অস্পৃশ্য" নানাজাতিতে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে! জাতিভেদের এই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ একটু আলোচনা করতে হবে।

ম্যাক্‌স্‌মুলার প্রথম সমগ্র ঋক্ বেদ প্রকাশিত করেন। তারপর রমেশ দত্ত বেদের বাংলা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং সংস্কৃতবিশারদ না হলেও বেদের কথা এখন

অনায়াসেই জান্‌তে পারা যায়। বেবর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদের নানাপ্রকার আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে—"Caste is not a Vedic institution" ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ ছিল না আবার বৈদিকযুগের খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছবিচার সম্বন্ধে একটা কথা শুনুন,—অতিথি-সৎকারের জন্য তখন গৃহস্থের বাড়ীতে গরু মারা হ'ত, এই জন্যে অতিথির আর-একটি নাম ছিল "গোঘ্ন"। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনেক পুরাতন কথা সঙ্কলন ক'রে "Beef-eating in Ancient India" নামক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখনকার খাদ্যাখাদ্য বিচার, স্পর্শদোষে খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হবার ব্যবস্থা, এসব বেদে শ্রুতিতে কোথাও দেখা যায় না। এমন কি ভবভূতির সময়ও গোমাংস ভক্ষণ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে মহর্ষি বশিষ্ঠ অতিথি হ'লে 'জেন আঅদেসু বসিঅঠমিসসেসু বচ্ছদরী বিসসিদা' বাছুর নিহত হ'ল এবং 'তেন পরাবড়িদেণ জেব্ব বরাইআ কল্লাণিআ মড়মড়াইদা'—তিনি এসেই সেই হতভাগ্য বাছুরের অস্থিমাংস মড়মড় শব্দে চর্ব্বণ ক'রে ফেল্‌লেন; কেননা 'সমাংসে মধুপর্ক ইতি আম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি'—মাংস সহিত মধুপর্ক দান করবে এই বেদবাক্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ক'রে গৃহস্থগণ অতিথিরূপে সমাগত বেদাধ্যায়ী বিপ্র বা রাজন্যের অভ্যর্থনার জন্য বাছুর ষাঁড় বা রামছাগল প্রদান ক'রে থাকেন—ধর্ম্মসূত্রকারগণ এই রীতিকে ধর্ম্ম ব'লে বিধান দিয়েছেন।—(ভবভূতির উত্তররামচরিত, ৪র্থ অঙ্ক)।

আমরা বলি হিন্দু হ'য়ে বেদের মত অগ্রাহ্য করে এমন [redacted] নেই। কিন্তু বেদবিরোধী বিধিব্যবস্থার চাপে ধর্ম্ম যে দেশ ছেড়ে পালাবার উপক্রম করেছেন তা আমরা বুঝেও বুঝ্‌তে পারি না। শ্রুতি ও স্মৃতি যেখানে পরস্পর বিসম্বাদী সেখানে বিরোধ মীমাংসায় স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে শ্রুতির কথাই গ্রাহ্য। কিন্তু আমাদের এমনি দশা হ'য়ে পড়েছে যে আমরা বরং সত্য ও শ্রুতি পরিত্যাগ করব তবুও স্মৃতির অদ্ভুত বিধান ও লোকাচারের কঙ্কালরাশি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। বিচার ও যুক্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি যদি অর্থহীন নির্ম্মম বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে সমাজ অমনি রক্ত-আঁখি হ'য়ে তার কড়া শাসনের জন্যে "একঘরের হুকুম বন্দোবস্ত" করতে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌বেন। বড় দুঃখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'ওই যে পশুবৎ হাড়ি ডোম প্রভৃতি বাঙ্গীর চারিদিকে ঘুরছে ওদের জন্যে,—ওই অধঃপতিত, দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্যে—তোমরা হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ কি করেছ? খালি বল্‌ছ ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি ক'রে ফেলেছ? এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা!'—কিন্তু বৈদিকযুগে এই ছুঁৎমার্গের অস্তিত্বই ছিল না; তখন ছিল শুধু বর্ণভেদ।

অনার্য্যেরা ছিল কৃষ্ণকায়, কিম্ভূতকিমাকার। তাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সুফলা সুফলা দেশে বাস করল গৌরবর্ণ আর্য্যেরা। অনার্যের সহিত সংমিশ্রণ যাতে না হয় তার জন্য আর্য্যেরা সাবধানতা অবলম্বন করেছিল—উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়া তাই তখন নিষিদ্ধ ছিল। আর্য্যেরা ছিল শ্রেষ্ঠ,—অনার্য্যেরা নিকৃষ্ট ব'লে বিবেচিত হ'ত। প্রাচীনকালে অন্য অনেক দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। পুরাতন বাইবেল অনুসারে ইহুদিরা ছিল ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জাতি; আর জেন্‌টাইলরা ছিল নিকৃষ্ট, অধম, অস্পৃশ্য—শিয়াল-কুকুরের সামিল। মিশরদেশের পুরাতন জাতির মধ্যেও এরূপ ভেদ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগে জাপানদেশের সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ অন্য সব জাতিকে হীন ব'লে ঘৃণা করত—শিল্পী বা ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসা লজ্জাকর ব'লে বিবেচনা করত। জাপানের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ ইচ্ছা ক'রে চেষ্টা ক'রে না'লে বুঝিয়ে, ব্যষ্টির বিকাশের প্রধান অন্তরায় এই জাতিভেদ প্রথাকে সমাজ থেকে রহিত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু যে দেশে যে রূপ আকারেই থাক্ না কেন, আমাদের দেশের মত এমন সর্ব্বনাশকারী জাতিভেদ পৃথিবীর কোথাও নেই, কখনও ছিল কি না সন্দেহ! আমাদের দেশে জাতিভেদের পাষাণ-স্তূপে নির্ম্মমতা এমন উগ্র হ'য়ে প্রকট হয়েছে যে তার নিশ্বাসে উৎকট ঘৃণার গরল অহরহ বাহির হচ্ছে; তার

চাপে পতিত জনসঙ্ঘ দলিত ও মথিত হ'য়ে নিতান্ত অসহায়ের মত একপাশে প'ড়ে রয়েছে।

সর্ব্বপ্রকার বিভেদ ভুলে গিয়ে আপামর সাধারণের কল্যাণকামনায় বুদ্ধ যখন নূতন সত্যের প্রচার আরম্ভ করলেন—সেই প্লাবনের যুগে ব্রাহ্মণাধিকার তিরোহিত হ'য়ে ভারতবর্ষে সব একাকার হ'য়ে গেল। সেই ভাববন্যা হতে যে যুগের উদ্ভব হ'ল ভারতবর্ষের সে এক শ্রেষ্ঠ যুগ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বিদ্যা ও বিজ্ঞান সর্ব্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হ'ল; মগধ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মহারাজ অশোকের সময় দেশবাসীকে এক নূতন জীবনের আস্বাদ প্রদান করলে। সে জীবনে জাতিভেদ একপ্রকার বিলুপ্ত হ'য়ে গেল; বিবাহাদির স্বচ্ছন্দ আদানপ্রদানে বিভিন্নজাতি মিলে মিশে এক হ'য়ে গেল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের আরও কতকগুলি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালীর মুখাবয়ব ও শরীরগঠন দেখে তাকে কোনমতে খাঁটি আর্য্যসন্তান ব'লে মেনে নিতে পারা যায় না। মণিপুর, কোচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজবংশ খাঁটি আর্য্যবংশ ব'লে পরিচিত হ'তে চান। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে কুলজী তৈরী ক'রে আপন আপন বংশের ধারাকে টেনে টেনে কেউ সূর্য্য কেউ চন্দ্র কেউ বা শুক্র কেউ বা শিব পর্য্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু মুখের উপর যে ছাপটা স্পষ্ট হ'য়ে আছে—তাতে তাঁদের চেহারায় মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ বেমালুম ধরা প'ড়ে যায়। তারপর শক ও হিন্দু মিলে যে রাজপুত ও জাঠ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশের উদ্ভব হয়েছে এ কথা ইতিহাসসম্মত।

বাংলাদেশে ১১০০।১২০০ বৎসর ধ'রে বৌদ্ধাধিকার ছিল। বিক্রমপুরে ও তার নিকট স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বৌদ্ধযুগের বাংলার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে নানাজাতির যখন অবাধসংমিশ্রণ হ'য়ে এসেছে, তখন জাত আর আছে কোথায়? খাঁটি আর্য্যরক্ত অনেক অনুসন্ধান করলেও মিলবে না। এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা "সমাজসংস্কার সমস্যায়" বলেছি, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ("সমাজসংস্কার সমস্যা" ২—৬ পৃঃ)। বৌদ্ধপ্লাবনে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুধর্ম্ম এমন আশ্চর্য্যভাবে নিঃশেষ ও লোপপ্রাপ্ত হয়েছিল যে আদিশূরের সময় বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ চেষ্টা ক'রেও একজনও পাওয়া যায়নি। তাই রাজা কান্যকুব্জ থেকে মাত্র পাঁচজন সুব্রাহ্মণ নিয়ে এসে বাংলায় বসবাস করিয়েছিলেন। এঁরা পাঁচজনে বঙ্গদেশী কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বাংলার নব্যব্রাহ্মণের খাঁটিত্ব কোথায়? আর-এক আশ্চর্য্য কথা এই যে মাত্র পাঁচজনের বংশ বরাবর সোজাসুজি চ'লে এসে নব্যবাংলায় এই ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হ'ল! নানা জাতির মেলামেশা অনেকদিন ধরেই হয়েছে—এই আমাদের প্রতিপাদ্য,—তাই এসব ঘটনার উল্লেখ করছি। রিস্‌লি প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদের মতে অনেক নূতন নূতন অনার্য্যজাতি হিন্দুসমাজের পার্শ্বে বসবাস করতে করতে ক্রমে হিন্দু হ'য়ে গেছে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আসামে আহোম নামে এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ ছিল। তাঁরা প্রথমে ছিলেন মঙ্গোলীয়; তাঁদের আদিবাসভূমি ছিল শ্যামদেশ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ ক'রে তাঁরা অবশেষে হিন্দু এবং ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচিত হলেন। সুতরাং দেখুন আমরা যে জাতি জাতি বলে চীৎকার ক'রে থাকি এবং কারও স্পর্শে কারও বা জলগ্রহণে জাত গেল ভেবে প্রমাদ গণি, তার মূলে প্রকৃত সত্যপদার্থ কিছু আছে অথবা তার ভিত্তি একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারের উপর—যা কোন কালেই যুক্তি বা বিচারসহ নহে?

তারপর আমাদের এই বাংলাদেশের কৌলিন্য প্রথার কথা ধরা যাক। বল্লালসেনের সময় এই প্রথার প্রচার হয়। "নবধা কুললক্ষণম্"—কুলীন হ'তে হ'লে আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি সৎগুণের অধিকারী হ'তে হয়। গুণের উপর কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা হ'লেও এই মর্য্যাদার অধিকারী হলেন একমাত্র ব্রাহ্মণেরা; যেন গুণরাশি ব্রাহ্মণেরই একচেটে, আর ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই একবারে নির্গুণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গুণ কি বাস্তবিকই বংশপরম্পরাগত হয় অথবা বিদ্যাশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির উপর গুণের বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে? কথাটা এতই সোজা যে স্কুলের ছোট ছেলেও অনায়াসে বুঝতে পারে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পুত্র

হ'লেই কি প্রতিভার অধিকারী হ'তে হবে? সেক্ষপীয়রের বা মিল্টনের বংশে তাঁদের মত প্রতিভা আর জন্মগ্রহণ করেছেন কি? পৃথিবীতে বরং ঠিক এর উল্টাই দেখা যায়। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য খেয়াল যে প্রতিভাশালী লোকের বংশে সেরূপ গুণান্বিত পুরুষ আর প্রায় জন্মায় না। আর প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে গুণী কুলীন, তাঁর সন্তান যে মাতৃগর্ভ থেকে নয়টি গুণ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে এমন সম্ভাবনা একটুও নেই। কুলীনের ছেলে নামে "কুলীন" হ'তে পারে, কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে বাঁটা-গাছ উর্ব্বরক্ষেত্রেও জন্মায়। সুতরাং অপরকে হীন ও অবনত ক'রে রেখে আর এরকম একটা অন্যায় গণ্ডী টেনে আপনার জাত বাঁচিয়ে চল্‌বার মূলে কি যে সৎ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে তা দেবতা হয়ত বা বুঝ্‌লেও বুঝ্‌তে পারেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধির তা অগম্য। আবার শুনুন আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঘটকপ্রবর দেবীবর বামুনদের মধ্যে মেল বাঁধলেন—বংশের দোষ দেখে দেখে একেরকম দোষ একত্র ক'রে ক'রে; ফলে একই জাতি থেকে আবার বহু গ্র-পরা-উপজাতির সৃষ্টি হ'ল। সমাজবিধি হ'ল এই যে মেলে মেলে বিবাহ দিতে হবে, মেলান্তরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন কর্‌লে একবারে কৌলিন্য-বিচ্যুতি;—অর্থাৎ মেলগত দোষকে বংশে কায়েমি ক'রে না তুল্‌লে সমাজে হীন হ'তে হবে। "অঘরে" মেয়ে দিলে কুল যাবে। সুতরাং কন্যাকে "সঘরে" অর্থাৎ নিজের গণ্ডীবদ্ধ মেলের ভিতর পাত্রস্থ করাটাই কুলীন পিতার বাঞ্ছিত হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ফল হ'ল বড় বিষময়। পাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় 'কুলীনের কুলরক্ষা করাই কুলীনের ধর্ম্ম' হ'য়ে উঠ্‌ল। আর ব্রাহ্মণের ছেলে কদাপি ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ নন! তাই পূর্ণ উদ্যমে কেউ ৬০, কেউ ৭০, কেউবা ৮০টি পর্য্যন্ত বিবাহ ক'রে বস্‌লেন এবং পাকা খাতায় বিবাহের লিষ্টি ক'রে রেখে দিলেন। এসব "নিশার স্বপন সম ভাবিছ অলীক?" কিন্তু তা নয়, অনেক ভুক্তভোগী বৃদ্ধ এখনও বেঁচে আছেন। এসকল কথা বল্‌বার একমাত্র কারণ এই যে, গুণ কখন বংশগত হয় না এবং অন্যায় অবিচারের গণ্ডী টেনে যারা আপনার দেশবাসীকে নির্ম্মম-ভাবে পরস্পর থেকে তফাৎ ক'রে দেয় তাদের জীবন সকলদিকেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে, উচ্চ আদর্শ বা সৎ-সঙ্কল্পের কথা তারা প্রায় ভুলে যায়।

অপরকে হীন অন্ত্যজ নীচ ছোটলোক ব'লে ঘৃণা করবার অধিকার আমাদের কোথায়? আভিজাত্যহীন তথাকথিত নীচজাতির গৃহে কি পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেননি? পৃথিবীতে যাঁরা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্ম-জগতে যাঁরা একটা মহাপ্লাবন বহিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসব মহাত্মাদের অনেকেই আভিজাত্যমণ্ডিত ছিলেন না। যীশু ছুতোরের ছেলে! ভক্তবীর কবীরের জন্ম নীচ জোলার ঘরে। ভক্তমালে রুহিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুর বর্ণনা আছে যাঁরা হীন বংশে জন্মলাভ করেছেন। মান্দ্রাজে হীনবংশোদ্ভব অনেক তামিল সাধু ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক পীর ছিলেন যাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে মন্দির ও দরগা নির্ম্মিত হয়েছে এবং উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণগণ যাঁদের দেবজ্ঞানে পূজা করেছেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নি। বসিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস প্রভৃতি, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ উচ্চ-বংশোদ্ভূত নন্—কেউ বা দাসীপুত্র, কেউ বা বেশ্যাপুত্র। সকল দেশেই এরূপ হয়েছে, মহাপুরুষগণ সকল দেশেই সমাজের সকল-রকম স্তরে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং কেন এই কপটাচার; কেন এই ঘৃণা ও নির্ম্মমত? কেন মানুষের মুখদর্শনে পাপ, তার ছায়াস্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা?

অত্যাচারী রাজা প্রথম চার্ল্‌সের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। এই অন্তর্বিপ্লবের ইতিহাস (Buckle's History of Civilization) পাঠ কর্‌লে তৎকালীন ইংলণ্ডীয় সমাজের নীচ ও উচ্চজাতি সম্বন্ধে একটা বড়কথা জানা যায়। কথাটা এই যে যতদিন প্রজাশক্তিকে চালিত কর্‌বার জন্যে উচ্চবংশজাত ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়েছিল ততদিন প্রজাপক্ষ জয় লাভ করেনি। তারপর যখন জনসাধারণের মধ্য থেকে যুদ্ধনেতার আবির্ভাব হ'ল, তখন রাজার দল পরাজিত হল, জনসাধারণের চেষ্টা জয়শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌ল। নেপোলিয়ন তাঁর ভগ্নী কারোলিনাকে মুরা নামক যোদ্ধার হাতে সম্প্রদান করেন; তিনি সরাইওয়ালার (Inn-keeper)

পুত্র ছিলেন। নেপোলিয়নের নিকট পুরুষকার আভিজাত্যের একমাত্র নিদর্শন ছিল। তিনি কি সৈনিক বিভাগে, কি শাসন বিভাগে যোগ্যতা ও গুণ অনুসন্ধান ক'রে সমাজের যে-কোন স্তর হতে লোকদের উন্নীত করতেন।

নেপোলিয়নের কার্য্যনীতির একটা বিশেষ অঙ্গ এই ছিল যে তিনি বরাবর গুণেরই আদর করতেন; যথার্থগুণী; তা সে সমাজের যে স্তর থেকেই আসুক না কেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সামরিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হ'ত। কর্ম্মতৎপরতার ফলস্বরূপ লোকের পদোন্নতি লাভ হ'ত। তার কোন্ কুলে জন্ম সে পরিচয় কেউ নিত না। ক্রম্‌ওয়েল মদ প্রস্তুত করতেন। তিনি যে-সকল সেনানায়ক নিযুক্ত করতেন তার মধ্যে অনেকেই "নীচ"-বংশোদ্ভূত। কেউ বা মুদি, কেউ বা ফেরিওয়ালা, কেউবা পরিচারক, কেউ বা ভিক্ষান্নপালিত, কেউ বা চামার, কেউ বা মুচি, কেউ বা "জুতি সেলাই"! বাক্‌ল্ বল্‌ছেন "the highest prizes being open to all men, provided they displayed the requisite capacity." এই "জুতি সেলাই" বল্‌তে আর-একটি কথা মনে পড়্‌ল। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অগ্রণী বিখ্যাত উইলিয়ম কেরীও এই ব্যবসায়ী ছিলেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপাদ্য এই যে জাতিভেদরূপ বিষময় প্রথার এই ফল দাঁড়িয়েছে যে আমাদের দেশে যারা হীন শ্রেণীর তারা এমন পদদলিত, অবমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, যে কোন সুযোগে তাদের প্রতিভা বিকশিত হবার ও ভদ্রশ্রেণীস্থ হবার উপায় নেই।

সুতরাং বর্ত্তমান য়ুরোপ বা আমেরিকায় জাতিভেদ আছে, অতএব আমাদের দেশেও জাতিভেদ কোন ক্ষতির কারণ হ'তে পারে না—এই ব'লে চীৎকার ক'রে যাঁরা পুরাতনের কঙ্কাল এখনও আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখ্‌তে চান, তাঁরা একবার যুক্তিসহকারে বিবেচনা ক'রে বুঝে দেখ্‌বেন যে পাশ্চাত্য দেশে আভিজাত্যের সম্মান এদেশের মত একটা নিছক পাগলামি নয়। তাঁতি, জোলা, গাড়োয়ানের ঘর থেকে এদেশে কজন বড়লোক হবার সুযোগ পেয়েছে? এদেশে যদি তেলির ঘরে জন্ম হ'ল ত মানুষ চিরকাল তেলিই র'য়ে গেল,—সে যতগুণের গুণী হোক না কেন সমাজে খানিকটা হেঁট হ'য়ে থাক্‌তেই হবে, গুণ থাক্‌লেও সমুচিত আদর সে কখন পাবে না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আজ লর্ড হয়েছেন বিলাতী আভিজাত্যের নিয়মে, কিন্তু আমাদের দেশে যিনি কুলীন বামুন হ'য়ে না জন্মেছেন তিনি আর তা হ'তে পার্‌বেন না। লর্ড রবার্ট্‌স্ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন সামান্য সৈনিক; কিন্তু সামরিক বিভাগে অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়ে শেষে সমাজে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য লাভ করেছিলেন। লর্ড কিচনারও তাই। এরূপ আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিদ্যাবিজ্ঞানে, ব্যবসাবাণিজ্যে, কৃষিশিল্পে—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে গুণের পরিচয় দিয়ে, অসাধারণত্ব দেখিয়ে, সামান্য থেকে বড় হ'য়ে উঠেছেন এবং পাশ্চাত্য সমাজ তাঁদের বড় ব'লে, শ্রেষ্ঠ ব'লে, গুণান্বিত ব'লে আদর ক'রে বরণ ক'রে নিয়েছে। ইংলণ্ডে চাষার ছেলে, মুদীর ছেলে, অক্‌স্‌ফর্ড বা কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন ক'রে অভিজাত শ্রেণীর সকলপ্রকার রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপ লেখাপড়া শিখে গুণী হ'য়ে সে পুরাদস্তর Gentleman হয়। আমেরিকায় প্রজাশক্তির চূড়ান্ত উন্মেষ হয়েছে; তাই সেখানে দেখা যায় সামান্য কুটীরে জন্মগ্রহণ ক'রে সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তর থেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্তরে উঠেছিলেন রাষ্ট্রনায়ক মহামতি গার্‌ফিল্ড। সে দেশে আজ যে মুটে মজুর খান্‌সামার কাজ করছে, কাল সে বিদ্যার্জ্জনের জন্যে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। কেউবা যে কলেজে চিম্‌নী পরিষ্কারকের কাজ করে সেই কলেজেই আবার পড়্‌ছে। তার সহপাঠী ক্রোড়পতির সন্তান যদি তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে তবে সেই ধনী-সন্তানকে নানাপ্রকার লজ্জা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। সেখানে আজ যে কাঠ কাটে আর-একদিন সে দেশের রাষ্ট্রনায়ক (President) হবার আশা রাখ্‌তে পারে। সুতরাং এমন বড় কুলীন সেখানে কে আছে যে তাঁকে কন্যাদান করবে না? আমি এখানে পাশ্চাত্য সমাজনীতির বিচার করছি না, আমার প্রতিপাদ্য এই যে পাশ্চাত্যদেশের জাতিভেদ ও ভারতবর্ষের জাতিভেদের মধ্যে তফাৎ অনেক। আমাদের দেশে জাতিভেদপ্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে মানুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার

করেনি; আপন ভাইকে পর ক'রে দিয়েছে; তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে; সে তুচ্ছ ঘৃণ্য, [illegible] অযোগ্য ও জঘন্য, এই কথাই প্রচার ক'রে এসেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের জাতিভেদ মানুষে মানুষে ব্যবধানের এমন অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর তুলে দেয়নি, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের পথে এমন অন্তরায় হয়নি।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মিলে মোট ২৩ লক্ষ মাত্র। সমস্ত লোকসংখ্যার তুলনায় এঁরা কজন? সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু লেখাপড়া, জ্ঞানের অনুশীলন এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানাবিষয়ের আলোচনা এঁদের মধ্যেই অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সকল জাতি প্রায় এসব বিষয়ে এঁদের বহু পশ্চাতে প'ড়ে আছেন। এক্ষণে আপন শিক্ষা দীক্ষা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানান্বেষণের ধারাকে দিন দিন পুষ্ট ও প্রবল ক'রে তুলে যদি সমগ্র জাতিকে বেঁচে থাকতে হয় তবে প্রকৃত কর্ম্মীর আবির্ভাব ২৩ লক্ষ উচু জাতের মধ্য হ'তে অধিক সংখ্যক হবে অথবা যাদের আমরা নীচজাত আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছি সেই চার কোটিরও অধিক জনসঙ্ঘ অধিক সংখ্যক কাজের লোক উৎপন্ন ক'রে সমাজকে পুষ্ট করবে? সকল দেশে সমাজের সর্ব্বপ্রকার স্তর হতে প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে আজ একবার আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে এই বিরাট জনসঙ্ঘকে নিকৃষ্ট ব'লে অবজ্ঞা ক'রে আমরা কত উৎকৃষ্ট জিনিসের অপচয় করছি, সামাজিক অত্যাচারে ও শিক্ষাদীক্ষার অভাবে আমাদের কতটা শক্তি বিকাশলাভ না ক'রে লোকচক্ষুর আড়ালে মুষড়ে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা মনে হচ্ছে। বাঙালীর আজ সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ কতকটা উন্মুক্ত হয়েছে; ক্রমে আরও উন্মুক্ত হবে। বাঙালী সেনা নিয়ে যে সৈন্যদল গঠিত হবে তাতে কি শুধু উচ্চজাতিরই লোক থাকবে অথবা সমাজের সকল স্তর থেকে সুস্থ ও সবলদেহ লোক সংগ্রহ ক'রে সেই সৈন্যদলকে পরিপুষ্ট করতে হবে? বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা অর্দ্ধেক; তাদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, সুতরাং তাদের কথা এখন বাদ দিলাম কিন্তু বিভিন্নজাতির হিন্দুসেনা যখন কোন অভিযানে বাহির হবে তখন বামুন রাঁধুনীর অভাব হ'লে কি তারা যে-যা হাঁড়ি মাথায় ক'রে কুচকাওয়াজ করবে? আজকাল ট্রেঞ্চে অর্থাৎ খাদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে যুদ্ধ করতে হয়; সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেই শত্রুর গুলিতে বিদ্ধ হ'তে হবে। সুতরাং শাণ্ডিল্য, বাৎস্যায়ন বা ভরদ্বাজ—এঁদের মধ্যে যার বংশধর ট্রেঞ্চে খাবার জুগিয়ে দিয়ে গেল তার আবিষ্কার কর্ত্তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলে সে খাবার কখনও মুখে তুলতে হবে না আজ এই বিজ্ঞানপ্লাবনের যুগে সকল দেশে সকল সমাজের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হ'লে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যস্থাপন ক'রে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। এই সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টায় যে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিতে হবে তার মধ্যে জাতিভেদের কঠোর নির্ম্মমতা প্রথম এবং প্রধান।

জাতিভেদের বজ্রকঠোর বন্ধন বাংলা দেশে তবু ত অনেকটা শিথিল হয়েছে। বাংলায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যের পরই নবশাখজাতি সমাজে স্থান পেয়েছেন এবং তাঁদের জল "চল" হয়েছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও শিক্ষাদীক্ষার গুণে অন্য অন্য অনেক জাতি বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলে দাঁড়াচ্ছেন এবং এক "অচলায়তনে"র নিতান্ত গোঁড়া বামুন ছাড়া আর কেউই তাঁদের ঘৃণা ক'রে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না। কিন্তু মাদ্রাজে জাতিভেদের শাসন এখনও বড় ভয়ানক। সেখানে আয়ার ও আয়েঙ্গার-গণ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই নীচ ও অস্পৃশ্য। নবশাখ প্রভৃতি যেসব জাতি বাঙালী হিন্দুসমাজে একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার ক'রে আছেন মাদ্রাজী হিন্দু-সমাজে সেরূপ কিছু নেই। মাদ্রাজে পেরিয়া নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাদের অবস্থা বড়ই হীন। তারা বংশের পর বংশ ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাথা হেঁট ক'রেই থাকে, তাদের ছায়া স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এতই তারা অভিশপ্ত ও অপবিত্র! স্বর্গগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তামিল দেশ ভ্রমণকালে এক সম্প্রদায় লোক দেখেছিলেন; তারা দূর থেকে চীৎকার করতে করতে আসে—"মহাশয় স'রে যান্ আমি অধম যাচ্ছি।" পাছে

তার ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা নষ্ট হয়—তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোন হতভাগ্যের গলায় ঘণ্টা বাঁধা আছে, চল্‌তে গেলেই ঘণ্টা বাজে আর সেই শব্দ শুনে শুচি ব্রাহ্মণ অশুচিতার আগমন-বার্ত্তা জান্‌তে পেরে ছুটে পালান। আবার এইসকল নীচজাতের নাম শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। সেখানে বামুনদের নাম রামস্বামী, কুমারস্বামী; কিন্তু এইসব অন্ত্যজবংশীয়দের নাম হবে সাপ, ব্যাঙ, পিঁপ্‌ড়ে, কেঁচো, ছুঁচো! কি ভয়ানক ব্যাপার! বাংলার হাড়ি ডোম চণ্ডাল মুদ্দাফরাস ওদের চেয়ে ঢের ভালো আছে—তাদের আরো ভালো আরো বড় ক'রে তুল্‌তে হবে—গুণবান শীলবান হলে তাঁরাও ব্রাহ্মণের সম্মান পাবার অধিকারী এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

আমরা যে কারণে ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক অধিকারের দাবী কর্‌ছি, নীচজাতি ব'লে যাদের ঘৃণা করি তারাও ঠিক সেই কারণেই সামাজিক অধিকার দাবী কর্‌ছে। বাংলা দেশে জাতিভেদের কঠোরতা কম; তবুও এখানে নমঃশূদ্র ও পোদ প্রভৃতি জাতি লেখাপড়া শিখে সামাজিক অত্যাচারের কারণে উঁচুজাতের উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌ছেন। মান্দ্রাজের ডাক্তার নায়ার অব্রাহ্মণ সমাজের মুখপাত্র স্বরূপে একটি দল বেঁধে গেছেন। সেই দল এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কতকটা এক হ'য়ে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পথে বাধা দিচ্ছেন। বাংলা দেশে নমঃশূদ্রদের মধ্যেও এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এঁরা বল্‌ছেন—নূতন শাসন সংস্কারে অব্রাহ্মণদের স্বত্ব-রক্ষার জন্য যদি গোড়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়—তবে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে নূতন সুখ-সুবিধার সব অধিকারই ক্রমে ব্রাহ্মণগণ একচেটে ক'রে নেবে। তা ছাড়া আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা লোকসংখ্যা হিসাবে অর্দ্ধেক ব'লে communal representation সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি বাগিয়ে নিচ্ছেন। এইসকল মতামতের ভালমন্দ, আলোচনা কর্‌বার জন্য আমি একটা কথাও বল্‌ছি না। আমি বল্‌তে চাই এই যে এদিকেও আমাদের সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। যে অধিকারটুকু ইংরেজ আমাদের দিতে চায় আমাদেরই দেশবাসী আজ তাতে আপত্তি তুল্‌ছে;—কেন না আমরা অনেক কাল ধ'রে তাদের ঘৃণা করেছি এবং এখনও কর্‌ছি; তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।

জাতির গঠন ও বিকাশে এই জাতিভেদ অ[illegible] পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নেই; তার উপর ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা এই রব কর্‌তে কর্‌তে সকলেই এক-একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। হিন্দুমুসলমান ত বরাবরই আলাদা হ'য়ে আছে। এ অবস্থায় কবি ভাবের আবেগে ব'লে থাক্‌তে পারেন "একবার তোরা জাতিভেদ ভুলে" ইত্যাদি। কিন্তু এতদিনের বন্ধন এককথায় খ'সে পড়্‌বে কি? আমার লিখিত "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" (History of Hindu Chemistry) নামক পুস্তকের "বিজ্ঞান ও শিল্পের অবনতি" (Decline of Science) শীর্ষক অধ্যায়ে আমি জাতি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছি। চরক ও সুশ্রুত দেশীয়চিকিৎসা-প্রণালীর দুখানি মহাগ্রন্থ। এতে অবস্থা-বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন শবস্পর্শ হ'লে জাতিচ্যুত হ'তে হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হ'য়ে গেল শবব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউব্যবচ্ছেদ হবে; অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্যশরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জান্‌তে হবে। ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে কর্‌বার মত নয় কি? জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে এমনি ক'রে যখন স্বাধীনচিন্তার গলা টিপে মারা হ'ল, তখন ৬৪ কলাবিদ্যা লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। বিজ্ঞানের যা কিছু রইল—তা Surgeon পরামাণিক, Botanist বেদে আর Metallurgist ভীল কোল সাঁওতালের হাতে। আঙুলের নৈপুণ্যে ঢাকাই মস্‌লিন্ অতি সূক্ষ্ম হ'ল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের দৌড় ওই "পাত্রাধার তৈল" বা "তৈলাধার পাত্রের" বেশী আর গেল না। বুদ্ধি জড় ও আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব বিচার ক'রে ঘটনাপরম্পরার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা লুপ্ত হ'ল। সামাজিক অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোক অস্পৃশ্য ও মূর্খ

হ'য়ে পণ্ডত্বে নেমে গেল। ওদিকে আর্করাইট (Arkwright) নাপিত ছিলেন, ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতেন —কিন্তু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে আবিষ্কার ক'রে বস্ত্রবয়ন-কলে যুগান্তর উপস্থিত করেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে কোন্ নাপিত এ প্রকার বৃত্তিত্ব দেখতে সক্ষম? তাই এদের মধ্য থেকে জেমস্‌ওয়াট বা আর্করাইটের উদ্ভব অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মশক্তি লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তার জন্যে জাতিভেদ বড় কম দায়ী নয়।

প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন তাঁর New Freedom নামক পুস্তকের একস্থানে আমেরিকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলছেন যে যেদেশের রাস্তার মুটে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনায়ক হবার আশা পোষণ করতে পারে, কে দেশের নেতা হবে এবং কোন্ কুলে তার জন্ম হবে যুক্তরাজ্যে একথা কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে না। সুবিধা ও সুযোগ জনসাধারণের সকলের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত; সুতরাং সমাজের যে-কোন স্তর থেকে সেখানে দেশনায়কের উদ্ভব হ'তে পারে। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন আরও বলেন যে সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি পুষ্ট হয় নিম্নস্তরের লোকের দ্বারা। জনসাধারণের মধ্য হতেই যথার্থশিক্ষিত ও গুণসম্পন্ন লোক উদ্ভূত হ'য়ে দেশের ভাব ও কর্ম্মের ধারাকে নানা অবদানপরম্পরায় বিচিত্র ক'রে তোলে। এই ধারাকে অঙ্কুর রাখবার জন্যে সমাজের উচ্চ-স্তরের মুষ্টিমেয় লোকের সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সমাজদেহের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক—সকলপ্রকার পুষ্টির উপাদান জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, উচ্চস্তরের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেরূপ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং "জাতির" দোহাই দিয়ে সেই-বিপুল জনসঙ্ঘকে পদদলিত ক'রে আমরা জাতিগঠনে যে কত বাধার সৃষ্টি করেছি তা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনারই অধিগম্য। বর্ত্তমানে আমাদের শাসনসংস্কারের দাবীকে ইংরেজ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চীৎকার ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ যখন একবার এই দাবী করবে তখন কেউ তাকে আটকাতে পারে কি? পৃথিবী জুড়ে জনসাধারণের যুগ এসেছে। আমাদেরও এই যুগকে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরণ ক'রে নিতে হবে। আপনার দেশভাইকে অস্পৃশ্য ব'লে আর দূরে রাখলে চলবে না।

এখন আমরা সভ্যজগতে সকল জাতির সঙ্গে এক আসরে বসতে চাই; পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) স্থান পেতে চাই। কিন্তু অন্যে আমাদের কি চক্ষে দেখে আজ তা তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে আরম্ভ মাত্র—কোকিলের প্রথম গান বসন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে মাত্র। দারিদ্র্য ও সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি নানাদোষের জন্য আজও আমরা অন্য জাতির অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছি। আমাদের অন্তর সমৃদ্ধ হ'য়ে অদূর ভবিষ্যতে নানাকার্য্যে বৈচিত্র্যে বিকাশলাভ করবে না কি? দেশীয় রাজের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ স্যর টি মাধব রাও হিন্দু-সমাজের বৈষম্যকে লক্ষ্য ক'রে বড় দুঃখে বলেছেন—এই-সব বৈষম্য ও তজ্জনিত ক্লেশ আমরা আপন হাতে সৃষ্টি ক'রে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। সুতরাং সত্যভাব চেষ্টা করলে এর প্রতিবিধানও আমাদের আপনারই হাতে।—আমাদের যুক্তি নেই, বিচার নেই, কুফলপ্রসূ অতি তুচ্ছ লোকাচারকে আমরা মনু রঘুনন্দন প্রভৃতির দোহাই দিয়ে সাগ্রহে আঁকড়ে থাকি। "কেন" ব'লে কেউ যদি প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই—"কি আশ্চর্য্য! ওযে চিরকাল হ'য়ে আসছে গো!" আমরা বিলাতী বিস্কুট খাবো, বরফ দিয়ে সোডা লেমনেড্ খাবো, কিন্তু জাতিবিশেষের কেউ যদি হাতে ক'রে একগ্লাস জল দেয় অথবা আমাদের চৌকাট মাড়ায় তাহলে অমনি চীৎকার—"জাত গেল, হাঁড়ি ফেল, স্নান কর!" অদ্ভুত ব্যাপার! তারই ফলে আমরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র মিলে সকল জাতিটাই বিদেশের অগ্রগণ্য জাতিদের কাছে হেয় অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় হয়ে আছি। যতকাল নিজেদের স্বভাব শোধন না করব, ততকাল এমনি থাকতে হবে। সুতরাং সাধু-সাবধান!

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বক্তৃতা হইতে বাঙ্গালীনিবাসী শ্রীমান্ রতনমণি চট্টোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রাচীন ভারতে পার্লামেণ্ট

রাজ্যব্যবস্থা।

বৈদিক যুগের পর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হইতে বৃহদ্রথদের সময় পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭০০) ভারতের রাজ্যগুলি এক এক ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাসভূমির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, ভরত পঞ্চাল বিদেহ প্রভৃতি জাতি যে দেশে বাস করিত সেইটুকুই মাত্র তাদের জাতির রাজার অধীনে শাসিত হইত। পতঞ্জলি যে জাতিকে ঐক্ষ্বাক আখ্যা দিয়াছিলেন, তারাও এইরকম নিজের দেশে নিজের রাজার অধীন ছিল। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাই রাজাদের নিজের জাতির বাসস্থানের বাহিরের পরদেশকেও অধীন করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে পরবর্ত্তী কালের রাজ্য আর সমজাতীয় লোকের বাসভূমি মাত্র রহিল না, তাহা বহুজাতির অধ্যুষিত দেশ হইয়া উঠিল; তার সীমা আর জাতির বাসের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রহিল না, ভৌগোলিক হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রাচীন ঐক্ষ্বাক জনপদ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া হইল কাশী-কোশল রাজ্য এবং মগধ রাজ্যের মধ্যে মগধ ও অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এই রাজ্যসম্প্রসারণ ৫৫০ হইতে ৩০০ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খুব দ্রুত চলিয়াছিল। কারণ এই সময় ভাব-রাজ্য স্থানীয় না থাকিয়া সার্ব্বভৌম হইবার চেষ্টা করিতেছিল—বুদ্ধদেব গণতন্ত্রের লোক হইয়াও সকল দেশে তাঁর ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন; দেখাদেখি বিষয়-রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্থানীয় রাজাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা দিলেন যে রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে হইবে। জাতক-সকলে 'সকল-জম্বুদ্বীপে একরজ্জম্' স্থাপনের আদর্শ প্রচারিত হইতে লাগিল।

এইরূপ বিস্তৃত রাজ্যের সময় লোকের চেয়ে স্থানের প্রাধান্য দেখা যাইতে লাগিল। আগে এক এক জাতিকে বলিত বিশ বা জন, এবং সেই জন যে দেশ অধিকার করিয়া বাস করিত তাকে বলিত জনপদ; তার পর জনপদ বলিতে জনপদবাসী জনদিগকেও বুঝাইতে আরম্ভ করে; তার পর জনপদ কোনো বিশেষ জাতি বা জনের বাসভূমি না বুঝাইয়া দেশ মাত্রকেই বুঝাইতে লাগিল।

সমিতি।

যখন রাজ্য জাতিমাত্রের বাসভূমি ছিল তখন জাতির রাজা জাতির শাসন রক্ষণ ও আচরণ পর্য্যালোচন করিতেন জাতির নির্ব্বাচিত কতকগুলি প্রধান লোকের পরামর্শ অনুসারে। এই পরামর্শ-সভাকে সমিতি বলিত। জাতিগত রাজ্য বিস্তৃত হইয়া যখন দেশগত হইয়া উঠিল তখন সমিতি নাম লোপ পাইয়া হইল জানপদ। জাতক, ধর্ম্মসূত্র, মহাভারত যখন রচিত হয়, তখন সমিতির স্মৃতি একরকম লোপ পাইয়া গেছে।

জানপদ।

৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব হইতে ৬০০ খ্রীষ্টপর পর্য্যন্ত রাজ্যকে দুই প্রধান অংশে ভাগ করিয়া জানা হইত—রাজধানী ও রাষ্ট্র বা দেশ। রাজধানী নানা নামে পরিচিত হইত—পুর (পুরং মুখ্যস্থানম্—বীর-মিত্রোদয়), নগর (নগরং রাজধানী—অর্থশাস্ত্র; রামায়ণেও রাজধানী অর্থে নগর আছে), দুর্গ (বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি—রামায়ণ; অর্থশাস্ত্রেও রাজধানী অর্থে দুর্গ আছে), নিগম (জাতক ও অন্যান্য পালি গ্রন্থে নগর অর্থে)। এবং রাষ্ট্র বা দেশকে বলিত জনপদ।

পালিগ্রন্থে ও রামায়ণ-মহাভারতে জনপদ হইতে নিষ্পন্ন জানপদ শব্দে রাজধানী ব্যতীত সমস্ত রাষ্ট্রের নির্ব্বাচিত সচিব-সভা বুঝাইতে আরম্ভ করে। রামায়ণে দেখিতে পাই রাজা দশরথকে খবর দেওয়া হইতেছে—

> উপতিষ্ঠতি রামস্ত সমগ্রমভিষেচনম্।
> পৌরজানপদশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥২-১৪-৫৪।

পৌর জানপদ ও নৈগম কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের অভিষেকের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

পুর বা রাজধানীর প্রতিনিধি পৌর, জনপদের প্রতিনিধি জানপদ, এবং নগরের বৈশ্য বা বণিক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নৈগম।

খাড়বেল-শিলালিপি (১৬৫ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) হইতে এই জানপদ শব্দের পারিভাষিক অর্থ আরো সুস্পষ্ট হইয়াছে।

এই জানপদ যে-সমস্ত বিধি নিয়ম প্রস্তুত করিতেন তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইত। তাঁদের ইচ্ছা রাজাকেও মান্য ও পালন করিতে হইত। পৌর জানপদ নৈগম

সমেত্য তে মন্ত্রয়িত্বা সমতাংগতবুদ্ধয়ঃ।
উচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
স রামং যুবরাজানম্ অভিষিঞ্চস্ব পার্থিব।
ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্।

তাঁরা সকলে সমবেত হইয়া বিচার ও মন্ত্রণা করিয়া একমত হইয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথকে বলিলেন—আমরা রামচন্দ্রকে যুবরাজ রূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি তাঁকে অভিষেক করুন।

এই দাবী ও আদেশে ক্ষুণ্ণ হইয়া রাজা দশরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কথং নু ময়ি ধর্ম্মেণ পৃথিবীম্ অনুপালতি
ভবন্তো দ্রষ্টুম্ ইচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্?—অযোধ্যাকাণ্ড।

আমি ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য পালন করা সত্ত্বেও আপনারা কেন যুবরাজ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন?

ইহার দ্বারা পৌর জানপদ নৈগম প্রতিনিধিদের ইচ্ছার শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে জাতি জানপদ শ্রেণী ও কুল প্রত্যেকের বিভিন্ন ধর্ম্ম বা নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে।—

জাতি-জানপদান্-ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্ চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্ চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥

মহাভারতে শ্রেণীবদ্ধ রাজাদের উল্লেখ আছে—'রাজানঃ শ্রেণীবদ্ধাশ্চ তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি।' অর্থশাস্ত্রে শ্রেণী মানে যোদ্ধসমিতি। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় জানপদ গণ শ্রেণী জাতি প্রত্যেকে স্ব স্ব নিয়ম পালন করিবে ব্যবস্থা আছে—

ব্যবহারান্ স্বয়ং পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽহরহম্।
কুলানি জাতী শ্রেণীশ্চ গণাজানপদানপি॥ ১ম অধ্যায়।

রাজা প্রত্যহ সভ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া উঁহাদের কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য যে কুল শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তার উল্লেখ অর্থশাস্ত্রেও আছে। কৌটিল্য দেশসঙ্ঘ জাতিসঙ্ঘ ও কুলসঙ্ঘ দ্বারা রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে রাজ্যে একটি কুল বা পরিবার প্রধান হইয়া শাসন ও শক্তি পরিচালন করে সেখানকার প্রণালীকে কুলসঙ্ঘ বলে। মনু গ্রামসঙ্ঘ বা গ্রামসমূহ দ্বারা রাজ্যব্যবস্থার উল্লেখও করিয়াছেন। বৃহস্পতি গ্রাম ও দেশ শব্দ গ্রামসঙ্ঘ ও দেশসঙ্ঘ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; গ্রাম ও দেশ রাষ্ট্রের নিয়মের অবিরোধী নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিত।

দশকুমারচরিতে (তৃতীয় অধ্যায়) জানপদের মুখ্য বা নায়ক (প্রেসিডেণ্ট) জানপদ-মহত্তম নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁকে রাষ্ট্রমুখ্য বলাও হইয়াছে। রামায়ণে আছে—গ্রামঘোষ-মহত্তরাঃ। রামায়ণের টীকায় ঐ কথার ব্যাখ্যা আছে—গ্রামে ঘোষে চ বর্ত্তমানা মহত্তরাঃ—মহত্তরাঃ প্রধানভূতাঃ (গোবিন্দরাজ)। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের মতে ঘোষ মানে স্ব-তন্ত্র নগর, যে নগর নিজের আভ্যন্তরীণ কার্য্য পরকর্ত্তৃত্বনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে করিতে পারে,—বর্ত্তমান কালের মিউনিসিপালিটির সমশ্রেণীয় প্রতিষ্ঠান

মিত্রমিশ্র কৃত যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় পৌর ও রাষ্ট্র ব্যবহারের বিবরণ আছে। বীরমিত্রোদয়-ব্যবহারে পৌর স্থলে পুর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাতে রাষ্ট্র ও জানপদ সমার্থক।

পৌর।

পুর বা নগর শব্দে আগে রাজ্যের সকল শহরকেই বুঝাইত না, কেবলমাত্র রাজধানী বুঝাইত। (পুরং মুখ্য-নগরম্।—বীরমিত্রোদয়। মন্দোৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি।—শকুন্তলা ২য় অঙ্ক। নগরং রাজধানী।—অর্থশাস্ত্র।) সাধারণ নগরকে আগে গ্রাম বলিত (বীরমিত্রোদয়; অর্থশাস্ত্র; পাণিনি; পতঞ্জলি; কাশিকা)। শাকল পূর্ব্ব মদ্র দেশের রাজধানী ছিল; পুষ্যমিত্রের সময় রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে তাহা আর নগর রহিল না, গ্রাম হইয়া গেল—শাকলং নাম বাহীক গ্রামঃ (পতঞ্জলি)। রাজধানী বুঝাইতে দুর্গ শব্দও ব্যবহৃত হইত—রাজ্যকে দুর্গ ও জনপদ অথবা দুর্গ ও রাষ্ট্র এই দুই ভাগ করা হইত।—সংরক্ষেৎ সময়ং রাজা দুর্গে জনপদে তথা।—বারদ। ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরম্।—মনু, ৭।২৯।

খাড়বেল-লিপিতে পৌর শব্দ আছে। মিত্রমিশ্র পৌর শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মিলিতো জনসঙ্ঘঃ। দিব্যাবদানে একটি উপাখ্যানে পৌর-শক্তির পরিচয় পাওয়া

যায়।—অশোকের পুত্র কুনালের প্রতি তার বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা অসন্তুষ্ট হন; রাজা অশোকের আদেশে কুনাল তক্ষশিলার পৌর সভায় উপস্থিত হন; তিষ্যরক্ষিতা রাজা অশোকের জাল আদেশপত্র পাঠাইয়া ঐ তক্ষশিলা-পৌর কর্ত্তৃক কুনালকে অন্ধ করিয়া দেন।

বীরমিত্রোদয় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে পৌর বলিতে নগরের অধিবাসীদের প্রতিনিধি-সভা বুঝাইত—পৌরঃ পুরবাসিনাং সমূহঃ। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (২।৫) রাজধানীর লোকদেরই নাগরিক বলা হইয়াছে—নাগরিকা ইতি পাটলিপুত্রিকাঃ। পৌর ও জানপদ যে পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সভা তার পরিচয় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। পৌর দেশের আভ্যন্তরীণ সভা ও জানপদ বাহ্য সভা ছিল।—

অশংসতে জনঃ সর্ব্বো রাষ্ট্রে পুরবরে তথা।
অভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ।—রামায়ণ।

অশোকের অনুশাসনে জন শব্দ দ্বারা নিয়ম-প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বুঝানো হইয়াছে—জনং ধম্মযুতম্।

পৌর কর্ত্তব্য।

পুর বা নগরের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন প্রচলন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন পৌর। এর প্রধান কর্ত্তব্য ছিল মিউনিসিপালিটির কাজ। নগরের প্রধান বণিক বা শ্রেষ্ঠী (ব্যাঙ্কার) পৌরপ্রধান নিযুক্ত হইতেন বলিয়া পৌর সভার নায়ককে শ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিন্) বলা হইত। পৌর সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আভ্যন্তর ও সাধারণ সভ্যেরা বাহ্য নামে পরিচিত হইত। আভ্যন্তর পৌর গঠিত হইত নগর-বৃদ্ধ লইয়া; সেইজন্য আভ্যন্তর পৌর পরিচিত হইত পৌর-বৃদ্ধ নামে। পৌর-বৃদ্ধদের সম্মান অত্যন্ত বেশী ছিল—শূদ্র পৌরবৃদ্ধকে আসিতে দেখিলে ব্রাহ্মণদের পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাইতে হইত [গৌতম-ধর্ম্ম-সূত্র (শাস্ত্র), ৪।৯।১১]; সমস্ত পৌরবৃদ্ধকে সমবয়সী মনে করা হইত—যেন তাঁরা সকলে বয়স্যঃ সমানেঽহনি জাতঃ—বয়সের জন্য কারো খাতির বেশী হইত না। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে পুরসভায় সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য প্রতিনিধি থাকিত।

পৌরসভার একজন সেক্রেটারী থাকিতেন এবং তিনি সভার রিপোর্ট লিখিতেন—রিপোর্টকে চিরক বলিত—চিরকং নাম লিখিতং পুরাণৈঃ পৌরলেখকৈঃ (বশিষ্ঠ-সংহিতা)। ইহকে লৌকিকলেখ্য বলিত; এবং ইহা ছাড়া রাজকীয় লেখ্য আলাদা প্রস্তুত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পৌর রাজার অধীন ছিল না। পৌর-কর্ত্তব্য ছিল এইসব—

(ক) নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা (বশিষ্ঠ ১৬।২০)।

বালদ্রব্যং ন্যাসবৃদ্ধাঃ বর্দ্ধয়েয়ুর্ন ব্যবহার-প্রাপনাৎ, দেবদ্রব্যঞ্চ (অর্থশাস্ত্র)।

(খ) নাগরিকদের বলাধানের জন্য পৌষ্টিক-ব্যবস্থা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং শান্তিকং পৌষ্টিকং তথা।
পৌরাণাং কর্ম্ম কুর্য্যাস্ তে সন্দিগ্ধে নির্ণয়ং তথা। —বৃহস্পতি।

(গ) নগরের শান্তি রক্ষা সকলে মিলিয়া করিবেন, একজন কেউ নয়—

চাট-চৌর-ভয়ে বাধাঃ সর্ব্বসাধারণাঃ স্মৃতাঃ।
তত্রোপশমনং কার্য্যং সর্ব্বৈর্ নৈকেন কেনচিৎ। —বৃহস্পতি।

(ঘ) সাহস (ফৌজদারী) মামলা ছাড়া অন্য বিবাদের মীমাংসা—

সাহসস্তারবর্জ্জানি কুর্য্যুঃ কার্য্যাণি তে নৃণাম্। —বৃহস্পতি।

(ঙ) নগরের সাধারণ-ব্যবহৃত স্থানগুলির পর্য্যবেক্ষণ সকলে সম্মিলিত ভাবে করিতে হইত—

ধর্ম্মকার্য্যমপি সংভূয় কার্য্যম্ ইত্যুক্তং তেন বৈ।
সভা-প্রপা-দেবগৃহ-তটাকারাম-সংস্কৃতি। —বৃহস্পতি।

পাটলিপুত্রের পৌর কার্য্য।

মেগাস্থিনিস্ ষ্ট্রাবো প্রভৃতি পর্য্যটকেরা পাটলিপুত্রের পৌর দেখিয়া তার কার্য্যপ্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁরা জননির্ব্বাচিত নগর-শাসক সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা যে শাসক নিযুক্ত করিতেন তাকে নাগরক বলিত (অর্থশাস্ত্র)। এই সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে ছয়টি বোর্ড থাকিত, তাতে পাঁচ পাঁচ করিয়া মেম্বর থাকিত, তাঁরা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন—

(১) নগরের শিল্পবাণিজ্য।

(২) নগরে আগন্তুক বিদেশী; তাদের মৃত্যু হইলে তাদের সম্পত্তি তাদের আত্মীয়দের নিকট প্রেরণ।

(৩) জন্ম ও মৃত্যু লেখা।

(৪) বেচাকেনার শুল্ক আদায়; দ্রব্যের দরদাম নির্ণয় ও স্থির করা; বাজার হাট দেখা; সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থান ও গৃহ তদারক।

ষ্ট্রাবো যাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, তাঁরাই পৌরবৃন্দ বা পৌরমুখ্য। বোর্ড হইতেছে পরিষৎ বা সঙ্ঘ; তার সভ্যসংখ্যা অনুসারে নাম হইত—পঞ্চক, দশক, বিংশক সঙ্ঘ (পতঞ্জলি)।

যৌ ব্রূয়ঃ পঞ্চ বা কার্য্যাঃ সমূহহিতবাদিনঃ।
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাং গ্রামশ্রেণিগণাদিভিঃ॥
—বীরমিত্রোদয়।

সমূহ বা জনসাধারণের হিতবাদী দুই তিন বা পাঁচ প্রতিনিধির সঙ্ঘ যে ব্যবস্থা করিবেন তাহা গ্রাম শ্রেণী গণ মান্য করিবেন।

পঞ্চ সংঘা। চতুবর্গো ভিক্ষুসংঘো, পঞ্চবর্গো ভিক্ষুসংঘো, দসবর্গো ভিক্ষুসংঘো, বীসবর্গো ভিক্ষুসংঘো, অতিরেকবীসতিবর্গো ভিক্ষুসংঘো।—মহাবর্গ।

বিষয়ের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে সংঘের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত।

সংঘের যতগুলি সভ্য উপস্থিত হইলে বিষয় আলোচনা হইতে পারে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাকে ইংরেজিতে বলে কোরাম; প্রাচীন ভারতে তার নাম ছিল বর্গ (পাণিনি ৫।১।৬০)। বর্গের অন্তর্গত সভ্যদের বলিত বর্গিন্ (ভৃগু)।

লিঙ্গিনঃ শ্রেণীপুগস্থ বর্গিণ্-জাতাস্ তথাপরে।
সমূহস্থাশ্চ যে চান্যে বর্গাংস্ তান্ অব্রবীন্ ভৃগুঃ॥
—নীলকণ্ঠ-ধৃত কাত্যায়ন-বচন।

সমূহস্থ বর্গের অন্তর্গত ছিল পুগ গণ সঙ্ঘ।—চণ্ডেশ্বর ইত্যাদি।

গ্রাম-পৌর-গণ-শ্রেণ্যশ্-চতুর্ব্বিধাশ্চ বর্গিণঃ।—
মিত্রমিশ্র-ধৃত ভৃগু-বচন।

মহাভাষ্যে (৪।২।২) বাসুদেব ও অক্রূর বর্গ হইয়াছিলেন দেখা যায়।

বর্গ মানে দল—

কর্ষক-বণিক্-পশুপাল-কুসীদি-কারবঃ যে যে বর্গে।—
গৌতম-ধর্ম্মশাস্ত্র (১১।২১)।

নৈগম ও পুগ।

পুর বা নগরে বণিকদের যে সংঘ থাকিত তাকে বলিত নৈগম।—নৈগমাঃ পৌরবণিজঃ।—মিত্রমিশ্রের বীরমিত্রোদয়; নগরাণি কর-বর্জ্জিতানি নিগম-বণিজাং স্থানানি।—প্রসন্নব্যাকরণ-সূত্র-ব্যাখ্যান। শিল্পীদের সংঘকে বলিত পুগ।

সমূহঃ বণিজাদীনাম্ পুগঃ সম্পরিকীর্ত্তিতঃ।—কাত্যায়ন।

জাতক প্রভৃতি পালি গ্রন্থে পৌর অর্থে নেগম (নৈগম) শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে পৌরে বণিকদের সংখ্যাই অধিক থাকিত। রামায়ণেও নৈগম ও পৌর একসঙ্গে উল্লেখ আছে—যদিও স্বতন্ত্র অর্থে।

নেগম মুদ্রা।

রাজার টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। পৌর রাজার টাঁকশাল হইতে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইতেন; বণিকেরা নিজেদের টাঁকশালেও মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন—তাকে নেগম মুদ্রা বলিত। তুলনীয়—

সৌবর্ণিকঃ পৌরজানপদানাং রূপ্যসুবর্ণমাবেশনিভিঃ কারয়েৎ।
—অর্থশাস্ত্র

জানপদ ও পৌর-সভার রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য।

জানপদের সকল কাজের সঙ্গেই পৌরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব পুর ভিন্ন জনপদের কার্য্যেও পৌর কর্ত্তৃত্ব করিত জানপদের সহযোগে। পৌর-জানপদ রাজার মুদ্রা-বিভাগের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিত। যুবরাজ নির্ব্বাচনের সময় পৌরজানপদ ব্রাহ্মণদের সহিত পরামর্শ করিয়া পাত্র স্থির করিত (রামায়ণ)। যিনি পৌর-কল্যাণ কামনা করিতেন ও অনুশাসনপ্রণালী জানিতেন এমন রাজপুত্রই জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ-নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচিত হইতেন। অভিষেক-কর্ম্মে জনগণের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য পৌরজানপদ নিজেদের মধ্য হইতে আবার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেন—পৌরজানপদশ্রেষ্ঠঃ নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ উপস্থিত থাকিতেন।

'তৎ নাথদরিদ্রাণাং সংস্কারো যজনক্রিয়া' প্রভৃতি কর্ম্মে সাহায্য করা এদের কর্ত্তব্য ছিল।

অপর দলিলের জাল হইতে পারে, কিন্তু জানপদচিহ্নিত রেজেষ্টরী-করা দলিল জাল হয় না। এ জন্য জনপদ-চিহ্নিত দলিল প্রামাণ্য সাক্ষী বলিয়া স্বীকৃত হইত। (অপরার্ক রাজার স্মৃতিশাস্ত্র।) কারণ—

দ্বি-ত্রি-লিপিজঃ সকৃতেন সলেখ্যেন যুক্তিভিঃ।
কুর্য্যাদ্ধি সদৃশম্ লেখ্যং, তস্মান্ জানপদম্ শুভম্॥
—ব্যাসসংহিতা।

দুই-তিন-প্রকার লিখিতে সক্ষম লোক সহজেই সদৃশ নকল জাল দলিল তৈয়ারি করিতে পারে; সেইজন্য জানপদ-চিহ্নিত কৃত বা রেজেষ্টারী দলিল নিরাপদ্।

দেশাধ্যক্ষ জানপদ-লেখ্য প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা 'কৃত' হইত অর্থাৎ রেজেষ্টারী করা হইত। নিগম-সভা-কলকবার বা রেজেষ্টারী আপিস লেখ্য নকল করিয়া রাখিত।

পৌর-জানপদ।

পৌর ও জানপদ সম্মিলিত হইয়া যে সভা করিত তাকে বলিত পৌর-জানপদ। পৌর-জানপদ প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন ও রাজাকে নিয়ন্ত্রিত করিত। রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার শক্তিও পৌর-জানপদের ছিল। মহাভারতে বেণ রাজাকে ব্রাহ্মণেরা নির্ব্বাসিত করেন। মৃচ্ছকটিক নাটকে 'সার্থবাহ-বিনয়দত্তস্য নপ্তা সাগরদত্তস্য তনয়ঃ' রাজার নিকট সুবিচার না পাওয়াতে পৌর-জানপদ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। রাজার ভাই পৌরান্ সমাশ্বাস্য পৌরের বিশ্বাসভাজন হইয়া সিংহাসন লাভ করেন। দূত জনপদ-সমবায়ে বা পৌরে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত দোষী সংস্থানককে দণ্ডিত করিতে অনুরোধ করিল। এই পৌর বা জনপদ-সমবায় পৌর-জানপদ।

সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ বলেন যে পৌর দুষ্ক্রিয় রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও নির্ব্বাসিত করিতে পারিত এবং নিজেদের সভায় বিচার করিয়া রাজবংশের বাহিরের লোককেও রাজা নির্ব্বাচন করিতে পারিত। এখানেও পৌর মানে পৌর-জানপদ।

দশকুমার-চরিতে বলা হইয়াছে যে পৌর-জানপদ যখন রাজার ভাইএর পক্ষ তখন তাঁরই রাজা হওয়ার আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

"অনুজাঃ পুনঃ অতিবহবঃ তৈঃ অপি ঘটন্তে পৌরজানপদাঃ।"
—তৃতীয় অধ্যায়।

পৌর-জানপদে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইত তার বিবরণ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। রাজা তাঁর সম্বন্ধে পৌর-জানপদের মত নির্ণয়ের জন্য চর নিযুক্ত করিতেন। চর এইসব সব্-কমিটি বা বিভাগে সন্ধান করিত দেখা যায়—

(১) তীর্থ-সভা-শালা-সমবায়,

(২) পূগ-সমবায়,

(৩) জন-সমবায়।

চরেরা এইরূপ করিয়া কথা তুলিত—

সর্ব্বগুণসম্পন্নশ্চায়ং রাজা ভ্রূয়তে। ন চাস্য কশ্চিৎ গুণো দৃশ্যতে যঃ পৌরজানপদান্ দণ্ড-করাভ্যাং পীড়য়তীতি।

শোনা যায় রাজা নাকি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। কিন্তু যে পৌর-জানপদকে দণ্ড ও কর দ্বারা পীড়ন করে তার ত কোনো গুণই দেখা যায় না।

রাজার প্রাপ্য ছিল শস্যের ষষ্ঠভাগ ও বাণিজ্য-পণ্যের দশম ভাগ। তার অতিরিক্ত লইলেই রাজাকে অত্যাচারী অন্যায়কারী বিবেচনা করা হইত।

পৌর-জানপদের মন্ত্রিন্।

পৌর-জানপদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশীর ভাগ লোকের সম্মানিত ও বিশ্বাসভাজন হইতেন রাজা তাঁকেই প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া তাঁকে মন্ত্র বা State policy ও দণ্ড বা Government পরিচালনা করিবার ভার দিতেন; যেমন এখন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে করা হয়।

তস্মৈ মন্ত্রঃ প্রযোক্তব্যো দণ্ডমাধিৎসতা নৃপ।
পৌর-জানপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্ম্মতো গতাঃ॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৮৩।৪৩।

ক্যাবিনেট মিনিষ্টার বা মন্ত্রী-পরিষৎ রাজার সহিত রাষ্ট্রপরিচালনপদ্ধতি (মন্ত্র, state policy) স্থির করিয়া রাষ্ট্রীয় বা জানপদ পার্লামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট বা স্পীকার দ্বারা রাষ্ট্র বা জানপদের সমর্থনের জন্য তাদের নিকট উপস্থিত করিতেন; সেই বার্ত্তাবহ কর্ম্মচারীকে রাষ্ট্রীয় বলিত। কোনো বিশেষ কারণে নূতন ট্যাক্স্ প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা ছিল জানপদের হাতে।

অষ্টানাং মন্ত্রিণাং মধ্যে মন্ত্রং রাজোপধারয়েৎ।
ততঃ সংপ্রেষয়েদ্ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ায় চ দর্শয়েৎ॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৮৫।১১-১২।

মন্ত্রীদের কর্ম্মে স্থায়িত্ব নির্ভর করিত পৌর-জানপদের সমর্থন ও বিশ্বাসের উপর। বিশ্বাস নষ্ট হইলেই মন্ত্রীরা সমর্থন পাইতেন না; তখন তাঁদের পদত্যাগ করিতে হইত এবং রাজা নূতন মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া তাঁকে মন্ত্রীপরিষৎ গঠন করিতে বলিতেন—ঠিক যেমন এখন ইংলণ্ডের পার্লা-

মেণ্টে করা হয়। স্কন্দগুপ্তের মন্ত্রী চক্রপালিত একটি শিলালেখ দ্বারা প্রচার করেন যে তিনি পৌরবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া অল্পদিনেই বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন এবং প্রার্থনা করিয়াছেন "নগরমপি চ ভূয়াদ্ বৃদ্ধিমৎ পৌরযুষ্টম্" নগরও বৃদ্ধিযুক্ত হোক ও পৌরানুগত হোক। (জুনাগড় শিলালেখ।)

ন্যাগরিক ও প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট।

সাম্রাজ্যের মধ্যে নগরের ও প্রদেশের শাসন স্বতন্ত্র ব্যবস্থার অধীন হইত—যেমন এখন ইংরেজ-রাজ্যে হয়। পৌর কেবল পুরের ব্যবস্থা করিত এবং পৌর-জানপদ সমস্ত দেশের ব্যবস্থা করিত। অশোক-সাম্রাজ্যের উত্তরাপথের নগর তক্ষশিলার পৌর রাজবিদ্রোহী হইলে সম্রাট নিজেই যাইতে চাহিলে তিষ্যরক্ষিতার বশীভূত মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল—কুমার কুনালকে প্রেরণ করুন পৌরশাস্তি করিবার জন্য। পৌর কুমারকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়া বলিল—আমরা কুমার (রাজপ্রতিনিধি, ভাইস্‌রয়) অথবা রাজার বিরুদ্ধ নই; যেসব দুষ্টাত্মা অমাত্য বা রাজকর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের অপমান করে আমরা তাদেরই বিরুদ্ধ।

রাজ্ঞোঽশোকস্যোত্তরপথে তক্ষশিলানগরং বিদ্রুতম্ শ্রুত্বা চ রাজা স্বয়মেবাভিপ্রস্থিতঃ। ততোঽমাত্যৈর্ অভিহিতঃ—দেব, কুমারঃ প্রেষ্যতাং, স নংক্ষ্যতি। অথ রাজা কুণালমাহূয় কথয়তি—বৎস কুণাল, গমিষ্যসি তক্ষশিলানগরং সংনাময়িতুম্। কুণাল উবাচ—গচ্ছতু দেব গমিষ্যামি।

অনুপূর্ব্বেণ তক্ষশিলামনুপ্রাপ্তঃ। শ্রুত্বা চ তক্ষশিলাপৌরা অর্দ্ধত্রিকানি যোজনানি মার্গশোভাং নগরশোভাং চ কৃত্বা পূর্ণকুম্ভৈঃ প্রত্যুদ্গতাঃ। কথ্যতি চ—ন বয়ং কুমারস্য বিরুদ্ধাঃ, ন রাজ্ঞোঽশোকস্যাপি, তু দুষ্টামাত্যা অস্মাকম্ অপমানং কুর্ব্বন্তি।...

—দিব্যাবদান।

তারপরে অশোক অনুশাসন প্রচার করেন যে তক্ষশিলা-অমাত্যরা তিন বৎসর অন্তর বদলী হইবে ও নূতন অমাত্য নিযুক্ত হইয়া যাইবে (ধৌলি শিলালিপি)। অন্যান্য প্রদেশে পাঁচ বৎসর অন্তর শাসক বদল হইত; তক্ষশিলাপৌর আন্দোলন করাতে এই বিশেষ নিয়ম হয় যাতে নগরজনের পরিক্লেশ না ঘটে। উজ্জয়িনীতেও এইরূপ আন্দোলনের ফলে সেখানেও ত্রৈবার্ষিক ব্যবস্থা হয় (কলিঙ্গ শিলালিপি)। এইসব পৌর এমন সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন যে কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধাচরণ যে রাজদ্রোহ নয় তাহা তাঁরা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন। এখন ইংরেজ আমলেও প্রধান কর্ম্মচারীরা পাঁচ বৎসর অন্তর ও নিম্নতন কর্ম্মচারীরা তিন তিন বৎসর অন্তর বদলী হইয়া থাকেন।

ট্যাক্স্ আদায়।

ট্যাক্স্ বা কর আদায়ের সম্পর্কে বহুবার পৌর-জানপদের উল্লেখ দেখা যায়। উভয় সঙ্ঘের সম্মতি ব্যতীত হয় ধার্য্য হইত না; রাজা যেসব বিশেষ ট্যাক্স্ আদায় করিতেন তাও পৌর-জানপদের সম্মতি-সাপেক্ষ ছিল; এইজন্য রাজা পৌরজানপদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে বাধ্য ছিলেন—এতেন প্রদেশেন রাজা পৌর-জানপদান্ ভিক্ষেত (অর্থশাস্ত্র, ৫।২।৯০)। কিন্তু পৌরজানপদ অন্যায় ট্যাক্স্ রাজার সম্মান রক্ষার জন্য "প্রণয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সামন্ত রাজা অধিরাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া পৌরজানপদের বিরাগভাজন হইতেন—কুপিত পৌরজানপদ সেই রাজাকে হত্যা করিত ও প্রকৃতিপুঞ্জ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে নির্ব্বাসিত করিত—

কুপিতৈস্ তৈর্ এবং ঘাতয়েৎ। প্রকৃতিভির্ উপহৃত্য অপনয়েৎ।

—অর্থশাস্ত্র।

উজ্জয়িনীর রাজা রুদ্রদামন (১৩০ খ্রীষ্টাব্দ) মৌর্য্যযুগের প্রস্তুত জলাশয় সুদর্শন হ্রদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলে পৌর-জানপদ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন; পরাজিত রাজা নিজের অর্থ হইতে তার সংস্কার করান।

পৌর-জানপদে রাজার বক্তৃতা।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৮৭ অধ্যায়) রাজা ও পৌর-জানপদের সদ্ভাব রক্ষার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজা যুক্তির দ্বারা উৎকোচের দ্বারা পৌরজানপদের সান্ত উপস্থিত (সংশ্রিত) ও অনুপস্থিত (উপাশ্রিত) সভ্যকে বশীভূত করিবেন এবং

ইতি বাচা মধুরয়া শ্লক্ষ্ণয়া সোপচারয়া
স্বরশ্মীনভ্যবহৃজেদ্ যোগম্ আধায় কালবিৎ।

এইরূপ মধুর বাক্যে নমস্কার দ্বারা ধনাদানের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

পৌরজানপদকে সম্বোধনের সময় রাজা সম্মানসূচক ভবৎ—আপনি শব্দ ব্যবহার করিতেন।

পৌর-জানপদের অনুগ্রহ।

পৌর-জানপদ যে-সমস্ত সুবিধা সম্ভোগ করিত তাকে অনুগ্রহ বলা হইত (অর্থশাস্ত্র)। কলিঙ্গ-রাজ খারবেল (১৬০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) বলিয়াছেন যে একদা তিনি পৌর-জানপদকে বহু অনুগ্রহ দান করেন। পৌর-জানপদ যাহা দাবী করিতেন রাজা তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন এবং রাজার সম্মান রক্ষার জন্য সেই কর্ম্মকে অনুগ্রহ বলা হইত। যেসমস্ত কাজ হইতে রাজাকে নিবৃত্ত থাকিতে হইত তাকে বলিত পরিহার (অর্থশাস্ত্র)। দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজা কর ও রাজস্ব আদায় পরিহার করিতেন।—নিবৃত্তপরিহারা পিতেবানুগৃহ্লীয়াৎ। খনি হস্তিবনব্রজ বণিকপথ বারিস্থলপথ পণ্যপত্তন সেতুবন্ধন প্রভৃতির জন্য রাজা অনুগ্রহ দান করিতে বাধ্য ছিলেন। রুদ্রদামন সুদর্শন হ্রদ সংস্কারকে পৌর-জানপদ-অনুগ্রহ বলিয়াছেন।

দীর্ঘসত্র জন্য রাজার নৈগম-জানপদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইত। নৈগম-জানপদ অর্থব্যয় মঞ্জুর করিলে রাজা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেন।—দীঘনিকায়, কূটদন্ত সুত্ত।

রাজা সমর-সজ্জার সৈন্য সংগ্রহ ও অর্থ সংগ্রহের জন্যও পৌরজানপদের নিকট প্রার্থনা করিতে ও অনুমতি লইতে বাধ্য ছিলেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৮৭ অধ্যায়)।

পৌর-জানপদ ও রাজার দৈনিক সম্পর্ক।

রাজাকে বা রাজপ্রতিনিধি যুবরাজকে প্রত্যহ নিয়মিত পৌরজানপদে উপস্থিত থাকিয়া তাঁদের সহিত পরামর্শ করিতে হইত—

পৌরজানপদানাঞ্চ যানি কার্য্যাণি নিত্যশঃ।
রাজানং সমনুজ্ঞাপ্য তানি কার্য্যাণি ধর্ম্মতঃ॥—
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৪০।৫।১৯।

দ্বিতীয়ে (দিবসের দ্বিতীয় ভাগে) পৌরজানপদানাং কার্য্যাণি পশ্যেৎ (রাজা)। —অর্থশাস্ত্র, ৮।১৯।১৬।

রাজা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও পৌর-জানপদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইত। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁদের কাছে ধর্ম্মপরিপৃচ্ছা উপস্থিত করিয়াছিলেন (অশোক অনুশাসন)।

পৌর-জানপদে ব্যবস্থিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন পৌর। ইহারই উপর দণ্ড বা কার্য্যনির্ব্বাহের ভার ন্যস্ত ছিল—Executive Council.

শাসনপদ্ধতির উপর পৌরজানপদের প্রভাব।

বামদেব বলিয়াছেন যে পৌরজানপদ যেসব পদ্ধতির ও কর্ম্মচারীদের অনুমোদন ও সমর্থন করিবেন তারাই স্থায়ী হইবে—

পৌরজানপদা যস্য ন মুহ্যন্তি অপীড়িতাঃ
রাষ্ট্রকর্ম্মকরাহ্যেতে রাষ্ট্রন্তু চ বিরোধিনঃ॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৯৪।১৩।

রাজকর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিয়া দেশের ক্ষতি করিলে বা তাদের অবহেলা হইতে দেশে চুরি ডাকাতি হইলে, পৌর-জানপদ রাজার নিকট ক্ষতির এক বিল পেশ করেন ও রাজাকে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হয় নিজের কোষের অর্থ হইতে। রাজাকে যে ভৃতি দেওয়া হয় তাহা রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য; এইজন্য রাজা প্রজার ভৃত্য; ভৃত্য কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে তার দণ্ড পাইতেই হইবে।

দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজা জানপদায় তু।
অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ॥
—যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৩৬।

প্রত্যাহর্ত্তুম্ অশক্তস্ তু ধনং চৌরৈর্ হৃতং যদি।
যৎকোষাৎ তদ্ধি দেয়ং স্যাদ্ অশক্তেন মহীভৃতা॥
—মিতাক্ষরা।

মনু, মেধাতিথি, নন্দন প্রভৃতি বহু শাস্ত্রকার এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা রাজার কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা বা অক্ষমতার জরিমানা।

পৌর-জানপদের সংগঠন।

মহাভারতে দেখা যায় যে পৌর-জানপদের সভ্যেরা সকলেই প্রায় ধনী হইতেন অথবা মধ্যবিত্ত অল্প থাকিতেন। দশকুমার-চরিতে (তৃতীয় অধ্যায়) জানপদে গ্রামনি বা গ্রামবাসী সভ্য দেখা যায়। গ্রামনি গ্রামের মধ্যে ধনী মোড়ল বৈশ্য (মৈত্রায়ণী সংহিতা) অথবা ক্ষত্রিয় (দীঘনিকায়, কূটদন্তসুত্ত) হইতেন। জানপদ-সভ্যেরা প্রায়ই এই গ্রামনি শ্রেণীর লোক হইতেন।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক পুস্তক দীঘনিকায় হইতে সভ্য-

নির্ব্বাচনের প্রথা জানা যায়।—রাজার জনপদে যত নৈগম জানপদ-ক্ষত্রিয় থাকে, পৌর-জানপদের যারা মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী অমাত্য ও পারিষদ, নৈগম জানপদ ব্রাহ্মণ যাদের বড় বড় অট্টালিকা বাড়ী আছে, গৃহপতি, বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি যারা স্বল্পধন নয়, তাদের সকলকে রাজা ভোট দিবার অধিকার দিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে ডাকিতেন। সম্বহুলতায় বা majority ভোটে যিনি যদ্ভূয়সিক বা elected হইতেন তিনি সভ্য গণ্য হইতেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভোটের অধিকার তখনও সম্পত্তিগত ছিল, বিদ্যাগত নয়—দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা ভোট দিতে অধিকারী ছিলেন না, যেমন এখন ভারতবর্ষের নূতন ব্যবস্থায় মূর্খ ধনী প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে, কিন্তু গ্রাজুয়েট সাত বছরের প্রবীণ না হইলে ভোট দিতে পারিবে না, যদি তার সম্পত্তি না থাকে; ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের ভোট দিবার অধিকার জন্মিতে তাদের বয়স হইবে অন্তত ৩৩ বৎসর। এইজন্যই রামায়ণে দেখিতে পাই পৌরজানপদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্রভাবে দশরথকে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন। ইহা ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বের অবস্থার পরিচায়ক।

পৌর অপেক্ষা জানপদের সভ্যসংখ্যা অনেক বেশী থাকিত। পৌরের সংগঠন সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণ আগেই প্রদত্ত হইয়াছে। নগরের বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পৌর প্রতিবিভক্ত ও উপবিভক্ত হইত। পতঞ্জলি কাত্যায়ন মহাবগ্গ এইসব উপসঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা পাঁচ হইতে বিংশতিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাও আগে বলা হইয়াছে। এইসব সঙ্ঘ একত্র মিলিত হইয়া পৌর হইত। পৌরের অন্তর্গত প্রত্যেক সঙ্ঘের একজন করিয়া মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ থাকিতেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে মলিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস চাণক্যকে সমস্ত দেশের কথা বলিতেছেন; তাহা হইতে অনুমান করা যায় তিনি পৌরসঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দশকুমার-চরিতে দুইজন পৌরমুখ্যের উল্লেখ আছে; তাঁদের একজনের উপর বহির্বাণিজ্যের ভার ছিল। তীর্থ-সভা-শালা-সমবায়, পুগ, জন মিলিয়া পৌর সম্পূর্ণ হইত। জাতিসঙ্ঘের মধ্যে শূদ্র সভ্যও থাকিতেন (গৌতম)। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন শ্রেণীমুখ্য ও গণ তাঁকে অভ্যর্থনা করিতে যায় (যুদ্ধকাণ্ড)। নৈগম রামচন্দ্রকে অভিষেক করেন বণিক ও শূদ্রের প্রতিনিধিরূপে। দশরথের মৃত্যুর পর শ্রেণীরা ভরতকে রাজ্যাধিকারী স্থির করেন। পৌর ও জানপদ দুই বুঝাইতে শ্রেণী ব্যবহৃত হইয়াছিল বোধ হয়। ভরত রামচন্দ্রকে রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন যখন, তখন গণপ্রিয় লোকেরা অনুগমন করিয়াছিলেন। এই গণমুখ্য গণপ্রিয়রা সমমত হইয়া মন্ত্রীদের সহিত রাষ্ট্রব্যবস্থা করিতেন। নৈগম গঠিত হইত মণিকার, গন্ধদন্ত-কারুকার, স্বর্ণকার, তক্ষণ, গন্ধবণিক প্রভৃতির প্রতিনিধিদের দ্বারা। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হইতেন গ্রামঘোষ-মহত্তরাঃ।

জানপদে ও নৈগমে গ্রাম ও নগরের মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচিত হইত।

এইসমস্ত সংগঠন-প্রণালীর সাহিত্যিক প্রমাণ মুদ্রা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ এখন বসাড় নামে পরিচিত; এখানে কতকগুলি শিলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাদের উপর লেখা আছে—শ্রেষ্ঠী নিগমস্য; শ্রেষ্ঠী সার্থবাহ-কুলিক-নিগম; কুলিক-হরিঃ; প্রথম কুলিক-হরিঃ। নিগমশ্রেষ্ঠী মানে নিগম বা পৌরের মুখ্য বা প্রধান ব্যক্তি—প্রেসিডেণ্ট। কুলিক মানে পৌরের বিচারক; প্রথম কুলিক মানে পৌর বিচারালয়ের চীফজাষ্টিস্ বা প্রধান বিচারক। শ্রেষ্ঠীসার্থবাহ-কুলিক-নিগম ভিন্ন ভিন্ন উপসঙ্ঘের সভাপতি। এই শিলমোহরগুলি পৌর-জানপদের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের।

পৌর-জানপদ নিয়ম।

পৌর-জানপদ যে-সব প্রস্তাব ধার্য্য করিতেন তাই নিয়ম হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে সমর্থিত হইত এবং ইহা আইন রূপে পালনীয় ও মান্য হইত। যে কেউ অমান্য করিত বিচারালয়ে তার দণ্ড হইত।

> যো গ্রাম-দেশ-সঙ্ঘানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদম্
> বিসংবদেন্ নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাদ বিপ্রবাসয়েৎ॥
> —মনু ৮।২১৮ ইত্যাদি।

পৌরজানপদ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিধিকে সময় বলিত। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এই সময়কে ধর্ম্ম বা আইন বলিয়া স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা আপস্তম্ব বলিয়াছেন সমস্ত ধর্ম্ম সময় হইতে সম্ভূত।—সময়াচারিতান্ ধর্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। ধর্ম্মজ্ঞ সময়ঃ প্রমাণম্।

একপ্রকারের ধার্য্য প্রস্তাবকে স্থিতি বা দেশস্থিতি বলিত—দেশের বিশেষ অবস্থায় যার উৎপত্তি;—যেমন ডিপোর্ট বা ইন্টার্ণ করিবার ১৮১৮ সালের অর্ডিনান্স, রাউলাট এক্ট ইত্যাদি ইংরেজ আমলে হইয়াছে।

দেশস্থিত্যানুমানেন নৈগমানুমতেন বা।
ক্রিয়তে নির্ণয়স্তত্র ব্যবহারস্ত বাধ্যতে ॥—বৃহস্পতি।

এইসমস্ত দেশস্থিতি নিয়ম বাধ্য বলিয়া প্রচারিত হইত। এইরূপ Proclamation laws বা সাময়িক আইনকে সম্বিৎ অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বলিত। সম্বিৎ যাতে লেখা থাকিত তাকে বলিত সম্বিৎ-পত্র।

গ্রামো দেশশ্চ যৎ কুর্য্যাৎ সত্যলেখ্যং পরস্পরম্।
রাজাহবিরোধি ধর্ম্মার্থং সংবিৎপত্রং বদন্তি তৎ ॥
—বীরমিত্রোদয়ে বৃহস্পতি।

রাজার অবিরোধী সম্বিৎ হইত বলাতে রাজার বিরোধী সম্বিতেরও অস্তিত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

সময় যে পত্রে লিখিয়া রাখা হইত তাকে বলিত সময়ক্রিয়া—

যত্রৈতল্ লিখিতং পত্রে ধর্ম্ম্যা সা সময়ক্রিয়া।—বৃহস্পতি।

সম্বিৎ কেবলমাত্র জানপদ ও পৌর প্রচার করিতে পারিত। শ্রেণী বা গণ (রাজ্যান্তর্গত প্রজাতন্ত্র) সম্বিৎ প্রচার করিতে পারিত না। এই বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকদের কোনো কাজ করিতে, বা কোনো কাজ হইতে বিরত হইতে, বা অধিক কর দিতে আদেশ করা হইত।

পৌর-জানপদ হিন্দু পার্লামেণ্ট।

এই যে যমজ প্রতিষ্ঠান পৌর-জানপদ,—ইহা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত নির্ব্বাসিত অর্থদণ্ডিত করিতে পারিত, নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিত; এর তুষ্টির উপরই রাজবংশের ভবিষ্যৎ রাজা হওয়া নির্ভর করিত; এরই শ্রেষ্ঠকে রাজা মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যশাসনের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিতে বাধ্য ছিলেন; নূতন ট্যাক্স্ প্রবর্ত্তন করিতে হইলে রাজাকে এঁদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হইত; এঁদের বিশ্বাসভাজন না হইলে প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা থাকিত না; নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলেও এঁদের কাছে রাজাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত; এঁরা শিল্প বাণিজ্য বার্ত্তা অর্থ সম্বন্ধে দাবী করিয়া রাজার অনুগ্রহ জোর করিয়া আদায় করিতেন; এঁরা রাজাকে বিষয় বিশেষ পরিহার করিতে বাধ্য করিতেন; এঁদের কোপ হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদেরও বিতাড়িত হইতে হইত; এঁরা রাজার বিরুদ্ধে নিয়ম ও সময় প্রচার করিতেন। অতএব এই সমিতি ও সঙ্ঘকে হিন্দু পার্লামেণ্ট নাম স্বচ্ছন্দেই দেওয়া চলে। এই পৌরজানপদ একদিকে যেমন রাজশক্তিকে নিয়মিত করিত, অন্যদিকে আবার রাজাকে কর্ত্তব্যপালনে সতত উৎসুক ও যত্নবান করিয়া রাখিত।

শ্রীকাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল।

বাংলার মজুর

বাংলায় মজুরদের মধ্যে বাঙ্গালী-মজুরের দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। ডক্, কারখানা, ষ্টেশন, চা-বাগান, কয়লার খনি, যেখানেই যাওয়া যাক্, চোখে পড়িবে সব ভিন্ন-ভাষা-ভাষী অ-বাঙ্গালীর দল। এতে বুঝা যায়, হয় বাংলার লোক মজুরী করে না, কিংবা এসব মজুরী পছন্দ করে না;—নিশ্চয়ই এই মজুরদের চেয়ে তারা বেশী সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে বলিয়াই মনে করে। দেশে আজকাল নূতন নূতন কোম্পানী ঢের গঠিত হইয়াছে; দৈনিক খবরের কাগজখানি হাতে লইলে প্রথমেই নজরে পড়ে "অত লক্ষ" টাকা মূলধন লইয়া "অমুক" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা। জানি আমরা যে, কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে আজকাল দেশী-মূলধনের অভাব পড়িবে না অভাব যদি পড়ে সুশিক্ষিত পরিচালক ও নিপুণ মজুরের। তাতা কোম্পানীর মত, দক্ষ পরিচালক হয় ত প্রথমতঃ বিদেশ হইতেও আনা যাইতে পারে; কিন্তু মজুর মিলিবে কোথায়?—তাই, মজুরদের কথাটাই আমাদের আজ বড় করিয়া ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষিই ভারতকে জীবিত রাখিয়াছে বটে, কিন্তু পুষ্টি দিতে পারে নাই। দেশের পুষ্টির রসদ খুঁজিতে হইবে তার শিল্প ও বাণিজ্যের ভিতর দিয়া। এ দেশের লোকের অভাব

অল্প, তাই অল্পেতেই তার তুষ্টি। অবস্থার উন্নতির দিকে তার খেয়াল নাই, বাঁচিয়া থাকিতে পারাটাই সে যথেষ্ট মনে করে। মান্ধাতার আমল হইতে তার জমিটিকেই সে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে,—ঘর থেকে আঙ্গিনাটিই তার বিদেশ। তাই বাংলার মজুর তার গ্রামটি ছাড়িয়া সহরের কারখানায় যাইতে নারাজ. দুনিয়ার লোক জীবনযাত্রার পথে ট্যাক্সি বা ট্রাম হাঁকাইয়া চলুক তার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,—চিরদিন ধরিয়া সে তার গরুর গাড়ীটি নিয়াই বিব্রত। তাই একমাত্র মিলের ধুতী ও কাপড়ের ছাতা ভিন্ন ঠাকুরদাদার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত তার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের কল-কারখানার মজুরদের চেয়ে যে তারা ভাল অবস্থায় আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই বাংলায় মজুরী করিতে আসে সব ভিন্ন প্রদেশের লোক,—বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও রাজপুতানা হইতে। শুধু কারখানায় নয়, বাংলায় চাষের এবং ফসল কাটার সময়ও অন্যান্য প্রদেশের মজুর দলে দলে আসিয়া এখানে কাজ করে।

"Thanks to its fertile soil, Bengal is able to support practically the whole of its teeming indigenous population by agriculture, and there are very few landless labourers. It is necessary therefore to satisfy from outside the great and growing demand for unskilled workmen in the jutemills on the banks of the Hooghly, the numerous other industrial undertakings in and around the metropolis and the tea-gardens of Darjeeling and Jalpaiguri and for road and railway construction throughout the province. * * In this province the net excess immigrants over emigrants is close on 1,400,000" (Census of India 1911. Vol. v. ch. III, p. 93).

(জমির উর্ব্বরতাগুণে বাংলায় যে পরিমাণ ফসল হয় তাতে বাংলার বাঙ্গালী অধিবাসী সকলেরই খোরাকী হইয়া যায়। জমা-জমি নাই এরূপ মজুরের সংখ্যা এখানে খুব কম; কাজেই হুগলীর পারে পাটের কারখানাগুলিতে রাজধানীর ও তার আশেপাশে অসংখ্য শিল্প-ব্যবসায়ে দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ির চা-বাগানে এবং রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে "অনিপুণ" মজুরের প্রয়োজন যেরূপ বেশী হইয়া পড়িয়াছে ও দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে তাতে বাংলার বাহির হইতে মজুর আনা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার বাসিন্দা বিদেশীর সংখ্যা বিদেশস্থ বাঙ্গালীর সংখ্যা হইতে প্রায় ১৪ লক্ষ বেশী।)

কেহ কেহ দোষ দেয় যে ভারতের জলবায়ুই দেশটাকে মাটী করিয়াছে। কিন্তু তার চেয়ে ভারতীয় মজুরদের শক্তি ও সামর্থ্যকে মাটী করিয়াছে তাদের মাটীর উত্তরাধিকার স্বত্ব। তাই ভারতের যে-কোন কল-কারখানার খবর লইয়া দেখুন জমি চাষ ও ফসল কাটার সময় আসিলেই মজুরের কমতি পড়িয়া যায়। এ সময় পরিচালকগণকে বড় মুস্কিলেই পড়িতে হয়। ভারতে শতকরা ৭২ জন কৃষিজীবী। তাই প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে ১,৩১৬ জন জমা-জমীর কাজ করে এবং ২৮৭ জন বাহিরের মজুরী করে। বাংলার মজুরশ্রেণীর,—শুধু বাংলায় কেন, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই মজুর লোকের দুই-এক বিঘা করিয়া জমী আছে। বাংলায় যখন ফসল কাটার সময় আসে এবং মজুরের "চাহিদা" (demand) বাড়িয়া যায় তখন অন্যান্য প্রদেশের মজুর ভিন্ন তার কাজ চলে না। যাদের জমা-জমী নাই সে সময় তারা নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া লয়। চট্টগ্রামের অনেক মজুর সে সময় আরাকানে চলিয়া যায়। আবার বর্ষাশেষে শীতকালে বিহার অযোধ্যা ইত্যাদি প্রদেশ হইতে মজুর আসিয়া সেখানে খাল ও পুকুর কাটা, রাস্তা তৈয়ার ও পাল্কী-বেহারার কাজ করে। বাংলায় জাহাজ-কোম্পানীর খালাসীরা অনেকেই চট্টগ্রামের লোক। মেঘনার ও পদ্মার চরে যেসব মুসলমান বাস করে এবং যাদের জায়গা-জমী বিশেষ নাই তারা ধান কাটার সময় ত্রিপুরা ও বিক্রমপুরে আসিয়া মজুরী করে। ত্রিপুরার পাল্কীবেহারা অনেকেই শ্রীহট্ট জেলার ও বিহার প্রদেশের। রাজসাহী বিভাগের অবস্থাও ঢাকা-চট্টগ্রামের মত; সেখানেও স্থানীয় মজুরের অনাটন। রংপুর জেলায় ১৮০০ একর জমি গভর্ণমেণ্ট হইতে সাঁওতালদিগকে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৫।৩০ বৎসর আগে—এমনকি রেলগাড়ী হওয়ার আগেও বাংলার মজুরীর অবস্থা এই ছিল। মজুরেরা সাধারণতঃ হাঁটিয়াই শতাধিক মাইল দূর জেলায় চলিয়া যাইত। ১৮৯১ সনের আদমসুমারীতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কৃষিজীবী মজুরের সংখ্যা ৯৯,১৭২; তার মধ্যে ২৪ পরগণায় ৪১,৯৩৭। বঙ্গদেশে মেদিনীপুরের মজুরেরাই সবচেয়ে গরীব। সাঁওতাল কোল ইত্যাদির মত তারাও শীতকালে প্রেসিডেন্সি বিভাগে কাজ করিতে আসে; নদীয়া ও যশোহরের লোক আবার খুলনাতে মজুরী করিতে যায়। বর্দ্ধমান বিভাগে মজুরের সংখ্যা ১৮৯১ সনের সেন্সাসে ৩০২,

৮৬৭। রাণীগঞ্জে কয়লার খনি থাকায় এখানে মজুরের "চাহিদা" বেশী। তবু এখানের মজুরেরা বাংলার নানা জেলায় এবং আসামের চা-বাগানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেক সাঁওতাল মজুর বীরভূম জেলায় গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গোয়ালন্দ ঘাটের হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৯১৭-১৮ সনে ৯,৮০৮ জন কুলী সে পথে আসামের চাবাগানে গিয়াছিল, তার মধ্যে বাঙ্গালী ৫০৮। ১৯১৮-১৯ সনে আসাম-যাত্রী কুলীর মোট সংখ্যা ১১৯,৮৮৩; তার মধ্যে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মজুরের সংখ্যা ২,৩৬৪। খাদ্যদ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ও বাংলার দুর্ভিক্ষই এই সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ। মেদিনীপুর হইতে ১,৪৫৮ জন, বাঁকুড়া হইতে ৭০১ জন ও বর্দ্ধমান হইতে ১৪৬ জন মজুর ১৯১৮-১৯ সনে আসামে গিয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, Dec. 10, 1919.)

বাংলার মজুরেরা ক্যানাডা, ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে খুব কমই কাজ করিতে যায়; যেহেতু তাদের নিজেদের কাজই করে অন্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া। ১৮৯১-৯২ সনে বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে মাত্র ১৮০ জন মজুর বিদেশে গিয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১০ সনের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৯৭,২৩৩ জন মজুর রেজিষ্ট্রী হইয়া উপনিবেশ ইত্যাদিতে গিয়াছিল। তার মধ্যে ভিন্ন প্রদেশীয় মজুরের সমষ্টি ৯১,০৩০। মোট সংখ্যা হইতে তাহা বাদ দিলে বাকী ৬,২০৩ জন মজুর বাঙ্গালী ও আসামী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মোটামুটি বাংলার মজুরদের পরিচয় এই।

এখন, বাঙ্গালী মজুরদের দুইভাগে ভাগ করা যাক্। (ক) যারা গ্রামে থাকিয়া তাদের কৃষীবল প্রতিবেশীর বাড়ীতে বৎসর বা মাস বা দিন-হিসাবে মজুরী খাটে (অধিকসংখ্যক)। ও (খ) যারা কলকারখানায় কাজ করে (অল্পসংখ্যক)। আমরা এই দুই শ্রেণীর মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। তাদের আয়-ব্যয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনযাত্রা-প্রণালী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও লক্ষ্য এবং অবস্থার উন্নতি বিধান কিরূপে হইতে পারে তাহা ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে দেখাইয়া ভারতের কলকারখানা ইত্যাদিতে নিপুণ ও যথেষ্ট মজুরের অভাব কি করিয়া ঘুচিতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

(ক)

এ কথা মিথ্যা নয় যে, পল্লীগ্রামের মজুরেরা কারখানার মজুরদের চেয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের আনন্দ অনেকটা বেশী করিয়া ভোগ করে। পল্লীর খোলামাঠ, মুক্ত হাওয়া ও জীবনযাত্রার সুলভ উপকরণ এবং সামাজিক ও পারিবারিক উদারতা তাদের জীবনটাকে সরসতা হর্ষ ও গানে ভরিয়া তুলে, যাহা সহরের ধূলা-বালু-পরিপূর্ণ জানালাহীন বদ্ধ কুঠরীর মধ্যে অনাত্মীয় অবস্থায় সহজে মিলে না। সাধারণ কৃষকদের চেয়ে তাদের অবস্থাও নেহাত মন্দ নয়।

"In most parts of the lower provinces, the labourer whether landless or not, lives nearly as well as the middle class agriculturist. He is generally paid on a grain-basis and has been less affected by the dearness of provisions than the artisan."*

Vide Memorandum on the Material Condition of the Lower Orders in Bengal by F. H. Skrine. Para 27

নিম্নতন প্রদেশগুলিতে অনেক স্থানেরই শ্রমজীবী, তার জমি থাকুক আর নাই থাকুক, মধ্যশ্রেণীর কৃষকের প্রায় সম-অবস্থাপন্ন। সাধারণতঃ ফসলের কিয়দংশ তাকে মজুরী বাবত দেওয়া হয়, ও খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার দরুণ কারকরদের চেয়ে তাকে কম বেগ পাইতে হয়।

তাদের অভাব অল্প; চিরদিন ধরিয়া তারা একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাংলাদেশে পাটের কল্যাণে তাদের রোজ্‌গার কতকটা ইতিমধ্যে বাড়িয়া গেলেও অবস্থা তাদের যেইকে-সেই আছে। কারণ, তাদের মজুরী যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, তার চেয়ে বরং বেশী পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে তাদের দৈনন্দিন খরচ। বিলাসিতার ওরা ধার ধারে না; কিন্তু এদের আয়ের প্রায় সব অংশই খোরাকীর জন্য ব্যয় হইয়া যায়।

"From a comparison of the provincial averages * * * it would appear that between 1873 and 1903 the wages of the three classes of labour—namely, the agricultural work, the domestic servant and the artisan—have all risen far more in Bengal, Assam and the Punjab than in other parts of India, the indicated rates of increase being, for agricultural labour, 39 p.c in Bengal, 41 p.c. in Assam and 49 p.c. in the Punjab. * * * this establishes a relation between wages and the no mal cost of living, for the staple food

of Bengal and Assam is rice, the price of which has risen more than that of any other food grain." (Imperial Gezetteer of India. Vol III, Ch IX, pp. 469-70).

প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক্-হিসাব তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের ভিতর কৃষিজীবী-মজুর, বাড়ীর চাকর ও কারকর এই তিন শ্রেণীরই মজুরী বাংলা আসাম এবং পঞ্জাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। কৃষির মজুরী বৃদ্ধির হার,—বাংলায় শতকরা ৩৯, আসামে ৪১, পঞ্জাবে ৪৯। এতে মজুরী এবং জীবনযাত্রার সাধারণ খরচের মধ্যে একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়; কারণ বাংলা ও আসামের প্রধান খাদ্য চাউল, এবং তার দাম অন্যান্য খাদ্য শস্যের চেয়ে বেশীমাত্রে বাড়িয়া গিয়াছে।

অন্যান্য বিষয় নিয়া আলোচনা করিবার আগে একটা আদর্শ (typical) মজুর-পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখাইলে তাদের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে। ধরুন, একটি পরিবারে তিন ভাই, এক বোন, দুই বৌ, মা ও তিনটি শিশু। বড় ভাইটি সুবিধামত এক এক "মৌসমে" এক এক ব্যবসা করে, মেজটি বছর-হিসাবে মহাজনের বাড়ীতে গেরস্থির কাজ করে এবং ছোটটি বাড়ীতে থাকিয়া গরু-বাছুর রাখে ও জমিগুলির তত্ত্বাবধান নেয়, অবসর-মত বড় দুই ভাইও সময় সময় তার সাহায্য করে।

আয়

বড় ভাই	
শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক এই চার মাস মাঝির কাজ করিয়া পায়	৯৫৲
বাদ, নৌকাভাড়া	২৫৲
	৭০৲
অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে ধানক্ষেতের মজুর খাটিয়া খোরাকী সহ	২৮৲
বাকী ছয় মাস কখনও ঋ-খোরাকী বা বিনা-খোরাকী "মুনিষ" খাটিয়া এবং মাটী কাটিয়া	৫০৲
মেজ ভাই গেরস্থির কাজ করিয়া বাইনে ৬০৲, খোরাকী ৪৮৲ ও পূজা পার্ব্বণে কাপড় গেঞ্জি ৫৲ মোট	১১৩৲
তিন বিঘা জমির আধ বছর পোষ (net)	৫০৲
দুধ, বর্ষায় মাছ, ডিম, তরকারী ইত্যাদি বিক্রী করিয়া	৩০৲
মেয়েরা গিরস্থের ধান ভানিয়া ও চিড়া কুটিয়া ...	২০৲
মোট	৩৬১৲

ব্যয়

মেজ ভাইয়ের খোরাকী বাবত (যাহা মনিবই দেয়) ...	৪৮৲
পরিবারের অন্যান্যের খোরাকী খরচ	২৫০৲
কাপড়, গেঞ্জি ইত্যাদি	৪০৲
তামাক ও বড় ভাইয়ের গাঁজা (অপরিহার্য্য) ...	৬৲
সুদ (মেজ ভাইয়ের বিয়ের ঋণের)	১২৲
মোট	৩৫৬৲

এই মোটামুটি হিসাবে ৫৲ অতিরিক্ত থাকে বটে, কিন্তু মেজ ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে যে ঋণ করা হইয়াছিল তার আছে ৫০৲। কাজেই এই ঋণ শীঘ্র শোধ হওয়া দুষ্কর; তার উপর অজন্মা ইত্যাদিতে চাউল-ডালের দর বাড়িয়া গেলেই মুস্কিলের কথা। এ জন্যই এবার ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষের সময় শুধু মজুর শ্রেণীর মেয়েরা নয়, এমন কি অনেক সম্পন্ন কৃষকঘরের বৌ-ঝিদেরও অন্নের অভাবে আসিয়া মাটী কাটিতে হইয়াছিল;—ব্রাহ্মণবাড়িয়ার "জেনানা-খাল" তাঁদের কীর্ত্তি। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, প্রায় প্রত্যেক মজুর-পরিবারই দেনার দায়ে অল্পবিস্তর জড়িত। যদি মজুরীর পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া যায়, বা একবার দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়, তাও তাদের অবস্থার উন্নতির আশা কম। তার কারণ—

এ দেশের মজুরেরা বেশী টাকা হাতে পাইলে স্বভাবত অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে। জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে টাকা সঞ্চয় বা ব্যয় করিতে তারা অভ্যস্ত নয়। তাই একবার যখন কোন কোন কারখানার কুলীদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়ার কথা উঠিয়াছিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ আপত্তি উঠাইয়াছিলেন যে, কুলীদের জীবনযাত্রার বর্ত্তমান অবস্থায় বেশী টাকা হাতে পাইলে তারা আরও বেশীদিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে ও হাতের টাকা না ফুরান পর্য্যন্ত পুনঃ কারখানার কাজে আসিতে চাহিবে না। (Bengal Economic Journal, April 1918). অনেক সময় তারা বাড়ীতে গিয়া (প্রধানতঃ ধানকাটা ও বিয়ের মাসে) এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়ে যে, পুনঃ সহরে আসিবার রেলভাড়া পর্য্যন্ত তাদের হাতে থাকে না। তাই কুলীদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট পাওয়ার দাবী হইতেছে। বাজারে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে, যে মুটে বা তরকারীটা কিনিতে একজন ভদ্রলোক তিনবার ইতস্ততঃ করিতেছেন, একজন মজুর-শ্রেণীর লোক হয়ত মাঝখান হইতে আসিয়া বেশী দরদস্তুর না করিয়াই তাহা লইয়া গেল। বিয়ে-খাওয়া উপলক্ষে ঋণ-করা তাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুরদের হাতে যে টাকা থাকে না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে আজকাল সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের কল্যাণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। শুধু অপব্যয় নয়, বলিয়াছি যে, টাকা

হাতে থাকা অবস্থায় কাজ করিবারও তাদের বড় গরজ দেখা যায় না। বাংলার মজুরেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, মদ বড় খায় না (তাড়ি ভিন্ন), কিন্তু তামাক, গাঁজা, ভাঙ্গ ইত্যাদি চলে। ভদ্রলোকদের পূজার ও বিয়ের বাজার করিবার সময় গাঁজা একটা প্রধান সওদা, নচেৎ মজুরদের অনেককেই খুসী করা যায় না। এক "ছিলিম" গাঁজা পাইলে বাংলার মাঝিরা সারা রাত নৌকা চালাইতে রাজী হয়। কতকগুলি সাধু (?) আজকাল অনেক পল্লীগ্রামে এই কু অভ্যাস বাড়াইয়া তুলিতেছে। তামাকটা ইতর ভদ্র সকলেরই প্রিয়, তাই কি পরিমাণ টাকা এজন্য মজুরদের ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ; কিন্তু গাঁজা ও তাড়ি সাধারণতঃ মজুরশ্রেণীর লোকেরাই বেশী খায়। বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সিতে ১৮৮১-৮২ সনে গাঁজা ৯৩৫,৮০৫ ও তাড়ি ১৪৯,৭০৮ টাকার লাগিয়াছিল। ১৯১২-১৩ সনে গাঁজা ২৮,১১,১৪৭ টাকা ও ১৯১৭-১৮ সনে ৩৩,০৪,৫৮৫ টাকা। (Administration Report on the Excise Department of Bengal, 1917-18) আমরা এই উপলক্ষে মাত্র দেখাইলাম যে, কি পরিমাণ টাকা বাংলার মজুরদের ঘর হইতে ক্রমশঃই বেশী বেশী বাহির হইয়া যাইতেছে।

আমাদের দেশীয় মজুরদের দুর্দ্দশার কারণ কি এবং কি করিলে তাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের দিনে আজ সকলেরই তাহা চিন্তনীয়। ম্যালেরিয়ায় পল্লীর মজুরের জীবন অলক্ষ্যে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে ও শিক্ষার অভাবে তারা "যে তিমিরে সে তিমিরেই" রহিয়া গিয়াছে। মজুরদের অপব্যয়ী ও উদ্যমহীন হওয়ার কারণ তাদের জীবনযাপন ধারার (standard of living) হীনতা। বাপ হইতে ছেলে, ছেলে হইতে নাতি বাঁধা পথে চিরদিন ধরিয়া একই রকমে মজুরী খাটিয়া আসিতেছে। ভদ্রশ্রেণীর পিতা যেমন ছেলের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন, নিজের চেয়েও সমাজের উচ্চতর স্তরে তাকে উন্নীত করিবার জন্য ব্যগ্র হন; মজুরদের সে ভাবনা নাই। কাজেই এজন্য টাকা জমাইয়া রাখাও নিষ্প্রয়োজন। ছেলে বয়স্ক হইলেই তাকে পরিবারের আয়ের বিধান করিতে হয়, তার উন্নতির সীমাও সে পর্য্যন্তই। সকল অবনতির মূলে তাদের শিক্ষার অভাব। বড় বড় কারখানার মালীকগণও বলেন যে, ভারতের পাঁচজন কুলীর কাজ বিলাতের একজন কুলীর দ্বারাই চলে। তাহাদিগকে পটু করিয়া তুলিতে হইলে সকলের আগে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীর মজুরদের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে মোটামুটি এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।—

১। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। স্বর্গীয় গোখলে মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত হওয়ার এখনও ঢের দেরী। গভর্ণমেণ্ট হইতে যথোচিত সাহায্যের আশাও কম। কিন্তু আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভবিষ্যৎ ভারতের যে রাঙ্গা ছবিখানি আমাদের চোখের সাম্নে ভাসিতেছে মজুরদের দ্রুত শিক্ষিত ও পটু করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহা আকাশ-কুসুমের মত বিলীন হইবে। মুস্কিল এই,—ছেলেরা একটু বয়স্ক হইলেই মজুরশ্রেণী তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিতে চায় না। তাই আমাদের একমাত্র উপায় গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কি ভাবে ইহা সহজে সম্ভব হইতে পারে বলিতেছি। গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গলা দেশে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় অনেকগুলি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; মোটের উপর অনেক গ্রামেই একটু ভাল লেখাপড়া-জানা ছাত্রের অভাব হইবে না। দামোদরের বন্যা, ত্রিপুরা ও বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ, পূর্ব্ব-বাঙ্গলার ঝড় ইত্যাদির সময় দেশের ছাত্রসমাজের সেবাব্রত ও কার্য্যক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেশের উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ আগ্রহ ছাত্রদেরই সবচেয়ে বেশী। এই ব্রতের ভারও তাঁহাদিগকেই নিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করা হউক। শিক্ষার এক প্রধান বিষয় হইবে দেশের ইতিহাস। প্রত্যেক সমিতিতেই বাঙ্গলা খবরের কাগজ দুই-একখানি রাখা উচিত এবং কিছু লেখাপড়া শিখিলেই মজুরদের তাহা পড়িতে দিতে হইবে। এই সমিতির খরচ নির্ব্বাহের জন্য সম্পন্ন গেরস্থ ও ভদ্র লোকদের বাড়ী হইতে প্রতি সপ্তাহে "মুষ্টিভিক্ষা" আদায় করিতে হইবে,—অবশ্য যাঁরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিবেন। এ ভাবে কাজে অগ্রসর হইলে সফলতা নিঃসন্দেহ।

২। স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের মোটামুটী নিয়মগুলি এসব বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া ভাল। সেজন্য সমিতির ছেলেদের মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যনীতির বই দুই-একখানি পড়িতে দিতে হইবে,—তাদের নিজেদেরও তাতে উপকার। বাড়ীর চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গল বাড়িতে না দেওয়া, পুকুরে আবর্জ্জনা না ফেলা, গ্রামে কলেরা লাগিলে কি ভাবে সাবধান হইতে হইবে, মাদক দ্রব্য ব্যবহারের অপকারিতা, ইত্যাদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

৩। যৌথ ঋণদান-সমবায়। মহাজনদিগকে টাকার সুদ দিতেই মজুরদের প্রাণান্ত। একবার কর্জ্জ করিলে আসল টাকা বড় শীঘ্র আদায় হইয়া উঠে না। বলিয়াছি যে, প্রত্যেক মজুর-পরিবারেরই কিছু না কিছু ঋণ থাকে। তাই তাদের জন্য অল্পসুদে টাকা পাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রামের ব্র্যাঞ্চ পোষ্ট-আফিসগুলিতে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের প্রসার আরও হওয়া উচিত। এতে করিয়া মজুরদের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়িতে পারে।

৫। একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথা যাতে তাদের মধ্যে নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। মজুরদের বুড়া বয়সের জন্য কোন "পেনসনের" ব্যবস্থা নাই ;—অসুখ-বিসুখে তাদের আর গত্যন্তর কি ?

৬। বাংলার কুটীর-শিল্পের প্রচার ও উন্নতি বিধান করা উচিত। তাতে, মজুরী না মিলিলেও তাদের আয়ের পথ প্রশস্ত থাকিবে। ঝুড়ি, ব্যাগ, চরকার সুতা ইত্যাদি তারা বেশ সুন্দর তৈয়ার করিতে পারে। শিক্ষা পাইলে বিদেশী জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হয়ত তারা টিকিয়া যাইতে পারে।

৭। আর একটি প্রধান প্রয়োজন, জীবনযাত্রার উন্নত আদর্শ তাদের সাম্‌নে ধরা ;—অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে তাহা সহজেই হইয়া আসিবে। বিদেশী মজুরদের অবস্থা কিরূপ দ্রুত উন্নত হইতেছে, দেশের কল্যাণার্থ তাদের আসন যে সবচেয়ে নীচে নয়, কোনমতে দিন-কয়টা কাটাইয়া যাওয়াই যে জীবনের চরম সার্থকতা নয়, জীবনটা যে বৃথা-স্বপ্ন নয়, জগতের আর-সব সম্প্রদায় যখন উন্নতির পথে দ্রুত চলিয়াছে, তারাই বা কেন পাছে পড়িয়া থাকিবে,—এসব ধারণা তাদের মধ্যে জাগাইয়া দেওয়া উচিত।

(খ)

আমরা পল্লীর মজুরদের বর্ত্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম ; এখন সহরে কারখানার মজুরদের অবস্থা ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। গ্রামের মজুর কেন সাধারণতঃ সহরে আসিতে কিংবা আসিলেও থাকিতে চায় না এবং কি করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহাও আলোচ্য। মিঃ রস্কিন্ ও অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ কারখানার মজুরদের চেয়ে গ্রামের মজুরদের জীবনটাকেই বেশী লোভনীয় বলিয়া মনে করেন। তাই কারখানার চেয়ে কুটীর-শিল্পের উন্নতিতেই দেশের মঙ্গল বেশী করিয়া নির্ভর করে বলিয়া তাঁদের মত। কারখানার মজুরদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে চাহিলে তাঁদের কথায় সায় না দিয়া উপায় নাই।

এবং এ জন্যই পল্লীর শান্তিময় জীবন ত্যাগ করিয়া সহরের আবর্জ্জনার মাঝখানে তাদের জীবনের আনন্দ লোপ করিতে আমাদের দেশী মজুরেরা নারাজ। কল-কারখানার পেষণে তাদের দৈহিক ও মানসিক অবনতিই নয়ং সাধিত হইতেছে। কিন্তু শুধু কুটীর-শিল্প যে বিংশ শতাব্দীর কল-কারখানার দিনে আমাদের অভাব ঘুচাইয়া দেশের ধনবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইবে তাহা আমরা মনে করি না। শিল্পজগতের মাঝখানে আমাদের আসন পাইতে হইলে কল কারখানার উন্নতি ভিন্ন উপায় নাই। বিদেশীর বাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটীর-শিল্প টিকিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয়তা নাই। কাজেই মজুরদের কারখানা-জীবনটাও যাতে আনন্দকর ও রমণীয় হইয়া উঠে সে বিষয়ে কারখানার মালিকদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। তাহা হইলে আজ তারা নিপুণ ও অনিপুণ মজুরের যে সামঞ্জস্যের অভাব বোধ করেন সে প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। কারখানার মজুরদের দৈহিক ও মানসিক অবনতি কি অনিবার্য্য ? য়ুরোপ ও আমেরিকাতে মজুরদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তা

কি আমরা দেখি না? শিক্ষায়, কুশলতায়, বলে তারা দেশের কোন শক্তির চেয়ে হীন নয়, বরং রাষ্ট্রশক্তির প্রধান নেতা আজকাল তারাই। তাদের সাহায্যমূলেই ভারতের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা। ভারতের মজুরদেরও কারখানা-জীবনটাকে আনন্দজনক করা যায়, শিক্ষা পাইলে তারাও জগতের যে-কোন শ্রমজীবীদের মত কার্য্যকুশল হইয়া উঠিতে পারে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলির নির্ম্মাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দেশীয় মিস্ত্রিরাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জমি চাষ ও ফসলকাটার সময় আসিলেই ভারতীয় কল-কারখানাগুলিতে মজুরের কমতি পড়িয়া যায়। তার কারণ, মজুরদের প্রায় অনেকেরই দুই-চার বিঘা করিয়া জমি আছে; তার পর একবার বাড়ী গেলে হাতে পয়সা থাকা পর্য্যন্ত তারা বাড়ীর মায়া কাটাইয়া আসিতে চায় না। এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সমগ্র ভারতের উত্তরাধিকার স্বত্ব ও জমি-বিভাগের নূতন রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জমির এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগই (Small holdings) ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ প্রচলনের অন্তরায়; বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই প্রস্তাব হইতেছে যে, জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ উঠাইয়া দিয়া বড় বড় ভূমিভাগের (large holdings) সৃষ্টি করা হউক। এই "Economic holding"গুলিকে অবিভাজ্য ভূমিখণ্ড বলিয়া রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে ও আইন প্রণয়ন করিয়া তাদের পুনর্বিভাগ বন্ধ করিতে হইবে। তাতে সমস্ত দেশে একটা নূতন রকম উলট-পালট হইবে। যাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্ব নষ্ট করিয়া এদের সৃষ্টি হইবে, তাহাদিগকে তাদের জমির যথোচিত মূল্য দেওয়া হইবে। ভারতের প্রচলিত ভূমিবিভাগের কারণ, সে চিরদিন ধরিয়া শান্তিতে তার জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে; প্রবলের শক্তি এখানে দুর্ব্বলের স্বাধিকার নষ্ট করিবার জন্য কখনও উন্মুখ হয় নাই। য়ুরোপের প্রাচীন অবস্থা ভিন্নরূপ ছিল, তাই সেখানে আজ পর্য্যন্ত অন্য বন্দোবস্ত। (বড় ও ছোট জোত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এডাম স্মিথের ওয়েল্থ্ অব্ নেশান্স্ পুস্তকের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।) এজন্যই কথায় বলে যে, য়ুরোপের ছোট ভাইয়েরা মিলিয়া বর্ত্তমান উপনিবেশগুলির সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতেও বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যখন তাহা ফলপ্রসূ হইবে ও সমগ্র ভারতে প্রবর্ত্তিত করা হইবে তখন আমাদের এই দুই দিকের প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া যাইবে। স্থানে স্থানে এই বিধি সম্বন্ধে পরীক্ষাও চলিতেছে। বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য The Report of the Committee appointed to make proposals on the Consolidation of small and scattered holdings in the Baroda State 1917. And also, the Consolidation of Agricultural Holdings in the United Provinces, 1918, by Prof. Jevons.

অতএব কারখানার মজুরদের যথেষ্ট "জোগান" (supply) ও তাদের উন্নতির জন্য আমরা নিম্নলিখিত উপায় বলিতে পারি:—

১। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের স্বাধিকার নষ্ট করা ও তাহার যথোচিত মূল্য দিয়া ভারতীয় কৃষির উন্নতিকল্পে তাহা হইতে "economic holdings"এর সৃষ্টি করা।

২। অথবা (১)-উপায় অসম্ভব হইলে কারখানার মজুরদের প্রত্যেককেই চাষের জন্য দুই এক বিঘা করিয়া জমি দেওয়া। গিরিধিতে কয়লার খনির মজুরদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য কারখানার মালীকগণও তাঁদের কুলীদের জন্য বস্তির ধারে অনেক জায়গা রাখিয়া এরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন।

৩। "কুলী-ব্যারাক" প্রস্তুত না করিয়া প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদা বাড়ী করিয়া দেওয়া, যাতে পরিবার নিয়া থাকার সুবিধা হইতে পারে। এক চতুষ্কের মধ্যে চারিটি কুলীপরিবারের "বাসা" হইতে পারে। আসামের কোন কোন চা-বাগানে এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়াছি। "Barrack life" দেশী মজুরেরা পছন্দ করে না; পল্লীর খোলা বাড়ী হইতে আসিয়া এরূপ নোংরা কোঠায় থাকিয়া তারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তার চেয়ে যার-যার ছোট এক-এক-খান বাড়ী থাকিলে তারা অনেক আরামে ও সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবে। বাড়ীর আশেপাশে শাক-শব্জি করিবার জন্য একটু অতিরিক্ত জায়গা থাকাও প্রয়োজন।

৪। কুলীদের স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত ও নির্দ্দোষ পানীয় জলের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই।

৫। মজুরদের খাটুনীর ঘণ্টা আরও কমাইয়া দিতে হইবে;—বিশেষতঃ স্ত্রী-মজুর ও বালকদের। রাত্রিতে মজুরদিগকে খাটিতে দেওয়া উচিত নয়। অসবাপত্য অবস্থার ও সন্তান একটু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত না খাটাইয়াও তাদের জন্য অন্ততঃ অর্দ্ধবেতনের ব্যবস্থা থাকা ভাল। শিশু সন্তানটিকে ধূলা-বালুতে ফেলিয়া রাখিয়া মা কাজ করিতেছে এ দৃশ্য বড়ই শোচনীয়;—সন্তানটিকে বাড়ীতে কাহার নিকট ফেলিয়া আসিবে? ওয়াসিংটনে শ্রমজীবীদের কন্‌ফারেন্সে বালক-মজুরদের অন্যূন বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষ মজুরদের দৈনিক খাটুনির ঘণ্টা যেরূপ ঠিক করা হইতেছে (ভারতবর্ষ সম্বন্ধে) তাহা অনতিবিলম্বে এখানে প্রচলিত করা উচিত।

৬। কুলীদের প্রতি কারখানার মালীকদের ব্যবহার সহৃদয় হওয়া দরকার। মজুরদের সুখ-সুবিধা ও কল্যাণের দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। জীবন ধারণের উপযোগী সকল জিনিষই আজকাল দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে; তাই বেশী মজুরীর জন্য আজকাল রেলওয়ে, কাপড়ের মিল ইত্যাদির মজুরগণ এত ঘন ঘন ধর্ম্মঘট করিতেছে। তাদের মজুরী আরও বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

৮। মজুরের জীবন যাপনের ধারাকে (Standard of living) উন্নত ও তাদের কার্য্যক্ষমতা নিপুণতর করিয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কারখানার সন্নিকটে প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তার পর কারখানা-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা ও লাইব্রেরী ক্লাব ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত থাকাও উচিত। ভারতের অনেক বড় বড় কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের উন্নতিকল্পে তাদের শিক্ষা যে অপরিহার্য্য এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেন।

৯। মজুরদের অভাব-অভিযোগ নিরাকরণার্থ সমগ্র ভারতীয় শ্রমজীবীসমবায় গঠিত হউক। বর্ত্তমানে যেসব ট্রেড্-ইউনিয়ান্ আছে তাদের শক্তি আরও বেশী ও দরকার। মাত্র সম্প্রতি বম্বে মিল-হ্যাণ্ড্‌স ইউনিয়ান্ ও মাদ্রাস লেবার ইউনিয়ানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথমটির সভ্যসংখ্যা মোটে ৮০০০। দেশে আজকাল যে-সব ধর্ম্মঘট হইতেছে তাহার মূলে প্রায়ই কোন সঙ্ঘশক্তির সহায়তা নাই। মজুর-সঙ্ঘে মহিলা সভ্যেরও স্থান থাকা উচিত কারণ মেয়ে মজুরদের অভাব-অসুবিধা মেয়েরাই ভাল বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য মহিলাদের দ্বারা স্ত্রী-মজুরদের অনেক দুর্দ্দশার অবসান হইয়াছে।

যদিও বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে কারখানার মজুরদের চেয়ে গ্রামের মজুরেরাই বেশী আরামে আছে; বিশেষত বাংলার মজুরেরা, যাদের ২।৪ বিঘা জমী ও তার সঙ্গে অন্যান্য আয়ের পথ খোলা রহিয়াছে; তবুও ভবিষ্যতে কারখানার মজুরদের অবস্থার উন্নতি হইলে, ও তারা শিক্ষা পাইলে জীবনের আনন্দ ও উচ্চধারায় জীবনযাপনের সুযোগ তাদেরই বেশী হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতির মেরুদণ্ড তারাই।

আমরা যেরূপ ব্যবস্থার কথা বলিলাম, কল-কারখানার অবস্থা এ ভাবে উন্নত করিতে না পারিলে বাংলার মজুর তার পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া নিতান্ত দায়ে না পড়িলে সহরে কুলীগিরি করিতে আসিতে চাহিবে না যদিও আসে, মাসকয়েক কাজ করিয়া কিছু টাকা হাতে করিতে পারিলেই পুনঃ বাড়ী চলিয়া যাইবে। পারিবারিক জীবনের আনন্দের আকর্ষণ মজুরদেরও কম নয়। আমরা দু দিক দিয়াই মজুরদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষী। কুটীর-শিল্পের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পাইয়া গ্রাম্য মজুরদের এবং কারখানাগুলির বৃদ্ধি ও কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শুভ ব্যবস্থাহেতু সহরের শ্রমজীবীদের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার ধারা উন্নত হউক এই আমাদের কামনা। তাদের উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে;—তাই আজ নূতন রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আনন্দের দিনে, নব নব কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উত্তেজনার মধ্যে তাদের কথাটাই আমাদের বড় করিয়া মনে পড়ে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

যৌবন

আমি, আকাশের মত উঠিব উর্দ্ধে,
বাতাসের মত ছুটিব ;
কুসুমের মত লুটাইব মধু,
ভ্রমরের মত লুটিব।
যে পথে কখন যায় নাই কেহ
সেইখানে আমি বাঁধি নিজ গেহ,
যেথা যত মানা সঙ্কট নানা
সেথা গিয়ে আমি জুটিব।
সম্মুখে আমি ছুটে যাই সদা
বিরাম নাহিক জানি,
চক্ষে আমার ভাতিছে নিয়ত
অজানার হাতছানি।
ক্ষণ অবসর নাহিক আমার,
লাভ-ক্ষতিগুলি খতিয়ে নেবার
উঠে পড়ে শুধু ছুটিয়া যাবার
শুনি আহ্বান-বাণী।
আমি, প্রাণের আবেগে অমর হইয়া
সমরের গান গাহি ;
গোপনের ধন আবরণ টুটে
বাহির করিতে চাহি।
দেখি নাই যাহা ছুটি তার পানে
ফিরিবার কথা জাগেনাক প্রাণে ;
জীবন-প্রবাহে তরণীটি মোর
উজানের মুখে বাহি।
আমি, সহজ সরল চলা-পথ ছেড়ে
ধরি কণ্টকময়,
অবরোধ সাথে ঘটিলে বিরোধ
পাই নিজ পরিচয়।
উজ্জ্বলতর রচিবার তরে
ভাঙ্গি গড়া-কাজ অবহেলা-ভরে
নূতনের মাঝে চির-পুরাতনে
করিবারে চাহি লয়।
পণ্ডিত বলে হেলাইয়া শির,
"মিছে ছুটিস কেনরে অন্ধ ?"
আমি বলি, "ওহে, মন-মৃগ মোর
পেয়েছে নাভির গন্ধ।"
—অন্তর-মূলে যাহার আবাস
পেয়েছি যে তার মুগ্ধ আভাস,
এবে পরিচিত বেষ্টন মাঝে
পারি কি থাকিতে রুদ্ধ ?
বিশ্বের যত বন্দীর ডাক
বেজেছে পরাণে মনে,
বন্ধন খুলে কোলাকুলি এবে
করিব তাদের সনে।
অসীমের সাথে মিলন-আশায়
সসীমের কাছে লয়েছি বিদায় ;
তাই, সুদূরের মাঝে দৃষ্টি হারায়
ধাই শুধু প্রাণপণে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

চিরন্তনী

(৩)

গ্রীষ্মকালটা যতদিন থাকে ততদিন মানুষের অভিজ্ঞতা স্বীকার করে বটে যে শীতকাল একদিন আসিবে, কিন্তু মানুষকে বর্ত্তমান এমন গ্রাস করিয়া রাখে যে তার মন অতীত কি ভবিষ্যৎকে সহজে আমল দিতে চায় না। তাই প্রায় প্রতি বৎসরেই পৌষের শীতে বৃদ্ধ দল সাক্ষ্য দিয়া থাকেন, এমন শীত দেশে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একবারও পড়ে নাই। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ওই এক কথাই লোকে বলিয়া যায়।

শীতের কাপড়-চোপড় গত বৎসরের কাজ শেষ করিয়া যখন পেন্‌সনের আশায় বাক্‌সে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন করুণার মনে হয় নাই যে আগামী বৎসর আর এই জীর্ণ পল্টনের সাহায্যে শীতের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না, কারণ তখন যে বসন্তের বাতাস বুড়ো শীতকে তুড়ি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল। তাহার ভাবনা

ভাবিবার জন্ত তখন আর কে ব্যস্ত! কিন্তু তরুণ কান্ত কি চিরকাল তরুণ থাকে? শীত আবার জরার ভার লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তোবড়ানো টিনের বাক্সের পেটের ভিতর হইতে সাতবৎসরের পুরানো কাপড়গুলি এবারও যখন করুণ বাহির করিয়া সকলকে দিল তখন যাহাদের রক্ত গরম তাহারা তাহাতেই কোনো রকমে কাজ চালাইয়া লইল। কিন্তু বৃদ্ধ তারিণীকান্ত দুইদশ দিন শীত সহ্য করিয়া অবশেষে পরাস্ত হইয়া করুণাকে বলিলেন, "করু, এবার বড় বেশী শীত পড়েছে, এমন ত আর কোনো বার হয় না। এ শীত আমি কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়।"

করুণা জানিত দাদামহাশয় অভাব কখনও জানাইবেন না, তাঁহার স্বল্প বাক্যের ওইটুকু ইঙ্গিতেই বুঝিয়া কাজ করিতে হয়। কাজেই সে সেদিন ইস্কুলের পর বাড়ী আসিয়া কতগুলা ফ্লানেল হাতে করিয়া ত্রিতলবাসিনী গৈলজার সেলাইয়ের কল ধার করিয়া সেলাই করিতে বসিয়াছিল।

অরুণা সেদিন পাশের বাড়ীতে গান শিখিতে গিয়াছিল। গানের উপর তাহার বড় ঝোঁক। সে কাছে থাকিলে কাটা কাপড়গুলা টাঁকিয়া দিতে পারিত, সেলাইটাও একটু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইত। কিন্তু ছোট বোনের গান শিখিবার উৎসাহটা কাজের চাপে দবাইয়া দিয়া তাহার আনন্দটুকু হরণ করিয়া লইতে করুণার কষ্ট হইতেছিল। তাই সে অরুকে আর ডাকে নাই। যে কারণে বউ-কাঁটকী শাশুড়ীর বউ শাশুড়ীর পদ পাইবা মাত্র নিজের বউটির উপর গত জীবনের সমস্ত দুঃখের শোধ তুলিয়া লয়, ঠিক সেই একই কারণে করুণা সম্ভব হইলেই অরুণাকে কাজের হাত হইতে মুক্তি দিত। অরুণার চেয়েও অনেক অল্প বয়সে মাতৃহীনা করুণার কাঁধে সংসারের ভার পড়িয়াছিল, তার কৈশোরের উদ্দাম আনন্দ-স্রোত গৃহিণীপনার দায়ে দুদিনেই শুকাইয়া গিয়াছিল; তাই অরুণার জীবনে সে স্রোত মুক্ত রাখিয়া সে যেন আপনার অকালে-হারানো শৈশব কৈশোর ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিত। যেসব হাসি খেলা নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যের পীড়নে তাহাকে জীবনপ্রভাতেই ছাড়িতে হইয়াছিল, তাহারা যে তাহার হৃদয়ের কতখানি শূন্য করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, দূর হইতে কত মোহনরূপে যে তাহার মনকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে চাহিত, তার কর্ম্মশৃঙ্খল তাহার চঞ্চল চরণে নিগড় হইয়া কেমন করিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিত, সেসব কথা করুণার যতবার মনে হয় ততবারই অরুণার কর্ম্মবিমুখ মনের প্রতি মমতায় সে পূর্ণ হইয়া উঠে।

একলা ঘরে বসিয়া বসিয়া কল চালাইতে চালাইতে করুণার হাত ভার হইয়া উঠিতেছিল। একে শীতের সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত, তাহার উপর নির্জ্জনতায় শ্রান্তি যেন আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল। কেউ কাছে বসিয়া গল্প করিলে কি অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো কাজে লাগিয়া থাকিলে নিজের কাজটাও যেন হাল্কা হইয়া যায়। খাইতে অনিচ্ছুক শিশুকে মা যেমন গল্প করিয়া ভুলাইয়া ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দ্যান, করুণার ইচ্ছা করিতেছিল তাহাকেও তেমনি গল্পে ভুলাইয়া কেউ কাজগুলা করাইয়া লয়। কিন্তু কোথাও ত কাহাকেও দেখা গেল না।

পিঠের শিরদাঁড়া টন্‌টন্ করিতেছিল, হাতের বাঁধন যেন খসিয়া আসিতে চাহিতেছিল। করুণা কলের উপর সেলাইটা ফেলিয়া দিয়া একবার গিয়া কুপুর বিছানায় টান হইয়া শুইয়া পড়িল।

করুণার মনে হইল সত্যই কি তাহার তিরটা জীবন এমনি ভাবে কাটিয়া যাইবে? জীবনের প্রতিদিন সকালে উঠিয়া এই ভাড়াটে বাড়ীর সহস্র-জোড়-দেওয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, এই ঠিকে ঝির হাত মুখ নাড়া, আর এই সযত্নে সঞ্চিত তুচ্ছ আহার্য্যের রূপ দেখিয়াই কি তাহার জীবন কাটিবে? মায়ের কোল হইতে আরম্ভ করিয়া বরণ পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রেই কি ভূমিশয্যায় ক্লান্তদেহ এলাইয়া দিয়ে, আবার বিষণ্ণ মনে ওই ক্ষুদ্র গৃহকোণে জাগিয়া উঠিবে?

তরুণ জীবন এসব নিরাশার কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। জীবন যত নবীন তাহার আশা তত রঙীন তত অগাধ না হইলে অত দীর্ঘ পথ মানুষ চলিত কি করিয়া? করুণার মনে ভবিষ্যতের কত সুখের ছবি জাগিয়া উঠিল। কখনোই এমন দুঃখ-দৈন্যের বোঝা বহিয়া চিরদিন তাহার কাটিবে না। সে যেন চোখে দেখিতে পাইতেছিল, সমস্ত ভাবনা-চিন্তার বোঝা দূরে নামাইয়া দিয়া একটি

শান্ত স্নিগ্ধ গৃহমণ্ডলীর মধ্যে হাসিমুখে আনন্দে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিত্য অন্নচিন্তার বেদনা কাটিয়াছে, অষ্টপ্রহর পরিশ্রম কে হরিয়া লইয়াছে, জীবনের যত ঈপ্সিত ধন একে একে তাহার চারিধারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আজ যাহা পায় নাই বলিয়া ব্যথায় সে কাতর, একদিন সে-সমস্তই তাহার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে, আশা এই কথাই করুণার কানে কানে বলিয়া গেল।

ছায়ার মত যেসব মানুষের ছবি করুণার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পটে ফুটিয়া উঠিয়া আবার নূতনের স্থান জোগাইতে মিলাইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার মধ্যে করুণা একবার দেখিল তাহার নবপরিচিত অবিনাশের মুখ। আপনার অদ্ভুত খেয়ালে আপনি হাসিয়া করুণা ভাবিল, উঃ, মানুষের মন যেন সিঁদেল চোর, টাকা দেখিয়াই চুপিচুপি একবার উঁকি দিয়া আসে। ছবি মিলাইয়া গেল। আবার নূতন কি একটা লোভনীয় আবেষ্টনে আপনাকে বসাইয়া করুণা মনের-মত করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ সাজাইতে বসিল।

পাশের বাড়ীর কোন্ একটা বাড়ীতে টং টং করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। আর শুইয়া পড়িয়া স্বপ্নের মালা গাঁথিলে কাজ পিছাইয়া যায়। করুণা চট্ করিয়া খাট হইতে নামিয়া কলের ছুঁচের তলায় জামা ফেলিয়া ঘড়্ঘড়্ করিয়া চাকাটা সজোরে ঘুরাইতে লাগিল। পরদার আড়াল হইতে কাহার যেন জুতার শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিল। করুণা গ্রাহ্য করিল না। খুব জোরে আবার যেন কে গলা খাঁকরানি দিয়া উঠিল। কলের ঘড়্ঘড়ানি থামাইয়া করুণা তাহার হরেক-রকম-তালি-দেওয়া পরদাটা তুলিয়া দেখিল, দরজায় অবিনাশ দাঁড়াইয়া, সঙ্গে একটি বিধবা মেয়ে। করুণা বিস্মিত হইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সাতদিন মাত্র আগে তাহাদের নূতন পরিচয়, তবু পুরাতন পরিচয়ের দোহাই দিয়া এরি মধ্যে অবিনাশ চারবার তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে। আজ আবার সঙ্গী লইয়া হাজির।

অবিনাশ বহুকালের পরিচিত বন্ধুর মত কথার সুরে একটা দাবী জানাইয়া বলিল, "তোমরা কবে আমাদের ওখানে যাচ্ছ, বল। আমি ত আজ শতদলকে সুদ্ধ নিয়ে এলাম; আমাকে আর কোনো দোষ দিতে পারবে না।"

করুণা ভাবিল, শতদলকে না আনিলে তাহার যেন কতই দোষ দিবার অধিকার ছিল।

মুখে কিছু না বলিয়া সে আসিয়া শতদলের হাত ধরিল। শতদলকে লইয়া সাম্নের ঘরে সে অনায়াসে ঢুকিতে পারিত, কিন্তু চার বৎসর বয়সে অবিনাশের সঙ্গে পরিচয় থাকিলেও আজ এতদিন পরের নূতন আলাপের জোরে সে তাহাকে সুদ্ধ নিজেদের একমাত্র শুইবার ও বসিবার ঘরে ঢুকাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তারিণী-কান্ত বাড়ী ছিলেন না। তাই তাঁহার ঘরটা ভিতর দিক দিয়া বন্ধ করিয়া করুণা কেবল নিজেদের ঘরের দরজাই খোলা রাখিয়াছিল।

অবিনাশ করুণাকে চুপ্‌চাপ দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ঘরে কে?"

করুণা বলিল, "কেউ না।"

অবিনাশ পরদাটা দরজার উপর ছুড়িয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, "তবে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে চল।"

করুণা শতদলের হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া চলিল। গুটিগুটি করিয়া অবিনাশও পিছন পিছন ঢুকিয়া পড়িল। করুণা সে ঘর ঘুরিয়া তারিণীকান্তের ছোট খুপ্‌রা ঘরটির দরজা খুলিয়া অতিথিদের সেইখানেই বসাইল।

ঘরের একটি মাত্র চেয়ারে অবিনাশকে বসিতে বলিয়া করুণা হাতড়াইয়া দিয়াশলাই আনিয়া তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া দিল। যাহার বাড়ীর ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো, আনাচে কানাচে আব্‌লুস-মেহগনির আস্‌বাব, তারই সাম্নে বার্ণিশ-চটা টেবিলের উপর কেরসিনের লণ্ঠনটা তুলিয়া রাখিতে করুণার একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু তখনি মন বলিল, যাকে দরিদ্র বলিয়াই সবাই জানে, তাহার দারিদ্র্য ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখিবার প্রয়াস কেন? চিরপরাজিত মানুষও যে পরাজয়ের লজ্জা ভুলিতে পারে না, তাই মনকে বুঝাইলেও করুণা লজ্জিত ভাবেই আলোটা তুলিয়া রাখিল। জীর্ণ টেবিলের চেহারা পাছে ধনী অভ্যাগতদের চোখে পড়ে তাই বাঁ হাতখানা

বাড়াইয়া অরুণার হাতের তৈরি টেবিল-ঢাকাটা আড়ালে আর-একটু টানিয়া জামাইয়া দিল।

ঘরের রিক্ত নিরাভরণ মূর্ত্তির দিকে কিন্তু তখন অভ্যাগতদের নজর ছিল না। তাহারা দেখিতেছিল, ঘরের শ্রেষ্ঠ আভরণ ওই লজ্জিতা তরুণী কুমারীকে। আরো মুখ নীচু করিয়া ঘরের সামান্য জিনিষগুলোই একটু সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে করুণা ভাবিতেছিল, এত বড়-লোকদের সঙ্গে সে কি কথা বলিবে? হঠাৎ মনে পড়িল কুশল-প্রশ্ন ত করা যায়। করুণা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল দুই জোড়া চোখই তাহার মুখের উপর স্থির হইয়া আছে। লজ্জিত হইয়া করুণা আবার মুখ নামাইল।

অবিনাশ পরের বাড়ীতে আসিয়া নিজেই কর্ত্তার মত বলিল, "তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, করুণা? বোসো।"

করুণা ছোট ভক্তপোষে শতদলের পাশে তাড়াতাড়ি আসিয়া বসিয়া পড়িল।

অবিনাশ বলিল, "এই শতদল, আমার দিদির মেয়ে। ও অবশ্য তোমাদের মত শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গে মেশ্‌বার যোগ্যই নয়। তবু নিয়ে এলাম; যার নিজের গুণ আছে, সে সকলেরই গুণ দেখ্‌তে পায়। নইলে পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়ে একে, তাতে রূপগুণেরও কোনো বিশেষ বালাই নেই, তুমি যে ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে এমন আশা আমি করিনি।"

শতদলের মুখের উপরই তাহার এমন পরিচয়ের ঘটায় করুণা কেমন যেন অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিল। মানুষটাকে প্রথম পরের বাড়ী আনিয়াই তাহার এ কি লাঞ্ছনা! সে এতক্ষণে ভাল করিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিল। বাস্তবিকই শতদল শতদলের মত রূপে চলঢল্ করিতেছে না। সে নিতান্তই সাদাসিধা দেখিতে। রং ময়লা, ছোট্ট রোগা পাতলা মানুষটি। মাথার কাপড়, নিরাভরণ হাত, আর পরণের দামী কাপড় তাহাকে খানিকটা ভারিক্কি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। বৈধব্যের সেই গুরুগম্ভীর ছাপ না থাকিলে হয়ত তাহাকে অনায়াসে চোদ্দ বৎসরের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু তার মুখে জীবন যে বিষাদের ছায়া ফেলিয়া গিয়াছে, সে ছায়া প্রথম উষার আলোকপাতের মত নয়। খাঁটি আগুনের আঁচে না পুড়িলে মানুষের মুখে অমন ছাপ পড়ে না; আর সে পোড়া অত অল্প বয়সে হয় না। শতদলের বয়স ডেইশ-চব্বিশ বৎসর হওয়াই বেশী সম্ভব। অবিনাশের মুখের পরিচয়ে তাহার যে পরিচয় মেলে করুণা দেখিল শতদলের নিজের নীরব মুখ তাহার সম্পূর্ণ উল্টা সাক্ষ্যই দিতেছে; কিন্তু নিজের সে পরিচয় সম্বন্ধে সে নিজে একেবারেই সচেতন নয়; তাই এই শিক্ষিতা মেয়েটির কাছে আপনার অজ্ঞতা লইয়া দাঁড়াইতে সে একান্তই কুণ্ঠিতা। তাহার সে কুণ্ঠা অবিনাশ আরো বাড়াইয়াই তুলিতেছিল।

শতদলের দিকে চাহিয়া দুইহাতে তাহার দুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া করুণা বলিল, "আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আমরা ভড়ং করে বেড়াই বলে আমাদের আসল মূল্য যে খুব বেশী, তা ভাব্‌বেন না। কস্তুরী মৃগ নিজের গন্ধ নিজে টের পায় না, তাই আপনি ঘরের জিনিষের অনাদর করছেন।"

শতদল করুণার কথা ও সহৃদয়তায় তৃপ্ত হইয়া খুব নীচু গলায় বলিল, "ছি, অমন কথা বল্‌বেন না আপনাদের পায়ের ধুলোর যুগ্যিও আমরা নই। জানি কি আমরা পৃথিবীর? জন্মে অবধি হাঁড়ি ধর্‌তে শিখেছি, তাই নিয়েই আছি, আজন্ম তাইতেই কাটবে। অবসরকালে বোঁদল করে মনটা একটু বদ্‌লে নিতে হয়।"

করুণা বলিল, "আমরাও ওর চেয়ে খুব বেশী কিছু জানি যে তা নয়। তবে লোকের চোখে আমাদের গিল্‌টিটা খুব সহজে ধরা পড়ে না বলেই একটু সুবিধে। তা ছাড়া সত্যিও যদি আপনি আমাদের চেয়ে কোনো বিষয়ে খাট হন, তবে সেটা আপনার লজ্জার বিষয় তত্তটা নয়, যতটা শিক্ষাদাতা অভিভাবকদের।"

যে মেয়েটি এতক্ষণ লজ্জায় সঙ্কোচে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছিল না, তাহার মুখে এমন কথা শুনিয়া অবিনাশ বেশ একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। অবিনাশের মত অমন একজন যোগ্য অভিভাবকের নামে নালিশটা তাহারই মুখের উপর যে কোনো দরিদ্র বালিকা করিতে পারে এমন কথা অবিনাশ ভাবেই নাই। লোকের মুখের উপর কথা শুনাইয়া দেওয়াটা সে এতদিন তাহার নিজের একচেটিয়া ব্যবসায় বলিয়াই জানিত। অন্য লোকে

ত কেবল শুনিতেই আছে। বিশেষ বাহারা পদে মর্য্যাদায় ধনে দৌলতে সব দিকেই ছোট তাহারা ত শুনিবেই; আর স্ত্রীলোকের কথা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। করুণার মন্তব্যে অবিনাশ তাই তাড়াতাড়ি কথার সুর বদ্‌লাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অরুণাকে দেখ্‌ছি না যে? তাকে ডাক।"

করুণা বলিল, "সে আস্‌ছে একটু পরে।"

অবিনাশ বলিল, "পরে কেন? কোথাও গিয়েছে নাকি?"

বাড়ীতে আসিয়া অতিথি যে এমন করিয়া জেরা করে করুণার তা জানা ছিল না। সে অবিনাশের ধরণ-ধারণে কেমন একটু মজা পাইতেছিল। অরুণ যে গান শিখিতে গিয়াছে এ কথাটা বলা কি না-বলায় বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তবু অবিনাশ কি বলে দেখিবার জন্যই করুণা বলিল, "হ্যাঁ, সে একটা কাজে একজনদের বাড়ী গিয়েছে। এই এল বলে।"

অবিনাশ বলিল, "ওঃ, কাজে? বিশেষ জরুরি কাজ বুঝি? তা অরুণা ত ছেলেমানুষ, তাকে কাজে না পাঠানোই ভাল।"

শতদল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ছেলেমানুষের মত কাজ না হলে কি আর ছেলেমানুষ গিয়েছে?"

করুণা হাসিয়া বলিল, "কাজটা এমন কিছু বিষম নয়। সে পাশের বাড়ী গান শিখ্‌তে গিয়েছে।"

অবিনাশ বলিল, "অরুণা বুঝি গাইতে পারে বেশ? এখন থেকে যদি ভাল-রকম ওস্তাদের কাছে গান শেখে তাহলে পরে বেশ নাম কর্‌তে পার্‌বে। গান জিনিষটার আজকাল খুব আদর। একটা লোক রেখে তোমরা দুজনেই শিখ্‌লে পার।"

করুণা উত্তর দিবার আগেই শতদল বলিল, "ইস্কুলের চাপের উপর আবার বাড়ীতে নিয়মিত গান শেখা কি সোজা?"

অবিনাশ সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "শীতল-বাবুর মেয়েরা লছমীনারায়ণ ওস্তাদের কাছে গান শেখেন, ওরকম ভাল ওস্তাদ আজকাল দেখা যায় না। তোমরা যদি শেখ ত তার কাছেই শিখো। আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।"

করুণা এইবার একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাদের সুবিধে হবে না এখন।"

আঁচলের চাবি বাজাইয়া তাল দিতে দিতে অরুণা সিঁড়ি দিয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল, "আমি রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।" ফিরিয়া ফিরিয়া ওই লাইনটাই সে গাহিতেছিল। ঘরের কাছে আসিয়া অনেক মানুষের সাড়া পাইয়া তাহার চাবির বাজ্‌না আর সদ্যশেখা গান দুই থামিয়া গেল। সে একবার মাথা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া আবার সুট করিয়া মাথাটা সরাইয়া লইল। করুণা একটু সস্নেহ হাসি হাসিয়া চোখের ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল।

অরুণা ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া ঘরে আসিয়া দিদির পিঠে হাত দিয়া দাঁড়াইতেই অবিনাশ বলিল, "তোমার গলা ত ভারি সুন্দর। একটা গান শোনাও।"

অরুণা প্রশংসা শুনিয়া খুসী হইল, কিন্তু নূতন মানুষের প্রথম অনুরোধেই গান করিলে গায়ক-সমাজে তাহার নাম থাকিবে কি করিয়া? ভদ্রসমাজেও বোধ হয় থাকিবে না। দ্বিতীয় বার অনুরোধের আশায় সে বলিল, "আমি তেমন বিশেষ ভাল—"

অবিনাশ অরুণার কথা শেষ হইবার আগেই বলিল, "ভাল গান বেছে দেখ্‌বার দরকার নেই। যেটা গাইছিলে সেইটে গাইলেই হবে। বাজ্‌না কাছে দেখ্‌ছি না, আচ্ছা থাক্, অম্‌নিই গাও।"

অরুণা বেচারা আর উচ্চবাচ্য করিবার সুবিধা পাইল না। করুণার পিছনে বসিয়া মুখটা আড়াল করিয়া গান শুনাইয়া দিল—ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি! এই গানটা বিশেষ করিয়া অবিনাশের কাছে গাওয়াতে করুণার মন একটু আপত্তি জানাইতেছিল; তবু অবিনাশ নিজেই ফরমাস করিয়াছে মনে করিয়া সে একটু আশ্বাস পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গান শেষ করিয়া এক নিমেষও অপেক্ষা না করিয়া অরুণা বলিল, "এইবার শতদলদি একটা গাইবেন না? না গাইলে কিন্তু আমি ছাড়্‌ছি না।"

এত চট্ করিয়া দিদি পাতাইয়া লওয়াতে খুসী হইয়া শতদল বলিল, "আমি কি ভাই তোমাদের মত অত গুণের

লোক। তুমি গান শেখাও যদি তাহলে না হয় পরে তোমার কাছে পরীক্ষ দেব।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া পিঠে-ঝোলানো লম্বা বেণীটা দোলাইয়া অরুণা বলিল, "ওসব চালাকি আমি শুনছি না। আগে গাইয়ে নিয়ে এখন ফাঁকি দেওয়া ?"

শতদল হাসিয়া অরুণাকে কাছে টানিয়া চুপিচুপি বলিল, "আচ্ছা আমি আর-একদিন গাইব, সত্যি বলছি।"

অরুণা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিল, "না সে হবে না।"

করুণা শতদলের সঙ্কোচের কারণ বুঝিয়া বলিল, "আঃ কি করিস্ অরু! এখন থাম্ "

অবিনাশ শতদলের কথা শোনে নাই; সে বলিল, "শতদল গাইতে জানে না। বৃথা সাধনা করে কোনো লাভ নেই।"

অরুণা খাড়া হইয়া উঠিয়া জোর গলায় বলিল, "আহা! তা বই কি! উনি নিজে বল্—"

অরুণা মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "অরু, বললাম না চুপ করতে ?"

অরুণা দিদির এত সাবধানতার কারণ না বুঝিয়াই চুপ করিল।

করুণা অরুণাকে ইসারা করিয়া নীচে পাঠাইয়া দিল। অবিনাশ সঙ্গীতের যে হিনী-শক্তি সম্বন্ধে মস্ত এক বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিল, এবং করুণাকে বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বার-পাঁচ-ছয় লছমীনারায়ণ ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল।

অরুণা হঠাৎ দুই রেকাবী খাবার হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। করুণা উঠিয়া রেকাবী দুখানা লইয়া অরুণাকে জলের খোঁজে পাঠাইল। অবিনাশ করুণার হাতের ভার লাঘব-করিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত বাড়াইয়া দিল। করুণা "না, না, আপনি বসুন," বলিয়া একটা রেকাবী তাহার কাছে টেবিলে রাখিয়া আর-একখানা শতদলের হাতে দিতে গেল। শতদল সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া তার পক্ষে একটু উঁচু গলায় বলিয়া উঠিল, "আমাকে ?" ব্যাপার বুঝিয়া করুণা তৎক্ষণাৎ জড়সড় হইয়া সরিয়া আসিল। সমস্ত কাণ্ডটা দেখিয়া অবিনাশের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে খুব কঠোর দৃষ্টিতে শতদলের দিকে তাকাইয়া নীচু গলায় বলিল, "শতদল, ধর, ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ?"

শতদলকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, ভয়ে লজ্জায় সে এখনি মাটিতে মিশাইয়া যাইবে। বিধবা হইয়া বিধর্মীর হাতে সন্ধ্যা বেলায় জলগ্রহণ করিবার মত সাহস তাহার ছিল না; সে যে অতিবড় অনাচার! আবার করুণার অনুরোধ কি বলিয়া সে উপেক্ষা করিবে তাও সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, কারণ সে বুঝিয়াছিল, করুণা না জানিয়াই এমন অনুরোধ করিতেছে। যাহাকে এত অল্প সময়ের মধ্যেই সে খানিকটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে আঘাত কি করিয়া করিবে? কিন্তু অবিনাশের নীরব শাসনে তার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

করুণা একবার মাত্র দুইজনের মুখের দিকে তাকাইল। তারপর খাবারের রেকাবীখানা দূরে সরাইয়া রাখিতে চলিল। অবিনাশ বলিল, "দাও না। আর দেরী করে কি লাভ ?"

করুণা বলিল, "না থাক্। ওটা ওঁকে দেবার দরকার নেই। আমি ভুল করে দিতে যাচ্ছিলাম।"

অবিনাশ বলিল, "তবে ওর জন্যে আবার নূতন কি আনবে ?"

করুণা বলিল, "না, কিছুই আর আনতে হবে না।"

শতদলের চোখে মুক্তির আনন্দ ও অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। অবিনাশ অবাক্ হইয়া করুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, অদ্ভুত মেয়ে!

(৪)

অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন অবিনাশ যে আবহাওয়ার মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছিল, তার নিজের চেষ্টাতেই সে আবহাওয়া দূরে ফেলিয়া আসিয়া সে এখন নূতন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়াছে। তাদের সংসারে রোজ আনা, রোজ খাওয়া ব্যাপারই চিরকাল চলিত, কাজেই মরণ-কালে পিতামাতা অনাথ অবিনাশের জন্য ভরণ-পোষণের কোনো ভাণ্ডার রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু দেবতা শেষ বয়সে তাঁদের কোলে যে একটি অস্ফুট কলির মত শিশু উপহার

দিয়াছিলেন সেইটিকে কিশোর পুত্রের জিম্মায় ফেলিয়া গিয়াছিলেন। অবিনাশের দিদি তখন শ্বশুর-শাশুড়ীর অধীন। মরণ-কালে মায়ের সেবা করিতে আসিয়া কচি ভাইটিকে তিনমাস ধরিয়া সে-ই বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; মা বিদায় লইলে চারুবালা খোকাকে শ্বশুর-বাড়ীতেও সঙ্গে করিয়াই লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানের আত্মীয় কুটুম্ব একটা পরের ছেলের এত আদর দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন। শাশুড়ী বলিলেন, "বাপ বুড়ো-মিন্‌সের কি কোনো আক্কেল নেই। পরের ঘাড়ে ছেলেটাকে ফেলে দিলে!—তার দুধের দাম, ঝিয়ের মাইনে এত এত কে দেবে শুনি?"

চারু শুধু চোখের জল মুছিল। লোকমুখে বাপের কানে কথা উঠিল, "চারু নিজের মায়ের পেটের ভাইটাকে মানুষ করবে, তাও আবার মাইনে-করা ধাইয়ের মত টাকা চেয়েছে!"

বাপ ব্যাপার বুঝিয়া মাসিক ১৫ টাকা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। শাশুড়ী খুসী হইয়া টাকাটা নিজের বাক্সে তুলিতে গেলেন; চারু বলিল, "ভাই মানুষ করে বাপের কাছে টাকা নিতে আমি কিছুতেই পারব না।"

বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া গেল। শাশুড়ী বলিলেন, "তবে ও মা-খেকো রাক্ষসকে এখনি বাড়ী থেকে বের কর। আমার সংসারে ঠাঁই হবে না।"

শাশুড়ীর গাল ভাইকে পাছে লাগে তাই গোপনে তাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া দেবতার কাছে মাথা কুটিয়া চারু খোকাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বাপকে জানাইল, "আমার শরীর এখন ভাল নেই। খোকাকে এখন তুমি রাখ, আবার আমি কিছুদিন পরে আন্‌ব।"

খোকা ফিরিয়া আসিল দেখিয়া খোকার জেঠি বলিলেন, "মাগো, এই বয়সেই ছুঁড়ি কি ধড়িবাজ হয়ে উঠেছে দেখেছ? আরো টাকা নেবার মৎলব, তাই ছুতো করে ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিলে।"

রুগ্ন পিতার তখন সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। কন্যার আচরণে তিনিও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ছেলের জেঠি মুখে দরদ দেখাইলেও ছেলেকে কোলে করিতে তাঁর হাতের বাত টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। অগত্যা চৌদ্দবৎসরের বালক অবিনাশই খোকার ভার লইল; কিন্তু দিদি ও জেঠির উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। মায়ের পেটের বোন যে এমন অসহায় অবস্থায় মানুষকে ফেলিয়া দিতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া মেয়েজাতের উপরেই সে আগুন হইয়া উঠিল। পিতার মৃত্যুর পর দিদি একবার লুকাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল, "খোকাকে আমার কাছে পাঠালে আমি দেখ্‌ব। তুমি ছেলে-মানুষ পার্‌বে না।" অবিনাশ রাগিয়া লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল, "দশমাসের ছেলে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এখন তিন চার বছরের ছেলে চেয়ে নাম কিন্‌তে হবে না। সে এখন মানুষ চিন্‌তে শিখেছে, জানই যে তোমার কাছে থাকতে চাইবে না। সাফাই গাইবার চেষ্টা আমি বুঝি। খোকার ভার এতদিন যে বয়েছ, সে আরো কিছুদিন পার্‌বে।"

দূত কথার উপর আর-একটু রং দিয়া চারুর শ্বশুরবাড়ীতে বলিয়া আসিল। কলহের আগুন এমন দাউ দাউ [illegible] জ্বলিয়া উঠিল যে নাবালক ভাই দুটির অনিষ্টের ভয়ে চারু আর কথাটি বলিল না। অবিনাশের মেজাজ গরম, কি জানি যদি আরো বেশী শক্ত কিছু বলিয়া বসে, তাহা হইলে তারই অভিভাবকহীন মাথায় বাজ পড়িবে। কাজেই চারু কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। জেঠি আসিয়া অবিনাশকে বলিলেন, "দেখ্‌লি চারুর চাল! ধরি মাছ না ছুঁই পানি।"

অবিনাশ ভাবিল সত্যই তাই। কিন্তু জেঠির উপর শ্রদ্ধাটা তার বাড়িয়া উঠিল না।

পুত্রকন্যার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত না করিয়া পিতা-মাতার যে মরিবারও অধিকার নাই, এমন কথাও তার মনে উদয় হইয়াছিল। অবিনাশ ভাবিল, যে লোক চোখ বুজিলে ছেলেমেয়ের দাঁড়াইবার ঠাঁই মেলে না, সে বিবাহ করে কেন? পরপারের অধিবাসীকে মানুষ রেহাই দিয়া কথা বলে, কিন্তু অবিনাশ তাও দিল না। আর এপারের ত কথাই নাই। অসহায় শিশুভাইটি ছাড়া আর সকলেই তাকে দূরে ফেলিয়া গেল দেখিয়া কেবল মাত্র সেই ভাইটিকেই সে ভালবাসিতে শিখিল। পৃথিবীর আর-সকলেই হইল তার পর।

আঠারো বৎসর বয়সেই সংসারের অনেক অভিজ্ঞতা

সঙ্কল্প করিয়া অবিনাশ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কোনো মূল্যও নাই, সুখও নাই। তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায় খুঁজিতে সে রাজধানী কলিকাতায় আসিয়াছিল। সঙ্গে ছিল ছোট ভাইটি। যে ধনীর বাড়ীতে সকালে সন্ধ্যা খাটিয়া সে অর্থ উপার্জ্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল, তিনি তার অধ্যবসায় দেখিয়া একদিন তাকে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। এমন অযাচিত উপকার যে কেহ করিতে পারে একথা অবিনাশ বিশ্বাস করিত না। সে বলিল, "আপনার টাকা আমি শোধ করব কি করে?"

মনিব বলিলেন, "শোধ আবার কিসের জন্যে করবে? আমার ঘরে আমার ছেলের মত থাকবে, তা হলেই হল।"

অবিনাশ তবু প্রশ্ন করিল, "আপনার কি ছেলের অভাব আছে?"

এমন আহম্মকের মত প্রশ্ন তিনি কখনও শোনেন নাই, বলিলেন, "ছেলে থাকলেই কি ছেলের সখ মানুষের মেটে? দেখছ না তুমি আমাদের স্বজাতি, সহজেই আপনার হতে পার।"

অবিনাশ বলিল, "ওঃ হ্যাঁ, এখন বুঝেছি।"

বোঝাপড়া হইয়া গেল বটে, তর্ক উঠিল শুভকার্য্যটা সারিয়া যাওয়া ভাল কি আসিয়া করা ভাল। গৃহিণী বলিলেন, "পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই। হাতে পায়ে শেকল বেঁধে তবে ছাড়তে হয়। নইলে পালাবার পথ পেলে ফিরবে না। বিগড়াবার জন্যে ত ওরা হাঁ করে আছে, বিয়ে-থাওয়া দিয়েই না কোনো রকমে বাগে রাখা যায়।"

কর্ত্তা বলিলেন, "বিগড়োবার জন্যেই যদি অত উৎসাহ তবে ঝাড়া হাতেই বেরুতে দাও। মেয়েটাকে সুদ্ধ জলে ফেলে কি লাভ? ফিরে যদি আসে, তবেই না হয় মেয়ে দেওয়া যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওসব তুমি বোঝো না। কপালে মেয়ের যদি দুঃখু লেখা থাকে, তবে কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু মন্তর না পড়িয়ে ছেড়ে দিলে টাকাগুলো নাহক জলে যাবে।"

কর্ত্তা কিন্তু গৃহিণীর পরামর্শ শুনিলেন না। তিনি ভাগ্যের উপর কর্ত্তার ভবিষ্যৎ-চিন্তার ভার না দিয়া নিজেই লইলেন। দু বৎসরের মেয়েকে আর চার পাঁচ বৎসর কোনো প্রকারে ঘরে রাখা চলিবে। ততদিন না হয় বিলাত-ফেরতের ভাবীবধূর উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া যাইবে। কর্ত্তার প্রস্তাবে অবিনাশ একটু অতিরিক্ত উৎসাহ ও আনন্দ দেখাইয়াই সাগর পাড়ি দিল। কর্ত্তা একটু সন্দিগ্ধ হইলেন, কিন্তু নিজের সুবিবেচনায় নিজের উপর খুসী হইয়া উঠিলেন।

খোকা তখন সাত আট বৎসরের ছেলে। গ্রামের পাঠশালে দুই চার আনা খরচ দিয়া এবং দুবেলা দুইমুঠা ভাত দিয়া তাহাকে দিয়া অনেক ফাইফরমাস খাটানো চলে। গরুটা চরাইয়া আনা, কোলের ছেলেটা ধরা, দুপয়সার নুন তেল কিনিয়া আনা ইত্যাদি অনেক ছোটখাট কাজ পয়সা খরচ করিয়া করাইতে মানুষের গা কস্‌কস্ করে, কিন্তু অমনি লোক পাইলে খুসী হইয়া উঠে। অবিনাশ বিলাত যাইতেছে, একটা হোম্‌রাচোম্‌রা হইয়া দেশে ফিরিবে; এখন তাকে হাতে রাখার চেষ্টাও ভাল। কাজেই চারুর শাশুড়ী এবং অবিনাশের জেঠি দুই শিশুবৎসলার হৃদয়ই করুণায় পুরিয়া উঠিল। ঘরের ছেলে কি কখনও ফেলা যায়? না হয় লাগিলই তার জন্য দু দশ টাকা! খোকার দুই দিকেই সাদর আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিল। চারু শাশুড়ীর মনটা নরম হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি খোকাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

জেঠি বলিলেন, "টাকার গন্ধ পেয়েছে আর আমায় দেবে? বাবা, ও মেয়ে তেমন মেয়ে নয়। শকুনের মত গন্ধে গন্ধে ওড়ে। আর অবিনাশকেও ধন্যি বলি, আমি সাক্ষাৎ জেঠি থাকতে কুটুমের ঘরে ভাইটাকে পাঠালে মান-ইজ্জত আর রইল না।"

অবিনাশ ভাবিল, টাকাই যখন টানের কারণ, তখন যে রাখে-রাখুক, সবই সমান। দিদির যে এতটুকুও প্রাণের টান আছে আর তাদেরই অমঙ্গলের ভয়ে যে সে এতদিন সে টান দেখাইতে পারে নাই, এমন বিশ্বাস অবিনাশের মনে কোনো দিন স্থান পায় নাই। সে বিশ্বাস গড়িয়া উঠিল তার বুকে, যে দিদির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তার আঁচলের আড়ালে তার হৃদয়ের উত্তাপে প্রাণ পাইয়া আর তার চোখের সুধাধারায় স্নান করিয়া ছেঁড়া কাঁথায় স্বর্গসুখ বাড়িতে লাগিল।

ব্যারিষ্টার হইবে বলিয়াই অবিনাশ বিলাত গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছাইয়াই সে ডিগ্রি লইবার মৎলবে কেম্ব্রিজের কলেজে পড়িতে চলিয়া গেল। কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিতে করিতে ভাবী বধূর বয়স বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের চিরন্তন প্রথা-মত হু হু করিয়া আকাশ পাতাল ছাড়াইয়া চলিল। পুরুষের বয়স ত সহজে বাড়িতে চাহে না, কাজেই অবিনাশ নিশ্চিন্ত মনে নব নব পথে জ্ঞানসঞ্চয়ের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। সে ভাবী শ্বশুরকে জানাইল, যে-দেশে জ্ঞানভাণ্ডার লুটাইতেছে, সেখানে আসিয়া দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়াই যদি না কুড়াইলাম, তবে আমার বুদ্ধিকেও ধিক্ জীবনকেও ধিক্।

কিন্তু জামাইয়ের জ্ঞানের বস্তার চাপে মেয়ের বয়সও চাপা পড়িবে না, মাথাও উঁচু বই নীচু হইবে না; সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অবিনাশের জ্ঞানস্পৃহায় বাধা দিয়া ফিরিবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিলেন। অবিনাশ জানাইল, বিলাতের মাটি মাড়াইতে আর শখ চামড়ার চমক্ দেখিতে সে আসে নাই, কিছু একটা করিয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছে। যাঁর হাতে ভাণ্ডারের চাবী তিনি ভাবিলেন, পেটের ভাত বন্ধ হইলেই মুখের কথার খই ফোটা থামিয়া যাইবে; কাজেই খবর পৌঁছিল বেশী দেরী করিলে টাকা বন্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই।

কোনো কিছুর জোর না থাকিলে মানুষ জোর গলায় কথা বলিতে পারে না। তাই দেশ ছাড়িয়া বিলাত যাইবার সময় অর্থ ও বিদ্যায় দরিদ্র অবিনাশ মনিবের কথায় কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। আপাতত যা পাওয়া যায় তাই লাভ, পরের কথা পরে হইবে, এই রকমের একটা চিন্তাই তখনকার মত তাহার মনে আসিয়াছিল। কিন্তু বিলাতে কয়েক বৎসর কাটাইবার পর সে মোটা রকম ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াই সুর বদ্‌লাইয়া ফেলিল। খরচের টাকা বন্ধের খবর পাইয়া তাই অবিনাশ লিখিল, "আপনি আমাকে এতদিন যে সাহায্য করিয়াছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। মহৎ লোক ভিন্ন এমন নিঃস্বার্থভাবে পরকে কেহ সাহায্য করে না। এবং অতি নীচ ভিন্ন কেহ বিনা বাক্যব্যয়ে পরের টাকা আত্মসাৎ করে না। আমি দেশে ফিরিয়াই অল্পে অল্পে আপনার সমস্ত টাকা শোধ করিব।"

ভাবী জামাতার এই-রকম পত্র পাইয়া কন্যাকে তাহার আশায় আর কি করিয়া কুমারী রাখা চলে? কন্যার পিতা অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘ আট বৎসর পরে অবিনাশ যখন দেশে ফিরিল, তখন আর তাহার পুরাতন মনিববাড়ী যাইবার দরকার হয় নাই। ডাক্তার হইয়া চাকরী লইয়াই সে জাহাজে চড়িয়াছিল। কিন্তু পশার জমাইবার মত টাকা হাতে আসিবামাত্র সে চাকরী ছাড়িয়া প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়ী রাখিয়া জম্‌কাইয়া স্বাধীন ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিল।

এবার তাহার যে জীবন সুরু হইল পল্লীগ্রামের দুঃখী বালক অবিনাশের জীবনের সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সে জীবনে অবিনাশ অনেক দুঃখভোগ করিয়াছিল, তাই সেই দুঃখ একেবারে ভুলিবে বলিয়াই বোধ হয় এবার দেশের মাটিতে পা দিয়া সে আর তার পুরাতন জীবনের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। আজ সে যেন এক সম্পূর্ণ নূতন মানুষ; অতীতের তাহার কাছে আর কোনো দাবী নাই। অবিনাশ আত্মীয়-স্বজনদের সকলকে ছাড়িয়া ভাবিয়াছিল, নূতন জায়গায় নূতন মানুষের মাঝখানে নূতন মানুষ হইয়া বসিয়া এইবার সে বুঝি জীবনের যা কিছু সবই নিজের মনের মত করিয়া গড়িতে পারিবে। অনেক সময় মানুষ মনে করে আমার চারিপাশের ক্ষুদ্র জগৎটাই কেবল দুঃখের আধার, এর সম্পর্ক কাটাইয়া আমার অদেখা বৃহত্তর জগতের আর-একটা নূতন কোণে গিয়া বাসা বাঁধিতে পারিলেই যেন সব দুঃখের শান্তি। সে ভুলিয়া যায় যে দুঃখের বীজ তার নিজের স্বার্থ নিজের অহমের মধ্যেই নিহিত; বাইরের জগতে সে বীজ এখনও অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায় নাই, তাই দুঃখও সেখানে দেখা দেয় নাই।

অতীতের স্পর্শমাত্র পাছে তার নূতন জীবনকে কলুষিত করিয়া তোলে তাই অবিনাশ কারুর দাবী গ্রাহ্য করে নাই, কোথাও দাবী করিতেও যায় নাই। কিন্তু যার জন্য তাহার অতীত দুঃখ অনেকাংশে দায়ী তাকেই সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। যে ছোট ভাইটিকে নিজের বুকের মধ্যে করিয়া সে পালন করিতেছিল; কেবলমাত্র যাহার অদর্শন সেই দীর্ঘ প্রবাসেও তাহাকে মাঝে মাঝে

উন্মনা করিয়া তুলিত, সেই ক্ষুদ্র মানুষটির টান তাহাকে একবার দিদির বাড়ী পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। অবিনাশ চাকর চোখের জলের ভিতর দিয়া, শতদলের আকুল ক্রন্দন অগ্রাহ্য করিয়া পল্লীগ্রামের সেই সুখনীড়ে ঝড় তুলিয়া ভাইকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল—অতগুলি স্নেহময় প্রাণের আকুল আহ্বানও তাহাকে একদিনের জন্য ফিরাইতে পারে নাই।

কিন্তু দুঃখ যে অর্থের ছায়া। অবিনাশ যেমন চাহিয়াছিল, জীবন ত তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিল না। যে অর্থ সকল সুখের উৎস বলিয়া সে মনে করিয়াছিল, প্রাণ পাত করিয়া সে অর্থ ত অজস্র সংগ্রহ করিল, কিন্তু সুখ মিলিল কই? ওই অর্থের মোহে সে নিজেও কাঁদিল, অনেককেও কাঁদাইল, কিন্তু যার সন্ধানে এত বেদনার সৃষ্টি তার দেখা ত আজও পায় নাই। অর্থ ঐশ্বর্য্য ত জীবনের শূন্যতা পূরণ করিতে পারিল না। দুঃখের জীবনে ভুল করিয়া যাহাকে চাহিয়াছিল, সুখের জীবনে আজ দেখিল তাহার এতদিনের বেদনা এর জন্য নয় সে আরো কোনো সাধনার ধন। কিন্তু কোন্ পথে তাহার সন্ধান মিলিবে সে খবর অবিনাশ পায় নাই। তাই অন্ধের মত এই অরণ্যেই সে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে।

করুণাদের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় অবিনাশ ভাবিয়াছিল, শতদলের এই অভদ্র আচরণের জন্য তাহাকে বেশ দু চার কথা শুনাইয়া দিবে। কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথেই নিজের এই সঙ্কল্পের কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল; শতদলের ত্রস্ত সঙ্কুচিত মূর্ত্তিকে কোণে ঠেলিয়া দিয়া করুণার দৃপ্ত উজ্জ্বল রূপ যে কখন অবিনাশের মন জুড়িয়া বসিয়াছিল, তা সে নিজেই টের পায় নাই।

খাইবার সময় যখন শতদলের সঙ্গে অবিনাশের দেখা হইল, শতদল তখন ভয়ে লজ্জায় কাঠ হইয়া গিয়াছে। অন্যদিন অবিনাশকে অনেক অনুরোধ করিয়া সে এটা ওটা খাওয়াইত, পারিবারিক কুশলপ্রশ্ন করিত, সাংসারিক কুশলপ্রশ্ন করিত, সাংসারিক নানা ব্যবস্থার বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ চাহিত, আজ কিন্তু তার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইতেছিল না। যদি শতদলের গলার স্বরেই তার আজকার অপরাধের কথাটা অবিনাশের স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে! না জানি তাহার এই নির্ম্ম বিচারকটি কি গুরুদণ্ডই দিবে!

টেবিলে খাবার সাজানো ছিল, পাশে দাঁড়াইয়া শতদল চামচে করিয়া নিঃশব্দে অবিনাশের প্লেটে একে একে সব-রকম ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পরিবেষণ করিতেছিল। পরিমাণ সম্বন্ধে সে কোনো প্রশ্নই করিতেছিল না, অবিনাশও সে দিকে নজর না দিয়া খাইয়া যাইতেছিল। কি যেন একটা সমস্যার পূরণ করিতে তাহার মন ব্যস্ত ছিল শতদলের দিকে এতক্ষণ তাহার চোখই পড়ে নাই। হাঁটায় করিয়া দুইটা মালপোয়া তুলিয়া অবিনাশের পাতে দিতেই হঠাৎ শতদলের ভারী চাবির গোছাটা টেবিলের উপর ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। অবিনাশ মুখ তুলিয়া শতদলের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তুমি ত আছ।"

কথাটার ঠিক অর্থ না বুঝিলেও শতদলের শ্যামাভ মুখখানি বিচারের ভয়ে মুহূর্ত্তে রাঙা হইয়া উঠিল তাহার অপরাধীর মত ভীরু চোখ দুটির দৃষ্টি মাটির দিকে নামিয়া পড়িল। অবিনাশ শতদলের সঙ্কোচের দিকে কোনো রকম নজর না দিয়া বলিল, "শতদল, তুমি খোকাকে চিঠি লেখ না?"

শতদল বিস্মিত হইয়া চোখ তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, লিখি ত। কেন?"

অবিনাশ যেন এতক্ষণে একটা কূল পাইল। সে বলিল, "জান, আমি বিলেত যাবার আগে হারিণী-বাবুর পাশের বাড়ীতে থাকতাম। উনি আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। আবার এতদিন পরে ওঁদের কাছেই এসে পড়েছি, পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে ওঁদের একদিন আমাদের এখানে নেমন্তন্ন করা উচিত।"

পুরাতনের প্রতি এমন প্রেম যে তাহার এই মানুষটির আছে, শতদল তাহার কোনো পরিচয় এতদিন পায় নাই। কিন্তু আজ যখন সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শতদলের মুখের দিকে তাকাইল, তখন শতদলকে বলিতে হইল, "হ্যাঁ পুরাণো বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আদর যত্ন করা উচিত বৈকি।"

কিন্তু বন্ধুপ্রীতির এই নিদর্শনের সঙ্গে শতদলের চিঠির কি সম্পর্ক সেটা সে বুঝিল না। অবিনাশ বলিল, "তুমি ত চিঠি লিখতে জান, করুণা-অরুণাকে নেমন্তন্ন করার ভারটা তোমারই নেওয়া উচিত। বেশ ভদ্র বিনীত

ভাবে একটা চিঠি লিখে দিও, আমি পাঠিয়ে দেব। যদি না পার ত বল আমিই একটা লিখে দি, তুমি নকল করে দিও।"

শতদল জানিত অন্য লোকেই অবিনাশকে নিমন্ত্রণ করে এবং সে যথাসম্ভব সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে। নিমন্ত্রণ করিবার এত আগ্রহ অবিনাশের আর কখনও দেখা যায় নাই। তিনচারবার পরের খাইয়া আসিয়া ভদ্রতার খাতিরে যদি বা কখনও করিয়াছে, তাও সে পুরুষ বন্ধুদের; সে ব্যাপারে শতদলের কোনো সম্পর্ক থাকে না। পরিচিত মেয়েদের আতিথ্যের প্রতিদান সে দিত গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া নয়ত থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাইয়া; কিন্তু সে দলেও কখনও শতদলের ডাক পড়ে নাই। অবিনাশের শিক্ষিত বন্ধু-জগতের সঙ্গে এই পল্লীবালার পরিচয় কোনোদিন হয় নাই। এতদিন সে ছিল অন্দরে অবিনাশের একটি দুঃখিনী পোষ্যা রূপে; যে সম্পর্কের দাবীতে সে সকলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত সে দাবী জানাইবার সাহসও তাহার হয় নাই, সুযোগও মিলে নাই। তাই আজ অবিনাশের এ অযাচিত অনুগ্রহে শতদল অবাক্ হইয়া রহিল। ভাবিয়া পাইল না কোন্ পুণ্যে তার এত উচ্চ পদ।

অবিনাশ আপন মনে আপনার নিমন্ত্রণপর্ব্বের চিন্তা করিতেছিল। শতদলের কোনো উত্তর না পাইয়াই কিছুক্ষণ পরে বলিল, "আস্‌ছে বৃহস্পতিবার ওদের ইস্কুল ছুটি। সেই দিন সন্ধ্যেতে করা যাক্, কি বল?"

যেন শতদলের পরামর্শেরই অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে। শতদল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সেই বেশ।"

আর কোনো পরামর্শ না করিয়াই অবিনাশ নিজের উপরের ঘরে চলিয়া গেল। তখনও তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল ঐ করুণারই কথা।

বিলাত যাইবার আগে যে-সব মেয়েদের সঙ্গে অবিনাশ পরিচিত ছিল, তাহার অধিকাংশই তাহার খুড়ি জেঠি মাসি পিসি। তাহাদের চিন্তায় সে কোনো দিন মস্তিষ্ককে বেশী খাটায় নাই। কিন্তু নিজে তাহাদের ভাবনা স্বেচ্ছায় না ভাবিলেও তাহারা সুবিধা ও সুযোগমত অবিনাশকে ভাব হইতে ছাড়ে নাই। তাহাদের ব্যবহারে অবিনাশের স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে যে মোটামুটি ধারণাটা হইয়াছিল, রমণীসমাজের পক্ষে সেটাকে গৌরবজনক বলা চলে না। অবিনাশ বলিত, "আমাদের দেশের মেয়েরা জোঁকের জাত; যতক্ষণ রক্ত শুষ্‌তে পারে ততক্ষণ ধরে থাকে, তার পরেই সরে পড়ে।"

তাহার নিজের সমসাময়িক মেয়েদের ত কোনো একটা অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তাহার মনে হইত না। অবিনাশ দেখিত, তাহারা যতদিন শিশু থাকে, শিশুর মত খেলিয়া বেড়ায়, তারপর পিতামাতা চোখ বাঁধিয়া যে সংসারে ছাড়িয়া দেয়, অন্ধের মত সেইখানেই ঘুরিয়া মরে। শুধু অন্ধ কেন, জড় বলিলেও চলে। তাহারা দুঃখে কথা বলিতে জানে না, পথ দেখিয়া চলিতে জানে না, প্রাণের ডাক শুনিতে পায় না। যাহার সঙ্গে বাঁধা থাকে সে যদি মাথা তুলিয়া হাঁটে তবে তাই অনুসরণ করে, সে যদি ধুলায় পঙ্কে লুটাইয়া পড়ে তবে সেখানেই মুখ গুঁজিয়া পড়ে। আর এই অন্ধের নড়ীটি হারাইলে পরের দ্বারে কাঁদিয়া মরে। ভাগো দুর্দ্দশা থাকিলে অনন্ত দুর্দ্দশা হয়, নয় ত জড়পিণ্ডের মত দিন কাটিয়া যায়। শেষে একদিন এই তাহার জেঠি-খুড়ির মত জোঁক হইয়া উঠে।

তাহার যে দিদিটির মধ্যে খনির গর্ভের হীরার মত অনেক গুণ ছিল, তাহার পরিচয়ের সৌভাগ্য অবিনাশের ঘটে নাই, দিদির মেয়ে শতদলের পরিচয় লইতে অবজ্ঞায় তাহার মুখ ফিরিয়া যাইত, আর যে-সব নীরব মনকে সে জড়ের দলে ফেলিয়াছিল, তাহারা ত কোনো দিন তাহার যথেষ্ট কাছে আসেই নাই।

কলিকাতায় যে রমণীসমাজের সঙ্গে অবিনাশ পরিচয় করিল, তাহারাও ত অবিনাশকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে সত্যই যাহাদের শিক্ষা আছে তাহাদের আড়ম্বর নাই, তাই তাহারা পিছনে থাকিতেই ভালবাসে। কিন্তু শিক্ষার গর্ব্ব লইয়া রঙীন ফানুসের মত যাহারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সাধারণ মানুষের মত তাই তাহাদের সঙ্গেই অবিনাশের সহজে পরিচয় হইয়াছিল। সুখের আশায় তাহাদের পিছনে সে অনেক ঘুরিয়াছে, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছে, তাদের এ চমক্ কেবল গিল্‌টির।

দরিদ্রের ঘরের এই অনাড়ম্বর মেয়েটিকে দেখিয়া অবিনাশ এতকাল পরে সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

এর বেশভূষায় মানুষধরা ফাঁদের বাহুল্য নাই, মন ভুলাইবার জন্য কথার বিচিত্র বাঁধুনি নাই; কিন্তু ধনীর মেয়ের যে তেজ নাই, এর তা আছে। অবিনাশের সবচেয়ে বিরক্তি বোধ হইত তখন, যখন সে দেখিত তাহার পরিচিতারা তাহার মত ধনী গুণী ও খ্যাতনামাদের তুষ্ট করিবার জন্য স্বচ্ছন্দে নিজেদের মত বলি দিত। তাহাদের কথাবার্ত্তায় বোধ হইত এইসব তথাকথিত গুণীদের প্রতি কথায় প্রতি কাজে যেন তাহারা মুগ্ধ, এদের তুষ্ট করিতে পারিলেই যেন তাহাদের জীবন ধন্য। কিন্তু তবু এই মিথ্যা স্তুতিবাদে অবিনাশ এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে করুণার আজকার স্বাধীন মতানুবর্ত্তিতায় তাহার অহমিকায় ঘা লাগিয়াছিল। অবিনাশের ধারণারও এটা অতীত ছিল, যে, তাহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কোনো কাজ করা করুণার মত মেয়ের সম্ভব। এই আঘাতটাই আবার অবিনাশকে ক্রমাগত করুণার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

অবিনাশের গর্ব্ব ছিল সে এত বড় কলিকাতা সহরের অসংখ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার ফাঁদে পা দিয়াও ধরা পড়ে নাই, তাহার ধনমুগ্ধ সুন্দরীদের পূজাতেও ভোলে নাই; কিন্তু আজ তাহারই মন তাহার অলক্ষ্যে এই দরিদ্রের কন্যার জন্য ফাঁদ পাতিতে বসিল।

প্রথম দর্শনেই অবিনাশ করুণার মধ্যে এমন একটা মানুষের পরিচয় পাইয়াছিল, যাহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাই পুরাতন পরিচয় ঝালাইয়া ইহাকে ভাল করিয়া চিনিবার জন্য সে ঘন ঘন যাওয়া আসা সুরু করিল। যে শতদলকে সে এতদিন আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই সূত্রে যে এই মেয়েটিও তাহাদের বাড়ী আনাগোনা করিতে পারে, এই ভাবিয়া সেই শতদলকেও বাহিরে টানিয়া আনিল। আজ তাহাকেই গ্রন্থকর্ত্রীর পদে বসাইয়া সে তাহার প্রথম যৌবনের পরিচিতাকে নিমন্ত্রণ করিতে উদ্যোগী হইল।

তবু ঘুমাইতে যাইবার সময় অবিনাশের মনে খোঁচার মত এই কথাটাই বিঁধিতেছিল যে করুণা স্বনামধন্য চিকিৎসক অবিনাশকে উপেক্ষা করিয়া তাহার দুঃখিনী আত্মীয়া শতদলকেই প্রধান স্থান দিয়াছে।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

নটরাজ শিব

নটরাজ শিবের মূর্ত্তিগুলি ভারতীয় ভাস্কর্য্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে নটরাজ শিব অত্যন্ত পরিচিত দেবতা, উত্তর ভারতে তাঁহার প্রাদুর্ভাব ততটা নহে। বাঙ্গালা দেশেও যে এক সময়ে নটরাজ বিশেষ আদৃত ছিলেন এই সংবাদ অনেকে অবগত নহেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতী পত্রিকায় লঙ্কায় নটরাজ শিব শীর্ষক এক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। অব্যবহিত পরে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এক নটরাজ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। যোগেন্দ্রবাবু তদীয় প্রবন্ধের সহিত নটরাজ মূর্ত্তির এক অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহার আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক মাননীয় ব্যক্তি নটরাজ মূর্ত্তিকে যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে নটরাজ শিবের মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশের মনীষীগণের পরিচিত নহে।

নটরাজ মূর্ত্তি শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মূর্ত্তি। ভারতীয় ভাস্করগণ কোন কোন নটরাজ মূর্ত্তিতে এই নৃত্যের লালিত্য এবং ছন্দ এত সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে পুলকিত সৌন্দর্য্যবিচারকগণ তাঁহাদিগকে অসংখ্য সাধুবাদ না দিয়া পারেন নাই।

ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলা—প্রাচীন কালের বঙ্গ ও সমতটের হৃদয়—হইতে নটরাজের অনেকগুলি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সারা বাঙ্গালায় তাঁহার মূর্ত্তি অন্য কোথাও এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি।

কি করিয়া নটরাজ প্রাচীন বঙ্গে ও সমতটে আসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেনই বা রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে তাঁহার প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয় নাই; এই সমস্যার যথাযথ উত্তর দেওয়া কঠিন।

বরেন্দ্রে এক শ্রেণীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা এযাবৎ "মা ও ছেলে"র মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে এই মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে প্রসূতি সদ্যপ্রসূত সন্তান সহ শয্যায় শুইয়া আছেন এবং পরিচারিকাগণ তাঁহাদের

নটরাজ মূর্ত্তি—দশবাহু—শঙ্করবন্ধে প্রাপ্ত।

শুশ্রূষা করিতেছে। উপরে শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি, কার্ত্তিকেয় গণেশের মূর্ত্তি এবং কখনও কখনও নবগ্রহ ও সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তিও ছোট ছোট করিয়া উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মূর্ত্তিগুলিকে কেহ কেহ "মায়া দেবী ও বুদ্ধ," কেহ কেহ বা "কৃষ্ণ-যশোদা" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাদের সঠিক স্বরূপ কেহই স্থির করিতে এ পর্য্যন্ত পারেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ইংরেজী ভাষায় লিখিত সংগ্রহতালিকায়ও (catalogue) এই মূর্ত্তিগুলি "মা ও ছেলে" মূর্ত্তি (Mother and Child) বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৬, ৪৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু আমার বোধ হয় এই মূর্ত্তিগুলি শিবের সদ্যোজাত রূপের মূর্ত্তি। সদ্যোজাতের প্রচলিত ধ্যানের সহিত ইহাদের মিল নাই সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যেই এইসকল মূর্ত্তি যে সদ্যোজাত শিবমূর্ত্তি, তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। যাক্—সদ্যোজাতের স্বরূপ নির্ণয়ের স্থান ইহা নহে। এই "মা ও ছেলে" মূর্ত্তির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে আমি যতদূর অবগত আছি, এই মূর্ত্তি এই পর্য্যন্ত বরেন্দ্রের সীমার বাহিরে পাওয়া যায় নাই। দিনাজপুর বগুড়া রাজসাহী জেলায় এই "মা ও ছেলে" মূর্ত্তি অসংখ্য পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন রাঢ়-বঙ্গ-সমতটে এই দেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল এমন কোন নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। এই "মা ও ছেলে" বা সদ্যোজাত মূর্ত্তি যেমন বরেন্দ্রের নিজস্ব, নটরাজ শিবও তেমনি সমতট-বঙ্গের নিজস্ব ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এখনও রহস্যাবৃত, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণে এইরূপই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

নটরাজ, নটেশ, নাটেশ্বর, নর্ত্তেশ্বর ইত্যাদি নাম একই দেবমূর্ত্তির। ত্রিপুরা জেলায় ভারেল্লা নামক স্থানে আবিষ্কৃত নটরাজ মূর্ত্তির পাদপীঠে বিস্তৃত খোদিত লিপি ছিল, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহার পাঠ প্রকাশিত করিয়াছি। এ লিপিতে দেবতা নর্ত্তেশ্বর ভট্টারক বলিয়া উল্লিখিত। মোটামুটি বর্ত্তমান শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের কতকাংশ ও ত্রিপুরা-নোয়াখালি জেলা লইয়া অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পূর্ব্বস্থ এবং সমুদ্রের উত্তরস্থ সমতল ভূভাগ লইয়া প্রাচীন সমতট রাজ্য গঠিত ছিল। বর্ত্তমান ঢাকা ডিভিসন (ময়মনসিংহের উত্তরাংশ বাদ দিয়া) প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের স্থানীয়। এই সমতট-বঙ্গে নটরাজ তাঁহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। বিক্রমপুরে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী রামপালের সন্নিহিত এক গ্রাম নাটেশ্বর বলিয়া অভিহিত। এই গ্রামে এক প্রকাণ্ড দেউলের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। তাহার আশপাশ হইতে কয়েকখানা উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই দেউল হইতে এখনও নটেশ শিব-

মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু গ্রামের নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে নটেশই এই দেউলের প্রধান দেবতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া মহকুমায় (ত্রিপুরা জেলায়) এক গ্রামের নাম এখনও নাটঘর এবং তথায় নটেশ শিবমূর্ত্তি এখনও পূজা পাইতেছেন। এইসকল দেখিয়া মনে হয়, সমতট-বঙ্গে নটেশের বিশেষ সমাদর ছিল।

মৎস্যপুরাণের ২৫৯তম অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) নটরাজ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের পদ্ধতি সবিস্তারে দেওয়া আছে। কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণের এই স্থানটির মূল এবং অনুবাদ এলোমেলো ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। যাহা হউক, মৎস্যপুরাণের বর্ণনা হইতে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উদ্ধার করা যায়। নটরাজের হাত চারিখানা, আটখানা, দশখানা বা ষোলখানা হইতে পারে। দশবাহু মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তগুলিতে—খড়্গ, শক্তি, দণ্ড, ত্রিশূল এবং বর-মুদ্রা; আর বাম হস্তগুলিতে—ঢাল, নরকপাল, সর্প, খট্বাঙ্গ এবং জপমালা থাকিবে। ষোড়শ-বাহু মূর্ত্তিতে দশ-বাহু মূর্ত্তির আয়ুধসমূহ ছাড়া শঙ্খ, চক্র, গদা, ঘণ্টা, বিষ্ণু-ধনু এবং বিষ্ণুবাণও থাকিবে। ত্রিলোকহর্ষণ নটরাজের মূর্ত্তির চারিদিকে দেব-দানব-রক্ষ-যক্ষ ইত্যাদিকে স্তবে নিযুক্ত এবং সম্ভ্রম-প্রণত দেখাইতে হইবে। কঙ্কালরূপী ভৃঙ্গী ঋষি ভূত-বেতালগণ সহকারে দেবদেবেশের সহিত নৃত্যে যোগ দিতেছেন, তাহাও দেখাইতে হইবে।

ঢাকা ও ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত নটরাজ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমি জানি। ইহা ভিন্ন অন্য কোথাও নটরাজ মূর্ত্তি আছে বলিয়া যদি কেহ জানেন তবে দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

১। রামপালে বল্লালবাড়ীর বিস্তৃত দক্ষিণ পরিখার অব্যবহিত দক্ষিণে একটি নটরাজ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা শ্রীযুক্ত রায় রমেশচন্দ্র গুহ বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়া এক্ষণে ঢাকা মিউজিয়মে আছে। আবিষ্কার-স্থানের অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয়, রামপালের ক্রোশেক-বিস্তৃত বিপুলায়তন দীর্ঘিকার উত্তর তীর অধিকার করিয়া এই নটরাজের মন্দির সংস্থিত ছিল। বল্লালের সীতাহাটি তাম্র-শাসনের প্রারম্ভেই নৃত্যপরায়ণ অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের বন্দনা

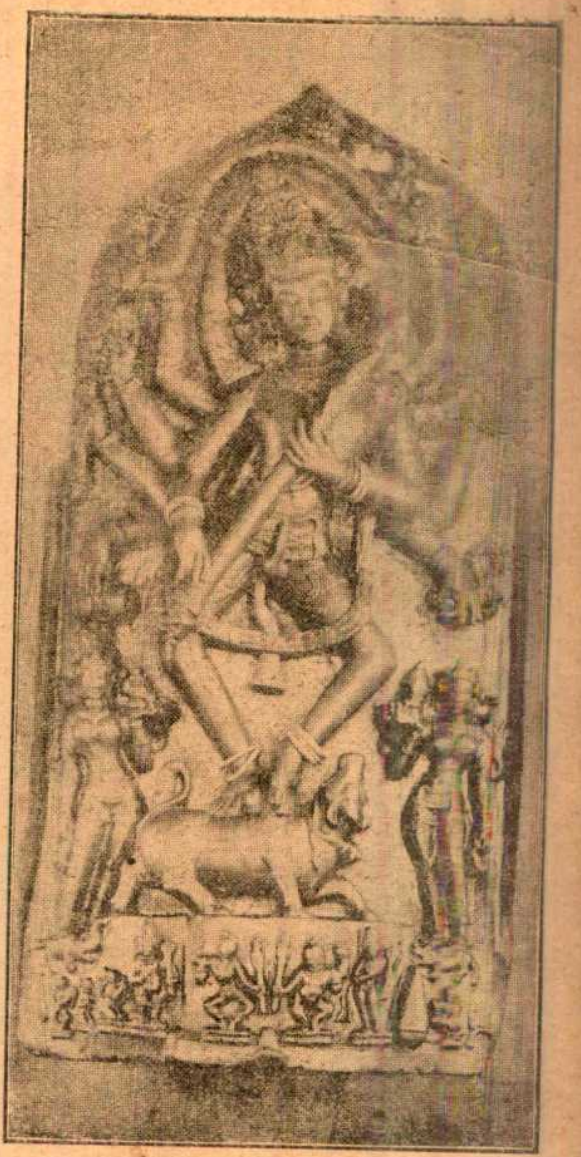

নটরাজ মূর্ত্তি—দ্বাদশবাহু—নাটঘর গ্রামে পূজিত।

পাওয়া যায়। এই নটরাজ মূর্ত্তি যে সেনবংশেরই প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কে বলিবে?

২। রামপাল দীঘির কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত শঙ্করবন্ধ গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত নটরাজ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত জগদীশকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়া ঢাকা মিউজিয়মে আছে।

৩। রামপাল দীঘির প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বলৈ বা রাণীহাটির দেউল-সন্নিহিত [illegible]

আবিষ্কৃত নটরাজ মূর্ত্তি। ইহা এক্ষণে বলৈ গ্রামের পূর্ব্বে অবস্থিত আউটসাহি গ্রামের শ্রীযুক্ত ইন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীর পুকুরের বাঁধা ঘাটে সংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে।

৪। লৌহজঙ্গ বা তারপাশার দুই মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী কলিকাল গ্রামে প্রাপ্ত অর্দ্ধভগ্ন নটরাজ মূর্ত্তি।

আমার নিকট এই মূর্ত্তির খবর পাইয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এইখানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পরিশেষে রাজশাহী মিউজিয়মে উপহার দিয়াছেন।

৫। ত্রিপুরা জেলায় বড়কামতা বা চান্দিনা থানার অধীন ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত খোদিত লিপিযুক্ত সুবৃহৎ নটরাজ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিখানা এক ফকীর ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল। লিপিযুক্ত পাদপীঠের অংশটি আমি ঢাকা সাহিত্যপরিষদের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তথায়ই আছে। দেবতার শরীরের ঊর্দ্ধাংশ-সমন্বিত বৃহৎ খণ্ডখানি সযত্নে সংগৃহীত হইয়া শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক ঢাকা মিউজিয়মে উপহৃত হইয়াছে।

৬। ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় নাটঘর গ্রামে পূজিত নটরাজ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি এখনও সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

৭। রামপাল দীঘির মাইল তিনেক দক্ষিণে চুড়াইন গ্রামের দেউল সন্নিহিত ডোবা হইতে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড নটরাজ মূর্ত্তির ভগ্ন নিম্নাংশ। এই ভগ্ন নিম্নাংশের আকার ও ওজন দেখিয়াই বুঝা যায় যে সম্পূর্ণ অবস্থায় এই মূর্ত্তি অন্ততঃ মানুষ-প্রমাণ উঁচু ছিল। এই ভগ্নাংশটি ঢাকা মিউজিয়মে আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে মূর্ত্তির অন্যান্য অংশ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই চুড়াইন দেউল হইতেই বিখ্যাত রজতময় বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে গিয়া ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও ঢালাই কার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন এই মূর্ত্তিখানা দেখিয়া আসিতে পারেন। আর্ট গ্যালারীর সংলগ্ন ঘরে ইহা রক্ষিত হইতেছিল বলিয়া জানি।

এই শেষ ৭নং মূর্ত্তিখানা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অন্য ছয়খানা মূর্ত্তিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর মূর্ত্তি দশবাহু-সমন্বিত এবং মৎস্যপুরাণে দশবাহু মূর্ত্তির হাতে যে যে আয়ুধ দেওয়া হইয়াছে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির হাতেও প্রায় তাহাই আছে। এই শ্রেণীর মূর্ত্তির স্বাভাবিক দুই হস্ত নৃত্য-ভঙ্গি প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সরল ভাবে রক্ষিত হস্তটিকে "গজহস্ত" বলে। এই গজহস্তের ললিতভঙ্গি এত মনোহর যে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান কঠিন। পাঠক চিত্রে তাহার কিছু আভাস পাইবেন। এই স্বাভাবিক দুই হস্তে বর ও জপমালা ছিল কি না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না, কারণ এই শ্রেণীর মূর্ত্তি মাত্র দুইটিই পাওয়া গিয়াছে এবং দুটিরই এই হাত দুখানি অল্পবিস্তর ভাঙ্গা। অন্যান্য হস্তগুলির আয়ুধ মৎস্যপুরাণের তালিকার সহিত মিলে। উপরের তালিকায় ১ম ও ২য় মূর্ত্তি এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ২নং থানার ছবি প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নটরাজ মূর্ত্তি দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট। ৩, ৪, ৫, ও ৬নং মূর্ত্তিগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর মূর্ত্তির তিন জোড়া হাতই বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য। ১ম জোড়া স্বাভাবিক হস্তদ্বয়। এই দুই হাত দিয়া দেবতা আড়া-আড়ি ভাবে দেহের সম্মুখে ধৃত বীণাযন্ত্র বাজাইতেছেন। ২য় জোড়া হাত শেষ নাগকে লেজ ও মাথায় ধরিয়া ছত্রাকারে মাথার উপর উঠাইয়া ধরিয়াছে। ৩য় জোড়া স্বীয় জটা-মুকুটের উপর উঠাইয়া দেবতা করতালি দিতেছেন বা অঞ্জলিবদ্ধ করিতেছেন। বাকী ছয়খানি হাতে বিভিন্ন শৈব অস্ত্র ধৃত। এই বিষয়ে একখানি মূর্ত্তির সহিত অপর-খানির মিল নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর মূর্ত্তির নিম্নেই নৃত্যপরায়ণ আনন্দোন্মত্ত বৃষ আছে। দেবতার উভয় পার্শ্বে গদা ও গৌরী দেবীর মূর্ত্তি এবং রোমহর্ষণ নৃত্য দেখিতে আগত বহু দেবদেবী ভূত প্রেত, নাগ ইত্যাদির মূর্ত্তি ঊর্দ্ধে ও নিম্নে বর্ত্তমান। এই বাহন বৃষ দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিগুলিকে উত্তর ভারতের মূর্ত্তি হইতে বিশেষিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের নটরাজ মূর্ত্তিগুলিতে শিবের পদতলে অপস্মার পুরুষ নামক দানব। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দাক্ষিণাত্যের বেশীর ভাগ মূর্ত্তিই চারিবাহুবিশিষ্ট। উত্তর ভারতে চারি-বাহু মূর্ত্তি নাই বলিলেই হয়।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বাদামীর ১নং গিরিগুহার প্রবেশদ্বারে এক ষোড়শবাহু বিশিষ্ট নটরাজ মূর্ত্তি আছে

এই মূর্ত্তির পশ্চাতে বাহন বৃষ উঁকি দিতেছে, দেখা যায়। ছত্রাকারে মস্তকের উপরে ধৃত শেষনাগও এই মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২০, ৫১৪ পৃষ্ঠায় বাদামি গিরিগুহা প্রবন্ধের চিত্র দ্রষ্টব্য।) কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পীর হস্তে নটরাজ মূর্ত্তি যেন একটু বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল। কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তর কাটিয়া শিল্পী তাণ্ডব নৃত্যের যে আনন্দ ও তন্ময়তা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, পাথরে তাহার জুড়ি ভারতের অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মান্দ্রাজের কোন কোন ধাতব নটরাজ মূর্ত্তি অবশ্য খুবই সুন্দর, কিন্তু পাথর কাটায় বাঙ্গালী শিল্পীর জিৎ। আর যাহাই হউক, বাঙ্গালী শিল্পীর হাতের নটরাজ মূর্ত্তিতে শিবের পায়ের তলের বৃষ ঘাড় বাঁকাইয়া দুই পা উঠাইয়া লাঙ্গুল দোলাইয়া যেরূপ উন্মত্ত আনন্দে প্রভুর নৃত্যে যোগ দিয়াছে, লোহার মত শক্ত পাথর খুদিয়া ততখানি আনন্দ বাহির করা যে-কোন দেশের যে-কোন যুগের শিল্পীর পক্ষে গৌরবজনক বিবেচিত হইত।

১ম শ্রেণীর নটরাজ মূর্ত্তির নমুনা শঙ্করবন্ধে আবিষ্কৃত নটরাজ এবং ২য় শ্রেণীর নটরাজ মূর্ত্তির নমুনা নাটঘরে পূজিত নটরাজ, এই দুই মূর্ত্তির ছবি প্রদত্ত হইল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

সুরের সাথে

সুরের সাথে গাঁথব তোমায়,
　　আমার মনের গীতে গীতে,
প্রাণের সনে যেমন মেশে
　　রক্তধারা ধমনীতে ॥
আমার ভোরের ভৈরবী আর
　　আমার সান্ধ্য পূরবীতে ॥
শ্রাবণ-রাতের বারিধারে
বসন্তেরই পুষ্পভারে,
শরতের অই স্বচ্ছ নীলে,
　　ছয়টি ঋতুর রাগিণীতে ॥
আমার তরুণ দিনের আলোয়
আমার ভরা সাঁঝের কালোয়,
তিমির রাতের স্তব্ধ গভীর
　　বাণীবিহীন কাহিনীতে ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

বাতাস-কলে কাঠ চেরা—

আমেরিকার এক ছুতারের বয়স হইয়াছে ৮৩ বছর। সে এখন করাত চালাইয়া কাঠ চিরিতে পারে না, বার্দ্ধক্যে তার অঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়া কি সে নিষ্কর্ম্মা হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়াছে? পরের রোজগার বসিয়া খাইতেছে? তেমন পরনির্ভর জাত ওরা নয়। আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মান-বোধ ওদের মজ্জাগত।

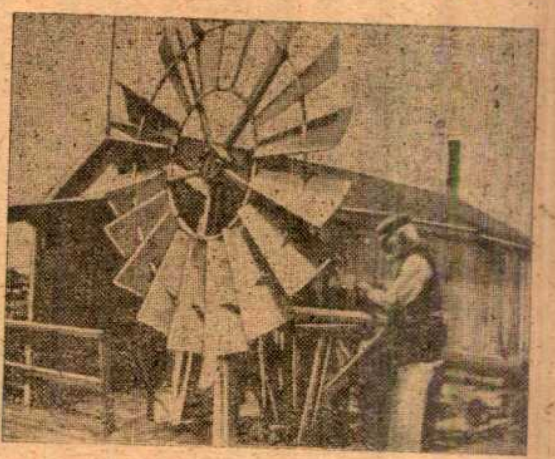

বাতাস-কলে ছুতারের কাজ—৮৩ বছরের বুড়ার উদ্ভাবন।

৮৩ বছরের বুড়ো ফন্দি খাটাইয়া বাতাসকে দাস করিয়াছে; ঘুর্ণী চাকায় বাতাস লাগিলে চাকা ঘোরে, আর সেই-সঙ্গে যদি করাত আঁটিয়া দেওয়া যায় তবে আপনা-আপনি করাত চলে। করাতের মুখে শুধু কাঠ খাওয়াইয়া গেলেই বিনাশ্রমে চেরাই হইয়া যায়। বুড়া বসিয়া বসিয়া অনায়াসে বাতাসকে দিয়া কাঠ চেরাইয়া লয়।

জায়গার মিতব্যয়—

যারা ছোট ঘরে থাকে তারা হাড়ে হাড়ে জানে দরকারী জিনিস-গুলা রাখিবার জায়গা করাই কি মুস্কিল। জিনিস শিকায় ঝুলাইয়া, টাঁড়ে শাঙায় তুলিয়া, আল্‌নায় দোলাইয়া, তবু ঘরের মেঝেয় পা বাড়াইবার গা মেলিবার ঠাঁই পাওয়া যায় না। বাক্সর বদলে আল্‌মারী রাজ করিয়া, থাকে থাকে উঁচু দিকে জিনিস রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া মেঝে খানিকটা আজাড় করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু তাতেও ত খুব বেশী সুবিধা হয় নাই। সম্প্রতি বুদ্ধি খাটাইয়া একটি খাট তৈরি হইয়াছে যার চার-পায়ার ফাঁকে টানা দেরাজ, শিথান ও পৈথান দুদিকে গুটানো টেবিল; খাটের চার পায়ার ফাঁকটা বুজানো হইয়াছে টানা দেরাজ দিয়া, তাতে ঘরকন্নার কাপড়-চোপড় ত থাকিবেই—এমন কি এক কুঠুরিতে একটা ষ্টোভ আর অল্পস্বল্প রান্নার বাসন-কোষনও থাকিতে পারিবে। শিথানের দিকে একটি ডালা খুলিয়া নীচে পাতিলেই সেটিতে টেবিলের কাজ চলে ও তার দু পাশে দুটা বিদ্যুৎ-বাতি জ্বালা যায় রাত্রে লেখাপড়ার জন্য; আর পৈথানের দিকেও একটি টেবিল করা যায়, তার ভাঁজে ভাঁজে ফুকোরে কোটরে লুকানো থাকে প্রসাধনের সাধন—আয়না চিরুণী

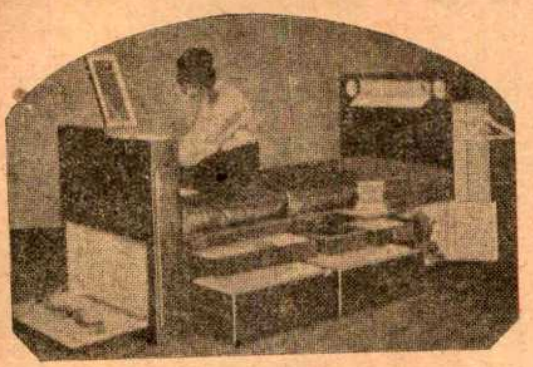

খাটের ভিতর ঘরকন্না।

বুরুশ গন্ধ পাউডার ইত্যাদি। পায়ের দিকের টেবিলের তলায় একটি বাক্স আছে তাতে জুতা ছাড়িয়া গুছাইয়া রাখা যায়। এই খাটের সুবিধা এই,—যে জায়গাটা বিছানায় জুড়িয়া থাকে সেই জায়গারই মধ্যে বাক্স টেবিল রান্নাঘর সব গুছাইয়া গুটাইয়া রাখা চলে, জিনিস ঘরময় ছড়াইয়া ঘর কুশ্রী ও জায়গা জোড়া হইয়া থাকে না। আমাদের দেশেও এমনি খাট আমাদের তৈরি করিতে হইবে।

টাকাকড়ির কারবারী—

যেসব কারবারীর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনিতে বা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয় তাঁরা দরোয়ানকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। একদিন দরোয়ান জামা ছিঁড়িয়া গায়ে একটু জখমের চিহ্ন করিয়া আসিয়া মুনিবের কাছে কাঁদিয়া পড়ে গুণ্ডারা মারিয়া টাকা কাড়িয়া লইয়াছে; যে

টাকা বহিবার নিরাপদ উপায়।

ঐ যাঃ! পকেট মেরেছে! টাকার থলি দেখিয়ে চলি!—
বুড়ো বুড়ো চোর-ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে?

একটা জামা ছিঁড়িতে ও গায়ে আঁচড় লাগাইতে মায়া করে, সে বলে পকেটমার পকেট মারিয়াছে। এর প্রতিকার হইতেছে টাকায় ব্যাগ পিয়নের কোমরের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধিবার ব্যবস্থা করা। তাতে পিয়ন সশরীরে স্বয়ং চুরি না গেলে টাকা খোয়া যাইবার সম্ভাবনা অল্প; কেউ সহজে ছিনাইয়া বা ছিপাইয়া টাকা লইতে পারিবে না।

আমেরিকার সন্ন্যাসী—

আমাদের গরম দেশে নগ্নদেহ সন্ন্যাসীর অভাব নাই। শুনিয়াছি হিমালয়ের গুহাতেও মহাত্মা সন্ন্যাসীদের নগ্নদেহে থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে তীর্থঙ্কর মহাবীর ও বুদ্ধদেব যে ত্যাগের ও বৈরাগ্যে মন্ত্র প্রচার করিয়া গেছেন, তাতে আমাদের দেশে সাঁচ্চা ও ঝুটা সন্ন্যা পঙ্গপালের ন্যায় প্রচুর হইবারই কথা। আশ্চর্য্যের বিষয় বিষয় আমেরিকাতেও একটি সন্ন্যাসী দেখা গিয়াছে। এঁর নাম উইলিয় পেষ্টার, আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশে এক কুটীরে নগ্নদেহে ই

আমেরিকার সন্ন্যাসী।

বাস করেন; মাঝে মাঝে একটা আলখাল্লা পরেন; ইনি সহ যাইবার সময় প্যাণ্টালুন-কোট পরেন; চুল দাড়ি যথেচ্ছ বাড়ি চলিয়াছে। ইনি প্রকৃতির আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার চে করিতেছেন, তাই খাবার সংগ্রহ করেন ভিক্ষা বা অরণ্যের স্বচ্ছন্দজ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া। ইনি অপরকেও প্রকৃতির আদিম বাহুল্যবর্জি প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দেন। এ ছা তাঁর তপস্যা ও সাধনার আর কোনো বিশেষ খবর জানা যায় নাই।

পুলের উপর খাল—

জলের উপর দিয়া মানুষ-প্রভৃতির ডাঙায় ডাঙায় হাঁটিয়া যাই সুবিধার জন্য পুল হয় দেখিয়াছি। য়ুরোপের সবই অদ্ভুত—সেখ জলের ডাঙায় ডাঙায় বহিয়া যাইবার জন্য পুল করা হইতেছে। কাটা দরকার হয় কোনো জলা জায়গার আবদ্ধ জল বহাইয়া ডোবা জায়গাটাকে বাহির করিবার জন্য, অথবা যেসব জায়গায় নাই সেইসব জায়গায় জল বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য। লম্বা হইলে খালের পথে নদী পড়িতে পারে। যেখানে খালে নদ কাটাকাটি হয়, সেখানে খালের ও নদীর দুয়েরই বিপদ ঘটার সম্ভা হয়—নদীর স্রোত নিজের খাত ছাড়িয়া কাটা খালকেই নিজের ব পথ করিয়া লইতে পারে, যেমন কলিকাতার দক্ষিণে কাটা খা গঙ্গাস্রোতের প্রধান পথ হইয়াছে ও পুরাতন পথ আদি-গঙ্গা প পরিণত হইয়াছে; তা ছাড়া নদীর জোয়ার-ভাটায় খালের জলেও ধরে বা টান পড়ে, তাতে খালের উদ্দেশ্য ঠিক পুরা মাত্রায় সিদ্ধ হ

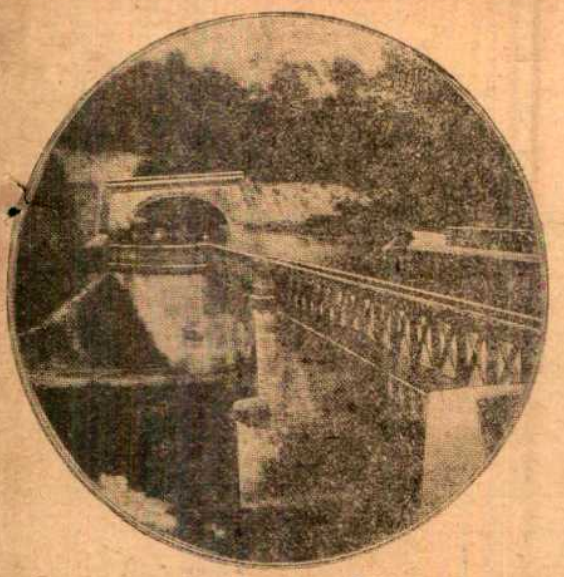

পুলের উপর দিয়া খালের নদী পার।

পারে না; অথবা খালের জল নদীতে পড়িয়া নদীকে বেগবতী ও বন্যপ্লাবিনী করিয়া তুলিতে পারে। ফ্রান্সের শোমঁ (Chaumont) দেশের একটি খালকে মার্ন নদী পার করিয়া লইয়া যাইবার দরকার হয়; তখন ইঞ্জিনিয়ারদের ঐ দুইরকম বিপদের সম্ভাবনা মনে পড়ে। বিপদ বা বাধা দেখিয়া দমিবার পাত্র ত য়ুরোপের লোক নয়—তারা মার্ন নদীর উপর পুল বাঁধিয়া খালের জলস্রোত সেই পুলের উপর দিয়া নদী পার করিবার ব্যবস্থা করিল, পুলের পথের উপর দিয়া খালের জল চলে আর পুলের ফুটপাথ হইয়াছে তার দুই কূল—সেই পাড়ে পাড়ে পায়ে হাঁটার পথ।

কুকুরের চুলছাঁটা—

কত দেশের মানুষ কত রকম করিয়া চুল ছাঁটে। ভারতে গোত্রচিহ্ন দেখিয়া গোষ্ঠীর লোককে সহজে চেনা যাইবে বলিয়া এক দুই তিন টিকি রাখা, গো-খুর প্রমাণ চুল রাখিয়া সব কামানো, মাথার চাঁদি কামাইয়া দুপাশে চুল রাখা প্রভৃতি কত-রকম ফ্যাশানের ফ্যাসাদ যে হইয়াছিল তার আর ইয়ত্তা নাই। এখন ইংরেজদের দেখাদেখি এক-আনা-পনেরো-আনা চুল কাটা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছাঁটা, চালি চ্যাপ্‌লিন্ ফ্যাশানে কো নাকের ফুটোর তলে একটু করিয়া গোঁপের ঝোপ রাখা প্রভৃতি ক কায়দাই দেখা যাইতেছে। ফরাশীরা ফ্যাশানের ওস্তাদ। তারা এখন নানাবিধ কায়দায় কুকুরের গায়ের লোমও ছাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটি লোমশ কুকুরকে ক্ষৌরী করিয়া তার লোমের বিচিত্র কেয়ারী করা হইয়াছে কেমন তাহা ছবিতে দেখা যাইতেছে। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?

ফ্যাশান-দুরস্তর চুল-কাটা কুকুর।

জলে ভাসিয়া পায়ে পাখা করার কসরৎ।

ভাসিবার আশ্চর্য্য শক্তি—

জলের উপর অনড় ভাবে চিত হইয়া ভাসা যায় হাত পা মাথা জলের উপর পাতিয়া বিছাইয়া দিয়া; মাথা তুলিলে পা ডোবে, পা তুলিলে মাথা তল হয়। মাথা পা তোলা যায় যদি দুই হাত বুকের দুপাশে মাছের পাখনার মতন নাড়িয়া জল সাঁতা যায়। কিন্তু হাত পা না নাড়িয়া একজন জাপানী কেইশীমোতো তোফা জলের উপর মাথা উঁচু করিয়া ভাসিয়া থাকিতে ও সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ধরিয়া পাখা নাড়িতে পারে। কেইশীমোতোর বয়স হইয়াছে নব্বই!

অনিদ্রা নিবারণ—

মাথায় রক্ত চড়িলে রাত্রে ঘুম হয় না। রাত্রে ঘুম না হইলে কষ্ট হয়, রোগও হয়। লেবাননের একটি মেয়ে এলিস ডার্লিং বলেন যে তিনি অনিদ্রা নিবারণের এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। মাথার দিকে বালিশ বা তোষক পাট করিয়া একটা বেদীর মতন করিতে হয়

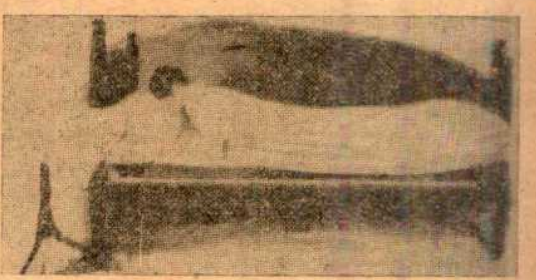

অনিদ্রার প্রতিকার।
উঁচু বালিশে কপাল রাখিয়া উবুড় হইয়া শোওয়া।

এবং উপুড় হইয়া শুইয়া সেই বেদীর উপর কপাল রাখিয়া অল্পক্ষণ থাকিতে-থাকিতেই মাথার রক্তের চাপ কমিয়া যায় ও তার ফলে তন্দ্রা আসে। ঘুম আসিয়া গেলে তখন আপনিই পাশ ফিরিয়া আরামে শুইবার চেষ্টা হয়।

কাদা কালি—

কালি আগে তরলই হইত। পরে কালির বড়ি হইয়াছে—জলে গুলিয়া লইলেই লেখা যায়। এখন আবার কাদা কালি তৈরি হইতেছে! গাঢ় দুধ যেমন টিনে থাকে অথবা কাদা মাজন যেমন চাপোপযোগী নলে থাকে, তেমনি এই কাদা কালি নলে থাকে; নলের মুখের ঢাকনি খুলিয়া তলায় একটু চাপ দিলেই নল কাদা কালি উদ্গার করে। এই কাদা কালির সুবিধা এই যে ইহা খুব শীঘ্র ও সহজে জলে গুলিয়া যায় ও তাড়াতাড়ি লেখার উপযুক্ত হইয়া

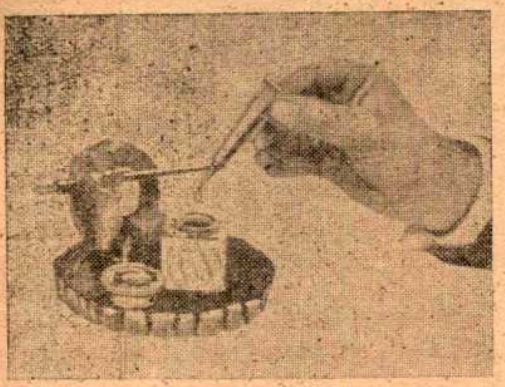

টিউবে কাদা কালি।

উঠে। এক ফোঁটা কাদায় এক দোয়াত ভরা তরল কালি পাওয়া যায়।

কূর্ম্ম অবতার—

কচ্ছপ বোধ হয় সব জন্তুর চেয়ে দীর্ঘজীবী। কশ্যপ শব্দ অপভ্রংশে হইয়াছে কচ্ছপ। কশ্যপ দেবতা দৈত্য দানব প্রভৃতির পিতা—এক-রকম আদি পিতা। কচ্ছপ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার, যখন পৃথিবীর দেহে জল কেবলমাত্র স্থলে পরিণত হইতেছে সেই যুগের। এত কালেও কচ্ছপের দেহ ও স্বভাবের বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই বোধ হয়। একটা কচ্ছপ বাঁচে অনেক শত বৎসর। লণ্ডন চিড়িয়াখানায় একটা কচ্ছপ আছে—তার নাম পীটার, বয়স হইয়াছে তিনি শত বৎসর, আকার প্রকাণ্ড। সে জগতের ইতিহাসে কত ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছে, সভ্যতার বিবর্ত্তনে কত পরিবর্ত্তনই সে

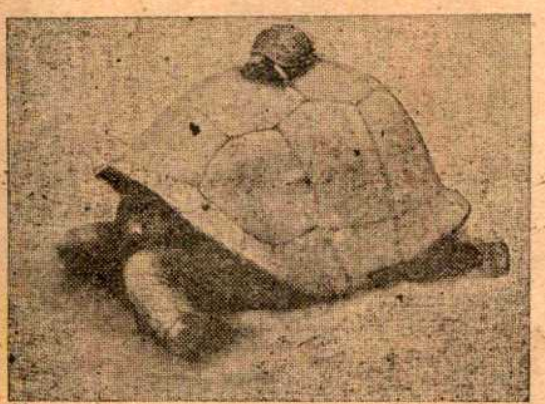

কূর্ম্ম অবতার!
তিন শত বৎসরের ধাড়ি ও কোলের (পিঠের) খোকা।

দেখিল। হয়ত সে দেখেও নাই, সে তার শুঁড় খোলার ভিতর গুটাইয়া থাকিয়াছে এবং যখন একটু বাহির করিয়াছে তখনও সে সচ্চরিত্র লোকের মতন উঁচু নজরে কারো দিকে চাহে নাই। কোলে পিঠে করিয়া যে খোকা-কচ্ছপটিকে সে লইয়া বেড়াইতেছে একদিন সেও অতটুকু ছিল, আবার এই খোকাও কালে ওরই মতন অতবড় হইবে ভালয় ভালয় বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিলে। কলিকাতার জীবশালায় এইরূপ অতিকায় কচ্ছপ দুটি আছে। তাদের বয়স কত হইয়াছে কে জানে?

নখের সখ—

আমাদের দেশে দেহের বর্জ্জনীয় পদার্থকে বর্জ্জন না করিয়া রাখিয়া দেওয়া ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। সন্ন্যাসীরা চুল-দাড়ি কাটে না; দেবতার কাছে মানত করিয়া চুল দাড়ি নখ রাখা হয়; অশৌচের সময়ও ক্ষৌরী বন্ধ রাখা হয়। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদের হাতে নখ লতাইয়া বাড়ে; অনেক গৃহস্থও ধর্ম্মসংস্কারের বশে হাতের একটা দুটা নখ বড় করিয়া রাখে। নখ বাড়িয়া বাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বাঁকিয়া-চুরিয়া লতাইয়া চলিতে চায়; তাই মাঝে মাঝে ভাঙিয়া ছোট হইয়া যায়। একজন চীনেম্যান তার বাঁ হাতের কয়েকটি নখ তোয়াজ করিয়া বাড়াইয়াছে—এত বড় নখ জগতে আর কোনো মানুষের নাই বোধ হয়। কলিকাতা শিবপুরের বোটানিকাল বাগানে

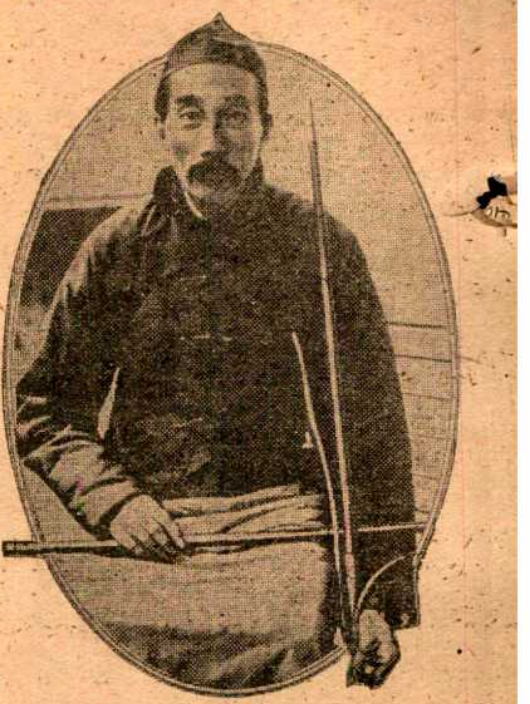

নখী!

বটগাছের ঝুরি সোজা নামাইবার জন্য যেমন বাঁশের চোঙের ভিতর দিয়া চালানো হয়, এই চীনেম্যানও তেমনি নখগুলিকে সোজা রাখিবার জন্য ও যাতে ভাঙিয়া না যায় এজন্য বাঁশের চোঙের মধ্যে ভরিয়া রাখে। সবচেয়ে লম্বা নখটি ৩১৷৷০ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় দু হাত লম্বা। মাঝারিটি ২১৷৷০ ইঞ্চি; সব ছোটটি ৬৷৷০ ইঞ্চি! সব ছোটটির মতনও ঐশ্বর্য্য আর কারো আছে কি না জানি না—না থাকাই সম্ভব। বিলাতের ধনী মেয়েরা হাতের নখ বেশ একটু বড় বড় রাখেন এই জানাইবার জন্য যে তাঁদের হাতের কাজ করিয়া খাটিয়া খাইতে হয় না; এই বড় নখ মাজিয়া ঘসিয়া সাফ রাখিতেই তাঁদের দিন কাটে। এই চীনেম্যানও বোধহয় খুব ধনী—হাতের কাজ সেও করে না।

মারিতে চায়, দুর্ব্বলও তেমনি বাঁচিবার ইচ্ছাতে সবলের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে। পরিত্রাণ পাইবার জন্য জীবসমাজে নানাবিধ বুদ্ধি শেষে স্বভাবে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। সিংহ উট মরুভূমিতে থাকে; তাদের রং মরুভূমির বালির মতন ধূসর হইয়াছে; তাতে সিংহ আত্মগোপন করিয়া শিকার খোঁজে এবং উট আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। বনের আলো-ছায়ার আল্‌পনার মধ্যে থাকে বাঘ জিরাফ; তাদের দুজনের গায়ের উপরই আলো-ছায়ার আল্‌পনা, তাতে বাঘের সুবিধা লুকাইয়া শিকার ধরিবার ও জিরাফের সুবিধা লুকাইয়া শিকার না হইবার। প্রজাপতি পাখীর খাদ্য; প্রজাপতি ফুলের বনে বিচরণ করে বলিয়া ফুলের বিচিত্র বর্ণ আয়ত্ত করিয়া আত্মগোপন করে। অনেক প্রজাপতি গা থেকে একরকম তিক্ত রস ও তীব্র দুর্গন্ধ বাহির করিতে পারে; তাদের

পোকাদের আত্মরক্ষার বর্ম্ম—গুগ্‌লির খোলা আঁটিয়া অঙ্গরক্ষা ও গুব্‌রেপোকার দাড়া বহিয়া নিজেকে ভীষণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নিরীহ দুর্ব্বল পোকারা করে।

সেই অস্ত্রের ভয়ে পাখীরা তাদের ধরে না; যেসব প্রজাপতির ঐ-রকম অস্ত্র নাই তারা ঐ-সব রসগন্ধযুক্ত প্রজাপতির রূপ অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে। অনেক মাকড়সা ও পিঁপড়ে লালতা-ভীমরুলের রূপ ধরিয়া ছদ্মবেশে শত্রু ঠকায়। জলের তলে এরকম পোকা হয়, তাদের গা নরম, মাছের রসনায় সুস্বাদু। মাছের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বেচারারা গুগ্‌লি শামুকের খোলা দিয়া গায়ের উপর এক বর্ম্ম তৈরি করে এবং কেউ কেউ বা গুব্‌রে পোকার দাড়া সংগ্রহ করিয়া নিজেকে ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রচার করিতেও চেষ্টা করে। মাছেরা ঐ বর্ম্ম-আঁটা ছদ্মবেশ দেখিয়া আর তাদের চিনিতে পারে না।

ল্যাম্প-পোষ্টের ফুলসজ্জা—

যে জাতের মধ্যে সত্য শিব সুন্দর যত প্রকাশমান সে জাত তত সভ্য উন্নত। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা পরের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া কল্যাণকামনা ও সৌন্দর্য্যবোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে তবেই জাতি উন্নত ও সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। এইখানে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের ও আমাদের সহিত য়ুরোপ-আমেরিকার পার্থক্য। আমরা আমার বাড়ীর ওঁচলা ময়লা প্রতিবাসীর দরজার কাছে ফেলি; পথে গাড়ীতে সভায় ভিড়ে থুতু ফেলিতে দোংরা করিতে সঙ্কোচ বা ঘিন্না বোধ করি না; ঘামে-দুর্গন্ধ জামা-কাপড় পরিয়া পরের গা-ঘেঁসিয়া বসিতে লজ্জা পাই না। কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার লোকেরা পরের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে প্রত্যেকে নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে পারিয়াছে এবং

ল্যাম্পপোষ্টের ফুলসজ্জা।

তার ফলে সুস্থ সবল হইয়াছে। যেখানে থাকি, আমার আবেষ্টনকে সুন্দর ও পবিত্র পরিষ্কার রাখিতে হইবে এ বোধ তাদের সজাগত হইয়াছে। শহরের পথ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ত ছিলই; এখন তার পথের আলোর থামগুলিকেও পুষ্পসজ্জায় ভূষিত করিয়া নয়ন-মনোহর করিতেছে; মাথার উপরের টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তারের জাল সরাইয়া ফেলিতেছে—কোথাও কুশ্রী কিছু থাকিবে না এই তাদের সাধনা। আর আমাদের?

জীবশরীরে চাম্‌ড়ার অঙ্গ কি কি—

চাম্‌ড়া শুধু দেহের মাংসপেশী স্নায়ু শিরার আবরণ নয়; চাম্‌ড়া নানা আকারে রূপান্তরিত হয়।—পশু পাখী মানুষের নখ লোম পালক চুল, মাছের আঁশ, ঝুম্‌ঝুমি সাপের ল্যাজের ঝুম্‌ঝুমি—এ সবই চাম্‌ড়ার রূপান্তর। গণ্ডারের খড়্গ বহুলোমের মুষ্টিবদ্ধ সমষ্টি—তার চাম্‌ড়ারই অঙ্গ। পাখীর পালক সদ্য ডিম-ফোটা ছানার গায়ে প্রথমে লোমের মতন থাকে; ক্রমে লোমের গোড়া নখের মতন শক্ত খোল

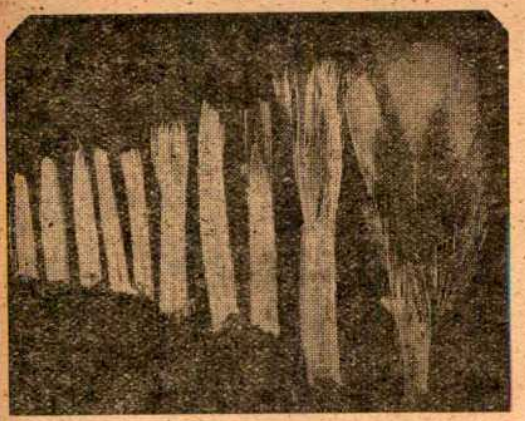

পালকের বিবর্ত্তন।

হইয়া উঠে ও তার মাথায় তুলির মতন খোপনা হয়; তারপর নলের ভিতর হইতে পালকের খোপ্না ক্রমশ বড় হইয়া বাহিরে আসে ও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে

কয়ালী।

আমেরিকার অদ্ভুত বুদ্ধিমতী মেয়ে—

আমেরিকার একটি অত্যাশ্চর্য্য বালিকার খবর আমরা পাইয়াছি। মেয়েটির কাহিনী বাস্তবিকই বড় বিস্ময়ের বিষয়। মেয়েটির বয়স যখন চার বছর তখন সে ভাজ্জিলের কাব্যের অনুবাদ করে। নয় বছর বয়সে তাকে লেল্যাণ্ড্‌ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হয়। এখন সে ক্রমে ক্রমে সাহিত্য-চর্চ্চায় এমন উন্নতি করিতেছে যে আমেরিকার মধ্যে সে খুব প্রতিভাশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

এখন মেয়েটির বয়স সতেরো বছর। এই বয়সেই সে সতেরো-খানি বই লিখিয়াছে ও দশ হাজারের উপর কবিতা লিখিয়াছে! সম্প্রতি প্রকাশ যে মেয়েটি তার ডায়ারি বই ছাপাইয়াছে। এই ডায়ারি সে দুই বৎসর বয়স হইতে লিখিতে আরম্ভ করে। মেয়েটি সতেরোটি ভাষা জানে এবং নানা কাগজে লিখিয়া থাকে। অভিনয়ে নায়িকা সাজিতে এবং বক্তৃতা দিতেও সে খুব দক্ষ।

মেয়েটি এক বৎসরে পা দিতে-না-দিতেই এমন ভাবে কথা কহিতে শিখিয়াছিল যে তার কথা বেশ সহজেই বোঝা যাইত। দুই বছর বয়সে সে লিখিতে ও পড়িতে শেখে। চার বছর বয়সে তাকে তার বাপ-মা নানাদেশে বেড়াইয়া আনেন। এই সময়ে ল্যাটিন ভাষায় একটি বই অনুবাদ করা ছাড়া মেয়েটি কয়েকটি জায়গায় সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী লেখে। পাঁচ বছর বয়সে বার্লিন সহরে মেয়েটি অনেক পড়াশুনা করে।

মণ্টরিয়েল ও নিউইয়র্কের অনেক হাসপাতালে মেয়েটি আহত ও কর্ম্মে অক্ষম সৈনিকদিগকে খেল্‌না তৈরী করিতে ও কৌতুককর খেলা খেলিতে শিখায়। এই কাজে তার গত দুই বৎসর কাটিয়া যায়।

যে-সব ছেলে মেয়ে প্রভূত বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়, ছেলেবেলায় তাদের বড় রোগা দেখা যায়। মিস্ ষ্টোনার কিন্তু শরীরে তেমন ক্ষীণ নয়। মেয়েটি উচ্চতায় পাঁচ ফুট সাড়েসাত ইঞ্চি; ওজনে দেড় মণের কিছু বেশী এবং ব্যায়াম কাজেও খুব নিপুণ। সম্প্রতি একজন চিত্রশিক্ষকের সঙ্গে বচসায় তাঁর তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া সে তাঁকে ছুড়িয়া জলে ফেলিয়া দেয়।

ছেলেবেলা হইতে খ্যাতি পাইতে থাকিলে অনেকে সেই খ্যাতির আনন্দকেই সম্বল করিয়া বাকী জীবনটা সাধারণ লোকের মত কাটাইয়া দেয়। এই মেয়েটি কিন্তু এত যশ পাইয়াও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। দিনের পর দিন তার যশের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচুর লেখা বাহির হইতেছে। এই লেখা হইতে প্রতি সপ্তাহে তার আয় হয় পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫০ টাকা। সে-আয় সে অক্ষম সৈনিকদের সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করে। এখন নাকি মেয়েটির বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সে তার ছেলেমেয়েদের তার চেয়েও বুদ্ধিমান করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। তার আরো ইচ্ছা স্বামীকে কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয় তাহাও সে দেখাইয়া দিবে।

পেঁপে বড় করিবার উপায়—

আমাদের দেশে পেঁপে সাধারণতঃ খুব বড় হয় না। বাংলাদেশে পেঁপের আকার ছোট। বোম্বাই ও সিংহলী পেঁপে খুব বড় হয়। কিন্তু ছোট জাতের পেঁপেও বড় করিবার একটি সহজ উপায় আছে। এ-উপায়টি মালয় দ্বীপে প্রচলিত। পেঁপে-গাছ যখন গোড়ায় পরিধিতে তিন ইঞ্চি মোটা থাকে সে-সময় তার গুঁড়িতে মাটি হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি উপরে একটি গর্ত্ত করিতে হয়। গর্ত্তটি এক ইঞ্চির বেশী গভীর হইবে না, এবং কেবল একটি রবারের নল তাতে যেন যাইতে পারে। তারপর দুই পাঁইট জল ধরে এমন একটি বোতলে আধ বোতল চিনি ভরিয়া তাতে জল দিয়া চিনি গলাইয়া লইতে হয়। চিনি ভালো করিয়া গলিয়া গেলে গাছে-লাগানো সেই নলটি বোতলের জলের মধ্যে ডুবাইয়া একদিন ও এক রাত্রি বোতলটি গাছের গায়ে রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন দেখা যাইবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গাছ সমস্ত জল শুষিয়া লইয়াছে। তারপর নীচের দিকে যে পেঁপে ঝোলে তার উপর একটি থলে জড়াইয়া রাখিতে হয়। এই উপায়ে নাকি পেঁপে পরিধিতে দশ হইতে বারো ইঞ্চি বড় হয়। আর গাছে যখন অনেক পেঁপে ধরে তখন ছোট ছোট পেঁপেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। তাহলে বড়গুলির বাড়িবার সুবিধা হয়। আশা করি পাঠকেরা এ-বিষয়ে পরীক্ষা করিতে দেরী করিবেন না।—প্যারী।

চেনাচেনা

পরিচিত নয় তবু যে লাগ্‌ছে চেনাচেনা,
পরের জিনিষ যেন আমার নিজের হাতের কেনা।
পথের ধারের ঘরটি যেন কোন্ দেশেতে যেতে,
একটি দিবস ছিলাম হোথা দুর্য্যোগেরি রেতে।
নিজের জমির জিনিষ যেন দূর সহরের হাটে,
গ্রামের ধনীর বজ্‌রাখানি অচিন্ নদীর ঘাটে।
আপন আপন লাগছে কেন বুঝ্‌তে নারি সেটি—
শৈশবেতে লেখা যেমন নিজের হাতের চিঠি।
চেনা গলার স্বরটি যেন বহুরূপীর সাজে,
সখার আঁকা চিত্রখানি প্রদর্শনীর মাঝে।
পড়ে গেছে ফুলটি ঝরে, গন্ধ আছে জেগে,
কনক বলয় কোথায় গেছে কষটি আছে লেগে।
শব্দ মনে পড়্‌ছেনাক বুঝ্‌ছি তবু মানে,
গানের কথা হারিয়ে গেছে সুরটি জাগে প্রাণে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আলো ও ছায়া

পুব আকাশের গায়ে রঙের আবির মাখা হতে আরম্ভ হয়ে গেছে, স্তব্ধ ধরণীর বুকে ঘুমে অচেতন বাতাসের তন্দ্রা টুটিয়ে একটি পাখী বড় মিষ্টি করে একবার ডেকে উঠ্‌ল। বাতাস জেগে উঠে পলাশ-পারুল-অশোক-শাখার ওপর দিয়ে ছুটে এসে, ময়ূর-কণ্ঠী রঙে ছোপান শাড়ির অন্তরালে সুন্দরীর কানে-রাঙা সুনীর দুলের মত ডালিম-মুকুলের চোখে আবেগ-ভরা নিশ্বাস মাখিয়ে, তাকে দোলা দিয়ে বল্‌ল—ওঠ মুকুল, জাগো। বড় দেরি হয়ে গেছে! আলো হয়ত এসে দেখ্‌বে তোমার চোখের পাতায় ঘুম এখনও জড়িয়ে রয়েছে। আর দেরি নয়, জাগো!

মুকুল জাগ্‌ল। পাতার ওপর থেকে শিশিরকণা নেমে তার মুখখানি ধুয়ে গেল। বাতাস বল্‌ল—তোমার বুকে জীবন আমি ভ'রে দিলাম আমার কাজ ফুরাল। তুমি এখন আর মুকুল নও। জগতের সঙ্গে এবার তোমার পরিচয় হোক। আমি এখন আসি?

ফুল দুলে দুলে বল্‌ল—এখনি! না-না আর-একটু থাক। তোমার ঐ পাগলকর নিশ্বাস আর-একবার আমার কপালের ওপর ছোঁয়াও।

বাতাস বল্‌ল—আমার কাজ যে এখনও সব সারা হয়নি! এখন যাই, কিন্তু আবার আমি আস্‌ব! তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় তখনই ভাল ক'রে হবে।

অভিমান ক'রে ফুল বল্‌ল—তবে এখন আমায় জাগালে কেন?

সবুজ পাতার ওড়না সরিয়ে প্রভাত-আলো ফুলের মুখে চুমা দিয়ে শিশিরকণাগুলি মুছে নিল। ফুল হেসে বল্‌ল—হাওয়ার চেয়ে তোমার স্পর্শ মিষ্ট! কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না কেন?

আলো বল্‌ল—তাকিও না ফুল, আমায় তুমি সইতে পারবে না।

আলোর দিকে মুখখানি ঘুরিয়ে এনে ফুল বল্‌ল—না তাকিয়েও যে থাকতে পারছি না, তুমি যে বড় সুন্দর!—কিন্তু একি! তুমি আমার গায়ে কি মাখিয়ে দিলে?

আলো বল্‌ল—রূপ।

ফুল বল্‌ল—আর আমার বুকের ভিতর এ কি অনুভব কর্‌ছি?

আলো বল্‌ল—তৃষ্ণা।

ফুল বল্‌ল—ও যে আমার রূপকে শুখিয়ে দিবে! কিসে পরিত্রাণ পাব?

আলো বল্‌ল—তৃষ্ণা কখনও মেটে না, শুধু বেড়েই চলে। ওর পরিত্রাণ নেই।

ফুল কেঁদে বল্‌ল—ও তবে আমায় কেন দিলে?

বড় করুণ সুরে কে ফুলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। ফুল তাকে জিজ্ঞেস কর্‌ল—কে তুমি?

সে বল্‌ল—আমি ভ্রমর।

ফুল বল্‌ল—বাতাস আমায় জীবন দিয়েছে, আলো আমায় রূপ দিয়েছে, তুমি আমায় কি দিতে এসেছ?

ভ্রমর বল্‌ল—পূর্ণতা। জীবন যখন শ্রান্ত হবে, রূপ যখন ম্লান হয়ে আস্‌বে, তখন তোমার পূর্ণতা প্রকাশ পাবে—তোমারই বুকের রক্তে গড়া ফলে।

ফুল বল্‌ল—আর আমি কি দিব তোমায়, কি আছে আমার?

ভ্রমর বল্‌ল—সুধা। আমার তৃষ্ণার জল।

ফুল বল্‌ল—আলো বলেছে তৃষ্ণা ত মেটবার নয়।

ভ্রমর বল্‌ল—ও সইতেও যে বুক ফেটে যায়!—

ফুল ব্যথিত হয়ে বল্‌ল—এস-এস, মেটাও তোমার তৃষ্ণা। যা আছে আমার সবই তোমায় দিলাম।

দিনের কাজ সারা হল। শূন্য পসরা মাথায় নিয়ে, বেচাকেনার হিসাবের বোঝা বুকে চাপিয়ে সবাই হাটের পথ ছেড়ে চলেছে। ক্লান্ত ফুল মাটির কোলে ঢুলে পড়ল। বাতাস তার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-কোমল স্পর্শ দিয়ে বল্‌ল—তোমায় আমি ভুলিনি ফুল।

মেঘের আড়াল হতে তারার আলো এসে বল্‌ল—তোমার রূপ অক্ষয় হয়ে আমার বুকে রইল।

ফুল ম্লান হেসে বল্‌ল—আমিও তোমাদের ভুলিনি।

কিন্তু সে কোথায়? যাকে আমি আমার সব দিয়েছি তাকে দেখ্‌ছি না কেন?

বাতাস ফুলের কানে কানে বল্‌ল—এ তৃষ্ণাই শুধু রইল তোমার বুকে। ঐ অনন্ত তৃষ্ণাই তোমাকে আবার নব-জীবনের আলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আস্‌বে।

কালো ছায়া নিবিড় হয়ে এল। ফুল ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

বাতাসের গান

বাতাস আমি কেঁদে বেড়াই
আকাশখানির মাঝে,
অচিন্ত্য কাল দিন-রজনী,
নিত্য সকাল-সাঁঝে।
ভাব্‌ছি আমি কে যে মোরে
ব্যথার কারায় রাখ্‌লে ধ'রে;
শূন্যে বেড়াই আঘাত ক'রে,
যাইগো, ম'রে লাজে!
অচিন্ত্য কাল দিন রজনী,
নিত্য সকাল-সাঁঝে।

কেউ ত আমায় ধরেনি হায়,
কেউ রাখেনি বেঁধে;
সন্দেহে তাও চিত্ত উধাও
ছুট্‌ছে কেঁদে কেঁদে!
কোন্ ছলে কি লীলা করে
মিথ্যা আড়াল নীলাম্বরে,
ধাই গো, যত যায় তা' স'রে,
ধর্‌তে পারি না যে!
অচিন্ত্য কাল দিন-রজনী,
নিত্য সকাল-সাঁঝে।

শ্রীমণিকান্ত হালদার।

কষ্টিপাথর

খাদ্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার।

বিলাতী আলু।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১৪.৭	প্রোটিড	১৮
তৈল	০.১	ভস্ম	০.৮
	জল ৬২.৬		

ইহাতে বিলক্ষণ পরিমাণে শ্বেতসার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা ইহাতে প্রোটিডের পরিমাণও অধিক। কেহ কেহ বলেন যে ভাত বা রুটীর বদলে আলু ব্যবহার চলে।

ফুটন্ত জলে কিঞ্চিৎ লবণ ফেলিয়া দিয়া খোসা-সুদ্ধ সিদ্ধ করিতে হয়।

ওল কচু।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহগুণ, শতকরা		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১২.৮	প্রোটিড	২.৩
তৈল	০.৯	ভস্ম	১.৪
	জল ৭৮		

মেদকারিতা গুণে ওল তরকারীর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণাক্ত পদার্থ (ভস্ম) থাকায় ইহা আহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। এই জন্য অর্শরোগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী।

ওলে চুনের দানা দানা ছুই এক প্রকার যৌগিক পদার্থ থাকায় ইহা গলায় লাগে, ভস্মসার দ্বারা চাষ করিলে সুখাদ্য হয়।

কাঁচা কলা ও মোচা।

কাঁচা কলা ও মোচা উত্তম তরকারী। ইহাতে ট্যানিক্ এসিড্ থাকায় পেটের পীড়া ও কৃমি রোগের পক্ষে উপকারী।

শুষ্ক কাঁচা কলা।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৭৭.৮	প্রোটিড্	৪.১
তৈল	০.৪	ভস্ম	২.৭
সূত্র	১.২		

ইহার দাহগুণ যথেষ্ট, কিন্তু মেদকারিতা গুণে ইহা কোন ধান্য-জাতীয় শস্যের সমকক্ষ নহে।

বেগুন।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৪.০	প্রোটিড	১.৪
তৈল	১.৫	ভস্ম	১.৩
	জল ৯০.৯		

কড়াই-শুঁটী।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ (খোসা ছাড়ান)

দাহগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১৬.৯	প্রোটিড্	৭.০
তৈল	.৫	ভস্ম	১.০
	জল ৭০.৬		

মেদকারিত গুণে ইহা অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডাইল যেরূপ দুষ্পাচ্য ইহা সেরূপ নহে। পক্ক বুট বা মটর জলে ভিজাইয়া অঙ্কুরিত হইবার সময়ে রন্ধন করিলে ইহাদের সারপদার্থ অধিক পরিমাণে জীর্ণ হইতে পারে।

শিম।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৬·৯	প্রোটিড	২·১
তৈল	·৩	ভস্ম	·৭

জল ৮৩.০

বরবটী।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১.৩	প্রোটিড	৩.৫
তৈল	১.২	ভস্ম	·৬

কচি বরবটী অতি বলকারী। মেদকারিতা গুণে ইহা কড়াইশুঁটী ব্যতীত অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মূলা।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৩·৪	প্রোটিড	·২
তৈল	কিঞ্চিৎ	ভস্ম	·৮

জল ৯৫·৭

ইহাতে গন্ধক থাকায় ইহা চর্ম্মরোগের পক্ষে হিতকারী।

বাঙ্কপি

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৪.৬	প্রোটিড	১·২
তৈল	৩.২	ভস্ম	৮

জল ৭৫·৬

ইহাদের মেদকারিতা গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গন্ধক থাকে বলিয়া ইহারা উক্তগুণবিশিষ্ট।

ফুলকপি

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৫.০	প্রোটিড	৩.০
তৈল	২.১	ভস্ম	১·১

মেদকারিতা গুণে ফুলকপি বাঁধাকপি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কমলালেবু।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৮.২	প্রোটিড	০.৯
তৈল	০·১	ভস্ম	০·৪

জল ৬৩·৪

কমলালেবু অতি সুখাদ্য-সুসুপাচ্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও পরিপাচক বলা। পেটের পীড়ার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

নারিকেল।

মালা ছাড়ান নারিকেলের রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৩·৫	প্রোটিড	৪·৫
তৈল	৫৭·৪	ভস্ম	১·৫

ডাবের জল।

শ্বেতসার ও শর্করা	২৪	প্রোটিড	১৪
তৈল	কিঞ্চিৎ	ভস্ম	·৬

রাসায়নিক খাদ্যগুণ বিচার করিলে নারিকেল ফলের রাজা। কিন্তু ইহাতে অত্যধিক পরিমাণে তৈল থাকায় ইহা অত্যন্ত গুরুপাচ্য। পরিপাক হইলে নারিকেল কডলিভার তৈলের মত উপকারী। নারিকেলের দুগ্ধ বা নারিকেল-কোরা মিশ্রিত ডাইল ও তরকারী অতি সুস্বাদু হয়। মুড়ি ও নারিকেল ভক্ষণ অম্লরোগের পক্ষে উপকারী বলিয়া কথিত আছে। নারিকেল অপেক্ষা নারিকেল-দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অধিক লঘুপাচ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাবের জল উত্তম পানীয়। সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে, আহারের এক ঘণ্টা পরে পান করিলে ইহা বিশেষ ফলকারী। ডাবের জল অম্লরোগীর পক্ষেও ব্যবহার করা যায়।

নারিকেল-দুগ্ধ দ্বারা ডাল, তরকারী ও মাংস অতি সুস্বাদ হইয়া থাকে। রন্ধন শেষ হইলে নারিকেল-দুগ্ধ যোগ করিতে হয়। নারিকেল কোরাইয়া কোন পাত্রে রাখিবে। একটা নারিকেলে এক পোয়া ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া পাত্র ঢাকিয়া রাখিতে হয়। শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই জল বড় উপকারী।

কৃষক, মাঘ ১৩২৬।

দুহাজার বছরের পাঁজী।

ঐতিহাসিকগণকে অনেক সময়ে কোন্ বছরের কোন্ মাসের কোন্ তারিখ কি 'বার' ছিল তাহা জানিবার জন্য পুরাতন পাঁজী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়। আমাদেরও কখন কখন উহা প্রয়োজন হয়। ঐ কাজটা সহজ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি The Teacher's Aid নামক পত্রিকায় একটা অতি সহজ নিয়ম বাহির হইয়াছে। ঐ নিয়মটা ব্যবহার করিতে হইলে দুইটি তালিকা সম্মুখে রাখা প্রয়োজন।

প্রথম তালিকা ('বার')।

(ক) খৃষ্টের জন্ম হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত :—শুক্র—০, শনি—২, রবি—৩, সোম—৪, মঙ্গল—৫, বুধ—৬, বৃহস্পতি—০।

(খ) ঊনবিংশ শতাব্দীর জন্য :—

বুধ—১, বৃহস্পতি—২,.....মঙ্গল—০।

(গ) বিংশ শতাব্দীর জন্য :—

সোম—১, মঙ্গল—২, ইত্যাদি।

২য় তালিকা ('মাস')।

সকল শতাব্দীর জন্য :—

জানুয়ারী—০, ফেব্রুয়ারী—৩, মার্চ্চ—৩, এপ্রিল—৬, মে—১, জুন—৪, জুলাই—৬, আগষ্ট—২, সেপ্টেম্বর—৫, অক্টোবর,—০, নভেম্বর—৩, ডিসেম্বর—৫।

নিয়ম।—এখন চারিটা সংখ্যা যোগ দিতে হইবে :—

(১) তারিখ, (২) আমরা যে মাস চাই, ২য় তালিকায় সেই মাসের পাশে যে সংখ্যা দেওয়া আছে, (৩) বৎসর, (৪) তৃতীয় সংখ্যাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায়।

এই চারিটি সংখ্যার যোগফলকে ৭ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ১ম তালিকার সেই সংখ্যার পূর্ব্বে কি 'বার' লেখা আছে তাহা দেখিলেই আমাদের কার্য্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা মনে রাখা দরকার :—

(ক) ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে-কোন তারিখ

কি বার জানিতে হইলে, বৎসরের সমস্ত সংখ্যাটিই ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাকেই ৪ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে চতুর্থ সংখ্যা।

(খ) ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে-কোনও বৎসরের জন্য সেই বৎসরের শুধু শেষ দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাকেই ৪ দিয়া ভাগ করিলে ৪র্থ সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কোনো তারিখ সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলা হইল না কেন? তার উত্তর এই যে বিলাতে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে ভাবে বছর গণনা করা হইত, তাহাতে দেখা গেল যে equinox ও solsticeএর তারিখে কয়েকদিন ভুল হইতেছে। সেই ভুলটা শোধ্‌রাইবার জন্য ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বরের পরের দিনকেই একেবারে ১৪ই সেপ্টেম্বর বলিয়া গণনা করা হয়।

(গ) যে বৎসর 'লিপ্ ইয়ার' হইবে, সে বৎসরের ২৯ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে-কোনোও তারিখের জন্য নিম্ন-মত চারিটি সংখ্যার যে যোগফল পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে ১ বাদ দিয়া পরে তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হইবে।

উদাহরণ।

২৩শে মার্চ্চ, ৮৭৮—

২৩+৩+৮৭৮+২১৯=১১২৩ [বিশেষ দ্রষ্টব্য (ক)]

১১২৩—৭—অবশিষ্ট ৩=রবিবার [১ম তালিকা (ক)]

২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৫২—

২+৫+১৭৫২+৪৩৮=২১৯৭ [বিশেষ দ্রষ্টব্য (ক)]

২১৯৭÷৭—অবশিষ্ট ৬=বুধবার [১ম তালিকা (ক)]

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৫২—

১৪+৫+৫২+১৩=৮৪ [বিশেষ দ্রষ্টব্য (খ)]

৮৪÷৭—অবশিষ্ট ০=বৃহস্পতিবার [১ম তালিকা (ক)]

৪ঠা মে, ১৮৯৯—

৪+১+৮৯+২২=১১৬ [বিঃ দ্রঃ (খ)]

১১৬÷৭—অবশিষ্ট ৪=সোমবার [১ম তাঃ (ক)]

২১শে অক্টোবর, ১৮০৫—

২১+০+৫+১=২৭ [বিঃ দ্রঃ (খ)]

২৭÷৭—অব ৬=সোমবার [১ম তাঃ (খ)]

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০—

২৯+৩+২০+৪—১=৫৩ [বিঃ দ্রঃ (খ), ও (গ)]

৫৩÷৭—অব ০=রবিবার [১ম তাঃ (গ)]

১৫ই মে-১৯২০—

১৫+১+২০+৫=৪১ [বিঃ দ্রঃ (খ)]

৪১—৭—অব ৬=শনিবার [১ম তাঃ (গ)]

শ্রীপাঁচুগোপাল দাস

(শিক্ষক, বৈশাখ) এম্ এস্ সি, বি টি।

বস্ত্র।

নির্লজ্জতা দূর, মর্য্যাদা রক্ষা, বেশভূষা ও শারীরিক সৌষ্ঠব সংসাধন প্রভৃতি উদ্দেশ্যের অন্তরালে শরীর রক্ষা হেতু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন। স্বভাবতঃ মেদ ও চর্ম্মের আবরণ দ্বারা কতকটা উত্তাপ শরীরে রক্ষিত হয়। তথাপি কতকগুলি বাহ্য কারণে দেহের এই স্বাভাবিক তাপের হ্রাস করিয়া থাকে। এই হ্রাস নিবারণার্থ বস্ত্র আবশ্যক।

কাপড় নিজে উত্তাপের অপরিচালক নহে। উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যে যে শুষ্ক বায়ু থাকে তাহা অত্যন্ত অপরিচালক, এজন্য যে কাপড়ে যত অধিক বায়ু থাকে, তাহা তত অধিক অপরিচালক। এই অপরিচালকতা গুণে শরীরের উত্তাপ রক্ষণ, জলীয় পদার্থ শোষণ, শীত নিবারণ, বাহ্যিক বায়ুর উষ্ণতা হইতে শরীর রক্ষা, ও বায়ুর সহিত আগন্তুক বিষাদি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না দেওয়া প্রভৃতি কারণে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

গাত্রে অল্প ঢিলা ভাবে কাপড় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বস্ত্রের মধ্যে যে স্থান থাকে তাহাতে কতকটা শুষ্ক বায়ু আবদ্ধ থাকিতে পারে। তজ্জন্য ঢিলা বস্ত্রে অধিক শীত নিবারণ করে। শুভ্র পদার্থে সূর্য্যকিরণ বা অন্য-প্রকার তাপ লাগিবা মাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শুভ্রবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্লান্তিজনক ব্যায়ামের পর শীঘ্রই পরিহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সাময়িক শীতের গরম বস্ত্র পরিত্যাগ করিবা হঠাৎ সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। সকল অবস্থাতেই গরম ও সুখপ্রদ বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

সচরাচর তিন প্রকার বস্ত্র আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি; প্রথম—সূতার বস্ত্র, দ্বিতীয়—রেশমী বস্ত্র, তৃতীয়—পশম বস্ত্র। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে, সূতার বস্ত্রই আমাদের প্রকৃত ব্যবহার্য্য।

সাধারণতঃ এই কয় প্রকার দ্রব্য দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যথা—পাট, কার্পাস, পশম, রেশম, মেরুণা, জুট, তসর, গরদ, চামড়া ও রবার।

শীতনিবারণ-কার্য্যে পাট ও কার্পাস অপেক্ষা পশমী বস্ত্র অ উপকারী। অত্যধিক শৈত্যে চামড়া ও রবার নির্ম্মিত বস্ত্র উপকারী।

উত্তাপ নিবারণ।—সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বস্ত্রের নির্ম্মাণ অপেক্ষা বর্ণের দিকে লক্ষ্য রাখা অধিক আবশ্যক। শ্বেত বর্ণের বস্ত্র উত্তাপ অধিক বিকিরণ করিয়া থাকে; তৎপরে পীতাভে পীত, ঈষৎ গোলাপী, নীল ও পরিশেষে কৃষ্ণ। ছাতা ও টুপি বা পাগ্‌ড়ি সাদা কাপড়ের হইলে অধিক উপকারী।

ঘর্ম্ম শোষক।—এই কার্য্যে পশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

গন্ধ শোষক।—যে-সকল বস্ত্রে অধিক আর্দ্রতা শোষণ করে, গন্ধও তাহাতে অধিক শোষণ করে, এজন্য পশম অধিক গন্ধ শোষক। এতদ্ব্যতীত এই ধর্ম্ম বস্ত্রের বর্ণের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কাল বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গন্ধ শোষক। তৎপর ক্রমে নীল, লাল, হরিত ও পীত। শ্বেত বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা কম গন্ধ শোষণ করে।

ম্যালেরিয়া নিবারক।—আফ্রিকার বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, খালি গায়ের উপর ফ্লানেল ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কম হয়।

পরিশ্রমের পর মোটা বস্ত্র গায়ে দিলে ঘর্ম্ম বাষ্পাকারে নির্গত ও বস্ত্রে ঘনীভূত হইয়া জল হয়। বাষ্প জল হইবার সময় তাহা হইতে গুপ্ত ভাবে তাপ বাহির হয়। ঐ তাপ দ্বারা শরীর গরম হয়। পরিশ্রমের পর কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা শীতল্য পশমী কাপড় অথবা মেরুণা অধিক উপকারী। যে-সকল ব্যক্তির সর্ব্বদা সর্দ্দি হয় অথবা যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, শীতকালে তাহাদের গাত্রে প্রথমে ফ্লানেল দিয়া তাহার উপর একখণ্ড চামোয় (ছাগচর্ম্ম) ব্যবহার করিলে, অধিক উপকার হয়। ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব-সময়ে একটুকরা ফ্লানেল পেটের উপর বান্ধিয়া রাখিলে ওলাউঠা নিবারণ হয়।

কাপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। পরিচ্ছন্ন চীরবাস, অপরিষ্কৃত বহুমূল্য সাটিন ও কিংখাব হইতেও বিশেষ গৌরব-

জনক। শরীরস্থ ক্লেদ প্রভৃতির দ্বারা আমাদের গাত্রবস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদাই দূষিত হইয়া থাকে। এজন্য সাবান সোডা, ক্ষার প্রভৃতি দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

কাপড়ের বর্ণ সাদা অথবা ঈষৎ রঞ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। ঘর্ম্ম লাগিয়া ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত। সংক্রামক রোগীর (হাম, সর্দ্দি, ওলাউঠা, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি) নিকট যাইতে হইলে, পশম পশম প্রভৃতি প্রাণীজ ও রং-করা—বিশেষতঃ কালবর্ণের—বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও গামছা কখন ব্যবহার করিবে না। নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বদা গাত্র ঢাকিয়া রাখা ভাল। নিদ্রাকালে গাত্রে কাপড় থাকা উচিত। গাত্রে ঢিলা ভাবে কাপড় ব্যবহার উত্তম। ভিজে কাপড় ব্যবহার করা অপেক্ষা উলঙ্গ থাকা ভাল।

(স্বাস্থ্যসমাচার, চৈত্র)। শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

১৯১৮ অব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলসমূহের অস্থায়ী ইনস্পেক্টর মহাশয় বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল একটি রিপোর্টের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী মহাশয় বাঙ্গালাদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক বালকদিগকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯১১ অব্দের লোকগণনা অনুসারে এরূপ বালকের সংখ্যা কলিকাতা দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য প্রদেশ বাদে ২৮১৬৬৮৮ ছিল। তন্মধ্যে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা দিবার উপযুক্ত স্কুলসমূহে, ১৫৫৫০১৩ জন বালকের স্থান আছে; কিন্তু এখন ১৩২৫২২৩টি বালক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে এখনও স্কুলসমূহে যথেষ্ট স্থান আছে। তাহা হইলেও সকল স্কুলের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। যে-সকল স্কুলগৃহের অবস্থা সন্তোষজনক সেই-সকল স্কুলে মোট ৪৭৪০৭৯টি বালকের স্থান সঙ্কুলন হইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে এখন যে-সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযোগী অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহা ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত নহে। কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় কম, কোথাও বেশী। প্রতি প্রাইমারী স্কুলে ১২০টি বালক স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারে, এই ভাবে হিসাব করিলে বাঙ্গালা দেশে ২৫৫৩৪টি প্রাইমারী স্কুলের দরকার হয়। কিন্তু স্কুলের সংখ্যা এখন ৩১৯১৭। অথচ, সকল স্থলে স্কুল নাই, আবার অনেক স্থলে প্রয়োজনের অনুপাতে স্কুলের সংখ্যা বেশী, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা কম। এ দিকে স্কুলের সংখ্যা বেশী হইলেও, শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। আপাততঃ ৪০১৬৯ জন শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষা দানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৯৩৮৯০ হওয়া আবশ্যক। এখন প্রত্যেক শিক্ষক গড়ে ২৯ জন বালককে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন।

মোটের উপর, বর্ত্তমানকালে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযোগী বালকের মধ্যে শতকরা ১৭টি বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর শতকরা ৪২ জনের উপযোগী শিক্ষক আছেন। কিন্তু শিক্ষার অবস্থা আদৌ ভাল নয়। বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াইবার ভাল ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

রীতিমত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে নূতন আদর্শ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ ২১৩০৯৪৩৮ টাকা, তাহাদের সরঞ্জামের জন্য ৯২৯৬০৩৩ টাকা, জমি ক্রয় বাবদ ১২৮২৬০৪ টাকা এবং ছেলেদের শ্লেট কিনিয়া দিবার জন্য ১০৫৬২৫৭ টাকা,—অর্থাৎ মোট ৩২৯৪৪৩৩২ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। আর নিত্য নিয়মিত খরচ হইবে,—শিক্ষকদের বেতন মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে ১১৩০৯১০ টাকা, বাড়ীঘর ও সাজসজ্জা ঠিক অবস্থায় রাখিবার জন্য ২২০৮১৬ টাকা, লাইব্রেরী কনটিনজেন্সী ও রেকর্ড বাবদ ১৩৯৩৪৩ টাকা, বালকদের জন্য বই কাগজ কলম প্রভৃতি ৭৭৭৫২৩ টাকা শ্লেট ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আবার কিনিয়া দিবার জন্য ২১১২৫১ টাকা, স্কুল পরিদর্শন বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় ৩৯৯৭৮০ টাকা, ছাত্রদের বৃত্তি বাবদ ২৯৪২২৫৩ টাকা, বাড়ী মেরামত বাবদ ১৩৬৬৬৪ টাকা ও আসবাবপত্র মেরামত খরচ ৯৯৮৪০ টাকা; অর্থাৎ মোট ২৩৪৮৪৭৩৩ টাকা ব্যয় হইবে।

মানুষের শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাহা তাহার জীবনের কাজে লাগে। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন কৃষক। সুতরাং তাহাদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে।

আমরা বিবেচনা করি, কৃষি-প্রধান পল্লীতে প্রত্যেক আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত কিছু জমি থাকা উচিত। সেই জমিতে কৃষক-বালকগণকে হাতে-কলমে চাষ-আবাদের কাজ শিখাইতে হইবে। হাতে-কলমে চাষ-আবাদের কাজ শিখাইতে হইলে, শিক্ষকদেরও কৃষিকার্য্য কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

ক্লাসগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত স্থানে বসাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার উপকারিতা ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ছাত্রদিগকে নিজেদের শরীর সুস্থ রাখিতে এবং গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে শিখা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ শিক্ষা ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবনে বৃথা হইবে না। গ্রাম্য কৃষক যখন দেখিবে ছেলেকে স্কুলে পাঠাইলে তাহার চাষের কোন ক্ষতি হইবে না,—লেখাপড়া শিখিয়া বাবু বনিয়া গিয়া ছেলে আর ক্ষেত্রে চাষ করিতে অস্বীকৃত হইবে না, তখন সে অতি সহজেই এইরূপ বিদ্যালয়ের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে, এবং নিজেরা উদ্যোগী হইয়া ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হউক আর নাই হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না। তখন প্রাথমিক শিক্ষা compulsory করিলেও যে ফল হইবে, না করিলেও সেই ফল হইবে।

কৃষি-প্রধান অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত যেমন কৃষিক্ষেত্র থাকিবে, এবং ছাত্রেরা হাতে-কলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবে,—শিল্পপ্রধান স্থানগুলিতে যে স্থানে যে শিল্প প্রধান, অধিবাসীদের মধ্যে যে-শ্রেণীর শিল্পীর সংখ্যা খুব বেশী, সেই স্থানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সেই শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অভিজ্ঞ শিক্ষক রাখিতে হইবে, স্কুল-সংলগ্ন ক্ষেত্র ও কারখানায় উৎপন্ন শস্য ও শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিতে পারা যাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক বাঙ্গালার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন রকমের হওয়া আবশ্যক। পুস্তকগুলি খুব সরল হওয়া উচিত। কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি যতসংযুক্ত ও সংযুক্ত বাক্যে যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বিরচিত হইলে স্বল্পশিক্ষিত আরম্ভ করিয়া তাহাদের সাধারণ শিক্ষা যেরূপ সহজে অগ্রসর হইবে, ঐরূপ পুস্তকের মধ্যেই কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ও উপদেশ থাকার যে

গুলির শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইবে। তাহার সহিত স্কুলের সংলগ্ন যে ক্ষেত্র এবং ওয়ার্কশপ বা কর্ম্মগৃহ থাকিবে, তাহাতে পণ্ডিত বিদ্যার হাতে-কলমে পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে demonstrationএর যাহা ফল তাহাও হইবে; ফলে বোধ হয়, এখন যে শিশুদিগকে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য দেশের লোকের এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের ঝোঁক পড়িয়াছে, সেই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর শিক্ষা খুব সহজেই হইয়া যাইবে।

স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন শিক্ষা-সাপেক্ষ; এবং সে শিক্ষা অতি শৈশব কাল হইতেই আরম্ভ হওয়া কর্ত্তব্য। এখন যখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়া যাইতেছে, সকল বালক-বালিকাই যখন লেখা-পড়া শিখিবার সুযোগ পাইতেছে, তখন স্বাস্থ্যরক্ষা ও চরিত্রগঠন শিক্ষাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরম্ভ করিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর-পালন সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। (স্বাস্থ্যসমাচার, চৈত্র।)

বিশ্বাসের প্রতিদান

সেদিন আইন পরীক্ষাটা বেশ ভাল করিয়া দিয়া আসিয়া মেসের ছাদে আরামকেদারাখানা টানিয়া লইয়া টুর্গনিভের একখানা বই আরম্ভের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় আমার পাশের ঘরের যতীন সশব্দে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "পরেশ-দা, শীগ্‌গির, এখ্‌খুনি এস, ভয়ানক দর্‌কার।"

যতীন আমার এক বৎসরের বড় হইলেও আমাকে দাদা বলিত। উঠিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, বলিলাম, "কেন হে?"

সে ব্যস্তভাবে বলিল, "এই শোন না।" তাহার পর কে একটি নূতন ছেলে আমাদের মেসে দূর পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে, তাহার উপর কি একটা উপদ্রবের মতলব আঁটিয়াছে সেইটা ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু ইহাদের কি একটা কথা তাহার সুদূর পল্লীগ্রামের সরলতার (অথবা যতীনের ভাষায় হোকামীর) পক্ষেও বিশ্বাস করা শক্ত হইতেছিল। তাই আমাকে দর্‌কার। আমি বলিলে নাকি সে বিশ্বাস করিবে।

কিন্তু যতীনের পরামর্শের ফলে বেচারী যে কি অপ্রস্তুত হইবে সেটা মনে করিয়া আমি "না আমি ওতে নেই" বলিয়া পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলাম।

যতীন মহা খাপ্পা হইয়া বই কাড়িয়া লইয়া বলিল, "মশায়কে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কেন ওতে আপনি নেই? আগে কি স্বয়ং এ কাজ করেননি। অরোরা বোরিয়ালিস্ কি এত প্রাচীনকালে ঘটেছিল নাকি?"

আমার মুখটা হঠাৎ এক ঘা কড়া চাবুক খাওয়ার মত বিকৃত হইয়া গেল।

যতীন সোল্লাসে বলিল, "হুঁ, হুঁম, বাবা! তবে আর কেন চালাকী কর, চল।"

আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলিলাম, "মাপ কর ভাই। এক সময়ে একটা অন্যায় করেছিলাম বলে ফের সেটা কর্‌তে পারি না। যথেষ্ট আক্কেলসেলামী দিয়েছি।"

যতীন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে তুমি আস্‌বে না?

আমি কোনও উত্তর না দিয়া তাহার হাত হইতে বইটা লইয়া ভাল করিয়া পড়িবার ভান করিলাম।

যতীন গন্‌গন্ করিতে করিতে "চোঙ্‌ড়া" (Joseph Surface) "জোসেফ্ সার্ফেস" প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজীতে আমাকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে করিতে নামিয়া গেল।

কিন্তু সে আমার পড়াটা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

সে চার বৎসর আগেকার কথা; তখন আমি সবেমাত্র এফ-এটা পাশ করিয়াছি। আমাদের মেসে আমাদের বাড়ীর আমরা চারজন ছিলাম—দাদা, মেজদা, আমি, মেজদার একটি ছোট ভাই। আমি আমার মেজ ভগ্নী-পতিকে মেজদা বলিতাম। ভাইটি ছোট বলিলেও ছিল আমারই সমবয়স্ক, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়ার কল্যাণে তাহাকে দেখাইত অতি ছোট। সে শরীর সারিতে এবং পড়াশুনাটা আমাদের তদারকে ভাল করিয়া করিতে মোট মাস দুই তিন আসিয়াছিল। কিন্তু পড়া তাহার ভাল হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, তবে যতীনের নিকট তাস ও আমার নিকট দাবা সে মোটামুটী একরকম শিখিয়া লইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় যতীনের ব্রীজের চতুর্থ ব্যক্তির স্থানটা সে প্রায়ই লইত। আমাদের সে সগরম আড্ডার মাঝে তাহাকে দেখিলে মেজদা আমায় বলিতেন, "ভায়া, একটু নজর রেখো, ও-বেচারীর দফাটা একেবারে সেরো না।"

যতীন তৎক্ষণাৎ বলিত, "কিছু পরোয়া নেই মেজদা, পরেশদা ওর ইংরিজী আর অঙ্ক দেখে দেয়।" আমিও

সেটার একটা মৌন সমর্থন করিতাম। কেবল দাদা ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করিতেন বোধ হয়; কারণ সে সময় তিনি সিগারেটটা দুইটানে ছাই করিয়া দিতেন।

মেজদাও বাড় নাড়িয়া সন্তুষ্ট মনে চলিয়া যাইতেন। কারণ আমি নাকি সারা বছর ফাঁকি দিয়া অন্তিমে তিন মাস আমার পড়াশুনার চাড়ে সকলকে অবাক করিয়া দিয়া একটু জাঁকালো রকমে পাশ করিয়াছি।

কিন্তু ভরসাটা আমার তাহার প্রীহাটির আয়তন দেখিয়া বড় হইত না। কারণ এই দুই মাসে মেজদা ডি গুপ্ত, ম্যালেরীন, পাইরেক্স, সুধানিন্ধু—মায় সাগর পর্য্যন্ত কত কি এক ডাক্তারখানা ঔষধ তাহাকে খাওয়াইয়াও নেটির এতটুকু নড়চড় করিতে পারেন নাই। শেষ নাকি একটা ব্যাটারীর (Eattery) ঘায়ে সেটা একটু নড়িয়াছিল; কিন্তু যতীন শপথ করিয়া বলে, "সেটা ঠিক বটে, কিন্তু উঠেছিল, নামেনি।"

এই অবস্থায় যতীন কয়েকদিন হইতেই কি একটা ভৈরব আঁটিতেছিল। হঠাৎ মেজদা দুইদিনের ছুটিতে একলা দেশে যাওয়ায় সেটা পাকাইয়া লইল। আমি তখন ছুটির দিনের মাধ্যাহ্নিক ঘুমটার শেষে, অলসতার আবেশটা ধীরে ধীরে অথবা তড়িঘড়ি কাটাইয়া দিব বিচার করিতেছি, এমন সময়ে যতীন অতি ভীষণ শব্দের সহিত দরজা খুলিয়া দিয়া আমাকে সময়ের মূল্য বুঝাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "শোন পরেশদা: তোমার ল্যাংবোটকে একটা মজা করা যাক্।"

এমন সময়ে তথাকথিত "ল্যাংবোট" ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এই যে পরেশদা উঠেছেন।"

বেচারীকে আমি বোধ হয় কিঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলাম; মনে মনেও বোধ হয় কিছু ছিল। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মেসে থাকিবার সময় সে আমার সহিত সর্ব্বদা ঘুরিত। এতে যতীনের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উল্লিখিত উপাধির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু "ল্যাংবোট" তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতিবোধ করে নাই।

সে বলিল, "হ্যাঁ পরেশদা, যতীনদা বলছিলেন আপনি পিলের ভাল একটা কি নতুন ওষুধ জেনে এসেছেন; কি একটা টিঞ্চার অরোর—না—কি?"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "অরোরা?"

যতীন বহুকষ্টে রাগ চাপিয়া বলিল, "আহ ঐ যে সেই সুইডেনের বিখ্যাত ফার্মটা; তাদের ওষুধ!"

মুহূর্ত্তের জন্য আমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়া গেল; আর তাহার সরল বিশ্বাসের মর্য্যাদাটা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম "ও—হ্যাঁ, দে, লিখে দিচ্চি।"

সে একখানা কাগজ আনিয়া দিল, আমি কাগজটায় ইংরেজীতে লিখিয়া দিলাম—

টিঞ্চার অরোরা বোরিয়ালিস্।

(Tincture Aurora Borealis)

বড় শিশি। সুইডেনে প্রস্তুত।

বেচারী অগাধ বিশ্বাসে কাগজখানি লইয়া চলিয়া গেল। যতীনও আমার মত পরিবর্ত্তনের ভয়ে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

তাহার অজ্ঞতায় আমি অবাক হইয়া গেলেও মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, তাই ত, যতীন শেষ পর্য্যন্ত কি করে কি জানি। অনেকক্ষণ পরে স্থির করিলাম কাগজখানা ফিরাইয়া লইব। কিন্তু দুই জনের কাহারও তখন খোঁজ পাইলাম না। কাজেই মনটাকে একপ্রকার ফাঁকা প্রবোধ দিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিতে বেশ সন্ধ্যা হইয়াছিল। অন্যমনস্ক ভাবে মেসের অনিবার রাস্তা দিয়া একটা বড় ডাক্তারখানার সম্মুখে পৌঁছিয়াছি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে চমকিত হইয়া দেখিলাম—যতীন এবং মেসের আরও সাত-আটজন ছেলে কাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাকেও তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল, সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "পরেশদা, পরেশদা, তোমার 'ল্যাংবোট' অরোরা বোরিয়ালিস্ খাচ্চে, দেখে যাও।"

আমার বুকের রক্তটা যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। তখন সকলে মিলিয়া তাহার প্রচণ্ড অজ্ঞতার শোধ দিতেছিল। সে বেচারা ভীত বিবর্ণ মুখে শুধু বলিতেছিল—"কিন্তু, কিন্তু, পরেশ-দাদা লিখে দিলেন যে।"

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময়

চারশত চৌত্রিশ বৎসর গত হইল পুণ্যভূমি নবদ্বীপে ভগবৎপ্রেম মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ২৫শে ফাল্গুন ১৪০৭ শক [১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃঃ] দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যার সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সবিস্তারে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর তিনি নবদ্বীপে গৃহস্থাশ্রমে কাটাইয়াছিলেন।

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥—চরিত।

তিনি ৩রা মাঘ ১৪৩১ শক [১৭ জানুয়ারী ১৫১০ খৃঃ] কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
* * * *
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
* * * *
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
চরিত। মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ।

তিনি আষাঢ় মাসের শুক্ল সপ্তমীর দিন অন্তর্দ্ধান করেন। [২৭ জুন ১৫৩৩ খৃঃ]। কিন্তু স্যর উইলিয়ম হণ্টর তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

In 1527 the apostle was mysteriously rapt away from mortal sight and five years later his royal convert followed him.

অর্থাৎ তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে আশ্চর্য্য রূপে অন্তর্দ্ধান করেন, তাহার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার রাজ-শিষ্য দেহত্যাগ করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস করিবার পর তিনি মোট অষ্টাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার তীর্থ ভ্রমণের কাল এই ১৮ বৎসরের মধ্যেই ধরা হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামীর স্পষ্ট উল্লেখের পর হণ্টরেরই ভুল হইয়াছে ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির আলোচনা করিলে চরিতামৃতের ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। আমার সন্দেহের কারণগুলি বলিতেছি সুধীগণ বিচার করুন।

মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ এই কয়খানি। বাংলাতে—(১)- কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, (২) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও (৩) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত। সংস্কৃতে—১। মুরারির কড়চা ও কবিকর্ণপুরের (ক) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (খ) বৃন্দাবন চম্পূ ও (গ) চৈতন্য-চরিত আর কয়েকখানি কড়চা। গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ প্রামাণিকগ্রন্থ বলেন, কেহ বলেন না। আমার বিশ্বাস গোবিন্দ নামক কোন ব্যক্তির অস্তিত্বই ছিল না। মহাপ্রভুর বহুকাল পরে কেহ স্বয়ং দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিয়া আপনার ভ্রমণকাহিনী মহাপ্রভুর নামে চালাইয়াছে।

কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ও ভক্ত কাঞ্চনপাড়া-নিবাসী শিবানন্দ সেনের পুত্র। প্রভুর আজ্ঞায় বালকের নাম পরমানন্দদাস রাখা হইয়াছিল।

তিনি চন্দ্রোদয় নাটকের শেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথা কর্ণিতং
গ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যৈকশেষং গতে,
কো জানাত শৃণোতু কন্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্ ॥

এই শ্লোকের অনুবাদ প্রেমদাস এইরূপ করিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য-কথামৃত যেথিনু শুনিনু যত
কোটীগ্রন্থে না যায় বর্ণন।
অজ্ঞান বালক হঞা আমি তার কৃপা পাঞা
কিছু মাত্র করিল লিখন ॥
গৌর-প্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে-সকল
স্মৃতিপথে গেল তারা সব।
পুস্তকে লিখিল যাহা সত্য হয় নয় তাহা,
অন্য কেবা জানিব শুনিব ॥
অতএব কৃষ্ণ তুমি সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি
অন্তর্ব্বাহ্য তোমাতে গোচর।
যদি সত্য লিখি আমি তবে তুষ্ট হঞা তুমি
প্রীতি হবে আমার উপর ॥

কবিকর্ণপুরের এই শপথের পর তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের আরম্ভে কর্ণপুর লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈলা অন্তর্দ্ধান,
বিরহ-বেদনায় রাজা আকুল পরাণ,
ইত্যাদি।

অর্থাৎ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বিরহে কাতর হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি মহাপ্রভুর

বিরহে বড় কাতর হইয়াছি। রথের সময়ে সেবা-অধিকার আছে, না আসিলেই নয়, সেই জন্য আসিয়াছি, নতুবা 'মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শূন্য।'" তিনি এই রূপে বহু বিলাপ করিয়া প্রভুর লীলা নাটক রূপে দেখাইতে আজ্ঞা করিলেন। এই উক্তিতে বোধ হয়, প্রতাপরুদ্রের জীবনকালে মহাপ্রভু স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন। যদিও প্রতাপরুদ্র এইরূপ অনুরোধ বা আজ্ঞা করিলেন, তথাপি তাঁহার জীবিতাবস্থায় এ নাটক লেখা হয় নাই। কেননা নাটকের শেষে কবি লিখিয়াছেন

শাকে চতুর্দ্দশশতে রবি-বাজি-যুক্তে, গৌরহরি ধরণি-মণ্ডল আবিরাসীত।
তস্মিংশ্চতুর্ণবতি ভাক্তি তদীয় লীলা গ্রন্থোয়মাবিত ভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

চৌদ্দশত সাত শকে, নবদ্বীপ পুরলোকে, গৌরহরি আবির্ভাব হৈল। চৌদ্দশত চোরানই, শক যবে গ্রন্থ এই, মোর মুখে প্রকট হইল।

প্রভু যদি আটচল্লিশ বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান করিতেন তবে আষাঢ় ১৪৫৫ শক [জুন ১৫৩৩ খৃঃ] অন্তর্দ্ধানের সময় হইত ও প্রতাপরুদ্রের তখন বাঁচিয়া থাকা ও নাটক লিখিতে আজ্ঞা করা উচিত হইত। কিন্তু ইতিহাসে পাই যে প্রতাপরুদ্র ইহার এক বৎসর পূর্ব্বেই ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার দুই পুত্র এক এক বৎসর বা অল্প কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী রাজবংশের সকল কুমারদের (এক প্রতাপরুদ্রের ৩২টি পুত্র ছিল) অসিমুখে ফেলিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। প্রাচীন রাজবংশ লোপ পাইল। প্রভু ৪৮ বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের জন্য রাজাকে শোক করিতে হইত না।

প্রতাপরুদ্র যখন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরও বাঁচিয়া ছিলেন তখন সন্ন্যাসের পর ১৮ বৎসর নীলাচলে বাসের মধ্যেই তীর্থভ্রমণের ছয় বৎসর ধরিতে হইবে, ও প্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় আষাঢ় শুক্ল সপ্তমী ১৪৪৯ শক [৬ জুলাই ১৫২৭ খৃঃ] ৪২ বৎসর বয়সে ধরিতে হইবে।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছয় বৎসর গমনাগমনে ধরা হয়, কিন্তু তিনি ছয় বৎসর নীলাচল ছাড়া ছিলেন না। বোধহয় এ কথা বলিবার অর্থ এই যে, সন্ন্যাসের পর প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ছয় বৎসরের পর আর কখন পুরী ত্যাগ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর মতন সতর্ক গ্রন্থকারের এরূপ ভুল আশ্চর্য্য বটে।

প্রভুর বয়স ২৪+১৮=৪২ বৎসর। শেষের ১৮ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরে গমনাগমন। এইরূপ পাঠই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

সুধীপাঠকগণ মধ্যে কেহ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান সন সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

মোহ

কে যায়?—"মানব-মনের মৃগ।"
কোথায়?—"মৃগ-তৃষ্ণিকায়!"
হায়রে মূঢ়! মরম-তৃষা
মরীচিকায় তৃপ্তি পায়!
"রূপের পথের পথিক আমি,
আগুন দেখে আর কি থামি?
পতঙ্গ ধাই পোড়ার পথে—
দীপের মুখে দীপ্তি ভায়!"

কে যায়?—"তোমার চিত্ত-চাতক।"
কোথায়?—"বোশেখ-অম্বরে!"
কই সে বারিদ, কই সে ধরা,
কাজরী-সুর-ছন্দ রে?
"আকাশ তাহার দিন-বীণাটির
রোদের তারে দিয়েছে মীড়,
এখন 'ফটিক-জলের' দীপক-রাগ
যাক্ ফেটে' মোর কণ্ঠ রে!"

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

সেলাইএর কল

(১)

সুরম্য সুসজ্জিত ঘরের ভিতর বড় টেবিলের কাছে বসিয়া বাড়ীর গিন্নী চোখে চশ্‌মা আঁটিয়া নিপুণ হস্তে সেলাই করিতেছিলেন। ঘরময় ছোট ছোট শিশুগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক-একবার একজন আসিয়া মাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া যাইতেছিল। মা দুইহাতে কাপড়ের ছোট ছাঁটগুলিকে নিজের দিকে টানিয়া ছোট যন্ত্রপাতিগুলি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। ঘরের আর-একদিকে একটি বছর দশেকের মেয়ে ফ্রকের হাতায় লেশ বসাইতেছিল। সে উঠিয়া আসিয়া মাকে কহিল, "দেখ তো মা হয়নি ?"

মা তখন নিজের কাজ লইয়াই অতি ব্যস্ত, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "হ্যাঁ হয়েছে।"

মেয়ে বুক ফুলাইয়া কহিল, "তুমি ত আগে থাকতেই ব'লে বসো আমি পারব না।"

দিনটি গরমের উপর ঠাণ্ডা পড়িয়া আরাম উপভোগের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ নামিয়া দাবদগ্ধা ধরিত্রীর শুষ্ক বুক জুড়াইয়া শীতল করিয়া দিতেছিল। ভিজা মাটির সোঁদাগন্ধ ঘরের মধ্যেও ঢুকিয়া মানুষের প্রাণেও অতীত স্মৃতির অস্পষ্ট আভাস জাগাইয়া একটি বিচিত্র হিল্লোলে দোলাইয়া দিতেছিল। তৃষিত চাতকগুলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জল খাইয়া বাঁচিতেছিল।

একটি বছর তিনেকের ছেলে নিজের একটি ধোয়া পাজামা লইয়া বারান্দার সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ঝিয়ের অনুকরণে সেটি আছাড়িয়া কাচিতেছিল; তার ছোট ভাই, দাদার এ হেন কৃতিত্বে পরম সুখী হইয়া, আর-একখানা কাপড় আগাইয়া দিতেছিল।

"ওমা কলের সে ঢাকাটা গেল কোথায় ? মিনু, যা মা ভাখ্‌ ভাখ্‌".....

মিনু মায়ের ডাকে উঠিয়া গিয়া খোকার হাত হইতে সেটা লইয়া কহিল, "দেখ্‌চো মা, খোকা কাচ্‌তে যাচ্ছিল। আচ্ছা না, এতে কি চমৎকার রেশম দিয়ে অক্ষর তুলেচে! এটা কে করেছে মা ?"

মা অক্ষরটার দিকে একটু চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "যে কলটা দিয়েছে সেই করেছে।"

"কে সে ? দোকানদার ?"

"না দোকানদার নয়। আমার বিয়ের দিনে ওটা আমি পেয়েছিলাম, কে যে দিয়েছিল তা আমার বাবাও জানেন না, ভিড়ের মধ্যে কে কখন দিয়ে গিয়েছিল।"

মিনু সেই ঢাকাটা কলের গায়ে পরাইতে পরাইতে কহিল, "তা বেশ তো, তোমারই লাভ হয়ে গেল।"

মা উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কলটা যে দিয়াছিল তাহাকে মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কলের গায়ে চিরবসন্তের হাসির মত গোলাপী রঙের বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল স্নেহ-উপহার। ভাবিতে গিয়া তাঁহার চিরদিন যাকে মনে পড়ে সেদিনও তাহাকেই মনে পড়িল। বারো বৎসর পূর্ব্বের কোনো কথা স্পষ্ট মনে ছিল না, তবু যখন সেই একখানি তরুণ মুখ মনে পড়িয়াছে, তখনি মনে হইয়াছে, সে যেন চিরসুন্দর। মেয়ের দিকে চাহিয়া মেয়ের মা মনে মনে ভাবিলেন, "আহা আমার মিনুর যদি তেমনি সুন্দর একটি বর হতো!" কিন্তু সে ছিল এক নগণ্য দরজি। এই বিলাসী ধনীর দুয়ারে তার মত কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

(২)

বাজারের ঠিক মাঝখানে মীনাজ দরজির লাল রঙের একতলা ছোট দোকান ছিল। মীনাজের বাবা পাটনা কি আরা এম্‌নি কোন্‌ একটা জেলার মুসলমান। কিন্তু দেশে কি একটা অপরাধ করিয়া সে বাংলা মুল্লুকে পলাইয়া আসে। খর্ব্বকায় আকৃতির জন্য বেঁটে মুসলমানের অখ্যাতিও তার ছিল। কিন্তু মীনাজের আকৃতি যেমন তার পিতার বিপরীত ছিল, প্রকৃতিও ছিল তাই। সে "বাপ্‌কা বেটা" হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য সন্তান ছিল। বাপের তামার মত পোড়া বর্ণের পরিবর্ত্তে তার বৈশাখী চাঁপার মত বর্ণ আর শক্ত দৃঢ় কঠিন চেহারার পরিবর্ত্তে ছিপ্‌ছিপে পাতলা, একটু দীর্ঘায়তন হাসিমাখা সুন্দর চেহারা। ইংরেজি হাইস্কুলে সে ফার্ষ্ট ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তার পর বাপের সঙ্গে জাতব্যবসা আরম্ভ

করিয়াছে। তবে লেখাপড়ার নেশাটা তাহাকে ভূতের মত চাপিয়া ছিল। সারাদিন বাপের নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রের মত সে কলের ছুঁচের মুখ হইতে ফরমাইস মত সেলাইগুলা বাহির করিয়া দিয়া তারপর সময় পাইলেই বইতে মুখ গুঁজিত। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা অনেকে সেই পথ দিয়া যাতায়াতের সময় খোলা জানালাটার কাছে যেখানে মীনাজ নতমুখে ঘড়্‌ঘড়্‌ করিয়া কল চালাইয়া যাইত সেইখানে একটু উঁকি দিয়া সহাস্য কৌতুকের সহিত কহিত, "সেলাম মিঞা সাহেব।" ঘাড় তুলিয়া একটু হাসিয়া মীনাজ কহিত, "সেলাম, সেলাম।" এইসব ছাত্রদের অনেকতক বড়লোকের ছেলেও ছিল। যাহাদের সঙ্গে মীনাজ এককালে একই বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়াছে এখনও তারা মীনাজকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে।

পূজার সময় আসন্ন। মীনাজের বাপের ছোট দোকানটিতেও অনেকগুলি গ্রাহক জুটিয়াছে। দুই বাপে বেটায় চব্বিশ ঘণ্টা খাটিয়াও কাজ চুকাইয়া ফেলিতে পারিতেছে না বলিবারও জো নাই, কারণ হয়ত এখনকার এই রোজগারেই মাস তিনেক চালাইতে হইবে। ভাদ্রমাস শেষ হইয়াছে মাত্র। ভরা ভাদ্রের জলে তখনও চারিদিক জলে ভিজা। আকাশের এক-একদিকে ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া নবাগত শরতের স্বর্ণোজ্জ্বল নির্ম্মল আকাশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার কাদা শুকাইয়া কঠিন হইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। মীনাজের মনটা একবার বাঁশী লইয়া বসিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কিন্তু হাতে তাগাদার কাজ, উঠিবার উপায় নাই। আদালতের একজন পেয়াদা খানিকটা ফিকা নীল রঙের রেশমী কাপড় কিনিয়া পাঞ্জাবী করিতে দিয়াছিল। তখন সেইটা তাহার হাতে ছিল। একটা অনুচ্চ মিষ্ট শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল—একটি বছর দশেকের ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে তাহার দোকানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটির পায়ে ছোট ছোট লাল মক্‌মলের জুতা, গোল গোল শুভ্র হাতে আঁটিয়া গাছ কয়েক মূল্যবান সোনার চুড়ী, কপালের উপর চুলে আট্‌কানো একটি দামী-পাথর-বসানো ছোট প্রজাপতি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। মীনাজ আশ্চর্য্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এ ধনীর দুলালী এখানে আসিল কোথা হইতে? সেই সময় সেই পাঞ্জাবীর ফরমাইস-দাতা পেয়াদা আসিয়া কহিল, "কি ভাইসাহেব, হয়েছে তো?"

মীনাজ তাড়াতাড়ি সেলাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "না ভাই, একটু বাকী আছে, ও-বেলা এস, পাবে।"

লোকটা বিরক্ত হইয়া কহিল, "এ-বেলা ও-বেলা ক'রে কেবলি তো হাঁকাচ্ছো, এত সময় পাই কোথা বল দেখি?"

মীনাজ হাসিয়া কহিল, "না, এইবার হয়ে যাবে।"

লোকটা কহিল, "পরের চাকরী করি, এই দেখ, ডেপুটি-বাবুর বাড়ী আছি মোতায়েন, তাঁর মেয়েকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে এসেছি তাই আস্‌তে পেয়েছি।"

মীনাজ সসম্ভ্রমে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিল—সে দোকানের এক কোণে কতকগুলি রং-বেরঙের কাটা কাপড়ের টুক্‌রার পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

পেয়াদা কহিল, "ওগুলো তোমাদের দরকারী না কি?"

মীনাজ ঘাড় নাড়িতেই মেয়েটি পরম উৎসাহে পুতুলের জন্য সেগুলি কুড়াইতে বসিয়া গেল। মীনাজ প্রাণপণে ঘাড় গুঁজিয়া সেলাইতে মন দিল। ক্ষণকাল পরে মাথা তুলিয়া দেখিল মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে। মাথা তুলিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মীনাজ বাহিরে চাহিল—মেয়েটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

(৩)

সেই দিনই সকল কাজ ফেলিয়া মীনাজ সেই পাঞ্জাবীটা শেষ করিয়া ফেলিল। তাহাদের একটি মাত্র কল, পিতা পুত্রে কাজ করে, সেজন্য তাহাদের অনেকখানি সময় ক্ষতি হয়, তাই মীনাজ অনেক দিন হইতে আর-একটি কল কিনিবার জন্য বলিতেছে এবং এই নূতন কলটি যে কেবলমাত্র মীনাজেরই হইবে, সে কথাও বাপের সঙ্গে হইয়া গিয়াছে। সেই কলের জন্য বাপকে একটা নিয়মিত তাগাদা দিয়া মীনাজ তার সেই খোলা জানালায় আসিয়া বসিল। তার উৎসুক চক্ষুদুটি কল ছাড়িয়া কোন্ সময়ে রাস্তার পানে অপলক দৃষ্টি পাতিয়া চাহিয়া রহিল। এক সময় চকিতে মীনাজ বুঝিল, কই তার মন ত আজ সূর্য্য-সাগরে ডুবিয়া নাই। কোন্ একটা অজ্ঞাত প্রতীক্ষায়

পথপানেই চাহিয়া আছে। সেই পেয়াদা আসিয়া ঢুকিতেই মীনাজ লক্ষ্য করিল সে একা। মীনাজ নিঃশব্দে তার জামাটি বাহির করিয়া দিল। সে জামাটি গায়ে দিয়া কহিল, "মোটে পনর মিনিট আমার সময়।" তারপর প্রসন্ন মুখে কহিল, "হ্যাঁ বেশ হয়েছে; তা ও-বেলা এসে তোমার মজুরীটা দিয়ে যাব, কি বল ভাই?"

মীনাজ কহিল, "আচ্ছা।"

লোকটা চলিয়া গেল। মীনাজের মনের ভিতরটা প্রভাতের মধুর আলোয় আলোয় ভরিয়া গিয়াছিল। পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ-আলোকের মূল সুইচ্ টেপার মত একবার দপ্ করিয়া সব অন্ধকার কালো হইয়া গেল। সে সবিস্ময়ে ভাবিল, আমি কি এই খরিদ্দারের প্রত্যাশায় বসে ছিলাম নাকি?

দিন পাঁচ সাত কাটিয়া গেল। মীনাজের প্রতীক্ষার আর শেষ নাই; প্রতি প্রভাত হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত। দরিদ্রের দুর্ম্মূল্য সময় এইভাবে বৃথায় কাটাইয়া তার মনে মনে একটা তীব্র অনুশোচনা জাগিয়া উঠিলেও ঐ সময় সে সব ভুলিয়া যাইত। অতঃপর সে প্রতিদিন এইখানি সময় আপনার এই উন্মাদ মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হইতে লাগিল। বাসায় ফিরিতে তাহার অনেকখানি বেলাও হইয়া যাইত। একজন বড় উকীলের ছেলের সহিত মীনাজের কিছু হৃদ্যতা ছিল। এক ডজন রুমালের কানি মুড়িবার জন্য সে তাহাকে কাপড় দিয়াছিল। তাহাদের বাসা বাজারের অনেক দূরে। মীনাজ সেই রুমালগুলা কাগজে মুড়িয়া তাহাকে দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া দুয়ারে দাঁড়াইতেই একটা উৎকট আনন্দে তাহার গতিরোধ হইয়া গেল। দেখিল সেই মেয়েটি নিবিষ্ট মনে কাপড়ের টুক্‌রা বাছিতেছে, মীনাজকে দেখিয়া কহিল, "ও দরজি, এর মধ্যে সে টুকরোটা যে খুঁজে পাচ্ছিনে, তুমি কাকে দিয়ে দিয়েচ?"

মীনাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিতেছিল, সে রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিল, "কোন্‌টা? কি রঙের?"

মেয়েটি বিরক্ত হইয়া কহিল, "সে রঙের যে আর নেইই।"

মীনাজও বসিয়া বাছিতে লাগিল। কিন্তু মেয়েটির পছন্দমত টুক্‌রা না পাইয়া কহিল, "আমার দোকানে ত তেমন ভাল টুক্‌রো থাকে না, আচ্ছা আমি অন্য দোকান থেকে এনে দেবো।"

"আচ্ছা, দিও, দেবে তো ঠিক।"

"হাঁ দেবো বই কি?"

বাইরে বুড়া দরোয়ান বার চার তাগাদা করিলেও মেয়েটি নির্ব্বিকার মনে মীনাজের কলটার দিকে ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর যাইবার সময় বারংবার বলিয়া গেল, "দেখ আমাদের পুতুলের বিয়ে হবে, জামা তৈরী কর্‌তে ভুলে যেও না যেন।"

মীনাজ একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

(৪)

মীনাজের বাপের সেই দৃঢ় সবল দেহটা কিছুদিন হইতে একটা ব্যথায় কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সেলাইএর তাগাদার অধিক পরিশ্রম করিয়া সেই ব্যথা ও জ্বরে সে শয্যাগত হইয়া পড়িল। মীনাজ ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইল। ডাক্তার জানাইলেন লিভারের উপর ফোড়া হইয়াছে, অস্ত্র করিতে হইবে। কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই উচিত। মীনাজের হাতে তখন বেশ পয়সা জমিয়াছে, সে বাপকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইবার উদ্যোগে লাগিল। বাঁধিয়া ছাঁদিয়া জিনিষপত্র জোগাড় করিতে সে যখন অতি ব্যস্ত সেই সময় একখানি টম্‌টম্ আসিয়া তাহার দুয়ারে থামিল, তাহাতে একটি বারো তের বৎসরের ছেলের সহিত সেই মেয়েটি। মেয়েটি লাফাইয়া পড়িয়া কহিল, "দরজি, আমার সেই টুক্‌রো? দাও দাও।"

মীনাজ সেটা আনিয়া হাতে দিতেই সে ঘরের মধ্যে চাহিয়া কহিল, "ব্যাগ গোছাচ্ছো কেন তুমি?"

মীনাজ কহিল, "আমার বাবার অসুখ করেচে তাই কল্‌কাতা যাব।"

মেয়েটি উৎসাহিত হইয়া কহিল, "ওঃ কল্‌কাতা যাবে তুমি! তা দেখ, আমার জন্যে একটা সেলাইএর কল কিনে এনো তো? বাবা বলেন যে, যে কল্‌কাতা যাবে তাকে দিয়ে আমার কল আনিয়ে দেবেন।"

ছেলেটি ডাকিল "আভা"। মেয়েটি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

একবৎসর পরে মীনাজ যখন ফিরিয়া আসিল তখন তার বাপ মারা গিয়াছে। বাপের মৃত্যুর পর দশ মাস এদিক ওদিক বেড়াইয়া সে ফিরিয়াছিল। সেদিন তার পাড়ায় খুব উৎসব লাগিয়াছিল ডেপুটি বাবুর মেয়ের শুভবিবাহ। মীনাজের মনটা এ সংবাদে অকারণ একটা তীব্র ব্যথায় বিষিয়া উঠিল। একাকী অন্ধকার শয্যায় পড়িয়া বিবাহের বাজনা শুনিতে শুনিতে সে বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। একটা বেতের প্যাট্‌রার ভিতর খানিকটা গোলাপী রঙের মোটা জাপানী সিল্ক ছিল, সেইখানি বাহির করিয়া বাতি জ্বালিয়া সেলাই করিতে বসিল। গোলাপী রেশমে বড় বড় অক্ষরে লিখিল "স্নেহ-উপহার।" সেই কাপড়ে একটা হেরাটোপ সেলাই করিয়া সেটা বৃদ্ধ কলের গায় পরাইয়া বাবুর্চ্চিকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়া সে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের ছোট একটি বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া ও টুপিটি মাথায় দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। মীনাজের সে দোকানে আর কেহ কখনো স্নিগ্ধ হাসিমাখা তরুণ মুখখানি দেখিতে পায় নাই।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

দেশের কথা

অন্ন।

চতুর্দ্দিক হইতে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে, তাহা বড় ভয়ানক। অসময়ে বৃষ্টিপাতের দরুণ আগুধান একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অন্য দিকে চাউল, ডাউল, কাপড়, কাগজ প্রভৃতির মূল্য হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এখন প্রতিদিনই কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। ভারতবাসী ধৈর্য্যের চরম সীমায় উঠিয়াছে। লোক সুসময়ের আশায় কোনমতে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু দিন দিন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতের দিকে যতটা দৃষ্টি যায়, তাহাতে আর আশার ক্ষীণ রেখাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অভাবের তাড়নায় লোকের মুখের হাসি লয় পাইয়াছে। ছেলে বুড়ো সকলের মনেই এক বিষাদ-কালিমা পতিত হইয়াছে। এইরূপভাবে বাঁচিয়া লাভ কি? তাই বলিতেছিলাম, আসুন, সকলে মিলিয়া ইহার প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করিয়া মুস্কিল আসানের জন্য লাগিয়া যাই।—যশোহর।

আজকাল দুর্ম্মূল্যতার দরুণ বাংলার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এবং শ্রমজীবীগণকেই বেশী ভুগিতে হইতেছে। যাহাদের টাকা আছে—যেমন জমিদার, ব্যবসায়ী—তাহাদের বেশী কিছু ভাবিবার নাই, অন্য দিকে গ্রামের কৃষকগণ যাহারা নিজ হস্তে হলচালনা করিতে পারে, দু'বেলা দুটি অন্নের জন্য তাহাদিগকেও ভাবিতে হয় না। কৃষিজাত উৎপন্ন প্রত্যেক জিনিষের মূল্যই তিন চারি গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে গুড়ের মন ২৲। ৩৲ টাকার স্থলে ৯৲। ১০৲ টাকা হইয়াছে, চিনির মন ৮৲। ৯৲ টাকার স্থলে ৩০৲। ৩৫৲ টাকা হইয়াছে। যত বিপদ তথা-কথিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের। ইহাদের বেতন বাড়িয়াছে কিন্তু আয় বাড়ে নাই। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। অনেকে একবেলা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি বরিশাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, যে তথাকার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ অত্যন্ত যাই পাইতেছেন। তাহারা না খাইয়া মরিবে সেও আচ্ছা, তবু মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না। রামকৃষ্ণমিশন বরিশালের মধ্যবিত্ত দরিদ্র লোকদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষার জন্য সাধারণের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন।—যশোহর।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—বরিশালের সর্ব্বত্রই চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। গরীব মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মনে ত্রাস জন্মিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি, চাউলের দর না কমিলে বড়ই বিপদের কথা। আশা করি গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান করিবেন।—কাশীপুরনিবাসী।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য—খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্ম্মূল্যের দরুণ সরকারী কর্ম্মচারীগণ বেতন বৃদ্ধি চাহিতেছে, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করাই দায় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে ভাত কাপড় দিয়া না বাঁচান তাহারা যাইবে কোথায়? বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি করিলে তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে। কিন্তু যাহারা বেতন পায় না, যাহাদের জমি জমা নাই, তাহারা যাইবে কোথায়? রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন রৌপ্য মুদ্রার অভাব হওয়ায় জিনিসের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ জানিয়া আমাদের কি হইবে? অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ তত্ত্ব নির্ণয় করুন। দেশের লোককে পেট ভরিয়া খাওয়াইবার গবর্ণমেণ্ট উপায় করুন। তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।—ত্রিপুরাগাইড।

দেশী বিলাতী সকল রাজকর্ম্মচারীগণের বেতনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু ব্যয়ের অনুপাতে আয় বাড়িতেছে না। সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন এবং অন্যান্য ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আসল কাজে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থের অনাটন পড়িবে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারীগণও বর্ত্তমান আয়ে পরিবার-প্রতিজনকে পালন করিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্যয় বৃদ্ধি যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেই হইবে ইহার পর প্রজার উপর ট্যাক্স বসাইলে প্রজা একেবারে জাহান্নামে যাইবে। সুতরাং আয় বৃদ্ধির একমাত্র পথ উন্মুক্ত আছে—তাহা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি করা। অন্যান্য সভ্য দেশে পণ্যদ্রব্যের উপর যে শুল্ক আদায় হয়, তাহাতেই গবর্ণমেণ্টের অবস্থা সচ্ছল হয়। এই সমস্যার একমাত্র উপায় হইতেছে রাজা-প্রজার সম্মিলনে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করা। রাজা চেষ্টা না করিলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির আশা করা বৃথা।—যশোহর।

অনশনে মৃত্যু—খুলনা জেলার কোন একটি স্থানে অন্নাভাবে ১৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এ কলঙ্ক যে কিছুতেই ক্ষালন করা যাইবে না।—বীরভূমবাসী।

অনাহারে মৃত্যু—খুলনার একখানি স্থানীয় কাগজ প্রকাশ ঐ

জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন গাবুরা ইউনিয়নে না খাইতে পাইয়া উনিশটি লোক প্রাণ হারাইয়াছে। আরও কতলোক উপবাসে দিন কাটাইতেছে। শুধু খুলনায় নহে, খোঁজ লইয়া দেখ দেশের সর্ব্বত্রই কত শত শত সহস্র সহস্র লোক উপবাস করিয়া বা আধপেটা খাইয়া দিন গুজরান করিতেছে। আজ না খাইতে পাইয়া উনিশজনকে প্রাণ দিতে হইয়াছে; কাল হয়তো উনিশ হাজারকে প্রাণ দিতে হইবে। —ত্রিপুরাহিতৈষী।

জল।

আমাদের এই বঙ্গদেশে এক্ষণে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের প্রায় সকল স্থান হইতেই জলকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আজকাল অনেক পল্লীগ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয়। অনেকস্থলেই তাদৃশ ধনশালী লোক নাই। সুতরাং সে-সকল স্থানে জলাশয় খনন অথবা প্রাচীন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেই-সকল স্থানে রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ বিশেষ আবশ্যক। তাঁহাদিগের চেষ্টা ব্যতীত দরিদ্র প্রজাগণ এই নিদারুণ জলকষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—

"পানীয়ং প্রাণিনঃ প্রাণাঃ, পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাশ্বতী॥"

অর্থাৎ জল জীবের জীবন, জল অতি পবিত্র পদার্থ, এই জলদানে সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি সাধন হউক। এই বঙ্গদেশে সে পূর্ব্বভাব বজায় নাই। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলনিদান ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। আধুনিক দানের মূলে রাজসম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। ইংরেজ গভর্মেণ্ট যদি দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে দেশে জলাশয় খনন প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুরোধ করেন তাঁহারা সে কার্য্যে অবশ্যই মনোযোগী হইবেন। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড পল্লীগ্রামে ইন্দারার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহা সংখ্যায় অল্প। দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান হউন। আগামী শীত ঋতুতে আমাদের সম্রাটপুত্র ভারতে শুভাগমন করিবেন। তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ দেশের প্রত্যেক জমিদার ও সম্পন্ন লোক নিজ নিজ এলাকায় এক একটি পুষ্করিণী বা ইন্দারার ব্যবস্থা করিয়া দিউন। ইহাতে দেশের কাজও করা হইবে এবং সম্রাটপুত্রকে সম্মান প্রদর্শনও হইবে। পানীয়াভাবে মৃত্যুমুখ হইতে দেশের লোক রক্ষা পাইবে এবং তাঁহাদিগের প্রভূত অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে।—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

পাবনা, নদীয়া, হুগলি জেলায় স্থানে স্থানে জলকষ্টের সংবাদ রায়ত, মোহাম্মদী, চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের জলকষ্ট ত চিরকাল আছেই। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—

পাবনা সহরে শোচনীয় জলকষ্ট উপস্থিত। এরূপ জলাভাব আমরা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই বা তদ্বিষয়ে কিছু শুনি নাই। এক্ষণে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ কতক গুলা ইন্দারা ও পুকুর খনন করাইয়া না দিলে জনসাধারণ জলাভাবে মারা যাইবে। ধনীর অর্থ যে কতভাবে অপব্যয়িত হয় তাহা আর খোলসা করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। সম্প্রতি এই সহরের কোন অপুত্রক ধনবান একটি শিশুকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাহার নামে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ধনীগণ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অর্থের যথার্থ ব্যবহার জানেন না।—সুরাজ।

কলের জল না পাওয়ায় যশোহর সহরবাসীর পানীয় জলের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।—যশোহর।

বস্ত্র।

বস্ত্রসমস্যা—খাওয়া ও পরা এই দুইটি মানুষের পক্ষে অনিবার্য্য। আর্য্যার শেষোক্তটি অধিকতর প্রয়োজনীয়। মানুষ দু'এক বেলা না খাইয়াও কোনরূপে কষ্টে থাকিতে পারে, কিন্তু বস্ত্র পরিধান না করিয়া মানুষ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। যুদ্ধের পর হইতে বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে দীন দরিদ্র লোকের পক্ষে বস্ত্র ব্যবহার ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। আর যে কাপড় সস্তা হইবে সেরূপ কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না, অধিকন্তু আরও দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধির আশঙ্কাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারই বস্ত্রবয়নের কলকারখানার কেন্দ্র। এখান হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে সুতি কাপড় রফতানি হয়। এক ভারতেই ৪০ কোটি টাকার কাপড় আমদানি হয়। যুদ্ধের সময় কাপড়ের কলের শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করিয়া শতকরা ২৪০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া শতকরা আরও ৩০৲ বেতন বৃদ্ধির দাবী উপস্থিত করিয়াছে। কারখানার মালিকগণ যদি তাহাদের এই দাবী পূর্ণ করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের কাপড়ের কলের কুলিরা যে বেতন পাইত এখন তাহার উপর শতকরা তিনশত টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে মাসিক একশত টাকা পারিশ্রমিক পাইত এখন তাহারা ৩০০৲ পাইবে। সুতরাং কাপড়ের মূল্য হ্রাস পাইবার আশা ত নাইই, অধিকন্তু কাপড় পাওয়াও সঙ্কটজনক হইবে। এসময় জনাব এহলামাবাদী হাজেবের প্রস্তাবিত স্বদেশী খেলাফৎ ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের অভাব মোচন, খেলাফৎ সমস্যার জন্য বিদেশী বর্জ্জন এবং লাভজনক ব্যবসায় অর্থাৎ সকল দিক দিয়া দেশের জন্য নিতান্ত মঙ্গলদায়ক হইত।—মোহাম্মদী।

স্বাস্থ্য।

রোগ—ঘরে ঘরে রোগের প্রাদুর্ভাব, ডাক্তারদের শ্বাস ফেলিবার সময় নাই। সহরে ত ডাক্তার কবিরাজ মিলে। মফঃস্বলের অবস্থা শোচনীয়, ইনফ্লুয়েঞ্জাতে দলে দলে লোক মরিতেছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই। ভ্রমণশীল ডাক্তারগণ সহরের আশেপাশে ঘুড়িয়া বেড়ায়, গ্রামের লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে।

—ত্রিপুরা-গাইড।

ডাক্তারি স্কুল—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালায় কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল খুলিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দিন দিন রোগ পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে ডাক্তারী স্কুল কলেজ বৃদ্ধি করাই ত আবশ্যক।

—বীরভূমবার্ত্তা।

গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত বেলগাছিয়া কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজে ৯ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সম্প্রতি কলুটোলার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় ৭০ সহস্র টাকা ব্যয়ে উক্ত কলেজে একটি দাতব্য ডিস্পেন্সরী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবং ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক ১২০০৲ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে রোগের যেরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছে তাহাতে সত্বর আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল স্থাপনের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।—যশোহর।

পাটনায় মেডিকেল কলেজ—আমরা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, পাটনায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইতেছে। আজকাল কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ও বিশেষতঃ ছাত্রসংখ্যার আধিক্য হেতু মেডিকেল

কলেজে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত, ছাত্রগণকে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, তাহা দেখিয়া সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন যে, বঙ্গের বিভিন্ন অংশে, আরও এক বা একাধিক মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এসম্বন্ধে আমরা মহামান্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের অলৌকিক সদাশয়তা ও বদান্যতার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম তিনি এতদুপলক্ষে ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—প্রতিকার।

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা—মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী মণ্ডলপুর গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ গ্রামের ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত হরিপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয় জেলাবোর্ডের হস্তে ১৪ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।—সম্মিলনী।

মুর্শিদাবাদ তালিবপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনকল্পে উক্ত গ্রামের মৌলবী গোলাম মহবুব ছাহেব ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে ৭ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—মোহাম্মদী।

রাজসাহী টাউনের মাড়োয়াড়ী মহাজন জ্ঞানিরাম বাবুর পৈত্রিক বাসস্থান জয়পুর রাজ্যে। তথায় তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য এককালীন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—হিন্দুরঞ্জিকা।

বাঙ্গালার ধাত্রীগণের শিক্ষার ব্যয় জন্য সরকারী বজেটে ৬৫০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—বীরভূমবার্ত্তা।

শিক্ষা।

[illegible]ান—পুনা মহিলা কলেজে মিঃ ডি এল গাডা ৫০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে মিঃ গাডা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।—বঙ্গরত্ন।

লর্ড সিংহ গোখলে মিমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।—বীরভূমবার্ত্তা।

লালগোলা টেক্‌নিক্যাল স্কুল—লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কে, সি, আই, ই, রাজবাটীতে একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই উপযুক্ত কর্ম্মকার, সূত্রধর, বস্ত্র-সতরঞ্চী-কম্বল-নির্ম্মাতা নিযুক্ত করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার ছাপাখানার কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

কুমিল্লা সদর মহকুমার শ্রীযুত করুণাকিশোর কর বি, এল মহাশয় চৌদ্দগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপনের জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। দেশের কৃতীসন্তানগণের নিকট দেশ এই ত চায়।

—যশোহর।

বীরভূমনিবাসী চাইবাসার উকীল রাখালচন্দ্র চাটার্জ্জি বীরভূম সহরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আঠারো হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—বঙ্গরত্ন।

আশ্রয়।

লালগোলার মহারাজ বাহাদুর। কাশীতে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

স্বাবলম্বন।

ধর্ম্মগোলা—বাঁকুড়ায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার কারণ এই যে বাঁকুড়া সম্পূর্ণরূপে দেবমাতৃক দেশ। যে বৎসর বৃষ্টি অল্প হয় বা অসময়ে বৃষ্টি হয় সেই বৎসর হাহাকার পড়িয়া যায়। এ জেলায় কঙ্কর প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ভূমিই বেশী। আজ দ্বাদশ বৎসরেরও অধিক হইল বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস "বাঁকুড়া-দর্পণে" এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যে, এখানে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করা উচিত। বাঁকুড়ার বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট ভাস সাহেবও এক্ষণে সেই মতের পক্ষপাতী। তাঁহার চেষ্টায় এক্ষণে বাঁকুড়া জেলায় ১২টি ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সুফল ফলিবে নিশ্চয়। তাঁহার এই শুভ চেষ্টা সফল হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। যে কয়টি গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের নাম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সাধারণের চাঁদার টাকা হইতে প্রত্যেক গোলায় তিনি ২০৲। ২৫৲ টাকা সাহায্য দানের প্রস্তাবও করিয়াছেন।

গ্রামের নাম	থানা
১। মান্দারবনী	ওন্দা
২। রামসাগর	ঐ
৩। সুরমানগর	ঐ
৪। লাপুড়	ঐ
৫। অযোধ্যা	জয়রামপুর
৬। লায়েকবাঁধ	ঐ
৭। রাধানগর	ঐ
৮। ভড়া	ঐ
৯। চুয়ামসিনা	ঐ
১০। দ্বারকা	বিষ্ণুপুর
১১। রূপটগঞ্জ	সোনামুখী
১২। ধনসিমলা	ঐ

মাইপুর, রাণাবান্দ, খাতড়া, ইন্দপুর, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটী, শালতড়া এবং বড়জোড়া থানার এলেকাতেও দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন দেখা যায়। ঐ সকল থানারও কয়েকটি বড় বড় গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইলে ভাল হয়। ইহা কেবল স্থানীয় লোকের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। মহাজনগণ অতি উচ্চ হারে বাড়ি সহ ধান্য আদান করেন। এইসকল ধর্ম্মগোলার প্রজারা সুসময়ে যে ধান্য মজুদ রাখিবে তাহাই তাহারা অসময়ে অতি সামান্য সুদে প্রাপ্ত হইবে, আর সে সুদের ধান্যেও তাহাদের ভাণ্ডার পুষ্ট হইবে। সমবায় সমিতির রীতি অনুসারে পরস্পরের সাহায্যে প্রত্যেকেই লাভবান হইবেন। সমবায় নীতির প্রসারের জন্য সকলেরই এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

—বাঁকুড়া দর্পণ।

গ্রাম্যসমিতির সদনুষ্ঠান—জেলা ২৪ পরগণা, সোনারপুর গ্রামনিবাসী কয়েকজন বিশেষ ভদ্রলোকের চেষ্টায় ঐ গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার, জল-নিকাশ ও সুপেয় জল সম্বরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

—রায়ত।

জীবন-রহস্য

মৃত্যু যারে বলি মোরা মৃত্যু সে ত নহে,
সে যে এই জীবনেরে যুগে যুগে বহে;
মরণের মাঝে আছে সুগুপ্ত জীবন,
শক্তিহীনে শক্ত করে জীবন্ত মরণ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

মিশরের রাজধানী কায়রো

মিশর দেশ ভারতবর্ষের চেয়েও প্রাচীনতর সভ্যতার লীলাভূমি। মিশর দেশকে আগে ভারতের লোকে মিশ্রস্থান বা বর্ব্বর দেশ বলিত, এবং সে দেশের লোককে বলা হইত শ্যামমুখ। মিশর মানুষের ভাগ্যের অনেক উন্নতি অবনতি দেখিয়া আসিতেছে। অন্যান্য কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু যদি মিশরের পিরামিডের কথা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, এখানকার সভ্যতার রীতি-নীতি কত উন্নত ছিল। পিরামিডগুলি বড় বড় লোকের কবর মাত্র। ইহাদের মধ্যে ঘর করিয়া মৃতদেহ রাখা হইত। কত-শত যুগের পর আজ অবধি সেই-সমস্ত মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তাদের পরিচ্ছদ ও ভূষণ পর্য্যন্তও এখনও অবিকৃত। শরীর হইতে নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া হাড় ও মাংসকে যুগের পর যুগ অবিকৃত রাখার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কোন জাতি দুই দিনে অর্জ্জন করিতে পারে না। ইহা হইতেই জানা যায় মিশরের সভ্যতা কত প্রাচীন। এই প্রবন্ধে আমরা মিশরের রাজধানী কায়রোর বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

আধুনিক কায়রো আব্বাসিয়ার এক চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই আব্বাসিয়া নাম আসিয়াছে প্রথম খাদিভ্ আব্বাসের নাম হইতে। আব্বাসিয়ার খানিক অংশ তিনি গড়িয়া তুলেন। কায়রোর বড় বড় বিস্তৃত সৈন্যাবাসে কতকগুলি ব্রিটিশ সৈন্য বাস করিতেছে। তার পাশ দিয়া জিতান, ওয়েসিস্, কুব্বা, হেলিওপলিস্ এবং মাতারিয়া প্রভৃতির উপকণ্ঠস্থ সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাওয়া যায়। রাজধানী হইতে তিন মাইল দূরে কায়রোর রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। মহম্মদ আলি নীল নদীর তীরে

কায়রোর প্রকাণ্ড পিরামিড ও স্ফিঙ্ক্স্।

প্রাসাদটি গঠন করেন, তার চারিদিকে মনোরম বাগান। শুব্রার পথে ভ্রমণ করা আগে খুব আনন্দের বিষয় ছিল,—পথটি বড় বড় গাছের নিবিড়-পত্র-ভারে ছায়াময় ও শীতল। কায়রোর পশ্চিম দিকে নীল নদীর প্রাচীন বিখ্যাত বন্দর বুলাক্ অবস্থিত। মিশরের এই নদীকে নীল নদী বলার একটু ইতিহাস আছে। ইহার জল সর্ব্বদাই খুব নীল, আর এর উপরের আকাশ ত দিন রাত নীল হইয়াই

আছে। নীল আকাশের ছায়ায় প্রগাঢ় নীল জলের নদীকে নীল ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাই আমাদের দেশের সংস্কৃত লেখকরা ইহার নাম দিয়াছিলেন নীল নদী। নীল নদীর উৎপত্তিস্থান হিন্দুগণই বহু প্রাচীন যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নদীকে ভারতের লোকে আগে কালী বা কৃষ্ণা নদী বলিত। (১৯১৫ সালের এপ্রেল মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের The Discovery of the Source of the Nile by Ancient Hindus প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

যাইহোক, মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র এই বুলাক্। আব্বাসিয়া এবং ওয়েসিস্ যাইতে যেমন কোন কষ্ট নাই, তেমনি বুলাকেও বৈদ্যুতিক ট্রামে করিয়া সহজেই যাওয়া যায়। যে-কোন দিনে বা কোন উৎসবের রাত্রিতে নীল নদীর তীরে বেড়াইতে আসিলে বিদেশীরা প্রাচ্য উৎসব-সমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারে না। বুলাক্ বন্দরের বিপরীত দিকে বিখ্যাত ঘাজিয়ারা দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপকে বুলাক্ বন্দরের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য অপর একটি বৃহৎ সাঁকো তৈরী করিবার কথা হইতেছে। এইখানেই ইস্‌মাইল পাশা তাঁর বৃহৎ প্রাসাদ তৈরী করান, এখন তাহা ইংরেজদের একটি হোটেলে পরিণত হইয়াছে। এইখানেই আবার ঘোড়-দৌড়ের মাঠ ও টেনিস্ প্রভৃতি খেলার সুন্দর জায়গা আছে। কিন্তু এখানে সকলের চেয়ে মনোরম—বুলাক্ হইতে ঘাজিয়ারাতে যে সাঁকো গিয়াছে তার উপর দিয়া বেড়ানো। সূর্য্যাস্তের সময় সাঁকো হইতে নীলের উপরকার তেকোণা ডবল পাল-তোলা নৌকাগুলি দেখিয়া বোধ হয় যেন বড় বড় পাখী ডানা মেলিয়া জলের উপর বসিয়া আছে। এই সাঁকোটি আবার প্রাচীন কায়রোকে আধুনিক ইংরেজ-পূর্ণ চঞ্চল কায়রোর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেছে। সাঁকোটির পাশে পাশে ইংরেজের অনেক কীর্ত্তিকলাপ এখন স্থান লইয়াছে। তাদের মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম্ উল্লেখযোগ্য। এই মিউজিয়ামে মিশরের প্রাচীন স্বদেশী ফারাও, রোমীয়, গ্রীক ও আরব্য রাজাদিগের অনেক স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষিত আছে। আরো রক্ষিত আছে—মিশরের নানা স্থান হইতে খুঁড়িয়া-পাওয়া অনেক মামি

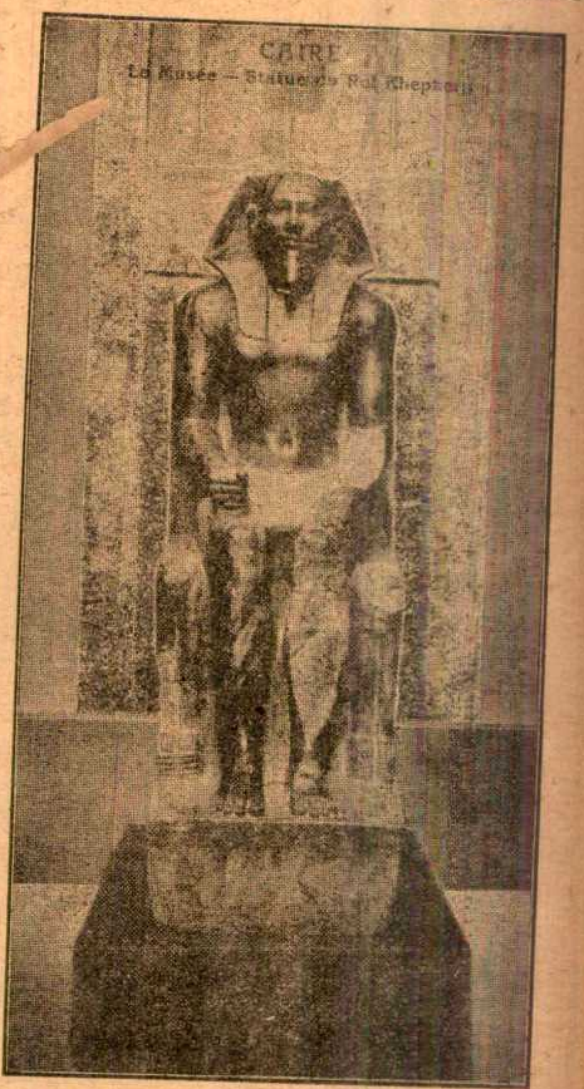

মিশরের দ্বিতীয় পিরামিডের নির্ম্মাতা রাজা খেফ্‌রেনের প্রতিমূর্ত্তি।

বা রক্ষিত মৃতদেহ। সাঁকোটি রোজ বেলা একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন দলে দলে নৌকায় শত শত লোক প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষ লইয়া কায়রোয় নামিতে থাকে। মিশরের বড় বড় পিরামিড দেখিতে যাইতে হইলে এই সাঁকো পার হইয়া যাইতে হয়। সাঁকোটি লম্বায় ৮০০ হাত। দিনরাত ধরিয়া ইহার উপর দিয়া গাড়ী ও লোকের যাতায়াত। যে ঘাজিয়ারা দ্বীপে আসিয়া সাঁকোটি শেষ হইয়াছে সেই দ্বীপেই বিখ্যাত ঘিজে পিরামিডগুলি দাঁড়াইয়া আছে।

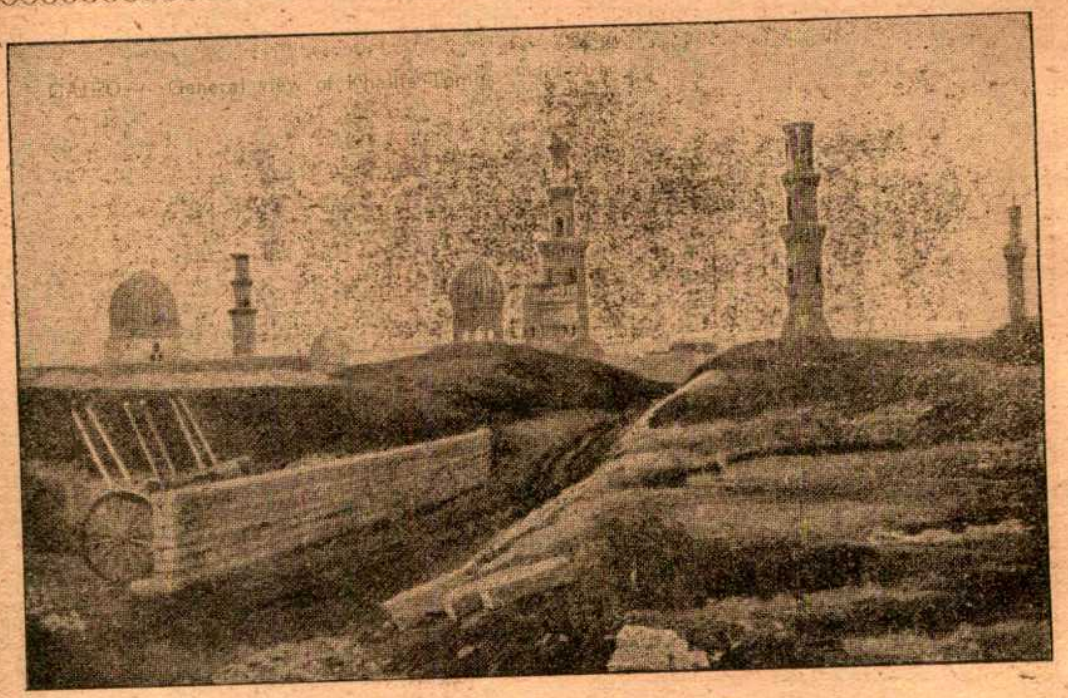

নির্জ্জন প্রান্তরে মিশরের মুসলমান খলিফাদের সমাধিস্তম্ভ।

মিশরের পিরামিড পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম। ইহারা মিশরের সভ্যতার প্রাচীনত্বের চূড়ান্ত নির্দ্দেশ। অন্যান্য পিরামিড অপেক্ষা ঘিজে পিরামিডগুলিই কায়রোর কাছে এবং এইগুলিই সবচেয়ে বেশী দেখিবার জিনিষ। ঘিজে পৌঁছিলে সকলের চেয়ে কাছে যে পিরামিড দেখিতে পাওয়া যায় সেইটি সেখানকার অন্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম। খৃষ্টের জন্মের ৩৭৩৩ বৎসর আগে চতুর্থ রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা খুফু বা থিওপো ইহা তৈরী করান। তিনি এর নাম রাখেন খুট্। এর মধ্যে যেসব পাথরের খণ্ড আছে তাতে এই রাজার নাম লাল কালিতে লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। পিরামিডটির এক-একটি পাশের দৈর্ঘ্য ৭৭৫ ফুট, আগে নাকি প্রতি দিক আরো ২০ ফুট করিয়া বেশী লম্বা ছিল। উচ্চতায় ইহা ৪৫১ ফুট, আগে ছিল ৪৮১ ফুট, এখন বালিতে বসিয়া গিয়াছে। ইহার মাথার উপর যে জায়গা সেটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০ ফুট। দুর হইতে এর মাথার দৃশ্যটি বড় চমৎকার। পিরামিডে ঢুকিবার পথে যে ভিতরকার ফটক সেটি মাটি হইতে প্রায় ৫০ ফুট উঁচু।

কায়রো হইতে আধ ঘণ্টা অন্তর যে ট্রাম চলিয়াছে, তাহাতে যাইলে ছয় ঘণ্টায় এখানে পৌছান যায়। গাড়ী করিয়াও এখানে যাইবার ব্যবস্থা আছে। নীলের সাঁকো পার হইয়া ঘিজে যাইবার পথটি প্রায় সাড়ে ছয় মাইল ধরিয়া বড় বড় গাছের ছায়ায় সুশীতল। ঘিজে পিরামিডের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখিলে মিশরের রাজধানী কায়রোর যৌবন-শ্রী, সৌন্দর্য্য ও সম্পদের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। এ স্থানটি প্রকৃতির মনোরম লীলাভূমি।

ঘিজের স্ফিঙ্ক্‌সটি প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরানো। এটি দেখিতে এক অদ্ভুত জিনিষ। এর মুখটি ছিল নানা রঙে রঙিন, মাথাটি লম্বায় ৩০ ফুট, মুখটি চওড়ায় ১৪ ফুট আর দেহটির দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট। এটিকে মিশরের লোকেরা খুব প্রাচীন জিনিষ বলিয়া মনে করে। ইহার পায়ের কাছে আগে লোকে দেবতার উদ্দেশে পূজা দিত ও জন্তু বলি দিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার কাছে মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য অনেক জায়গা খোঁড়া হয়। কিন্তু সে মরু-ভূমিতে গর্ত্ত করা এক শক্ত ব্যাপার। গর্ত্ত করার সঙ্গে-সঙ্গেই চারিদিক হইতে বালি উড়িয়া আসিয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দেয়। এই স্ফিঙ্ক্‌সের পাশে একটি বৃহৎ পাথরের মন্দির।

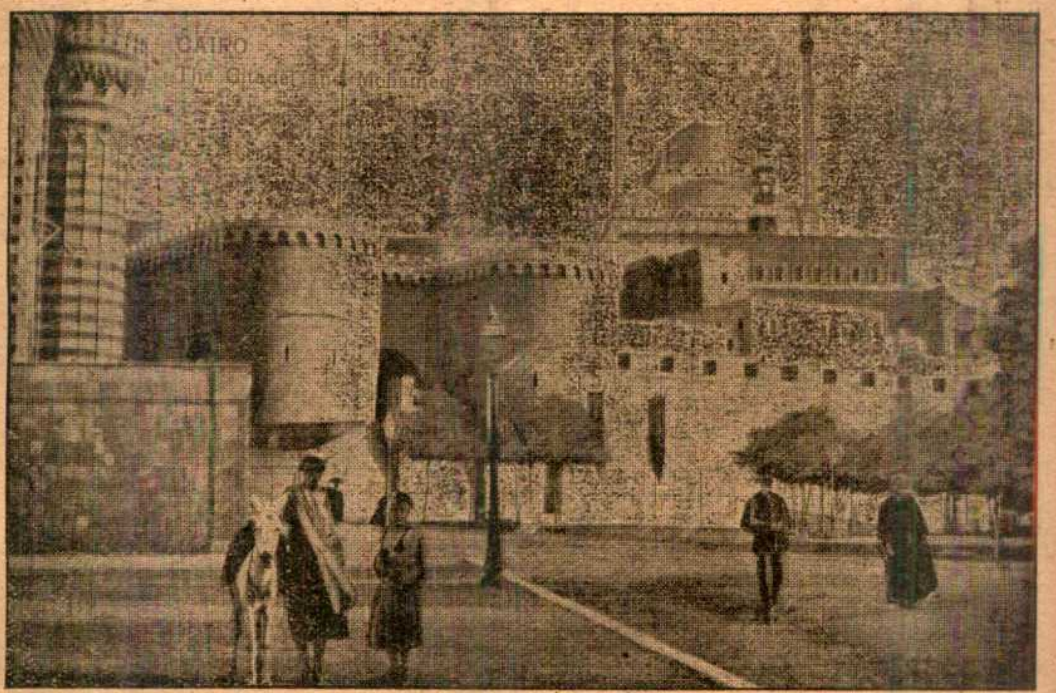

আব্বাসিয়ার গড় বা দুর্গপ্রাসাদ।

এটি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এম মারিয়েৎ কর্ত্তৃক খুঁড়িয়া বাহির করা হয়। এইখানেই রাজা খেপ্‌রেনের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাই অনেকের ধারণা যে তিনিই হয়ত এই মন্দিরটির নির্ম্মাতা।

পিরামিড ছাড়া কায়রোর চারিদিকে অন্য যেসব বড় বড় পাথরের গৃহ আছে সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর খালিফ্ ও মামেলিউকের সমাধি-স্তম্ভ। ২২৫০ হইতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশরে যে-সব রাজা রাজত্ব করেন তাঁরা এইগুলি তৈয়ারী করিয়া যান। এই স্তম্ভগুলির মধ্যে আবার মনোরম—ইমাম শেফের সমাধি এবং মহম্মদ আলির সমাধি ও মস্‌জিদ্। তাছাড়া এঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজনের সমাধিস্তম্ভও এখানে দাঁড়াইয়া আছে। যে-মাঠে এগুলি অবস্থিত সেখানটিকে মৃতের সহর বলা যাইতে পারে। সেখানে লোকের বাস খুব অল্প—মাঝে মাঝে দুই-একটি ঘর মাত্র। নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রান্তরের বুকে মৌন নির্ব্বাক আকাশের তলায় মৃত ব্যক্তিরা কি প্রগাঢ় শান্তিময় নিদ্রায় ডুবিয়া আছে। মিশরযাত্রীদের এ জায়গাটি না দেখিলে কিছুই দেখা হইল না।

কায়রোর মাঝখানে যে বৃহৎ গড় বা দুর্গ দাঁড়াইয়া আছে তাহা ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান আলাদিনের আদেশে নির্ম্মিত হয়। কায়রোকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সুল্‌তান যে প্রাচীর তৈরী করান, এই গড়টি তারই দ্বারস্বরূপ। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। এই গড়টির পরিকল্পনা করেন একজন গ্রীক ভাস্কর। তাঁর আদর্শ ছিল কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপলের সেণ্ট-সোফিয়া ধর্ম্মমন্দির। গড়টির মাঝখানে একটি সুশোভিত জায়গায় মহম্মদ আলির কবর আছে। গড়টির মাথা বৃহৎ গোলাকার; তার দুই পাশে দুইটি সরু সরু লম্বা চূড়া আকাশের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। দূর হইতে এই গড়টি দেখিলে ইহার বিপুল সুরম্য আকৃতি দর্শকের মনে কায়রোর বিশেষত্বের বিশেষ ছাপ রাখিয়া যায়।

তারপর আবার বুলাক্ বন্দরের কথা। ইহার পূর্ব্বদিকে

ঘোমটা-পরা মিশরের মেয়ে।

ইস্‌মাইলিয়া পাড়া। বিখ্যাত ফরাসী উদ্যান-নির্ম্মাতা এখানে এস্‌বেকিয়া উদ্যান তৈরী করেন। উদ্যানটিকে তিনি প্যারিস্ সহরের সমকক্ষ করিয়া একটি সৌন্দর্য্যকেন্দ্ররূপে গঠিত করিতে চেষ্টা করেন। কায়রোর এই দিকেই প্রসিদ্ধ শারিয়া-কাস্‌র্-অল্-নীল অবস্থিত। ইহার কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আছে—প্রকাণ্ড সাভয় হোটেল, সুলেমান পাশার স্তম্ভ, ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিল্ডিংস্, খাদিভের ভাই মহম্মদ আলি পাশার রাজপ্রাসাদ, ইস্‌মাইলিয়ার রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি। তারপর কাস্‌র্-অল্-দুবারা; এখানে নীল নদীর তীরে ব্রিটিশ এজেন্সি অবস্থিত। তার পাশে পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ও ওয়ার অফিস এবং সুদান গভর্ণমেণ্ট এজেন্সির গৃহসমূহ। ইহাদের কাছাকাছি আরো অনেক সর্‌কারী গৃহ আছে। তারপর একটু দূরে নদীর তীরে ইব্রাহিম পাশার প্রাসাদ। নূতন শারিয়া-সুলেমান্-পাশার পথ এখন লোকে যাতায়াতের জন্য খুব ব্যবহার করে।

কায়রোর থিয়েটার ও অপেরার গৃহগুলিও উল্লেখযোগ্য। সেগুলি—খাদিভের অপেরা গৃহ, স্কেটিং রিঙ্ক্‌স্, কাফে কন্‌সার্টস্, চিড়িয়াখানা এবং নীলের নানা রকম মাছ রক্ষা করিবার গৃহ প্রভৃতি।

অপেরা গৃহের মাঝখানে প্রসিদ্ধ বাগান ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে এস্‌বেকিয়া। এখানে ইব্রাহিম পাশার প্রস্তর-

মিশরের গ্রাম্য নারী।

প্রতিমূর্ত্তি এবং অপেরা-গৃহটি নূতন লোকের কাছে বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। ইহার সাম্‌নে বৃহৎ কন্টিনেণ্টাল হোটেল। ইহা শেফার্ড্‌স্ হোটেল হইতে বেশী দূরে নয়। ইহার পর দক্ষিণ দিকে খুব কাছে মিশরের বিচারালয় ও ট্রামওয়ে স্কোয়ার এবং জেনারেল পোষ্ট অফিস। এখান হইতে মস্কি ষ্ট্রীট দিয়া পূর্ব্বদিকে যাওয়া যায়, আবার দক্ষিণ

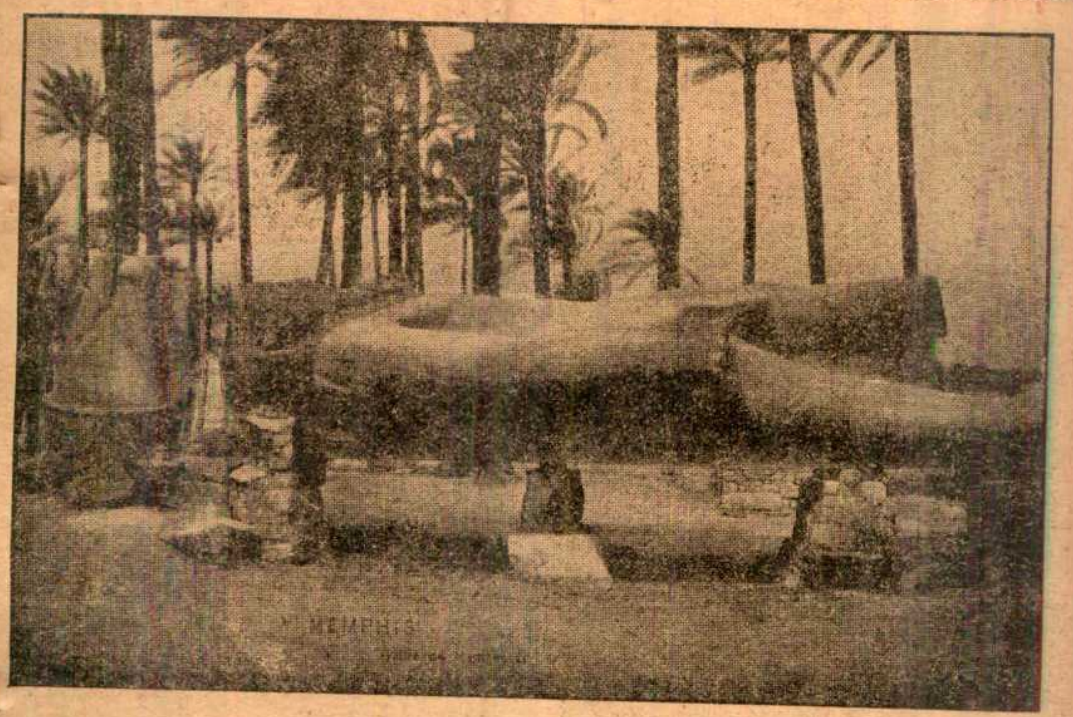

মেম্ফিসের রাজা দ্বিতীয় র‍্যামসেসের শায়িত মূর্ত্তি।

দিকে আসিলে শারিয়া আব্‌দিনে পৌছান যায়। শারিয়া আব্‌দিন শেষ হইয়াছে মেদান আব্‌দিন স্কোয়ারে। ইহার পূর্ব্বদিকে বৃহৎ রাজ-প্রাসাদ। সুল্‌তান শীতকালে এই প্রাসাদে রাজকার্য্য করিয়া থাকেন।

এ-সমস্ত ছাড়া কায়রোয় আরো অনেক দেখিবার মত জিনিষ আছে। এখানকার লাইব্রেরিতে কোরানের রুশ, শার্‌কাসীয়, পারস্য ও আরব্য ভাষার সংস্করণ রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়া কাগজ ও পাতার অনেক বই আছে। যাঁরা মিশরের পূরাবৃত্ত জানিতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছে এই বই-গুলির মূল্য যথেষ্ট। জৈতানে উটপাখীর যে চিড়িয়াখানা আছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। একটি বাগানের ভিতর লম্বা পাথরে তৈরী ঘর, তার মাঝে মাঝে পাথরের প্রাচীর দিয়া এক-একটি ছোট-ছোট কামরা করা হইয়াছে। এক-একটি কামরায় এক-একটি উটপাখী থাকে।

ফ্রান্সের প্যারিস্ নহরে যেমন নানা দিক হইতে ট্রাম আসিয়া এক জায়গায় মিলিয়াছে, কায়রোর বড় ষ্টেশনেও তেমনি অনেক জায়গা হইতে রেলগাড়ী আসিয়া মিলিয়াছে। ষ্টেশনের সাম্‌নে যে বড় ঘড়ি টাঙানো আছে তাতে রেলের সময় অপেক্ষা সময় পাঁচ মিনিট কম করা থাকে, মন্থরগতি যাত্রীদিগকে তৎপর করিবার জন্য।

কায়রোর প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে মিশরের মরুভূমির ঠিক পাশেই হেলোনান্ অবস্থিত। এই হেলোনানে মোকাত্তাম্ পাহাড়ের নীচে মেম্ফিস্ একটি দ্রষ্টব্য জায়গা। কায়রো হইতে আধ ঘণ্টা রেলে গিয়া নৌকা করিয়া নীল নদী পার হইলেই মেম্ফিসে যাওয়া যায়। অনেক বৎসর ধরিয়া হেলনান্ মিশরের রাজাদের স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। অসুস্থ লোকেরা এখানে আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক ধাতুমিশ্রিত জল ব্যবহার করিয়া বিশেষ শারীরিক উন্নতি লাভ করিতেন।

মিশরের মেয়েদের কয়েকটি সুন্দর বিশেষত্ব আছে। এখানকার গ্রাম্য মেয়েরা জলের কলসী বড় ভালবাসে। কলসী মাথায় লইয়া লোকের কাছে দাঁড়ানো বা কলসী লইয়া ছবি তোলানো এঁদের একটা গর্ব্বের বিষয়। আমাদের বাংলা দেশের গ্রামে সঙ্গী-সাথী লইয়া কলসী কাঁখে করিয়া জল আনা মেয়েদের অনেক দিনের অভ্যাস মিশরে এ-বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে। মিশরের বড়

দ্বিতীয় র‍্যামসেসের শায়িত মূর্ত্তির মুখ।

বংশের মেয়েরাও ছবি তুলাইবার সময় কলসী কাছে রাখিয়া বসে। তিন হাজার বছর আগেও মিশরে এ প্রথা ছিল এবং এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছে। য়ুরোপের সভ্যতা মিশরের নারীদের এ-প্রথাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। এখানকার মেয়েদের আর-একটি বিশেষত্ব—তাদের অদ্ভুত ঘোম্‌টা। আধখানা নাকের উপর দুইটি ভুরুর মাঝখানে একটি কাঠের ফাঁপা চোঙার খোল লাগানো থাকে, আর সেই খোল হইতে ঝুলিতে থাকে একটি লম্বা চাদরের মত কাপড়। কাপড়টির দুই কোণ আট্‌কানো থাকে গালের দুই পাশে খোঁপার উপরকার কাপড়ের সঙ্গে। চোখ দুটি বাহির হইয়া থাকে, বাকি মুখটা ঘোমটায় ঢাকা পড়ে। কোন কোন স্ত্রীলোকের ঘোমটার কাপড় সোনার টুক্‌রো দিয়া মোড়া বা সোনার রং করা থাকে। অনেক ধনী ও উচ্চ বংশের মেয়েদের ঘোম্‌টা পাৎলা রেশমী কাপড়ের হয়। পাৎলা রেশমের মধ্যদিয়া সুন্দর মুখের জলুস্ অনেক সময়ে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান রমণীরা যেমন অবরুদ্ধা, এঁরাও তেমনি। ইহাঁরা কালেভদ্রে যখন বাহির হন তখন নিজেদের রূপের বিভায় বাহিরটাকে একটু আলোকিত করিয়া দেন। এঁরা যা খোলা বাড়ীতে মুখের উপর রেশমের নামমাত্র ঘোম্‌টা।

মিশরে মেম্ফিসের রাজা দ্বিতীয় র‍্যাম্‌সেসের যে প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি আছে তাহা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। বদর-উস্-শান্ গ্রামে এক প্রান্তরে খেজুরগাছের বনের ভিতর র‍্যাম্‌সেসের প্রস্তরমূর্ত্তি শায়িত আছে। কত হাজার বৎসরের ঝড়, জল, রৌদ্র, বজ্র ইহার উপর দিয়া প্রচণ্ড লীলায় চলিয়া গিয়াছে। র‍্যাম্‌সেসের দৃপ্ত প্রতিমূর্ত্তি এখন দৃপ্তভাবেই শুইয়া আছে।

কায়রো মিউজিয়ামে কেরানীর মূর্ত্তি।

কায়রোর মিউজিয়ম বা চিত্রশালায় যে-সব অদ্ভুত অবিকৃত মূর্ত্তি রক্ষিত আছে তাদের যে-কোনটিকে ভালো করিয়া দেখিলেই তারা যে কত জ্ঞান ও শক্তির পরিচয়

মিশরের কফি-বিক্রেতা ফেরিওয়ালা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।
ইনি মিশরের এক্‌স্‌পিডিশনারি ফোর্শে কাজ করিতেছেন।

দিতেছে তাহা জানিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। আর জানা যায় কত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞান ও বিদ্যা মূর্ত্তিগুলির মুখের ভঙ্গিমায় দেহের আকৃতিতে ও রেখায় রেখায় ফুটিয়া রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটির কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। সেটি একটি কেরানী কায়স্থের প্রস্তরমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে, ডান হাতে তার কলম ও বাঁ হাতে ভূর্জ্জপত্র। তার প্রভু তাকে কি বলিয়া যাইতেছিলেন আর সে লিখিতেছিল। তার চোখ দুটিতে প্রতীক্ষা ও ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, কি লিখিবে এই আগ্রহে তার সমস্ত মুখখানি উন্মুখ। তার এ প্রতীক্ষার কিন্তু আজও অবসান হয় নাই; ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া সে বসিয়া আছে—কবে তার প্রভু আসিয়া আবার তাকে লিখনের বিষয় বলিয়া যাইবেন। এরই একটি জুড়ী আছে ঘিজে চিত্রশালায়, তার দেহ ও আকৃতি এই রকমই দীপ্ত ও আত্মস্থ।

ইজিপ্‌সিয়ান্ এক্‌স্‌পিডিশানারি ফোর্সের সহিত কার্য্যোপলক্ষে গিয়া আমরা মিশর দেখিয়া ধন্য হইলাম। প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের জ্ঞান ও গৌরবের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা সেই সভ্যতার তরঙ্গায়িত বিপুল জীবনের পার্শ্বে বসিয়া কয়েকটি ঢেউ দেখিলাম মাত্র, তার বিস্তৃতির সীমা স্থির করা ত দূরের কথা!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

বিয়ের ফুল

(৩)

হীরক নিজের ঘরে বসিয়া একটি সোনার হারে মানানসই করিয়া তার জয়-করিয়া-পাওয়া সোনার মেডেলগুলি গাঁথিতেছিল। রমা ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীকে তারই ভূষণ-মণ্ডনে নিযুক্ত দেখিয়া হাসিমুখে হীরকের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; হীরক একবার মুখ একটু কাত করিয়া চোখ বাঁকা করিয়া হাসিয়া আবার মেডেল গাঁথায় মন দিল। রমা হীরকের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হচ্ছে এ?

হীরক হাসিমুখে বলিল—জানোই ত মার হুকুম আমি অমান্য করতে পারি না। যেখানে মার হুকুম আবার

আনন্দের সমর্থন পেয়েছে সেখানে আর বিলম্ব সয় না। তাই আমার বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য দিয়ে হৃদয়লক্ষ্মীকে বরণ করব।

হীরক একটা সাঁড়াশি দিয়া শেষ মেডেলটির কোঁড়া হারের সঙ্গে গাঁথিয়া রমার গলায় হারগাছি পরাইয়া দিল—প্রীতির আনন্দে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমা বলিল—যাই মাকে দেখিয়ে আসি।

হীরক বলিল—শুধু উপহার নিয়ে গেলেই হবে না, আমাকেও কিছু দিয়ে যেতে হবে।

উৎসুক কৌতুকের মাধুর্য্যে রমার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—কি চাই?

হীরক হাসিমুখে বলিল—ছুটি।

রমা স্বামীর প্রার্থনার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ছুটি? কিসের ছুটি?

হীরক মিনতির স্বরে বলিল—আজকের রাতটি আমায় ছুটি দাও, কাজ করতে হবে।

হীরকের কাজ মানে যে জমিদারীর কাজ তাহা রমা জানিত। রমা মুখ ভার করিয়া বলিল—চারদিন পরে কল্‌কাতা বেড়িয়ে এসেই আজ আবার ছুটি চাই! না, তোমার রাত জাগতে হবে না।

হীরক একটু বিব্রত হইয়া বলিল—আমার উপহারের বদলে এই প্রার্থনা তোমার মঞ্জুর করা উচিত।

রমা হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আচ্ছা, আমি মঞ্জুর করলাম। কিন্তু কেমন তুমি রাত জেগে কাজ করো দেখা যাবে।

হীরক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—লক্ষ্মীটি, মাকে বোলো না যেন।

রমা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। হীরক বুঝিল সে মাকে বলিতেই যাইতেছে।

হীরক ডাকিল—লোকনাথ-দা!

লোকনাথ ঘরে আসিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—নালিশের বাক্‌স আনিয়েছিস্?

হীরক হাটখোলার মাঝখানে একটা ছিদ্রকাটা বাক্স টাঙাইয়া দিয়াছিল; প্রজাদের মধ্যে কারো কোনো নায়েব-গোমস্তার বিরুদ্ধে নালিশ থাকিলে তারা যদি প্রকাশ্যে হীরকের সাম্‌নে না বলিতে পারিত তাহা হইলে নালিশ লিখিয়া সেই বাক্সর মধ্যে ফেলিয়া যাইত; যারা দরখাস্তে নিজেদের নাম দিয়া নালিশ করিত তাদের নাম গোপন রাখিয়া হীরক অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকার করিত। বেনামী দরখাস্তেরও অনুসন্ধান ও প্রতিকারে সে অবহেলা করিত না। এজন্য তার সমস্ত কর্ম্মচারী ভয়ে ভয়ে থাকিত, কেউ অন্যায় অত্যাচার করিতে সাহস করিত না; এবং প্রজারাও সুখে নিরুপদ্রবে থাকিয়া হীরককে ভালোবাসিত ভক্তি করিত।

লোকনাথ বলিল—হ্যাঁ, বাক্স আনানো হয়েছে।

হীরক বলিল—বাক্সটা এইখানে দিয়ে যা; ম্যানেজার-বাবু কতকগুলো জরিপনক্সা পাঠিয়ে দেবে, সেগুলোও আমায় দিয়ে যাস্। আর বড় আলোটা জেলে দিবি—তেল ভোরে দিস্—যেন সমস্ত রাত জ্বলে।

লোকনাথ চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—সমস্ত রাত জাগতে হবে বুঝি? তা হবে না—এই আজ কল্‌কা থেকে এলে.....

হীরক হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—তোকে যা বল্‌লাম তাই করগে যা—তুই মুনিব, না আমি মুনিব?

লোকনাথ হীরককে জন্মাবধি কোলে পিঠে করিয়া অনেক ঝক্কি উপদ্রব সহিয়া এতবড় করিয়াছে, সে হীরককে ভালো করিয়াই চিনিত। সে আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লোকনাথ বাহির হইয়া যাইতেই হীরক নিজের অকারণ রাগের জন্য লজ্জা বোধ করিতে লাগিল; তার স্নেহময় ভৃত্যের স্নেহের আশঙ্কাকে সে যে প্রভুত্বের দম্ভ দিয়া অপমান করিয়াছে এতে তার মন অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল তখনি লোকনাথকে ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু চাকরের কাছে ক্ষমা চাহিতেও তার লজ্জা বাধিল; সে ভাবিল—সে আলো লইয়া আসিলে তাকে খুসী করিয়া দিলেই হইবে।

ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন সুমতি। মাকে দেখিয়াই হীরক তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছোট্ট মেয়ের মতন তাঁর গালে ধীরে ধীরে হাতের মৃদু আঘাত করিয়া আদর করিতে করিতে বলিল—তুমি বিচ্ছু

বোলো না মা। তুমি জানো—তুমি বল্‌লে আমাকে শুন্‌তেই হবে; কিন্তু সেটা ঠিক কাজ হবে না।

সুমতি হীরকের বড় বড় চুলগুলির ভিতর দিয়া অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—রাত জেগে কাজ কর্‌তে হবে, এমন কি জরুরী কাজ শুনি?

হীরক বলিল—ম্যানেজার-বাবু খবর দিয়ে গেলেন হাজারটাকিয়ার জমিদারেরা হাজারটাকিয়া বিল থেকে একটা ডাঁড়া কেটে চঞ্চলা নদীর সঙ্গে যোগ কোরে দিয়েছে; বিলের সব জল চঞ্চলাতে এসে পড়াতে চঞ্চলার জল ফেঁপে উঠ্‌ছে; তাতে পাথারকোলা গ্রাম বন্যায় ভেসে যাবার জোগাড় হয়েছে; এর এক প্রতিকার আমাদের চিথোলমারী বিলের লক্‌গেট খুলে দিয়ে চঞ্চলার উদ্বৃত্ত জল সেই বিলে বইয়ে দেওয়া; তাতে কিন্তু অনেক ধান- আর পাট-ক্ষেত ডুবে যাবে; এখন আমায় দেখ্‌তে হবে বিলে জল ভর্‌লেই বেশী ক্ষতি হবে, না গ্রাম ডুব্‌লেই বেশী ক্ষতি হবে।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হাজারটাকিয়ার বাবুদের বিলে কি তার জল নিকাশ বন্ধ করে না?

হীরক বলিল—বলা হয়েছিল, তারা শোনেনি, শেষে হয় ত লাঠিয়াল পাঠিয়ে শোনাতে হবে।

সুমতি ভয় পাইয়া বলিলেন—কাজ নেই বাপু দাঙ্গা-হ্যাঙ্গামে। লোক বাঁচাতে গিয়ে লোক মর্‌বে সে ত ঠিক নয়। তার চেয়ে ফসল নষ্ট হওয়াই ভালো, প্রজাদের যা লোক্‌সান হবে সেটা খাজনা-টাজনা মাপ কোরে পুষিয়ে দিলেই হবে। বেশী রাত জাগিস্‌নে তুই—এই কল্‌কাতা থেকে কষ্ট কোরে এলি।

হীরক হাসিয়া বলিল—মা, তুমি কেবল নিজের ছেলেটিরই কষ্ট দেখ্‌ছ—আর কত মায়ের কত ছেলের যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে ত দেখ্‌ছ না। জমিদার ত মা প্রজার ভৃত্য; প্রজার বিপদের সময় জমিদার উদাসীন হলে তার নিমকহারামী করা হবে না?

সুমতি ছেলের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া বলিলেন—না, আমি তোকে বারণ কর্‌ছি না, যত শিগ্‌গির হয় কাজ সেরে শুয়ে পড়িস্।

হীরক মার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—তবে এখন লক্ষ্মী মা হয়ে যাও ত। এতক্ষণ আমার অনেক কাজ হয়ে যেত। যত দেরী কর্‌বে তোমারই ছেলের তত রাত্তির হবে—আমার কি বলো না—কে হবে তোমার ছেলের রাত জেগে মাথা ধর্‌বে অসুখ কর্‌বে—

সুমতি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—আঃ কি যে বকিস্! তোর বক্‌তে হবে না, তুই কাজ সেরে নে। আমি যাচ্ছি।

হীরক হাসিমুখে বলিল—শুধু একবচন নয় মা, বহুবচনে বলো—আমরা যাচ্ছি। নইলে তোমার পিছন থেকে যে এক চোখ দেখিয়ে ঝগ্‌ড়ার সূত্রপাত কর্‌ছে সে আমায় কাজও কর্‌তে দেবে না, ঘুমুতেও দেবে না। তোমার কাছে যে নালিশ কর্‌তে গিছল তাকে মিথ্যে নালিশের দায়ে আজকের রাতটা তোমার কাছেই বন্দী কোরে রাখোগে।

সুমতি হাস্যপ্রফুল্ল মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—এস বৌমা, পাগলকে আর ক্ষেপিয়ো না।

রমা অপ্রসন্ন মনে শাশুড়ীর পিছন পিছন যাইতে যাইতে চট করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া প্রান্তরপারের দিগন্ত-রেখার মতন সুন্দর ভ্রূ বাঁকাইয়া কিল উঁচাইয়া শাসাইয়া চলিয়া গেল। হীরক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আনন্দে কৌতুকে হাসিতে লাগিল।

লোকনাথ একটা প্রকাণ্ড আলো জ্বালিয়া লইয়া ঘরে আসিল এবং টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে উষ্ণ স্বরে বলিল—এই নাও আলো—এক রাত কেন তিন রাত জ্বল্‌বে!

হীরক হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া ভৃত্যের পিঠে হাত চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলিল—রাগ করিস্‌নে ভাই লোকাদা। শুনেছিস্ ত পাথারকোলা গাঁয়ের বিপদের কথা।

লোকনাথ উষ্ণভাবেই বলিল—তা ত শুনেছি। কিন্তু ঐ যাঁরা মাসের মাস মুঠো মুঠো টাকা নিচ্ছেন সেইসব ম্যানেজার-বাবুরা কি কর্‌ছেন? তাঁরা রাত জাগুন না। তাঁরা অতগুলোতে মিলে একটা বুদ্ধি ঠাওরাতে পারেন না?

হীরক চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিল—তারা ত ভাই আমার কাছে দুশো চারশো টাকা পায় কিন্তু আমি যে প্রজাদের কাছ থেকে মাসের মাস পাঁচ সাত হাজার টাকা নি। কার গরজ বেশী ভাই?

লোকনাথ পরাস্ত হইয়া অস্পষ্ট ভাবে গজগজ করিয়া বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গেল, তার অসন্তোষ হীরকের কথাতেও গেল না এইটুকু বোঝা গেল।

হীরক পাথারকোলা গাঁয়ের ও চিথোলমারী বিলের ম্যাপ নক্‌সা জরিপী চিঠা কাগজপত্র ডিহিদারের রিপোর্ট খুলিয়া কি করিলে সব দিক রক্ষা হয় তার উপায় সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বৃদ্ধ লোকনাথ প্রভুর কর্ম্মসমাপ্তির প্রতীক্ষায় ঘরের বাহিরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। কাছারীর ঘড়ীতে যখন দুটা বাজিয়া গেল, চৌকীদার হাঁকিয়া গেল, চৌকীদারের ডাকে শেয়ালগুলা হুয়া হুয়া করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল, তখন লোকনাথ একবার ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল—তখনও হীরক টেবিলময় ছড়ানো কাগজের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া খস খস করিয়া কি লিখিয়া যাইতেছে। লোকনাথ হতাশ হইয়া হাই তুলিয়া সেইখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল।

বন্দিনী রমারও ঘুম হইতেছিল না। এক এক চমক ঘুমের পর হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তার মনে হইতেছিল 'এতক্ষণ তাঁর কাজ হয়ে গেছে হয় ত।' কিন্তু নিরুপায় ভাবে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেছিল। সুমতিরও ঘুম হইতেছিল না; তিনি রমার উৎকণ্ঠায় ব্যথিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া নীরবে তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন।

ভোরবেলা সুমতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; রমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া কান পাতিয়া অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নিশ্চয় হইল যে শাশুড়ী ঘুমাইতেছেন। সে তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল এবং পায়ের মল গোছের উপর তুলিয়া গুঁজিয়া সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিজের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল ঘরের দরজা জুড়িয়া লোকনাথ শুইয়া ঘুমাইতেছে। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না; সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখান হইতে হীরককে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, কিন্তু দেখিল মেঝের উপর হীরকের ছায়া পড়িয়াছে, তাতেই দেখা গেল সে তখনো চেয়ারে বসিয়া বসিয়া কাজই করিতেছে। রমা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যেমন ধীরে ধীরে আসিয়াছিল তেমনি সন্তর্পণে ফিরিয়া গিয়া শাশুড়ীর কোলের কাছে শুইয়া পড়িল। রমা উঠিয়া আসিতেই সুমতির ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। রমাকে ফিরিয়া আসিয়া চুপিচুপি শুইতে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন রমা কার সন্ধানে গিয়াছিল। তিনি রমার গায়ে হাত দিতেই রমা চম্‌কাইয়া উঠিল। সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁরু কি এখনো শোয় নি মা?

রমার মাথায় লজ্জার বাজ ভাঙিয়া পড়িল—সে যে স্বামীসন্দর্শনের আগ্রহে গোপনে বাহির হইয়াছিল ইহা শাশুড়ীর কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াতে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে যেন হীরকের উদ্দেশেই যায় নাই, এমনি কৈফিয়তের ভাবে মৃদুস্বরে বলিল—বোধ হয় শোন্ নি। ঘরে দাউ দাউ কোরে এখনো আলো জ্বল্‌ছে—ছায়া দেখ্‌তে পেলাম বসেই আছেন।

সুমতি রমার কপালে হাত দিয়া বলিলেন—এখনো রাত আছে মা, তুমি ঘুমোও।

রমা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

যখন বেশ ফর্সা হইয়া গেছে, কাককোকিল ডাকিতেছে, লোকনাথ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর দুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একবার আড়ামোড়া ভাঙিয়া হীরকের ঘরে ঢুকিল। তাকে আসিতে দেখিয়াই হীরক মুখ তুলিল। লোকনাথ বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—সকাল হয়ে গেল, এখনো কি আলো জ্বল্‌বে নাকি? সমস্ত রাতটা ঠায় বোসে গেল!

হীরক চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িয়া দুই হাতের আঙুল মাথার চুলের মধ্যে চালাইয়া দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিল—পণ্ডশ্রম! কিছু ঠিক হল না। আমায় সেখানে যেতে হবে। লোকাদা, ম্যানেজার-বাবুকে সেলাম পাঠিয়ে দে।

লোকনাথ আলো নিভাইয়া ল্যাম্প তুলিতে তুলিতে বলিল—এত সকালে তোমার ম্যানেজার উঠেছে কিনা! তার ত তোমার মতন সারা রাত ঘুম হচ্ছিল না!

হীরক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, একটু পরেই না হয় লোক পাঠাস্।

লোকনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রমা মুখ ভার করিয়া ঘরের সাম্‌নে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

হীরক তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে রমাকে ধরিয়া ঘরে আনিল। হীরক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাগ নাকি?

রমা শাদা গোলাপের মতন গাল দুটি ফুলাইয়া বলিল—না নয়, তোমার কাজের আবার ক্ষতি হবে!

হীরক হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল—কাল সমস্ত রাত পণ্ডশ্রম হয়েছে—না পেলাম তোমায়, না পেলাম উপায়। এখনি আবার পাথারকোলা ছুটতে হবে।

রমা তার কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামীর দৃঢ়তা চিনিত; সে মুখখানি ভয়ে ভাবনায় ব্যাকুল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এখনি যাবে?

হীরক দেখিল রমার পুষ্পকলির মতন চোখ দুটি প্রগাঢ় প্রণয়ের আবেশে লালিম ও বিচ্ছেদভয়ে অশ্রুশিশিরসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হীরক রমার কাঁধে হাত রাখিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—লক্ষ্মী আমার, তুমি অমন কোরে আমায় যদি নিবারণ কোরো না, তাহলে আমি যেতে পারব না। অত লোকের বিপদ, তুমি কি আমায় থাকতে বলবে?

রমা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল—তোমার না গেলে কি চলে না?

হীরক জোর দিয়া বলিল—নিতান্তই না।

রমা বলিল—তবে আর বারণ করি কি কোরে, তবে কাল সমস্ত রাত জেগেছ; নেয়ে খেয়ে যাও।

হীরক বলিল—ভাত খেয়ে গেলে চলবে না; আমি নেয়ে নিচ্ছি। তুমি মাকে বোলে কিছু জলখাবার নিয়ে এস।

রমা ঘর হইতে বাহিরে চলিল। হীরক হাসিয়া বলিল—মাকে গিয়ে লাগিয়ে না যেন। মার হুকুম আমার হয়ে তুমিই নিয়ে এস।

রমা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। সে হাসি বর্ষাসন্ধ্যার আলোকপ্রভার শেষ বিদায়ের মতন ম্লান, বেদনায় আর্দ্র।

সুমতি পূজা করিতে বসিয়াছিলেন। রমা একখানি রেকাবি হাতে করিয়া ম্লানমুখে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা? হীরুর কাজ কি এখনো হয়নি?

রমা বলিল—না, এখনি পাথারকোলা যাচ্ছে।

সুমতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—এখনি? সমস্ত রাত জাগরণের পর না নেয়ে খেয়ে?

রমা বলিল—আমি নাইতে বোলে এসেছি। ভাত খাবার সুর সইবে না, জল খেয়ে যাবে বললে।

সুমতি বলিলেন—তুমি এইখেনে জলখাবার দিয়ে হীরুকে ডেকে আনো।

রমা লজ্জামাখা হাসিমুখে বলিল—সে আপনার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে পাছে আপনি বারণ করেন যেতে। সে বললে, মার হুকুম তুমিই চেয়ে এনো।

সুমতি পুত্রের মাতৃবৎসলতায় প্রীত হইয়া হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাকে অভয় দিয়ে ডেকে আনোগে।

রমা ঠাঁই করিয়া জলখাবার দিয়া হীরককে ডাকিতে গেল। হীরক তখন স্নান করিয়া আসিয়া টেবিল-আয়নার সাম্‌নে বসিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইতেছিল। আয়নায় রমার ছায়া পড়িতে দেখিয়া হীরক বুরুশ দিয়া চুল চাপিতে চাপিতে বলিল—মা কি বললেন?

রমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—ছুটি মঞ্জুর। মা তাঁর পুজোর ঘরে জল খেতে ডাকছেন।

হীরক ভয় করিতেছিল এই ছুটি পাইতে অনেক তর্ক বিতর্ক ওকালতী করিতে হইবে। এত সহজে ছুটি পাইয়া সে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া উঠিয়া পড়িল ও রমার সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে চলিল। হীরক মার ঘরে গিয়াই হাসিয়া বলিল—এই ত লক্ষ্মী মেয়ে! আমি শিগ্‌গির ফিরে আস্‌ব মা।

হীরকের ভয় ও ভুলাইবার চেষ্টা দেখিয়া সুমতি হাসিয়া বলিলেন—শিগ্‌গির যাতে ফিরে আসিস্ তার ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি—রমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

এই আদেশ শুনিয়া রমার মুখে প্রভা-তনল জ্যোতি ঝকমক করিয়া উঠিল। হীরক মুখ ফিরাইয়া রমার দিকে চাহিল, সেই সময় রমাও অপাঙ্গদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল, তাতে তার চোখের কালো উজ্জ্বল তারা চঞ্চল হইয়া উঠিল, যেন কুবলয়-কোষের মধ্যে মধুলুব্ধ ভ্রমর সঞ্চরণ করিতেছে। মাতার আদেশ ও পত্নীর উৎসাহে কৌতুক অনুভব করিয়া

হীরক উৎফুল্ল মুখে বলিল—ওকে কোথায় নিয়ে যাব না, আমি যাচ্ছি কাজে।

সুমতি বলিলেন—কাজ ত তুই আর সারাক্ষণই করবিনে। ছেলেমানুষ কোথাও বেরুতে পারে না, নিয়ে যা। পাথারকোলার কাছারী-বাড়ীতে আমি ওর সঙ্গে গিয়ে কতবার থেকেছি—নদীর পাড়ে চমৎকার সে বাড়ী।

সুমতি পরলোকগত স্বামীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি স্বামীকে অল্পদিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, তাই তাঁর স্বামী তাঁকে সঙ্গে লইয়াই ফিরিতেন। নিজের মন দিয়া তিনি বধূর মন বুঝিতে পারিতেছিলেন বলিয়াই পুত্রকে এই আদেশ করিলেন।

হীরক হাসিয়া বলিল—তবে তুমিই আর বাকী থাকো কেন, তুমিও চলো।

সুমতি বলিলেন—তুই যদি আমায় যেতে দিস্ তা হলে কি আমি তোকে ছেড়ে থাকি? আমাকেও নিয়ে চ না।

হীরক ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, তোমার গাড়ীপাল্কীতে চড়া হবে না; বুকের ধড়ফড়ানি বাড়লে সে মুস্কিল হবে। এখন একটু ভালো আছ।

পুত্রের স্নেহাতুর আশঙ্কা দেখিয়া সুমতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাব না; তুই বৌমাকে নিয়ে যা।

হীরক খাওয়া শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—তবে মা চটপট কোরে তোয়েরি হয়ে নিতে বলো; আমি মোটর আন্‌তে বলিগে।

হীরক রমার দিকে একবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রমা উল্লাসে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবুদ্ধি

(সংস্কৃত হইতে)

বর্ষা আসিলে কুঞ্জকাননে
গাহে নাকো আর পিক,
ভেকেরা যেথায় বক্তা, সেথায়
নীরব থাকাই ঠিক্।

"বন ফুল"

আলোচনা

মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র-তট।

অনেকেই অবগত নহেন যে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি সহরের অনতিদূরে সমুদ্র-উপকূলে বীরকুল নামে একটি গ্রাম ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় বঙ্গদেশের একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। কলিকাতার ব্রাইটন বলিয়া আখ্যাত হইত। ঐ গ্রামটি কাঁথি হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের Valentynএর মানচিত্রে ও ১৬৮৮ খৃঃ অব্দের Thomas Bowry's chartএ উহা নিরকুল বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৭০৩ খৃঃ অব্দের Pilot chartএ গ্রামটি প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু তৎস্থানে বীরকুল নামে একটি নদী দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী কর্ম্ম-ক্লান্তি অপনোদন ও স্বাস্থ্যসংগ্রহের জন্য বীরকুল যাইতেন ও সেখানে একটি বাংলাঘর ছিল। কথিত আছে ওয়ারেন হেষ্টিংস কিছুকাল ঐ ঘরে বাস করিয়াছিলেন। বহুদিন হইল ঘরটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। Sydney Griceএর Letters of Warren Hastings to His Wife পুস্তকে বীরকুলের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে:—

"Bircool was the Sanitorium—the Brighton of Calcutta and the newspapers and the civil record mention constantly that so and so is gone to Bircool for his health."

পূর্ব্বে বীরকুল নামে মেদিনীপুর জেলার একটি পরগনা ছিল। এখন আছে কি না মেদিনীপুরবাসীগণ বলিতে পারেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই জুন-তারিখের কালেক্টার হিউয়েটের রিপোর্টে প্রকাশ যে—বীরকুল পরগনা পূর্ব্বে উড়িষ্যা সামন্ত রাজ্য ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত ছিল ও ময়ূরভঞ্জরাজ তাঁহার সর্দ্দারগণের দ্বারা রাজস্ব আদায় করিতেন। অনুমান ১৫০০ খৃঃ অঃ সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হওয়ায় ময়ূরভঞ্জরাজ সাগর রায় নামক এক ব্যক্তিকে বীরকুল পরগনার জমীদার নিযুক্ত করেন ও ১৭৮০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত উহা সাগর রায়ের বংশধরগণের হস্তগত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিরূপে উহা ময়ূরভঞ্জরাজের হস্তচ্যুত হইল তাহার প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত।

"মহাকবি কালিদাস কি বাঙালী ছিলেন?"

গত মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মহাকবি কালিদাস কি বাঙালী ছিলেন?" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় যে ৩টি প্রমাণ আপাততঃ তুলিয়াছেন, তাহা দ্বারা কালিদাসকে বাঙ্গালী মনে করা যাইতে পারে না। কারণ,—

১। মিথিলাতেও শ্রীষ্ম ঋতুতে বর্ষারম্ভ ধরা হয় এবং যদিও সেখানে সাধারণতঃ চান্দ্র-মাস চলিত, তথাপি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সৌর মাসই গণনা করা হয়।

২। অন্যান্য প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলে তবেই দ্বিতীয় যুক্তিটির মূল্য আছে, নতুবা ইহা শুদ্ধ অনুমান মাত্র। রঘু সেনা-সমূহ লইয়া পূর্ব্ব-সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও দেশসকল জয় করিতে করিতে সহোদধির তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। এই সর্গটি পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে দিগ্‌বিজয় বর্ণনের নিমিত্তই কালিদাস রঘুকে কোনরূপে একধারে আনিয়া ফেলিলেন ও দিগ্‌বিজয় শেষ করাইলেন—'প্রাগ্‌জ্যোতিষে'। প্রাগ্‌জ্যোতিষ মিথিলারাজ্য হইতে পরবর্ত্তী ছিল না।

৩। মৈথিলী রমণীরা শাড়ী পরেন। এমনকি নব্যাদের ধুতি পরিতে দেখিলে বৃদ্ধ মৈথিলেরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মৈথিলী রমণীরা আলতা পরেন ও কলসী কাঁখে জল ভরিতে যান। তথায় বিবাহে এয়ো স্ত্রীরা মেয়েকে কদলী-বৃক্ষমধ্যস্থ শিলের উপর দাঁড় করাইয়া স্নান করান ও কন্যাকে দর্পণ ধারণ করান। মিথিলার ব্রাহ্মণদের গৃহেও বরকন্যাকে মাটিতে-পাতা শয্যায় বসিতে হয়। সেখানে পুষ্প-শয্যার ব্যবস্থা আছে, অভাবে অন্ততঃ ২।১টি ফুলও দেওয়া হয়। গর্ভিণীরা মাটি খান, ইত্যাদি।

সুতরাং ঐ তিনটি কারণে কালিদাসকে মৈথিলও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, মৈথিল পণ্ডিতেরা তাঁহাকে মৈথিল বলিয়াই দাবী করেন। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি মৈথিল ছিলেন, এ-বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে 'সরস্বতী' নাম্নী হিন্দী পত্রিকায় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। আমার মৈথিলবন্ধু পণ্ডিত শ্রীবিধনাথ মিশ্র মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, যে, মৈথিলদের সহিত বাঙ্গালীর মিল নানা বিষয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার।

কালিদাস কি বাঙ্গালী ?

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ছিলেন ?" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার এক স্থলে কিছু ভুল আছে। তিনি লিখিয়াছেন "মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনার সময়, রঘুর রাজধানী যে কোথায় ছিল, তাহা বর্ণনা করেন নাই।" পুনশ্চ "রঘুবংশের রাজারা যে কোথায় রাজ্য করিতেন, তাহা রঘুর দিগ্‌বিজয় সমাপ্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই।" রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৪র্থ শ্লোক এই :—

"ন মে স্থিরা শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং স্পৃহাবতী বস্তুষু কেষু মাগধী,
ইতি স্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ প্রিয়াসখীরুত্তরকোশলেশ্বরঃ।"

সুতরাং রঘুবংশীয় রাজারা উত্তরকোশলের ঈশ্বর ছিলেন। ইহা রঘুর জন্মের পূর্ব্বের কথা। রঘু দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া প্রথমে প্রাচ্য (৪।৩৮)। রঘুর দিগ্‌বিজয়-কালে কাম্বোজরাজ তাঁহাকে অশ্ব ও ধন দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে ৪ সর্গ ৭০ শ্লোকে কোশলেশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি কোশল দেশের রাজা ছিলেন। দিগ্‌বিজয়-শেষে রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিলে পর কৌৎস ভিক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হন। তাহাতে রঘু কুবেরকে জয় করিয়া যত অর্থ প্রাপ্ত হয়েন সমস্তই কৌৎসকে দান করিয়াছিলেন। ৫ম সর্গের ৩১ শ্লোক এই :—

জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ দাম্পত্যভূতামভিনন্দ্যসত্ত্বৌ
গুরুপ্রদেয়াধিকমিস্ত্রহোর্থী নৃপোহর্থিকামাদধিকপ্রদশ্চ।

এখানে স্পষ্টই সাকেতনগর তাঁহার রাজধানী ছিল দেখা যাইতেছে। "রঘুবংশে" ঐ বংশ যে কোশলদেশের রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজধানী যে সাকেত ছিল তাহার আরও উল্লেখ আছে। আর তিনটি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। ১১শ সর্গের শেষ শ্লোকে রাম বিবাহ করিয়া "পুরমবিশদবেধ্যাম্।" ১৩শ সর্গের ৬১-৬৫ শ্লোকে "রহস্যযোধ্যামনু-রাজধানীম্" সরযূর বর্ণনা;—এবং ১৩শ সর্গের শেষ শ্লোকে রাম রাবণ বধ করিয়া "সাকেতোপবনমুরেরমধ্যবাস"।

পরিশেষে বক্তব্য, লেখক যে তিনটি যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার কোনটিরই সারবত্তা নাই।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা।

আমাদের দেশে ১৩ই বৈশাখ নতুন মেঘ ধরা হয়। এই দিন সকল লোক একখণ্ড শ্যাওড়ার ডাল ও এক টুক্‌রা আউশের জমির মাটি ঘরের চালে দেয়। কেন দেওয়া হয় এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারি যে ইহাতে গৃহে বজ্রপাত হয় না। এই বিশ্বাসের কারণ কি তাহা বলা যায় না। কারণ অনেক গৃহে শ্যাওড়ার ডাল ও আউশের জমির মাটি দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। ইহা দেওয়ার প্রকৃত কারণ কি ও বিজ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি ? যদি থাকে তবে তাহা কি ?

শ্রীএককড়ি ভুণ্ডু।
সা- সুটগুড়ী
(বর্দ্ধমান)

মনুষ্যের ন্যায় পশুদিগকে "এনোফেলিস্" মশকে দংশন করে কি না ?

যদি উক্ত মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়ার বীজ পশাদির শরীরে প্রবেশ করে তবে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় কি না ? হইলে লক্ষণ ও ঔষধ কি ?

যদি না দংশন করে, তবে কেন করে না ?

শ্রীজিজ্ঞাসু ভট্টাচার্য্য।
পোয়ারকোলা, খুলনা।

১। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত ও ভ্রমণবৃত্তান্ত হিন্দী কোন্‌গুলি ?

২। ইংরেজি হইতে অনুবাদযোগ্য "জীবনচরিত"গুলির নাম করুন।

৩। ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিকপত্রের মধ্যে কোন্‌গুলি বহুজনসমাদৃত।

৪। বিদেশীয় (ভারতবর্ষের বাহিরে প্রকাশিত) মাসিকপত্রগুলির মধ্যে কোনগুলি বহুজন-সমাদৃত।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র আঢ্য।

মীমাংসা।

বৈশাখের জিজ্ঞাসার উত্তর একজনে দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অনেকের মিলাইয়া যদি সকলগুলির উত্তর হয়। আমি কয়েকটি দিলাম—কতক কতক উত্তর হইতে পারে।

৭। দক্ষিণ প্রয়াগ—ত্রিবেণী, E. I. Rai.. হুগলির উত্তরে।

৮। কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি
পুরুষঃ পুরুষঃ পরিএবান
দূর্ব্বে, প্রতু সহস্রেণ শতেন চ।

প্রত্যেক কাণ্ড বা গ্রন্থি হইতে দূর্ব্বাঙ্কুর যেমন উদ্গত হয় ও পুরুষ-পরম্পরায় বিস্তৃত হয়, তুমি সেইরূপ বংশপরম্পরায় শত সহস্রে বাড়িতে থাক। ধান্য সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাই নাম দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য। প্রতু—প্রতনোতু—বর্দ্ধিত হও, বিস্তৃত হও। পরিএবান=পরি+এবৃ+শানচ=পরিবর্দ্ধমান। বৈদিক অধিবাস অনুষ্ঠানের মন্ত্র।

১১। বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ
নকুলঃ সর্ব্বতোভদ্র, ন সর্পশ্চ কদাচন।—ললিতজ্যোতিষ,
শালিহোত্রাধ্যায়।

১৬। অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।—বেদান্তসারোক্ত পঞ্চ ক্লেশই পঞ্চ দুর্গতি।

১৭। জল কাঁপিয়া উঠিলে তেল দিলে শান্তি হয়। সমুদ্রে ঝড় বহিলে কেরোসিন তেল জাহাজের চারি পার্শ্বে ছিটান হয়। বরবধূর মধ্যে কলহের শান্তি হউক এই তাৎপর্য্যে তেল ঢালা হয়।

২৪। বেতড়—বেঁতড় বা ব্যাঁতড়, বারুইপুরের নিকট।

হেতেগড়—হেতে, ঐ স্থানেরই নিকট। কলিকাতার দক্ষিণ পঞ্চান্ন গ্রামের অধীন।

মদনমল্ল—ডিহি মেদনমল্ল পরগনা। বারুইপুরের জমিদারদের জমিদারী, যাহার কতক অংশ Port Canning Co. ক্রয় করিয়া প্রায় ৩ লাখ বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া Canning Town নগর বসাইয়াছে। E.B.S.R. St.

কলাহাটী—বারুইপুরের দক্ষিণ।

সঙ্কেতমাধব—বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। গৌরাঙ্গ সমাজ।

সীতাখালি—ঐ দক্ষিণ।

মণ্ডলঘাট পরগনা—মেদিনীপুরে, ঘাটালের নিকট।

কোদালিয়া—বারুইপুরের নিকট।

চৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কালীঘাট হইতে আদি গঙ্গা দিয়া অর্থাৎ—রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি হইয়া সুন্দরবন দিয়া ঘুরিয়া উৎকল গিয়াছিলেন; ঐ শুষ্ক গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকল অনুসন্ধানে জানা যাইবে।

সুবর্ণপুর—সোনারপুর E. B. S. R. St.

বালিঘাটা—বেলেঘাটা E. B. S. R. St.

শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।

২৫ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে 'খিসমা' নামক গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাট সবডিভিসনে, 'বীরনগর' (উলা) গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। গ্রামটি বড় পুরাতন। পূর্ব্বে এই গ্রামের নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। শ্রীমন্ত সদাগর যে এই স্থান দিয়া সিংহলে যান সে সম্বন্ধে যথেষ্ট জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। ৺উলাচণ্ডী দেবী (একটি প্রস্তরখণ্ড) উক্ত উলাগ্রামের গ্রাম্যদেবতা। কথিত আছে উক্ত দেবী নামে পরিচিত প্রস্তরখণ্ড শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকার একখানি নঙ্গরের পাথর। তিনি সিংহল গমনকালে ভীষণ ঝড়-তুফানে বাধা পান। পরে ঐ স্থানে সেই প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া ৺চণ্ডীর আরাধনা করিলে তিনি বিপদমুক্ত হইয়া সিংহলে যান। ঐ দেবীমূর্ত্তি গ্রামের একপ্রান্তে অদ্যাপি স্থাপিত আছেন এবং প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমাতে তাঁহার পূজা ও মেলা হইয়া থাকে। আর ঐসকল স্থান যে পূর্ব্বে গঙ্গানদীর গর্ভে ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বে একখানি বৃহৎ নৌকার কিয়দংশ এক বাড়ীর উঠান খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাওয়া যায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষার জীবনচরিত কতকগুলির নাম—

(১) চারিত্রপূজা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।
(৪) রাজা রামমোহন রায়—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
(৫) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
(৬) বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৭) মাইকেল মধুসূদন দত্ত—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
(৮) আত্মজীবনচরিত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৯) আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু।
(১০) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।
(১১) ভূদেব-চরিত—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।
(১২) আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী।
(১৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
(১৪) বঙ্কিমজীবনী—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(১৫) দীনবন্ধু মিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(১৬) অক্ষয়কুমার দত্ত—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
(১৭) আত্মজীবনচরিত—কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।
(১৮) রসসাগর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।
(১৯) রামকৃষ্ণকথামৃত—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
(২০) বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষার ভ্রমণকাহিনী কতকগুলির নাম—

(১) ভূপ্রদক্ষিণ—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।
(২) য়ুরোপে তিন বৎসর—রমেশ দত্ত।
(৩) য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী ও পত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৪) নরওয়ে ভ্রমণ—শ্রীমতী বিমলা দাস।
(৫) ভারতভ্রমণ—শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী।
(৬) জাপানযাত্রী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৭) চীনভ্রমণ—ইন্দুমাধব মল্লিক।
(৮) বিলাত ভ্রমণ—ইন্দুমাধব মল্লিক।
(৯) ইউরোপ ভ্রমণ—শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।
(১০) দক্ষিণাপথ ভ্রমণ—শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী।
(১১) প্রবাসচিত্র—শ্রীজলধর সেন।
(১২) হিমালয়—শ্রীজলধর সেন।
(১৩) ভারত প্রদক্ষিণ—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

ইংরেজি হইতে অনুবাদযোগ্য জীবনচরিত—

ইংরেজিতে এত বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ লোকদের জীবনী আছে যে তাদের নাম করা কঠিন। বসওয়েলের লেখা জন্‌সনের জীবনচরিত খুব নামজাদা বই।

ভারতবর্ষের ইংরেজী মাসিকপত্র কতকগুলি—

1. Modern Review
2. Hindustan Review
3. East and West
4. Indian Review
5. Everymans Review
6. Young India
7. Educational Review

ভারতবর্ষের বাহিরের মাসিকপত্র—

ভারতের বাহিরটা এতবড় ও তাদের কর্ম্মক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক বিষয়ে বহু বহু মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। তাদের নাম করা অসম্ভব।

ভাবের উদয়

(আন্‌সারি)

মোর মনের জলে ভাব-শফরী
মাঝে মাঝে ছুটছে নাচি',
যেন দরজী কাটে রেশমী কাপড়
নৃত্য করে কপার কাঁচি!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্যক্তির লক্ষ্য ও জাতির লক্ষ্য।

আমাদের দেশের ও জাতির অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই প্রধানতঃ কয়েকটি কথা আগেই মনে হয়; যেমন, আমরা পরাধীন, আমরা গরীব, আমাদের মধ্যে অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, আমরা রুগ্ন দুর্ব্বল ও অল্পায়ু, ইত্যাদি। এইসব কারণে মনে হইতে পারে, আমরা যদি স্বাধীন হইতে পারি, যদি ধন পাই, যদি আমাদের মধ্যে কেহ নিরক্ষর না থাকে, যদি দেশের স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং আমরা সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারি, তাহা হইলে আর কোন দুঃখ থাকে না। যে-যে দিকে এখন প্রধানতঃ আমাদের আকাঙ্ক্ষা ধাবিত হইতেছে, সে সমস্তই স্পৃহনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্তই উপায় স্বরূপ বলিয়া, লক্ষ্যস্থল বলিয়া নহে; কেন না, উহার কোনটিই পরমার্থ নহে। পৃথিবীর প্রধানতম জাতিদের ত এই সমস্তই আছে; কিন্তু তাহারা কি শান্তি পাইয়াছে, আনন্দ লাভ করিয়াছে, শ্রেয়ঃ কি তাহাদের অধিগত হইয়াছে? স্বাধীনতা, ধন, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, দৈহিকবল ও দীর্ঘজীবন, প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা পরমার্থ লাভের সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু এই সমুদয়ের অসদ্ব্যবহারে কিরূপ দুর্গতি হয়, মানুষের ইতিহাসে তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। বেশীদিন আগেকার ইতিহাস পড়িবার দরকার নাই, আমাদেরই জীবিত কালে পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে রক্তের স্রোত বহিয়াছে এবং এখনও যাহার বিরাম হয় নাই, তাহাই প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। রক্তপাতই উহার একমাত্র কুফল নয়। সকল রকমের নীচতা, কপটতা, মিথ্যাচরণ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, লালসা ও অন্যবিধ পাপ পুঞ্জীভূত করিলে সেই সমষ্টি যুদ্ধ হয়, বিদেশী ও বিদেশকে পদানত করিবার জন্য যুদ্ধ তাহাই।

মানুষ বিপন্ন হইলে অনেক সময় তাহার অনুতাপের উদয় হয় এবং শ্রেয়ের দিকে মন যায়। গত মহাযুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইয়াছে, সেইসব জাতির মনে অনুতাপের উদয় হইয়াছে কি না জানি না, মনে হইতেছে, তাহারা সুযোগ পাইলে প্রতিশোধ লইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যাহারা জিতিয়াছে, তাহাদেরও লোকক্ষয় খুব হইয়াছে, এবং অন্তর্ব্বিবাদেরও সীমা নাই। কিন্তু, জেতাদের মধ্যে কতক-গুলি সৎলোক শ্রেয়ের পথ চিন্তা করিলেও কোন জেতা জাতি শ্রেয়ের বিষয় ভাবিতেছে না। তাহাদের বলদর্প অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়াছে, ন্যায়ান্যায় বিচার আগে সামান্য যাহা ছিল, তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোভের ত অন্তই নাই। বিজেতা বিজিত কোন জাতিই মহাযুদ্ধের প্রকৃত অর্থাৎ স্বস্বচরিত্রগত কারণ নির্ণয় করিতে ব্যগ্র না, এইরূপ কারণ জানিয়া নিজ নিজ স্বভাবের আমূল সংস্কার করিতে কোন জাতির আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।

এইসব কথা ভাবিলে এই প্রশ্নটিই মনে জাগে, আমরা স্বাধীন, ধনী, "শিক্ষিত", সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবী কেন হইতে চাই? প্রবল জাতিদের মত ব্যবহার করিবার নিমিত্ত? তাহা ত কখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

প্রাচীনতম কাল হইতে এপর্য্যন্ত মানুষ একটি ভুল করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তির আদর্শ একটি, জাতির আদর্শ অন্য প্রকারের চলিয়া আসিতেছে। সত্য বটে, ব্যক্তিগত জীবনেও লোকে সচরাচর ধনী মানী ক্ষমতাশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রকৃতি হীন, চরিত্র মন্দ হইলেও, তাহাকে সম্মান দেয় এবং তাহার মত অবস্থাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে। কিন্তু যদি মানুষকে ভাবিয়া দেখিতে বলা যায়, যে, ঐরূপ "বড়লোক"ই বড়, না বুদ্ধদেবের মত লোক বড়, ঐরূপ লোকের দ্বারা জাতি ও মানবসমাজ গৌরবান্বিত হয়, না বুদ্ধদেবের মত লোকের দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, তখন যে উত্তর পাওয়া যায় তাহাতে ভুল বুঝিতে বাকী থাকে না যে মানুষের পূজনীয় আদর্শ কি। ব্যক্তিগত জীবনে, আমরা নিজ নিজ আচরণ দ্বারা না হউক, মুখে এবং নির্জ্জন চিন্তার সময় ইহা স্বীকার করি, যে, সংসারের "বড়মানুষ"রা নিজেও শ্রেয়ের পথ ধরিতে পারেন নাই, মানবজাতিকেও শ্রেয়ের পথে চালিত করিতে পারেন নাই; শ্রেয়ের পথ ধরিয়াছেন ও ধরাইয়াছেন বুদ্ধ নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সংসারের বড় লোক এবং প্রকৃত মহৎ লোক যেমন দুই ভিন্ন শ্রেণীরই আছে, এবং শেষোক্ত শ্রেণীই নমস্য বলিয়া পরিগণিত, জাতি-সমাজে এপর্য্যন্ত সেরূপ শ্রেণীবিভাগ এখনও হয় নাই; কারণ

এপর্য্যন্ত যাহারা বড় জাতি বলিয়া গণিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা সবাই সাংসারিক হিসাবে বড়, জাতিগত ভাবে প্রকৃত মহত্ত্ব তাহাদের নাই; যদিও মহৎ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে জন্মিয়াছেন বটে।

একজন মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে চুরি করিলে, মিথ্যা কথা বলিলে, প্রতারণা করিলে, নরহত্যা করিলে, কপট হইলে, নারীর সর্ব্বনাশ করিলে, সে অবজ্ঞার যোগ্য বিবেচিত হয়, এবং কখনও তাহার মতি পরিবর্ত্তন হইলে তাহার অনুতাপের উদয় হয় এবং সে আপনাকে হেয়ও মনে করে; জাতীয় জীবনে প্রত্যেক "বড়জাতি"র সম্মানিত বহু সাম্রাজ্য-স্থাপক "বীর"ও রাজনীতিজ্ঞ পরস্বাপহরণ করিয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তে ধরা কলঙ্কিত করিয়া, অগণিত নারীর চরম দুর্গতির ও জীবনের ব্যর্থতার কারণ হইয়াও ঘৃণার পরিবর্ত্তে সম্মান ও পূজা পাইয়া আসিতেছে এবং তাহারা যে-যে জাতির লোক, সেই সেই জাতি বড় জাতি বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কোন "বড় জাতি"র এপর্য্যন্ত মতি পরিবর্ত্তন ও আত্মগ্লানি হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই, পড়ি নাই। বস্তুতঃ ইহা এখনও সত্য, যে ছোট চোরই চোর, বড় চোর "সাম্রাজ্য-স্থাপক"; ছোট নরহন্তা ফাঁসীর যোগ্য, বড় নরহন্তা মহাবীর ও তাহার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হওয়া উচিত!

কিন্তু প্রকৃত আদর্শ ইহার বিপরীত। একজন মানুষ নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য যাহা করিলে লোকের চোখে হীন বলিয়া গণ্য হয়, সে একা বা আরও অনেক লোকের সহিত দলবদ্ধ হইয়া "দেশের জন্য" তাহা করিলেও তাহার আচরণ ঠিক্ তেমনি গর্হিত ও নিন্দনীয়। অনেক মহাত্মা শ্রেয়ের জন্য অপমান, বিদ্রূপ, নির্য্যাতন, দারিদ্র্য, অনাহার, রোগভোগ, দৈহিক ক্ষীণতা, কারাবাস, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যাহা আদর্শ বলিয়া বুঝিয়াছেন, ধর্ম্ম বলিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করেন নাই। এই প্রকারে তাঁহারা অমর হইয়াছেন, শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াছেন, ও মানুষকে শ্রেয়ের পথ দেখাইয়াছেন। "বড় জাতি"দের মধ্যে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন জাতিই জাতিগত ভাবে এই প্রকারের মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। "আমরা জাতিগত ভাবে দরিদ্র হইব, নানা দুর্গতি ভোগ করিব, এমন কি ধরাধাম হইতে আমরা লুপ্ত হইব, তথাপি হেয় কাজ করিব না, পাপে লিপ্ত হইব না"; এরূপ প্রতিজ্ঞা ও আচরণ কোন "বড় জাতি" (কিম্বা ছোট জাতি) করিয়াছে বলিয়া জগতের ইতিহাসে দেখা যায় না। বড় জাতিদের ধন বিদ্যা শক্তি বাণিজ্য সেনাদল সাম্রাজ্য যেরূপই হউক, তাহারা ক্ষুদ্রচেতা ও ছোট। তা বলিয়া আমরাই যে বড়, তাহা নয়; আমরাও ত উহাদেরই আদর্শ ধরিয়া চলিতেছি। আমরা যদি ধন বিদ্যা স্বাস্থ্য আয়ু ও স্বাধীনতাকে আমাদের ও অন্য জাতি-সকলের শ্রেয় লাভের উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতে প্রাণপণ করি, তবেই আমরা প্রকৃত মহৎ জাতি হইতে পারিব।

এক একটি মানুষের মহৎ হইবার উপায় যাহা, এক একটি জাতিরও মহৎ হইবার উপায় তাহাই। জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব, স্বরাজ্য, স্বায়ত্তশাসন আমরা লাভ করিতে পারি বা না পারি, তাহা লাভ করিবার ইচ্ছা আমাদের হইয়াছে, এবং অনেকে যিনি যে উপায় ভাল মনে করিতেছেন সেই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এই মনে রাখা দরকার, আমাদের লক্ষ্য কি, সৎ উপায়ই বা কি? "বড় জাতি"দের লক্ষ্য এপর্য্যন্ত যাহা দেখিয়া আসিতেছি, তাহা যেন আমাদের লক্ষ্য না হয়। তাহাদের অবলম্বিত উপায়ও যেন আমরা অবলম্বন না করি।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।"

"জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সেই সমুদয়কে পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে (অর্থাৎ সমস্তই পরমাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এইরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে)। এইরূপে বিষয়াসক্তিকে ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

ঈশোপনিষদের এই উপদেশ আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে যেন বিস্মৃত না হই।

যাহা অপর জাতির সম্পত্তি, ছলে বলে কৌশলে তাহা আমাদের হউক, প্রবল জাতিদের ইহাই প্রধান লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। শুধু অন্য জাতির দেশ দখল করিয়া ও তাহাদিগকে পদানত করিয়াই প্রবল জাতিরা সন্তুষ্ট নহে। তাহাদের শিল্প ও বাণিজ্য রাজশক্তির প্রয়োগে ও প্রতিযোগিতা দ্বারা

নষ্ট করিয়া নিজেদের ধন বৃদ্ধি করাও প্রবল জাতিদের অবলম্বিত একটি উপায়। ফলে পৃথিবীতে এখন দুই রকমের যুদ্ধ চলিতেছে; অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ ও বাণিজ্যের যুদ্ধ। বাণিজ্যের যুদ্ধও অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধের মত গর্হিত। এক দেশে যাহা উৎপন্ন হয় না, অন্য দেশ তাহা যোগাক্; ইহা যুদ্ধ নয়, গর্হিতও নয়। কিন্তু এক দেশ যদি অন্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে নষ্ট করিয়া, কিম্বা তথাকার কাঁচা মাল হইতে জিনিষ প্রস্তুত যাহাতে না হয় তাহার মত উপায় অবলম্বন করিয়া তৎসমুদয় স্বদেশে আনিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ঐ দেশে বিক্রয় করে ও তদ্দ্বারা লাভবান্ হয়, তবে তাহা যুদ্ধেরই মত গর্হিত। যে প্রতিযোগিতা অপরের অনিষ্ট ইচ্ছা করে, অপরের উন্নতি না হউক প্রার্থনা করে, অপরের উন্নতিতে কাতর হয়, তাহা কখনই ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কি দর্শনবিজ্ঞানসাহিত্যে, কি শিল্পবাণিজ্যে, ঈশ্বর আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারা যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট বস্তু আমরা গড়িয়া দিব, অন্যেরাও তাহাই করুন; ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও জাতি দ্বারা এইরূপ ইচ্ছার বিপরীত নীতি অবলম্বিত হইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত লোকে কেবল স্বদেশের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির কথাই ভাবিয়া আসিতেছে। তাহাতে কোন কোন জাতি ধনী ও প্রবল হইতেছে বটে, অর্থাৎ তত্তৎজাতির কোন কোন শ্রেণীর লোক খুব ধনশালী হইতেছে ও বাকী লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে সচ্ছলতা ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু সমুদয় মানবজাতি উপকৃত হইতেছে না; বরং জাতীয় ঈর্ষ্যা ও প্রতিযোগিতা বশতঃ যুদ্ধ ঘটিতেছে এবং যখন যুদ্ধ হইতেছে না তখনও জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতেছে। যাহাতে সব দেশের সব শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ হয়, এরূপ নীতিই অবলম্বনযোগ্য।

যে-পরিবারের সকল মানুষ নিজের নিজের সুখ শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা না করিয়া সমুদয় পরিবারের মঙ্গল চিন্তা করে, সেই পরিবারের কল্যাণ হয় ও তাহাতে শান্তি বিরাজিত থাকে। যে-দেশের পরিবারসমূহ কেবল আপনাদেরই স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা দেখে, সমগ্রজাতির হিত কিসে হয় আগে তাহার কথা ভাবে না, সে দেশ বড় হয় না; কিন্তু যেদেশের লোকেরা দেশের ও জাতির স্বার্থের খাতিরে নিজের ও পরিবারের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদের দেশ ও জাতি বড় হয়। তদ্রূপ যে-সব মানুষ, পরিবার, ও জাতি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকেই একমাত্র কল্যাণ জ্ঞান করিয়া, ব্যক্তির, পরিবারের ও জাতির ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, তাহারাই ধন্য। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ, এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, পরিবার ও জাতির কল্যাণে বাস্তবিক বিরোধ নাই। সকলেরই যাহাতে কল্যাণ, সেই বস্তু বা নীতি বহু গণনা ও বিচার দ্বারা স্থির করিতে হয় না। শ্রেয়ঃ যাহা, তাহা একজনের পক্ষে শ্রেয়ঃ, পরিবারের পক্ষে শ্রেয়ঃ, জাতির পক্ষে শ্রেয়ঃ, সমগ্র মানবকুলের পক্ষেও শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মের পথই একমাত্র অবলম্বনযোগ্য পথ। মানুষ যদি এই পথ অবলম্বন করিয়া চলে, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, সব মানুষ তাহার আত্মীয় হইয়া গিয়াছে, এবং সব দেশ তাহার স্বদেশে পরিণত হইয়াছে।

আমি যে দেশে জেলায় গ্রামে বাস করি, তাহার কল্যাণ চিন্তা না করিয়া আগে গ্রীনল্যাণ্ডের লোকদের কথা ভাবিতে হইবে, "বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতি এরূপ বলে না। উহা কেবল ইহাই বলে, যে, পরিবারের, গ্রামের, জেলার, দেশের কল্যাণ অবশ্যই সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয় এবং তাহা স্বাভাবিক ও সহজসাধ্যও বটে, কিন্তু এই কল্যাণের চিন্তা ও সাধন ধর্ম্মানুমোদিত হওয়া চাই; তাহা হইলেই উহা প্রকৃত কল্যাণ হইবে, এবং উহার সাধনে জগতের অন্য কাহারও অমঙ্গল ত হইবেই না, প্রত্যুত মঙ্গলই হইবে।

এরূপ মনে হইতে পারে বটে, যে, এরূপ করিলে জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত হইতে পারে; অতএব জীবনসংগ্রামে যে-কোন প্রকারে হউক টিকিয়া থাকা চাই,—তাহা তোমার কেতাবী ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী হউক বা না হউক। কিন্তু ইহা কখনই আদর্শ নহে। জগতের মহাজনেরা নিজেদের জন্য "বাঁচা আপন বাঁচা" নীতি অবলম্বন করেন নাই। সেইজন্যই তাঁহারা মরিয়াও অমর হইয়া আছেন এবং মানবকুলের নবজীবন-লাভের সহায় হইয়াছেন। যে-কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিয়া শতায়ু হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে, ধর্ম্মপথে থাকিয়া অল্পায়ু হওয়াও বাঞ্ছনীয়। শ্রেয়ের জন্য প্রাণপণ করিয়া যে-সব মহাত্মা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেমন মনুষ্যপ্রকৃতিকে উন্নত করিয়াছেন ও করেন তাহা

ছেন; তেমনি যদি কোন জাতি শ্রেয়ের জন্য প্রাণপণ করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্তও হন, তাহা হইলেও সেই জাতির অকালমৃত্যু ব্যর্থ বিবেচিত হইবে না। কি ব্যক্তির, কি জাতির, জীবনের সার্থকতা দৈর্ঘ্যে নহে; গভীরতায়, উৎকর্ষে, শ্রেয়ের অনুষায়িতায় উহার সার্থকতা।

নূতন ভারতশাসন আইন।

বাংলা এই ১৩২৭ সালের মধ্যেই নূতন ভারতশাসন আইন অনুসারে কাজ আরম্ভ হইবে। ইহা দ্বারা আমরা কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, তাহা আগে একাধিক বার বলিয়াছি; নূতন করিয়া বলিবার বেশী কিছু নাই। এস্থলে তাহা বলা আমাদের অভিপ্রেতও নহে। কেবল একটা সাধারণ কথা বলিয়া রাখি। আইনটার নানা ধারা, তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও সমগ্রভারতের নানা নিয়ম, নির্ব্বাচন ও তাহার আয়োজনের আড়ম্বর, এ সকলের মধ্যে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, যে, যাহা স্বোপার্জ্জিত নহে, তাহা প্রকৃত লাভও নহে, তাহা মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়াইতে পারে না। মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির জন্য মানুষকে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, ত্যাগ করিতে হয়। যদি নূতন আইনে তাহার সুযোগ পাইয়া কেহ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহাই হইবে প্রকৃত লাভ।

আমাদের অভিলাষ ত এই যে আমরা সমুদয় ভারতবর্ষের লোক আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিব, এবং একলক্ষ্য হইয়া আমাদের দেশকে ভারতের ও জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ করিব। কিন্তু ভারতশাসন আইনের প্রয়োগ হইবার আগেই দেখিতেছি, সমস্ত দেশে ও প্রদেশে নানা দলের দলাদলি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন দলগুলি ত আছেই; তাহার উপর নূতন দলের উদ্ভব হইতেছে। আমরা অবশ্য এরূপ অসঙ্গত আশা করি না, যে, সকল বিষয়ে সকল মানুষের মত এক হইবে। মতভেদ স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এবং মঙ্গলের কারণ। কোন মানুষই সত্যের সব দিক্‌টা যুগপৎ আয়ত্ত করিতে সমর্থ নহেন। কেহ কিয়দংশ দেখেন, অপরে অন্য অংশ দেখেন। এইরূপে সত্যের ধারণা কতকটা সম্পূর্ণ হইতে থাকে। কার্য্যপ্রণালী এবং উপায় সম্বন্ধেও ইহা সত্য, যে, কোন প্রণালী বা উপায়ই নিখুঁত ও সিদ্ধিলাভের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে।

কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও, দলাদলির ভাবটাকে অবশ্যম্ভাবী ও কল্যাণকর মনে করা যায় না। কোন দলভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক কর্ম্মীর প্রত্যেক মত ও কার্য্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করা এবং বিচারফল অনুসারে তাহার সমর্থন করা বা না করা অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি বিশেষ কোন দলভুক্ত হইতেই হয়, তাহা হইলেও দলাদলি পরিহার করা অসাধ্য নহে। অমুক আমার দলের লোক, অতএব তাঁহার মত ও কার্য্যের সমর্থন করিতেই হইবে; অমুক আমার দলের লোক নহেন, অতএব তাঁহার মত ও কার্য্যের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেই হইবে; ইহার নাম দলাদলি। আমার দলের সবই ঠিক্ ও ভাল, অন্য দলের সমস্তই ভুল ও মন্দ, এইরূপ মনে করা দলাদলির ফল। দলাদলির চরম কুফল ফলে তখন যখন মানুষ মনে করে, যাহারা আমার দলের লোক নহে তাহারা সবাই বিশ্বাসের অযোগ্য বদ্‌লোক।

নূতন ভারতশাসন আইনে সুফল কি ফলিবে না ফলিবে তাহা কেহই ঠিক্ অনুমান করিতে পারেন না; কিন্তু দলাদলির কুফলটা যাহাতে না ফলে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা দুঃসাধ্য নহে। দেশের লোকদের নিকট হইতে অন্ততঃ এইটুকু কি আমরা আশা করিতে পারি না?

নূতন আইন হইতে অন্ততঃ একটি সু-ফলের আশা করা যাইতে পারে। দেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামের যে নিরক্ষর রায়ৎ বৎসরে অন্যূন এক টাকা রোড্ সেস পব্লিক ওয়ার্কস্ সেস্ দেয়, তাহার নিকটও এই খবর পৌঁছিতে পারে, যে, সে তাহার মত আরো অনেকের সঙ্গে মিলিত হইয়া এমন কাহাকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, যাহার দ্বারা দেশের হিত হইতে পারিবে। তাহা হইলে গরীব নিরক্ষর রায়ৎকেও ভাবিতে হইবে, তাহার হিত কিসে হয়, তাহার মত আর দশজনের হিত কিসে হয়, এবং সেই হিত করিবার চেষ্টা করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি কে। তাহার উপর এতটা ভাবিবার ভার দেওয়ায় তাহাকে শ্রদ্ধা করা হইয়াছে, এইরূপ ধারণা যদি তাহার জন্মে, তাহা হইলে তাহার আত্মসম্মান-বোধ জন্মিবে ও বাড়িবে। যদি দরিদ্র নিরক্ষর লোকদেরও দেশ সম্বন্ধে ও নিজেদের সম্বন্ধে চেতনার উদ্ভবের সম্ভাবনা এবং তাহাদের আত্মসম্মানের উদ্রেক নূতন

ভারতশাসন আইনের অন্যতম ফল হয়, তাহা হইলে তাহা কিছু লাভ বটে।

কিন্তু যদি নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা প্রধানতঃ দলাদলির ব্যাপার হয়, কিম্বা কাহার কত টাকা বা জমীদারী আছে, তদনুসারে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে কোন সুফল ত হইবেই না, অধিকন্তু কিছু কুফল হইবে। অমুক আমার জমীদার, তাঁহাকে ভোট না দিলে তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, অমুক উকীল-বাবুকে ভোট দিলে তিনি ভবিষ্যতে মোকদ্দমার সময় কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, নির্ব্বাচন-কার্য্যটা যদি প্রধানতঃ এবম্বিধ বা তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট রকমের ভয় ও প্রলোভনের বশে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সম্ভাবিত সুফলের আশা কোথায়?

কোন কোন প্রদেশে, নূতন ভারতশাসন আইনটি কি, নির্ব্বাচকদের দায়িত্ব কিরূপ, প্রতিনিধিদের কর্ত্তব্য কি, প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে। বাংলা দেশে এখনও তাহার সূত্রপাত হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভায় যাঁহারা প্রতিনিধি হইতে চান, তাঁহাদের নাম ক্রমে ক্রমে খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। তাঁহারা শুধু ভোট চাহিলেই ত হইবে না। তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্বন্ধে লোকশিক্ষার ভার লইতে হইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রী ও পুস্তিকা ছাপাইতে হইবে, স্বয়ং বা স্বনিযুক্ত কার্য্যকর্ত্তা দ্বারা নির্ব্বাচকদের বহু সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে, যেখানকার বা যাহাদের প্রতিনিধি হইতে চান, তাহাদের অভাব দুঃখ আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।

বঙ্গে প্রতিনিধিদের সংখ্যা।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় মোট সভ্যসংখ্যা ১৪২ হইবে। নির্ব্বাচিত হইবেন ১১৬ জন, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন ২৬ জন কে কত জন নির্ব্বাচন করিবেন, নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল:—

গ্রাম্য মুসলমানগণ	৩৩
গ্রাম্য অমুসলমানগণ	৩৩
নাগরিক মুসলমানগণ	৬
নাগরিক অমুসলমানগণ	১১
জমীদারগণ	৫
দুটি বিশ্ববিদ্যালয়	২
ভারতীয় বণিকেরা	৩
ইউরোপীয় বণিকেরা	১২
সাধারণ ইউরোপীয়গণ	৬
ফিরিঙ্গীরা	৩
শ্রমজীবীরা	২

মনোনীত সভ্যদিগের তালিকা

অবনত শ্রেণীদের জন্য	১
দেশী খৃষ্টিয়ানদের জন্য	১
অন্যেরা	২
সরকারী সভ্য	২০
বিশেষজ্ঞ	২

"অন্যেরা" যে কে তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন আপাততঃ স্থগিত থাকিবে। ঢাকাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান প্রতিনিধি দেওয়া ঠিক্ হয় নাই। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের সংখ্যা খুব বেশী। ঢাকার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ভবিষ্যতেও কলিকাতার সমান হইবে না। কলিকাতাকে আরও বেশী সভ্য দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচকগণ অন্যপ্রকারেও নির্ব্বাচক হইতে পারিবেন; সুতরাং কলিকাতা একজন প্রতিনিধি পাইলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

ইউরোপীয়দিগকে ও ফিরিঙ্গীদিগকে অত্যন্ত বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা ১৮৯০২। তাহারা তিনজন প্রতিনিধি পাইবে, অর্থাৎ প্রতি ৬৩০০ জনে একজন। মুসলমানদের সংখ্যা ২৩৯,৭৫,১৭১। তাহারা ৩৯ জন প্রতিনিধি পাইবে, অর্থাৎ প্রতি ৬১৪১৪৮ জনে এক জন। ইহার মানে এই, যে, মোটামুটি এক-একজন ফিরিঙ্গীকে একশত মুসলমানের সমতুল্য ধরা হইয়াছে। "অবনত" শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা ৯৯,৩৮,২৪৪। তাহারা পাইবে একজন প্রতিনিধি; তাহাও আবার তাহারা নির্ব্বাচন করিতে পাইবে না, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দিবেন।

যাহা হউক প্রায় এককোটি "অবনত" শ্রেণীর লোকদের একজন মাত্র প্রতিনিধি হইবে, অথচ প্রতি ৬৩০০ ফিরিঙ্গীরও প্রতিনিধি হইবে একজন। অতএব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় এক-একজন ফিরিঙ্গী ১৫৮০ জন "অবনত" শ্রেণীর লোকের সমান। ধনে ও বুদ্ধিতে সাধারণ মুসলমান রায়ৎ ও সাধারণ "অবনত" শ্রেণীর রায়তে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রতি ছয়লক্ষ মুসলমান এক-একজন প্রতিনিধি পাইবে, আর ৯৯ লক্ষ "অবনত" শ্রেণীর লোকেও তাহাই পাইবে। অবশ্য "অবনত"শ্রেণীভুক্ত উপযুক্তযোগ্যতাবিশিষ্ট লোকেরা "অমুসলমানদের" প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারিবে; ইহা মন্দের ভাল।

বঙ্গে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ১৯৭০৭। তাহারা মোট ১৮ জন প্রতিনিধি পাইবে। অর্থাৎ প্রায় প্রতি ১১০০জনে একজন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। তাহার মানে এই, যে, এক-একজন ইউরোপীয় ৬ জন ফিরিঙ্গীর, ৬০০ মুসলমানের, এবং ৯১০০ অবনত শ্রেণীর লোকের সমান।

দেশীয় খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা, ধন, বিদ্যাবুদ্ধি ফিরিঙ্গীদের চেয়ে ঢের বেশী। তাহাদিগকে একজনমাত্র মনোনীত প্রতিনিধি এবং ফিরিঙ্গীদিগকে তিনজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়।

ইউরোপীয়গণ যে ১৮ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবে, তাহার ভাগ নিম্নলিখিত রূপ হইয়াছে:—

বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স	৬ জন
ইণ্ডিয়ান জুটমিল্‌স্ এসোসিয়েশুন	২ জন
ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশুন	১ জন
ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশুন	১ জন
কলিকাতা ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশুন	২ জন

ইউরোপীয় বণিকদের এইসব সমিতির প্রত্যেকটির সভ্যসংখ্যা কয়জন করিয়া তাহা জানা থাকিলে বলিতে পারা যাইত, কোন্ সমিতির এক-একজন সভ্যকে কোন্ শ্রেণীর বাঙ্গালীর কয়জনের সমান ধরা হইয়াছে। সমিতিগুলির সভ্যেরা যে ১২ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, তাহা ছাড়া আবার সাধারণ ইউরোপীয়েরা (যেমন ব্যারিষ্টার প্রভৃতি) ৬ জন নির্ব্বাচন করিবে।

জমীদারেরা ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। কোন্ কোন্ ডিভিজনের জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক কত কত খাজনা দিলে নির্ব্বাচন-অধিকার পাইবে, তাহা নিয়মাবলীতে লেখা আছে। তদনুসারে মোট নির্ব্বাচক জমীদারের সংখ্যা কত হইবে, এখনও তাহা প্রকাশিত হয় নাই হইলে বুঝা যাইবে, যে, প্রতি কয়জন জমীদার দ্বারা এক একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে, কেবলমাত্র ৫ জন জমীদার ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইবে মনে করা ঠিক্ হইবে না। গ্রাম মুসলমান ও অমুসলমানদিগকে যে ৬৬ জন প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি অল্পায়াসেই জমীদারদের দ্বারা অধিকৃত হইতে পারিবে; কারণ গ্রাম্য লোকদের উপর জমীদারদের প্রভাব খুব বেশী।

বিশেষ তলাইয়া না বুঝিয়া শুধু নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ১১৬ এবং মনোনীতদের সংখ্যা ২৬ হইতে, ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত সমুদয় বা অধিকাংশ বিষয়ে লে[illegible] প্রবল হইবে, অনুমান করা ভুল হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবতঃ কাহারা মত দিবে, দেখা যাক্। ২০ জন মনোনীত সরকারী সভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মত দিবে। তা ছাড়া অপর মনোনীত ছয়জন সভ্যেরও সরকারের পক্ষাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা। "অন্যেরা" ২ জন, ১৮ জন ইউরোপীয় ও তিনজন ফিরিঙ্গী সভ্যকেও ঐ দলে ধরা যাইতে পারে। যে-যে-বিষয়ে জমীদারদের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত নহে, তাহার সম্বন্ধে ৫ জন জমীদারপ্রতিনিধিকে সরকারের তরফের লোক মনে করা যাইতে পারে; কারণ জমীদারশ্রেণীর উপর গবর্ণমেণ্টের প্রভাব বেশী এবং শিক্ষা ও স্বাধীনচিন্ততা এখন পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণিত হয় নাই। খিলাফৎ ও তুরস্ক সম্বন্ধে মুসলমানদের মনের অবস্থা যতদিন উত্তেজিত থাকিবে, সম্ভবতঃ ততদিন তাহাদের ৩৯ জন প্রতিনিধি সরকার পক্ষ অবলম্বন না করিলেও, উত্তেজনা প্রশমিত হইলে যে-সব বিষয়ে মুসলমানদের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত নহে তাহাতে অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধির গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মত দিবার সম্ভাবনা আছে; কারণ মুসলমানসমাজে উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনচিন্ততা বিশেষ ভাবে

ক্ষিত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রাম্য ৬৯টি প্রতিনিধির পদ অনেক স্থলে জমিদারদের দ্বারা অধিকৃত হইবার সম্ভাবনা। এইসব প্রতিনিধি অন্ত [redacted] জন জমীদার প্রতিনিধির মত হইবে, মনে করা যাইতে [redacted] মাড়োয়ারী বণিক্-সভার একজন প্রতিনিধি মাড়োয়ারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যবস্থাপক সভায় ছয়জন সভ্য লেবারের অর্থাৎ শ্রমীদের প্রতিনিধি হইবে বলিয়া সরকারী (communique) জ্ঞাপনীতে লেখা হইয়াছে। তাহারা wage-earners ও labour অর্থাৎ মজুরী-উপার্জ্জক ও শ্রমীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন পড়িয়াছিলাম, যে, নাগরিক মজুরী-উপার্জ্জকদিগকে (urban wage-earners) নির্ব্বাচন-অধিকার দেওয়া হইবে, তখন কলকারখানার শ্রমীদের কথাই মনে হইয়াছিল। এখনও এই নির্ব্বাচকসমষ্টিকে labour constituency নাম দেওয়া হইয়াছে। যে-কেহ মানসিক বা শারীরিক শ্রম বা উভয়ের দ্বারা রোজগার করে, তাহাকেই শ্রমী বলা চলে। কিন্তু লেবারের অর্থ দৈহিকশ্রমজীবী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শ্রমীদের প্রতিনিধি কাহারা হইতে পারিবে এবং তাহাদিগকে কাহারা নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে নিয়মাবলীতে লেখা হইয়াছে :—

"A person shall not be eligible for election as a Member of the Council to represent—

* * *

(b) a Landholders, University, Commerce and Industry, or Labour constituency (which constituencies are hereinafter in these rules referred to as special constituencies) unless his name is entered on the electoral roll of the constituency."

"A person shall be qualified as an elector for a labour constituency who has a place of residence in the constituency and is, on account of employment by a Company which is a member of one of the Affiliated Associations of the Bengal Chamber of Commerce, in receipt of a monthly wage amounting to Rs. 25 and not exceeding Rs. 35."

বেঙ্গল্ চেম্বার্ অব্ কমার্স্ বঙ্গের ইংরেজ বণিক্দের প্রধান সমিতি। যে-সব কোম্পানী ইহার সহিত অঙ্গীভূত সভাসকলের সভ্য, সেই-সব কোম্পানীর মাসিক ২৫ হইতে ৩৫ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মীরাই নির্ব্বাচক ও প্রতিনিধি হইবেন, এই নিয়ম করা হইয়াছে। এই-সব কোম্পানীই সম্ভবতঃ ইউরোপীয়দের। সুতরাং তাহাদের বেতনভোগীরা ইংরেজ বণিকদের অনুমোদিত তাঁহাদেরই বেতনভোগী প্রতিনিধিপদপ্রার্থীকে ভোট না দিয়া অন্য কাহাকেও ভোট দিতে সাহস করিবে না। অতএব, দেখা যাইতেছে, এই কৌশলের দ্বারা ইউরোপীয় বেসরকারী সভ্যদের দলে আরও ২ জন লোক বাড়ান হইল, অর্থাৎ ১১৬ জন নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে ২০ জন—ষষ্ঠাংশেরও অধিক—ইংরেজ ও ইংরেজদলভুক্ত দেশী লোক হইবার ব্যবস্থা হইল। আমরা যতদূর জানি, কলকারখানার অধিকাংশ মজুর মাসিক ২৫ টাকার কম বেতন পায়। তাহাদিগকে বাদ দিয়া এবং দেশীলোকদের পরিচালিত সমুদয় কারখানা ছাপাখানা বাদ দিয়াও নির্ব্বাচকসমষ্টির নাম labour constituency রাখাটা উপহাস মাত্র। ৩৫ টাকার উপর যে-সব কর্ম্মী রোজগার করে, তাহাদিগকেই বা বাদ দেওয়া হইল কেন? ২৫ হইতে ৩৫ টাকা বেতনের কর্ম্মীদের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে কি? অবশ্য কুলি মজুরদেরও বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার কাজ হয় ইংরেজীতে। শ্রমীদের মধ্যে যথেষ্ট ইংরেজী-জানা লোক আছে কি? তাহাদিগকে দেশভাষায় বক্তৃতা করিতে দিলে তাহাদের মত প্রকাশের কাজ চলিবে বটে, কিন্তু তাহারা অন্য সভ্যদের ইংরেজী বক্তৃতার অর্থ বুঝিয়া বিতর্কে যোগ দিতে পারিবে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সব বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর আদি বাংলায় হইলে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ইংরেজ সভ্যদের অসুবিধা হইবে। শ্রমীদের প্রতিনিধি শ্রমী হইবে, আমরা এই নিয়ম সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি; কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত নিয়মে যে-যে দোষ আছে ও তাহাতে যে অন্যায় ও অসুবিধা হইবে, তাহা দেখানও কর্ত্তব্য মনে করি বলিয়া উপরের মন্তব্যগুলি প্রকাশ করিলাম।

নূতন ভারত-শাসন আইনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা অন্যূন ১২৫ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যে, এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। তদনুসারে ১৫ জন বাড়াইয়া মোট সংখ্যা ১৪০ করা হইয়াছে, এবং কখন কখন প্রয়োজন মত অতিরিক্ত ছয়জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগেরও ব্যবস্থা

করা হইয়াছে (যেমন, স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা বিষয়ক আইন করিতে হইলে কিছুকালের জন্য এক বা দুইজন ডাক্তার নিযুক্ত হইতে পারে)। যে ১৫ জন সভ্যপদ বাড়ান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা পাইল ৬টি, অর্থাৎ শতকরা ৪০। সাধারণ ইংরেজরা ২টি পদ পাইবে, আগে এইরূপ স্থির ছিল ; এক্ষণে তাহা বাড়াইয়া ৬ করা হইয়াছে—একেবারে তিনগুণ বৃদ্ধি! ফিরিঙ্গীরাও ১ হইতে তিনটি পদ পাইল—তিনগুণ বৃদ্ধি! তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনগুণ, "অবনত" শ্রেণীর লোকদের তিনগুণ, দেশী খৃষ্টিয়ানদের তিনগুণ, এবং ভারতীয় বণিকদের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পাইল। ইহাকেই বলে ন্যায়-বিচার। পার্লেমেণ্টের জয়েণ্ট কমীটি ফিরিঙ্গীদের প্রতিনিধি বাড়াইবার কথা মোটেই বলেন নাই, তবু তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়া গেল। জয়েণ্টকমীটি, "অবনত" শ্রেণীরা যথেষ্ট প্রতিনিধি পায় নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া লেখেন, যে, মনোনয়ন দ্বারা তাহাদিগকে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দেওয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের উচিত। সুপারিসের ফল হইল এই যে তাহারা প্রায় এককোটিসংখ্যক লোক একজন মনোনীত প্রতিনিধি পাইল, এবং সুপারিস্ না থাকা সত্ত্বেও ফিরিঙ্গীরা আগেকার ১ জনের জায়গায় তিনজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাইল। যে-সকল নমঃশূদ্র ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের কথায় প্রতারিত হইয়াছিল, এখন তাহাদের চোখ ফুটিবে কি?

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভাসমূহে প্রতিনিধিদের সংখ্যা।

ভারত-শাসন আইনের প্রথম তফসীল অনুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যসংখ্যা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইয়াছে। প্রাদেশিক মোটামুটি লোকসংখ্যা আমরা বসাইয়া দিলাম। এখন প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপকসভ্যসংখ্যা ইহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে, কিন্তু মূল তালিকার অনুপাতেই বাড়িয়াছে।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	ব্যবস্থাপক সংখ্যা
মান্দ্রাজ	৪.১৪ কোটি	১১৮
বোম্বাই	১.৯৬ কোটি	১১১
বাংলা	৪.৫৪ কোটি	১২৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৪.৭১ কোটি	১১৮
পঞ্জাব	১.৯৯ কোটি	৮৩
বিহার-ওড়িশা	৩.৪৪ কোটি	৯৮
মধ্যপ্রদেশসমূহ	১.৩৯ কোটি	৭০
আসাম	.৬৭ কোটি	৫৩

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শিক্ষায় ও ধনেও সব প্রদেশ সমান, কিন্তু সভ্যসংখ্যা শিক্ষা ও ধনশালিতার অনুপাতেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। কোন্ প্রদেশ কত উন্নত বা অগ্রসর তাহা স্থির করাও কঠিন। বস্তুতঃ, যে-প্রদেশের বিস্তৃতি ও লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার ব্যবস্থাপক সভাও তত বড় হওয়া আবশ্যক। দেশ যত বড় এবং তাহার লোকসংখ্যা যত বেশী হয়, দেশের নানাবিধ কাজ করিবার জন্য দেশসেবকের সংখ্যাও তত বেশী হওয়া উচিত; নতুবা কাজ চলিতে পারে না। বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীরা এক শ্রেণীর দেশসেবক; অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য অন্যবিধ দেশসেবক। সবাই জানেন, দেশের, জেলার, নগরের, আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারী, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রভৃতির সংখ্যা বেশী বা কম হইয়া থাকে। অতএব ইহা বুঝা মোটেই কঠিন নয়, যে, ভারতীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যসংখ্যা প্রদেশগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যার অনুযায়ী হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় নাই।

নির্ব্বাচক হইবার যোগ্যতা সব প্রদেশে এবং এক প্রদেশের সব জেলায় একরূপ হয় নাই। তৎসত্ত্বেও যে প্রদেশগুলিতে নির্ব্বাচকসংখ্যা অধিক। সাউথবরা কমীটির জন্য যে মোটামুটি তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে নির্ব্বাচকসংখ্যা মান্দ্রাজে ৫৪২০০০, বোম্বাইয়ে ৬৫৩০০০, বঙ্গে ১২২৮০০০, আগ্রা-অযোধ্যায় ১৪৮৩৫০০, পঞ্জাবে ২৩৭০০০, বিহার-ওড়িশায় ৫৭৬০০০, মধ্যপ্রদেশসমূহে ১৫৯০০০, এবং আসামে ৩০০০০০। এই সংখ্যাগুলি পরে কিছু পরিবর্ত্তিত হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনুপাত প্রায় ঠিক্ থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা নির্ব্বাচক-সংখ্যার অনুযায়ীও হয় নাই। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বঙ্গের ব্যবস্থাপকদের সংখ্যা মোটামুটি ২৫০ হইতে পারিত। ইহা বেশী নয়। বিলাতের লোকসংখ্যা বঙ্গের সমান অথচ তথাকার হাউস্ অব্ কমন্সেরই সভ্যসংখ্যা ৭০৭।

ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় প্রাদেশিক সভ্যদের সংখ্যা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সভ্যসংখ্যা এখন ঠিক্ কত প্রস্তাবিত হইয়াছে, জানিতে পারি নাই। সাউথবরা কমীটির প্রস্তাব জানা আছে; এখন তাহার আলোচনায় লাভ নাই। অনেক বৎসর হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় খুব দক্ষ বাঙালী প্রতিনিধি কেহ নির্ব্বাচিত হইতেছেন না। সুরেন্দ্রবাবু চলনসই গোছের দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তিনিও এখন প্রাদেশিক সভায় গিয়া মন্ত্রী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় অর্থনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্, এবং বিতর্কনিপুণ বাঙালী প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত না হইলে, অন্যান্য প্রদেশের লোকদের বাঙালীর রাষ্ট্রীয় কার্য্যে বিচক্ষণতা সম্বন্ধে ধারণা হীন হইতে হীনতর হইতে থাকিবে। পার্লেমেণ্টের জয়েণ্ট কমীটি দ্বারা প্রাদেশিক সভ্যদের যেরূপ তালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে বঙ্গের ১৭ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ৬ জনকে বঙ্গের সাধারণ নির্ব্বাচকরা (general electorate) নির্ব্বাচন করিবেন; বাকী সভ্যেরা জমীদার, মুসলমান, ইউরোপীয়গণ, এবং দেশী বণিক্‌সমিতি দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচকসমষ্টি ও নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হয়, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ তত উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গের অধিকাংশ সভ্য সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাচিত হওয়ায়, মোটের উপর বঙ্গের প্রতিনিধিরা খুব উৎকৃষ্ট হইবেন, আশা হয় না।

আমরা জানি বাঙালীদের অহঙ্কার আছে, যে, "আমরা (বাণিজ্য ব্যবসা ছাড়া) সব বিষয়েই ভারতের সেরা।" আমরা কয়েক বৎসর হইতে এই ধারণার ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। কাজটি প্রীতিকর নহে। কিন্তু ভ্রম পোষণ করা অনিষ্টকর বলিয়া আমরা এই কাজ করিতেছি। বাঙালীদের মধ্যে যাঁহার যে-দিকে ঝোঁক, যিনি যে-কাজে ব্রতী, তাহা খুব শ্রম ও যত্নের সহিত করিতে চেষ্টা করিলে, বাঙালীর পিছাইয়া যাইবার বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা হয় না। কারণ, আমরা মানসিক বা দৈহিক শক্তিতে, সাহস ও উৎসাহে, কিম্বা আত্মোৎসর্গে স্বভাবতঃ হীন নহি।

আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের (U.S.A.) প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে। এইসব সভায় কেবল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিষয়ের ব্যবস্থা হয়। আমাদের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে আমেরিকার এই রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মত মনে করা যাইতে পারে। সমুদয় দেশটির ব্যবস্থা সম্মিলিত-রাষ্ট্রমণ্ডলের ব্যবস্থাপক সভায় হয়। এই সভার নাম কংগ্রেস্। ইহা দুই কক্ষে বিভক্ত, যথা—(১) প্রতিনিধি-সভা (House of Representatives) এবং (২) প্রবীণ-সভা (Senate)। প্রতিনিধিসভায় প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ লোকসংখ্যার অনুপাতে সভ্য নির্ব্বাচন করে; কিন্তু প্রবীণ-সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্র, ছোটই হউক বা বড়ই হউক, দুজন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করে। তদনুসারে ৪৮টি রাষ্ট্রের ৯৬ জন সভ্য লইয়া এই প্রবীণ-সভা গঠিত। আমাদের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রমণ্ডলের কংগ্রেসের স্থানীয় মনে করিলে দেখা যায়, যে, আমেরিকার কংগ্রেস্ যেমন দুই কক্ষে বিভক্ত, আমাদের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাও তেমনি দুই কক্ষে বিভক্ত। একটির নাম ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লী, অপরটির নাম কৌন্সিল অব ষ্টেট। লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লীটি আমেরিকার প্রতিনিধিসভার, এবং কৌন্সিল অব্ ষ্টেটটিকে আমেরিকার প্রবীণ-সভার মত মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিরই মত আয়তনে ও লোকসংখ্যায় ছোট বড়। সেইজন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন্ প্রদেশ হইতে কত সভ্য প্রেরিত হইলে ন্যায়সঙ্গত হয়, বলা কঠিন। বুদ্ধি, বিদ্যা, সভ্যতা, লোকহিতৈষণা, প্রদত্ত রাজস্ব, লোকসংখ্যা, বিশালতা, প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রদেশ-গুলির মর্য্যাদানুযায়ী স্থান নির্দ্দেশ করা অসাধ্য বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। অথচ কোন কোন প্রদেশের লোক বলিয়াছেন, যে, আমরা বাংলার চেয়ে বিসে ছোট, যে, আমাদিগকে বাংলার চেয়ে কম সভ্য দেওয়া হইল? এই ঝগড়ায় আমরা যোগ দিতে চাই না। ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য সমুদয় ভারতবাসীর একজাতিত্ব সম্পাদন এবং কল্যাণের পথে একলক্ষ্য হইয়া গমন। সেই কাজের গোড়াপত্তন প্রাদেশিক

ঈর্ষ্যাদ্বেষের পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা হইবে না। আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহেরও সবগুলি সমান অগ্রসর নহে; অথচ তাঁহারা কেবলমাত্র স্বস্ব লোকসংখ্যার অনুপাতে রাষ্ট্রমণ্ডলের প্রতিনিধি-সভায় সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, এবং সেনেট বা প্রবীণসভায় ছোট বড় প্রত্যেক রাষ্ট্রই দুজন করিয়া সভ্য প্রেরণ করেন। আমাদের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুটি কক্ষ গড়িবার কর্ত্তা আমরা নহি। কিন্তু উহা কেমন করিয়া গড়া উচিত, তাহা বলিতে বাধা নাই। আমরা বলি, আমাদেরও প্রদেশগুলি হইতে লোকসংখ্যা অনুসারে লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লীতে প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়া উচিত, এবং আমেরিকার প্রবীণসভার ন্যায় আমাদের কৌন্সিল অব্ ষ্টেটেও ছোটবড় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সমানসংখ্যক সভ্য প্রেরিত হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থাতেও সকলে সন্তুষ্ট হইবে না। কিন্তু আমেরিকার মত অগ্রসর গণতন্ত্র দেশের নজীর ইহার অনুকূলে রহিয়াছে, এবং ইহা অপেক্ষা ন্যায্যতর কোন ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয় নাই। সুইজার্‌ল্যাণ্ডের দ্বিকক্ষক ব্যবস্থাপক সভার গঠনও আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের দ্বিকক্ষক কংগ্রেসের অনুরূপ। সাউথবরা কমীটি, পার্লেমেণ্টের জয়েণ্ট কমীটি, এবং তৎপরবর্ত্তী সরকারী কমীটি, লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্‌ব্লী সম্বন্ধে কাহারও প্রস্তাব লোকসংখ্যার অনুযায়ী হয় নাই; কি মাপকাঠির অনুযায়ী হইয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কৌন্সিল্ অব্ ষ্টেটের গঠনেও লোকসংখ্যা অনুসারে ভিন্নভিন্ন প্রদেশের সভ্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; কি মাপকাঠি অনুসারে ঐ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। আমেরিকার সেনেট বা প্রবীণসভার আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশকে সমসংখ্যক সভ্যও দেওয়া হয় নাই।

পুরীতে দুর্ভিক্ষ।

বিহার-ওড়িশা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে পুরীর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অঞ্চলের মত স্বল্পায়তন স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার প্রয়োজন নাই। কারণটার অর্থ বোধগম্য হইল না। একটা জেলার একটা অংশে যদি অধিকাংশ মানুষ যা-তা খাইয়া কঙ্কালসার হয় এবং অনশনে কেহ কেহ মারা যায়, তাহা হইলে ঐ অবস্থা দুর্ভিক্ষপদবাচ্য কেন হইবে না? গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নয়, এবং সকল শ্রেণীর লোকের উপযোগীও নয়। সরকারী সাহায্য ব্যতীত বেসরকারী সাহায্যেরও খুব আবশ্যক আছে। বিহার-ওড়িশা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাসমহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, আগামী অক্টোবর নবেম্বর মাসে নূতন শস্য সঞ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্যের দরকার হইবে। টাকাকড়ি তাঁহার নামে পাঠাইলেই চলিবে। ঠিকানা—সত্যবাদী, সাখীগোপাল ডাকঘর, পুরী জেলা।

বঙ্গে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

১২ই মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে, ৩০এ এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্য্যন্ত সপ্তাহকালে বঙ্গে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, যে, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, অন্যত্র হয় নাই বলিলেই চলে। পশ্চিমবঙ্গে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া এবং ধান ও পাট বপনের জন্য বৃষ্টির খুব দরকার হইয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে পৌষ ও হৈমন্তিক ধানের নির্ড়ান কার্য্য উত্তম চলিতেছে। মাঠে যে সব ফসল আছে, তাহাদের ফলন ভাল হইবার সম্ভাবনা সাধারণতঃ এইরূপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-সপ্তাহের তুলনায় সমুদয় প্রদেশে সাধারণ চালের দর শতকরা ১৲ চড়িয়াছে।

বক্ষ্যমান সপ্তাহে দেশী চাল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ছিল জঙ্গীপুরে—টাকায় পৌনে সাতসের। বর্ম্মা চাল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ছিল বাগেরহাটে—টাকায় সাত সের। দেশী চাল সর্ব্বাপেক্ষা আক্রা ছিল কাল্‌নায়—টাকায় চার সের চৌছটাক; তমলুক ও ফেনীতে দর ছিল টাকায় চারসের পনের ছটাক। বাখরগঞ্জ চিরকাল প্রচুর চাউল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত; সেখানকার দর পাঁচসের।

ভারতবর্ষে কৃষিশিক্ষালয়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৭১ জন লোক কৃষি ও পশুপোষণের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে শতকরা ৮জন মাত্র লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। ইহা হইতে সকলেই অনুমান করিবেন যে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারত

পুরীর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক।

বর্ষে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা খুব বেশী আছে। বড়লাটের কৌন্সিলে একটি প্রশ্নের উত্তরে যে তালিকা দেওয়া হয় (যাহা গত ৩রা এপ্রিলের ইণ্ডিয়া গেজেটে বাহির হইয়াছে), তাহা হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ব্রিটিশভারতে মাত্র সাতটি কৃষিকলেজ ও সাতটি কৃষিস্কুল আছে। ব্রিটিশভারতের লোকসংখ্যা ২৪ কোটি ৪২ লক্ষ। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। তথায় উচ্চতম কৃষিশিক্ষার নয়টি শিক্ষালয় আছে, তদ্ভিন্ন আরো ছয়টি কৃষিকলেজ আছে, এবং তা ছাড়া আরও ১৩টি কৃষিবিদ্যালয় আছে। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের লোকসংখ্যা মোটামুটি দশ কোটি। সেখানে শ্বেত ছাত্রদের কৃষিশিক্ষার জন্য ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে বন্দোবস্ত আছে এবং প্রায় আড়াই হাজার উচ্চশ্রেণীর কৃষিবিদ্যালয় আছে; এতদ্ভিন্ন প্রাথমিক কৃষিবিদ্যালয় আরো অধিক আছে। ঐ দেশের অধিবাসী নিগ্রোদের সংখ্যা এক কোটি। তাহাদের কৃষিশিক্ষার জন্য প্রায় সাড়ে চারিশত কলেজ ও স্কুল আছে।

তথাপি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, যে, ভারতের কৃষিজীবী রায়ৎদের জন্য ইংরেজ আমলাদের প্রাণ দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া অবিরত কাঁদিতেছে।

ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার।

হাউস্ অব্ কমন্সে মিঃ লান্ ১৯১৩ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার জানিতে চান। তদুত্তরে অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ফিশার যাহা বলেন, তাহা নীচে মুদ্রিত হইল।

সাল	হাজারকরা মৃত্যুর সংখ্যা
১৯১৩	২৮.৭২
১৯১৪	৩০.০০
১৯১৫	২৯.৯৪
১৯১৬	২৯.১০
১৯১৭	৩২.৭২
১৯১৮	৬২.৪২

১৯১৯এর অঙ্ক উত্তরদানকালে প্রস্তুত ছিল না, এখনও বোধ হয় প্রস্তুত হয় নাই। মিঃ ফিশার ১৯১৮ সালের ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দায়িত্ব ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করেন। তদ্বিষয়ে দুটি বক্তব্য আছে।

(১) ঐ বৎসরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগেকার বৎসরগুলির মৃত্যুর উচ্চ হারের জন্য দায়ী কে? ১৯২০ সালের নিউ হেজেল্ বার্ষিক পুস্তকে অনেক দেশের আধুনিক যে মৃত্যুর হার দেওয়া আছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষের অঙ্কগুলির তুলনা করুন।

দেশ	হাজারকরা মৃত্যুর হার
ইংলণ্ড-ওয়েল্‌স্	১৫.৭
স্কটল্যাণ্ড	১৭.১
আয়ার্ল্যাণ্ড	১৭.৬
অষ্ট্রেলিয়া	১০.৭
অষ্ট্রিয়া	২০.৫
বেল্‌জিয়ম্	১৪.৮
বুল্‌গেরিয়া	২১.৫
ডেন্‌মার্ক	১২.৮
ফিন্‌ল্যাণ্ড	১৫.৬
ফ্রান্স	১৯.৬
জার্মেন সাম্রাজ্য	১৫.০
হাঙ্গেরী	২৩.৩
ইতালী	১.৭৯
জাপান	১৯.৫
হল্যাণ্ড	১২.৪
নিউজীল্যাণ্ড	৯.১
নরওয়ে	১৩.৩
প্রশিয়া	১৪.৯
রুমেনিয়া	২৩.৮
রুশিয়া	২৮.৯
সার্বিয়া	২১.১
স্পেন	২২.১
সুইডেন	১৪.৬
সুইজার্ল্যাণ্ড	১৩.৩

ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার বেশী হইবার কারণ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, এবং গ্রাম ও নগরগুলিকে, বিশেষতঃ গ্রামগুলিকে, স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল করিবার ও রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টার অভাব। উপরের তালিকায় দেখা যায়, যে-যে দেশে নিরক্ষর লোক খুব বেশী, মৃত্যুর হারও তথায় বেশী।

(২) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অতিরিক্ত মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু ঐ পীড়া ত পৃথিবীর আরো অনেক দেশে ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ভারতের মত বেশী লোক কোথাও মরে নাই। গত বৎসর ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাউস্ অব্ কমন্সে বলেন, যে, ১৯১৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে, ঐ ছয়মাসে ইংলণ্ডও ওয়েল্‌সে ১৩৬০০০ মানুষ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা পড়ে। ইংলণ্ড-ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। ভারতের লোকসংখ্যা সাড়ে একত্রিশ কোটি। ভারতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুর হার ইংলণ্ড-ওয়েল্‌সের সমান হইলে এদেশে ছয়মাসে প্রায় ১২২৪০০০ লোক ঐ রোগে মরিত। দুমাসে উহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪০৮০০০ মরিত। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-কমিশনার সার্জ্জন মেজর নর্ম্যান্ হোয়াইট লিখিয়াছেন, যে, ১৯১৮ সালের এক ঋতুতে, এবং অধিকাংশই দুমাসের মধ্যে ("the vast majority within the space of two months"), ভারতবর্ষের ষাট লক্ষ লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা পড়ে। অর্থাৎ ইংলণ্ড-ওয়েল্‌সের হারে যত লোক মরিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার পনের গুণ মরিয়াছিল! ইহার কারণ আর কিছুই নয়; যাবজ্জীবন অর্দ্ধাশন-অনশন বশতঃ আমাদের দেহের রোগবিষের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইবার ক্ষমতা ইংরেজদের চেয়ে খুব কম। তাহার উপর, চিকিৎসকের অভাব, চিকিৎসার ও চিকিৎসা করাইবার সঙ্গতির অভাব, এবং অজ্ঞতা আছে।

দেশী রাজ্যে অবৈতনিক ও অবশ্যকর্ত্তব্য শিক্ষা।

ভারতের কোন্ কোন্ দেশী রাজ্যে শিক্ষা অবৈতনিক (free) এবং অবশ্যকর্ত্তব্য (compulsory), ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্নের উত্তরে যে তালিকা দেওয়া হয়, তাহা হইতে দেখা যায়, যে, উহা নিম্নলিখিত রাজ্যগুলিতে অবৈতনিক ও অবশ্যকর্ত্তব্য—কোল্হাপুর, বড়োদা, বারোয়ানী (আংশিক অবশ্যকর্ত্তব্য); নিম্নলিখিত রাজ্যগুলিতে অবশ্যকর্ত্তব্য—বোম্বাইয়ে আউন্ধ, গোণ্ডাল (কেবল বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা), লিম্বডী (প্রায় সমুদয় গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা), মোর্ভী, ফল্টন (মিউনিসিপালিটীগুলিতে), ছত্তরপুর (নামে মাত্র, এবং কয়েক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আবদ্ধ), কপুরথালা (শিক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য করিবার প্রণালী নজুর হইয়াছে), মৈসুর; নিম্নলিখিত রাজ্যগুলিতে শিক্ষণ অবৈতনিক—বাজানা, বাঁসদা, বারিয়া (প্রাথমিক ও মধ্য), ভোর (প্রাথমিক), কাম্বে (গ্রাম্য-দ্যালয়ে, বালিকাবিদ্যালয়ে ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ে), ছোট উদয়পুর, চুড়া (প্রাথমিক), দাফ্লাপুর, ধর্মপুর (প্রাথমিক ও মধ্য), ধ্রাঙ্গাধ্রা, ঈদর্, জামখাণ্ডী (প্রাথমিক), জঞ্জিরা (তৃতীয় মান পর্য্যন্ত), জশ্দান্, জাঠ, জওহর, ছোট ও বড় কুরুণ্ডোয়াড্, লথ্তার (প্রাথমিক ও মধ্য), লিম্বডী, মানবদর (প্রাথমিক ও মধ্য), ছোট মীরাজ (৪র্থ মান পর্য্যন্ত প্রাথমিক), মুধোল (প্রাথমিক), মুলী (প্রাথমিক), নবনপর, ফল্টন (প্রাথমিক), রাজকোট (সদর শহর ব্যতীত অন্যসর্ব্বত্র প্রাথমিক), রামদুর্গ (প্রাথমিক), সাচিন, সাবন্তবাড়ী (কেবল একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়; তা ছাড়া অবনত শ্রেণীর বালকবালিকারা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পায়), ওর্থ, টান-লাধ্তার (প্রাথমিক ও মধ্য), ওয়াধোয়ান্, ওয়াঙ্কানের (প্রাথমিক), বঙ্গে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, মধ্যভারতে আলী রাজপুর, নাগোদ, নরসিংগড়, রটলম (প্রাথমিক), মান্দ্রাজে পুডুক্কোট্টাই (রাজধানী ছাড়া সর্ব্বত্র প্রাথমিক), পঞ্জাবে বাহাওলপুর (গ্রাম্য প্রাথমিক পাঠশালায়), কাল্সিয়া, রাজপুতনায় ঝালাওয়ার, করৌলী, শাহপুরা, সিরোহী, যুক্তপ্রদেশে রামপুর, এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর (প্রাথমিক)।

শিক্ষা অবৈতনিক না করিয়া পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে বাধ্য করা উচিত নহে। এই জন্য কোন কোন রাজ্যে, যেমন মৈসুরে, শিক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য অথচ অবৈতনিক নহে, পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। হয়ত ভারতগবর্ণমেণ্টের খবর সকল স্থলে ঠিক্ নয়।

ব্রিটিশভারতের কোন কোন প্রদেশে মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে শিক্ষা অবৈতনিক করিবার আইন হইয়াছে; কিন্তু খরচটা (গবর্ণমেণ্টের কিছু সাহায্য লইয়া) মিউনিসিপালিটীসমূহকেই বহন করিতে হইবে। বাংলাদেশে মিউনিসিপালিটীসমূহে কেবল বালকদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আইন হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন মিউনিসিপালিটী আইন অনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করেন নাই। যদি বঙ্গের কোন মিউনিসিপালিটী চেষ্টা করিয়া থাকেন অথচ আমরা খবর পাই নাই, তাহা সুখের বিষয় মনে করিব।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূত গোণ্ডাল রাজ্যের শিক্ষার ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার জিনিষ। সেখানে পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে বাধ্য, বালকদিগকে নহে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটি কাগজে এরূপ ব্যবস্থার কারণ এই পড়িয়াছি, যে, গোণ্ডালের ঠাকুর সাহেব নামে অভিহিত রাজা মনে করেন, বালিকারা সবাই শিক্ষিত হইলে বালক ও যুবকেরা লজ্জায় পড়িয়া শিক্ষিত হইতে চাহিবে; অতএব তাহাদিগকে বাধ্য করিবার দরকার নাই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নয়।

অর্ণবযান-চালন-বিদ্যালয়।

সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার বিদ্যা শিখাইবার জন্য বাংলাদেশে কোন বিদ্যালয় নাই। বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহা শিখিয়াছেন, এমন বাঙালী বোধ হয় কেহ নাই। এরূপ বিদ্যালয় না থাকাতে এই অতীব প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিখিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। বঙ্গে এরূপ বিদ্যালয়ের কাজ আছে কি না, থাকিলে তথায় কি শিখান হইবে, কত বালক সমুদ্রযাত্রায় রাজী হইতে পারে,

কোন্ কোন্ জাহাজ-কোম্পানী তাহাদিগকে কাজ দিতে ইচ্ছুক, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট গত ৩রা ফেব্রুয়ারী একটি কমীটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমীটির একটিও অধিবেশন হইয়াছে কি না জানি না। এরূপ বিদ্যালয়ের খুব দরকার আছে। যে-সব বালক ও যুবক ইহার ছাত্র হইতে ও সমুদ্রযাত্রা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই কমীটির সভাপতিকে The Port Officer, Calcutta ঠিকানায় চিঠি দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এ বিষয়ে কিছুস্থির হইয়াছে কি না। তাঁহারা কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, প্রভৃতি ইংরেজী দৈনিকেও চিঠি লিখুন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন, যে, অনেকে ইচ্ছুক আছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।

বৈশাখের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, "যদি ক্রমশঃ সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মেথর, ঝাড়ুদার, পিয়াদা, চাপ্‌রাসী, চৌকীদার ও কন্‌ষ্টেবল্‌দের বেতন বাড়ান উচিত ছিল। তাহার পর অল্পবেতনের কেরানী ও শিক্ষকদের। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সিবিল সর্জ্জন প্রভৃতির বেতন অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় খুব বেশী আছে। উহা বাড়ান কোনমতেই উচিত ছিল না। ঐসব কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বেতনে যোগ্য দেশী লোক পাওয়া যায়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মুন্সেফ সবজজ প্রভৃতিরও বেতন যাহা আছে, গরীব দেশের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। * * * আমরা ইহা বলিতেছি না যে আমাদের দেশী সরকারী অধ্যাপক, ডেপুটী, মুন্সেফ এবং সবজজদের কোন অভাব নাই; কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে, যে-দেশের অধিকাংশ লোক জন্ম হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে দেশে ইহারা যে-বেতন পান, তাহাই যথেষ্ট।"

মে মাসের মডার্ন্ রিভিউ কাগজেও এই ধরণের অনেক কথা লিখিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটি চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যাহাদের যাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন, তাহাদের বৃদ্ধি হওয়া খুব আবশ্যক। কিন্তু হাকিম ও প্রফেসর কেন বৃদ্ধি চান, তাহার ভিতরের কারণ লিখিতেছি। (১) সাহেবদের কমিয়া গেলে, দেশীয়দেরও কমিলে কোন অভিযোগ থাকিত না। সাহেবদের বাড়িবে, আমাদের বাড়িবে না? এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবে? (২) সবাই জানি, সাহেব যে কাজ করেন, আমরাও সে কাজ করি। বেতনের গুরুতর ইতর-বিশেষ, মানের লাঘব হেতু, আমরা আমাদের কর্ম্মসামর্থ্য (Efficiency) দেখাইতে পারি না। (৩) যদি বোধ করিতে পারিতাম, দেশটা আমাদের, টাকা বাঁচিলে আমাদেরই থাকিবে, আমাদেরই কাজে আসিবে, তাহা হইলে স্বদেশপ্রেম জাগিতে পারিত, এবং বেতন না বাড়াইয়া কমাইয়া দিলেও কেহ কিছু বলিত না। কিন্তু যদি এমন জ্ঞান হয়, দেশের টাকা বটে কিন্তু ভূতে খাইতেছে, তখন [ঐ] টাকার প্রতি আমার মায়া হইতে পারে না। দশভূতে খাইতেছে, আমি কি দোষ করিলাম? যত Department আছে, সব মনে করে লুঠিয়া লইতে পারিলে হয়। এই কারণে খরচা বাড়িয়া চলিয়াছে। সে টাকার খরচ-কর্ত্তা আমি নই, আমার জ্ঞাতিবন্ধু কেহ নয়; খরচের কর্ত্তা এমন লোক যাহাকে আমার-দেশ-অভিজ্ঞ বলিতে পারি না। এমন কি যাহার নিঃস্বার্থতায় বিশ্বাস করিতে পারি না, তখন খরচ কমাইবার ইচ্ছা হইবে কেন? (৪) এতদিন এমন বেতন দিয়াছে, যে বেতনে একটা বাঁধাবাঁধি জীবন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এখন এই মহার্ঘ্যের দিনে সে জীবন হঠাৎ পরিবর্ত্তন করা সাধ্য নয়। অবশ্য দেশের অগণ্য লোকেরও বহু কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কষ্ট দূর করিতে কেহ নিষেধ করে না। তা ছাড়া আমাদের বেতনের টাকা পাইতেছে কে? মোটর-গাড়ী কিনিলে টাকাটা বিদেশে চলিয়া যাইত। কয় জন বড় চাকুরিয়ার মোটর আছে? এ দিকে ডাক্তার উকীল ব্যবসায়ী লোকে দেশের টাকার প্রতি কি কষ্টের প্রতি তাকাইতেছে কি? কেবল চাকরের স্বদেশপ্রেম আশা করিতে পারা যায় না। * * * আমার মনে হয়, [বিশ্রামবৃত্তিভোগীরাই (pensioners)] লুঠ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এত টাকা বেতন পাইবে, তাহার অর্দ্ধেক বৃত্তি পাইবে, এই নিয়মে চাকরী। যাঁহারা চাকরীতে আছেন, তাঁহাদের বেতন বাড়িল, কিন্তু যাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহাদের বৃত্তি কমিয়া গেল! ইহা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না।"

লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা এবং তৎকর্ত্তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিয়াছেন। তাহা অন্যায় হয় নাই। এই অবস্থা ও ব্যবস্থা যদি চরম, চূড়ান্ত ও স্থায়ী হইত, কোন সুপরিবর্ত্তনের আশা না থাকিত, তাহা হইলে আমরাও কিছু

বলিতাম না। বাস্তবিক, এখন সকল বিষয়ে দেশের কর্তৃত্ব যাহাদের, তাঁহাতে দেশীয় কর্ম্মচারীদের বেতন না বাড়াইয়া কিম্বা কমাইয়া যদি কিছু টাকা বাঁচে, তাহা হইলে তাহা খরচ করিবার এরূপ ব্যবস্থা হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজের লাভই বেশী।

আমরা কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া অনেক কথা লিখিয়া থাকি; এক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছি। দেশটা আমাদের, দেশের টাকাটাও আমাদের; উহা এখন বেহাত হইয়া গিয়া থাকিলেও উহাতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দেশটা ও দেশের টাকাটা আমাদের অধিকারে আসিলেও যে, আমরা, শিক্ষিত লোকেরা, মাহিনা আদি নানা বাবতে উহার অনেক অংশ ভাগ করিয়া লইব না, দেশের "সাধারণ" লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মান আবশ্যক, এবং আগে হইতেই তাহার কিছু নমুনা কার্য্যতঃ দেখান দরকার। তাহা না হইলে দেশে স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সকলের সমবেত চেষ্টা হইবে না, ব্যাপক হইবে না, আন্তরিক হইবে না, প্রবল হইবে না। কেবল "চাকরদিগকে" স্বদেশপ্রেমিক হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি না; সকলেরই স্বদেশপ্রেমিক হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যবসায়ী, উকীল, ও ডাক্তারেরা ত ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত দেশের রাজস্ব হইতে পারিশ্রমিক পান না, সুতরাং তাঁহাদের পাওনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার জো নাই। মোটর-গাড়ী প্রভৃতি ক্রয়ের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু সকল দেশেই কৃতী ব্যবসায়ী, কৃতী আইনজীবী ও কৃতী ডাক্তারেরা চাকুরিয়াদের চেয়ে বেশী রোজগার করে এবং খরচও বেশী করে।

ইহা সত্য যে আমরা বহু বৎসর হইতে যে ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত, হঠাৎ তাহা বদলান কঠিন। কিন্তু যেরূপ বেতন বাড়িতেছে, তাহাতেও হাকিম ও অধ্যাপকরা আগেকার মত সঞ্চয় করিয়া আগেকার মত সচ্ছলভাবে থাকিতে পারিবেন না। কিছু হাত খাট করিতেই হইবে—যেমন দরিদ্রতর লোকদিগকে করিতে হইতেছে। যাহা বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে, তাহা না হয় স্বেচ্ছায় আরও একটু অধিক মাত্রায় করা যাক্, এবং সকলে মিলিয়া স্বরাজ, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব, বা স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা যাক্।

আমরা আগে আগে জাপানের রাজকর্ম্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। তাহা একবৎসরের পুরাতন বার্ষিক পুস্তক দেখিয়া। সম্প্রতি জাপান সম্বন্ধে ১৯১৯-২০ সালের বহি প্রকাশিত ও হস্তগত হইয়াছে। জাপানের রাজকর্ম্মচারীরা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শিন্-নিন্, চোকু-নিন্, সো-নিন্, ও হান্-নিন্। জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি হেতু, গত ১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে, জাপানে কোন কোন শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীদের পাওনা বাড়িয়াছে। তাহাদের বেতন না বাড়াইয়া কিছু কিছু ভাতা দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা শিন্-নিন্ অর্থাৎ মন্ত্রী শ্রেণীর কর্ম্মচারী, তাঁহাদের প্রাপ্য বাড়ান হয় নাই। ইহাঁদের সর্ব্বোচ্চ বেতন, অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর বেতন, বার্ষিক ১৮৭৫০ টাকা, মাসিক ১৫৬২৷৷০, সর্ব্বনিম্ন বেতন বার্ষিক ৭৫০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬২৫ টাকা। জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা ধনী দেশ এবং তথায় জীবনধারণের ব্যয় এদেশ অপেক্ষা অধিক। এরূপ দেশের গবর্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে যে-সব কর্ম্মচারী নূনকল্পে মাসিক ৬২৫ টাকা বেতন পান, তাঁহাদের প্রাপ্য বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ হান্-নিন্ শ্রেণীর কর্ম্মচারী, এবং তাহার উপরের সো-নিন্ শ্রেণীর যে সব কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক আড়াইশত টাকার অধিক নয়, তাহাদিগকে শতকরা ৫০ টাকা ভাতা দেওয়া হইয়াছে। সো-নিন্ শ্রেণীর উচ্চতর বিভাগের এবং চোকু-নিন্ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে বেতনের অল্পতা অনুসারে শতকরা ৪৫, ৪০, ও ৩৫ টাকা ভাতা দেওয়া হইয়াছে। জাপানের ব্যবস্থাটি ন্যায়-সঙ্গত ও স্বাভাবিক; যাহারা সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী তাহাদের প্রাপ্য বাড়ে নাই, যাহারা দরিদ্রতম কর্ম্মচারী তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারে ভাতা দেওয়া হইয়াছে, যাহারা মাঝামাঝি রকম বেতন পায় তাহাদের বেতন যাহার যত কম সে তত বেশী হারে ভাতা পাইয়াছে। ভারতের কর্ত্তাদের ব্যবস্থা ঠিক্ উল্টা। সকলের চেয়ে বেশী বেতন সিবিলিয়ানরা ও অন্যান্য ইম্পীরিয়্যাল বিভাগের লোকেরা পায়; সেইজন্য তাহাদের বেতন আগেই বাড়িয়াছে। তাহার পর দেশী হাকিম প্রভৃতিদের সম্বন্ধে বিবেচনা ক্রমে ক্রমে

হইতেছে; কেরানী, পিয়াদা প্রভৃতিদের ভাবনা পরে ভাবা যাইতে পারে।

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজম্।

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজম্ মহাশয়ের মৃত্যুতে জগতের ও ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি হইল। তিনি জগতের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞদের মধ্যে একজন ছিলেন। ভারতীয়-দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিলাতের রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো অর্থাৎ সদস্য হইয়াছিলেন। ইহা অতি উচ্চ সম্মান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর হইয়াছিল। যাঁহার প্রতিভায় মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, এত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু গভীর পরিতাপের বিষয়। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে (গণিতেও) ফেল হইয়া মাদ্রাজ বন্দর আফিসে ২০।৩০ টাকার কেরানীগিরি করিতেছিলেন। এমন সময়ে কোন কোন সদাশয় ইংরেজের চোখে তাঁহার গণিতের খাতাকয়েকটি পড়ায় তাঁহারা উহা কেম্ব্রিজের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক হার্ডির গোচর করেন। তখন তাঁহার প্রতিভা জানা পড়ে, ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া কেম্ব্রিজে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় ট্রিনিটী কলেজের ফেলো হন, এবং রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পালি ও সংস্কৃতে পণ্ডিত, অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন এবং অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংস্কৃত পালি ও প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের ক্ষতি হইল।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা।

গতমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "দেশী ও বিদেশী" প্রবন্ধে রবিবর্ম্মার গঙ্গাবতরণ ছবির এবং ধুরন্ধরের শকুন্তলা-বিদায়ের কিছু দোষের উল্লেখ আছে। গঙ্গাবতরণ ছবিটি আমরাও ভাল মনে করি না। কিন্তু স্পর্দ্ধা ও শক্তির ব্যঞ্জনার জন্য পা ফাঁক করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়ান, কেবল ইংরেজদের ভঙ্গী নয়; এদেশেও এ ভঙ্গী দৃষ্ট হয়। গঙ্গাবতরণ-কালে শিবের মনে যে শুধু "প্রতীক্ষার ভাব" নয়, স্পর্দ্ধাও ছিল, তাহা মূল রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩৪ সর্গের বর্ণনায় বুঝা যায়; যথা—জাহ্নবী "পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এইরূপ গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে বুঝিয়া, ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাজূট মধ্যে তিরোহিত করিলেন।" শকুন্তলা-বিদায়ের ছবিতে কণ্বমুনির যেরূপ পরিচ্ছদ আঁকা আছে আমরা সেইরূপ পরিচ্ছদ-পরিহিত অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি; উহা পাদ্রিদের নিকট হইতে ধারকরা নয়। "দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ" করার রীতি এবং ভঙ্গীও দেশী, বিলাত হইতে ধারকরা নহে।

দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন, "অবনীন্দ্র-বাবুর স্কুলের কোনো কোনো চিত্রকর বোসে বোসে তুলি ঘোষে ঘোষে ছবি নকল করছেন।" অবশ্য, অবনীন্দ্র-বাবুর কোন শিষ্যই বাঙ্গালী-জীবনের কিছু আঁকেন নাই, দীনেশ-বাবু এ কথা বলেন নাই। কিন্তু পরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে পাঠকদের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। এই জন্য, স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার, নন্দলাল বাবুর "পৌষ পার্ব্বণ," "বাউল," "ষষ্ঠী পূজা," গগন-বাবুর "পুরীর মন্দির দ্বারে প্রতীক্ষা," "বর্ষায়," "শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ," "শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব," সুরেন্দ্রনাথ করের "হাতে খড়ি," "পথের সাথী," "বহিন্," শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর "গুণ-টানা," মুকুলচন্দ্র দের "গ্রহণে স্নান," সারদাচরণ উকীলের "শেষ খেয়া," প্রভৃতি বিস্তর ছবি বাঙ্গালী জীবনের ছবি। তাড়াতাড়ি যে-কটা মনে পড়িল, লিখিলাম। পূর্ণ তালিকা দেওয়া কঠিন, সে চেষ্টা করিলাম না। এই তালিকা হইতেই দীনেশ-বাবুর স্মরণ হইবে, যে, গগন-বাবু "আমাদের জীবনে" "ভাল কিছু"ও দেখিয়াছেন এবং আঁকিয়াছেন। দীনেশ-বাবু যে "যশোদা"র উল্লেখ করিয়াছেন, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি তাঁহার ছবিও আঁকিয়াছেন।

য়ুরোপীয় নারী।

য়ুরোপীয় নারীরা সুন্দরী গুণশীলা গায়িকা বা নৃত্যকুশলা হইলে সমাজ তাঁহাদের সেইসকল গুণ উপভোগ করিতে চায়, দীনেশ-বাবু তাহা বলিয়াছেন এবং তাহার কুফলেরও

আভাস দিয়াছেন। এ বিষয়ে আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়। য়ুরোপীয় সমাজে নারীর সম্মানিত স্থান ও গৌরবান্বিত সৎকার্য্যের বর্ণনা করা তাঁহার প্রবন্ধে বোধ হয় অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া তিনি সে বিষয়ে বলেন নাই। কিন্তু অনেক সময় লেখকের অনভিপ্রেত হইলেও আংশিক সমাজচিত্রে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। এইজন্য আমরা ইহা বলা দরকার মনে করি, যে, পাশ্চাত্য সমাজে বহু বহু নারী কেবল নিজ পরিবারে মা নহেন, সমাজেও মায়ের কার্য্য করিয়া দীনদুঃখী শিশুর, প্রতারিতা নারীর, গৃহহীন চিররুগ্ন নরনারীর হিত করেন, দেশ হইতে পানদোষ বিদূরিত করিবার চেষ্টা করেন, সামাজিক পাপের মূলে সংগ্রাম করেন। বঙ্গে গৃহে ও গৃহের বাহিরে এইরূপ ব্যাপক মাতৃত্বের যে সুযোগ নাই, তাহা আমাদের দোষে। এই দোষ সত্ত্বেও স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া ও স্বর্গীয়া নির্ম্মলা দাস মহাশয়ার চরিত্রে এই মাতৃভাব বিকশিত হইয়াছিল।

বঙ্গের দেশী মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত কাহারা ?

নূতন ভারতশাসন আইন অনুসারে বঙ্গের দেশী মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত তিন জন বাঙালীর নাম প্রবাসীর পাঠকেরা ২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলে, যে তিনটি নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঠক করিবেন, তাহা যথাক্রমে আষাঢ়ের প্রবাসীতে ছাপিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতম প্রতিনিধি।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি কে, প্রবাসীর পাঠকেরা ২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিয়া পাঠাইলে, যে নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঠক করিবেন, আষাঢ়ের প্রবাসীতে তাহা ছাপিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের উপর ভারতগবর্ণমেণ্ট এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্ট অনুসারে কাজ করিতে হইলে এককালীন সাড়ে তেষট্টি লক্ষ এবং বার্ষিক ৬৫,১৬,২০০ টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে কোথাও লেখা নাই, যে, এই টাকাটি গবর্ণমেণ্ট দিবেন কি না, কিম্বা কে দিবে, অথবা নূতন ট্যাক্স দ্বারা উহা তুলিতে হইলে ঐ ট্যাক্স কি পরিমাণে কাহাদের উপর ধার্য্য হইবে। অথচ বর্ত্তমান অধিকাংশ বেসরকারী কলেজ, যাহাতে অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষা পায়, ঐ মন্তব্য অনুসারে, উঠিয়া যাইবে, বুঝা যাইতেছে কারণ, কমিশনের রিপোর্টে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কলেজগুলিকে উন্নতি করিয়া পুনর্গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীকৃত হইবার জন্য সাহায্য, সুযোগ, ও সময় দিবার যে সুপারিস আছে, ভারতগবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে রাজী নহেন বুঝা যাইতেছে; ভারতগবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা সেগুলি শীঘ্র উঠিয়া যাক্। তাহাতে যে-সব ছেলে পড়ে, তাহারা কোথায় যাইবে, তাহাদিগকে কি গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক অপরাধের ওজুহাতে অন্তরায়িত করিতে চান? তাহার জন্যও ত কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ ও খোরপোষ বাবদে বহুৎ টাকা চাই। গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যটির সংক্ষিপ্ত সার যেন এই, যে "কমিশনের প্রস্তাবিত উন্নতির জন্য টাকা আমরা দিব না কে দিবে জানি না, কেহই নাই বা দিল? উন্নতি নাই বা হইল? কিন্তু বেসরকারী সস্তা কলেজগুলি উঠিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক।" বঙ্গের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ কমিশনের রিপোর্ট ও তদুপরি গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য সম্বন্ধে প্রায় কিছুই ভাবিতেছেন না, করিতেছেন না, বলিলেও চলে। অথচ ঐ মন্তব্য-অনুযায়ী আইনের খসড়া শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ও তাহা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আইনে পরিণত হইবে। তখন ধনী লোক ছাড়া অন্য সকলকে হায় হায় করিতে হইবে।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্মান তাঁহার বহু পূর্ব্বেই পাওয়া উচিত ছিল। কেন পান নাই, তাহার কারণের একটু নমুনা ডাক্তার ওয়ালারের অদম্য ইংসুট্য স্বভাবের জন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার ওয়ালার কেন বসু মহাশয়ের শত্রু তাহা আমরা জানি। হয়ত পরে তাহা প্রকাশ পাইবে। যখন, অনেক বিবেচনার পর, রয়্যাল সোসাইটীর কমীটি তাঁহার নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া স্থির

করিয়াছেন, তখনও ডাক্তার ওয়ালারের বাধা দিবার প্রবৃত্তি ও আশা ছিল।

অনেকে মনে করে, আচার্য্য বসু যেন একটা কোন তত্ত্বের আভাস পাইবামাত্রই তাহা প্রকাশ করিয়া বসেন; সুতরাং হঠাৎ তাঁহার ভুল বাহির হইয়া যাইতে পারে। এইসব লোকের জানা উচিত, তিনি বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হওয়ার বহু বৎসর পরে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রয়্যাল সোসাইটীও তাঁহার বা অন্য কাহারও কোন আবিষ্ক্রিয়া বা উদ্ভাবিত যন্ত্রের বৃত্তান্ত পাইবামাত্র ছাপেন না; তাঁহারা এদেশের সম্পাদকদের মত বুভুক্ষিত নহেন। অনেক বুঝিয়া-সুঝিয়া পরখ করিয়া তবে তাঁহারা ছাপেন।

কোন মানুষই ভ্রমাতীত নহেন। আচার্য্য বসুরও সব মত চিরকাল অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত না হইতেও পারে। তাহাতে তাঁহার কার্য্যের গৌরব ও যশের হানি হইবে না। কিন্তু সত্য নির্দ্ধারণার্থ বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ প্রকাশ এক প্রকার, যেমন টাইম্‌স্ কাগজে অধ্যাপক বেলিস্ করিয়াছিলেন, আর, হিংসুটে লোকের সন্দেহ প্রকাশ অন্য প্রকারের, যেমন ঐ কাগজেই ডাঃ ওয়ালারের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল।

পুস্তক-পরিচয়

মোগল বিদুষী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মোস্‌লেম প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা। ১১৭+৩ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা।

বইখানির ছাপা ও বাঁধা অতি সুন্দর। বিশেষতঃ মলাটের কাপড়ের গভীর নীলকৃষ্ণ রঙ্গে চক্ষুর তৃপ্তি হয়। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই জলন্ত লাল বা হলদে রঙ্গ অথবা "ছাতার কাপড়ে" বাঁধান বইগুলির যুগ হইতে অনেক দূরে আসা গিয়াছে।

এই পুস্তিকায় বিষয় আকবরের খুড়ী গুল্‌বদন এবং আওরংজীবের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেবউন্নিসার জীবনী। এই দুই মহিলা সম্বন্ধে যত-কিছু তথ্য ইংরেজী বা ফার্সী ইতিহাসে আছে তাহার সমস্তই এখানে সমাবেশ করা হইয়াছে; কিছু বাদ দেওয়া হয় নাই, কল্পনার সাহায্যে বা অলঙ্কারের ছটা দিবার জন্য কিছুই যোগ দেওয়া হয় নাই। শুধু সমসাময়িক কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিয়া কাহিনীকে সম্পূর্ণ ও মনোরম করা হইয়াছে। ফলতঃ এই দুই "বিদুষী" সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহা এবং পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া ইংরেজীতে যে-সব নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার সারাংশ এই বাঙ্গালা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে; এই বিষয়ে বঙ্গ পাঠককে ইংরেজী কোন পুস্তকের অপেক্ষা রাখিতে হইবে না, ইহা এই গ্রন্থের গৌরব।

গুল্‌বদন ফার্সীতে আত্মজীবনী রচনা করেন এবং সৌখীন পদ্য লেখেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে ঠিক বিদুষী বলা যায় না। সে উপাধি জেবউন্নিসার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু গুল্‌বদনের সরল জীবনে যে করুণ গার্হস্থ্য-স্নেহ, ধর্ম্মভক্তি, ও স্নিগ্ধ শান্ত নারীহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া মহিষীর দীপ্ত ভাব-বিচলিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেবের দীপ্তজীবনে দেখা যায় না। মার্কিন-লেখক হোম্‌স্ এর কথায় প্রথম জনকে হৃদয়বতী রমণী (heart-woman) ও দ্বিতীয় জনকে মস্তিষ্কশালিনী নারী (brain-woman) বলিলে ঠিক হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে জেবের প্রাণের সকল মায়া-মমতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা হতভাগা আকবরের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, এবং এইজন্য সম্রাটের ভিন্ন দুহিতাকে শেষ জীবন সুদীর্ঘ কারাবাসে কাটাইতে হয়। তাই তাঁহার জীবনকাহিনী অশ্রুমধুর রসে সিঞ্চিত।

কবি বলিয়া জেবউন্নিসার খ্যাতি ছিল। কিন্তু প্রচলিত "মখ্‌ফী পদ্যমালা" তাঁহার রচনা নহে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমান পণ্ডিত আবদুল মুক্তাদির মহাশয়ের গবেষণার ফল ব্রজেন্দ্রবাবু অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকেরা বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র "রাজসিংহে" জেবের কুৎসা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমি মডার্ণ রিভিউ পত্রে ফার্সীগ্রন্থের সাহায্যে নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়াছি যে, অপবাদ পঞ্জাবী কোন কোন মুসলমান লেখকের সৃষ্টি এবং আগাগোড়া মিথ্যা ও ইতিহাসবিরুদ্ধ। এই চূড়ান্ত মীমাংসা ব্রজেনবাবু (২৪-৩৭ পৃষ্ঠা) বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া মুসলমান সমাজ কের্ন, সমস্ত সত্যসন্ধ সুধীবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এরূপ বিশুদ্ধ ইতিহাসের যতই প্রচার হয় ততই আমাদের ভাষা ও দেশের মঙ্গল।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

চিত্র-পরিচয়

প্রজাপতি-দূত।

বিবাহের দেবতা প্রজাপতি। চিত্রপতঙ্গ বাংলা দেশে প্রজাপতি নামে পরিচিত। এই নামসাম্যে লোকে চিত্রপতঙ্গকেই বিবাহের দেবতা বলিয়া ভুল করে। লোকের বিশ্বাস আইবুড়ো ছেলেমেয়ের গায়ে চিত্রপতঙ্গ প্রজাপতি বসিলে তার বিবাহ আসন্ন হয়। চিত্রিতা কিশোরীর হাতে চিত্রপতঙ্গ আসিয়া বসিয়াছে।—প্রজাপতি বিবাহের অগ্রদূত, এই বিশ্বাসে তরুণীর অন্তর আশায় আকাঙ্ক্ষায় উৎসুক ও দৃষ্টি আনন্দ-মাধুর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

চারু।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

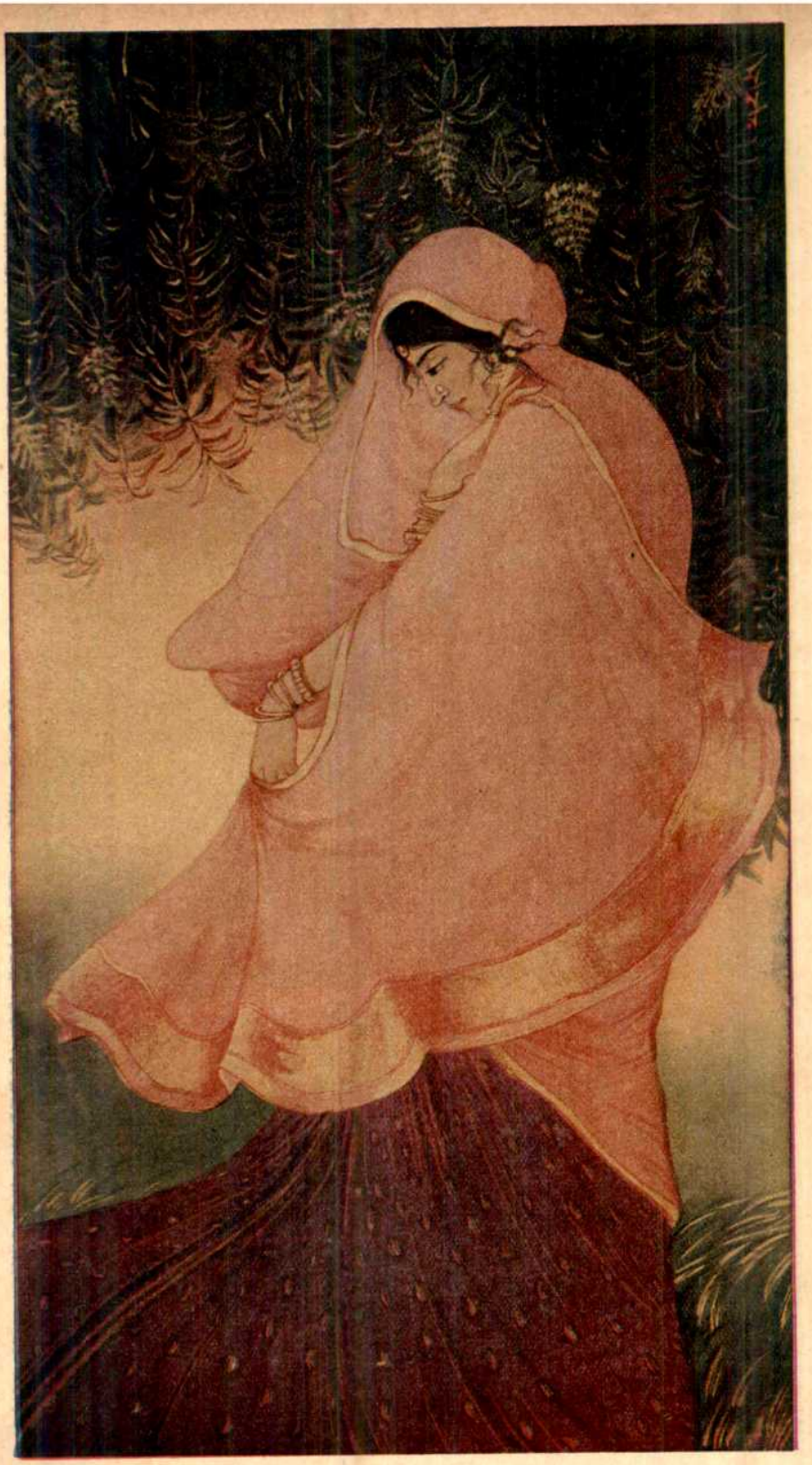

কুহু।

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সৌজন্যে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২৭

৩য় সংখ্যা

কোন্ পথে ?

এই দুর্দিনে, যখন 'হা টাকা' 'হা টাকা' রব উঠিয়াছে, অন্ন-রোগের যাতনায় দেশের নাড়ী ছাড়িতে বসিয়াছে, যখন ভাতকাপড় জোটাইতে লোকে অন্ধকার দেখিতেছে, তখন জীবনোপায়ে সত্যাসত্য বিচার প্রীতিকর হইবে না। যাহাঁরা মানের আশায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, ছুটাছুটি করিতেছেন, তাহাঁদেরও হইবে না। কারণ যাচ্ঞা দ্বারা যে মান অর্জ্জিত, তাহা অপমানের ন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিতে থাকে।

তবে কাহাদের তরে স্বদেশপ্রানির কীর্তনে বসিতেছি ?

যাহাঁরা বর্ত্তমানকে সোপান করিয়া ভবিষ্যতের মহোজ্জ্বল কীর্ত্তিমন্দিরে উঠিবার কল্পনা করেন, যাহাঁরা দেশের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ মিলাইয়া 'স্বদেশী' আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাঁরা অতিগামী ও অনতিগামী নামে বিভক্ত হইয়াও দেশের হিত কামনা করেন, তাহাঁদিগকে স্বশাসন ও স্বয়ং-শাসনের ঐক্য বিবেচনা করিতে বলিতেছি। আর যে-সকল যুবার মুখপানে তাকাইয়া মাতৃভূমি ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া দিন গণিতেছেন, তাহাঁদিগকেও চিন্তা করিতে ডাকিতেছি।

ভালমন্দ, সম্পদ-বিপদ, সকল দেশেই, বোধ হয় সকল সময়েই, লাগিয়া আছে। মানুষের জীবনে এই, জাতির জীবনেও এই। একথাও ঠিক, আমরা উপস্থিত কষ্টকে বড় করিয়া দেখি, সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। আমাদের মন এক সময়ে দশদিকে ধাবিত হইতে পারে না; যে সময়ে যে দিকে হউক সে দিকেরই ভালমন্দ গণিতে বসে।

সম্প্রতি আমাদের দেশের মুখ্যগণ, দেশ-শাসনে কর্তৃত্বলাভের বাঞ্ছায়, রাজপুরুষগণের নিকট স্ব স্ব যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। পরকে নিজের আজ্ঞাধীন করা, তাহার ব্যবহার নিজের ঈপ্সিত মার্গে চালিত করার অর্থ দেশশাসন। কিন্তু স্ব-কে শাসন না করিলে পর-কে শাসন করিতে পারা যায় কি ?

বহুকালের রোগ-ভোগে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। বলাধান হইতে সময় লাগিবে। এ সময় ধৈর্য ও সংযমের কিঞ্চিৎ হানি সহিবে না। বলবান ক্ষণিক অসংযমের দোষ কাটাইয়া উঠিতে পারে, বলহীন তাহাতে রোগ দুঃসাধ্য করিয়া তোলে। আচারে ব্যবহারে সংযম, কাজে কথায় সংযম, ধন-মানের লোভে সংযম,—ইহা সনাতন ধর্ম, এবং দুর্বলের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। জাপান মরিয়াছিল, বাঁচিয়াছে। কি ঔষধে, কি পথ্যে বাঁচিয়াছে ? সে ঔষধে, সে পথ্যে নিশ্চয়ই ধর্ম ছিল

মানুষ যে অনুকরণদক্ষ বানর, জাপান সে সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। জাপানী জাপানীই আছে,

দেশ-ভক্তির কষ্টিপাথরে কষিয়া দেশী সোনার সহিত মিলাইয়া বিলাতী সভ্যতা কোথাও গ্রহণ, কোথাও বর্জন করিয়াছে। লোকে বলে, সে ঔষধ, সে পথ্য, দেশ-প্রেম।

দেশ-প্রেম, দেশ-ভক্তি প্রভৃতি শব্দ শুনিতে মন্দ নয়। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি? ইহা কি মানব-মাত্রের ভ্রাতৃ-প্রেম? এক সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া সকলের ভ্রাতৃসম্বন্ধ? কিন্তু সে ভ্রাতৃপ্রেম উচ্চ হইলেও দেশপ্রেম নহে। দেশ-প্রেম অনুদার; যাহাকে বান্ধব মনে করে, কেবল তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। যিনি উৎসবে ও ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে, সঙ্গ ছাড়েন না, তিনি বান্ধব। যিনি যত স্থানে সঙ্গী থাকেন, তিনি তত বান্ধব।

লোকে বলে, কতগুলি লোকের সমূহ, রাম-শ্যাম যদু-হরি প্রভৃতি লইয়া একটা সমাজ। এটা কাজের কথা নহে। কারণ রামশ্যামাদি ব্যক্তি অমর নহে; তাহারা আজ আছে, কাল নাই। এমন ক্ষণবিধ্বংসী দেহ ধরিয়া সমাজ হইতে পারে না। এই-সকল দেহে যে পুরাণ-পুরুষ, যে দেহী বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মিলনে সমাজ। এখন যে ব্যক্তিসমূহ দেখিতেছি, পূর্ব্বকালে ইহারা অন্য ছিল। ইহাদের আদি এক, ইহাদের জীবনযাত্রা এক ছিল। ইহাদের ভয় ও ভাবনা, সুখ ও দুঃখ, কীর্ত্তি ও অবদান, এক ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতিতে, পুরাণ ও ইতিহাসে ইহাদের পুরাণপুরুষের একত্ব ব্যক্ত করিতেছে। কাজেই ইহাদের মার্গ এক, গন্তব্য এক হইয়া রহিয়াছে।

কালান্তরে, বাহ্য নূতনের সমাগমে মার্গ বিচলিত হয়, আভ্যন্তর পুরাতনের প্রবাহে বাধা উপস্থিত হয়। তখন পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব ঘটে। তখন কেহ পুরাতনের জ্ঞাতপথে, সংস্কার ও অভ্যাসবশে, চলিতে থাকে; পুরাতনের দেহে নূতনকে অল্পে অল্পে মিশাইয়া লইয়া পুরাতন রক্ষা করে। কেহ বা মিলনে না গিয়া নূতনের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, এবং নূতনই শ্রেয়ঃ কল্পনা করিয়া জীবনযাত্রা সুগম করিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে, অনতিগামী ও অতিগামী দলের সৃষ্টি হয়। সকলেরই জন্ম-কোষ্ঠীতে গমন লিখিত আছে; কাহারও মৃদু, কাহারও বা শীঘ্র।

কিন্তু যে বন্ধন একটা বিপুল সমাজকে বাঁধিয়া রাখে, সে বন্ধন অতিগামীর প্রবল অপকর্ষণে শিথিল হইলেও সহসা ছিন্ন হয় না। কারণ, ছিন্ন হইলে সে সমাজ নূতন সমাজে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার মার্গ ও গন্তব্য আর পুরাতন থাকে না। তখন দেশ-প্রেম অবলম্বন-হীন হইয়া উদাস-প্রেমে পরিণত হয়; আকুল হৃদয় কৃত্রিম আশ্রয় সৃষ্টি করিয়া আত্মতুষ্টিসাধন চায়। নূতন গন্তব্য একদিনে স্থির হয় না, নূতন মার্গ একদিনে রচিত হয় না।

সমাজের প্রাচীনের প্রতি ভক্তি ব্যতীত দেশ-ভক্তি জন্মিতে পারে না। এই ভক্তির গুণে জন্ম-ভূমি জননীর তুল্য গরীয়সী। যে নদী-মাঠ-বন, যে ধূলা-মাটি-কাদা, আ-মা-র পিতৃপিতামহগণের চরণ-চার হইয়াছিল, তাহা আমার পূজ্য, কারণ তাহা আমার স্থিতির সাক্ষী। এই হেতু দ্বিজেন্দ্রলাল আমার দেশকে সকল দেশের সেরা বলিয়াছেন। লোকে স্বভাবতঃ রক্ষাশীল। যাহা আছে, তাহা ভাল; যাহা ছিল, তাহাও ভাল ছিল। দেশ-ভক্ত রক্ষাশীল না হইয়া যায় না। তিনি বিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করেন, বিপ্লব পরিহার করেন। কারণ, বিপ্লবে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত হইতে পারে। ইদানী হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি হিন্দুর যে বিচারহীন অনুরাগ প্রবল হইয়াছে, তাহা অতিগামীর অপকর্ষণের প্রতিক্রিয়া, তাহা দেশভক্তির একটা বাহ্য বিকাশ। কারণ, স্বদেশের সত্য প্রাচীনকে বর্জন করিয়া অন্যদেশের ছায়াকে ধরিয়া লোকে দাঁড়াইতে পারে না।

ইদানীর হিন্দু প্রায়ই ভ্রষ্টাচার। তাহার আচারে ও ব্যবহারে শত-শত অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। তথাপি সে মনে করে, সে প্রাচীনের বংশধর। এইখানেই ঐক্য। যদি এ দেশে জন-ক্রতু (democracy) প্রবল হয়, তাহা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। ইংরেজ জাতির তুল্য রক্ষাশীল জাতি আর কই?

আমাদের সমাজ, বিবর্তনের পথ ধরিতে পারিতেছে না, বিপ্লবের আবর্তে ঘুরিতেছে। পশ্চিমের প্রবল প্রবাহে, পূর্ব ও পশ্চিমের বিমুখী স্রোতে, আবর্ত জন্মিয়াছে। এখন ধৈর্যের সময়, সংযমের সময়। আমাদের শক্তি অল্প; প্রমাদে ও কৃত্রিম উত্তেজনায় সে শক্তিটুকু ব্যয় করিলে বাঁচিতে পারিব না। দৈবের বিপরীত অনু-

রাগ নহে, অসূয়ার বিপরীত ক্ষমা নহে, দলাদলির বিপরীত প্রণয় নহে।

আশ্চর্য এই, বিজ্ঞজনেও সংযমের শক্তি ভুলিয়া যাইতেছেন, প্রেমের বিনিময়ে বিদ্বেষের বাণিজ্য করিতেছেন। ইহাতে কাম্য যে কতদূরে গিয়া পড়িতেছে, তাহা ভাবনার মধ্যে আসিতেছে না। যাবতীয় দেহীর ন্যায় সমাজেরও মূলমন্ত্র ঐক্য, অনৈক্য মধ্যেও ঐক্য—ইহা তাঁহারা উত্তমরূপে না জানেন, এমন নহে।

আমরা যে নির্জীব, তাহার নানা লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ, স্ব-প্রত্যয়-লোপ। কাজটা ভাল করিতেছি, কি মন্দ করিতেছি, তাহা অন্যের প্রত্যয়ে বুঝিতে হইলে জীবনকে ধিক্। কিন্তু সেই দশা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। দুঃখের সময়, বিপদের সময়, পাড়াপড়শীকে ডাকা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু পাড়ার বাহিরে গিয়া গ্রামান্তরের দয়ালুর অন্বেষণ একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? যদি কেহ 'আহা' বলে, অমনই মরমে গলিয়া যাই, চোখ দিয়া জল পড়ে, প্রশান্ত বোধ করি। লোকে 'বেশ' 'বেশ' বলিল, যে-সে নয় বিদেশী বলিল, ইংরেজ বলিল 'বেশ' 'বেশ', অমনই মানবের অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল,—ইহাতে বুঝি আমরা বাস্তবিক নির্জীব, জীবের ভান করিয়া সংসারচক্রে পুত্তলিকার ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছি। আমাদের নিজের প্রত্যয় নাই; বাঁচিয়া আছি, কি মরিয়াছি, তাহার বোধ হারাইয়াছি। বড় বড় লোক, দেশে যাঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে, দেখি তাঁহারাও আত্ম-প্রত্যয় হারাইয়াছেন। কে কোথায় জীবিত বলিল, অমনই তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে। যে জাতি পর-প্রত্যয়ে চলে, উঠে ও বসে, সে যে সব হারাইয়াছে। সে জাতির মধ্যে যে দুন্দুভি-ধ্বনি করিবার লোক পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি। সংসারী মানব ধন ও মান চায়; ইহা মানুষ-রূপ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। তথাপি বুঝি, অতিলোভ প্রাকৃত জনের ধর্ম, শিক্ষাবিহীন লোকের ধর্ম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, গ্রামের বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহের বাজনা বাজিলে, গ্রাম-সুদ্ধ লোক উৎসবের আশায় উৎফুল্ল হয়; কারণ তেমন বাজনা প্রত্যহ বাজে না, সকলের বাড়ীতেও বাজে না।

যাহাদের নিজের প্রত্যয় নাই, তাহারা পরই স্তব-স্তুতি ভালবাসে, মিথ্যা প্রশংসা ও চাটুবাদ লইয়া জীবন পুষ্ট বোধ করে। চাটুকার আশ্রিত হইয়া পরে আশ্রয় হইয়া পড়ে; তখন মিথ্যা কৃতিত্বের লোভে আশ্রয়ও নানা ছল করিতে থাকে। কেহ বিবাহে ছেলে বিক্রি করে নাই; সংবাদপত্রে এই অসম স্বার্থত্যাগ ঘোষণা না করিয়া ছাড়ে না। পুণ্যকর্ম, দানধর্ম, আর পুণ্য নাই, ধর্ম নাই; কাজেই, উপকারের আশায় যে দান, তাহাকে দান না বলিয়া বিক্রয় বলি। জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, আতুর-শালা-প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সময় অন্তর্যামী নারায়ণ সাক্ষী না হইয়া রাজপুরুষ হইতেছেন; ইষ্টদেবের নামে, ঠাকুরের নামে, না হয় পিতৃপিতামহের নামে, উৎসর্গ না হইয়া রাজকুলের নামে হইতেছে। রাজপুরুষ মান্য, অবশ্য পূজ্য কারণ তিনি, রাজার স্থানে, ন্যায় ও ধর্মের দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। দণ্ডধরের জাতি নাই, কুল নাই, গোত্র নাই; এবং তাঁহার তুল্য উচ্চ আসন কাহারও নাই। এ সব সত্য। কিন্তু যে হিন্দু আচার লইয়া আকুল, তাহার শাস্ত্রে কাপটের প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে। তথাপি বিপদ এই, ইংরেজ জাতির তুল্য বুদ্ধিমান্ জাতি আর নাই। ইংরেজ রাজপুরুষের চোখে ধুলা পড়ে না, পড়ে নিজের চোখে।

দান-ধর্মের তুল্য ধর্ম নাই। কিন্তু যখন দেখি, দানধর্ম দম্ভের কারণ হইয়াছে, দাতা নিজের নামটি ভুলিতে পারিতেছেন না, তখন ধর্মের গ্লানি অনুভব করি। এক নগরে এক বিষয়ে নানা জনের দান থাকিলে দাতার নামে দানের বিশেষ করিবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। কারণ, সকল দানের লক্ষ্য এক। কিন্তু 'সবে ধন নীলমণি' হইলে নগরের নামে দান উৎসর্গ করিলে দেশভক্তির পরিচয় পাইতাম না কি? এইরূপ, "দাতব্য" কুষ্ঠাশ্রম, "দাতব্য" আতুরাশ্রম, "দাতব্য" সভা প্রভৃতির "দাতব্য" বিশেষণে বিজাতীয় দান ব্যক্ত করিতে থাকে। কারণ হিন্দুধর্ম প্রাচ্যধর্ম, মানুষের প্রতি অবজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেখিয়া মর্মে মর্মে রোদন করিতে থাকেন, "দাতব্য" সভা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করেন, বাঙ্গালা ভাষাও "দাতব্য" শব্দে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। নিরন্নের অর্থলোভ বুঝিতে পারি; কিন্তু ধনীর অতিমান-লোভ মোহের ফল নয় কি?

অভিমান নিশ্চয়ই চাই। কুরুকুল ধ্বংস হইয়া গেল, দুর্যোধন অভিমানে অটল। উদার, অনুদার, যিনি যাহাই হউন, তাঁহার অভিমান না থাকিলে তাঁহাকে মানুষ বলিতে পারি না। যাঁহার মনুষ্যত্বের অভিমান নাই, তাঁহার কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশে যাঁহারা দয়াশীল, যাঁহারা নেতা, তাঁহারা এই সোজাকথা ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকারে দেশের অভিমান খর্ব করিতেছেন। দান পাইলেই হইল, বিচার নাই; সেই দানে নিরন্নের ও নির্বস্ত্রের দুঃখ দূর করিতে বসিয়া যান। যে "গোরু মেরে জুতা দান" করে, তাহার পাপ অধিক, না সে দানের গ্রহীতার অধিক? লোকে বলে, আজকাল দাতা বিরল; আমি বলি গ্রহীতা বহুল। এই গ্রহীতা বাঁচিলে কি, মরিলেই বা কি? দানগ্রহণে মানীর মাথা কাটা যায়। যাহার মাথা বাঁচাইতে পারিলাম না, তাহাকে নির্জনে নিঃশব্দে মরিতে দেওয়াই ভাল। প্রতিকার থাকিতেও কত লোক ব্যাধিহত হইতেছে; ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া নিরাহারে মরিলে অধিক আর কি?

কিন্তু অভিমান অর্থে অহঙ্কারও বুঝায়। মান-বোধ ঠিক হইলে অহঙ্কার বা দর্প আসে না। অভিমানী দর্প করে না, বরং আচার-ব্যবহারে আত্ম-সংযম করে। ইদানীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধির তুল্য অভিমান কাহারও দেখি না। তিনি দেশের অভিমানে দীনের ন্যায় আচরণ করিয়া আপনাকে উচ্চ স্থানে বসাইয়াছেন। যাহারা লম্বা কোঁচায় বুক ফুলাইয়া চলে, তাহারা অভিমানের ধার দিয়াও যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই, ইদানী অনেক নব্য-শিক্ষিত এই দুইএর প্রভেদ বুঝিতে পারেন না, 'হেট-কোট-নেকটাই' আঁটিয়া মনে করেন, ভাগ্যে-ভাগ্যে মানটা বজায় রহিল। যাঁহাদিগকে এমন কৃত্রিম কৌশলে মান রক্ষা করিতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমত্ত। নতুবা এমন দৈন্যের নিশানা উড়াইয়া, স্বদেশকে অস্বীকার করিয়া, কোন্ মানী একদিন বাঁচিতে পারিত? রেলে কি ষ্টীমারে, আপিসে কি হাওয়াখানায়, সাহেবী পোষাকে তাঁহারা যে মান পাইয়া থাকেন, তাহা দেশকে অপদস্থ করিয়া পান না কি? পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলে মহাপাতক হয় না; আমরাও পুরাতন জোড় পরিতেছি না। এ সব সত্য; কিন্তু কোনও দিন দেশকে হেট-কোট-নেকটাই পরাইতে পারিব কি? ইংরেজ কখনও এ দেশের ধুতি পরিয়াছে কি?

স্ব-প্রত্যয়, চৈত্তিক সভ্যতায় ব্যক্ত হয়, ভৌতিক সভ্যতায় ভান হয়। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া থাকার নাম স-ভ্য-ত। ইহার নিমিত্ত বহু ক-ল-না আবশ্যক, ইহাতে বহু ছদ্ম ও ছলনা থাকিবেই থাকিবে। বস্ত্র পরিয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি না, বস্ত্র না পরিয়াও থাকি না, সভাতে বসিতে পারি না। ইহা সভ্যতার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত। এইরূপ, দুইখানা পা দিয়া না চলিয়া যখন চক্র ঘুরাইয়া পথ অতিক্রম করি, তখন সভ্যতার আর-এক সোপানে উঠিয়াছি। উঠিতে উঠিতে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, তিনকেই গমন-মার্গ করিয়া ফেলিয়াছি। এসব ভৌতিক সভ্যতা; পঞ্চ মহাভূতকে কলনা দ্বারা বশে আনিয়া ইহার সুখবৃদ্ধি-জনক সভ্যতা। কিন্তু আর-এক সভ্যতা আছে। সভাতে ক্ষুৎকাসি রোধ করিয়া, সমাজে স্বাভাবিক পশু-প্রবৃত্তি দমন করিয়া, অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানও সভ্যতা। রাগ-দ্বেষাদির সংযম, আর-এক কথায়, চিত্তের সংস্কার চৈত্তিক সভ্যতা। এই দুই-এর মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়ঃ, তাহা আমরা সবাই জানি। আমাদের সভ্যতা কোন্‌টা, তাহাও ত জানি।

ধর্মের গতি সূক্ষ্ম; তত্ত্বের ত কূল পাওয়া যায় না। তথাপি, নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত সবাই বুঝি, কোন্‌টা কু-কর্ম, কোন্‌টা সুকর্ম, কোন্ কর্মে অধর্ম, কোন্ কর্মে ধর্ম। বর্তমান ইয়ুরোপের অর্থনীতি, অর্থোপার্জনে ধর্মাধর্ম বিচার করে না; মনে করে, প্রবৃত্তিমার্গ প্রসারিত করিলে মানুষের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য আপনা-আপনি ঠিক হইয়া আসিবে। অর্থাৎ মানুষকে পশু কল্পনা করিয়া প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম অন্বেষণ করিতে বলে; প্রশস্য, শ্রেয়ঃ, শ্রেষ্ঠ বুঝিতে পার, ভালই; না পার, ক্ষতি নাই। কারণ পরজন্ম আছে কি নাই, বিজ্ঞানশালায় তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইয়ুরোপের প্রচলিত বিজ্ঞান বলে, যোগ্যতমের জয়; বলে, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া চল। কিন্তু বলে না, যোগ্যতম কি; বলে না, জয় দ্বারা যোগ্যতমের সম্ভব হইতে পারে কি না। ক্ষয়ের দ্বারা ধনের সঞ্চয় হইতে দেখি কি?

আমাদের দেশের বিজ্ঞান বলে, প্রবৃত্তি-মার্গের শেষ নাই ; যাহার শেষ নাই, তাহাতে কত দৌড়াইবে ? বলে, যোগ্যাযোগ্যের মাপ-কাঠি এ জীবনে নাই ; সে মাপ-কাঠিতে সবাই যোগ্য, অযোগ্য কেহ নাই। জীবে জীবে সংগ্রাম নয়, জীবে জীবে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, এমন দুর্লভ জন্ম হেলায় পাত করিও না, আনন্দ অন্বেষণ কর।

যে দেশের বিজ্ঞান এই ভাবের কথা বলে, সে দেশে সে বিজ্ঞান শেখানা হইতেছে না। পাকে-প্রকারে শেখানা হইতেছে, সুখবাদই চূড়ান্ত। এমন ধাক্কা, এমন ভাঙ্গা, সাম্‌লাইয়া চলা—দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! স্ব-প্রত্যয় হারাইয়াছি, পর-প্রত্যয়ে চলিতেছি, ফিরিতেছি। পর-প্রত্যয়ে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না, দেশ-প্রেমও জাগে না। বাগ্মী ও কবি চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "ভারতসন্তান, জাগ, জাগ।" ভারতসন্তান জাগে না, কারণ জাগিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে ঘুমানো মন্দ কি ?

বহু উপদেশক বলেন চাকরি করিও না। কারণ, অনেক চাকরিতে পয়সা কম, প্রভুর মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে নিজের স্বাধীনতা ও ধর্মবুদ্ধি থাকে না। কথাটা সত্য বই কি। কিন্তু সেবক নইলে সমাজ চলে না,—রাজ্য চলে না। ইয়ুরোপের অর্থনীতি বলে, কতক লোক ভৃত্য হইবেই, সংসারে দারিদ্র্য থাকিবেই, তুমিও ভৃত্য পাইবে। কর্তা ও ভৃত্যের দ্বন্দ্বও চিরকাল থাকিবে, কারণ ভরণের মাপকাঠি নাই, যে যত টানিয়া মাপিয়া লইতে পারে, সে তত লইবে। আমাদের দেশ বলে, সেবাধর্ম অতি গহন বটে ; কিন্তু সেবা-ধর্মের তুল্য ধর্ম নাই, দাস্য-ভাবের তুল্য ভাব নাই। যে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবা করে, তাহার ধর্মবুদ্ধির তুলনা নাই, ঐশ্বর্যের সীমা নাই।

এই ভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। মনিবকে ফাঁকি দিয়া মাসের শেষে মাহিনা আদায় করিতে পারা বুদ্ধির কার্য বিবেচিত হইতেছে। সেবা অবৈতনিক হইলে ত কথাই নাই, তাহা অনুগ্রহ-মধ্যে গণ্য হইতেছে। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া খানিকটা দেশ ভাসিয়া গেল, বিদেশের নয়, আমাদেরই দেশের যুবজন বিপন্ন দেশবাসীকে উদ্ধার করিয়া আসিল। ইহাতে অনুগ্রহ কি, প্রশংসার হেতুই বা কি ? কিন্তু দেশের আত্মপ্রত্যয়হীন নেতৃকুল পর-প্রত্যয়ের লোভে যুবাদিগের কর্ণপটহ দুন্দুভি-নিনাদে ছিন্ন না করিয়া ছাড়িলেন না। স্তব উৎকোচ-বিশেষ, উৎকোচও আর কিছুই নহে, দেনা ও পাওনা। ইস্কুলে উৎকোচ চলিতেছে, সেবার জন্য নহে, ভালমানুষির জন্য ; বিদ্যামহাপীঠেও উৎকোচ, বিদ্যা-অর্জন কর্তব্যের জন্য চলিতেছে ; দেশের বালক ও কিশোর ও যুবা উৎকোচে পালিত হইতেছে। ইহারা বড় হইয়া উৎকোচের আকাঙ্ক্ষায়, সেবা ও ধর্মের মাহাত্ম্য ভুলিয়া যাইতেছে। মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বর, অনারারি মাজিষ্ট্রেট, কি গভর্মেণ্টের কাউন্সিলের মেম্বর, প্রভৃতি হইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ দেখিলে মনে হয়, ধন্য আমার দেশ, যে দেশে এত লোক, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, শিষ্ট ও নীতিমান্, স্বেচ্ছায় সেবক হইতে চাহিতেছেন। পরে বুঝি, সেবার কাড়াকাড়ি নয়, পদের কাড়াকাড়ি। কিন্তু, পদের গৌরব কিসে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না।

দেশের লোক যে অ-সত্যের প্রতি ধাবিত হইয়াছে তাহা আদালতের মকদ্দমা গণিলে বুঝিতে বাকি থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মকদ্দমার বৃদ্ধি সভ্যতার লক্ষণ। লোকে যে অত্যাচার, যে অন্যায়, আগে সহিত এখন তাহা সহিতেছে না। আগে লোকে নির্বোধ ছিল, নিজের অধিকার ও স্বত্ব বুঝিত না, এখন বুঝিতে পারিতেছে। কথাটা কিছু সত্য বই কি। কিন্তু গ্রামে "২১১ ধারা" এত শুনি যে, তাহা আমারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। অল্প সত্যকে মিথ্যার দ্বারা বাড়াইলে ধর্ম রক্ষা পান না। ভয়ে ভয়ে সজ্জনে আপোষে মকদ্দমা মিটাইতে চান। অসত্যতা যে বাড়িয়াছে, তাহা কে না জানে ? ইহার কারণও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রতারণা চলিতে পারিলে চলে, চুরি হইতে পারিলে চুরি বাড়ে। বিলাতী সভ্যতার সহিত আইনের ও নজীরের যে ভুলচেরা ভাষ্য আসিয়াছে, যে ভাষ্যের ভাষ্য ছাপাইতে বড় বড় ছাপাখানা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, সে আইন, সে সূক্ষ্মনীতি আমাদের এই অ-সভ্য বা অল্প-সভ্য সমাজের নিমিত্ত প্রণীত না হইলেই ভাল ছিল। অসভ্যকে সভ্যের সংসর্গে আনিলে অসভ্য হীনবীর্য ও কলুষচিত্ত হইয়া অধোগত হয়,

তাহারা ধূর্ত ও নিঃসত্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যাহার যে ধর্ম তাহা সে ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে এই পরধর্ম ভয়াবহ বিপ্লবে পরিণত হয়। বাঙ্গালী যখন প্রথম ইংরেজী সভ্যতার সুখবাদে মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন তাহার কদাচারের সীমা ছিল না; এখন সে কদাচার হইতে বাঙ্গালী কতকটা সাম্‌লাইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা পিতৃপিতামহের বহু সুকৃতির ফলে। ধর্মের হানির তুল্য ক্ষতি আর কিছু নাই। যাহার নাম ধর্মের অধিকরণ, সেখানে সজ্জন যাইতে ভয় পায়। কারণ সেখানে লুকাচুরির ও সূক্ষ্মবুদ্ধিচালনার অন্ত নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক ন্যায়ের নিষ্কি ধরিয়া থাকিলেও আইনের কূটতর্কে, ঘটনার কৃত্রিম সমাবেশে, বৃষরূপী ধর্ম মাত্র একপাদে দাঁড়াইয়া আছেন।

যাহাঁরা ব্যবহারাজীব, উকীল-মোক্তার টোর্নি, তাহাঁরা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, মানে ও ধনে, দেশের অগ্রণী। কেবল এ দেশে নয়, সব দেশেই। কারণ, ইহাঁরা দেশের নিয়ম যেমন জানেন, অন্যে তেমন জানে না। ইহাঁদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ, মানুষের মতন মানুষ, আছেন। কিন্তু আইন-আদালতের এমন গণ্ডি, তাহার ভিতরে যিনি প্রবেশ করেন, তিনিই চিত্তে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়েন। আইনে দোষ নাই, ধর্মে বাধিলেও আইনে বাধা নাই, এইরূপ যুক্তি এড়াইতে পারা সোজা নয়। কারণ যুক্তিতে সুখবাদ চরিতার্থ হয়।

ধনী, মানী, জ্ঞানীর ব্যবহার দেখিয়া অপরে ব্যবহার শেখে। তাহাঁরাই সমাজের আদর্শ; তাহাঁরাই শিক্ষক; ইস্কুলের মাষ্টার নয়, টোলের অধ্যাপক নয়, ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিও নয়। কারণ, ইহাঁদের বিদ্যা থাকিলেও "বুদ্ধি" নাই, যাহার জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সংসার-সাগর হেলায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। যে বুদ্ধি দ্বারা ধন ও মান দুইই লাভ করিতে পারা যায়, সে বুদ্ধি ছাড়িয়া কে অন্যবুদ্ধির উপাসনা করিবে? তাইত ইস্কুলের মাষ্টার, টোলের অধ্যাপক, সমাজের কৃপার পাত্র হইয়া আছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আইন শিখাইবার কলেজ, উকীল তৈয়ারির কল, কিছুদিন বন্ধ করিলে ভাল হয়। কারণ মাল বহুৎ জমিয়া গিয়াছে, কাটতির চেয়ে গড়তি বেশী হইয়াছে। সমাজ বলে, যখন ধন-মানের লোভ এত, তখন আইন-কলেজ আরও খোলা হউক, উকীল আরও বেশী হউক, লভ্য ধনের ভাগ হইয়া যাউক। ওকালতি দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি ধনোৎপাদকের ধন উকিলের ঘরে সমাহৃত হয়। এই সমাহরণের ব্যাপ্তি হইলে মন্দ কি? ব্যবসায় মাত্রেই ভাগ্য পরীক্ষা। কিন্তু তা বলিয়া যে ধর্মেরও পরীক্ষা না হইতেছে, এমন নয়। বৃত্তির দোষ নাই; যে বিধানে বৃত্তির মূল্য চড়িয়া গিয়াছে, সে বিধানের দোষ। ডাক্তারি বৃত্তি ধরুন। এমন প্রশস্ত বৃত্তি আর কি আছে? যিনি আতুরের সেবা করেন, মৃতবতের প্রাণরক্ষা করেন, তিনিই ত মানুষ, নররূপে দেবতা; কিন্তু যে বিধানে তাঁহার বৃত্তির মূল্য ধার্য হইয়াছে, সে বিধানের দোষে বাড়ীর পাশে ডাক্তার থাকিতেও বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাইতেছে। ডাক্তার হইলেই যাঁহাকে সাহেব সাজিতে হয়, তিনি বিনা ডাকে কি করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিবেন?

বিলাতী কলের ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কলার—চাতুরীর আমদানি হইয়াছে। কলের তেল, কলের আটা, কলের কাপড়, প্রভৃতি কোন্ কলে খাঁটি মাল বাহির হইতেছে? আইনমন্ত্রী দণ্ডবিধির ধারা বাড়াইয়া বাড়াইয়া হয়রান। কিন্তু দণ্ডের ধারা, আর ধর্মের ধারা ত এক নয়। এ দেশেও নয়, বিলাতেও নয়। সে দেশেও ধারার পর ধারা যোগ করা হইতেছে; কিন্তু বুদ্ধিও পৃথ্বীর তুল্য বিপুলা। কৈমিতিক বিশ্লেষণ-বিদ্যা শিখিতে পারেন, কিন্তু ধর্মজ্ঞান দিতে পারেন না।

কেহ কেহ বলে, ক্রয়-বিক্রয়ে, বাণিজ্যে অসত্য করিতে হয়। কারণ ক্রয়-বিক্রয়, দান-ধর্ম নয়; অর্থে নির্লোভ হইয়া বাণিজ্য নয়। তা ত নয়; কিন্তু অসত্যে পুণ্যও নয়। তা ছাড়া, অসত্যে দোকান-পাটও টেকে না, তুলিয়া দিতে হয়। বাঙ্গালীর বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন এক চমৎকার কৌতুক। প্রথমে মনে হয়, তাহার বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে তারপর মনে হয়, এমন নির্বোধ, যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নির্বোধ মনে করে। দুঃখ হয়, ব্যবসায়-বুদ্ধি নাই, মনে করে, অত্যুক্তি বঞ্চনা নয়।

বাঙ্গালী বাইরে যতই বড়াই করুক, তাহার ব্যবসায়ে, তাহার সমবায়ে, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতেছে না; ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে দশহাত পিছাইয়া পড়িতেছে। এই জাতিগ্লানি স্মরণ হইলে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। কিন্তু, এইখানেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। অবিশ্বাসের হেতু, সে অপটুতা নহে; অপটু হইলেও সত্যপরায়ণকে কে না বিশ্বাস করে? অবিশ্বাসের শিকড় ভাসা-ভাসা নহে, বহুদূরে বহুনীচে চলিয়া গিয়াছে, সমাজরূপ বৃহৎ অট্টালিকার পোতে গিয়া ঠেকিয়াছে। অর্থনীতির সাধ্য নাই, সে মূল উৎপাদন করে; 'হা অন্ন' 'হা বস্ত্র' রবে দেশদিক বিদীর্ণ হইলেও সাধুশীলতা আপনাআপনি জন্মিবে না। বঞ্চনার বিদগ্ধতা প্রকাশ পায়; বাঙ্গালী একটু স্থূলবুদ্ধি হইলে, বোধ হয়, বিশ্বাসভূমি হইতে পারিত। সমাজযন্ত্রের কোথায় কোন্ কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহার খোজ না লইয়া উপরের চাকায় অগ্নিতপ্ত তৈল নিষেক দ্বারা কি হিত হইবে? যেখানে চোরে চোরে মাসতুত ভাই, সেখানে কে কাকে চোর বলিবে? তা ছাড়া, আইনে যে চুরি ধরা পড়ে না, সে চুরিতে অর্থের উপার্জন, উচ্চপদে অধিষ্ঠান, কিংবা মানের কেতন-উড্ডয়ন, কিছুই বাধে না। ইহাই ত জীবনের সার্থকতা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, "দেখ, আমি পাঁচ টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন আমার পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি হইয়াছে।" কিন্তু পাঁচ হইতে পাঁচ লাখ, ভাগ্যের খেলা, না পৌরুষের পরিচয়, তাহা শ্রোতার কানে পহুঁছে না। দেশ-লক্ষ্মী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি আমার ধনবৃদ্ধি করিয়াছ, বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার ধনরক্ষা করিয়াছ, বিদেশ হইতে আনিয়াছ?" তখন কেহ বলে, "মা, তোমার ব্রীহি বৃদ্ধি করিয়াছি, তোমার রামশ্যাম পুত্র পারে নাই, আমি তপস্যা দ্বারা পারিয়াছি।" কেহ বলে, "আমি তোমার যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া তোমার সেবায় লাগাইয়াছি, তস্কর খুঁড়িয়া লইতে বসিয়াছিল, আমি তাহার সন্ধি দেখিয়া লইয়াছি।" কেহ বলে, "আমি তুষ দিয়া গম আনিয়াছি, জট দিয়া কাপড় কিনিয়াছি, অম্ল বেচিয়া ঔষধ পাইয়াছি।" মালক্ষ্মীর বদনকমল প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তথাপি জিজ্ঞাসা করেন, "দেখ, আমার রাম-শ্যাম বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হীন; আমার ধনের রক্ষা ও বিনিময়ে বৃদ্ধি করিতে গিয়া তাহাদের দুঃখ বাড়াও নাই ত? উপার্জিত ধন বাঁটিয়া লইয়াছ ত?"

গত জানুয়ারি মাসের "মডার্ন রিভিউ" নামক মাসিক পত্রে মা-সরস্বতীর ১৪ জন পুত্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম। ৮ জন এম্-এ, এম্-এস্সি পাশ এবং ৬ জন বি-এ, বি-এস্সি পাশ, বাঙ্গালী যুবা কলিকাতায় নেশা-বিক্রির দোকান খুলিয়াছে! কেহ কেহ উদ্দেশ্যও বলিয়াছে, মাদক-বিক্রয়ে পুঁজি লাগে অল্প, কিন্তু লাভ হয় প্রচুর; অর্থাৎ রাতারাতি বড়মানুষ হইতে পারা যায় কিন্তু আরও সোজা পথ ছিল, তাহাতে মূলধন কিছুই লাগে না। দস্যু নিদ্রিতের টাকা-কড়ি আত্মসাৎ করে, মাদক-বিক্রেতা জাগ্রতকে পশু করিয়া তাহার সর্বস্ব—তুচ্ছ টাকা কড়ি নয়—তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। এক সুরা-বিক্রেতা বলিয়াছে, পেটের দায়ে এই ঘৃণ্য কর্মে রত হইয়াছে। কর্মটা যে ঘৃণ্য, দেশের ভাগ্য, সে বোধ এখনও লুপ্ত হয় নাই। তথাপি মনে হয় না, পেটের দায়ে গাছের পাতা খাইতে হইয়াছিল।

আরও আছে। "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন, ঢাকায় নব্য-শিক্ষিত শতাবধি বাঙ্গালী মাদক বিক্রয়ের অনুজ্ঞা চাহিয়াছিল। কে পাইল কে না পাইল, ইহা লইয়া পরে রেষারেষি হইয়াছিল। "সঞ্জীবনী" রুষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, বিদ্যামহাপীঠের বহি হইতে এই-সকল হিতাহিত-বিচার-শূন্য যুবকদের নাম কাটিয়া দেওয়া হউক। সংস্কারবর্তনের (graduation) সময় কানে নাকি মন্ত্র দেওয়া হয় "সচ্চরিত্র হইবে"?

আমি বলি, রোষের কারণ নাই, ক্ষোভের কারণ আছে। জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যামহাপীঠে এবং তাহার আশ্রিত আয়তনে ধর্মাধর্মজ্ঞান জন্মানা হয় কি? ধর্মকর্মে অভ্যাস করানা হয় কি? সত্যকথা আর সত্যকাজ এক ত নয়। ধর্ম-জ্ঞান কিছুই হয় না, তাহা নহে। কিন্তু এত অল্প, এত পরোক্ষ, যে, তাহা দ্বারা ভৌতিক সভ্যতার সুখবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে পারা যায় না। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞানে বড়-কিছু হয় না।

আমার বিশ্বাস, এই-সকল যুবার মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। কারণ কোরানে মদ্যপান নিষিদ্ধ। হিন্দুশাস্ত্রেও নিষিদ্ধ; কিন্তু হা শাস্ত্র, হা সমাজ! যে শাস্ত্র পায়ে দলিতে শিখাইতেছি, কারণ তাহার সবটা সনাতন নয়; যে সমাজের অন্ত্যেষ্টির আশায় বসিয়া আছি, কারণ তাহার সবটা বর্তমানের যোগ্য নয়; কোন্ মুখে তাহার শরণাগত হই? খ্রীষ্টান পাদ্রী হিন্দুর ভক্তি-বিগ্রহের নাম পুত্তলী রাখিয়াছে। হিন্দুর ছেলে পুতল-খেলা ছাড়িয়াছে, কিন্তু মন্দিরে যায় না, গির্জ্জাতেও যায় না। দেশে এমন উপদেশকও জন্মিয়াছেন, যিনি দিনে দশ-বার রঘুনন্দনের আদ্যশ্রাদ্ধ করেন; কারণ তিনি তাঁহার তত্ত্বে আমাদের বর্তমান পাতকের বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ নবদ্বীপের ন্যায়পঞ্চাননের টিকী টানিয়া মস্তকে ঘটাকাশ ও পটাকাশ আবিষ্কার করিতেছেন; কারণ আমাদের অন্ন-ঘটে কেবল আকাশ, বস্ত্র-পটেও কেবল আকাশ। স্নেহলতা পুড়িয়া মরিল; এমন নিদারুণ ঘটনাতেও মুখে 'আহা' বাহির হইল না; বাহির হইল গালি।

এক হিন্দুকুলবধূ শ্বাশুড়ীর তিরস্কার সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল; আর-এক বধূ,—হিন্দু কি অহিন্দু জানি না,—হিন্দুসমাজের জরাগ্রস্ত পিতামহীর বধির কর্ণে ধিক্ ধিক্ বলিতে বসিলেন, যেন তৎসনামন্ত্রে জরা গিয়া উদ্ধত যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এক উপদেশক শিশুমৃত্যুর সংখ্যাধিক্যে ব্যথিত হইয়া জননীকে শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে বলিয়াছেন, যেন মা নিজের ছেলের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছেন। কেহ শিশু-কল্যাণ-কামনায় প্রদর্শনী খুলিতে লাগিয়া গিয়াছেন, যেন বাল ও যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, পরম কল্যাণে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। ইহাঁদের অভিপ্রায় শুভ; কিন্তু বিলাতী বাদের অনুবাদ দ্বারা দেশ জাগে না। কারণ সেটা অনু-বাদ। আর, পরিবাদে অনুবাদের তুল্য অসহনীয় কিছু নাই। ইহাঁরা কলিকাতাকেই দেশ মনে করিয়া তাহার সুরম্য হর্ম্যে ভোগের সহস্র উপকরণে, রাজপথের কুট্টিমে, রথচক্রের ঘর্ঘরে, দেশের নাড়ীর বেগ অনুভব করেন। যদি এই ভ্রমে না পড়িতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, হিন্দুসমাজ সুখে নাই, দেশ সুখে নাই। তাহার হৃৎপিণ্ড অসাড় হইয়াছে, তাহার শ্বাসে মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। এ সময় ঔষধ চাই, সুপথ্য চাই। এখন উপহাসের ও উপদেশের সময় নয়; ধীরভাবে সেবার সময়। সমাজ মাত্রেই স্বভাবত রক্ষাশীল,—এ কথা কে না জানে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, ইংরেজের সংসর্গে, আমাদের চিরপোষিত সংস্কারে, আঘাত পড়িতেছে; এমন আঘাত, যাহাতে সমাজ-সৌধের মূল পর্য্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে। অবিরত ভাঙ্গা চলিতেছে, গড়ার দিকে মন নাই। এখন সবাই প্রভু, আজ্ঞাকারী কেহ নাই। বলে, স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা নষ্ট করিতে পারি না। স্বেচ্ছাচারিতাকে বলে স্বাধীনতা; যেন স্বাধীনতার মধ্যে শাসন থাকে না। স্বেচ্ছাচারীর নিমিত্ত কিন্তু বিস্তীর্ণ অরণ্য পড়িয়া ছিল। সেখানে তিনি বাক্‌স বাক্‌স রঙ্গ ও বোঝা বোঝা তুলী লইয়া গিয়া যত-ইচ্ছা-তত মোহিনীর রূপ-লাবণ্য হাবভাব লিখিতে পারিতেন; চিত্রে কেহ কালী ঢালিতে যাইত না। গদ্যের ও পদ্যের কলা-কুশলীও গাড়ী গাড়ী কাগজ লইয়া গিয়া মনের সাধে, গল্পে ও উপন্যাসে, নানা ছন্দে ও বন্ধে, প্রেমের লুকাচুরি স্বচ্ছন্দে বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন, কেহ চুরি করিয়া পড়িতে যাইত না। একদিকে কান্তকলার নামে যথেচ্ছাচার, অন্যদিকে সমাজের স্বাভাবিক পুরাতন শীল, এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কাব্য দ্বারা যেমন শাস্ত্র, পুরাণ দ্বারা যেমন কাব্য, এবং গীত দ্বারা যেমন পুরাণ লঘু ও হৃত হইয়া পড়ে, সমাজও লঘু ও হৃত হইতেছে। ব্যতিব্যস্ত সমাজ নূতন আদর্শ খুঁজিতেছে, যাহাকে সম্মুখে রাখিয়া আত্ম-লুপ্ত না হইয়া বাঁচিয়া বড় হইতে পারে; কিন্তু কেহ সে আদর্শ-নির্মাণে মনোযোগ করিতেছেন না।

কেহ বলেন, 'চরিত্র-বল' বাড়াও; কিন্তু বলেন না, কোথা হইতে এই বল আসিবে। কেহ বলেন, 'নৈতিক বল' বাড়াও। কিন্তু পূর্বোক্ত সুরা-বিক্রেতার নীতির বল কম কি? যাঁহারা সমাজনীতি অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মপ্রসাদ চাপিয়া রাখিয়া, কর্মমাত্রেই, বৃত্তিমাত্রেই গৌরব-জনক,—এই ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের নীতির বল অল্প কি? কেহ বলেন, মেরুদণ্ড সোজা কর। কিন্তু মাংসের কাথে ও শারীরিক ব্যায়ামে সে মেরুদণ্ড সোজা হয় না। কিসে হইতে পারে, ভাবিয়া দেখা দেশে নবদ্বীপ

থাকিতেও ন্যায়-চর্চার ফল ফলিতেছে না, কার্যকারণ-নির্ণয়ে ভ্রম হইতেছে, কারণে না পশিয়া কার্য ধরিয়া টানাটানি চলিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, লোকনিন্দা প্রবল করিয়া বর্তমান সমাজে দুর্নীতি ও ব্যক্তির অসাধুতা দমন কর। ইহা মন্দের ভাল বটে; কারণ আমরা লোকাপবাদ যত ভয় করি, রাজদণ্ডকে তত ভয় করি না। কিন্তু বিপদ এই, বর্তমান বিপ্লবের সময় লোকমত স্থির হইতে পারে নাই, সমাজশাস্ত্র রচিত হইতে পারে নাই। তা ছাড়া, যে বান্ধব আমার সমসুখদুঃখভাগী সে বান্ধবের নিন্দাই আমার পক্ষে লোক-নিন্দা। সে বান্ধব অদ্যাপি একমত হইতে পারেন নাই। অ-বান্ধবের নিন্দায় হিতে প্রায়ই বিপরীত হইয়া পড়ে; সমাজ, শিশুর ন্যায়, বাঁকিয়া বসে। চিত্তের দুর্বলতা হউক, কোনও সমাজ নিজের শাসন অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে চায় না। এই কারণে দেখিতেছি, যাহারা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে অতিগামী, তাহারা সামাজিক অধিকার দানে মন্থরগামী হইয়া পড়িতেছেন।

আমাদের প্রবৃত্তি কোন্ পথে চলিতেছে; সে পথ শ্রেয়ঃ কি না; শ্রেয়ঃ না হইলে কোন্ পথে চলা কর্তব্য, এবং সে পথে দেশকে চালাইবার উপায় কি,—এইসব প্রশ্নের উত্তর চাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময়

দিনে দিনে ভারতের বহির্বাণিজ্য বাড়িয়া যাইতেছে। বিদেশী বাণিজ্য ব্যাপারে দেশের আর্থিক উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। নানা দেশের শিল্পের সহিত ভারতের শিল্পের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। অনেকে বলেন, বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলে এদেশের উন্নতি হইবে। যে-সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য পূর্বে সহজে বিক্রয় হইত না, সে-সমস্ত দ্রব্য এখন বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। তাহাদের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। অন্য পক্ষে যে-সমস্ত দ্রব্য সহজে পাওয়া যাইত না তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। এই প্রকারে বাণিজ্য-বিনিময়ে দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া যাইতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন, এই বাণিজ্য ব্যাপারে দেখা যাইতেছে দেশের ধনাগমের সুবিধা সত্ত্বেও আমাদের অনেক প্রাচীন শিল্প ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। পূর্বে যে-সমস্ত শিল্পে ভারতের বিশেষ অধিকার ছিল তাহা লুপ্তপ্রায়। যে-সমস্ত দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-বিনিময় চলিতেছে সে-সমস্ত দেশে কলকারখানার উন্নতি ও বিজ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য ভারত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পাশ্চাত্য সমস্ত দেশই শিল্পজ্ঞানে উন্নত। জাপান ও আমেরিকা ভারতের সহিত বাণিজ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই বাণিজ্য-বিস্তৃতিতে আমাদের অর্থসমস্যা ক্রমে জটিল হইয়া উঠিতেছে।

যে-সমস্ত দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্যবিনিময় চলিতেছে তাহাদের মুদ্রা ভারতে প্রচলিত নয় এবং ভারতের মুদ্রাও সে-সমস্ত দেশে প্রচলিত নয়। সুতরাং আমাদের দেনাপাওনার হিসাবের সময় পরস্পরের মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য গণনা করিতে হয়। নানা কারণে এই মুদ্রা-বিনিময়ের হিসাব সহজ নয়। প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত। ভারতে প্রধানতঃ রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত। সুবর্ণ ও রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য পরিবর্তনশীল। জনবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সমস্ত সভ্য-দেশেই সুবর্ণের আদর বাড়িতেছে। ইউরোপে কেবল সামান্য সামান্য কারবারে রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার আছে। বিদেশী বাণিজ্যে এবং দেশের মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়ে সুবর্ণই প্রধান মুদ্রা। তবে পৃথিবীতে যথেচ্ছ পরিমাণে সুবর্ণ উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া প্রায় সর্বত্রই কাগজের নোট ব্যবহার হইতেছে। গত ইউরোপীয় সমরে ইউরোপে প্রচুর অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল। তাহার জন্য প্রায় সকল দেশই ঋণগ্রস্ত হইয়াছে। দেশের সঞ্চিত সুবর্ণ যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, সেইজন্য কোন কোন দেশে কাগজের প্রচলন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ডে কাগজের নোট সকলে গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু এইরূপে লোকের উপর কৃত্রিম মূল্য চাপাইলে মুদ্রার দাম কমিয়া যায়। তাই সোনার পাউণ্ডে যে পরিমাণে জিনিষ পাওয়া যায় সেই মূল্যের নোটে তত জিনিষ পাওয়া যায় না। সাধারণ কথায় নোটের দাম

সোনার মুদ্রার দামের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য ভারতের সঙ্গে বিনিময়ে রূপার টাকার দাম বিলাতি ষ্টার্লিং ও পাউণ্ডের দামের তুলনায় অধিক হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ রৌপ্য প্রধানতঃ মেক্‌সিকো দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহৃত হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হওয়ায় রৌপ্যের আম্‌দানী কমিয়া গিয়াছে। ফলে রূপার দাম বাড়িয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ইউরোপীয় দেশসমূহ যুদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং ভারতে ঐ-সমস্ত দেশ হইতে আম্‌দানী কমিয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া ভারত হইতে অনেক জিনিষ ইউরোপে রপ্তানী হইয়াছে। তাহাতে বিদেশী বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশে ভারতের পাওনা বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের রপ্তানীর মূল্য দিবার জন্য অধিক রৌপ্যের আবশ্যক হইয়াছে।

এদিকে উৎপাদনের হ্রাস হইয়াছে, তাহার উপর নানা কারণে রৌপ্যের আবশ্যকতা বাড়িয়া যাওয়াতে ইহার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৫ সালে এক আউন্স রৌপ্যের দাম ছিল ২৭৯ পেন্স। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে ইহার দাম হয় ৩৫৯ পেন্স। ঐ বৎসর ডিসেম্বরে ৩৭ পেন্স। কিন্তু পর বৎসর আগষ্ট মাসে ইহা বাড়িয়া ৪৩ পেন্স হয়। রৌপ্যের দাম প্রতি আউন্সে ৪৩ পেন্স কিংবা তাহার কম থাকিলে আমাদের দেশের এক টাকার দাম ১৬ পেন্স হয়। ইহার অধিক দাম হইলে বিনিময়ে টাকার দাম বাড়িয়া যায়। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রূপার দাম আউন্স-প্রতি ৫৫ পেন্স হয়। সুতরাং বিনিময়ে টাকার দাম সেই সময় হইতে বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে রূপা না হইলে চলিবে না, এবং রৌপ্যমুদ্রার অভাবে দেশের মধ্যে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে; এইজন্য ভারত-সচিব মার্কিন-গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে প্রতি-আউন্স ৫০ পেন্সের অনধিক মূল্যে বহুল পরিমাণে রৌপ্য ক্রয় করেন। মার্কিন-গভর্ণমেণ্ট কিছুদিনের জন্য আইন করিয়া রৌপ্যের দাম কমাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে রৌপ্য-বাণিজ্যে এই নিষেধ রহিত করার পর রৌপ্যের দাম অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ইহার দাম হইয়াছিল ৭৮ পেন্স। পরে এই বৎসরের প্রথমে প্রায় নব্বই পেন্স পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে টাকার বিনিময়-মূল্য বাড়িয়া গিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে একটাকার বিনিময়ে ৩৪।৩ পেন্স পাওয়া যাইত। আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের কারবার এমন চলিয়াছিল যে ইউরোপ আমেরিকার নিকট বহু পরিমাণে ঋণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে বিলাতি ষ্টার্লিং পাউণ্ডের দাম মার্কিন ডলারের হিসাবে কমিয়া যায়। ফলে বিনিময়-বাজারে রূপার দাম বাড়িয়া যায়। সম্প্রতি রূপার দাম কিয়ৎপরিমাণে কমিয়াছে এবং বিনিময়ে একটাকার মূল্য ২৭।২৮ পেন্সে নামিয়াছে।

আয়-ব্যয় আলোচনার সময় ভারতের অর্থ-সচিব এই বিনিময় এবং মুদ্রা-ব্যাপারে আমাদের লাভ-ক্ষতির এক হিসাব দিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে গত বৎসর (১৯১৯-২০) এই বিনিময়ে ভারতের মোট ১১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। তাঁহার হিসাবটি নিম্নে দেওয়া গেল :—

কাউন্সিল বিল বিক্রয়লব্ধ লাভ—১২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডকে টাকা অগ্রিম দেওয়ার লাভ—	২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা
	মোট ৪১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।
রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয়ে ক্ষতি	১৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা
সোনা ক্রয়বিক্রয়ে ক্ষতি	৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা
টাকা প্রস্তুত করার জন্য ক্ষতি	৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা
বিবিধ ক্ষতি	১৭ লক্ষ টাকা
	মোট ক্ষতি ২৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা
ক্ষতিবাদে লাভ	১১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা।

এই হিসাবের মধ্যে কয়েকটা কথা আছে যাহা সাধারণের জানা আবশ্যক—যেমন "কাউন্সিল বিল" ও "রিভার্স কাউন্সিল"। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে সম্বন্ধ তাহার জন্য ভারতবর্ষ বৎসরে প্রায় ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডকে প্রদান করে। ইহাকে ইংরেজীতে বলে "হোম

চার্জেস্"। ভারত-সচিবের সভার যাহা-কিছু খরচ তাহা ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিয়াছে। এ দেশে যে-সমস্ত রেল ও কল-কারখানা বিদেশীর টাকায় চলিতেছে তাহার সুদ ও লভ্যাংশ প্রতিবৎসর বিলাতে প্রেরণ করিতে হয়। যে-সমস্ত বিদেশী ভারত হইতে অবসর কিংবা বিদায় গ্রহণ করিয়া বিলাতে অবস্থান করিতেছে তাহাদের বেতন ও পেন্‌সন্ বাবদে অনেক টাকা পাঠাইতে হয় এইপ্রকারে নানাকারণে বৎসরে ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড আমাদিগকে দিতে হয়।

ভারতের আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ অধিক হইলেও এই "হোম চার্জেসের" জন্য আমাদের পাওনার পরিমাণ কমিয়া যায়। বিলাতের খরচ চালাইবার জন্য আমাদের টাকা পাঠান আবশ্যক, কিন্তু বাণিজ্যে আমাদের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক বলিয়া আমাদিগকে আর টাকা পাঠাইতে হয় না। ভারত-সচিব তাঁহার আবশ্যকতা অনুসারে বিলাতি বণিকদিগের নিকট "কাউন্সিল বিল" বিক্রয় করেন। সাধারণতঃ এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের বাণিজ্য-বিনিময়ে "এক্সচেঞ্জ বিল" বা বিনিময়-পত্রের আদান-প্রদান হয়। ভারতবর্ষের একজন সওদাগর যদি ইংলণ্ডে একজনের নিকট এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ ক্রয় করেন এবং ইংলণ্ডের একজন সওদাগর ভারতের একজনের নিকট দশ হাজার টাকার জিনিষ ক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুদ্রা বা টাকা প্রেরণ না করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট "এক্সচেঞ্জ বিল" বিক্রয় করিয়া নিজেদের পাওনা আদায় করেন। যে সব লোককে টাকা পাঠাইতে হইবে তাঁহারা ঐরূপ বিল ক্রয় করেন; আর যাঁহারা মাল বিক্রয় করেন তাঁহারা ঐ বিল বিক্রয় করেন। আমদানী-রপ্তানীর আপেক্ষিক পরিমাণ হিসাবে বিনিময়-পত্রের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান আমেরিকার সহিত ইউরোপের যে সম্বন্ধ তাহাতে মার্কিন ডলারের দাম ইউরোপীয় মুদ্রার তুলনায় অধিক হইয়াছে। বাজারের অবস্থার উপর এই হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। ভারতবর্ষে ইহার বিশেষত্ব এই যে ভারতসচিব বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। ভারতের বাবতে বিলাতে খরচের জন্য যে টাকা আবশ্যক সেই টাকা তিনি "কাউন্সিল বিল" বিক্রয় করিয়া বিলাতেই পাইতে পারেন। অর্থাৎ তিনি ইংলণ্ডের বণিকদিগকে ভারতগবর্ণমেণ্টের নামে এক হুণ্ডি দেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—এই হুণ্ডি প্রদর্শন মাত্র ভারতগবর্ণমেণ্ট লিখিত পরিমাণে টাকা প্রদান করিবেন। যে বণিকের ভারতে টাকা প্রেরণের আবশ্যক আছে তিনি তাহা নির্দ্দিষ্ট দামে ক্রয় করিবেন, এবং তাঁহার উত্তমর্ণের নিকট উহা প্রেরণ করিবেন, উক্ত উত্তমর্ণ গভর্ণমেণ্টের নিকট উহা উপস্থিত করিলে তাহার টাকা পাইবেন—এই হুণ্ডিকে বলে "কাউন্সিল বিল"। যখন বাজারে "কাউন্সিল বিলের" অধিক আবশ্যক থাকে তখন ইহার দাম বাড়িয়া যায়। আর যখন ইহার আবশ্যক কম কিন্তু ভারতসচিবের অর্থের আবশ্যকতা আছে তখন ইহার দাম কম হয়। যুদ্ধের আরম্ভ হইতে ভারত উত্তমর্ণের স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে এবং বিনিময় হার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতেছে। সেইজন্য "কাউন্সিল বিল" বিক্রয় করিয়া আমাদের রাজস্ববৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। ভারতসচিব তাই হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে "কাউন্সিল বিল" বিক্রয় করিয়া গত বৎসর আমাদের লাভ হইয়াছে ১২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

কিন্তু তাঁহার হিসাবে, "রিভার্স" বিল" বিক্রয় করিয়া আমাদের ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছে ১৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই "রিভার্স কাউন্সিল" ভারতে বিক্রয় হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিলাতে ভারতসচিবের নামে এই হুণ্ডি প্রদান করেন। যে সব বণিকের বিলাতে টাকা প্রেরণের আবশ্যক আছে, তাঁহারা উহা ক্রয় করেন। যখন বিনিময়-হার কমিয়া যায়, এবং ভারত হইতে অর্থ প্রেরণের আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ পন্থা অবলম্বনীয়। চেম্বারলেন কমিশন এবং ব্যাবিংটন স্মিথ কমিশন এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে শুদ্ধ বাণিজ্যের সাহায্যের জন্য এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। ১৯১৮-১৯ সালে ভারতে আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৮৫ কোটি টাকার অধিক হইয়াছিল। এবং ১৯১৯-২০ সালে আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ ১১৯ কোটি টাকার অধিক। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষ হইতে টাকা প্রেরণের বিশেষ আবশ্যক নাই। অথচ ভারত-গভর্ণমেণ্ট আমাদের

মাস হইতে এই "রিভার্স বিল" বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকার উপর। ইহা ছাড়া বাজারে বিনিময়-হার অপেক্ষা "রিভার্স বিলের" মূল্য প্রায় ১ পেনি বেশী। তাহাতে আমাদের আরও ক্ষতি হইতেছে। এক পাউণ্ডের দাম বাজারে প্রায় ৮৷৵১০, তাহার জায়গায় আমরা পাইতেছি মাত্র ৮৷/০ আনা। গবর্ণমেণ্ট বলেন, বিনিময়-হার রক্ষা করিবার জন্য "রিভার্স বিল" বিক্রয় করা হইতেছে। আমরা ইহার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। বোম্বাইএর ব্যবসায়ীগণ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন। এদেশের ইংরেজ বণিকগণও ইহার বিরোধী। তবে কেন যে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ক্ষতিকর ব্যাপারে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নয়। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে বিনিময়-হার রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ "রিভার্স কাউন্সিল" বা বিপরীত হুণ্ডি বিক্রয় করা হইতেছে; যে উদ্দেশে এই পথ অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা সাধিত হইয়াছে, এবং অতঃপর সপ্তাহে ২০ লক্ষ পাউণ্ডের স্থানে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের হুণ্ডি বিক্রয় করা হইবে। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত সকলে একমত হইতে পারেন না। বোম্বাইএর সুবিখ্যাত "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা দেখাইয়াছেন যে ইহাতে ক্ষতি বই লাভ হয় নাই। রাজস্বের ক্ষতি ব্যতীত আরও এক বিশেষ ক্ষতি এই হইয়াছে, যে, যেসমস্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময় অনেক টাকা এদেশে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন অধিক বিনিময়-হারে এই সঞ্চিত ধন বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন। তাহাতে এদেশের ব্যবসায় ও শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে। যে-সমস্ত অর্থ দেশের উন্নতিসাধনে নিয়োজিত হইত, তাহা বিলাতে প্রেরিত হইলে, দেশে অর্থের অকুলান হইবে। এইরূপ অর্থসঙ্কটে জিনিষের মূল্য কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে।

যুদ্ধের সময় কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতসচিব যতদূর সাধ্য বিনিময়-হার কমাইয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় আমাদের অর্থসচিব বিনিময়-হারের এক ইতিহাস দেন। যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানি হইত, অর্থের অভাবে তাহার কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্য ভারতসচিব এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত টাকার দাম ছিল ১৬৯ পেন্স, তাহার পর ঐ বৎসরে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত টাকার দাম করা হয় ১৭ পেন্স। এবং ইহার সঙ্গে অন্য এক চুক্তি থাকে, যে, যুদ্ধাবসানের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত এই হারে টাকার বিনিময় চলিবে। রূপার দাম বৃদ্ধি হওয়াতে এই হার ১৮ পেন্স করা হইয়াছিল। এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই বন্দোবস্তে আমাদের প্রায় ১৬৫ লক্ষ পাউণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপ বন্দোবস্তে প্রথমতঃ আমাদের দেশের রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া রাখা হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ বিনিময়-হারের বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে লাভ হইত, তাহা না হইয়া ক্ষতি হইয়াছে। রূপার দাম কমিবার আশঙ্কায় বোধহয় এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া রূপার দাম বাড়িয়াই গিয়াছে এবং বিনিময় হার তৎসঙ্গে বাড়িয়াছে। মোটের উপর এই বন্দোবস্তে আমাদের যে-ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে ইহার পরিমাণ অনুমেয়।

ইউরোপের মহাসংগ্রামে পৃথিবীর মধ্যে এক আর্থিক বিপ্লব আসিয়াছে। ভারতের সহিত বিলাতের কিরূপ বিনিময় চলিবে এবং আমাদের মুদ্রাপদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য গতবৎসর এক রয়াল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার সভাপতি ছিলেন, স্যার ব্যাবিংটন্ স্মিথ। ইহার একমাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন শ্রীযুক্ত দাদিবা-মের্‌ওয়ান্‌জি দালাল, ইনি বোম্বাইএর মধ্যে বাজারদরের এক-জন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই কমিশন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অতঃপর আমাদের টাকার সহিত বিলাতী সুবর্ণ-পাউণ্ডের বিনিময়-হার স্থায়ীভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এবং প্রতি টাকার দাম দুই শিলিং বা এক পাউণ্ডের দাম দশ টাকা হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিনিময়-হার ছিল টাকায় ১৬ পেন্স, বা এক পাউণ্ডের দাম ১৫৲ টাকা। এই বিনিময়-হার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ পৃথিবীতে রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা জানিয়াছেন যে সর্ব্বত্রই রৌপ্যের আবশ্যক আছে; এবং রৌপ্যের

উৎপাদন ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করিলেও ইহার মূল্য সহজে কমিবে না। সুতরাং অনিশ্চিত অবস্থায় না থাকিয়া একটা সঙ্গত-প্রকারে হার স্থির করিয়া ফেলা ভাল। তাই তাঁহারা টাকার বিনিময়-হার ২ শিলিং স্থির করিয়াছেন। যদি রূপার দাম আউন্স-প্রতি ৬২·৯ পেন্স বা তাহার কম হয়, তাহা হইলে এক টাকার দাম দুই শিলিং থাকিলে আমাদের লাভ হয়। কমিশন ধরিয়া লইয়াছেন যে শীঘ্র রূপার দাম ইহার কম হইবে না, বরং অধিক হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট হার সুযুক্তিসম্পন্ন।

রূপার দাম অনেক দিন অধিক থাকিলে ইউরোপীয় দেশসমূহ ইহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। আমেরিকা তাহার রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ভারতে রৌপ্যের বিশেষ আবশ্যক আছে। চীন প্রভৃতি দেশেও রূপার প্রচলন অধিক। এশিয়ার এই সমস্ত দেশের জন্য রূপার দাম না কমিতে পারে। সুতরাং অনেকের ধারণা এই হইয়াছে, যে, কমিশনের নির্দ্দিষ্ট হার ঠিকই হইয়াছে। এইরূপ বন্দোবস্তের মধ্যে নানা জটিল সমস্যা নিহিত। আমাদের দেশে রূপার জন্য এমনই তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে গত ৪ বৎসরে প্রায় ১০৩ কোটি টাকা ভারতের টাঁকশালে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই কয়বৎসরে নোটের প্রচলন দ্বিগুণের অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালে এ দেশে একুনে প্রায় ৬৪ কোটি টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ১৯১৮-১৯ সালে ইহার পরিমাণ ১৩৩ কোটি টাকা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দেশে কত টাকা এবং নোটের প্রচলন বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটা মোটা কথা এই যে, দেশে মুদ্রা বৃদ্ধি হইলে দেশের জিনিষের মূল্য বাড়িয়া যায়। যুদ্ধের টানাটানিতে এবং এই মুদ্রাবৃদ্ধিতে আমাদের দেশের সকল সামগ্রীই মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে লোকে নোট গ্রহণ করিতে চাহিত না, এবং যুদ্ধের সময় এক টাকার নোটকে সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। সেইজন্য অনেক ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দরকার হইয়াছিল। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ক্রমে লোকে নোট ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং আমাদের রূপার টাকা ক্রমে কমাইয়া দেওয়া হইলে, লোকের বিশেষ আপত্তি হইবে না। রয়াল কমিশন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে পরিমাণে নোট প্রচলিত হইবে, তাহার শতকরা ৪০৲ টাকা হারে "পেপার কারেন্সি রিজার্ভে" রৌপ্য কিম্বা সুবর্ণ কিম্বা উক্ত ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা জমা থাকিলে নোট প্রচলনের কোন বাধা থাকিবে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যত নোট প্রচলিত হইবে, তাহার মূল্য সোনা বিনা রূপায় কিম্বা উভয় ধাতুর মুদ্রায় "পেপার কারেন্সি রিজার্ভে" জমা থাকিবে। তাহাতে নোট প্রচলন সহজ হয় না। যুদ্ধের সময় এই নিয়ম রহিত করিয়া দেওয়া হয়। বিলাতে ইহার দলিল জমা রাখিয়া একশত কুড়ি কোটি টাকার নোট এদেশে প্রচলিত করা হইয়াছে। ইহার অধিক নোট প্রচলিত করিতে হইলে আবার নূতন আইন করিতে হইবে। কিন্তু "রয়াল কমিশনের" মতে ইহা না করিয়া, এমন একটি পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে নোটের প্রচার স্বতঃই বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। যখন-তখন ইহার জন্য ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি আবশ্যক হইবে না। ইহা খুব সঙ্গত প্রস্তাব। এবং আমাদের বিশ্বাস নোট প্রচলন বৃদ্ধি হইলে এদেশে রূপার টাকার অধিক আবশ্যক থাকিবে না। চীনেও রূপার আমদানী কমিয়া যাইতেছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আমেরিকার অনেক ধার শোধ করিয়া দেওয়াতে ডলার ও পাউণ্ডের বিনিময়-হার কমিয়া যাইতেছে। চারিদিকের লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, সত্বর রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। এইরূপ অবস্থায় টাকা-পাউণ্ডের বিনিময়-হার এত উচ্চ থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। ভারতসচিব এই উচ্চহার রক্ষা করিলে, দেশের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইতি-মধ্যেই তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

উচ্চ বিনিময়-হারে বিদেশী জিনিষ এদেশে সস্তায় বিক্রীত হইবে। তাহাতে এদেশের শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা। ভারতের বস্ত্র-ব্যবসায় এই প্রথম মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। বিলাতী বস্ত্র এদেশে সস্তায় বিক্রীত হইলে দেশীবস্ত্রের বিক্রয় কমিয়া যাইবে। ইহার উত্তরে এই বলা হয়, যে সস্তা জিনিষ পাইলে দেশের লোকের মঙ্গল, এবং সস্তায় কলকারখানা আমদানী হইলে, দেশের শিল্প নানাভাবে উন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের শিল্প ইউরোপীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায়

উপর নির্ভর করে; কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে কোন দেশের উন্নতি হয় না। যদি দেশীয় শ্রমজীবীগণ রীতিমত খাটিবার সুযোগ না পায়, এবং দেশীয় শিল্পবিস্তারের প্রতিবন্ধকতা আসে, তাহা হইলে সস্তায় বিদেশী জিনিষ পাইলে আমাদের কি লাভ হইবে? ইহার মধ্যে দেখা গিয়াছে, যে, বিদেশী বাণিজ্যে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে এবং বিদেশী মালের আমদানী বাড়িয়াছে। রুশিয়া প্রভৃতি দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের অভাব হইবে না। সুতরাং ক্রমে আমাদের বিদেশী বাণিজ্য সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে। এইসব কারণে মনে হয়, উচ্চ বিনিময়-হার আমাদের উন্নতির অন্তরায়। বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় এত উচ্চহার নির্দ্দিষ্ট করাতে এদেশের মঙ্গল হইবে না।

এই বিনিময়-হারের ফলে আমাদের যে আর-একটি বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের নোটের জন্য যে "পেপার কারেন্‌সি রিজার্ভ" আছে এবং সুবর্ণমুদ্রার বিনিময় রক্ষা করিবার যে "গোল্‌ড্ ষ্টাণ্ডার্ড রিজার্ভ" আছে, তাহার প্রায় সমস্ত টাকা ইংলণ্ড-গবর্ণমেণ্ট ধার লইয়াছেন। "পেপার কারেন্‌সি রিজার্ভ" হইতে ৮২৷৷০ কোটি টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বতন হারে ইহার দাম ৫৷৷০ কোটি পাউণ্ড। আমাদের দলিল ঐ পাউণ্ড হিসাবে। বর্ত্তমান হারে ইহার দাম ৫৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ আমাদের ক্ষতি ২৭½ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া "রিজার্ভে" যে সোনা আছে, তাহার ও দাম কমিয়া যাইবে। এইসব কারণে আমাদের মোট ক্ষতি প্রায় ৪০ কোটি টাকা। গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষতি বিনিময়-হারের লাভ হইতে ক্রমে পূরণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত। ইহা কেবল হিসাবের হেরফের। আমাদের জিজ্ঞাস্য এইরূপ পরিবর্ত্তন কি নিতান্ত আবশ্যক? ভারতসচিবের এক কথায় আমাদের ৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হইল। তাহা ছাড়া প্রধান ক্ষতি আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের। যখন শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত এ দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, তখন এইরূপ বন্দোবস্তে সকলের প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল।

কাকামশাই

১

যখন আই-এসসি পাস করে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে ঢুকলাম, তখন সবাই আমাকে একটি আস্ত গাধা ঠাওরালে, কিন্তু তা'হলেও আমি আমার নিজের মনের মত রাস্তা ছাড়তে পারলুম না। সবচেয়ে রেগেছিলেন কাকামশাই, তা তাঁর রাগ্‌বারই কথা। আমার যখন আড়াই বছর বয়স তখন বাবা ও মা মারা যান, আর এমন কেউ ছিল না যে আমাকে প্রতিপালন করে; কাজেকাজেই কাকামশাই আমাকে তাঁর বাড়ীতেই নিয়ে গেলেন; শুনেছি যে নিয়ে যাবার আগে আমার বাবা আর মাকে, তাঁদের এই বদ্‌মায়েসির জন্য,—অবশ্য তাঁরা সেসব শুনতে আসেননি,—পাঁচশ গালাগালি দিয়েছিলেন। এইখানে আমার এই অদ্ভুত কাকাটির কথা একটু বলা দরকার। ইনি আমার বাবার সহোদর ভ্রাতা নন, বৈমাত্রেয়—অর্থাৎ আমার ঠাকুরদাদামশাইএর দুইটি বিবাহ ছিল; কাজেকাজেই আমার বাবার সঙ্গে এঁর বিশেষ বনিবনাও ছিল না; আর-একটা কথা, আমার বাবা ছিলেন গরীব, একেবারে নিঃস্বই বলা চলে, কিন্তু কাকামশাই ছিলেন ধনী, অগাধ বিষয়, অবশ্য এসব তাঁর নিজের রোজ্‌কার। যাই হোক, কাকা ত আমায় আড়াই বছর বয়সে নিয়ে এলেন। আমি বড় হ'য়ে উঠ্‌লুম। তখন তিনি আমায় এক ফ্রী-স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন, আর উঠ্‌তে বস্‌তে আমায় শাসাতে লাগ্‌লেন যে যদি কখনও আমি ফেল হই তো স্কুল ছাড়িয়ে আমায় মুদির দোকানে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন। আমার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা, কিন্তু তাঁর দুই ছেলে পড়্‌ত সবচেয়ে যে স্কুলের মাইনে বেশী তাতে, আর তাদের বাড়ীতে পড়াবার জন্য দুজন প্রাইভেট টিউটর। আমার এই খুড়তত ভায়েরা আমার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড় ছিল। আমি যখন ফিফ্‌থ্ ক্লাশে পড়ি, তখন তারা একজন এট্টেন্থ ক্লাসে পড়ে, আর একজন থার্ডক্লাসে পড়ে। আর তাদের বাবুগিরিই বা দেখে কে! প্রত্যেক থিয়েটারের দিন থিয়েটারে যাবে, আর কাপড় জামা এসেন্সের ত কথাই নেই! আমার বেশ মনে হচ্ছে যে আমি একদিন

থিয়েটার দেখ্‌তে যেতে চেয়েছিলুম, তাতে কাকামশাই জুতো নিয়ে মার্‌তে এসেছিলেন। যাই হোক, সুখে দুঃখে সময় কাটিয়ে যখন আমি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করলুম, তখন একমুহূর্ত্তের জন্য কাকামশাইএর মুখে হাসি দেখে-ছিলুম। তারপরে আই-এসসি পাস করে যখন আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হ'তে গেলুম তখন তো কাকামশাই যাচ্ছেতাই বল্‌লেন, আর বল্‌লেন যে তাঁর বাড়ীতে আমার আর জায়গা হবে না, পটোগিরি শেখ্‌বার জন্য তিনি আমায় টাকা দেবেন না, আমি যেখান থেকে পারি যেন নিজে রোজ্‌কার করে আমার মনোমত কাজ করি। আমারও আর সহ্য হ'ল না, আমিও তাঁকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়ে চলে এলুম। হাতে একটা প্রাইভেট টিউশানি ছিল, মাসে পনর টাকা করে পেতুম, তাই হ'ল আমার সম্বল। আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হলুম, প্রিন্সিপ্যাল ত আমায় খুব আদর ক'রে নিলেন আর বল্‌লেন যে যদি আমি ফার্ষ্ট হ্যাণ্ড করতে পারি ত তিনি ষ্টের কাছে আমাকে ইংলণ্ডে পাঠাবার জন্য রেকমেণ্ড কর্‌বেন। আর্টস্কুলে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। এর মধ্যে আর কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি, আর আমিও কখনও তাঁর কাছে যাইনি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটা ঘটনা আমায় একটু বিব্রত করতে লাগ্‌ল,—প্রায় দুই-একমাস অন্তর একখানি এন্‌ভেলাপ আস্‌ত তার মধ্যে একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট থাকত, এ চিঠি কে দিত বা কোথা থেকে আস্‌ত, তা কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌তুম না। যাই হোক, কোন রকমে দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল।

২

এর মধ্যে আট বছর কেটে গেছে। আমি বিলাতে গিয়ে কেন্‌সিংটন্ আর্ট স্কুলে পড়ে সেখানকার সেরা ডিপ্লোমা পেয়েছি; এমন কি রয়াল আর্ট গ্যালারীতে আমার একখানি শাদায়-কালোয়-আঁকা ভূদৃশ্য স্থান পেয়েছে; এর চেয়ে সম্মান পাবার আশা আমি কখনও করিনি। ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে বেল্‌জিয়ম ফ্রান্স ও ইটালীর বিখ্যাত চিত্রশালাগুলি দেখে আমি ফিরে এলুম। এখানে এসেই দেখি যে কপালক্রমে আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদ খালি হয়েছে। একখানা দরখাস্ত করে দিলুম, প্রিন্সিপ্যাল আমায় খুব ভালবাস্‌তেন, তার উপর কেন্‌সিংটনের ডিপ্লোমা, দরখাস্ত অতি সহজেই মঞ্জুর হ'য়ে গেল। আড়াইশ টাকা মাইনেতে কাজ আরম্ভ কর্‌লুম।

ইতিমধ্যে কাকামশাইএর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে-ছিলুম, সঙ্গে একখানা ছবি নিয়েছিলুম, তাঁকে দেব ব'লে, আমার মতে আমার এই ছবিখানাই সবচেয়ে সেরা, যেখানা আর্ট গ্যালারীতে স্থান পেয়েছে তার চেয়েও ভাল। গেলুম, তাঁকে প্রণাম করে ছবিখানা দিলুম, তিনি ত দেখে হেসেই অস্থির,—যেখানে সমুদ্রের ঢেউ এঁকেছি সেখানটায় আঙ্গুল দিয়ে বল্‌লেন, "এখানে কালি পড়ে গিয়েছিল বুঝি!! তা এ কালির আঁচড়পিঁচড় টান্‌তে শেখ্‌বার জন্যে বিলাত যাওয়ার দরকার ছিল কি? ছেলে-বেলায় ত তা যথেষ্টই করা হয়েছে। আমি ভাব্‌ছি না-জানি কি ছবিই আঁক্‌তে শিখে আস্‌ছিস্!" এই বলেই আবার খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আমার কিন্তু ভারি রাগ হ'ল, যেখানা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবি সেখানা নিয়ে এরকম ঠাট্টা! আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌ল—না হয় ছবি তাঁর পছন্দ হয়নি, তা বলে ও-রকম করে বল্‌বার কি দরকার ছিল! আমি তো রাগ ক'রে ছবি নিয়ে চলে এলুম এবং এসেই কাকার এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকে ডাকে পাঠিয়ে দিলুম। আমি অবশ্য দেখ্‌তে যাইনি, কিন্তু শুনেছি যে, সেখানা পেয়ে তিনি পুরা দু'ঘণ্টা হেসেছিলেন, আর অনেক দাম দিয়ে খুব ভাল ফ্রেমে সেখানা বাঁধিয়ে নিজের শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন। মানুষের মনের ভাব বোঝাই শক্ত!—সেদিনের অত ভাল ছবিখানা তাঁর পছন্দ হ'ল না, আর এই যাচ্ছেতাই ব্যঙ্গচিত্র, তাও নিজের, এতে এত খুসী! এর পরে আর আমি কাকার কাছে যাইনি, খালি তাঁর মৃত্যুর সময় একবার গিয়ে-ছিলুম, সে কথা পরে বল্‌ব।

৩

এইবার একটা সুখবর দিই, আমি বিয়ে করেছি, ব্রাহ্মমতে, অবশ্য হিন্দুবাড়ীতে যে বিয়ে হত না তা নয়, তবে ওই-সব গোবর-টোবর খাওয়া আমার দ্বারা মোটেই হ'ত না, তার উপরে একটা ১১।১২ বছরের ঘ্যান্‌ঘ্যানে

ডাক্তার পুঁটুলি বউ আন্‌লে আমার একলার সংসার চলে কি করে? আর এদিকেও সুবিধা ছিল—আমার এক বন্ধু জ্যোতিষ, তারা ব্রাহ্ম, তারই এক বোন ছিল, নাম অমিতা, নামটি বেশ, মেয়েটিও দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছে, হার্‌মোনিয়াম পিয়ানো এস্রাজ বেহালাও বেশ বাজাতে পারে, আবার এদিকে গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্ম্ম জানে এবং করে; খালি নভেল, কুরুশ, উল নিয়ে সময় কাটায় না। দেখেশুনে আমার মেয়েটিকে বেশ পছন্দ হয়েছিল। তবে একটা মুস্কিল হ'ল প্রস্তাব আমাকে নিজেকেই কর্‌তে হবে। কি করি? অগত্যা জ্যোতিষকে দিয়েই বলা গেল। তার বাবা মা তো খুব রাজী, জ্যোতিষের ত কথাই নেই, অমিতারও শুন্‌লুম অমত নেই। একদিন আচার্য্য এসে দুহাত এক ক'রে দিলেন। ধুমধাম বিশেষ কিছুই হয়নি, কারণ বরপক্ষে বর একা আর কন্যাপক্ষের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, কাজেই কোন গোলমাল হইরই আর হল না।

বিয়ের পরেই ভবানীপুরের দিকে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া নেওয়া গেল এবং আমরা কর্ত্তা-গিন্নিতে সংসার আরম্ভ কর্‌লুম; কিন্তু দুজনেই এবিষয়ে ভারী পটু, চাকর-বামুন ব্যাটাদের যেন মর্‌সুম পড়ে গেল,—আমাদের দুজনের মাসে চাল লাগে ১৷৷০ মণ, ঘি লাগে তিন সের, এই-রকম সব জিনিসই জলের মত খরচ হয়। তার উপরে কোন-কোনদিন ঠাকুরের অনুগ্রহ হয়, তিনি আর আসেন না। তখন দুই পণ্ডিতে মিলে নানা-রকম সুখাদ্য তৈরী করা হয়, অবশ্য সব সময় সবগুলো গেলা যায় না! এক-এক-দিন আফিস থেকে এসে দেখি যে ঝি আর আসেননি, ঠাকুরুণ নিজেই কোমর বেঁধে বাসন মাজ্‌তে ঘর ধুতে লেগে গেছেন। এই-রকমে সুখে স্বচ্ছন্দে আমাদের দিনগুলি কেটে যেতে লাগ্‌ল। অবশ্য সময়ে সময়ে নানারূপ অভাব ও কষ্টের মধ্যে পড়েছি, তা সংসার কর্‌তে গেলে নিছক সুখভোগ হয় না, কিন্তু কখনও আমাদের দুজনের মধ্যে, যাকে ইংরেজীতে friction বলে, অর্থাৎ মনোমালিন্য, তা হয়নি, কাজে-কাজেই মানসিক সুখ যথেষ্টই ছিল।

ইতিমধ্যে আরেকটি প্রাণী এসে হাজির হয়েছেন, এবং এসেই একেবারে আমাদের উপরে প্রভুত্ব আরম্ভ করেছেন, একেবারে পুরা autocrat—যেন পৃথিবীর সমস্ত জিনিস এবং সময় তাঁর, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই, তা হলেই অতি ভীষণভাবে vigorous agitation আরম্ভ হবে। এই-রকম করে দিনগুলি কেটে যেতে লাগ্‌ল, আমারও ক্রমে নাম হ'তে লাগ্‌ল, ক্রমেই অনেকের কাছে নানা-রকম private কাজ পাওয়া যেতে লাগ্‌ল।

একদিন এই-রকম কাজে একটু দেরী হয়ে গেছে, প্রায় সন্ধ্যা ৭টার সময় বাড়ী ফিরে দেখি যে কাকার ওখান থেকে একজন লোক এসেছে, তখনই যেতে হবে, কাকার বড় অসুখ, আর বাঁচ্‌বার আশা নেই। তখনই কাকার বাড়ী রওনা হলুম। গিয়ে দেখি, তাঁর যে হার্ট-ডিজিজ ছিল সেটা খুব বেড়েছে, ডাক্তারে ত ঘর ভরে গেছে, কল্‌কাতার যত নামজাদা ডাক্তার, সায়েব এবং বাঙ্গালী প্রায় সকলেই এসেছেন, কিন্তু কেউ কিছু কর্‌তে পারেননি, সবাই বলেছেন যে বড় জোর আর ঘণ্টা তিনেক বাঁচ্‌বেন। কিন্তু কাকার দেখ্‌লুম বেশ টন্‌টনে রয়েছে। আমাকে দেখেই কাকা বল্‌লেন, "কিরে অবু এসেছিস! (আমার নাম অবিনাশ) তোর কাকী-মা রইলেন, দেখিস্। আর ঐ ছবিখানা তুই নিস—" সেই আমার আঁকা তাঁর ব্যঙ্গচিত্র।—আর কিছু বল্‌লেন না। রাত্তির দশটার সময় দেহত্যাগ কর্‌লেন। সৎকার করে বাড়ী ফির্‌তে সকাল হ'য়ে গেল।

৪

কাকা আজ প্রায় আড়াই বছর মারা গেছেন। আমি সে ছবিখানা নিয়ে এসেছি, আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অমিতা কিছুতেই ছাড়েনি, সে বল্‌লে কাকার এই শেষ ইচ্ছাটুকু আমাদের পালন করা উচিত, কাজে-কাজেই সেখানা এনে এক জায়গায় টাঙ্গিয়ে রেখেছি; কিন্তু কাকা এই ব্যবহারের মানে বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, আর তাঁর কোন্ কাজেরই বা মানে বুঝেছি! সবই খামখেয়ালী! আরও একটা অদ্ভুত কথা, এত বড় বিষয়ী লোক হয়েও কাকা কিছু উইলপত্র করে যাননি—অন্ততঃ আমরা কেউ জানি না, কাকীমাও না, তাঁর উকীলকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, "উইল কিছু থাক্‌লে কি আর আপনারা জান্‌তেন

না ?" যাক, সেজন্য আমি কিছু চিন্তিত নই, কারণ কাকীমা যতদিন আছেন তাঁর জন্য বিশেষ ভাবনা নেই, আর তিনি থাকতে বিষয়ের কেউ কিছু করতে পারবে না, তার পর তিনি মারা গেলে কি হয় না হয় তা নিয়েও আমার বিশেষ দরকার নেই, কখনই কাকার বিষয়ের লোভ করিনি, এখনও সে প্রবৃত্তি নেই।

একটা খবর দিতে ভুলে গেছি, আমার সেই খুড়তুত ভায়েরা পাঁচ-ছবার এণ্ট্রেন্স ফেল করে আউট হয়েছিলেন, তার পরে একদিন বড় ভাই একটা অস্থানে গিয়ে মারামারি করে মারা পড়েন আর তাঁর ছোট ভাই দু-এক মাস পরেই কাকার নাম জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ ছ'হাজার টাকা বের করে যে কোথায় সরেছেন, তাঁর আর কোন পাত্তাই নেই।

ক্রমে কালের মহিমায় আমরা কাকার কথা প্রায় ভুলে গেছি, কেবল মধ্যে মধ্যে সেই ছবিখানি চোখে পড়ে আর চকিতের মত তাঁর কথা মনে পড়ে, আবার ভুলে যাই। কাকীমার তত্ত্বাবধারণ আমিই করছি, তিনি তাঁদের বাড়ীতেই আছেন, মধ্যে মধ্যে অমিতা গিয়ে তাঁকে দেখে আসে, আমি ত প্রায় রোজই যাই। একদিন তাঁর বাড়ী থেকে ফিরছি, একটু রাত হয়ে গেছে,—গেলে তিনি প্রায় জলটল না খাইয়ে ছাড়তেন না,—দেখি যে অমিতা দরজায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল, ভাবলুম যে বুঝি খুকীর কিছু অসুখ করেছে! তারপর ভাবলুম যে না, তা হ'লে ত অমিতা কাকীমার ওখানে বুচুকে পাঠাতেই পারত! তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকতেই অমিতা বললে, "ওগো, শীগ্‌গির দেখবে এস, খুকী কি বার করেছে!" মেয়েমানুষের এমনি স্বভাব যে, তবু বলবে না যে কি বার করেছে! গিয়ে দেখি যে কাকার ব্যঙ্গচিত্রখানার পিছন-দিকের কাগজটি খুকী বিশেষ যত্ন করে ছিঁড়েছেন এবং তার ভিতর থেকে একখানি কাকার হাতের লেখা বড় চিঠি বেরিয়েছে,—সেটিরও সদ্গতি হচ্ছিল, এমন সময় অমিতা দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়েছে, তাতে খুকীর অত্যন্ত রাগ হয়েছে, তা রাগ হবারই কথা, তিনি অত কষ্ট করে বার করলেন আর যা কেড়ে নিল!

চিঠিখানি দেখলুম আমার নামেই, এবং কাকা নিজের হাতেই তা লিখেছেন। চিঠিখানি পড়ে কাকার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল আর তাঁর সেইসময়ের অদ্ভুত ব্যবহারের মর্ম্ম বুঝতে পারলুম। তিনি যে আমায় অত বকতেন, অত অযত্ন করতেন, সে আমারই জন্য, বুঝতে পারলুম। তিনি যে আমায় অত অযত্ন করতেন, সে আমারই জন্য, সেটা কেবল তাঁর বাইরের মুখস—ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত, আমার প্রতি স্নেহধারা চিরকাল বয়েছে, কিন্তু আমরা কেউ তা জানতে পারিনি। তাঁর দুটি ছেলে আদরে যত্নে বিগড়ে গিয়েছিল; পাছে আমিও সেই-রকম হই সেই ভয়ে তিনি অত কঠোর শাসন করতেন। এইবার বুঝতে পারলুম যে মাসে মাসে সেই যে পঞ্চাশটাকা আসত সে কে দিত! শেষে তিনি লিখেছেন যে আমার প্রতি তিনি যা দুর্ব্যবহার করেছেন তা পরিশোধের জন্য তিনি আমাকেই তাঁর সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করেছেন। তাঁর সেই ছেলে যদি বেঁচে থাকে ত কিছু পাবে না, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসহারা কিছু পাবে, তাও যদি আমি ইচ্ছা করি ত দেবো! আর-সব যাঁরা উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁরা কেউ দু-হাজার কেউ পাঁচ-হাজার এই-রকম করে পনর-হাজার টাকা মাত্র পাবেন। উইল তাঁর উকিল রাধিকা-বাবুর কাছে আছে, এই চিঠি নিয়ে গেলেই তা আমি পাব। এই চিঠি পড়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম, আর এই কষ্ট হতে লাগল যে এতই অধম আমি যে কাকার এই ভালবাসার কোন কিছুই আমি আগে বুঝতে পারিনি। রাত্রেই রাধিকা-বাবুর কাছে গেলুম, অনুযোগ করলুম যে তিনি তো ঘুণাক্ষরেও আমাদের উইলের কথা জানতে দেননি! চিঠি না পেয়ে তো উইলের কথা কেউ তেই পারত না! রাধিকা-বাবু একটু হেসে বললেন, "অবিনাশ, তোমার কাকা আমাকে এটুকু বিশ্বাস করতেন এবং আমাকে তিনি উইলের কথা তোমাদের বলতে বিশেষ করে বারণ করেছিলেন। যদি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে তোমরা কিছু খোঁজ না পাও কিম্বা তারই মধ্যে তোমার কাকীমা মারা যান ত হ'লে যেন আমি উইল প্রকাশ করি, এই তাঁর আদেশ

ছিল। এই নিয়ে যাও তোমার উইল।" এই বলে তিনি একটি গালা-মোহর-করা মোড়ক আমার হাতে দিলেন। আমি নিয়ে তাঁকে নমস্কার করে বাড়ী এসে খুলে দেখলুম যে চিঠিতে যা লেখা আছে উইলেও তাই, তবে নানারকম কায়দা-কানুন করে লেখা এই যা।

তমসকুমার মল্লিক।

ধূমকেতু

১

প্রস্থান প্রবেশেতে চির নব ঢঙ,
সংসার-যাত্রায় আস্‌মানী সঙ।
কোথা হতে কোথা যাও
পৃথিবী চমকি দাও
কাইজার নেপোলিয়ঁ। তৈমুরলঙ।

২

চঞ্চল, চিনিনাক বাসা কতদূর;
দেখি যবে শান্তিতে ধরা ভরপূর—
বহে বায়ু ঝিরঝির,
বাজে সেতারের মিড়,
তুমি ধর সপ্তমে বাজখাঁই সুর।

৩

কুঞ্জেতে এসো তুমি পরি রণসাজ,
শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ত্রিষ্টুভ-মাঝ।
আসি কর প্রশ্ন হে
ভর হৃদি বিস্ময়ে,
গৃহদ্বারে দুর্ব্বাসা ঋষিকুল-রাজ।

৪

উন্মনা পলাতক অদ্ভুত লোক,
বিশ্বের পানে মেলো বিদ্বেষ চোখ।
বন্ধন-বাধাহীন
ব্যোমবাসী বেদুইন,
অনাদি কবির কৃত উদ্ভট শ্লোক।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চিরন্তনী

(৫)

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হইয়াছে। শীতের বেলা ছোট, ঘণ্টা দুই আগেই পথে পথে গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দিনের কর্ম্ম-কোলাহল ক্রমে ডুবাইয়া আনন্দপিপাসী মানুষের দল আনন্দের সন্ধানে নানা পথে ছুটিয়াছে। সারাদিনের নীরস জীবনযাত্রার পর সহরের পুরুষ এই সময়টির আশাতেই তৃষিত চাতকের মত চাহিয়া থাকে। তাহাদের দিনের শ্রান্তি রাত্রের দুশ্চিন্তা ভুলাইবার জন্য কত ব্যবসায়ী কতরকমের আনন্দের বাজার সাজাইয়া রাখিয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জোগাইতেই তাহারা মানুষকে নানা ভাবে ডাক দিতেছে। যে যে-নেশায় মত্ত, সে ক্লিষ্ট হৃদয় জুড়াইতে সেই দিকেই ছুটিয়াছে। উৎসবময়ী রজনী সন্ধ্যায় দুঃখহারিণীর রূপে সাজিয়াছে। এই কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য সে তার পালিত পুত্রদের দুঃখ হইতে মুক্তি দিবে।

মুক্তি নাই কেবল চিরদুঃখিনী দরিদ্রকন্যাদের। সহরের গরীব বাঙালীর মেয়ে নিত্য পরিচিতের আবেষ্টনে নিত্য জাগিয়া উঠে, আদিম মানুষের মত নিত্যই সারাক্ষণ আহারের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। সেই আদিম মানুষটা আজ তাহার মধ্যে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে, তবু সেই আদিমের সেবাই তাহার চিরদিনের জন্য বরণকরা কাজ। উন্নত মানুষের এই আনন্দটুকু মাত্র তার আছে যে সেই নিত্যকার সেবার আয়োজনে নিজের চেয়ে পরের জন্যই সে বেশী ব্যস্ত। একটি ঘরে একই ভাবে মান্ধাতার যুগের চলিত রান্না কয়েকটি সে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া করে, কারণ মাতৃকুল-ক্রমে এইটুকুই তাহার শিক্ষা, এই একটিমাত্র কাজেও তার বৈচিত্র্য নাই। সেই বেড়ি সেই হাঁড়ি, সেই ডাল চচ্চড়ি; খেলার সাথীর সঙ্গে ধূলোবালি লইয়া যাহার অভিনয় সুরু হইয়াছিল, চিরজীবন তাই চলিয়াছে। দিন-শেষে বেলা গড়াইয়া পড়ে, সূর্য্য অস্ত যায়, ধরণীর রূপ বদ্‌লাইয়া যায়, ঘনায়মান অন্ধকারে সৃষ্টিতে কি একটা মহিমা জাগিয়া উঠে, কিন্তু দুঃখিনীদের অন্তরে অন্ধকারই কেবল নিবিড় হইয়া উঠে, তাহার অভিনব সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠে না।

ছুটির পর খাবার খাইয়া সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নানারকম আমোদে কাটাইয়া রণু এইমাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে। নূতন-শেখা কি একটা গানের সুর ও পদ ভুলিয়া যাইবার ভয়ে অরুণা ঘরে বসিয়া ক্রমাগত সেটা আবৃত্তি করিতেছে। ভাত খাইবার ডাক পড়িতেই দুজনে ছুটিয়া নীচে চলিয়া গেল। তাদের দুজনকে খাওয়াইয়া করুণা নিজের ও দাদামশায়ের ভাত ঢাকা দিয়া রাখিল। তিনি তখনও তাঁহার নিত্য সান্ধ্যপর্য্যটন সারিয়া ফেরেন নাই। সকল বাড়ী হাজিরা না দিতে পারিলেও পালা করিয়া সপ্তাহে সমস্ত পরিচিত মণ্ডলীর খবর একবার তাঁহার না লইয়া বিশ্রাম নাই। এই দৈনিক পর্য্যটনটাই ছিল তাঁহার অবসর রঞ্জনের প্রিয় উপায়।

টবে ঘেরা যে ছোট বারাণ্ডাটি অবিনাশের প্রকাণ্ড লালবাড়ীর দিকে মুখ করিয়া পড়িয়াছিল, তারই সাম্নের দরজায় মাদুর পাতিয়া সহস্রবার-পড়া একটা কি গল্পের বই খোলা করিয়া করুণা দাদামশায়ের পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। অরুণা গলা ছাড়িয়া গান সাধিতেছিল, রণু ভূগোল হাতে করিয়া পৃথিবীর যত সাগরের নাম উচ্চকণ্ঠে জপ করিতেছিল। রণুর পাঠের উৎসাহে চীৎকার ক্রমেই বাড়িয়া চড়িতেছিল। অরুণা তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "পড়ার উৎসাহটা অমন সশব্দ না হলেও ত চলে। তোর জ্বালায় মানুষের একটু নিরিবিলিতে গান করবার জো নেই।"

রণু বলিল, "আর তুমি কানের কাছে যত ভুল সুরে গান গাইলেই আমি যেন ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়ে যাব। তোমার গাইতে হবে না, চুপ কর। ভেবেছেন যেন কতই চমৎকার গলা!"

"তোর চেয়ে ত ভাল!"

কলহ বাধিয়া উঠিল। দুজনেই দুজনকে থামাইতে চায়। কিন্তু এ কার্য্যে কার প্রকৃত অধিকার সেটা আর ঠিক হয় না। অরুণা দিদিগিরি ফলাইয়া সুবিধা পাইল না, কারণ যে দিদি ভাইএর পড়ার ব্যাঘাত করে তাহার দাবী অগ্রাহ্য। শেষে ঘর চেয়ার টেবিল লইয়া তর্ক বাধিল। এ বলে আমার ঘর, ও বলে আমার চেয়ার। মহা হুলস্থুল কাণ্ড! করুণাকে শালিস মানিয়াও বিবাদ মিটিল না। রণু রাগিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল—"যাও, চাই না তোমার ঘর।" কিন্তু বেচারা অন্য ঘরই বা পায় কোথায়। অগত্যা দাদামশায়ের ঘরের মেঝেয় গিয়া শুইয়া পড়িল। অরুণার গানের সুর ছুটিয়া গেল। রণুর অভিমানে অপ্রস্তুত হইয়া তাহাকে ঘরে আনিবার জন্য অনেক টানাটানি করিল। কিন্তু না পারিয়া বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টাইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "ওঃ! ভারি নবাব রে! না এলে ত না এলে, কারুর সাধ্যতে দায় পড়েনি।"

অরুণা ঘরে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিছানা পাতিয়া শুইল, মনে মনে রণুর জন্যে দুই-একবার ভাবনা হইলেও মনকে সান্ত্বনা দিল, শীত লাগিলে আপনি উঠিয়া আসিবে। করুণা কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তার ভয় হইল পাছে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ করে। অরুণা শুইয়া পড়িলে অনেক সাধ্যসাধনা, তর্কযুক্তির ফলে সে রণুকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইল।

ভাইবোনের ঝগড়া-বিবাদের শান্তি হইয়া ঘর নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল। ভাড়াটেবাড়ীর আশেপাশের ঘরে ছেলে-ঘুম-পাড়ানী সুর থামিয়া গেল। দিবসান্তে গৃহাগতজনের আনন্দমুখর কলধ্বনি ঘুমে জুড়াইয়া গেল। অরুণার বই পড়ার ছলটা মন আর মানিতে চাহিতেছিল না। বই ফেলিয়া সে বারাণ্ডার রেলিং ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। একটুখানি মানুষ-চলাচলের পথ সেখান দিয়া দেখা যায়, তাও সে কৃপণের দানের মত একটি ফালি মাত্র। বুভুক্ষুর মত করুণা সেইদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দিনের কাজ তাহার শেষ হইয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যা তাহার পরিশ্রমের জন্য কোনো পুরস্কার লইয়া আসে নাই। সন্ধ্যার দানে তৃপ্ত হইয়া যাহারা বিশ্রামের আশায় বাড়ী ফিরিতেছিল, করুণা যেন তাহাদের আনন্দিত মূর্ত্তি হইতে নিজের জন্য দুই-এক কণা আনন্দ কাড়িয়া লইতে চাহিতেছিল। একটি একটি করিয়া পথিক কোন্ অজানা রাজ্য হইতে আসিয়া সেই পথে ক্ষণিকের মত উদিত হয়, আবার কোন্ অজানা লোকের পথে মিলাইয়া যায়। অপরিচিত তাহারা, তাই করুণা আপন মনে তাহাদের পরিচয় সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সঙ্গে কত রাজ্যের পথে ঘাটে প্রাসাদে কুটীরে ঘুরিয়া আসিতেছিল। আপন ইচ্ছামত সে কেরানীর ছেলেকে রাজকন্যার প্রিয়তম করিয়া তুলিয়া তার সুখস্বপ্নে ডুবিয়া

ছিল, আবার প্রেয়সীর পথযাত্রীকে বিরহে পাগল করিয়া তাহার সঙ্গে বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিতেছিল! তাহার নিজের শূন্য মন তখন এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসরকালটা পূর্ণ করিতে চাহিতেছিল, তাই এই মানুষগুলির ছাঁচটুকু তাহাদের কাছে ধার করিয়া সে যেন হাতেগড়া পুতুল দিয়া নিজের সাধ মিটাইতে চাহিতেছিল।

চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি যখন ক্লান্ত হইয়া আসিল, করুণা শ্রান্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল। এখনও বিশ্রাম পাইবার অবসর হয় নাই। নিষ্কর্মা হাত পা আর মন লইয়া আর কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়? করুণা তারিণীর পদধ্বনির আশায় ক্রমে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। এমনি প্রতিদিনই হয়, তবু প্রতিদিনই সে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এ বাড়ীর সকলেরই পায়ের শব্দ তার চেনা। কিন্তু এ যেন আর-কেউ। বৃদ্ধের শিথিল গতির শব্দ এ নয়। বলিষ্ঠ পুরুষের দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ। করুণা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এত রাত পর্য্যন্ত দরজা খোলা থাকে, না জানি কে আসিয়া ঢুকিল। সাম্‌নের দরজায় কট্ কট্ করিয়া কড়া নড়িয়া উঠিল। করুণা ছুটিয়া গিয়া দেখিল—দরজায় দাঁড়াইয়া অবিনাশ! সে বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, "একি, এত রাত্রে আপনি যে!"

অবিনাশ বলিল, "দিনের কাজের ভীড়ে সময় হয়নি, এই একটু আগে একটা 'কল' সেরে ফির্‌লাম, তাই এখন শতদলের চিঠিটা দিতে এলাম। সে তোমাদের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছে।"

"ও মা, তা আপনি নিজে না এলে কি চল্‌ত না? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই ত হত।"

অবিনাশ বলিল, "আমি নিজে বল্‌তে এলাম, তুমি যেন যাও।"

করুণা চিঠি খুলিয়া দেখিল তাহাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ। শতদল বিশেষ করিয়া প্রত্যেককে যাইতে লিখিয়াছে, কারুর কাছে ভদ্রতার এতটুকু ত্রুটি করে নাই। কিন্তু অবিনাশের এ কি-রকম কথা! সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া করুণাকে যাইতে বলিতে আসিয়াছে। নাম করিয়া আর একজনের কথাও বলিল না। এ-রকম শিষ্টাচারে তাহার প্রতি টান দেখানো হইলেও, করুণার মনের কোণে একটু যেন অপমানের ঘা লাগিল। কেন, আর-সকলে কিসে এত তুচ্ছ হইল? অবিনাশের চোখে যাহাকে ভাল লাগিয়াছে, তাহার পরিজনকে অবহেলা করাতে সে নিজ সৌভাগ্যে হৃষ্ট হইয়া উঠিল না। করুণা বলিল, "শতদল ত সকলকেই যেতে বলেছেন, আমার বিশেষ করে না যাবার আশঙ্কা ত কিছু নেই।"

অবিনাশ সকলের কথাটা কানে না তুলিয়া তাহার অভ্যাস-মত জোর দিয়া বলিল, "আমি চাই যে তুমি যাও!" আগ্রহের অনুরোধটা যেন হুকুমের মত শুনাইল। ধরণটা করুণার ভালো না লাগিলেও সে বুঝিল এর চেয়ে সরস অনুরোধ করিতে এত বয়সেও অবিনাশ শিখে নাই। "হ্যাঁ, সবাই গেলেই আমিও যাব। শতদলকে বল্‌বেন, তার নিমন্ত্রণে খুব খুসী হলাম। আমরা যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব।" এই কথা বলিয়া করুণা বিদায় লইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু করুণার জন্যই শতদলকে দিয়া যে নিমন্ত্রণ করাইয়াছে, উপলক্ষ্যের কাছে এ নিবেদনটাতে সে খুসী হইতে পারিল না। অবিনাশ অপ্রসন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন মানুষ এমন ভাবে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিলে করুণা ভিতরে যায় কি করিয়া? কিন্তু তাহার মন বলিতেছিল, অবিনাশের এখন যাওয়া উচিত। অবিনাশ নড়ে না দেখিয়া করুণা জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যি, এত রাত্রে আমাদের জন্যে আপনাকে মিছামিছি এতটা কষ্ট কর্‌তে হল। কিচ্ছু দর্‌কার ছিল না! যে-কেউ আস্‌লেই চল্‌ত।"

অবিনাশ বলিল, "তার জায়গায় আমার কষ্ট স্বীকার করাটার কি কোনো বিশেষ মূল্য নেই?"

করুণা এ-রকম উত্তর আশা করে নাই। সে ভাবিয়াছিল ভদ্রতার কোনো একটা বাঁধিগৎ বলিয়াই সে সারিবে। কিন্তু এ ত আর-একটু বেশী অন্তরঙ্গের কথা! করুণা তবু গায়ে না মাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের জন্যে আপনি এতটা কর্‌লেন, আর আমি কি অকৃতজ্ঞের মত সেদিকে তাকাব না? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

অবিনাশ করুণার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ধন্যবাদ আমি চাই না। কোনো দর্‌কার নেই।

আমি যা চাই সেইটুকুই আমার জন্যে করতে পার ত কোরো।"

করুণা বলিল, "আপনি খুব খাঁটি অতিথিপরায়ণ। ধন্যবাদেরও অপেক্ষা রাখেন না। আচ্ছা তাই ভাল। আপনার ইচ্ছামত সকলে মিলে খুব খেয়ে আসা যাবে।"

তারিণীকান্তের পায়ের শব্দ শোনা গেল। অবিনাশ তাড়াতাড়ি একবার বলিল, "তুমি যেও নিশ্চয়।"

তারিণীকান্ত উপরে উঠিয়াই বলিলেন, "কে? ও! আমাদের অবিনাশ! বেশ বেশ, এস বসবে এস। করুণা, বসতে জায়গা দাও।"

এখন যে বসিবার সময় নয় সেটা দাদামশায়কে অতিথির সামনে স্মরণ করাইয়া দেওয়া শক্ত। করুণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্যা পূরণ অবিনাশই করিল। সে এতক্ষণ নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখায় নাই, এইবার সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিয়া গেল, "না, আর বসবার সময় নেই। শতদল আপনাদের নেমন্তন্ন করেছে, তাই চিঠি দিতে এসেছিলাম। আপনারা যাবেন।" সিঁড়ির শেষ ধাপে কথাটা শেষ হইল। তারিণী শুনিলেন কি না সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অবিনাশ বাড়ী চলিয়া গেল। তারিণীও সে বিষয়ে উৎকণ্ঠা মাত্র না প্রকাশ করিয়া খাওয়া-শোওয়ার আয়োজনে লাগিয়া গেলেন।

বুধবার সকালে শতদলের নিমন্ত্রণলিপি দেখিয়া অরুণা ও রণু আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল। কলিকাতা সহরে বড়লোকের ছেলেমেয়েরা এই অফুরন্ত নিমন্ত্রণের স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খায়, তাই নূতন একটা দেখিলে টানের কোনো বিশেষ কারণ না থাকিলে তারা ভদ্রতার এই উৎপীড়নে বিরক্তই হইয়া উঠে। কিন্তু যাদের ভাগ্যে এরকম সাদর আহ্বান কচিৎ কদাচিৎ ঘটে তারা এইসব এক-একটি দিনকে জীবনের এক-একটি স্মরণীয় উৎসবের মধ্যে সযত্নে বরণ করিয়া রাখে। রণু খুসী হইল অনেক দিন পরে মনোমত আহার্য্য প্রাণ ভরিয়া খাইতে পারিবে বলিয়া; অরুণা খুসী হইল ধনীগৃহের অভ্যাগতরূপে কত বিশিষ্ট লোকের সামনে নিজের সুকণ্ঠ শুনাইয়া, সুন্দর মুখখানা দেখাইয়া এবং আরো অনেক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া মনে মনে একটু আনন্দ ও গর্ব্ব লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু ইস্কুলের হুড়োহুড়ির দিনে মনের আনন্দকে মনে মনে তোলা দিয়া উপভোগ করিবারও সময় থাকে না। তাই নিমন্ত্রণের কথাটা সেদিনকার মত মনের এক কোনে গপা দিয়া কাজের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হইল।

বৃহস্পতিবার ছুটি। ঢিলা হাতে কাজ করিতে করিতে করুণা মাঝে মাঝে দোতলার ঘরের লম্বাছের রোদে পিঠ দিয়া বসিতেছিল। অরুণা কি একটা জিনিষের সন্ধানে ঘরের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দিদিকে দেখিয়া বলিল, "দিদি, ইস্কুলের লটারীতে তুমি যে জার্মান-মুক্তোর মালাটা পেয়েছিলে, সেটা কোথায় গেল?"

করুণা বলিল, "সেটা ত কোন্‌কালে সৈলজার খোকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তা দিয়ে কি করবি?"

অরুণা গালে হাত দিয়া বলিল, "যা গো, তুমি যা হোক মেয়ে? কি বলে অমন সুন্দর জিনিষটা নষ্ট করলে? আমি কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করলাম মাথা ঘষে সেই মালাটা দিয়ে চুল আটকে শতদলদির বাড়ী যাব! তুমি আমার সব প্ল্যান মাটি করে দিলে?"

করুণা বলিল, "ভারি ত ঝুঁটো মুক্তো।"

অরুণা বলিল, "আহা কে বুঝত ত! আমি কি লোককে ডেকে তার ইতিহাস বলতে বসতাম?"

করুণা বলিল, "না বললেও পঁচিশ টাকা পেন্‌শনের কেরানীর নাতনী যে গজমোতির মালা পরে না, তা সবাই জানে। সেটা গেছে ভালই, লোকে হাসত বই ত আর কিছু লাভ হত না।"

অরুণা বিরক্ত হইয়া বলিল, "দাও চাবিটা, দেখি পরে যাবার মত একটাও ছেঁড়া ন্যাকড়া আছে কি না। ওরা অত বড়লোক, ওদের বাড়ী কি করে যে পেন্নী সেজে যাব মনে করে আমার কান্না পাচ্ছে।"

উৎসবোচিত কোনো পরিচ্ছদই বোনকে দিতে পারিবে না মনে করিয়া করুণার দুঃখ হইতেছিল, তবু সে অরুণাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, "নাই বা থাকল তোর? বড়লোক ওরাই, আমরা ত নয়, আমাদের ছেঁড়া ময়লার লজ্জা নেই।"

তত্ত্বকথায় অরুণার মন প্রবোধ মানিল না। বাক্স হাৎড়াইয়া একটা সস্তারকম জালের মত ছুতা বাড়ী মাত্র আবিষ্কার করিয়া সে জলভরা বড় বড় চোখ নীচু করিয়া

বসিয়া রহিল। ঘণ্টা দুই পরে করুণা আসিয়া তাহাকে বিষণ্ণ-মুখে একটা বই হাতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "অরু, দাদামশায়ের খাবার করে রাখ্‌তে হবে, ভুলে গেছিস্? বাড়ীর কাজ না সেরে যাব কি করে?"

অরুণা মুখ না তুলিয়াই ঝাঁঝিয়া বলিল, "আমি কাজ কর্‌ব এখন। আমি নেমন্তন্নে যাব না। তুমি যেও।"

করুণা বলিল, "সে কি রে? এই না সাজসজ্জার ফর্দ্দ কর্‌ছিলি কাল রাত থেকে? এরি মধ্যে কি হল?"

অরুণার রুদ্ধ শোক কথার ফাঁকে চোখ ছাপাইয়া উঠিল। চোখের জলে অবরুদ্ধ গলায় ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, মেথরাণীর মত আধখানা কাপড় ত সম্বল, তারির ভাবনা রাত থেকে ভাব্‌তে কারুর দায় পড়েনি। আমার মাথা ধরেছে, শরীর ভাল লাগ্‌ছে না, আমি যেতে পার্‌ব না, তুমি বলে দিও।"

শরীর ভাল নয় বলিয়া ঘরের সব কাজ করিতে পারিবে, নিমন্ত্রণে যাইবে না, এ রোগটা যে কি বুঝিতে করুণার বিলম্ব হইল না। আহা বেচারী ছেলেমানুষ, কাল এত উৎসাহ করিয়াছিল, কিন্তু আজ দারিদ্র্যের অপমান মাথায় তুলিয়া যাইতে পা সরিতেছে না। উপদেশ দেওয়া বৃথা! করুণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাদামশায়ের ঘরে চলিয়া গেল।

ছোট একটা টিনের বাক্সের সকলের নীচে সযত্নে কাগজে মোড়া ছিল একটি রংচটা ফিকা গোলাপী বোম্বাই শাড়ী। তাহার গায়ে মাঝে মাঝে পোকাকাটার দাগ। করুণার মা স্বামীর ঘরে পা দিয়া এইটি প্রথম উপহার পাইয়াছিলেন। পিতামাতার স্মৃতিজড়িত এই চিহ্ন-টুকু তাঁহাদের কন্যা কত যত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রাণ ধরিয়া ব্যবহার করিতে কোনো দিন পারে নাই। কিন্তু আজ করুণার অশ্রুভারাক্রান্ত মুখ তাহাকে টলাইল। বাড়ীর সেই একটিমাত্র মূল্যবান পরিচ্ছদ তাহার স্মৃতিতে মূল্য আরো বাড়াইয়াছিল। কাপড়খানা হাতে করিয়া অরুণার কাছে গিয়া সে বলিল, "অরু, বাড়ীতে কোণের মধ্যে একা একা বসে থাক্‌লে মাথা আরো ধর্‌বে, তুই চল্ ও-বাড়ী, মস্ত খোলা ময়দানে বেড়ালে মাথা ছেড়ে যাবে। আর হ্যাঁ, ও-ঘরের বাক্সটা খুলে মায়ের এই কাপড়খানা দেখ্‌ছিলাম, তোকে এটা বেশ মানায় বোধ হয়, দেখ্ ত।"

অরুণার মাথাধরা ছাড়িয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "এখন ইচ্ছে কর্‌ছে না, যাবার সময় একেবারে পর্‌ব এখন।" করুণা নীচে চলিয়া যাইতেই কিন্তু কাপড়টা সে একবার গায়ে জড়াইয়া হাতে ফেলিয়া ছোট্ট আয়নাটার সাহায্যেই তাহার রূপের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইল।

ঘরের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। মুক্তার মালার বিরহে আর জম্‌কালো কাপড়ের অভাবে অরুণার স্নান ও মাথা ঘসা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ওই জীর্ণ বোম্বাই শাড়ীর পাটে পাটে কি হাসি ছড়ানো ছিল জানি না, তাহার দর্শন স্পর্শনেই অরুণার মনের আঁধার কাটিয়া গেল। তাহার নিমন্ত্রণ যাত্রার উৎসাহ আবার বাড়িয়া উঠিল। সে করুণাকে বলিল, "স্নান না করে লোকের বাড়ী গেলে তারা বল্‌বে কি? আমি গাটা অন্ততঃ ধুয়ে আসি, চুলে পাউডার ঘস্‌লেই বেশ ফুল্‌বে। শৈলজাদিদির অনেক আছে, আমায় দেবে বলেছে।"

করুণা হাসিয়া বলিল, "স্নানে কাজ নেই, হাত পা ধুয়ে আয়, শীতকালে ওই ঢের।"

ফুলেল তেল, গোলাপজল, এসেন্স কি আর কোনো সুগন্ধি ছিল না, অলঙ্কারও বাড়ী খুঁজিলে মিলিত না। তবু হাতের যত্নে যতটা হয় করুণা অরুণার বেশভূষা প্রসাধনে ততটা সাহায্য করিল। অরুণা দিদির অলক্ষ্যে কখন শৈলজার পাউডার ও সুধার অগুরুর একটু সদ্ব্যবহার করিয়া আসিল সস্তার বাহারে-জিনিষ পরিতে করুণার কেমন একটু বাধ-বাধ ঠেকিত। তাই উপরি-চটক্‌দার ডুরে শাড়ীখানা না পরিয়া সে একখানা সাধারণ ধোয়া কালাপেড়ে শাড়ী আর নিজের হাতের তৈরি একটা হাতকাটা কালো আলপাকার জামা পরিয়াই উৎসবসজ্জা শেষ করিল। অরুণার কালো ঘন চুলের রাশ একটা সোনালী জরির ফিতার খোপার চারিপাশ দিয়া ছড়ানো ছিল। করুণা তাহার লম্বা পাৎলা চুল জড়াইয়া খোঁপা করিয়া রাখিয়াছিল।

রণু আসিয়া তাড়া দিল, "শীগ্‌গীর কর, শীগ্‌গীর কর, তোমরা কেবল সাজ্‌বে আর দেরী কর্‌বে, এদিকে আমার ভোজ মাটি হোক্।"

হঠাৎ কে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "না, না, ভোজ

মাটি হবে কেন? যথেষ্ট আয়োজন আছে। তুমি খেয়ে কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়।"

করুণা চম্‌কিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল নিমন্ত্রণকর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অরুণা অবিনাশের মেজাজটা একটু মোলায়েম বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "আমাদের বোধ হয় ভুল হয়েছে। আপনার বাড়ী আমাদের নেমন্তন্ন কি আমাদের বাড়ী আপনার নেমন্তন্ন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ত।"

অরুণার কথার উত্তরে করুণার মুখের দিকে চাহিয়া অবিনাশ বলিল, "আমি একটা কোথাকার কে; তোমাদের মত বড়লোকের সুনজর এমন একটা তুচ্ছ লোকের উপর পড়্‌লে ত ধন্য হয়ে যেতাম!"

করুণার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। এ-রকম উত্তরে তাহার কোন্‌খানে যে ঘা লাগিল, অবিনাশ সেটা মোটেই বুঝিল না। করুণার রক্তাভ মুখের চেহারা দেখিয়া সে খুসী হইয়াই উঠিল। কিন্তু অরুণা ঠাট্টার সুরে বলিয়া উঠিল, "না, ঠিক বলেছেন এইবার, আমাদের এই রাজপ্রাসাদে স্বয়ং কুবেরকেই মানায় না, আর আপনাকে কি বল্‌ব? এত ঐশ্বর্য্য আপনি কখনও দেখেননি বোধ হয়।"

অবিনাশ লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, না, তা বল্‌ছি না; টাকাতেই কি আর বড়লোক হয়।" নিজের ভুলটা ঢাকা দিবার জন্য অন্য কথা পাড়িবার ছলে সে বলিল, "আর দেরী কেন? বেশভূষা সেরে এস। আমি গাড়ী এনেছি।"

করুণা বলিল, "আমাদের মত বড়লোকে এর চেয়ে বেশী বেশভূষা করে না, আর এইটুকু পথ গাড়ী চড়ে যাওয়ার অভ্যাসও আমাদের নেই। আপনি বৃথা কষ্ট কর্‌লেন।"

অবিনাশ বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া কথা খুঁজিয়া পাইল না। খানিক ভাবিয়া বলিল, "গাড়ীটা যখন আনাই হয়েছে তখন আর কেন ফেরানো!"

(৬)

মোটরগাড়ী হুস্ করিয়া এক মিনিটের মধ্যেই অবিনাশের গেটে আসিয়া ঢুকিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই অরুণা একবার চারিধারে উৎসুক ও আনন্দিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিয়া লইল, তাহার এ উচ্চাসনটা কেউ হিংসাদীপ্ত চোখে চাহিয়া দেখিল কি না। প্রতিবার জান্‌লায় শৈলজার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া সে খুসী হইয়া গেল। রণু চালকের পাশে বসিয়া চাকার উপর হাত রাখিয়া জীবনটা যেন ধন্য করিয়া লইল। তারি মধ্যে একবার চীৎকার করিয়া বলিয়া লইল, "কালীবাবু, আপনার মত গাড়ী চালাতে আমায় শিখিয়ে দেবেন! উঃ আপনার কি মজা!" কেবল করুণা মাথাটা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে মানুষের মনে যেমন লজ্জা হয়, শৈলজা-সুধাদের চোখের উপর দিয়া নিঃস্পর্কীয় এই টুকু ঐশ্বর্য্য ভোগেও তাহার কতকটা সেই রকম লজ্জা করিতেছিল। ইচ্ছা করিতেছিল প্রকাণ্ড ঘোম্‌টা টানিয়া মুখখানা ঢাকিয়া ফেলে।

দুইসারি পাতাবাহারের গাছের ভিতর দিয়া মার্ব্বেল-পাথরের চওড়া সিঁড়ির পাশে মাধবীলতায় আচ্ছন্ন গাড়ী-বারাণ্ডার তলায় আসিয়া তাহারা নামিল। মাথার উপর বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড় নিমেষের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। সাম্‌নের বারাণ্ডার প্রকাণ্ড দুইটি গোল থামের গায়ের নানা রঙের পাথর-বসানো নক্‌সাগুলি আলোর স্পর্শে নি-মাণিক্যের মত জ্বল্‌জ্বল করিয়া উঠিল। তক্‌মাপরা দাড়িওয়ালা মুসলমান দারোয়ান লম্বা সেলাম ঠুকিয়া নত হইয়া সিঁড়ির দিকে হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইল। কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে রণু আরো নূতন নূতন সম্পদ ও সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবার আশায় এদিক-ওদিক কাচের দরজার ভিতর দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ছেলেমানুষীটা অভদ্রতা ভাবিয়া অরুণা চোখ রাঙাইয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। পাছে লোকে মনে করে এমন জিনিষ তাহারা আর-কখনও দেখে নাই, এই ভয়টাও অরুণার মনে ছিল।

সিঁড়ি বাহিয়া বারাণ্ডায় উঠিয়া সেখান হইতে অবিনাশের সঙ্গে তাহারা দোতলায় উঠিবার কার্পেট-পাতা কাঠের সিঁড়িতে আসিয়া পড়িল। রণু চাপাগলায় অরুণকে বলিল, "দিদিভাই, অমন সুন্দর নতুন কার্পেটের ওপর জুতো পায়ে দিয়ে যাবে?"

অরুণা ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া বলিল, "চুপ।"

শুভ্রবেশে শতদল দরজার কাছে অভ্যর্থনা করিতে

দাঁড়াইয়া ছিল। করুণাদের ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি হাত চাপিয়া ধরিল। লাল কাগজের ফুলের ভিতর দিয়া বিজলীর আলো আবীরের মত সকলের গায়ে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। করুণার বর্ণলেশশূন্য শুভ্র রংও ঐ আলোতে রঙীন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অবিনাশ এতগুলো লোকের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া করুণার এই নূতন সৌন্দর্য্যের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া ছিল। ঘরের অন্যান্য অভ্যাগতরা করুণা ও অবিনাশের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া লইল। অবিনাশ তাহাদের দৃষ্টির বিদ্রূপকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলেও করুণা সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সে শতদলের আগে-আগেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ঘরের মানুষগুলির বেশবিন্যাস সুশোভন, সুচিক্কণ, তাহাতে অভাবের কোনো চিহ্ন নাই। যেখানে যেটুকু চাই, সমস্তই আছে। অর্থের অনাটনে তাহাদের শ্রীহীন করে নাই, যত্নের অভাবে তাহাতে একটি মলিন রেখা পড়ে নাই, সময়ের স্রোতে তাহার চাকচিক্য ম্লান হইয়া যায় নাই। মেয়েদের অলঙ্কারের মধুর শিঞ্জনে আর পোষাকের বিচিত্র রঙে ঘরখানা মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গৃহসজ্জার আড়ম্বরের কাছে প্রসাধনভূয়িষ্ঠাদের শোভা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড ঘরের চারিকোণে চারিটি মেহগনির আধারের উপর গ্রীক দেবীদের মূর্ত্তি। ঘরের মাঝখানে চন্দন-কাঠের দীপাধারের উপর জাপানী বৌদ্ধমন্দির বিদ্যুৎশিখা বুকে ধরিয়া স্থির হইয়া আছে। শীতের দিনেও রূপার ফুলদানিগুলি ফুলের রাশিতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফুলগুলি বিদেশী ক্রিসান্থিমাম। ঘরের সামনের দরজায় পিতলের আংটায় দুইধারে দুইটা মক্‌মলের পর্‌দা দুলিতেছে, অতিথিদের ঘরে ঢুকিতে পাছে অসুবিধা হয় তাই ঘন সবুজ রেশমের বোনা দড়ি দিয়া দুইপাশে সেগুলি আটকানো। দড়ির আগায় জরির ভারী ভারী থোপ্‌না দুলিতেছে। দেয়ালে কাল কাঠের ফ্রেমে বড় বড় চারখানা ছবি। শিল্পীশ্রেষ্ঠ র‍্যাফেলের অমর কীর্ত্তি। ঢুকিবার দরজার ও তাহার মুখোমুখি দরজার উপরে দুইটা ঝিনুকের কাজকরা ডিম্বাকৃতি আয়না। চিম্‌নীর তাকের উপর বিলাতী সুন্দরীদের প্রতিকৃতি চাম্‌ড়ার গদি আঁটা বড় বড় সোফা, গুরু কাপড়ে মোড়া। একটা মার্ব্বেল-পাথরের টেবিলে সোনালী কাজকরা বড় বড় অ্যাল্‌বাম সাজানো। তা ছাড়া দামী চেয়ার, মস্ত বড় পিয়ানো প্রভৃতি বিদেশী কেতার সব-রকম আস্‌বাবই নিজ নিজ রূপের দিকে অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। ঘরের সজ্জা কি অতিথিদের বেশভূষা ভাবভঙ্গী কোথাও দীনতার লেশমাত্র নাই। পার্থিব মহিমায় সমস্ত উজ্জ্বল।

এই দরিদ্রের সন্তানগুলির চোখ এত আড়ম্বরের উপর আর কখনও পড়ে নাই। তাহাদের দৃষ্টি যেন ঝল্‌সাইয়া যাইতেছিল। এমন জায়গায় স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করিতেও তাহাদের বাধ-বাধ বোধ হইতেছিল। তিন ভাইবোনে আড়ষ্ট হইয়া এককোণে দাঁড়াইয়া রহিল। অবিনাশ ও শতদল দুইধার হইতে দুইজন ছুটিয়া আসিল। কিন্তু করুণা দেখিল শতদলের দশাও প্রায় তাহাদেরই মত। এই বাড়ীতে বাস হইলেও এইসব মানুষের মধ্যে সে করুণার চেয়েও অনেক কম পড়িয়াছে। সে লোকজনকে ডাকিয়া বসাইতেও যেন লজ্জা পাইতেছে। তার এ-রকম জড়সড় ভাব দেখিয়া অবিনাশ রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "আঃ শতদল! তুমি কি মানুষকে বস্‌তে বল্‌তেও জান না? করুণা, এই যে এস, এদিকে বস্‌বে এস।"

করুণা শতদলের দিকে একবার চাহিয়া একটু সঙ্কুচিত ভাবেই অবিনাশের পিছন-পিছন চলিল। শতদল মামার তাড়ায় অরুণা ও রণুকে লইয়া সাম্‌নের সোফাটাতেই বসাইয়া দিল; সোফার একধারে ঘন সবুজ রেশমের পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা যে সুন্দরীটি বসিয়া পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট নব্য ব্যারিষ্টারের পূজার ছুটি যাপনের একঘেয়ে বর্ণনা উদ্‌গ্রীব হইয়া এই দশম কি একাদশ বার শুনিতেছিলেন এবং সবে এই অষ্টমবার তাঁর ভ্রমণপ্রীতির একটি মাত্র পরিচয় দিয়া ব্যারিষ্টার-মহাশয়কে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছেন, এই দুটি বালকবালিকার মুগ্ধ ও ক্ষুধিত দৃষ্টির দৈন্য আর শ্রীহীন সজ্জার লজ্জায় পীড়িত হইয়া তিনি অবজ্ঞাভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কলটেপা পুতুলের মত ব্যারিষ্টার-সাহেব তড়াক করিয়া উঠিয়া নিজের পাশে আর-একখানা শূন্য চেয়ার টানিয়া আনিয়া হাজির করিলেন।

সুন্দরীর দৃষ্টি তখন ঘুরিয়া অবিনাশ ও করুণার যুগল মূর্ত্তির উপর গিয়া পড়িয়াছে। ওই নিরাভরণার আরক্ত মুখের লজ্জানম্র নতদৃষ্টির মধ্যে কি ছিল বলা যায় না, যাহাতে অবিনাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া কথার স্রোতে আর হাতের টীতে সেই দৃষ্টিটুকু নিজের দিকে আকর্ষণ করিবার অত সুস্পষ্ট চেষ্টা করিতেছিল; যাহাতে এই সুসজ্জিতার অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টি জ্বালাময় হইয়া উঠিল, এবং নবীন ব্যারিষ্টারের মুখে চোখে কৌতুক ফুটিয়া উঠিল। ব্যারিষ্টার সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিনীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ঘরের চারিপাশ হইতে জোড়া জোড়া চোখ সেই দিকেই ফিরিল। তরুণ-তরুণীদের গুঞ্জনের সুর তার-ছেঁড়া এস্‌রাজের গানের মত হঠাৎ খাপ্‌ছাড়া ভাবে থামিয়া গেল। সকলেই বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল সুরভঙ্গের জন্য দায়ী যাহাকে বোধ হইতেছে তাহার বেশভূষা ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তা কিছুই এমন একটা চমক্ দিবার স্পর্দ্ধা রাখে না। তাই তাহাদের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল, জিজ্ঞাসুদৃষ্টি উত্তর না পাইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। পুরুষ-মহলে কোথাও আনন্দ, কোথাও কৌতুক ফুটিয়া উঠিল; রমণী-মহলে ঘৃণা হিংসা অবজ্ঞা বেদনা আনন্দ, নানাবকম ভাবের ছবিই দেখা গেল।

ঘরের যে কোণের যে আসনে যেমন ভাবে করুণা বসিয়া ছিল, তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন করিতেও তাহার হাত পা বাধা দিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই যে নূতন লোকে আজ সে প্রথম পা দিয়াছে, এখানকার আইনকানুন, সমস্তই ত তাহার অজানা। কিন্তু আইন যে অজ্ঞকে ক্ষমা করে না, একথাও সে জানিত। তাই প্রতি পলে তাহার ভয় হইতেছিল, কখন্ না জানি সে অজ্ঞাতে কোন্ গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিবে। এমনি জড়ের মত বসিয়া থাকাটাও যে এখানকার রীতির ঠিক অনুযায়ী নয়, তা ত সে ঘরে পা দিয়াই বুঝিয়াছিল, এবং এখনও বুঝিতেছে যে তাহার অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচয় ক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়া সকলকে তাহারই দিকে টানিতেছে। কিন্তু এতজনের দৃষ্টির সমালোচনার বিষয় হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও মুক্তির উপায় যে তাহার জানা নাই। কাজেই এ দ্বন্দ্বের মীমাংসায় মনকে লাগাইয়া বাহিরে সে কেবল লজ্জায় ক্রমেই রাঙা হইয়া উঠিতেছিল।

করুণাকে নিশ্চল নির্ব্বাক দেখিয়া অবিনাশ তাহার মনস্তুষ্টির জন্য নিজের কথার পুঁজি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল, ঘরের আভরণের মধ্যে যা-কিছুর কোনো বিশেষত্ব ছিল, একে একে সমস্তই করুণার কোলে কাছে আনিয়া জড়ো করিল, শীতের দিনেও তাহাকে রঙ্গ দেখিয়া বেয়ারাকে দিয়া চার-পাঁচবার সরবৎ আনাইল যা-কিছু করিবার সব করিল, কেবল অতিথিবর্গের দিকে নাহিয়া তাহাদের ক্ষণিক সেবার ছলেও করুণাকে মুক্তি দিল না কিম্বা তাহার প্রকৃত অস্বস্তির কারণের দিকে নজর দিল না।

অবিনাশের বন্ধু যতীন্দ্র একে একে সমস্ত অভ্যাগতের সঙ্গসুখে ক্লান্ত হইয়া অবিনাশের চেয়ারের সম্মুখে স্তূপীকৃত পিতল ও পাথরের গৃহসজ্জা, আর নানা কালের ছবির রাশি ঠেলিয়া আসিয়া ঠিক তার মুখের কাছে দাঁড়াইল। অবিনাশ চকিতের মত একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "ওঃ যতীন! তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল বটে। তা এখন বোধ হয় তোমার সময় হবে না আচ্ছা, পরে দেখা যাবে, কি বল?"

যতীন উত্তর দিবার আগেই পিতলের বুদ্ধমূর্ত্তি দেখাইয়া অবিনাশ করুণাকে বলিল, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম—এই মূর্ত্তিটা! ওঃ হ্যাঁ, দার্জ্জিলিং-পাহাড়ে এই ছুটিতে Curio Hunting করতে—"

যতীন হাসিয়া অবিনাশের পিঠে এক ঘা দিয়া বলিল, "নিজের সম্বন্ধে পরকে ভাববার অবসর তুমি কোনো কালেই দাও না জানি, কিন্তু এখন যে দেখছি আমাদের হয়েও সব আগেই ভেবে রাখ। আমার সম্ব্রে যে এখন হওয়া উচিত নয়, তা কি আর আমি বুঝি না। তবে সেটা আমায় বলতে দিলেই পারতে। আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, আমি অবিনাশের বন্ধু—" বলিয়া কথার শেষে সে করুণাকে একটা লম্বা নমস্কার করিল।

অবিনাশ, "আচ্ছা, কালই তাহলে কথাটা হবে," বলিয়া যতীন ও করুণার পরিচয় পরস্পরকে জানাইয়া দিল। ঘরে আসিয়া এতক্ষণে অবিনাশ ছাড়া দ্বিতীয় এক ব্যক্তির পরিচয় সে প্রথম পাইল। যতীন বলিল, "দেখুন, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমার বন্ধুবরের মানুষের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান

তাতে এই দীর্ঘকাল যে আপনার খুব আনন্দে কেটেছে তা আমার মনে হয় না। তবে ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। তা ছাড়া তার অন্তরের সম্পদ আমাদের মত বাজে লোকের জন্ত খরচ না করে সে যে আপনাদের মত গুণীর সম্বর্দ্ধনায় ব্যয় করেছে, এটা তার বুদ্ধির পরিচয়ও বলতে হবে। আমাদের সে এক কথাতেই বিদায় নিতে বাধ্য করে; কিন্তু আপনাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে একবারও নড়তে দ্যায়নি। আপনার বোধ হয় এতক্ষণে পা ধরে গেছে।"

অবিনাশের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়া ফেলিলেও যে ঈপ্সিত জিনিষটি আজ তাহার পাওয়া শক্ত হইত, যতীনের দুটো একটা নিতান্ত মামুলি খেলো রসিকতাতেই তাহার ফল ফলিতে চলিল, দেখিয়া অবিনাশ মোটেই খুসী হয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া মস্তিষ্ককে দস্তুরমত খোঁচা দিয়া কত নূতন নূতন বিদ্যার পরিচয় সে দিল, কত কষ্টে শেখা কথার আবৃত্তি করিল, কত দেশ-বিদেশের বর্ণনা শুনাইল, কত ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল ছবি তাহার চোখের কাছে ধরিল, কত ভবিষ্যৎ বিনোদনের প্রতিশ্রুতি করিল, তবু করুণা ভাল করিয়া ঘাড় তুলিয়া চাহিল না, কথা যা বলিল, তাও সংক্ষিপ্ত তিন অক্ষরের বেশী বড় নয়। আর যতীনের দুটো হাতুড়ে-পাওয়া ফাঁকা কথাতেই কিনা সে হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, জড়ভরতের মত অনেকক্ষণ একজায়গায় হাঁ করে বসে আছি বটে। আপনারা বোধ হয় আমার আদব-কায়দার জ্ঞান দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আর অবিনাশ-বাবুও আমার বোকামির জ্বালায় সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে আমায় গাল দিচ্ছেন।"

অনভ্যস্ত জায়গায় আসার প্রথম সঙ্কোচের উপর স্বয়ং গৃহকর্ত্তার সমস্ত মনোযোগটা হরণ করার লজ্জা করুণাকে এতক্ষণ পীড়া দিতেছিল। সেই যেন অবিনাশের এই কর্ত্তব্যে ত্রুটির জন্ত দায়ী এই-রকম একটা কথা এতক্ষণ তাহার মনে ঘুরিতেছিল। অবিনাশের যে একাগ্র মনোযোগটা আজ সকলের মধ্যে ছড়াইয়া যাওয়া উচিত ছিল, সেটা এতক্ষণ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া, করুণা নিজগুণে মুগ্ধ কিম্বা অবিনাশের অনুচিত আচরণে তাহার প্রতি বিরক্ত বিশেষ হয় নাই, কিন্তু হইয়াছিল নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত আর উপেক্ষিত অতিথি-দের গুপ্ত আঘাতে পীড়িত। তাই এতক্ষণ পরে একজন সম্পূর্ণ বাহিরের লোকের হাল্কা কথাই গৃহকর্ত্তার একাগ্র-তার চেয়ে তাহাকে খুসী করিল। সে অবিনাশকে মুক্তি দিয়া ও নিজে মুক্ত হইয়া বাঁচিল।

যতীনের প্রবেশে অবিনাশের কথার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে করুণার দিকে একবার চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখের দৃষ্টি করুণার ব্যবহারকে ভৎর্সনা করিতেছিল; কিন্তু মুখের কথা দ্বিতীয় মানুষের দর্শনে লজ্জিতা নববধূর প্রণয়গানের মত একেবারে লোপ পাইল।

বনদেবীর মত সবুজ পোষাকে সাজিয়া যে সুন্দরীটি ইহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন হঠাৎ অবিনাশের চোখ তাঁহার উপর পড়িল। যতীনের সঙ্গে করুণাকে কথা বলিতে দেখিয়া অবিনাশ সেই দিকে অগ্রসর হইল। সুন্দরী মৃদু হাসিলেন। অবিনাশ বলিল, "এই যে মিস্ দত্ত। আপনার মা ভাল আছেন ত!"

অকস্মাৎ তাঁহার মাতার প্রতি এত অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া দত্তকন্যার ফুল্লাধর ফাটিয়া হাসি উছলিয়া আসিতেছিল। তিনি হাসিয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ ভালই! যাক্ আপনার এতক্ষণে চারধারে তাকাবার অবসর মিলেছে দেখ্‌ছি!"

সে কথায় কান না দিয়া অবিনাশ বলিল, "সেই গানটা আপনি জানেন না? সেই যে মানসী রায়ের favourite গানটা।

মিস্ দত্ত বলিলেন, "হ্যাঁ শুনেছি বটে!"

অবিনাশ বলিল, "সেইটা করুন।"

মিস্ দত্তর গান করিতে আপত্তি ছিল না। ওঁর গানের আদর বন্ধু সমাজে না করিত এমন লোক ছিল না। অবিনাশের মতে অমন গলা প্রায় নাই। কিন্তু অবিনাশকে একটু খোঁচা দিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "আমাদের গান আর কি শুনবেন! ওই যাঁরা নূতন এসেছেন তাঁদের বলুন না দু'একটা গাইতে! আমরা আর কি জানি?"

অবিনাশ যেন কি একটা খেই পাইল। সে বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক কথা! অরুণা খুব সুন্দর গায় বটে! আপনাকে শোনাচ্ছি।"

প্রস্তাব শুনিয়া মিস্ দত্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন বটে। কিন্তু অবিনাশ অরুণাকে দিয়া গোটা তিনেক গান গাওয়াইয়া ছাড়িল। মিস্ দত্ত গান শুনিয়া বলিলেন, "শিখ্‌লে গলা নেহাৎ মন্দ হবে না বোধ হয়। আমাদেরও ভাল ট্রেনিং পাবার আগে গলা এর চেয়ে খুব বেশী ভাল ছিল বলা চলে না।"

অবিনাশ বলিল, "আপনার গলা বছর তিনেকে আশ্চর্য্য improve করেছে। অতটা সচরাচর দেখা যায় না। কে বল্‌বে একই গলা।"

মিস্ দত্ত ব্যারিষ্টার-সাহেবের শরণ লইলেন। অরুণার গান শুনিয়া দুই তিন জন তাহাদের দুই বোনকেই একত্রে অনেক তারিফ করিয়া লইলেন।

যতীন সাম্‌নে যাহাকে পাইতেছিল, তাহার সঙ্গেই করুণাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছিল। কিন্তু তারিণীবাবুর নাতনী শুনিয়া যাহারা তাঁহাকে চেনে তাহারা বলিল, "ও তা হবে। আমি চিনি না।" যাহারা চেনে না, তাহারা বলিল, "হ্যাঁ, নাম শুনেছি বোধ হচ্ছে।"

গলার গুণে অরুণা নবপরিচিতদের মধ্যে শীঘ্রই একটা প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। তাঁহাদের সহাস্য দৃষ্টির মধ্যে একটা কৃপা-কটাক্ষের ছোঁচা এবং বিনীত অনুরোধের আড়ালে একটা অনুগ্রহ-প্রদর্শনের ভঙ্গী থাকিলেও সংসার-অনভিজ্ঞা অরুণার কাছে তা ধরা পড়িল না। অনুগ্রহকে যে ভয় করে সেই অরুণার চোখে কিছু না এড়াইলেও অরুণা সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ভাবেই লইতেছে দেখিয়া দাতাদের কৃপা-কটাক্ষ তাহাদের নিজেদের কাছে ব্যর্থ হইয়া পড়িল। যাহাকে আমরা ভিক্ষু ভাবিয়া দান করি, সে যদি ন্যায্য পাওনা পাইয়াছে ভাবিয়া মাথা হেঁট না করে, তবে আত্মপ্রসাদ মাত্র আমাদের লাভ; তাও যদি আত্মপ্রসাদ পাইবার ক্ষমতা থাকে।

মিস্ দত্ত গানের আসর হইতে বিদায় লইলে, তাঁহার মামাতো বোন বিজলী আসিয়া অরুণার পাশে বসিল। অরুণা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লওয়ার পর বিজলী বলিল, "তুমি ত দেখ্‌ছি খুব ভাল গাইতে পার! ভালই! মানুষের যা বিদ্যা থাকে, তাই কাজে লাগে। আর তোমাদের এখন দরকারও আছে।"

অরুণা বলিল, "দরকার আর কি? ভাল জিনিষ সকলেরই পেতে ইচ্ছা করে এই যা।"

বিজলী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সে ত ঠিক কথা। তবে কিনা ওটা তোমাদের একটা হাতের পাঁচ। ভবিষ্যতের অনেক ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।"

অরুণা বলিল, "ও, গান শিখিয়ে রোজগারের কথা বল্‌ছেন।"

বিজলীর কথার উদ্দেশ্য তা না হইলেও সে বলিল, "সেটাও বটে।"

অরুণা বলিল, "মিস্ দত্ত বুঝি গানের শিক্ষয়িত্রী?"

বিজলী অপমানে লাল হইয়া বলিল, "কে তোমায় অমন কথা বল্‌লে? মুরলার বাবা যে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। ও কিসের দুঃখে কাজ করবে!"

অরুণা বিশেষ কিছু অপ্রস্তুত না হইয়াই বলিল "টাকার দরকার না থাক্‌লে আর রোজগার করে কি লাভ? তবে আপনি ওইরকম বল্‌ছিলেন তাই আমি ভাব্‌লাম।"

বিজলী বলিল, "অত বড় ঘরের মেয়ে, বা-বাপের মুখ হেঁট করবে কি করে?"

অরুণা বলিল, "ওসব আপনার ভুল। আমার দিদি ত কাজ করেন। কই কেউ ত কখনও একটা কথা বলে না।"

অরুণার তুলনার স্পর্দ্ধায় বিরক্ত হইয়া বিজলী "আমাদের বাড়ী হবার জো নেই" বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

করুণাকে নিঃসঙ্গ না পাইয়া অবিনাশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভ্যাগতা মহিলাদের সঙ্গে দুই চারিটা কথা বলিয়া বেড়াইতেছিল। বিজলীর কাছে আসিতেই সে বলিল, "আপনার নূতন অভিথিটি কি মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী?"

অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ, ওদের টাকার বড় টানাটানি।"

কথাটা করুণা শুনিল। সত্য কথাই বটে, কিন্তু করুণার মনে হইল, এ পরিচয়টুকু না দিলে কি অবিনাশের চলিত না? তারা ত কারুর কাছে ভিক্ষা করিতে আসে নাই! অবিনাশ বিজলীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমি গরীব ঘরেই জন্মেছিলাম, গরীবের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক মমতা আছে।"

বিজলী গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল, "সে ত থাকাই উচিত।"

অবিনাশ আপনার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া আর-এক-জনের সন্ধানে চলিয়া গেল। করুণা সব কটা কথাই শুনিয়াছিল। সে কথাগুলার ঠিক খুঁৎটা ধরিতে পারিল না, কিন্তু মনটা তার কি একটা বেদনায় একটু দমিয়া গেল।

শতদল আসিয়া অতিথিদের খবর দিল, আহারের আয়োজন হইয়াছে। তাহার কথায় কেউ কান দিল, কেউ দিল না। অগত্যা সে করুণা ও অরুণাকে একটু পরিচিত দেখিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। অবিনাশ দেখিয়া বলিল, "কোন্ কোণে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছ?"

শতদল বলিল, "খাবার হয়েছে যে।"

গৃহকর্ত্তা সকলকে ডাকিয়া যথাস্থানে লইয়া চলিলেন।

খাবারের আয়োজনটা ইংরেজি ধরণে হইলেও অবিনাশ ও শতদল বাঙালীর চিরন্তন প্রথামত অতিথি সৎকারেই ব্যস্ত ছিল। খাবারের টেবিলে অতিথিদের সঙ্গে বাড়ীর লোকের বসার বন্দোবস্ত হয় নাই। বিজলী করুণার পাশেই বসিয়াছিল, অন্যদিকে ছিল যতীন। দুইধারের দুইজনই আয়তনে করুণার চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু পোলাও কালিয়া চপ কাট্‌লেটগুলো টেবিল ঘুরিয়া তাদের পাতের কাছে আসিবামাত্র-দুইজনই কেন জানি না সহাস্য দৃষ্টিতে করুণার পাত দেখাইয়া নিজেদের গুরু-ভোজনের বর্ণনাতেই নিজেদের রসনা তৃপ্তি করিতেছিলেন। করুণা দুই একবার বলিল, "আপনারা নিজেরা কেবল হাত নেড়ে সরিয়ে আমার ঘাড়েই সব চাপাবার চেষ্টা কর্‌ছেন, বেশ ত মজা?"

বিজলী হাসিয়া বলিল, "আপনি ভাল করে খান, আমার ত নেমন্তন্নে অরুচি ধরে গেছে। আপনার এখনও নূতন।"

করুণা কথার উত্তর দিল না; যতীন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "উনি ভেবেছেন, আপনি কল্‌কাতার বাইরেই থাকেন তাই বোধ হয় নূতন বল্‌ছেন।"

করুণা বলিল, "কল্‌কাতার বাইরের লোকে কি এখানে আস্‌বার আগে কোনদিন খায় না?"

যতীন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তা না, তবে সেখানে আর রোজ রোজ কে এত হুজুগের ভোজ নিয়ে ব্যস্ত।"

বিজলীর মুখোমুখি বসিয়াছিল রণু। খান্‌সামা যতবার মাংসের চপ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল, ততবারই সে ঘাড় নাড়িয়া গোটা-দুই আদায় করিতেছিল। অন্যান্য জিনিসেও তাহার কিছুমাত্র অরুচি দেখা গেল না। বিজলী চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিতেছিল। খান্‌সামা ঘুরিয়া আসিয়া তাহার পাতেও দুটা চপ তুলিয়া দিল। বিজলী প্রায় চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দেখেছ কাণ্ড!" তারপর গলাটা একটু নামাইয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট সঙ্গীটিকে বলিল, "আমায় যেন ঐ হ্যাংলাকুটো ছেলেটা পেয়েছে! ছিঃ লোকে দেখ্‌লে ভাব্‌বে কি?"

বিজলীর আশেপাশের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মধ্যে দুচার-জন তাহার বিজলীর মত চকিত-চমকে হাসিয়া টেবিলে গড়াইয়া পড়িল। বিজলীর রকম দেখিয়া ও সকলের হাসিতে চমকিয়া রণু জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিল। বিজলীর সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইতেই বিজলী বলিল, "না, না, তুমি খাও, ভয় পেও না। আমি দেখ্‌ছিলাম, তোমার ত বেশ খাসা চেহারা।"

রণু এই অপরিচিতার কথায় অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। বিজলী ও তাহার বন্ধুবর্গ তাহার এমন আশ্চর্য্য ও অভিনব রসিকতায় আর-এক চোট হাসিয়া দুই-একটা কাঁচের বাসন-কোশন ভাঙিয়া লইল। একজন "আমি চপ খাচ্ছি" বলিয়া আস্ত তিনটা চপ একসঙ্গে মুখে পুরিয়া অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া তারিফ পাইবার ইচ্ছায় বিজলীর দিকে তাকাইল। বিজলী হাত বাড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনাকে congratulate কচ্ছি।" হাসির বান আবার ডাকিয়া গেল। তবে তাহার মধ্যে কতজনকে গায়ের জোরে হাসিতে হইয়াছিল বলা শক্ত।

ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া করুণা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। অরুণা দূর হইতে কারণটা ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিল, "এরা ত বেশ সহজ-আনন্দে ভেসে চলে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর করুণা একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিজলী মেয়েটি কে?"

তিনি বলিলেন, "বিজলী? ও মুরলার বোন হয়। ওর সম্পর্কেই ত এত আদর এখানে।"

করুণা কথাটা না বুঝিয়াই বলিল, "ও, তাই নাকি?"

ঘরের একটা টেবিলের উপর এক জায়গায় একরাশ ফুল ঢালা ছিল। বিদায়-কাল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যেন অতিথিসেবার দক্ষিণা-স্বরূপ অবিনাশ সকলকে এক এক গোছা ফুল উপহার দিল।

করুণাকে যে গুচ্ছটি দিল তাহার রূপে আর ভারে আর-সমস্ত ফুলগুলি যেন ম্লান হইয়া পড়িল। যতীন দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিন, দিন, আমি গাড়ীতে তুলে দিচ্ছি। আপনি তারে পড়ে যাবেন।"

করুণা এই সুস্পষ্ট পক্ষপাতে এমন লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার হাত হইতে ঝরঝর করিয়া সব ফুলগুলি পড়িয়া গেল। যতীন চট্ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে বসিয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইল। বিজলী এদিকে একটা কিছু ব্যাপারের আভাস পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত দেখিয়া মুরলাকে ডাকিয়া করুণাকে শুনাইয়া ইংরেজীতে বলিল "মুরলী সাবধান! তোমার রাজ্যে ডাকাত পড়িয়াছে।"

মুরলা ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ইংরেজীতে বলিল, "চুপ।"

করুণা যেন পলাইবার পথ পাইতেছিল না। তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

উতল বরিষণে

উতল বরিষণে
বাদল-ঘোর ঘনে
　　আজিকে প্রাণে মনে নিবিড় হয়ে যায়।
আজিকে মনে পড়ে উদার মাঠখান
সুদূর-গাছে-ঘের—তাহাতে অফুরান
　　বাদল ঝরে পড়ে,
　　বাতাস কেঁদে মরে,
　　জলের শাদা ধোঁয়া ঘনায়ে দূরে ভায়।

আকাশ ঘিরে ঘিরে কেবল কালো মেঘ
কেবল ঝরঝরে আকুল জল-বেগ,
　　মাঠের বুক-ভরা
　　মাটির তৃষা-হরা
　　চপল জল-ধারা ছুটিছে কি লীলায়!
আজিকে মনে পড়ে নিজন নদীকূলে
ছলকি' জল ছুটে চুমিয়া তরুমূলে
　　নদীর আঁকে বাঁকে
　　বাঁশের হেলা শাখে
　　তরল ঝোপে ঝাপে সে জল ভেঙে ধায়।
কেবল ছুটে যায় নদী সে ছলছল
বাদল নাচি' নাচি' বলিছে—চল, চল,
　　আঁধার-ভরা গ্রামে
　　নিঝুম ঘুম-ধামে
　　বাদল নদী সাথে কত না ভাষে গায়।
আজিকে মনে পড়ে নিথর তরুসারি
তাদের মাথা পরে বাদল-ঘন-বারি,
　　ভিজিয়া পাতা-পাশে
　　জোনাকি কভু হাসে,
　　একেলা বাসা পানে বাদুড় ঝাপটায়।
আজিকে মনে পড়ে পুকুরে কালো জলে
বাদল চিকিমিকি ঠমকি' ছুটে চলে,
　　ভেকের কলকথা
　　ভাঙিছে নীরবতা,
　　হরষ-ভরা ধ্বনি গ্রামেরে উতলায়।
আজি এ বরিষণে কেবল মনে পড়ে
খোলা সে মাঠখানি গ্রামের বন-ঘেরে,
　　নীরব দিশি দিশি,
　　আঁধারে ধারা মিশি'
　　নদীতে, পাতা পরে মুখর হয়ে গায়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সমাজ সংস্কার

১। বিষয় নির্দ্দেশ।

ইউরোপীয় মহাসমর ও রুসীয় বিপ্লব পৃথিবীর সকল সমাজ আলোড়িত করিয়া এক নূতন যুগ আনিয়াছে। তাহার ফলে ভারতীয় শাসনসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার কার্য্য আরম্ভ হইলে আমাদের সমাজেও এক নূতন যুগান্তর উপস্থিত হইবে। এই নূতন দায়িত্ব বহনের জন্য আমাদের সমাজকে এখন হইতে উপযোগী করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের এখন দেখা আবশ্যক যে, আমাদের সমাজের গঠনপ্রণালী এই নবযুগের নূতন কর্ত্তব্য পালনের সম্পূর্ণ উপযোগী কি না, আর যদি উপযোগী না হয় তবে কি কি পরিবর্ত্তন বা সংস্কার দ্বারা আমরা সমাজকে সেই সেই কার্য্যের উপযোগী করিতে পারি।

অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের কাল হইতে দেখিতে পাই যে, সমাজকে জীবশরীরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুরুষসূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০,৯০,১২), ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজের এই চারি অঙ্গ পুরুষ-শরীরের মুখ, বাহু, উরু ও পাদরূপে কল্পিত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও সমাজকে একটি জীবন্ত শরীর বলিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, শরীরের ন্যায় ইহার প্রত্যেক অবয়বের রক্ষা ও পোষণ অন্য সকল অবয়বের পোষণের উপর নির্ভর করে। সমগ্র সমাজ বা ইহার কোন অঙ্গ পরস্পর-নিরপেক্ষ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে, বা আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। সমাজের সহিত তাহার প্রত্যেক অবয়বের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, ইহার কোন এক অঙ্গের পীড়া হইলে সমগ্র সমাজ অসুস্থ হয়।

পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্ম্ম ও রাজ্যশাসন, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার একই অখণ্ড সমাজ-জীবনের নানা দিক্ মাত্র। যে-সকল অঙ্গের দ্বারা সমাজের এই-সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সেগুলি যেমন পরস্পরনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, এই কার্য্যগুলিও সেইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ; একের উপর আর-একটি নির্ভর করে; একের উন্নতি অবনতি বা বিশৃঙ্খলায় অপরগুলিরও উন্নতি, অবনতি বা বিশৃঙ্খলা ঘটে। ইহাদের বিভাগ কেবল কার্য্যের সুবিধার জন্য; বস্তুতঃ, ইহাদের সকলগুলি একই সমাজ-জীবনের অন্তর্গত। পারিবারিক-জীবনের উপর সামাজিক-জীবন নির্ভর করে; সামাজিক জীবনের উপর ধর্ম্মজীবন নির্ভর করে; এবং রাজনৈতিক উন্নতি বা অবনতি এই-সকলের সম্মিলিত ফল, অথচ তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা রাজনৈতিক-জীবনের উপর নির্ভর করে। সমাজ শব্দ এই ব্যাপক অর্থে লইলে সকলগুলিই সমাজ-জীবনের অন্তর্গত হয়। আমরা এস্থলে সমাজ রাজনৈতিকজীবন ও ধর্ম্মজীবন বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমাজ-জীবনের অর্থে লইব। এবং এই সংকীর্ণ অর্থে সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে যদি কোন রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উঠে, তাহার আলোচনা আমরা যতদূর সম্ভব পরিহার করিতে চেষ্টা করিব।

২। পারিবারিক-জীবন।—স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থাগতবৈষম্য এবং সেই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য উপযোগী শিক্ষার আবশ্যকতা।

এই সমাজ-শরীরের অর্দ্ধেক স্ত্রী ও অর্দ্ধেক পুরুষ। সমাজের এই দুই বিভাগকে আমরা দেহের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ বলিতে পারি। বাম অঙ্গকে যদি দুর্ব্বল বিকল নিশ্চেষ্ট ও পঙ্গু করিয়া রাখা হয়, কেবল দক্ষিণ অঙ্গের দ্বারা কোনও কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। আমাদের সমাজের স্ত্রী ও পুরুষের অবস্থা যদি তুলনা করি তাহা হইলে কি তাহা এইরূপই বিকলাঙ্গ বলিয়া মনে হয় না? পুরুষকে শিক্ষা স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়া যেরূপ সমাজের কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী করি, স্ত্রীজাতিকে কি সেই পরিমাণেই সকল বিষয়েই হীন ও কর্ত্তব্য পালনের অনুপযোগী করিয়া রাখি না? ইহাতে সমাজের কিরূপ বলক্ষয় হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। স্ত্রীজাতি শিক্ষিত ও আপন অধিকার প্রাপ্ত হইলে সমাজের যে-সকল উপকার করিতে পারিতেন, আমাদের সমাজে তাহার কিছুই পারেন না। সামান্য গৃহকর্ম্ম ও সন্তান প্রতিপালন করিয়াই গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা কি সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করেন! বাহিরের কোন সমাজের কাজে সহায়তা করিবার অবসর পান না। এমন কি গৃহকর্ম্ম ও সন্তান প্রতিপালনও তাঁহারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাঁহারা ঐ কর্ম্ম সমধিক যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিতেন। সন্তানের শিক্ষার ভার পর্য্যন্ত লইতে পারিতেন। তদ্ভিন্ন বিপদের সময় নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহাদিগকে অন্যের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হইত না, ভদ্রভাবেই স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। আরও অশেষ প্রকারে সমাজের সেবা করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতিবিষয়ে ঔদাসীন্যবশতঃ সমাজের অর্দ্ধেক অংশের এইরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে। এবং সেই হীনাবস্থার ফলেই তাঁহারা অনেক ন্যায্য অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থা, বালবিধবার চিরবৈধব্যের নিয়ম, পুত্রের দায়াধিকার কন্যার পিতার অনুগ্রহলভ্য যৌতুক মাত্রে অধিকার,—এই-সকল ঘোর অধিকারবৈষম্য স্ত্রীজাতির সেই হীনাবস্থারই ফল। যদি তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, যদি তাহার ফলে তাঁহারা কখন ব্যবস্থাপ্রণয়নের অধিকার পান, তবেই তাঁহাদের এই ঘোর অধিকারবৈষম্যের অবসান হইবে।

স্ত্রীজাতির এই হীনাবস্থার ফলে পুরুষদেরও কিছু কিছু শাস্তি পাইতে হইতেছে। আমাদের সমাজে সকলেই কন্যাসন্তান হইলে দুর্ভাগ্য মনে করেন। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য আমাদের কর্ম্মের ফল, এবং ইচ্ছা করিলেই তাহা যে দূর করিতে পারি, ইহা ভাবিয়া দেখি না। কন্যা হইলে আমাদের প্রথম ও একমাত্র ভাবনা হয় কি করিয়া উহার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। বরের পণ দিতে কন্যার পিতার সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এই প্রথা নিবারণের জন্য কত সভাসমিতি হইতেছে, কত আন্দোলন হইতেছে; কিন্তু বরের পণ না কমিয়া চাল ও কাপড়ের দরের সঙ্গে সঙ্গে বরং চড়িয়া যাইতেছে। অনেকেই ইহাতে বরের পিতাকে গালি পাড়েন, আমি কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ অপরাধ দেখি না। বরের বাজারের দর অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মালের থাকৃতি ও যোগান বুঝিয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে। পাশকরা ছেলে কিনিবার জন্য সকলেই ছুটিয়াছেন। মাল হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে ক্রমেই বেশী দর হাঁকিতেছেন। সুতরাং দর উঠিবে না কেন? পাশের মোহ কাটাইয়া যদি অন্য বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হই, অথবা কন্যাকে শিক্ষা দিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত করি, তাহা হইলে পাত্রের দর কমিয়া গিয়া নিশ্চয়ই কন্যার দর উঠিতে থাকিবে। কিন্তু আমরা তাহার কিছুই না করিয়া কেবল সভাসমিতি করিয়া বরের বাপের নিন্দা করি। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের ঘরে মেয়ে পড়িতে পায় না; পাত্র আসিয়া অনেক পণ দিয়া কন্যাকে বিবাহ করে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, চাষাদের মেয়েরা সম্ভ্রান্তঘরের মেয়েদের ন্যায় শুধু গৃহের শোভা বৃদ্ধির উপকরণ নহে, বিলাসের সামগ্রীও নহে, তাহারা স্বামীর ঘরের বাহিরের—সকল কার্য্যের সহায়। তাহাদের পল্লীজীবনের অভাব মোচনের জন্য যে কার্য্যপটুতা ও শ্রমশীলতা আবশ্যক

তাহা তাহাদের বাল্যকালেই পিতৃগৃহে শিক্ষা হইয়া থাকে। ভদ্রঘরের কন্যাদিগকেও সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যপালনের উপযোগী করিলে, বরের পণপ্রথা আমাদের দেশ হইতে অচিরেই উঠিয়া যাইবে।

কন্যাদিগকে সুশিক্ষিতা করিলেও অনেক সময় দেখা যায়, যে, কন্যার বিবাহে পিতাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহা দুইটি স্বতন্ত্র কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, পিতা ধনশালী হইলে তিনি কন্যাকে স্বেচ্ছায়ই নিজের ধনের কিয়দংশ যৌতুকস্বরূপ দান করেন। ইহাতে কিছুই দোষ নাই; বরং ইহা শাস্ত্রের বিধানেই আছে,—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮।৪৭)

আমাদের দেশে যখন কন্যার পুত্রের ন্যায় পিতৃধনের অংশে অধিকার নাই, তখন তাহার কিয়দংশ তাহাকে যৌতুকস্বরূপ না দেওয়াই অন্যায়। কিন্তু বরের পণস্বরূপ অর্থের দাবী করা এক স্বতন্ত্র জিনিষ। তাহার কারণও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে এখন যে জন্য এই পণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার এক গভীর কারণ আছে। তাহার মূলে আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে বাহ্যবিষয়াসক্তির বৃদ্ধি ও আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার লোপ দেখিতে পাই। ইহা আমাদের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা-বর্জ্জিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীরই ফল। এ শিক্ষা স্ত্রীজাতির মধ্যে এখনও বেশিক প্রবেশ করে নাই সেইজন্য তাঁহাদের আজিও একটা সংস্কার-গত ধর্ম্মভাব আছে। স্ত্রীশিক্ষা অর্থে—যদি আমরা, এখন পুরুষদিগকে যে নীতি ও ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাই বুঝি, তাহা হইলে এইরূপ স্ত্রীশিক্ষার আমাদের দেশে আর অধিক প্রচার না হওয়াই ভাল। কেন না, এইরূপ স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হইলে, আমাদের স্ত্রীজাতির মধ্যে এখনও যেটুকু ধর্ম্মভাব আছে তাহাও লোপ পাইবে। এখন পুরুষদের মধ্যেই এই শিক্ষা সমধিক প্রচলিত হইয়াছে। তাহার ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। যে-কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা জ্ঞানের জন্য নয়, তাহা পাশের জন্য; আর পাশ, চাকুরীর জন্য ও বিবাহ করিয়া অর্থলাভের জন্য। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার যখন এই ফল, তখন কন্যাকে শিক্ষিতা করিলেই যে বরের পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে, তাহা আশা করা যায় না। আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বরপক্ষীয়েরা কন্যার শিক্ষার বা স্বভাবের বিষয় একবারও খোঁজ নেন না। তাঁহারা চান দুটি জিনিষ,—কন্যার বর্ণ ও কন্যার পিতার সুবর্ণ। সুতরাং সমাজের এই কুপ্রথা তুলিতে হইলে শিক্ষার আমূল সংস্কার আবশ্যক। অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দিতে হইবে। কন্যাদিগেরও তদনুরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য উন্নত করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষা ও অবস্থার প্রকৃত সামঞ্জস্য হইবে, ও অর্থের লালসা চলিয়া গিয়া যথার্থ গুণের আদর বাড়িবে; এবং পণের পরিবর্ত্তে সহধর্ম্মিণী-লাভই বিবাহের লক্ষ্য হইবে।

স্ত্রীপুরুষের শিক্ষার সামঞ্জস্যের অভাবে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিরোধ ও অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহার জন্য উন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব জ্ঞানালোচনার অভাবে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা অন্ধ-আচার বা শুচিবাইগ্রস্ত হইয়া জ্ঞানালোচনার ফলে পুরুষেরা যাহা স্বাস্থ্য ও সমাজরক্ষার জন্য আবশ্যক মনে করিতেছেন সেই-সকল কার্য্যে ব্যাঘাত দিতেছেন। স্ত্রীলোকদের আচার কেবল অন্ধসংস্কার ও পারলৌকিক ফলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ, ঐহিক ফলপ্রদ স্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রবিরুদ্ধ হইয়াছে। তাই হিন্দুর মেয়েরা মেটে ঘর গোময় লেপিয়া মার্জ্জিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সিমেণ্টের ও মর্ম্মরের মেজেও নির্ম্মল জলে ধৌত না করিয়া গোবর লেপিয়া পরিষ্কার করিতেছেন—কলের জল অশুচি মনে করিয়া, বিষ্ঠা ও বিষাক্ত পদার্থমিশ্রিত পুকুরের পানা পান করিতেছেন, কখন বা গোময় গোমূত্র পর্য্যন্ত ঘাঘাঃকরণ করিয়া আত্মার পাপও ধৌত করিতেছেন। তাঁহারা এই ভয়ের দ্বারা ধর্ম্মলোপের ভয়ে দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহারা জানেন না অমাদের শাস্ত্রে একথাও আছে যে, যে বালিকা পতিমর্য্যাদা জানে না পতি সেবা ও ধর্ম্মের শাসন শিখে নাই তাহার বিবাহ দেওয়া পাপ।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাং অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥
মহনির্ব্বাণ তন্ত্র ৮।৩৭।

যে-সকল সমাজ-সংস্কারক এখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন, কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, ও অনাচরণীয় জাতিকে আচরণীয় করা ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত স্ত্রীলোকের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার না হইলে তাঁহাদিগের এই সকল সংস্কারের প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেহই এ-সকল সংস্কার সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না। বলপূর্ব্বক করিতে যাইলে ঘোর গৃহবিদ্রোহ ও অশান্তি ঘটিবে। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজ-সংস্কারকের সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। কেন না, স্ত্রীলোকের জ্ঞানবিস্তারের উপরই অধিকাংশ সমাজসংস্কার নির্ভর করিতেছে।

৩। সামাজিক-জীবন।—হিন্দুসমাজের সামাজিকজীবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণভেদ। ইহার উৎপত্তি ও বর্ত্তমান অবস্থা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জাতিগুলি হিন্দুসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ। জাতির মূল উপাদান বৃত্তি-অনুসারে সমাজের শ্রেণী বিভাগ। ইহা সকল সভ্যসমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের শ্রেণীবিভাগ হইতে আমাদের সমাজের শ্রেণীবিভাগের প্রভেদ এই যে, অন্য সমাজের শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের জাতিভেদ ব্যক্তিগত বৃত্তিভেদের উপর নহে, বংশগত বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বংশগত বৃত্তিভেদ অন্য সমাজে যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। রাজপদ অধিকাংশ দেশেই বংশগত, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ইংলণ্ডের মত সভ্য দেশেও বংশগত। কিন্তু সকল বৃত্তিই ভারতবর্ষে বংশগত হইয়াছে ইহাই আমাদের সমাজের বৈচিত্র্য। কেবল পাশ্চাত্য সমাজের মতামত লইয়া যাঁহারা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের জাতিভেদকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিঘ্নকারী একটা সমাজ-ব্যাধি বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু ইহা সমাজব্যাধিও নয়, অসভ্যতার চিহ্নও নয়। আমরা উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতে দেখিতে পাই শরীরের যতই ক্রমোন্নতি হয় প্রত্যেক অঙ্গের ও তাহার বৃত্তির তত প্রভেদ হইতে থাকে। তেমনি সমাজ-শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বৃত্তিভাগ ও বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণীভাগও হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন সমাজ jelly fishএর ন্যায় বৈষম্যশূন্য ছিল। তাহাতে শ্রেণীবিভাগও ছিল না, বৃত্তিবিভাগও ছিল না; প্রত্যেক লোককেই জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সকল কাজই করিয়া লইতে হইত। সুতরাং

সকলেরই আহারচেষ্টার সময় চলিয়া যাওয়াতে কোনপ্রকার শিল্প বা বিজ্ঞানের উন্নতির অবসর ছিল না। পরিশ্রমের বিভাগ ও বৃত্তি-ভেদের দ্বারাই সমাজে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে। সাম্যসংস্থাপন করিতে গিয়া যদি আমরা বৃত্তিভেদ তুলিয়া দিই, তাহা হইলে সমাজ আবার সেই বর্বর অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। ভেদ ও বৈষম্য হইতেই উন্নতি। সুতরাং ভেদ ও বৈষম্য সমাজের ব্যাধি নহে, ইহা তাহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের ও সম্পূর্ণ বিকাশের পরিচায়ক।

যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতবর্ষে কত সহস্রবর্ষ ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা একটা প্রকৃতির খেয়াল বা কুচক্রী ব্রাহ্মণদের উদ্ভাবিত ফাঁদ নহে, যে মনে করিলেই ইহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। আমাদের সমাজের জাতিভেদের বিশেষ কোন উপযোগিতা না থাকিলে, তাহা কখনও এতদিন টিকিত না। ইহার উপযোগিতা এই যে ইহাতে সমাজের শৃঙ্খলা যেরূপ রক্ষিত হয়, ও যেরূপ অল্প পরিশ্রমে সহজেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, সমাজে প্রত্যেক লোক আপন-আপন ইচ্ছায় বা আকস্মিক সুযোগের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ বৃত্তি স্থির করিলে, সেরূপ হয় না। তাহাতে পরস্পরের প্রতিযোগিতায় ও উপযুক্ত বৃত্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টায় অনেক শক্তি নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক শ্রেণীর বৃত্তি বংশগত হইলে আর-একটি সুবিধাও আছে। তাহাতে যে কেবল সন্তান পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে বিনা আয়াসেই উত্তরাধিকারী হন তাহাই নহে, তদ্ভিন্ন heredityর নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক সন্তানই, তাহার পূর্ব্বপুরুষের উপার্জ্জিত দক্ষতা লাভ করেন। এইরূপে এক এক বংশে এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িতে থাকে। এই-সকল কারণে জাতিভেদ ভারতবর্ষে এতদিন স্থায়ী হইয়াছে। এবং তাহারই ফলে ভারতবর্ষ জ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প প্রভৃতিতে অতি প্রাচীনকালেই সভ্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

কিন্তু একথা সত্যের একদিক্ মাত্র। ইহার বিপরীত দিক্‌ও আছে। জীব ও প্রাণিজগতে দুইটি নিয়মের দ্বারা ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে। প্রথমটি বংশগত সাদৃশ্য (heredity)। দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য (spontaneous variation.)। প্রথম নিয়মের ফলে প্রত্যেক সন্তান তাহার পূর্ব্বপুরুষের উপার্জ্জিত শারীরিক আকৃতি ও মানসিক গুণের উত্তরাধিকারী হয়। দ্বিতীয়টির ফলে এই পূর্ব্বপুরুষের সাদৃশ্য ছাড়া প্রত্যেক সন্তানে কিছু-না-কিছু ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য স্বতঃ উৎপন্ন হয়। সেগুলিও বংশরক্ষার উপকারক হইলে আবার সন্তান-পরম্পরায় বর্ত্তে। নতুবা ঐ বৈচিত্র্য একপুরুষেই লোপ পায়। এই দ্বিতীয় নিয়মের বলেই উদ্ভিদ্- ও জীবজগতে ক্রমোন্নতি হইতেছে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা সন্তানের কিছুই উন্নতি হইত না। এইজন্য বৃত্তিভেদ বংশগত করিলে, এই spontaneous variation দ্বারা বংশের যে উন্নতি হয় তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা ও প্রতিযোগিতাও উন্নতির আর-এক কারণ। বৃত্তিভেদ বংশগত করিলে উন্নতির সে-সকল কারণও কার্য্য করিতে পারে না। ইহার ফলে পূর্ব্বপুরুষের উপার্জ্জিত উন্নতিটুকুই কেবল রক্ষিত হয়। কিন্তু বংশের ক্রমোন্নতির পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। এবং ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য বংশগত উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য সভ্যতার আজ পতন হইয়াছে, ও ব্যক্তির উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ জয়ী হইয়াছে। তাই প্রাচ্য সত্যযুগ অতীতের গর্ভে।—আর পাশ্চাত্য স্বর্ণযুগ ভবিষ্যতের গর্ভে। বৃত্তিভেদ কেবল বংশগত করিয়া না রাখিয়া তাহা ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণ ও যোগ্যতার দ্বারা নিরূপিত হইবার সর্ব্বপ্রকার বাধা সমাজ হইতে উঠাইয়া না দিলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ চিরদিনের তরে রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। এবং প্রতিযোগিতায় আমরা সকল পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য জাতির কাছে পরাজিত হইয়া অচিরে জগতে লুপ্ত জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিব। ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বপ্রকার বাধা যদি আমরা দূর করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সমন্বয় করিতে পারিব।

হিন্দুসমাজে বৃত্তিভেদ বংশগত কেন হইয়াছিল তাহা যেন বুঝা গেল। কিন্তু তাহা হইতে হিন্দুসমাজ পরস্পর আহার ব্যবহার বিবাহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধশূন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতিতে কিরূপে বিভক্ত হইল তাহা বুঝা যায় না। তাহা বুঝিতে হইলে বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই জাতিভেদের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে।

জাতিভেদের প্রথম অবস্থা।

বৈদিককালে বর্ণভেদ—ও অসবর্ণবিবাহ-প্রথা।

সর্ব্বপ্রাচীন ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তের দ্বাদশ ঋকে (ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২) চারিবর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী নয় মণ্ডলে বিপ্র, রাজন্য, ও বিশ্ এই তিন বর্ণের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রের উল্লেখ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে 'দস্যু' বা 'দাস' (ঋগ্বেদ ২।১২।৪) ও আর্য্যবর্ণ (ঐ ৩।৩৪।৯) এই দুই বর্ণের উল্লেখ আছে। এই 'দাস' হইতেই শূদ্র ও 'আর্য্য' হইতেই বৃত্তিভেদে অন্য তিন দ্বিজবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল। 'দাসগণ' কৃষ্ণ ও আর্য্যগণ শুভ্রবর্ণ ছিলেন। এই বর্ণের ভেদ হইতে 'বর্ণ' শব্দের উৎপত্তি। ইহা হইতে অনুমান হয় যে দাসগণ এদেশীয় আদিম নিবাসী ছিলেন ও আর্য্যগণ তাঁহাদের বিজেতা। এইরূপ বিজেতৃ-বিজিত সম্বন্ধ ও বংশের ভেদ হইতেই বিবাহাদি-সম্বন্ধ জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। বংশভেদ না থাকিলে কেবল বৃত্তিভেদ হইতে ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ উৎপন্ন হইতে পারিত না, এবং দ্বিজ ও শূদ্রের সামাজিক অবস্থা ও অধিকারের এত তারতম্য হইত না।

অতি প্রাচীন বৈদিককালে এই তিন আর্য্যবর্ণেরই দাসবর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।২৯) দেখা যায় শূদ্র কেবল অপরের দাস ছিলেন শুধু তাহাই নহে, তাঁহার ধনাধিকার ছিল না, জীবনেও অধিকার ছিল না, তিনি "যথাকামবধ্য" ছিলেন। বৈদিককালে শূদ্রের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইলেও, তিনি অনাচরণীয় হন নাই, বা তাঁহার সংস্পর্শে কোনরূপ অশুচিত্ব হইত ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে কোন শ্রেষ্ঠবর্ণের নিকৃষ্টবর্ণের বা শূদ্রের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনের বা স্পৃষ্টান্নভোজনের, এমন কি তাঁহাদের সহিত বিবাহেরও কোন নিষেধ পাওয়া যায় না। এই অনুমান কেবল নিষেধ-অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণও আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৯।১) কবষ ঐলুষ দাসীপুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৪।১১।১৭) দেখা যায়, দীর্ঘতমাঃ দাসকন্যা উশিজের পুত্র ছিলেন। যজুর্ব্বেদসংহিতায় (৭।৪।১৯,১৪) আর্য্য ও শূদ্রের মধ্যে অবৈধ সংসর্গের উল্লেখ রহিয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৫।১৭৮,৯) দেখা যায় যে স্ত্রীলোকের যে কেবল অন্যবর্ণের পুরুষের সহিত বিবাহ হইত তাহা নহে, বহুবিবাহ পর্য্যন্ত হইত। উপরিউক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের রাজন্য- ও বৈশ্যস্বামী থাকিতেও ব্রাহ্মণস্বামীরই তাহার উপর অধিকার অগ্রগণ্য। যথা—"উত বৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ। ব্রহ্মাচেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা॥ ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ন বৈশ্যঃ। তৎ সূর্য্যঃ প্রব্রুবন্ নেতি পঞ্চেমা মানবেভ্যঃ॥" অর্থাৎ "পূর্ব্বে যদি কোন স্ত্রীলোকের দশজন অব্রাহ্মণ পতি থাকে, পরে ব্রাহ্মণে যদি তার হস্ত গ্রহণ করে, তবে ব্রাহ্মণই একমাত্র পতি। ব্রাহ্মণই পতি, রাজন্য নয় বৈশ্য নয়—এই কথা সূর্য্য পঞ্চমানবদের বলিয়াছেন।" প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত হইতেও বৈদিক

সমাজের অবস্থা অনেক জানা যায়। মহাভারতে দেখিতে পাই, যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়া শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেববানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের সন্তান হইতে প্রসিদ্ধ যদুবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। পরশুরামের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া ব্রাহ্মণই হইলেন। ব্যাস কৈবর্ত্তকন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতার বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ হইলেন। এই-সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, সে সময় অনুলোম ও প্রতিলোম এই দুইপ্রকার অসবর্ণবিবাহই প্রচলিত ছিল, এবং সেই বিবাহোৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত; পরবর্ত্তী কালের ন্যায় তাহাদের যথাক্রমে মাতার বর্ণ বা সঙ্করবর্ণ হইত না। বৈদিককালের ব্রাহ্মণের অধিকাংশই যে নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল মহাভারতে তাহার প্রমাণ আছে। যথা—জনক উবাচ—

ব্রহ্মণৈকেন জাতানাং নানাত্বং গোত্রতঃ কথম্।
বহূনীহ হি লোকে বৈ গোত্রাণি মুনিসত্তম॥
যত্র তত্র কথং জাতাঃ সংখ্যানিং মুনয়ো গতাঃ।
শুদ্ধযোনৌ সমুৎপন্না বিযোনৌ চ তথাপরে॥

পরাশর উবাচ—

রাজন্নৈতদ্‌ভবেদ্‌গ্রাহ্যং অপকৃষ্টেন জন্মনা।
যতাত্মনাং সমুৎপত্তিস্তপসা ভাবিতাত্মনাম্॥
উৎপাদ্য পুত্রান্ মুনয়ো নৃপতে যত্রতত্র হ।
স্বেনৈব তপসা তেষাম্ ঋষিত্বং প্রদদুঃ পুনঃ॥
* * * *
এতে স্বাং প্রকৃতিং প্রাপ্তা বৈদেহ তপসোগ্রয়াৎ।
প্রতিষ্ঠিতা বেদবিদো দমেন তপসৈব হি॥

(শান্তিপর্ব্ব, ১০৮৭০—৭৫)

অর্থাৎ মুনিরা যে সে নিকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করিয়া আপন তপস্যার বলে তাহাদের ঋষিত্ব বিধান করিয়াছেন।

অন্যত্র বলা হইতেছে,

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥
ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহে ইত্যপি।

(বনপর্ব ১২৪৮০—৮২)

এখানে বলা হইয়াছে যে বর্ণসঙ্কর হেতু সকল বর্ণেরই জাতি স্থির করা কঠিন; কারণ সকল বর্ণই সকল বর্ণে সন্তান উৎপাদন করেন। এবং নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া সেই কথা প্রমাণিত করা হইয়াছে, "যে আমরা যাগ করি, সেই আমরা জানি না যে আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ।"

বৈদিক কালে যে সর্ব্বপ্রকার অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে এখনও যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। ঋগ্বেদে, আর্য্যগণ শুভ্রবর্ণ ছিলেন, বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু এখনকারের ব্রাহ্মণদিগকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইতে গৌরবর্ণের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার বিভিন্নবর্ণের দেখি কেন? ইহা কৃষ্ণবর্ণ দাসদের সহিত আর্য্যবর্ণের নানারূপ মিশ্রণের ফল কি নহে? আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, আধুনিক ভারতবর্ষে—যেখানেই শ্বেত ও কৃষ্ণ জাতির মিশ্রণ হইয়াছে সেইখানেই এইরূপ নানাবর্ণের সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। যেখানে কৃষ্ণজাতির রক্তের ভাগ অধিক, সেখানে অধিক কৃষ্ণবর্ণ; আর যেখানে অল্প সেখানে ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। কাশ্মীর ও পঞ্জাবে ভিন্ন, বোধ হয়, বিশুদ্ধ আর্য্য-শোণিত কোন ব্রাহ্মণের ধমনীতে এখন প্রবাহিত হয় না। বিজয়ী আর্য্যগণ যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন তখন তাঁহাদিগের সহিত অধিকসংখ্যক আর্য্যবংশীয় স্ত্রীলোক ছিল না। সেইজন্য তাঁহাদিগকে অনার্য্যনারী বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাহারই ফলে এই মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সকল দ্বিজবর্ণের মধ্যেই এখন অল্প বা অধিক পরিমাণে অনার্য্য-শোণিত প্রবেশ করিয়াছে; সেইজন্য আর এখন মুখের আকৃতি বা বর্ণের দ্বারা নিকৃষ্টবর্ণের লোককে উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে প্রভেদ করা কঠিন। অনেক স্থলে নিকৃষ্ট জাতীয় লোকের আকৃতি ও বর্ণ উৎকৃষ্ট জাতি অপেক্ষা অধিক আর্য্যজনোচিত। একজন সুবর্ণবণিকের সহিত তাঁহার পুরোহিত ঠাকুরের তুলনা করিলেই একথা সত্য কি না বুঝা যাইবে।

জাতিভেদের দ্বিতীয় অবস্থা।

স্মৃতি ও পুরাণের যুগে বর্ণ-ভেদ।

প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ ও নিকৃষ্ট বর্ণের সংসর্গ নিষেধ।

কালক্রমে এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মিশ্রণে বিশুদ্ধ আর্য্যের সংখ্যা ক্রমে লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইল। তখন বর্ণের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য অসবর্ণবিবাহ ক্রমশঃ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। বৈদিক কালের অবসান হইতেই এইরূপ বিবাহ বন্ধের চেষ্টা চলিল। কিন্তু তাহা একবারে বন্ধ করিলে শ্রেষ্ঠ বর্ণদিগের ইচ্ছামত কন্যালাভের অসুবিধা হইবে এইজন্য নিকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ যাহাতে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা না পায়—এইরূপ ব্যবস্থাই প্রণীত হইল; তাহারই ফলে সূত্র ও ধর্ম্ম-সংহিতায় চারিবর্ণে সবর্ণা ও অনুলোম বিবাহের বিধান ও প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ দেখি। এই বর্ণসংমিশ্রণ যদি ভারতবর্ষে এইরূপে বাধা প্রাপ্ত না হইত তাহা হইলে আর-কিছু দিনে সমস্ত বর্ণ মিশিয়া এক সমানাকৃতি ও সদৃশবর্ণের মহাজাতিতে পরিণত হইত। ইউরোপীয় জাতি-সকল বহুজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াও আন্তর্জাতিক বিবাহের ফলে অল্পদিনে এক-একটি সমানাকৃতি ও সমান বর্ণের জাতিতে পরিণত হইতেছে। সূত্র ও ধর্ম্মসংহিতায়, এরিয়ানের গ্রন্থে (Arrian's Indica XII. 8. 9.) ও পালি সাহিত্যে প্রথম দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে ও স্পৃষ্টান্ন ভোজন ও সর্ব্বপ্রকার সংসর্গও রহিত হইয়াছে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (১।৪) সবর্ণ-বিবাহ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের বিধান ও প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ দেখা যায়। যথা—"সর্ব্বেষাম্ শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্রবর্জ্যম্।" ইহার অর্থ কাহারও মতে শূদ্রা সকলবর্ণেরই ভার্য্যা হইতে পারে, তবে বৈদিক মন্ত্র বর্জ্জন করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে। গোভিল গৃহ্যসূত্রে (৩।৪।৩৫) কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠবর্ণের শূদ্রা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অন্যস্থলে ইহা বিহিত ছিল।

মনু-সংহিতায়ও (৩।১২, ১৩) অনুলোম বিবাহের বিধান আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যদিও দ্বিজাতির শূদ্রা-বিবাহ প্রশস্ত বলে করা হয় নাই, তথাপি তাহার যে বিধান ছিল একথা স্বীকার করা হইয়াছে।

যদৃচ্ছতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ।
ন তত্রেদং মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্॥

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ১।৫৬)

বিষ্ণুস্মৃতিতে আছে,

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু
মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতা।

(বিষ্ণুস্মৃতি, ১৬ অধ্যায়।)

এখানে দেখা যায় অনুলোম ও প্রতিলোম দুইপ্রকার বিবাহ হইত। পৈঠীনসি বলিয়াছেন,

"অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ। অপি বা
ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েত, শূদ্রায়াং বা ইত্যেকে।"

মনু প্রথমে অসবর্ণ বিবাহের বিধান করিয়া (৩।১২, ১৩) আবার আপদের সময়ও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা-বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন (মনু ৩-১৪-১৯)। এই বিরোধের সমাধান কি? কুল্লুকের মতে ব্রাহ্মণের প্রতিলোমক্রমে শূদ্রা-বিবাহ নিষেধই মনুর অভিপ্রেত। অর্থাৎ অগ্রে সবর্ণাবিবাহ না করিয়া শূদ্রা-বিবাহ দূষণীয়। মাধবাচার্য্যের মতে এই নিষেধ মতভেদ মাত্র, অথবা ভিন্ন যুগের জন্য; "মতভেদেন যুগভেদেন বা ব্যবস্থোপপত্তেঃ"—পরাশরভাষ্য।

এই যুগভেদের ব্যাখ্যা যে কল্পিত তাহা আমরা পরে দেখাইব। ফলতঃ ধর্ম্মসংহিতা ও পুরাণের কালে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল; তবে প্রতিলোম বিবাহ নিন্দনীয় হইয়াছিল। সবর্ণা হইতে উৎপন্ন পুত্র পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত; কিন্তু অসবর্ণা হইতে অনুলোম-বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা মাতার বর্ণ পাইত ও প্রতিলোম-বিবাহজাত পুত্র বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণ হইতে অনুলোম-বিবাহোৎপন্ন সন্তান তিন প্রকার, ক্ষত্রিয় হইতে দুই প্রকার ও বৈশ্য হইতে এক প্রকার। ইহাদের মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, নিষাদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র নাম হইলেও তাহারা মাতার বর্ণই প্রাপ্ত হইত, বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইত না। প্রতিলোম হইতে জাত সঙ্কর বর্ণ তিন প্রকার; যথা, বর্ণসঙ্কর, সঙ্কীর্ণসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কীর্ণসঙ্কর। উত্তম ও অধম বর্ণের মিলনে বর্ণসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর ও বর্ণসঙ্করের মিলনে সঙ্কীর্ণসঙ্কর, এবং বর্ণসঙ্কর ও সঙ্কীর্ণসঙ্করের মিলনে বর্ণসঙ্কীর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে বৈদিক কালের চারি বর্ণের মিশ্রণে অসংখ্য বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সময়ে একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নীত বা অবনীত হইবারও নিয়ম ছিল। নিকৃষ্ট জাতির কন্যা উৎকৃষ্ট বর্ণের দ্বারা ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষ পরিণীতা হইলে তাহার সন্তান উৎকৃষ্ট বর্ণেরই হইত। এইরূপে শূদ্রার সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে সাত পুরুষ লাগিত। আবার উৎকৃষ্ট বর্ণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া নিকৃষ্ট বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহার সন্তানেরা নিকৃষ্ট বর্ণ হইত। এইরূপ ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র হইতে সাত পুরুষ লাগিত।

আরও দেখা যায় মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের শূদ্রা বা অন্য অনুলোম-বিবাহজাত সন্তান ঔরসপুত্র মধ্যে গণ্য হইত, এবং সে ধনাধিকারীও হইত। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় লিখিয়াছেন,—

তথা অনুলোমজানাং মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ঔরসেষ্বন্তর্ভাবাৎ তেষামপ্যভাবে ক্ষেত্রজাদীনাং দায়হরত্বং বোদ্ধব্যম্। শূদ্রাপুত্রস্ত্বৌরসোঽপি কৃৎস্নং ভাগং অন্যাভাবেঽপি ন লভতে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ার সহিত অনুলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্তাদি ঔরসপুত্রের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদেরও অভাবে ক্ষেত্রজাদি পুত্র ধনের অধিকারী হইবে ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শূদ্রা হইতে অনুলোমবিবাহ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র যদিও ঔরসপুত্রের মধ্যে গণ্য তথাপি অন্য পুত্রের অভাবেও সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে না।

জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগেও এরূপ কথা আছে, "যস্তু শূদ্র এবৈকঃ পুত্রো ব্রাহ্মণস্য স তৃতীয়ভাগাধিকারী।" অর্থাৎ যদি শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র থাকে তাহা হইলে সে ধনের তৃতীয় ভাগ পাইবে।

জাতিভেদের তৃতীয় অবস্থা।

একাদশ শতাব্দীর পর হইতে সর্ব্বপ্রকার অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, সমুদ্রযাত্রাদির নিষেধ ও জাতিভেদ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধযুক্ত উপজাতিভেদে পরিণত হইয়াছে।

মুসলমান আক্রমণের পরবর্ত্তী কালে প্রণীত বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে আমরা প্রথমে দেখি কলিকালে অসবর্ণবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

বৃহন্নারদীয়।

সমুদ্র-যাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

আদিত্য পুরাণ।

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। * * *
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ॥
* * * *
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

নিবন্ধকার হেমাদ্রি ও রঘুনন্দন আধুনিক লোকাচারের অনুরোধে এই নিষেধের কলিকালে প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। আমরা এস্থলে দেখাইব যে কলির আরম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত ছিল। মুসলমান আক্রমণের পর হিন্দুদের জাতীয় পতনের সঙ্গে সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মণের শূদ্রের গৃহে বা শূদ্রের পাককরা অন্ন ভোজন ও সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি উঠিয়া গিয়াছিল।

পরাশরই কলির ধর্ম্মবক্তা:—'কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ' (পরাশর-সংহিতা ১।২৪)। কলিতে যদি অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইত তাহা হইলে পরাশর-সংহিতায় নিশ্চয়ই ইহার নিষেধ থাকিত। তাহা যখন নাই, অথচ গৃহ্যসূত্র ও মনুসংহিতা প্রভৃতিতে যখন তাহার বিধান আছে, তখন কলিতেও তাহার প্রাপ্তি না হইবে কেন? পরাশরসংহিতায় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে কলিতে বিবাহ করিতেন এবং সেই বিবাহজাত পুত্রের ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কার হইত এবং সেরূপ স্থলে পরাশর তাহার অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন; সুতরাং কলিতে অসবর্ণ বিবাহ পরাশরের অভিমতই বলিতে হইবে।

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কারাত্তু ভবেদ্দাসোঽসংস্কারান্ত্ত নাপিতঃ॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সুতো জায়েত নামতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রেন সংশয়ঃ॥
বৈশ্যকন্যাসমুদ্ভূতো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
স হ্যার্দ্ধিক ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রেন সংশয়ঃ॥
(পরাশর-সংহিতা ১১।২১-২৪)

ইহার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণঃ শূদ্রকন্যাং উঢ়্বা তস্যাং যং পুত্রং উৎপাদয়তি, স যদি অমন্ত্রকৈঃ নিষেকাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ ভবতি তদা দাস ইতি উচ্যতে, সংস্কারাভাবে তু নাপিত ইত্যভিধীয়তে * * * দাসাদীনাং ভোজ্যান্নত্বং যাজ্ঞবল্ক্যোপ্যাহ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন যদি সে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া নিষেকাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় তাহা হইলে দাস বলিয়া উক্ত হয়;

অন্যথা নাপিত হয়। **** বাসাদির অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন ইহা যাজ্ঞবাল্ক্যও বলিয়াছেন।

কলিতে শূদ্রার সহিত দ্বিজাতির যে অসবর্ণ বিবাহ হইত এই পরাশর-বচন তাহার প্রমাণ। সুতরাং কলির আদিতে অসবর্ণ বিবাহ বিধবাবিবাহ, ও সমুদ্রযাত্রা, বা দাসাদির ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের এইরূপ বচন শ্রুতি ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ, অতএব তাহা অপ্রমাণ। ব্যাসসংহিতায় স্পষ্ট কথিত আছে,

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের যেখানে বিরোধ দেখা যায় সেখানে শ্রুতির প্রমাণ গ্রাহ্য, এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ স্থলে স্মৃতির প্রমাণই গ্রাহ্য। বিশেষ আদিত্যপুরাণ পুরাণও নহে, উপপুরাণ মাত্র। সুতরাং তাহার সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে উপপুরাণ যে অগ্রাহ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? এস্থলে মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি ও রঘুনন্দনের মতাবলম্বীরা বলেন যে মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধারণভাবে অসবর্ণ বিবাহের বিধান আছে। আদিত্য-পুরাণে কলিতে উহা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ নাই। স্মৃতির বিধি কলি ভিন্ন অন্যযুগের জন্য বুঝিয়া লইতে হইবে। একপ মীমাংসা অসঙ্গত। পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিরা নিজেরাই কলিতে অসবর্ণা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণমতে কলির পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী যুধিষ্ঠিরের কাল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ ব্যাস ও প্রপিতামহ পরাশর কলিরই লোক। এই তপোনিষ্ঠ ঋষিরা নিজেরা কলিধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিলেন, আর অন্যের বেলা কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ করিলেন—ইহা কল্পিত ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনও কি একালের লোকদের জন্য ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীজাত পুত্রের দায়াধিকারের ব্যবস্থা না লিখিয়া সত্যযুগের জন্য ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলেন? সুতরাং কলিতে অসবর্ণ বিবাহ তাঁহারা বিধান করেন নাই ইহা কল্পিত ব্যাখ্যা। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় শ্রুতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ দেখিয়া আধুনিক হিন্দুসমাজ চলে ইহা ভ্রম। আধুনিক হিন্দুসমাজ প্রচলিত আচারেরই দাস। সে আচার শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া আধুনিক উপপুরাণরচয়িতারা তাহা সমর্থনের জন্য নূতন বচন রচনা করিয়াছেন, এবং নিবন্ধকারেরা সেই-সকল লোকাচার সমর্থন করিবার জন্য এবং তাহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নহে ইহা দেখাইবার জন্য বৃহৎ শ্রুতিস্মৃতির অর্থসঙ্কোচ ও অদৃষ্টশ্রুতি-কল্পনারূপ কৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত অসবর্ণবিবাহ কলিতেও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি কলিতে নিবর্ত্তিত হইয়াছিল আদিত্যপুরাণের এই বচন পৌরাণিকের কল্পনা মাত্র। পুরাণকর্ত্তা ইহাও বুঝিতেন যে ঐ-সকল প্রথা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নহে, সেই জন্য তিনি, 'সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ' এই বলিয়া ওকালতি করিয়াছেন। রঘুনন্দন বলেন, 'সময়ঃ সংবিৎসা চ প্রতিজ্ঞা' (উদ্বাহতত্ত্ব ১৪); অর্থাৎ, সময় অর্থে সংবিৎ বা প্রতিজ্ঞা। পুরাণকর্ত্তা বলিতেছেন 'বুঝেসুঝে' ব্যবস্থা করিয়া ঐ-সকল আচার তুলিয়া দিয়াছেন, এবং সাধুদের 'প্রতিজ্ঞা' বেদবৎ প্রমাণ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভের পর সমাজবিপ্লবের ভয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা একটা সংবিৎ বা resolution পাশ করিয়া কতকগুলি উদার প্রাচীন আচার তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই resolution সমাজে পাছে গ্রাহ্য না হয় এই আশঙ্কায় তাহা বেদবৎ প্রমাণ এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাশীরাম বাচস্পতি রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বের টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন,—

'নমু এতেষাং কর্ম্মণাং কলৌ নিষেধকো বেদো নাস্তি। তৎ কথমেতানি কলৌ নিষিদ্ধানি। তত্রাহ, সময়শ্চেতি।'

অর্থাৎ, এই সকল কর্ম্মের কলিতে নিষেধক বেদবাক্য নাই; তবে এই-সকল আচার কিরূপে কলিতে নিষিদ্ধ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, 'সময়শ্চ' ইত্যাদি।

আমরা দেখিলাম অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সমাজ এখন শ্রুতিস্মৃতির অনুসরণ না করিয়া অন্যভাবে প্রণোদিত আধুনিক দেশাচারেরই অনুসরণ করিতেছে? এবং সেই দেশাচার শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও সমাজের ঘোর অনিষ্টকর হইলেও তাহার সমর্থন করিতেছে। ইহারই ফলে চতুর্ব্বর্ণ এখন অসংখ্য উপবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে এবং সেই-সকল উপবর্ণের মধ্যে বিবাহ ভোজন প্রভৃতি সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। উপবর্ণের মধ্যে কোন শাস্ত্রেই ত বিবাহ বা তাহার নিষেধ নাই। তবে তাহা সমাজে কেন বন্ধ হইল? ইহাতেও অধোগতির শেষ নাই। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বলাবলি করিয়া এ উহাকে একঘরে করিতেছে, ও তাহার সহিত সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ করিতেছে। এইরূপে হিন্দুসমাজের একতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বৈদিককালে ও স্মৃতি ও সংহিতার যুগে আমরা দেখিয়াছি, বর্ণভেদ কেবল বংশভেদের উপর নহে, বৃত্তিভেদের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকাতে জাতিভেদ তখন সমাজের তত অনিষ্ট করিতে পারে নাই, বরং জাতীয় উন্নতির অনেক বিষয়ে কারণ হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও জাতিভেদ বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে এখন আর তাহা বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; একমাত্র বংশভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ আর এখন শূদ্রের কাজ করিলেও ব্রাহ্মণত্ব হারান না; বা নীচবর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণের গুণসম্পন্ন হইলে উৎকৃষ্টবর্ণের স্থান লাভ করেন না। সুতরাং এখন বর্ণভেদ কেবল গুণকর্ম্মহীন বংশভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সমাজের এরূপ অবস্থা তাহার উন্নতি হইতে পারে না।

৪। সমাজকে জনতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপযোগী করিতে হইলে এই-সমস্ত কাল্পনিক ভেদ ও বৈষম্য দূর করিয়া তাহাকে ব্যক্তির গুণ ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এইরূপ অন্তঃসারশূন্য বংশমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্যক্তি-গত যোগ্যতার উপর স্থাপিত ইংরেজ-শাসনের সংস্পর্শে আমাদের সমাজ এখনই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর একমাত্র ব্রাহ্মণই শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী নহেন, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে পৌরোহিত্য ছাড়িয়া পাচকত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। কায়স্থগণ এখন আর ব্রাহ্মণের দাস নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রভু হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ সকলের শিক্ষক ছিলেন, নিকৃষ্টজাতিরা ইংরেজিশিক্ষার মাহাত্ম্যে এখন তাঁহার শিক্ষক হইয়াছেন। বৈদিককালে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত থাকাতে নানাবর্ণের মিশ্রণে প্রকৃত বংশভেদ অন্ততঃ উচ্চ-বর্ণদের মধ্যে, অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছিল। জাতির বৃত্তিভেদও এখন উঠাইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই কাল্পনিক জাতিভেদকে আশ্রয় করিয়া আর হিন্দুসমাজ কতদিন থাকিতে পারে? ইহা ভিন্ন হিন্দুসমাজের ধ্বংসের আরও দুইটি কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বিধবাবিবাহ বন্ধ হওয়াতে হিন্দুর জনসংখ্যা দিন দিন কমিতেছে, ইহার উপর হিন্দুসমাজ সংকীর্ণনীতির অনুসরণ করিয়া উন্নতিশীল হিন্দুদিগকে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য সমাজচ্যুত করাতে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। এই বহিষ্কার নীতি

অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ দিন দিন আত্মহত্যাই করিতেছে। যাঁহারা গুণকর্ম্মান্বিত তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া কেবল গুণকর্ম্মহীন জাত্যভিমান লইয়া হিন্দুসমাজ কয়দিন আর এই জীবনসংগ্রামে টিকিতে পারে? সমাজকে ব্যক্তির গুণ ও যোগ্যতার উপর পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত না করিলে আর রক্ষা নাই।

৫। পটেল বিল।

মাননীয় পটেল মহোদয় অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণতার অত্যাচার হইতে উন্নতিশীল হিন্দুদিগকে রক্ষা করিয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থান দিয়া ইহাকে উন্নত ও নব যুগের উপযুক্ত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক রূপ আপত্তি করিতেছেন। আমরা সেগুলি বিচার করিব।

(১) রক্ষণশীল হিন্দুরা ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় আপত্তি করিতেছেন। আমরা দেখিয়াছি অসবর্ণবিবাহ হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদ- বা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। তথাপি যদি কোন হিন্দুর ইহা উপ-পুরাণবিরুদ্ধ হওয়াতে অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাঁহার স্বাধীন ধর্ম্মমতে হস্তক্ষেপ করা এ আইনের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। কেবল যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু বর্ত্তমান আইনের দোষে হিন্দুনাম পরিত্যাগ না করিলে অসবর্ণার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহারা যাহাতে হিন্দুনাম রক্ষা করিয়া অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারেন তাহার উপায় করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। সুতরাং রক্ষণশীল হিন্দুদের ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহাদের স্বাধীন ধর্ম্মাচরণে এই আইন কিছুমাত্র বাধা দিবে না। কিন্তু এই আইন পাশ না হইলে উন্নতিশীল হিন্দুদিগের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেবল উন্নতিশীল হিন্দু কেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শৈব ও অন্যান্য সম্প্রদায়, যাঁহাদের শাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহের স্পষ্ট বিধান আছে, যাঁহাদের সমাজে অসবর্ণা বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে—তাঁহাদেরও অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া অসবর্ণ বিবাহ করিলে বর্ত্তমান আইন অনুসারে সেই বিবাহজাত সন্তান বৈধ-পুত্র বলিয়া গণ্য বা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। এই আইন কেবল সেই আইনের ত্রুটি সংশোধন করিয়া অনেক হিন্দুর আপন বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মাচরণের বাধা দূর করিবে মাত্র।

(২) অনেকে আইনের দ্বারা সমাজসংস্কার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু সে আপত্তি বাধ্যতামূলক আইনের বেলা খাটিতে পারে, অনুমোদক আইনের বেলা খাটে না। এবং প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ আইন, বিধবা বিবাহ আইনের ন্যায় অনুমোদক আইন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বাধা দূর হইবে। সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতার প্রসারের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের এ আইনের বিরোধী হওয়া অসঙ্গত। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপরিই রাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভের যাঁহারা বিরোধী, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কোলাহল করা কেবল তাঁহাদের ছলনা মাত্র।

(৩) কেহ কেহ সৌজনিকের (Eugenics) দোহাই দিয়া বিবাহের প্রতিবাদ করিতেছেন। এ আপত্তিটা বৈদিক কালে করিলে শোভা পাইত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অসাবধানতায় আমাদের দেহে এখন কৃষ্ণ জাতির ছাপ এমন লাগিয়াছে যে তাহা অসবর্ণ বিবাহ কেন অসগোত্র ও অসপিণ্ড বিবাহ পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেও দূর মিলাইয়া যাইবে না। বরং বিপরীত ব্যবস্থা করিলে তাহা মিলাইবার কিছু আশা আছে। সৌজনিকের নিয়ম অনুসারেই অসবর্ণ বিবাহ ছাড়া অন্তর্জ্জাতিক বিবাহও এখন আবশ্যক হইয়াছে।

৬। অদ্বৈতবাদী, বিশ্বপ্রীতির প্রচারক হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত আধুনিক হিন্দু-সমাজের অসামঞ্জস্য ও তাহা দূরীকরণের উপায়।

মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্ম্মের মূল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম যাহার শাখা, গীতা পুরাণ ও তন্ত্রে যাহার সমন্বয়, তাহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ই সেই ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও গৌরব।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—(ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৯।১৪।১) ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—(ঈশোপনিষদ। ১) যে ধর্ম্মের উপদেশ; কেবল মনুষ্যে নয়, সর্ব্বজীবে দয়া ও প্রীতি যে ধর্ম্মের বিধান; স্বদেশপ্রীতি নহে, "জগদ্ধিত" যাহার নীতি;—সে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, যাহার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এ ধর্ম্মের উদারতা ও ব্যাপকতা এত অধিক যে ইহার মধ্যে কেবল ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ নহে, বৌদ্ধ পার্শি ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান হইতে জড়োপাসক ও ভূতপূজক পর্য্যন্ত সকলেই স্থান পাইতে পারে। উপনিষদেই যে কেবল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্মের সহিত অনার্য্য-ধর্ম্মসমূহের সমন্বয়ের জন্যই নবীন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। কি বৈদিক কি পৌরাণিক কালে হিন্দুধর্ম্মের অধিকারি-ভেদে উপাসনা-ভেদের ব্যবস্থা এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের জন্যই বিহিত হইয়াছে। ইহাতে পিশাচোপাসক অসভ্য জাতি হইতে অদ্বয়চৈতন্যবাদী পর্য্যন্ত সকলেরই নিম্ন স্থান আছে। জগতে এমন কোন মত নাই বা ধর্ম্মের আদর্শ নাই যাহার ইহার মধ্যে উপযুক্ত স্থান না হইতে পারে। সকল ধর্ম্মেরই একটা না একটা creed আছে। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের এ পর্য্যন্ত কেহ একটা creed বা catechism বা definition তৈয়ার করিতে পারিলেন না। ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে। ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরব। creed আছে বলিয়াই অন্য সকল ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। creed নাই বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক, অনন্ত ও সনাতন। সকল ধর্ম্মই কোন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দেবতাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাতে বিদ্বেষ-পোষণ করেন; হিন্দুধর্ম্মের মূল শ্রুতির উপদেশ,—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৩)

কেন না—

যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।
(ঐ, ৭।২৪)

সেই জন্য হিন্দুর দেবতা গীতায় বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
(গীতা, ৪।১১)

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
(গীতা ৯।২৩)

পুরাণেও হিন্দুর দেবতা 'সর্ব্বভূতসংস্থিতা—' (চণ্ডী, ৫।১৬৮০)।

বৈদিককালে অনার্য্য জাতি-সকল ও আর্য্যসমাজচ্যুত লোকেরা ব্রাত্যস্তোমের অনুষ্ঠান করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইতেন (সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়)। পরবর্ত্তী পৌরাণিক কালেও ভারতবর্ষীয় অনার্য্য বর্ব্বর জাতি-সকল, ও শক যবন কাম্বোজ হূণ প্রভৃতি

বিদেশীয় জাতি-সকল হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলে.., এখনকার অধিকাংশ রাজপুত ও ক্ষত্রিয়-রাজগণ—যাঁহারা সূর্য্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা—এইরূপে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত বৈদেশিক জাতিমাত্র। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বেদ-স্বরূপ ভাগবত পুরাণ যবন ও অন্যান্য জাতিদিগের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা বিধান করিয়াছেন,—

কিরাত হূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরকংকা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।

ইহা সকলেই জানেন চৈতন্য হরিদাস নামক যবনকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। শৈবদিগের স্মৃতি তন্ত্রশাস্ত্রেও এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাব দৃষ্ট হয়। মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে (১৪।১৮৭) আছে,

চাণ্ডালং যবনং নীচং মদ্যা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া।
কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্॥

স্ত্রীলোক ও যবনকে পর্য্যন্ত কৌল করিতে হইবে, না করিলে নরক হয়।

অন্যত্র বলা হইয়াছে—

যথার্ণসংস্থতং বারি ন পৃথক্‌ভাবমাপ্নুয়াৎ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না বর্ণা ভবেয়ুর্জনাঃ পৃথক্॥
বিপ্রাদ্যাস্তজ্জপর্য্যন্তা দ্বিপদা বেহত্র ভূতলে।
তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১৪।১৮২-১৮৩)

যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শেও অপবিত্র হয় না, সেইরূপ শৈবদিগের মতেও ব্রহ্মে নিবেদিত অন্ন নীচজাতির স্পর্শে অশুদ্ধ হয় না।

যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ।
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধিবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥

(মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৩।৯১-৯২)

এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা ভারতবর্ষে এতদিন সকল ধর্ম্মের ও জাতির সমন্বয় হইয়াছিল। এবং এখনও এই আন্তর্জাতিক সম্মিলনের যুগে এই জাতিসমন্বয়স্থাপনের কালে এই ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে। উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে এই বিশাল ধর্ম্ম এখন এক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন উদার অসাম্প্রদায়িক আচার বা মত প্রচারে বাধা দিতেছেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুনাম তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মত ও আচার হইতে অনেক বিশাল। হিন্দুধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ করিতে গিয়া তাঁহারা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিতেছেন। যদি নবযুগের উপযোগী করিয়া আমাদের সমাজকে গড়িতে হয়, তবে তাহা এই সনাতন ধর্ম্মের উদ্বোধনের দ্বারাই হইবে। ধর্ম্মসংস্কার-বিরহিত সমাজসংস্কার বা কেবল রাজনৈতিক উপায় দ্বারা আইন্ পাশ করিয়া সমাজ সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু এদেশে সমাজ ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ এরূপ অচ্ছেদ্য যে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নহে। কি পারিবারিক জীবনে কি সামাজিক জীবনে কোন সংস্কার করিতে হইলে তাহা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া করিতে হইবে। সুতরাং সমাজ সংস্কারের জন্য সেই বিশ্বজনীন উদার সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্বোধন আবশ্যক। এবং সেই বিশাল ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে অজ্ঞান, কুসংস্কার ও ভেদমূলক সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্মকে বিলীন করিতে হইবে। এই বিরাট্ ধর্ম্মের আদর্শ পুনর্ব্বার উদ্দীপিত করিতে পারিলে সেই অগ্নিতে সমস্ত সামাজিক বৈষম্য, প্রাণহীন শুষ্ক লোকাচারের জঞ্জাল গলিয়া এক অভিনব ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে পরিণত হইবে। সমস্ত সমাজ-সংস্কারকের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যাহা না হইয়াছে, একজন ধর্ম্মবীরের ক্ষণিক সংস্পর্শে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া নিমেষের মধ্যে সেই-সকল মহা পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য এই-সকল ধর্ম্মসংস্থাপকের দ্বারা যে-সকল মহা সমাজসংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা যুক্তি দ্বারা বা রাজনীতির দ্বারা কখনই হইতে পারিত না। সেই জন্য সমাজসংস্কারের ভিত্তি সনাতন ধর্ম্মের উপর স্থাপন করিতে হইবে। এবং তাহা হইলে আমরা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র জগতের আন্তর্জাতিক সমাজসংস্কার-সমস্যারও সমাধান করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় করিতে পারিব।

শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেদিনীপুরে সমাজসংস্কার সম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

মুক্তি

মনের দোরে ঘা দিয়েচে
বনের বায়ুতে—
ঢেউ লেগেচে কোণের বধূর
মরম-স্নায়ুতে।
দুয়ার খুলে', নয়ন তুলে',
বাহির চেয়ে হৃদয় দুলে!
পথের বাঁশীর সুর বাজে আজ
ঘরের সাসিতে;—
বুকের ঘাটে বান এল, প্রাণ
চায় যে ভাসিতে!

ঘোম্‌টা নাহি, কে যায় বাহি'
প্রভাত-সরণি—
নীড়ের পাখী কে যায় নভে
পাখার তরণী?
কোন্ অসীমে উধাও মরম?
শঙ্কা কি নেই? নেই কি সরম?
সত্য যাহার চিত্তে জাগে,
অম্‌নি সে কি রে?
অতীত্ করে সকল সীমা—
সকল ফাঁকিরে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

হীরার ইতিহাস

মণির মধ্যে হীরা প্রধান। হীরার মূল্য সকল মণির চেয়ে বেশী তার উজ্জ্বল লাবণ্যের জন্য আর তার দুর্লভতার জন্য। পুরাতন অরণ্যের গাছের গুঁড়ি মাটির তলে চাপা পড়িয়া চাপে ও তাপে পাথুরে কয়লা হইয়া যায়; চাপ ও তাপ আরো বেশী হইলে, কয়লা হইয়া-পড়ে হীরা। কিন্তু এই ঘটনা ঘটে খুব অল্প, তাই হীরা দুর্লভ, সুতরাং দুর্মূল্য। জগতে যত হীরা আছে তা যদি এক জায়গায় জড়ো করা যায় তবে এক ওয়াগন কয়লার চেয়ে বেশী হয় না; পিরামিডের আকারে ছোলঙ করিয়া কয়লা যেমন ঢালা থাকে, সমস্ত হীরা যদি তেমনি করিয়া জড়ো করা যায়, তবে তার তলার বিস্তার হয় আট ফুট ও চূড়া উঁচু হয় পাঁচ ফুট মাত্র। এই পরিমাণ কয়লার দাম বড় জোর ৬০।৬৫ টাকা; কিন্তু এই হীরার স্তূপের দাম গড়ে হয় ১৪০০ কোটি টাকা। আন্দাজ করা হইয়াছে যে পৃথিবীতে কাটা মাজা হীরা আছে প্রায় ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ক্যারাট অর্থাৎ ১০৷৷০ টন অর্থাৎ প্রায় ২৮৪ মোন।

হীরার দাম প্রত্যেক মণির রং স্বচ্ছতা উজ্জ্বলতা কাটার নিপুণতা ও বেদাগ অবস্থার তারতম্যে বেশী কম হয়। একখণ্ড খনিজ হীরার ওজন যদি ২৷৷০ ক্যারাট থাকে, তাহা কাটিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিলে হইয়া পড়ে ১ ক্যারাট; আকাটা আড়াই ক্যারাটের দাম দিতে যদি হয় ২০০ টাকা, কাটা ১ ক্যারাট হীরার দাম হইয়া উঠে ৫০০ টাকা। নীলাভ শ্বেত স্বচ্ছ হীরার দাম ৬০০০ টাকা স্বচ্ছন্দেই হইতে পারে; এবং হল্‌দে আভার হীরা ৪০০ টাকাতেই পাওয়া মুস্কিল নয়। নীলাভ শ্বেত স্বচ্ছ হীরারই দাম সবচেয়ে বেশী; যদিও জহুরীরা বরফের টুক্‌রার মতন শাদা হীরারই বেশী তারিফ করিয়া থাকে।

আকরজ হীরা স্বচ্ছ নির্ম্মল খুব কমই হয়; কিছু না কিছু রঙের আমেজ থাকেই থাকে। সার্ উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হীরার রং বদল করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। কাটিয়া পালিশ করিলেও হীরার রঙের একটু পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রাচীন ভারতে যখন পরিকর্ম্ম (পালিশ) ও অশ্রীকরণ (পলকাটা) দ্বারা হীরকের গুণান্তর ঘটানো হইত। প্রাচীন ভারতে শাদা লাল হল্‌দে কালচে ছায়াযুক্ত হীরা পাওয়া যাইত।

অনেক রঙিন হীরা অন্ধকারে জ্বলে। দিনের আলোর রৌদ্রতাপ অথবা বিদ্যুৎ-তাপ শোষণ করিবার এদের শক্তি আছে; অন্ধকারে রাখিলে এরা সেই শোষিত তাপ বিকিরণ করে। বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্ ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সাপের মাথার মাণিক সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে সেও এই-রকম কোনো স্বয়ংপ্রভ মণি। সাপেরা সেইরূপ মণি একটি সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং দিনের বেলা তাতে রোদ খাওয়াইয়া রাত্রে সেটি মুখে করিয়া বেড়ায়; সেই মণি অন্ধকারে জোনাকির মতন আপনি জ্বলে; তাহা দেখিয়া কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া মণির কাছে আসে ও সাপ তাদের সানন্দে আহার করিতে থাকে।

পৃথিবীতে যত হীরা পাওয়া যায় তার অধিকাংশ আগে ভারত হইতে সংগৃহীত হইত। এখন শতকরা ৯৮ ভাগ আহরণ হয় দক্ষিণ-আফ্রিকার খনি হইতে। সংগৃহীত হীরার তিন পোয়ারও বেশী অংশ কেনে আমেরিকা—শতকরা ৮৫ ভাগ। এখন আমেরিকায় ৪০০ কোটি টাকার হীরা মজুত আছে লোকের ঘরে ঘরে ভূষণে অলঙ্কারে। কোনো জাতির ধনশালিতার পরিমাণ হয় তার মণির পরিমাণ দেখিয়া। এই অনাবশ্যক বিলাসিতায় টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে গরীবের ত তেমন সাধ্য নাই; সুতরাং যে জাতির অধিকারে যত বেশী টাকার মণি থাকে সে তত ধনী বলিয়া পরিগণিত হয়। আমেরিকার মণি কেনার খরচ বছর বছর হুহু করিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। হীরা আগে রাজারাজড়ারই ভূষণ ছিল, প্রাসাদের কক্ষই তাতে আলো হইত; কিন্তু এখন আমেরিকার মুদির দোকানের বিক্রীওলী মেয়েদের গায়েও হীরার চমক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন মিশরে ফারাও রাজারা বিলাস ঐশ্বর্য্যে মগ্ন ছিল, কিন্তু তারা একত্রিশ বংশ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াও কখনো হীরার মুখ চক্ষে দেখে নাই। তবে মিশরী পণ্ডিত প্লিনি (১০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের ষট্‌কোণ হীরকের উল্লেখ করিয়াছিলেন দেখা যায়। ব্যাবিলনের চার হাজার বছরের সমৃদ্ধিতেও হীরার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে নাই।

ম্যাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেক্‌জান্দার ভারতবর্ষে দিগ্‌বিজয়ে আসিয়া গ্রীসকে ভারতের হীরার খবর জানাইয়াছিলেন। গ্রীসের পর রোমের অভ্যুদয়ের সময়ও সে দেশে হীরা সুদুর্লভই ছিল। মোস্‌লেম আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে য়ুরোপের বুকে বিরলগাঁথা হীরার মালা এক ছড়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সব হীরাই ভারত হইতে সংগৃহীত। কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কারে যাত্রা করেন তখন সমস্ত য়ুরোপে যত হীরা ছিল, এখন আমেরিকার একটা বড়রকের জহুরীর দোকানে তার চেয়ে অনেক বেশী হীরা আছে। প্রাচীন সভ্য দেশের মধ্যে ভারত ছিল হীরকমণ্ডিত। ভারতের হীরকের খ্যাতি পৌরাণিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে যে যে দেশে হীরক পাওয়া যায় তার মধ্যে ভারতবর্ষ প্রাচীন ও প্রধান। ভারতে গোলকণ্ডা ও পান্না হীরকখনির জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ। গোলকণ্ডা কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী স্থান এবং পান্না এলাহাবাদের নিকট বুন্দেলখণ্ডে। এসব জায়গায় হীরা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত পুস্তকে ভারতের হীরকখনির নির্দ্দেশ এইরূপ আছে—

হৈম-মাতঙ্গ-সৌরাষ্ট্রাঃ সৌণ্ড্র-কালিঙ্গ-কোশলাঃ।
বেণ্বাতটাঃ স সৌবীরাঃ বজ্রস্যাষ্টাবিহাকরাঃ॥

হিমালয়, সুরাট, বিহার, বঙ্গপ্রান্ত, অযোধ্যা, মহারাষ্ট্র, সিন্ধুনদসন্নিহিত দেশে আটটি হীরকখনি ছিল।

টেভার্নিয়ে দেখিয়া গিয়াছেন ভারতের এক একটা হীরকখনিতে ৬০০০০ মজুর কাজ করিত।

ভারতবর্ষ ছাড়া দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল ও দক্ষিণ-অফ্রিকার ট্রান্সভালে হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অন্যান্য মণি খনির মধ্যে নানা পদার্থের সঙ্গে তাল পাকাইয়া থাকে; কিন্তু হীরা থাকে স্বতন্ত্র স্ফটিক আকারে। ঐ স্ফটিক ছয়কোণ, আট কোণ, বারো কোণ, আটচল্লিশ কোণ হয়। ইহা প্রাচীন ভারতবর্ষেও জানা ছিল—

কোটাঃ পার্শ্বানি ধারাশ্চ ষড়ষ্টৌ দ্বাদশেতি চ।
উত্তুঙ্গ সমতীক্ষ্ণাগ্রা বজ্রস্যাকরজা গুণাঃ॥
—গরুড় পুরাণ।

হীরা কাটিয়া পল তোলা একটা মস্ত শক্ত আট—অঙ্কশাস্ত্রের সাধনার ধন পল যত বেশী হয় ততই যে হীরা উজ্জ্বল হয় তা নয়; উজ্জ্বলতা পল ও পলের কোণের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এমন কোণ করিয়া পল কাটিতে হয় যাতে আলোক-কিরণ পলের উপর পড়িয়া তার উল্টা পিঠের পলের তলা হইতে হোঁচট খাইয়া পরাবর্ত্তিত হইয়া পাশের পলের ভিতর দিয়া রামধনুরঙে ভাঙিয়া প্রতিফলিত হয়। এই বিদ্যা সুপ্রাচীন হইলেও বড় জোর পঞ্চাশ বছর হইল এর পূর্ণতা হইয়াছে। বষ্টনের হেন্‌রী মর্স নামে একজন এই হীরা কাটার অসঙ্গত প্রণালী আবিষ্কার করেন গত শতাব্দীতে। তিনি উজ্জ্বলতা সম্পাদনের জন্য হীরা কাটিয়া ছোট করিয়া ফেলিতে একটুও দ্বিধা করিতেন না। তিনি হীরার আকারের অনুপাতে তার পলের আয়তন ও সংখ্যার অঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া বাঁধা নিয়ম (ফর্ম্মূলা) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এখন সকল দেশের জহুরীরাই মর্সের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেছে। এখন হীরা কাটা হয় তিন ধরণে বা প্যাটার্নে—ছক-কাটা, পদ্ম কাটা, ও গোলাপ-কাটা।

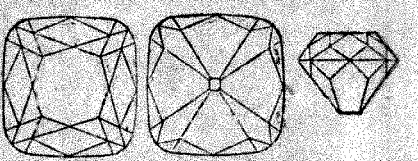

ছক-কাটা বা চৌকা-কাটা হীরা।

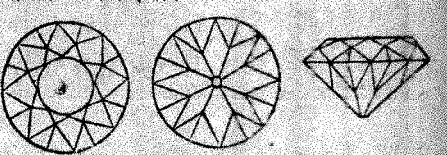

পদ্ম-কাটা হীরা।

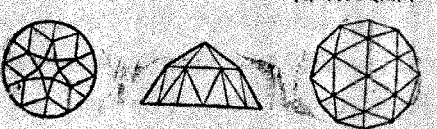

গোলাপ-কাটা হীরা।

হীরা কাটার কৌশল য়ুরোপে ১৪৫৬ সালে আবিষ্কৃত হয়। হল্যাণ্ডের রাজধানী এম্‌ষ্টার্ডাম, বেলজিয়মের এণ্টওার্প ও লণ্ডনে এই ব্যবসায় চলিতেছে। হীরার গুঁড়া তেলে মিশাইয়া ধাতুর থালের উপর হীরা খুব জোরে ও দ্রুত ঘষিলে পালিশ হয়। প্রাচীন ভারতে হীরকের যখন পরিকর্ম্ম (পালিশ) ও অস্রীকরণ (পল কাটা)

হইত। হীরক পরীক্ষণ হইত "ক্ষারোল্লেখনশালাভিঃ"—ক্ষার, উল্লেখন ও যন্ত্র দ্বারা। হীরক ভিন্ন যে হীরক উল্লিখিত হয় না তাও ভারতে জানা ছিল।

হীরা সকল পদার্থ অপেক্ষা শক্ত; এজন্য এর সংস্কৃত এক নাম বজ্র। অথচ খুব বেশী তাপ দিলে ইহা গলিয়া উবিয়া যায়। একটা দামী হীরা উবাইয়া ফ্লোরেন্সের দুজন বৈজ্ঞানিক ইহা প্রমাণ করেন। ১৭৭২ সালে লাভোয়াসিয়ে প্রমাণ করেন যে হীরা খুব বেশী তাপে পোড়ানো যায়। ১৭৯৭ সালে ইংরেজ রাসায়নিক স্মিথসন টেনাণ্ট প্রমাণ করেন যে হীরা আর কয়লা এক জিনিস।

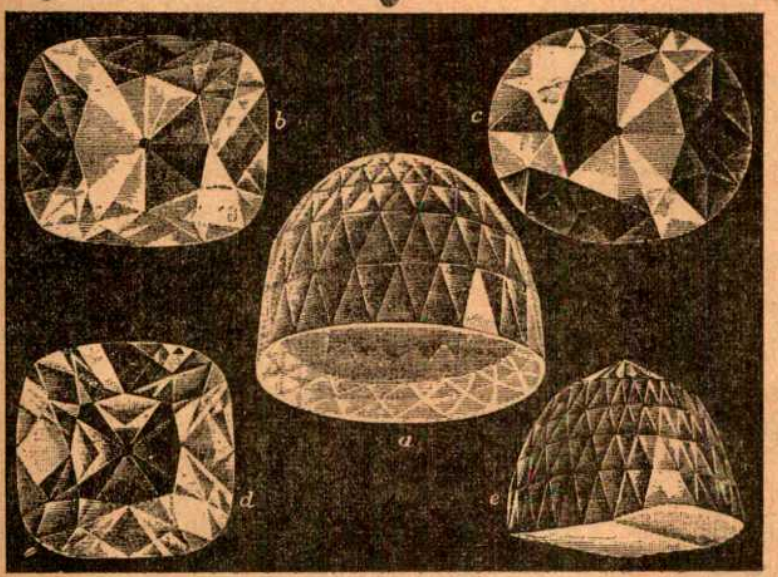

a. মহৎ মোগল; b. দক্ষিণ নক্ষত্র; c. কোহিনুর; d. রেজেণ্ট বা রাজ-অভিভাবক; e. অর্লফ।
পাঁচটি নামী ও দামী হীরার প্রকৃত আকার ও রূপ।
প্রত্যেকটি হীরা আয়তনে যতবড়, ছবিতে ততবড়ই করা হইয়াছে।

হীরার মধ্যে কি কি উপাদান থাকে জানিতে পারার পর সেই সেই দ্রব্য আশ্লেষণ করিয়া নকল হীরা প্রস্তুত করিবার রাসায়নিক চেষ্টা অনেক দিন হইতেই হইতেছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও এ চেষ্টা চলিয়াছিল। নকল ও আসল হীরা পরীক্ষার উপায় গরুড় পুরাণে বর্ণিত আছে।

উৎকৃষ্ট হীরক পরীক্ষার উপায় অনেক রকম আছে। তার মধ্যে সহজ—হীরা জলে ভাসে—লঘ্বস্তসি তরতি (বরাহ)।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে হীরা লৌহঘটিত অঙ্গার। কোনো কোনো লৌহময় উল্কাপিণ্ডের মধ্যে হীরা পাওয়া গিয়াছে। ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মতে হীরা বলাসুরের অস্থি। বল নামে এক অসুর ছিল; ইন্দ্র তাকে বজ্রাঘাতে দগ্ধ করেন; সেই বলাসুরের হাড় হইল হীরক (গরুড়পুরাণ, মহাপুরাণ, বৃহৎসংহিতা, জ্যোতিঃসংহিতা)। আবার কারো মতে দধীচির অস্থি হইতে বজ্র নির্ম্মিত হওয়ার পর যে-সব অবশিষ্ট অস্থি থাকে তাহাই হয় হীরা—এবং হীরার এক নাম সেইজন্য বজ্র। আবার কেউ বলেন মৃত্তিকার শক্তি-বিশেষই এর উৎপত্তির কারণ।

রত্নানি বলাৎ দৈত্যাৎ দধীচিতোঽন্যে
বদন্তি জাতানি।
কোচিদ্ ভুবঃ স্বভাবাৎ বৈচিত্র্যং
প্রাহুর্ উপলানাম্॥
—বৃহৎসংহিতা।

লৌহ কাচ ও অন্যান্য মণি মিলাইয়া প্রাচীন ভারতে নকল হীরা প্রস্তুত করা হইত।

সকলপ্রকার মণিরত্নের সঙ্গেই শুভাশুভসংঘটনের শক্তি সম্বন্ধে কুসংস্কার সকল দেশের লোকদের মধ্যেই দেখা যায়। য়ুরোপের লোকেরা মনে করে হীরা গায়ে থাকিলে লোক পাগল হয় না বা বিষে তার মৃত্যু ঘটে না এবং দম্পতি-কলহ ঘটে না। ভারতবর্ষেও হীরক সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল ও আছে—

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥
—ভাবপ্রকাশ।

উপন্যাসের উন্মত্ত কল্পনাও তেমন রহস্যপূর্ণ গল্প আবিষ্কার করিতে পারে না ভারতবর্ষের এক-একটি হীরা সম্বন্ধে যেমন গল্প প্রচলিত আছে। এসব তুচ্ছ বুদ্বুদের জন্য প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল হইতে কত যুদ্ধ রক্তপাত হত্যা রাজ্যধ্বংস রাজবংশ-পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে তার আর

নামজাদা হীরা।

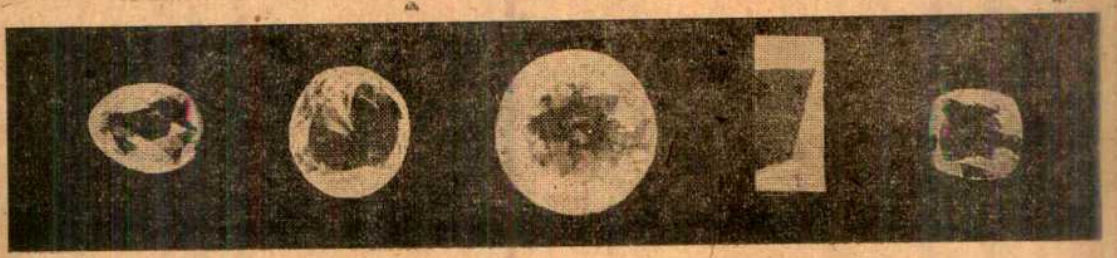

ক　　খ　　গ　　ঘ　　ঙ

(ক) সাঁসী। (খ) অর্‌লফ্‌। (গ) মোগল। (ঘ) আক্‌বর শাহ্‌। (ঙ) পোলার ষ্টার (ধ্রুবতারা)।

নামজাদা হীরা।

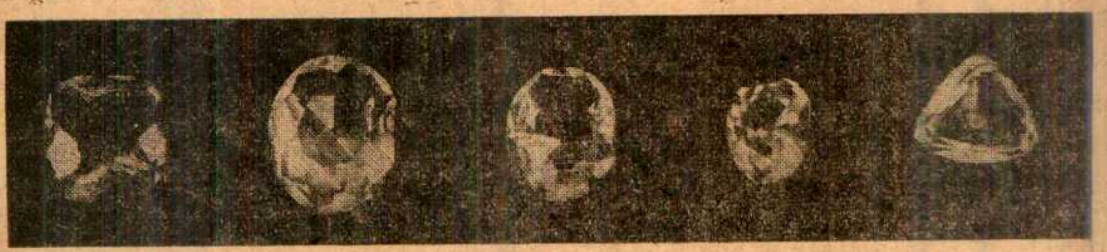

ক　　খ　　গ　　ঘ　　ঙ

(ক) রিজেন্ট বা পিট। (খ) কোহিনুর। (গ) পিগট। (ঘ) এম্‌প্রেস ইউজেনি। বড়োদার গায়কবাড়ের সম্পত্তি।
(ঙ) কাশাক, ডিউক অফ্‌ ওয়েষ্ট্‌মিন্‌ষ্টারের সম্পত্তি।

নামজাদা হীরা।

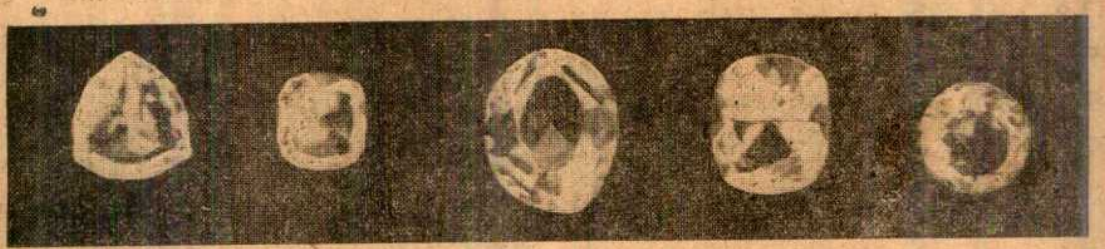

ক　　খ　　গ　　ঘ　　ঙ

(ক) ফ্লোরেন্‌টাইন হীরক। অষ্ট্রীয়ার রাজার মুকুটমণি। দাম ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। (খ) হোপ্‌ (আশা)। (গ) কোহিনুর।
(ঘ) ষ্টার অব্‌ দি সাউথ (দক্ষিণ নক্ষত্র)। (ঙ) মিশরের পাশা।

ইয়ত্তা নাই। এই তুচ্ছ অঙ্গার-জাতির জন্য লোকে কত পাপে না আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে।

বিষ্ণুর বক্ষমণি কৌস্তভ লইয়া দেব-দানবে যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের শ্যমন্তক মণির জন্য প্রসেন ও জাম্ববানের মৃত্যু,—এ ত গেল পৌরাণিক ব্যাপার।

তারপর ঐতিহাসিক যুগে মহৎ-মোগল (Great Mogul) নামে বিখ্যাত হীরার লোভে নাদির শা দিল্লি আক্রমণ করিয়া কি রক্তপাত অত্যাচারই না করিয়াছিল! এই হীরা গোলকণ্ডা খনি হইতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গিয়াছিল; এর অসংস্কৃত অবস্থায় ওজন ছিল ৯৮৭ ক্যারাট; ভেনিস দেশের এক জহুরী ইহা কাটিয়া পল তোলার পর ওজন হয় ২৮০ ক্যারাট। পর্য্যটক ট্যাভার্ণিয়ে এই হীরা ঔরংজীবের রত্নমঞ্জুষায় দেখিয়া গিয়াছিলেন ১৬৬৫ সালে। তিনি এর বর্ণনায় লিখিয়াছেন—এর আকার

প্রকৃত আধখানা ডিমের মতন। মীর-জুম্‌লা এই হীরা শা-জাহান বাদ্‌শাকে উপহার দ্যান। এই হীরাটি ছিল গোলাপ-কাটা। এই হীরাটি যে ভারতবর্ষ হইতে কোথায় গেল এ পর্য্যন্ত তার সন্ধান মিলে নাই। হয়ত পারস্যের শাহের তেহেরানের ভাণ্ডারে রত্নরাজির মধ্যে ইহা বিরাজ করিতেছে।

অর্লফ (Orloff) নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ হীরা একজন ফরাসী সৈনিক ভারতবর্ষে আসিয়া শ্রীরঙ্গমের এক দেব-মূর্ত্তির চোখ হইতে চুরি করে; সে যে-জাহাজে দেশে ফিরিতেছিল সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন চোরের উপর বাটপাড়ী করে; ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ফরাসী রাজকুমার অর্লফ ৯ লক্ষ টাকা দিয়া সেটি কিনিয়া তাঁর প্রণয়িনী রুশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিনকে উপহার দিয়া প্রণয়-কলহ আপোষ করেন। সেই হইতে উহা রুশ সম্রাটের মুকুটমণি হইয়া ছিল। এখন রুশিয়ার রাজা নাই; ভারতের এই মণি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে জানা নাই। এই হীরা হরিদ্রাভ। কেউ কেউ অনুমান করেন ইহাই লুপ্তসন্ধান মহৎ-মোগল নামক হীরা।

জগৎপ্রসিদ্ধ কোহিনুর (কোহ্-ই-নূর=প্রভা-পর্ব্বত) অনেকে কল্পনা করেন যে শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তক মণিরই ফার্সী নাম। ইহা মালব দেশের রাজবংশে বহু পুরুষ ধরিয়া ছিল। সুল্‌তান আলা-উদ্‌-দীন ১৩০৪ সালে মালব-রাজকে পরাজিত করিয়া ইহা লাভ করেন। ১৫২৬ সালে হুমায়ুন বাদ্‌শা ইহা জয় করিয়া লন। ঔরংজীবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইহা তখ্‌ৎ-তাউস বা ময়ূরসিংহাসনের এক ময়ূরের চোখে বসানো ছিল। মহম্মদ-শার রাজত্বকালে এরই লোভে নাদির-শা দিল্লি আক্রমণ করে। নাদির-শা দিল্লি অধিকার করিয়া রাজাভাণ্ডারে এই রত্ন না পাওয়াতে সন্ধানে জানিতে পারিল মহম্মদ-শা উহা পাগ্‌ড়িতে লুকাইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন ধূর্ত্ত নাদির-শা মহম্মদ-শার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করে, এবং বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ পাগ্‌ড়ি বদল করে। মহম্মদ-শাহের পাগ্‌ড়ি খুলিয়া এই রত্নপ্রভা দেখিয়া মুগ্ধ নাদির বলিয়া উঠে—কোহ্-ই-নূর—প্রভা-পর্ব্বত। সেই হইতে এই হীরা কোহিনূর নামে বিখ্যাত। নাদির-শার মৃত্যুর পর নাদিরের ছেলে শা-রুখ্ ইহা দান করেন আফ্‌গান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আহ্‌মদ শা দুরানীকে। দুরানী বংশ হইতে ১৮১৩ সালে ইহা পঞ্জাব-কেশরী রণজিত সিংহের অধিকারে যায়; তারপর ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৪৯ সালে ইহা আত্মসাৎ করিয়া ১৮৫০ সালে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়াকে উপহার দ্যায়। ইহা এম্‌ষ্টার্ডামের জহুরীকে দিয়া কাটাইয়া লওয়াতে আগের চেয়ে ছোট কিন্তু উজ্জ্বল হইয়াছে। এখন ইহা ইংলণ্ডের রাজার মুকুটমণি। এই হীরার দাম কত জিজ্ঞাসা করাতে রণজিত সিংহ নাকি বলিয়াছিলেন—পাঁচ জুতি। অর্থাৎ ইহা বীরভোগ্য, যে কাড়িয়া লইতে পারিবে ইহা তারই। কেউ কেউ অনুমান করেন যে লুপ্তসন্ধান মহৎ-মোগল নামক হীরাই এই কোহিনূর।

রিজেণ্ট বা পীট (Regent or Pitt) নামে পরিচিত হীরা ১৭০১ সালে কৃষ্ণা নদীর তীরে একজন পলাতক ক্রীতদাস কুড়াইয়া পাইয়াছিল; সে উহা লইয়া সমুদ্রকূলে পৌঁছিয়া এক জাহাজের ইংরেজ মাঝিকে বিক্রী করে। সেই ইংরেজ মাঝি বেচারাকে দাম না দিয়া হত্যা করে। প্রসিদ্ধ আর্ল অফ্ চ্যাথাম পীটের ঠাকুরদাদা টমাস পীট তখন মান্দ্রাজের গভর্ণর ছিলেন; তিনি ঐ হীরা কিনিয়া ১৭১৭ সালে আবার ফ্রান্সের রাজ-অভিভাবক ডিউক অফ্ আর্লেয়াঁকে বিক্রী করেন। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা রাজকোষের অন্যান্য রত্নের সঙ্গে চুরি যায়; কিন্তু পরে আবার উদ্ধার হইয়াছিল এবং এখনো ফ্রান্সের সরকারী ভাণ্ডারে আছে। এর দাম আন্দাজ ৫০ লক্ষ টাকা।

আক্‌বর-শা নামে একটি হীরা আকারে লম্বা ও তার উপরে আরবী বচন উৎকীর্ণ ছিল। ইহা বড়োদার মহারাজা গায়কবাড় ৪ লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়াছেন। গায়কবাড়ের সম্পত্তি আর-একটি উত্তম হীরার নাম এম্প্রেস ইউজেনী। নিজাম নামে পরিচিত হীরা হায়দরাবাদের নিজামের সম্পত্তি।

টেভার্ণিয়ে গ্রেট টেবল্ নামে একটি হীরা ১৬৪২ সালে গোলকণ্ডায় দেখিয়া যান; ইহা চৌকা। কেউ কেউ মনে করেন এখন পারস্যের শার কাছে যে দরিয়া-ই-নূর

নামে হীরা আছে সেটিই টেভার্ণিয়ের বর্ণিত গ্রেট টেব্‌ল্। পারস্যের শার আর-একটি উৎকৃষ্ট হীরার নাম তাজ-ই-মাহ্—চন্দ্রমুকুট। ইহা ফিকা গোলাপী রঙের, পেয়ারার মতন আকারের।

১৫৭০ সালে ম্যাসিয় দ্য সাঁসী নামে কনষ্টান্টিনোপলের ফরাশী রাষ্ট্রদূত ভারতবর্ষ হইতে একটি হীরা কেনেন এবং তাহা অধিকারীর নামে সাঁসী বলিয়া পরিচিত হয়। ইহা ফ্রান্সের রাজা হেন্‌রী তৃতীয় ও চতুর্থের অধিকারে যায়। চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজার এক বিশ্বাসী চাকর ইহা গিলিয়া ফেলে; চোরেরা হীরা না পাইয়া চাকরটিকে মারিয়া ফেলে। পরে মরা চাকরের পেট চিরিয়া হীরা উদ্ধার করা হয়। এবং সাঁসী তাহা পুনরধিকার করিয়া ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথকে বিক্রী করেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স্ ইহা ১৬৯৫ সালে প্রায় ৩ লক্ষ টাকায় ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রী করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা রুশিয়ায় চলিয়া যায়; সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পার্শী ধনী সার্ জমশেদ্‌জী জীজীভাই ইহা কেনেন। ১৮৮৯ সালে আবার ইহা বাজারে বিক্রীর জন্য উপস্থিত হয় এবং দাম চাওয়া হয় দু লক্ষ টাকা।

ভারতের খনিজাত আর-একটি নামী হীরা ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। তার নাম হোপ ডায়মণ্ড। এর রঙে নীল ও সবুজের আভা খেলে—ময়ূরকণ্ঠী বলা যাইতে পারে। এর অধিকারী ছিলেন যিনি তাঁর নাম ছিল হোপ। দাম ছিল তিন-চার লক্ষ টাকা। প্রথমে টেভার্ণিয়ে ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া এটি চতুর্দ্দশ লুইকে বেচেন। ফরাশী বিপ্লবের সময় ইহা নিপাত্তা হইয়া হারাইয়া যায়। তার পরে যখন আবার পাওয়া যায় তখন সেই আসল হীরার আধখানা মাত্র। য়ুরোপীয়দের কু-সংস্কার আছে যে এ হীরা যার কাছে থাকে তার অমঙ্গল ঘটে। টেভার্ণিয়ে বাণিজ্যে লোক্‌সান করিয়া জাহাজে মারা যান; ফরাশীরাজের প্রিয়পাত্রী মাদাম দ্য মন্ত্‌স্পান ইহা উপহার পাইয়াই রাজার প্রীতি হইতে বঞ্চিত হয়; তার কাছ থেকে ইহা পান ফরাশী রাজপারিষদ নিকলাস ফোকে—তিনি প্রাণদণ্ডে নিহত হন; তারপর ইহা ষোড়শ লুই ও মহিষী মারী আন্তোয়ানেৎ লাভ করিয়া বিদ্রোহী প্রজার হাতে মারা যান; এ হীরাটি লইয়া রাখেন মহিষীর এক সখী প্রিন্সেস দ্য লাম্বাল—তাঁকেও বিদ্রোহীরা বধ করে। যেসব চোর এই হীরা চুরি করে তারাও হয় গর্দ্দান দ্যায় নয় দ্বীপান্তরে যায়; যে রত্নবণিক ইহা কাটিয়াছিল সে দারিদ্র্যে প্রাণত্যাগ করে; রত্নবণিকের ছেলে চোরেদের উপর বাটপাড়ী করিয়া ইহা হাতাইয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়া বিচারের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়; তারপর এ হীরা যার অধিকারে যায় সে এমন নিঃস্ব হইয়া পড়ে যে অনাহারে তার প্রাণ যায়। তার পরের অধিকারী লর্ড হোপ দেউলিয়া হন ও তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী তাঁকে

শ্রীমতী ম্যাক্‌লীন, পূর্ব্বতারা ও আশা (হোপ) হীরায় ভূষিত হইয়া ভোজের সভা উজ্জ্বল করেন।

ত্যাগ করিয়া তাঁকে সমাজে অপদস্থ লজ্জিত করে; সেই অভিনেত্রী শেষজীবনে ঝি-গিরি কাজ করিতে বাধ্য হয়; তার পর ইহা পায় এক নর্ত্তকী লোরেন্স লেঙ্গ্রী—এই হীরা পরিয়া নাচিতে নাচিতে এক হতাশ প্রণয়ীর গুলি খাইয়া তার মৃত্যু হয়; যে রুশিয়ান বিলাসী এই হীরা ঐ নর্ত্তকীকে উপহার দিয়াছিল সেও গুপ্তঘাতকের হাতে মারা যায়; তার পরের অধিকারী অপঘাতে মারা যায়; তুর্কী

এক্‌সেল্‌সিয়র হীরক।
১৯০৫ সালে কুলিনান হীরা আবিষ্কারের আগে পর্য্যন্ত বৃহত্তম হীরা বলিয়া গণ্য ছিল।

কুলিনান হীরক—অমার্জ্জিত অবস্থায়।

সুল্‌তান আব্‌দুল হামিদ ইহা কিনিয়া সিংহাসনচ্যুত হন। তারপর ইহা আমেরিকায় পৌঁছে। এডোয়ার্ড ম্যাক্‌লীন নামে এক ধনী ইহা ৯ লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়াছেন; শ্রীমতী ম্যাক্‌লীন এই হীরা ও প্রসিদ্ধ পূর্ব্বতারা হীরা পরিয়া এক ভোজ দিয়াছিলেন—সেই ভোজের প্রতি মিনিটে খরচ হইয়াছিল ৫০০ টাকা; সকলেই মনে করিয়াছিল ঐ অলক্ষুণে হীরা এঁর বোধ হয় সহিয়া গেল; কিন্তু তাঁর একমাত্র শিশু-পুত্র মোটর-গাড়ী চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। এখন লোকের মনে কুসংস্কার আরো দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে যে ঐ হীরা অপয়া।

ভারতের খনি হইতে প্রাপ্ত আর-কয়েকটি প্রসিদ্ধ নামী দামী হীরার নাম—নাসক, পিগট, পাশা হোয়াইট স্যাক্‌সন, ষ্টার অফ্‌ ঈষ্ট্‌ (পূর্ব্বতারা), পোলার ষ্টার (ধ্রুবতারা)।

ব্রেজিলের খনিজাত প্রসিদ্ধ নামী হীরাও কতকগুলি আছে। ষ্টার অফ দি সাউথ (দক্ষিণ নক্ষত্র) যখন খনি হইতে পাওয়া যায় তখন তার দাম হয় ৬ লক্ষ টাকা; কাটা হইলে বড়োদার গায়কবাড় উহা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া কেনেন। বড়োদার মহারাজা আর একটি প্রসিদ্ধ হীরা সংগ্রহ করিয়াছেন, তার নাম এম্‌প্রেস ইউজেনী। দুই শতাব্দী আগে একজন চাষী ইহা কুড়াইয়া পাইয়া তার লাঙ্গল মেরামতের মজুরী বলিয়া এক কামারকে দ্যায়। পরে ফ্রান্সের রাণীর হারের মধ্যমণি হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাও খুব দামী হয়। তার একটি হায়দরাবাদের নিজাম ৬০ লক্ষ টাকা দিয়া কেনেন। এই হীরার নাম ভিক্টোরিয়া।

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত এক্‌সেল্‌সিয়ার নামের হীরাটি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরা ছিল। এটি ১৮৯৩ সালে একজন মজুর গাড়ী বোঝাই করিতে করিতে কুড়াইয়া পায়। ১৯০৫ সালে ট্রান্সভাল খনি হইতে একটি প্রকাণ্ড হীরা পাওয়া যায়—সেটি কুলিনান ডায়মণ্ড নামে বিখ্যাত। ট্রান্সভাল গভর্মেণ্ট এটি কিনিয়া ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডকে উপহার দ্যান। এই হীরা কাটিয়া অনেক টুক্‌রা করা হইয়াছে এবং সেগুলি জগতের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল স্বচ্ছ বেদাগ অবর্ণ হীরা বলিয়া বিখ্যাত ও সমাদৃত। এই হীরা আদত অবস্থায় ছিল ওজনে প্রায় এক সের।

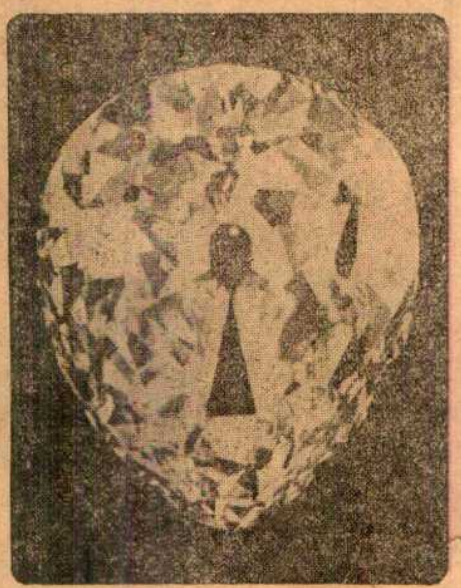

কুলিনান্ হীরক—কাটার পর বৃহত্তম খণ্ড।

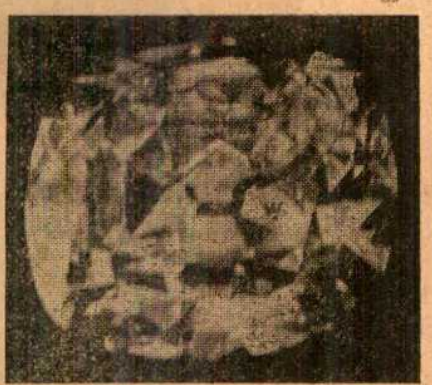

কুলিনান্ হীরকের এক অংশ—কাটার পর দ্বিতীয় বৃহৎ খণ্ড।

হীরক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে যাঁর ইচ্ছা তিনি শব্দকল্পদ্রুমে হীরক শব্দ, Encyclopaedia Britannica ও Chambers's Encycl opaediaতে Diamond শব্দ দেখিবেন এবং ডাক্তার রামদাস সেনের রত্নরহস্য ও পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির রত্নপরীক্ষা বই পড়িবেন।

জহুরী।

আলোর আড়াল

"ওরে ও খোকা, তোর দিদিকে ডেকে দে ত একবার।"

ডাক শুনে নিজেই উঠে পড়্লুম, খোকার আর ডাক্‌বার দর্‌কার হল না। দুপুর বেলাটা কাজকর্ম্ম কিছুই নেই, বসে বসে একখানা বই পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলুম। তা বইয়েরও তেম্‌নি ছিরি, মাগো মা, এত আজেবাজেও বক্‌তে পারে, কোথায় আমি মর্‌ছি হাঁপিয়ে নায়িকা আর নায়কের বিয়ে হল কি না দেখ্‌বার জন্যে, না রাজ্যির বক্তৃতা জুড়ে দিল, এর মনেই বা কি হচ্ছিল আর ওর মনেই বা কি হচ্ছিল। আরে গেল যা, মনে যা খুসি হোক্ না, বাইরে তুই গল্পটা এগিয়ে নিয়ে চল্ না। এমন সময় একটা আস্ত কলা মুখে পুরে খোকা এসে বল্‌লে, "ডিডি, সুকি-পিছি ডাক্‌সে।"

আমি ঘর থেকে বেরতেই মাও পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, "কেন, তোকে দুপুর-বেলা ডাক্‌ছে কেন? কৈ গো সুকো-ঠাকুজ্জি?"

পাড়ার সুকি-পিসি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বিধবা মানুষ, বয়েস হয়েছে, কিন্তু এখনও দিব্যি শক্ত। আঁচলের খুঁটে বাঁধা দোক্তাটুকু মুখে চেলে দিয়ে বল্‌লেন, "এই যে গো, আজ আমাদের কনককে দেখ্‌তে আস্‌বে কিনা, সেই যে গো সেই রাণীহাট থেকে যে সমন্দটা এসেছে, সেই তারা। তাই বউ বল্‌লে, 'একবার ওদের মলিনাকে ডাক না দিদি, ওর মত চুলবাঁধার হাত আর কারু দেখিনি, একটু কনকের চুলটা বেঁধে দিক।' তাই এলুম। বাবা, যা খুঁৎখুঁতুনি বরদের, সুন্দরী মেয়ে চায়, তা তিন জেলার মেয়ে খুঁজে আর সুন্দর পছন্দ হচ্ছে না। মস্ত ভারি জমিদার, টাকা-কড়ির অন্ত নেই, মোটে দুটি ছেলে। বড়টির জন্যেই মেয়ে খুঁজ্‌ছে। এখন দেখি আমাদের বরাতে যদি জুটে যায়। তা মলিনা, আয় মা একটু চট্ করে, আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, বাড়ীতে একেবারে কাজের অন্ত নেই।" সুকি-পিসি চলে গেলেন।

মা এতক্ষণ নীরবে তাঁর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন, পিসি খিড়্‌কির দরজা পার হতে না হতেই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "ওঁদের বাড়ী কনে দেখ্‌তে আস্‌ছে তা ঠাট করে

আমার মেয়েকে ডাক্‌তে আসা কেন? সুন্দর মেয়ের দেমাকে আর মাটিতে পা পড়ে না, কি আমার রূপসী বিদ্যেধরী গো! না হয় আছেই আমার কালো মেয়ে, তাই বলে যে-সে এসে বাড়ী চড়াও হয়ে অপমান করে যাবে নাকি? আর এ মেয়েও হয়েছে তেমনি ধিঙ্গি, মান-অপমান-জ্ঞান একেবারে নেই। কে একটু তু করে ডেকেছে, না অম্‌নি যাবার জন্যে নাচ্‌ছেন। লজ্জা করে না? সতেরো বছর বয়স হতে চল্‌ল এখনও পোড়া মেয়ের বিয়ের নাম গন্ধ নেই, উনি আবার আহ্লাদ করে পরকে সাজাতে যাচ্ছেন!"

মায়ের কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বাবা ঘর থেকে বলে উঠ্‌লেন, "থামো থামো, মেয়ের যে বয়েস কত তা অতখানি চীৎকার করে পাড়াপ্রতিবেশীকে খবর দিতে হবে না, এম্‌নিতেই তারা রক্ষে রাখে না। মলিনা, যা দেখি তুই মা, অনর্থক লোককে রাগিয়ে লাভ নেই।"

গায়ে একটা জামা দিয়ে একখানা ফর্‌সা কাপড় পরে কনকদের বাড়ী চল্‌লুম। ডাক শুনে প্রথমে ভারী ফুর্ত্তি হয়েছিল। নিজের কোনো বিদ্যে থাক্‌লে সেটা দেখাবার লোভ কার না হয়? তার উপর যদি কনকের মত মেয়ের অঙ্গে বিদ্যের পরিচয়টা ফুটিয়ে তোলা যায় তা হলে ত সোনায় সোহাগা। সুন্দর মানুষকে সাজিয়ে দিতে মনে ভারি একটা গর্ব্ব হয়, মনে হয় যেন বিধাতারই জুড়িদার হয়ে উঠ্‌লুম, তিনি যাকে সুন্দর করেছেন, আমি তাকে আরও সুন্দর করে তুল্‌লুম। তবে আমার মত মানুষকে সাজিয়ে দিতে বল্‌লে, যাকে বলা হত সে কাঁদ্‌তে বস্‌ত কি মার্‌তে আস্‌ত, তা জানি না, ওটা কেউ কখনো পরীক্ষা করে দেখেনি; এমন কি গল্প শুনি যখন মায়ের কোলে শিশু হয়ে সবে এসেছি, তখন মা আমাকে দুগাছি বালা দিতে চেয়েছিলেন, তাতে ঠাকুরমা বলেছিলেন, "ও মেয়ের হাতে আর এখন থেকে সোনা দিতে হবে না, ওঁকে পার কর্‌তে নিজেদের হাতে দড়ি না পড়ে তা হলেই ঢের হবে।"

সত্যি বাপু, ঢের ঢের কুৎসিত দেখেছি, কিন্তু আমার মত একটি কখনো আর চোখেও পড়ে নি। যেন মূর্ত্তিমতী অভিশাপ, আমার দিকে লোকে তাকায় কি করে তাও ত ভেবে পাই না। ছোটো বেলায় একবার সখ করে মায়ের বড় আয়নাখানায় মুখ দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, সেই প্রথম আর সেই একরকম শেষ। তার পরও অনেকবার এ পোড়ামুখের ছায়া চোখে পড়েছে, কিন্তু সে দৈবাৎ, সাধ করে আর কখনও দেখ্‌তে যাইনি।

এমন মেয়ের যে হিন্দুঘরে কত আদর তা আর লিখে জানাবার দর্‌কার নেই। তার উপরে বছরের পর বছর কাট্‌ছে, বর জোটে না, বয়স ষোলো সতেরো পার হয়ে আঠারোয় চল্‌ছে। লোককে যতই বল যে মেয়ের বয়েস চৌদ্দ, তারা আর কত দিনই বা মান্‌বে? তার উপর আমার ছোটোভাই উপেন যে এই বছর পরীক্ষা দিচ্ছে, তাকে ত আর আমার বড় ভাই বলে চালানো যায় না! বাড়ীর লোকের মেজাজ ক্রমেই গরম হচ্ছে এবং তার দহনের ভাগটা আমি বেশ ভাল করেই লাভ কর্‌ছি। মা ত আর পারতপক্ষে একটা ভাল কথা বলেন না, বাবা ভালমন্দ দুই প্রায় বলা ত্যাগ করেছেন। তার উপর যদি আমার চেয়ে চার বছরের ছোটো কনককে আজ দেখ্‌তে আসে আর তাকে সাজিয়ে দিতে আমারই ডাক পড়ে তা হলেই যে একটা অনর্থপাত হবেই এ ত জানা কথা।

যাক্‌, মায়ের বকুনি, বাবার উপদেশ, সব শুনে খিড়্‌কির দরজা পার হয়ে পুকুরপাড় দিয়ে চল্‌লুম কনকলতাদের বাড়ী। ডাক শুনে প্রথমে যে উৎসাহের আবির্ভাব হয়েছিল, সেটা এতক্ষণে একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েমানুষের রূপ যে একমাত্র মূলধন তা ত উঠ্‌তে বস্‌তে শুন্‌ছি; তার আর যাই থাক আর নাই থাক, তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি সে পরের কথা, গোড়ায় তার পথের এই সম্বলটি না যদি রইল তা হলে সে বাণিজ্যে বেরোবার আগেই যে দেউলে হয়ে বস্‌বে। আর একমাত্র উপায় তার রূপের ত্রুটি রূপা দিয়ে সংশোধন করা। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী আমার বাপের উপর কৃপা করে কেবল তাঁর বাহনটির রূপেরই কিছু ভাগ আমাকে দিয়েছিলেন; আর কোনো করুণা প্রকাশ করেননি। কাজেই এমন অবস্থায় আমার মত রূপসীকে গলায় বেঁধে ডুবে মরা ছাড়া তাঁদের যে আর কোনো উপায় নেই, একথা যদি দিনে দশবার করেও তাঁরা আমাকে শোনান্‌, তা হলে তাঁদের দোষ দিই কি করে? দেখ্‌ছি ত নিজের চোখে চেষ্টার ত্রুটি তাঁরা করেননি,

কিন্তু মানুষের চোখে কিছুতে ত ধুলো দেওয়া যায় না। গোধূলির রাঙা আলো, গোলাপী বেনারসী, সুগন্ধি পাউডার ধার-করা গহনার বাহার, কিছুতেই আমার এ খাঁটি নিকষ-কালোকে চাপা দিতে পারেনি, এ ত অনেকবার পরীক্ষা করেই দেখা হল। বিয়ে হিন্দুর মেয়ের দিতেই হবে, অথচ কোনো হিন্দুর ছেলেই আমাকে বিয়ে করবে না, এ ত বড় বিষম বালাই।

কনকদের বাড়ী পৌঁছে দেখি বেজায় ধুম বেধে গিয়েছে। পাড়ার যত বুড়ী কচি যে যেখানে ছিল সবাই এসে ছোট বাড়ীখানা ভরে ফেলেছে। বুড়ীরা বসে গল্প করছেন, আধবয়সীরা বড়লোক অতিথিকে কি দিয়ে মিষ্টিমুখ করাবেন তারি ভাবনায় আর আয়োজনের চেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠেছেন, এবং আমাদের দলের বউগুলি জুটেছেন সকলে মিলে কনককে ঘিরে বসে তার রূপকে কি করে জমিদার-বিজয়িনী করা যায় তারই উপায় ঠাওরাতে ব্যস্ত। কনকের মায়ের শোবার ঘরে তাঁদের আড্ডা বসেছে, ঘরে তিল ফেলবার ঠাঁই নেই, তক্তাপোষের উপর পাড়ার বৌঝিদের যত বেনারসী শাড়ী, ক্রেপের শাড়ী, বোম্বাই শাড়ী, পার্শী শাড়ী সব জমা করা হয়েছে, গোটা কয়েক কালো-লেশ-বসানো গোলাপী রেশমের ব্লাউস্ এবং লাল টুক্‌টুকে আধইঞ্চি পুরু মখ্‌মলের জ্যাকেটও শাড়ীর স্তূপের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে। দু-তিনটি ছোট ছোট ব্যাগ-বাক্সও অলঙ্কার গর্ভে নিয়ে হাজির হয়েছে। সম্প্রতি তর্ক উঠেছে এই যে কনের চুলের বিনুনিটা আগে চওড়া জরির ফিতে দিয়ে জড়িয়ে তার পর খোঁপা করা হবে, না শুধু চুলের খোঁপা করে সেটাকে জর্ম্মানি মুক্তোর জাল দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে। ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে আমি ভাব্‌লুম যে এঁদের হাতের সজ্জা নিয়ে বেরলে কনকের জমিদার-গৃহিণী হবার আশা যে বিশেষ থাক্‌বে তা নয়, অন্ততঃ জমিদারটির পছন্দটা যদি নিতান্তই সত্যযুগের না হয়।

আমাকে দেখ্‌বামাত্র রায়দের বিনোদিনী চট্ করে কনকের বিনুনির থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ফিরে বসে বল্‌লে, "এই যে, এতক্ষণ পরে আসল নাটের কাণ্ডারী এসেছেন, আর আমাদের কাজ নেই, আমরা জানিই বা কি আর আমাদের পছন্দই বা কি? তোমার কত বিবি-ফ্যাশান জানা আছে, তুমিই সাজিয়ে দাও; আজকালকার ছেলের পছন্দ, বিবিয়ানাতেই তারা ভুল্‌বে।"

আমি জান্‌তুম আমার হাতের কাজটা তাদের নিজেদেরও যে ভাল না লাগে তা নয়, কিন্তু সেটা সোজা ভাষায় বল্‌তে সকলেই নারাজ, বরঞ্চ এই ভাবটাই সকলে গায়ে পড়ে আমার সাম্‌নে প্রকাশ করতে ভালবাসত যে তাদের বিধিদত্ত সুরূপের কল্যাণে তাদের সাজসজ্জার অত খুঁটি-নাটির খবর রাখবার কোনোই প্রয়োজন নেই। রূপ যে প্রত্যেকেরই সুন্দর ছিল তা বলা যায় না, তবে সে কথা আমার উল্লেখ মাত্র করবার অধিকারও বিধাতা দেননি। অতএব অতি কষ্টে মুখে একটু হাসি টেনে এনে বিনোদিনীর পরিত্যক্ত জায়গাটায় বসে কনককে তাঁদের সাজের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে বস্‌লুম।

কনক মেয়েটি সত্যিই কনে সাজাবার যত্ন, তবে বড় হয়ে ঘরের গৃহিণী, দশজনের একজন হতে গেলে মানবে কি না সন্দেহ। ছোট্ট একটুখানি, গোলগাল গড়ন, একরাশ কালো কোঁকড়া চুল, ভাসা ভাসা চোখ, নাকটি চাপা, ঠোঁট দুটি লাল টুক্‌টুক্ করছে, রঙটাও ফর্শাই, তবে পাড়াগাঁয়ের জল-হাওয়ার কল্যাণে তার উপর মলিনতার ছায়া এসে পড়েছে। আমাদের গাঁয়ে সুন্দর বলে ত তার খুবই নামডাক, তবে বড়ঘরের ছেলের পছন্দও আবার বড়-রকম, তারা ত সহজে তুষ্ট হবার পাত্র নয়।

ভুরু অবধি নামানো পাতাকাটা চুলের বাহারকে কোনোরকমে কপালের মাঝামাঝি অবধি উঠিয়েছি, এমন সময় তরঙ্গিনী ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌লে, "আহা কিবা ছিরিই হল, মাঠ কপাল না বের করলে আর চলে না, ভুরু অবধি টেনে সেই ভোম্‌রা বুরুচটি কপালের উপর দিয়ে গিলে কেমন খাসা মানাত। মেয়ের নিজের যেমন চেহারা, সবাইকে তেম্‌নি না করলে ওঁর মন উঠ্‌বে কেন?"

ইচ্ছে করছিল সব ছেড়েছুড়ে উঠে বাড়ী পালাই। কিন্তু রাগ দেখাবার অধিকারই কি আমার আছে? আমার ত জন্মে অবধি সংসারের লোকের কাছে এই একমাত্র পাওনা, এ বাড়ী ছেড়ে গেলেই কি আর সে পাওনার হাত এড়াতে পারব? চুপ করে মুখ বুজে বসে কনকের চুল বাঁধা শেষ করলুম, কাপড়-জামার স্তূপ ঘেঁটে একখানা হাল্কা বাসন্তী

রঙের শাড়ী আর লাল জ্যাকেট বেছে নিয়ে তাকে পরালুম, এধার ওধার তাকালুম, কোথাও যদি একটা ফুলের নাম গন্ধ আছে, কালো চুলের এলো খোঁপার পাশ দিয়ে একটি আধফোটা লাল গোলাপ পরিয়ে দিতে পারলে ঐ লাল জামা আর লাল ঠোঁটের সঙ্গে মানাত। গয়নার বাক্স ঘেঁটে লাল-পাথর-বসানো কিছু বের করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সেখানেও কিছু কি পাবার জো আছে? কেবল চাপ চাপ সোনা। কোথাও যদি বা একটি লাল পাথর উঁকি মারছে তা অমনি তার পাশে পাঁচকুড়ি নীল সবুজ পাথর প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে আছে। আমি হাল ছেড়ে দিলুম। কিন্তু অন্তেরা ছাড়বে কেন? দেখতে দেখতে কনকের কচি মুখের দুপাশে ঝাড়লণ্ঠনের মত ভারি দুটি দুল দোল খেতে লাগল, গলায় নেক্‌লেশের স্তর বুকের মাঝামাঝি নেমে এল, পায়ে একজোড়া ঝাঁঝ মল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। কনকের পিসি নিজে পরাচ্ছেন, সেখানে আর আমি কি বলব?

কনে সাজানো ত শেষ হল, তাকে দেখবার লোকও এসে পড়ল। বৈঠকখানা-ঘরে মহা হৈ চৈ বেধে গেল, ধনী অতিথি, নীরবে তাঁর অভ্যর্থনা করলে তাঁদের সম্মানের হানি হয়। প্রতিবেশীর বাড়ীর ধার-করা রূপোর বাসনে জলখাবার নিয়ে যাওয়া হল, ঘন ঘন তামাকের পানের জন্যে চীৎকার শোনা গেল, অবশেষে এল কনে দেখাবার পালা। কনকের দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখখানি দুপুরের ফুলের মত শুকিয়ে উঠেছে, তার মা এক তাড়া দিয়ে বললেন, "এই দেখ একবার মেয়ের ছিরি! কেঁদে কেটে এইবার এক কাণ্ড কর আর কি, তা না হলে রূপ বাড়বে কেন?"

ঝি মেয়ে নিয়ে চলল, পিছন পিছন মেয়ের দলও ছুটল, পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে চোখ সার্থক করতে হবে ত? পুরুষ জাতের অধিকার আছে দেখবার যোগ্য জিনিষকে সোজাসুজি খোলাখুলি তাকিয়ে দেখবার, আমাদের অধিকার নেই বটে, তা বলে কি ইচ্ছাটাও নেই? আমাদের কাজেই আনাচে-কানাচে উঁকি মেরেই রাজার জাতটিকে দেখতে হয়।

ঘরের মধ্যে বাড়ীর লোক ছাড়াও আরও দশবারো জন বসে আছেন, তার মধ্যে গুটিকয়েক পাড়াপ্রতিবেশী, বাকি অজানাগুলিই আজ অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছেন। মেয়ের দল ফিস্‌ফিস্ করে বলাবলি করতে লাগল, "জানিস্, বর নিজেই এসেছে। আচ্ছা কোনটি বর বল্ দেখি? ঐ নীল-চশমা-পরাটি, না ঐ যে হাতে সোনার ঘড়ী পরা ঐটি?"

তাকিয়ে দেখলুম। হ্যাঁ রূপ আছে বটে, শুধু টাকার গর্ব্বেই তিলোত্তমার সন্ধানে বেরোয়নি। নীল-চশমা-পরা যুবকটি একটু পিছিয়ে বসে ছিলেন, কাজেই ঠিক করলাম তিনিই বর! অন্যটি যে তাঁর ভাই তাতে সন্দেহ নেই, চেহারা একেবারে একছাঁচে ঢালা। গায়ের রঙ দুজনেরই খুব ফর্শা, তবে বড়জনের রঙ একেবারে শাদা, রক্তের চিহ্নও নেই, ছোটজনের রঙ যেন দুধে-আলতা গোলা। মানুষ হয়ে জন্মাতে হলে এমনি চেহারা নিয়েই জন্মাতে হয়, যা দেখে লোকে চোখ ফিরোতে চায় না। আর আমি, উঃ!

বোধ হয় একটু বেশী মনোযোগ দিয়েই আমি জমিদার-পুত্রটিকে দেখছিলুম, হঠাৎ শুনলুম পিছন থেকে কনকের দিদি বলে উঠল, "দেখ্ একবার মলিনার রকম, মেয়ে একেবারে যে মজে গেলেন। আচ্ছা, ওকে যদি এক্ষুণি কনে বলে ওদের সামনে দাঁড় করান যায়, তাহলে ওরা কি করে বল্ দেখি?"

কথাটা আমাকে শোনাবার তার ইচ্ছে ছিল কি না জানি না, কিন্তু বাক্যবাণে যে মানুষ মরে না কেন তাই ভাবি। যন্ত্রণা ত কিছু কম হয় না। মনে হল যেন বুকের ভিতর কে তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে দিল। শিরায় শিরায় এমন করে যে এক মুহূর্ত্তে বিষের ধারা বইয়ে দিতে পারে মানুষ নিজের সেই কথা বলবার শক্তিকে কি করে এমন নিশ্চিন্ত মনে সারাক্ষণই কাজে লাগায়? মানুষের আইনকেও বলিহারি! সামান্য একটা আঁচড় কারু গায়ে দিলে, তার কত না শাস্তিই আছে; কিন্তু তার মনে যত বড়ই শেল মার না কেন তার কোনো জবাবদিহিরও দরকার নেই।

আমাকে যদি সত্যিই কনে বলে ঐ মানুষটির চোখের সামনে দাঁড় করানো হত, তা হলে কি যে হত তা তোমরা না জান আমি ত বেশ জানি। আমাকে দেখলে লোকের চোখে কি যে ভাব জেগে ওঠে তা ত আমার জানতে বাকি

নেই, সেই ভাবই ঐ নীলকমলের মত চোখে বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে উঠ্‌ত, পাত্‌লা ঠোঁট দুটো অনেক কষ্টে ভিতরের ঘৃণার হাসিকে সতর্ক প্রহরীর মত আগ্‌লে রাখ্‌তে চাইত, কিন্তু মুখের রেখায় রেখায় সেই হাসি ফুটে উঠ্‌ত। চিরকাল ত সয়ে আস্‌ছি, কিন্তু সেদিন কেন মনে হল এর মুখে আমি ও-জিনিষ সইতে পার্‌ব না? অনিন্দ্য রূপের সাম্‌নে আমার এই বিশ্বনিন্দিত কুৎসিততার পরাজয়!—এ আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এলুম, বাড়ীর সবাই তখনও কনকের ভবিষ্যৎ জমিদার-গৃহিণী হবার পরীক্ষার ভাবনায় ব্যস্ত, আমার পালানোটা কেউ দেখেও দেখ্‌লে না। সন্ধ্যের সময় ঘরের ভিতর বিছানা কর্‌ছি, মা বাইরে বারাণ্ডায় বসে ছোট-খুকীকে কিসুকে করে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা কর্‌ছেন, সে যত মুখে নিচ্ছে তার দশগুণ ফেলে দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে আর হাত পা ছুঁড়ে জানাতে চেষ্টা কর্‌ছে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপকার সে সইতে চায় না। এমন সময় আবার সুকি-পিসির আবির্ভাব হল; ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তেই তিনি চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "এই নাও বউ, এই থালা আর রেকাবি দুটো বুঝি তোমার এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল।" তাঁর সুর একেবারে অপ্রসন্নতায় ভরা।

মা খুকীকে মুক্তি দিয়ে বাসন ক'খানা তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লেন, "হ্যাঁ আমারই বটে। তা কনে দেখে পাত্তররা কি বল্‌লে গা ঠাকুজ্জি?"

"তাঁদের পছন্দ হল না গো, আমাদের কনক নাকি কালো, ওঁরা বাঙালীর ঘরে মেম-সায়েব খুঁজ্‌তে এসে-ছিলেন, তা কোথায় পাবেন পান গিয়ে, আমাদের মেয়ের বরের অভাব হবে না, কথায় বলে 'ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব,' বেঁচে থাকুক্ আমার ভাই, সে যতদিন রোজ্‌গার কর্‌ছে ততদিন কোনো জমিদারের নাক সেঁট্‌কানির ধার ধারি না।" কনকের পিসি প্রস্থান করলেন।

এতে আমার আনন্দ হবার হয়ত কোনো কারণই ছিল না, কিন্তু ওগো তোমরা যে মেয়ের রূপের গর্ব্বে এই রূপহীনার বুকে অমন খোঁচা দিয়েছিলে, তাকে ত প্রত্যাখ্যানের ও অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? আমাকে দেখে সে কি বল্‌বে তাই ভেবে নিজের আনন্দে তোমাদের মন ভরে উঠেছিল, কিন্তু তোমাদের আদরের দুলালীকেই বা সে কি বল্‌ল? সেই জ্যোতির্ময় মূর্ত্তিকে মনে মনে নমস্কার কর্‌লুম, তিনি যে না জেনেই আমার অপমানের প্রতিশোধ দিলেন, তিনি যে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রূপসীকেও আজ আমার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন? তোমরা, যাদের ভগবান রূপ দিয়েছেন তারা, আমার কথা বুঝ্‌বে না; কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যার দিকে চাইলে লোকের মুখে অবজ্ঞা হাসি ছাড়া আর কিছু ফোটে না, তা হলে বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন সেই অনিন্দ্যসুন্দর মানুষটিকে আমি কৃত কি অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্‌ছিলাম।

সত্যিই কনকের বিয়ে আট্‌কাল না। কিন্তু তার বিয়ের দিন বর দেখে আমিও হেসেছিলুম। বরের চেহারা দেখে যে আমারও হাস্‌বার সাহস হয়েছিল এতেই বোঝ সে কেমন দেখ্‌তে ছিল। পদ্মকলির মত ছোট্ট আর সুন্দর কনককে যখন সেই বন্যমহিষাকৃতি মানুষটির হাতে সঁপে দেওয়া হল তখন বৃদ্ধ প্রজাপতি নিজের কীর্ত্তি দেখে হাস্‌লেন কি কাঁদ্‌লেন জানি না, কিন্তু আমার চোখে জল এসেছিল, আহা বেচারী কনক! সুকি-পিসি কিন্তু দেখ্‌লুম খুব খুসি, হাত নেড়ে বল্‌লেন, "না হয় একটু রঙ কালো, তা পুরুষমানুষ কি রঙ নিয়ে ধুয়ে খাবে? বয়েস আর এমনই কি বেশী? ও বয়সে কত লোকের প্রথম বিয়েই হয় না। হ্যাঁ কনক এখন ছোট আছে বটে, তা ও-বয়সের মেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাগরটি হয়ে উঠ্‌বে, তখন আর বেমানান হবে না। তা বড়লোকের হাতেই সেই পড়্‌ল, পাত্তর ত যেমন-তেমন নয়, ওদের টাকা থাকে? দোরে হাতী বাঁধা, টাকার ছালার ওপর বসে আছে।"

এতে বুঝ্‌লুম পাত্রটি খুব বড়লোক এবং দ্বিতীয় পক্ষের। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল, কনককে যে প্রথম দেখ্‌তে এসেছিল, তার মুখ এখন কনকের মনে পড়্‌ছে। তার জায়গায় কিনা এই, যেন দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে সাক্ষাৎ বৃত্রাসুর!

কনক দুদিন পরেই চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে শ্বশুর-বাড়ী চলে গেল।

(২)

রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে, বাসন কোশনগুলো খিড়্কীর পুকুর থেকে ধুয়ে এনে সবে শোবার ঘরে ঢুক্‌ছি, এমন সময় বাবার ঝাঁঝালো গলার স্বর শুনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। মাকে বকে বল্‌ছেন, "চুপ্ কর বল্‌ছি, তোমার মেয়ের কপাল যেমন তেম্‌নি হয়েছে। এও যে হবে তাও ত ভরসা ছিল না।"

মা বল্‌লেন, "পোড়ারমুখো বিধাতা চিরকাল এম্‌নি করে আমার বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে গো! ওগো এমন সোনার-চাঁদ জামাই পেলাম যদি তবে আবার এ জ্বালা কেন?"

বাবা আবার ধম্‌কে বল্‌লেন, "মুখ্‌খুর মত চেঁচালেই ত হয় না, ওই জ্বালার জন্যেই অমন জামাই পাচ্ছ, তা না হলে যা না তোমার রূপসী মেয়ে, বর খুঁজ্‌তে ত জিব বেরিয়ে গেল, একটাও জুট্‌ল না।"

শেষের কথাগুলোর মানে ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল, বছর ছয় হল ও-রকম কথা ত দিনরাতই শোনা যাচ্ছে; কিন্তু গোড়ার কথাগুলোর ত কোনো কূলকিনারা কর্‌তে পার্‌লুম না। বিধাতা নতুন করে মায়ের পাতে কি ছাই পরিবেশন কর্‌লেন, আর তাঁর কোন্ সোনার-চাঁদ জামাইয়েরই বা কি দুর্দ্দশা ঘট্‌ল? কিন্তু বাবা মা তখুনি থেমে গেলেন, বোধ হয় আমার আসাটা টের পেয়েছিলেন, কাজেই আমার কিছুই বোঝা হল না।

পরদিন ভোরে উঠেই শুন্‌লুম আমার বিয়ে পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছে, কাল গায়ে-হলুদ, পর্শু বিয়ে; অরক্ষণীয়া কন্যা, তাকে পার যথাসম্ভব শীঘ্র করা প্রয়োজন, কাজেই মাস তিথি বার লগ্ন—কোনো-কিছুর বাধাকেই গ্রাহ্য করা হবে না।

সব ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু বরটি কে? কোথায় এমন দয়ার আর ঔদার্য্যের অবতারটিকে পাওয়া গেল, যে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করে এবং এমন কি চোখে না দেখেও আমা-হেন জীবকে গলায় গেঁথে নিতে রাজী হয়ে গেল? হিন্দু-সমাজের মেয়ের নাকি বিয়ের আগে এসব কোনো কথাই ভাবতে নেই, একজন পুরোহিত অবোধ্য ভাষায় কতকগুলো মন্ত্র আউড়ে দেবার পরই অবশ্য তারা পতিটিকে দেবতা বলে একেবারে হৃদয়-মন্দিরে তুলে নেবে এবং ফুল চন্দন নিয়ে পূজা কর্‌তে বসে যাবে, কিন্তু তার আগের মুহূর্ত্তে যদি তাঁর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও কৌতূহল তাদের মনে আসে তা হলে যে নারীর প্রধান অলঙ্কার লজ্জা একেবারে তাদের অঙ্গ থেকে খসে যাবে এবং তারা বিদেশী ম্লেচ্ছভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে একেবারে ভরাডুবি হয়ে যাবে। কিন্তু এত ভয় থাকা সত্ত্বেও আমার মনটা কেবল ঐ সমস্যার সমাধান কর্‌বার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল। কে সে, কে? কিন্তু দেখ্‌লাম, আমার জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র অন্যদের ঢেকে রাখ্‌বার শক্তি ও ইচ্ছাও ঠিক তেম্‌নি প্রবল। বাবা অনেকবার আগে আশান্বিত হয়ে সে আশা পরের কাছে প্রকাশ করে ঠকেছেন; এবারে তাঁর দৃঢ়পণ, বার বিয়ে তাকে শুদ্ধ বিয়ের আগে খবর দেবেন না। বিয়ের চিঠি ছাপিয়ে বাক্সে বন্ধ করে রেখে দিলেন, গায়ে-হলুদের দিনে চিঠি বিলনো হবে। দিন আমার জন্যে বসে রইল না, এক এক করে কাট্‌তে লাগ্‌ল। একবার করে মনে হয় মায়ের মুখের "সোনার-চাঁদ জামাই," আশায় আনন্দে মন ভরে ওঠে, কত রঙীন স্বপ্নই খোলা চোখের সাম্‌নে ভাস্‌তে থাকে; আবার তখুনি মনে পড়ে "তবে আবার এ জ্বালা কেন?" তখন অজানা ভয়ে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে।

গায়ে-হলুদের দিন সকাল থেকে পুতুলের মত বসে আছি, আজ আমার কিছু কর্‌বার দিন নয়। পাড়ার যত মেয়ে এসে ঘর ভরে ফেলেছে, বরের খোঁজ না পেয়ে তাদের কৌতূহল ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্‌ছে, তার ধাক্কা সাম্‌লাতে মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমি বিয়ের কনে তাই আমার রক্ষে। তবু তারা আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে, যদিই অতর্কিতে আমার কাছ থেকে কোনও সন্ধান বেরিয়ে পড়ে!

হটাৎ বাইরে একটা কলরব শোনা গেল। সবাই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ল. "ঐ-রে গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এসেছে!" সঙ্গে সঙ্গে একরাশ রঙীন-কাপড়-পরা লোক [illegible] আমাদের ভিতরের উঠানে ঢুকে পড়ল।

ইচ্ছে করল আমিও একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু আমি যে কনে।

ঘরের ভিতরে বসেই টের পেলুম যে একটা খুব বড় বিস্ময়ের ঢেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গিনীদের উপর এসে পড়েছে, তা না হলে তারা হটাৎ এমন চুপ হয়ে যাবে কেন? আমার কপালে এমন কি অসম্ভব সম্ভাবনা দেখা দিল?

হটাৎ তরঙ্গিণী ছুটে ঘরে ঢুকে বললে, "ওগো, একবার বেরিয়ে দেখসে, কেমন কপাল ফিরেছে, কুব্জারাণীকে বরণ করতে মথুরার রাজা এল বলে! বাবা, কার কপালে কি না থাকে! মাগো মা, তুই কি না শেষে রাজরাণী হতে চল্লি! ওমা, এই বর যে কনককে পছন্দ করলে না গো! কালে কালে কতই দেখব!" সে আবার তখুনি ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমাকে হটাৎ বিশহাত জলের তলায় যেন কে ফেলে দিলে। যে কনককে পছন্দ করেনি সেই বর? সে আর কে হবে? বিধাতা তাহলে সেই নিষ্কলঙ্ক চাঁদের বুকের কলঙ্ক হবার জন্যেই এতদিন আমাকে মজুত করে রেখে-ছিলেন? কিন্তু এ কি পাগলের স্বপ্ন, না বিকারের রোগীর প্রলাপ? অমাবস্যা আর পূর্ণিমাকে এক সুতোয় নাকি গাঁথা যায়? তরঙ্গিণী এ কি বলে গেল?

এমন সময় বাইরে শুনলুম মেয়েলি গলায় কে বলছে, "হ্যাঁ মা, আমাদের বৌমাকে একবার দেখতে পাব না?"

মা বললেন, "দেখবে বৈ কি বাছা, এর পর তোমাদেরি ত হবে। তবে আজ তার শরীরটা বড়ই খারাপ, সকাল থেকে শুয়ে আছে, মাথা ঘুরছে, উঠবার ক্ষমতা নেই।"

"ওমা তাই না কি গো, শুভদিনে এসব আবার কি?" বলতে বলতে মেয়েমানুষটি সেখান থেকে চলে গেল।

জন্মে অবধি আমার মাথা কোনোদিন ধরেছে বলে ত মনে পড়ে না। মনের বোধ হয় আর-কিছু তখন তাড়া-তাড়িতে মনে আসেনি। আমার মতন বৌকে একেবারে শাস্ত্রের দড়িতে শক্ত করে বেঁধে দেবার আগে ভরসা করে আবার বের করাও যে যায় না?

সারাদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া আর গোলমাল চলল। গায়ে-হলুদ নামে আমার কাজে, যে যেখানে ছিল সবাই-কারই হল। তত্ত্ব যেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, বিকেলে আমাকে সেখানে একবার তরঙ্গিণী টেনে নিয়ে গেল তখন বরপক্ষের লোকজন সব পেটভরে খেয়ে এবং বকশিস নিয়ে বিদায় হয়েছে। কাজেই পোষাকী সাজ-ধরাটা ভুলে রেখে ঘর থেকে বেরনো গেল।

তরঙ্গিণী বোধ হয় ভেবেছিল যে আমার জন্যে এমন রাজ-ঐশ্বর্য্যের আগমন দেখে অন্ততঃপক্ষে আমি একবার মূর্চ্ছাও যাব। কিন্তু তার প্রথম কথাটা শোনবার পর আর কিছুতে আমার আর আশ্চর্য্য হবার ক্ষমতা ছিল না। আকাশের চাঁদই যখন নেমে এল তখন কতগুলো সোনারূপো আসা এমনি কি আর বিচিত্র? কাঠের পুতুলের মত আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তরঙ্গিণী বললে, "কি গো পছন্দ হল না, তোমার যুগ্যি নয় নাকি?"

আচ্ছা পরের সুখে মানুষের এমন করে বুক ফাটে কেন? পরের দুঃখ দেখলে এই মেয়েরই ত আঁচল আপনা থেকে চোখের কোণে ওঠে, কিন্তু আজ এ কথায় কথায় এমন কেউটে-সাপের মত ছোবল মারতে আসে কেন? আমি যেন তাকেই বঞ্চিত করে তার ধন নিয়ে আসছি। থাকতে না পেরে বললুম, "আমার মত মানুষের এসব জিনিষ চোখে দেখাই সাজে। ভেবেছে হলে চমৎকার মানাত। পরে দেখবি একবার?"

"আ গেল যা, কথার ছিরি দেখ," বলে তরঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই তত্ত্বের জিনিষের বাহার ছিল বটে, কিন্তু তার দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে ইচ্ছা করল না। আবার নিজের ঘরে গিয়ে বসে রইলুম। মেয়ের দল আর আমার কাছে এল না, তারা রাত অবধি মধুমত্ত মধুকরের মত সেই জিনিষ-সাজানো ঘরটির চারিপাশেই ঘুর বেড়াল।

পরদিনই বিয়ে। 'শুভস্য শীঘ্রম্' বাবা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন, আমার বিয়ের কোনখানে অসময়ের ফাঁক তিনি রাখলেন না, কোন্ ছিদ্র দিয়ে কখন্ শনি প্রবেশ করে তার কি কিছু ঠিক আছে?

সকাল থেকে ঘরের কোণে চুপটি করে বসে আছি, আজ আমার সখীদের তত সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, আমাকে খোঁচা মারবার উৎসাহটাও তাদের কমে গিয়েছে।

নিয়তির সঙ্গে ত আর মানুষের যুদ্ধ চলে না, আমার কপালের সুখটা তাদের বাধ্য হয়েই সইতে হল।

বিকেল বেলা কনে সাজাবার পালা, এমন কনেকেও সাজতে হয়! তবু কনে যখন, তখন এই নিকষ-কালোর উপরেই লাল বেনারসী পরে সোনার গহনা গায়ে দিয়ে বসলুম। ইচ্ছে করছিল একবার উঠে আয়নায় মুখখানা দেখে আসি। কিন্তু সকলে তার মানে উল্টো রকম বুঝবে, তাই চুপ করে বসে রইলুম।

আমার বিয়ের পক্ষে ধুমধাম যথেষ্টই হয়েছিল, যে কাঁটা এতদিন বাবার বুকে লেগে ছিল, তাকে উপ্‌ড়ে ফেলতে পারবার আনন্দে বাবা মুক্তহস্তে খরচ করছেন। গাঁ সুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন, আলো বাজনা সবই হয়েছে, আমার অঙ্গেও গহনা উঠেছে, যদিও শুনেছিলুম বরপক্ষ কোনো দাবিই করেনি। পাশের ঘরেই মহা ধুম করে পিঁড়ি চিত্র করা হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকারিণীদের গল্প চলছিল, তার ভাগ কিছু কিছু আমার কানেও এসে পৌঁছচ্ছিল।

যথাসময়ে বর এল। বাজনার শব্দ, হুলুধ্বনি, শাঁখের রোল, সব মিলে যেন আকাশ ছিঁড়ে ফেলতে চায়। সবাই দৌড়ল বর দেখতে, কেবল আগ্রহ যার সব চেয়ে বেশী সে ছাড়া।

স্ত্রী-আচারের সময় ইচ্ছা করছিল মুখ তুলে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, কিন্তু পারলুম না, ঘাড় যেমন হেঁট ছিল তেমনিই রইল, মাথা নীচু করে চোখের সামনে দেখছিলুম দুখানি পা, ঠিক যেন একজোড়া শ্বেতকমল, তার উপর মাখনের মত রঙের গরদের ধুতি লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু যেন গায়ের রঙের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে। কবিতায় পড়েছিলুম শ্রীরাধিকার রাঙা পা কালো মাটিতে ফুল ফুটিয়ে তুলত, তখন ভাবতুম সে বুঝি কবির কল্পনা শুধু; কিন্তু সেদিন বুঝলুম তা সত্যি; আমার কালো পাথরের মত কঠিন কুৎসিত বুকে যে সেদিন ঐ পা দুখানি নন্দনের ফুল ফুটিয়ে তুলেছিল, তবে মাটিতে কেনই বা না ফুটবে?

শুভদৃষ্টির সময় এল। মাথায় চেলীর কাপড়ের আবরণ এসে পড়ে বর-কনেকে সকলের থেকে আড়াল করে দিল। আমার কানের কাছে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "নাও, এবার ভাল করে দেখে নাও।"

ভাল করেই দেখলুম। বুঝলুম কেন আমার এ সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। বুকের ভিতরটা যেন একবার হু হু করে গেল, তারপর মনে হল মাথার ভিতর আগুন ধরে গেল, কিছু যেন আর বুঝতে পারলুম না। আমার স্বামীর চোখ অর্থহীন ভাবে একবার সামনের দিকে ফিরল, সেই ক্ষণেই বুঝলুম তিনি অন্ধ। কনককে তিনি দেখেছিলেন তবু পছন্দ করেননি; আজ তিনি আমাকে বিয়ে করতে এসেছেন, আজ আর তাঁর চোখের পছন্দের দরকার নেই তাই।

বাসর-ঘরে দুচার জন মেয়ে একবার উঁকি দিয়েই পালাল; এই উৎসবের পাৎলা আবরণের আড়ালে কি যে নিদারুণ অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছিল, তা তাদের পুরোপুরি বুঝবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু শোকাচ্ছন্ন পরিবারের ছোট শিশুগুলিও যেমন না-বোঝা আতঙ্কে কেঁদে ওঠে, এরাও তেমনি অজানা ভয়ে যেন ত্রস্ত হয়ে চলে গেল। ঐ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে সুরসিকার হাসিও যে ঠোঁটের কোণে মিলিয়ে আসবে।

সারাবাড়ীর উপর দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে এল। নিমন্ত্রিতেরা চলে গেছে, ছোট ভাই-বোনরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। মা বাবা কোথায় তা জানবার উপায় নেই, তাঁরা নিজেদের মুক্তির আনন্দ নিয়ে আমার কাছ থেকে চিরকালের মতই যেন দূরে সরে গেলেন। এখন যখন আমার সেই গত জীবনের দিকে ফিরে তাকাই তখন বুঝি বাপের বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ী আসবার অনেক আগে থেকেই আমার বাপের বাড়ী থাকা ঘুচে গিয়েছিল, যেখানে ছিলুম সেখানে আমাকে শুধু মেয়ে বলে কেউ দেখত না, অরক্ষণীয়া কুৎসিত মেয়ে বলে দেখত, কাজেই একদিকে ছিল নিষ্ফল আক্রোশ, আর-একদিকে ছিল নির্বাক বেদনা আর বিদ্রোহ। কিন্তু যাক সে কথা।

বরকনে বাসরে ঢুকে অবধি খাটের উপর চুপ করে বসে আছি। স্বামীর মুখের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিলুম, কিন্তু সেখানে কিছুরই যে খোঁজ পাওয়া যায় না, চোখের দৃষ্টিতে যেমন ভাবহীনতা, সমস্ত মুখেও যেন তাই।

কিন্তু তবু কি সুন্দর! আমার বুকের মধ্যে যেন প্রলয়-ঝড় বইছিল; খুসি হব, না মাটিতে পড়ে কাঁদব, কিছু ভেবে পাচ্ছিলুম না। এই যে এমন সাক্ষাৎ দেবপুত্রের মত মানুষটি, ভাগ্য একে আমার কাছে আজ এনে দিয়ে গেল, এতে আনন্দ হয় বই কি, কিন্তু তার পক্ষে এ যে মর্ম্মান্তিক অভিশাপ! মনে পড়্‌ল সেই কনককে দেখাবার দিনে তার দিদির ঠাট্টা "মলিনাকে যদি কনে বলে দেখানো হয়, তাহলে কি হয়?"

ঠাট্টা আজ সত্য হয়ে দাঁড়াল! কিন্তু এখন আর তাতে হাস্‌বার কিছু রইল না; অদৃষ্টের এই ঠাট্টা যাদের উপর দিয়ে হয়ে গেল, তাদের একজনের বুকে অশ্রু ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, আর একজন শ্বেতপাথরের দেব-বিগ্রহের মত স্তব্ধ নীরব হয়ে বসে রইল, তার পূজা তোমরা পদ্মফুল দিয়ে কর্‌লে কি অপরাজিতা দিয়ে কর্‌লে তা সে চেয়েও দেখ্‌ল না। কিন্তু আমার অবস্থাটা তোমরা কি কেউ কল্পনাও কর্‌তে পার? কখনো কি এমন দশায় পড়েছ তোমার নিজের যা পরম সৌভাগ্য ছিল সেইটাই ভীষণতম দুর্গতির আকার ধরে দাঁড়িয়েছে। জান্‌তুম যে এই মানুষটি কি-রকম একান্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়েছিল যে তার জীবনসঙ্গিনীটি তার চোখের আনন্দদায়িনী হবে। আজ ভগবান তার দৃষ্টি হরণ কর্‌লেন বলে মানুষ তাকে এমন ঠকানোটাই ঠকালে! আর সেই ঠকাবার উপায় হলুম কিনা আমি, যে তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে নিজের রূপহীন দেহকে আগুনে সঁপে দিতেও পার্‌ত, তাকে দিয়েই আজ নিষ্ঠুর ভাগ্য ঐ লোকটির হাসির উৎসকে রুদ্ধ করে দিল। প্রথম দেখায় প্রেম মানুষের মনে আসে কি না এ নিয়ে ত তর্ক শুনেছি, কিন্তু একি তর্কের জিনিষ? যা যুক্তির কোনো ধার ধারে না তাকে নিয়ে যুক্তি তর্ক করাই মিথ্যে। আমি ত চোখে দেখেই ভালবেসেছিলুম, কিন্তু তাকে যে চোখে দেখ্‌তে দেওয়া হল না! এ দুঃখ আমার কোনো দিনও গেল না, যে, সে যেটাকে সবচেয়ে দুর্গতি মনে করেছিল, তাই তাকে আমার হাত থেকে নিতে হল। মেয়েমানুষ চিরকাল সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কেবল এই চায় যে তার প্রিয়তমের সুখের জন্যে যেন সে নিজের আত্ম বিসর্জ্জন দিতে পারে, কোনো দুর্গতিকেই যেন সে ভয় না করে, এই তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলে সে জানে তার জায়গায় আমার হল এই যে আমি তাঁর কাছ থেকে আলোয় মাথা তুলে দাঁড়ালুম, কিন্তু আমারই কালো ছায়ায় আমার অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মুখকে কালো করে তুল্‌লুম, সে যে তা জান্‌তেও পার্‌ল না, তাতে আমার দুঃখ বাড়্‌ল বই কম্‌ল না।

রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ তাঁর ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাতে তিনি আমার হাত চেপে ধরে বল্‌লেন, "মলিনা, তুমি মনে মনে আমাকে কত অভিশাপ দিচ্ছ জানি না। তবু এ কথা শুন্‌লে যদি তোমার কোনো শান্তি হয় তাই বল্‌ছি, আমি তোমার উপর কোনো দাবি কর্‌ব না; তুমি নিজে আমায় যদি কিছু দিতে না চাও, দিও না। সংসারিক দিক দিয়ে তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না তা তুমি জান, কিন্তু সেটা সামান্য কথা। কত সামান্য সেটা এই কয়েক ঘণ্টায় ভাল করে বুঝেছি, আগে বুঝ্‌লে তোমাকে আমার এই অন্ধকার জীবনের সঙ্গে এমন কঠিন বাঁধনে বাঁধ্‌তাম না।"

অভিশাপ দেবার অধিকার কি আমার ছিল? সেই রাত্রে তাঁর হাত নিজের হাতে ধরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম এর ক্ষতি পূরণ আমি কর্‌ব, যেমন করে পারি। বিধাতা তাঁকে দৃষ্টিহীন করেছেন আর আমাকে করেছেন রূপহীন; কাজেই চোখের দেখার সম্বন্ধ, চোখে দেখার আনন্দ, আমাদের জীবনে ঘট্‌বে না; কিন্তু দৃশ্য জগৎ ছাড়াও যে আর-এক জগৎ আছে, তার যত আনন্দ সব আমি তাঁকে দেব—দৃশ্য জগৎকে আমি তাঁর হয়ে দেখ্‌ব, আমার ভিতর দিয়ে তিনি নিজের হারানো দৃষ্টিকে ফিরে পাবেন। পুরাকালে সাবিত্রী নিজের স্বামীর দেহমুক্ত আত্মাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন; আমি আমার স্বামীর চোখের আলো ফিরিয়ে আন্‌তে না পারি, নিজের চোখ তাঁকে দেব। দেবতা-মানুষে মিলে আমাকে দিয়ে তাঁকে প্রতারণা কর্‌বে ভেবেছে, আমি তাদের হার মানাব। তারপর যদি এমন দিন কখনো আসে যে তিনি স্বীকার করেন যে আমাকে পাওয়া তাঁর পক্ষেও সৌভাগ্য হয়েছিল, সে দিন আমার সব অপমানের বেদনার অবসান হবে। সে দিন যদি নাও আসে তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু

মানুষের হাতের খেলার পুতুল হয়ে আমি মরব না, তোমরা ভেবেছ আমাকে নিজেদের ইচ্ছা আর প্রয়োজন-মত চালাবে, কিন্তু আমারও যে একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে তা আমি জানিয়ে দিয়ে যাব।

পরদিন সকালে কনে বিদায় হল। কান্নাকাটি সবাই নিয়ম-মত করল, কেবল আমি ছাড়া। আমার হয় সব কান্না চুকে গিয়েছে, নয় এখনও সব বাকি, মাঝ-পথে দাঁড়িয়ে কেঁদে আর লাভ কি? নীরবেই বিদায় হলুম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসীতা দেবী।

সোঁদাল ফুল

আজ যেন কে কুঞ্জবনে
আগুন দেছে ফুলঝুরিতে,
ফুলের পরব হলুদ-বরণ
মাতল সবার মন-চুরিতে!
ঐ দেখনা সবুজ পাতার
আড়াল হ'তে ফুলের কাতার—
মরি! দিকে দিকে বিস্ময়েরি
ছবি বাঁধা ফুল-ডুরিতে!
পল্লীপথের তোরণগুলি
দেখ্‌নারে আজ ফুল-জড়ানো,
প্রাপুড়ি-রচা গালচেখানি
পথে পথে ঐ ছড়ানো;—
ঐ যে শোভা বাইরে ফুটে
মন কি ওতে চম্‌কে উঠে?—
জানি, দুই দিকে রঙ্ ধরলে পরে
হবে না তোর আর ঘুরিতে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বিয়ের ফুল

(৪)

চঞ্চলা নদীর বাঁধের ধারেই পাথারকোলা কাছারী-বাড়ী। তার হাতায় ফুলের বাগান; তার পিছনে ফলের বাগান। হীরক সমস্ত দিন তদারকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তবু রমার উল্লাসের অভাব নাই। চঞ্চলা নদী বাঁধের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া চঞ্চলা বালিকার মতন খরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; বাগানের বেড়ায় অপরাজিতা ফুল যেন নীল নীল চোখ মেলিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে জলের সেই ব্যস্ত গতি দেখিতেছে। রমা সমস্ত দিন নায়েব-গোমস্তাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া গল্প করিয়া বাগানে বাগানে বেড়াইয়া, ছুটাছুটি করিয়াও নিজের অজস্র আনন্দ ব্যয় করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, যেন বাঁধা হরিণ-শিশু তার বনবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে!

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ মেঘ করিয়া আসিল। মেয়েরা শঙ্কিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—কানায় কানায় ভরা নদী, এর ওপর জলঝড় হলে বাঁধ উপ্‌চে গাঁ না ভেসে যায়।

অপর একজন মনের শঙ্কাকে আশ্বাসে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—না, শরতের মেঘ, এখনি হেসে চোলে যাবে।

এই সান্ত্বনা সত্ত্বেও রমার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। সে উদ্বিগ্ন হইয়া সঙ্গের দাসীকে চুপি-চুপি বলিল—লোকনাথ-দাদাকে বল্‌গে ওঁকে ডেকে আনুক।

রমা সকলের কাছ হইতে বিদায় লইয়া কাছারী-বাড়ীর দোতালার উপর একলা চুপ করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া হীরকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার কালো মেঘের অবগুণ্ঠনে নিবিড় হইয়া নামিয়া আসিতেছিল; রমার মুখখানিও ভয়ের ব্যাকুলতায় অমনি ম্লান অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছিল।

হীরক হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—টুনটুনি-পাখীর কি মেঘ দেখে ভয় করছে নাকি?

রমা জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি আমার কাছে থাকো। যদি ঝড় বৃষ্টি হয়—নদী উপ্‌চে আসে—

হীরক হাসিয়া বলিল—নদী উপ্‌চে এলেও দোতালায় তোমার নাগাল পাবে না। অধিকন্তু আমি বিলের লক্‌গেট খুলে দিতে বলেছি—জল এখনি হু হু কোরে নেমে যাবে—কোনো ভয় নেই। সন্ধ্যে হয়ে গেল, বৃষ্টিও থেমেছে—নইলে তোমায় বিলে জল পড়া দেখ্‌তে নিয়ে যেতাম।

স্বামীর আশ্বাসবাক্যে নির্ভয় হইয়া রমা আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—কাল নৌকো কোরে নদী দিয়ে বিলে বেড়াতে যাব। বিলে নাকি অনেক পদ্মফুল হয়েছে—আমি নিজের হাতে পদ্মফুল পদ্মচাকি তুলে আন্‌ব।

হীরক হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে। তোমার নিজের হাতে তোলা পদ্মফুল দিয়ে আমাদের ফুলশয্যে হবে।

রমাকে কাছারী হইতে এক ঝুড়ি পদ্মফুল ভেট পাঠাইয়াছিল। রমা সেইগুলি দিয়া একটা মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সে সেই মালাছড়া আনিয়া হীরকের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—আজ আমাদের মাল্যদান, কাল হবে ফুলশয্যা।

হীরক নিজের গলা হইতে মালা খুলিয়া রমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—ফুলের গলাতেই ফুল শোভা পায়। এ মালা তুমিই পরো।

হঠাৎ বাহিরে ব্যথিত বিরহীর চাপা কান্নার মতন হু-হু করিয়া ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি যেন আকাশ ভাঙিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুমদাম শব্দ করিয়া জান্‌লা কপাট আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, জলের ঝাপ্‌টা ঘরের মধ্যে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল; সর্ব্বত্র ব্যস্ততা ছুটাছুটি লাগিয়া গেল—চাকর-দাসীরা কপাট জান্‌লা বন্ধ করিতেছে, জিনিস সাম্‌লাইতেছে, পাইক-পেয়াদারা ডাক হাঁক করিয়া পরস্পরকে সাবধান করিতেছে।

রমা ভয় পাইয়া হীরকের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। হীরক রমাকে বাহুবেষ্টনে কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ভয় কি। শরতের বৃষ্টি বেশীক্ষণ হবে না।

ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। চঞ্চলা লক্ষ টেউয়ের হাততালি দিয়া রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছে; মেঘ বৃষ্টিধারার আঁচল উড়াইয়া উড়াপাক খেলিতেছে; বাতাস হুহুঙ্কার করিয়া গাছের মাথা ধরিয়া মাটিতে নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেছে—ধনুকের টঙ্কারের মতন গাছগুলা টিক্‌ই শব্দ করিয়া আবার সোজা হইয়া যাইতেছে এবং সেই বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কোনোটার ডাল ভাঙিতেছে, কোনোটার মূল ভাঙিতেছে, কোনোটা উৎপাটিত হইয়া পড়িতেছে।

হীরক শুষ্কমুখে বলিল—সাইক্লোন!

ঝড়—ঝড়—ঝড়—তুমুল ঝড়। লক্ষ কোটি দানব যেন রণে মাতিয়া হুঙ্কার করিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল। ফুঁয়ের মুখে কাগজের মতন ঝড়ের ধাক্কায় টিনের চাল উড়িয়া বজ্রাঘাতকে উপহাস করিয়া কড় কড় কড়াৎ শব্দে গাছ ডগায় গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ফুসের চালগুলাকে লইয়া ঝড় যেন ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল। খোঁড়াবাঁশও মট মট শব্দ করিয়া ঝড়ের ঝাপটে দুলিতেছিল।

হীরক রমাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া বলিল—চলো রমা, নীচে নেমে যাই।

রমা ভয়-পাওয়া পাখীর মতন নীরবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বামীর বুকের মধ্যে লাগিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। হীরক রমাকে লইয়া সিঁড়ির মাথায় আসিয়াছে, ঝড়ের একটা প্রবল ঝাপট আসিয়া বাড়ীতে লাগিয়া বোঁ-ওঁ-ওঁ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর আধখানা খসিয়া হীরক ও রমার উপর আছড়াইয়া পড়িল। বিকট কোলাহলের মধ্যে জানাও গেল না হীরক ও রমা চাপা পড়িয়া একটা কথা বলিবারও অবকাশ পাইয়াছিল কি না।

তখন সকলে নিজের নিজের ঘরবাড়ী ও প্রাণ পরিজন লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তথাপি দালান পড়ার শব্দ শুনিয়া প্রথমেই দৌড়াইয়া আসিল লোকনাথ, এবং তার চীৎকারে পাইক পেয়াদা নায়েব গোমস্তা। তখন রাত্রি সবে দশটা হাঁক ডাক করিয়া লোক জড়ো করিতেই ঘণ্টা খানেক সময় গেল। তখন এমন জোরে ঝড় বহিতেছে যে কেহ কারো কথাও শুনিতে পায় না, কেউ কাউকে ডাকিতে যাইতে পারে না; খোলা জায়গায় দাঁড়াইলে বৃষ্টির ছাট যেন ছররার মতন আসিয়া গায়ে বিঁধিতেছিল; গাছ পড়া, চাল ওড়া, বাঁশ পড়া দেখিয়া নিজেও উড়িয়া পুড়িয়া যাইবার

ভয়ে হৃৎকম্প হইতেছিল; তবু লোক জুটিল সেই বিষম দুর্য্যোগের পক্ষে অনেক। সকলের অগ্রণী বৃদ্ধ লোকনাথ। তার চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে, মুখে বিলাপের করুণ ক্রন্দনের বিরাম নাই, তবু সে ক্ষিপ্তের মতন কোদাল ধরিয়া খসিয়া-পড়া বালি চুন সুর্কী সরাইতেছিল। ঝড় জলে হারিকেন লণ্ঠনের আলোও টিকিতেছিল না; সকলকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কাজ করিতে হইতেছিল; তাই কাজ করিতে হইতেছিল ভয়ে ভয়ে—কোদাল শাবলের খোঁচা হীরক বা রমার গায়ে না লাগিয়া যায়। ঝড়ের ধাক্কায় একএকবার আধ-ভাঙা বাড়ী কাঁপিয়া হেলিয়া মটমট করিয়া উঠিতেছে এবং চাপা পড়িবার ভয়ে সব লোক একএকবার ছুটিয়া পলাইতেছে। কেবল লোকনাথের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রাণের মায়া নাই, দেবতার ভ্রূকুটি দেখিয়া ভয় নাই।

ঝড় জল থামিল তখন রাত্রি দুটা। সমস্ত রাত রাবিশ ইট কড়ি বরগা সরাইয়া হীরক ও রমার দেহ যখন বাহির হইল তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজকার উষাকে পক্ষীকাকলি আরতি করিয়া আবাহন করিল না; এ যেন দেবাসুরের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বিজয়-গৌরবে চামুণ্ডার হাসি।

বৃদ্ধ লোকনাথ এতক্ষণ সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া যুঝিতেছিল; হীরক ও রমার পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ দেহ বাহির করিয়া যখন পরিষ্কার জায়গায় আনা হইল তখন আর সে নিজেকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না; "ভাইরে, এ কি হল রে!" বলিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া সে হীরকের পাশে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং ক্লান্তি উদ্বেগ ও শোকে সেও মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

হীরক ও রমার দেহ দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল না জীবন আছে কি না। তবু তাদের মরণ-আলিঙ্গন শিথিল করিয়া ঘরে বিছানার উপর শোয়ানো হইল; গায়ের ধূলা বালি ধোয়াইয়া মুখে চোখে জল দেওয়া হইতে লাগিল; লোকের পর লোক ছুটিল দিকে দিকে ডাক্তার ডাকিতে।

খবর গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। প্রজারা সব নিজেদের ধ্বংসপ্রায় ঘরকন্না মুমূর্ষু পুত্রকন্যা ফেলিয়া হায় হায় করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। কাল যে গ্রাম জনপ্রিয় জমিদারের আগমনে আনন্দের উৎসবক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল, রাত না পোহাইতেই তাহা শ্মশানের হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কাছারীর উঠানে শোকার্ত্ত প্রজার ভিড় জমিতে লাগিল।

গেঁয়ো ডাক্তার আসিয়া তার অল্প বিদ্যা লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। তার ফলে এইটুকু বুঝিতে পারা গেল হীরক বাঁচিয়া আছে, কিন্তু রমার জীবনের আর কোনো চিহ্নই নাই। তখনই মোটর দৌড়িল নবগ্রামে; জমিদারী ডাক্তারখানার এসিটাণ্ট সার্জ্জনকে লইয়া আসিবে।

মোটর ফিরিতে বিকাল হইয়া গেল; আসিল ডাক্তার ও ম্যানেজার। ডাক্তার আসিয়া দেখিল রমার মৃত্যু হইয়াছে দম বন্ধ হইয়া; হীরকের মাথায় ও শিরদাঁড়ায় চোট লাগাতে তার চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে—মৃত্যু শীঘ্র না হইলেও জড়বুদ্ধি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকার আশঙ্কা আছে। ডাক্তারের শুশ্রূষার অনেকক্ষণ পরে হীরক চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু চোখে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল না—কেমন ফ্যালফ্যাল করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

ডাক্তারের আদেশে রমার দেহ সেখান হইতে সরাইয়া লওয়া হইল, এবং ম্যানেজারের আদেশে চঞ্চলার তীরে হীরকের প্রিয়তমার দেহ ভস্মশেষ হইয়া গেল।

হীরকের জীবন আছে, জ্ঞান হইতেছে, শুনিয়াই লোকনাথ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। এবং একটু পরেই চোখের জল মুছিয়া হীরকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারের পরামর্শে হীরককে মোটরে শোয়াইয়া নবগ্রামে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। মোটরের উপর তক্তা পাতিয়া তারই উপর ধরাধরি করিয়া হীরককে শোয়ানো হইল। সঙ্গে রহিল ডাক্তার ও লোকনাথ।

লোকনাথ মোটরে চড়িতে গিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বৌমাকে এখানে রেখে গিয়ে মার কাছে কেমন কোরে মুখ দেখাব? খোকা-বাবুর জ্ঞান হলে—বৌমাকে যখন খুঁজবে তখন তাকে কি বল্‌ব?

ম্যানেজার ও ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাকে নিষেধ করিল—হীরকের জ্ঞান হইতেছে, এখন তার কাছে কিছু প্রকাশ করা ঠিক হইবে না।

লোকনাথ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে গিয়া গাড়ীতে চড়িল।

মোটর যখন নবগ্রামে আসিয়া পৌঁছিল তখন মোটরের শব্দ পাইয়াই সুমতি একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরু ফিরে এল?

দুর্ঘটনার খবর সবাই শুনিয়াছিল, কেবল সুমতিকে শোনাইতে কেউ সাহস করে নাই। দাসী চলিয়া যাইতে যাইতে কান্নাচাপা স্বরে বলিয়া গেল—কি জানি।

সুমতি বাহির হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিতেই দেখিলেন চাকরেরা ধরাধরি করিয়া হীরুকে উপরে তুলিয়া আনিতেছে। পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়াই একেবারে আড়ষ্ট আকাট হইয়া সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—লোকনাথ, কি হয়েছে রে?

লোকনাথ উপরে উঠিয়া আসিয়া মার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—কাল ঝড়ে আমাদের সর্ব্বনাশ কোরে গেছে মা।

সুমতি একবার ছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—প্রাণ আছে ত?

—প্রাণ ধুকধুক করছে। জ্ঞানচৈতন্য কিছুই নেই। এ কি হল মা?—বলিয়া লোকনাথ আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমতি আড়ষ্ট হইয়া শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌমা? বৌমা কৈ?

লোকনাথ চাপা কান্নার মধ্যে কথা জড়াইয়া বলিল—সোনার প্রতিমাকে চঞ্চলার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি মা।

সুমতি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া সেখানেই শুইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁর ছিল হৃদ্‌রোগ; এই আঘাতে দুর্ব্বল হৃদয় ক্লান্ত হইয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

অনেক তাহুতের পর যখন তাঁর জ্ঞান হইল তখন তিনি ক্ষীণ স্বরে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরু আমার বাঁচবে ত?

ডাক্তার ভরসা দিয়া বলিল—প্রাণের কোনো ভয় নেই।

ডাক্তারের কথার স্বরে প্রাণের ভয় ছাড়া অপর রকম একটা আশঙ্কার আভাস ধরিতে পারিয়া সুমতি বলিলেন—তবে?

ডাক্তার বলিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া সুমতি বলিলেন—আমার কাছে লুকোবেন না; আমায় সমস্ত স্পষ্ট কোরে বলুন কি ভয় করছেন আপনি।

ডাক্তার বলিল—পক্ষাঘাত হবার ভয় আছে।

সুমতি ম্যানেজারকে বলিলেন—জেলা থেকে সিভিল সার্জ্জনকে আনতে টেলিগ্রাম করুন; আর টেলিগ্রাম করুন আনন্দ-বাবুকে, কল্‌কাতা থেকে দুজন বড় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে তিনি আসবেন। ডাক্তার-বাবু, আমার হীরুকে ভালো কোরে তুলুন, আমার আর নেই।

সুমতি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার ও ম্যানেজার সান্ত্বনা দিয়া তাঁকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ডাক্তার বলিল—আপনার ছেলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে; এখন আপনি উতলা হলে অসুখ বাড়বে যে মা।

সুমতি বলিলেন—আমি এখন মোটেই যে বাঁচি বাবা। আমার ঘরের লক্ষ্মী বৌমা গেল, হীরুর অমন দশা হল—এতেই আমার বুক যে ভেঙে যাচ্ছে।

ম্যানেজার বলিল—আপনি না থাকলে বাবুকে দেখবে কে? এখন জ্ঞান ফিরে আসছে—এখন আপনাকে দেখতে পেলেও তাঁর মন অনেকটা সুস্থ হবে।

সুমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আমার বৌমা যদি থাকত তবে সে আমার হীরুকে ভালো কোরে তুলতে পারত। আমিই পোড়াকপালী আমার মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম। হীরু যখন বৌমাকে খুঁজবে তখন তাকে কি বলব বাবা? বৌমা নেই শুনলে কি সে আর বাঁচবে?

সুমতি নিজে অনুরোধ করিয়া রমাকে হীরুকের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন; তাঁর মন তাই নিজেকে অপরাধী, তার মৃত্যুর কারণ বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল। তিনি আকুল ক্রন্দনে শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন—মা আমার ফিরে এস, ফিরে এস। তোমাদের বালাই নিয়ে আমারই যে আগে যাবার কথা মা। আমার হীরুর যে তুমি আনন্দধনি ছিলে। আমার একটু অসুখ হলে তোমার মুখ শুকিয়ে যেত, চোখের জল পড়ত। আজ তোমার মা মৃত্যুশয্যায় পোড়ে তোমায় ডাকছে তুমি কোথায় মা?

কাঁদিতে-কাঁদিতেই সুমতি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ঔষধ দিতে দিতে মুখ বিকৃত করিয়া ম্যানেজারকে বলিল—অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আস্‌ছে। টেনেটুনে এক আধ মাস যদি রাখা যায়।

ম্যানেজার ম্লান মুখে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল—আর বাবু?

ডাক্তার মৃদু স্বরে বলিল—বাবুরও অবস্থা ভালো নয়—ঐ-রকম জড় হয়ে পাঁচ সাত বছরও থাক্‌তে পারেন।

ম্যানেজার ম্লান মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এমন সময় একজন চাকর আসিয়া ডাক্তারকে খবর দিল—বাবু চোখ তাকিয়েছেন।

ডাক্তার বলিল—চলো, আমি মাকে একটু সাম্‌লে রেখে যাচ্ছি।

হীরক চোখ মেলিয়া চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া যেন সমস্ত ব্যাপারটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকনাথ ইহা দেখিয়া উল্লসিত হইয়া হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ক্রন্দনকম্পিত স্বরে ডাকিল—খোকা, খোকা, ভাই!

হীরক এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বলিল—অ্যাঁ?

লোকনাথ যেন কৃতার্থ হইয়া বলিয়া উঠিল—আমায় চিন্‌তে পার্‌ছিস্ ভাই?

হীরক মৃদুস্বরে বলিল—লোকাদা!

লোকনাথ আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না, সে দুই হাতে হীরককে জড়াইয়া ধরিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হীরক একটুক্ষণ অবাক হইয়া লোকনাথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—লোকাদা, রমা? রমা কেমন আছে? রমা কই?

লোকনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিছন ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই আর শোক লুকাইতে পারিল না, ঘরের চৌকাঠ পার হইবার আগেই কাঁদিয়া ফেলিল।

হীরক চোখ বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে তীব্রস্বরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিল—লোকাদা!

লোকনাথ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হীরকের আরক্ত চক্ষুতে কঠোর দৃষ্টি দেখিয়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া আসিল ও মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাই? অমন কেন কর্‌ছ?

হীরক কঠোর স্বরে বলিল—রমা কই বল্?

লোকনাথ থতমত খাইয়া কি মিথ্যা কথায় হীরককে শান্ত করিবে ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় ডাক্তার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তারকে দেখিয়াই হীরক রুষ্ট স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—ডাক্তার-বাবু, আমরা দুজনে ছাত চাপা পড়েছিলাম, দুজনকেই যদি বাঁচাতে না পার্‌লেন তবে আমায় কেন বাঁচালেন? আমি ত দেখ্‌ছি আমার হাতপা সব অবশ হয়ে গেছে। পক্ষাঘাতে আধমরা হয়ে থাকার চেয়ে আমার রমার সঙ্গে যাওয়া যে ভালো ছিল।

বলিতে বলিতে হীরক কাঁদিয়া ফেলিল।

হীরকের কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া খুসী হইয়া ডাক্তার বলিল—আপনি মার কথা ভাব্‌ছেন না? আপনার শক্তি শিগ্‌গির ফিরে আস্‌বে—আপনি ভয় কর্‌বেন না।

হীরক হতাশ ক্রন্দনের মধ্যে বলিল—আর শক্তি! আমার যে শক্তি ছিল সে যে আমায় ছেড়ে গেছে! আমি মার কাছ থেকে তাকে নিয়ে গেলাম, মাকে আর ফিরিয়ে দিতে পার্‌লাম না!—মাকে আমি মুখ দেখাবো কি কোরে!

ডাক্তার বলিল—আপনি এত উতলা হবেন না। মার খুব ঘন ঘন ফিট হচ্ছে; আপনাকে কাতর দেখ্‌লে তাঁকে বাঁচানো যাবে না।

হীরক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—মা মা মা! ডাক্তার-বাবু, আমাকে মার কাছে নিয়ে চলুন—মাকে আমি দেখ্‌ব।

ডাক্তার বলিল—এখন তাঁর কাছে গেলে তাঁর মন চঞ্চল হবে। কাল ভালো হয়ে আপনি নিজে হেঁটে তাঁর কাছে যাবেন।

হীরক আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার কান্নায় বাধা দিল না। ডাক্তার আশা করিতেছিল কান্নার আক্ষেপবিক্ষেপে হীরকের আহত স্নায়ু শিরা অস্থি মজ্জা জাগ্রত সবল সতেজ হইয়া উঠিবে।

(৫)

আনন্দ-বাবু হীরকের ম্যানেজারের টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতার দুজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া নবগ্রামে আসিয়াছেন। ডাক্তারেরা হীরকের ঘরে প্রবেশ করিতেই তাঁদের সঙ্গে আনন্দ-বাবুকে দেখিয়াই হীরক একটু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এঁরা কে জ্যাঠামশায়?

আনন্দ-বাবু অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন—এঁরা ডাক্তার, তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন বাবা।

হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—কে বল্‌লে আপনাদের এইসব উপদ্রব জোটাতে? আমি ভালো হতে চাইনে, আমি ভালো হব না। [ক্ষমা আমার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে গেছে—আমার নড়্‌বার শক্তি নেই যে আপনাদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করি। আপনাদের পায়ে পড়ি আপনারা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান .....

হীরকের দেহ নিস্পন্দ নিশ্চল, অথচ তার মন অত্যন্ত উত্তেজিত বিচঞ্চল হইয়া কেবল তীব্র তীক্ষ্ণ কথায় আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল।

আনন্দ-বাবু নিকটে আসিয়া তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুজড়িত স্বরে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—বাবা, তুমি মৃত্যু কামনা কর্‌ছ, কিন্তু তোমার এ অবস্থায় মৃত্যু যে শীঘ্র হবে তার ত কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন অক্ষম হয়ে পোড়ে থাকা কি বাঞ্ছনীয়? তোমার মার কথা তুমি ভেবে দেখ্‌ছ না? তুমি ভালো না হলে যে তোমার মা ভালো হবেন না।

মার নামে হীরকের মন দ্রব হইয়া গেল, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—মা মা মা!

ডাক্তারেরা সেই অবকাশে হীরককে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিতেই হীরক আবার উগ্র উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি বোলে আপনারা কি আমার কথা শুন্‌বেন না? ম্যানেজার-বাবু, এঁদের এখান থেকে যেতে বলুন।

রোগীকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইতে দেখিয়া ডাক্তারেরা ভয় পাইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমরা চোলে যাচ্ছি।

ডাক্তারেরা হীরককে যতটুকু দেখিবার অবকাশ পাইলেন তাতেই তাঁরা বুঝিলেন যে তার অবস্থা খুব খারাপ। তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াই জীবন কাটাতে হইবে, এবং সেই জীবনের মেয়াদও পাঁচ সাত বছর বড় জোর। হীরকের বলিষ্ঠ শরীর বলিয়া ঐ আঘাত সহিয়া এখনো টিকিয়া আছে; চাই কি ভালো হইয়াও উঠিতে পারিত যদি বাঁচিয়া থাকিবার কোনো স্পৃহনীয় টান তার জীবনের প্রতি থাকিত। তার প্রিয় পত্নীর মৃত্যুর শোকে তার মন ব্যথিত হইয়া আছে, জীবনে সে আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছে না; এ অবস্থায় তার মা তার কাছে থাকিলেও অনেকটা সান্ত্বনা সে পাইত। কিন্তু তার মার অবস্থা তার চেয়েও সঙ্কটাপন্ন—এখন-তখন অবস্থা। এ অবস্থায় তাঁকে ছেলের কাছে লইয়া যাওয়াও উভয়ের পক্ষেই বিপদসঙ্কুল;—ছেলের অবস্থা দেখিয়া মা ও মার অবস্থা দেখিয়া ছেলে যে প্রবল দুঃখের আঘাত অনুভব করিবে তাতে দুজনেরই মৃত্যুকে ডাকিয়া নিকটে আনা হইবে। যদি একের সম্মুখে অপরের মৃত্যু ঘটে তবে ত আর কথাই নাই—সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ইহা একটা মস্ত বাঁচোয়া যে সুমতি বধূর শোকে হীরকের কাছে যাইতে চাহিতেছে না; জ্ঞান হইলেই তিনি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষীণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া কেবলই বলিতেছেন—আমার ঘরের লক্ষ্মীপ্রতিমাকে আমি নিজের হাতে তুলে বিসর্জ্জন কর্‌লাম। আমি এ মুখ হীরুকে কেমন কোরে দেখাব? বৌমা বেঁচে থাক্‌লে যে হীরু আমার বৌমার যত্নে ভালো-বাসায় চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ত! এখন হীরুকে আমার কে দেখ্‌বে।

সুমতির মনের মধ্যে এই সমস্যাটাই এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—পীড়িত হীরককে কে দেখিবে? তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ডাক্তারেরা যাই বলুক তাঁর আর বেশীদিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন তাঁর মৃত্যু না হইতেছে ততদিনও তাঁকে শয্যাগত হইয়াই থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় পীড়িত শোকার্ত্ত অক্ষম হীরককে দেখিবে কে? মাইনে-করা চাকর-দাসী হাজার করিলেও যত্নে ত্রুটি ঘটিবেই; যেখানে আপনার বলিয়া টান নাই, মমতার দরদ নাই সেখানে কেবল কর্ত্তব্যের সেবা-যত্ন প্রাণের টানের অভাব

পূরণ করিতে পারে না। হীরকের অর্থের লোভে অনেক আত্মীয় আসিয়া জুটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তারা হীরকের চেয়ে হীরকের অর্থের ও নিজেদের স্বার্থের যত্নই অধিক করিবে। এক লোকনাথ আছে—কিন্তু সেও ত শুধু মাইনের সম্পর্কে আবদ্ধ, তাতে আবার সে পুরুষমানুষ। হীরক যে শিশুর চেয়েও অসহায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এখন তার অভাব অনুভবে বুঝিয়া পূরণ করিবার ক্ষমতা আছে শুধু মার, স্নেহপ্রাণ পত্নীর, অথবা মায়ের জাত কোনো আত্মীয় স্ত্রীলোকের। যেখানে যত আত্মীয় স্ত্রীলোক ছিল সকলকেই একে একে সুমতি স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এমন কাউকেই তাঁর মনে হইল না যে তাঁর অথবা রমার স্থান অধিকার করিয়া হীরকের যত্ন করিতে পারিবে, যার শুশ্রূষা হীরক প্রসন্ন মনে সহ্য করিবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছে পক্ষাঘাত রোগ ইচ্ছাশক্তির অভাবের ফল; যদি হীরক শোক ভুলিয়া জীবনে আনন্দ অনুভব করে তবে তার রোগও সারিয়া যাইতে পারে। কি করিলে হীরকের মনে জীবনের মাধুর্য্য ও বাঁচিয়া উঠিবার আগ্রহ ফিরাইয়া আনা যায়? আহা, রমা যদি হীরকের মতন পঙ্গু হইয়াও বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে তার জন্যই হীরক চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিত, তার মনে রমার যত্নের আগ্রহ তাকে সুস্থ সবল করিয়া তুলিত। আর কাউকে দিয়া কি রমার স্থান পূরণ করা যায় না? যদি হীরকের আবার বিয়ে দেওয়া যায়? এমন পঙ্গু নিস্পন্দ মরণাপন্নকে মেয়ে দিবে কে? বাংলা দেশে মেয়ের অভাবও নাই, কোনো মূল্যও নাই; আইবুড়ো নাম খণ্ডাইতে পারিলেই মেয়ের বাপ মা বর্ত্তিয়া যায়; এ ত আবার ধনী বর, বড় ঘর; হোক না বর শয্যাগত অস্পন্দ জড়, অনেক মেয়ে তার জন্য পাওয়া যাইবে এবং তার বাপ মা ও আত্মীয় স্বজন সবাই সমস্বরে বলিবে মেয়ে অনেক তপস্যা করিয়া চাঁপা ফুলে হর পূজিয়া তবে অমন বর ঘর পাইয়াছে। কিন্তু এই যে সব মেয়ে তারা ত সব খুকী বলিলেও হয়; তারা কি শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই স্বামীর দরদ বুঝিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিবে? হীরকই কি তেমন মেয়েকে বিয়ে করিতে চাহিবে? একটি এমন বড় মেয়ে পাওয়া যায় যার স্বভাব প্রকৃতি জানা আছে, যার মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যে নিজে বুঝিতে পারে ও যাকে বুঝিতে পারা যায়, যে সেবায় উৎসুক মমতায় আগ্রহান্বিত, তবে হয় ত হীরককে রাজি করানো যাইতে পারে। কিন্তু যার নিজের ভালোমন্দ বিচারে বয়স ও বুদ্ধি হইয়াছে সে হীরকের মতন স্বামীকে স্বীকার বা করিবে কেন এবং ভালোই বা বাসিতে পারিবে কেন সবচেয়ে ভালো হয় যদি এমন একটি ভালো মেয়ে পাও যায় যে প্রকৃতিতে স্নেহময়ী, স্বভাবে শান্ত ও সৎ, হীরবে বিবাহযোগ্যা এবং সে আসিয়া হীরকের সেবার ভার মা গ্রহণ করিবে প্রথমে অর্থের অনুরোধে এবং ক্রমে উভয়ে মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইলে দুজনেই দুজনকে চাহিবে স্বাধে টানে! কিন্তু জগৎসংসারটা ত মানুষের ফরমাসে তৈরিও ন মানুষের ফরমাস-মতন এখানে কিছু পাওয়াও যায় না, এখানে আগে হইতেই কারিগরের খেয়াল-খুসীতে তৈ হইয়া আছে, তারই ভিতর হইতে বাছিয়া লইতে হয় যার কপাল ভালো তার মনের সঙ্গে মানানসই হইয়া যায় কিন্তু অধিকাংশেরই জামার কাটছাঁট যেমন মনের মতন না, কোথাও কুঁচকাইয়া থাকে, কারো ঢলঢল করে, কাঁ আঁট হয়—নিত্য বোতাম ছেঁড়ে, কেউ বা বোতাম টাঁকি লয়, কেউ বা সুতা বাঁধিয়াই কাজ চালায়, কেউ বা হতা হইয়া হাল ছাড়িয়া দ্যায়—বুকের কাছটা খোলা হাঁ-করিতেই থাকে; কারো জুতো ঢল—ফসফস করে, কা বা আঁট—পায়ে প্রথম-প্রথম ফোস্কা পড়িতে থাকে, তারপ কড়া পড়িয়া যায়—কিন্তু তারও কি যন্ত্রণা কম!—তেম সংসারটাতেও অধিকাংশের ভাগ্যে মনের মতন মানানস অবস্থা জোটে না।

সুমতির মনের মধ্যে এই সমস্যা যত জটিল হইয়া উঠিতে ছিল তিনি ব্যাকুল হইয়া রমার শোকে তত কাঁদিতে ছিলেন—মা আমার, মা আমার, আমার হীরুকে তুই সাবিত্রীর মতন যমের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে বাঁচাতে পারতিস্—সে অমৃত-শক্তি যে তোর প্রাণে ছিল মা!

বধূর মৃত্যুতে কোনো শাশুড়ী এমন কাতর কখনে হয় নাই বোধ হয়। একে ত রমা সুমতির মেয়ের মত প্রিয় ছিলই, এখন তার মূল্য আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল সুমতি আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ও হীরকের অসহায় অবস্থ সম্ভাবনায়। সুমতির ব্যাকুলতা দেখিয়া ডাক্তার চিন্তি

ভীত হইয়া উঠিতেছিল—বিকল হৃদয়যন্ত্র যে কোনো মুহূর্ত্তে স্থগিত অস্পন্দ হইয়া যাইতে পারে।

আনন্দ-বাবু সব শুনিয়া সুমতির ইচ্ছা বুঝিয়া একটুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—আপনি যেরকম মেয়ে খুঁজছেন ঠিক সেই-রকম একটি ভালো মেয়ে আমার বাড়ীতে আছে; কিন্তু তারা আপনাদের জাত নয়, এই এক মুস্কিল।

সুমতি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আর জাত। এখন জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে—বৈতরিণীর ঘাটে খেয়ামাঝি ত ডাকাডাকি করছে! হীরুই কি আর বেশীদিন বাঁচবে?—আমার বৌমা নেই, আমি থাকব না, ওকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? যে-দিন বিছানায় পোড়ে থাকবে সেই কটা দিন কেউ যদি তাকে আমার বোলে যত্ন করলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব, হীরুরও বাকী দিন-কটা একটু আরামে

বলিতে সুমতির চোখ দিয়া জল হুহু করিয়া লাগিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তা হলে নিয়ে আসি গিয়ে যদি তার মত হয়।

ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন—যদি নয় চাই। সে গরিবের মেয়ে, তাকে ত চিরজীবন হীরুকে এখন থা নয় তা কি হীরুকে ধ না?

ড ভালো

মেয়েকে রাজি কোরে নিয়ে আসুন, তারপর হীরুকে রাজি করার ভার আমার।

আনন্দ-বাবু সুমতির বিবেচনা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মার স্নেহ যে কত সতর্ক, কত যে তার সূক্ষ্মদর্শনের শক্তি, তার পরিচয় পাইয়া আনন্দ-বাবু সম্ভ্রম-মুগ্ধ হৃদয়ে সেবার বিবাহের ঘটকালি করিতে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

সুকেশী—

জীবজন্তুর মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অধিক লোমশ হয়।—সিংহের কেশর হয়, সিংহীর হয় না; ময়ূরের সুপুচ্ছ, ময়ূরীর হয় না; পুরুষ-মানুষের দাড়ি গোঁপ হয়, মেয়েদের হয় না। কিন্তু চুলের বহরে পুরুষেরা মেয়েদের কাছে হার মানিয়াছে;—পুরুষে চুল বড় করিয়া

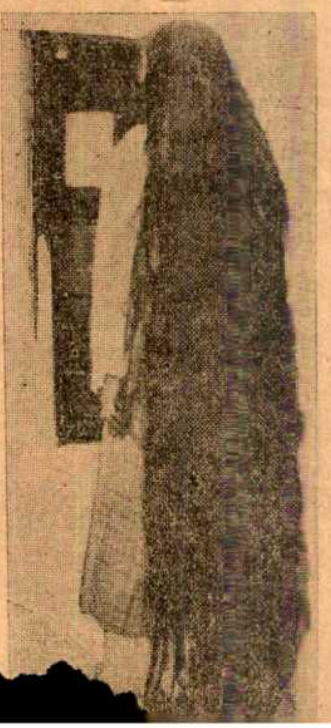

"ও তার হেঁটুর নীচে চুল রে ভাই, তার হেঁটুর নীচে চুল!"

হেঁটুর নীচে চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন সুকেশী খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের দেখাদেখি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে আগুল্‌ফলম্বিত বা পদচুম্বিত কেশকলাপের বর্ণনা চল্ হইয়াছিল; কিন্তু তেমন সুকেশী লেখকের কল্পনাতেই ছিল, লেখকেরা কেউ দেখেন নাই বোধ হয়। সম্প্রতি একটি ইংরেজ মেয়ের সংবাদ পাওয়া গেছে, তার চুল এত লম্বা যে মাটিতে লুটায়। এই মেয়েটির নাম মিস্ এথেল পেন্—এ ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা; এর মাথার চুল কোঁকড়া ঢেউ-খেলানো। সটা সটা সোজা চুল যত লম্বা হয়, সেই চুল কোঁকড়া হইলে খাটো হইয়া যায়; সুতরাং এথেল পেনের চুল সোজা হইলে যে আরো লম্বা দেখাইত তাতে কোনো সন্দেহ নাই! ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বাই কি কম! আমাদের দেশের খুব অল্প পুরুষই এত লম্বা, মেয়েরা ত আরো ছোট। সুতরাং এথেল পেন্‌কে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুকেশী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এলাহাবাদে একজন বাঙালী মহিলা আছেন তাঁর চুলও মাটিতে লুটায় শুনিয়াছি; এজন্য তিনি মাঝে মাঝে চুলের ডগ খানিকটা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ও চুলের মাপ পাইলে এথেল পেনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁর বা এইরূপ কোনো দেশী সুকেশীর ফটোগ্রাফ পাইলে আমরা ছাপিতে পারি।

ভবিষ্যতের রেলগাড়ী—

মানুষ আগে গোরুর গাড়ীতে ঠুকুস ঠুকুস করিয়া চলিয়াই সন্তুষ্ট ছিল; পরে দ্রুতগামী ঘোড়ার যানে গতিবৃদ্ধি করিল। ষ্টিম-এঞ্জিন আবিষ্কার হওয়াতে ঘোড়ার দৌড়ও আর মনে ধরিতেছিল না। তারপর আবিষ্কার হইল মোটর-গাড়ী বা বিদ্যুতে-চালা গাড়ী। তার চেয়েও জোর চলে এরোপ্লেন বা ওড়া-গাড়ী। এখন লোকের চেষ্টা

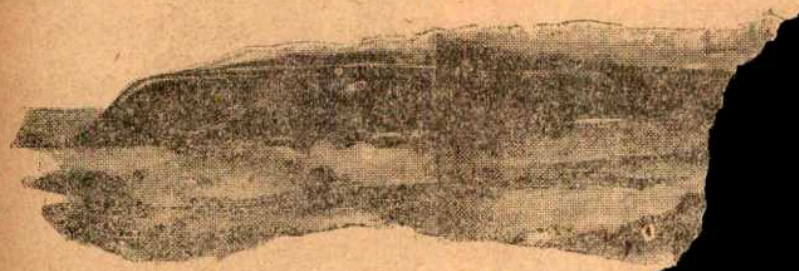

ভবিষ্যতের রেলগা

চলিতেছে কি করিয়া ডাঙার গাড়ীকেও ওড়া-গাড়ীর মতন ঘণ্টায় অন্তত একশো মাইল ছুট করানো যায়। এত জোরে গা বাতাসের যে বাধা ঠেলিতে হয় সে মোটা—আবার ক্রমশ সরু। যেসব জীবকে বাধা ভেদ করিয়া চলিতে হয় তাদের আকার স্বভাবত এই রকম, যেমন—পাখী, মাছ, কুমীর ইত্যাদি; তাদের মুখ ছুঁচলো, ধড় মোটা, ল্যাজের দিক ক্রমশ সরু। ভবিষ্যতের রেলগাড়ীও দেখিতে একটি বৃহৎ সরীসৃপের মতনই হইবে।

চুরুটের বহর—

চুরুটের মধ্যে সিগার নামে পরিচিত চুরুটই বেশ বড় বড় হয়। এসব চুরুট ফিলিপাইন দ্বীপের চুরুটের কাছে বালখিল্যদেরও শিশুদের খেলাঘরের চুরুট বলিলেও হয়। ফিলিপিনোরা যে চুরুট ফোঁকে তার

প্রকাণ্ড চুরুট।

ক্যাম্বিশ চটে এক-রকম দোমড়ানো নৌকা তৈরি করিয়াছেন; ইহা খুলিলে নৌকা হয় ও একজনকে বহিতে পারে এবং দুমড়াইয়া গুটাইয়া ফেলিলে একজনে ইহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। ক্যাম্বিশের থলে ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া ছড়াইয়া পাতিলেই নৌকা হয়; দুপাশে দুটি ফাঁশ থাকে, তার ভিতর দিয়া দাঁড় গলাইয়া দাঁড় টানা যায়, আবার মুড়িয়া বহিবার সময় সেই ফাঁশ দুটি ধরিবার হ্যাণ্ডেলের কাজ করে। এ-রকম নৌকা পথিকের ও সৌখিনের উপকারী।

ফেলিতেও পারে। এজন্য কুমীরের মুখবন্ধ খুব মজবুত করা দরকার। আমেরিকায় সহরের রাস্তার নর্দ্দমা পরিষ্কারের কাজেও কুমীর লাগানো হয়; কলিকাতার পথের মাঝে মাঝে এক-একটা গর্ত্ত ঢাকা থাকে সেই ঢাকা খুলিয়া ধাঙড়

বাতাসে ফোলানো ক্যাম্বিশের নৌকা।

নৌকা মুড়িয়া বহন।

কুমীরের গাড়ী—

মানুষ জগতের সব-কিছু নিজের কাজে লাগায়। এতদিন কুমীরের চামড়ায় তোফা ব্যাগ জুতা হইতেছিল। এখন আমেরিকায় জ্যান্ত কুমীরকে সাজ পরাইয়া লাগাম লাগাইয়া ছেলেদের গাড়ী টানানো

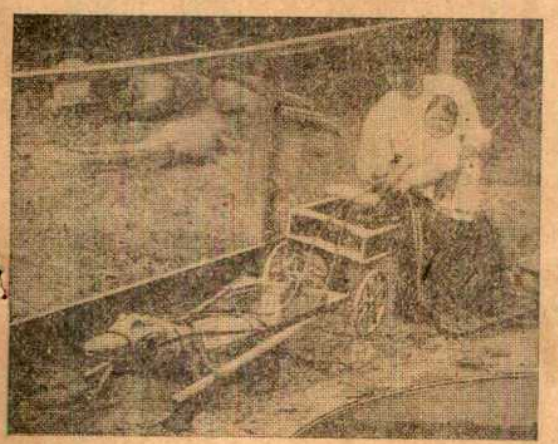

কুমীর-টানা গাড়ী।

একটি কল-কাঠি টিপিলে কব্জা-জোড়া পাখা মেলে মোড়ে। পাখা-মোড়া উড়ো-গাড়ী ও উড়ো-নৌকার আবিষ্কারক তাঁর কলের মূলতত্ত্ব দেখাইয়া দিতেছেন।

হইতেছে। কিন্তু এ সখ বড় বিপজ্জনক—কুমীরের মুখের বাঁধন একবার ছিঁড়িয়া গেলে সে হয়ত সওয়ার ছেলেটিকে জলপান করিয়া

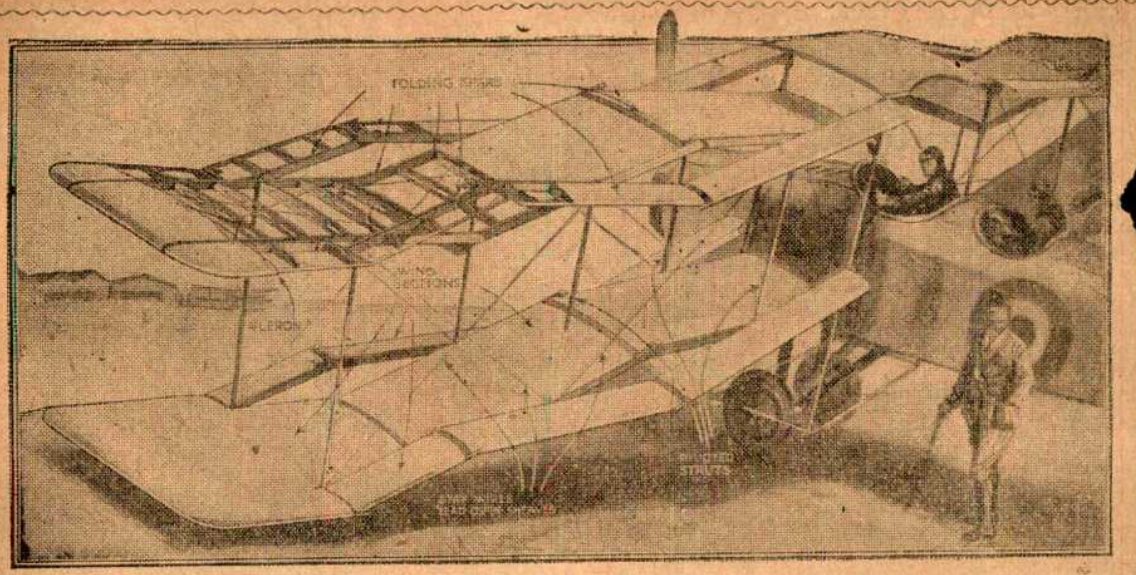

উড়ো গাড়ী পাখা মেলিতেছে।

বালক নামিয়া ময়লা সাফ করে। আমেরিকায় এই কাজ কুমীরকে দিয়া করানো হয়; নর্দ্দমার মধ্যে কুমীর ছাড়িয়া দিলে কুমীর জমা ময়লা ঠেলিয়া পথ করিয়া চলে এবং অন্য গর্ত্তের কাছে গেলে বাহির হইয়া পড়ে।

উড়ো-গাড়ী ও উড়ো-জাহাজ—

পাখীদের ওড়া দেখিয়া মানুষের উড়িবার সখ হয়। বহুকালের সাধনায় বহু জীবন বলি দিয়া মানুষ নিজেকে উড়াইতে পারিয়াছে। মানুষের উড়ো-গাড়ী ততক্ষণ ওড়ে কল যতক্ষণ চলে; কল থামিলেই পড়িতে হয়। ডাঙার উপর বিকল হইলে আছাড় খাইয়া হাড় গুঁড়া হয়; জলে পড়িলে ডুবিয়া মরিতে হয়। দক্ষ উড়ন-মাঝি কল বিগড়াইবার সূত্রপাত বুঝিয়াই নামিয়া পড়ে। কিন্তু অকূল সমুদ্র পাড়ি দিবার সময় যদি কল খারাপ হয় তবে কোথায় নামিবে? এইজন্য আজকালকার এরোপ্লেন একাধারে উড়ো-গাড়ী ও উড়ো-নৌকা করিয়া গড়া হইতেছে—ডাঙায় পড়িলেও চলিবে, জলে পড়িলেও ভাসিবে। এরোপ্লেন পাখা বিস্তার করিয়া থাকে বলিয়া তার নামিবার জন্য

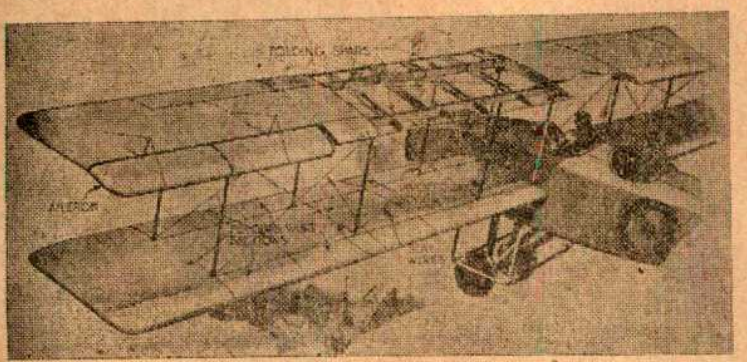

উড়ো গাড়ী পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

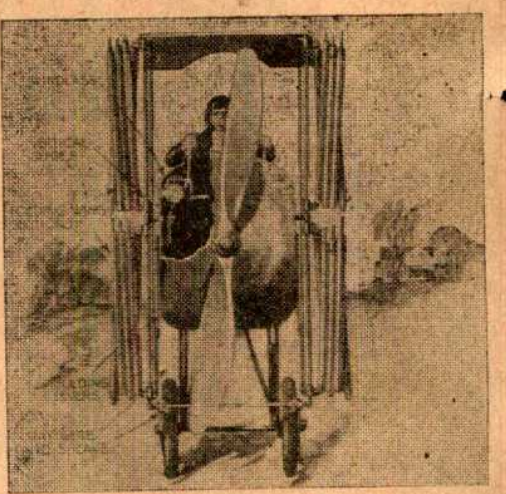

উড়ো গাড়ী পাখা মুড়িয়া ডাঙায় নামিল।

ফাঁকা ময়দান দরকার; গাছপালায় হোঁচট লাগিলে তার পাখাই তখন তার বিপদের কারণ হয়। সম্প্রতি মিষ্টার ওয়েইজ পাখীর ডানার মতন গুটানো-ছড়ানো পাখার এরোপ্লেন তৈরি করিবার আয়োজন করিয়াছেন; হার-মোনিয়মের বেলো বা হাপরের মতন এই ডানা গুটানো ও ছড়ানো যাইবে অতি সহজে; ইহার ফলে ডাঙায় অল্প জায়গাতেই নামা চলিবে ও জলেও আর বিপদ ঘটিবে না। জলে পড়িয়া এই উড়ো নৌকা কেবলমাত্র জলের উপরটি আল্‌তো আল্‌তো ছুঁইয়া উড়িয়া চলে,

উড়ো গাড়ী পাখা মুড়িয়া জলে নামিয়া হইল উড়ো নৌকো—জলের ঠিক উপরকার যেন সর ছুঁইয়া চল্‌কাইয়া উড়িয়া চলে বলিয়া এই উড়ো নৌকো সকল জলযানের চেয়ে বেগবান, ঘণ্টায় ৭০ মাইল চলিতে পারে।

তাতে একে জল কাটিয়া চলিবার বাধা অতিক্রম করিতে হয় না, বাতাসে নিরালম্বন হইয়া ভাসিয়া থাকিতেও হয় না—জলের সরের উপর দিয়া যেন এ উড়িয়া চলে, তাই চলিতে পারে অতি দ্রুত—ঘণ্টায় ৭০ মাইল। এত জোরে আর কোনো জলযান যাইতে পারে না।

কলের দোল্‌না—

গরিব বাঙালী মা কোল দুলাইয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান; যাদের অবস্থা সচ্ছল তাঁরা বেত বা কাঠের দোল্‌নায় ছেলে শোওয়ান।

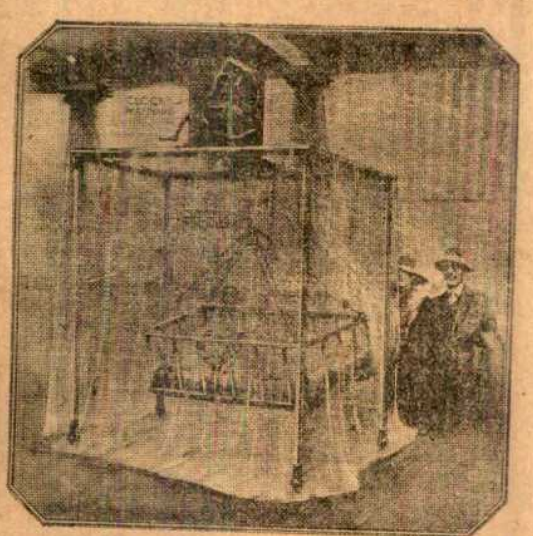

কলের দোল্‌না।

দোল্‌নার অসুবিধা এই—একজন লোককে ক্রমাগত ঠেলা দিবার জন্য নিযুক্ত থাকিতে হয়। ধনী আমেরিকার ধনীর দুলালেরা কলের দোল্‌নায় ঘুম যায়। ঘড়ীর দোলন যেমন আপনি এদিক ওদিক দোলে, দোল্‌নাকেও তেমনি একটা ঘড়ী-কলের সঙ্গে জুড়িয়া দিলে সেটাও পেণ্ডুলামের মতন আপনি দোলে।

সোজা থাকো—

শিরদাঁড়া সোজা রাখার ঘড়ী।

পিঠের শির-দাঁড়া সোজা রাখিলে দেহ সুস্থ সবল ও সুশ্রী থাকে। যারা সাহেবী পোষাক পরে তারা ব্রেস্ বা গ্যালিস্ আঁটিলে বাধ্য হইয়া নিজেকে সোজা রাখে; কিন্তু আমরা ঢিলা পোষাকে সহজেই কোঙা হইয়া থাকি; তার ফলে আমরা হই কোলকুঁজো। একরকম গ্যালিস্ তৈরি হইয়াছে, তার সঙ্গে একটা বাজন-ঘড়ী লাগানো থাকে। সেই গ্যালিস্ পরিয়া একটু কুঁজো হইলেই ঘড়ী কড়াৎ করিয়া বাজিয়া ওঠে আর সাবধানী লোক অমনি সোজা হয়।

মাছের ঘরে আড়িপাতা—

গভীর সমুদ্রের তলায় মাছ ঝিনুক হাঙর প্রভৃতি জলচর প্রাণীরা কেমন অবস্থায় থাকে কি করে জানিবার কৌতূহল অনেকের হয়, কিন্তু কৌতূহল মিটাইবার সুবিধা অনেকেরই হয় না। যেসব ডুবুরি সমুদ্রের তলায় নামে তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত, অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যাঁরা জলচরের জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটা-কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন বা নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে পারিবেন তেমন কেউ এ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তলায় নামিবার সুযোগ পান নাই। আমেরিকায় এই অসুবিধা দূর করিবার কল্পনা ও চেষ্টা চলিতেছে। প্রস্তাব হইয়াছে—কূল হইতে খানিক দূরে সমুদ্রে একটা চোঙ পুঁতিতে হইবে; চোঙটা ইস্পাতের বা সিমেণ্টের বা কংক্রীটের বা ইটে গাঁথা, যার হোক হইবে; এই চোঙের মধ্যে থাকিবে ঘোরানো সিঁড়ি ও তিন তলা; তিন তলায় জলের তলে দেয়ালের গায়ে তিন সার ফুকোর থাকিবে; ফুকোরগুলি হইবে কক্ষের আকারের—সরু দিক ঘরের ভিতরে ও চাঁদল দিকটা থাকিবে পুরু পুরু কাচের পরকলা দিয়া ঢাকা—যাতে জল ঘরের ভিতরে না ঢুকে ও জলের চাপে কাঁচও ফাটিয়া ভাঙিয়া না যায়। উপর ও নীচের তলার ফুকোর দেখিবার জন্য; মাঝের তলার ফুকোর দিয়া আলো ফেলিয়া জল আলোকিত করা হয়। হঠাৎ কোনো কাচের ঢাক্‌নি ভাঙিয়া গেলে ফুকোর বন্ধ করিবার অন্য উপায়ও প্রস্তুত রাখা হইবে। কাচ ভাঙিবামাত্র যে জল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে তারই গতির বেগে ও চাপে স্বয়ংক্রিয় একটা ঢাক্‌নি সেই ফুকোরের মুখ চাপিয়া ধরিবে এবং একটা পাম্প চালাইয়া দিয়া জলখানিকে

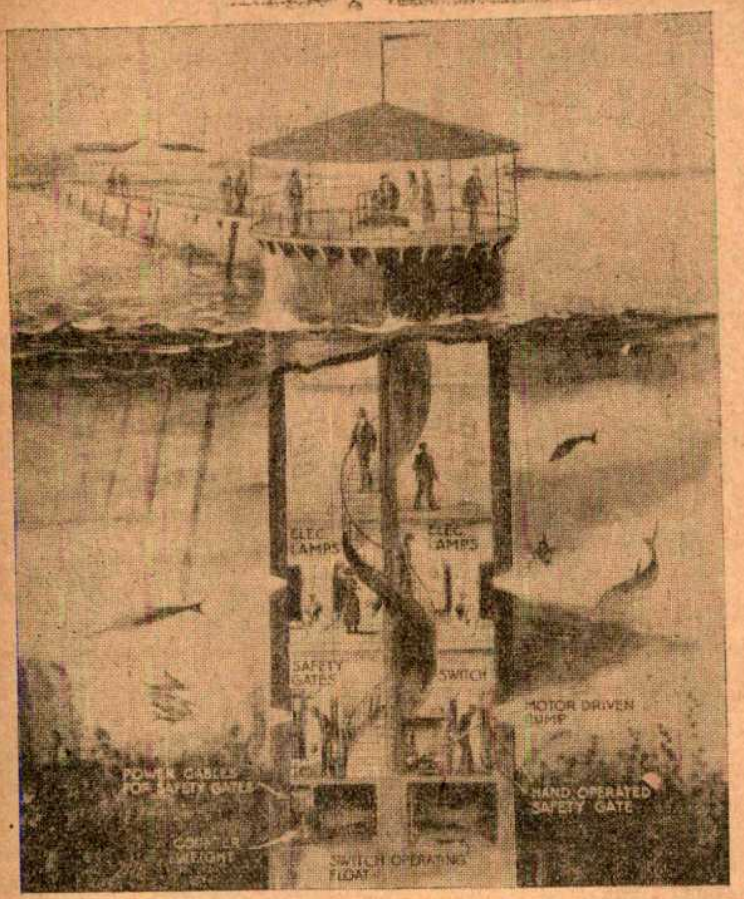

মাছের ঘরে আড়ি পাতার জলটুঙি।

সেচিয়া বাহির করিয়া দিবে আপনা হইতেই। যদি কল হঠাৎ বিগ্‌ড়াইয়া যায় ও ফুকোর আপনা-আপনি বন্ধ না হয়, তবে হাতে কল চালাইয়া ফুকোর রুদ্ধ করিবারও কল হাতের গোড়াতেই মজুত থাকিবে।

পাঁচশত বৎসরের পুরাতন টাইপ—

এতদিন এই জানা ছিল যে জার্ম্মানীতে ক্যাক্‌স্টন প্রথম বই ছাপা আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি জানা যাইতেছে যে ৫০০ বৎসর আগে কোরিয়া দেশে ধাতুতে তৈরি ছাপার হরপ দিয়া বই ছাপা প্রচলন ছিল; এইসব হরপ বা টাইপ ধাতুখণ্ডের এক পিঠে উঁচু

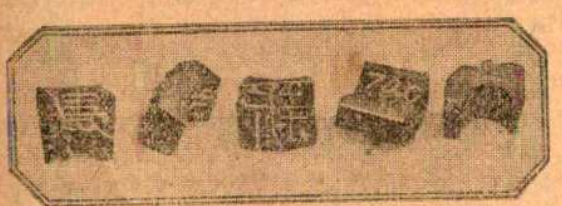

পাঁচশত বৎসরের পুরাতন টাইপ।

হইয়া তোলা থাকিত, ও ধাতুখণ্ডের নীচের দিকটায় খাল কাটা থাকিত; মোমের পাটার উপর সেই টাইপ পুঁতিয়া দিলে ধাতুখণ্ডের তলার খালে মোম ঢুকিয়া টাইপগুলিকে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিত, ছাপিবার সময় টাইপ সরিয়া যাইত না। সেই টাইপের উপর কালি মাখাইয়া তার উপর কাগজ পাতিয়া চাপ দিয়া লেখা ছাপা হইত দিনে ১৫০০ আন্দাজ কপি। এইরূপ পুরাতন কতকগুলি টাইপ আমেরিকার নিউইয়র্ক মিউজিয়মে ও ইংলণ্ডের মিউজিয়মে সংগৃহীত আছে। এশিয়ার পরাজয়ের দিনে এ একটা মস্ত গৌরবের আবিষ্কার সন্দেহ নাই!

বৃহৎ শামুক—

লণ্ডনের জীবশালায় একটি শামুক সংগৃহীত হইয়াছে তার আকার ৮ ইঞ্চি; এই শামুক পূর্ব্ব-আফ্রিকার বাসিন্দা, সেদেশের লোকেরা এই শামুক ও তার ডিম খুব তারিফ করিয়া খায়। এর ডিম পায়রার ডিমের মতন বড় বড় হয়। এতবড় শামুক নাকি পৃথিবীর আর কোথাও এখনো দেখা যায় নাই।

দুমুখো বাছুর—

প্রকৃতির খেয়ালের অন্ত নাই। জীবপঙ্ক হইতে মানুষ পর্য্যন্ত কতবিধ জীব সৃষ্টিই না হইল। প্রচলিত জীবেরই আবার মাঝে মাঝে কত রকম-ফের হইতে শোনা যায়। জোড় যমজ ছেলে; পাঁচ-ঠ্যাঙা বাছুর; হাতে পায়ে ছয় ছয় আঙুল; নুলো; গন্নাকাটা; কত বি

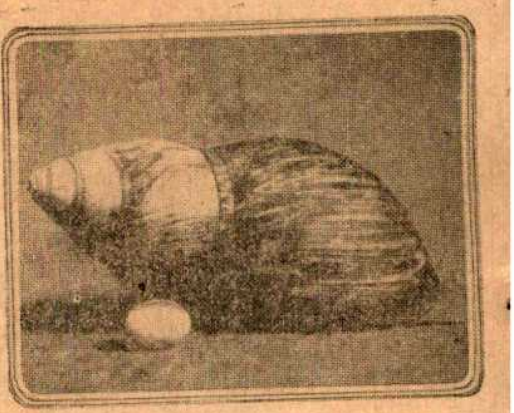

অতিকায় শামুক ও তার ডিম।

প্রকৃতির বিকৃতি দেখা শোনা যায়। আমেরিকায় একটি গরুর জো যমজ বাছুর হইয়াছিল—দুটি বাছুর যেন পেটের কাছে কাটিয়া দুজনের পিছন দিক ফেলিয়া দিয়া কেবল মুখের দিকটা পরস্পরের পে

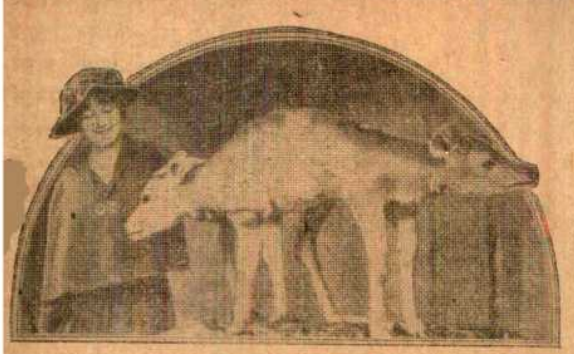

দুমুখো বাছুর।

জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এই বাছুরের দুদিকে দুটো মুখ ও সাম্‌নের এক এক জোড়া পা ছিল; পেটের মাঝখান হইতে পিছনের এক জোড়া পা বাহির হইয়াছিল। এরা ইচ্ছামত একসঙ্গে দুই মুখেই বা এক মুখে খাইতে পারিত। জন্মিয়া ছয় মাস বাঁচিয়াছিল; পরে সর্দ্দি লাগিয়া মারা পড়িয়াছে। ছবিতে একটি মেয়ে একদিকের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতেছে; অপর মাথাটি আদরের লোভে অন্য মাথার হিংসা করিতেছিল কি না কে জানে!

ইজি-চেয়ার বাইসাইকেল—

বাইসাইকেল চালাইবার সময় ঘোড়ায় চড়ার মত বসিয়া অথবা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পা চালাইতে পরিশ্রম হয়, ক্লান্তি আসে। প্যারিসের একজন লোক ইজি-চেয়ার বাইসাইকেল বা আরাম-

ইজি-চেয়ার বাইসাইকেল ও তার উদ্ভাবনকর্ত্তা।

দারা বাইসাইকেল আবিষ্কার করিয়াছেন—এতে বেশ কাত হইয়া পিঠ হেলান দিয়া বসা যাইবে, পা দুটাও সাম্‌নে ছড়াইয়া পাদানি ঘুরাইতে পারা যাইবে।

পাঁউরুটির শাঁসের ফুল—

টাট্‌কা পাঁউরুটির শাঁস প্রায় ময়দাই থাকে; তাই টাট্‌কা পাঁউরুটি খাইলে হজম হয় না। টাট্‌কা পাঁউরুটির শাঁস হাতে চট্‌কাইলে দলা পাকাইয়া যায়। প্যারিসের মাদাম প্রম্পের গাতিকের নামে একটি ধনী মহিলা একদিন খানিকটা পাঁউরুটির শাঁস হাতে চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে দেখিলেন সেটা দিব্যি গোলাপফুলের আকার ধারণ করিল। সেইদিন হইতে তিনি এই ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন—পাঁউরুটির শাঁসের ফুল গড়িয়া রং করিয়া বিক্রয় করেন ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ লোকহিতে দরিদ্রদের দান করেন। তার নিজের ত অর্থের অভাব নাই; তাঁর নূতন বিদ্যার নূতন শিল্প হইতে যা আয় হয় তা পরহিতে ব্যয় হয়।　　ফরাসী।

চাঁদের পূর্ণগ্রহণ দেখা যায় কেন—

পরের ধনে পোদ্দারি করিয়াই চাঁদ যুগে যুগে অনেক কবি এবং অনেক প্রণয়ীর মন কিনিয়াছে। কিন্তু তার আলোর পুঁজির সবটুকুই যে ধার করিয়া পাওয়া এ কথা আজ আর কারও অজানা নাই। আমাদের দেশের খেতাবী রাজা মহারাজাধিরাজদের মতো তাকে খাতির করিয়া নিশানাথ বলা হয় বটে, কিন্তু আসলে দিনের রাজাও সূর্য্য, রাতের রাজাও সূর্য্যই। সূর্য্য না থাকিলে অতবড় জলজলে পূর্ণিমার চাঁদটাকে দেখিবার জন্যও দেশালাই ধরাইয়া আলো জ্বালিবার দরকার হইত। কিন্তু এই যে সিদ্ধান্ত, ইহাও আরেকটু হইলেই বাতিল হইবার পথে গিয়াছিল আর কি!—যারা পরকে তোয়াজ করিয়া পরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিনপাত করে, তারা একটু ফন্দিবাজ লোক না হইয়া যায় না; চাঁদও কম পাত্র নন; অরসিক পণ্ডিত লোকদের জব্দ করিতে তিনি ফিকির করিয়া তাদের চোখে ভারি একটা ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিলেন। অনেক মাথা ঘামাইয়াও কিছুতেই বুঝিতে পারা গেল না, যে, চাঁদের নিজস্ব জ্যোতি কিছু যদি নাই থাকিবে তবে পূর্ণ-গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে পড়িয়াও তার সবটুকুই কেমন করিয়া অস্পষ্ট আবছা আবছা তামাটে চেহারার হইয়া চোখে পড়ে। পৃথিবীটা মোটেই যে স্বচ্ছ নয়, এ লইয়া নিশ্চয়ই তর্ক বাধিবে না, আর এও ঠিক যে চাঁদকে সে সূর্য্যের আলোর সবটুকু হইতে ঢাকিয়া আড়াল করে বলিয়াই পূর্ণগ্রহণ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। এ অবস্থাতেও চাঁদের যদি আপনার বলিতে আলো কিছু নাই থাকে, এবং অন্য কোনও প্রকারে কিছু আলো জুটাইয়া পাইবারও সুবিধা সে না করিতে পারে তবে আমাদের চোখে একবারেই তার না-পড়িবার কথা। কিন্তু চাঁদের এই চালাকি, তার এই ফাঁকি দিয়া স্বয়ংপ্রভ বলিয়া সুনাম কিনিবার মতলব ভাসিয়া গেছে। বুঝিতে পারা গেছে, পুরা গ্রহণের সময় পৃথিবীর অস্বচ্ছ কলেবর ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো চাঁদের উপর গিয়া পড়িতে পায় না সত্যি, কিন্তু স্বচ্ছন্দেই তার পাশ ঘিরিয়া ঘুরিয়া গিয়া পড়িতে পারে। সোজা, খাড়া চলিয়া যাওয়াই আলোকরশ্মির বাঁধা নিয়ম, তা ঠিক; কিন্তু দুরকমের দুটি স্বচ্ছ জিনিসের মধ্য দিয়া চলিতে গেলেই তার এই এক-রোখা চলার তাল কাটিয়া যায়,—তার ফলে সোজা পেন্সিলটার আধখানাকে জলে ডুবাইলে সেটাকে কোমরে বাতগ্রস্তের মতো বাঁকা মাঝখানটায় ভাঙা মতন দেখিতে হয়। সূর্য্যের আলো আকাশের ব্যোমবন্ধুর মধ্য দিয়া বরাবর সোজা চলিয়া আসিতে থাকে, কিন্তু সে-মুলুক ছাড়াইয়া আমাদের বায়ুমণ্ডলের এলাকায় পা দিতেই তার একটানা গতির মুখে লাগামের টানের মতো হেঁচ্‌কা একটা টান পড়ে, ফলে গলির মোড়ে ঘোড়ার মতো সে ঘুরিয়া নূতন পথে চলিতে সুরু করে। আলো যদি বাতাসের ফাঁদে পড়িয়া বাঁকা পথে না চলিত তবে পৃথিবী তার এতবড় শরীরটা লইয়া চাঁদকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে আলোর দূতকে চাঁদের সন্ধান না পাইয়া অনেক দূরের পথ দিয়াই চলিয়া যাইতে হইত।—কিন্তু বাতাসের ফাঁদ বড় শক্ত ফাঁদ। খানিকটা করিয়া আলোর ঘাড় মুচ্‌ড়াইয়া ছায়ার সঙ্গেসঙ্গেই চাঁদের দিকে সে

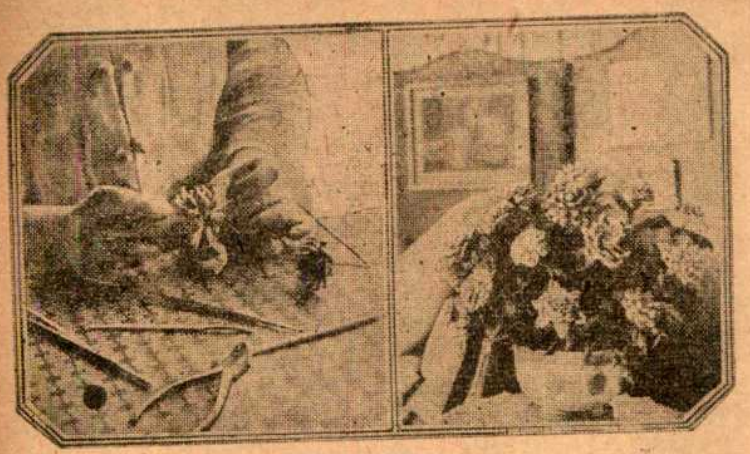

পাঁউরুটির শাঁসের ফুল।

ঠেলিয়া দেয়, মা যেমন করিয়া চব্বিশঘণ্টাই ঝগড়া হয় এমন দুটি ছেলেকে ঘাড়ে ধরিয়া একসঙ্গে একবিছানায় শুইতে পাঠান্।—এই-রকম করিয়া ছায়ার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াও চাঁদের ম্লান বিষণ্ণ মুখখানি আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে সূর্য্যের সোহাগে, তার নিজের নিজস্ব আলোকের দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া নহে। স. চ.

বিচিত্র অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ধরিতে পারে! সেখানে কোথাও গাছের পাতাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মালার আকারে গাছের গুঁড়ির চারিদিকে জড়াইয়া আছে; কোথাও বড় বড় থামের মত গাছ দাঁড়াইয়া আছে, তাদের মাথায় পাতার গোল গোল বড় বড় বল; কোথাও কত গাছ পাখীর আকার ধরিয়া রহিয়াছে—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ যেন উড়ু উড়ু করিতেছে; কোথাও পিরামিডের মূর্ত্তি ধরিয়া গাছ দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও আবার গাছ কুঁজোর মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা বাটির মত।

কোন ঝুপি বা পত্রবহুল ছোট গাছ হইতে এরূপ ভাস্কর্য্য হইতে পারে না। যে-সব গাছের গুঁড়ি লম্বা ও সোজা হয় সে-সব গাছ হইতে নানা জিনিষ গড়িয়া তোলা সোজা। এ কাজে কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের দরকার। মনে করুন একটি গাছকে কারুর মুরগীর মত গড়িতে ইচ্ছা হইল। তাঁকে তাহা হইলে মুরগীর মত করিয়া গাছটিকে মাঝে মাঝে ছাঁটা দরকার। এই রকম ছাঁটিতে থাকিলে গাছটিও যেন ভাস্করের মনের ইচ্ছা আপনা-আপনি জানিতে পারে এবং সেই রকমে আপনাকে বাড়াইতে

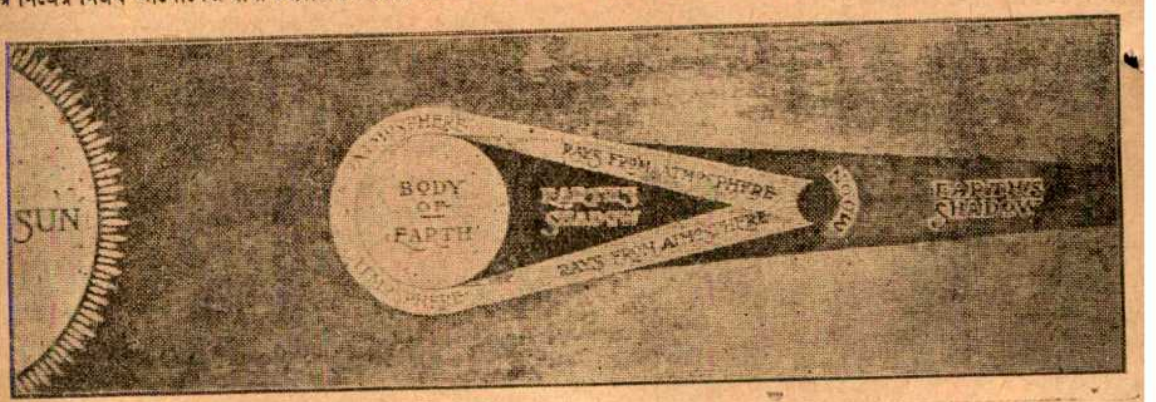

পূরা চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় কেন।

পূর্ণিমার দিন সূর্য্যের আলো সমস্ত চাঁদটার উপর পড়ে বলিয়া আমরা পূর্ণচন্দ্র দেখি; যে পূর্ণিমায় চাঁদ আর সূর্য্যের মাঝে পৃথিবী আসিয়া আড়াল করে সেদিন পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়িয়া পূর্ণচন্দ্রের গ্রহণ হয়। পৃথিবী আড়াল করা সত্ত্বেও আমরা যে চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাই, তার কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে পরাবর্ত্তিত সূর্য্যের আলো গিয়া চন্দ্রের উপর পড়ে।

বৃক্ষ-ভাস্কর্য্য—

পাথর কুঁদিয়া তাহা হইতে নানা মূর্ত্তি গঠন করার কথা ত সকলেই জানে, ইহা আর তেমন আশ্চর্য্যের বিষয়ও নয়। কিন্তু জীবন্ত গাছকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, ছোট বেলায় তার উপর চাপ দিয়া বা ছুরির সাহায্যে বিভিন্ন পথে বাড়িতে দিয়া তাকে নানারকম জিনিষের আকারে গড়িয়া তোলার ভাস্কর্য্য আজকাল ইউরোপের কোন কোন দেশে আরম্ভ হইয়াছে। রিচ্‌মণ্ড সহরের রয়্যাল কিউ নার্সারিতে এই ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার বাগানে এই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় যে গাছ কি করিয়া এরূপ

থাকে। বাড়ীর কুকুরকে একটি বিশেষ জায়গায় যাইতে যদি রোজই বাধা দেওয়া যায় তাহা হইলে সে যেমন সেদিকে যাইতে চায় না, গাছও তেমনি বাধা পাইয়া পাইয়া আপনার সহজ পথ ছাড়িয়া ভাস্করের কৃত্রিম পথেই চলিতে থাকে। গাছও ত প্রাণী, গাছের ডাল ছাঁটিলে তার চোট লাগে; কোনো প্রাণীই আঘাত পাইতে চায় না; তাই গাছ যখন বুঝিতে পারে ভাস্কর কেমন আকারে তাকে রাখিতে চাহিতেছে, তখন সে নিজেই ঠিক সেই আকারে বাড়ে, এবং তখন আর তাকে ছাঁটার দরকার হয় না, সে নিজেই ভাস্করের ইচ্ছামত রূপ ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। ভালো কোন জিনিষ গাছ হইতে ভালো করিয়া গড়িতে প্রায় কুড়ি হইতে পঞ্চাশ বৎসর লাগে; কিন্তু

একবার গঠিত হইয়া উঠিলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ইহা বর্ত্তমান থাকে। বৃক্ষ-ভাস্কর্য্যের এক প্রাচীন নিদর্শন আছে, তাহা নাকি প্রায় ছয় শত বৎসরের।

বৃক্ষ-ভাস্কর্য্য একটি সুন্দর কলাবিদ্যা। প্রাচীন গ্রীস দেশে ইহার প্রচলন ছিল; রোমীয়রাও ইহাতে খুব পারদর্শী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় এই বিদ্যা ইংলণ্ডে প্রবেশ করে। হল্যাণ্ডে নাকি ইহার এখন কিছু প্রচলন আছে। আমাদের দেশে বৃক্ষ-ভাস্কর্য্যের প্রচলনের কোন কথা আমাদের জানা নাই। এ বিদ্যা চর্চ্চা করা কিন্তু সব জাতিরই প্রয়োজন। জাতির সৌন্দর্য্য-বোধ ও কলাবিদ্যার ইহা সুন্দর পরিচয়।

প. স.

বৃক্ষ-ভাস্কর্য্য।
গাছ ছাঁটিয়া মুরগীর আকার করা হইয়াছে

পুস্তক-পরিচয়

আকাশের খোকা—শ্রীকানন বন্দ্যোপাধ্যায় রচয়িত্রী। প্রকাশক রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। সচিত্র। দশ আনা।

খোকা-খুকীদের মনতোষণ গল্প সহজ ভাষায় গল্প বলার ভঙ্গীতে লিখিত। দেশে উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য বইএর বড় অভাব। পুরুষের কর্ম্ম নয় গল্প বলা; তারা ছেলেদের গল্প বলিতে বসিয়া বিদ্যার বোঝা আজাড় করিতে থাকে। শিশুদের গল্প বলিয়া তাদের কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিয়া তাদের আনন্দ দিবার কাজ মেয়েদেরই। এই কাজে রচয়িত্রীর প্রথম প্রয়াস সুন্দর সফল হইয়াছে।

বীরভূম-বিবরণ—দ্বিতীয় খণ্ড। মহারাজকুমার শ্রীমহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদক। তিন টাকা। বহু চিত্রে ভূষিত।

বীরভূমের কতকগুলি গ্রামের ইতিকথা, কিম্বদন্তী, ইতিহাস, শিল্প, স্থাপত্য, দেবকাহিনী, লোককীর্ত্তি প্রভৃতি এই বিবরণে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার বিবরণ সংগ্রহ হইলেই বাংলার প্রকৃত ইতিহাস সংগঠিত হইতে পারিবে। এই বিবরণ বহুল তথ্যে পরিপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। ইহার ভিতর দেশের ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন উপাদান প্রচুর সমাবেশিত আছে। দেশের সকল দিকের সংবাদ জানিতে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা ইহা পাঠ করিলে প্রীত ও উপকৃত হইবেন। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির এই উদ্যম ও সফলতা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

শিশু-পালন—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু সম্পাদিত। সচিত্র। আট আনা।

গর্ভাশয়ে জন্ম লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের উপদেশ এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। শিশুর আহার, খেলা, ব্যায়াম, চিকিৎসা সব কিছুই আলোচনা করিয়া বুঝানো হইয়াছে। এই বইখানি প্রসূতিদের খুব কাজে লাগিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাই না; অথচ আমরা তাদের জন্য বই লিখিতে বসিয়া নিজেদের বিদ্যা উদ্ধার করি! এ বড় তাজ্জব ব্যাপার। হাতে কলম ধরিয়া বসিলেই আমরা সোজা বাংলা কথা ভুলিয়া গিয়া ইংরেজির তর্জ্জমা করিতে থাকি উৎকট সংস্কৃত শব্দ দিয়া। এতে আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়; যাদের জন্য লেখা তারা যদি বুঝিতেই না পারে, তবে তাদের কাছে হুইটম্যান এমার্সন প্রভৃতির বুলি আওড়াইয়া কেবল নিজের বিদ্যা জাহিরের অসুবৎ করিয়া লাভ কি? খুব সোজা ঘরোয়া চল্‌তি কথায় যদি লিখিতে না পারেন তবে পণ্ডশ্রম করা কেন? যাঁরা একটু বেশী বাংলা পড়িয়াছেন এ বই তাঁদের কাজে লাগিবে। এতে কয়েকখানি ছবি আছে তার কোনো কোনো খানি দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় প্রবাসীতে প্রকাশিত আমেরিকায় শিশুপালন প্রবন্ধের ছবির নকল; অথচ ঋণ স্বীকার করা হয় নাই।

প্রথম শিক্ষা ইংলণ্ডের ইতিহাস—শ্রীরামচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক আর সি দাস এণ্ড কোম্পানী। বারো আনা

ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদের ছেলেদের খুব বেশী করিয়া পড়ানো উচিত বলিয়াই বিদ্যালয়ে উহার পাঠ বন্ধ করা হইয়াছে। ইংরেজের ন্যায় স্বত্ব ও অধিকার স্বায়ত্ত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়া কিরূপ সফল হইয়াছে, ইংরেজের অধীন আমাদের সে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে ইংরেজের করায়ত্ত আমাদের ন্যায় স্বত্ব কাড়িয়া স্বায়ত্ত করিবার জন্য। সুতরাং এই পুস্তক প্রণয়নে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে। কিন্তু শিশুপাঠ্য পুস্তকের ভাষা সংস্কৃত না হইয়া খাঁটি বাংলা হওয়া উচিত। ভারী সংস্কৃত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে

বালকবালিকাদের মনে অর্থ আপনা-আপনি প্রতিভাত হয় না; এবং তারা পাঠে আনন্দ পায় না। এতে শিক্ষার ও পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। লেখক ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাণীর কাহিনী সংক্ষিপ্ত করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। অতিভাষণে সত্য আচ্ছন্ন করার চেয়ে অল্পভাষণ ঢের ভালো। পরাধীন জাতির লেখক বিজেতা জাতির রাজাদের সম্বন্ধে সত্য ততক্ষণই বলিতে পারেন, যতদিন উভয় জাতির মধ্যে কোনো সম্পর্ক না ঘটিয়াছিল; যখন হইতে সম্পর্ক ঘটিয়াছে, তারপরে সত্য বলা সহজ নয়। মিথ্যা বলার চেয়ে চুপ থাকা ঢের ভালো। লেখকের হৃবিবেচনা দেখিয়া আমরা প্রীত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি।

বৃন্দাবন-কথা—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ২৮১ পৃষ্ঠা। ছবিওয়ালা। দাম আড়াই টাকা। কাপড়ে বাঁধা।

বৃন্দাবনধামের পৌরাণিক ও ইতিহাসের বিবরণ, সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থান ও হিন্দুর তীর্থ স্থানের বৃত্তান্ত, তীর্থযাত্রীর করণীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীর সাহায্যে ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই।

ভারতের নারী—শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নিউ ইণ্ডিয়া পাব্‌লিসিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ১৯৭ পৃষ্ঠা। রেশমী কাপড়ে গদিমোড়া বাঁধাই। দাম দেড় টাকা।

বিশ্বসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের নাম কেমন করিয়া হইল ও ভারতবর্ষে যুগে যুগে সতী-সাধ্বীর মাহাত্ম্য কিরূপ ঘোষিত হইয়াছে তাহা অবতরণিকায় সংক্ষেপে বিজ্ঞাপন করিয়া সমাজে নারীর আবশ্যকতা এবং সমাজে গৃহে নারীর কর্ত্তব্য ও সম্পর্ক কতদিকে কত রকম তার আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশেষে কতকগুলি আদর্শ সতী নারীর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ী ননদভাদুর প্রভৃতির প্রতি যেমন বধূর কর্ত্তব্য আছে, বধূর প্রতিও তাদের একটা কর্ত্তব্য আছে—সেদিকটা পরিষ্কার করা হয় নাই। বইএর ভাষা ভারী অথচ রচনার ভঙ্গী মধ্যমপুরুষে নারীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ গেলানোর মতন মাঝে মাঝে। ভাষা আরো সহজ করা উচিত ছিল। ভাদুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক যে বিসদৃশ অশোভন, মেয়েদের যে লেখাপড়া শিখাইয়া পরিবারের সম্রাজ্ঞী পদের মর্য্যাদা ও সম্মান দেওয়া উচিত, ইহা লেখক স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ পাইলাম। বিবাহের সময় আজকাল নববধূকে বই উপহার দেওয়ার সুপ্রথা হইয়াছে। মেয়েরা যাতে নিজেদের অধিকার পরিবারে ও সমাজে সাব্যস্ত করিয়া লইতে পারেন, যাতে স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ পাইয়া দাসত্ব ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে পারেন এরূপ উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া বই রচনা করা উচিত। দাসীদের শৃঙ্খল সুদৃঢ়, অত্যাচারে অধিকতর সহিষ্ণু ও অপ্রতিরোধী করিবার সাধন যেসব বই তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই, সম্মান নাই। প্রেমে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সজ্ঞানে যে আত্মদান আত্মবিলোপ দুঃখবরণ তাই মহনীয়; অন্ধ সংস্কারে শাস্ত্র ও প্রথার ভয়ে নিরুপায় অসহায় বলিয়া যে অবনতি তাহা সেবিত ও সেবিকা উভয় পক্ষেরই আত্মার অকল্যাণের। এই বইখানিতে মেয়েদের সাধ্বী সতী পরিজনে মমতা-ময়ী হইতে অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মেয়েদেরও যে মনুষ্যত্ব সবার আগে, তারপর তার পরিবারের ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক এ কথা লেখক কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মামুলি বকেয়া প্রথার সমর্থন করিয়া বই লিখিয়া কোনো লাভ নাই; এখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায় ধর্ম্ম স্বাধীনতা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ আসিয়াছে—সেই বাণী সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে হইবে।

সরল পশুপালন—শ্রীহেমন্তকুমার বসু, ভেটেরিনারী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রণীত। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৮ ও ৯ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ৭২ পৃষ্ঠা। রেশমী কাপড়ে গদিমোড়া বাঁধাই। আট আনা।

পশুপালনের বই। তার এমন দামী সৌষ্ঠব না করিয়া দাম আরো সস্তা করা উচিত ছিল। গোরু ঘোড়া হাতী কুকুর প্রভৃতি পশু পালনের প্রণালী ও তাদের রোগ চিকিৎসার ঔষধ ও ব্যবস্থা এই বইএ আছে। গৃহস্থের উপকারী বই।

ভিনাসচিত্র ও অন্যান্য গল্প—শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। দশ আনা।

"সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক ক্লিমেন্স সেমুয়েল লেঙ্গহর্নস্ (মার্কটোয়েন) সম্বন্ধে চারিটি কথা এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি কৌতুকচিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" বাংলা সাহিত্যে অনাবিল হাস্যরসের বড় অভাব। বিদেশী সাহিত্যের এই আমদানী বিমর্ষ বাঙালীর মুখে হাসি ফুটাইতে সাহায্য করিবে।

নীতিরত্নমালা—শ্রীমোহিনীমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। চট্টগ্রাম। ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি ৮৬ পৃষ্ঠা। পাঁচ আনা।

সকলজনমান্য কতকগুলি নীতিকথা, চাণক্যের নীতি, শ্রীকৃষ্ণের গীতায় উপদেশ, বুদ্ধদেবের বচন, শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবতত্ত্ব, তুলসীদাস ও কবীরের দোঁহা, রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ, হজরত মহম্মদের উপদেশ, যীশুখৃষ্টের উপদেশ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা না বুড়া, না বালকদের উপযুক্ত। বালকদের মোহমুদ্গর বা যীশুর সপ্তম আজ্ঞা পাঠ করিবার আবশ্যক নাই; বুড়াদের কাছে এর অনেক কথাই জানা। তবে জানা কথাও অনেক সময় জানাইতে হয়। সেই হিসাবে এ পুস্তকের সার্থকতা আছে বটে। কিন্তু ইহা বালকবালিকাদের উপযুক্ত করিয়াই সঙ্কলন করিলে কাজ বেশী হইত।

স্বর্গীয় রামকুমার নন্দী মজুমদারের জীবনচরিত—প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, শিলচর, শ্রীহট্ট। বারো আনা।

রামকুমার শ্রীহট্টবাসী; তিনি কতকগুলি বই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর চরিত্রে সাধুতা ও ঈশ্বরপরায়ণতা ছিল।

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি—শ্রীচন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক বিরচিত। বাক্‌সা। পাঁচ আনা।

দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রতিপাদক সঙ্গীত-পুস্তক।

জীবন-প্রহেলিকা—শ্রীঅমৃতলাল সরকার বিরচিত ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে শ্রীশরৎচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, বৌবাজার, কলিকাতা।

প্রাণপদার্থ কি, জীবপঙ্ক হইতে মানুষ পর্য্যন্ত প্রাণীর উদ্ভব ও পরিণতির ক্রম বিশ্বনিয়মের সহিত তুলনা করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জীবন রহস্যের অনেক তত্ত্ব মীমাংসার চেষ্টা ইহাতে আছে।

গঙ্গাধর-গ্রন্থাবলী—৺ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। প্রকাশক শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ৫১ শাঁখারীটোলা, কলিকাতা।

গঙ্গাধর প্রবিষ্ণু ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের বন্ধু ছিলেন। তাঁর রচিত গীতহার (গান ও কবিতা), তারা বাই (নাটক), একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব (প্রহসন) বই তিনখানি একত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পানিত্রাস, হাওড়া। ডঃ ক্রঃ ১৯৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র। কাপড়ে বাঁধা। পাঁচ সিকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই বইএর প্রথম সংস্করণের পরিচয় দিবার সময় আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তারই পুনরুক্তি করিয়া বলি—যে মহাত্মা আত্মার বলে সকল অত্যাচার অন্যায় অবিচার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর তাঁর জীবনী ভীরু অসহায় উদ্যমহীন জাতির কাছে পরম রসায়ন। এই পুণ্য অবদান আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের পাঠ করিয়া আত্মবলে বলীয়ান হইয়া ওঠা উচিত।

বইএর ভূমিকায় সোকমান্য টিলক মহারাজের লিখিত মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সমালোচনা আছে। একজন নির্ভীক দেশহিতৈষী অপরজন নির্ভীক দেশহিতৈষীকে কিরূপ দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, ইহা জানা সকলেরই উচিত।

এ বইএর অল্পদিনেই দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে বোঝা যাইতেছে পাঠকসমাজে এর যোগ্য সমাদর হইয়াছে। হওয়া উচিত—মহাত্মা গান্ধীই ত এখন পলিটিক্স্ ক্ষেত্রের আত্মবল। এই মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদেরও আত্মবলে ও আত্মবলে সকল নিরোধ ও বাধাকে প্রতিরোধ ও জয় করিবার জন্য সত্যে আগ্রহ অর্জ্জন করিতে হইবে—মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ব্রত আমাদের সকলকে মিলিয়া [illegible]পন করিয়া দিতে হইবে।

লহরী কাব্য—কাজী আব্দার রেজাক শেরিফাবাদী [illegible] কৈকর, বর্দ্ধমান। ডঃ ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি, ৪০ পৃষ্ঠা। ।।

বিতার বই। মিলের গরমিল, ছন্দের হোঁচট, ভাবের অভাব, ভাষার দৈন্য এই কবিতাগুলির অলঙ্কার। ছেলেমানুষীতে ভরা। সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে যাই। এই দুর্মূল্য কাগজের বাজারে শাদা কাগজ কালো করিয়া লেখক বুদ্ধির পরিচয় দ্যান নাই।

প্রদোষ-সংবাদ—শ্রীআনন্দমোহন সাহা প্রণীত। মানসী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

একটি ছ বছরের শিশুর ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনী। শোকের কথা সমালোচনার অতীত। লেখকের শোকে আমরা সমবেদনা অনুভব করিতেছি। ছোট ছেলের জ্ঞানস্পৃহা, দয়া, স্নেহ প্রভৃতির ছোট ছোট আখ্যায়িকাগুলি এই জীবনের বিশেষত্ব ছিল। ভগবান সেইসব সদ্‌গুণ নিজের অনন্ত গুণে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই সন্তপ্তদের সান্ত্বনা দিবেন।

কবিকথা—(দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। ৫১৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। সচিত্র। দু টাকা।

কবিকথার এই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাচীন কবি ভাসের সমস্ত নাটক-গুলির অনুবাদ আছে। কবি ভাসের নাটক যখন প্রথম দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন ও ত্রিবাঙ্কুর হইতে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন তখন সেগুলি বাংলা করিবার ধুম পড়িয়া যায়। এ কাজে হাত দিয়াছিলেন শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে গুরুবন্ধু-বাবু ও নিখিল-বাবু নিছক গদ্যে ও প্রিয়ম্বদা দেবী ও চারু-বাবু গদ্যে পদ্যে মূলানুসরণে অনুবাদ করিতে থাকেন। কিন্তু নিছক গদ্য বলিয়াই বোধ হয় গুরুবন্ধু-বাবু ও নিখিল-বাবুর উৎসাহ টেঁকসই হইল—তাঁরা প্রায় সব নাটকগুলিরই অনুবাদ ক্রমে ক্রমে মাসিক পত্রে প্রকাশ করিলেন। গুরুবন্ধু-বাবুর অনুবাদগুলি বই হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কি না জানি না। এই কবিকথা দ্বিতীয় খণ্ডে নিখিলবাবুর অনুবাদ সবগুলি প্রকাশ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদে সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধনের চেষ্টা করেন যুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ধারাবাহিক রকমে। এঁদের নব-প্রকাশিত ভাসের নাটকগুলির বাংলা প্রকাশ করিয়া নিখিল-বাবু বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিলেন। নিখিল-বাবু কবিকথার প্রথম ভাগে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলির বাংলা বাহির করিয়াছেন তৃতীয়ভাগে শ্রীহর্ষ শূদ্রক-ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও নাটক শীঘ্রই বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। এই চেষ্টা প্রশংসার্হ ও শুভ কিন্তু অনুবাদ নিছক গদ্যে হওয়াতে সংস্কৃত মূলের কবিত্বরসমাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে; এরকম অনুবাদে কেবল গল্পটুকু ছাড়া মূলের রচনারীতির সৌন্দর্য্যের আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কবির কাব্য নাটকের অনুবাদ কবি না করিলে তাদের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না তবে নেই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভালো এঁদের চেষ্টায় যদি কবির পরিচয় ভালো করিয়া দিতে উদ্যোগী হইয়া উঠেন তবেও এঁদের রচনাশ্রম সার্থক হইবে।

ছবির মধ্যে স্বপ্নালাপ নামক রঙিন ছবি ও রাসলীলার ছবি ভালো হইয়াছে।

অল্পব্যয়ে ব্যবসা—শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ প্রণীত প্রকাশক এম বসু, ৪৯।২এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭৪ পৃষ্ঠা বারো আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে চার অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।—

প্রথম অধ্যায়—ব্যবসায়ের গোড়ার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—(১) অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা (২) পুস্তক প্রকাশ (৩) পুস্তক বিক্রয় (৪) ছোট ছাপাখানা (৫) ডুপ্লিকেটর (৬) পেটেন্ট ঔষধ বিক্রয়।

তৃতীয় অধ্যায়—জৈবিক ব্যবসা (৭) শূকরের চাষ (৮) মুর্গীর ব্যবসা (ক) বিলাতী মুর্গীর ব্যবসা (খ) মুর্গী ডিম বিক্রয়ের ব্যবসা (গ) ডিমের চাষ (৯) গোপালন ও গব্যব্যবসা (ক) মাখনের ব্যবসা (খ) দুধের ব্যবসা।

চতুর্থ অধ্যায়—কৃষিজ ব্যবসা (১০) সব্জীর ব্যবসা (ক) পালং শাকের চাষ (খ) বিলাতী বেগুনের চাষ (গ) বিলাতী মটরের চাষ (ঘ) বাঁধাকপির চাষ (ঙ) ফুলকপির চাষ (চ) আলুর চাষ (১১) ফলের ব্যবসা (ক) পেঁপের চাষ (খ) কলার চাষ।

এই দারুণ অন্নসমস্যার দিনে অল্পমূলধনে লাভজনক ব্যবসার দিকে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থকার সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বইখানি ছোট হইলেও ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে।

বৈশ্য জাতি ও বর্ণধর্ম্ম—শ্রীরজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন প্রণীত ও প্রকাশিত। মালদহ। ডিমাই ৮ পেজি ২৪৫ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা

বৈশ্য সম্প্রদায়ের কাল্পনিক উৎপত্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ব্যাখ্যা এবং তাঁদের সন্ধ্যা বন্দনা তর্পণ অশৌচ ব্রত নিয়ম প্রভৃতি শাস্ত্রানুগত

পালনীয় সংস্কার ও অনুষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা মন্ত্র পদ্ধতি প্রভৃতি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

ফল্গু—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। লাভপুর, বীরভূম। ডিমাই ৮ পেজি ৮৮ পৃষ্ঠা। দশ আনা।

পদ্যের বই। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের পদ্ধতিতে রচিত। ভাবের চেয়ে কথার গাঁথুনিই বেশী এবং সেইসব কথার মধ্যেও কবিতার যোগ্যতা সামান্যই দেখা যায়। এমন রচনা এই ভাবপ্লাবনের যুগে অচল।

দাস আমি—প্রকাশক শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়, প্রভাকর লাইব্রেরী, ৫নং রামমোহন মুখোপাধ্যায় লেন শিবপুর হাওড়া। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ৫২ পৃষ্ঠা। "দাস আমির মজুরী আট আনা মাত্র।"

নানান তত্ত্বকথার আবোল-তাবোল। মজুরী পোষাইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ২৭৮ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

শক্তিমান মনস্বীর জীবনচরিত যত লোকে লেখে ততই তাঁর চরিত্রের নানা দিকে আলোকপাত হয়। মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবন-চরিত তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে তাঁর মহাপ্রাণতা পরিবেষণ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এজন্য এই জীবনচরিতখানি দেশের কাজ ও উপকার কিছু-না-কিছু করিতে পারিবে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও করতোয়া—শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু প্রণীত ও প্রকাশিত। সেরপুর, বগুড়া। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ১৪৪ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

এই ইতিহাসে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশ ও করতোয়া নদীর বিবরণ নিম্নলিখিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

প্রথম অধ্যায়—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের আদিকথা ও অবস্থান।
দ্বিতীয় অধ্যায়—পৌণ্ড্রদেশের বিবরণ।
তৃতীয় অধ্যায়—ধর্ম্মেতিহাস ও ঐশ্বর্য্যাদি।
চতুর্থ অধ্যায়—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা মহাস্থানের আধুনিক অবস্থা।

করতোয়া।

প্রথম অধ্যায়—করতোয়ার প্রাচীনত্ব ও গঙ্গার সহিত করতোয়ার সম্বন্ধ।
দ্বিতীয় অধ্যায়—পুরাণে করতোয়া, করতোয়া মাহাত্ম্য।
তৃতীয় অধ্যায়—করতোয়ার গতি, বাণিজ্য।
চতুর্থ অধ্যায়—করতোয়ার ক্ষুদ্রত্বের কারণ, অধুনা করতোয়া ও দেশের অবস্থা।

এই পুস্তকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কেবল রাজপরিবর্ত্তন নহে—ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন, সমাজপরিবর্ত্তন প্রভৃতির বিবরণ দিয়া ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন—"বর্ত্তমানে কোন জাতি যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্তই থাকুক না, তাহাদের মত দুর্দ্দশা হইতে আবার উন্নতি করিয়াছে, এরূপ জাতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। এইজন্য ইতিহাস জাতীয় অবসাদ ও নৈরাশ্যের ঔষধ।"

এই সুলিখিত ইতিহাসখানি বঙ্গের এক কোণের উপর অনেকখানি আলোক নিক্ষেপ করিতে পারিবে। দেশকে সকলেরই স্পষ্ট করিয়া জানা উচিত। এই ইতিহাস প্রাদেশিক হইলেও সমগ্র দেশের সঙ্গে এর যোগ আছে। দেশের পরিচয় খণ্ড খণ্ড হইতেই সমস্ত হইয়া উঠে।

রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৮ পৃষ্ঠার ছোট বই, দাম এক টাকা।

লেখক জানান নাই এই অনুবাদ ইংরেজি হইতে, না মূল হইতে। মূল হইতে নয় বোধ হয়। সে যাই হোক, শ্লোকগুলি সরস বাক্যে ও শ্রুতিমধুর ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ভূমিকায় সাহিত্যরসজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ওমার খায়্যামের কবিত্ব ও দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এই কাব্যের রসগ্রহণে পাঠকের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পারস্যের মরমিয়া কবির এই মজাদার সুন্দর শ্লোকগুলি বিশ্বসাহিত্যে পরম সমাদৃত; সুতরাং তাদের সরস অনুবাদও বাংলাসাহিত্যরসিক মহলে সমাদৃত হইবে।

স্মৃতিকণা—স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান আশুতোষ লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম। বারো আনা।

কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা আছে। ষোল বছরের মেয়ের লেখা। সে হিসাবে কবিতাগুলি ভালো।

অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন পক্ষে—শ্রীলালবিহারী মজুমদার কবিভূষণ। প্রকাশক—শ্রীঘনমোহন দাস, পুরাতন মালদহ। মূল্য মাত্র দুই আনা।

এই প্রবন্ধ যখন মালদহের গৌড়দূত ধারাবাহিক প্রকাশ করিতে ছিলেন তখন প্রবাসীর দেশের কথার মধ্যে অনেক উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিশেষ জোর দিয়া অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করা হইয়াছে। ইহা সকলকেই পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

জাতীয় শিক্ষার অধিকার—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালী[illegible] দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পঞ্চবট কানন, মাণিকতলা, কলিকাতা। ডিমাই ৮ পেজি, ২৪ পৃষ্ঠা চার আনা।

লেখকের মোট বক্তব্য ধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত শিক্ষা ব্যর্থ "দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য, চতুর্ব্বর্গ সাধনে তাহাদের জীবনে পূর্ণ সিদ্ধি আনিবার জন্য, যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা।" জাতীয়তা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শিক্ষা দিতে ও পাইতে হইবে—ইহাতে কারো দ্বিমত হইবার নাই।

দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে—শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রণীত। আদর্শ লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র। আট আনা।

"গল্পসূত্রে নানা দেশের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রথম পরিচয়" এই পুস্তকের সাহায্যে হইতে পারিবে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দেশের পরজীবনে-প্রসিদ্ধ ছেলেমেয়েদের কাহিনী সরস করিয়া লেখা হইয়াছে। এই প্রণালী বঙ্গসাহিত্যে নূতন। ছেলেমেয়েদের বিশেষ প্রীতিকর বই হইয়াছে ইহা আমরা নিজের বাড়ীর পরিচয় হইতে বলিতেছি। মুদ্রারাক্ষস।

মায়াদেবী—শ্রীদাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া বীণাপাণি পাঠশালা হইতে প্রকাশিত। দাম চার আনা।

একটি গল্প লইয়া একখানি পুস্তিকা। গল্পটি আজগুবি ও আগা গোড়া অসঙ্গতিতে পূর্ণ। পাড়াগাঁয়ে বেদেরা যেমন মাটিতে আঁটি পুঁতিয়া, সঙ্গে সঙ্গে গাছ জন্মাইয়া, মুকুল ধরাইয়া ও ফল ফলাইয়া

লোককে তাক্ লাগাইয়া দেয়, এই গল্পটিতে লেখকও তেমনি পাঠকদের তাক্ লাগাইবার প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বেদের মত চাতুর্য্যও তাঁতে নাই। নায়িকা মায়াদেবীর আট বৎসর বয়সে প্রেমে পড়িয়া বিভোর হইয়া যাওয়া—লেখকের মানসরাজ্যে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবজগতে তাহা যে কতদূর অসম্ভব তাহা লেখক চেষ্টা করিলেই বোধ হয় জানিতে পারেন। হতশ্রী প্রেমিক সুকুমারের এক মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া, পত্নী হইতে তার কাশী ও কাশী হইতে বদরিকা-শ্রমের পথে যাইতে তার যেটুকু সময় লাগিল সেই সময়ের মধ্যে আট বৎসরের মায়াদেবীর অকস্মাৎ ষোড়শীত্ব প্রাপ্ত হওয়া এবং বিবাহিতা হইয়াও সুকুমারের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু পিছু মায়াদেবীর ছোটা ও অদ্ভুতভাবে দুজনের মিলন ঘটা—এ-সমস্ত একেবারে আজগুবি। চার আনা পয়সা খরচ করিয়া বইখানি কেনা অপেক্ষা চার আনার সন্দেশ খাইলে উপকারে আসিতে পারে।

স্বস্তিকা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। দাম ছয় আনা।

কতকগুলি গান ও কবিতায় বই। বইখানি আমাদের খুব ভাল লাগে নাই। আধ্যাত্মিক গানগুলিতে বেশ প্রাণের আবেগ আছে বটে, কিন্তু কবিতাগুলি মোটের উপর কবিত্বের সহজ স্ফূর্ত্তি হইতে বঞ্চিত।

সাবিত্রী—শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত। শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, এম-এ কর্ত্তৃক ১৫ নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কাব্যাকারে সাবিত্রীর চরিত্র-কথা। সাবিত্রীর চরিত্রে জায়গায় জায়গায় অতিরঞ্জন এবং অসঙ্গতি আছে। সাবিত্রীকে নূতন উপলক্ষ্যের সহিত বুঝাইবার প্রয়াস নাই। মোটের উপর কাব্যখানি মন্দ নহে। অন্তঃপুরিকার সাহিত্য-চর্চ্চা প্রশংসারই কারণ। ছন্দে ও উপমা-নির্ব্বাচনে লেখিকাকে আরো একটু সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। বইখানির কাগজ ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

মগধ—পাটলিপুত্র ও রাজগৃহ (প্রথম খণ্ড)—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। বাঁকিপুর (পাটনা) হইতে প্রকাশিত। দাম দুই আনা।

একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। পাটলিপুত্র ও রাজগৃহের ইতিবৃত্ত পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। বিষয়টি পদ্যের উপযোগী হইলেও পদ্যে তার গুরুত্ব খর্ব্ব হয় নাই। তবে জায়গায় জায়গায় ছন্দের ত্রুটি আছে।

মাধুরী—শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত, এম-এ প্রণীত। ১৯।৪ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায় দ্বারা প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

কন্যার মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস এবং সেই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া ভগবানের উপলব্ধি। গুরুতর ধর্ম্মকথাও অনেক আছে।

বিভ্রাট—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক গ্রে, মল্লিক, দি লণ্ডন লাইব্রেরি, ১৫ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

এখানি প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার লা বিশের রচিত লা প্রাবেয়ার নামক হাস্যরসাত্মক নাটিকার দেশী হাঁচে ঢালা বাংলা অনুবাদ। রচনা বেশ ঝরঝরে, কোথাও অনুবাদের গন্ধ নাই। বাটিকামারি শাখা-সাহিত্য-প্রচার-সমিতের সভাপতি মণিকলাল সিদ্ধান্তরত্নকে বাঁটি ভাঙালী তৈরী করিয়া গ্রন্থকার যথেষ্ট শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকতারও পরিচয় দিয়াছেন। বইটিতে তিনখানা একখানি সুন্দর ছবি আছে, গল্পের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হইল না।

সন্ধানী-আলো।

Pandit Sivanath Sastri. A sketch of his life and writings (with a portrait) by Pandit Sitanath Tattvabhusan (210-3-2 Cornwallis street, Calcutta). Pp. 46. Price 8 as.

এই গ্রন্থে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

সাধু-সঙ্গ

(তুলসীদাস)

চুঁড়িছে ভ্রমরা কমল-অঙ্ক,
ময়ূর মাগিছে নিবিড় বন;
ঝাঁপায়ে পড়িছে দীপে পতঙ্গ,
চাহিছে চকোর চাঁদ-কিরণ;
'তুলসী' খুঁজিছে সুজন-সঙ্গ,
যাহাতে তাহার মজেছে মন।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

দেশের কথা

দেশের কথা ত আমাদের হাহাকার! প্রত্যেক মাসে অক্ষমদের আর্ত্তনাদ প্রকাশ করিতে ক্লেশ হয়, লজ্জা করে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হয়। আগে দেশের যে অবস্থা হইলে লোকে দুর্ভিক্ষ বলিত, এখন সেই অবস্থা স্থায়ী ও লাগ্নিক হইয়া গিয়াছে; তার উপরও যখন নিতান্ত-আবশ্যক খাদ্য পেয় দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে তখন তাকে আমরা বলিতেছি দুর্মূল্য! বঙ্গদেশ জীবন-যাত্রার সকল পদার্থেরই দুর্মূল্যে পীড়িত হইতেছে।—

নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের দর পুনঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে চাউলের মন ৩৲ ৩৷০ ছিল এখন তাহা ৭৷০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। এবার আবাঢ় শ্রাবণ মাসে লোকের যে কি হইবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। পূর্ব্বে যে কাপড়ের মূল্য ১৷৷০ আনা ছিল তাহাই এখন ৬৲ টাকায় উঠিয়াছে, প্রতি সপ্তাহেই বাড়িতেছে। এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে যে কাগজের মূল্য ছিল ৵৫—৵১০ ছিল তাহাই এখন ৷৵০ ৷৷৵০ আনায় বিক্রীত হইতেছে। ব্যয় ক্রমেই বাড়িতেছে কিন্তু আয় বাড়ে নাই। এইরূপ ভাবে চলিলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ আর কত দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে? এখন ধর্ম্ম কর্ম্ম কিম্বা পরোপকার করা দূরের কথা, জীবিকা সংগ্রহ করিতেই অধিকাংশ লোককে সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিতে হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও কি চলে? ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস

বহিতেছে, অনেকে পরিবার-প্রতিজনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরণের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে। সোনার ভারত, আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।—যশোহর।

ধান্য-চাউলের মূল্য হ্রাস পাইল না। চৈতালি শস্যের আশা অনেকের ছিল, কিন্তু ফাল্গুনের শেষে শিলাবৃষ্টি হওয়ায় চৈতালি সমূলে নষ্ট হইয়াছে। ফাল্গুনের শেষে বৃষ্টি হওয়ায় খেজুর-গুড়েরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইক্ষুগুড় এতদঞ্চলে যাহা উৎপন্ন হয়, প্রথমে একটু বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রীত হওয়ায় একটু সুবিধা ছিল, এখন আর শ্রম এবং খরচের দাম পোষায় না। মৎস্যাদিও দুর্লভ হইতেছে। চাউল নাই, মৎস্য নাই, তরকারির মূল্য কি হইতে পারে, সহজেই অনুমেয়। চাউল দেশী মোটা (৬০এর ওজনে) /৭॥ সাড়ে সাত সের দরে বিক্রীত হইতেছে।—যশোহর।

চাউলের দর ও দুর্ম্মূল্যতা—চাউলের দর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বিগত বৎসরও খাদ্য শস্যাদির মূল্য এমন দিনে এরূপ শোচনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় নাই।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

চাউলের মূল্য—এজেলার সর্ব্বত্রই চাউলের দর প্রায় দশ টাকায় উঠিয়াছে।—চাকাগেজেট।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—আবার চাউলের মূল্য শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মূল্য আরও বাড়িবে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে যে দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহা না কমিলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে উপবাস করিতে হইবে। দরিদ্র ত একরূপ উপবাস করিয়াই আছে।
—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

দেশের সর্ব্বত্র এই ভীষণ দুর্ম্মূল্যতার কারণ বিদেশে রপ্তানী। কারণ—

গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে চাউল আমদানী রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তখন চাউলের মূল্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু জানিনা কর্ত্তৃপক্ষ কেন তাহা রদ করিলেন। ফলে দোকানদারগণ সুবিধা পাইয়া ইচ্ছামত মূল্য আদায় করিতেছে।
—যশোহর।

যুদ্ধের সময় লোকে অন্নকষ্ট পায় নাই। সে সময় বস্ত্র ও বিলাসের বিবিধ উপকরণ ছাড়া জীবন ধারণ উপযোগী প্রত্যেক দ্রব্যই সুলভ ছিল। তার কারণ ধান চাল কলাই গোধূম প্রভৃতি প্রধান খাদ্য দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানী বন্ধ ছিল। দেশে যাহা জন্মিয়াছিল, দেশবাসীর পক্ষে তাহাই প্রচুর বোধ হইয়াছিল।

বঙ্গের স্বর্ণপ্রসূ ভূমিতে অন্নসমস্যা প্রায়ই হয় না। ফসল গত বৎসর ও এ বৎসর বেশ হইয়াছে। তবু আমরা অনাহারে ম্রিয়মান। উৎপাদক কৃষক অনাহারী। বিদেশী বণিক, বিদেশী Consumer স্ফীতোদর। আমাদের দুর্গতির বিষয় ভাষায় বর্ণনা হয় না। আমরা "চিনির বলদ"। পিঠে চিনির বিপুল বোঝা বহিতেছি। কখনও এক বিন্দু শর্করা জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়া তাহার স্বাদ অনুভব করিতে পারি না। এমনি পোড়া কপাল আমাদের।—সুরাজ।

দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসকদের স্বার্থসম্পর্ক এক না হইলে এর প্রতিকার সহজে হইতে পারে না। যদি ঐকান্তিক ও আন্তরিক চেষ্টায় দেশের লোক দেশশাসনের কর্তৃত্ব স্বায়ত্ত করিতে পারে, তবেই এর প্রতিকার হইবে। গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য দেশকে রক্ষা করা; দেশবাসীর উচিত গভর্মেণ্টকে তাঁদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া করাইয়া করিয়া তোলা।—

অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে এবার চাউলের মূল্য টাকা উঠিবে। তখন লোকের অবস্থা যে কি হইবে তাহা শিহরিয়া উঠিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সত্বর ইহার প্রতিবিধান তৎপর হউন, গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য করুন। এই সঙ্গে কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? যদি দেশবাসী সকলে একজোট হই গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলেই পরিত্রাণের আশা আছে। দূরদূরান্ত হইতে আগত ধান ব্যবসায়ীগণের দ্বারা গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীগণ এ টাকার লোভে পোলাজাত সমস্ত ধান চাউল ব্যবসায়ীর হাতে দিতেছে। জমিদারগণকেও বলি আর নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া সময় নাই। এখনও অনাহারে ক্লিষ্ট প্রজাগণকে মৃত্যুর কর হইতে রক্ষার জন্ম গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করুন। পূর্ব্বে লোকগণ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ম বড় বড় দীঘি খনন করিয়া দি অতিথি-অভ্যাগতগণকে আদরের সহিত ভোজন করাইতে ধর্ম্মগোলা স্থাপনে স্বার্থত্যাগের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। একনিষ্ঠ কর্ম্মী এবং মহান প্রাণ।—যশোহর।

দেশের জমিদার-সম্প্রদায় গভর্মেণ্ট ও প্রজার দালাল বা ফড়ে মাত্র হইয়া না থাকিয়া যদি নিজেকে স্বতন্ত্র ষ্টেট বলিয়া বিবেচনা করেন ও নিজের এলাকার অভাব মোচন করিবার দিকে যত্ন তবে দেশের এই হাহাকার অনেকটা কমে। দেশ আমরা অল্প দামে কাঁচা মাল বিদেশকে বেচি বিদেশের নিকট হইতে বেশী দামে প্রস্তুত শিল্প কিনিতে বাধ্য হই।

গত বৎসর ভারতবাসী ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার জাপানে পাঠাইয়াছে। আর উক্ত দেশ হইতে আমদানী ৩৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার জিনিষ। কবে ভারত শিল্পের উন্ন কাঁচা মালের পরিবর্ত্তে আপনাদের শিল্পজাত পণ্য বিদেশে পারিবে। সে দিন কি খুব দূরে?—যশোহর।

জাপানী মাল।—নিম্নলিখিত হিসাব হইতে দেখুন ভারতে মালের আমদানী কিরূপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে:-

বৎসর	আমদানী দ্র
১৯১২—১৩	৫০৭
১৯১৩—১৪	৪৭৮
১৯১৪—১৫	৪৪৫
১৯১৫—১৬	৭৫০
১৯১৬—১৭	১৩০০
১৯১৭—১৮	১৮২৬
১৯১৮—১৯	৩০৬০

আর অন্যদিকে ভারত যে-সমস্ত মাল (তুলা ছাড়া) রপ্তানী করিয়াছে তাহার পরিমাণ উক্ত ৭ বৎসরে ১৪৯ লক্ষ ইহা হইতেই জাপানের নিকট ভারতের ভীষণ ঋণের প উদ্ভবের স্বরূপতা উপলব্ধি হইবে।—বীরভূমবাসী।

যদি জমিদারেরা নিজের নিজের এলাকার কাঁচা মাল হইতে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তন করিবার সাহায্য ও উৎসাহ দ্যান তবে এই টাকাটা আমাদের দেশেই থাকিয়া যায়; এবং প্রজারা স্বচ্ছল অর্থশালী হইলে জমিদারদেরও লাভ বেশী হয়—কারণ তাঁরা গভর্মেণ্টকে যে খাজনা দ্যান তাহা ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থির হইয়া আছে।

দেশজোড়া এই অভাবের ফলে দেশের লোকের অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষে লোকের দুর্গতি চরমসীমায় পৌছিয়াছে। উড়িষ্যায়—বিশেষ করিয়া পুরী জেলায়—দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রে বিশেষ করিয়া আলোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া—

ময়ূরভঞ্জে দুর্ভিক্ষ—উড়িষ্যা কটকের একজন সংবাদদাতা তার এপ্রেসের "বেঙ্গলীতে" লিখিয়াছেন,—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের কতক অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। রিলিফ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাহায্যের চেষ্টা চলিতেছে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

গাবুরায় দুর্ভিক্ষ—বঙ্গবাসীতে পুরী জেলার দুর্ভিক্ষের বিষয় গত-পূর্ব্ব সপ্তাহের সংবাদপত্রে পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে সেখানকার দুর্ভিক্ষ গাবুরার দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা কম, কারণ অত্র ইউনিয়নে ১৯টি লোক অনাহারে মরিয়াছে। এখানকার বহুলোকের ঘর দুয়ার নাই, দারুণ গ্রীষ্মের রৌদ্র তাহাদের শরীরের উপর দিয়া যাইতেছে। অত্রস্থ বিস্তর লোক আহার যোগাইতে না পারিয়া স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার উদ্দেশ নাই।—খুলনাবাসী

গ্রামবাসীদের ভীষণ সঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। দারুণ অন্নকষ্ট গ্রামগুলি ধ্বংস করিবার জন্য তাহার আধিপত্য প্রকাশ্যভাবে বিস্তার করিতেছে। পেট ভরিয়া দুই বেলা ভাত খাইতে পায় এমন লোকের সংখ্যা অনেক গ্রামেই খুব কম। অনেক পিতা মাতা নিজেরা ফেন (ভাতের মাড়) খাইয়া শিশুসন্তানগুলিকে অতিকষ্টে-সংগৃহীত যৎসামান্য অন্ন দিয়া জীবনধারণ করাইয়া রাখিতেছে।—বরিশাল-হিতৈষী।

অভাবের তাড়নার অনিবার্য্য ফল—

ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। সাথে সাথে চুরিও বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক জায়গায়ই ধান চাউল চুরি হইতেছে।

—বরিশাল-হিতৈষী।

দেশের লোকেদের অভাব মোচন করিতে গভর্মেণ্ট বাধ্য। যদি গভর্মেণ্ট তাতে মনোযোগী না হয় বা অক্ষম হয় দেশের লোক হাঙ্গামা করে, লুট করে; গভর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিতে হয়। আমাদের দেশের লোক জানেই না যে গভর্মেণ্টের উপর তাদের কোনো দাবী আছে, তাদের কাছে গভর্মেণ্টের কোনো দায়িত্ব আছে, অথবা নিষ্ক্রিয় উদাসীন গভর্মেণ্টকে বাধ্য করিয়া নিজেদের দুঃখ দূর করাইবার তাদের কোনো শক্তি আছে। তাই আমাদের দেশের লোক হয় ভিক্ষা করে, নয় প্রতিবাসীর বড়ী চুরি করে, নয় ত সুবোধ ভালোমানুষটির মতন আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত এড়ায়—তবু তার প্রতিবাদ করে না, প্রতিকারের চেষ্টা করে না, কারণ তারা জানেইনা প্রতিবাদ কার কাছে কেন করিবে ও কিসে তাদের এই সর্ব্বনাশী দুঃখের প্রতিকার হইবে। যা একটু চেঁচামেচি সংবাদপত্রে ও দুচারজন অসহ্য লোকে করিতেছেন তারই ফলে—

বিহার গবর্ণমেণ্ট পুরী জেলা-বোর্ডের হস্তে ৫০ সহস্র টাকা ন্যস্ত করিয়াছেন, উক্ত টাকা দ্বারা বিনা লাভে খরিদ-দরে [পুরীর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের] ধান চাউল বিক্রয় করা হইবে। উদ্দেশ্য মহৎ।

—যশোহর।

গভর্মেণ্টের এই কৃপণের দানের চেয়ে বিহের এই দান অনেক মহৎ ও বৃহৎ।

বন্যবান।—কলিকাতার ডাক্তার জে এম দাস মহোদয় সাধারণ দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে বিতরণার্থ পুরীর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের নিকট ১৫৮ খানা ধুতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এসকল বস্ত্র নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর দরিদ্রগণকে প্রদান করিয়া দাতার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

কিন্তু এইরূপ মুষ্টিভিক্ষায় দেশব্যাপী অভাব মিটিবার নয়।

অভাবে আত্মহত্যা—আমরা সংবাদ পাইলাম রূপনগর থানায় জগদীশপুর গ্রামে শ্রীমতী দনী দাসী নাম্নী একটি অতি দরিদ্রা স্ত্রীলোক একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিত। তাহার স্বামী কয়েকমাস হইল সুন্দরবনে খাটিতে গিয়া আর ফিরিয়া না আসায় অন্নবস্ত্রাদির অভাবে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। দনী দাসী অনেকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়াও তাহার স্বামীর কোনই খবর পায় নাই। এদিকে এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে তাহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। দরিদ্রা স্ত্রীলোকটি পুত্রকন্যা সহিত নিজের জীবন রক্ষার কোন উপায় না পাইয়া গত ১৩ই বৈশাখ সোমবার রাত্রে উদ্বন্ধনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে। স্ত্রীলোকটির বয়স প্রায় ৩০।৩৫এর কম হইবে না। অন্নবস্ত্রাদির দুর্ম্মূল্যতার জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কি প্রকার শোচনীয় হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। অন্নবস্ত্রাভাবে যে কত হতভাগ্য নরনারী নানা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে?—নীহার।

নীরবে এইরূপে মরিতে মরিতে আমাদের জীবনীশক্তি উদ্যম কর্ম্মচেষ্টা সব লোপ পাইয়া গেছে। তার পর—

দেশে নানা প্রকার সাংঘাতিক সংক্রামক ব্যাধি যে এখন এরূপ বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে, অন্ন-বস্ত্রের অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রজাপালক রাজশক্তি যদি এখনও এই অসহনীয় অভাবাদির দূরীকরণে যত্নবান না হন, তাহা হইলে এ দেশবাসীর যে কি ভীষণ দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা কল্পনায় আনাও কঠিন।

গভর্মেণ্টকে বারম্বার ডাক দেওয়াতে তাঁদের স্বর্গের আসন টলিয়াছে। তাঁরা দুর্ম্মূল্যতার কারণ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ লইয়া প্রজার দ্বারস্থ হইয়াছেন দেখিতেছি।—

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা অনুসারে প্রচারিত।—গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতিগুলি যুদ্ধেই ব্যস্ত ছিলেন; যে-সব জিনিষ না হইলে আমাদের দিন চলে না তাহা তৈয়ার করিবার সময় পান নাই; কাজেই ঐ-সকল জিনিষের অভাব ঘটিয়াছিল। অভাব হইলেই জিনিষের দর বাড়ে। কাজে-কাজেই ইউরোপে প্রস্তুত ঐ-সমস্ত জিনিষের দর বাড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে, এইসকল জাতি যুদ্ধে খরচ চালাইতে তাঁহাদের নগদ টাকা খুব বাড়াইয়াছিলেন। ধান যেমন খুব বেশী জন্মিলে তাহার দর কমিয়া যায়, টাকাও সেইরূপ বেশী হইলে তাহার দর কমিয়া যায়; অর্থাৎ পূর্ব্বে যে টাকায় যত জিনিষ কিনিতে পারা যাইত, এখন সেই টাকায় তাহা অপেক্ষা কম জিনিষ কিনিতে পারা যায়। এই কারণে ইউরোপে প্রস্তুত আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির দর চড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের পূর্ব্বে, যে দর ছিল তাহা অপেক্ষা, হল্যাণ্ডে শতকরা ১০৪ টাকা এবং বেলজিয়মে শতকরা ২৬১ টাকা দর চড়িয়াছে। এখন বিলাতে শতকরা ১৩৪ টাকা চড়িয়াছে।

ইহার অর্থ, পূর্ব্বে টাকার ক্রয় করিবার যে শক্তি ছিল এখন তাহা নাই। ইহা যে কেবল ইউরোপেই হইয়াছে তাহা নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়াছে, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে। সুতরাং ভারতবর্ষেও জিনিষের দর বাড়িয়াছে। ইহার হাত এড়ান ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু ইউরোপে দর যতদূর চড়িয়াছে ভারতবর্ষে ততদূর চড়ে নাই।

সাধারণতঃ লোকের এই ধারণা যে, বিদেশে বেশী পরিমাণে চাউল রপ্তানী হওয়ার জন্যই চাউলের দর বাড়িয়াছে। ইহা ঠিক নহে। এসিয়ার অন্যান্য দেশে চাউলের দর বঙ্গদেশ অপেক্ষা দুই গুণ বা তিন গুণ চড়িয়াছে। বিদেশে চাউল রপ্তানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে-সমস্ত কড়া ধরবাঁধার নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতেই উহা অতদূর চড়িতে পারে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে গড়ে প্রতি বৎসরে ২,৪৫৪,৩০০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইত। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন শস্য খুব বেশী পরিমাণে জন্মিয়াছিল এবং অনেক উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষ হইতে ২,৪৬৩,৬০০ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল (তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে ১,৯৬৪,০০০ টন রপ্তানী হইয়াছিল); তাহাতে ভারতবর্ষের মিট রপ্তানী ৪৯৯,৬০০ টন দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষে, বৃষ্টি না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে চাউলের রপ্তানী কমাইয়া দেন, এবং তাহার ফলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে কেবলমাত্র ৭০৭৮০০ টন চাউল রপ্তানী হয়; তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতেই ৫৪৮,২০০ টন রপ্তানী হইয়াছিল; তাহাতে ভারতবর্ষের মিট রপ্তানী ১৫৯,৬০০ টন দাঁড়ায়। রপ্তানী এখন এত কমান হইয়াছে যে, যে-সকল দেশ কেবল ভারতবর্ষের চাউলের উপরই নির্ভর করে, তাহাদের একেবারে যাহা না হইলেই চলে না সেই পরিমাণ যদি ব্রহ্মদেশ হইতে না পাওয়া যায়, তবেই তাহা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা হয়। যেমন, লঙ্কাদ্বীপ এবং মরীশস্ দেশ; এই-সকল দেশে বিস্তর ভারতবাসী থাকে; অথবা ষ্ট্রেড্ডার মত স্থান, যেখানে বিস্তর ভারতবাসী তীর্থ করিতে যায়।

কত রপ্তানী করা হইবে তাহা বর্ত্তমানে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর ঠিক করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রথম তিন মাস বঙ্গদেশের বন্দর-সকল হইতে ভারতীয় চাউল রপ্তানী করা হয় নাই। দ্বিতীয় তিন মাসে যাহা বঙ্গদেশে ব্যবহার করা হয় না কেবল এইরূপ পুরাতন হার্ড টেবিল রাইস নামক চাউলই খুব কম পরিমাণে বঙ্গদেশ হইতে রপ্তানির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমানে কেবল করাচী হইতেই ভারতীয় চাউল রপ্তানী করার আদেশ দেওয়া হইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষের হিতের জন্য এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে চাউলের আমদানী-রপ্তানীতে বর্ত্তমানে কোন বাধা দেওয়া যাইতেছে না।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৯১৯।২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে (ব্রহ্মদেশ ছাড়া) ৩২,১৯৬,০০০ টন জন্মিয়াছে; ১৯১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে ২০,৬৭২,০০০ টন জন্মিয়াছিল, অর্থাৎ এই বৎসর ১১,৫২৪০০০ টন বেশী জন্মিয়াছে। একমাত্র বঙ্গদেশেই, ১৯১৮।১৯ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা এই বৎসর ১,৩৫৪০০০ টন বেশী জন্মিয়াছে এবং বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম এই তিনটি প্রদেশে ঐ বৎসর অপেক্ষা ৬,৭৬৬০০০ টন বেশী জন্মিয়াছে।

—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ইত্যাদি।

চাউল ইত্যাদির মূল্য কেন এরূপ বাড়িতেছে তৎসম্বন্ধে সাধারণকে সঠিক কারণ বুঝাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলাতেই একটি করিয়া বেসরকারী কমিটি গঠন করিতেছেন। দুর্ম্মূল্যতার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া, মূল্যাদি বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা, অমূলক জনরবের প্রতিবাদ করা ও গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া ব্যতীত তাঁহাদের এ বিষয়ে আর কিছু করিবার বা বলিবার বিশেষ কোন অধিকার থাকিবে না। এইরূপ কাজের জন্য বেসরকারী কমিটি গঠনের কি আবশ্যকতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জিনিষের মূল্য সর্ব্বত্রই সমানভাবে বাড়িতেছে, এ সংবাদ কোন স্থানেই গোপন রহিয়া যাইতেছে না। সুতরাং ইহার জন্য এরূপ কমিটি স্থাপনে কোনই সুফলের আশা করা যায় না। এই কার্য্য এবং দুর্ম্মূল্যতার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া ও অমূলক জনরবের প্রতিবাদ করা সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারাই ভালরূপ সম্পন্ন হইতে পারে। মনে করুন দুর্ম্মূল্যতার তথ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাই সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য কমিটির বেসরকারী সভ্যগণের প্রতি উপদেশ করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বেসরকারী সভ্যই যে উক্ত কারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত হইয়া তাহাই প্রচার করিবেন ইহার কারণ কি? এ অবস্থায় আমরা এরূপ বেসরকারী কমিটি স্থাপন নিতান্তই অযৌক্তিক মনে করি। এরূপ কমিটি দ্বারা প্রকৃত কাজ কিছুই হইবে না।—সুরাজ।

মিষ্টিকথায় চিঁড়ে ভিজে না। কেবল বাগাড়ম্বরে লোক ভোলে না। গভর্মেণ্ট যে দেশের গভর্মেণ্ট সে দেশের প্রতি তাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না বলিয়াই দেশের লোকের দৃঢ় ধারণা।—

সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় লোক শিহরিয়া উঠিতেছে। দুর্ম্মূল্যতা-জনিত লোকের ক্লেশের কথা স্বীকার করিলেও গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করিতেছেন না।—সুরাজ।

অথচ যেরূপ দেখা যাইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকারে তাদৃশ মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।—ঢাকাপ্রকাশ।

গভর্মেণ্টকে অমনোযোগী থাকিতে আমরা কিছুতেই দিব না। কিন্তু যতদিন গভর্মেণ্টকে ষোলো আনা মনোযোগী করিতে না পারিতেছি ততদিন—

দেশের মধ্যবিত্ত ও দীনদরিদ্র জনসাধারণকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাদিগকেই ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।

সে চেষ্টা হইতেছে—কৃষি ও বস্ত্রবয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ। কৃষিকার্য্য কেবল নিম্নশ্রেণীর কৃষকগণের হাতে না রাখিয়া, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ যদি তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং পরিচালন করেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীদিগের চক্রান্তে এভাবে দেশের শস্যাদি স্থানীয় ভাণ্ডার শূন্য করিয়া বিদেশে যাইতে পারিবে না; ফলে আহার্য্য দ্রব্যাদি দেশবাসীগণের সহজ-লভ্য হইবে। তার পর, নিজহাতে যে-সকল ভদ্রগৃহস্থ কৃষিকার্য্য করিতে পারিবেন, তাহাদের নিজ পরিজনবর্গের আহার্য্য নিজের আয়ত্তেই থাকিবে। অযথা অভিমান ত্যাগ করিয়া যে পন্থা যাঁহারা অবলম্বন করিবেন, এ দুর্দ্দিনে তাঁহারাই নিশ্চিত বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন।

বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধেও সেই কথা। যে দেশ বস্ত্রশিল্পের জন্য পৃথিবীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেই দেশেই এখন বস্ত্রবয়ন একরূপ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই পরের হাতে আত্মসমর্পণের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, এখন তাহাই দেখা দিয়েছে। এখনও যদি দেশের কর্ম্মীগণ একার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রাভাবে অনেককেই দিগম্বর হইতে হইবে। আজকাল যেরূপ উন্নতপ্রণালীর তাঁত বাহির হইয়াছে, তদ্দ্বারা সকল গৃহস্থই অনায়াসে নিজ প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। প্রত্যেক গৃহেই এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা সংসারের কার্য্যাদি করিয়াও যথেষ্ট সময় পাইয়া থাকেন; সেই স্ত্রীলোকেরাই এই তাঁত দ্বারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। যাঁহারা বস্ত্রাভাবের দায় হইতে উদ্ধার পাইতে চাহেন, তাঁহারা অবিলম্বে এই উপায় অবলম্বন করুন। তারপর, দেশের তন্তুবায়দিগকে উৎসাহিত করিয়া বস্ত্রবয়নে প্রবৃত্ত করিতে পারিলে, বস্ত্র সকলেরই সহজলভ্য হইবে।

যাঁহারা দেশের যথার্থ কল্যাণ কামনা করেন, সোদরপ্রতিম প্রতিবাসীগণের সুখে ও দুঃখে যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন, এ দুর্দ্দিনে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব বিলুপ্তির আতঙ্কে যাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা করযোড়ে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা স্থিরচিত্তে দেশের দশা চিন্তা করিয়া উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব করিবেন না। এ সময় আত্মরক্ষার ইহাই একমাত্র উপায়। এরূপে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিলে, আজ ওলাউঠা বসন্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে উপায়হীন স্বদেশবাসিগণকে অকালে কালকবলিত হইতে দেখিয়া সজ্জনগণকে যে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে হইতেছে, শ্মশানের সেই মর্ম্মবিদারী দৃশ্য আর কাহাকেও দেখিতে হইবে না।—চাকা-প্রকাশ।

দেশে অন্নাভাবের ফল স্বাস্থ্যহানি। এই স্বাস্থ্যহানির আর-একটি কারণ সর্ব্বত্র পরিষ্কার জলের অভাব।

জলকষ্ট।

আজকাল এত্র জেলার পল্লীগ্রাম হইতে আমরা জলকষ্টের অনেক সংবাদ পাইতেছি। পল্লীর অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়, বিশেষ বরিন্দ্র অঞ্চলে জলের বড়ই অভাব। বরিন্দ্র-অঞ্চলবাসী পুরাতন পুষ্করিণীর কর্দ্দমাক্ত শৈবাল-পরিপূর্ণ জল পান করিতেছে। তাহার ফলে কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।—মালদহ-সমাচার।

আগামী শীতকালে আমাদের যুবরাজ ভারতে শুভাগমন করিবেন। তাঁহার সম্মানার্থ দেশের জমিদার ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ এলাকায় পুষ্করিণী বা ইঁদারার ব্যবস্থা করিয়া লউন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করুন। ইহাতেই অর্থের ঠিক সদ্ব্যবহার হইবে।—মালদহ-সমাচার।

পল্লীবাসীর জলকষ্ট—নদীয়া জেলার থানা দৌলতপুরের অন্তর্গত পাকুড়িয়া ও মহিষকুণ্ডী গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৩।৪ মাইলের মধ্যে কোন নদী বা পানীয় জলের উপযুক্ত ইন্দারা বা পুষ্করিণী না থাকায় পল্লীবাসীর ভীষণ জলকষ্ট হইতেছে। একেই অন্নাভাব, তাহার উপর জলকষ্ট। গরীব কৃষকগণ গ্রীষ্মকালে উপায়বিহীন হইয়া অগত্যা জল পান করিয়া নানাবিধ সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। আশা করি নদীয়া জেলাবোর্ডের ও কুষ্টিয়া লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মহোদয়গণ তদন্ত করিয়া গরীব পল্লীবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করতঃ তাহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।—বঙ্গবন্ধু

যশোহরের বহু পল্লী হইতে অসহনীয় জলকষ্টের ভয়ঙ্কর সংবাদ আমরা পাইতেছি। কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া গ্রামবাসীগণ আশঙ্কা ওলেরা ও অন্যান্য রোগে পোকা-মাকড়ের মত মরিতেছে। জেলাবোর্ড এবং যশোহরবাসী এই ভীষণ জলকষ্ট হইতে ধরিত্রী গ্রামবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য অবহিত হউন।—যশোহর।

দেশের অভাব মোচন করিতে হইলে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি করা দরকার। আয় বৃদ্ধির উপায় শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও প্রসার প্রথম। আপাততঃ আত্মরক্ষার জন্য বাঁকুড়ায় যেরূপ ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে সেইরূপ চেষ্টা প্রত্যেক জেলায় হওয়া উচিত। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম—

স্থানীয় জমিদার ও নায়ক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের চেষ্টায় গত দুই মাস যাবত "হুল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক" নামক একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া ভালরূপ চলিতেছে। ২৫৲ টাকা অংশের হাজার অংশে মোট ২৫ হাজার টাকা মূলধন। স্থানীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করা ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।—সুরাজ।

যারা চাকুরে ও মজুর তাদের বেতন ও মজুরীর হার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া ধনিকদের কর্ত্তব্য।—

এই ভীষণ দুর্ম্মূল্যতার দিনে চারিদিকেই বেতনবৃদ্ধির একটা গোরতর আন্দোলন দেখা যাইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহাদের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার কথা হইয়াছে তাহা সমস্তই সিভিলিয়ান বা "প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস" প্রভৃতির বড় বড় কর্ম্মচারী সম্বন্ধে। গভর্ণমেণ্ট অফিসের সামান্য বেতনের কর্ম্মচারীগণের, টেলিগ্রাফ পোষ্টাফিসের কেরানীদের, পিয়ন-কনেষ্টবলদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপার লইয়া ত কোন কথা কেউ বলিতেছেন না, অথচ ইহাদের সংখ্যা যেরূপ বহুল, ইহাদের কার্য্যও সেইরূপ অত্যাবশ্যকীয়। "বেঙ্গলী" "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি দেশের মুখপত্রগুলি "প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস" প্রভৃতির বেতনবৃদ্ধি লইয়া খুইয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন কিন্তু যেরূপ নীকুলের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কোন কথাও বলিতে দেখি না।

—বীরভূমবাসী।

পুলিশের বেতন বৃদ্ধি।—"বীরভূমবাসী" যেন হে নিম্নলিখিত পে পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের বেতন-বৃদ্ধি হইয়াছে:—

লেখাপড়া-জানা হেড্-কনষ্টেবল অতঃপর আসিষ্টাণ্ট সব্‌ইন্‌স্পেক্টর-রূপে গণ্য হইবে। তাহাদের বেতন মাসিক ২৩৲, ৩০৲ ও ৩৫৲ এই তিনটি গ্রেডে বিভক্ত হইবে।

সব্‌ইন্‌স্পেক্টরের যতগুলি পদ খালি হইবে তাহার শতকরা ৫০টি এই আসিষ্টাণ্ট সব্‌ইন্‌সপেক্টরগণ হইতে পূরণ করা হইবে।

হেড্-কনষ্টেবলদিগের বেতন ২০৲, ২৫৲, ৩০৲ টাকা হইবে।

টাইম্‌স্কেল মতে ডেপুটী সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্টের বেতন ২৫০৲ টাকা হইতে ৭০০৲ ও সুপারইন্‌টেনডেণ্টের বেতন ১৪০০৲ পর্য্যন্ত হইবে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ও সব্‌ইন্‌স্‌পেক্টরদিগের কিছুই হইল না কেন?

ইহার উত্তর—"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।"—বীরভূমবাসী।

প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি।—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দুর্দ্দশার কথা কাহারও অবিদিত নাই। যাঁহারা উচ্চ বেতনে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের বেতন ক্রমশঃই বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। অথচ এই নিরীহ গোবেচারী পরিশ্রমী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকগণের প্রাপ্য মান্ধাতার আমলে যাহা ছিল তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হইল না। যাহারা দিন-মজুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহারাও এইসব হতভাগ্য শিক্ষকদের অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন করে। শিক্ষকদের এই অবস্থার প্রতি দেশের লোক অনেক দিন হইল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ফল এতক হয় নাই। সম্প্রতি পাবনা জেলায় উল্লাপাড়া কেন্দ্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কানসোনা গ্রামে বাবু হরেন্দ্রনাথ ভৌমিকের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ অনেক দিন হইলই চলিতেছে—বর্ত্তমান লিপিবদ্ধ মন্তব্যের ফল কি হয় আমরা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

—সুরাজ।

অধিক বেতনের কর্ম্মচারীদেরই ভৃতি বাড়ে, তার কারণ তারা শোরগোল করিতে পারে বেশী, তাদের অসন্তোষের খবর তারা প্রভুর কানে সহজে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। যে নিজে চেষ্টা না করে, সে পায়ও না। "এইসব মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।" এর প্রধান উপায় দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। আমাদের দেশে শিক্ষা পাইবার ইচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পায় না। প্রত্যেক বৎসর কত ছেলে-মেয়ে স্কুলকলেজে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিয়াও জায়গা পায় না। এর উপর নূতন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সংস্কারে হয় ত বেসরকারী অনেক কলেজের তিরোধান ঘটিবে। তখন অবস্থা হইবে চমৎকার! দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং গভর্মেণ্টকেও বাধ্য করা উচিত।

বিদ্যালয়ের অভাব—"মেদিনীপুর জেলার অধীন গড়বেতা থানার অন্তর্গত পাথরভোড়্যা গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন উচ্চ, মধ্য বা প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় পার্শ্ববর্ত্তী ৮।১০ খানি গ্রামের ছাত্রগণের শিক্ষা-লাভের কোন উপায় না থাকায়, আমরা সচেষ্ট হইয়া শিক্ষোন্নতিকল্পে পাথরভোড়্যা গ্রামের নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়টিকে উচ্চ প্রাথমিকে পরিণত করিয়া স্কুলের আবশ্যকীয় আসবাবপত্রাদিসহ ২ জন শিক্ষকের দ্বারা (১ম শিক্ষক যাহার গ্রেড গুরুট্রেনীং পাশ বা ছাত্রবৃত্তি) ৩ বৎসর কাল স্কুলের কাজ চালাইয়া আসিতেছি। কিন্তু সরকারী কৃপাদৃষ্টির অভাব প্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত সাহায্য পাইতেছি না। আমাদের স্কুল-গৃহটি ছাত্রগণের অনুপাতে সংকীর্ণ হওয়ায় মাননীয় ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় নূতন গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ করেন। সেই আদেশানুসারে আমরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের স্কেল মত গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া বহু কষ্টে গ্রাম হইতে চাঁদা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিক্ষাদ্বারা প্রায় ২৫০ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া গৃহটির অর্দ্ধেক কার্য্য সমাধা করিয়াছি, কিন্তু এখনও অন্যূন ২০০৲ শত টাকার অভাব। উক্ত টাকা ব্যতীত গৃহটি সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই। এতদুদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্য জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের নিকট পুনঃ পুনঃ দরখাস্ত করায় তাঁহারা ফণ্ডে টাকার অভাব বলিয়া জানাইয়াছেন। এক্ষণে আমাদের এই কাতর ভিক্ষা-প্রার্থনা তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াও ফললাভে সমর্থ হইতেছি না। গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হইলে আমাদের সকল আশা উৎসাহ সহ এই দরিদ্র পল্লীবাসীদের শিক্ষা-স্কুলটি সমূলে বিনষ্ট হইবার জোগাড় হইয়াছে।

এক্ষণে যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কৃপাপরবশ হইয়া ইহার প্রতি-বিধানে (সাহায্য দানে) উদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত ও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। বিদ্যোৎসাহী জনগণের নিকট ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা।" আমরা আশা করি বোর্ড এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া দেশের ও দশের অভাব মোচন করিবেন।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

নোয়াখালী জেলায় কোন কলেজ না থাকায় শত শত শিক্ষার্থীকে বৎসর বৎসর কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, নোয়াখালীর ফেণী মহকুমায় একটি কলেজ স্থাপনের জন্য তত্রত্য অধিবাসীগণ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। —যশোহর।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—সম্প্রতি চাটমোহরে সারস্বত লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধঃপতিত জাতিসমূহের শিক্ষাকল্পে একটি অবৈতনিক বিদ্যা[illegible] স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যোক্তা স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত। আপাততঃ ৮টি মুচীর ছেলে লইয়া স্কুল হইতেছে। দুপুরে স্কুল বসে। জ্ঞানেন্দ্র-বাবু নিজে ইহাদের পুস্তকাদি কিনিয়া দিয়াছেন। আপাততঃ তিনি নিজে এবং নিজ অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কতিপয় বন্ধুদ্বারা শিক্ষাদানকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আরও ছাত্র সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

—সুরাজ।

শিক্ষা অবশ্যদেয় করিবার আইন অনেক দেশে ক্রমে ক্রমে পাস্ হইতেছে—

বাধ্যতামূলক শিক্ষা—বোম্বাই সহরের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আইন প্রণীত হইতেছে। এই আইন অনুসারে বোম্বাই মিউনিসিপালিটির এলাকা মধ্যে বালক ও বালিকা মাত্রেরই শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। মিউনি-সিপালিটি তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং সরকারও তাহার সাহায্য করিবেন।—কাশীপুর-নিবাসী।

মূলতানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আইন পাশ হইয়াছে। আগামী বৎসর এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে। আইনটি গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করিয়াছেন, ব্যয় কুলাইবেন্ মিউনিসিপালিটি। ঐ আইন সর্ব্বত্র পাশ হইলেই সুখের হয়।

—কল্যাণী।

বাংলাদেশেও এরূপ আইন পাস্ হইয়াছে। কিন্তু কৈ, কোনো মিউনিসিপালিটি যে এ বিষয়ে একটুও উদ্যোগের সাড়া দিতেছেন না?

শিক্ষা বিস্তারের জন্য গভর্মেণ্টের প্রচুর দান করা কর্ত্তব্য, দেশের ধনীদেরও কর্ত্তব্য। দানের সংবাদ আমরা প্রত্যেক

মাসেই পাই। কিন্তু বাঙালীর শিক্ষায় দান মোটের উপর অপর প্রদেশের লোকের তুলনায় অতি সামান্য। এ মাসেই তুলনা করিয়া দেখা যাক।—

বাংলার দান।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মেদিনীপুর কলেজ-ভবনের উন্নতি কল্পে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।—প্রতিকার। এডুকেশন-গেজেট।

শিক্ষার্থে দান—শ্রীপুর টাউন হলের জন্য টাকির স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয় এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।
২৪ পরগনা-বার্ত্তাবহ।

অন্য প্রদেশের দান।

শোলাপুরের রাজা, রায়পুর কলেজের হাতে ১০০০৲ টাকা মূল্যের একটি সম্পত্তি দান করিয়াছেন—উদ্দেশ্য সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান ছাত্রকে প্রতিবৎসর একটি হীরক-খচিত মেডেল পুরস্কার দেওয়া। উদ্দেশ্য সার্থক হৌক।—কল্যাণী।

দান।—শ্রীযুত মনোহর লাল ফৈজাবাদের হিন্দু হাই স্কুলের উন্নতি কল্পে ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। অতঃপর স্কুলটি মনোহর হাই স্কুল নামে অভিহিত হইবে।—এডুকেশন গেজেট।

বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ বণিক শ্রীযুক্ত দামোদর বিঠলদাস ঠাকরসী গুজরাটের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পনেরো লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের আর-একটি উপায় নির্ভীক সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ সংবাদপত্রের প্রচারবৃদ্ধি।

নবযুগ।—কলিকাতা হইতে "নবযুগ" নামে আর-একখানি নূতন বাংলা দৈনিক বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা এই নূতন সহযোগীকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

দৈনিক পত্রিকা—সংবাদ পাওয়া গেল যে, এনগর হইতে একখানি বাঙ্গলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে একটি লিমিটেড্ কোম্পানী গঠিত হইতেছে। এই কোম্পানীর মূলধন হইবে একলক্ষ টাকা। পূর্ব্ববঙ্গে একখানিও বাঙ্গালা দৈনিক নাই; সুতরাং প্রস্তাবিত পত্রিকা প্রকাশিত হইলে, এদেশের যথেষ্ট মঙ্গল হইবে বলিয়াই আশা করা যাইতে পারে।—ঢাকা প্রকাশক।

সংবাদপত্রের মুখ-চাপা আইন সত্ত্বেও সংবাদপত্রের কর্ম্মের ক্ষেত্র এখনো যথেষ্ট খোলা ও বিস্তৃত পড়িয়া আছে। প্রত্যেক সংবাদপত্র হইতে দেশের কিছু-না কিছু উপকার হইতেছে। জগতে কিছুই নিষ্ফল নয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

"জাতিভেদ সমস্যা।"

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসীতে" প্রকাশিত "জাতিভেদ সমস্যা" প্রবন্ধে পূজ্যপাদ ডাক্তার রায় বলিয়াছেন, "তাঁতি, জোলা, গাড়োয়ান এর ঘর থেকে এ দেশে ক-জন বড় লোক হবার সুযোগ পেয়েছে?' জাতিভেদ সম্বন্ধে তিনি হিন্দু-সমাজের কথাই বলিয়াছেন। মুসলমান-সমাজে জাতিভেদ নাই, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে "জোলা" এই কথাটির কেন যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "জোলা" বলিলে মুসলমান তন্তুবায় বুঝায়। গাড়োয়ানের ঘর থেকে "বড় লোক" বেরিয়েছে কি না তাহা আমি জ্ঞাত নহি। একথা সত্য যে সকল সমাজে ধনবান, বুদ্ধিমান ও প্রকৃত জ্ঞানীলোকের সংখ্যা অল্প। এমন কি যাঁহারা "বড়" জাত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন যথা—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যেও তন্তুবায় সমাজের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ৺গৌরীশঙ্কর দে, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺ক্ষেত্রমোহন দে ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত, ৺বামাচরণ ভদ্র, ৺বৈকুণ্ঠচরণ মল্লিক এবং আরও অনেক ব্যক্তির নাম করিতে পারি যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, দান ও পরোপকার ইত্যাদি গুণে অনেক তথাকথিত উচ্চ জাতির লোক অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নহেন বা ছিলেন না। ডাক্তার রায়ের প্রিয় ছাত্র ডাক্তার রসিকলাল দত্ত মহাশয় শুনিয়াছি তন্তুবায় সমাজের লোক। তিনি অত রসায়ন শাস্ত্রে "বড় লোক" হইয়াছেন। ডাক্তার রায় "বড় লোক" অর্থে কাহাদের মনে করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁতিদের ভিতর অনেক "বড় লোক" আছেন ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। আশা করি ডাক্তার রায় ভবিষ্যতে তাঁতিদের মধ্যে বড় লোক হইবার সুযোগ পায় নাই বলিয়া অসত্যের প্রচার করিবেন না। আর-এক কথা, গাড়োয়ান বলিয়া বাঙ্গালা দেশে কোন জাতি আছে বলিয়া ত মনে হয় না। সুতরাং গাড়োয়ানের উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। গাড়োয়ানী কাজ অনেক জাতে করিয়া থাকে; এমন কি আমি দুই-একজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদেরও গাড়োয়ানী করিতে দেখিয়াছি।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তিলি সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার রায়কে জিজ্ঞাসা করি মহারাজা বাহাদুর কি তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পাইতেছেন না? আমাদের সমাজে যাহারা জাতিভেদ মানে তাহারা কি মহারাজা বাহাদুরকে একঘরে মুখে না ঘসৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিয়া আসিতেছে? তাঁতি, তিলি, কামার, কুমার, সাহা, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ইত্যাদি জাতি যে লেখা-পড়ায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই তাহার কারণ কেবল মাত্র জাতিভেদ নহে। কারণ পূর্ব্ব কালে "Mass Education" ছিল না বা প্রয়োজনও হয় নাই। "Mass Education" ছিল না বলিয়াই "জাতিভেদ" আমাদের দেশে এইরূপ ভাবে স্থান দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা অপেক্ষিত লোকেদের অপেক্ষা অনেক কম।

ডাক্তার রায় আমেরিকার জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট উইলসনের New Freedom নামক পুস্তকের দোহাই দিয়াছেন। তার উত্তরে আমি লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে ডাক্তার রায় প্রেসিডেন্ট উইলসনের পুনরুক্তি করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য

নহে। আমেরিকাতেও খুব ভয়ানক-রকম জাতিভেদ আছে; তবে সাদায় সাদায় নহে, সাদায় ও কালোতে। আমেরিকার অধিবাসী "নিগ্রো" কি কখনও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদ ত দূরের কথা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিয়াছেন বা পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি? আমেরিকার কোন "নিগ্রোকে" সাদা মানুষের হোটেলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, নাপিতের দোকানে কামান হয় না, ইত্যাদি আরও অনেক-প্রকার নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। আমি জাতিভেদের পোষকও নহি এবং সমর্থকও নহি। বর্ত্তমান কালে জাতিভেদ কোনমতে থাকা উচিত নহে ইহা আমি মনে করি। কিন্তু তথাপি সত্যের খাতিরে পূজনীয় ডাক্তার রায়ের বাক্যের উপরও দুই একটি কথা লিখিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীসত্যচরণ পাল।

সম্পাদকের মন্তব্য।

পত্র-লেখক মহাশয় বলেন, যে, মুসলমান সমাজে জাতিভেদ নাই ইহা যখন স্বীকৃত, তখন জোলাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতির মত উল্লেখ করা ঠিক হয় নাই। মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমান সমাজে হিন্দুদের মত জাতিভেদ নাই, ইহা ঠিক্। কিন্তু হিন্দু-সংস্পর্শহেতু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কতকটা জাতিভেদের মত একটা জিনিষ আছে, ইহা নৃতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই জন্য জোলাহা (জোলা) দিগকে কতকটা স্বতন্ত্র জাতের মত উল্লেখ করা যাইতেও পারে। ১৯০১ সালের ভারতীয় সেন্সস্‌রিপোর্টে রিজ্‌লীসাহেব লিখিয়াছেন—

"In India, however, caste is in the air; its contagion has spread even to the Muhammadans; and we find its evolution proceeding on characteristically Hindu lines. In both communities foreign descent forms the highest claim to social distinction; in both promotion cometh from the west. As the twice born Aryan is to the mass of Hindus, so is the Muhammadan of alleged Arab, Persian, Afghan or Moghal origin to the rank and file of his co-religionists. And just as in the traditional Hindu system men of the higher groups could marry women of the lower while the converse process was vigorously condemned, so within the higher ranks of the Muhammadans a Saiad will marry a Shekh's daughter but will not give his daughter in return, and intermarriage between the upper circle of *soi-disant* foreigners and the main body of Indian Muhammadans is generally reprobated, except in parts of the country where the aristocratic element is small and must arrange its marriages as best it can. Even there, however, it is only under the stress of great poverty that a member of the *Ashráf* or 'noble' class will give his daughter to one of the *Ajláf* or 'low people' as converts of indigenous origin are called in Bengal. Of course the limits of the various groups are not defined as sharply as they are with the Hindus."—*Census of India*, 1901, Vol. I, p. 543.

গাড়োয়ানরা একটা স্বতন্ত্র জাত নহে এবং তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজপুত প্রভৃতি জাতের লোকও অল্পসংখ্যক আছে, সত্য; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারা 'নিম্ন' শ্রেণীর লোক। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জাতিভেদ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার মানস করেন নাই; সেইজন্য কখন বা জাতের (caste) উল্লেখ করিয়াছেন, কখন বা সামাজিক স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে পেশা, জীবিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে জাতও (functional castes) আছে। বর্ত্তমান কালে হিন্দুপ্রাধান্য থাকিলে, গাড়োয়ান বলিয়া একটা আলাদা জাত উৎপন্ন হইতে পারিত।

পত্রলেখক কয়েকজন বিদ্বান বা কৃতী তন্তুবায় বা অপর ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তির নাম করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের উপর বৌদ্ধপ্রভাব গিয়াছে, মুসলমানপ্রভাব গিয়াছে, বৈষ্ণবপ্রভাব গিয়াছে, ইংরেজরাজত্ব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব চলিতেছে। এহেন দেশের বর্ত্তমান যুগের মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণেতর কৃতী লোকের নাম করিয়া, জাতিভেদের কুপ্রভাব সত্ত্বেও মানুষ বড় হইতে পারে কিম্বা পারে না, তাহার বিচার চলে না। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকিলে জাতিভেদ দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব কতটা নষ্ট হইতে পারে, তাহার কতক প্রমাণ ও পরিচয় এখনও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে আছে;—যেখানে অনেক জায়গায় "অস্পৃশ্য" জাতির লোকেরা দূর হইতে ব'মুনকে অশুচি করিয়া দেয়, ছায়া দ্বারা অশুচি করিয়া দেয়, বামুনের পাড়ায় ঢুকিতে পায় না, বামুনের ব্যবহৃত রাস্তায় চলিতে পারে না, বামুনের পুকুর কুয়া ব্যবহার করিতে পারে না, বামুনের ছেলেরা যে ইস্কুলে পড়ে তথায় নিজেদের ছেলে পাঠাইতে পারে না, ইত্যাদি।

এমন কোন দেশ বা যুগ থাকিতে পারে না, যেখানে বা যখন mass educationএর, সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার, প্রয়োজন নাই বা ছিল না। সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা না-থাকাটা সব দেশেই উচ্চশ্রেণীর লোকদের জাত্যহঙ্কার, স্বার্থপরতা, বা অদূরদর্শিতার ফল।

পত্রলেখক মহাশয় সর্ব্বশেষে আমেরিকায় নিগ্রোদের দুরবস্থার কথা লিখিয়াছেন। তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইহা সত্য। কিন্তু সমুদয় পাশ্চাত্য দেশসকলের মধ্যে একমাত্র আমেরিকাতেই এই প্রকারের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ আছে; অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশসকলে যে-প্রকার স্তরভেদ বা শ্রেণীভেদ আছে, তাহা এবম্বিধ নহে। আমেরিকার নিন্দা করিবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে; তাহা হইলে বুঝা যাইবে, যে, আমেরিকার শ্বেতকৃষ্ণভেদ যেমন কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুদের জাতিভেদের মত, এবং কোন কোন বিষয়ে হিন্দুদের জাতিভেদ অপেক্ষাও খারাপ, তেমনই উহা কোন কোন প্রধান বিষয়ে হিন্দুদের জাতিভেদ অপেক্ষা কার্য্যতঃ কম অনিষ্টকর।

পত্রলেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন নিগ্রোর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে কি? আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের (U. S. A.) প্রেসিডেণ্ট হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে (Vol. XXVII, p. 655) আছে, "The Constitution requires the president to be a native-born citizen of the United States, not under thirty-five years of age, and for fourteen years resident in the United States"। এইরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট নিগ্রো সেদেশে অনেক আছে; অতএব বোধ হয় তদ্দেশজাত নিগ্রোর প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আইনে বাধা নাই; কালে নিগ্রো প্রেসিডেণ্ট হইতেও পারে।

হিন্দুর সামাজিক নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণেতর জাতির রান্না ব্রাহ্মণে খাইতে পারে না। কিন্তু নিগ্রোর রান্না শ্বেতকায়েরা খাইতে পারে ও খাইয়া থাকে।

লালা লজপৎ রায় বহু বৎসর আমেরিকায় ছিলেন। তিনি সে-দেশ সম্বন্ধে একটি বই লিখিয়াছেন। নিগ্রোদের নানা-প্রকার দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"America has its own untouchables [the Negroes], but their condition is in some respects even better

than that of the best educated and the most enlightened among the Indian castes." (*The United States of America*, pp. 449—50)। "Yet in spite of these complaints I am of opinion that, generally speaking, the Negro has better and larger facilities for education than the Indians have in their own country." (P. 101)।

দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৫২ জন লিখনপঠনক্ষম হইয়াছিল। ভারতবর্ষে শতকরা ৭।৮ জন লিখনপঠনক্ষম। আমেরিকার দক্ষিণস্থ রাষ্ট্রগুলিতে (in the Southern States) নিগ্রোদের অবস্থা উত্তরের নিগ্রোদের চেয়ে খারাপ। কিন্তু দক্ষিণেও ১৯১৬ সালে মোট নিগ্রো অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ২০ জন শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইতেছিল। ভারতে মোট অধিবাসী-সংখ্যায় শতকরা ৪ জনও শিক্ষালয়ে শিক্ষা পায় না।

আমরা বলিতেছি না, যে, শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুদের দুরবস্থার জন্য জাতিভেদ সম্পূর্ণ দায়ী; কিন্তু দোষ কতকটা যে জাতিভেদ প্রথার তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সূর্য্যগ্রহণ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে 'জাতিভেদ সমস্যা' নামক প্রবন্ধে একটু লেখনীর ভ্রম হইয়াছে। তাহাতে আছে "পৃথিবীর ছায়া-সম্পাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে।" "পৃথিবীর" এই কথাটার পরিবর্ত্তে "চন্দ্রের" এই কথা হইবে।

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময়।

শ্রীঅমৃতলাল শীল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মহাপ্রভুর তিরোভাব সময় সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে আমার সামান্য জানাশুনা যাহা আছে তাহা প্রেরণ করিলাম।

মহাপ্রভুর সময় সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিই বৈষ্ণব সমাজে প্রমাণ।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান।
(আদিলীলা—১৩ পরিচ্ছেদ।)

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল শেষখণ্ডে লিখিত আছে যে মহাপ্রভু আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হন।

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ (শেষখণ্ড।)

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেও আষাঢ় শুক্লাসপ্তমী মহাপ্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া উল্লিখিত। লোচনদাস ভক্তগণের শোকোচ্ছ্বাস বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজ শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে॥ (শেষখণ্ড)

কোন চৈতন্য-মঙ্গল-কর্ত্তাই তিরোভাব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শকের উল্লেখ করেন নাই। মহাপ্রভুর স্থিতিকাল কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতে কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুই লেখকের মিল নাই। কবিকর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিতে ২০ সর্গে ৪০-৪১ শ্লোকে লিখিয়াছেন মহাপ্রভু চতুর্বিংশে নবদ্বীপতলে সন্ন্যাস করেন, পরে ক্ষেত্র হইতে তিনবৎসর এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করেন এবং তথায় বিংশ বর্ষ যাপন করেন।

ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্ততাত্মা
শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ।
নানালীলা লাস্যমাসাদ্য ভূমৌ
ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোঽসৌ জগাম। (২০ সর্গ ৪১ শ্লোক।)

অর্থাৎ মহাপ্রভু ৪৭ বর্ষ লীলা করিয়া স্বধাম গমন করেন। কবিকর্ণপুর গোস্বামীর হিসাবে ১৪৫৪ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়। যদি ১৪৫৪ই তাঁহার তিরোভাবের শক হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নিয়োগে প্রতাপরুদ্রের শোকোচ্ছ্বাস সম্ভব। রাজোপাধ্যায়ের মতে প্রতাপরুদ্র ১৪২৬ শক হইতে ১৪৫৪ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ১৪৫৪ শকে গতাসু হন। একবৎসরেই মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রাজার পরলোক গমন অসম্ভব নয়। তবে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হরিসাধন মহাশয় কোন্ প্রমাণ-বলে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে মহাপ্রভুর তিরোভাব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। সম্ভবতঃ তিনি, মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াই তিরোহিত হন, এই মত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

শ্রীভূষণচন্দ্র দাস, শান্তিপুর।

গাছের আলো।

আমার লিখিত "পচা গাছপালার আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতা"র কারণ অনুসন্ধানের উত্তরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গেল বৈশাখের "প্রবাসী"তে আরও অনেকগুলি নতুন খবর দিয়েছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত রাসায়নিক তথ্যটা যে তিমিরে সে তিমিরেই' রয়ে গেছে। Encyclopoediaতে Phosphorescent Plant সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, কিন্তু নাই কেবল—Fungi জাতের গাছ কি খেয়ে অমন সুন্দর আলো দিতে পারে—সে সূক্ষ্ম রাসায়নিক তথ্যটা। সুরেনবাবু যে কয়জনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, তাঁরা, আলো-দেওয়া Fungus পচাগাছে জন্মায়, এ পর্য্যন্তই আলোর কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু Fungusও ত বৃক্ষদেহীভুক্ত? ওরা কেন এমন সুন্দর আলো বিকিরণ করতে পারে, অন্য গাছেরা কেন পারে না, সেটার কারণ নির্দ্দেশ করেননি। Fungusগুলা কি কি জিনিষ ওসব পচা কাঠের শরীর থেকে সংগ্রহ করে নিচে থাকে আর অমন সুন্দর রকমকে আলো দিতে পারে? সে জিনিষগুলোর খবর পেলেই ত আলোজগতের দু'একটা সম্পদ বাড়তে পারে হয়ত। আর ওরা যখন সেই উপাদানগুলো অন্য কোথাও না পেয়ে খালি পচা গাছপালার মধ্যেই পায়, তখন ত বোঝা যায় হয় পচা জিনিষগুলার মধ্যেই আলোর উপাদান উৎপন্ন হয় অথবা তারা অন্য কোথাও বা সংগ্রহ করে। আর এ-প্রকারের আলো যদি গাছের নিজেরই হয়ে থাকে (Fungusই হউক আর যা-ই হউক, গাছ ত বটে, তবে অন্য গাছে, লুথার বার্ব্বাঙ্কের প্রণালী অনুসরণ করে এ জিনিষটা পরিচালিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। বিশেষতঃ যখন Fungusএর চেয়ে আরও উচ্চশ্রেণীর আলো-দেওয়া গাছের কথা শুনেছি। গেছে মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে এসম্বন্ধে আমি বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দু-একটি গাছের কথা পাঠকবর্গকে জানিয়েছিলাম। তার কাগের মাসের "প্রবাসী"তে দক্ষিণ-আমেরিকার আলো-দেওয়া গাছ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। আমাদের পুরাণাদিতে মৃতসঞ্জীবনী লতা ও বিশল্যকরণী প্রভৃতি গাছগাছড়ার আলোবিকিরণ করবার ক্ষমতার উল্লেখ আছে।

এখন একটা কথা হচ্ছে এই যে, Phosphorescence বলতে অনেকেই কেঁচোর আলো, জোনাকীর আলো, পিঁড়ির আলো, পুতের

আলো ও গাছের আলো প্রভৃতি সব-রকমের আলোকেই একজোটায় ফেল্‌তে চান্—প্রকৃত প্রস্তাবে এসকল আলোর মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না? যদি থাকে—সেটা কি?

সুরেনবাবু যে কয়টি আলোর বিষয় লিখেছেন, সকলগুলিই যেন নিরপেক্ষ ভাবে আলো দিতে পারে বলে' বোধ হয়। কিন্তু আমি যতগুলি আলো দেখেছি—কেবল বেঙের ছাতার আলো ছাড়া আর সবগুলিই আপ্‌না-আপনি জ্বল্‌তে পারে না; তাদের গায়ে জল ঢেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আলো বিকিরণ করতে থাকে। এখন আবার অনুসন্ধানে দেখ্‌তে পাওয়া গেল যে, জল দিলেই সব আলো দৃষ্টিগোচর হয় না;—জল দেওয়ার খানিক পরে জঙ্গলগুলোকে বা পাতা-লতাগুলিকে খুব ঘাঁটাঘাঁটি না কর্‌লে সব গাছের আলো দেখা যায় না, খুব ক্ষীণ আলোর রেখা দু-একটির দেখা যায় মাত্র। খুব ঘাঁট্‌লেই একেবারে সমস্ত স্থান উজ্জ্বল আলোতে পরিণত হয়। কাটগুলি বা পাতাগুলি একদম পচা, নয় মরিয়া দিনকয়েক পর শুকাইলে যে অবস্থা হয় অধিকাংশ পাতাগুলি সেরকমের হওয়া চাই। আবার কতগুলি জ্যান্ত ঘাসের পুরাণো ডাঁটাগুলিও খুব সুন্দর আলো দেয়—ওই-রকমের কতগুলি জ্যান্ত ঘাস আমি ডাক্তার পি সি রায়কে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম। একটা গাছের খুব লম্বা একটি লাঠির মত মরা শিকড় মাটির নীচে পাই, সেটার এত আলো, যে, বাতির কাছে নিলেও একটা ফিকে বা হাল্‌কা উজ্জ্বল সবুজ রঙের আলো দিচ্ছিল। সেটার বাইরে যেমি উজ্জ্বল আলো, ভিতর ভেঙ্গে দেখি, ভিতরেও সর্ব্বত্র তেম্নি দিব্যি আলো। আমি কতগুলো শুক্‌নো পাতা ও কাটা ওইসব জঙ্গলের ভেতর কয়েকদিন ফেলে রেখেছিলাম, সবগুলো আলো দেওয়ার ক্ষমতা পায়নি, কতগুলি সুন্দর আলো দিয়েছিল। একটা আলোদেওয়া আমপাতাকে একদিন রোদে শুকিয়ে আবার সেই মাটির উপর দিন দশেক ফেলে রাখার পর (অবশ্য জল দিতে হয়েছিল রোজ) এনে দেখি, এবার পূর্ব্বের চেয়ে ১০ গুণ বেশী জোরালো হয়ে গেছে, প্রায় ৩ হাত জলের নীচে থেকেও দেখা যায়। কিন্তু ঘরে চীনাবাসনে রেখে বেটায় জল দিয়েছিলাম ক্রমে ক্রমে সেটার আলো ৫।৭ দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। অনুসন্ধানে এ জাতীয় আলোর আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যেতে পারে, যদি কেউ কষ্ট স্বীকার করে চেষ্টা করেন।

উত্তাপবিহীন আরও কতরকমের আলো যে দুনিয়াতে আছে, তার বোধহয় ইয়ত্তা নেই, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিটা এখনও ততদূর পৌঁছায়নি, যাতে তারা উত্তাপ ও আলোকের সম্বন্ধটা বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন
টালা (কলিকাতা)
২৭, কালীকুমার ব্যানার্জির লেন।

আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে জাতিভেদ সমস্যা নামক প্রবন্ধের একস্থানে লেখক ক্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য জাতির সহিত গৌরবর্ণ আর্য্য জাতির বৈবাহিক আদান প্রদান নিষিদ্ধ ছিল।

মহাভারতের অন্যতম নায়ক ভীম রাক্ষস-দুহিতা হিড়িম্বার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নাগরাজের বিধবা কন্যা উলুপীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে জাত সন্তান ইরবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। রামায়ণেও পুলস্ত্য-তনয় ঋষিবর বিশ্রবার সহিত রাক্ষস-দুহিতা কৈকেসীর বিবাহের উল্লেখ আছে। কৈকেসী কৃত্তিবাসের গ্রন্থে নিকষা নামে পরিচিতা; ইঁহারই গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণাদির জন্ম হয়। নৃপবর শান্তনু দাশরাজের পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ-প্রস্তাবে দাশরাজ আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন নাই; পরন্তু এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্য পাইবে, এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া তবে কন্যাদান করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অনার্য্য জাতির মধ্যেও শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা আর্য্যদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করিতেন না।

লেখক অন্যত্র লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে মণিপুর ত্রিপুরা প্রভৃতির অনার্য্য রাজবংশ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতে চান। এইরূপ চেষ্টার সফলতা যে প্রাচীন কালে ঘটিত না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ঋগ্‌বেদে অনার্য্য জাতি মধ্যে যযাতি, পুরু, তুর্ব্বসু, যদু প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের বংশীয়েরা মহাভারতে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, এবং তাঁহাদের কার্য্য-কলাপই মহাভারতের বর্ণনার বিষয়। বলা বাহুল্য যে যদুর বংশে কৃষ্ণের এবং পুরুর বংশে কুরুপাণ্ডবগণের উৎপত্তি। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে ঋগ্‌বেদে অনার্য্য জাতি মধ্যে কৃষ্ণ নামে বীরপুরুষের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই কৃষ্ণই কালক্রমে মহাভারতের নায়করূপে বর্ণিত এবং আরো পরে অবতার রূপে পূজিত হইয়াছেন।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা।

প্রসিদ্ধ কোষকার সুবলচন্দ্র মিত্রের "সরল বাঙ্গালা অভিধান" ও ঢাকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত, কবিরত্ন এম-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সম্বর্ত্তচন্দ্রিকার" বিবৃতি, এতদুভয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, মহাশয়ের জন্মস্থান বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

সুবল-বাবু লিখিয়াছেন—"দীনেশচন্দ্র সেন—১৭৮৮ শকে কার্ত্তিক মাসে ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জের অধীন কাজুরী গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়।"

অক্ষয়-বাবুর অভিমত—"দীনেশচন্দ্র সেন। জন্ম—১২৭৩ সাল (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ)। নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রাম।"

কাহার কথা সত্য?

শ্রীরাধাচরণ দাস, পাবনা।

ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অনেকাংশের স্ত্রীলোকগণই বৈশাখ মাসের ১লা তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত মাসের সংক্রান্তি দিন পর্য্যন্ত রাত্রের আহার সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, চলিত ভাষায় ইহাকে "বেইল-ভাতা" কহে। ইহার উদ্দেশ্য কি? কোন্ সময়ে কাহা দ্বারা ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল?

শ্রীশিশিরকুমার রাহা।

১। উদুখল ও ঢেঁকিতেই আমাদের দেশে গৃহস্থ-ঘরে ধান ভানা হয়। এমন কোন হাত-কল আছে কি যাহার দ্বারা ঐ কাজ আরও সহজে হইতে পারে? যদি থাকে তবে কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত?

২। কি উপায়ে কাবের খোসা ছাড়ান যায়, অথচ মধ্যের অংশ আস্ত থাকে? এই কাজের জন্য কোন হাতকল পাওয়া যায় কি না? যদি থাকে তবে কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত?

৩। চাউল ও ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যহানি হয় না এমন আর কোন জিনিষ আমাদের দেশে জন্মায় কি না? যদি থাকে তবে তাহার নাম কি?

শ্রীগৃহস্থ।

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা থাকিলে তাহার বা তাহাদের নাম করুন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বেরা।

১। কি কি বাংলা বই ফরাসীতে অনূদিত হইয়াছে?

২। কি কি ফরাসী বই বাংলায় অনূদিত হইয়াছে?

৩। ফরাসী শিক্ষা করিবার কোনও বাংলা বই আছে কি না?

৪। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ বই ও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ কোন্ উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে?

৫। শেক্‌স্‌পিয়ারের কোন্ কোন্ বই বাংলায় অনূদিত হইয়াছে?

৬। রাজনীতি সম্বন্ধে লেখা কয়খানি বই বাংলায় আছে?

অন্নদাশঙ্কর রায়।
(চেঙ্গনাল)

১। কার্ত্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হয় কেন? ইহার কোন পৌরাণিকত্ব আছে কি না? বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি?

২। দশহরার দিন গৃহের চতুর্দ্দিকে গোময় বেষ্টন দেওয়া হয় কেন?

এককড়ি দে।

দুর্গেশনন্দিনী।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায় প্রণীত "পার্ব্বত্য-কাহিনী" নামক সাঁওতাল-পরগণার ইতিবৃত্তে লিখিত আছে (৭১ পৃঃ),—

"তপ্পা মণিহারীতে একটী প্রবাদ আছে যে, মানসিংহ দিল্লীর সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিপ্লব জন্য আগমন করিয়া তপ্পা মণিহারীতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গস্থানই মানগড় নামে প্রসিদ্ধ। * * রাজা মানের পুত্র জগৎ সিংহ ঐ সময় বীরেন্দ্র সিংহ নামক এক দুর্গাধিপতির কন্যার পিতার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমলাকিতা বীরেন্দ্র সিংহের বাসস্থান বলিয়া কথিত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গড় বিমলী-গড় নামে পরিচিত। বীরেন্দ্র সিংহের পরিণীতা ভার্য্যার নাম বিমলা ছিল। সুতরাং তাঁহার নামানুসারে গড়টীর নামকরণ হওয়া অসম্ভব নহে। মানগড় হইতে বিমলাকিতা বিমলী-গড় প্রায় ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। শিবমন্দিরে যুবরাজ জগৎ সিংহের সহিত বিমলা ও দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। বিমলীগড়-বিমলাকিতার অনতিদূরে (½ মাইল) মৌজা মার্পায় একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।"

এই-সকল স্থান রাজমহলের অনতিদূরবর্ত্তী। মানসিংহ রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাটের আহ্বানে তিনি যখন দক্ষিণাপথে যান, তখন তিনি জগৎ সিংহকে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন। (৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "বাঙ্গালার ইতিহাস," পৃঃ ৩৫)

আমরা মানগড়াদি দেখিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, স্থিম-বাবু বর্ণিত জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-বৃত্তান্ত কি ঐতিহাসিক সত্য? যদি সত্য হয়, তবে ইহার ঘটনাস্থল গড়মান্দারণ, কি বিমলীগড়-মান্দারণ-কিতাদি? কোন্‌টির প্রামাণ্য বেশী?

শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার।

মীমাংসা

আমার পৈত্রিক বাড়ী ঢাকা জেলায় সুয়াপুর গ্রাম, কিন্তু জন্ম হয়েছিল ঐ জেলায় আমার মামাবাড়ী, বশজুরী গ্রামে। "বগজুরী" শব্দটির "ব"এর সঙ্গে "গ"এর ঠোঁটটি জুড়ে দিয়ে এবং "গ"এর পেটের টানটি আকারে পরিণত হয়ে পাঠকের প্রমাদসূত্রে "কাজুরী" এরূপ শব্দ নির্ম্মিত হয়েছে।

তারিখগুলির মধ্যে যে কোন্ গোল আছে এমন বোধ হয় না, একটি শকাব্দা, একটি বাঙ্গলা সন এবং আর একটি খ্রীষ্টাব্দ। এ তিনেই বোধ হয় এক মানে বুঝুচ্ছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় "এনোফেলিস" মশক সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করিয়াছেন।

"এনোফেলিস" মশক মনুষ্যের ন্যায় পশ্বাদিকেও দংশন করে এবং উহাদের শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। কিন্তু উহাদের বিষ মনুষ্য-শরীরে যেমন কাজ করিতে পারে, পশ্বাদির শরীরে তেমন কাজ করিতে পারে না। আমাদের দেশে খুব ম্যালেরিয়াও আছে এবং "এনোফেলিস" মশকেরও অভাব নাই। এই মশক আমাদিগকে যেমন দংশন করে, গবাদি পশুকেও সেইরূপ দংশন করিতে দেখা গিয়াছে। ইহারা পশুদিগকে এমন ভাবে কামড়ায় যে, উহাদের শরীর ফুলিয়া উঠে ও রক্ত বাহির হয়। যখন রক্ত বাহির হয় তখন নিশ্চয়ই রোগের বীজটা পশুদিগের শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু উহাদের কখন ম্যালেরিয়াও হয় না এবং তজ্জন্য আমাদিগকে কোন ঔষধেরও ব্যবস্থা করিতে হয় না।

শ্রীএককড়ি কুণ্ডু।

গত মাসে প্রবাসীতে যে জীবনচরিতগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে আরও কতকগুলির নাম করা যাইতে পারে। যথা:—

১। অমিয় নিমাই-চরিত—শিশিরকুমার ঘোষ।

২। বিবেকানন্দ-চরিত—প্রমথনাথ বসু।

৩। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী—বঙ্কুবিহারী কর।

৪। বুদ্ধদেব—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৫। গেরিবল্‌ডীর জীবনচরিত—৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

৬। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যে নিম্নের গুলিরও নাম করা যাইতে পারে।

১। জাপান—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। দার্জ্জিলিং—প্রভাতচন্দ্র ঘোষ।

৩। দেবগণের মর্ত্তে আগমন—দুর্গাচরণ রায়।

৪। নেপালে বঙ্গনারী—হেমলতা দেবী।

৫। পরিব্রাজক—বিবেকানন্দ স্বামী।

শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ী।
তেমাথা, রংপুর

আকাশ-প্রদীপ।

কার্ত্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দিবার ব্যবস্থা পৌরাণিক—

তুলায়াং তিলতৈলেন সায়ংসন্ধ্যাসমাগমে
আকাশপ্রদীপং যো দদ্যাৎ মাসমেকং নিরন্তরম্
সশ্রীকায় শ্রীপতয়ে, স শ্রীমান্ ভুবি জায়তে।
ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে—
ইতি মন্ত্রেণ যো দদ্যাৎ প্রদীপং সর্পিরাদিনা
আকাশে মণ্ডলে বাপি স চাক্ষয়ফলং লভেৎ॥
বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকম্
অগ্নিষ্টোম-সহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও বলা হইয়াছে কার্ত্তিকমাসে দীপদানে বহুপুণ্য লাভ হয়।

বামনপুরাণে দেখা যায় বলি রাজা প্রথম বিষ্ণু-আয়তনে কার্ত্তিক মাসে দীপদান করার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

লিঙ্গপুরাণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে কার্ত্তিক মাসে দীপদান করিলে নরক নিবৃত্ত হয়—নরকার প্রদাতব্যো দীপঃ সংপূজ্য দেবতাঃ। কলিকা-পুরাণে দীপদান-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে "চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপঃ" বলা হইয়াছে। উচ্চস্থানে দীপদান সুপ্রশস্ত, কারণ বসুমতী সর্ব্বংসহা হইলেও দুটি দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না—অনার্য্য-পাদঘাতঞ্চ দীপতাপঃ তথৈব চ। সুতরাং স্বচ্ছন্দে বৃক্ষকোটৌ তু দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় দীপদান কর্ত্তব্য।

অগ্নিপুরাণে কার্ত্তিক মাসে দীপদানের পুণ্যমালা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

বাহুল্যভয়ে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিলাম না।

কার্ত্তিক মাসে দীপদানের সঙ্গে জৈন ইতিহাস একটু জড়িত আছে। জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান-মহাবীর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় নির্ব্বাণ লাভ করেন; তাঁর ভক্তরা সেইদিন আলোকমালায় নগর সজ্জিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীলের লেখা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এর বৈজ্ঞানিক কারণ বোধ হয়, কার্ত্তিক মাসে ছাতা-পোকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের অত্যন্ত উপদ্রব হয়; ঘর হইতে দূরে তাদের আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার জন্য উচ্চে দীপ দান করা হয়।

দশহরায় গোবর।

দশহরায়—

দশপ্রস্থান্ তিলান্ দদ্যাৎ দশবিপ্রেভ্য এব চ।
দশপ্রস্থান্ যবান্ দদ্যাৎ দশসংখ্য-গবীস্তথা॥

স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড; ভবিষ্যপুরাণ, উত্তরখণ্ড।

দশটি গোরু দানের বদলে এখন গোবর দিয়া অনুকল্পে কাজ সারা হয়।

দশহরায় নাগবংশের জন্ম; নাগদের কোপ শান্তির জন্য এইদিন মনসা পূজা করিতে হয়। গোবরের বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া সাপ আসিতে পারে না বলিয়া লোকের বিশ্বাস; সাপ দূরে রাখিবার জন্য বাড়ীর চারিদিকে গোবরের বেড় দেওয়া হয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশী মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে জানিতে চাহিয়াছিলাম যে পাঠকদের মতে বাংলার দেশী মন্ত্রী হইবার যোগ্যতম তিন-জন কাঁহারা, এবং বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি কে। উত্তরে বেশী চিঠি আসে নাই, মাত্র ১১০ জনের ভোট আমরা ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যাহা আমাদের হাতে আসিয়াছে, তদনুসারে যাঁহাদের নাম যত অধিক লোকে করিয়াছেন, ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া গেল।

এ বিষয়ে আমাদের কোন মত প্রকাশ করিব না। দেখা যাইতেছে, যে, অনেক উত্তর-দাতা এরূপ বহু ব্যক্তির নাম করিয়াছেন, যাঁহারা দেশী মন্ত্রী হইবার, কিম্বা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অপর কাহারো প্রতিনিধি হইবার, ইচ্ছা সম্ভবতঃ কখনো স্বপ্নেও করেন নাই। সেই জন্য তালিকা দুটি কৌতুকাবহ।

দেশী মন্ত্রী হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

১। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।
৩। „ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।
৪। „ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
৫। মৌলবী এ কে ফজলল হক্।
৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। সার্ আশুতোষ চৌধুরী।
৮। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত।
৮। „ বিপিনচন্দ্র পাল।
৮। „ ভূপেন্দ্রনাথ বসু।
১১। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।
১১। সার্ রাসবিহারী ঘোষ।
১৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩। „ অরবিন্দ ঘোষ।
১৩। সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
১৩। মহারাজাধিরাজ সার্ বিজয়চন্দ্ মহতাব বাহাদুর।
১৩। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ।
১৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়।
১৯। রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার।
ডাক্তার আবদুল্লা আল্‌মামুন্ সুহ্রাবর্দ্দি।
সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।
২০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
সার্ নীলরতন সরকার।
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।
„ কিরণচন্দ্র দে, আই সি এস্।
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র।
সার্ জগদীশচন্দ্র বসু।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই সি এস্।
২১। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার এ্যাট্ ল।
„ প্রমথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার এ্যাট্ ল।
সার্ বিনোদচন্দ্র মিত্র।
মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ব্যারিষ্টার এ্যাট ল।
সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতম প্রতিনিধি।

১। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। *
২। সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়। *
৩। সার্ আশুতোষ চৌধুরী।
৪। সার্ নীলরতন সরকার।
৫। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।
৬। „ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সার্ জগদীশচন্দ্র বসু।
সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
৭। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি আর্ এস্।
মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
ডাক্তার সতীশচন্দ্র নাগচী।

* সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মধ্যে কেবলমাত্র এক ভোটের প্রভেদ হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় পরাধীনতার কারণ।

জাপানীরা কোথায়-কোথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেখানে তাহারা কি করিতেছে, ও কি করা কর্ত্তব্য, এই-সব বিষয়ে একজন জাপানী জাপান-ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি কোরিয়া সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"This country prides itself on being one of the oldest nations of the earth. Oriental pride in mere age is shared by our people too: but I am afraid that in the Occident old age is identified with senility, decrepitude, and dotage. However that may be, Korea was once a powerful and advanced nation, from whom Japan learned most of her ancient arts and crafts."

তাৎপর্য্য—পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের অন্যতম বলিয়া এই দেশ অহঙ্কার করে। কেবলমাত্র বয়সে প্রাচ্যজাতিরা যে গৌরব অনুভব করে, তাহা জাপানীদেরও আছে; কিন্তু, সম্ভবতঃ, পাশ্চাত্য দেশ সকলে লোকে প্রাচীনতাকে জরা, জীর্ণাবস্থা ও মস্তিষ্কবিকৃতি বা বুদ্ধিবৈকল্যের সমার্থদ্যোতক মনে করে। সে যাহা হউক, কোরিয়া এক সময়ে শক্তিশালী ও অগ্রসর জাতি ছিল, এবং তাহার নিকট হইতে জাপান তাহার অধিকাংশ প্রাচীন শিল্প ও কলা শিখিয়াছিল।

কোরিয়া সম্বন্ধে জাপানী লেখক যাহা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। প্রাচীনত্বের অহঙ্কার আমাদেরও আছে; আমাদের দেশও এক সময়ে শক্তিশালী ও অগ্রসর ছিল; আমাদের দেশ হইতেও প্রাচীন কালে অনেক জাতি নানা বিদ্যা শিখিয়াছিল। কিন্তু কোরিয়ার মত আমরা সেকালের অহঙ্কার লইয়া থাকায়, কোরিয়ার মত আমাদেরও অধঃপতন হইয়াছে, যদিও ইহাই আমাদের অধোগতির একমাত্র কারণ নহে। জাপান সময়ে নিজের প্রাচীনত্ব ভুলে নাই, প্রাচীনের ভাস যাহা কিছু তাহা রাখিতেছে ও তাহাতে গৌরববোধ করিতেছে, তেমনি তরুণ থাকিবার জন্য অনিষ্টকর প্রাচীন প্রথা আদি ত্যাগ করিয়া মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতেছে, ইষ্টকর নূতনকেও লইতেছে। ইহা তাহার নবীনতার লক্ষণ ও কারণ। অনিষ্টকর নূতনও জাপান লইয়াছে ও লইতেছে, কিন্তু তাহা পরিহার ও বর্জ্জন করিবার শক্তি তাহার আছে।

কোরিয়ানদের সম্বন্ধে জাপানী লেখক আরও বলিয়াছেন

—"Indolence was the badge of honour. The first lesson to instil into him is to work." "আলস্যই তাহাদের সম্মানের চিহ্ন ছিল। সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে, তাহা শ্রম।" আমাদের সম্বন্ধেও কি ইহা ঠিক্ নয়? আমাদের দেশে "বাবু" সম্মানসূচক আখ্যা। এবং কেহ অলস হইয়া গিয়াছে বলিতে গেলেও আমরা বলি, "অমুক বড় বাবু হইয়া গিয়াছে।" আমাদের সুখের চূড়ান্ত আদর্শ "পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাওয়া।" বস্তুতঃ, আমাদের দেশে, কাহার কতগুলা চাকর আছে, অর্থাৎ কে নিজে কত অকর্ম্মণ্য ও নিজের দৈহিক প্রয়োজন সাধনেও অক্ষম, তাহাই তাহার পদমর্য্যাদা বা সামাজিক সম্মানের পরিচায়ক। সেই জন্য ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, শ্রমের মন্ত্রে আমাদের সকলকে দীক্ষিত হইতে হইবে,—দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমের। ইংরেজীতে প্রতিভার একটি সংজ্ঞায় তাহাতে পরিশ্রম করিবার অসীম ক্ষমতা বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক যে কয়জন লোকের নামে ভারতবর্ষ বিদেশে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই খুব পরিশ্রমী। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর বিদেশে যাইবার আগেই অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিক্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তৎপরে ফ্রান্সের পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, তখন যশোরে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি সভা হয়। তাহাতে এই কৃতী যুবক বলেন, "আমার মানসিক শক্তি সাধারণ রকমের; আমার মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। আমি সামান্য যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি, তাহা অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এবং দৃঢ়তার সহিত কাজে লাগিয়া থাকিয়া।"

পরাধীনতা নানাবিধ।

আমাদের দেশে বিদেশীরা রাজত্ব করিতেছে, ইহাই আমাদের একমাত্র রকমের পরাধীনতা নহে। বিদ্যার নানা শাখায়, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, আমরা পরমুখাপেক্ষী। নানাপ্রকার কলের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। কলকারখানায় প্রস্তুত আমাদের দরকারী অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আসে; দেশে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহারও বেশীর ভাগ বিদেশীদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। দেশের বহির্বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে; তাহারা আমদানী ও রপ্তানী উভয় কার্য্য করে; জাহাজ তাহাদের। বাংলাদেশের কলকারখানায়, রেলের, জাহাজ-ঘাটের শ্রমজীবী অধিকাংশ অ-বাঙালী; এমন কি অনেক জেলার ধানকাটার কাজ বাংলাদেশের বাহির হইতে কুলি আনাইয়া করাইতে হয়। বড় বড় ব্যবসা মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীর মুসলমান, প্রভৃতিদের হাতে। ছোট দোকান পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় নগরে বহুপরিমাণে অবাঙালীর হাতে গিয়াছে। নূতন ভারতশাসন আইন অনুসারে যতগুলি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইবে, তাহাতে একমাত্র বাংলাদেশের সভায় ১৮ জন বেসরকারী ইউরোপীয় সভ্য হইবে। এত বেশী বেসরকারী ইউরোপীয় সভ্য আর কোন প্রদেশে হইবে না। ইহার মানে এই, যে, বাংলাদেশে ইউরোপীয় বণিক ও কলকারখানার মালিকদের সংখ্যা ও প্রভাব যত বেশী, অন্য কোন প্রদেশে তত নহে। ইহা বাঙালীর লজ্জার বিষয়। তাহার পর, একমাত্র বাংলা দেশেই অ-বাঙালী ভারতীয় বণিকেরা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছে। আমরা মাড়োয়ারী বণিক্-সভার কথা বলিতেছি। ইহার মানে এই, যে, উদ্যোগী ও বাণিজ্য-পটু মাড়োয়ারীরা ভারতের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিলেও, বাঙালীর অকর্ম্মণ্যতাহেতু একমাত্র বাংলাদেশেই তাহাদের বাণিজ্যের প্রসার এতবেশী হইয়াছে, যে, কেবল এখানেই তাহারা আলাদা প্রতিনিধি পাইয়াছে। ইহা বাঙালীর লজ্জার বিষয়।

বিদ্যার নানাশাখায় খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয় স্বাধীন চিন্তা গবেষণা আবিক্রিয়া উদ্ভাবন করিতেছেন বটে; কিন্তু আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ক যত বহি পড়ি তাহার অধিকাংশ বিদেশী ভাষায় বিদেশীদের দ্বারা লিখিত। উন্নততম দেশের লোকেরাও বিদেশী ভাষায় বিদেশীর লেখা বহি পড়েন, এবং তাহা পড়া খুব দরকার। কিন্তু সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য পরের মুখাপেক্ষী জাতি সভ্য জগতে একমাত্র আমরাই। পাশ্চাত্য এক-একখানা বৈজ্ঞানিক ঐতি-

হাসিক দার্শনিক কাগজ খুলিলেই দেখা যায়, প্রতিসংখ্যায় কত নূতন চিন্তা, নূতন আবিক্রিয়া, নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের কথা রহিয়াছে। আর আমাদের সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করিয়াছেন, এরূপ লোকদের নাম শুনিতে গেলে একটা হাতের পাঁচটা আঙুলও যথেষ্ট অপেক্ষা বেশী হয়।

আমরা কোম্পানী গড়িয়া যত কারখানা করিতেছি তাহার কল আসে বিদেশ হইতে। যন্ত্র বা কল এদেশে একটিও প্রস্তুত হয় না, বলিতেছি না। কিন্তু প্রধান প্রধান অধিকাংশ যন্ত্র বা কল বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

পেটেণ্ট আফিসের হিসাব।

কেহ কোন নূতন যন্ত্র বা কল বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করিলে যাহাতে অপরে বিনা আয়াসে তাহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে না পারে, তাহার জন্য পেটেণ্ট আইন ও পেটেণ্ট আফিস আছে। এই আইন অনুসারে পেটেণ্ট আফিসে নূতন যন্ত্র বা প্রক্রিয়া রেজিষ্টরী করিলে তাহার স্বত্ব উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকের থাকে। ভারতবর্ষেও পেটেণ্ট আফিস আছে। ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত এদেশের পেটেণ্ট আফিসে যন্ত্রপ্রক্রিয়াদির স্বত্ব রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত, ভারতীয়েরা, ভারতপ্রবাসী বিদেশীরা, এবং বিদেশবাসী বিদেশীরা কত দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহার একটি তালিকা ভারতীয় পেটেণ্ট আফিস সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। নীচে তাহা তুলিয়া দিলাম।

সাল	ভারতীয়দের	ভারতপ্রবাসী বিদেশীদের	বিদেশবাসী বিদেশীদের	মোট দরখাস্ত
১৯১৯	১১৩	২০০	৭২৬	১০৩৯
১৯১৮	৭৭	১৫৫	৪১২	৬৪৪
১৯১৭	১১৪	১২৯	৩৫৯	৬০২
১৯১৬	৬১	১০৫	২৭৬	৪৪২
১৯১৫	৭০	১০৫	২৭০	৪৪৫
১৯১৪	৫৬	১১৭	৪১৫	৫৮৮
১৯১৩	৬৫	১৩২	৫০৮	৭০৫
১৯১২	৫০	১২০	৫০৮	৬৭৮
১৯১১	৬৪	১৪২	৬০১	৮০৭
১৯১০	৬২	১৩৭	৪৬৮	৬৬৭
মোট	৭৩২	১৩৪২	৪৫৪৩	৬৬১৭

ভারতীয়েরা তাহাদের স্বদেশে কেবল যে বিদেশীদের চেয়ে অল্পসংখ্যক পেটেণ্টের দরখাস্ত করে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভাবন ও আবিক্রিয়ায় কম উদ্যমের পরিচয় দেয়, তাহা নয়; খুব দরকারী ও উৎকৃষ্ট রকমের যন্ত্রাদির জন্য দরখাস্ত প্রায় সমস্তই বিদেশীদের নিকট হইতে আসে; ভারতীয়দের তেমন দরখাস্ত নাই বলিলেও চলে।

আমরা সব বিষয়ে পরাধীন কেন?

আমাদের বুদ্ধি অন্যজাতির লোকদের চেয়ে কম নয়; সাহসী লোকও আমাদের মধ্যে আছে; সুস্থ বাঙালীর দৈহিক বল গড়ে অন্যজাতির লোকদের চেয়ে বোধ হয় কম নয়; বাংলার জমী উর্ব্বরা; এদেশে মাটীর নীচে, ইহার সংলগ্ন সমুদ্রে, এরূপ অপর্য্যাপ্ত জিনিষ আছে, যাহা হইতে প্রচুর ধনাগম হইতে পারে। তথাপি আমরা সব দিকে পরাধীন ও দরিদ্র কেন? দেশের অস্বাস্থ্যকরতা একটা কারণ বটে। গ্রীসের ও রোমের সাম্রাজ্যের অধঃপতনের একমাত্র কারণ বর্ব্বরজাতিদের আক্রমণ নহে, ম্যালেরিয়াও অন্যতম প্রধান কারণ, ইহা এখন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের উদ্যমহীনতা, দারিদ্র্য, নির্বীর্য্যতা, ভীরুতা, আলস্য, অনেক পরিমাণে রুগ্নতা-প্রসূত; আবার রুগ্নতাও যে দারিদ্র্যসম্ভূত ও উদ্যমহীনতা হইতে উদ্ভূত, তাহাও সত্য। বস্তুতঃ, বীজ আগে কি গাছ আগে, এ প্রশ্ন যেমন একটা হেঁয়ালির মত, সেইরূপ কোন্‌টি যে আমাদের দুর্দ্দশার কারণ আর কোন্‌টি যে ফল, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। কার্য্যকারণ শৃঙ্খল এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে, যে, রোগকে দুর্দ্দশার কারণ ও ফল, দারিদ্র্যকে কারণ ও ফল, আলস্যকে কারণ ও ফল, উভয়ই বলা যায়। যাহাই হউক, দুরবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান এবং তাহা অপনোদনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এই উভয়ের নিকট সমুদয় বাধাই নিশ্চয়ই পরাজয় স্বীকার করিবে। এজন্য আমাদের মনে খুব জোর বাঁধিতে হইবে।

জাপানে কাষ্ঠপাদুকা-রক্ষক।

জাপানের লোকেরা যে স্বদেশের ভাল ও সুবিধাজনক প্রাচীন কিছুই পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহার একটি

দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাপানীদের প্রাচীন পাদুকা কাঠের তৈরী, নাম "গেতা"। গৃহে ঢুকিবার সময় তাহা বাহিরে খুলিয়া ঢুকিতে হয়। বায়োস্কোপে, থিয়েটারে কিম্বা প্রকাণ্ড সভাগৃহে ঢুকিবার সময়ও এইরূপ করিতে হয়। তখন বাহিরে কখন কখন কয়েক হাজার গেতা জমা হয়। সেই-গুলি রক্ষা করিবার জন্য, এবং অভিনয় বা সভার কার্য্য শেষ হইবার পর যাহার গেতা তাহাকে দিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদিগকে জাপানী ভাষায় গেতাবান বা গেসোকুবান বলে। তাহারা প্রত্যেকের গেতায় একটা করিয়া নম্বর জুড়িয়া দেয়, এবং সেই-নম্বর-যুক্ত একটা কাঠের টিকিট ঐ গেতার মালিককে দেয়। মালিক বাহিরে আসিয়া ঐ টিকিট দিলেই নিজের গেতা পান। কাহারো বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অনেক অতিথি সমাগম হইলে তিনি আগে হইতে গেতাবান্ ভাড়া পাইবার আফিসে গিয়া একসন্ধ্যার মত উপযুক্তসংখ্যক গেতাবান ভাড়া পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসেন। অধিকাংশ সহরেই এই কাষ্ঠপাদুকা-রক্ষক গেতাবান্ সর্ব্বরাহের আফিস আছে।

আজকাল বড় বড় আফিস্-বাড়ীতে জাপানীরা জুতা ব্যবহার করে, কিন্তু যে-সব বাড়ীর মেজেতে মাদুরের বা অন্যবিধ ফরাস বিছান আছে, তথায় জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লাইব্রেরীগুলিতে সাধারণতঃ মাদুর বিছান থাকে, এবং পাঠক ও গ্রাহকদের গেতার হেফাজত করিবার জন্য লোক রাখা হয়। উয়েনো পুস্তকালয়ে প্রত্যহ তিন হাজার লোকের গেতার ব্যবস্থা করা দরকার হয়।

অনেকে জাপানীদিগকে গেতা ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জুতা বুট ধারতে পরামর্শ দিয়াছেন; কিন্তু গেতা বুটের চেয়ে খুব সস্তা এবং জাপানের কর্দ্দমাক্ত রাস্তার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। এইজন্য জাপানীরা গেতা রক্ষা করিয়াছে। বাহিরের কাদা ধূলা ও অন্যবিধ ময়লা ঘরের মধ্যে না আনিয়া বাহিরে রাখিলে ঘরবাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং বাহির হইতে রোগের কারণ ঘরে আমদানী না হওয়ায় এই অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।

একদল মানুষ রেলগাড়ী হইতে নামিয়া বা কোন আমোদালয় বা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া যখন গে পায়ে চলিতে আরম্ভ করে, তখন সেই খটাখট শব্দ বিদে দের কানে ভয়ানক বাজে, কিন্তু ইহা জাপানীদের কা বেশ মানবীয় ঠেকে; কারণ ইহা কোন ইতর প্রা পায়ের শব্দের মত নহে।

জাপানে প্রাচীন কালের ভাল বা সুবিধাজনক যা তাহা রক্ষার আর-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যুদ্ধের জ ধনুর্ব্বাণের আজকাল কোন উপযোগিতা নাই, ইহা অপে বহুবহুগুণ নরঘাতক অস্ত্র এখন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তীরে দ্বারা লক্ষ্যবেধ করিতে হইলে যেরূপ শারীরিক উৎকর্ষ স্থৈর্য্য আদির প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য জাপানে এখন ধনুর্বিদ্যা প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে সম্রাট পর্য্য তীরনিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া উহার গৌরব প্রয়োজন শিক্ষা দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে তোকিও এ অন্যান্য বড় বড় সহরে ধনুবিদ্যা শিখাইবার জন্য বিশেষ আছে। যেমন ক্রিকেট ফুটবল বেস্‌বল খেলার প্রতি যোগিতার জন্য, তদ্রূপ ধনুর্বিদ্যার প্রতিযোগিতার জ অনেক ময়দান আছে। মহিলা ও পুরুষেরা প্রতিযোগি দেখিবার জন্য দলে দলে এইসব ময়দানে আসেন জাপানীদের মতে, ধনুর্বিদ্যা অনুশীলন করিলে শুধু শরীরের উন্নতি হয়, তাহা নহে; আত্মসংযম, নিশ্বাসপ্রশ্বা নিয়মিত করা, তীরনিক্ষেপ কার্য্যে ও লক্ষ্যে মন স্থির কর এইসকলও অভ্যস্ত হয়। রাইফ্‌ল্ বন্দুক দ্বারা লক্ষ স্থির করা অপেক্ষা তীরের লক্ষ্য স্থির করায় বেশী নৈপুণ্যে প্রয়োজন। জাপানী যুদ্ধশিক্ষা বিভাগে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তোকিও উচ্চতর নর্ম্যালস্কুলে, তোকি উচ্চতর বাণিজ্য-শিক্ষার স্কুলে এবং কেইওগিজুকু বি বিদ্যালয়ে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় চন্দননগরে জনসাধারণে মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে পুস্তকসংগ্রহসমেত এক সুন্দর অট্টালিকা তাঁহার পিতার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন এই নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন-উৎসব গত ২ জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃ

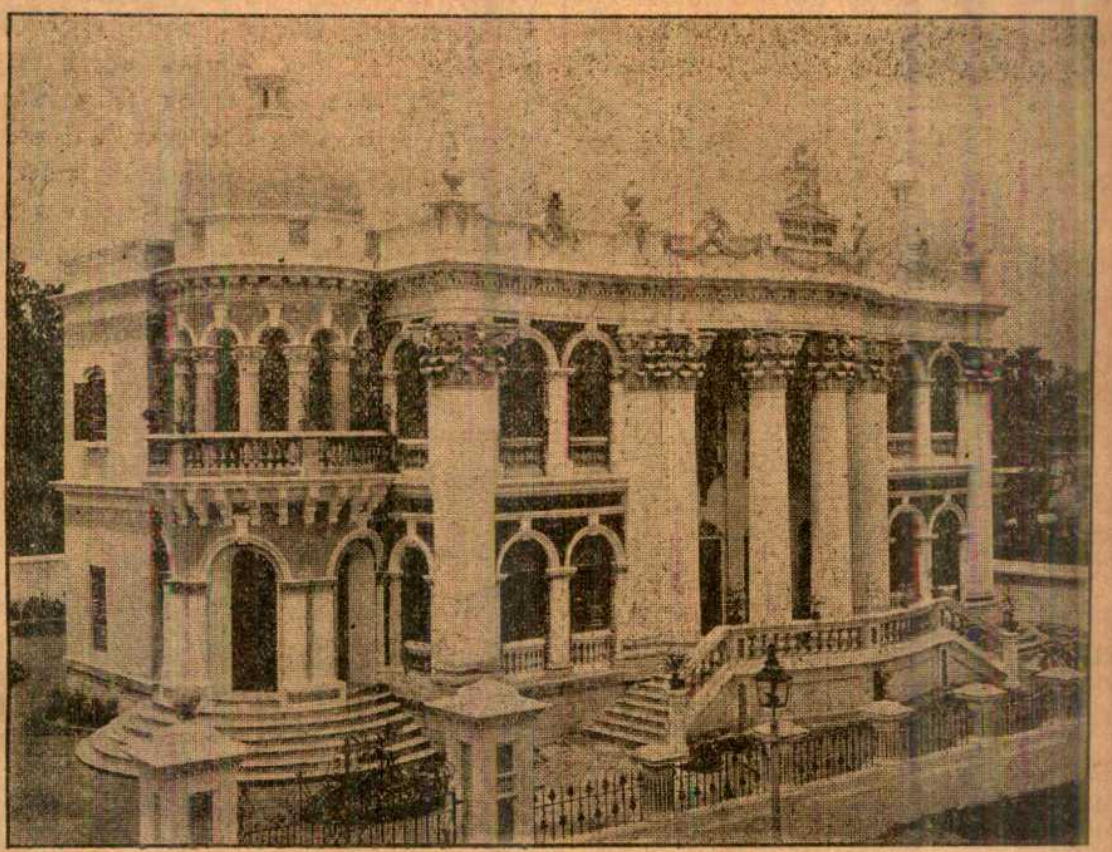

নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির—চন্দননগর লাইব্রেরী।

সম্পন্ন হয়। গৃহটি দুই অংশে বিভক্ত। সম্মুখের দ্বিতল অংশ পুস্তকসংগ্রহের ও পাঠকদের ব্যবহারের জন্য। হল, তাহার দুই পাশে বক্তাদের বিশ্রামের ঘর, এবং উপরে পুরমহিলাদের বসিবার স্থান, সভাসমিতি ও উৎসবাদির জন্য। হলে সাড়ে সাত শত শ্রোতার স্থান হয়। অট্টালিকাটির বাহিরের দৃশ্য এবং ভিতরের মূর্ত্তি আদি মনোরম। এই-সকলের পরিকল্পনা দাতা মহাশয়ের। গৃহটি নির্ম্মাণের ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর হইয়াছে। পুস্তকালয়টি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাতে বাংলা, ইংরেজী ও ফরাসী পুস্তক রাখা হয়। সভাসমিতির জন্য এইরূপ আয়তনের সুন্দর হল সম্বলিত এবম্বিধ পুস্তকালয় বাংলাদেশে অল্পই আছে বোধ হয়। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় ইহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনজন ট্রাষ্টীর হাতে দিয়া পিতৃভক্তি ও জনহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানদানের মত দান আর নাই। ইহার অন্যতম উপায় অবলম্বন করিয়া হরিহরবাবু চন্দননগরের অধিবাসীদিগের এবং দেশবাসী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গোধন।

কৃষির ভিত্তির উপর সভ্যতা যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এমন আর কিছুর উপর নয়। যে-সব জাতি কলকারখানার সাহায্যে নানা পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর নানা দেশের ধন আহরণ করিতেছিল, তাহারাও সম্প্রতিকার মহাযুদ্ধে বুঝিয়াছে, ধাতুর আকারে ও কাগজের আকারে সঞ্চিত ধন খাইয়া মানুষ বাঁচে না, কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন মানুষের প্রাণরক্ষা হয় না। পাঁচ বৎসর ধরিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন না করায়, এখন এইসব জাতি আঁধার দেখিতেছে, এবং দুর্ব্বলতর জাতিদের শস্যভাণ্ডার হইতে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অনেকের অল্পাহার ও অনাহার-ভাত মৃত্যুর কারণ হইতেছে। নিজ নিজ দেশে কৃষির উন্নতিচেষ্টাও অবশ্য সকলে করিতেছে। এখন কোন্ জাতির গো-মহিষ কত আছে, তাহার খোঁজ পড়িয়াছে। কারণ যে-সব দেশে কৃষিকার্য্যে অশ্বের বা যন্ত্রের খুব ব্যবহার আছে, সেখানেও দুগ্ধ মাখন প্রভৃতির জন্য গোমহিষের খুব প্রয়োজন। হিসাবে দেখা যাইতেছে, অন্য ধনের মত গোধনেও ভারতবর্ষ দরিদ্র।

"দি ওয়ার্লড্ এণ্ড্ দি নিউ ডিস্পেন্সেশুনে" প্রকাশিত একটি তালিকায় দেখা যায়, যে, আর্জেণ্টাইনে প্রতি ২জন মানুষের ১টি গোরু আছে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে প্রতি তিনজনের ২টি, বিলাতে প্রতি ৪ জনের ১টি, জার্মেনীতে ও ফ্রান্সে প্রতি ৩ জনের ১টি, এবং রুশিয়ায় ও ভারতবর্ষে প্রতি ৪ জনের ১টি।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের স্বাস্থ্য।

১৯১৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে তিনমাস শেষ হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্মমৃত্যুরোগের তালিকা গত ৫ই জুনের গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ায় বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাংলাদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী। প্রধান প্রধান প্রদেশগুলির হিসাব নীচের তালিকায় সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। এই তালিকায় "জেলাসমূহ" বলিতে সহরগুলি বাদে জেলাগুলির বাকী অংশ বুঝিতে হইবে। জন্মের ও মৃত্যুর সংখ্যাগুলি দ্বারা মোট অধিবাসীসংখ্যা অনুসারে বার্ষিক হাজারকরা কত জন্ম ও মৃত্যু তাহাই বুঝিতে হইবে।

প্রদেশ	সহরেজন্ম	সহরেমৃত্যু	জেলায়জন্ম	জেলায়মৃত্যু
বাংলা	১৭.১	২৬.৪	১৮.২	২৬.৪
বিহার-ওড়িষ্যা	২৫.৬	৩৮.৮	২৫.৯	৪১.২
আসাম	২৮.৯	৩৬.৯	২২.২	৪৯.৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৭.৪	৪৪.৩	২৭.৯	২৯.৯
পঞ্জাব	৫০.২	৩৬.৫	৩৪.৪	২৪.৩
উ-প-সীমান্ত	৩৩.৮	৩৮.৭	২২.৯	২৯.৪
মধ্যপ্রদেশ	৩৭.৫	৪৯.১	২৫.৫	৪৮.৩
মাদ্রাজ	৩২.২	৩৯.১	২১.৫	২৩.৯
বোম্বাই	২৪.৭	৪৫.৫	২৪.৮	৩২.৭
বর্ম্মা	২৫.৩	৪৯.৩	২৭.৫	৩১.৪

আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাব ছাড়া আর সর্ব্বত্র সহরগুলিতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী। জেলাগুলিতেও কেবলমাত্র পঞ্জাব ছাড়া অন্য সব প্রদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী। আগ্রা-অযোধ্যাতেও গ্রাম এবং সহর একত্র ধরিলে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যাই বেশী।

যে-দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইতে যাইতেছে, তথায় এত বেশী মানুষ কেন মরিতেছে, তাহার অনুসন্ধান নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের ঝগড়ার চেয়ে কম জরুরী কাজ নহে।

সর্ব্বত্রই জ্বরে খুব বেশী মৃত্যু হয়। তা ছাড়া, প্লেগ, ওলাওঠা, বসন্ত, উদরাময় ও রক্তামাশয়, এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়া আছে।

পঞ্জাবের হাঙ্গামা।

গত বৎসরের পঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করিবার জন্য পঞ্জাবের কংগ্রেস সব্-কমিটি যাঁহাদের উপর ভার দিয়াছিলেন, তাঁহাদের রিপোর্ট আগেই প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার পর সর্‌কারী হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ভারতসচিবের নিকট পেশ্ করিবার নিমিত্ত ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং ভারত-সচিব বড়লাটকে যে-চিঠি লিখিয়া এ বিষয়ে বিলাতী গবর্ণমেণ্টের মত জানাইয়াছেন, রিপোর্টের সহিত তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-সচিব তাঁহার চিঠিতে অনেক উঁচু উঁচু "ধর্ম্মের কথা" বলিয়াছেন; কিন্তু বড়লাটের অবিমিশ্র অত্যুক্তিপূর্ণ প্রশংসা করিয়াছেন, সার্ মাইকেল ওডোয়ারের মৃদু সমালোচনার পর জোরের সহিত সুস্পষ্ট তারিফ করিয়াছেন, এবং জেনারেল ডায়ারকে যে তাঁহার ভারতবর্ষের চাকরীতে ইস্তফা দিতে বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়াছেন। পঞ্জাবের শত শত লোকের উপর যেরূপ পৈশাচিক অত্যাচার হইয়াছে, পঞ্জাবের ও সমুদয় ভারতবাসীর উপর বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা থাকায় পঞ্জাবী শত শত লোকের যেরূপ লাঞ্ছনা ও অপমান করা হইয়াছে, ইহাতে তাহার যথেষ্ট প্রতিকার হইল মনে করা যাইতে পারে না। অথচ ইহাতেও অধিকাংশ ভারতপ্রবাসী ইংরেজ বলিতেছে, ভারতের আন্দোলনকারী-দিগকে খুসি করিবার জন্য মণ্টেগুসাহেব "সাম্রাজ্যরক্ষক"-ডায়ারকে বলি দিয়াছেন!

পঞ্জাবের কয়েকটি জায়গায় অনেক লোক কয়েকজন ইংরেজকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে, দু-একজন ইংরেজ স্ত্রীলোককে আক্রমণ ও তাহাদের প্রাণবধের চেষ্টা করে, গৃহদাহ ও অন্যান্য প্রকারে সম্পত্তি নষ্ট করে, ইত্যাদি। এইসব অপরাধে অনেকের ফাঁসী, দ্বীপান্তর, দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, ইত্যাদি শাস্তি হইয়াছে। দণ্ডিত সকলেই অপরাধী কি না, জানি না; কিন্তু যাহারা অপরাধী তাহাদের শাস্তি আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। এইসব শাস্তি ছাড়া কতকগুলি সহর ও গ্রামের উপর নিগ্রহ-পুলিস বসান, তাহাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়, ইত্যাদি দণ্ড হইয়াছে। দোষী নির্দ্দোষ সকলের এইরূপ একসঙ্গে শাস্তিদান অন্যায়। যে ন্যায়বুদ্ধি শাসনকর্ত্তাদিগকে ন্যায্য দণ্ড দিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, নরহন্তা বা অন্যপ্রকারের অত্যাচারী সর্‌কারী চাকরদের বিচারের সময় সেই ন্যায়বুদ্ধি প্রযুক্ত হইলে জেনারেল ডায়ারের ফাঁসী হইত, সার্ মাইকেল ওডোয়ারের যাবজ্জীবন কারাবাস হওয়া উচিত ছিল, এবং লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পদচ্যুতি এবং তৎপরে বিলাতে পার্লেমেণ্টে তাঁহার বিচার হইত। অন্যান্য সর্‌কারী চাকরদেরও যথাযোগ্য শাস্তি হইত। এইসব লোকের শাস্তি হইত, কেন মনে করি, বলিতেছি। যখন দেশে এবং বড়লাটের কৌন্সিলে রৌলট বিলের

বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছিল, তখন একথা গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছিল যে ঐ বিল আইনে পরিণত হইলে দেশে অশান্তি হইবে। গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা সরকারকে ভয় দেখান হইতেছে, এবং দেশের লোককে উপদ্রব করিবার জন্য উস্কাইয়া দেওয়া হইতেছে। সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা বশতঃ বড়লাট বলিয়াছিলেন যে অশান্তি উপদ্রব দমনের জন্য তাঁর অধস্তন কর্ম্মচারীরা যে-সব উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদের সমর্থন করিবেন। আমাদের ধারণা এই প্রতিশ্রুতি বশতঃ পঞ্জাবে রাজভৃত্যেরা এত অত্যাচার করিতে সাহস পাইয়াছিল। সার্ মাইকেল ওডোয়ার দ্বারা ডায়ারের কাজের এবং সামরিক আইন বলবৎ থাকার সময় প্রায় সমুদয় হুকুমের ও কাজের সমর্থন হইয়াছিল। সেই জন্য ওডোয়ার ডায়ার প্রভৃতির পাপের অংশী। ডায়ার, ফ্রাঙ্ক জন্‌সন্, প্রভৃতিও স্বনাম-কুখ্যাত।

পঞ্জাবে বিদ্রোহ হয় নাই, বড় রকমের দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছিল। তাহা দমন করিবার জন্য সামরিক আইন ঘোষণা করিয়া উহার প্রয়োগ আবশ্যক ছিল না; কারণ উহা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই, প্রথম যে-যে জায়গায় হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহা থামিয়া যায়। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ডায়ার অনেক শত মানুষ খুন ও তাহার তিনগুণ মানুষকে জখম করাইবার পর, তাহারই ফলে আরো কয়েক জায়গায় হাঙ্গামা হয়। প্রথমে যে হাঙ্গামা হয়, ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচ্‌লুকে হঠাৎ গোপনে অজ্ঞাত স্থানে নির্ব্বাসন না করিলে তাহাও সম্ভবতঃ হইত না।

যদি ইহা স্বীকারও করা যায় যে পঞ্জাবে বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা হইলেও নির্দ্দোষ লোকদিগকে গুলি করিয়া মারা, নির্দ্দোষ লোকদের উপর আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপ ও কলের কামান চালান, নির্দ্দোষ লোকদিগকে একটা গলিতে কেঁচোর মত পেটের উপর চলিতে বাধ্য করা, ইত্যাদি কাজের সমর্থন কেবল স্বার্থপরতায়, ভয়ে, প্রতিহিংসায়, এবং সাম্রাজ্যপূজায় অন্ধ লোকেরাই করিতে পারে। জার্মেনরা যুদ্ধের সময় নিজেদের শত্রুজাতীয় অসৈনিক নির্দ্দোষ লোকদের উপর আকাশ হইতে বোমা ফেলায় ইংরেজরা তাহাদিগকে পিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। সেই ইংরেজ এখন স্বজাতীয়দের পঞ্জাবী কীর্ত্তির প্রশংসা করিতেছে! অল্পসংখ্যক ইংরেজ এই অপকীর্ত্তির তীব্র সমালোচনা করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, ইহা ইংরেজজাতি ও মানবকুলের ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ।

ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য।

সত্যসত্যই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কিম্বা সাম্রাজ্য রক্ষার ওজুহাতে প্রতিহিংসাবৃত্তি, প্রভুত্বপ্রিয়তা বা অর্থগৃধ্নুতা চরিতার্থ করিবার জন্য যে সব ইংরেজ পরাধীন বা দুর্ব্বল জাতির উপর অত্যাচার করে, তাহাদিগের নিন্দা করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া ইংরেজ জাতির পক্ষে দুঃসাধ্য। শুধু ইংরেজজাতির কেন, সাম্রাজ্যস্থাপক বিদেশশাসক জাতিমাত্রের পক্ষেই ইহা দুঃসাধ্য। ঐশ্বর্য্যের, প্রভুত্বের, ও সাম্রাজ্যের পূজা, এবং ঈশ্বরের, ধর্ম্মের, মানবভ্রাতৃত্বের, ন্যায়ের পূজা, উভয়ই একসঙ্গে চলিতে পারে না। "আমাদের সাম্রাজ্য পৃথিবীতে বিশালতম হইবে, জলে স্থলে আকাশে আমাদের প্রতাপ সর্ব্বাধিক হইবে, জলে যুদ্ধ-ও-বাণিজ্য-জাহাজ, আকাশে যুদ্ধ-ও-বাণিজ্য-নভোযান আমাদের সকলের চেয়ে ভাল ও বেশী হইবে, আমরা সকলের চেয়ে ধনী জাতি হইব," ইহা যাহাদের আদর্শ, "আমরা সকলের চেয়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়বান্, ঈশ্বরভক্ত জাতি হইব," ইহা তাহাদের আদর্শ হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা মুখের কথায় উচ্চ ধর্ম্মনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠার সুন্দর ব্যাখ্যা করিবে, কিন্তু কাজে, যাহারা জাতিকে সাম্রাজ্যিক লাভবান্ ও প্রভু করিয়াছে বা রাখিয়াছে, তাহাদের প্রকৃত কোন ক্ষতি ত করিবেই না, প্রত্যুত প্রশংসা ও পুরস্কারই করিবে, ইহা অনিবার্য্য।

যুদ্ধের সময় জার্মেনী বেল্‌জিয়মে ও ফ্রান্সে যে-সব অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করেন। বিখ্যাত লেখক লর্ড ব্রাইস্ উহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া উহা ব্রাইস্ কমিটি নামে পরিচিত। ঐ কমিটির রিপোর্টে আছে, "Such acts are no part of war, for innocence is entitled to respect even in war. They are mere murders,..." "এইরূপ নিষ্ঠুর কাজ যুদ্ধের অঙ্গ নহে, কারণ নির্দ্দোষিতা যুদ্ধেও সম্মান অব্যাহতি পাইবার যোগ্য। এইসব কাজ খুন মাত্র।" পঞ্জাবে যদিই বা বিদ্রোহ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও নির্দ্দোষ লোকের প্রাণবধ খুন ভিন্ন কিছুই নহে।

ক্ষমার কথা উঠিয়াছে। আমরাও ক্ষমার পক্ষপাতী প্রতিহিংসা দ্বারা চালিত হওয়া অনুচিত মনে করি। কিন্তু শাস্তি দিবার শক্তি যাহার আছে, ক্ষমা কথাটি ব্যবহার করিবার অধিকারী কেবল সেই। কেন-না, যে ইচ্ছা করিলেও শাস্তি দিতে পারে না, সে যদি বলে 'ক্ষমা করিলাম,' তাহা অর্থশূন্য বা মিথ্যাকথা। অপরাধী (এবং অনেক স্থলে নিরপরাধ) দুর্ব্বল লোকদের শাস্তি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে আমাদের সামর্থ্য অসামর্থ্য কিছুই নাই; কিন্তু প্রবলের শাস্তি দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতএব পরম সাত্ত্বিক সাম্রাজ্যিকদিগকে ক্ষমা করিতে বলার কিম্বা ক্ষমা করার ভান করিবার

ন্যাকামি আমরা পছন্দ করি না। আমাদের যখন, শাস্তি দিবার কিম্বা নিষ্কৃতি দিবার, কোন ক্ষমতাই নাই, তখন অপরাধ ও নির্দোষিতার উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব। যাহারা শাস্তি দিতে পারে, তাহারা ক্ষমা করিবে, কি শাস্তি দিবে, ভাবুক; যদি ক্ষমা করে, তাহা হইলে তুল্য অপরাধী, কম অপরাধী বা নিরপরাধ ভারতীয়দের ভীষণ শাস্তি কেন হইল, তাহার ভাবনাও তাহারা ভাবুক। আমরা প্রভু নই, দণ্ডক্ষমার ভাবনা আমাদের নয়।

কোরিয়া জাপানের অধীন। কোরিয়ান্‌রা কিছুদিন হইতে স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়াছে। ফলে তাহাদের উপর নানা অত্যাচার হইয়াছে। একটির বৃত্তান্ত নীচে নিউ ইণ্ডিয়া কাগজ হইতে তুলিয়া দিলাম।

A KOREAN JALLIANWALA BAGH

In view of the Amritsar affair it should be interesting to compare the Japanese attitude towards their subject people. The other day Mr. Grundy, M. P., asked in the Commons, the Under Secretary of State for Foreign Affairs:

"Whether he is aware that in April 1919, the Christian men in the Korean village of Cheamni were ordered by soldiers of the 78th Japanese Regiment to assemble in the Church, *that the doors were then shut and the men shot down, their bodies being bayoneted* and the church and most of the houses in the village set on fire; whether the British Consul made any enquiries into this incident, whether any report has been received; if so, will the report be published; and whether he has received information that a merely nominal punishment was inflicted on the Japanese officer responsible, after urgent representations had been made to the Japanese Governor General at Seoul." (Italics ours.)

Mr. Harmsworth admitted that the facts were correct and that the punishment inflicted on these inhuman murderers was 30 days close arrest "including reduction of pay and pension and deferment of promotion."

জাপান ম্যাগাজিনে ইহার নিম্নমুদ্রিত কৈফিয়ৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

Last summer we read in papers that a church was bombarded by Japanese gendarmes. That sounds bad enough. As far as I understand, this was done, not because it was a church, nor because good Christian people gathered there for worship—but because a dozen instigators of insurrection hid themselves under its roof When a building is used not for a religious purpose but for harbouring law-breakers, it forfeits its sanctity. On questions like these it is exceedingly difficult to be absolutely impartial and fair. Distortion of facts by interested and hostile parties is only human and too frequent. I can well imagine, however, that Japanese authorities—or more probably the lower officials, civil and military—may exercise functions awkwardly, to say the least, and sometimes too zealously. When a colonial administration as experienced as the British commits errors in Egypt or in Jamaica, it is not to be wondered at that novices like us are not free of them.

এখানেও সেই বিদ্রোহের ওজুহাত, পৈশাচিক কাজে দোষক্ষালনার্থ সেই অতি মৃদু ভাষার প্রয়োগ, এবং সর্ব্বশেষে অন্য এক অভিজ্ঞ সাম্রাজ্যস্থাপক জাতির—ব্রিটিশ জাতির—এবম্বিধ কাজের নজীর প্রদর্শন।

ভারতে ফরাসীর অকৃতকার্য্যতা ও ইংরেজের কৃতিত্বের একটি কারণ।

মেকলে তাঁহার ক্লাইব-সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাব্যতা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে। তাহার উপায়ও তিনিই আবিষ্কার করেন। তদ্দ্বারা তিনি দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। ভারতে ফরাসীর রাজত্ব স্থাপিত হইয়াও গেল কেন, এবং ইংরেজের রাজত্বের সূত্রপাত ফরাসীর পরে হইয়াও কেন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার একটি প্রকৃত কারণ মেকলের প্রবন্ধের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রথমে ডুপ্লে সম্বন্ধে মেকলের কথা উদ্ধৃত করি।

"The man who first said that it was possible to found an European Empire on the ruins of the Mogul monarchy was Dupleix. His restless, capacious and inventive mind had formed this scheme, at a time when the ablest servants of the English Company were busied only about invoices and bills of lading. Nor had he only proposed to himself the end. He had also a just and distinct view of the means by which it was to be attained. He clearly saw that the greatest force which the princes of India could bring into the field would be no match for a small body of men trained in the discipline, and guided by the tactics, of the West. He saw also that the natives of India might, under European commanders, be formed into armies, such as Saxe or Frederic would be proud to command. He was perfectly aware that the most easy and convenient way in which an European adventurer could exercise sovereignty in India, was to govern the nations, and to speak through the mouth of some glittering puppet dignified by the title of Nabob or Nizam. The arts both of war and policy, which a few years later were employed with such signal success by the English, were first uderstood and practised by this ingenious and aspiring Frenchman."

অতঃপর মেকলে দেখাইয়াছেন, যে, কেমন করিয়া কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র ডুপ্লে প্রভু হন এবং ডুপ্লে-ফতেহাবাদ নগর ও ডুপ্লে-জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন, ও ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নৃপতি হন। কিন্তু তথাপি, ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য কেন স্থায়ী হইল না? তাহার কারণ, সোজা ভাষায় এই, যে, ফ্রান্স সে-যুগে নিজের সাম্রাজ্যবিস্তার, জয়গৌরব, প্রভুত্ব, ও আর্থিক লাভের খাতিরে ফরাসী সেনাপতিদের অত্যাচার ও অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ক্ষমা

করিতে পারে নাই; ইংলণ্ড পারিয়াছিল, এবং ক্ষমার চেয়েও বেশী কিছু করিয়াছিল ও এখনও করিতেছে,—অত্যাচারীকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া উচ্চ প্রশংসা ও অন্যবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছে। মেকলের কথাতেই তাহা বলি।

ভারতবর্ষে ক্লাইবের অপকার্য্য-সকলের বিচারের জন্য পার্লেমেণ্টের এক কমিটি নিযুক্ত হয়। তাহাতে জানা পড়ে যে ক্লাইব বাস্তবিকই অন্যায় কাজ বহুৎ করিয়াছিল; তবে তন্মধ্যে ইংরেজজাতির পক্ষে সুবিধাজনক ও, মেকলের মতে, ভাল কাজও ছিল।

"It was clear that Clive had been guilty of some acts which it is impossible to vindicate without attacking the authority of all the most sacred laws which regulate the intercourse of individuals and of states. But it was equally clear that he had displayed great talents, and even great virtues; that he had rendered eminent services both to his country and to the people of India;....."

মেকলে নিজেই ইহার পর বলিতেছেন যে, সাধারণ দণ্ডবিধি আইনে একথা বলে না, যে, দোষ ক্ষালনার্থ অভিযুক্ত ব্যক্তির গুণের উল্লেখ করা যায়। খুনী কোন মানুষ দাতা ছিল বলিয়া তাঁহার সাত খুন মাফ্ হয় না।

"Ordinary criminal justice knows nothing of set-off. The greatest deser. cannot be pleaded in answer to a charge of the slightest transgression."

কিন্তু অতঃপর মেকলে প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে, যাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া বৃহৎ রকমের অপরাধ করে, তাহাদিগকে, গুণদোষের কাটাকাটি করিয়া পুরস্কৃত করাই উচিত!

"It is not in this way that we ought to deal with men who, raised far above ordinary restraints, and tried by far more than ordinary temptations, are entitled to a more than ordinary measure of indulgence. Such men should be judged by their contemporaries as they will be judged by posterity. Their bad actions ought not indeed to be called good; but their good and bad actions ought to be fairly weighed; and, if on the whole the good preponderate, the sentence ought to be one, not merely of acquittal but of approbation."

মেকলে ভাল ও মন্দ কাজ তুলদাঁড়িতে ওজন করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু কোন্ প্রভুত্বপ্রিয় ধনমুগ্ধ জাতি সাম্রাজ্যের স্থাপক, বিস্তারক, বা রক্ষক কোন শক্তিশালী স্বজাতীয়ের এমন কাজকে ভাল বলিবে না যাহার দ্বারা সাম্রাজ্য-স্থাপন, বিস্তার বা রক্ষার সাহায্য হইয়াছে? মেকলে বলিতেছেন পার্লেমেণ্টের সব দলের সুবুদ্ধি (!) লোকেরা উপরে বর্ণিত নীতি যে ঠিক্, তাহা অনুভব করিয়াছিলেন।

"Reasonable and moderate men of all parties felt this in Clive's case. They could not pronounce him blameless: but they were not disposed to abandon him to that low-minded and rancorous pack who had run him down and were eager to worry him to death."

ক্লাইবের বিচারের পুরা বৃত্তান্ত দিবার স্থান নাই আবশ্যকও নাই। এখন, পার্লেমেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্স্, যাহা স্থির করিলেন তাহাই বলি। তাঁহারা ঠিক্ করিলেন সরকারী চাকরে সরকারের শক্তির সাহায্যে ভূয়োদর্শন বা ধন (সদুপায়েই হোক্ আর অসদুপায়েই হোক্) যাহা অর্জ্জন করে, তাহা সরকারেরই থাকা উচিত, কর্ম্মচারীর তাহা প্রাপ্য নহে। ঠিক্ কথা; কিন্তু তা বলিয়া কর্মচারী যদি চুরি, ডাকাতী, বাটপাড়ী বা উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা ভূমি বা অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহা সরকারের গ্রহণ করা কোন্ ধর্ম্মে অনুমোদন করে জানি না, এবং অপরাধী কর্ম্মচারীকে অব্যাহতি দিয়া ও তাহার খুব প্রশংসা করিয়া পরে তাহাকেই উচ্চ সরকারী কাজে নিযুক্ত কিরূপে করা চলে জানি না! কিন্তু মেকলের প্রবন্ধ অনুসারে ক্লাইবের ভাগ্যে কতকটা এইরূপই ঘটিয়াছিল। যথা—

"The Commons resolved that acquisitions made by the arms of the State belong to the State alone and that it is illegal in the servants of the State to appropriate such acquisitions to themselves. They resolved that this wholesome rule appeared to have been systematically violated by the English functionaries in Bengal. On a subsequent day they went a step farther, and resolved that Clive had, by means of the power which he possessed as commander of the British forces in India, obtained large sums from Meer Jaffier. Here the Commons stopped. They had voted the major and minor of Burgoyne's syllogism; but they shrank from drawing the logical conclusion. When it was moved that Lord Clive had abused his powers, and set an evil example to the servants of the public, the previous question was put and carried. At length, long after the sun had risen on an animated debate, Wedderburne moved that Lord Clive had at the same time rendered great and meritorious service to his country; and this motion passed without a division."

মেকলে এই মীমাংসার খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

"The result of this memorable inquiry appears to us, on the whole, honourable to the justice, moderation, and discernment of the Commons."

এই সময়কার ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের মত "সুবুদ্ধি"র পরিচয় দিতে না পারায়, ভারতে-নিযুক্ত ফরাসী কর্ম্মচারীদের দোষের জন্য তাহাদের শাস্তি দেওয়ায়, মেকলে ফ্রান্সের নিন্দাই করিয়াছেন! যথা—

"The equitable (!) and temperate proceedings of the British Parliament were set off to the greatest advantage by a foil. The wretched government of Louis the Fifteenth had murdered, directly or indirectly, almost every Frenchman who had served his country with distinction in the east. Labourdonnais was flung into the Bastile, and, after years of suffering, left it only to die. Dupleix, stripped of his immense fortune, and broken-hearted by humiliating attendance in antechambers, sank into an obscure

grave. Lally was dragged to the common place of execution with a gag between his lips. The Commons of England, on the other hand, treated their living captain with that discriminating justice which is seldom shown except to the dead. They laid down sound general principles; they delicately (!) pointed out where he had deviated from those principles; and they tempered the gentle censure with liberal eulogy."

পঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধীয় তাঁহার চিঠিতে মিঃ মণ্টেগু ওডোয়ার এবং ডায়ারের কার্য্যের আলোচনায়, বিশেষতঃ ওডোয়ারের কার্য্যের আলোচনায়, যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, মেকলের শেষোদ্ধৃত বাক্যটি ঠিক্ যেন তাহারই বর্ণনা।

সাম্রাজ্য স্থাপন, বিস্তার, ও রক্ষার কার্য্য, বুদ্ধের বা যীশু খৃষ্টের উপদেশ অনুসারে চলিলে, সম্পন্ন করা যায় না। সুতরাং যদি কোন জাতি নিজের দেশের সাম্রাজ্যের স্থাপক, বিস্তারক বা রক্ষকদিগকে তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য সমুচিত শাস্তি দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সাম্রাজ্য থাকে না। এইজন্য, যে-যুগে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই-যুগে ভারতে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিনষ্ট হইয়াছিল।

জামেকা দ্বীপ ইংলণ্ডের অধীন। ১৮৬৫ সালে, গবর্নর আয়ারের (Eyre) শাসনকালে, সেখানে হাঙ্গামা হওয়ায় সামরিক আইন ঘোষিত হয়। আমরা ইহার বৃত্তান্ত ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ কাগজে হার্বার্ট পলের আধুনিক ইংলণ্ডের ইতিহাস (A History of Modern England, by Herbert Paul, published by Macmillan) হইতে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি। এই হাঙ্গামার সময় জামেকার অধিবাসী নিগ্রো পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়। সেখানেও শাসনকর্ত্তা বলিয়াছিলেন বিদ্রোহ হইয়াছিল, ঐতিহাসিক বলেন, হয় নাই ("there was no general insurrection in Jamaica")। সেখানে যে সব অত্যাচার হইয়াছিল, ঐতিহাসিক তাহাকে "work of vengeance" "প্রতিহিংসার কাজ" বলিয়াছেন। সেখানে স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত বেত মারা হইয়াছিল। নিগ্রোদের নেতা একজনের ফাঁসী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বলেন, "Although Governor Eyre approved of his execution, history must pronounce it to have been murder without even the forms of law," "যদিও গবর্ণর আয়ার তাহার ফাঁসীর অনুমোদন করেন, তথাপি ইতিহাস ইহাকে, আইন-সঙ্গত বিচারের বাহিরের আকার পর্য্যন্ত শূন্য খুন্‌ই বলিবে।" এই হাঙ্গামায় একজনও সৈন্য বা জাহাজী গোরা হত বা আহত হয় নাই, কিন্তু প্রায় ৪৫০ নিগ্রোকে গুলি করা বা ফাঁসী দেওয়া হয়, ৬০০ জনের বেত হয়, এবং নিগ্রোদের এক হাজার বাড়ী পুড়াইয়া ফেলা হয়। আয়ারের কাজের বিচারের জন্য রয়্যাল কমিশন বসে, তাহার পর আদালতেও তাহার বিচার হয়। কিন্তু আয়ার খালাস পায়। তাহার দণ্ড এই পর্য্যন্ত হইয়াছিল, যে, সে আর সরকারী চাকরী পায় নাই। তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাহার ভক্তদের যে দল বাঁধা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছিলেন, বিখ্যাত লেখক কার্লাইল, লেখক রেভারেণ্ড চার্ল্‌স কিংস্‌লী, টেনিসন, রাস্কিন, প্রভৃতি। আয়ারের দণ্ডবিধানপ্রয়াসী ছিলেন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, হাক্স্‌লী, টমাস্ হিউজ্, হার্বার্ট স্পেন্সার, গোল্ড্‌উইন্ স্মিথ্ প্রভৃতি।

আমরা ইতিহাস অতি সামান্যই জানি। ভারতবর্ষে বা ইংরেজের অধীন অন্য কোন দেশে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী অত্যাচার করিয়া সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের সামান্য ইতিহাসজ্ঞানে মনে পড়িতেছে না। এরূপ দৃষ্টান্ত কাহারো জানা থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসী-সম্পাদককে জানাইবেন।

"বেশী সাহস" ও "অধিকতর ভয়"।

জেনারেল ডায়ারের লিখিত জবানবন্দীতে আছে, বেশী সাহস দেখাইতে হইলে তৎপূর্ব্বে অধিকতর ভয়ের দরকার। সে ও তাহার অধীনস্থ কয়জন সিপাহী জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগে নিরস্ত্র পলায়নপর লোকদের উপর গুলি চালাইয়া যে, প্রায় ৫০০কে খুন ও ১৫০০কে জখম করে, সে বলিতে চায় যে তাহা এই ভয়ের জন্য যে তখন গুলি না করিলে, বিপুল পঞ্জাবী জনতা তাহাদিগকে ঝড়ের মুখে তূঁষের মত উড়াইয়া দিত। তাহার এই কথা যে মিথ্যা তাহাও তাহার মৌখিক জবানবন্দী হইতেই প্রমাণ হয়। তাহাতে সে স্বীকার করে, যে, গুলি না চালাইয়াও জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগের জনতাকে তাড়াইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু তাহারা তাহা হইলে আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে উপহাস করিত। অর্থাৎ সে উপহাসের ভয়ে গুলি চালাইয়াছিল, ঝড়ের মুখে তূঁষবৎ উড়িয়া যাইবার ভয়ে নহে। এই যে উপহাসের ভয়, ইহাও ঠিক্ সত্য কথা নয়। কারণ, তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রমাণিত হয়, যে, বহু পঞ্জাবীর প্রাণবধ করিয়া সে তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিল, যে, তাহারা ভবিষ্যতে যেন চিরকালের মত ভয়ে কেঁচো হইয়া থাকে, ইংরেজ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে হাত তোলার কল্পনাও করিতে না পারে। ইহা হইতে গুলি চালানর আদি কারণে পৌঁছা যায়। তাহা প্রতিহিংসা। যেহেতু কতকগুলা লোক জনকয়েক ইংরেজকে মারিয়াছে, অতএব তার চেয়ে অনেক বেশী দেশী লোককে মারিয়া প্রতিশোধ লইতে হইবে, অতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ইংরেজ এই

সংকল্প করিয়াছে বলিয়া গুজব হাঙ্গামার সময়ই রটিয়াছিল। এই গুজব যে সম্পূর্ণ অমূলক না হইতেও পারে, বেসরকারী তদন্ত কমিটির সংগৃহীত সাক্ষ্য হইতে এইরূপ অনুমান হয়।

প্রকৃত কথা এই, যে, ভারতবাসীরা নিরস্ত্র এবং নানা কারণে নির্বীর্য্য হইয়াছে; অতএব তাহাদের যত লোককেই গুলি করা যাক্ না, তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই, ডায়ারের এই নির্ভয়ের ভাবই গুলি নিক্ষেপের কারণ, "অধিকতর ভয়" কারণ নয়। যখন ভারতীয়দের অস্ত্র ছিল, বীর্য্য ছিল, তখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও এই হুকুম দিতেন যে বিদ্রোহীর আগে গুলি না চালাইলে সরকারের সৈন্য গুলি চালাইবে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের জন্য গত ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ১৯৫ পৃষ্ঠা দেখুন। আয়ার্ল্যাণ্ডে বহুকাল ধরিয়া শিন-ফেন দলের লোকেদের পুলিশ খুন, সৈনিক খুন, বারিক দাহ ও লুট, অস্ত্র শস্ত্র লুট, গোরু লুট, গুপ্ত যুদ্ধ, সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার প্রচার, শিন-ফেন দমনার্থ প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ হইতে খালাস করিতে আইরিশ কুলিদের অস্বীকার, প্রভৃতি বিদ্রোহিতার নানা প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হইতেছে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে তথায় ভয়ের কারণ পঞ্জাব অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী। কিন্তু সেখানে কোন ইংরেজ রাজভৃত্য বা সেনাপতি ডায়ারের মত খুন করিবার কল্পনাও করে না। কেন না, আইরিশদের অস্ত্র আছে, প্রবল প্রতিহিংসাবৃত্তি আছে, প্রতিশোধ লইবার সাহস আছে, এবং তাহাদের সহিত আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সংস্পর্শ আছে। গুলি চালাইয়া আইরিশকে কেঁচো করিবার সম্ভাবনা না থাকায় আয়ার্ল্যাণ্ডে ডায়ারের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, গুলি চালাইয়া পঞ্জাবীকে কেঁচো করিবার সম্ভাবনায় বিশ্বাস থাকায় জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগে ডায়ার কাপুরুষতা ও পাশবিকতার চূড়ান্ত করিয়াছে। আমরা প্রতিহিংসাপ্রণোদিত হইয়া প্রতিশোধ লওয়াকে বাঞ্ছনীয় বা সম্মানার্হ মনে করি না, কেন না ইহা পশুর ও অনুন্নত মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম, কিন্তু নিরস্ত্র নির্দোষ গলাসনপর লোকদিগকে বধ করা অতি হেয় কাপুরুষতা ও পৈশাচিকতা জ্ঞানে অধিকতর ঘৃণা করি। জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগে যে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহা ঐতিহাসিক সাক্ষীর মত, নিরপরাধ নিহত লোকদের প্রতি সমবেদনার চিহ্নের মত, হিন্দুমুসলমানের সমানদুর্দশারূপ ভ্রাতৃত্বের প্রমাণের মত, থাকিবে। কিন্তু এই বাগে হন্তা বা হত কোন পক্ষই মনুষ্যত্বের কোন উচ্চগুণের পরিচয় না দেওয়ায়, উহা বীরের তীর্থ হইবে না, সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষের তীর্থ হইবে না। সাত্ত্বিক মানুষ প্রাণ হরণ করেন না বটে, বরং প্রাণ দেন, কিন্তু পলাইতে পলাইতে প্রাণ দেন না, ভয়ে দিশাহারা হইয়া প্রাণ দেন না।

প্রতিকার-চিন্তা।

পঞ্জাবে দেশী লোকেরা যে অধর্ম্ম করিয়াছে এবং বিদেশী লোকেরা তদপেক্ষা আরো বেশী যে অত্যাচার করিয়াছে কোন পক্ষের বা উভয় পক্ষের ভীষণ শাস্তি দানাই ভবিষ্যতে তদ্রূপ ঘটনা নিবারিত হইবে না। প্রতিকারের বিষয় গত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছি। পুনরুক্তি করিব না। সংক্ষেপে বলি, আমাদের ও ইংরেজদের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ যত অনর্থের মূল। একজাতি প্রভু ও অর্থশোষক, অন্যজাতি দাস ও শোষিত, এ অবস্থা উভয় পক্ষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করে। এক পক্ষ টুঁ শব্দেই আতঙ্কে ভাবে, এই বুঝি দাস মাথা তুলিল, তবে ত আমাদের সর্ব্বনাশ, তবে হয় ত বা আমাদের অনিষ্ট করে; এই ভাবিয়া তাহারা ভীষণতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাসকে পুনর্মূষিকীভূত করিতে চায়। অন্য পক্ষও বহুকালের লাঞ্ছনা ও শোষণজাত সঞ্চিত মনোবিকারের বশে মধ্যে মধ্যে পাশবৎ পিশাচবৎ ব্যবহার করে। অতএব, একমাত্র প্রতিকার, চূড়ান্ত ও চরম প্রতিকার, আমাদের ও ইংরেজদের মধ্যে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক সম্বন্ধের লোপ এবং স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন। ইহা দু রকম আকার ধারণ করিতে পারে। প্রথম, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এখন ইহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দ্বিতীয় আকার, ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত আত্মকর্তৃত্বশালী জাতিদের মত হওয়া। ইহা এখনই সম্ভব, এবং প্রথমতঃ ইহারই চেষ্টা করিতে হইবে। আত্মকর্তৃত্ব বিনা স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় অনেকে প্রাণ লওয়া ও দেওয়া উভয়ের পক্ষপাতী থাকিতে পারেন। আমরা লওয়ার পক্ষপাতী নহি, প্রয়োজন হইলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু যাঁহারা লওয়া দেওয়া উভয়েরই পক্ষপাতী, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায়, গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য দানে বিরত থাকা এবং তজ্জন্য পঞ্জাব অপেক্ষাও ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকা, একমাত্র সম্ভবপর চরম উপায়। কিন্তু এই উপায় ধীরভাবে চিন্তা ও আলোচনার পর, উপযুক্ত সময়ে অবলম্বনীয়; যখন-তখন এই উপায় অবলম্বনের কথা তোলা যাইতে পারে না।

তুরস্কের কথা।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসের এক বক্তৃতায় তুরস্ক সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তুরস্ককে সন্ধির যে সব সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেই প্রতিশ্রুতি ভগ্ন হইয়াছে। মুসলমান দেশের মধ্যে তুরস্ক সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন ছিল। তা ছাড়া তুরস্কের সুল্‌তান মুসলমানদের খলিফা। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের তীর্থগুলি প্রকৃত স্বাধীন মুসলমান

নৃপতি তুরস্কসুলতানের রাজ্যভুক্ত থাকা উচিত। সুতরাং ঐ দেশের লাঞ্ছনা মুসলমানদের প্রাণে বড় বাজিয়াছে।

যে-সব ভারতবাসী ও এশিয়াবাসী মুসলমান নহেন, তাঁহারাও, এশিয়ার বাহিরে এশিয়াসম্ভূত জাতির শক্তির শেষ চিহ্ন লুপ্ত হইতে দেখিয়া, এবং খৃষ্টীয় ইউরোপীয় জাতিদের দোষগুণের বিচার যে নীতি অনুসারে হয়, তুরস্কের বিচার তদনুসারে না হওয়ায়, ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছেন। উপায় কি? শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয় ও তাঁহার সহযোগী ও অনুচরগণ, ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় সংশ্রব ত্যাগ ও সহকারিতা বর্জ্জন করিতে বলেন। ফৌজ্‌দারী কোন আইনের বিধি ভঙ্গ না করিয়া, কাহারও শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি না করিয়া, সশস্ত্র বিদ্রোহ না করিয়া, কোন্ অবস্থায় ও কি কারণে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক ত্যাগ ও আজ্ঞা অমান্য করা চলে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, কোন মানুষ যদি গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ ত্যাগ ও উহার অবাধ্যতার ফল ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকে, এবং যদি সে নিজে কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করে, তাহা হইলে এই পথ অবলম্বন করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার আছে। বর্ত্তমান সময়ে এই উপায় অবলম্বন করা উচিত কি না, সে বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যাইতেছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় রয়্যাল সোসাইটীর সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ওয়ালারের ইহাতে বাধা দিবার ইচ্ছার অভাব এবং চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়াছে। যে-সব জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়ত বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া সমূহের নীরব অনুরাগী সমজ্‌দারই থাকিতেন, তাঁহারা প্রকাশ্য সভাগৃহে মৌখিক এবং সংবাদপত্রে চিঠি-লিখিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যের সত্যমূলকতা ও গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা ভারতের নানা ইংরেজী দৈনিকে বাহির হইয়াছে। বিলাতের প্রধান বৈজ্ঞানিক পত্র নেচ্যরের সম্পাদক গ্রেগরী সাহেব এক সভায় বলিয়াছেন, পদার্থবিজ্ঞানের এক ক্ষেত্রে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার যেমন মূল্যবান্, বিজ্ঞানের অপর এক ক্ষেত্রে বসুমহাশয়ের আবিষ্কারগুলির গুরুত্বও তদ্রূপ। ইহা খুব উচ্চ প্রশংসা। শ্রীমতী এনী বেসাণ্টের নিউইণ্ডিয়ায় বসু মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—

He has carried on a long and weary battle against western bigotry and prejudice, but has at last conquered and is recognised as one of the foremost scientific leaders of the world. We should say "the foremost", because he has opened up a new road ;...

শ্রীমতী বেসাণ্টকে অনেকে কেবল থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর নেত্রী ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারিণী বলিয়াই জানেন। কিন্তু তিনি যৌবনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সী অপেক্ষা কঠিনতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বহু বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আটটি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অনেক ক্লাসে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। অতএব, আচার্য্য বসু বিজ্ঞান-জগতে নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া শ্রীমতী বেসাণ্ট যে তাঁহাকে বর্ত্তমান জগতের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, তাঁহার এই মত হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, অন্ততঃ ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

মন্ত্রীত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ।

আমরা পাঠকদিগকে বাংলার দেশী মন্ত্রী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য কাঁহারা, তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলাম। কোন মুসলমান মত লিখিয়া পাঠান নাই; কিন্তু কয়েকজন অমুসলমান দুজন মুসলমানের নাম লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহা তালিকায় ছাপা হইয়াছে। সম্প্রদায়নির্বিশেষে গুণগ্রাহিতা শুভ লক্ষণ।

দুর্ভিক্ষ।

পুরীতে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, অধিকন্তু তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কটক জেলাতেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। আগামী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাহায্য দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহ, দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান কমিটির কোষাধ্যক্ষ, পুরী, সকলে এই ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করুন। বহুশত লোক অনাহারে মরিয়াছে; এখনও অনেক মৃত্যু হইতেছে।

বঙ্গে সাতক্ষীরা, চাঁদপুর প্রভৃতি মহকুমা হইতে দুর্ভিক্ষের ও অনশনে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অনশনমৃত্যুর প্রমাণ দেওয়া দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেও চলে। কারণ যাহারা অনাহারে মরে, তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রত্যহ অনাহারের বলবৎ প্রমাণ দিয়া আসিয়া এবং পরে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন সাক্ষীকে ডাকিয়া আনিয়া অনাহার সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে না।

যেখানে যেখানে দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তথাকার নেতৃবর্গ, কমিটি করিয়া সাহায্য চাহিলে কিছু সাহায্য মিলিবে। দুর্ভিক্ষ বাস্তবিক সর্ব্বত্রই হইয়াছে; কম আর বেশী এই তফাৎ। ৩রা জুন যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গে মোটা চাল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ছিল মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে, টাকায় সাড়ে ছয় সের; সকলের চেয়ে আক্রা ছিল ফরিদপুরের মাদারীপুরে, টাকায় তিন সের চৌদ্দ ছটাক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দুর্দ্দিন

চিত্রকর শ্রীঅসিতকুমার হালদার

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. Roy & Sons, Calcutta.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩২৭ | ৪র্থ সংখ্যা

লাইব্রেরী

[চন্দননগরে মৃত্যুগোপাল-স্মৃতিমন্দির লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সভাপতির অভিভাষণ]

আমরা যখন এই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই, আমাদের মনে হইল যেন কোন মন্দিরে ঢুকিতেছি। ইহার কারিগরি, সাজসজ্জা, গড়নপেটন অতি সুন্দর হইয়াছে। যিনি এই মন্দিরের নক্সা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বাড়ীটি যেন একখানি ছবি, একেবারে নিখুঁত। ইহা ত মন্দিরই বটে—দেবমন্দির, সরস্বতীর মন্দির। যে মন্দিরে ঢুকিতেই মন প্রফুল্ল হয়, সে মন্দিরে দেবতার সাধনার সিদ্ধিরও লাভ হয়। আর যেখানে ঢুকিতেই মন চটিয়া যায়, সেখানে সিদ্ধি লাভ হয় না। এইজন্য একটি শ্লোক আছে, আমরা এখানে সেটি তুলিয়া ব্যাখ্যা করি:—দুঃখার্দ্ধি চিত্তবিক্ষেপো, বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরস্তথা—দুঃখ হইলেই, মন চটিয়া গেলেই, কোন কাজই ভাল লাগে না। সে মন কোন কাজেই লাগে না—চিত্তের একাগ্রতা হয় না। বিশেষরূপ মনোযোগ না হইলেই কোন কাজেই ফল হয় না। এখানে সে আশঙ্কা নাই। মন্দির দেখিলেই মন ভাল হয়, ঢুকিলে আরও ভাল হয়, সুতরাং এখানে লোকে মন দিয়া পড়িবে এবং পড়ার ফল পাইবে।

সকলেই জানেন যত-রকম দান আছে, তার মধ্যে বিদ্যাদান সকল দানের চেয়ে বড়। সেইজন্য এখন অনেকে স্কুল করিয়া বিদ্যাদান করিতেছেন। সুসভ্য জাতি ভিন্ন এই দানের মাহাত্ম্য লোকে বুঝিতে পারে না। যাহারা সুসভ্য নয়, তাহারা অন্নদান, ভূমিদান, জলদান প্রভৃতিতেই খুসী থাকে। তাহারা বুঝে না যে এক বিদ্যাদান হইলে তাহা হইতেই আর-সব দান আপনা হইতে আসিয়া জুটে। বিদ্যাদান অপেক্ষাও লাইব্রেরী-দান আরও বড়। কেননা লাইব্রেরী বিদ্যার মূল। বিদ্যাকে যদি গাছের সঙ্গে তুলনা কর, লাইব্রেরী তাহার জড়। বিদ্যাকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা কর, লাইব্রেরী তাহার ফোয়ারা, অফুরন্ত জলরাশির আধার। সুতরাং যাঁহারা লাইব্রেরী দান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ দানের উপরও যদি কিছু শ্রেষ্ঠ দান থাকে, তাই করিয়া থাকেন। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয়, সেটি ছেলেদের। লাইব্রেরীতে যে বিদ্যাদান হইয়া থাকে, সেটি ছেলে বুড়া সবারই। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয়, তাহা ছেলেরা কয়েকবৎসর মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু লাইব্রেরীতে যে বিদ্যাদান হয়, তাহা মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিনই মানুষ লইতে পারে। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয়, তাহার সীমা আছে, বাসবিদ্যাই দান হইয়া থাকে। এখানকার দান অসীম, অনন্ত—ইহার সীমাও নাই, অন্তও নাই। পৃথিবীতে যত-কিছু জ্ঞান

আছে, সবই কলমবন্ধী-করা বইএ লেখা। সুতরাং লাইব্রেরীতে যখন সবরকম বইই থাকে, তখন যত-রকম বিদ্যা, যত-রকম জ্ঞান আছে, সবই সেখানে দান হয়। শেঠ-মহাশয়েরা এই লাইব্রেরী দান করিয়া এ অঞ্চলের পরম উপকার করিলেন। আইস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই, তাঁহাদের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি ও গুণগান করি।

যখন লাইব্রেরী-দানের সভায় আমি সভাপতি হইয়াছি, আমি মনে করি লাইব্রেরীর উৎপত্তি স্থিতি সম্বন্ধে এ সময়ে কিছু বলিলে বেলয় হইবে না, বরঞ্চ লয়-মাফিকই হইবার সম্ভাবনা।

লাইব্রেরীর ইতিহাস খুব লম্বা। যখন হইতে মানুষ সভ্য, যখন হইতে মানুষ নিজের মনের ভাব বাহিরে আঁকিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই লাইব্রেরীর উৎপত্তি। আমি এখানে 'আঁকিতে' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি; 'লিখিতে' শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার কারণ লিখিতে গেলেই বর্ণমালার দরকার হয়। বর্ণমালার পূর্ব্বেও মানুষে মনের ভাব ব্যক্ত করিত ছবি আঁকিয়া, জন্তু-জানোয়ার আঁকিয়া, গাছপালা আঁকিয়া। তখন ছাপা ছিল না, কাগজ ছিল না, তালপাতার বা ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার ছিল না। তখন মনের ভাব জানাইবার জন্য ছবি আঁকিত হয় পাথরে, নয় মাটির টালিতে, তাও আবার পোড়ান টালি নয়, রৌদ্রে শুকান। পাথরের টালির একটি লাইব্রেরী মিশরে মাটির অনেক নীচে পাওয়া গিয়াছে। তখন মিশরে পিরামিড্ করা আরম্ভ হইয়াছে কি না সন্দেহ। যাঁহারা বড় বড় পিরামিড করিয়াছেন, তাঁহাদের আগে ত নিশ্চয়ই। তাহাতে পাথরগুলিতে কেবল ছবি আঁকা। ইহার ভিতর একটি লাইব্রেরীতে যত বই ছিল, মন্দিরের দেওয়ালে তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। সুতরাং সেগুলি যে সত্য-সত্যই লাইব্রেরী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। এইসব লাইব্রেরী মন্দিরেই থাকিত, মন্দিরের পুরোহিতেরাই পড়িত, পড়াইত ও যত্ন করিয়া রাখিত। মিশরের এই লাইব্রেরী যীশুর জন্মের প্রায় ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহার পর বরাবরই মিশরে লাইব্রেরী হইতেছিল, পাথুরে বই যে কত হইয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই।

ইংরেজী ১৮৫০ সালে লেয়ার্ড সাহেব নিনিভা নগরে খুঁড়িতে আরম্ভ করেন। তিরিশ ফুট খুঁড়িবার পর তিনি এক প্রকাণ্ড হল পান। সেই হলের সমস্ত মেঝেটাতে একফুট উচা করিয়া পাথরের টালি সাজান ছিল। আর টালিগুলিতে আগাগোড়া তেকোণা অক্ষরে লেখা ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন এটি অসুররাজ (এসিরিয়ার রাজা) সার্ডেনাপোলাসের লাইব্রেরী। ইহাতে অন্ততঃ ২০,০০০ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বই ছিল, কতকগুলি অভিধান ছিল, অনেক মহাকাব্য ছিল, ইতিহাস ছিল, জ্যোতিষের বই ছিল; একজন বড় রাজার লাইব্রেরীতে যাহা কিছু থাকার সবই ছিল। নিনিভাতে এতবড় একটা লাইব্রেরী পাইয়া ইউ-রোপের লোকের বড়ই স্ফূর্ত্তি হয় ও উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তাহারা মেস্‌পটের যেখানে যেখানে ঢিবি দেখে, সেইখানেই খুঁড়ে। আর তাহার ভিতর থেকে কত বাড়ী ঘর মূর্ত্তি, কত লাইব্রেরী বাহির হয়! এইসব দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া সকলের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে যীশুর জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মেস্‌পটে সুমের ও আকাদ নামে দুইটি জা বাস করিত। সুমেরেরা দাড়ি কামাইত, আকাদেরা কামাইত না। সুমেরেরা সকলের আগে সভ্য হইয়াছিল। তাহারা পাথরের মূর্ত্তি গড়িত, পাথরের বাড়ী তৈয়ারি করিত, দূর-দূরান্তরে বাণিজ্য করিত; লেখাপড়াও করিত। তাহাদের মারিয়া আকাদরা মেস্‌পটের রাজা হয়। সুমেরের সভ্যতা আকাদরা অনেকটা লইয়াছিল। সুতরাং সুমেরের ভাষা তাহাদের শিখিতে হইয়াছিল। ভাষা শিখিতে গেলেই অভিধান চাই। তাই তাহারা সুমের ও আকাদ—দুই ভাষারই অভিধান করিয়াছিল। সে অভিধানও এই লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। একখানি মহাকাব্যও এই-সকল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়, তাহার নাম "ইস্তার ও ইস্‌দুবাল।" এই মহাকাব্যের ইংরেজী করা হয় ও তাহা আমার হাতে একবার পড়িয়াছিল, আমি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া দুই-এক পাতা পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু দুই-এক পাতা পড়িয়াই আমি আর সে বইখানিকে ছাড়িতে পারি নাই। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহা পড়িয়া-

ছিলাম। আশ্চর্য্যের কথা এই যে যত প্রাচীন মহাকাব্য আছে, সে-সকলই অত্যন্ত লম্বা; রামায়ণ বল, মহাভারত বল, ইলিয়ড্ বল, ওডেসি বল, সবই লম্বা। কিন্তু ইস্তার ও ইস্দুবাল একালের মহাকাব্যের মত—রঘুবংশের মত, মিল্টনের মত, মেঘনাদবধ কাব্যের মত—বেশ সর্গবদ্ধে লেখা। ইহারও বীজ-বিন্দু-পতাকা সব আছে, বর্ণনাও সবই খুব উজ্জ্বল। ইহাতে স্বর্গের বর্ণনা আছে, নরকের বর্ণনা আছে, সমুদ্রের বর্ণনা আছে, পর্ব্বতের বর্ণনা আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আছে, কেল্লা আছে।—একটা অদ্ভুত জিনিস।

যবন বা গ্রীস্ দেশে অনেক বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। আলেক্‌জেণ্ডারের গুরু এরিস্‌টট্‌লের এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। তিনি তাহা ছাত্রকে দিয়া যান। এথেন্সে ইউক্লিডের এক লাইব্রেরী ছিল। পিসিস্‌ট্রেটসেরও লাইব্রেরী ছিল। কিন্তু আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরী পৃথিবীর সব লাইব্রেরীকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সেনাপতি টলেমি মিশর দেশ দখল করিয়া লন্। এই টলেমিরাই আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরী স্থাপন করেন। তখন 'টেপিরাস' বলিয়া এক গাছের ছালে লেখা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ণমালাও চলিয়া গিয়াছে। টলেমিরা সবদেশের বই সংগ্রহ করিতেন; মিশরের বইও তাঁহারা সংগ্রহ করিতেন, হিব্রুদের বইও সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত দেখিয়া লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। কেহ কেহ বলেন সেখানে ৪ লক্ষ পুস্তক ছিল, কেহ বলেন সেখানে ৭ লক্ষ পুস্তক ছিল। অনেকে মনে করেন খলিফা ওমর যখন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া দখল করেন, তখন লাইব্রেরীটি পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, খলিফা ওমরের অনেক আগে নানারূপ গোলযোগে লাইব্রেরী নষ্ট হইয়া যায়। গোলযোগ যে কিরূপ তাহার একটা উদাহরণ দিই। এই লাইব্রেরীর দুইটি ভাগ ছিল, একটি সমুদ্রের খুব কাছে ছিল এবং সেইটিই বড়। জুলিয়াস সিজর যখন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার নৌকার বহর-গুলিতে আগুন লাগাইয়া দেন, তখন সেই আগুনে ঐ বড় লাইব্রেরীটি পুড়িয়া যায়। সিজরের পর তাঁহার পরম বন্ধু এণ্টনি এই ক্ষতি পূরণের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েন। তিনি করেন কি—পার্গামস নামে এক জায়গায় এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, সেইটি আনিয়া ক্লিওপেট্রাকে দান করেন ক্লিওপেট্রা ঐ বড় লাইব্রেরীতে পার্গামসের বইগুলি রাখিয়া দেন।

রোমেও বড় বড় লাইব্রেরী ছিল যে-সকল লাইব্রেরী সর্ব্বসাধারণের হাতে থাকিত, সবলোই সেখানে গিয়া পড়িতে পাইত। আগষ্টস এইরূপ পাব্লিক লাইব্রেরী ব. সাধারণের পাঠাগার সর্ব্ব-প্রথম খুলেন। খ্রীঃ সন ৪ সময়ে রোমনগরে এইরূপ ২৮টি পাব্লিক লাইব্রেরী হয়; ইহ ছাড়া সকল বড় বড় নগরেই লাইব্রেরী ছিল। কন্‌ষ্টা-নোপলে রোমের রাজধানী যখন উঠিয়া যায়, তখন সেখানেও খুব বড় বড় লাইব্রেরী হয়। সেখানকার একটি লাইব্রেরীতে ১ লক্ষেরও বেশী বই ছিল। রোম সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে পোপেরাও বড় বড় লাইব্রেরী করিয়াছিলেন যেখানে বড় monastery বা মঠ বা বিহার থাকিত, বিশপ থাকিতেন, সেখানে খুব বড় লাইব্রেরী হইত। বড় বড় রাজারাও তখন লাইব্রেরী করিতেন। প্রথম প্রথম লোকে লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িত, তারপর বই বাড়ী লইয়া যাইবারও ব্যবস্থা করা হয়।

এ ত গেল 'অন্ধ'যুগের কথা—অর্থাৎ Dark Agesএর কথা। বর্ত্তমান সময়ে লাইব্রেরীর ত সংখ্যা নাই। সকল নগরে বড় বড় পাব্লিক লাইব্রেরী আছে, ইউনিভার্সিটি গুলিতে লাইব্রেরী আছে, রাজার বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে ইহার মধ্যে সম্প্রতি একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী হইয়াছে তাহার কথা আপনাদের সকলেরই জানা আবশ্যক আমেরিকার রাজধানী ওয়াসিংটন নগরে একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে; সেখানে এককোটী বই রাখিবার জায়গা করা হইয়াছে এবং দরকার হইলে জায়গা বাড়াইবারও ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা কোন বইই ছাড়েন না; নূতন বই পাইলেই সংগ্রহ করেন। এখন ইউরোপে লাইব্রেরিয়ান্ হইতে গেলে একটি কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় —কিরূপে আল্‌মারীতে বই সাজাইয়া রাখিতে হয়, কিরূপে লাইব্রেরীর ক্যাটালগ্ করিতে হয়—এইসব লইয়াই একটা science হইয়াছে। শুধু লাইব্রেরিয়ানদের উপকারের জন্য অনেকগুলি মাসিকপত্র আছে এবং অনেকগুলি সোসাইটি আছে।

এইবার আমাদের নিজের দেশের লাইব্রেরীর কথা বলিব। যখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা বেদমাত্র লইয়া থাকিতেন, সেই প্রাচীনকালে আমাদের লাইব্রেরীর দরকার হইত না। ব্রাহ্মণেরা পাঁচবছরের ছেলে বাড়ী হইতে লইয়া গিয়া গুরুগৃহে রাখিয়া দিতেন্। সেখানে তাহারা বেদ মুখস্থ করিতে থাকিত। নয় বৎসর বা ১৮ বৎসর বা ২৭ বৎসর বা ৩৬ বৎসর কেবল বেদ মুখস্থ করিতে হইত। ব্রাহ্মণেরা গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিতেন, তখন এক-একটি লাইব্রেরী হইয়া ফিরিতেন। বেদ কলমবদ্ধী করিবার উপায় ছিল না, করিলে তার ঘোর নরক নিশ্চয়। অল্-বেরুনি বলিয়া গিয়াছেন ইং ৯৫০ সালে কাশ্মীর দেশে সব-প্রথম বেদ কলমবদ্ধী হয়। এখনও বেদের পুথি অতি বিরল। মোক্ষমূলর যতগুলি পুথি দেখিয়া ঋগ্-বেদের বই ছাপাইয়াছেন, কোনখানিই ইং ১৬ শতকের আগের নয়। আমরা তার চেয়েও ঋগ্-বেদের পুরাণ পুথি পাইয়াছি—একখানি ইং ১৩৪২ সালের পাইয়াছি। আর এই আবহমান কাল বেদ মুখে-মুখেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদেরও যেমন, বৌদ্ধদেরও তেমনই। ইং ৪০০ সালে ফাহিয়ান ভারতে আসেন পুথি সংগ্রহের জন্য, কিন্তু কোথায়ও পুথি পান নাই; একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে একজন বলিয়া দিল "এদেশে ও-রকমে পুথি সংগ্রহ হইবে না। বুড়া বুড়া ভিক্ষুদের ধর, আর তাদের মুখ হইতে লিখিয়া লও।" ফাহিয়ান এইরূপ করিয়াই বৌদ্ধদের সমস্ত পুথি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

বেদ ও ধর্ম্মগ্রন্থের কথা যাই হোক, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাই হইত, লাইব্রেরীও ছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই ছোট-খাট একটি লাইব্রেরী রাখিতেন। যাঁহার যত বড় লাইব্রেরী, তিনি তত বড় পণ্ডিত—কেননা "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ।"

বৌদ্ধদেরও বিহারে বিহারে লাইব্রেরী থাকিত, জৈনদেরও উপাশ্রয়ে উপাশ্রয়ে লাইব্রেরী থাকিত, রাজাদেরও লাইব্রেরী থাকিত। মুসলমান বিজয়ের সময় বৌদ্ধদের অনেক বড় বড় লাইব্রেরী নষ্ট হইয়া যায়। ওদন্তপুরী বিহারের লাইব্রেরীটি ত বক্তিয়ার পুড়াইয়া ফেলেন—সে কথা মুসলমানেরই ইতিহাসে সুব্যক্ত। এইরূপে নালন্দ ও বিক্রমশীলের লাইব্রেরীও যায়। বাঙ্গলার প্রধান গৌরব যে জগদ্দল বিহার, তাহারও এই দশা। ভোজ রাজার লাইব্রেরীটিরও বোধ হয় এই দশাই হইয়াছিল। ভাগ্যে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু পুথি লইয়া সে সময় নেপালে ও তিব্বতে পলায়ন করেন। ভাগ্যে ইহার পূর্ব্বেও তুটিয়ারা আসিয়া দশ হাজার বই জগদ্দল বিহার হইতে তর্জ্জমা করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাই আমরা এখন টের পাইতেছি যে বাঙ্গলা দেশ এককালে বৌদ্ধ দেশই ছিল।

বল্লালসেনেরও লাইব্রেরী ছিল। সে সময়কারও ব্রাহ্মণদের লাইব্রেরী ছিল—কারণ তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক কোটেসন পাওয়া যায়। বই না থাকিলে এসব কোটেসন কি করিয়া হয়। সে-সকল লাইব্রেরী কোথায় গেল? বাঙ্গলা বড় খারাপ দেশ। পুথি এ দেশে থাকে না—আগুন আছে, বৃষ্টি আছে, জল আছে, বন্যা আছে, আর সকলের চেয়ে শত্রু আছে উই আর ইঁদুর—আর একটা শত্রু পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। ইহাদের হস্তে অনেক প্রাচীন লাইব্রেরী লোপ হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা যাহা আছে, কিছু কিছু বলি।

নেপালে মুসলমানের উপদ্রব হয় নাই। সেখানকার নিবার রাজারা বহুকাল ধরিয়া পুথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহাদের লাইব্রেরীতে ১৪০০।১৫০০ বৎসরের পুরাণ পুথি পাওয়া যায়। সে দেশে একটু যত্ন করিলে পুথি বহু বহু কাল থাকে। গোর্খা রাজারা নেপাল দখল করিলে নিবার রাজাদের লাইব্রেরী লুট হইয়া যায়। কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গবাহাদুরের সময় হইতে আবার লাইব্রেরী গড়া হইতেছে, তাহাতে প্রায় ১৬ হাজার পুথি আছে। ইহার মধ্যে প্রায় ২০০০ তালপাতার পুথি। সেগুলি প্রায়ই বাঙ্গলা বিহারের পলাতক ভিক্ষুরা লইয়া গিয়াছিল। লাইব্রেরীটি অতি যত্নে রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য মহারাজা বীর সম্‌সের জঙ্গ রাণা একটা ঘণ্টাঘর তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। উপরের গম্বুজে ঘড়ী থাকে। আর একটা প্রকাণ্ড হল ও তাহার চারিদিকে দালান—সমস্ত পুথিতে ঠাসা। ইহাতে ইংরেজী বই অনেক আছে, ১৬০০০ সংস্কৃত পুথি আছে; ভোট দেশের টেঙ্গুর কেঙ্গুর পূরাই আছে—সে

প্রায় দশ হাজার পুথি ; চীনদেশের ত্রিপিটক পুরাই আছে, সেও প্রায় ৩।৪ হাজার পুথি ; অনেক ছবি আছে—নানা রকমের ছবি, বিশেষতঃ তন্ত্রের ছবি। এই ঘণ্টাঘরটি মহারাজের অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহা ছাড়াও নেপালের অনেক বাড়ীতে অনেক রকমের পুথি আছে, তাহার খবর পাওয়া দুষ্কর।

মহারাজ রণজিত সিংহের পুরোহিত মধুসূদন অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার ছেলেদের উত্তরাধিকারীরা কে কোথায় কোন্ বই রাখিয়াছে জানা যায় না।

রাজপুতানার সকল রাজার কেল্লাতেই এক-একটা 'পুথিখানা' আছে। ২০০০ হইতে ৬০০০ পুথি অনেক লাইব্রেরীতে আছে। গুজরাটের জৈনেরা, আলাউদ্দীন দেশ দখল করার পর, পুথি লইয়া বসলমীরে পলাইয়া যায়। সেখানে এখনও সে-সকল পুথি বজায় আছে। শ্রীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে অনেক পুথি আছে। রাজাদেরও অনেক ভাল লাইব্রেরী আছে। তাঞ্জোরের লাইব্রেরী অনেকদিন হইতেই ছিল। ছত্রপতি শিবাজীর পিতা সাহজী ঐ দেশ দখল করিয়া তাঞ্জোর রাজধানী করিলে ঐ লাইব্রেরীর খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়। উহাতে ১৮ হাজারের উপর পুথি আছে।

এইখানে কাশীর একটি প্রাচীন লাইব্রেরীর কথা বলিব। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বড় সন্ন্যাসী গোদাবরীতীর হইতে আসিয়া কাশীতে বসবাস করেন এবং সেইখানে বরুণার ধারে এক লাইব্রেরী করেন। সে লাইব্রেরীতে বাছা বাছা প্রায় তিনহাজার পুথি ছিল। তাহার একটি তালিকা এখনও আছে। সন্ন্যাসীর নাম—সর্ব্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী।

মুসলমান বাদসাহেরা অনেকেই লাইব্রেরী রাখিতেন। ওমরাহেরাও অনেক লাইব্রেরী রাখিতেন। তাঁহারা যে শুধু আরবী ও পারশীরই বই রাখিতেন, এমন নয়, হিন্দুস্থানের বইও অনেক রাখিতেন। মুসলমানেরা লাইব্রেরীতে বসিয়া বই পড়িতে ভাল বাসিতেন। লাইব্রেরীর সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়াই হুমায়ুন দেহত্যাগ করেন।

ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে এখন ত চারিদিকেই লাইব্রেরী হইতেছে। আমাদের বাঙ্গলাদেশে এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী সকলের চেয়ে পুরাণ। লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন সমারোহে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে এক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। সে লাইব্রেরী উঠিয়া গেলে তাহার পুথিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীকে দেওয়া হয়।

লর্ড মেট্‌কাফ ছাপাখানাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া স্বদেশবাসীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সেজন্য সেকালের বাঙ্গালীরা তাঁহারা নাম দিয়া মেট্‌কাফ হল নামে প্রথম পাব্‌লিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। লর্ড কর্জ্জন সেই লাইব্রেরীর মূলে এখন কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক এই লাইব্রেরীতে নিত্য পড়িতে যায়। এবং নানা বিষয়ের আলোচনা করে। নূতন পুস্তক বাহির হইলেই এখানে আনা হয় এবং বিশেষ যত্ন করিয়া রাখা হয়। মেট্‌কাফ হলের দেখাদেখি কলিকাতায়ও বাহিরে অনেক পাবলিক লাইব্রেরী হইয়াছে।

আমরা আজ যে লাইব্রেরী খুলিতে আসিয়াছি, এটির বয়সও বড় কম নয়, পঞ্চাশের অনেক উপরে হইবে। এতদিন অন্যের অগোচরে কিছুমাত্র ঘটাটঙ্কার না করিয়া ইহা চন্দননগরের অনেক উপকার করিয়া আসিতেছে। আজ এই লাইব্রেরীর পুনর্জ্জন্ম বলিলেও বলা যায়। ইহার ঘাতকর্ম্ম করিবার জন্য আজ আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এখনও ইহার অনেক সংস্কার করিতে হইবে। প্রথম সংস্কার লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য স্থির করা। যদি উদ্দেশ্য না স্থির করেন, নানা বিষয়ের নানা বই আনিয়া আপনারা ইহার সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিবেন। কোন দিকেই এক-গ্রতা থাকিবে না। —ক্রমে একটা জগাখিচুড়িও হইয়া উঠিতে পারে—২০০ খানি ইংরেজি নভেল, ৩০ খানি ইতিহাস, ৫০ খানি সংস্কৃত, ৯ তিনেক বাঙ্গলা—এইরূপ পাঁচ মেলের সাহিত্য করিলে হইবে না।

যদি আমার একটা কথা শুনেন—আমি বলি, যাহাতে বাঙ্গলা চেনা যায়, শুদ্ধ এমন-সকল বই আপনারা সংগ্রহ করুন। এতদিন আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের চক্ষু সকল দিকেই আছে, কেবল বাঙ্গলার দিকে নাই। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস যেমন জানি—Wars of the Roses পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে পারি—

এলিজাবেথের ওম্‌রাহদের কীর্ত্তিকাহিনী বেশ করিয়া শিখিয়াছি—প্রাচীন আর্য্যরা পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম কোণে ৪০০০।৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে কি করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করি—আলেক্‌জাণ্ডার কতগুলি লোক লইয়া ভারতে আসেন তাহাও বলিয়া দিতে পারি—হাইদারআলি, টিপুসুলতান, হোসেনগজ, শিবাজী, বীরবুক্ক, রাণাপ্রতাপ আমাদের খুব পরিচিত;—আমরা জানি না কেবল আমাদের এই সোনার বাঙ্গলার কথা। বাঙ্গলার ইতিহাস আমরা পড়ি না, পড়িলেও তাহাতে কিছু পাই না। অথচ এই বাঙ্গলা চিনিবার জন্ম কোন বাঙ্গালীর আগ্রহ নাই। যাঁহারা ইংরেজির বা সংস্কৃতের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বলেন —বাঙ্গলায় শিখিবার বা জানিবার কিছু নাই, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাঁহারা ছাড়া আর সকলেই ত আপনার দেশের কথা জানিবার জন্ম কতই না ব্যগ্র। কিন্তু সে ব্যগ্রতা নিবারণের জন্ম কে কি করিতেছেন? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—কেহই কিছুই করিতেছেন না। সেইজন্ম আমি জিদ্ করিয়া বলিতেছি—আপনাদের এই লাইব্রেরী বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর সেবায় নিযুক্ত হউক। বাঙ্গলায় যেখানে যতটুকু নূতন কথা বা নূতন খবর মিলিবে, সব ভক্তিসহকারে সংগ্রহ করিতে থাকুন। আর আপনাদের লাইব্রেরী হইতে সে কথা চারিদিকে প্রচার হইতে থাকুক। সারা বাঙ্গলাটা এক বড় কথা। এই যে গঙ্গাতীরে পুণ্য-ভূমিতে আমরা বাস করি, যে পুণ্যভূমিতে পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও জার্ম্মান সকলেই আপন আপন বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারের জন্ম ৩০০ বৎসর ধরিয়া কতই না চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইতিহাসই কি আমরা জানি, না জানিতে চেষ্টা করি। অথচ তাহা আমাদের অনায়াসসাধ্য। অন্য দেশ হইলে ইহারই উপর ১০০ বলুম বই লেখা হইয়া যাইত। কিন্তু আমরা এক পাতাও লিখি নাই। আপনাদের লাইব্রেরীর ছয়শ মেম্বর আছেন, একটু চেষ্টা করিলে আমাদের এই কলঙ্ক মোচন করিয়া দিতে পারেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চিরন্তনী

(১)

রাত্রি সাড়ে-দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া করুণারা যখন বাড়ী ঢুকিতে যাইতেছে, তাহাদের পাড়ার আশেপাশের ভাড়াটে বাড়ীগুলি তখন সারি সারি দীর্ঘকায় জীর্ণ কঙ্কালের মত অন্ধকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রাণের কোনো আভাসও দেখা যাইতেছে না। রং-চটা ধূলামাখা সবুজ দরজা-জান্‌লাগুলা বন্ধ; চুন-বালিখসা, ঝুল-কালিমাখা মলিন দেয়ালগুলোর ভিতরে যে কি আছে বোঝা শক্ত; রাত্রের তেলের খরচ বাঁচাইবার জন্ম এরি মধ্যে সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে দুই-একটা বাড়ীর তিনতলা কি চারতলার কোনো একটা নিভৃত কোণ হইতে প্রাণহীনের মিথ্যা হাসির মত কেরো-সিনের বাতির ক্ষীণ কয়েকটি রেখা এই আঁধার রাজ্যের রূপ আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে। তারি সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষাভয়ভীত দুই-চারিজন দরিদ্র বালকের শ্রান্ত গলার সুর কি একটা ব্যথার সুরের মত বাজিয়া উঠিতেছে।

করুণাদের মস্ত বড় পুরানো বাড়ীখানা পাতালপুরীর সমস্ত অন্ধকারের একটা নিস্তব্ধ জমাট স্তূপের মত দেখাইতেছিল। এই নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের নিবিড় চাপে তাহার নিজের পায়ের শব্দ, ভাই-বোনের গলার শব্দ, রণুর দুই-একটা অস্ফুট আনন্দ-উচ্ছ্বাস কেমন যেন খাপছাড়া শুনাইতেছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া রণু হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল, "আজ যা মজাসে খেয়েছি।" করুণার কানে তাহার হাসিটা ঠিক শ্মশানে আনন্দ-সঙ্গীতের মত শোনাইল। মনে হইল অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাঙা বাড়ীর ফাটলগুলো যেন বালকের এই অবিবেচনায় বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল।

দরজার সাম্‌নে আসিয়া করুণা দেখিল ভিতর হইতে দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার কড়া নাড়িয়া ঘুমন্ত বাড়ীটা জাগাইয়া তুলিতে কেমন একটা ভয় আর সঙ্কোচ হইতেছিল; মনে হইতেছিল চোরের মত সে যেন কি একটা নিষিদ্ধ আনন্দ ভোগ করিয়া আসিয়াছে, চোরের মত সকলের অগোচরেই লুকাইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে

পারিলে বাঁচে, বঞ্চিতদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির তিরস্কার তাহার সহিবে না।

জোরে খট্ খট্ করিয়া রণু দরজার কড়া কটা নাড়িয়া দিল। দু মিনিট কাটিয়া গেল, সাড়া নাই। রণু চেঁচাইয়া ডাকিল, "দরজা খুলে দাও।" করুণা চাপা গলায় বলিল, "এই, অত চেঁচাস্ নে।" অরুণা বিরক্ত হইয়া বলিল, "এই অন্ধকারে গলির মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?" রণু দুইহাতে দরজা ঝাঁকাইতে লাগিল। ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়িত ক্ষীণ গলায় উত্তর আসিল, "খুলছি।"

দরজার ভিতর দিকের হুড়্কায় দড়ি বাঁধা থাকে, তারি আর-একটা প্রান্ত বাঁধা থাকে চারতলার বারাণ্ডার লোহার রেলিংএ। বাহির হইতে লোকে ডাকিলে সব তলার লোকেই নীচে না আসিয়া সেই দড়িতে এক টান দিয়া দুরজা খুলিয়া দিতে পারে। ঝড়াৎ করিয়া সশব্দে হুড়্কা খুলিয়া পড়িয়া গেল। ভিতরেও সমস্ত অন্ধকার। রণু কিল, "আলো দেখাও।" এত নিস্তব্ধ বাড়ী যে ফস্ করিয়া দিয়াশলাই জ্বালার শব্দটি পর্য্যন্ত দুতলা হইতে শোনা গেল। বারাণ্ডার রেলিংএর পাশে তারিণীকান্ত লণ্ঠন ঝুলাইয়া ধরিলেন। কতকালের ব্যবহৃত সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির ধাপের মাঝখানগুলি মানুষের পায়ের অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই অসমান সিঁড়ি বাহিয়া তিন ভাই বোনে উপরে উঠিয়া আসিল।

জিনিষে ঠাসা ছোট ঘরখানির সঙ্কীর্ণ চলাচলের পথে পায়ে পায়ে কাপড়ের আঁচল কি কিছু একটা কোথাও বাধিয়া যায়। ঘরে ঢুকিয়াই দরজার কাছের চেয়ারটায় রণু এক ঠোক্কর খাইয়া পড়িয় চেঁচাইয়া উঠিল, "তোমাদের জ্বালায় অস্থির! পথের সাম্নেই চেয়ার রেখে দিয়েছেন যেন ঘরে ঢুকেই আমি উল্টে পড়ি।" করুণা কিছু না বলিয়া চেয়ারটা সরাইয়া দিয়া ভাইকে টানিয়া তুলিল। তারিণীকান্ত এতক্ষণ পরে "এই যে আলো নাও।" বলিয়া লণ্ঠন হাতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

চৌকি চেয়ার টেবিল সবকিছুর উপরে তাহাদের ছাড়া ময়লা ছেঁড়া কাপড় ছড়ানো, বিছানার উপরে একধারে আজকার-দেওয়া ধোপকাপড়ের স্তূপ, আর একধারে রণুর ডালাখোলা বাক্সটা চাপানো। নিমন্ত্রণে যাইবার আগে সে বাক্সটা ঘাঁটিয়া কি একটা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার পর আর যথাযথ ভাবে যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হয় নাই, সব তেমনি লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে। মেঝেতে একপাশে তারের ঢাক্নী চাপা বিকালের বরাদ্দ একপোয়া কাঁচা দুধ চাপা দেওয়া আছে, এখনও জ্বাল দিতে বাকি; আর একদিকে কম্বলের ছোট আসনের সাম্নে তারিণীকান্তের এঁটো থালায় ঠাণ্ডা ভাত তরকারি পড়িয়া আছে। সমস্ত ঘরের মধ্যে চারজন মানুষের ভাল করিয়া চলা ফিরা করিবার স্থানও যেন নাই। এতরাত্রে ঘরে ফিরিয়া বসিয়া পড়িবার মত জায়গাও জিনিষপত্র ঠেলিয়া না লইলে মিলিবে না।

পাঁচ বৎসর এই ঘরেই করুণা দিন কাটাইয়াছে, কিন্তু আজ ঘরে পা দিয়াই তার মনে হইল—এই বদ্ধ সঙ্কীর্ণ খুপ্রীর ভিতর মানুষের একটা দিন কাটে কি করে?

পোষাকী কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া রাখিবার আগেই যেখানকার যা জিনিস সেইখানে তা সব সরাইয়া রাখিয়া দুই বোনে ঘরে একটু জায়গা করিয়া লইল। কাপড় বদ্লাইয়া করুণা মাটির তোলা উনানে কাগজ জ্বালিয়া দুংটা জ্বাল দিয়া লইল, পাছে নষ্ট হইয়া যায়। রণু ঘনঘন ছট্‌ফট করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কেবলি বলিতে লাগিল, "আঃ খালি খালি দেরী করছ দাও না বিছানা করে। কখন ঘুমোব? এমন ঠেসে খেয়েছি যে আর নড়্তে পারছি না।"

অরুণা বলিল, "দেখ্ছিস্, বিছানা করবার জন্যেই জায়গা করছি, তবু না চেঁচালে চলে না? বেশ ছিলাম এতক্ষণ, যেই বাড়ীতে পা দেওয়া, অমনি হাড় জ্বালাতন সুরু হল।"

রণু ঘুমের কথা ভুলিয়া বলিল, "সত্যি, ওই বাড়ীটা যদি আমাদের হত! আঃ কেয়া আরাম আছে, অবিনাশ-বাবু কেন আমাদের কেউ হলেন না? অত টাকা দিয়ে ওঁর কিই বা দরকার? আমাদের থাক্লে কেমন মজা হত, তা না, আমাদের কিচ্ছু নেই। যাই বল ভাই, বড়-দি, ভগবানের কিন্তু একটুও বুদ্ধি নেই।"

করুণা বলিল, "রণু, বোকার মত বক্তে হবে না, ঘুমোও গিয়ে।"

পাতা বিছানা দেখিয়া রণু আর উচ্চবাচ্য না করিয়া

শুইয়া পড়িল। অরুণা তার পরণের বোম্বাই শাড়ীখানা পাট করিতে করিতে বলিল, "আমার পাশে মুরলা দত্ত বলে যে একজন মেয়ে বসে ছিল, তার সাজের যা বাহার কি বল্‌ব? দেখ্‌তে এমন যে কিছু সুন্দরী বলে ত আমার মনে হল না। ওর সবুজশাড়ী আর পাথরবসানো নেক্‌লেস্‌টা পেলে আমাকেও কিছু যে ওর চেয়ে খারাপ দেখাত তা বলা যায় না। তোমাকে পরালে ত কথাই ছিল না। ইচ্ছে কর্‌ছিল, ওর সব কেড়ে নি।"

করুণা বলিল, "কি যে পাগ্‌লামি কর্‌ছিস্? ভারি না চমৎকার শাড়ী, তার উপর আবার অত লোভ।"

অরুণা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "আমি ত তোমার মত স্বর্গের সিঁড়ি পিছ্‌লে পড়িনি, আমার লোভ হয়, হিংসে হয়, সব হয়। এতদিন আমি ননীদির হিংসে কর্‌তুম, কিন্তু আজ যা দেখ্‌লুম ননীদিরা তার কাছে লাগেও না। আচ্ছা সত্যি বল ভাই, অত বড় একটা বাড়ী, অমনি মস্ত পিয়ানো, ঘরভরা জিনিষ, কত সুন্দর সুন্দর সাজগোজ-করা লোকজন, কেমন হাসিগল্প, কাজকর্ম্মের ভাবনা নেই, পড়া মুখস্থ না কর্‌লেও খাবার পর্‌বার ভাব্‌না হয় না, তোমার দেখে শুনে লোভ হয় না?"

করুণা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হয় ত হতেও পারে। তবে কি জানি? অত ভেবে দেখিনি।"

অরুণা বিস্মিত হইয়া বলিল, "লোভ হয় কি না তাও জান না, আবার ভেবে দেখ্‌তে হবে? আমার ত ভাব্‌তে একটুও সময় লাগে না, আমায় যদি কেউ ওই-সব দ্যায়, তা হলে আমি এখ্‌খুনি এই পচা ভাঙা বাড়ীটায় এক লাথি মেরে চলে যাই।"

করুণা বলিল, "ওই-সব পেলেই যে সুখের বান ডাক্‌বে, তোকে কে বল্‌লে?"

অরুণা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "বল্‌বে আবার কে? আমি বল্‌ছি, আমার মনে হয়। যদি নাই সুখ হয়, তখন পরের কথা পরে দেখা যাবে। পেলে কিন্তু আমি ছাড়ি না।"

হাসিয়া করুণা বলিল, "আচ্ছা মীমাংসা ত এখন হয়ে গেল। কালই হয়ত আলাদিনের দৈত্য বাড়ীটা কাঁধে করে নিয়ে আস্‌বে, তখন আর ভেবে দেখ্‌বার দর্‌কার হবে না। এখন আজকের মত বিছানা পেতে ঘুমোনো যাক্।"

অরুণা মেজের বিছানার চাদর ঝাড়িতে ঝাড়িতেও বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা নয়; ওদের বাড়ী দেখে এখন আমাদের বাড়ীতে ওদের বস্‌তে বল্‌তেও আমার লজ্জা কর্‌বে।"

করুণা বলিল, "তবে ওই বাড়ীটা ধার করেই ওদের বসাস্।"

সাড়ে-এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। পাশের ঘর থেকে তারিণীকান্ত ডাকিয়া বলিলেন, "অরু, কাল ইস্কুল আছে। আর রাত কোরো না, এইবার ঘুমোও।"

মৃদুস্বরে "ছাইয়ের ইস্কুল" বলিয়া অরুণা লেপটা টানিয়া নাক মুখ পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত বাড়িয়া চলিল, করুণার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না; যে অরুণা এতক্ষণ নিজের অবস্থায় এত অতৃপ্তি জানাইতেছিল, সে ত শান্ত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যে আজকার ঐশ্বর্য্যের মেলাটাকে আমল দিবে না এমন ভাব দেখাইতেছিল, তারই চোখে কেন ঘুম নাই? করুণার শান্ত জীবনযাত্রার পথে দুঃখ-কষ্টের অনেক বেদনাময় ইতিহাস ছিল, কিন্তু ছিল না উত্তেজনা। তাই অকস্মাৎ এই নূতন পথের বাঁকে আসিয়া-পড়িয়া সে সেটাকে ঠিক সহজ ভাবেই পাশে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কেবলি তার মনে হইতেছিল, কেন এই নূতন মানুষটি এই কদিন ধরিয়া তাহার প্রতি এত টান দেখাইতেছে, কেন সে তাহার ইন্দ্রপুরীর দরজা এই দরিদ্রার চোখের সাম্‌নে খুলিয়া ধরিল, কেনই বা এতলোকের চোখ তাহাকে দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল? করুণা ভাবিল, এই যে আদর যত্ন, এ যদি পুরাণো বন্ধুত্বের একটা ভদ্র বিনীত প্রতিদান মাত্র হয়, তবে তাহার কি এসব লইয়া এত মাথা ঘামানো ভাল? আর বাড়ীর আর বাইরের যেসব মানুষ একটা অত্যুগ্র কৌতূহল লইয়া তাহাকে এরি মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহারা কি সে কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবে না? করুণার ভয় হইল, কালই বোধ হয় ঘরে ঘরে তাহাকে লইয়া একটা কানাকানি সুরু হইয়া যাইবে, যাতে তাহার মনেও অনুক্ষণ একটা ভিত্তিহীন উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিবে।

কিন্তু তখনি আবার তাহার মনে হইল, এই আদর-যত্নের মধ্যে কি পুরানো বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো ছাড়া আর কিছুই নাই? আছে, আছে বোধ হয়,—নাই মনে করিতে করুণার মনের কোণে একটু ব্যথা লাগিতেছিল। তবু করুণা জোর করিয়া ভাবিল, না আর কিছু নাই। সে এ চিন্তাটা মন থেকে তাড়াইবার জন্য চোখ দুটা শক্ত করিয়া বুজিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। ঘুম কিন্তু আসিল না। বড়লোকের বাড়ীর চোখ-ঝলসানো, উৎসবের রূপ দেখিয়া আসিয়া সেখানকার উন্মত্তের মত আনন্দ-কোলাহলে যোগ দিয়া, তাহার মাথার ভিতরটায় এখন যেন কিসের একটা স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। তাদের ভাঙা-ঘরের দারিদ্র্যের নগ্ন কঠিন মূর্ত্তি, সেখানকার যত বেদনা দীর্ঘশ্বাস, যেন ধনীর প্রাসাদের উজ্জ্বল আনন্দ আর হাসিগানের সঙ্গে পাশাপাশি দুই সারি ছবির মত তাহার চোখের সাম্নে দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল।

যে কথাগুলি তাহার ভাই বোনের মুখে শুনিয়া সে তাদের থামাইয়া দিয়াছিল, সেই কথাগুলিই তাহার মনে ধ্বনিত হইতেছিল, "নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু জীবনভরা দুঃখ আর হতাশা!" সমস্ত সম্পদের রূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল অবিনাশের দৃপ্ত মূর্ত্তি আর তাহার ঐ আলোক-উজ্জ্বল লাল বাড়ীখানা। অবিনাশের পাশে ঘুরিতেছিল মুরলীর সেই সুসজ্জিত মূর্ত্তি, যেটাকে কেন জানি না করুণা স্মরণ করিয়া খুসী হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

মুরলাকে মনে করিতেই মনে পড়িল বিজলীর কথা। করুণা ভাবিল কেন সে মুরলাকে অমন কথা বলিল? মুরলার স্বার্থের সঙ্গে করুণার স্বার্থের কি সম্পর্ক? উত্তরটা মাথায় পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিল না। করুণা ভাবিয়া-দেখিতে চেষ্টা করিল, অবিনাশকে কি বিজলী তাদের দুজনের স্বার্থের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছে? যদি তাই ভাবিয়া থাকে, তবে সেটা কি সত্য? করুণা নিজের মনকে প্রশ্ন করিল, "অবিনাশকে তাহার কেমন লাগে?" অবিনাশের রুক্ষ গলা, হুকুম করার মত কথা বলার ভঙ্গী, অহঙ্কৃত কঠিন মূর্ত্তি, শতদলের প্রতি নির্ম্মমের মত ব্যবহার, আর-সকলকেও তাচ্ছিল্য করিয়া চলা, কিন্তু করুণার প্রতি একটা উগ্র আদরের ভাব, আর তাহার ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল ছবি, সমস্ত কেমন জট পাকাইয়া করুণার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। নিজের প্রশ্নে সে নিজেই নিরুত্তর হইয়া রহিল "ভাল লাগে" বলিতে পারিল না, কিন্তু 'মন্দ লাগে'ই বা বলিতে পারিল কই? করুণা নিজেই নিজেকে বুঝাইল, ওসব কথা ভাবিবার তাহার কোনোই দরকার নাই। আরো কতক্ষণ কতকিছু ভাবিতে ভাবিতে করুণা ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াই করুণা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, বড়লোকের মত উত্তেজিত জীবন ভাল নয়, দরিদ্রের জীবনে যে স্নিগ্ধ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব আছে, তাতেই মানুষের জীবন ধীরে ধীরে খাঁটি হইয়া গড়িয়া উঠে, ঐশ্বর্য্যের কৃত্রিম উত্তেজনার উত্তাপে অসময়ে ফোটানো ফুলের মত মানুষের জীবনও তাহার প্রকৃত রূপ না পাইয়া বিকৃত হইয়া যায়; মন মাতাল হইয়া পড়ে, সোজা পথে চলিতে পারে না। অবশ্য দারিদ্র্যের নিষ্পেষণেও মানুষকে বিপথে লইয়া যায়; কিন্তু তাতে সংগ্রাম আছে। ধনীর অতিরিক্ত পাওয়ার দুঃখ, গরীবের না-পাওয়ার দুঃখের চেয়ে বেশী; সেখানে পাওয়ার মূল্য বোঝা শক্ত।

করুণা ভাবিল, নির্ব্বোধের মত পরের ঐশ্বর্য্যের দিকে সে আর লুব্ধ দৃষ্টি দিবে না।

কাজে কর্ম্মে ইস্কুলের তাড়নায় দিনটা যেন কুমোরের চাকার মত পাক খাইতে খাইতে শেষ হইয়া গেল। সকালের শান্ত বিবেচক মন, ক্রমে বিরক্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিল।

অল্প আঁচে ইকমিক কুকারে রান্না চড়াইয়া করুণা বারাণ্ডায় বসিয়া একটা পুরানো ফ্যাসানের জামা কাটিয়া ছাঁটিয়া অরুণার আধুনিক পোষাকের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ শৈলজার গলা শোনা গেল, "ও গো সুন্দরী, সন্ধ্যেবেলা ঘাড় হেঁট করে আর ওটায় সেবা করে কি হবে? দরজায় যে তোমার রাজার দুলালের রথ এসে দাঁড়িয়েছে, মুখ তুলে একবার চাও।"

করুণা মুখ তুলিয়া দেখিল মাথার কাপড় টানিয়া শৈলজা ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়া তিন তলায় পলাইতেছে আর সশব্দে করিয়া জুতার শব্দ করিতে করিতে অবিনাশ দুতলায় উঠিতেছে।

কালকার উৎসব-রজনীর আদর আপ্যায়নের পর আজই এত শীঘ্র আবার অবিনাশকে দেখিবার আশা করুণা মোটেই করে নাই। তবু মুখের হাসিতে মনের বিস্ময়টা ঢাকিয়া সে বলিল, "আসুন, এমন সময় যে আপনার মত কাজের লোকের আজ সময় হল?"

অবিনাশ সে কথার ঠিক উত্তর না দিয়া বলিল, "গাড়ী নিয়ে এসেছি, চল গড়ের মাঠে আজ খুব ভাল বায়োস্কোপ আছে। আমি সকালেই বক্স ভাড়া করে রেখেছি।"

করুণার মনের ভিতর একটা খোঁচা লাগিল। শিষ্টাচারের নিয়ম—একপক্ষ নিমন্ত্রণাদি করিলে আর-একপক্ষকে তাহার প্রতিদান দিতে হয়। কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে আর্থিক পার্থক্য তাহাদের এতই বেশী, যে এই-রকম করিলে তাহাদের ঋণের বোঝাই কেবল ভারী হইবে, শোধের আর কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে না। করুণার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল, অবিনাশের কি এমনি অবুঝের মত তাদের ঋণী করা উচিত? কিন্তু এখন ত তাকে ফিরানোও শক্ত। যদি সে বলিত, "বেড়াতে যাবে কি না?" যদি তাহার কথার সুরে করুণার উত্তরের কি মতের একটা প্রতীক্ষা থাকিত, তাহা হইলে বিনীত প্রত্যাখ্যান করা চলিত; কিন্তু অবিনাশ কথা বলে এমন ভাবে যেন তাহার নিজের মতামত আর ইচ্ছা-অনিচ্ছারই কেবল মূল্য আছে, যাদের লইয়া ব্যাপার তাদের কোনো কথাই বলিবার নাই; এমন জায়গায় করুণা কি বলে? তবু সে বলিল, "কই আপনি ত আগে একবার জিগ্‌গেসও করেননি? চট্ করে কতগুলো টাকা নষ্ট করে বস্‌লেন!"

অবিনাশ বলিল, "এর মধ্যে আগে বল্‌বার কি আছে? গাড়ীতে উঠ্‌বে, তারপর সেখানে নেমে দেখে আবার ফিরে আস্‌বে, চুকে গেল। আর টাকা ত নষ্ট কর্‌বার জন্যেই রোজ্‌গার করি।"

করুণা বলিল, "নিজের টাকা নিজের জন্যে আপনি নষ্ট কর্‌তে পারেন, পরের জন্যে কেন কর্‌বেন?"

অবিনাশ বলিল, "পরের জন্যে করে যদি আমার সুখ হয়, তবেই ত নিজের জন্যে হল।"

করুণা বলিতে যাইতেছিল, "পর আপনার টাকা শুধু-শুধু নেবে কেন?" কিন্তু ভাবিল কথাটা বড় কঠোর শুনাইবে, তাই বলা হইল না। অবিনাশের কাছে তাহাকে হার মানিতে হইল। অবিনাশের গলা শুনিয়া অরুণা নামিয়া আসিয়াছিল। তর্ক শুনিয়া সে বলিল, "টাকা যখন নষ্ট হয়েই গেছে, তখন আর আপ্‌শোষ করে কি লাভ? বরং তা থেকে যেটুকু উপকার পাওয়া যায়, আদায় করে-নেওয়া ভাল। দিদি, দেখেই এস।"

করুণা বলিল, "গেলে যেন আমি একলা যাব আর কি? অত আমার সখে ধরেনি।"

অরুণা বলিল, "অবিনাশ-বাবু ত আমাকে ডাকেননি।"

অবিনাশের এতক্ষণে নিজের ত্রুটিটা মনে পড়িল। সে সংক্ষেপে বলিল; "হাঁ, তুমিও চল।"

অরুণা বলিল, "আর শতদল-দি?"

অবিনাশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শতদলের বোধ হয় আজ একাদশী; সে যেতে পার্‌বে না।"

করুণা বলিল, "তবে কেন আজ ঠিক কর্‌লেন?"

অবিনাশ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "অত কি মনে থাকে?"

বায়োস্কোপ দেখা হইয়া গেল।

পরদিনও সন্ধ্যায় অবিনাশ আসিয়া হাজির। করুণা বলিল, "আজ আবার কি ব্যাপার?"

অবিনাশ বলিল, "টাকা নষ্ট করাতে তোমার আপত্তি, চল আজ গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে।"

করুণা বলিল, "টাকা নষ্টর বদলে বুঝি সময় নষ্ট কর্‌তে হবে?"

অবিনাশ বলিল, "কতগুলো মড়া বেঁটে বেড়ানোর চেয়ে এতে সময়ের সদ্ব্যবহার হয় বলেই আমার বিশ্বাস। অন্ততঃ আনন্দ পাই বেশী। তোমার কি বেড়াতে যেতে ভাল লাগে না?"

করুণা বলিল, "ভাল লাগে না, বল্‌ছি না, তবে—"

অবিনাশ তার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আর 'তবে'র দর্‌কার নেই, তোমার ভাল লাগে, আমারও ভাল লাগে; এর মধ্যে 'না' বল্‌বার ফাঁক নেই। এইবার চট্‌পট্ কাজ কর্ম্ম সেরে গাড়ীতে উঠে পড়।"

সেদিনও শতদলের খবর লইতে গিয়া শোনা গেল, তাহার আজ একটু জ্বর হইয়াছে, সে যাইতে পারিবে না।

বাড়ীর লোকের জ্বর ফেলিয়া বেড়াইতে যাওয়াতেও করুণার বিশেষ আপত্তি ছিল। অবিনাশ বলিল, "ওর অমন একটু আধটু জ্বর হয়। আর না হলেও সে কোনো দিন বেড়াতে যেতে চায় না।"

করুণা বলিল, "আপনি যেতে বলেন না ত চাইবে কি?"

অবিনাশ বলিল, "তোমাকে ত বলছি, তুমি চল না!"

করুণা সেদিন নড়িল না। সে শতদলকে দেখিতে চলিয়া গেল। অবিনাশ পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের হাঁড়ি-কুঁড়ির প্রতি একাগ্র প্রেম সম্বন্ধে একটা লম্বা বক্তৃতা করিয়া অন্যমনে রোগী দেখিতে চলিয়া গেল।

শতদলের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক গল্প করিয়া করুণা বাড়ী ফিরিতেই কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া শৈলজা হাত নাড়িয়া গান ধরিল,

"সেজন কে, সখি, বোঝা গেছে,
আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে।"

(৮)

পাড়াপড়শীর তীক্ষ্ণ নজরের হুল আর বয়স্কাদের বাক্য-বাণ তাহাকে বিঁধিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া করুণা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিজের মনের নূতন প্রশ্নের উত্তর সে পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিতেছিল না, অথচ বাহিরে তাহার মনের সেই প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা যে হাট-বাজারের পণ্যের মত ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ফিরিবে এবং কৃত্রিম উপায়ে তাহার মনকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইবে এ চিন্তা করুণার অসহ্য। মানুষের মুখে চাপা দিবার দুটি উপায় আছে, হয় একেবারে ঘর সংসার পাতাইয়া বসা, নয় সে বিষয়ের তিলমাত্র সন্দেহের ভিত্তি লোপ করা। করুণা দুইটার একটাও খুব সহজসাধ্য মনে করিল না। সোজা-সুজি তারিণীকান্তের পরামর্শ এবিষয়ে নেওয়া চলে না। তবু চেষ্টার ত্রুটি না করিয়া করুণা একদিন তাঁহাকে বলিল, "দাদামশায়, অবিনাশবাবু আজকাল আমাদের প্রায়ই বিকালে বেড়াতে নিয়ে যেতে চান। তুমি বাড়ী থাক না, তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় না।"

তারিণীকান্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "বেশ ত, ইস্কুল থেকে এসেই বাড়ীতে বন্ধ হও। বিকেলে বেড়ানো স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী।"

করুণার আর কোনো কথার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি চশমাজোড়া কানে গুঁজিয়া হেগেলের দর্শন বই পিছন ফিরিয়া পড়িতে বসিলেন।

সেদিন শতদলকে দেখিতে গিয়া করুণা শুনিয়াছিল অবিনাশের সঙ্গে শতদলের সচরাচর দিনে দুইবার মাত্র দেখা হয়। একবার দুপুরে খাইবার সময়, আর-একবার রাত্রে বিকালের জলখাবারটা সে তাহার বাহিরের বসিবার ঘরে চাকর বাকরের সাহায্যেই সারিয়া লয়; সেদিকে শতদলের বিশেষ গতিবিধি নাই। সুতরাং অবিনাশ যে কখন কোথায় কাহাকে লইয়া বেড়াইতে যায়, সে খবরও শতদলের পাওয়া একটু শক্ত।

বাড়ী আসিয়াই আজও করুণার মনে হইল, নিশ্চয় খানিক পরেই অবিনাশ গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে। গাড়ীর বাঁশীর শব্দে পাড়া সচকিত করিয়া এবং গলার স্বরে বাড়ীর আনাচে কানাচে খবর দিয়া অবিনাশ যে দিগ্বিজয়ী বীরের মত প্রতিদিন করুণার মন হরণ করিতে আসিত, সেটা পাড়ার লোকের কাছে করুণার গর্ব্বের রূপ ধরিয়াই দেখা দিত। তাহারা ইতিমধ্যেই করুণাকে জানিতে দিয়াছিল যে বড়লোককে ফাঁদে ফেলিতে পারিয়াছে বলিয়াই ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে সেটা অমন করিয়া জাহির করিয়া বেড়ানো শোভন ও সুরুচিসঙ্গত নয়।

অবিনাশের নিত্য আগমনের আড়ালে যে কি উদ্দেশ্য আছে, সেটা পাড়ার লোক বলিয়া দিলেও করুণা এখনও সেটা জানে বলিয়া নিজের কাছে স্বীকার করিত না। তাই দশজনের মুখের কথার প্রেতকে একটু নিরাশ দিবার এবং নিজের মনকে শান্ত হইয়া ভাবিতে একটু অবসর দিবার ইচ্ছায় করুণা অবিনাশকে আজ কোনো রকমে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টায় ছিল। তাছাড়া আর-একটা লজ্জার বেদনাও তাহাকে ঘা দিয়া দমাইতে চাহিতেছিল অবিনাশ যদি সত্যই তাহারই জন্য আসে, তবে কেন সে তাহার আসা-যাওয়াকে একটা নম্র আবরণে ঢাকা দিতে পারে না, যাতে করুণার চোখের চেয়েও বাইরের দশজনের চোখে সেটা অত বড় হইয়া না উঠে?

নিজের বাড়ীর অন্তঃপুরে যে মেয়েটি দিবারাত্রি পড়িয়া আছে, পৃথিবীর মধ্যে তাহার সম্বন্ধেই অবিনাশকে সবচেয়ে উদাসীন বলিয়া বোধ হইত; তাই করুণা ঠিক করিল আজ তাহারই বাড়ীতে লুকাইয়া সে অবিনাশকে ফাঁকি দিবে। প্রদীপের কোলের অন্ধকার প্রদীপের চোখে ধরা পড়িবে না। কোথায় যে যাইতেছে, একথাটা কাহাকেও না বলিয়া "একটু বেড়িয়ে আসি" বলিয়া করুণা বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অতবড় বাড়ীর অত চটকদার আস্‌বাবে সাজানো সুন্দর সুন্দর ঘর ছাড়িয়া একেবারে বাড়ীর শেষ টেরে ছোট একখানি ঘরে শতদল স্থান লইয়াছিল। বাড়ীর বড় বড় সব কাম্‌রাগুলিতেই মার্ব্বেল-পাথরের মেজে, কিন্তু যে ঘরখানি সিমেণ্ট-করা। ঘরে বিজলীর বাতির অভাব নাই, কিন্তু সেটার ব্যবহার কোনো দিন হয় বলিয়া মনে হয় না। ছোট তক্তাপোষের পাশে পিতলের পিল্‌সুজ, প্রদীপ আর পরিষ্কার কাপড়ের একগোছা সলিতা সাজানো; দেখিলে মনে হয় নিত্য-কর্ম্মে এরাই বেশী সাহায্য করে। ঘরের জানালা দিয়া রান্নাঘরের উঠান, বাঁশের মাচার উপর একটা সযত্নে পালিত কুম্‌ড়ো-লতা, বিলাতী টবে একটা তুলসী-গাছ, আর ছাইগাদার পাশে গোটা-কয়েক গাঁদাফুল আর আধমরা রজনীগন্ধার গাছ দেখা যায়। রান্নাঘরের পিছনে পাশের বাড়ীর একটা বেলগাছ আর দুটা সুপুরি-গাছের মাথা শীতের বাতাসে সর্ সর্ করিয়া দুলিয়া ঘরের অধিকারিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

করুণা যখন শতদলের সেই নিভৃত নিকেতনে গিয়া পৌঁছিল, তখন সে মেঝেয় মাদুর পাতিয়া একটা গানের বই উল্টাইতেছিল। করুণাকে দেখিয়াই বইখানা লুকাইয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

ঘরে ঢুকিয়াই করুণা বলিল, "আচ্ছা, বাড়ীতে অমন সব সুন্দর সুন্দর ঘর থাকতে, অমন বাহারে বাগান থাকতে, এই-রান্নাঘরের পাশে কি এত খাবার আশায় কুম্‌ড়োলতার সাথী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন?"

শতদল মৃদু হাসিয়া বলিল, "সত্যি ভাই, খাবার লোভেই বটে! আমার মত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ও-সবের মধ্যে মনের কোনো খোরাক পায় না। তাই এই কোণে যতটা পারি নিজের মনের মত ঘর বেঁধে নিয়েছি। অত বেশীর মধ্যে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, একটু ফাঁক তাই করে নিতে হয়েছে।"

করুণা বলিল, "আমরা ভাই, আবর্জ্জনার গাদার মধ্যে মানুষ হয়েছি, তাই ভেবেছিলাম আবর্জ্জনার বদলে সোনার গাদা হলেই বুঝি মন ভরে; কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে মনে হল বোঝা যারই হোক্ কম হওয়াই ভাল।"

শতদল হঠাৎ কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা, ছোট মামার মুখের কথাটি তুমি কোথায় পেলে ভাই?" তার পরেই জিভ কাটিয়া বলিল, "তুমি বলে ফেলেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না, ছোট মামার কথা উঠ্‌লে আমি সব ভুলে যাই।"

বড় মামার সঙ্গে শতদলের যে-রকম সম্পর্কের আভাস পাওয়া গিয়াছিল, তাতে যে আদব কায়দা ভুলাইয়া দিতে পারে এমন ছোট মামার অস্তিত্ব সম্বন্ধে করুণার কেমন খট্‌কা লাগিতেছিল। সে বলিল, "তুমি যখন মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তখন আমাদের নূতন বন্ধুত্বের সূত্রপাত স্বরূপ সেইটাই না হয় বজায় থাক্। আপনির বোঝাটাও নামিয়ে ফেলা ভাল।" কিন্তু যে কথাটা জানিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল সেইটাই সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বড় মামা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়াই তাহার যা অবস্থা, আবার ছোট সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাইতে সাহস হইতেছিল না।

শতদল বলিল, "তাই ভাল। কিন্তু একতরফা হলে চল্‌বে না। আজ বেশ সময়ে ভাই তোমাকে পেয়েছি, ছোট মামার চিঠি পড়ে কেবলি সেই হাল্কা হওয়ার দেশের জন্যে মন যেমন কর্‌ছে, এমন সময় একটা মানুষের মনের দেখা পেয়ে মনটাকে খানিকটা জুড়িয়ে নেওয়া যায়।"

করুণা কেবল বলিল, "সত্যি, মানুষ না হলে মানুষের চলে না।"

শতদলের গানের বইখানার উপরে একখানা চিঠি এতক্ষণ হওয়ায় ফট্ ফট্ শব্দ করিতেছিল, হঠাৎ এক ঝট্‌কায় সেটা তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। শতদল চিঠিখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এই শোন, এইখানটা ঠিক তোমার কথার মত শোনাচ্ছে—

— অনেককাল পরে একটা নিস্তব্ধ নিরালা জায়গায় এসে মনে হচ্ছে, ছেলেবেলাকার আমাদের সেই জীবনটা যেন ফিরে পেয়েছি। এখানের আবহাওয়া সমস্তক্ষণ মনের উপর একটা বোঝা চাপিয়ে দিতে আসে না, তাই মনে হয় যেসব বোঝা কোলাহলের দেশে কুড়িয়েছিলাম, তাও আজ কোথায় নামিয়ে হাল্কা হয়ে এসেছি। ভাল মন্দ কিছুর ভারই এখানে নেই; মন্দ নেই সে ত ভালই, কিন্তু ভাল যে নেই তাতেও ক্ষতি নেই,—বোঝা যে নেই এই যথেষ্ট। বোঝা হয়ে যা থাকে, তা ভাল হয়েও দুঃখ দ্যায়, মন্দ হয়েও তায়।

শতদল চিঠি পড়া শেষ করিয়া করুণার মুখের দিকে চাহিল। করুণা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার ছোট মামা দেখছি খুব ভাবুক। দুজনে দুরকম হওয়াই ভাল।"

শতদল বলিল, "সত্যি আমার বড়মামা আর ছোটমামা দুই ভাই কে বলবে? একেবারে উল্টো।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, শতদল দিয়াশলাই আনিয়া ঘরের কোণের রেড়ীর তেলের প্রদীপটি জ্বালাইয়া দিল। তাহার রকম দেখিয়া করুণা বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওমা, একি ভাই? আকাশের বিদ্যুৎ ঘরে বাঁধা রয়েছে, রেড়ীর তেলের আলো আবার কেন? অতিথির সঙ্গে মানিয়ে আলো জ্বাললে নাকি?"

শতদল বলিল, "ছিঃ, কি যে বল তার ঠিক নেই! মানানো আবার কি? অতিথি দেবতা, বিদ্যুতের আলোও তার কাছে তুচ্ছ। আমি নিজে যেমন, আমার তেমনি আলো। এই আলোটি জ্বাললে আমার মায়ের ঘরের আলো পাঁচ বছরের অন্ধকার কাটিয়ে আমার ঘরে এসে পড়ে। যতদিন সে ঘরে ছিলাম, নিজের হাতে রোজ এই আলোটি এমনি সময় জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দিতাম। আর ছোট মামা শাঁক বাজিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে দিত। আজও যখন আলো জ্বালি, তখন সেইসব খোড়ো ঘর আমার চোখের সামনে হেসে ওঠে, সেখানকার শাঁকের শব্দ, ভাই-বোনের হাসি কানে এসে বাজে।—পাগলের মত খানিকটা বকলাম কিছু মনে কোরো না ভাই; তোমাকে কেমন আপনার মনে হচ্ছে তাই যেসব কথা কখনও বলি না তাই আজ বলে ফেললাম।"

করুণা তাহার হাত ধরিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল। কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। কথা কিছু বলা উচিত, তাই কতক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তোমাদের দেশ কেমন বল না ভাই। আমি কখনো কলকাতার বাইরে পা দিইনি। সত্যি, বাংলা দেশ কেমন আমার ভারি জানতে ইচ্ছা করে।"

দেশের কথা শতদলের প্রাণের কথা। স্মৃতিতে তাহার হাওয়া ভাসিয়া আসিয়াই যেন তাহার বিরহী প্রাণ সরস করিয়া তুলিল। সব কথা এই নূতন বন্ধুটিকে বলিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল, কিন্তু প্রাণ আলো করিয়া যা থাকে কথার ফাঁকে ফাঁকে তাহার ছটা ধরা পড়িবেই

শীতের সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া আসিল। করুণার বাড়ী ফিরিবার সময় কখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তবু সে বসিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিল। সেই তাহাদের ছায়া-শীতল গ্রাম, পুকুর-ঘাটের গোপালের মন্দির, ধূলোয় ঢাকা নির্জন রাঙা পথ, শত বৎসরের পুরোনো ধ্বংসস্তূপে ভরা আমবাগান, ভোরের পাখীর গান আর চিরপরিচিত বৈরাগীর আনন্দ-লহরীর কীর্তন, সেই তাহার চিরবধূরূপিণী জননীর নীরব অক্লান্ত সেবা, সেই তাহার স্নেহ-কোমল খেলার সাথী ছোট মামা, তাহার অকালে-হারানো আদরের ভাইটি, তারপর তাহার অচেনা স্বামীর নূতন সংসারের সুখ-দুঃখের অল্প আমেজ, এই-সব নানা ছবি শতদলের ভালবাসার আলোয় আরো সুন্দর হইয়া করুণার কাছে দেখা দিতেছিল। শত-দলের ঢাকা-দিবার চেষ্টাকে বিফল করিয়া তিনটি মানুষ তাহার এই স্মৃতির ছবিগুলি সজীব করিয়া তুলিতেছিল— তাহার মা, তাহার ছোট মামা, আর তাহার স্বামী। দুটিকে চিরবিদায় দিয়াছে, একজন এখনও শ্মশানের প্রদীপের মত জ্বলিয়া আছে। করুণা বুঝিল সংসারে এই মানুষটিই কেবল তাহার সুখ-দুঃখের সাথী, এরি হাতের আদর দুখ-ভুবার-ক্লিষ্ট শতদলকে এখনও ঝরিয়া মরিতে দেয় নাই, এরি গুণে তাহার অন্তরের সৌরভ এমন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

করুণা নূতন সখীর নূতন রকম গল্পের মায়াজাল কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের কল্পনায় রঙীন হইয়া দরিদ্র গৃহস্থের ঘর দ্বার, পুকুর ঘাট, তুলসীতলা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। গলির ভিতর ধোঁয়ায় কালো, দুর্গন্ধে আকুল, শতকণ্ঠের কোলাহলে মুখর, জীর্ণ ইটের

চোঙার মত কুদৃশ্য বাড়ী ছাড়া দরিদ্রের যে আর ঠাঁই আছে তা করুণা কোনো দিন দেখে নাই। শুনিয়াছে; কিন্তু এমন প্রাণের সুরে মিশাইয়া শুনে নাই। সেই মাটির ঘরের কোলে, আমবাগান আর বাঁশ-ঝোপের পাশের রাঙা পথে ধূলা মাখিয়া যারা মানুষ হইয়াছে, তাহাদের একটিকে দেখিয়াই করুণা মুগ্ধ হইয়াছিল, আর-একটির শুধু মানসী ছবি দেখিল। সে কেমন, একবার নিজের চোখে দেখিবার সাধ হইতেছিল।

মায়া কাটাইতে হইল। শতদল যাইবার সময় তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আবার এসো ভাই। এত অল্প দিনে যে এমন করে আমার পুঁজি লুট করে নেবে তা ভাবিনি। আর-জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার কেউ ছিলে।"

করুণা বলিল, "হ্যাঁ আস্‌ব বৈকি। কিন্তু তুমিও যেও। তুমি আমার অজানা দেশের বন্ধু।"

অজানা দেশের কথায় মন সরস করিয়া করুণা আজ রাত্রে বেশ খুসী আর তাজা মনেই বাড়ী ফিরিল। বুকে বালিশ দিয়া মেঝেয় পড়িয়া অরুণা তখন ইতিহাস পড়িতে ব্যস্ত। করুণা আসিতেই লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা মেয়ে যা হোক্! কোথায় যে যাও একটু বলে যেতে নেই? আমার যেন যত দায়! ওঁর জন্যে অবিনাশ-বাবু আমায় অস্থির করে তুলেছিল। সাত বাড়ী ছুটে কোথাও তোমার খোঁজ পেলাম না। শেষে ভদ্রলোক হাঁড়িমুখ করে চলে গেল। কোন্ রাজ্যে উধাও হয়ে গিয়েছিলে?"

করুণা বোনের কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "শৈলজারা অবিনাশ-বাবুকে দেখেছিল? কিছু বল্‌লে না?"

অরুণা বলিল, "দেখ্‌বে না কেন? অবিনাশ-বাবু ত আর চোর নয়? শৈলজাদিদেরও চোখ কাণা নয়। তুমি কোথায় গিয়েছিলে তাই বল না।"

করুণা বলিল, "আজ বল্‌ব না, কাল বল্‌ব।"

অরুণা অনেকক্ষণ অনেক জেরা করিল, বিস্ময় প্রকাশ করিল, অসম্ভব সব জায়গার নাম বলিল, কিন্তু কোথায় যে করুণা গিয়াছিল, সেটা বাহির করিতে পারিল না। অবিনাশ যাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, সে যে অবিনাশের বাড়ীতেই এতক্ষণ কাটাইয়া আসিয়াছে, এ কল্পনাটা অরুণার মাথায় ঢোকে নাই।

এই কলিকাতা সহরে আজন্ম একটা বিশেষ আবেষ্টনের মধ্যে কাটাইয়া একরকম লোক দেখাই করুণার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সচরাচর যেসব মেয়েদের সঙ্গে তাহার দেখা হইত, পরিচয় ভাল করিয়া হইবার অনেক আগেই তাহারা কি জাতীয় কথা বলিবে, কোন্ জিনিসে আগ্রহ দেখাইবে, তা যেন করুণা বুঝিতে পারিত। কাজেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও তাহাদের মধ্যে বেশী কিছু নূতন রস সে পাইত না। পাইবার মত কিছু বা যাদের মধ্যে থাকিত তাহারা এই সভ্যতার যুগে সহজে পরকে নিজের মনের কথা বিলাইয়া দিতে পারিত না। কিন্তু এই একটি নূতন দেশের নূতন মানুষের পরিচয় করুণা কয়েকদিন হইল পাইতে সুরু করিয়াছে, যাহার নিজের অন্তরের সম্পদের কথা বাদ দিলেও তাহার পল্লীনীড়ের যে আলো বাতাস গানটুকু তাহার চারিধারে জড়াইয়া আছে, তাহাই করুণাকে ক্ষণে ক্ষণে তাহার সদলাভের জন্য লুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। তা ছাড়া সভ্যতা এখনও তাহার অন্তরকে ও পরের চোখে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে নাই। যে চোখে দেখিবার জন্য উৎসুক দৃষ্টি আছে, যে মনে সহানুভূতির কোমল স্পর্শ আছে, তাহার কাছে সে এখনও অতি সহজেই ধরা দেয়। তাই করুণা এই অবজ্ঞাপীড়িত মনটিকে ভালো করিয়া কাছে পাইবার আশায় তাহার গুপ্ত প্রয়াণের কথা এত সহজে প্রকাশ করিয়া দিতে চাহিতেছিল না।

পরদিন করুণা অরুণাকে না বলিয়াই শতদলের সন্ধানে চলিয়া গেল। রান্নাঘরের ধোঁয়ার লোভে সে ঘরে কোনো চোরের আসার সম্ভাবনা কম জানিয়া দরজা খোলা রাখিয়াই শতদল আর করুণা মেঝেয় মাদুর পাতিয়া গল্পে মাতিয়াছিল। শতদলের কোলে মাথা দিয়া করুণা শুইয়া ছিল, শতদল সখীর এলো চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে তাহার বিগত সুখ-দুঃখের গল্প বলিতেছিল। পাশে তাহার মায়ের হাতের তৈয়ারি কড়ির ঝাঁপি, জাকড়ার আসন, তার ছোট মামার ছবি, আরো দুচারটে ছোটখাট জিনিস করুণার দর্শন পাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া যাইবার আশায় পড়িয়া আছে। কাঠের সিন্দুকের মধ্যে তাহার বিবাহিত জীবনের অল্প কয়টা দিনের যে কয়টি স্মৃতিচিহ্ন ছিল, সেগুলো যে করুণাকে দেখাইতে

তাহার একান্ত আপত্তি ছিল তা নয়। তবে এগুলো সে যত সহজে দেখাইয়াছিল, যেখানে ব্যথা আর আনন্দ আরো অনেক গোপন আর নিবিড় সেখানকার রাজ্যের জিনিসগুলি সে তত সহজে দ্বিতীয় মানুষের চোখের উপরে ধরিতে পারিতেছিল না।

শিশু মামাভাগ্নির একসঙ্গে পাঠশালায় যাওয়ার আর একসঙ্গে গাছে চড়া পুতুলখেলার গল্পে তখন তারা বিভোর। পাঠশালার ছেলেরা পুরুষপ্রবরের পুতুল খেলা দেখিয়া তাকে মেয়েমুখো ননীগোপাল বলিয়া ক্ষেপাইত, কাজেই লজ্জায় পড়িয়া তাদের গাছে চড়া, পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়া প্রভৃতি পুরুষোচিত খেলার শরণ লইতে হইত। কিন্তু এখানেও নিস্তার ছিল না। নারীর এমন আচরণে শতদলকে গেছো মেয়ে সন্ধ্যা ভগবতী প্রভৃতি ভূষণ মাথা পাতিয়া লইতে হইত। ছেলেবেলার এইসব তুচ্ছ দুঃখের কথায় আজ শতদলের বিষণ্ণম্লান মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হাসি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া গেল। হঠাৎ করুণাকে ঠেলা দিয়া প্রায় সোজা করিয়া তুলিয়া শতদল ভদ্র হইয়া বসিল। করুণা চাহিয়া দেখিল, দরজার গোড়ায় অবিনাশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার চোখে মুখে তীব্র বিরক্তির চিহ্ন। করুণার দিকে ভাল করিয়া না তাকাইয়াই সে শতদলকে গর্জ্জন করিয়া বকিয়া উঠিল, "এতকাল ধরে যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে রয়েছ, তা এতদিনে কি এইটুকু ভদ্রতাও শেখো নি? তোমার এঁদো ঘরের শোভা, আর ছেঁড়া ন্যাকড়ার সরঞ্জাম দেখ্‌তে কি মানুষ বাড়ীতে আসে? বাড়ীতে বস্‌বার ঘর কি দেখ্‌বার জিনিসের এত অভাব হয়েছে তা ত জান্‌তাম না। ছি, ছি, ছি! তোমার কোনো আক্কেল নেই।... এস করুণা, ঠাণ্ডা মেঝেয় বসে বাত ধরাতে হবে না। ঘরে বস্‌বে এস।"

করুণা বলিল, "এও ত ঘর, বেশ ত আছি।"

শতদল তাকে ঠেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "না ভাই, তুমি বস্‌বার ঘরেই বোসো গিয়ে, আমি আস্‌ছি।"

শতদলের আর-একটা অপরাধের কথা মনে পড়িল, জলখাবার দেওয়া হয় নাই। সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। করুণা অবিনাশের সঙ্গে বসিবার ঘরে চলিল। শতদল দরজার বাহির হইতে না হইতে অবিনাশের মুখের চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "এ সময় আমি বাড়ী থাকি না, তা ত তোমায় অনেকবার বলেছি।"

করুণা বলিতে যাইতেছিল, "আমি ত আপনার কাছে আসি নি," কিন্তু বলিল, "আমি শতদলের সঙ্গে একটু দেখা কর্‌তে এসেছিলাম।"

অবিনাশ মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল "আমার সময় কি এত সস্তা? দুদিন দুদিন তোমার বাড়ী গিয়ে তোমার দেখা না পেয়ে ঘুরে এলাম, আর তুমি একটু বিবেচনা করে নিজের যাওয়া-আসার খবরটি জানিয়ে রাখ্‌তে পার না?"

করুণা ভাবিল, আমার হাঁটা-চলার খবর মফঃস্বলকে দেবার কেন কোনো কথা আছে। কিন্তু অবিনাশ নিজের জানিবার দাবীটা যেভাবে জানাইল তাহাতে সে উত্তর দেওয়া চলে না। করুণা বলিল, "বেশ ত, আপনার সময় সস্তা নয়, অবিবেচক লোকের জন্যে ত বৃথা খরচ কর্‌বেন না। তারা আপনার ত্যাগের মূল্য বোঝে না।"

অবিনাশ একটু চটিয়া বলিল, "বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাই না। কাল কোথায় গিয়েছিলে বল।"

মিথ্যা কথাটা আর কি করিয়া বলে? করুণা বলিল, "এইখানেই এসেছিলাম।"

অবিনাশ বলিল, "এইখানে? আমি তোমায় খুঁজ্‌তে গিয়েছিলাম, বাড়ী গিয়ে তা শুনেছিলে?"

করুণা বলিল, "শুনেছিলাম।"

অবিনাশ বলিল, "তাও শুনেছিলে? তবে অকরুণাকে বলনি কেন কোথায় যাও?"

জেরায় পড়িয়া একটু থামিয়া করুণা বলিল, "এমনি।"

শতদল ঘরে আসিয়া ঢুকিল। অবিনাশ মুখ ভার করিয়া জুতা মস্ মস্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

পাতিত্য সমস্যা

(২১শে মার্চ্চ, খুলনা পৌণ্ড্রক-ক্ষত্রিয় সামাজিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ)

বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ। বক্তৃতায় তার গত অর্দ্ধশতাব্দী কেটেছে। এখন কাজে নাব্‌তে হবে।

আজ আমার মহা আনন্দের দিন! হাওয়া ফিরেছে। নবজাগরণের দিন এসেছে। ঐই মহাপ্রলয়ে তিনটি সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়ে গেল। সেই সময়ে যে-সব আইডিয়া ব্যক্ত হয়েছে তার ধাক্কা এখানে এসেছে। সেদিন বর্দ্ধমানের মহারাজা একটা বড় পাকা কথা বলেছেন—এখন চারিদিকে বড় অশান্তি দেখা দিয়েছে। তাকে বাধা দিলে চল্‌বে না। একে বাধা দিলে কি হয় জানি না। এর আঘাত-প্রতিঘাতের কথা আজ আমি বল্‌তে চাই। প্রথমেই মনে পড়ে পাতিত জাতিদের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চ জাতির লোকদের সম্পর্কের কথা।

আমি খুলনা জেলার লোক। এই খুলনার ৭ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৪ লক্ষ অস্পৃশ্য! ইহারা কৃষিজীবী। ইহারা ধনধান্যে সমৃদ্ধ। এই ৪ লক্ষ বলীয়ানের সঙ্গে ৩ লক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়ায় তা প্রণিধানযোগ্য। আমি দ্বেষজনক কোন কথা বল্‌ব না। যাতে কোন জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধে এখানে তেমন কোন রাগের কথা নেই। এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই এই বিসদৃশ অবস্থার দিকে নজর পড়েছে।

আমরা ছেলেবেলা গল্প পড়েছিলাম—উদর ও দেহের অবয়ব সম্বন্ধে। হিন্দু সমাজের তেমনি সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। লর্ড ডাফরীন্ আমাদের বিদ্রূপ করেছিলেন—এরা মুষ্টিমেয় (microscopic minority)—এরা আন্দোলন করে—এদের কে চেনে? কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সংখ্যা ২৩ লক্ষ। আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণী কত? একা নমঃশূদ্র ২৫ লক্ষ; ব্রাত্যক্ষত্রিয় ৫½ লক্ষ। বাঙ্গালার অধিবাসী ৪½ কোটী। এই ৪½ কোটীর মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ শতকরা ৬½ কি ৭ জন। কিন্তু আমরা অপর সবাইকে বাদ দিয়ে ঘরকন্না করতে চাই। এ একটা আত্মঘাতী ব্যাপার। সমাজের যাঁরা বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যাঁরা শিক্ষা পেলে সমাজের নেতা, মুখপাত্র হবেন, তাঁদের না টেনে তুলে তাঁদের বাদ দিয়ে ঘর করতে চাই। এ ত বাতুলতা; এ ত মহাপাপ। কোন কারণে হয়ত আমাদের অবস্থা ভাল; আমাদের গোলায় ধান আছে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহলে কি আমরা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিলাসিতা কর্‌ব, আর আমাদের প্রতিবাসীরা মারা যাবে? আমাদের কর্ত্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাঙ্গলাকে মা বলেন তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন কর্‌বেন না—মায়ের সন্তানকে পদাঘাত ক'রে দূরে ঠেলে কি তাঁরা অগ্রসর হবেন?—তবে তাঁদের কিসের মা বলা?

ব্যাপার কি—একটা বিড়াল ঘরে ঢুকল—হয়ত আঁস্তা কুড় খেটে, মরা ইঁদুর চট্‌কে—দুধ খেলে; আমরা কি তা ফেলে দিই। কিন্তু যদি একজন তথাকথিত ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাটের উপর আসে, আমরা জল ফেলে দিই। বরফ লেমনেড্ খাও না? তা কে তৈরী করে? সম্প্রতি আমার স্বগ্রামের নিকট এক শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। কলিকাতা থেকে বরফ এসেছে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনার জন্য। যেই বরফ, সেই ত জল—H_2O—অর্থাৎ অম্লজান ও উদজানের যৌগিক। জল খাবে না, বরফ খাবে কারণ,—ভণ্ডামি, প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা। কেবল দেখান—তুই নীচ জাতি, আমি উচ্চ জাতি। সবাই মায়ের সন্তান—সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন। বিবেকানন্দ বলেছেন—"হিন্দুধর্ম্ম দেশাচারে লোকাচারে পরিণত। ধর্ম্ম এখন আশ্রয় নিয়েছেন—জলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর।"

এই কি হিন্দুধর্ম্ম? হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ছিল। জন্মগত গরিমা সর্ব্বনাশের মূল হয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণের বিদ্যাশিক্ষার দরকার নেই। যিনি কুলীন, তিনি বিয়ে ক'রে ৩।৪ হাজার টাকা রোজ্‌গার করেন। এতে অনেক স্থলে অবনতি হয়েছে। জগতের ইতিহাস দেখুন। যীশু খৃষ্ট ছুতোর, কবীর জোলা। জগৎ নত মস্তকে তাঁদের

ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। মাদ্রাজেও পারিয়া পীর দেখা যায়। ভারতে একসময়ে চরিত্র দেখে সাধুদের পূজা হত এখন সম্মান জন্মগত হয়েছে। এ আর বেশী দিন টিকবে না। এখন হচ্ছে from log cabin to white house, অর্থাৎ পুরুষকার ও গুণের আদরের দিন। লর্ড্ জর্জ্জ "জুতিসেলাই"এর পালিত পুত্র। উইলিয়াম কেরি—যিনি এক হিসাবে বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিও—জুতি-সেলাই। এইখানে একটা কথা মনে পড়ল। একবার লর্ড ওয়েলস্‌লি অনেক গণ্যমান্য সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। সে ভোজের সভায় কাউন্সিলের অনেক মেম্বরও উপস্থিত ছিলেন। কেরিকে দেখে একজন পার্শ্বের বন্ধুকে কানে কানে বল্‌লেন—"Hallo, Carey is here. Is he not a shoemaker? ওহে, কেরি এসেছে যে! ও জুতা গড়ে না?" কেরি তা শুনতে পেয়ে বলে উঠ্‌লেন—"Beg your pardon sir, I am not a shoemaker but a cobbler. মাপ করবেন মশায়, আমি জুতা গড়ি না, ছেঁড়া জুতা মেরামত করি।" ইংলণ্ডে জাতিভেদ আছে বটে, কিন্তু তা অন্য প্রকার। আজ যিনি log cabinএ অর্থাৎ কুঁড়ে ঘরে থাকেন, কাল তিনি দেশনায়ক। আমাদের দেশে অন্যপ্রকার দেখতে পাই। মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণদাস পাল—এঁদের মধ্যে একজন সদ্গোপ, একজন তন্তুবায়, একজন তিলি। এঁরা সমাজের গৌরবস্থল। কিন্তু একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্রকে কন্যা দিতে রাজি হয়েন না। বল্‌বেন—ও যে তাঁতির ছেলে। এতে সমাজের কত অবনতি, কত লোকসান হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রকার বাগ্‌ভট বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"আমার গ্রন্থ হয়ত লোকে উপেক্ষা করবে। কারণ আমি চরক বা সুশ্রুতের ন্যায় ঋষি নই। কিন্তু ঔষধের যদি গুণ থাকে তাতে রোগ যাবেই—তা ব্রহ্মাই প্রয়োগ করুন বা আমিই করি।" এই ধরুন বিষ—ব্রাহ্মণ প্রয়োগ করুন বা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় প্রয়োগ করুন—তার ফল ভিন্ন হবে কি না আমি জিজ্ঞাসা করি। আমি বাড়ী গেলে চাষা-ভূষাদের নিয়ে থাকি। তারা বলে—"বাবু, আপনারা কি জাত জাত করেন। এই মোটা ভেটেলের চাল, আমি রাঁধি আর আপনি রাঁধুন। একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে কি বল্‌তে পারেন কোন্‌টা কার ভাত? দুইজনের একই রকম ভাত হয়।" অথচ আমরা বড় বড় বই থেকে জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই। হোটেলে সবাই একসঙ্গে খান, তাতে কারও বেশী উদর-পীড়া হয় বলে জানি না। সবাই রেলগাড়ীতে চড়েন—সেখানে কি সকলে নৈকষ্য কুলীন? যেথায় দিব্য বাবু হ'য়ে ট্রামগাড়ীতে যাচ্চে, আপনি তার পাশে বসেন; ষ্টীমারে একদিন, দু'দিন, তিনদিন চলেছেন—তাতেই থাকা, খাওয়া-দাওয়া;—জাত বাঁচে, কি ক'রে? তখন জাত থাকে কোথায়? ঢাকা অঞ্চলের একজন লোক কলিকাতা থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন—উইলসেন, ইষ্টেসেন, আর কেশবসেন, এই তিন সেনে মিলে জাতের সর্ব্বনাশ করেছে। যদি পাকস্থলী কেটে বের ক'রে রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) করেন, তবে বুঝ যাবে তার কতটুকু জাতি আছে। তবে কেন আমরা জাত্ জাত্ ক'রে মারা যাই?

আমি এখন যোগী, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমাজের মুখপত্রগুলি যতদূর সম্ভব পড়বার চেষ্টা করি। যেখানে দেখি—সেইখানে আর্ত্তনাদ। তাঁরা প্রবাদে বলেন না কে তাঁদের প্রপীড়িত করছেন, কিন্তু তাঁরা ভাবেন তাঁরা অত্যাচারিত। সেদিন যোগীসখায় লেখা দেখ্‌লাম—"আমরাও কালের কুটিলাবর্ত্তে পড়িয়া অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আছি।" সকল পত্রিকাতেই এক কথা। কে করছে—তাঁরা কারো নাম করেন না। এ বড় দুঃখের কথা। তাঁরা নিজেরা নিজেদের হীন অধঃপতিত মনেই বা করেন কেন, আর সত্যই কেউ অত্যাচার করছে বুঝে তা সহ্যই বা করেন কেন? কাল এক জায়গায় পেলাম—লেখক লিখ্‌ছেন—"তথাকথিত উচ্চজাতির অবস্থা দেখি—তাঁহাদের নিকট যোগী প্রভৃতি জাতি অনাচরণীয় কিন্তু পশ্চিমা-কুর্ম্মী পরিচয় দিলেই তার জল আচরণীয়।" আমরা কি পশ্চিম দেশে C. I. D. পাঠিয়ে তার জাতের খবর নিই! আবার কলিকাতায় কি নামক এক জাতীয় জীবের জলও চলে। যাঁরা ছুঁৎমার্গ অবলম্বন ক'রে চলেন তাঁরা কলিকাতায় গিয়ে অনেক সময়ে মেসে ওঠেন। তাঁর কি অনুসন্ধান

করে দেখেন পাচক ব্রাহ্মণ প্রকৃত পক্ষে কি জাতি? প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু একদিন তাঁর ঝির সঙ্গে আলাপ করছিলেন। ঝি বললে, "বাবু, লোক দেখলেই ধর্ম্ম গেল—না দেখলে আর কিছু নয়। ছোঁয়াছুঁয়িটা কেবল লোক-দেখাদেখি।" এই ঝি হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্ম্মের সার বুঝেছে।

আপনাদের আত্মমর্য্যাদা যে দিন-দিন জেগে উঠ্‌ছে এ বড়-শুভচিহ্ন। আপনারা যদি বোঝেন—আমরা অধঃপতিত নই, আমরাও বিদ্যাবুদ্ধি-বলে উচ্চস্থান পাব তবে উন্নতি নিশ্চয়। রাতদিন অভিযোগ করলে উন্নতি হবে না। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট। আপনারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান। আপনারা আজকালকার "উচ্চ"শ্রেণীস্থ মধ্যবিত্তের অবস্থা জানেন—তাদের বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন। আপনারা কিন্তু কৃষিজীবী, আপনারা সেই "পোদবৃত্তি" করেন। আমার এই খুল্‌নার সন্নিকটস্থ আপনাদের হরিমোহন বাছাড় রাসে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। সে আজ '৪০ বছরের কথা। আপনাদের মধ্যে অনেকে মোকর্দ্দমায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন। অর্থের অভাব নাই—চেষ্টার অভাব। গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলুন। ক্রিয়া-কর্ম্মে কম ব্যয় করুন। যিনি ক্রিয়া-কর্ম্মে দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন তিনি ২॥০ হাজার ব্যয় ক'রে বাকী ৭॥০ হাজার সমাজের কাজে ব্যয় করুন। চাই শিক্ষা। উন্নতির জন্য কি দরকার? আমি বল্‌ব—১ম শিক্ষা, ২য় শিক্ষা, ৩য় শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে কোন প্রভেদ নেই। আপনাদের সর্ব্বনাশের কারণ বাড়ী ব'সে সকলে অন্নসংস্থান করেন। আপনারা শিক্ষালাভ করুন—শিক্ষার দিকে মতি ফেরান—আপনাদের শক্তির প্রতিরোধ করতে কেউ পারবে না। আপনারা যা ভাব্‌বেন তাই হবে। Nations by themselves are made জাতি স্বতঃ গঠিত হয়। বর্দ্ধমান প্রাদেশিক সমিতিতে জষ্টিস্ চৌধুরী বলেছিলেন—mendicant policy ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করলে চল্‌বে না। আপনারাও mendicant policy ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। ভিক্ষাবৃত্তিতে কিছু হবে না। মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে আমার জল ছোঁন—ও বললে চল্‌বে না। আপনাদের উন্নতি আপনাদের উপর নির্ভর করে। আমি কোন বিরোধের ভাব উপস্থিত করতে চাইনে। মান্দ্রাজে পারিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে এসব বড়-একটা নেই। কর্ণেল উপেন্দ্র মুখুজ্জে মশায় জানেন বাঙ্গলাতে প্রায় ৭০০ ম্যাট্রিকিউলেসান বিদ্যালয়। আপনারা যদি হিসাব করে দেখেন গভর্ণমেণ্ট স্কুল প্রায় ৪৭টি হবে। বাকী ৬৫০টির ভিতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের চেষ্টাতে হয়েছে এমন স্কুল বাদ দিলে আর কয়টি থাকে? অধিকাংশ স্কুলই প্রধানতঃ তাঁদের চেষ্টাতেই হয়েছে। কিন্তু এমন কোন বিদ্যালয় আছে কি যেখানে তাঁরা তথাকথিত নিম্ন জাতিকে পাশে বসে বিদ্যাশিক্ষা করতে বারণ করেন? এই বাগেরহাট কলেজ হয়েছে। তাঁরা কি কোনদিন বলেছেন যে বারুইজাতি কায়স্থ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে পড়্‌তে দেবেন না। এ কথা বলা যায় না যে তাঁরা সব নিজেদেরই সুবিধা করে নিয়েছেন। কেউ দীঘি কেটে বলেন না—একলা আমি এই দীঘির জল পান করব। সুতরাং এটাও ভাব্‌বেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি স্কুল কলেজ ক'রে সকলের উপকার করেছেন। যদি তাঁরা বলেন আমরা এখানে আর-কাউকে পড়্‌তে দেব না তা হ'লে তাতে ক্ষতি হবে তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীদের। মোটামুটি আমি বলতে চাই যে বাঙ্গালা দেশ মান্দ্রাজ অপেক্ষা এইরূপ বিষয়ে অনেকটা উদার।

আমি কোন সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি। আমি রাসায়নিক। আমি নিক্তির ওজন ক'রে সকলের ভালমন্দ ওজন ক'রে বিচার করতে চাই। আমাদের সামাজিক ব্যাধি দূর করতে হলে আগে diagnosis রোগনির্ণয় করতে হবে। সার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাঁদের উচিত হস্ত-প্রসারণ করে কনিষ্ঠকে টেনে নেওয়া। উচ্চশ্রেণী সুবিধা পেয়েছেন—তাঁদের সুবিধা আছে—তাঁদের উচিত নিম্নকে টেনে আনা ও সুবিধার ও সুযোগের ভুক্তভোগী করা।

আর এক কথা। আপনাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। Reform Scheme নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আপনারা ভোটদাতা হবেন। অনেকে ভোট নিতে

আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হবেন। আপনারা তাঁদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবেন তাঁরা আপনাদের জন্য কি করবেন। যিনি আপনাদের মঙ্গল করবেন—তাঁকে ভোট দেবেন। তাঁরা আপনাদের শিক্ষা, রাস্তাঘাট, সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করবেন, এমন অঙ্গীকার করিয়ে নেবেন। উদ্ধারের পথ আপনাদের নিজেদের হাতে।

আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। আপনারা কায়স্থ-ব্রাহ্মণের সমান শিক্ষিত হোন। আপনাদের বলেই আমরা বলীয়ান। আজ ভাই ভাই ব'লে সকলকে আলিঙ্গন করতে হবে। জয়চাঁদ থেকে আরম্ভ ক'রে ৮০০ বৎসর কেবল গৃহবিবাদে কেটেছে। আর বিবাদের দিন নেই। 'সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে।' কে বড় কে ছোট ঈশ্বরের রাজ্যে? যে আপনাকে বড় মনে করে সে বড়; যে ছোট মনে করে সে ছোট। এমার্সন বলেছেন—you cannot make a slave of Washington ওয়াশিংটনকে দাস করবার শক্তি তোমার নেই। যাতে শক্তি জাগে তার উপায় করুন। তার উপায় শিক্ষা। আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা তুলতে পারেন। বরং আমাদের দুর্দ্দশা বেশী। আপনারা শতাংশের একাংশ চেষ্টা করলেও অনেক বেশী কাজ করতে পারেন। যাঁরা India as a nation অথবা Bengalee as a nation ভাবতে চান তাঁরা কাউকে বাদ দিয়ে পারেন না। তাঁরা কি দুচার জনে জাতি গঠন করতে পারেন? যদি নৌকার এক জায়গায় একটু ফুটো থাকে তবে সবটা জলে ডুবে যায়। দুর্য্যোধনের উরুতে যেমন একটু দুর্ব্বলতা ছিল ব'লে তার পরাজয় ঘটেছিল, তেমনি যতদিন শতকরা ৯৯ জন নিরক্ষর থাকবে ততদিন আমরা বড় হব না।

বিদেশে আমাদের কি অবস্থা? যদি ভুল দোরাব তাতাও Capeএ যান তাঁকে কুলী বলবে। ভারতবাসী হলেই কুলী নামে অভিহিত। তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেয় না, ট্রামে রেলে তার আলাদা বন্দোবস্ত। জগতের দরবারে এই ত আমাদের মান। কিন্তু আপিসে সাহেবের তাড়া খেয়ে যেমন বাড়ীতে এসে নিরীহ সহধর্ম্মিণীর উপর আমাদের চোটটা বেশী পড়ে, এখানেও আমাদের সেই ভাবটা বেশী। League of Nations হয়েছে। সেখানে লর্ড সিংহকে ভারতের পক্ষ থেকে ভোট দিতে খাড়া করবার কথা হয়। তাতে একজন American Senator কি বলেছেন শুনুন—

I can give you a picture of India in a word. She has a population of 294,301,056....Such a people mark and brand themselves at once as not only unfit for the Government of others, but as almost unfit for their own Government; yet I would not deny that right to the lowest of God's creatures to be let off with others like himself and wanted a Government of its own.

Amongst those 294,000,000 people there is no excess of superstition to which they have not gone; there is no shadow of intellectual night so black that they have not wrapped their souls in its sable folds; there is no species of caste by which men have fought to divide themselves and keep oppressed by power and priestcraft their fellowmen that has not been ripe in India for centuries of time.

এই ত আমাদের মান। এই মানে মানী হয়ে আমরা বলি জল নষ্ট করিস্‌নে। এখন আর পৃথক খাঁকুলে চলবে না। আমি intermarriage সর্ব্বজাতিক বিবাহের কথা বলছি না। আপনারা একটু এগুন, তাঁরাও আপনাদের দিকে একটু আসুন। কিন্তু আমি বলি যাঁরা কুলীন তাঁদেরই আগে এগুতে হবে। আপনারা ভাঙ্ ভাঙ্ করছেন। আমার ও-সব আসে না। এখানে চেহারা দেখে কে বড় কে ছোট তা ঠিক করতে পারেন?

আপনারা অবনত বললে কে? ও যেন ঠাকুরঘরে কে—না, আমি ত কলা খাইনি। আপনার ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নন। আপনারা বড় বড় পদ লাভ করুন—কাউন্সিলে নিজেদের মধ্য থেকে মেম্বর পাঠান। আপনারা অনেকেই লক্ষ্মীমন্ত। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করবেন। আপনাদের আয়ের অন্ততঃ একদশমাংশ স্বজাতির শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। যেমন কালীপূজার বারোয়ারির জন্য এক পয়সা ক'রে রাখা হয়, তেমনি ক'রে আপনারা যে যান পান তার দশমাংশ এমন কি শতাংশও আপনাদের উন্নতির জন্য রেখে দেন, আপনাদের উন্নতি আটকে রাখে কে? আপনারা নিজেরাই নিজেদের উন্নতি আটকে রেখেছেন। শিক্ষার বিস্তার করুন। উন্নতি ধ্রুব নিশ্চয়।

আমি আজ বুঝতে পারলাম—জাতীয় জাগরণের প্রথম

স্ফুরণ হয়েছে। প্রকৃত জাতীয় জাগরণের স্পন্দন দেশের সর্ব্বত্র পৌঁচেছে।

কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য—হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সকল স্তরের সহৃদয় লোক বহু প্রকারে জ্ঞাপন করছেন যে সকলেরই আপনাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি আছে ও তাঁরা আপনাদের উন্নতি কামনা করেন। এখন যদি আপনারা পুরুষকারের দ্বারা বিদ্যা যশ মান লাভ ক'রে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ করতে পারেন তবেই সব আয়োজন ও চেষ্টা সার্থক হবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দ্রাবিড় দেশের রামায়ণ

উত্তরভারতে আদি কবি বাল্মীকির বিরচিত রামায়ণ প্রচলিত। কিন্তু দ্রাবিড় দেশে অন্য একখানি রামায়ণ প্রচলিত। মূল ঘটনা উভয়ে এক হইলেও এ দুইখানি পুস্তকে অনেক প্রভেদ। দ্রাবিড় দেশের রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। বাল্মীকির হনুমান মুখপোড়া বানর, তাঁহার লাঙ্গুল প্রয়োজন-মত ১২ হইতে ১০০০ যোজন লম্বা, তিনি এক লম্ফে সমুদ্র পার হন, সূর্য্যকে কুক্ষিগত করিয়া রাখেন, অথচ সেই পুস্তকেই দেখিতে পাই তিনি বিদ্বান, বেদজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ ইত্যাদি। দ্রাবিড় দেশীয় রামায়ণের কথাগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার মত সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

সূর্য্যবংশীয় রাজা সগর যখন দক্ষিণ দেশে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন দ্রাবিড় দেশের এক রাজা জিমূতবাহন কোন সুন্দরী রাজকন্যার সহিত আপনার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজকন্যার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া সগর ছোঁ মারিয়া কন্যা কাড়িয়া লইলেন। জিমূতবাহন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া লঙ্কার প্রতাপী রাজা ভীমের শরণাপন্ন হইলেন। ভীম এককালে দিগ্বিজয়ী ও মহা বলবান ছিলেন, এখন অপত্যহীন বৃদ্ধ; তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। তিনি জিমূতবাহনকে পুত্ররূপে আপনার কাছে রাখিলেন ও রাক্ষসবংশে বিবাহ দিয়া লঙ্কা ও পাতাললঙ্কার রাজ্য দান করিলেন।

ইহার বহুকাল পরে জিমূতবাহনের বংশে ধবলকীর্ত্তি নামক এক প্রতাপী রাজা লঙ্কাতে রাজ্য করিতেন। তাঁহার শ্যালক শ্রীকণ্ঠকুমার ভগ্নীপতির অন্নদাস হইয়া থাকা হীন বিবেচনা করিয়া আপনার ও আপনার বংশের জন্য একটি রাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি পাতাললঙ্কার উত্তরে বানরদ্বীপে কতক দেশ জয় করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি রাজ্য স্থাপন করিয়া আপন ধ্বজাতে এক বানরমূর্ত্তি আঁকিয়া দিলেন। তিনি কিষ্কিন্ধ্যাতে যে বংশ স্থাপন করিলেন তাহাদের চিরকাল ঐ ধ্বজা ছিল। শ্রীকণ্ঠের বংশে বজ্রকণ্ঠ, ইন্দ্রায়ুধ, অমরপ্রভু ও কপিকেতু প্রতাপী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। অমরপ্রভু লঙ্কার এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কপিকেতুর দুই পুত্রের নাম কিষ্কিন্ধ্যা ও অন্ধ্রক। এক সময়ে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে বিজয়ার্দ্ধপর্ব্বতে আদিত্যনগরের রাজকন্যা মণিমালী স্বয়ম্বরা হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া দুই রাজকুমার, কিষ্কিন্ধ্যা ও অন্ধ্রক, স্বয়ম্বরসভাতে কন্যাপ্রার্থী রাজা ও রাজকুমারদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। এই সভাতে বিদ্যাধরদের দেশের রাজচক্রবর্ত্তী অশনিবেগের পুত্র বিজয় ও লঙ্কার রাজকুমার সুকেশও কন্যাপ্রার্থীরূপে উপস্থিত ছিলেন। রাজকন্যা সভার সকল রাজা ও রাজকুমারদের ছাড়িয়া কিষ্কিন্ধ্যাকে বরণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তীর পুত্র বিজয় অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি কিষ্কিন্ধ্যাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সভামধ্যেই যুদ্ধ হইতে লাগিল। বিজয় অন্ধ্রকের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলে কিষ্কিন্ধ্যা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ অশনিবেগ পুত্রের নিধন ক্ষমা করিতে পারিলেন না, তিনি আপন চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। লঙ্কার রাজকুমার সুকেশ কিষ্কিন্ধ্যার আত্মীয় ও বন্ধু; তিনিও সৈন্য লইয়া বন্ধুকে সাহায্য করিতে আসিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ অশনিবেগ জয়ী হইলেন। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা বিজয়ের পর বিদ্যাধররাজ্য অতি বিস্তৃত হইল। রাজকুমার কিষ্কিন্ধ্যা, অন্ধ্রক ও সুকেশ রাজ্য হারাইয়া পাতাললঙ্কাতে আশ্রয় লইলেন ও অতি দীনভাবে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মধুপর্ব্বতের উপর একটি

ছোট নগর বসাইয়া, কিষ্কিন্ধ্যা আপন দুই পুত্র ঋক্ষরজ ও সূর্য্যরজকে সেই নগরের রাজা করিলেন।

পাতাললঙ্কাতে বাসকালে সুকেশের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সুকেশ তাহাদের নাম মালী, সুমালী, ও মাল্যবন্ত রাখিলেন। যৌবনে এই তিন ভাই যোদ্ধা ও বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যাধরদের পরাজিত করিয়া লঙ্কার পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করিলেন। বিদ্যাধরদের দেশে বহুপূর্ব্বে বৃদ্ধ অশনিবেগের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র সহস্রার রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পর তৎপুত্র ইন্দ্র এখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। লঙ্কা উদ্ধার করিবার পর কুমারেরা (মালী, সুমালী ও মাল্যবন্ত) ঋক্ষরজ ও সূর্য্যরজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যাধরপতি ইন্দ্রকে তাঁহার রাজধানীতে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বলবান ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হইয়া আপন পূর্ব্বপুরুষদের মত আবার পাতাললঙ্কাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। উভয়ের রাজ্য আবার বিদ্যাধর-রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করিল।

রাজ্য হারাইয়া দীনভাবে পাতাললঙ্কাতে বাস করিবার সময়ে সুমালীর পুত্র রত্নশ্রবার পুত্র রাবণের জন্ম হইল। এই রাবণ কালে রাক্ষস-বংশের মহা বলবান দিগ্বিজয়ী রাজা হইয়াছিলেন। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন। ও কিষ্কিন্ধ্যা জয় করিয়া ঋক্ষরজ ও সূর্য্যরজকে তাঁহাদের প্রাচীন রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সূর্য্যরজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় বালী ও সুগ্রীব রাজা হইলেন। রাবণ লঙ্কারাজ্য দৃঢ় করিয়া স্থাপন করিয়া বিবাহ করিতে চাহিলেন। তিনি কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য উদ্ধার করিতে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে বালী ও সুগ্রীবের ভগ্নীকে কামনা করিলেন। বালী এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারিলেন না বলিয়া রাজ্য অনুজ সুগ্রীবকে ছাড়িয়া স্বয়ং অন্যদেশে গিয়া বাস করিলেন। সুগ্রীব রাবণের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। সম্ভবত এই বিবাহ স্মরণ করিয়াই বাল্মীকি (সুন্দরাকাণ্ডের ৫১ সর্গ) লিখিয়াছেন যে হনুমান যখন রাবণের সভাতে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রাক্ষসেশ! আপনার ভ্রাতা বানরপতি সুগ্রীব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

একবার সুগ্রীবের সহিত তাঁহার স্ত্রী সুতারার কোন বিষয়ে বিবাদ হয়। সুগ্রীব রাজধানী হইতে দূরে কোন স্থানে (সম্ভবত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে) অজ্ঞাতবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে একটি দুষ্টলোক সুগ্রীব সাজিয়া রাজধানীতে আসিল ও রাজপাট অধিকার করিয়া বসিল। সুগ্রীবের সহিত তাহার এত বেশী সাদৃশ্য ছিল যে সুতারা অথবা রাজমন্ত্রীরা কেহই চিনিতে পারে নাই নবাগত ব্যক্তি রাজমহিষীর সহিত রাজাভোগ করিতে লাগিল।

প্রকৃত সুগ্রীব সংবাদ পাইয়া মহা চিন্তিত হইলেন ও আপন অভিন্নহৃদয় বন্ধু হনুবর (অথবা হনুমহদ্বীপ দেশের রাজা পবনঞ্জয়ের পুত্র রাজা হনুমানের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। রাজা হনুমান অগণ চরের মুখে সংবাদ পাইলেন যে প্রসিদ্ধ বলবান বীর, কোশলের সূর্য্যবংশীয় রাজা রাম নিকটে পাতাললঙ্কাতে কোন কারণে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় রামের সহিত সুগ্রীবের অগ্নিসাক্ষী করিয়া মৈত্রতা স্থাপিত হইল। উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাম মায়া-সুগ্রীবকে বধ করিয়া সুগ্রীবের রাজ্য উদ্ধার করিতে ও সুগ্রীব সীতাকে খুঁজিয়া উদ্ধার করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। মায়া-সুগ্রীবের সহিত সুগ্রীবের এত সাদৃশ্য ছিল যে, রাম প্রকৃত সুগ্রীবের গলায় একছড়া মালা দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাম ও হনুমানের সাহায্যে সুগ্রীব আপন রাজ্য উদ্ধার করিলে হনুমান আপন রাজ্যে চলিয়া গেলেন ও সুগ্রীবের চরেরা সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সুগ্রীবের চরেরা সংবাদ আনিল যে লঙ্কার রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। পথে সীতাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা জটায়ু তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু বলে রাবণের সহিত আঁটিতে না পারিয়া নিহত হইয়াছেন। এখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে হনুবরের রাজা হনুমানের রাবণ

সভাতে দূতরূপে পাঠান উচিত। কেননা হনুমান স্বয়ং রাক্ষসবংশীয় ও রাবণের আত্মীয়, ইহা ছাড়া তিনি রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, মহাবীর সম্মাননীয় ও বাগ্মী। রাবণ সম্ভবত তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

রামের অভিজ্ঞান লইয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বত ও দধিমুখ-পর্ব্বতের পথে হনুমান লঙ্কাযাত্রা করিলেন ও সীতার অভিজ্ঞান আনিলেন। রাবণের সভাতে হনুমানের মুখে বাল্মীকি যে-সকল কথা বলাইয়াছেন তাহা বানরের মুখে সাজে না। রাবণ হনুমানের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। অতএব যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। রামের সহায়তার জন্য সুগ্রীবের আহ্বানে দ্রাবিড় দেশের ছোটবড় অনেকগুলি রাজা সৈন্য সহিত উপস্থিত হইলেন। সৈন্য কিষ্কিন্ধ্যা হইতে লঙ্কার পথে যাইবার সময়ে রাজা সমুদ্র কর্ত্তৃক শাসিত বেলান্ধপুর, রাজা সুবেলের শাসিত রাজ্য সুবেলাচল ও হংসদ্বীপের রাজা দ্বিপরদনের রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধের ফল যাহা হইল তাহা সকলেই জানেন, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এই বর্ণনায় যেসকল স্থানের নাম করা হইল তাহাদের মানচিত্রে স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত।

কিষ্কিন্ধ্য :—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী Bellary জেলাতে হোস্পেট Hospet জংশনের কাছে তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে আধুনিক অনাগুণ্ডী Anagundi প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। এই নগরই চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

কিষ্কিন্ধ্যার উত্তর-পশ্চিমে বম্বে প্রেসিডেন্সীর ধারবার Dharwar, রত্নগিরি Ratnagiri ও কোল্হাপুর Kolhapur প্রাচীন বিদ্যাধরদের দেশ।

লঙ্কা :—আধুনিক সীলোন Ceylon.

পাতাললঙ্কা :—কন্যাকুমারী হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান। আধুনিক ত্রিবঙ্কুর, কুর্গ, কনারা জেলা। লঙ্কার রাজ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে ত্রিচিনাপলী Trichinopoly পর্য্যন্ত ও পশ্চিমসমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গোকর্ণ :—Goa গোয়ার দক্ষিণে সমুদ্রতীরে।

হনুবর :—আধুনিক Honavar হোনাবর। গোয়া হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে, শরবতী নদীতীরে। [এই শরবতীর জলপ্রপাত গিরসোপ্পা প্রপাত Gersoppa Falls নামে প্রসিদ্ধ, এত উচ্চ প্রপাত পৃথিবীতে আর নাই]।

মহেন্দ্র পর্ব্বত :—ত্রিবঙ্কুর পূর্ব্ব সীমা, পশ্চিম ঘাটে। দধিমুখ পর্ব্বত তাহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ, ইরাজি সীমাতে।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

চাষের কাজে জীবাণু

জীবাণুর নাম করিতেই আমাদের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠে। প্রাণহর নানারকমের ব্যাধির বাহন, মরণের চর বলিয়া ছাড়া তাদের আমরা ভাবিতে পারি না। কিন্তু অল্প কয়েক রকমের রোগজীবাণুর অপরাধে যদি আমরা সমস্ত জীবাণু বংশটাকেই পৃথিবীর পিঠ হইতে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিয়া দিতে যাই তবে সেই সঙ্গে পৃথিবীর উপরকার এই শ্যামকান্তি তৃণতরুর আস্তরণটিকেও যে ঝাঁটাইয়া দূর করা হইবে সেকথা আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা নাই। জীবাণুর সঙ্গে উদ্ভিজ্জের এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নাড়ীর যোগ প্রথম লোকসমক্ষে প্রচার করেন উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্যাস্তিউর, জলাতঙ্ক ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের নিদান এবং বিধান নির্দ্দেশ করিয়া পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের কিংস্ কালেজের অধ্যাপক বটম্‌লি জীবাণু-সম্পর্কিত প্যাস্তিউরের ঐ আবিষ্কারকেই আরো খানিক দূর ঠেলিয়া লইয়া গিয়া ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সীমানার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহা লইয়া সে দেশে খুব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, জীবাণু-সংক্রামিত peat বা পচা ঘাস-পাতার চাপ্‌ড়া সারের মতো ব্যবহার করিলে জমি হইতে দেড়গুণ ফসল আদায় করা যাইতে পারে।

জীবাণু না থাকিলে পৃথিবীটা বিরাট পাঁশগাদার মতো আবর্জ্জনায় স্তূপে ভরিয়া উঠিত। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমাদের চারিপাশে যা কিছু মরিয়া ও ঝরিয়া যাইতেছে, জীবাণুরাই সেগুলির বিশ্লেষ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া দেয়, অকেজোকে নূতন করিয়া প্রাণসম্ভব করিয়া তোলে; নতুবা অন্তঃসার-শূন্য হইয়া যে গাছ বাতাসের ঠেলায় পড়িয়া যাইত, সে পড়িয়াই রহিত, অন্য পাঁচটি নূতন মুক্তোদ্গমের স্থানকে জুড়িয়া দখল করিয়া। যেমন করিয়া আমাদের দেশের শাস্ত্রগুলি মানুষের অত্যন্ত সাধারণ বিচার-বুদ্ধির স্ফুরণের উৎসমুখকেও পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছে। সেই নিজন্মা নিঃসার পৃথিবীতে মানুষ যদিই বা কোনোরকম করিয়া টিকিয়া যাইত ত মড়ার ভিড়ে সে দম লইতে পারিত না।

কিন্তু কেবল পুরাতনকে লইয়াই জীবাণুর কারবার নয়। নূতনের উদ্ভবের মূলেও তার কাজ খুব বেশী করিয়া আছে। লোকচক্ষুর অগোচরে তার শক্তি অনুযায়ী অশ্রান্তভাবে সে খাটিয়া চলিয়াছে। তারই ফলে উদ্ভিদের সতেজ স্বাস্থ্য, মানুষ এবং আর জীবদের দৈহিক সৌষ্ঠব এবং শক্তি। জীব এবং উদ্ভিদের প্রাণধারণের পক্ষে যে যে বস্তু আবশ্যক, জীবাণুরাই মধ্যস্থতা করিয়া পৃথিবীর নানা উপাদান হইতে সেগুলিকে জুটাইয়া, গ্রহণযোগ্য করিয়া তাদের জোগায়।

বোটানি বা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের দ্বারা চাষবাসের কাজের কোনো সুবিধা হইতে আরম্ভ হইবার অনেক আগে হইতেই মানুষের কাছে এটা ধরা পড়িয়াছিল যে, অনবরত ফসল দিয়া দিয়া যে জমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে একবার যদি মটর কড়াই সিম বা অন্য কোনো প্রকারের শুঁটির চাষ করিয়া লওয়া যায়, তবে তার বন্ধ্যাত্ব দূর হইয়া গিয়া উর্ব্বরতা ফিরিয়া আসে। ব্যাপারটা যে ঘটে এই পর্য্যন্তই লোকের জানা ছিল, কেন ঘটে সেটা অনেক মাথা ঘামাইয়াও অনেক দিন কেউ সমঝাইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে শুঁটিওয়ালা গাছকে শিকড়-সুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া তুলিয়া ভালো করিয়া মাটি ছাড়াইয়া লইলে শিকড়গুলির গায় ছোট ছোট

অনেকগুলি গুটি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির উপরে গুঁটি-গাছের আশ্চর্য্য প্রভাবের মূলে যে এই গুটিগুলিরই কোনো না কোনোরকম হাত আছে, সেটা এর পর আর কারো জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু, আমরা যেমন অনেকে জানি যে অতার টেলিগ্রাফ তাড়িত শক্তিতে সম্ভব হয়, কিন্তু কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা জানি না, এ জানাও ছিল সেই রকমের। গুটিগুলির দ্বারা মাটি যে কোন্ নিয়মে কেমন করিয়া প্রভাবান্বিত হয় সেটা জানিতে পারা গেল একেবারে প্যাস্তিউরের সময়ে, তাঁর গবেষণার ফলে।

ব্যাক্টিরিয়ম বা জীবাণুর দরকার হইতেছে শর্করা শ্বেতসারের। কিন্তু বেচারির এমনই দুরদৃষ্ট, মাটির মধ্যেকার বাতাসে নাইট্রোজেন্ হইতে প্রচুর পরিমাণে নাই—ট্রোজেন্-ঘটিত কতগুলি যৌগপদার্থ জন্মাইবার বিদ্যাটাই মাত্র তার জানা আছে। ভাগ্যে ঐ জিনিষগুলি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়া জন্মাইবার তার শক্তি আছে, তাই উদ্ভিদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া, নিজেদের বাড়্তি নাইট্রোজেনের খাবারটা তাদের গছাইতে পারিলেই, তার বদলে খুব সহজে দরকারের শর্করা তাদের কাছ হইতে জীবাণুরা পাইতে পারে। কড়াই বা মটর-গুঁটি বুনিবার পর অঙ্কুরটি পরিণত হইতে হইতে যেই তার সুতার মতো শিকড়গুলিকে মেলিতে আরম্ভ করে, অমনই সেগুলির উপর জীবাণুদের আক্রমণ সুরু হয়। চারা গাছটি যথাসাধ্য সে আক্রমণকে ঠেকাইতে চেষ্টা করে।—কিন্তু হাজার হাজার জীবাণুর একরোখামির কাছে সে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? হঠাৎ এক সময় একটি জীবাণু শিকড়ের ছাল ফুঁড়িয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়, ক্রমে আরও অনেক ঢোকে। যেখানে যেখানে তারা বাসা বাঁধে সেখানে সেখানে ছোট ছোট এক একটি গুটির উদ্ভব হয়।—জীবশরীরে কোনো জায়গায় পোকার বাসা করিলে যে-জন্য যন্ত্রণায় রসসঞ্চার হইয়া সেখানটা ফোস্কার মতো মাথা তুলিয়া উঠে, সেই একই কারণে কড়াই এবং মটর-গুঁটির গাছ শর্করা-রসে শরীরস্থ জীবাণুগুলিকে স্নান করাইয়া দিতে থাকে। নাইট্রোজেনঘটিত যে আহার পাইয়া গাছেরা বাঁচে তার সমস্তটুকুই কোনো না কোনো রকমে জীবাণুদের কাছ হইতে পাওয়া।—এবং বাতাসের নাইট্রোজেন হইতে এই-সমস্ত বস্তু জন্মাইয়া লইবার শক্তি তাদের নাই বলিয়া জীবাণুদের সাহায্য না পাইলে বাঁচিয়া থাকাই তাদের দুষ্কর হইত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে, এই সাহায্য করিতে হইলেই গাছেদের শরীর ফুঁড়িয়া ঢুকিবার কোনো প্রয়োজন যে জীবাণুদের আছে তাহা নয়। বাহিরের মাটিতে যারা থাকে, ইচ্ছা করিলে গাছের বাঁচাতে তারাও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। আর গুঁটিওয়ালা গাছ ছাড়া অন্যেরাও যে এ সাহায্য পাইতে পারে না এমনও নয়।

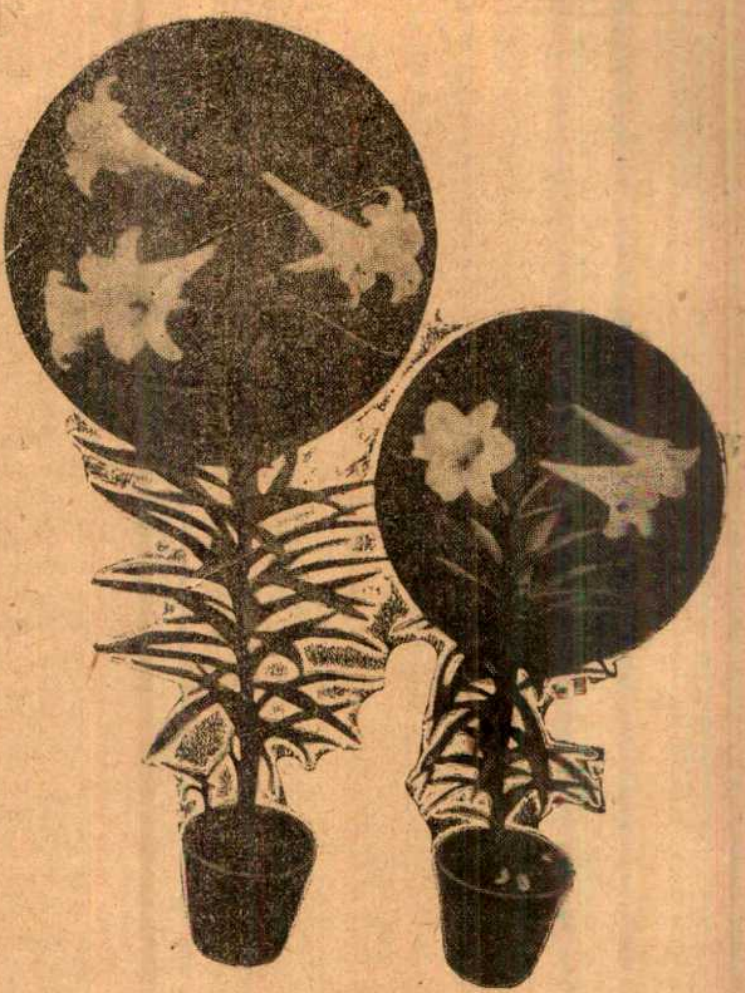

অণুজীবাক্রান্ত পচা ঘাসপাতার চাপ্ড়ার সারে ফুলের গাছ সাধারণ চাষের গাছের দেড়গুণ বড় হইয়াছে।

জীবাণুর সহায়তায় কেবল যে ফসল বাড়ে তা নয়,—সচরাচর যে সময়ে ফসল পাকিবার কথা, অণুজীবাক্রান্ত peatএর সার দেওয়া জমিতে তার চেয়ে অনেক অল্প সময়েই ফসল ফলিয়া পাকিয়া উঠে। তাছাড়া নানারকম ব্যাধি ও আব্হাওয়ার প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়িবার শক্তি বাড়ে, পত্রপল্লবের প্রাচুর্য্য ঘটে, এবং সেগুলি টকটকে লাল দেখিতে হয়,—ফুলের ফসল এবং তার বর্ণসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, ফলের পরিমাণ ত বেশী হয়ই, আকারও বাড়ে। জমির উপর জীবাণুর এই শুভ প্রভাব তিনবৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তাইতে দেখা গিয়াছে।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, সাধারণ peat অম্লধর্ম্মী বলিয়া গাছ-গাছড়ার জীবনের পক্ষে উহা ভারি অহিতকর; তার এই অম্লত্ব দূর করিবার জন্য দুই বৎসর ধরিয়া তাকে পচানো দরকার। কিন্তু তা'-করে যেমন করিয়া ডিম ফুটানো হয় তেমনি ভাবে তাপ দিয়া এই দুই বৎসরের কাজ এক সপ্তাহে করিয়া লওয়ার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স।

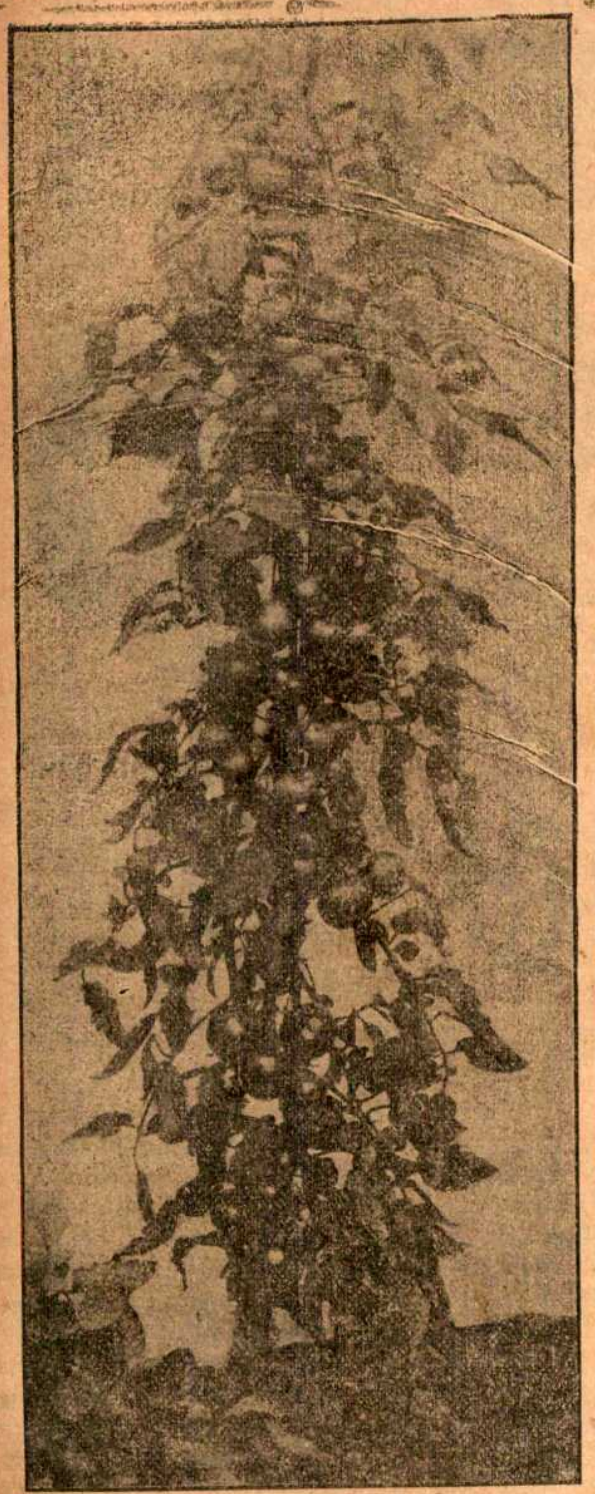

জীবাণু-সংক্রান্ত পচা ঘাসপাতার সারে বিলাতি বেগুনের জেয়াদা ফলন।

পুরাণো চিঠির ফাইল

এটি কোন্ এক বিয়ের নিমন্ত্রণ,
মুছে গেছে আঁখরগুলি যত,
কেবল রাঙা রঙটি আছে লেগে—
অতীত বিয়ের পাক্‌চুনারই মত।

২

এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি,—
চেয়েছে কার সাতাশ টাকা বাকি,
কাট্‌ঠোকরা কোথায় গেছে উড়ি'
নীরস শাখায় ঠোকর ক'টা রাখি'।

৩

এখান্ বটে আনন্দেরি লিপি—
পরীক্ষাতে পাসের প্রথম খবর;
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশী,
কাঁকুড় চেয়ে বীজটা তাহার জবর।

৪

একি? এ যে আদালতের সমন!
মুড়্‌কি সাথে বোল্‌তা কেন হেরি?
সাপ গিয়েছে খোল্‌সখানা ফেলি,
ফুলেই এ ছুঁচ মিশ্‌লো কেমন করি?

৫

এ চিঠিখান লিখ্‌ছে বাড়ীর ছেলে
ইষ্টিশানে পাঠিয়ে দিতে গাড়ী,
ছেলের এখন বহুৎ ছেলেপুলে,
ঠাকুরদাদা—চিন্‌তে তাঁরে পারি।

৬

এখানা এক ব্যব্‌সাদারের লিপি,
আস্‌তেছে এক ঔষধালয় হতে,
করেছে হায় পাঁচটি টাকা ভি-পি,
অনুরোধটা জরুর সেটা লতে।

৭

এ পত্রখান আত্মীয়েরি বটে!
চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার,
দেখ্‌ছি তাহার শীর্ণ হাতের পাতা,
'পাওয়ার' কোনো খবর নাহি আর।

৮

কোণটি ছেঁড়া, শোকের খবর এটি,
অতীত ভোলা সুদূর বুকের ব্যথা,
ছেলের গলার সোনার হারের সাথে
কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আলোর আড়াল

(৩)

শ্বশুরবাড়ী আসার পর প্রথম কদিন যে ভাবটা সারাক্ষণ মনকে ছেয়ে থাকত, সেটা একটা ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়। পাড়াগাঁয়ে গরীবের ঘরে মানুষ হয়েছি আমি, চারিদিকে এত ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি দেখে অবাক হওয়া বিচিত্র নয়; আর যখন মনে হত যে এই বাড়ী-ঘরেই এর পর আমাকে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, এই লোকগুলিকেই আপন বলে কাছে টেনে তাদের সঙ্গে ঘর করতে হবে, তখন স্বভাবতঃই ভয় এসে বুক জুড়ে বসত। আমি চিরদিন যা দেখে এসেছি, তার থেকে সবই যে বড় বেশীরকম আলাদা।

জমিদারদের মস্ত তিন চার মহলা বাড়ী, চাকর-দাসী পাইক-বরকন্দাজে অন্দর সদর সারাক্ষণ গিস্‌গিস্ করছে। একগেলাস জল গড়িয়ে খেতে গেলে তিনটে ঝি ছুটে এসে হাতের গেলাস কেড়ে নেয়। সমস্তক্ষণ কোলাহল, রাত একটার আগে তা থাম্‌বার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

পরিবারটিতে লোক যে খুব বেশী তা নয়, তবে অনুচরের দল অসম্ভব-রকম বড়, কাজেই মনে হয় বাড়ীতে যেন তিল ফেল্‌বার ঠাঁই নেই। আমার নিজের শাশুড়ী নেই, সৎশাশুড়ী, তিনিই আমার একমাত্র দেবর কেদিনী-মোহনের মা। তিনিই সংসারের কর্ত্রী। ঐ দেবরটি ছাড়া একজন বিধবা ননদ আছেন, তিনি আমার স্বামীর সহোদরা। তাঁর ছোট একটি ছেলে আছে, তার নাম কমলকুমার। এ ছাড়া দূরসম্পর্কীয়া অনাথা আশ্রিতাও দুচারজন ছিলেন।

শ্বশুর-বাড়ীতে পা দিয়েই আমার সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়েছিল এ বাড়ীর লোকদের অসামান্য রূপ। স্বামীকে আর দেওরকে আগেই দেখেছিলুম। এখন শাশুড়ী আর ননদকে দেখ্‌লুম, দুজনেই বিধবা এবং একজনের বয়েসও অনেক হয়েছে, কিন্তু দেখ্‌লে চোখ ফেরানো যায় না, ঠিক যেন:শাদা মেঘে ঢাকা সকালের আলো। ছোট্ট খোকা কমলকে দেখে মনে হল সত্যিই কমল, মুখ যেন ফুলের চেয়েও সুন্দর। বরণ হচ্ছে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি এ বাড়ীতে আমাকে মানাবে ভাল।

আমার অসাধারণ কুরূপে, আমি বোধ হয় সকলেরই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলুম, কারুর মুখে আর কথাটি নেই। দেওর মেদিনীমোহন একবার নিজের মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌লেন, তাঁর মুখে যেন বিদ্রূপের বান ডেকে গেল; কিন্তু শাশুড়ীর মুখে সে হাসির কোনো উত্তর দেখ্‌তে পেলুম না। ননদ মুখ গম্ভীর করে রইলেন। কেবল কমল-কুমার আমার চারপাশে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার লাল শাড়ীর আঁচল ধরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমারও লাল জামা আছে, আমিও পর্‌ব।"

বউকে অভ্যর্থনা করার পালা শেষ হতে অনেকক্ষণ লাগ্‌ল, শেষে আমার স্বামীর মহলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। মস্ত বড় বড় ঘরগুলো যেন হাঁ করে পড়ে রয়েছে, আমাদের দুটি মানুষের সাধ্য নেই যে তা ভরে রাখি। দেখে শুনে আমার যেন বুক দমে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর মুখের দিকে চোখ পড়্‌ল, এঁর জন্যে আমাকে সাহসে বুক বেঁধে চল্‌তে হবে। আমি যে ওঁর নষ্ট চোখের অভাব মোচন করতে এসেছি।

সন্ধ্যার সময় স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "লিনা, তোমার কি খুব মন খারাপ লাগ্‌ছে?"

আমি বল্‌লুম, "না, নিজের বাড়ীতে এসেছি, মন খারাপ লাগ্‌বে কেন?"

নূতন বউয়ের মুখে এমন কথা শুনেছ কখনো? কিন্তু অবস্থা যে আমার এমন হয়েছিল যে কেন-বৌ সাজ্‌বার একদিনও অবসর পেলুম না। যে মানুষের ভিতরে বাইরে কেবল আঁধার, তাকে আলো দিতে এসেছি, আমি কি একটা মুহূর্ত্তও মুখ আঁধার করে নষ্ট করতে পারি? প্রথম কয়েকটা দিন কি জ্বালাতনই লেগেছিল! এই রূপ! তাই নিয়ে সারাক্ষণ সেজেগুজে লোককে মুখ দেখাও আর তাদের চাপা শ্লেষের হাসি শোনো। বাপের বাড়ী ত যে মেয়েকে কাজ সারাদিন তাড়া করে বেড়াত, আমি তার কুটোখানা ভেঙে দুখান করবার জো নেই, তা হলেই দশজন হাঁ হাঁ করে উঠ্‌বে। একমাত্র যাঁর টানে এ বাড়ীকে আমি সইয়ে নেবার চেষ্টা করছিলুম, তিনিও এক দিন

একেবারে দুর্লভ হয়ে উঠেছিলেন, গভীর রাতে ছাড়া তাঁর আর দেখাই পেতুম না।

পাঁচ-ছ'দিন এম্‌নি করে থেকে আমার ত অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। এই পুতুলের মত করে জীবন কাটাবার মত কপাল করে যখন আসিনি তখন কেন এ ছেলেখেলা? আমাকে দিয়ে যে কত লোকে তাদের কত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে নিয়েছেন তা ত এখানে এসে আরও বুঝ্‌লুম। কথায় কথায় একদিন একজন আত্মীয়া আমায় জানিয়ে দিলেন যে মেদিনীমোহনের মামাতো বোনকে উনি বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন, সে মেয়ে তার পিসীরই মত রূপবতী। তাই আমার শাশুড়ী আমাকে বউ করে এনে আমার স্বামীর উপর শোধ তুল্‌লেন। দেওর একদিন রসিকতা করে বল্‌লেন, "দাদার আমার চিরকালই রুচিটা বড় বেশী মার্জ্জিত ছিল। কিন্তু স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার বেটাও যখন ছুঁচো হতে পেরেছিল, তখন ধরণীমোহনের মোহিনীও যে সেই দলে যাবেন তা আর আশ্চর্য্য কি?"

ধরণীমোহনের কপাল দেখি বিধাতা বড়ই ভাল করেছিলেন! নিজের ভাই, সেও তাঁর দুর্ভাগ্যে দুপাটি দাঁত বার করে ফেল্‌ল। আর আমার কপালের কথা না তোলাই ভাল।

যতই দিন যেতে লাগ্‌ল, ততই বেশী করে যেন বুঝ্‌তে লাগ্‌লুম যে এ বাড়ীতে আমি এসেছি বৌ হয়ে নয়, মূর্ত্তিমতী শাস্তি হয়ে। সংসারে আমার স্বামী অনেক অপরাধ করেছেন, রূপে তিনি অনিন্দ্য-সুন্দর, জমিদারের বংশের বড়ছেলে, অথচ স্বভাব গরীব-ঘরের ছেলের মত সংযত, তা ছাড়া সবচেয়ে বড় অপরাধ তাঁর এই যে তিনি এবং মেদিনী যদিও এক বাপেরই ছেলে তা হলেও টাকার বোঝা ওঁর অনেক বেশী এবং মেদিনীর অনেক কম, কারণ ওঁর মা ছিলেন ধনবান জমীদারের একমাত্র কন্যা, এবং আমার বর্ত্তমান শাশুড়ীঠাকুরাণী দরিদ্র-ঘরের মেয়ে কেবলমাত্র অসামান্য রূপের জোরে তিনি এ বাড়ীতে প্রবেশ লাভ করেছিলেন! যে মানুষ পৃথিবীতে এসে এতগুলো অপরাধ করেছে, তাকে যে শাস্তি পেতে হবে তা জানা কথা। কাজেই আমি এলুম। কিন্তু শাস্তিদাতাগুলিকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা আমার মনে ক্রমেই বেশী করে জায়গা দখল করতে লাগ্‌ল।

ভেবে দেখ্‌লুম আমি একরকম বাড়ীর গিন্নি বলা চলে। শাশুড়ী আছেন বটে, তবে তিনি আমার মহলের দিকে বিশেষ আসেন না, কাজেই আমার যা ইচ্ছা তা অন্তত আমি আরম্ভ করে দেখ্‌তে পারি, তারপর সেটা চালিয়ে যেতে পারব কি না তা পরের কথা। নিজের হাতে ওঁর সব কাজ করতে আরম্ভ করলুম। রান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, কিছুই বাকি রাখ্‌লুম না। আমাদের শোবার ঘরে চাকরদাসীকে ঢুক্‌তেই বারণ করে দিলুম। তারা প্রথম দিন হাঁ করে রইল, দ্বিতীয় দিন হাসাহাসি কর্‌ল, গরীবের মেয়ে যে জমিদারী চাল জানে না এতে তারা আমার উপরে অনেকখানি অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা খরচ করে ফেল্‌ল। দু-একজন উপদেশ দিতেও ত্রুটি কর্‌ল না। কিন্তু কিছুতেই গরীবের মেয়ের এ অসম্ভব চাল-চলন শোধ্‌রাতে না পেরে তারা শেষে দলবেঁধে আমার শাশুড়ীর কাছে হাজির হল।

সকাল বেলা আমি রান্নাঘরে বসে সবে কাজ আরম্ভ করেছি, এমন সময় দরজার কাছে শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মেদিনীমোহন দাঁড়িয়ে। আমায় ফিরতে দেখে তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, "কি বৌদি, ঘরে ঢুক্‌ব, না তা হলে কাজ মাটি হবে?"

আমি বল্‌লুম, "কেন, কাজ মাটি হবে কেন? এস।"

আমার দেওর আর-একবার তেমনি ভঙ্গী করে বল্‌লেন, "কি জানি, শুন্‌লাম তুমি ভয়ানক সাত্ত্বিক হয়েছ, আমাদের বাড়ীর কোনও চাকরবামুনকে দিয়েই আর তোমার কাজ চল্‌ছে না। আমরা চিরকালটা তাদের হাতেই খেয়েছি, আমাদেরও জাত গিয়েছে বোধ হয়।"

আমি চুপ করে রইলুম, কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে ত কথা ফুরবে না, তার চেয়ে নিজের কাজ করাই ভাল। দেওর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্‌লেন, "একবার তোমার হাতের রান্না খেয়ে দেখ্‌তে হচ্ছে, নিশ্চয়ই একটা কিছু তার আশ্চর্য্য গুণ আছে যাতে আমার রুচিবাগীশ দাদাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।"

'গুণ' কথাটার উপর তিনি এতখানি জোর দিলেন যে তাঁর রসিকতার মানে বুঝ্‌তে আমার একটুও দেরি হল না। কাক দেখ্‌লেই যেমন লোকের ঢিল ছুড়্‌তে ইচ্ছা

করে, আমাকে দেখলেই তেমনি বোধ হয় লোকের খোঁচা মারতে ইচ্ছা করে, এটা আমি জন্মে অবধি দেখে আসছি। মেদিনীমোহন অনেক করেও আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে না পেরে রান্নাঘর ছেড়ে নিজের লাল মখমলের চটিজোড়া পায়ে দিয়ে ফট্ ফট্ করে চলে গেলেন।

তারপর এলেন শাশুড়ী, মুখ তাঁর সব সময়েই গম্ভীর, সেই গাম্ভীর্য্য আরও খানিকটা বাড়িয়ে তিনি বললেন, "বৌমা, তুমি কচি খুকী নও যে কিছু বোঝো না। এসব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। হাজার হলেও তুমি এ বাড়ীর বৌ, তোমাকে এরকম ব্যবহার করতে দেখলে লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়। আমাদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, এতে যে ধরণীর অপমান হচ্ছে, তাও কি তুমি জান না?"

আরও অনেক কথা তিনি বলে গেলেন। আমি ঠিক করেছিলুম যে এদের হার মানাব। শাশুড়ী তাঁর যা বলবার ছিল বলে প্রস্থান করলেন। আমি জানতুম যে তিনি মুখের কথা ছাড়া আর কিছুই খরচ করবেন না। একেবারে যদি কিছু না বলতেন তা হলে সেটা লোকের চোখে খারাপ দেখাত। কিন্তু ধরণীর মাথা হেঁট হওয়াতে তাঁর আন্তরিক আপত্তি কিছুই ছিল না। কাজেই যদিও আর্য্য নিয়মানুসারে আমাকে খুন্তি-পেটা করে রান্নাঘর থেকে বের করে দেবার অধিকার তাঁর ছিল, তবুও অত্যন্ত উদারভাবে সে অধিকার তিনি উপেক্ষা করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সেদিন রান্না শেষ হতে আমার বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। সব সেরে ফেলে মস্ত একটা পেতলের জয়পুরী টেতে সব খাবার সাজিয়ে ঘরের দিকে চললুম। মার্ব্বেল-পাথরের মেঝে—এবাড়ীর সর্ব্বত্রই—বারাণ্ডা সিঁড়ি কিছু বাদ পড়েনি,—সব পার হয়ে খাবার ঘরে গিয়ে উঠলুম। নিজের হাতে আসন পেতে জল গড়িয়ে তার পর গেলুম ওঁকে ডাকতে। চাকরদাসীগুলো যেখানে-সেখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন তামাসা যেন তারা জন্মে কখনও দেখেনি।

ওঁর খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, নিজে খেয়ে সব পরিষ্কার করে ফেলে তারপর আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। উনি বসে বসে নিজের সেতার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। শুনেছিলুম বটে যে উনি খুব চমৎকার গাইতে বাজাতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে এসে অবধি তার কোনো পরিচয় পাইনি, সেতারটা দেখতাম বটে কিংখাবের খোলক পরে দেয়ালের গায়ে ঝুলে থাকত। পৃথিবীর সঙ্গে চোখে দেখার সম্পর্ক তাঁর যেদিন থেকে ঘুচে গিয়েছিল সেই দিন থেকে তিনি যেন অভিমান করেই আর-সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। আজকে আবার এতকাল পরে দেখি সেতারটা দেয়ালের গা ছেড়ে নেমে পড়েছে। মনে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল, তবে কি এতদিন পরে তাঁর মনে এমন কোনো সুখের স্পর্শ পৌঁচেছে যে তিনি তাঁর অভিমানও ভুলে গিয়েছেন?

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি বাজনাটা হাটের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, "শোনো মলিনা।"

আমি আস্তে আস্তে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। কি করে কথাটা পাড়বেন বোধ হয় ভেবে পাচ্ছিলেন না। খানিক পরে বললেন, "বামুনচাকরদের কাজ কি তোমার পছন্দ হয় না?"

বুঝলুম নালিশ একেবারে খাসদরবার পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। কিন্তু উনিও কি তাতে বিরক্ত হয়েছেন? তবে আর আমি কার জন্যে এসব করছি? সে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আনা তাই কি আমি নির্ব্বোধের মত ফেল করতে বসেছি? বুকের ভিতর থেকে কান্না যেন ঠেলে উঠতে লাগল, অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললুম, "ঝি-চাকরে তোমার সব কাজ করবে, এ আমার ভাল লাগে না।"

উনি আমাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, "কিন্তু এতে বড় বেশী গোলমাল হচ্ছে। কাজ কি? থাক, যেমন চলছিল চলুক না?"

এবার আর আমার চোখের জল বাধা মানল না। কান্না থামাবার চেষ্টা করতে করতে বললুম, "আমি কি তাহলে তোমার কোনো কাজেই লাগব না? কি করে তাহলে আমি বাঁচব? তোমার সেবা ছাড়া আমার জীবনের কোনো অবলম্বন নেই।"

আমার কান্না শুনে উনি আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে মাথায় মুখে হাত বুলতে বুলতে বল্‌লেন, "ছি, মলিনা, এই কথাতেই চোখের জল? তুমি যে আমার সমস্ত অভাব পূর্ণ করে দিতে চাও তাকি আমি জানি না? কিন্তু আমি ত কেবল একটা রক্ত-মাংসের শরীর মাত্র নয় যে কেবল তার পরিচর্য্যা কর্‌লেই আমার সব হলো? মানুষের মনেরও যে হাজার-রকম দাবি আছে তা ত জান? সুন্দরকে সে নিজের সব-রকম ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব কর্‌তে চায়। ভগবান আমার চোখ নিয়েছেন আর আমি রাগ করে আর-সব-কটা দরজা বন্ধ রেখেছি, এতে আমার মন যেন দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে উঠেছে। তাকে ত তুমি রক্ষা কর্‌তে পার। তোমরা অন্নপূর্ণার জাত, কিন্তু সে অন্ন কি কেবল মানুষের পাকযন্ত্রটাই লাভ কর্‌বে, তার আর-সব উপবাসী থেকে যাবে?"

আমি চোখের জল মুছে বল্‌লুম, "কিন্তু আমরা যে কেবল ঐটুকু কর্‌বারই শিক্ষা পেয়েছি, আর কিছু ত আমাকে কেউ শেখায়নি।"

উনি বল্‌লেন, "তোমার মত কর্‌বার আগ্রহ যার, তার কি আর শিখ্‌বার ভাবনা? আমি নিজেই অনেকটা শেখাতে পার্‌ব; যা না পার্‌ব, তার ভার অন্যে নেবে।"

সেদিন থেকে চাকর-দাসীরা নিজেদের হৃতরাজ্য আবার খানিক পরিমাণে ফিরে পেল। তা বলে যে তাদের বিস্ময়ের খোরাক ফুরিয়ে গেল তা নয়, বরং বাড়্‌লই। মেয়েমানুষে রান্না করে, ঘর ঝাঁট দেয়, এ বরং তাদের জানা ছিল, নেহাৎ জমিদারের বৌ বলেই যা একটু বেমানান লেগেছিল। কিন্তু মেয়েমানুষ যে মাষ্টার রেখে ইংরিজি পড়ে, স্বামীর কাছে গান বাজনা শেখে, তাও দিনে দুপুরে এবং ঘরের দরজা খুলে,—এ একেবারে তাদের সম্পূর্ণ অকল্পনীয় কাণ্ড। কিন্তু আমার স্বামীও এবারে আসরে নেমেছিলেন, কাজেই সোজা ভাবে কেউ আপত্তি জানাতে পার্‌ল না। শাশুড়ী আর এ মুখোও হলেন না। ননদ কোনো দিনই কারুর কোনো কথায় থাক্‌তেন না। অতবড় জমিদারের অতি আদরের মেয়ে ছিলেন তিনি, তারপর স্বামীরও খুবই আদরিণী হয়েছিলেন। সেই বাপ এবং সেই স্বামী যখন এক বৎসরের মধ্যেই মারা গেলেম, তখন তিনি দুর্জ্জয় অভিমানে আর ক্ষোভে সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্কই ছেড়ে দিলেন। এমন কি ছেলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ যেন ততটা গভীর ঠেকৃত না। তিনি স্বভাবতঃই গর্ব্বিতা আর অভিমানিনী ছিলেন, এবং চিরকাল তাঁর কথা সকলের আগেই রাখা হত; তাই যখন দেখ্‌লেন যে তাঁর কথা এখন আরও পাঁচজনের কথার সমানই হয়েছে, এমন কি পাঁচজনের কথার তলায় মাঝে মাঝে চাপাও পড়্‌ছে, তখন তিনি এত বড় ঘা খেলেন যে কথা বলাই একরকম ছেড়ে দিলেন। আমি তাঁর নিজের ভাইয়ের স্ত্রী, কিন্তু এতদিনের মধ্যে তিনি আমার সঙ্গেও দু তিনটার বেশী কথা বলেননি। কাজেই পারিবারিক গোলমালের মধ্যে যে তিনি ঢুক্‌বেন না এ কিছুই বিচিত্র নয়।

কেবল শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম মেদিনীমোহনই সম্পর্কটা বজায় রাখ্‌লেন। এমন দিন যেত না যেদিন তিনি অন্তত একটা খোঁচাও না দিয়ে ছাড়্‌তেন। হয়ত সকালে পড়া শেষ করে সবে বই গুছিয়ে তুল্‌ছি, এখানকার স্কুলের একজন বুড়ো মাষ্টার আমায় পড়াবার ভার নিয়েছিলেন, এমন সময় দেওর এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "ইস্, সরস্বতী-ঠাকরুণ বোধ হয় এতক্ষণ হিংসের চোটে শাঁওড়া-গাছে উঠে গেছেন! আমাদের কল্যাণে এতদিন তবু টিঁকে ছিলেন, তাঁকে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণাই দিইনি; কিন্তু বৌদি, তুমি তাঁকে দেশ-ছাড়া কর্‌লে। লক্ষ্মী-ঠাকরুণ ত অনেককাল পালিয়েছেন, এত তাঁর তাড়া যে বাহনটিকে নিয়ে যেতেও ভুলে গেলেন।"

আর-একদিন ওঁর কাছে গান শিখ্‌ছি। প্রথম প্রথম লজ্জায় মরে যেতুম, কিছুতেই ওঁর সাম্‌নে গলা খুল্‌তে চাইত না, শেষে একরকম সয়ে গিয়েছিল। উৎসাহ এত পেতুম যে নেহাৎ আমি বলেই বিশ্বাস করিনি, অন্য মেয়ে হলে ভাব্‌ত নিজে সাক্ষাৎ কিন্নরীই বোধ হয়। কখন যে গানের মাঝখানে মেদিনীমোহন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তা জান্‌তেও পারিনি। গান শেষ হতেই হটাৎ তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "বা রে, বৌদি যে সাক্ষাৎ কোকিল। না দাদা?"

তাঁর দাদা বল্‌লেন, "গলাটা বটে সেই-রকম।"

আমার দিকে চেয়ে বিকট মুখভঙ্গী করে দেওর বল্‌লেন,

"শুধু গলাটা, তাই নাকি?" বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমার স্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বল্‌লেন, "মলিনা, তুমি এসে আমার সব দুঃখ ঘুচেছে, কিন্তু তোমাকে যে আমি চোখে দেখ্‌তে পেলাম না এ দুঃখ আমার যাবে না।"

আমাকে চোখে দেখেননি এই তাঁর দুঃখ, হায় রে কপাল! আমি কোনো মতে বল্‌লুম, "আমায় না দেখে ভালই হয়েছে, আমি ত দেখ্‌তে ভাল নয়।"

আমার স্বামী আমাকে একেবারে তাঁর বুকের উপরে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "না মলিনা, আমি বিশ্বাস করি না, সবাই যাই বলুক। আমার দৃষ্টিহীন চোখে আমি দেখ্‌তে পাই তুমি মূর্ত্তিমতী আনন্দ, কালরাত্রির অবসানের মত সুন্দর, আঁধার আকাশে তারার মত সুন্দর, তুমি কুৎসিত কখনো হতে পারো না, তুমি এসে যে আমার আঁধারকেও সুন্দর করে তুলেছ।"

আমি তাঁর হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেলুম। ওগো এই দিনের প্রতীক্ষায় আমি যে আমার বিয়ের রাত্রি থেকে চেয়ে ছিলুম, তিনি ত আজ স্বীকার কর্‌লেন যে আমি তাঁর জীবনে আনন্দই নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার আনন্দ হল কৈ? ভেবেছিলুম এই দিনটার বিজয়ানন্দে বুঝি পৃথিবী ভরে যাবে। কিন্তু কোথায়? ঘরের মেঝেয় পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম। এত ভালবাসা, এত আনন্দ, এ সবই কি মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে? আমাকে তিনি কি ভেবে ভালবাস্‌ছেন, তা ত জান্‌তে পার্‌লুম। তবে এসব কি আমার প্রাপ্য নয়? আমি কি ঠকিয়ে নিচ্ছি? তাঁর মানসপ্রতিমা যে আমার সতীন হয়ে বস্‌ল।

কিন্তু পড়ে পড়ে কাঁদ্‌বারই কি আমার সময় আছে? তখুনি ওঁর ডাক এসে পৌঁছল, চোখের জল মুছে আবার ফিরে গেলুম।

এম্‌নি করে দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল। সারাক্ষণ ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি, যতদিক দিয়ে পারি তাঁর অভাব মিটিয়ে চলি। গান শুন্‌তে ভালবাসেন, তাই গান বাজ্‌না শিখ্‌লুম; স্কুলের সখ ছিল, দুজনে মিলে বাগান কর্‌লুম—রঙের বাহার না দেখুন, তাদের সুগন্ধ ওঁকে রড় আনন্দ দিত। বই পড়ে শোনানো ত আমার দুবেলার কাজ হল। ওঁর আবার লেখারও মাঝে মাঝে সখ ছিল; উনি মুখে বল্‌তেন, আমি লিখে নিতুম; নিয়ে মাসিকপত্রে, খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিতুম। দিনের পর দিন যত দেখ্‌তুম মুখে ওঁর আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে, সেতারের ঝঙ্কারে, গলার সুরে সেই ভাবই ঝরে পড়ছে, তত আমার বুকের ভিতর কান্নাহাসির ঢেউ একসঙ্গে দুলে উঠ্‌ত। আমিও কি ওঁকে প্রতারণা করছি? কিন্তু কি কর্‌ব আমি? আমি ত কিছু লুকোই নি, উনি যদি না বিশ্বাস করেন আমি কি কর্‌ব? আমার পূজার অর্ঘ্যে কোনো ত্রুটি আমি রাখিনি, পূজারিণীর ত্রুটি সংশোধন ত আমার হাতে ছিল না। দেবতা জান্‌তেন আমার কোনো অপরাধ ছিল না, কিন্তু আমার ধরার দেবতাকে ত তা আমি বোঝাতে পার্‌তুম না।

শ্বশুরবাড়ী আসার পর আর একবারও বাপের বাড়ী যাইনি। পুজোর সময় মা নিয়ে যাবার জন্যে খুব জেদ করেছিলেন, শাশুড়ীকে অনেক মিনতি করে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি এসে ওঁকে বল্‌লেন, "ধরণী, বেয়ান লিখেছেন বৌমাকে তিনি পূজোর সময় বাড়ী নিয়ে যেতে চান। তোমার মত থাকে ত বোলো, পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেব।" মত আছে কি না জান্‌বার অপেক্ষা না করেই তিনি চলে গেলেন।

স্বামী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন, "মলিনা, তোমার যদি যাবার ইচ্ছে থাকে ত বলো, আমি কোনো বাধা দেব না।"

দেখ্‌লুম তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। আমায় থাকা না-থাকাতে কারু যে কিছুমাত্র আনন্দের তারতম্য হয়, একথা এককালে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। একটুও না ভেবে বল্‌লুম, "না, আমি যাব না, তোমাকে একলা রেখে যেতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই।"

নিজেই মাকে লিখে দিলুম আমার যাবার সুবিধা হবে না। নিজের মেয়েও যে টাকার মায়ার পর হয়ে যায় এবিষয়ে অনেক কথা বলে মা সে চিঠির উত্তর দিলেন। কিন্তু আমি যে স্বয়ম্বরা হইনি সে কথাটা তাঁরা সুবিধামত বেশ ভুলে গিয়েছিলেন। তারপরেও চিঠিপত্র চল্‌ত, মাঝে

একবার বাবা খোকাকে নিয়ে দেখ্‌তেও এসেছিলেন। কিন্তু আমি সত্যিই পর হয়ে গিয়েছিলুম, খসে-পড়া ফুল-ফলেরই মত আমার আর জন্মস্থানে ফির্‌বার কোনো উপায় ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উনি যখন ভিতরে এলেন তখন দেখ্‌লুম মুখ কেমন যেন গম্ভীর। রোজই তিনি একবার বৈঠকখানাতে গিয়ে বস্‌তেন, কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেন, বন্ধুবান্ধবদেরও আগমন কম হত না। সন্ধ্যার পর আর বাইরে থাক্‌তেন না, ভিতরে এসে আমাদের ঘরের সাম্‌নের খোলা ছাদটায় বস্‌তেন। কোনো দিন আমি তাঁকে বই পড়ে শোনাতুম, কোনো দিন বা উনি সেতার বাজাতেন, গান কর্‌তেন। নীচের ফুলবাগান থেকে ফুল তুলে এনে ওঁর জন্যে বড় বড় গড়ে মালা গেঁথে রেখে দিতুম, উনি বল্‌তেন, "সবই কেবল আমার জন্যে, নিজেও কেন ফুলের গয়না করে পরো না?" হাসি আস্‌ত, আমার এই অঙ্গে ফুলের গহনা যা না সুন্দর মানাবে।

মুখ গম্ভীর দেখে আমি বল্‌লুম, "কি হয়েছে, অমন করে ঘরে এসে বসে রইলে কেন? ছাদে আজ যাবে না? আজ যে তোমার বাজানোর দিন।"

উনি বল্‌লেন, "আজ আর কিচ্ছুর দিকে মন যাচ্ছে না, একটা কথা শুনে অবধি তাই কেবল মাথার মধ্যে ঘুর্‌ছে। মানুষের আশার ত অন্ত নেই, অসম্ভবকেও সে বিশ্বাস করে বসে।"

আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "কি কথা গো?"

উনি বল্‌লেন, "ভবেশ আজ বল্‌ছিল যে আমার মত চোখের অসুখ নাকি কল্‌কাতার একজন নূতন ডাক্তার দুতিনজনের সারিয়েছে। তাকে একবার আনালে হয়, কি গিয়ে একবার দেখিয়ে এলে হয়।"

কল্‌কাতাই যাওয়া ঠিক হল। জিনিষপত্র গুছিয়ে গোটা তিন চার চাকর এবং দুজন সর্‌কার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম। গাড়ীতে যখন উঠ্‌তে যাচ্ছি তখন আমার দেওর এসে বল্‌লেন, "বৌদিদি, চলেছ নাকি? মুখ যে বেজায় গম্ভীর? পতিগতপ্রাণা সতী হিন্দুরমণীর মুখের ভাব ত ঠিক এমন হওয়া উচিত নয়। কি যে তুমি এখন ভাব্‌ছ তা আমার ভারি জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

নিজের ভাব্‌না যে আমি নিজের কাছেই একদিন স্বীকার কর্‌তে ভরসা পাইনি, তা আমার এই পরম সুহৃদ দেওরকে জানাব কি করে? পতিগতপ্রাণা মেয়ের কি ভাবা উচিত ছিল তা জানি না, আমি যা ভাব্‌ছিলুম তা যে সব নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম না। ভগবান চিরকাল আমার কপালে এই লিখেছেন, সুখদুঃখ ভালমন্দ আমার এমন জট পাকিয়ে দিয়েছেন যে তাদের আমি একটা দিনের জন্যেও ছাড়াতে পার্‌লুম না, ফুলের সঙ্গে কাঁটা আমার চিরদিন গাঁথা রইল।

কল্‌কাতায় মোটে সাত-আটদিন ছিলুম। সায়েব-ডাক্তার এল, দেখে শুনে বল্‌লে, "অনেক দিন ধরে চিকিৎসা কর্‌তে হবে। তবে সার্‌বার আশা আছে।"

ওষুধের মস্ত ফর্দ্দ নিয়ে, সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে মস্ত বড় বক্তৃতা শুনে আবার বাড়ী ফির্‌লুম।

গাড়ীতে বসে সারাক্ষণ উনি কেবলি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আচ্ছা মলিনা, সত্যি যদি আমি আবার দেখ্‌তে পাই তাহলে কেমন হয়?"

ডাক্তারে যা যা কর্‌তে বলেছিল, প্রাণ দিয়ে সব কর্‌তে লাগ্‌লুম। যখন উনি ভেবেছিলেন যে জগতের সঙ্গে ওঁর চোখে-দেখার সম্পর্ক চিরদিনের মত চুকে গিয়েছে, তখন অন্য অনেক পথ দিয়ে তিনি সেই সম্পর্ক বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন, আমিই ছিলুম তাতে তাঁর সহায়। এখন আবার সেই হারানো চোখ ফিরে পাবার আশা হল, অম্‌নি তিনি সব ভুলে একান্ত আগ্রহে সেই-দিকেই ঝুঁকে পড়্‌লেন। ডাক্তারি ব্যবস্থার ভাব্‌না ভাব্‌তে গিয়ে আমার পড়াশুনো কোথায় গেল তার ঠিক্ নেই; ওঁর সেতার আবার দেয়ালের গায়ে উঠ্‌ল; গানও থেমে গেল; ফুলের বাগানে উড়ে মালীর অধিষ্ঠান হল, ফুলগুলির যে দশা হল তা আমার খোঁজ নেবারও সময় হল না।

ওঁর চোখ ভাল হবার আশা ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। একদিন বল্‌লেন, "জানো মলিনা, আমার মনে হচ্ছে আমি আবার দেখ্‌তে পাব। মাঝে-মাঝে মনে হয় ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা কি-সব যেন চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে, অন্ধকার ঘরে প্রথম চোখ মেল্‌লে মানুষ যেমন দেখে, তেম্‌নি।"

আজকাল উনিই কেবল কথা বলতেন, আমি কেবল চুপ করে শুনতুম্।

মেদিনীমোহন প্রায়ই এসে খুব ব্যস্ত হয়ে খবর নিতেন, "দাদা, আজ কেমন ঠেকছে?"

উনি প্রায়ই হেসে বলতেন, "কি জানি, ঠিক বুঝি না, একমাস এই ব্যবস্থায় ত চলি, তারপর ডাক্তার-সাহেব দেখে যদি ভরসা দেন, তাহলে সাহস করে আশা করতে পারব।"

প্রতিদিনের মত দেওর-মহাশয়ের আগমন হলে, ভাইয়ের খবর নেবার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বৌদি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, কিন্তু সেটা দাদার সামনে কিছুতেই হবে না, চল পাশের ঘরে। দাদা, বেশী রাগ কোরো না।"

কথাগুলো শুনতে মিষ্টার মত, উনি হাসলেন। মেদিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমার মুখের হাসি মুখেই থেকে গেল, কথা না বলে দেওরের সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেলুম।

ঘরে ঢুকেই মেদিনী বললেন, "আচ্ছা বৌদি, প্রথম-প্রথম ত তোমায় খুব চালাক চতুর লেগেছিল, কিন্তু দাদার আদরের চোটে তোমার মাথা ঘুরে গেছে নাকি?"

আমি বললুম, "কি আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার লক্ষণটা দেখলে তুমি?"

হাসিতে মুখ একেবারে ভরে ফেলে তিনি বললেন, "তাই বলতেই ত এলুম। দাদার এত আদরেও মন উঠছে না বুঝি, তাই চোখ সারিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়ে তাঁকে একেবারে পেড়ে ফেলবার চেষ্টায় আছ? আমার মামাতো বোনকে দেখে তাঁর পছন্দ হয়নি, তোমাদের গাঁয়ের সেই কনক না কি তার নাম, সেই মেয়েকে দেখে দাদার আমার নাকি হাসিই পেয়েছিল, তোমার রূপে তাঁর চোখ আবার তখুনি না কাণা হয়ে যায়। আমি অবিশ্যি দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে লোকে অর্থাৎ আমি যে তোমায় কুৎসিত বলি সেটা আমার রসিকতা মাত্র, আসল কথাটা তার উল্টো। বেচারা তাই বিশ্বাস করে সুখে আছে, কিন্তু তুমি তার সে সুখের স্বপ্ন সইতে পারছ না দেখছি। আরও দিনকয়েক অমনি একাগ্রমনে পতিসেবা করলেই দাদার আমার একেবারে চোখ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ সার্থক হয়ে যাবে।"

এই একমাস ধরে শয়তান আমার মনে কেবলি যে ইঙ্গিত মেরেছে। আমি যে চোখ বুজে থাকতুম নিজের মনের নরক দেখতে চাইতুম না, পাপের রাজ যে কতবার আমার কানে মন্ত্র দিয়েছে, আমি যে চমকে তাকে মন থেকে তাড়িয়েছি। কিন্তু আজ যে সে আমার মনের নরক ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে, এই যে সে সামনে দাঁড়িয়ে হাসি তার বাঁকা ঠোঁট থেকে ফেটে পড়ছে। মাগো, এমন দেবপুত্রের মত চেহারা, কিন্তু বুকের ভিতর এত কালসাপ! আমার দেওর আবার সুরু করলেন, "দেখ বৌদি, আমি ভাল কথা বলছি। দাদাকে তুমি যেমন অমানুষ আর সাত্ত্বিক মনে করো, মোটেই তিনি তা নন। মহাৎ দায়ে পড়েই এখন কাঁটা মুড়ো খেয়ে-দেয়ে খড়ের দড়ি গলায় দিয়ে বৃন্দাবন যাবার চেষ্টায় আছেন। এককালে তাঁর চালে তিনি আমাদের তিন মাইল পিছনে ফেলে রাখতেন। বিশ্বাস করছ না? আচ্ছা, একবার ধরণীমোহন চোখ চাইতে পারুন, তখন বিশ্বাস করতে পথ পাবে না।"

আমার বুকের ভিতর অবধি যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, কোনো রকমে বললুম, "তুমি আমাকে এ কি বলছ ঠাকুরপো? তুমি না তাঁর ভাই?"

"ভাই বলেই ত বলছি। তোমায় একবার চোখে দেখলে আমার দাদাটির এমন পিলে চমকে যাবে যে আর সামলে উঠতে নাও পারেন। আমি আবার তাঁকে বলে রেখেছি তুমি তিলোত্তমারই সাক্ষাৎ ছোট বোন। কি, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? ভাবছ এখুনি দাদার কাছে কেঁদে পড়ে আমার ভীষণ কুপরামর্শগুলোর কথা বলে দেবে? তা দাও গিয়ে, আমি তাতে ভড়কাবার ছেলে নয়, মেদিনীমোহন-শর্ম্মাকে এখনও কেউ ভয় পেতে দেখেনি।" এই বলে আমার গুণধর দেওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। যেতে-যেতেই ফিরে বললেন, "দাদার চোখে ছুকোঁটা ওষুধ না দিয়ে ছুকোঁটা জল দিলেও সে কিছু তফাৎ বুঝত না, মাঝখান থেকে তুমি চিরকাল দুর্ভিতে কাটাতে।"

সেইখানেই বসে রইলুম, অনেকবার উনি ডাকতে পাঠালেন, লোক ফিরিয়ে দিলুম, বললুম, "আমার অসুখ

করেছে, এখন যেতে পারব না।" সে রাত্রে ওঁর খাওয়া হল কি না তারও খোঁজ নিলুম না। শয়তানকে চোখের সাম্‌নে থেকে দূর করলুম, কিন্তু মন থেকে সে গেল কই? তার কথাগুলো যেন আমার বুকের ভিতর কে আগুনের অক্ষরে লিখে দিয়ে গেল, সে আর ভুল্‌বার সাধ্য রইল না। সারারাত মেঝের উপর পড়ে পড়ে কেবল ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলুম যে এসব স্বপ্ন, এমন করে কি কপাল কারো পোড়ে?

একদিন ছিল যখন আদর যত্ন কাকে বলে তা জান্‌তুমই না; আনন্দ, যা নেহাৎ ভগবানের আলো-বাতাসের কাছ থেকে পাওয়া যায় তার বেশী কিছুই পাইনি। তারপর এল এক যুদ্ধের দিন,—আমার সমস্ত পরিচিত জগৎ আমায় একদিকে ঠেলেছে, অন্ধ স্বামীর হাত ধরে একলা বাঙালীর মেয়ে আমি আর-একদিকে গিয়েছি। সেই পথের শেষে কি আনন্দের আলোই দেখেছিলুম! চল্‌তে চল্‌তেই যে বুক ভরে উঠ্‌ছিল। যে ভালবাসা আমি পেয়েছিলুম স্বপ্নেও যে মানুষ তার চেয়ে সুন্দর কিছু দেখে না। কুরূপা আমার কাছে আগে যে জগৎ লোহার মত কালো আর কঠিন ছিল তাই যে পরশমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে উঠেছিল। এমন সময় কোথা থেকে এল এই কাল-কেউটে? এর ছোবলে আমার সারা পৃথিবী যে বিষিয়ে উঠ্‌ল। আমিই এই বিষ বুকে নিয়ে বাঁচব কি করে? কিন্তু মর্‌তে যে আরও পারি না, তাঁকে ফেলে যাব এই পিশাচের নাচের মধ্যে? বড় গর্ব্ব করেছিলুম, তোমরা আমাকে এনেছ ওঁকে শান্তি দেবে বলে, আমি তোমাদের দুরাশা ভেঙে দেব। বিধাতা আমার অহঙ্কার এম্‌নি করে চূর্ণ করে দিলে? ভোরের আলো মুখে এসে পড়্‌ল, চম্‌কে উঠে বস্‌লুম। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন একলা। আমার উঠে বস্‌বার শব্দে বুঝ্‌তে পেরেছেন আমি এই ঘরে। বুকের ভিতর যত কান্না লুকনো ছিল সব ফেটে পড়্‌ল, ওঁর দৃষ্টিহীন মুখের দিকে চেয়ে। উনি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আমার কাছে এসে বল্‌লেন, "মলিনা, এখন ভাল আছ?"

চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লুম, "হ্যাঁ ভালই আছি, চল ও-ঘরে।"

ওঁর হাত ধরে ও-ঘরে যেতে যেতে মনে মনে আবার একটা প্রতিজ্ঞা করলুম। প্রথমটা করেছিলুম বাসরের রাতে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীসীতা দেবী।

হাসি

১

অশ্রু-সাগর পার হয়ে আজ
এল আমার হাসি,
ভাঙা বুকের বেলায় বসি'
বাজায় রাঙা বাঁশী।
সাত-সাগরের-নাওয়া হাসি
সাগর-ফেনা-জড়া,
কণ্ঠে মোহন মোতির মালা
স্বাতীর জ্যোতি-ভরা।
পাখায় ঝরে শীকর-কণা,
চোখের কোণে জল,
সাত-সাগরের-ধোওয়া হাসি—
কেমন হাসি বল্?

২

কোন্ অমরার হাসি আমার,
কোন্ আকাশের আলো,
নিখিল-তিমির কবুলে উজল
নিবিড়-ঘন কালো?
কোন্ সুদূরের হাসি আমার,
কোন্ বিদেশের বঁধু,
দুবার-তোরণ পেরিয়ে এলে
ফুল্-ফাগুনের মধু?
ও হরষের হাসি আমার,
গো অ-মৃতের হাসি,
মরণ ফুঁড়ে' বেরিয়ে এলে—
তোমায় ভালোবাসি!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

বানরের ভাষা

ডাঃ গার্‌নার কর্ত্তৃক

বিবৃত

বানরের ভাষা শিরোনাম দেখিয়াই অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিবেন—বানরের আবার ভাষা? বাঁদুরে ভাষার বরং অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু বানরের আবার ভাষা কি?

ভাষা শব্দের সংজ্ঞা স্থির করা যাক আগে। ভাষা মানে অর্থযুক্ত উচ্চারিত শব্দ। প্রায় সকল প্রাণীই শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে; যে প্রাণীর শব্দ সেই জাতীয় অপর প্রাণীর কাছে অর্থযুক্ত বোধ হয় সেই শব্দকেই ভাষা বলা যাইতে পারে। এক প্রাণীর মনের চিন্তা ও ভাব শব্দ দ্বারা অপর প্রাণীর মনে সঞ্চারিত করিতে পারাই ভাষার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সংজ্ঞা অনুসারে প্রায় সকল প্রাণীরই নিজস্ব এক-একটি ভাষা আছে।

সিংহ যখন একলা থাকে, সে মাটির কাছে মুখ পাতিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে—হয়ত সে জানে মাটি তার গর্জ্জন দূরদূরান্তে বহিয়া লইয়া প্রতিধ্বনিত করিবে। যুদ্ধে আহ্বানের বেলা এই গর্জ্জন ভিন্ন-প্রকারের হয় এবং অপর সিংহ তাহা শুনিবামাত্র সেই-রকম গর্জ্জন করিয়াই জবাব দ্যায়। আবার অপর-রকমের গর্জ্জনের জবাব কেবল সিংহীরাই দিয়া থাকে; এবং সিংহীর জবাব যেদিক্ থেকে আসে সেই দিক ঠিক করিয়া সিংহ চলে ও উভয়ে মিলিত হয়। চিড়িয়াখানায় বন্দী সিংহরা খাবার সময় হইলেই ডাক ছাড়ে। তার মানে, সময় হইয়াছে, খাবার দিতে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। সিংহ বিরক্ত হইলে গজ্‌রায়, তার মানে—সাবধান, আমায় আর ঘাঁটাইয়া রাগাইয়ো না। বিড়াল শ্রেণীর জন্তুদের ভাষা খুব অস্পষ্ট। ঘরো বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া মরুভূমির সিংহ পর্য্যন্ত খুসী হইলে ঘরর্-ঘরর্ করিয়া অন্তরে একরকম শব্দ করে। এ শব্দ গজ্‌রানোর ঠিক বিপরীত ভাব প্রকাশ করে।

কুকুরের গোঙ্‌রানি বিড়ালের গোঙ্‌রানির চেয়ে স্পষ্ট। খেলার সময় কুকুর গোঙ্‌রায়; রাগ হইলে এই শব্দ আর-একটু তীব্র হয়, এবং তখন তার দাঁত বাহির হইয়া পড়ে। মানুষেরও রাগের সময় বা দারুণ ব্যথার সময় ঠোঁট গুটাইয়া গিয়া দাঁত বাহির হইয়া পড়ে। যারা কুকুর পোষে, তারা জানে কুকুরের ডাকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে; বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দের ডাক ও অপরিচিতকে দেখিয়া সাবধানের ডাক বেশ সহজেই চেনা যায়। অন্য কুকুর দেখিয়া ঝগড়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় বিরক্তি আনন্দ সাবধানতা প্রভৃতি বুঝাইবারও ভিন্ন ভিন্ন ডাক আছে।

এক শেয়াল ডাকিয়া উঠিলে, সব শেয়াল সাড়া দ্যায়। নেকড়ে বাঘদেরও এই স্বভাব।

হাতী এক-রকম নিঃশব্দ প্রাণী। কিন্তু তারাও ক্ষুধা ভয় বিরক্তি বুঝাইতে শিঙা ফোঁকার মতন নানান-রকম শব্দ করে। বীভারও প্রায় নীরব প্রাণী; তাদেরও এক-রকম গুঞ্জন আছে।

কীটপতঙ্গ প্রভৃতিও শব্দ করে। মদ্দা পোকা যখন শব্দ করে তখন মাদী পোকা বোঝে যে তাকে ডাকিতেছে।

জিরাফের শব্দ প্রায় শোনা যায় না; তবু তারা মাঝে মাঝে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে চায়।

হরিণের পাল চরিবার সময় কয়েকজন পাহারা দ্যায়;

ভয়ের সম্ভাবনা বুঝিলে পাহারাদারেরা দলের সকলকে খবর সঙ্কেত করে—প্রায়ই লেজের নিশান তুলিয়া; কিন্তু কখনো কখনো তারা মুখেও শব্দ করে। বনে মাঝে মাঝে দুই মদ্দা হরিণে মাদী হরিণের অধিকার লইয়া লড়াই বাধে; তখন শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকির শব্দ শুনিয়া দূর হইতে অপর মদ্দা হরিণেরা সেখানে ছুটিয়া যায়; এবং যার জন্য লড়াই, মাঝে হইতে তাকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করে। হরিণদের এই স্বভাব জানিয়া, শিকারীরা বনের

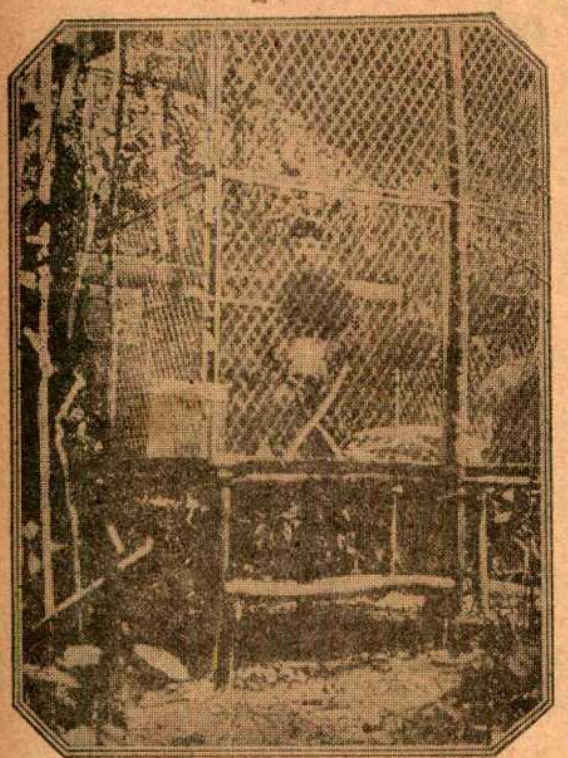

আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বানরের প্রতিবাসী হইয়া ডাক্তার গার্‌নার তাদের ভাষা শিখিতেছেন।

মধ্যে গিয়া মরা হরিণের দুটা শিং লইয়া ঠোকাঠুকি করিয়া শব্দ করে; এবং সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া হরিণ সেখানে আসিলেই তাকে বধ করে।

যে প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি যত পরিপুষ্ট ও উন্নত, তার মননশক্তি তত ব্যাপক ও প্রবল হয়; সেইজন্য তার চিন্তায় ও ভাবে বৈচিত্র্য অধিক হয়। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত, তার মননশক্তি তাই প্রবল, এবং তার চিন্তা ও ভাবও বিচিত্র। মানুষের মধ্যেও আবার সভ্যতার ও জ্ঞানচর্চ্চার তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভাষায় পার্থক্য তারতম্য শব্দের ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। যে জাতি সভ্যতায় ও জ্ঞানচর্চ্চায় উন্নত তাদের ভাষায় শব্দ-সংখ্যা, অসভ্য অনুন্নত জাতির ভাষার শব্দসংখ্যা অপেক্ষা, অনেক বেশী হয়। ভারতবর্ষের সভ্যজাতিদের সংস্কৃতমূলক ভাষার শব্দসংখ্যা সাঁওতালী কোল ওরাঁও মুণ্ডারী গারো খাসিয়া ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদের ভাষার শব্দসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী; আবার ইংরেজরা বিজ্ঞান বাণিজ্য যুদ্ধ আবিষ্কার প্রভৃতি কর্ম্মে নিজেরা অগ্রসর এবং অন্যান্য অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে যোগযুক্ত, এজন্য ইংরেজী ভাষার শব্দসংখ্যা বাংলা ভাষার শব্দসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী ও বিবিধ। জগতের মধ্যে আফ্রিকার বামন মানবদের ভাষার শব্দের পুঁজি সবচেয়ে কম, মাত্র ত্রিশ-বত্রিশটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া তারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। হোক না তাদের বাক্যের পুঁজি বত্রিশ, তবু ত সেটা একটা ভাষা, এবং সেটা মানুষেরই ভাষা।

মানুষ ছাড়া অপর জন্তুদের মধ্যে বানরই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান জীব। হইবারও কথা, কারণ জীব-বিবর্ত্তনের ক্রমাভিব্যক্তিতে বানরের আসন নরের ঠিক আগের পৈটাটিতেই। বানর শব্দ করে, এবং অপর বানরেরা তার মানে বোঝে। সুতরাং বানরেরও একটা ভাষা আছে।

বানরের ভাষার শব্দের উচ্চারণ ও শব্দের মানে কোন্‌টার কি, স্থির করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন আমেরিকার ডক্‌টার রিচার্ড এল গার্‌নার্‌।

গার্‌নার্‌ নিজেকে বানরের ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দিয়া বানরে বানরে কথা বলা লক্ষ্য করিতে ও তাদের ধ্বনি শুনিতে আরম্ভ করেন। এবং কোন্‌ ধ্বনির উচ্চারণ কিরূপ তাহা লিখিয়া রাখিয়া সেই ধ্বনির ফল বানর শ্রোতাদের মধ্যে কি দেখা যায় তাহাও পাশে পাশে লিখিয়া রাখিতে থাকেন। তিনি ইহা হইতে দেখিতে পান বানরের শব্দের মধ্যে অর্থযুক্ত ভাষা ও অভাষা দুইই আছে। ভাষা তারা উচ্চারণ করে ইচ্ছা প্রয়োগ করিয়া, তাতে একটা বাসনা প্রকাশ করিতে তারা চায়, এবং সেসব শব্দের

উচ্চারণের ধ্বনি ইচ্ছাতরঙ্গিত ; আর অভাষার শব্দ অনিচ্ছায় হঠাৎ প্রকাশ পায় এবং তার কোনো মানে থাকে না। এদের তিনি যথাক্রমে নাম দ্যান বাক্য-শব্দ ও ধ্বনি-শব্দ।

বানরেরা ভয় পাইলে ঠোঁট গুটাইয়া সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া তীক্ষ্ণ কিচকিচ শব্দ করে ; ভয় পাইলে বানরেরা ঘন ঘন হাই তোলে, যাতে যে তাদের ভয় পাওয়াইয়াছে সে তাদের বড় বড় দাঁত দেখিয়া নিজেই ভয় পায়। ঠোঁটে ঠোঁটে হঠাৎ চুম্‌কুড়ির শব্দ করিয়া বানরেরা প্রশ্ন করে।

একদিন গার্‌নার সিন্‌সিনাটি জু-গার্ডেনে গিয়া দেখিলেন যে একটা খাঁচায় একটা বড় ম্যাণ্ড্রিল-বানরের সঙ্গে নানান্ জাতের ছোট ম্যাণ্ড্রিল বন্ধ আছে ; খাঁচাটা দো-কাম্‌রা, মাঝখানে একটা ছোট দরজা আছে। ছোট ছোট বানরগুলি বড় বানরটার ভয়ে যে বিব্রত হইয়া আছে, তাহা দেখিয়াই বোঝা গেল। কয়েকজন সতর্ক হইয়া বড়টার নড়াচড়া লক্ষ্য করিতেছিল এবং থাকিয়া থাকিয়া একরকম শব্দ করিয়া উঠিতেছিল। সেই শব্দের মানে বুঝিয়া অপর বানরগুলি হয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল, নয় আশ্বস্ত হইয়া বসিতেছিল, বড় বানরটার রকমসকম যখন যেমন হইতেছিল ঠিক সেই অনুসারে। গার্‌নার সমস্ত দিন এই বানরদের রকমসকম দেখিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে বানররাও কথা বলে, এবং তাদের শব্দের মানে অপর বানরেরা বেশ বোঝে।

গার্‌নার লক্ষ্য করিয়া করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে মানুষের যেমন যোজনান্তর ভাষা, বানরদেরও তেমনি ; এক জাতের বানরের ভাষা অপর জাতের বানরেরা বুঝিতে পারে না ; তাদের মধ্যেও বাঙাল রেঢ়ো কক্‌নী কথার টান আছে। দু-জাতের বানর একসঙ্গে কিছুদিন থাকিলে তখন পরস্পরের কথার টান ও সুর কানে অভ্যাস হইয়া যায় ও তারা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে।

গার্‌নার একজোড়া বানর লইয়া দুটাকে দুঘরে রাখিয়া দ্যান এবং একটার কাছে একটা গ্রামোফোন লইয়া তার কথা যন্ত্রের মোমের চোঙে ধরিতে থাকেন। বানরটার তখন খুব বক্তৃতার সখ চাপিয়াছিল, সে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল, কাজেই তার শ্রুতিলিখন কাজটাও হইয়াছিল বেশ। সেই যন্ত্রে-ধরা কথা অন্যঘরে অন্য বানরের কাছে যখন ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন অন্য বানরটা অত্যন্ত অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল ; সে গ্রামোফোনের চোঙের মধ্যে উঁকি মারিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তার সঙ্গীকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু গ্রামোফোনে মানুষের বা অপর প্রাণীর শব্দ শুনিয়া তার এমন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। এতে প্রমাণ হইল বানরেরও ভাষা আছে এবং তার মানে তারা নিজেরা বেশ বোঝে। এ ঘরের বানরটি তার সঙ্গীর কথার উত্তরে যেসব কথা উচ্চারণ করিয়াছিল সে কথাগুলিরও রেকর্ড করিয়া লইয়া গিয়া যখন ও-ঘরের বানরকে শোনানো

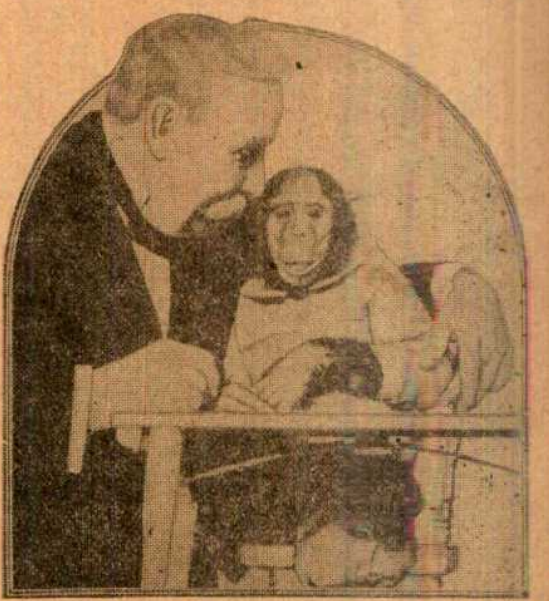

ফ্ল্যাশ্ লাইট জ্বালিয়া এইমাত্র ফুসির ফটো তোলা হইল। হঠাৎ আলোর তীব্র চমক লাগা ব্যাপারটা সে মোটেই পছন্দ করে নাই, কিছুতেই ক্যামেরার সামনে বসিতে সে রাজি হইবে না, কেবল ডাক্তার গার্‌নার তার নিজের ভাষায় তাকে অভয় দেওয়ায় আধসন্দিগ্ধ ভাবে সে ঘুরিয়া বসিয়াছে।

হইল, তখন সেও খুব ব্যস্ত হইয়া আরো বেশী কথা বলিতে লাগিল এবং চোঙের মধ্যে হাত ভরিয়া উঁকি মারিয়া তার সঙ্গীকে খুঁজিতে লাগিল। বানরেরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করিবার সময় একরকম শব্দ করে। এক বানরের এই শব্দ গ্রামোফোনে ধরিয়া অপর বানরকে শোনাইলে সেও রাগিয়া গিয়া সেইরূপ শব্দ করিতে থাকে ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনুসন্ধান করে।

একই রকমের শব্দ হইতে একই রকমের কাজ করিতে দেখিয়া দেখিয়া শব্দের মানে বা ইঙ্গিত স্থির করা যায়; এমনি করিয়াই অজানা ভাষার মানুষে পরস্পরের ভাষা শেখে। গার্‌নার্‌ও এই উপায়ে বানরের ভাষার বাক্য ও অর্থের সম্পর্ক স্থির করিতে লাগিলেন। এক বানরের কথা গ্রামোফোনে রেকর্ড করিয়া তিনি অপর বানরকে শোনাইতেন, এবং সে বানরের কোন্ শব্দে এ বানরের কি ভাব হয় তা লিখিয়া রাখিতেন; এইরূপ বহু বানরের কথা ও কাজের মধ্যে মিল ও এক ফল দেখিয়া তিনি তাদের ভাষার বাক্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

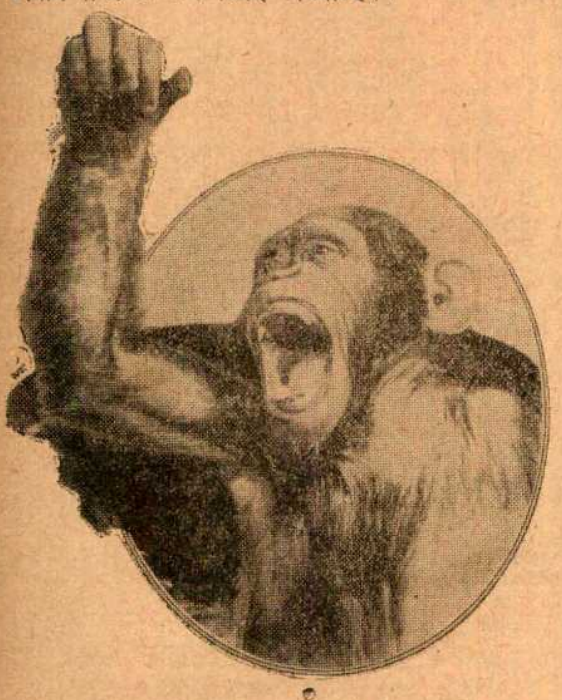

ডাক্তার গার্‌নার হুসিকে কাতুকুতু দিয়াছেন, সে হাসিতে হাসিতে তার শোধবোধ দিতে চাহিতেছে। হুসির হাসি শুনিতে অনেকটা মানুষের হাসির মতন।

এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা গার্‌নার দেখিলেন যে বানরের মধ্যেও যারা উচ্চ জাতের, অভিব্যক্তির বিবর্ত্তনে যারা অগ্রসর স্তরের, তাদের ভাষাও উন্নত ধরণের। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন বানর জাতের সেরা গরিল্লা ও শিম্পাঞ্জীদের ভাষা অধ্যয়ন করিতে হইবে তাদেরই ঘরকন্না ও জীবন-যাত্রার মধ্যে তাদের মুক্ত স্বাধীন অবস্থায়, তাদের দেশে গিয়া। এই উদ্দেশ্যে গার্‌নার তেইশ বার মধ্য-আফ্রিকার গহন বনের মধ্যে গিয়া একটানে অনেক দিন ধরিয়া বাস করিয়া আসিয়াছিলেন; এই কাজে আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে তাঁর জীবনের সাতাশ বৎসর কাটে। এইরূপে তিনি ৩৯ জাতের ভিন্ন ভিন্ন বানরের ভাষা অধ্যয়ন করেন! আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বন্ধু ছাড়িয়া অসভ্য বর্ব্বর আফ্রিকায় যাওয়াই ত কঠিন; তার উপর আবার মনুষ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা বিজন গভীর বনে দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেবল বানরের সঙ্গে বাস কী দুঃসহ দুষ্কর তপস্যা! বনে বানরের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তিনি বানরের ভাষা বুঝিতে পারিতেছিলেন এবং বানরেরাও তাঁর কথা বুঝিতে ঠিক না পারুক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিত। গরিলা ও শিম্পাঞ্জী বানরেরা হিংস্র প্রকৃতির; তাদের সঙ্গে বাস করা প্রাণ হাতে করিয়া। তাই গার্‌নার্‌ বনের মধ্যে একটা শক্ত মোটা তারের জালের খাঁচায় বন্ধ হইয়া থাকিতেন; মানুষ বানরকে বন্দী করিয়া বন হইতে আনিয়া খাঁচায় রাখে, গার্‌নার বানরদের বাড়ীতে গিয়া বনের মধ্যে খাঁচার ভিতর স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়াছিলেন বানরের ভাষা শিখিবার সঙ্কল্প লইয়া। এই আশ্চর্য্য তপস্যার সিদ্ধিলাভ তাঁর হইয়াছিল।

দীর্ঘকালের মনোযোগ ও পর্য্যবেক্ষণে তিনি এই তথ্যগুলি জানিতে পারিয়াছিলেন—

(১) যে বানর যত উচ্চস্তরের তার বাক্‌যন্ত্র তত সুগঠিত, সে তত বেশী শব্দ স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে; এক শব্দ বার বার একই রকম স্বরে উচ্চারণ করিতে পারে; এবং সেইসব শব্দের অর্থবোধও তাদের কাছে সুস্পষ্ট রকমে হয়। এইসব গুণ শিম্পাঞ্জীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর এমন ক্ষমতা নাই।

(২) বানর ও নর উভয়ের ভাষার মধ্যেই কতগুলি স্বরবর্ণ একই রকমে উচ্চারিত হয়। নানান স্বরবর্ণের মধ্যে প্রধান ও সুস্পষ্ট এইগুলি—দীর্ঘ আ, যেমন war আর শব্দে; ব্যাবৃত এ বা অ্যা, যেমন hat ব্যাট এক শব্দে; দীর্ঘ ঊ, যেমন blue ঊর্দ্ধ শব্দে; হ্রস্ব আ, যেমন hut থাক শব্দে; অ, যেমন cot ঘট শব্দে; দীর্ঘ ও, যেমন move লোভ শব্দে; এবং যুক্ত স্বর eu যেমন ফরাশী peu

ফনোগ্রাফ রেকর্ডে জিমের কথা ধরা হইতেছে।

রেকর্ডে নিজের গলা এবং কথা শুনিয়া জিমের বিস্ময়।

জিম সমজ্‌দারের মতে রেকর্ডে নিজের গলা শুনিতেছে।

শব্দে। শিম্পাঞ্জীর ভাষায় এতগুলি স্বর সমস্তই উচ্চারিত হয়; আরো কতকগুলো স্বর আছে, তা মানুষের কানে অস্পষ্ট, ধরা যায় না, বলা ত যায়ই না।

কোনো প্রাণীর বাক্য কোনো রকম অক্ষর বা বর্ণ দিয়া ঠিক প্রকাশ করা যায় না; আমরা বাঙালীরা মন বন যেমন উচ্চারণ করি তা মন বন লিখিলেও ঠিক হয় না, মোন বোন লিখিলেও ঠিক হয় না, ঐ দুয়ের মাঝামাঝি একটা স্বর উচ্চারণ করি। তেমনি আমাদের পশম শাসন পাষাণ প্রভৃতির শ ষ স, না তালব্য, না মূর্দ্ধণ্য, না দন্ত্য—তালব্য ও মূর্দ্ধণ্যর মাঝামাঝি। বর্ণমালা বা অক্ষর শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণের একটা সঙ্কেত মাত্র; বাংলা বর্ণমালার সাধ্য নাই ফরাশী eu, u এবং জার্ম্মান ü প্রভৃতির উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করে। পশুপাখীর ডাকও আমরা কণ্ঠে অবিকল উচ্চারণ করিতে পারি না, লেখা ত দূরে থাক। মানুষের বাক্যে যেমন ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত ও ব্যক্ত হয়, বানরের ভাষাতেও তেমনি। বানরের বাক্যে অর্দ্ধ-স্বর অর্দ্ধ-ব্যঞ্জন w এবং y ধ্বনি এবং কণ্ঠ্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনি স্পষ্ট ধরিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইয়াছে যে বানরের শারীর অবস্থা হইতে মানুষের শারীর অবস্থা পাইতে বিবর্ত্তনের ক্রমাভিব্যক্তিতে যত ধাপ তফাত, বানরের বাক্যস্ফূর্ত্তিও মানুষের বাক্য হইতে ততখানিই তফাতে আছে।

(৩) মানুষের কণ্ঠধ্বনি যেমন তার স্বজাতীয় লোকের কাছে অর্থদ্যোতক, বানরদের কণ্ঠধ্বনিও তেমনি; এক শব্দ হইতে তারা একই মানে বোঝে,—সেই শব্দ যতবারই শুনুক, তার অনুসারে শ্রোতার কাজ এক রকমই হয়। যে বক্তা শব্দ করে, সে একটা কিছু আন্তরিক অভিপ্রায় অপরকে বুঝাইবার জন্যই বলে; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শ্রোতা তার কথা অনুসারে ঠিক কাজটি করে ততক্ষণ বক্তা সেই কথা বারবার উচ্চারণ করিতে থাকে। অপরের সাম্‌নে যেসব শব্দ বানরেরা উচ্চারণ করে, একলা থাকিলে সেসব শব্দ কোনো বানর উচ্চারণ করে না। এতে বোঝা যায় বক্তা জানে যে তার কথার একটা মানে আছে, এবং সেই মানে সে অপরকে বুঝাইবার জন্য সেই শব্দ উচ্চারণ করে। দূরে বা কাছে শ্রোতা থাকিলে বানরেরা দূরত্বের আন্দাজ করিয়া চেঁচাইয়া বা আস্তে আস্তে কথা বলে; এতেও বোঝা যায় যে বানর যে কথা বলে তাহা অপরকে শোনাইয়া কিছু বলিয়া বুঝাইবার জন্যই; যে জন্য মানুষেরা কথা বলে, তাদের কথাও সেই একই উদ্দেশ্যে বলা হয়।

গ্রামোফোন প্রভৃতি যন্ত্রে এক বানরের কথা ধরিয়া অপরকে শোনাইলেও তারা তার মানে বুঝিতে পারে। সুতরাং তারা যে শব্দ করে তাতে তারা একটা ভাব ও মানে যে অপরের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চায় তাতে আর সন্দেহ নাই।

যে প্রাণীর স্বাভাবিক আবশ্যক যত তার বাক্‌স্ফূর্ত্তিও তত। মানুষের মধ্যে যে জাতি যত সভ্য ও উন্নত, তার আবশ্যক দ্রব্য ও অবস্থা ও ঘটনা তত বেশী, এবং তার ভাষার শব্দসম্পদও তত বেশী। শব্দ জুড়িয়া জুড়িয়া পদ হয়। বিশেষ্য ও ক্রিয়া জুড়িয়া বাক্যার্থ সম্পূর্ণ হয় এবং

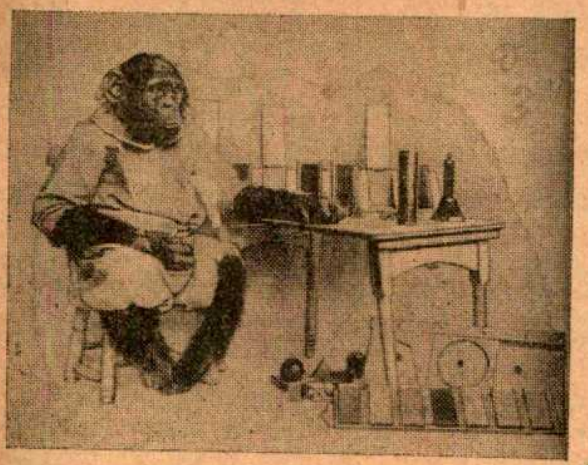

হুসির পড়ার ঘর। এখানে কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীতে তাকে বর্ণপর্য্যায়, জ্যামিতিক আকারজ্ঞান, এবং সংখ্যাগণনা শিখানো হইয়াছিল। টেবিলের উপরের ঘণ্টাটি নাড়িয়া দর্‌কার-মতো তার রাখালকে সে ডাকিত।

তাতে বিশেষণ জুড়িয়া সেই বাক্য আরো ফলিতার্থ হইয়া উঠে। কিন্তু এক মহাসমুদ্র-ভরা জলও জল, এক গোষ্পদ জলও জল, এক বিন্দু জলও যেমন জল, তেমনি বিশেষিত বাক্যও ভাষা, আবার শব্দ মাত্রও ভাষা। সুতরাং বানরের ভাষায় সমস্ত-পদ কর্ত্তা-ক্রিয়ান্বিত পদ না থাকিলেও, তার শব্দ যখন অর্থ দ্যোতনা করিতেছে ও অপরের নিকট তাহা প্রকাশের ইচ্ছা আছে, তখন তাকেও ভাষা বলিতে হয়।

ইহা ত প্রমাণ হইয়া গেছে যে মানুষ বানর হইতে বিবর্ত্তনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের ভাষাও বাঁদুরে ভাষারই পরিণতি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

ডক্‌টার গার্‌নার যেমন নিজে বানরের শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেন, তেমনি বানরদের দিয়া মানুষের শব্দ উচ্চারণ করাইবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সকল দেশের মানুষের মধ্যে একটি শব্দের ধ্বনিসাম্য দেখা যায়—সে হচ্ছে মা। গার্‌নারের পোষা বানর মোজেজ, ইংরেজী শব্দ মামা, জার্ম্মান শব্দ wie—ভী, ফরাশী শব্দ ফ্য, কোনো-রকমে উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিল। ফরাশী ফ্য মানে আগুন; গার্‌নার মোজেজকে কোলে লইয়া দিনের পর দিন নানান রকম আগুন দেখাইয়া দেখাইয়া বারবার ফ্য শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। অবশেষে তাঁর এই সাধনার সিদ্ধি হয়, মোজেজ কোথাও একটু আগুন দেখিলেই ভ্য ভ্য করিয়া চীৎকার করিত।

ডক্‌টার গার্‌নার এইরূপ একশোটি বাঁদুরে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তার ত্রিশটির মানে আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তিনি বানরের ঐসব শব্দ উচ্চারণ করিয়া বানরদের সঙ্গে কথা বলিতেন এবং বানরেরা তাঁর কথা বুঝিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়া তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করিত। জু-গার্ডেনে শিম্পাঞ্জী-দের খাঁচায় সব কজন হয়ত অঘোরে ঘুমাইতেছে; গার্‌নার খাঁচার কাছে গিয়া শিম্পাঞ্জী-ভাষায় তাদের ডাকিলেন—উঃ, উঃ। অমনি সব-কজন ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া খাঁচার গরাদের ধারে আসিয়া তাঁর কথার জবাব দিতে আরম্ভ করিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া অপর জাতির লোকের মুখে স্বজাতির কথা শুনিতে লাগিল।—এমন ঘটনা অনেক হইয়াছে।

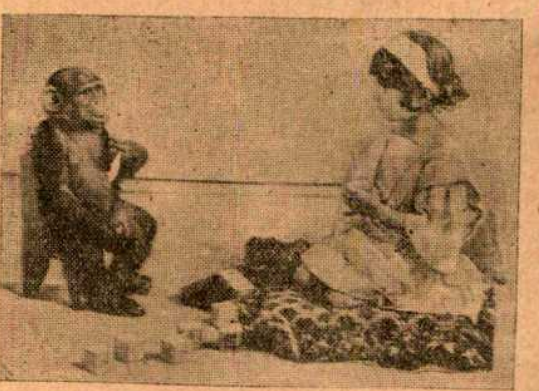

হুসির বানান শেখা। নিজের নামের অক্ষরের তিনটি চৌকো সে একত্র করিতে শিখিয়াছিল, ওটার মানে কি হইতেছে তাহা না জানিয়াই।

বানরদের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরে যতদূর সম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। কোনো প্রাণীর—এমন কি মানুষেরও—ভাষা লিখিয়া ঠিক উচ্চারণ বোঝানো কিছুতেই যায় না। তবু ডক্‌টার গার্‌নারের প্রদর্শিত পথে আমরাও পাঠক-পাঠিকাদের বানরের ভাষার একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করিতেছি।—

Weuh—য়হ্—ওটা কি?

আস্তে বলিলে অনুরোধ বোঝায়।

Ki-uh—কি-উঃ—আমায় চাই ; আমায় দাও।
Kri-i—ক্রি-ই—কোথায় ?
Ahr-r-r—আহ্‌র্‌-র্‌-র্‌—বড় বিপদ !
Qhui—হুই—অভাব বোঝায়।
Our-h—আউর্‌-হ্‌—কোথায় গো ? তুমি কৈ ?
Eu-nh—এউ-ন্‌হ্‌—এই যে, এখানে।
Khi-iu—খি-ইউ—সাবধান ! হুঁশিয়ার !
Khi-iu-hou—খি-ইউ-হৌ—পালাও, পালাও।
Chu-h—চু-হ্‌—শোনো ত।

সম্প্রতি ডক্‌টার গ্রার্‌নারের মৃত্যু হইয়াছে।

হরবোলা।

ফুল

১

তরু তারে পাতায় ঢাকে,
　　আকাশ ডাকে,—"আয় হেথায় !"
পাপুড়ি-পাখায় মাতন লাগে,
　　বোঁটার বাঁধন ফুলের পায় !
মর্ত্য মাটির দুলালী ফুল,
আকাশ তারে করলে আকুল,
আলোর ছলে গাল রাঙালে
　　অনুরাগের লাল চুমায় !

২

তরু তারে পাতায় ঢাকে,
　　আকাশ ডাকে,—"আয় হেথায় !"
মায়া তারে সীমায় বাঁধে,
　　অ-সীমা তার মন মাতায় !
মর্ম্ম-কোষে কাঁপন ধরে,
পরাণ চুঁয়ে পরাগ ঝরে,
গন্ধে মিশে যায় সে ভেসে,
　　মাটির কূলে লুটায় কায় !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

কৌতুকরসের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব

ডার্বীসুইপের দশটাকার টিকিটে দশসাথ টাকার প্রাপ্তি-সংবাদে, কিম্বা একটা ভারি মোকদ্দমায় বিপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট হইতে ডিক্রী পাইলে, মনে যে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে না পারিয়া, নাক-মুখ-চোখের রন্ধ্র দিয়া যখন শুভ্রফেনের ঢেউ খেলাইয়া বাহির হইয়া যায়, তখন সে হাসির মর্য্যাদা রাখিতে হই ত বন্ধুবর্গকে মিষ্টান্নের ফরমায়েসে নাছোড়বন্দ হইতেই হয়। হাসির পরিমাণ ও স্থায়িত্ব এবং মিষ্টান্নের বরাদ্দ উভয়ই এখানে লাভের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ অতিরিক্তমাত্রায় ধন কিম্বা যশ লাভ করিলে, মনে যে সুখ লাভ হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। তখনকার যে আনন্দ তা প্রয়োজনসিদ্ধিরই আনন্দ। আনন্দের পরিমাণ অধিক হইলে কেবল যে আনন্দ-বার্ত্তা শ্রবণের সময়েই তাহা উচ্ছলভাবে ছড়াইয়া পড়ে তাহা নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজে অকাজে সময়ে অসময়ে ছোটখাট দুই-একটা হাসির লহর মুখে লাগিয়াই থাকে। মানুষের কল্পিত ও বাস্তব প্রয়োজনের অন্ত নাই পরীক্ষায় শুভফল, আমদরবারি, খাসদরবারি, কি রায়বাহাদুরি প্রাপ্তি, নবীন-যুবকের নূতন বিবাহ, দুর্দ্দান্ত জমিদারের প্রজার জোটভাঙা প্রভৃতি হরেক রকম প্রয়োজন আমাদের লাগিয়াই রহিয়াছে। এই-সমস্ত নানা-প্রকারের প্রয়োজনসিদ্ধিতে আমাদের হৃদয় নানাভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠে এবং সেই উৎফুল্লতা, উৎসাহে অহঙ্কারে, হাসিতে গানে, মিষ্টান্নবিতরণে ও অনভ্যস্তদানদাক্ষিণ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এ-সমস্ত ব্যাপারের আনন্দ-হাস্যকে আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার কিছুই নাই, কারণ ইহা সফলতার শরীরগত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সফলতার পরিচয়েই ইহার পরিচয়, ইহার অন্য পরিচয় নাই। ফলের নাম উল্লেখ করিলেই হাসির কারণ সম্বন্ধে সমস্তই বলা হইয়া যায়, আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ঘোড়দৌড়ে অনেক টাকা জিতিয়াছে তাই হাসিতেছে, এ কথা বলিলে আর এ প্রশ্ন উঠে না যে

টাকা জিতিলে লোকে হাসে কেন? যদি বা ওঠে তবে তাহার উত্তরটা এই যে জিতিলে সফলতার জন্য আনন্দ হয় এবং আনন্দ মাত্রই শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে চোখমুখের পেশীর শিথিলতায় ঔজ্জ্বল্যে ও হাসিতে আপনাকে ব্যক্ত করে। মুখের পেশীগুলির এমন কি বিশেষত্ব যে আনন্দের উদ্ভবে সেইগুলিই সর্ব্বাগ্রে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া হাসির সৃষ্টি করিয়া আনন্দকে মুখমণ্ডলে মুখরিত ও চিত্রিত করিয়া তোলে তাহা শরীরবিদেরা উত্তর করিবেন। কিন্তু এসমস্ত স্থলে যে-আনন্দে হাসিটির উৎপত্তি সে-আনন্দের পিছনে প্রয়োজনসিদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুই খুঁজিবার নাই।

আরও অনেক রকমের হাসি দেখা যায় যেগুলির পিছনে প্রয়োজনসিদ্ধিও নাই, আনন্দও নাই। অপমানে ঘৃণায়, ক্ষোভে, শোকে, বীরত্বেও লোককে হাসিতে দেখা যায়, কিন্তু সেখানে হাসিটা মূলভাব নয়। দারুণ শোকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা দুঃখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে পারে না, কিম্বা একটা দুঃখ ঢিমা অবস্থায় অচঞ্চল ভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। একটা দুঃখ প্রধান ভাবে পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু সেইটাকে প্রধান ভাবে উপস্থিত রাখিবার জন্য চিত্তের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে দীনতা কাতরতা নির্বেদ লজ্জা প্রভৃতি নানা রকমের ছোট ছোট ভাবগুলি বায়োস্কোপের চঞ্চল চিত্রপর্য্যায়ের মতন নৃত্য করিতে থাকে এবং তাহারই ফলে একটি করুণ জীবন্ত শোকচ্ছবি মূর্ত্তিমান হইয়া ওঠে। কাজেই শোকের মধ্যে যে আমরা কখন একটা হাসি দেখিতে পাই, সেটা উদ্দাম ভাবতাণ্ডবে মুখপেশীসমূহের একটা বিকট ভঙ্গী মাত্র। কোনও ক্ষণে সেটা হাসির মত দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই হয়ত সেটা অন্তর্নিরুদ্ধ রোদনের উৎকট যন্ত্রণায় পরিণত হয়। হাসির মতন যেটাকে মনে হয়, সেটা নানাবিধ ভাবের আগম-নির্গমের একটা অন্তর্বর্ত্তী স্তর মাত্র। দুই একটা বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গৌণহাসিকে হাসি বলা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্যই ভাষায় এই-জাতীয় হাসিকে শোকের হাসি, ঘৃণার হাসি, প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বগলে কুতুকুতি দিলে, লাফিংগ্যাস্ পান করিলে, অথবা সিদ্ধি পান করিলে, অনেক সময়ে হাসি আসে বটে, কিন্তু সেটা কৃত্রিম উপায়ে স্নায়বিক উত্তেজনার দ্বারা হাসান ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এইরূপ কৃত্রিম এবং বাহ্যিক উপায়ে হাসিতে গেলে প্রথম প্রথম যে একটু মানসিক স্ফূর্ত্তি না হয় তা নয়, কিন্তু তাহার সহিত এমন একটা কৃত্রিমতা ও অবসন্নতা জড়ান থাকে যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার অস্বাভাবিকতায় আমরা উৎপীড়িত হইয়া উঠি। কৃত্রিম উপায়ে মুখাক্ষি সঙ্কোচ ও দন্তবিকাশ করিলে হাসি হয় না। হাসির একটি স্বতন্ত্র রস আছে।

যতই হাসির এই স্বতন্ত্র রসটির উৎস আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই, ততই মায়াপুরীর মধ্যে তাহা ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কোনও কৌতুকের ব্যাপারে আমরা সকলেই হাসি, কিন্তু কেন যে হাসি তাহার কারণ বলা সুকঠিন হইয়া পড়ে। খানিকটা পারদকে যেমন হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিতে গেলে তাহা অঙ্গুলের ফাঁক দিয়া শুভ্রধারায় গলিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বুদ্ধির জালে হাসিকে ধরিতে চেষ্টা করিলেও ঠিক সেইরূপ ফল হয়। রঙ্গালয়ে একটা ভাঁড়কে অপর একটা ভাঁড়ে ঠেলা মারিলে সে যখন দিব্য একটি পিপার মতন একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত গড়াইয়া যায়, তখন আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না। ইহাতে স্বার্থ বা প্রয়োজন-সিদ্ধির গন্ধমাত্রও নাই, কোনও বাহ্যিক বা কৃত্রিম স্নায়বিক উত্তেজনাও নাই, অথচ আমরা হাসি। শুধু যে তখনই হাসি তা নয়, বাহিরে আসিয়াও হয়ত যতবার সেই ভঙ্গী মনে পড়ে ততবারই হাসি। কিন্তু কেন হাসি, জিজ্ঞাসা করিলে শুধু এই উত্তর মনে আসে যে ব্যাপারটা যে ভারি হাসির! ব্যাপারটা ভারি হাসির, অথচ কেন হাসি বলা কঠিন, এই অবস্থায় কৌতুকরস বলিয়া একটি স্বতন্ত্র রসের আমরা ইঙ্গিত পাইয়া থাকি।

প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া যে আনন্দ আসে তাহাকে বুঝিতে আমাদের কোন গোল হয় না; কিন্তু যখন বিনা প্রয়োজনে অজস্র আনন্দ উচ্ছল হইয়া উঠে তখনই তাহার কারণ লইয়া নানা তর্ক উপস্থিত হয় এবং হয়ত তর্কও মীমাংসা হয় না।

কৌতুকের মোদকর কুতুকত্ব ও সুন্দরের হ্লাদকর

সৌন্দর্য্য এ উভয়েই প্রয়োজনের দ্বার দিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করে না। সেইজন্যই ইহাদের আনন্দ-গ্রন্থির গুটিকা যে আমাদের জীবনের কোন্ অংশে নিভৃতে নিহিত আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সেই গুটির সুতা যখন অকস্মাৎ ছাড় পাইয়া আমাদের দোল খাওয়াইয়া নাচাইয়া তোলে, তখন সেই নাচনটা শুধু আমরা টের পাই। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা যখন করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত প্রভৃতি মূল রসগুলির আলোচনা করিয়াছেন, তখন হাস্য-রসকেও একটি মূলরস বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু রৌদ্ররসে যেমন ক্রোধই প্রধান, বীরে যেমন উৎসাহ প্রধান, হাস্যরসের তেমন অন্য কোন স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি তাহারা খুঁজিয়া পান নাই, তাই হাস্যরসের স্থায়ীভাবকে 'হাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যুবক যুবতীর সহিত মিলিত হইতে চায় এবং যুবতী যুবকের সহিত মিলিত হইতে চায়; তাহাদের এই মিলনেচ্ছার পূর্ণ বিকাশের পথে নানা বাধা থাকে; তাই নানা হাবভাবের মধ্য দিয়া নানা বিলাস-বিভ্রমের মধ্য দিয়া ইহা যখন বিচিত্র আনন্দরশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই অস্ফুট বিলাস হাসির লহরে লহরে আপনাকে মুখর করিয়া তোলে। কিন্তু হাসি এখানে বাসনার ব্যঞ্জক ও দ্যোতক মাত্র। অন্তরে যে বিলাস-বাসনার বিকাশ হইতেছে, হাসি এখানে তাহাই প্রকাশ করিয়া ভাষার কাজ করিতেছে মাত্র; এখানে হাসি থাকিলেও হাস্যরস নাই। কারণ যে আনন্দে এখানে হাসি আসে, তাহার মধ্যে এমন কোন মৌলিকত্ব বা বিশেষত্ব নাই যে তাহাকে বিশেষভাবে হাসিরই রস বলিয়া বুঝিতে পারি। আনন্দে মানুষ হাসে এবং হাসি দেখিলেই আনন্দ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি; সেই হিসাবে হাসির সহিত আনন্দের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু যে আনন্দে মনে অন্য কোনও ভাব বিশেষ ভাবে দাঁড়াইতে পারে না, কোনও চিন্তা আসে না, শুধু কেবল হাসিই আসে, সেই আনন্দকেই হাসির আনন্দ বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যবোধে মানুষের মনে যে আনন্দ জন্মে, তাহাতে কোন প্রয়োজন থাকে না বটে, কিন্তু সেই সুন্দর বস্তুর অংশ বিশেষের পরস্পরের সামঞ্জস্য, কি অন্য অন্য তজ্জাতীয় সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা, কি সে সুন্দর বস্তুর দ্বারা অভিব্যক্ত বা উপস্থাপিত তত্ত্বের অনুসন্ধান, প্রভৃতি নানা চিন্তাস্রোতে চিত্ত ভাসিয়া চলে এবং সেই তরঙ্গের তালে তালে তার সৌন্দর্য্যকোষটি বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই সৌন্দর্য্য যখন শিল্প কি সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, তখন আর তাহাকে শুধু সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিতে পাই না; ছবির বর্ণচ্ছটা তখন চিত্তের মধ্যে নানা রসের বিচিত্র রং ফেলিয়া যে রসময়ী মূর্ত্তিকে সৃষ্টি করে তাহারই রসময় উপভোগের মধ্যে আমরা সৌন্দর্য্যের কোমল স্পর্শের আবেশ অনুভব করিয়া মোহিত হই। অশোকবনে রাবণনিয়ন্ত্রিতা সীতার ছবি দেখিলে, রামময়ীতার পূর্ব্বপ্রেম, রাবণের ধৃষ্টতা, রামের করুণ বিলাপ, সীতার দৈন্য প্রভৃতি নানা রসে হৃদয় আপ্লুত হয় এবং এই রসাপ্লবের মধ্যেই ছবিটির সৌন্দর্য্যের যথার্থ পরিচয়। ছবির বর্ণচ্ছটা এবং অবয়ব-সন্নিবেশের বৈচিত্র্য তখনই সৌন্দর্য্যপদবীর যথার্থ সার্থকতা লাভ করে, যখন ছবিকে দূরে ফেলিয়া রামসীতার করুণ রসের আস্বাদে আমাদিগকে বিভোর করিয়া তোলে। কাজেই সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দে প্রয়োজনের সম্বন্ধ না থাকিলেও চিন্তা ও ভাবের প্রাকট্য ও প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু হাস্যরসের বিশেষত্ব এই যে শুধু প্রয়োজনসম্বন্ধ-বিরহিত তা নয়; চিন্তা ভাব বা প্রবৃত্তিনিচয়ের সহিতও তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। কোনও স্ফীতোদর ব্যক্তি যদি সশব্দে পিণ্ডাকারে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে আমরা কৌতুক অনুভব করি; কিন্তু সে আছাড়ে যদি সে এমন বেদনা পায় যাহাতে তাহার জন্য আমরা ভীত বা দুঃখিত হই, তাহা হইলে নিমিষের মধ্যেই সে কৌতুকরসের আদ্যশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়। পাঁচজন ভদ্রলোক যদি কাহারও বাড়ীতে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হন ও তাহার গৃহ-দেহলীর নবলিপ্ত আল্‌কাৎরায় যদি কোন বিশিষ্ট অতিথির মুখ কালিময় হইয়া যায়, তবে সে মূর্ত্তি দেখিলে অন্য সকলে নিশ্চয় হাসিবে, কিন্তু ভদ্র গৃহপতি তাহাতে হাসিবার ত কোনও অবসর পাইবেনই না, বরং দুঃখিত হইবেন, কারণ তাঁহার ত্রুটিই ঐ দুর্ঘটনার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। আবার ঐ আল্‌কাৎরা-লিপ্ত ব্যক্তি যদি বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র হন, তবে হয় ত কোনও অতিথিই

তাঁহাকে দেখিয়া হাসিবার অবকাশ পাইবেন না। যে কোনও অন্যবিধ চিন্তা ভাব বা রস মাত্রই হাস্যরসের শত্রু। প্রয়োজনাভিসম্বন্ধরহিত ভাব চিন্তা এবং রসাদিবর্জ্জিত যে একটি বিশেষ আনন্দধারা হাস্যোচ্ছলতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে, তাহাকেই আমরা বিশেষভাবে হাস্যরসের নিজস্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই রসটি অন্য কোনও রসের অঙ্গ নয়, অথচ ইহার আনন্দের মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব আছে যে অন্যরসের সংস্পর্শমাত্রেই তাহার সহিত ইহার মিলন হইয়া যায়।

সকল রসের সহিত এবং চিন্তার সহিত ইহার বিরোধ, অথচ ইহার আস্বাদের মধ্যে এমন একটু অনির্ব্বচনীয়ত্ব আছে যে হাসি ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যেই তাহাকে ধরাছোঁয়ার উপায় নাই। সাধারণ হাসি মনের আনন্দের বাহ্যিক অনুভাব মাত্র। সে হিসাবে হাস্যকে একটা স্বতন্ত্র রস বলিয়া বর্ণন করাটা বিসদৃশ হইয়া পড়ে। সেইজন্য সেই-রকম রসকেই হাস্যরস বলা যাইতে পারে যাহার অন্য বিলক্ষণ এমন একটা স্বতন্ত্র আস্বাদ আছে যাহা হাসির মধ্যেই আপনাকে গঠন স্থাপন ও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিশেষ রসটির মধ্যে অন্যবিধ ভাবের বা রসের অভিসম্বন্ধ নাই বলিয়াই সংস্কৃত অলঙ্কারে ইহাকে হাস্যরস বলা হইয়াছে; এবং বুদ্ধদেব ইহাকে "হসিতুপ্পাদ" অর্থাৎ "হাসিপাওয়ার" রস বলিয়াছেন।

অন্য কোনও রসের মিশ্রণে হাস্যরস টিকিতে পারে না, এ কথা বলিলেই সন্দেহ আসে যে কথাটা খাঁটি কি না? বিশালোদর বৃষস্কন্ধ কোনও ব্যক্তি যখন আছাড় খাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়ে, কিম্বা আরসুলা বা কেন্নর ভয়ে যখন কোন লোক এঘর ওঘর দৌড়াদৌড়ি করে, তখন আমাদের যে হাসি আসে, তাহার পশ্চাতে একটা আত্মগর্ব্ব যেন আহার পাইয়া তাজা হইয়া বসিল, মনের অন্তঃপুরে খানা-তলাসি করিলে এমন একটা ব্যাপার যেন ধরা পড়িয়া যায়। আবার যখন দীনবন্ধু মিত্রের জলধর প্রথম আলকাৎরায় চুবনি খাইয়া কাপাস-তুলা গায় মাখিয়া স্ত্রীবুদ্ধির কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া হোঁদলকুৎকৎ রূপে দেখা দেয়, তখনকার হাসির সঙ্গে যেন একটা "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" তাথৈ তাথৈ করিয়া নাচিয়া উঠে। এসমস্ত দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে হয় যে গর্ব্বে, পাপের শাস্তিতে বা আত্মাভিমানে যে আত্মপ্রসাদের আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই কৌতুকের হাসির কারণ। কিন্তু একটা ছোট ছেলেকে একটা বড় টুপি মাথায় দিতে দেখিলে যে হাসি আসে তাহা জবরদস্তি করিয়াও আত্মপ্রসাদের কোঠায় ফেলা যায় না। আর আত্মাভিমান বা আত্মপ্রসাদের অনুভব হইলেই যে সেটা সব সময় কৌতুকের হাসির মত হাসিতে আপনাকে পরিব্যক্ত করে একথাও হলফ করিয়া বলা যায় না। কাজেই গর্ব্ব, আত্মপ্রসাদ বা আত্মাভিমান প্রভৃতি বৃত্তিই যে সর্ব্বপ্রকার কৌতুকরসের নিদান একথা কোনওক্রমেই বলা চলে না। বড়জোর এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, কোনও কোনও স্থলে কৌতুকরসের মধ্যেও গর্ব্বাদি অন্য প্রকারের আত্মতৃপ্তির যৎকিঞ্চিৎ লেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লেপগুলি কৌতুক রসের কারণ ত নয়ই, বরং কৌতুক-রসের অবসাদক। ঐগুলি একটু বাড়িয়া গেলেই কৌতুকরস ধ্বংস হইয়া যায়। ওগুলির লেপ সত্ত্বেও যে কৌতুকরস ধ্বংস হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে কোনও সময় কৌতুকের প্রাবল্যের তুলনায় গর্ব্বাদির লেপ এত কম হয়, যে ওটুকু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হাস্যরসের যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। আবার কোনও সময়ে বা কৌতুকের হাসির সহিত গর্ব্বাদি আত্মপ্রসাদ-জনিত হাসি এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, কৌতুকের হাসির কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া গর্ব্বাদির উপরেই দায় চাপাইয়া দিয়া হাসির কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হই।

প্রায় সকল-রকম হাস্যরসের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই যে যার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না বা যেটি আমরা ঠিক আশা করি নাই এমন একটা কিছু ঘটিয়া গিয়া আমাদের মনের গতিকে তার নিয়ত কক্ষা হইতে ঈষৎ শিথিল করিয়া দেয়। এই শিথিলতার এমন একটি সম্পূর্ণ মাত্রা বা তাল আছে, যেটুকুর স্থান ভয় দুঃখ বা অপর কোনও একটা তীব্ররস আসিয়া অধিকার করে।

এই শিথিলতার কথা ভাবিতে গেলেই আমাদের খেলার কথা মনে পড়ে। খেলায় আমাদের দেহ ও মনকে আমরা

ইচ্ছা করিয়া তাহার অভ্যস্ত গতির কক্ষা হইতে ভিন্নদিকে চালিত করিতে চেষ্টা করি, তখন এই শিথিলতা ও নূতনতায় আমরা এমন একটা নূতন উত্তেজনা উৎসাহ ও বল সঞ্চয় করি যে, তাহাতে ভূগর্ভের ঝরনার মতন আমাদের চিত্ত আনন্দে সিক্ত হইয়া ওঠে। তাই খেলার আনন্দের সন্ধান খেলায় যোগ না দিলে বুঝা যায় না। খেলায় যে লোক কোনও প্রয়োজনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সে আর খেলা দেখিতে পায় না। বিনা প্রয়োজনে দেহ ও মন যে আপনার চারিদিকের বাঁধনের ভিতর হইতে আপনাকে শিথিল করিতে চায় এবং শিথিল করে, সেইখানেই খেলার আনন্দ। এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই খেলার আনন্দের সঙ্গে হাস্যরসের আনন্দের অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। হাসির এমন একটা স্তর আছে যেখানে তাকে খোলা প্রাণের খেলা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অনেকের মধ্যেই এমন একটা ধাত দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে তাহারা অনায়াসে তাহাদের চারিদিকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর হইতে একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারে এবং তাহাদের পুরানো মনটাকে একঝাঁপে একটা নূতনের ছোপে চুবাইয়া লইতে পারে। এই যে সফলতা শিথিলতা বা সজীবতা—এইটিই বিশেষ ভাবে খেলার বৃত্তি।

আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন যখন কোন বাঁধন হইতে কোন-রকমে একটু ছাড়া পায়, তখন সেই মুক্তির ফলে আনন্দ পায়। খেলার এই ছাড়াটা স্বেচ্ছাকৃত, হাস্যরসে এটা আকস্মিক ঘটনা-চক্রের বৈচিত্র্য-ঘটিত। যাহার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, বেটা যাহার সাধারণত স্বভাবগত নয়, অথবা যে-রকমটার সঙ্গে যাহা আমরা দেখিতে অভ্যস্ত নই, এমন কিছু দেখিলেই আমাদের মন তাহার প্রচলিত অভ্যাসের বন্ধন হইতে একটা নাড়া পায়। সে নাড়াটা যদি প্রচণ্ডরকমের হয়, তাহাতে মন তাহার কক্ষচ্যুত হইয়া গিয়া আঘাত পায়, এবং সেই আঘাত ভয় বিস্ময় দুঃখ বীভৎসতা প্রভৃতিতে আপনাকে প্রকাশ করে; কিন্তু সে নাড়াটি যদি অতি মৃদুমন্দ রকমের হয়, তাহা হইলে মন তাহার প্রচলিত কক্ষার মধ্যে থাকিয়াই এমন একটা মৃদু মুক্ততার সাড়া পায় যে সে অকস্মাৎ একটা আনন্দের হাওয়ায় দোল খাইয়া নাচিয়া ওঠে।

এই ছাড়টা অকস্মাৎ ঘটে বলিয়া হাস্যরসের মধ্যে প্রায়ই একটা আকস্মিকতার গন্ধ পাওয়া যায়। আবার এই ছাড়ের মধ্যে যে একটা অজ্ঞাত মুক্তির স্বাদ আছে, সেই-টুকুতে কোনও সময়ে বা একটা খেলার মতন প্রাণখোলা ভাব, কোন সময়ে বা একটা আত্মপ্রসাদ বা গর্ব্বের ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সময়ে বা যে অবস্থা বা চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয়, তাহারও একটা ছোপ হাস্যরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে রঙীন্ করিয়া তোলে। আবার কোনও কোনও সময়ে অব্যবহিত-পূর্ব্বের রসান্তরের আনন্দও হাস্যরসের আনন্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। যখন পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা মতা নাপ্‌তেকে কনে সাজাইয়া রাজীবকে মিথ্যা বিবাহে এমন করিয়া বঞ্চিত করিল যে সে শূকরের ছানা সহিত পেঁচোর মাকে নবোঢ়া পত্নী মনে করিয়া পাল্কী চড়াইয়া নিজের প্রবীণা কন্যাদের নিকট বাড়ীতে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল, তখন সেই বিয়েপাগ্‌লা বুড়োকে দেখিয়া আমাদের হাস্য-রসের উদ্রেক হয়। একজন বৃদ্ধকে এমন অদ্ভুতরকমে বিয়ে-পাগ্‌লামিতে অন্ধপ্রায় দেখিলে আমাদের চিত্ত যে একটু নূতনত্ব বোধ করিয়া ছাড়ু পায় সেইটুকুই এখানকার হাস্য-রসের মূল উৎস। যতই বিয়েপাগ্‌লার পাগ্‌লামির নূতন নূতন পরিচয় পাই, ততই এই হাস্যরসের উৎস উৎসারিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে "অমন লোক যে ঐ ভাবে জব্দ হয়েছে সেটা ভালই হয়েছে" এ রকমের একটা ভাবও জড়িত থাকে, অথবা বিয়েপাগ্‌লার সঙ্গে তুলনায় আমাদের নিজেদের মহত্ত্ব বা গৌরবের একটা অস্ফুট আভাসও হয়ত আমরা বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু এগুলি হাস্যরসের মূল নিদান নয়, কেবল আনুসঙ্গিক স্বাদ মাত্র। সরবতের মূলরস শর্করার, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অম্ল একটু গন্ধ থাকিয়া সেই মূলরসকে বিশেষ ভাবে স্বাদসরসতা-সমন্বিত করিয়া তোলে; তেমনি হাস্যরসের আনন্দের মূল কারণ হচ্ছে একটা নূতনত্ব, বিশ্রাম, মুক্তি; আর সেই রসের সঙ্গে প্রতিস্থলে কৌতুকের যে একটা বিচিত্রতা আছে তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক আকস্মিকতার ঘটন গত

ও অবস্থাগত বৈচিত্র্য, চিত্তের প্রকৃতি ও অনুভবগত বিশেষত্ব এবং হাস্য-রসের সঙ্গসমুৎপন্ন ভাব বা চিন্তাকণার যৎকিঞ্চিৎ আমেজ। একটা মুক্তির আনন্দই হাস্যরসের মূল কারণ। সেইজন্যই অন্য কোনও রস বা চিন্তা আসিয়া পড়িলেই চিত্ত আবার বাঁধা পড়িয়া যায় এবং হাস্যরসের স্বচ্ছতা কলুষতায় কালিময় হইয়া ওঠে। হাস্যরসের উপর একটু কণার মত শুধু ভাসিয়া বেড়াইতে পারে, শুধু ততটুকু রসান্তরকেই হাস্যরস গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সেই রসান্তর, ভাবান্তর বা চিন্তান্তরের মাত্রা যদি একটু বাড়িয়া যায়, তাহা হইলেই হাস্যরস নষ্ট হইয়া যায়। যে-রকম যাকিছু আমরা সকল সময়ে দেখিয়া শুনিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের মনের সেই-রকমের এমন একটা অভ্যাস জন্মায় যে কোন্ বিষয়টির সঙ্গে কোন্ বিষয়টি খাপ্ খায় তার একটা ছাপ মনের মধ্যে থাকিয়াই যায়। সে ছাপটা স্পষ্ট আকারে মনের সাম্‌নে না থাকিলেও সেটা সকল সময়েই মনের অবয়বের সঙ্গে মিশিয়া থাকে; বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয়ে মনকে যখনই ক্ষণে ক্ষণে নানা পথে চলিতে হয়, তখনই সে তাহার এই অভ্যস্ত বাঁধা পথেই অতি সহজেই চলাফেরা করে। এই-রকম চলিতে চলিতে যখনই এমন কিছু তার সাম্‌নে পড়ে যা তাহার এই অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না, তখনই এই নূতন পথে বাঁকিতে গিয়া সে একটা দোল খাইয়া ওঠে এবং এই দোলের আনন্দই হাস্যরসের মূল কারণ। যাঁহাদের মন অভ্যাসের পথে এমন দৃঢ় হইয়া গেছে যে কোনও নূতন কিছু উপস্থিত হইলে সে পথে সহসা বাঁকিতে পারে না, তাঁহারা কৌতুককর বস্তুর উপস্থিতিতে আনন্দ না পাইয়া আঘাত পান। সেইজন্য হাস্যরসের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সেইখানেই হইতে পারে যেখানে মনটা এমন একটা হাল্কা ভাবে থাকে যাহাতে সে অনায়াসে তাহার বাঁধা পথ হইতে অন্য পথে ঘোরা ফেরা করিতে পারে—যাহাতে ঈষৎ বাঁকিতে গেলে সে আঘাত পায় না, শুধু একটা দোলা অনুভব করে মাত্র। একটি লতা সামান্য বাতাসে ইতস্ততঃ আনন্দে নৃত্য করে, কিন্তু একটা পাথর হয় অটল হইয়া বসিয়া থাকিবে, নয় প্রচণ্ড আঘাতে উল্টাইয়া গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কখনই দুলিবে না।

বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের দিবারাত্রই সম্পর্ক চলিতেছে এবং তাহার ফলে বাহিরের জগৎকে কি ভাবে, কখন কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে আমাদের চিত্তের মধ্যে সকল সময়েই তাহার একটা ইসারা রহিয়াছে। সেই ইসারাটা কোনও আইডিয়া কল্পনা বা জ্ঞান নয়, যে, আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ধরা পড়িবে, সেটা আমাদের চিত্তের জীবনীশক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া তাহারই এক-একটা বিশেষ বিশেষ প্রকার, ধারা বা ছন্দ হইয়া চিত্তের মজ্জায় মজ্জায় লীন হইয়া থাকে এবং চিত্তের সহিত বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ সম্মিলন বা আদান-প্রদানের ব্যাপারের সময় আপনা-আপনি উদ্বুদ্ধ হইয়া দুইয়ের মধ্যের পরিচয়-ব্যাপারের সৌকর্য্য সংঘটন করিয়া থাকে। জীবনীশক্তির প্রকারভূত হইয়া চিত্তের প্রাণনার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া থাকে বলিয়া নানা-দিকের পরিচয়ের নানা ইসারার বাহুল্যে চিত্তকে বিপর্য্যস্ত হইতে হয় না। কারণ এই ইসারাগুলির স্বতন্ত্র এমন কোনও স্বরূপ নাই যে তাহাদের বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে মনের থলি অযথা ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। চিত্তের ব্যাপার যে ভাবে যে ভাবে বাহিরের জগতের সঙ্গ ব্যবহারের যোগ্য হইতে পারে, সেই সেই ভাবে তাহার নানা অভ্যাস সঞ্চয় হয়; সে অভ্যাসগুলি চিত্তব্যাপারের আত্মগত প্রকার বলিয়াই সেগুলিকে চিত্ত হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করা যায় না।

বহির্জগতের অনন্ত বিচিত্র ভঙ্গীর তাল অনুসারে যে ভাবে যে ভাবে চিত্ত তাকে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, এ অভ্যাস বা ইসারাগুলি হচ্ছে চিত্তব্যাপারের গতির সেই সেই বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী বা প্রকার মাত্র। চিত্ত যখন বাহিরের জগতের সম্পর্কে আসে এবং তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে যায়, তখন সে তাহার ঐ ব্যাপার ভঙ্গী বা বিশেষ বিশেষ অভ্যাসকে কোনও ক্রমে এড়াইতে পারে না। যত দিকে যত রকমেই চিত্ত চলুক না কেন, সবদিকেই তাহার চলিবার একটা বিশেষ পদ্ধতি, প্রণালী বা প্রকার আছে। আমরা যেমন পথে চলিবার সময় কোনও বিশেষ ধারণা লইয়া চলি না, তথাপি আমাদের পা প্রভৃতি বিক্ষেপে এমন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব লইয়া তাহার গতিভঙ্গীকে মানিয়া চলে যে, তাহার একটু ব্যতিক্রম হইলেই, পথে সামান্য একটু গর্ত্ত

থাকিলে বা সামান্য একটু উঁচু কিছু থাকিলেই পদস্খলন নিবারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং আমরা চমকিয়া উঠি। প্রতিবিক্ষেপে পায়ে পায়ে নামে ওঠে, সেটা তার একটা বিশেষ ভঙ্গী, সেটা তাহারই গমন-ব্যাপারের নিজস্ব, তথাপি তাহার মধ্যে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একটা বিশেষ অপেক্ষা বা ধারণা লুকানো রহিয়াছে। এই যে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একটি বিশেষ অপেক্ষা বা আশা, ইহাতেই অজ্ঞাতে পায়ের গতিভঙ্গী স্বভাবত নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্দিষ্টক্রমে ব্যাপারিত হইয়া চলিয়াছে। পায়ের গতিভঙ্গীর মধ্যে যতটুকু চলন, ততটুকু পায়ের জীবনীশক্তি; কিন্তু যতটুকু তাহার চাল, তাহার রকম, ঢঙ, প্রকার, তাহার সমস্তটুকুই বাহিরের জগৎসম্বন্ধের একটা নির্দ্দিষ্ট অপেক্ষা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সঙ্গে যখন বাহিরের জগতের কোনও সম্পর্ক ঘটে, তখনই বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট অপেক্ষা বা ধারণা লইয়া চিত্ত তাহার সম্মুখীন হইতে চায়; সেইটিই তাহার অভ্যাস, চাল, ঢঙ বা প্রণালী। এই অভ্যাসের পথ হইতে কোনও অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মন যদি একেবারে অন্য একটা জায়গায় ছট্‌কাইয়া পড়ে তাহা হইলে মনে যে পীড়া জন্মে, নানা ভাবে তাহার আঘাত আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু অভ্যাসের পথ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হইয়া যদি সামান্য একটু নাড়া-মাত্র পায়, তাহা হইলেই সেই নাড়াটুকুকে এড়াইয়া আপন স্বাভাবিক অভ্যাসের পথে আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার জন্য অন্তঃপুর হইতে যে জীবনীশক্তির স্রোত আসিয়া স্বভাবগতিতে উপচিত হয়, সেইটিই হচ্ছে কৌতুক-রসের মূল নিদান এবং এইজন্যই চিত্তকে নূতন করিতে সঞ্জীবিত করিতে তরুণ করিতে কৌতুকের এত প্রয়োজন। যদি আকস্মিক ঘটনার প্রাবল্য এমন হয় যে চিত্ত তার অভ্যাসের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও অন্তঃপুরের জীবনীশক্তির ভাণ্ড হইতে নূতন রস নির্গত হইয়া আসে, কিন্তু আঘাতকে নিরাময় করিবার জন্যই সেটুক ব্যয় হইয়া যায়, সেইজন্য তাহার একটু-খানিকেও আমরা তহবিলে জমা দেখিতে পাই না। কিন্তু সামান্য নাড়াতে যে রস আসিয়া জমে, নাড়াটুকু সাম্‌লাইতে তাহার অতি অল্পই খরচ হয়। কাজেই সেখানে আমরা খানিকটা উচ্ছল জীবনীশক্তির আস্বাদ পাই, এবং এই আস্বাদই কৌতুকরসের আস্বাদ। এই জীবনীশক্তির প্রকাশ এবং প্রভাব কেন যে মুখের পেশী-গুলির উপর বিশেষ ভাবে কাজ করিয়া হাসি সৃষ্টি করে, সেটা শরীরতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের সঙ্গে সে বিচারের কোনও সম্পর্ক নাই। আমরা শুধু এই দেখিতে পাই যে আমাদের বিচিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারিদিক্ দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের যে যোগ ঘটিতেছে তাহার যেখানেই আমরা একটি অপ্রত্যাশিত সমাবেশ দেখিতে পাই, যাহাতে আমাদের চিত্ত তাহার অভ্যাসের পথে সামান্য একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে মাত্র, কিন্তু কোন রূঢ় আঘাত বা বিচ্যুতি সহ্য করিতে হয় না, সেইখানেই কৌতুকরসের সৃষ্টি। খুঁটিনাটির দিক দিয়া আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র যেমন বহুধা-বিচিত্র, তাহার কোনও ইয়ত্তা করা যায় না, তেমনি কোন্ কোন্ দিক দিয়া যে কেমন করিয়া কি কৌতুকরস সৃষ্টি হইতে পারে তাহারও কোন ইয়ত্তা করা যায় না।

একটা ছোট গাছে প্রকাণ্ড ফল দেখিলে হাসি পায়, বামন দেখিলে হাসি পায়, কুঁজো কি বাঁভা মানুষ দেখিলে হাসি পায়। আবার একটা পুতুলকে যদি মানুষের মতন তড়াক্ তড়াক্ করিয়া লাফাইতে দেখা যায়, কিম্বা একটা মানুষকে আছাড় খাইয়া ফুটবলের মতন গড়াইতে দেখা যায় তাহাতেও হাসি পায়। মেয়েরা বাঙ্গালীর ঘরে দেখিয়া হাসে; আবার বাঙ্গালী মেয়েরা হয়ত মেম দেখিয়া হাসে। ঢাকার কথা শুনিয়া বরিশালের লোক হাসে, বরিশালের কথা শুনিয়া ঢাকা হাসে, আর সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের কথা শুনিয়া পশ্চিমবঙ্গ হাসে। হাসি যে কতরকম থাকিতে পারে তাহার কোনও ঠিকানাই পাওয়া যায় না, এবং সমস্ত ব্যাপারেতেই দেখিতে পাই যে একটা অপ্রত্যাশিত বস্তুতে যে একটা নূতনত্বের চাঞ্চল্য আসে তাহাতেই হাসি আসে; তাহার মধ্যে নিজেকে বড় মনে করার ভাব বা দুষ্ট ব্যক্তিকে কর্ম্মোচিত প্রতিফল পাইতে দেখায় ফূর্ত্তি লাভ করা যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা কৌতুকরসের নিজস্ব নয়। যখন মানিক্‌পীরের গান শুনি যে—

কত কেরামত জানো রে আল্লা, কত কেরামত জানো,
হুঁকোর ভিতর পানি ভইরে গর্‌গরিয়ে টানো।

তখন আমরা যে হাসি, তাহাতে নিজের বাহাদুরির কোন লেশ আছে বলিয়া ত কিছুতেই মনে হয় না। মুসলমানি কথা এবং হুঁকোর গড়গড়ানি শব্দে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের পরিচয়, শুধু এই কথাতেই হাসি আসে। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন পড়িয়া যখন দেখা যায় দেবতারা মানুষের মতন দরদস্তুর করিতেছেন, গাড়ী চড়িতেছেন, চিঁড়ে দই খাইতেছেন, তামাক খাইতেছেন, তখন আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না। আবার যদি পড়ি যে এখানকার কোন রায়বাহাদুর বা C. I. E. স্বর্গে গিয়া সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, এবং এজিটেশনের ব্যবস্থার উদ্যোগ করে, তাহা হইলেও আমাদের হাসি আসে। শুধু ছন্দেতে যে হাসি আসিতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্যের মতন চলিতে চলিতে হঠাৎ পদ্য হইয়া গেল, কিম্বা পদ্য চলিতে চলিতে হঠাৎ গদ্য হইয়া গেল, পদ্যের মধ্যে এমন দুএকটা শব্দ পাইলাম যাহা গদ্যেই আমরা সাধারণত দেখিয়া থাকি। তাহার সঙ্গে কল্পনার উল্টাপাল্টা ত আছেই এবং হরত মধ্যে মধ্যে শ্লেষ বা punningও চলিতেছে।

চল লুপমেল—ইংরেজের খেল,
হাওয়ায় যেন উড়ে, ধোঁয়া বালি ছুঁড়ে,
দূরের জিনিষ কাছে এনে, কাছের ফেলে দূরে—
যেন তাহার খেলা। ছোট টিশন মেলা
ছাড়িয়ে ত অবিলম্বে এল শ্রীরামপুরে।
সেখানে একটু থামিয়ে, যাত্রী তুলে নামিয়ে
হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চলে দ্রুতগামী এ।
জ্ঞান নাইকো দাদার আলো কিম্বা আঁধার,
করে নাও দৃষ্টি ঝল্কা কিম্বা বৃষ্টি,
উর্দ্ধশ্বাসে উড়ে পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে
টড়া টক্ টড়া টক্ টড়া টক টড়া ধারামতে
ছাড়াল যে কত ষ্টেশন পারি নাইক গণিতে।

আবার

ব্যারিষ্টার-উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারী অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে,
মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক বাঙ্গালী চ দলে দলে॥
কাহারো পরণে কুর্ত্তি, কাহারো উড়নি উড়ে,
কাহারো বা খুলে চাপ্‌রাস, কাহারো সাহেবী ধড়া॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ী, কাহারো পিছনে টিকী,
কাহারো উপরে বুঁটি, কা কস্য পরিবেদনা॥

এরূপ বিবিধা মূর্ত্তি সমাগত সভাতলে
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিতে কতে॥
তন্মধ্যে মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীটি পুরোহিত
রেজুলেসন-নির্ম্মাণে বক্তৃতায় মহারথী।

* * *

পরিশেষে সভাতলে সবাই অপরাজিত,
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে॥
বাঙ্গালী-মহিমা-কীর্ত্তিকলাপ-কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

আবার

জান না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্ত
যদি না তা আকর্ষণ জন্য?

* * *

বাবা! সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে
শূকর-গো-মৃগ-মাংসে পুষ্ট
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ
যা কর সাহেব নাড়িব পুচ্ছ।

লঘু বিষয় লইয়া যে বাঙ্গলাতে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ করিতে যাওয়া হইয়াছে তাহাতে জিনিষটা হাল্‌কা হইয়া গিয়া হাসি জমাইতেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে এবং উপহাস শ্লেষের রসেরও বেশ মিল আছে।

আবার

পারো ত জন্মোনা কেউ বিদ্যুৎবারের বারবেলায়,
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবে নাকো তার ঠেলায়।
দেখ বিদ্যুৎবারের বারবেলায় আবার জন্ম হৈল
ভাই দিল মোরে কালো কোরে রোদে ধরে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

এখানে বিদ্যুৎবারের বারবেলায় প্রতি কুসংস্কারের ঠাট্টাটি ছন্দের জোরে চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছে।

আবার "বদ্‌লে গেল মতটা"তে কোরসের গদ্য ঢঙে ঝোঁকটাতেই সমস্ত হাসিটা জমাইয়া রাখিয়াছে।—

ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা।
কোরস— অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদলায়॥

বসন্তে যে বিরহিণীদের বিরহ-যাতনা বাড়ে এটার সঙ্গে সাহিত্যে আমরা সুপরিচিত; কিন্তু শুধু ছন্দের ঢঙের বর্ণনায় অদ্ভুতত্বে ও বিরহ-বিনোদনের অদ্ভুত উপায়ে কি সুন্দর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে।

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অন্ত
বুঝিবা এবার ঢুঁকা হোল তার সখি বা এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি,
এ সময় আহা বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত।
গুন্‌গুনে মাছি দিনের বেলায় শন্‌শনে মশা রাত্রে;
ঝর ঝর ঝর বুল কুল কুল বহে ঘাম সব গাত্রে;
*　　*　　*
পতি কাছে নাই পতি বিনে আর কে আছে নারীর সম্বল?
কাঁচা আম দুটো পেড়ে আন নথি, গুড় দিয়ে বাঁধি অম্বল।
নিয়ে আয় পান, তাল আন দুই, বিরহের এত জ্বালা মোরে যাই,
দাঁড়াইয়া কেন হাসিস লো তই বাহির করিয়া দন্ত।

আবার শুধু একটা অদ্ভুত হাসি টানিয়া আনিতে পারে—

কেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী।

কিম্বা

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে
স্বপ্নে মুই দেখি ভোরে, তারপরে ঘুম ভেঙ্গে ওরে
উঠে যেয়ে পড়ি মেয়ের বড়াস করে
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈত্তির কি আশ্বিনের ঝড়ে।

আবার বিরহের বর্ণনায় যখন পড়ি

তোমার বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই?
কি বলিব আর পরিত্যাগ (এখন) একেবারে চিঁড়া দই।
রেচে নাকো মুখে কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ!
এখন সকাল বেলা উঠে তাই হতাশ ভাবে সন্দেশ খাই,
বিরহেতে দিনে দিনে ওজনেতে ভারী হই।

তখন এই উল্টা বর্ণনাতে না হাসিয়া পারা যায় না। আবার বাঙ্গালার "মেঘদূতের" সঙ্গে ইংরেজী "ফেদার" মিলানোতে হাসি আসে। এমনি যেটা পড়িলে হাসি আসে না, ঢঙ্ করিয়া সেটা পড়িলে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না।

যেমন "অয়ি ময়ি বানিনি মা কুরু মানং"।

খাওয়ার জিনিষকে কখনও কাব্যরসের বিষয় করা হয় না। কিন্তু ভাল খাবার যদি কাহারও মনে কবিত্ব-প্রেরণা জাগাইয়া তোলে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

উহু　　সন্দেশ বুঁদি মজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া
উহু　　গড়েছ কি বিধি দয়ায় বিধি কত না বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও খাদি—আঃ
মদীয় বদনে ঢালিয়া,
উহু　　কোথায় লাগে কোপ্তা কাবাব, কোথায় পোলাও কালিয়া।
উহু　　খাই তা হলে চক্ষু মুদিয়া চিৎ হইয়া না মড়িয়া।
আহা　　ক্ষীর হোত যদি ভাঙ্গ-জলধি, ছানা হত হিমালয়,
আহা　　পরিতাম কিবু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয়।

আবার এর tragic সাইটি আরও চমৎকার—

ওহো　　না খেতেই যায় ভরিয়া উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়া।
ওহো　　মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চক্ষে বয়ে যায় দরিয়া!

কত রকমে যে সাহিত্যে হাসোর সৃষ্টি হইতে পারে, এরকম এলোমেলো ভাবে উদাহরণ তুলিয়া তাহার কোনও কিনারা করা যাইবে না। কৌতুকরসের সুর বিভাগ করিতে গেলে হয় ত শব্দগত, বাক্যগত, ছন্দগত বিপর্যয়ভাবে সমাবেশগত, কি চরিত্রগত, বাহ্যিক আকার, প্রকার, কি চাল-চলনগত, এমনি অনেক-প্রকারের বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র এটুকুই চাইই যে একটি নূতন রকমের কিছু আসিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে মনকে তার অভ্যাস-দশার সুপ্তি হইতে জাগাইয়া তুলিবে। শ্রীমতী বিলাসিনী কার ফর্ম্মার উচ্চ শিক্ষার গর্ব্বে স্বামীকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাট্‌না বাটা এবং রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যাপারটা এই "পতিই পরমগুরুর দেশে" অবরোধের দেশে যে নিতান্ত কৌতুককর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি; কিন্তু এই জিনিষটাই যদি অন্য দেশের অনুরূপ সামাজিক অবস্থাতে ঘটিত তাহা হইলে হয়ত তাহাতে কিছু হাসির কারণ থাকিত না। একটু আকস্মিকত্বের এমন মৃদু আন্দোলন যাহাতে অন্য কোন ভাব বা চিন্তা ঘুমিয়া উঠিতে না পারে, অথচ মনটা একটু দোলা অনুভব করিয়া জাগিয়া ওঠে,—এইটুকুই হচ্ছে কৌতুকরসের বিশেষত্ব, এইজন্যই অন্য রসের মতন এ রসকে ধরা ছোঁয়া সহজ নহে; হাসি ছাড়া, কেন হাসি তা বোঝান যায় না। আকস্মিকতাই বলি, আর নূতনত্বই বলি, কোনটাতেই হাসির সেই নূতনত্বকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, হাসির যথার্থ কারণ হচ্ছে নূতনত্বের মৃদু উত্তেজনায় চিত্তের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত গতির কক্ষা থেকে একটু মুক্তি, একটু আলগা ভাব এবং তাহার ফলে জীবনীশক্তির স্বচ্ছ প্রবাহের একটা অজস্র উপচয়। হাসি সেইজন্য শুধু মনের ক্লান্তি দূর করে না, দেহেরও ক্লান্তি দূর করে এবং দেহকে কার্য্যক্ষম করে। W. J. Cromie বলিয়াছেন—

Laughing is an exercise which aids digestion. "Laugh and grow fat." "A merry heart doeth good like a medicine." Laughing stirs up the abdominal organs and increasing the circulation of the blood it aids peristalsis and causes the flow of the juices etc., needed in digestion. Take a five minute dose of laughter after each meal."

হাসি নানা কারণেই হইতে পারে। কিন্তু অন্য হাসির সহিত কৌতুকের হাসির তফাৎ এই যে অন্য হাসিতে লাভ ক্ষতি দম্ভ অভিমান প্রতিহিংসা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনের সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু কৌতুকের হাসি অনিমিত্ত হাসি, এ হাসি আমরা নিজের উপর হাসি, পরের উপর হাসি, বাস্তব ব্যাপারেও হাসি, সাহিত্যের কাল্পনিক ব্যবস্থায় হাসি, শব্দের ঝঙ্কারে হাসি, কথার সুরে হাসি, অনেক সময়েই কিসে হাসি তা জানি না তবু হাসি, এ হাসি আমরা ইচ্ছা করিয়াই হাসি না, বরং অনেক সময় হাসি চাপিতে চেষ্টা করিলেও চাপিতে পারি না। বলি যে, দম ফেটে যায়, ভারি হাসি পাচ্ছে, কিছুতেই চাপা যাচ্ছে না। এর জোর এমন বেশী যে অন্য রসের মতন এ উপভোগের ইচ্ছা বা চেষ্টার অপেক্ষা করে না, জীবনীশক্তির যে উচ্ছল প্রবাহ আরম্ভ হয় তার গুটিকা উপভোক্তার নিজের হাতে নেই। চিত্তের অজ্ঞাতে আসিয়া যেই কোনও আকস্মিক সন্নিবেশ বৈচিত্র্যে জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে আঘাত দিয়া সঞ্চলিত করিয়া তোলে অমনি কৌতুকরসের অনুভবের সৃষ্টি হয়। অন্য রসের বেলা দেখা যায় তাহারা যখন সাহিত্যে বা শিল্পে স্থান পায় তখনই তাহারা ব্যবহার-ক্ষেত্র এড়াইয়া অলৌকিক এবং অনিমিত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু কৌতুকরসের বিশেষত্ব এই যে, এর স্বভাবই এই যে, এ সব সময়ই অনিমিত্ত ও প্রয়োজনবিহীন; লাভ- ও ক্ষতি-নিরপেক্ষ। প্রয়োজনের চাতুরী বা পাটোয়ারী বুদ্ধির তাড়নায় যখন মন কলুষিত হইয়া ওঠে, কৌতুকরসের খানিকটা সেখানে ছিটাইয়া দিতে পারিলে তখনই মন তাজা হইয়া ওঠে, এবং প্রয়োজনের উপরে উঠিয়া জীবনের যথার্থতার কেন্দ্রের একটু আভাস পায়। কৌতুকের দেবতা হচ্ছে প্রাণ, যে হাসিতে পারে তার এ সংসারে ভয়ের কারণ কম। যতই কেন ময়লা জমুক না কেন, যে খানিকটা হাসিতে পারে তার সেইখানেই অনেকখানি ভার লঘু হইয়া যায়। তাই আর কিছুও যদি আমরা না পারি, তবুও হাসির লহর তুলিয়া উচ্ছল আনন্দে যদি মনকে নাচাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলেও জীবনটা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

বর্ষা-চিত্র

কাজল-কালো মেঘের কোলে
কাহার পরিকল্পনা?
বকের সারি দিচ্ছে পাড়ি—
শুভ্র সরু আল্‌পনা!
বিজ্‌লী-মেয়ে দুষ্টু বড়—
যায়না রাখা চঞ্চলে;
মুহুর্মুহু ঢাক্‌চে মাতা
নীলাম্বরীর অঞ্চলে!
কোন পটুয়া রংএর পরখ
কর্‌লে নিপুণ অঙ্গুলে—
ইন্দ্রধনুর অঙ্গ জুড়ি'
সাত রকমের রং গুলে?
শিখীর গায়ে পাচ্ছে শোভা
সাচ্চা মণির কার্‌খানা;
পুচ্ছ তাহার লক্ষ হাজার
ইন্দ্রধনুর হারমানা!
ঝিল্লি-রবের তানপুরাতে
মিশিয়ে গলা, ঝোপ ঝাড়ে—
বর্ষাগমের হর্ষ-গীতি
গায় দাদুরী মল্লারে!
কেশর-ঝরা নীপের মূলে,
গন্ধামোদে উন্মনা,
কাজ্‌লী গীতে গায় বধূরা
কাজ্‌লা মেঘের গুণপনা!
গুড়ু গুড়ু গুড়ু দেয়ার ডাকে
হাল্‌কা বুকে হুল ফুটে;
বিদেশগত বঁধুর আশায়
জান্‌লা পাশে ফুল ফুটে!
ধরার কাছে জলের ঋণী
আকাশ ছিল বিন্-সুদে;
বর্ষারাণীর ভরসা পেয়ে,
সুদ সমেতে ঋণ শুধে!
বজ্রনাদের গর্জ্জে কামান,
ঝঞ্ঝা-বায়ুর ঝন্‌ঝনা,
আকাশ জুড়ে বাঁধ্‌লো সমর—
দেব্-দানবের গঞ্জনা!
পূর্ণ হল পুকুর ডোবা,
তূর্ণ হল নদ নদী,
তীর্থ-বারির প্রক্ষালনে—
বসুন্ধরার সদ্‌গতি!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

পঞ্চশস্য

হাতকাটা চিত্রকর—

প্রকৃতি যখন তাঁর কোনো সন্তানের অঙ্গহানি করিয়া পাঠান তখন তার অভাব তিনি মোচন করেন অপর অঙ্গে বা অবয়বে অধিক শক্তি সঞ্চার করিয়া। সুতরাং কারো কোনো অঙ্গহানি ঘটিলেই হতাশ নিরুদ্যম হইতে নাই; একটু চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে উদ্‌যোগী লোককে প্রকৃতি সাহায্যই করিয়া থাকেন।

সাধারণত মনে হয় চিত্রবিদ্যা একমাত্র হাতেরই কাজ, হাত না থাকিলে চিত্র করা অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু হাতকাটা লোকও চিত্র-বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া নাম করিয়াছেন ও করিতেছেন।

হাতকাটা চিত্রকর, ম্যসিয়ো শার্ল ফ্রাঁসোয়া ফেলু।

বেল্‌জিয়মের প্রসিদ্ধ চিত্রকর ম্যসিয় শার্ল ফ্রাঁসোয়া ফেলু ছিলেন জন্মাবধিই দুহাতকাটা। ১৮৩০ সালে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি ফুল লইবার জন্য কাঁদিয়া বায়না ধরিতেন। তখন তাঁর মা তাঁকে পায়ের আঙুলে করিয়া ফুল ধরিতে শিখাইতেন। এইরূপে তাঁর পায়ের আঙুল এমন নমনীয় ইচ্ছাবশ হইয়া উঠে যে তিনি শৈশবেই নিজে-নিজেই পায়ে করিয়া গাছ হইতে ফুল তুলিয়া লইতে পারিতেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি লেখাপড়ার কাজ পা দিয়াই চালাইয়া সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েট হন। তারপর পঁচিশ বৎসর বয়সে চিত্র শিখিতে আরম্ভ করেন এণ্ট্‌ওার্পে। তিনি ডান-পায়ের আঙুলের ফাঁকে তুলি, আর বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলে রঙের পাটা ধরিয়া অনেক ওস্তাদ চিত্রকরের নামজাদা ছবির নকল তুলিয়াছেন এবং নিজেও অনেক উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি চিত্রে দক্ষতার জন্য স্পেনের রাজসম্মান The Royal Order of Isabella, পোর্তুগালের রাজসম্মান The Order of Christ of Portugal লাভ করেন।

এঁর ছবি দেখিলে বোঝা শক্ত যে সে-ছবি পায়ে আঁকা। ছবির রেখাসম্পাত এমনি দৃঢ়, ও বর্ণসুষমা এমনি সুসঙ্গত, যে হাতেও অমন দক্ষতা বহু শিল্পীর সাধনার আকাঙ্ক্ষিত।

ফেলু পায়ে আঙুল-কাটা মোজা পরিতেন, এবং বুড়ো আঙুলের ফাঁকে তুলি ও রঙের পাটা ধরিয়া একটু হেলান দিয়া বসিয়া অনায়াসে ছবি আঁকিতে পারিতেন। তাঁর পা এমনি কর্মক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি সচ্ছন্দে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে পারিতেন; নিজের খাবার নিজেই ছুরি দিয়া কাটিয়া কাঁটা-চামচে দিয়া তুলিয়া খাইতে পারিতেন। আশ্চর্য আরো এই যে জলের গ্লাসও তুলিয়া চুমুক দিতে পারিতেন, এবং নিজে-নিজেই ক্ষৌরী-করিতে পারিতেন—কখনো একদিনও তাঁর দাড়ি কামাইতে গাল কাটিয়া যায় নাই। কেবল পারিতেন না তিনি জামার বোতাম দিতে; আর পাকে অবিরত হাতের কাজ করাইয়া করাইয়া পারিতেন না সোজা হইয়া সিঁড়ি উঠিতে; সিঁড়ি উঠিবার সময় দেয়ালে ঠেস দিয়া কাত হইয়া হইয়া ধাপে ধাপে চড়িতেন।

ফেলু সাহিত্যরসিক ছিলেন; অনেক কবিতা ও মিলনান্ত নাটক রচনা করিয়াও তাঁর খ্যাতি হয়। তাঁর একখানা নাটক এণ্ট্‌ওার্পে অভিনয় হইয়া বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

১৮৭৪ সালে ফেলু ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার আর্ট-গ্যালারীর প্রসিদ্ধ অনেক ছবির নকল করেন।

এই অসামান্য দক্ষতার জন্য ফেলু এণ্ট্‌ওার্পের প্রধান দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন জানি, তখন তাঁর বয়স হইয়াছিল সত্তর বৎসর। এখনো তিনি জীবিত আছেন কি না, অথবা কবে তাঁর দেহান্তর ঘটিয়াছে তার খবর আমরা পাই নাই।

সম্প্রতি আমেরিকায় একটি হাতকাটা চিত্রকরের আবির্ভাব হইয়াছে। এঁর বয়স অল্প। ইনি আগে এয়ারপ্লেন কারখানায় কাজ করিতেন; দুর্ঘটনায় দুহাত কাটা যায়। তিনি এতে হতাশ না হইয়া চিত্রশিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া চিত্রকর হইয়াছেন।

এই দুই উদ্‌যোগী পুরুষের দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে কিছুতেই হতাশ হইবার কারণ নাই। চাই শুধু উৎসাহ সাহস ও আশান্বিত অন্তর।

অনেক লোক পায়ে বাজনা বাজাইতে, সেলাই করিতে পারে। জাপানীরা নাকি পাকে হাতের সহকারী করিয়া কাজে খাটায় খুব বেশী।

—

শিকারী বিড়ালের গোঁপ—

বাংলায় একটা কথা চলিত আছে যে "শিকারী বেড়ালের গোঁপ দেখ্‌লেই চেনা যায়।" এতদিন পরে এই কথার বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

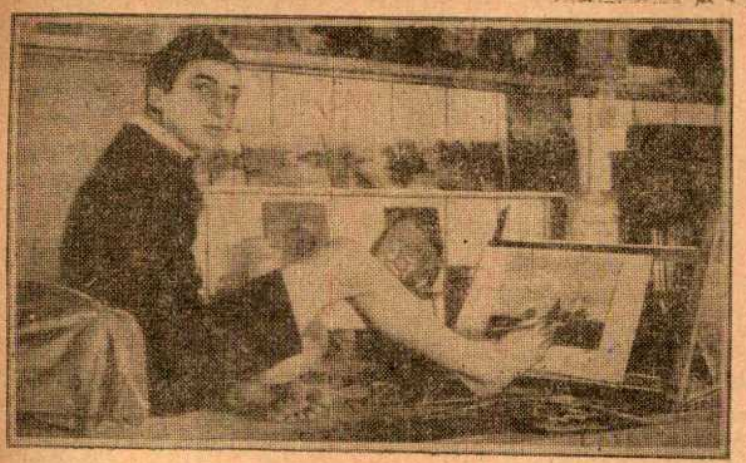

হাতকাটা তরুণ আমেরিকান চিত্রকর।

বিড়ালের গোঁপ তার চোখের দোসর। যে পথে মুখ গলাইতে গিয়া তার গোঁপ দুপাশে ঠেকে সে পথে পুষির শরীর গলিবে না—ইহা সে বুঝিয়া লয়।

অনেক প্রাণীর এমন কিছু অঙ্গলগ্ন অবয়ব থাকে যা তার দৃষ্টিকে সাহায্য করে। সাপ ঘন ঘন জিভ বাহির করিয়া চোখের দেখার ত্রুটি সারিয়া লয়। শিকারী প্রাণীরা শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার বা একটা ফাঁকা জায়গার উপর দিয়া লাফাইয়া যাইবার আগে ঘন ঘন গোঁপ নাড়ে; এতে তাদের দৃষ্টিতে শিকারের বা ওপারের আশ্রয়স্থানের দূরত্বের আন্দাজ হইয়া যায়। শিকারী বিড়াল যখন ইঁদুর দেখিতে পায় তখন সে ঘন ঘন গোঁপ নাড়ে; তাতে তার দৃষ্টিতে ইঁদুরের ছবি সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। কোনো জিনিষের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে সেই জিনিসের আকার ঝাপ্‌সা কোয়াসা-ঢাকা মতন হইয়া আসে; তখন চোখ আধবোজা করিলে আবার সেই জিনিসের রূপ সুস্পষ্ট রেখায় দেখা যায়। বিড়ালও শিকারের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে বলিয়া তার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে; কিন্তু সে গোঁপ নাড়িয়া দৃষ্টির সেই দোষ দূর করে। শিকারী বিড়ালের গোঁপ কামাইয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে সে বেচারা আর ইঁদুর ধরিতে পারে না; যতদূরে ইঁদুর আছে আন্দাজ করিয়া সে লাফ মারে সে আন্দাজ বারবার তার ভুল হয়, ইঁদুর পলাইয়া যায়। তারপর পরচুলা গোঁপ আঠা দিয়া লাগাইয়া দেওয়াতে বিড়াল আবার শিকার ধরিতে নিখুঁত অবস্থার চেয়ে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে দেখা গিয়াছে।

কাঠবিড়ালীদেরও গোঁপ চোখের দৃষ্টির দোসর, আর তাদের লেজটাও। তারা সদাই লেজটাকে পিঠে তুলিয়া নাচায়; তার উদ্দেশ্য গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায় লাফালাফি করিবার সময় দূরত্বের অনুমান ও আন্দাজ ঠিক করা। যদি কাঠবিড়ালীর গোঁপ ও লেজের লোম কামাইয়া দেওয়া যায়, তবে লাফাইতে গিয়া তার পদস্খলন ঘটে, পদে পদে বেচারা আছাড় খায়।

—

জোড়া ছেলে—

যমজ ছেলে অনেক হয়। মাঝে মাঝে এমন যমজ জন্মে যারা অঙ্গে অঙ্গে একত্র জোড়া। এমন জোড়া ছেলে বেশীদিন বাঁচে না, দৈবাৎ দু একটা টিকিয়া যায়। এরূপ যুগ্ম যমজের মধ্যে প্রসিদ্ধ শ্যামদেশের যমজ। সম্প্রতি ফিলিপিনো একজোড়া যমজ ছেলের সংবাদ পাওয়া গেছে। তারা পিঠোপিঠি কাঁধ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত জোড়া। এমনি ভাবে তারা জন্ম থেকে এই তেরো বছরে পা দিয়াছে। তাদের ভ্রাতৃস্নেহ অচ্ছেদ্য বলিয়াই তাদের চলাফেরায় খুব অসুবিধা ঘটে—একজন যদি চলে পুবে ত অপরকে পশ্চিমে মুখ করিয়া পিছু হাঁটিতে হয়। এ বড় ল্যাঠা। শোওয়ার সময় যে তারা কি করে তা ত ভাবিয়াও মীমাংসা করা যায় না। এদের বাপ মা এদের আমেরিকায় লইয়া গিয়াছেন ডাক্তারের ছুরিতে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইতে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটুক—কিন্তু প্রাণ-বিচ্ছেদ যেন না ঘটে।

ডাক্তারেরা বলেন ভ্রূণ-পরিণতির ব্যতিক্রম ঘটিলেই এমন-সব যুগ্ম যমজ বামন অতিকায় প্রভৃতি আকৃতি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। যদি একই রকমের বিকৃত-আকৃতি দুটি মেয়ে-পুরুষের বিবাহ হয় তবে তাদের ছেলেমেয়েরা জনক-জননীর বিকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াই জন্মিতে থাকে বলিয়া জাত-বেদারা অনুমান করিতেছেন।

জোড়া ছেলে।

—

বৃহত্তম মণি—

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সকল হীরার চেয়ে বড় হীরা কুলিনান ডায়মণ্ড। এটি আবিষ্কৃত হয় ১৯০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯১৭ সালে আমেরিকায় একটি ওপাল বা পুলক নামক মণি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তার আকার লম্বা প্রায় ৪ ইঞ্চি, চওড়া ৩ ইঞ্চির এক সুতো বেশী, মোটা ২ ইঞ্চির এক সুতো বেশী—যেন এক-খানা আধ্‌লা ইট। এর ওজন ১৮½ আউন্স—আধ সেরেরও বেশী ভারী। এই জাতের মণি এতবড় আর কখনো এর আগে পাওয়া যায় নাই। এর রং ময়ূরকণ্ঠী—নীল আর সবুজের ঝিলিক মারে। এমন সুন্দর রংদার ও বেদাগ পুলক এর আগে পাওয়া যায় নাই।

আমেরিকার নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়মে একটি পীলু বা যশম বা জেড মণি আছে, সেটি তার জাতের মধ্যে বৃহত্তম। লম্বাই ৭ ফুট, ওজন ৮১ মণ। এই মণিটি পাওয়া গিয়াছিল নিউ-জীলাণ্ডে। এই মণিটির উপর যুদ্ধনৃত্যপরায়ণ এক মাওরী যোদ্ধার মূর্ত্তি দাঁড় করানো আছে—মাওরী যোদ্ধা ছোরা উঁচাইয়া জিভ ভেঙাইয়া শত্রুকে অবহেলা দেখাইয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে।

—

বৃহত্তম জেড্ বা যশম মণি।

গাছে ধোঁয়া দেওয়া—

মানুষের যখন বসন্ত কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক রোগ হয়, তখন তার ঘরে সমস্ত বাড়ীতে ধুনো গন্ধক পুড়াইয়া ধোঁয়া দেওয়া হয়, যেন রোগের বীজ ধোঁয়ায় মরিয়া যায়, অন্যকে আক্রমণ না করিতে পারে। বাগানের এক গাছের রোগ হইলে অপর গাছগুলিও ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত হইতে পারে, এই ভয়ে সুস্থ গাছগুলিতে ধোঁয়া দেওয়া দরকার হয়। ঘরে ধোঁয়া ও গাছে ধোঁয়া দেওয়া ব্যাপার কিন্তু সমান সোজা নয়। ঘরের জান্‌লা দরজা বন্ধ করিলেই ঘরে ধোঁয়া দেওয়া যায়; গাছে ধোঁয়া দিতে হইলে গাছকে একটা তাঁবুর মধ্যে বন্ধ করিতে হয় বা ঘেরাটোপ ঢাকা দিতে হয়। উঁচু উঁচু গাছে ঘেরাটোপ ঢাকা দেওয়া ত সোজা কাজ নয়। আমেরিকা এই কাজে বেলুন নিযুক্ত করিতেছে। বন্দী বেলুনের তলায় ঘেরাটোপ ঝুলাইয়া বেলুনটাকে দড়ি ধরিয়া গাছের মাথার উপর আনা হয়; এবং উপর হইতে বেলুনটাকে দড়ি ধরিয়া টানিয়া নীচে নামাইলেই তার তলায় ঝুলানো ঘেরাটোপটা ছাতার মতন ছড়াইয়া গাছের উপর পরানো হইয়া যায়। তখন বেলুন হইতে ঘেরাটোপের বাঁধন খুলিয়া বেলুনটাকে অপর গাছে ঘেরাটোপ পরাইতে লইয়া যাওয়া হয়। ঘেরাটোপটা মাটিতে খোঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া তার মধ্যে হাইড্রোসিয়েনিক এসিডের ধোঁয়া ছাড়া হয়। এই এসিডের দুতিন ফোঁটা খাইলেই মানুষ মরে; এর ধোঁয়ায় কোনো পোকা মাকড় আর বাঁচে না—আণ্ডা বাচ্চা লইয়া সবংশে ধ্বংস হয়। ধোঁয়া দেওয়া হইয়া গেলে আবার বেলুন আনিয়া ঘেরাটোপে বাঁধিয়া ঘেরাটোপ তুলিয়া লওয়া হয়।

কয়ালী।

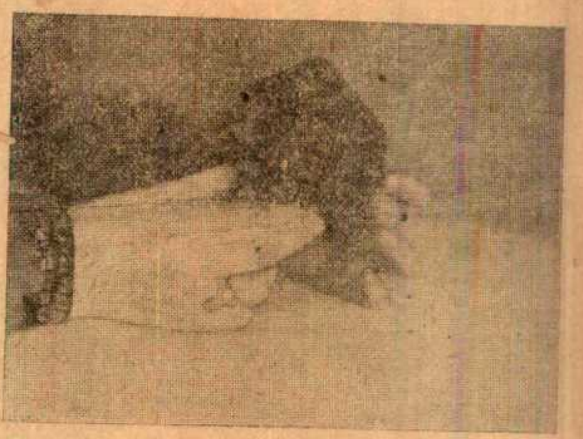

বৃহত্তম ওপ্যাল বা পুলকমণি।

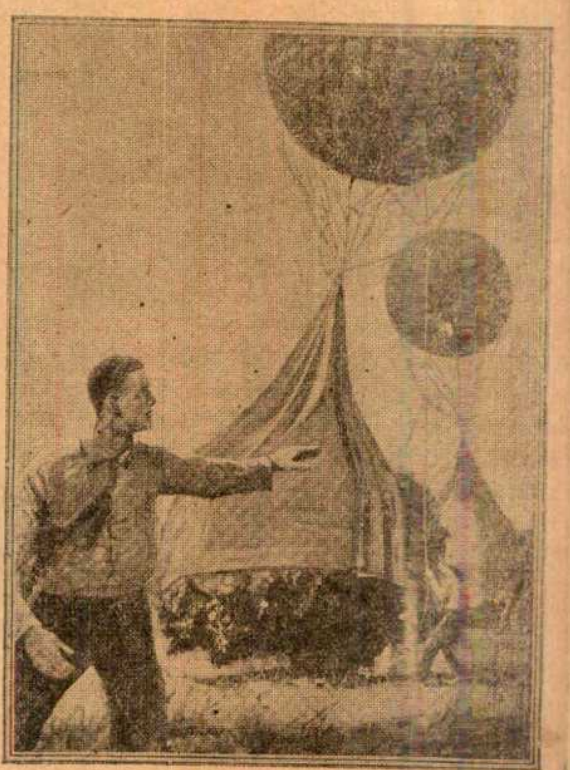

বেলুনের নীচে তাঁবু ঝুলাইয়া সেটাকে পোকায় ধরা গাছের উপর টানিয়া নামানো হইতেছে। তাঁবু নামিবার মুখে আপনা হইতেই ছাতার মতো ছড়াইয়া গিয়া গাছটিকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া ফেলে। তারপর বাঁধন-ছাঁদন কসিয়া তাঁবুর মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া হয়।

নারিকেলের ভেলা—

দারিদ্র্যের ভীষণ পেষণে পিষ্ট হইয়াও আমরা এখনও অর্থ বিষয়ে এমনি উদাসীন যে, আমাদেরই দেশে উৎপন্ন কত জিনিষ বিদেশীরা

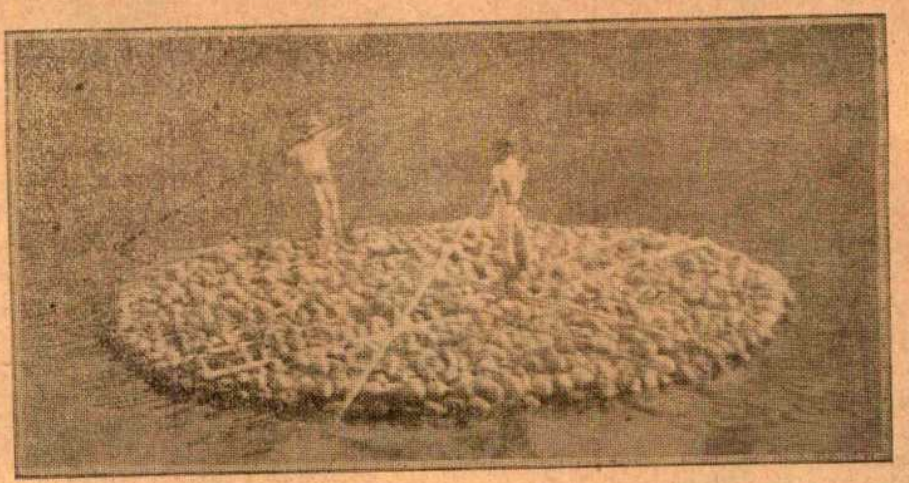

নারিকেলের ভেলা।

লুটিয়া লইয়া গিয়া অর্থ উপায়ের উপযোগী করিয়া লইতেছে, আর আমরা এখনও নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি। ভারতবর্ষ ও সিংহলে নারিকেল যত বেশী উৎপন্ন হয় তত আর জগতের কোথাও হয় না। নারিকেলের সমস্ত জিনিষই ব্যবহার করা যায়, কিছুই ফেলিবার নয়। বুদ্ধি খরচ করিয়া নারিকেলের গাছ হইতে খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, জ্বালানিকাঠ, দড়ি প্রভৃতি তৈরী করা যায়। এসব যে আমাদের দেশে হয় না এমন নয়। কিন্তু নানা জায়গা হইতে নারিকেল একত্র করিয়া বেশী পরিমাণে তাহা হইতে জিনিষ তৈরী করার চেষ্টা হওয়া উচিত। বিদেশীরা এসবের খুব ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। এক জায়গায় অনেক নারিকেল জোগাড় করিয়া কলে লইয়া যাইবার জন্য ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। তারা নারিকেলগুলি এক জায়গায় গোল করিয়া পরের পর থাকে থাকে সাজাইয়া তাদের উপর লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়া বাঁধিয়া একটি খুব বড় গোল ভেলা তৈরী করে। তারপর ভেলাটি নদীর জলে ভাসাইয়া লগি ঠেলিয়া কলে লইয়া যায়।

—

চিনির গাছ—

আমাদের দেশে চিনি তৈরী করার দুটি উপায় জানা আছে। এক খেজুর-গাছের রস জ্বাল দিয়া তাহা হইতে গুড় করিয়া, সেই গুড় হইতে চিনি তৈরী করা। আর এক—আক মাড়িয়া তার রস হইতে গুড় করিয়াও তাহা হইতে চিনি বাহির করা। বিট পালম হইতেও চিনি জার্ম্মানরা করিয়া থাকে। তালের রস ও নারিকেল রস হইতেও চিনি হইতে পারে। এ-সমস্ত উপায়ই পরিশ্রমসাপেক্ষ। ভগবান মানুষকে হাত পা ও বুদ্ধি দিয়াছেন তার নিজের প্রয়োজনের জিনিষ নিজের পরিশ্রমে অর্জ্জন করিবার জন্য। কিন্তু এমন অনেক জিনিষও তাঁর প্রকৃতির বক্ষে আছে যাহা একেবারেই মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী হইয়া রহিয়াছে। মানুষকে কেবল কষ্ট করিয়া সেগুলি খুঁজিয়া লইতে হইবে। মানুষের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু ও উদ্যমশীল তারা প্রকৃতি-মাতার বক্ষ হইতে এইসব প্রস্তুত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। আমাদের অনুসন্ধিৎসা কম, সেইজন্য আমাদের দুঃখও বেশী। পশ্চিমের পরিশ্রমী সন্তানরা প্রকৃতি-মাতার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া আনিতেছে। তারা সম্প্রতি এক প্রকার গাছের সন্ধান পাইয়াছে; সে গাছের পাতার উপর তৈরী সাদা চিনির চাঙড় আপনা-আপনি

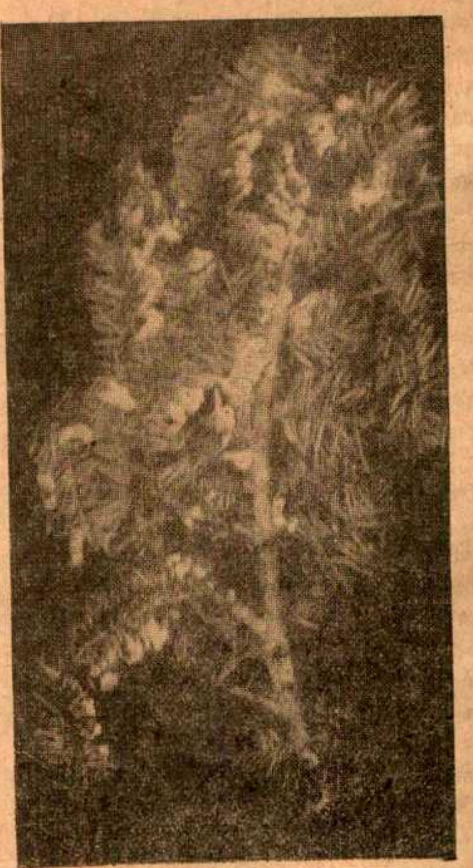

চিনি-ফলা গাছ। থোকা থোকা সাদা চিনি ধরিয়াছে।

বাহির হইয়া ঝুলিয়া থাকে! প্রথমে কানাডায় এ গাছের সন্ধান মিলিয়াছে।

এই গাছের নাম Douglas Fir. আমাদের দেশে বাব্‌লা বা সাঁই গাছ দেখিতে যেমন, এ গাছও দেখিতে অনেকটা সেই রকম। ইহার পাতা ছোট ছোট এবং ডালে কাঁটা। এই কাঁটার মাঝে সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া এক-রকম রস গড়াইয়া পড়িয়া পাতার গায়ে জমিতে থাকে। ইহাই জমিয়া শুকাইয়া চিনি হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও কানাডায় অনেক জায়গায় এই গাছ আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় এইসব জায়গা দিয়া কত দিন কত ব্যবসায়ী লোক, কত আবিষ্কারক চলিয়া গিয়াছেন, কাহারও চোখে এ গাছ পড়ে নাই। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যানকুভারের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক জন ডেভিড্‌সন্ এই নূতন চিনির গাছের নূতন তথ্য সভ্য-জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। অপর অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন।

এই গাছের পাতার গায়ে গায়ে ছোট বড় নানা আকারের চিনির চাঙড় ঝুলিতে থাকে। চাঙড়গুলির আকার পরিধিতে সিকি ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি অবধি। ছোট ছোট ড্যালাগুলি এক-একটি পাতার গায়ে এক-একটি শাদা ওলার মত দেখায়। কখনো বা একটি ড্যালা কয়েকটি পাতা জুড়িয়া ঝুলিতে থাকে। যেগুলি খুব বড় বড় চাঙড়, সেগুলি পাতা ও ছোট ছোট ডাল ঢাকিয়া থাকে। এই চিনি পাড়িয়া মুখে দিলে অত্যন্ত মিষ্টি লাগে এবং তার স্বাদ ভালো করিয়া বলে তৈরী চিনির মতই মধুর। মুখের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য ইহা কাইর মত হয় ও তারপর গলিয়া যায়। ইহা খুব শুষ্ক এবং শক্ত, মোটে চটচটে নয়। খুব প্রবল বৃষ্টি হইলে চিনি গলিয়া ঝরিয়া পড়ে, অল্প বৃষ্টিতে পড়ে না। কিন্তু মাটিতে পড়িয়া ইহা অনেক সময়ে জমিয়া যায়। আবার আধ-গলা অবস্থাতেও থাকে। সে সময়ে মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া ইহা খাইতে থাকে। অধ্যাপক ডেভিড্‌সন্ অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সকলের চেয়ে গরম জায়গায় এই চিনির গাছের জন্ম। পোকার পাতা বা ডাল কাটিয়া দিলে রস বাহির হইয়া চিনি হয়, না আপনা-আপনি রস বাহির হইয়া চিনি হয়, ইহা স্থির করিবার জন্য তিনি অনেক গাছ দেখিয়া বেড়ান। অবশেষে দেখা যায় যে পোকায়-কাটা গাছে চিনি অল্পই বাহির হয়, বরং অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় আছে এমন ও পোকা-বিহীন সুস্থ গাছেই বেশী চিনি জন্মায়। খুব শুক্‌নো জায়গায় থাকিলে এ গাছে ভাল চিনি হয় না। জমি একটু ভিজা থাকিবে ও সূর্য্যের আলো প্রচুর থাকিবে এমন জায়গায় এই গাছ থাকিলে তাহা হইতে বেশী চিনি হয়। গ্রীষ্মকালে দিনের পর দিন মুক্ত রোদ পাইতে থাকিলে এ গাছের বড় সুবিধা। মেঘলা ও বর্ষার দিনে এর চিনি উৎপাদনের শক্তি কমিয়া যায়।

আমাদের দেশে এ-রকম চিনির গাছ আছে কি না তাহা আমরা জানি না। আমাদের মধ্যে এমন কে অনুসন্ধিৎসু আছে যে প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে এ জিনিষের আবিষ্কার করিবে? আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; অতএব এখানে ঐরূপ চিনি-গাছ জন্মানো যাইতে পারে কি না তাহাও আমাদের ভাবিবার ও পরীক্ষা করিবার বিষয়।

আমেরিকার কয়েক বৎসর আগে এই চিনি-গাছ ছাড়া আর-একটি চিনির গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তার নাম "কাজি"। তার স্বাভাবিক চিনি আমরা যে চিনি ব্যবহার করি তার চেয়ে ১৮০ গুণ মিষ্ট। ইহার সন্ধান পাইয়া চিনিওয়ালারা খুব আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে এই গাছের চিনি আসলে গ্লিসারিনের মত, প্রকৃত চিনি নয়। এই গাছের বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হন নাই। অবশেষে আমেরিকার সম্মিলিত রাজ্যে এক কৃষিবিভাগে ইহার কতকগুলি পাতা ও বীজ জোগাড় করা হয়। ইহার সিকি ইঞ্চি পরিমাণ কোন অংশ খাইলে ঘনীভূত বা জমাট-বাঁধা শর্করার মত মিষ্ট লাগে।

দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় আবার "আস্‌বেরুন" নামে একটি গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তার ফল সামান্য একটু মিষ্ট। এই ফলের এমন গুণ যে ইহা খাইবার প্রায় আধো তের ঘণ্টা পরে যদি লেবু, কাঁচা ফল বা অন্য কোন টক জিনিষ খাওয়া যায়, তাহা হইলেও টক জিনিষ মুখে অত্যন্ত মিষ্টি লাগে। খাদ্যের দিক হইতেও এসব জিনিষের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের খুবই প্রয়োজন।

—

নূতন গ্রহ—

পশ্চিমের জ্যোতিষীরা সৌর জগতে একটি নূতন গ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন। এই গ্রহ তাঁরা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তবে ইহার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। এই গ্রহটি আকারে আমাদের পৃথিবীর মত। কিন্তু ইহা সূর্য্য হইতে এত দূরে যে সেখানে চিরযুগ রাত্রির নিবিড় অন্ধকার, আলোকের ক্ষীণতম রেখাও সেখানে পৌঁছায় না।

আমাদের পৃথিবী হইতে দূরতম গ্রহ নেপচুন। নেপচুনের গতিবিধি দেখিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা অনুমান করেন যে নেপচুন হইতেও দূরে অপর কোনো গ্রহ আছে, যার প্রভাব নেপচুনকে মাঝে মাঝে কেন্দ্রভ্রষ্ট করে। উহা নেপচুনকে যেটুকু স্থানচ্যুত করে তার পরিমাণ আমাদের মত লোকের কাছে খুবই কম। কিন্তু জ্যোতিষীদের কাছে তাহাই এক মহা ভাবনার বিষয়। তাঁরা বলেন—এই অজ্ঞাত গ্রহটি হয় খুব প্রকাণ্ড, তা না হইলে নেপচুনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না; আর নয় উহা খুব ছোট, কেননা, তাহা না হইলে এতদিন উহা তারাদেখী যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়িত। এতদূরে থাকার জন্য ইহার ছবি লওয়া অসম্ভব, তারা বলিয়া মনে করাও হয়ত ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে, অপর একটি পৃথিবী মনে করা ত দূরের কথা। ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইলে যেখানে ইহা আছে বলিয়া মনে হয় সেখানকার অস্পষ্ট কতকগুলি তারার তিনটি বা আরো বেশী তুলনামূলক ফটো তোলা উচিত। কিন্তু তাহাও এক সাধ্যাতীত ব্যাপার। খালি চোখে তাকে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব।

এই অজ্ঞাত গ্রহ মিথুন রাশিতে আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সূর্য্য হইতে তার দূরত্ব ৩৫০০০০০০০০ মাইল। সেখান হইতে সূর্য্যকে হয়ত একটি উজ্জ্বল তারার মত দেখাইবে। এবং সূর্য্যের আলো পূর্ণচন্দ্রের মত দেখাইলেও সেখানে দিনের আলো কদাচ পৌঁছাইবে। কেননা সমস্ত আকাশখানায় যদি ঠাসাঠাসি করিয়া অনেক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় তাহা হইলেও মধ্যাহ্নের সূর্য্যের আলোর কাছে তাহাদের আলো হীনপ্রভ। সেই নূতন গ্রহে আলো ম্লান ও ফ্যাকাসে হইবে, এবং উত্তাপ উৎপাদনের জন্য কিছু গুপ্ত কারণ না থাকিলে সেখানে উত্তাপের মাত্রা হইবে শূন্য। এই গ্রহ হইতে কেবল নেপচুন ছাড়া অন্য গ্রহ দেখা যাইবে না, নেপচুন দেখা—তাও কালেভদ্রে। এই অপরিচিতকে পরিচয়ের সীমায় আনিবার জন্য পশ্চিমের মনীষীরা উদ্‌গ্রীব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—নেপচুনকে আবিষ্কার করিবার সময় জ্যোতিষীরা এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

প্যারী।

—

সুদীর্ঘ নিদ্রা—

নিউইয়র্কে মিসেস ডোরা মান্‌চ্ নামে এক রমণী Encephalitis Lethargica নামক রোগে আক্রান্ত হন। ১০২ দিন ও রাত্রি ধরিয়া সমানে ঘুমাইয়া ২০শে জানুয়ারীতে তিনি জাগ্রত হন। নিদ্রিতাবস্থায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া পুনরায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহাকে আর কিছুতেই জাগ্রত করা যাইত না। যখন সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যর্থ হইল, তখন সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করা হইল। উক্ত রমণীটি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন। ইফ্‌ম্যানে নামে একজন সুনিপুণ বেহালা-বাদক যুবককে পীড়িতা রমণীর শয্যাপার্শ্বে বেহালা বাজাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। কয়েকটা গান বাজাইলে নিদ্রিতা রমণী চক্ষু উন্মীলন করিলেন, মাথা নাড়িলেন, কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন যে রমণীটির পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই, গায়ে বল পাইলেই হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যাগারে যত ব্যক্তি উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে তাহার মধ্যে এই প্রথম একজন রমণী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

—

রাতকাণা—

আমেরিকায় দুইজন যমজ যুবক পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তাহারা দুই ভাই শিশু ও জন্তু ভালবাসে; দুই জনেই ছারপোকা, মাকড়সা ও সর্পকে ঘৃণা করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা দুই জনেই রাতকাণা। রাস্তাঘাট তাহাদের নিকট যদিও সুপরিচিত, তথাপি রাতকাণা বলিয়া রাত্রিতে বাহির হইতে পারে না। (American Journal of Heredity, Dec. 1919.) ডাঃ বেট্‌সন সম্প্রতি একটি বংশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে সেই বংশে আট পুরুষ ধরিয়া রাতকাণা ব্যাধি চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যাধি হইতে কোন পুরুষ অব্যাহতি পায় নাই।

—

দুগ্ধবতী ছাগল—

সুইজারল্যাণ্ডে একটি স্যানেন জাতীয় ছাগল আছে, সে প্রত্যহ ৴৭ সাতসের করিয়া দুধ দেয়। (Goat World)

—

জ্বালানী কাঠ—

লণ্ডনে সম্প্রতি মহাসমরের জন্য কয়লা অতি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে অনেকে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতেছেন। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কাঠের কারখানায় ছোট ছোট কাঠ সমেত এক-একটা ঝুড়ি বিক্রয় হইতেছে। ঐ জ্বালানি কাঠ কিনিবার জন্য কারখানা খুলিবার সময় এত ক্রেতার সমাগম হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

—

বৃহৎ এঞ্জিন—

আমেরিকায় একটি সুবৃহৎ এঞ্জিন ভার্জিয়ানা রেলওয়ের জন্য তৈয়ার হইয়াছে। ইহার ১৬ টা চাকা আছে এবং ইহার ওজন ৩৬০ টন। বোধ হয় পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আর বড় এঞ্জিন নাই।

শ্রীসুষমা সিংহ।

—

চাঁদ-মারি হাউই—

মানুষ নিজে তার শরীরটাকে লইয়া উঁচুর দিকে ছয় মাইল উঠিয়া হাঁপাইয়া গিয়াছে; তার তৈরি বেলুনকে সে যতটা হাল্কা করিতে পারিয়াছে তাতে তা ঠেলিয়া ঠুলিয়া ২৪ মাইল উঠিয়া আর উঠিতে পারে নাই। বিলাতের ক্লার্ক কলেজের অধ্যাপক রবার্ট এইচ

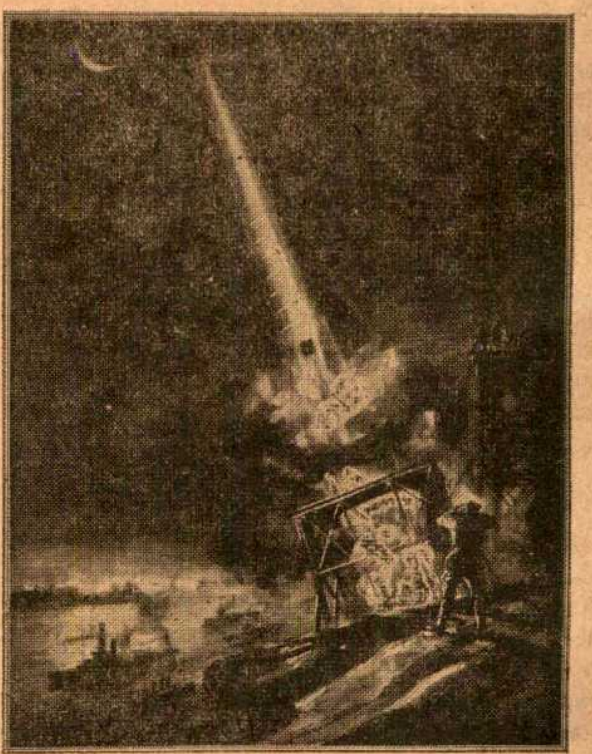

চাঁদ-মারি হাউই।

গডার্ড নামক একজন বিজ্ঞানবিৎ এমন এক আশ্চর্য্য হাউই তৈরি করিয়াছেন যাহা মিনিটে ৩৫ মাইলেরও বেশী ছুটিয়া ৬॥ মিনিটে ২৩০ মাইল খাড়া উপরে উঠিতে পারিবে। উপরের দিকে বাতাসের ঘেরটা ক্রমশ হাল্‌কা হইতে হইতে ২০০ মাইলের পরেই মিলাইয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অধ্যাপক গডার্ডের এই হাউই সে আবরণটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া মানবীয় দ্রব্যরাজির মধ্যে সর্বপ্রথম সীমাহীন ঈথর বা ব্যোমবস্তুর অজানা মুলুকে হানা দিয়া আসিতে পারিবে। কেবল একবারের ধাক্কায় মানুষের তৈরি কোনো হাউই এতদূর উঠিতে পারে না। আলোচ্য হাউইটি পর পর কয়েক বার ফুটিয়া ধাক্কার পর ধাক্কায় উপরে উঠিতে থাকিবে, পাখী যেমন করিয়া পাখার ঝাপটের পর ঝাপটে বাতাস ঠেলিয়া উঠিতে থাকে।

হাউইটিতে পর পর কতকগুলি বিস্ফোরকের স্তরবিন্যাস সাজানো আছে; একবারের ধাক্কায় যে গতিবেগ সঞ্চিত হইবে সেটা দমিয়া আসিতে না আসিতে নূতন বারুদের স্তরে আগুন ধরিয়া হাউইয়ে নূতন করিয়া ধাক্কা লাগিবে।

হাউইটির সঙ্গে আবহাওয়ার নিরীখ লইবার যে-সমস্ত যন্ত্র-পাতি জোড়া থাকিবে তাদের মোটামুটি একটা বাঁধা ওজন যদি আধসের ধরিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বিস্ফোরক, খোল ইত্যাদি সুদ্ধ

১৮ সের ওজনের হাউই ৩৫ মাইল,
২·৫৫ „ „ „ ৭০ মাইল,
৩·৪ „ „ „ ১১৫ মাইল,
৪·৯ „ „ „ ২৩০ মাইল,

উপরের দিকে চুঁ মারিতে যাইতে পারিবে। ঠিক এই অনুপাতের হার ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৫ মণ ৩৭ সের ওজনের একটি হাউই ছুটিতে ছুটিতে একেবারে মাধ্যাকর্ষণের এলাকার বাহিরে গিয়া পড়িবে। সে অবস্থায় আবার কোনো জ্যোতিষ্কের মাধ্যাকর্ষণের টানে ধরা না পড়া পর্য্যন্ত তার চলার আর বিরাম থাকিবে না। যদি ৭ মণ ২১ সের ওজনের একটি হাউইকে চাঁদের দিকে নিশানা করিয়া দাগা যায় তবে নিশ্চয় তাহা ২৪০,০০০ মাইল ছুটিয়া চাঁদের [illegible] গিয়া লাগে। খুব শক্তিমান্ দূরবীক্ষণেরও অবশ্য সাধ্য হইবে না লক্ষ্যভেদ সত্য সত্য হইল কি না দেখিয়া তাহা বলিতে পারা। কিন্তু যদি হাউইয়ের সঙ্গে খুব খানিকটা Flash powder (খুব উজ্জ্বল হঠাৎ আলো দেওয়া এক রকম দাহ্য গুঁড়া) পুঁজি জুড়িয়া দেওয়া যায়, আর শুক্লা প্রতিপদ বা শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদকে [illegible]ক্ষ্য করিয়া হাউইটি [illegible] দাগে, তবে এমন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে যে চাঁদের অন্ধকার শরীরটাতে ঠেকিবামাত্রই তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া পৃথিবী-বাসীর চোখে পড়ে। ½ গ্রেন জ্বলন-গুঁড়ার শিখা সওয়া-দুই মাইল দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে ৭ সের ওজনের জ্বলন-গুঁড়াই চাঁদ হইতে তার শিখা দেখা যাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ধরা যাক্, জ্বলনগুঁড়া এবং অন্যান্য যন্ত্রপতির মোটামুটি ওজন এর চার গুণ, তাহা হইলে বিস্ফোরক দরকার হয় মোট ৪৭৬ মণ। অবশ্য আমাদের ধরিত্রীর বিশ্বস্ত এই মশালটী অনুচরটির প্রতি আমাদের তরফ হইতে হঠাৎ অকারণে কোনো রকমের উৎপাত সুরু হওয়ার সম্ভাবনা নাই, অন্ততঃ অধ্যাপক গডার্ডের এমনতর দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। সময় এবং অর্থের নিতান্ত বাজে-খরচ করিবার প্রবৃত্তি হঠাৎ যে আর কারও হইবে তেমনও মনে হয় না, সুতরাং চন্দ্রদেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এই ঘোর কলির দিনে সত্য ত্রেতার দেবতা বেচারাদের নিজেদের মান লইয়া কি সন্ত্রস্ত হইয়াই যে থাকিতে হয়!

ম, চ,

চাঁদমারি হাউই
হাউইটিতে পরপর কতকগুলি বিস্ফোরকের স্তর সাজানো থাকে। তার একটাতে আগুন ধরিয়া তার ধাক্কার বেগ দমিয়া আসিবার আগেই নূতন একটি ধাক্কার বেগ সঞ্চিত হয়।

পুতুল নাচ—

এখন কমিয়া গেলেও আগে আমাদের দেশে পুতুল-নাচের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কোথাও বারোয়ারীর পূজা হইলে বা অন্য কিছু সমারোহ ব্যাপার হইলে পুতুল-নাচের আয়োজন হইত। দু পাঁচ বছর অগেও আমরা কলিকাতার কাছাকাছি অনেক জায়গায় পুতুল নাচ দেখিয়াছি এবং এখনও দেখা যায়। এখন কথা হইতেছে এই—এই পুতুল-নাচের প্রচলন

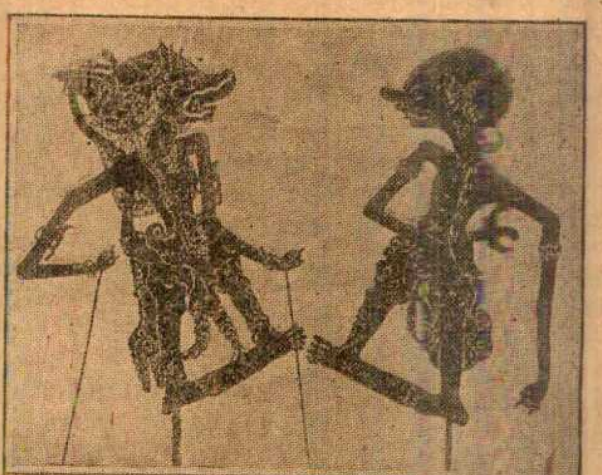

যবদ্বীপ ও শ্যামদেশের প্রাচীনকালের পুতুল-নাচের পুতুল।

হইল প্রথমে কোন্ দেশে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে পুতুল-নাচ হইত কি না বলা শক্ত। কোন্ দেশে প্রথম ইহার উদ্ভব হয় তাহা স্থির করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন আলোচনা চলিতেছে। পুতুলের নাচ দেখিতে বেশ, কিন্তু ইহা এক হাঙ্গামের [illegible]পার। কাঠের পুতুলগুলা ঠক্ ঠক্ করিয়া হাত নাড়িয়া ও মাথা

নাড়িয়া অভিনয় দেখাইয়া যাইবে—সে দেখিতে বড় চমৎকার। শ্যামের রাজা সম্প্রতি আমেরিকার সম্মিলিত রাজ্যের এক যাদুঘরে কতকগুলি অদ্ভুত পুতুলের ছবি ও মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। এগুলি যবদ্বীপে প্রাচীনকালে নাচাইতে ব্যবহৃত হইত। সেখানকার ইতিহাস লেখা হইবার পূর্ব্বেও ইহার প্রচলন ছিল। আমাদের দেশের মত এক জায়গায় একটা কালো পর্দ্দা টাঙাইয়া তার সাম্‌নে পুতুল নাচানো হইত। হরিণের কাঁচা চাম্‌ড়া দিয়া এইসব পুতুল তৈরী করা হইত। এবং ইহাদের উপর যে কারুকার্য্য থাকিত তাতে নৈপুণ্যের পরিচয় যথেষ্ট ছিল। কোনো কোনো ভালো পুতুলের হাতে আবার দড়ি বাঁধা থাকিত। এই দড়ির সাহায্যে তার হাত ওঠানো ও নামানো হইত। এই পুতুলনাচ যেন মানবের মূক অভিনয় বা প্যাণ্টোমাইম এবং বায়োস্কোপ-সিনেমার আদি।

প্যারী।

—

দরজা-শূন্য দরজা—

দরজা-জান্‌লায় কপাট লাগাইতে হয় বাহির হইতে বৃষ্টির ছাট, গরম বা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা, মশা মাছি পোকা ফড়িং এবং চোর-ডাকাত হইতে ঘরকে রক্ষা করিবার জন্য। পানামা অঞ্চলে দরজা-জান্‌লায় জাল টাঙাইয়া মশা-মাছির উপদ্রব হইতে বাড়ীগুলিকে মুক্ত করাতে সে দেশের লোকের ম্যালেরিয়া, হল্‌দে-জ্বর প্রভৃতি রোগ নিবারণ হইয়াছে। কিন্তু দিনরাত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাকা কষ্টকর, আলোর অভাব হয়। শার্শি লাগাইলে আলো পাওয়া যায়, কিন্তু বাতাস বন্ধ হয়। জাল টাঙ্গাইলে আলো বাতাস ধূলো অল্প নিবারণ হয়, অল্প আসে। সকল তাতেই কিছু-না-কিছু অসুবিধা আছে। আমেরিকার বষ্টন সহরের এক যন্ত্রী—মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার—এক কল করিয়া দরজায় জান্‌লায় বাতাসের পর্দ্দা খাটাইবার ফন্দি বাহির করিয়াছেন। দরজার গোড়ায় চৌকাঠের কাছে এক গর্ত্তে একটা ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্ বা মোটর-ফ্যান্ বসাইতে হইবে; সেই পাখা ঘুরিলে উপরকার বাতাস পাখার ঘূর্ণীর টানে নীচে বহিয়া আসিবে; ফ্যান্ বা পাখার পাশ দিয়া একটা চোঙ্ বা নল যদি ঘুরাইয়া দরজার উপরে ঝন্‌কাঠ বা সর্‌দলের কাছে ফাঁদালো করিয়া দেওয়া যায়, তবে বাতাস সেই নল দিয়া বহিয়া ঘুরিয়া গিয়া ফাঁদল মুখ দিয়া বহিয়া নীচে নামিতে থাকিবে; এইরূপে সদা চক্রাকারে বহমান বাতাস দরজার মুখের গোড়ায় এমন একটি অদৃশ্য অননুভব্য অস্পৃশ্য পর্দ্দা রচনা করিবে যা ঠেলিয়া বাহিরের গরম বা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা, বৃষ্টির ছাট, মশা মাছি পোকা ফড়িং কিছুই ঘরের মধ্যে যাইতে পারিবে না। এই পর্দ্দার সাহায্যে জান্‌লা দরজা বারো মাস ত্রিশ দিন খোলা রাখিয়া নিরাপদে নিরুপদ্রবে ঘর করা চলিবে—অবশ্য চোর-ডাকাতের শুভাগমন ছাড়া।

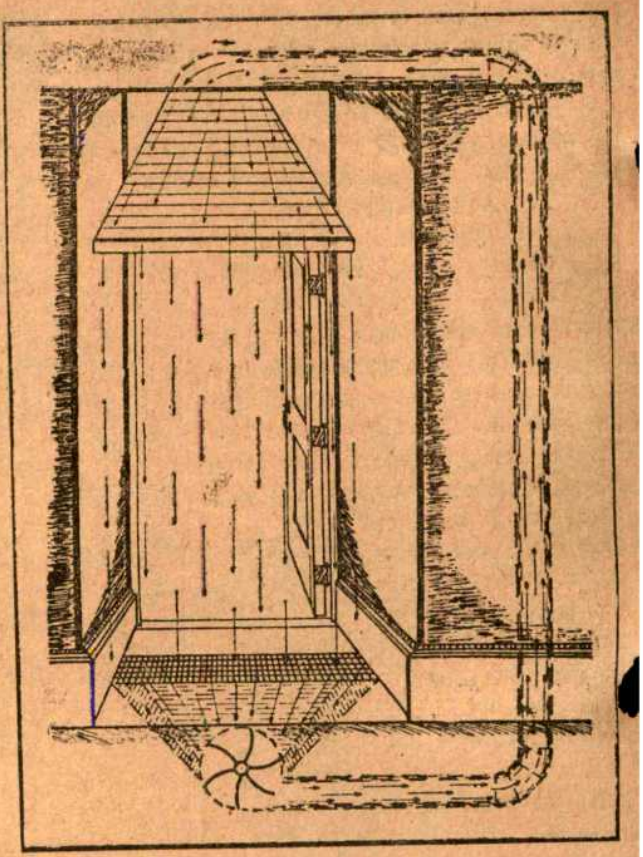

দরজাহীন দরজা।

চৌকাঠের নীচের ঘূর্ণিপাখার টানে বাতাস পাশের নল দিয়া ঘুরিয়া দরজার উপর দিয়া তীরের মতো নামিয়া আসিতেছে। এই বাতাসের স্রোতের পরদা ঠেলিয়া জলবৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া বা পোকামাকড়ের ঘরের মধ্যে ঢুকিবার সাধ্য নাই।

কয়ালী।

—

পুরুষের স্ত্রীভূমিকা অভিনয়—

আমাদের দেশের যাত্রাগানে ও প্রাথমিক থিয়েটারে পুরুষেরাই অভিনয় করে ও করিত। কিন্তু পুরুষের পরুষভঙ্গী স্ত্রীচরিত্রের কমনীয়তার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া পুরুষের স্ত্রীভূমিকা অভিনয় দেখিলে দর্শকের বিরাগ উপস্থিত হয়। কিন্তু সকল দেশেই এমন এক-একজন দক্ষ অভিনেতা দেখা যায় যারা স্ত্রীভূমিকা লইয়া তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া অতি নিপুণতার সঙ্গে অভিনয় করিতে পারে। এমনি একজন দক্ষ অভিনেতা চীনদেশে সম্প্রতি খুব নাম করিয়াছেন। তাঁর নাম মে ল্যাঙ ফ্যাঙ্।

আমাদের দেশে অল্প লোকেই চীন অভিনেতা মে ল্যাঙ্ ফ্যাঙের নাম শুনিয়াছেন। চীনের বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে তিনি এক দর্শনের জিনিষ! তাঁকে অভিনয়ে নামিতে দেখা চীনাদের লোভের বিষয়। তাঁর মত সুন্দরী, কমনীয়া, মধুরভাষিণী অভিনেত্রী চীন দেশে আর নাই। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে কিন্তু তিনি নীরস পুরুষ। তিনি নাম কিনিয়াছেন নারীর চলন, বলন, দৃষ্টি, ভঙ্গির অদ্ভুত অনুকরণে অভিনয় দেখাইয়া। আজ চীনাদের মুখে তাঁর গুণের কথা আর ধরে না। তাঁর সমকক্ষ হইতে পারে এমন অভিনেতা চীনদেশে এখন আর নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় দশ বছর আগে এমন বিখ্যাত অভিনেতার নাম অল্প লোকেই জানিত। তখন কিন্তু তিনি অনেক বড় বড় অভিন

ডানদিকে বই হাতে চীনদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

ইনি চীনদেশের আরেকজন অভিনেতা নারীর ভূমিকা অভিনয় করেন।

নামিয়াছিলেন। তাতেও যখন বিশেষ ফল লাভ হইল না, তখন তিনি নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু নিরুদ্যম হন নাই। পিকিং সহরে দুইজন বিখ্যাত অভিনেতা ও গায়কের কাছে তিনি শিক্ষা লইতে লাগিলেন। অভিনয়ে অনুরাগ তাঁর এমনি প্রবল। আবার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও দেখাইতে লাগিলেন। উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের গুণে তাঁর খ্যাতি কয়েক বৎসরের মধ্যে সকলকে ছাপাইয়া উঠিল। তাঁর গুরুরাও শিষ্যের কাছে হার মানিলেন। চীন দেশে এক প্রবাদ আছে—নীল থেকে যে সবুজ বেরোয়, তা নীলের চেয়ে ভালো। ল্যাঙ ফঙও তেমনি গুরুদের পরাস্ত করিলেন। কিন্তু কেবল গুরুদের গুণেই ল্যাঙ্ ফঙ্ এত বড় হন নাই। ভগবান তাঁকে অভিনেতার যোগ্য অনেক স্বাভাবিক গুণ দিয়াছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সঙ্গীতশক্তি, কমনীয় মুখভাব, স্ত্রীলোকদিগের হাবভাব অনুকরণ করিবার অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণে শীঘ্রই তাঁর নাম ছড়াইয়া পড়িল।

কি বিশেষত্বে ল্যাঙ ফঙ এত বড় হইলেন তাহা সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। এক কথায় তাঁর বিশেষত্ব বুঝাইতে গেলে এই বলিতে হয় তিনি স্বভাবের হুবহু ও যথাযথ অনুকরণে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন যার অভিনয় করেন তার মধ্যে আপনার সমস্ত অনুভূতি ও প্রাণ ঢালিয়া দেন। এমন কি এতটুকু চলার ভঙ্গী, এতটুকু হাত নাড়া, এতটুকু ঠোঁটের গতি, এতটুকু চোখের ঔদাসীন্য প্রভৃতি খুটিনাটি ব্যাপারে তিনি যার অভিনয় করেন তার বিশেষত্ব ফুটাইয়া দেন। স্বভাবের পথ হইতে তাঁর চলন-বলনের মুহূর্ত্তের জন্যও নড়চড় হয় না। স্বভাবের পুরা অনুবর্ত্তন করিতে অভিনয়ে বারো আনা লোকই অক্ষম।

অভিনয়ের গানে কথায় চলনে ভঙ্গীতে ল্যাঙ ফঙের এই স্বাভাবিক লীলাই তাঁকে এত বিখ্যাত করিয়াছে। প্রায় কুড়িখানি নাটকে ল্যাঙ ফঙ নারীর অভিনয় দেখান। তাদের মধ্যে কয়েকখানি বই তাঁর খুব প্রিয়।

প্রথম—ফুলের কবর নামে একটি নাটক। এটি একটি প্রকাণ্ড উপন্যাসের একটি অধ্যায় মাত্র। উপন্যাসখানি চল্লিশ ভাগে বিভক্ত এবং ইহাতে কুড়ি-একুশটি অধ্যায়। উপন্যাসটির নাম "লাল ঘরের স্বপ্ন",—প্রায় দুশো বৎসর পূর্ব্বে লেখা। আমাদের দেশে কত ভাল ভাল সংস্কৃত গ্রন্থের কর্ত্তাদের যেমন নাম পাওয়া যায় না, তেমনি এ বইটির গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত থাকিলেও তাঁর সৃষ্ট আনন্দে চীনবাসী এখনও উৎফুল্ল। এ বইখানি চীন দেশের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যে অধ্যায়ের অভিনয় করা হয় সেটি বড় করুণ। পাওয়ু নামে এক যুবকের সহিত একটি বালিকার প্রণয় হয়। তাদের প্রণয় ব্যাপার দুঃখে ও নিরাশায় পূর্ণ এক সুদীর্ঘ কাহিনী। নায়িকা তাইয়ু এই বালিকার দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইয়া পড়ে। এক দিকে সখীর এই মর্ম্মব্যথা, অপর দিকে আবার তখন বেনার শরতের বিদায়ের কাল। বর্ষার দানে পূর্ণাঙ্গী ধরার বুকে শরতের রাগ-লোহিত চুম্বন তখন মিলাইয়া আসিতেছে, সম্মুখে হিমানীর ধূসর চম্পু বিস্ফারিত! মানুষের ও প্রকৃতির এই দুঃখের দিনে ব্যথিত তাইয়ু শরতের ফেলিয়া-যাওয়া ফুল কুড়াইয়া লইয়া তাদের সমাধি দিতে আসিয়াছে। শরতের আদরে-কোটা ফুল শরতের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাক্, তাদের জন্য ধরায় কাঁদিবে কে? তাইয়ুর গান কী করুণ!—

ফোটা সে ফুল লুটিয়ে পড়ে
পালায় ভরে' শূন্য,
তাদের পলায়নের দুখে
আকাশ রহে পূর্ণ;
দীপ্তি তাদের লুকায় কোথা,
গন্ধ মরে' যায়,
তাদের তরে অশ্রু ফেলে'
বল্‌বে কে রে—হায়!

এ ছাড়া আর একটি তাঁর প্রিয় বই আছে। সেটির নাম "স্বেচ্ছা-সেবক।" এটিরও আখ্যানবস্তু খুব সুন্দর। প্রায় দুহাজার বছর আগে চীনে হ্যান বংশে মুল্যাঙ নামে এক কন্যা ছিল। সেই মেয়েটিই বইটির নায়িকা। তখন চীনে তাতারদের আক্রমণ প্রবল। মুল্যাঙ বংশের মধ্যে ছিল একমাত্র মেয়ে, তার ভাই ছিল না। তাতারদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা যায় কি করিয়া—এই হইল তার প্রধান চিন্তা। হ্যান গভর্ণমেণ্ট এক সৈন্যদল গঠন করিলেন। মুল্যাঙ পুরুষের বেশ ধরিয়া সেই সেনাদলে দেশের কাজ করিবার জন্য ভর্ত্তি হইল। কেহই তাকে চিনিল না। রণনৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার গুণে শীঘ্র শীঘ্র তার পদোন্নতি হইতে লাগিল। এইরূপে বারো বৎসর অসীম ধৈর্য্যের সহিত রণকার্য্য করিয়া সে দেশের জন্য বিজয়-লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া আনিল। তখন সে সেনাদলে জেনারেলের পদ লাভ করিয়াছে। এইরূপে দেশের সেবা করিয়া মুল্যাঙ কোন পুরস্কার লইল না, একেবারে কাজ হইতে অবসর লইল। এইবার মুল্যাঙ আত্মপ্রকাশ করিল। চীনারা দেখিল তাদের দেশের জন্য তাদেরই ঘরের মেয়ে কি আদর্শই না রাখিয়াছে।

এই-রকম আরো কয়েকখানি সুন্দর নাটকে ল্যাঙ ফঙ অভিনয় করেন। কেবল চলন বলন বক্তৃতা-ভঙ্গিমার গুণেই ল্যাঙ ফঙ বড় অভিনেতা হইয়া উঠেন নাই। আমাদের দেশের বড় অভিনেতাদের চরিত্র ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। তাঁদের ধারণা—বড় অভিনেতা হইতে হইলে কেবল গলাবাজিই চাই, আর কিছুর দরকার নাই। বড় অভিনেতা হইতে হইলে যে তার কি আদর্শের দরকার চীনের ল্যাঙ ফঙ আজ তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। আমাদের দেশের বড় অভিনেতারা ভালো নাটকের নায়কের অভিনয়ও করেন, আবার দুর্নীতি-ভরা নাটকের অভিনয় করিতেও কুণ্ঠিত নন। চীনের অভিনেতারা কিন্তু এ বিষয়ে বড় সতর্ক। তাঁরা ভালো নাটক ভিন্ন দুর্নীতিপূর্ণ নাটকের অভিনয়ে নামিতেই চান না। তাঁরা মনে করেন—খারাপ নাটকের অভিনয় করিলে চরিত্র অবনত হয় ও নৈতিক আদর্শকে লোকচক্ষে ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাই তাঁরা দুর্নীতি-মূলক অভিনয়ে নামিতে চান না। এই সুন্দর মহৎ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাঁরা উদ্যোগী মে ল্যাঙ ফঙ তাঁদের অগ্রণী। আমাদের দেশের মত চীনে অভিনয়ে দুর্নীতির অভাব ছিল না। কিন্তু মে ল্যাঙ ফঙ আজ তাঁর দেশের রঙ্গমঞ্চকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতেছেন। অভিনেতারা ও অভিনেত্রীরা যে বাহিরের সাধারণ লোকদের মত শিক্ষায় ও চরিত্রে উন্নত ও বলীয়ান থাকিতে পারে—ইহাই আজ তিনি জগতের সমক্ষে দেখাইতে চান। তাঁর আদর্শকে তিনি দিন দিন কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। তাঁর নেতৃত্বে চীন রঙ্গমঞ্চ আজ উন্নত। তাঁর অনুকরণে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চ উন্নত হইতে পারিবে না কি?

শ্রীরঙ্গলাল গুপ্ত।

বিয়ের ফুল

(৬)

আনন্দ-বাবুর নাৎনী রেণু আর অণু ঝগ্‌ড়া করিয়াছে; অণু দিদির সঙ্গে লড়াইএ না পারিয়া মেঝেয় পড়িয়া হাত-পা আছ্‌ড়াইয়া ভয়ানক চীৎকার জুড়িয়াছে; আনন্দ-বাবুর স্ত্রী মোহিনী হিমসিম খাইয়া যাইতেছেন, কিছুতেই অণুকে মাটি হইতে তুলিতেও পারিতেছেন না, তাকে চুপ করাইতেও পারিতেছেন না। রেণু বোনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে লজনচুষ চুষিতে বসিয়া গেছে, বোন যে হাত পা আছ্‌ড়াইয়া চীৎকার করিতেছে তার দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই—যেন সেই ঘরের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউ নাই।

সেবা স্কুল হইতে আসিয়া তার ফুলবাগানে জল দিতে-ছিল। সে অণুর ক্রমাগত চীৎকার শুনিয়া ঝারি নামাইয়া মোহিনীর ঘরে গিয়া ঢুকিল। তাকে দেখিয়া মোহিনী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—মেয়ের রাগ আর কিছুতেই থাম্‌ছে না।

সেবা হাসিয়া রেণুর কাছে গিয়া বলিল—রেণু লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি যদি আমার সঙ্গে আস রেণু, ত তোমায় একটা মস্ত বড় লাল টক্‌টকে গোলাপফুল দেবো, একটা বাঘের গল্প বল্‌ব; দিদি ত গোলাপও পাবে না, বাঘের গল্পও তাকে শুন্‌তে দেওয়া হবে না।

সেবার বাগানের মোহন সুন্দর ফুলের উপর অণু ও রেণুর বিষম লোভ ছিল; কিন্তু তারা কিছুতেই তার একটি হস্তগত করিতে পারিত না। সেই লোভন সামগ্রী লাভের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া ও দিদির চেয়ে নিজের জিৎ হইবে ভাবিয়া অণুর অঙ্গবিক্ষেপ বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অতবড় প্রবল আন্দোলনের পর একেবারে হঠাৎ চুপ করাটা অশোভন হইবে বলিয়া রেণুর চীৎকার একটানা সরু সুরে নামিয়া আসিল। সেবা ঝুঁকিয়া বলিল—চুপ করো অণু, চুপ না কর্‌লে দিদিও একটা গোলাপ পেয়ে যাবে।

রেণু এতক্ষণ অভিমানে সেবার দিকে না তাকাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বসিয়া ছিল, মুখের ভিতর লজনচুষটা গলিয়া মিষ্টরসে তার মুখ ভরিয়া তুলিলেও সে গিলিতেছিল না,

এমনি তার উপেক্ষা। কিন্তু এখন অণু চুপ না করিলে সেও যে একটা গোলাপ পাইবে এই সম্ভাবনায় উৎসুক ও উৎফুল্ল হইয়া সে সেবার দিকে ফিরিয়া উৎসাহের সহিত লজঞ্চুষ চুষিতে লাগিল। আর অণু, দিদিও একটা গোলাপ পাইয়া যায় দেখিয়া, কান্নার টানা সুরটাও হঠাৎ থামাইয়া ফেলিল এবং কান্না রোধ করিবার চেষ্টায় থাকিয়া থাকিয়া হেঁচকি তোলার মতন ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠাতে তার সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ হইতে লাগিল। সেবা অণুকে কোলে তুলিয়া হাসিয়া বলিল—অণু লক্ষ্মী মেয়ে। একটা গোলাপ আর একটা গল্প সে আজ পাবেই পাবে; আর অণু যদি বলে তবেই রেণুও পাবে।

রেণু কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তখনি তার মনে হইল অণুকে খুসী করিতে পারিলে তারও পাইবার সম্ভাবনা আছে; তখন সে তার মুঠো খুলিয়া কাগজের মোড়ক সুদ্ধ লজঞ্চুষগুলা অণুর সাম্নে ধরিয়া বলিল—এই নে অণু, সব লজঞ্চুষ। আমায় গল্প শুনতে দিবি?—গোলাপফুল দিতে দিবি?

যে লজঞ্চুষ লইয়া এতকাণ্ড হইতেছিল তার বেশীর ভাগ হস্তগত ত হইলই, অধিকন্তু যা কস্মিনকালে পাওয়া যায় না অথচ পাইতে লোভ হয় সেই গোলাপফুলও পাইবার সম্ভাবনা হইয়া গেল ও ফাঁকতালে একটা গল্পও শুনিতে পাওয়া যাইবে, এতে খুসী হইয়া অণু সেবাকে বলিল—বিবি-দিদি, দিদিকেও একটা ফুল দিয়ো.....

মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—বিবি ভাই, তোর বশীকরণের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। নাতজামাই যদি দজ্জাল হয়, তা হলেও তোর ভয় নেই।

সেবা হাসিয়া বলিল—যারা পাকা সওয়ার তারা দুষ্টু ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করে। আমারও মনে হয় অশান্তকে বশ করার একটা আনন্দ আছে।

এমন সময় আনন্দ-বাবু ঘরে আসিয়া ম্লান মুখে হাসিয়া বলিলেন—এইবার তোমার বশ করার শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে বিবি।

সেবা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—ও-মা! দাদামশায় যে! কখন এলেন?

আনন্দ-বাবু হাতের ব্যাগ নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এই আসছি ভাই।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরকের খবর কি?

আনন্দ-বাবু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—শোনো, বলছি।

সেবা রেণুর হাত ধরিয়া অণুকে কোলে করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল। আনন্দ-বাবু ডাকিয়া বলিলেন—বিবি, তুমিও থাকো, তোমার সঙ্গেও পরামর্শ আছে

সেবা আশ্চর্য্য হইয়া একবার আনন্দ-বাবুর দিকে তাকাইল এবং তার পরে অণুকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল—তোমরা এখন খেলা করোগে। আমি একটু পরে তোমাদের ফুল পেড়ে দেবো।

অণু ও রেণু খুসী মনে খেলা করিতে চলিয়া গেল। সেবা আসিয়া আনন্দ-বাবুর চেয়ারের পাশে পায়ের কাছে মাটিতে বসিল।

আনন্দ-বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—হীরক পরের জন্যে নিজের প্রাণ দিতে বসেছে

এই কথা শুনিয়াই মোহিনী ও সেবা উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আনন্দ-বাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—হীরকের জমিদারীর একটা গ্রাম বন্যায় ভেসে যাবার জোগাড় হয়েছিল। সে যেদিন এখান থেকে বাড়ী ফিরে গেল, সেইদিন ঐ খবর পেয়ে সমস্ত রাত জেগে কিসে প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষা পাবে তারই উপায় খুঁজেছিল; পরদিন সকালবেলাই সে নিজে সেই গ্রামে গেল; সঙ্গে গেলেন বৌমা। তা রূপর এই সাইক্লোন... ..

মোহিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—নৌকোডুবি হয়ে-টয়েছিল নাকি?

আনন্দ-বাবু বলিলেন—হীরক যে-রকম সাঁতার জানে, নৌকোডুবি হলেও হয়ত বাঁচত, বৌমাকেও বাঁচাতে পারত.....

মোহিনী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—তবে কি তারা দুজনেই বেঁচে নেই?

সেবার মুখ ব্যথিত ঔৎসুক্যে ব্যগ্র হইয়া তার দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটাইয়া তুলিল।

আনন্দ-বাবু কাতর স্বরে বলিলেন—বৌমা মারা গেছেন; হীরকের অবস্থাও খুব খারাপ, আঘাতে পঙ্গু হয়ে পোড়ে আছে।

মোহিনী চোখের বিগলিত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে

আনন্দ-বাবুও চোখ মুছিয়া বলিলেন—সাইক্লোনে বাড়ী চাপা পোড়ে। এই ঝড়ে নবগ্রামের সর্ব্বনাশ কোরে গেছে। হীরকের নিজের দেহে ত আঘাত লেগেছেই, তার বেশী চোট লেগেছে তার মনে—স্ত্রীর এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুতে। ছেলের এই দশা আর বৌমার মরা শুনে মাও শয্যা নিয়েছেন, তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বেন না, একমাসও আর বাঁচ্‌বেন কি না সন্দেহ। মা মারা গেলে হীরককেও আর বাঁচানো যাবে না। হীরক যে মা আর স্ত্রী দুজনকেই গভীর ভাবে ভালোবাস্‌ত—দুটো শোক সে কিছুতেই সাম্‌লাতে পার্‌বে না।

শাশুড়ী বৌ, মা ছেলে, স্বামী স্ত্রী এই তিন জনের মধ্যে পরস্পরের স্নেহ-ভালোবাসার মধুর সম্পর্কের পরিচয় পাইয়া সেবার মন মুগ্ধ হইয়া উঠিল, সে এই অচেনা পরিবারের দুঃখের সমবেদনায় ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

আনন্দ-বাবু চোখ মুছিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—মার এখন ভাবনা হয়েছে, তিনি মারা গেলে কে হীরককে দেখ্‌বে, যত্ন কর্‌বে। এই চিন্তাতেই তাঁর মৃত্যু আরো ঘনিয়ে আস্‌ছে।

সেবা চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল—ওঁদের কি আপনার লোক কেউ নেই? ওঁরা ত বড়লোক, নার্স্ রেখে দিলেও ত যত্ন হতে পারে।

আনন্দ-বাবু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—বড়লোকের আপনার লোকের অভাব হয় না; কিন্তু যেখানে প্রাণের টান নেই, কেবল টাকার টান, সেখানে কি যত্ন সেবা ঠিক হবে আশা করা যায়?

মোহিনী বলিলেন—তাতে আবার গিন্নি নিজে পোড়ে, তিনি যদি মারাই যান! বাড়ীর যে মালিক, সেই রোগী। যারা যত্ন কর্‌বে তাদের চালাবে কে?

সেবা ব্যথার উত্তেজনায় একটু জোরেই বলিয়া ফেলিল—চালাবে তাদের নিজেদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধি, আবার কে?

আনন্দ-বাবু বলিলেন—কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মভীরু লোক কি সংসারে চাইলেই পাওয়া যায় ভাই?

সেবা বলিয়া ফেলিল—আমি যদি হতাম ত জান্‌তে দিতাম না যে আমি রোগীর আত্মীয় নই।

আনন্দ-বাবু ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—তবে তুই চ না ভাই। এখানে মেয়ে পড়িয়ে, নার্স হয়ে, কী বা হবে তোমার? তুমি যদি এই কাজ স্বীকার করো তবে সমস্ত নবগ্রামের জমিদারীটাই তোমার হবে—তুমিই হবে সে বাড়ীর কর্ত্রী! তোমার সঙ্গে এই পরামর্শ কর্‌তেই ত আমি এসেছি।

সেবা অকস্মাৎ এই অভাবনীয় লাভের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—তাঁদের বাড়ীতে ফুলের বাগান আছে?

আনন্দ-বাবু ব্যথিত হাসির রেখাটুকুকে ঠোঁটের কোণে চাপিয়া বলিলেন—বাগানের ভেতরই বাড়ী তাঁদের। অনেক ফুলের বাগান আছে, আর তুমি ইচ্ছে কর্‌লে আরো অনেক ফুলের বাগান তৈরি করাতে পার্‌বে।

সেবা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিল—তাঁদের টাকা আমার সখের জন্যে কেন খরচ কর্‌তে যাব আমি?

আনন্দ-বাবু বলিলেন—তাঁরা তোমার বাসের জন্য বাড়ী দেবেন, বাগান দেবেন, যাবজ্জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় চলে এমন টাকা দেবেন, তুমি বিয়ে থা কোরে সংসারী হবে; কেবল তার বদলে শয্যাগত রোগী যে-কদিন বেঁচে থাক্‌বে তার দুঃখ প্রাণের মমতা দিয়ে লাঘব কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। এই তাঁরা প্রতিদান চান।

সেবা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—নিয়ে চলুন আমাকে দাদামশায়। অসাধ্য না হলে আমি তাঁকে সেবা কোরে সুস্থ কোরে তুল্‌ব।

আনন্দ-বাবু খুসী হইয়া বলিলেন—তবে ভাই তোমার বাক্‌স গুছিয়ে নাওগে, আজকেই রাত্তির আটটার গাড়ীতে যাই চলো। আমি একটা টেলিগ্রাম কোরে দিয়ে আসি।

আনন্দ-বাবু খুসী হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোহিনী সেবাকে বলিলেন—তবে আর দেরী কোরো না ভাই, কি নেবে থোবে দেখে শুনে নাওগে।

সেবা আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সেবাকে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াই রেণু ও অণু দৌড়িয়া আসিয়া সেবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমাদের ফুল দেবে, গল্প বল্‌বে চলো।

সেবা হুইয়া তাদের গালে হাতের তালি দিয়া আদর

করিয়া বলিল—ফুল তোমরা নিজেরা পেড়ে নাওগে ভাই। আর দিদিমার কাছে গল্প শুনো, আমি এখন এক জায়গায় যাচ্ছি।

অণু ও রেণু আশ্চর্য্য অবাক হইয়া গেল—এ কী কাণ্ড! বিবি-দিদির গাছে হাত দিবার হুকুম কারো ছিল না; আজ একেবারে ঢালা হুকুম ফুল তুলিবার! শিশুমনের বিস্ময় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না; তখনি আনন্দে তাদের সমস্ত মন ছাইয়া গেল, তারা নাচিতে নাচিতে ফুলো ফুলো চুলগুলি দুলাইয়া নাচাইয়া ফুল তুলিতে ছুটিয়া গেল।

সেবা নিজের ঘরে গিয়া জিনিস গুছাইয়া লইবে বলিয়া বাক্সর সাম্‌নে দাঁড়াইল। ক্ষণিকের উত্তেজনা সরিয়া যাওয়াতে এখন তার মনে নানান চিন্তা আসিয়া জড়ো হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেবা বাক্সর সাম্‌নে বসিয়া পড়িয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে আনন্দ-বাবু সেবার ঘরে আসিয়া সেবাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাক্স গোছানো হয়ে গেল ভাই? তবে এইবার খেয়ে নাওগে।

সেবা চিন্তাকুল মুখ আনন্দ-বাবুর দিকে ফিরাইয়া বলিল—আমি যাব না দাদামশায়।

আনন্দ-বাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—সেকি! কেন?

সেবা বলিল—তাঁদের বাড়ীর যে-রকম অবস্থা আপনি বল্‌লেন, তাতে আমি গেলে আমারই হাতে সমস্ত কিছুর ভার এসে পড়বে। লোকে ভাববে আমি টাকার লোভে এই কাজ স্বীকার করেছি।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের পরিচর্য্যা করবার মতন পরিচয় ত তাঁদের সঙ্গে তোমার নেই? পরের কাজ তুমি যা করবে তার মূল্য তোমার না নিলে চল্‌বে কেন? তুমি ত নার্সের কাজ করবে বোলেই এতদিন নিজেকে প্রস্তুত করছিলে, এখন সেই কাজই জুট্‌ছে। এ সুযোগ ছাড়া কি তোমার উচিত হবে?

সেবা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আনন্দ-বাবু সেবাকে নির্বাক দেখিয়া বলিলেন—আর আপত্তি কিছু কোরো না ভাই। আমি তাঁদের টেলিগ্রাম কোরে ধরেছি। তাঁদের একজন দরদী সেবিকার নিতান্তই দরকার। তুমি চলো, গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিয়ো যে তোমার মায়ের সেবা, তুমি কেবল বেতন নিয়েই কাজ করো না, তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অমূল্য, টাকা দিয়ে যা পাওয়া যায় না।

আনন্দ-বাবু ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন—উঠে পড়ো ভাই। আর বেশী সময় নেই।

নীচের রান্নাঘর হইতে মোহিনী ডাকিলেন—বিবি, তোমার দাদামশায়কে ডেকে নিয়ে নেমে এস, খাবার দেওয়া হয়েছে।

সেবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনন্দ-বাবুকে বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

আনন্দ-বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেবা তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া ঝুপ-ঝাপ করিয়া জামা কাপড় কতকগুলা টানিয়া ফেলিয়া রেখিয়া লইল কি আছে, না-আছে; তারপর আবার তাড়াতাড়ি সেগুলাকে বাক্সর মধ্যে এলোমেলো অবস্থাতেই ভরিয়া ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৭)

সেবা নবগ্রামে পৌঁছিয়া হীরেনের বাড়ীর হাতায় ঢুকিয়াই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুন্দর ছবির মতন বাড়ীখানিকে কোলে করিয়া আছে এক বিস্তীর্ণ সাজানো বাগান; সেবাদের গাড়ী বাগানের লাল-সুর্কী-ঢালা পথে প্রবেশ করিতেই ফুলের হাসি দিয়া বাগান যেন তাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। এই পুষ্পভূয়িষ্ঠ বাগান এখন হইতে উপভোগ করিবে একা সেই, এই সম্ভাবনায় আনন্দে—তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ী ঢুকিয়াও সেবার খুব ভালো লাগিতে লাগিল। সমস্ত বাড়ীর মেঝে সাদা মার্বেল-পাথর দিয়া ছাওয়া; সেই মেঝে আবার মাজা ঘসা, আয়নার মতন ঝক্‌ঝকে। বাড়ীর কোথাও এলোমেলো হইয়া কিছু পড়িয়া নাই, কুশ্রী হইয়া কিছু চোখে বাজে না কোথাও চেঁচামেচি গোলমাল নাই, চাকর-দাসীরা নীরব নিঃশব্দে কাজ করিয়া ফিরিতেছে। এতে সেবার মনে হইল—এ বাড়ীর যিনি গিন্নি আর যিনি মালিক তাঁরা নিশ্চয়ই এমন শৃঙ্খলাপ্রিয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে তাঁদের

শয্যাগত হইয়া থাকার সময়েও নিয়মিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম এখনো হইতে পারে নাই; এবং বাড়ীর চাকর-দাসীরাও তাদের মুনিবদের এমন ভালোবাসে যে তারাও তাঁদের অসুখে শোকাচ্ছন্ন হইয়া আছে, তারা তাঁদের প্রবর্ত্তিত নিয়মশৃঙ্খলা এখনো লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। যে-বাড়ীর চাকর-দাসীরা এমন সায়েস্তা, নিয়মানুগত, সে-বাড়ীর মালিকেরা হয় খুব কড়া লোক, নয় ত খুব স্নেহপ্রবণ; যাতে অপর লোককেও তাঁরা নিজেদের ইচ্ছার অনুসারে অনায়াসে হুকুমে চালনা না করিয়াও চালাইতে পারিতেছেন।

লোকনাথ আসিয়া সেবার জিনিসপত্র নামাইয়া সেবার নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গিয়া রাখিতে লাগিল। একজন ঝি আসিয়া সেবাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—আপনি ওপরে আসুন।

সেবা মার্ব্বেল-পাথরের সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া যেমন যেমন উপরে উঠিতেছিল তার বুকের ভিতরও তেমনি তেমনি উতলা হৃদয় ধক ধক করিয়া উঠিতেছিল। সে প্রতি পদক্ষেপে এই বাড়ীর বুকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে! তাঁরা তাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন, সে তাঁদের খুসী করিয়া তুলিতে পারিবে কি না, এই বাড়ীতে তার থাকিবার মেয়াদ কতদিন—এইসব ভাবনায় সেবার মন তোলপাড় করিতেছিল। আনন্দ-বাবু বলিয়াছিলেন—সে এখানে বিবাহ করিয়া নিজের গৃহস্থালি পাতিয়া বসিতে পারিবে। সেবা মন হাতড়াইয়া দেখিল তার হৃদয়সিংহাসন একেবারে খালি—গৃহস্থালির রাজ্যে অভিষেক করিবার মতন একটি মাথও তার মনে উঁকি মারিল না। দারিদ্র্য ও নিরাশ্রয়তার সঙ্গে লড়াই করিতেই তার মন এতদিন ব্যাপৃত ছিল; তার উপর ছিল তার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের সকল কোণ আচ্ছন্ন করিয়া, সকল প্রবেশদ্বার আগ্‌লাইয়া রাখিয়া; তাই এতদিন কোনো তরুণের মুখের ছবি সেবার মনে ছাপ রাখিবার অবসরই পায় নাই। আজ দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিবার সম্ভাবনার সূত্রপাতে তার চিরপোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাগান পাওয়ার সখ যখন মিটিবার আশা মনের কোণে বাসা বাঁধিতেছিল, তখন তার মনের অকস্মাৎ নিজের নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়তায় ও প্রণয়ের দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া উঠিল; রূপকথার শূন্য সিংহাসন পূরণ করিবার জন্য রাজহস্তী যেমন যোগ্য পাত্রের সন্ধানে দেশদেশান্তরে ধাবিত হইয়াছিল, তার মনও তেমনি দেশদেশান্তরে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল তার চেনা কোনো লোককে তার যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা হয় কি না দেখিয়া যাচাই করিয়া লইবার জন্য! কোথাও তার মন আগ্রহ অনুভব না করিয়া বার বার বিমুখ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া অপরের সন্ধানে ছুটিতেছিল।

তার চিন্তায় বাধা দিয়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল—আগে স্নান করবেন, না আগে মার সঙ্গে দেখা করবেন?

সেবা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা কোন্ ঘরে আছেন? বাবু কোন্ ঘরে আছেন?

ঝি আঙুল দিয়া ঘর দেখাইয়া বলিল—ঐ ঘরে আছেন মা, আর এই এ পাশের ঘরে আছেন বাবু।

সেবা ঘরের দেয়াল-জোড়া বড় আয়নার দিকে একবার চট করিয়া ফিরিয়া আপনার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে জাগিয়া আসিয়া মুখ চোখ শুকাইয়া বসিয়া গিয়াছে, চুল উস্কোখুস্কো ও কাপড় জামা মলিন লাট হইয়া গিয়াছে। এই বেশে নূতন লোকের সাম্‌নে বাহির হইতে সেবার লজ্জা বোধ হইল। সে বলিল—আমায় চানের ঘর দেখিয়ে দাও, আমি চট্ কোরে চান কোরে নিয়ে মার সঙ্গে দেখা করব।

স্নানান্তে দীর্ঘ ভিজা চুল আঁচড়াইয়া পিঠে ছড়াইয়া ধোয়া কাপড় জামা পরিয়া সেবা যখন ঝির পিছনে পিছনে গিয়া সুমতির ঘরে ঢুকিল, তখন লোক আসার শব্দ পাইয়া সুমতি দরজার দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—এস মা, এস।

সেবা অগ্রসর হইয়া গিয়া শয্যাগতার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সুমতি সেবার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাত্রের গাড়ীতে আস্‌তে কোনো কষ্ট হয়নি ত?

সেবা ঘাড় নাড়িয়া কোমল স্বরে বলিল—না।

সুমতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি নাকি বড় ভালো মেয়ে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া সেবার মুখে ঈষৎ একটু হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল, লজ্জায় ও কৌতুকে তার মুখ দীপ্তিতে ঝলমল করিতে লাগিল; সে কোনো উত্তর না দিয়া বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

এমন দীপ্তিত শ্রী সুমতি আর কোনো মেয়ের এর আগে দেখেন নাই। তাঁর মন মুগ্ধ হইয়া গেল। রমার কথা তাঁর মনে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রমার সঙ্গে সেবার তুলনাও তাঁর মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। রমার মতন এ সুন্দরী নিশ্চয়ই নয়; রমা ছিল শাদা গোলাপ, আর এ অপরাজিতা; রমা ছিল আকাশে উষার উন্মেষ, আর এ যেন সন্ধ্যার শ্যামলা বসুমতী; এও সুন্দর, এও নয়নকে মুগ্ধ করে, এও মনকে তৃপ্ত করে। সুমতির মনে হইল একে দেখিলে হীরকের নিশ্চয় মনে ধরিবে। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—তুমি আমার কাছে এস।

সেবা তাঁর কাছে সরিয়া গেলে তিনি সেবার হাত ধরিয়া একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—বড় দুঃসময়ে তোমায় এনেছি মা। আমি কোথায় তোমার যত্ন করব, না তোমাকে এনেছি আমাদের যত্ন করতে! এই বাড়ী ঘর চাকর দাসী সব তোমার, তুমি কিছু কুণ্ঠা কোনো সঙ্কোচ কোরো না মা, আমি মা-ছোড় হয়েছি, তুমিই এখন আমার মা।

রমাকে মনে করিয়া সুমতির চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সুমতির স্নেহে আর্দ্র ও আকৃষ্ট হইয়া সেবা সজল চোখে নিজের আঁচল দিয়া সুমতির চোখ মুছাইয়া দিয়া মৃদু কোমল স্বরে বলিল—আমিও মা মা-ছোড় ছেলেবেলা থেকে; আমিই বরং মা পেয়ে গেলাম……

সুমতি সেবাকে তার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—এ কি আর পাওনা মা? আমার ত শেষ হয়ে এসেছে। যে ছেলেটাকে মা-ছোড় অসহায় কোরে ফেলে যাব, তাকেই তোমায় দেখতে হবে, তার সমস্ত ভার তোমায় নিতে হবে।

এই কথায় সেবার মনে পড়িল হীরককে। তাকে দেখিবার জন্য তার মন উৎসুক হইয়া উঠিল, সে হীরকের ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহা দেখিয়া সুমতি বলিলেন—ঐ ঘরেই সে অক্ষম হয়ে পোড়ে রয়েছে; সাত দিন নাকি তার চোখের জল শুকুচ্ছে না। যত্ন কোর, মমতা দিয়ে, ভালোবেসে, তুমি তাকে ভালো কোরে তুলতে কি পারবে মা?

সেবা সেই অদেখা লোকটির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা কোরে দেখব।

সুমতি রোদন করিতে করিতে বলিলেন—তাই দ্যাখো মা। ঐ ঘরে সে আছে—যাও তুমি। আমার সাধ নেই যে তোমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব; তুমি লজ্জা কোরো না, তুমি হীরুর কাছে যাও। কামিনী, ডাকে আমার সঙ্গে কোরে ঐ ঘরে দিয়ে আয়।

সেবা ব্যগ্রতায় উৎসুক অথচ সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া আস্তে আস্তে গিয়া হীরকের ঘরে ঢুকিল। সেবা ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া গিয়া দাঁড়াইতেই হীরক চোখ ফিরাইয়া তাকে দেখিল এবং দুজন অপরিচিত যুবক-যুবতীর প্রথম সাক্ষাতে তাদের দুজনেরই দৃষ্টি বিস্ময়পুলকে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সেবা মনে করিয়াছিল সে আসিয়া দেখিবে বড়লোকের নবীগোপাল রোগের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে, রোগশয্যায় শীর্ণ হতশ্রী হইয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু সে আসিয়া দেখিল যে-লোক বিছানায় পড়িয়া আছে সে যে রোগী তার কোনো চিহ্ন তার মুখে নাই; তার মুখখানি শিশুর মতন সরল ও সুন্দর, অথচ তাতে পৌরুষের দৃঢ়তার ছাপ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে; তার বড় বড় কৃষ্ণ চুলগুলি ফুলিয়া উঠিয়া বহুকালের চিকিৎসার অভ্যাসে আপনিই মাথার দুপাশে বিভক্ত বিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; এই যুবাকে দেখিতে বাস্তবিক সুন্দর। সুন্দর বস্তু দর্শনের আনন্দ ও অপ্রত্যাশিত বস্তু দর্শনের বিস্ময় সেবার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর হীরক ত জানিত না যে তদের বাড়ীতে কোনো নূতন লোককে আনিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাই অকস্মাৎ এই নিতান্ত অপরিচিতাকে তার ঘরে আসিতে দেখিয়া তারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না; সেবার রং ফর্সা নয়, তার মুখশ্রী নিখুঁত নয়, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি শ্রী হীরকের চোখ দেখিতে পাইল যাহা সচরাচর সাধারণ মেয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; সেবার রূপ পরিবার বিশেষ একটি শোভন ধরণ, কান দুটি সাধারণ

চুল আঁচ্‌ড়াইবার বিশেষ একটি ভঙ্গী, তার মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, তার বড় বড় চোখদুটিতে মদির দৃষ্টি, তার পাতলা ঠোঁটের দুটি কোণে বিশেষ রকম একটু রেখার টান, তার দুটি গালের দুটি টোলে অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে লজ্জার লাবণ্যের টলটলানি, তার চোখে মুখে বিস্মিত আনন্দের আভা—সমস্ত গিয়া হীরককে মুগ্ধ চমৎকৃত করিল। হীরকের মনে হইল এই মেয়েটির চুল আঁচ্‌ড়াইবার ভঙ্গীতে বিখ্যাত উপন্যাস-লেখিকা জর্জ ইলিয়ট কিম্বা শার্লৎ ব্রন্তের—কি জানি কার যেন আদল আসিতেছে; তার ঠোঁটের তরঙ্গিত রেখার টান যেন চিত্রকরা ফুলধনু, যেন এক জোড়া ব্রেস্ ব্র্যাকেট—তার মধুমাখা কথা আর মন আলোকরা হাসির বন্ধনী হইয়া আছে; তার, সর্ব্বাঙ্গের সুষমা যেন পুষ্পপ্রচুর নববসন্তের কিশলয়ের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে দৃষ্টিলোভন। দুজনে দুজনকে দেখিয়া দুজনেরই যে আনন্দ ও বিস্ময় মনের গোপন পুরে উদয় হইয়াছিল তাহা তাদের দুজনেরই মুখে ফুটিয়া ওঠাতে একের চোখে অপরকে আরো সুন্দর আরো মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

বিস্ময়ের প্রথম স্তম্ভিত মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিয়া হীরক প্রথমে কথা কহিল—আমি পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট অনড় হয়ে পোড়ে আছি, আমি যে উঠে আপনার অভ্যর্থনা করব এমন সামর্থ্য আমার নেই; আমার অভদ্রতা ক্ষমা করবেন।

হীরক প্রথমে কথা কওয়াতে সেবার সঙ্কোচ অতিক্রম করা সহজ হইল, সে মৃদু কোমল কণ্ঠে বলিল—আপনি সে জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আপনার অসুখ জেনেই আমি দেখ্‌তে এসেছি।

হীরক যতক্ষণ সেবার সঙ্গে কথা বলিতেছিল, ও তার উত্তর শুনিতেছিল, ততক্ষণ কেবল ভাবিতেছিল এই মেয়েটি কে, এ কে হইতে পারে, কার আসার সম্ভাবনা। হীরক সম্ভাবনার সমস্ত রাজ্য তন্নাস করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি সেবা?

সেবা লজ্জিত হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া বলিল—হ্যাঁ।

হীরকের মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে ব্যথিত স্বরে বলিল—আপনি এমন দুঃসময়ে এলেন যে আপনাকে দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক এ বাড়ীতে কেউ নেই। মা আর আমি বিছানায় পোড়ে; আর-একজন যে ছিল সে আমাদের ফেলে আগেই চোলে গেছে।

রমাকে মনে হইতেই হীরকের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; একজন অপরিচিতা সদ্য-আগতা মেয়ের সাম্‌নে নিজের শোক গোপন রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও হীরক চোখের জল নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

সেবা তাড়াতাড়ি একেবারে হীরকের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পত্নীশোকাতুর অপরিচিত যুবাকে সে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ঘরের এদিক ওদিক তাকাইতেই সেবা দেখিল হীরকের খাটের মাথার দিকে একটা তেপায়া টেবিলের উপর একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ রহিয়াছে, ডাকে আসিয়াছে, এখনো তার মোড়ক খোলা হয় নাই। পূর্ব্বকার ব্যবস্থা ও অভ্যাস অনুসারে লোকনাথ ডাকের কাগজ পত্র আনিয়া প্রত্যহ হীরকের কাছে রাখে, সেগুলা অবহেলায় পড়িয়াই থাকে, হীরকের নিজের হাতে তুলিয়া পড়িবার সাধ্যও নাই, এমন কেউ নাইও যে তাকে পড়িয়া শোনায়; সেইসব চিঠিপত্র কাগজ একদিনের বাসি হইলে সেগুলি সরাইয়া লোকনাথ আবার টাট্‌কা ডাক রাখিয়া যায়। সেবা খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইয়া হীরককে অন্যমনস্ক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে খবরের কাগজ পোড়ে শোনাব কি?

হীরক হতাশাভরা স্বরে বলিল—আর খবর! বিশ্বসংসার থেকে ত আমি একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে গেছি। আপনি পড়্‌তে ত পড়ুন—আচ্ছা চেঁচিয়েই পড়ুন।

সেবা খবরের কাগজ খুলিয়া তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিষয়ের মোটা মোটা হেডিংগুলা পড়িতে লাগিল এবং যে খবরটা হীরকের শুনিবার আগ্রহ হইতে পারে মনে হইতেছিল অথবা যে হেড-লাইনটা পড়িবামাত্রই হীরকের দৃষ্টি উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, সেবা সেই খবরগুলি পড়িয়া পড়িয়া শোনাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ হীরক জিজ্ঞাসা করিল—আজকে বাংলা কোন্ তারিখ বল্‌তে পারেন?

সেবা একটু মনে করিয়া বলিল—আজকে তেস্‌রা।

হীরক ব্যগ্র হইয়া বলিল—তা হলে দেখুন ত, ডাকের কাগজপত্রের মধ্যে, প্রবাসী এসেছে কি না?

সেবা ডাকের কাগজের ভিতর হইতে বাছিয়া প্রবাসী বাহির করিয়া মোড়ক খুলিতে খুলিতে বলিল—এসেছে।

হীরক উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—একবার সূচীটা দয়া কোরে পড়্‌বেন কি?

সেবা সূচীর বিষয়নামগুলি একে একে পড়িতে লাগিল।

দুর্ঘটনা ঘটার পর প্রথম এই আজ হীরক কোনো বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল অথবা মনোযোগ দিল। আর পাশের ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া লোকনাথ ইহা দেখিতেছিল, অনেক দিন পরে তারও মুখ আজ হাসিহাসি হইয়া উঠিয়াছিল। খোকা-বাবুকে দুধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে, সে দুধ গরম করিয়া আনিয়া গেলাস হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সে এখন গিয়া তার খোকা-বাবুর নবোদ্‌গত উৎসাহে বাধা দিতে চাহিতেছিল না।

সেবা একটার পর একটা বিষয় হীরকের ফর্‌মাস-মত পড়িয়া পড়িয়া শোনাইতেছে। হীরক আর কখনো এমন কোনো মেয়ের সঙ্গ পায় নাই, যে বন্ধুর মতন অন্তরের সকল আকাঙ্ক্ষা এমন করিয়া পূরণ করিতে পারে; মেয়ে-মানুষ যে হাঁড়িকুঁড়ি দাঁটাচচ্চড়ি বড়জোর পরনিন্দা পরকুৎসা ছাড়া বিশ্বের উচ্চ চিন্তাধারার সঙ্গে অপরের যোগসাধন করিয়া দিতে পারে, ইহা হীরকের অভিজ্ঞতার অতীত ছিল; আজ তার এই নূতন অভিজ্ঞতার বিস্মিত আনন্দ তার দৃষ্টিতে মুখের দীপ্তিতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল; হীরকের আর হুঁশ ছিল না যে তার এখনো খাওয়া হয় নাই; এই নবাগত অপরিচিতারও এখনো হয়ত খাওয়া হয় নাই। সে এই কদিন বিশ্বসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আপনার শোকের মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া ছিল; আজ অকস্মাৎ এ কোন্ দেববালা আবির্ভূত হইয়া অবলীলাক্রমে তাকে দুঃখকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্বের আনন্দযাত্রার সঙ্গে জুড়িয়া দিল।

হঠাৎ হীরকের কানে ঘড়ী বাজার টং টং টং শব্দ গেল; সে চোখ ঘুরাইয়া ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল এগারোটা বাজিল। হীরক একটু লজ্জিত ও একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—উঃ অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনাকে অনেক বকিয়েছি। আমি টেরই পাইনি যে এত বেলা হয়ে গেছে। আপনার এখনো কিছু খাওয়া হয়নি। আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ বাড়ীর লোকগুলো সব গেল কোথায়? আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে সকলকেই পক্ষাঘাতে ধরল বাকি? এই অভিশপ্ত বাড়ীতে এমন দুঃসময়ে কষ্ট পেতে আপনি কেন এলেন?

সেবা কি বলিতে যাইতেছিল। হীরক তাহা বলিতে দিবার ও শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই কপাল ও ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বিরক্তিতীব্র স্বরে চীৎকার করিল—লোকাদা এই, কে আছিস এ তল্লাটে! সব মরেছিস নাকি?

সেবা হীরকের চীৎকারে ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ডেকে আন্‌ছি কাউকে।

লোকনাথ পাশের ঘরেই থার্মস্-ফ্লাস্ক গরম দুধ লইয়া বসিয়া আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছিল; হীরকের ডাক শুনিবামাত্রই সে তাড়াতাড়ি দুধটা রূপার গেলাসে ঢালিয়া রূপার রেকাবির উপর বসাইয়া লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল হীরক লোকনাথকে দেখিয়াই আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—আজ এতক্ষণ কোথায় মোরে ছিলি সব?

লোকনাথ ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। সেবা তাড়াতাড়ি কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—সকাল থেকে আপনার কিছু খাওয়া হয়নি আমি জান্‌তাম না। আমি আছি বোলেই এরা কেউ এতক্ষণ আসেনি। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। কাল থেকে আর কোনো অনিয়ম আমি হতে দেবো না।

সেবার সাম্‌নে ক্রোধ প্রকাশ করাতে এবং তাহে সেবা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া হীরক শান্ত ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; সেবা যে বলিল কাল হইতে আর অনিয়ম হইতে সে দিবে না, এর মানে কি কাল সে চলিয়া যাইবে, অথবা কাল থেকে সে তার কাছে আসিবে না? হীরক যে বারবার সেবাকে বলিল—কেন আপনি এমন দুঃসময়ে এলেন,—তাতে কি সেবা তার উদ্দেশ্য ভুল বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাই কি সে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে? হীরকের মুখ নিজের অসহিষ্ণু আচরণে অসন্তুষ্ট ও অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল, সে চুপ করিয়া রহিল।

সেবা লোকনাথের হাত হইতে দুধের গেলাস লইয়া হীরকের মুখের কাছে নত হইয়া বলিল—আপনি দুধটুকু খেয়ে নিন। গেলাসে কি কোরে খাবেন?

লোকনাথ বলিল—গলায় হাত দিয়ে একটু তুলে ধরতে হবে।

সেবা লোকনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ফিডিং কাপ্—গাড়ুর মতন নল দেওয়া বাটি নেই?

হীরক বলিল—ছিল সবই; আছেও বোধ হয়। কিন্তু দেখে-শুনে খুঁজে-পেতে করবার লোকেরই অভাব হয়েছে। আর কটা দিনই বা, এমনি কোরেই কেটে যাবে।

হীরকের কথায় বিষণ্ণ হতাশার যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা গিয়া সেবার অন্তরেও বাজিল। সেবা দুঃখিত স্বরে সান্ত্বনা ভরিয়া বলিল—আপনি অমন হতাশ হচ্ছেন কেন?...

হীরক ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল—আর আশাই বা করব কিসের?

সেবা বলিল—অসুখ মানুষের হয়েই থাকে; আবার ভালো হয়ে উঠবেন.....

হীরক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছলছল চোখে সেবার দিকে চাহিয়া উদাস স্বরে বলিল—আর ভালো! সব ভালো আমার শেষ হয়ে গেছে।

হীরকের শোক আবার মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সেবা তাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল—দুধটুকু জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলুন।

সেবা হীরকের মুখের কাছে নত হইয়া হীরকের গলায় একখানি ধোয়া তোয়ালে পাতিয়া দিল, তারপর বাঁহাতখানি হীরকের গলার তলে দিয়া তাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং আস্তে আস্তে হীরকের মাথাটি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ডান হাতে দুধের গ্লাস তার মুখের কাছে ধরিল। সেবা হাসপাতালে সেবিকার কাজ করিতে গিয়া কত রোগীকে ত এমনি করিয়া তুলিয়াছে; কখনো তার মনে একটু সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ হয় নাই; কিন্তু আজ তার মনে হইল সে একজন তরুণ সুন্দর পুরুষের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে; সেবার মুখ লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হইয়া উঠিল। হীরকও অনুভব করিতেছিল এই তরুণীর বাহুবেষ্টনের কোমল মদির স্পর্শ, তার গালের উপর লজ্জিতার ঘন দ্রুত নিশ্বাস, তার কপালে আনতার মাথার একটি স্খলিত অলকগুচ্ছের আলগোছ মৃদু স্ফুরণ! আজ তার দুধখাওয়ার মধ্যে ক্ষুধা শান্তি ছাড়াও একটু বেশী তৃপ্তি যেন সে পাইল। দুধ খাওয়া হইলে সেবা আবার আস্তে আস্তে হীরকের মাথা নামাইয়া বালিশের উপর রাখিয়া দিল, এবং একটু ফর্শা নেকড়া ভিজাইয়া হীরকের মুখ ধুইয়া দিয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিয়া দিল। হীরকের মনে হইল রমা থাকিলে সেও তাকে এমনি করিয়াই যত্ন করিত। তার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল, সে একটুকু নিরিবিলি কাঁদিয়া লইবার জন্য আর্দ্রস্বরে বলিল—আপনি এখন খেয়ে-টেয়ে বিশ্রাম করুনগে। লোকাদা, এঁকে নিয়ে যা, কামিনীকে বল্‌গে এঁকে দেখুক শুনুক,—তোরা সব কি হয়েছিস্ বল্ ত?

হীরকের কথায় যেন কান্নার সুর বাজিয়া উঠিল। সেবা তাড়াতাড়ি বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে, আমি নিজেই সব দেখে শুনে নেবো।

হীরক বলিল—হ্যাঁ, তাই নেবেন দয়া কোরে, আমার অবস্থা ত দেখ্‌ছেন? লোকাদা, নিয়ে যা এঁকে।

লোকনাথের পিছনে পিছনে সেবা হীরকের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই হীরক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ কান্না যে কেন তা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না; রমার অভাব উপলক্ষ্য করিয়া এ কান্না আসিয়াছিল, কিন্তু তার মধ্যে মিশিয়াছিল নিজের জড় অবস্থায় অক্ষমতার লজ্জা ও দুঃখ, নবাগতার যত্নের আতিথ্যের ত্রুটির লজ্জা ও বিরক্তি, আরো হয়ত অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় একটা কিছু।

সেবা বাহিরে আসিয়া লোকনাথকে বলিল—মা আর বাবু কখন্ কি খান, কি করেন, কি ভালোবাসেন, কি ভালোবাসেন না, সব আমায় বোলে দিয়ো। আমি একবার মাকে দেখে আসি।

সেবার কথাগুলি হীরক শুনিতে পাইল। সেবার যত্নের আগ্রহের পরিচয় যতই হীরক পাইতেছিল, ততই তার রমার অভাব মনে হইয়া মন-কেমন করিতেছিল; এখন ঘরে কেউ নাই দেখিয়া হীরক একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া লইতে লাগিল।

সেবা যখন সুমতির ঘরে গিয়া ঢুকিল, তখন সুমতির বিছানার পাশে চেয়ারে বসিয়া ছিলেন আনন্দ-বাবু। আনন্দ-বাবু সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—সেবাকে দেখ্‌লেন ত? কি মনে হয়?

সুমতি বলিলেন—খাসা মেয়ে। হীরুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। হীরুরও ভালো লেগেছে বোধ হয়; সেবার বই পড়া থিয় হয়ে ত শুন্‌ছে।

আনন্দ-বাবু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সেবাকে কি বিয়ের কথা বলেছেন?

সুমতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না, এখনো বলিনি। আরো দু-এক দিন যাক।

এমন সময় সেবা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেবাকে দেখিয়াই আনন্দ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যাই এবারে হীরুকে দেখে আসি।

আনন্দ-বাবু যাইতে যাইতে সেবাকে আস্তে আস্তে বলিয়া গেলেন—এখানে কিছু লজ্জা-টজ্জা কোরো না ভাই, দেখ্‌ছ ত বাড়ীর অবস্থা। এই বাড়ী ঘর সংসার চাকরদাসী সব তোমার—তুমি অসঙ্কোচে তোমার যা দরকার তা নেবে করবে বল্‌বে।

সেবা কেবল একটু হাসিল। আনন্দ-বাবু বাহির হইয়া গেলেন। সেবা সুমতির কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুমতি বলিলেন—এস মা এস। এতখানি বেলা হয়ে গেল এখনো কিছু খাওয়া হয়নি। কামিনীকে একবার ডাকো ত মা, তোমাকে খেতে দিক।

সেবা বলিল—আমার জন্যে আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না। আমি খাব এখন। আপনাদের ওষুধ পথ্য খাবার সময় কি হয়েছে?

সুমতি বলিলেন—কি জানি মা। লোকনাথ সব জানে, তাকেই জিজ্ঞাসা কোরে নিয়ো। পুরোনো চাকর, কত্তার আমলের, আমার হীরুকে ওই মানুষ করেছে, হীরু ওকে দাদা বলে, বৌমাও লোকনাথ-দাদা বল্‌ত।

সেবা সুমতির উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া নম্র স্বরে বলিল—আমিও ওকে লোকনাথ-দাদা বোলেই ডাকব।

কামিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, দিদিমণির জলখাবার আন্‌ব? ভাতও হয়ে গেছে।

সুমতি বলিলেন—আমার ঘরেই দুখানা থালা দে—মার আর বড়ঠাকুরের। তুমি বড়ঠাকুরের সাম্‌নে খাবে ত মা?

সেবা বলিল—কে দাদামশাই? দাদামশায়ের সাম্‌নে আমি খাই।

কামিনী খাবার ঠাঁই করিতে লাগিল। লোকনাথ কয়েক থোলো চাবি আনিয়া সেবার সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—এইসব চাবি বাক্স দেরাজ আল্‌মারীর।

সেবা জিজ্ঞাসু বিস্মিত দৃষ্টিতে সুমতির মুখের দিকে চাহিল। সুমতি বলিলেন—ঐসব চাবি আমার বৌমাই রাখ্‌তেন; এখন তুমিই রাখো মা। তুমি সবস্ত দেখে শুনে নিয়ো, আমার হীরুর যেন কোনো কিছুর অভাব হয় না, তোমার নিজেরও যেন কোনো কষ্ট না হয়, তোমাকেই কোরে কর্ম্মে নিতে হবে

লোকনাথের চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল; সুমতি তাকে ডাকিয়া বলিলেন—লোকনাথ, বড়ঠাকুরকে ডেকে দাওগে, ভাত আন্‌ছে।

লোকনাথ চলিয়া গেল। সেবা চাবির থোলো-গুলি লইয়া নাড়িয়া নাড়িয়া গম্ভীর মুখে ভাবিতেছিল এদের এই যত্নের ও বিশ্বাসের প্রতিদান সে দিতে পারিবে কি?

লোকনাথ গিয়া আনন্দ-বাবুকে খাবার প্রস্তুতের খবর দিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হীরুক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি আজকেই গেলে যাবেন জ্যাঠামশায়?

আনন্দ-বাবু হীরুকের কপালে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—না বাবা, তোমাদের এ অবস্থায় ফেলে আমি কোথায় যাব?

হীরুক জিজ্ঞাসা করিল—সেবাও কি এখন থাক্‌বেন কিছুদিন?

আনন্দ-বাবু বলিলেন—হ্যাঁ সেও থাক্‌বে। তোমার জেঠিমাকেও নিয়ে আস্‌ব ভেবেছি।

হীরুক উৎফুল্ল মুখে বলিল—আপনারা এখানে থাক্‌লে বেশ হয়!

আনন্দ-বাবু বলিলেন—তাই থাক্‌ব বাবা।

হীরক চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তার চোখে মুখে খুসীর আলো ঝলমল করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

বাংলার নতুন সাহিত্য ও তরুণ সম্প্রদায়।

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে 'দেশী ও বিদেশী' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলার বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি এবং নবীন বাঙ্গালীর মতিগতি দেখে দারুণ শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেই সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া হওয়া দরকার মনে করি।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে দীনেশ-বাবু লিখেছেন—'আমাদের সাহিত্যও নকলনবিশগণের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। * * * এই শ্রেণীর লেখকগণ কেবল হাঁকছেন তাজ তাজ তাজ, হোক্ না কেন তা তাজমহল—ওগুলি পুরাণো আদর্শ—এখন ওসকল রেখে কি হবে? হোক্ না কেন তা নিষ্ঠা, লজ্জা, বিনয়—ওসকল প্রাচীনদের মতে সদ্‌গুণ; এখনকার গুণ হবে—স্বেচ্ছাচার, যা খুসী মনে হবে তখনই সেইভাবের দরিয়ায় গা ঢালা। * * * এই সকল লেখক এদেশীয় নারীপ্রকৃতিতে এরূপ কল্পিত অসংযম আরোপ কোরে তাঁদের মা-বোনদের অপমানিত করছেন। * * * তাঁরা আমাদের সমাজের ছবি দিচ্ছেন না। * * * মূলকথা নিজে চোখে দেখে লেখার একটা শক্তি আছে, তা সহজে অর্জ্জন করা যায় না, তা হোতে একখানি তৈরী বই থেকে প্লট ও চরিত্রের ছায়া নিয়ে তাড়াতাড়ি কুড়ি কর্ম্মার একখানি বই লিখে প্রেসে দেওয়া সহজ। * * * আমাদের লেখকদের মধ্যে যাঁদের কথা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই লেখার বেশ ক্ষমতা আছে, তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় বড়, প্রতিভায় বড়, অথচ অনেকেই সম্মুখ না দেখে পুরটা দেখেন। * * "

দীনেশ-বাবু কোনো লেখকের নাম করেননি, কোনো পুস্তকেরও নয় অথচ তাঁদের নামে মস্ত নালিশ রুজু করেছেন। না আছে আসামীর নাম, না আছে চোরাই মালের হিসেব—আছে কেবল ঐ নালিশ। বাংলা দেশের লেখকদের মধ্যে 'প্রতিভা' ও 'শিক্ষা-দীক্ষা' মুড়িমুড়কির মত সস্তা নয়। প্রতিভা যাঁদের আছে তাঁদের হাতের পাঁচ আঙুলের মধ্যেই গোণা যায়। তাঁরা যে নকলনবিশ এমন কথা তো জান্‌তুম না। দীনেশ-বাবু বুটো মাল সাচ্চা বলে ঠাওরাননি তো; মুখোসকে মুখ ভাবেন নি?

তারপর দীনেশ-বাবুকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, অবশ্য কানে কানে;—তাঁর 'নীলমাণিক' কোন্ সমাজের ছবি? না, ওটা কোনো সমাজেরই ছবি নয়, নিছক কল্পনা? "আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা 'মা' ভিন্ন অন্য ডাকে বাইরের লোককে সাড়া দেন না"—একথা 'নীলমাণিক'-রচয়িতার মুখে একটু কেমন-কেমন শোনায় না কি? এই প্রসঙ্গে দীনেশ-বাবুকে ক্ষোভের সহিত জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতা সহরে বাঙ্গালী বারনারীর সংখ্যা ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে, তাতে কি এই প্রমাণ হয় যে বাঙ্গালী নারীরা মা ভিন্ন অন্য ডাকে সাড়া দেন না? এইসকল নারীকে দুরাত্মা প্রতারকেরা কি ডাকে ভুলিয়েছিল? 'পুণ্যক্ষেত্র' বারাণসীর কথা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি না—ওটা তো একটা open secret.

এইসব ব্যাপারে আনন্দিত হবার কিছু নেই, বরং এরূপ আলোচনা বড় দুঃখকর। তবে এসব উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে মানুষের মনে নানান্ ভাব নিয়তই উঠ্‌ছে পড়্‌ছে। কোনোটা ভাল, কোনোটা মন্দ। মানুষ নিরবচ্ছিন্ন ভালও নয়, মন্দও নয়। ভালো মন্দে মানুষ গড়া। এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হয় না কি?

এ সম্বন্ধে ফরাসী মনিষী রোমা রোলাঁর উক্তি প্রত্যেক বুদ্ধিমানের শিরোধার্য্য—

If we are to tell a hundredth part of the dreams that come to an ordinary honest man, or of the desires which come into being in the body of a chaste woman, there would be a scandal and an outcry. Silence such monsters! Bolt and bar their cage! But let us admit that they exist, and that in the souls of the young they are insecurely fettered.

দীনেশ-বাবু বাংলার অন্তঃপুরের দৌবারিক মহাশয়দের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে'—"এখনকার লেখকেরাও এই যে বিদেশী নকল চালাতে যাচ্ছেন—আমার বিশ্বাস তা এদেশে দাঁড়াবে না। এভাবের অসংযম আমাদের সমাজে নেই, তা' উড়ে এসে কিছুতেই আমাদের অন্তঃপুর অধিকার করতে পারবে না।" অথচ কি পূর্ব্বেই তিনি করুণস্বরে দৌবারিক মহাশয়দের নিকট 'বিনীত অনুরোধ' জানাচ্ছেন—"আপনারা নিজেরা না পড়ে, কিম্বা কোনো ভাল লোকের নিকট গল্পটি কেমন তা না জেনে, অন্তঃপুরে কোনো গল্পের বই পাঠাবেন না। যে সংযম ও শুচিতা হিন্দু রমণীর নিজস্ব, গল্পগুলি তা দস্যুর মত অপহরণ করবে।" এখন দীনেশ-বাবুর কোন্ কথাটা বিশ্বাস করি? প্রথমটা যদি ঠিক হয় তাহলে দীনেশ-বাবুর, অন্তঃপুরে-অঘটন-ঘটার, এত বিভীষিকা ভাষার কোনো কারণ আছে কি? দ্বিতীয় প্রস্তাব যদি ঠিক হয় তাহলে বলি—হিন্দু রমণীর সংযম ও শুচিতা এতই ঠুন্‌কো—একটা গল্প পাঠের ভার সইবে না? তাই বুঝি আমাদের দেশের কোনো কোনো দৌবারিক মহাপুরুষ বাহিরে যাবার সময় স্ত্রীরত্নগুলিকে ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে' রেখে যান এবং বাড়ীতে পুরুষ ভৃত্য বা পাচক নিযুক্ত করেন না!

দীনেশ-বাবু বলেছেন—"পারিবারিক স্নেহ ও প্রেম আমাদের জাতীয় তপস্যা। * * * বাৎসল্য ও দাম্পত্য এখনও বাংলার তপস্যারি সমগ্রী।" আমরা দুর্ভাগ্য, আমাদের পরিচিত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অধিকাংশ পরিবারে এর কোনো নিদর্শন পাইনি, বিপরীতটাই চোখে পড়েছে। আমাদের উক্তিটা নিতান্ত বাজে নয়। দীনেশ-বাবু যদি অধুনা-প্রকাশিত বাংলার অন্তঃপুরিকার রচিত উপন্যাস 'জন্ম-অপরাধী' * পড়েন তো বুঝতে পারবেন। এই মনস্বিনী বঙ্গনারীর সত্য কথা অসঙ্কোচে প্রচার করবার সৎসাহস আছে, বাংলার অন্তঃপুরের নির্ম্মম রুদ্ধ আবেষ্টনে তাঁর আত্মা ব্যাহত ও পঙ্গু হয়নি, তাঁকে আমরা এই অবসরে আনন্দে অভিনন্দন করি।

হাজার চুনকাম করলেও সাধারণ হিন্দু অন্তঃপুরের পঙ্কিলতা

---

* শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া রচিত এবং কর, মজুমদার এণ্ড কোম্পানি, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

অত্যাচার ও উৎপীড়ন ঠেকা দেওয়া অসম্ভব। পাঞ্জাব-ব্যাপার যেমন চুনকামে চাকা পড়্‌লো না।

আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠে বুঝ্‌তে পারলুম আর-একটা ব্যাপারে দীনেশ-বাবু বড়ই বিচলিত হয়েছেন। আমাদের এই যে যুগ এটা নাকি স্বেচ্ছাচারিতার যুগ! "এ যুগে বালকেরা নির্ম্মম এবং সর্ব্বপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত হয়ে পড়েছে!" দৃষ্টান্ত—"সেদিন একজন উচ্চ-শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূষণস্বরূপ তরুণ অধ্যাপক আমাকে একান্ত ভাবে বল্লেন, 'আমি ধর্ম্ম মানি না, ঈশ্বর মানি না'!" দীনেশ-বাবু ভেবে অবাক হয়েছেন, "আমাদের তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতবড় স্পর্দ্ধা কি কোরে এলো!" এতে দীনেশ-বাবুর বিস্ময় বা ক্ষোভের কোনো কারণ দেখি না। এযে যুগলক্ষণ, এযে বড় আশার কথা। এখন আর তরুণের দল সবাই যারা খুড়ো মামা মেশো পিশে মাষ্টার-মশাই না ঘুণ ধরা শাস্ত্রের কথায় ওঠবোস করতে সম্মত নয়। পত্রের মুখে ঝাল আর তারা খাবে না। তারা নিজেরা ভাবছে, নিজেরা বিচার করছে, নিজের মত নির্ভয়ে ব্যক্ত করছে। এই তো জ্যান্তো মানুষের লক্ষণ। যে শ্রদ্ধেয়, আমার বিচারে, তাকেই শ্রদ্ধা করবো; বয়োজ্যেষ্ঠ বলেই তাকে শ্রদ্ধা করবো না—তাহলে তো কত ভণ্ডবট গাছ, কত ইটপাথরের থামের গায়ে মাথা ঠুকতেও হয়! বিনা মানে হেয় দাসত্ব নয়, পদে পদে আত্মাকে ধূলি-লুণ্ঠিত করা নয়। সত্যকে জান্‌বার জন্যে, বোঝ্‌বার জন্যে, পাবার জন্যে যদি প্রচলিত সংস্কার বা সামাজিক বিধিনিয়ম ধ্বংস করতে হয় ক্ষতি কি? সত্য ভিসবায় চেয়ে শ্রেয় নয়?

দীনেশ-বাবু বাঙ্গালার লেখকদের সামনে কতকগুলি সমস্যা তুলে ধরেছেন—তাঁদের রচিত উপন্যাসে সেগুলির সমাধানের জন্যে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—'নিপীড়িত জাতিদিগের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা।' এখন নিপীড়িত জাতি কারা? দীনেশ-বাবুর নির্দ্দেশ-মত কেবল 'নিম্নশ্রেণীর লোক' নয়। আমাদের সমাজের একটা প্রকাণ্ড 'নিপীড়িত জাতি' ত্রিলোক; আমাদের ঘরে ঘরে 'নিপীড়িত জাতি' কনিষ্ঠের দল—অর্থাৎ বয়স যাদের অল্প, যারা তরুণ।

দীনেশ-বাবুর মতে এ দেশের তরুণের দল 'দুর্ব্বিনয়' 'স্বেচ্ছাচারিতা' 'নাস্তিকতা' 'অবিশ্বাস' প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। তাই তাঁর ক্রোধ ও দুঃখ রাখ্‌বার ঠাঁই নেই। তরুণ দলের এরূপ মতিগতির কারণ দীনেশ-বাবুর নিজের কথাতেই নির্দ্দেশ করি—"আমাদের প্রাচীন শুচিতা নেই, অথচ তার দর্পটি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই ছদ্মবেশী—জাতিভেটা মুখোসে দাঁড়িয়েছে। মুখোসটা ঋষিমুনিদের—কিন্তু ভিতরটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মুখোস পোরে আমরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভয় দেখাচ্ছি, ও নিজেরা যথেচ্ছাচার কোরে পূর্ব্বের সহিত বৈষম্যের নেখা যোক কেরে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা তারা কি কোরে সইবে? সুতরাং সকল জাতির মধ্যেই একটা বিদ্রোহের শিখা জ্বেলে উঠ্‌ছে।"

সত্যিকারের মানুষ আনন্দময়, অপরোক্ষ, সাহসে দুর্জ্জয়। তার স্পর্দ্ধার অন্ত নেই। অতিবড় শ্রদ্ধেয় পাত্রকে বা যুগযুগান্তের সংস্কারকে সে বিচার করতে কুণ্ঠিত নয়। অবিশ্বাসের তলোয়ার দিয়ে অসহ্য কাঙ্কের মতকে ছিন্নভিন্ন করে' সে আগামী কল্যের মতের প্রতিষ্ঠা-ভূমির পত্তন করছে।

সেরা আর্ট, অর্থাৎ আর্ট নামের যোগ্য যা, তা সমস্ত পার্থিব নিয়মের ঊর্দ্ধে অনন্তের পথে রাখবার, উদ্ধার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। মানুষের কাজে তা লাগতেও পারে, নাও পারে; সমাজের বাঁধি নিয়মের মধ্যে ওলটপালোট ঘটানো তার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আসল কথা—তার তেজ ভীষণ, গতি দুর্ব্বার; আর্ট জ্বলন্ত হুতাশনসমান—আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করে' তড়িৎ-শিখার ন্যায় যার প্রকাশ। সেইজন্যেই তা শুভ মঙ্গলপ্রদ। তার দ্বারা বাস্তব জগতের কল্যাণসাধন হলেও হতে পারে। তবে তার যথার্থ প্রভাব নিষ্ঠার ন্যায় চিরন্তন, লোকাতীত। সূর্য্যের জন্ম—আর্ট সূর্য্যেরই মত। সূর্য্য moralও নয়, immoralও নয়। সূর্য্য আছে—এইটেই সত্য। সূর্য্য অন্ধকার দূর করে—এইটেই সত্য। আর্টের কাজও তাই।

সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বেঙের ছাতার আলো।

"প্রবাসীতে" আলো-দেওয়া গাছপালার বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর, কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে এদেশীয় আলো-দেওয়া বেঙের ছাতার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সম্প্রতি Scientific American পত্রে আলো-দেওয়া বেঙের ছাতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। উক্ত প্রবন্ধ-লেখক মারিল সাহেব (W. A. Murril) বলেন, সৌভাগ্যক্রমে তিনি একজায়গায় একটা বস্তুভূমিতে অনেকগুলি আলো-দেওয়া বেঙের ছাতা দেখেছিলেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাদের ভিতর থেকে একরকমের বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়; ভেক এবং কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীদের ওপর উক্ত বিষের ক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাদের স্নায়ুগুলা অবশ হয়ে আসে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়; আর মাথাঘোরা, বমন, অতিসার প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণও দেখা গিয়েছিল।

তিনি বলেন,—জীবন্ত আলো-দেওয়া প্রাণীদের আলো বড় সংক্ষিপ্ত, আর তারা প্রায়ই থেকে থেকে আলো দেয়। কিন্তু বেঙের ছাতা যে আলো দেয়, সেটা স্থির এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাদের কোন-কোনটা কয়েক সপ্তাহ ধরে—এমন কি মাসখানেক পর্য্যন্ত—অনবরত একটানা আলো দিতে পারে। ক্রমবিকাশ বা জীবনসংগ্রামবাদের ধারা অনুসরণ করে অনেকেরই মনে কৌতূহল জাগতে পারে—গাছের বা বেঙের ছাতার আলো বিকিরণ করবার তাৎপর্য্য কি? একবার সঠিক খবর দেওয়া অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত দুষ্কর। তবে জীবন্ত প্রাণীদের আলো দেওয়ার কারণ হয়ত জীবনসংগ্রামে টিকে থাকা। অথবা বংশ বিস্তারের একটা ফন্দীবিশেষ হতে পারে কিন্তু গাছের আলোর ওই রকমের ত কোন তাৎপর্য্য বোঝা যায় না; তবে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে গাছের অথবা বেঙের ছাতায় আলো বিকিরণ করাটাও তাদের বংশবিস্তারের একটা কৌশল মাত্র। তাদের আলোতে আকৃষ্ট হয়ে জোনাকী বা ওই জাতীয় অন্যান্য পোক এসে তাদের গায়ের ওপর বসে এবং সে সময় বেঙের ছাতার বা গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাণু-সকল তাদের গায়ে পায়ে লেগে যায়, আর তারা সেগুলোকে নানা স্থানে ছড়িয়ে ওদের বংশবিস্তারের সুবিধা করে দেয়। তিনি এও লক্ষ্য করেছেন যে পচা গাছপালার মধ্যে আর্দ্রতা ও বেঙের ছাতার মধ্যে রসাধিক্য থাকলেই আলো অধিক নির্গত হয়। তিজা থাকার সঙ্গে আলো দেওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

Honey Agaric জাতের বেঙের ছাতাগুলো বোধ হয় myceliumএর জীবন্ত কোষগুলোর গতিকেই অনুসরণ করে থাকে। সেগুলোকে প্রায়ই পুরাণো গাছের গায়ে জন্মাতে দেখা যায় আর অন্ধকার রাত্রে আলো বিকিরণ করে থাকে। এই শ্রেণীর Rhigomorphs জাতের বেঙের ছাতাগুলোকে যখন জ্যান্ত Hyphae আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে, তখন তারা দিব্যি আলো দিতে পারে, কিন্তু বাইরের পর্দাটা ক্রমে পুরু হয়

উঠ্‌লে আর আলো দিতে পারে না। কিন্তু আবার এই শ্রেণীর Hymenophore জাতীয় বেঙের ছাতার myceliumগুলো শত জ্যান্তো হলেও একদম আলো দিতে পারে না।

আবার শোনা যায় Gymnopus Tuberosus জাতের বেঙের ছাতার বাইরের সূক্ষ্ম পর্দাটা বেশ আলো দিতে পারে। Panellus Styticus শ্রেণীর পরিণতবয়স্ক Hymenophoreগুলোও আলো দিতে পারে, কিন্তু ছোট্ট(বাচ্চা-বয়সী)গুলো আলো দিতে পারে না। Xylaria Hypoxylon জাতের বেঙের ছাতার কথা শোনা যায়—যখন তারা আপনা-আপনি-জন্মায় তখন আলো বিকিরণ করতে পারে, কিন্তু যত্ন-করে পুষ্‌লে আলো দেয় না। হয়ত কোন-রকম আলো-দেওয়া জীবাণু এদের শরীরের ভিতর বসবাস করে অমন সুন্দর আলোর লহর ফুটিয়ে তোলে।

Monadelphus illudeus জাতের একরকম প্রকাণ্ড, কমলা-রঙের, বিষাক্ত বেঙের ছাতাই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে পারে। ওদেশে ওগুলোকে সাধারণতঃ লোকে "Jack-my-lantern" বলে থাকে। ওরা ইউনাইটেড ষ্টেটের পূর্ব্বাংশে পুরাণো মরা গাছের গায়ের ওপর দলে দলে সুন্দর সুন্দর গোছায় গোছায় ফুটে থাকে। কোন-কোনটার টুপির ব্যাসটা ৬ ইঞ্চির ওপরও হয়ে থাকে। একজন কৃষক ওহিওতে আমি আলো-দেওয়া একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা দেখেছিল—সেটার টুপির বেড় হবে প্রায় ১০ ইঞ্চির ওপর; ডাঁটাটা প্রায় পনর ইঞ্চি লম্বা।

প্রাণি-জগতের এই উত্তাপশূন্য আলোক দেওয়ার ব্যাপারটার সম্বন্ধে অনেকেই অনেকদিন ধরে অনেক কথা শুনে আস্‌ছে। অনেকেই হয়ত অনেক বিষয় দেখে অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে ঢের জান্‌বার বাকী। গভীর সমুদ্রের আলো-দেওয়া মাছ; অন্ধকার রাতে জাহাজের পার্শ্বে সমুদ্রের ঢেউএর ওপর সুন্দর, ঠাণ্ডা আলোর খেলা; জোনাকীর বাতি; পচামাছ, পচা কপি প্রভৃতির মধ্যে "জ্যান্ত" আলোর ঝিকিমিকি;—এসব হয়ত অনেকেই অবাক চোখে চেয়ে দেখেছেন; কিন্তু কেউই সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করে এদের দ্বারা মানুষের কাজের উপযোগী কোন জিনিষ গড়ে তুল্‌তে পারেননি। Molisch সাহেব খনি এবং বারুদখানার জন্য আলো-দেওয়া বীজাণু দ্বারা একরকমের উত্তাপশূন্য আলো তৈরী করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে বড় একটা উপকার হয়নি। তবে মানুষের বুদ্ধি যে ভাবে হুস্ করে জ্ঞানান্বেষণে ছুটেছে, তাতে বোধহয় শীঘ্রই এ ব্যাপারটারও একটা কিনারা হয়ে যেতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

—

বই ছাপা আবিষ্কার।

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে (২৭৮ পৃষ্ঠায়) লেখা আছে—"জর্ম্মানীতে ক্যাক্‌স্টন্ প্রথম বই ছাপা আবিষ্কার করেন।" ইহাতে তিনটি ভুল আছে। প্রথম—জর্ম্মানীতে প্রথম বই ছাপা হয় নাই। হল্যাণ্ডে লরেন্স্ কষ্টার (Coster) প্রথম বইছাপা আবিষ্কার করেন বলিয়া এতদিন জানা ছিল। দ্বিতীয়—ক্যাক্‌স্টন্ জর্ম্মানীর লোক নহেন, ইংল্যাণ্ডের লোক। ওএষ্টমিন্‌ষ্টারে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তৃতীয়—ক্যাক্‌সটন্ প্রথম বইছাপা আবিষ্কার করেন নাই। কষ্টারই এই সম্মানের ইয়োরোপীয় অধিকারী।

অন্নদাশঙ্কর রায়।

—

ভাসের অনুবাদক।

আষাঢ়ের প্রবাসীর ২৮৩ পৃষ্ঠায় "পুস্তক-পরিচয়ে" কবিকথা নামক পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'মুদ্রারাক্ষস' সংস্কৃত কবি ভাসের নাটকের বাংলায় যে-সব অনুবাদকদের নাম করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বাদ পড়িয়াছে, তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

—

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য।

আষাঢ়ের প্রবাসীতে 'ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের স্বাস্থ্য' বিচার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত অনুমান হয়।

(১) এই তালিকা মাত্র তিন মাসের। বার্ষিক তালিকা না দেখিলে দেশের প্রজাবৃদ্ধি কিংবা প্রজা-হ্রাস বলিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, এক বৎসরের দেখিলেও চলিবে না। কারণ সকল ঋতু সমান যায় না, সকল বৎসর সমান যায় না। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে বৎসরে চারিটি ঋতু গণনা করা চলে। ইংরেজী তিন তিন মাসে এক এক ঋতু ধরিলে হিসাব বোঝা সোজা হয়। জানুআরি হইতে শীত, এপ্রেল হইতে গ্রীষ্ম, জুলাই হইতে বর্ষা, অক্‌টোবর হইতে শরৎ। প্রবাসীতে প্রদত্ত তালিকা বর্ষাকালের। অবশ্য পঞ্জাবে বর্ষা নাই বলিলেও চলে।

(২) দেখিতেছি, বর্ষাকালে মান্দ্রাজ, বাংলা, পঞ্জাব উত্তম। আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বিহার-ওড়িষ্যা অধম। অন্যান্য প্রদেশ মধ্যম।

(৩) নগর ও গ্রাম বিচারে, বাংলা উত্তম। অর্থাৎ বাংলা দেশের নগর ও গ্রামের স্বাস্থ্য সমান। এই ঋতুতে মধ্যপ্রদেশ সমান অধম।

(৪) দেখিতেছি, বাংলার নগর উত্তম। অন্যান্য প্রদেশের নগর কেন অধম?

এখন জন্ম দেখি। বর্ষাকালে জন্ম হইলেও, প্রকৃত জন্ম বা গর্ভাধান শরৎকালে। অতএব জন্মের তালিকা হইতে শরৎকালের স্বাস্থ্য পাইতেছি। প্রথমে গ্রাম দেখি।

(৫) শরৎকালে পঞ্জাব উত্তম। বাংলা অধম। পঞ্জাবের পর আগ্রা-অযোধ্যা ও বর্মা। বাংলা অধম কেন? কারণ শরৎকাল মেলেরিয়ার কাল।

(৬) নগর ও গ্রাম দেখি। বিহার-ওড়িষ্যা, বর্মা, ও বোম্বাই সমান। বাংলাও সমান, যদিও অন্যান্যে।

সমান ও অসমানের অর্থ এই যে, গ্রাম হইতে নগর, গ্রামবাসী হইতে নগরবাসী অগ্রসর হয় নাই। উভয়ের অবস্থা প্রায় সমান। কিন্তু বাংলার জন্ম অত্যল্প।

সকল প্রদেশে গর্ভাধানের ঋতু এক না হইতে পারে। অন্যান্য ঋতুতে জন্ম কত, তাহা না দেখিলে ভাল মন্দ বলিতে পারা যায় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

—

বাঙালী সুকেশী।

আষাঢ়ের প্রবাসীর পঞ্চশস্য বিভাগে 'সুকেশী' বর্ণনায় এলাহাবাদের এক মহিলার কেশের উল্লেখ আছে। তাঁর নাম শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। চুলের দৈর্ঘ্য মাপা হয় নাই—মাটি হইতে প্রায় ৮ ইঞ্চি উপরে 'আগা' শেষ হইয়াছে; কিন্তু মাথার উপর যে একটু curvature চালু আছে তাহা ধরিলে চুলের দৈর্ঘ্য ৫ ফুটের কাছাকাছি যাইবে। এ ছবি যখন

সুকেশী শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

লওয়া হয় তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়েন। তাহার ফলে তাঁহার খুব চুল উঠিয়া যাইতে থাকে। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার চুল গোড়ালির বাহিরে লুটাইয়া পড়িত। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ছয় আঙুল করিয়া কাটিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যখন পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনভাব অর্দ্ধেকের অধিক কমিয়া গেল এবং দৈর্ঘ্যও খুব কমিয়া গেল—পাছে ইহা অপেক্ষা আরও কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় এই ছবিখানি তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ("বম্বর ক্যাসল্, মোহতিশিমগাঞ্জ, এলাহাবাদ) শিক্ষকতা করেন। বীরেশ্বর-বাবুর এক ছাত্রী মিস্ ভাসেল (Miss Vassell) কর্ত্তৃক এই ফটো গৃহীত; এবং তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া জর্ম্মনীর একখানি মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল যুদ্ধের পূর্ব্বে। সৌদামিনী দেবীর হালের ফটো নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

—

লম্বা চুল।

আষাঢ় মাসের প্রবাসীর ২৭৩ পৃষ্ঠায় পঞ্চশস্যে মিস্ এথেল্ পেনের চুলের কথা আছে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীদের মধ্যে অনেকেরই চুল মাটিতে লুটায়। সেখানে চুল বড় করিতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যথা-সাধ্য চেষ্টা করে। লম্বা চুল তাহাদের এত প্রিয় যে চুল কাটিয়া দেওয়াই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি বলিয়া মনে করে। তাহাদের কাছে লম্বা চুল শোভার দিকেও যেমন, গুণের দিকেও তেমন। Crow) জাতির কোন দলপতির চুলের দৈর্ঘ্য ছিল ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি; তাহার চুল এত লম্বা বলিয়াই তাহাকে দলপতিত্বে বরণ করা হয়। টেবিলের উপর চেয়ার রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইলেও তাহার চুল মাটিতে লুটায়। মোট কথা এ বিষয়ে পুরুষেরা মেয়েদের কাছে হার মানে নাই। The Descent of Man—Drawin (Page 884, 1909 Edition) দেখুন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মৈত্রেয়।

—

জাতিভেদ-সমস্যা।

গত আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ পাল মহাশয় ডাক্তার সার্ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "জাতিভেদ-সমস্যার" সমালোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা আজকাল সমালোচনা করেন তাঁহারা মোটেই সমদর্শী নন, অধিকন্তু বিশেষ একদর্শী।

জাতিভেদ যে ভারতবাসীর ঐক্যের পরিপন্থী পূজনীয় ডাক্তার রায় তাহাই বুঝাইয়াছেন। কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা বোধহয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। একবার এক পল্লীগ্রামে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে একজন শিক্ষিত তিলি কোন এক বন্ধুর অনুরোধে কায়স্থের সারিতে খাইতে বসিয়াছিলেন। একজন কায়স্থ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন। অবশেষে অপমানিত ব্যক্তি লজ্জায় সেস্থান ত্যাগ করেন এবং এখন নাকি তিনি সেই কায়স্থের বিশেষ শত্রুতা করিতেছেন। এই অনৈক্যের কারণ জাতিভেদ নয় কি? এই ব্যাপারে পল্লীর অধিকাংশ লোকই নাকি সমাজকে গালি দিয়াছিল।

সত্যবাবু কতকগুলি লোকের নাম করিয়াছেন যাঁরা নিম্নজাতি হইতে বড়লোক হইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বড়লোকের তুলনায় ইহা যে কতটুকু তাহা কি তিনি ভাবেন নাই? এই হইলেই হইবে না। বাঙ্গালায় শিক্ষাকে শতকরা ৭·৭ হইতে ৯·২এ তুলিতে হইবে। সুতরাং কল্পিত বড়লোকের তুলনায় এই লোকগুলি যে কিছুই নন, একথা বোধহয় পাল মহাশয় স্বীকার করিবেন। আর তিনি যে বড়লোকদের নাম করিয়াছেন তাঁরা ভদ্র জাতির কাছে যে কতটা তটস্থ হইয়া যান তাহা বোধহয় পাল মহাশয় জানেন না।

সত্যবাবু আমেরিকার শাদায় কালোয় ভেদের সহিত আমাদের অন্তর্জাতি-ভেদের তুলনা করিয়াছেন। তাঁর বুঝা উচিত ছিল যে ভারতের এই জাতিভেদ দুইটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে নহে, একটি মহাজাতির নিজের অংশের মধ্যে। সুতরাং তাঁর তুলনা অন্ধের মত হইয়াছে। ডাঃ রায় একথা বলেন নাই যে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জাতি মিশিয়া এক মহাজাতি প্রস্তুত হউক; তিনি কেবল ভারতের এই অন্তর্জাতিভেদের উচ্ছেদের কথাই বলিয়াছেন। একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে কালভেদে শাস্ত্রভেদ হওয়া উচিত। বেদের নিয়ম এখন না চলিতে পারে, কেননা বেদ যে-সময়ের লেখা তখন মানুষের মজ্জাগত প্রাণ ছিল, আর এখন অন্নই জীবন। সুতরাং এই নবীন যুগে কিছু নূতন শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। আর সে সম্বন্ধে ডাঃ রায় যোগ্য ব্যক্তি।

শ্রীশীতলচরণ সেন।

—

সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "জাতিভেদ-সমস্যা" প্রবন্ধে সূর্য্যগ্রহণে হিন্দুদের হাঁড়ি ফেলিয়া দেওয়ার রীতিকে

রীতিমত উপহাস করিয়া "কপটতার" নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এই রীতির মূলে কিন্তু বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সূর্য্যালোকের অন্যান্য গুণের মধ্যে ব্যাধিবীজ-বিনাশক (Germicide) ও শক্তিবর্দ্ধক গুণদ্বয় যে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ও রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর, তাহা বিদেশীরা বুঝিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ভারতবাসীরা হাঁড়ি ফেলে কেন তাহার কারণ তাঁহারা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আচার্য্যগণ অতি প্রাচীনকালে ঋগ্বেদের সময়েরও পূর্ব্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ আছে। সেইসব প্রমাণ হইতে এই জানা যায় যে গ্রহণের সময় অদৃষ্ট একরূপ বিষ (রোগবীজ) দেহে লিপ্ত হয়। সূর্য্যের অন্য অর্থাৎ রশ্মি দ্বারা এই বিষ নষ্ট হয়। গ্রহণ সময়ে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পায় না। সুতরাং সেই সময় রোগবীজ সম্পূর্ণ নষ্ট না হইয়া কিছু দেহে লিপ্ত থাকে। ঐ অদৃশ্য রোগবীজ বা কীটাণু ধুইয়া ফেলিবার জন্যই বোধ হয় স্নানের ব্যবস্থা আছে। পাকের হাঁড়ি ধুইলে এই বিষ সম্পূর্ণ না যাইতে পারে (কারণ তাহার শোষকগুণ আছে), সম্ভবতঃ এই জন্যই তাহা ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

—

নিম্ন শ্রেণীকে উচ্চ জাতিতে উন্নয়ন।

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "জাতিভেদ-সমস্যা" পাঠ করিয়া সামাজিক ভাবে কিছু বলিতেছি।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য এক হুকুম জারি করিয়া depressed class বা চণ্ডাল সদৃশ লোকদিগকে উচ্চ সমাজে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এই জাতি শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিল, এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। তবে এখনও ইহারা ত্রিপুরার মহারাজার পাল্কী বহন করিয়া থাকে। বাঙালী জমীদারদের এরূপ দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করা উচিত নয়।

মণিপুর রাজ্যে হিন্দুয়ানীর বিশেষতঃ বৈষ্ণবতার ভয়ানক কড়াকড়ি। সেখানে কাহারও বাড়ীর কোন ঘরে ম্লেচ্ছজাতি ঢুকিলে সে ঘর পোড়াইয়া ফেলা হয়। এবারে কিন্তু মহারাজার হুকুমে ছয় হাজার মণিপুরী জাত্যভিমান ভুলিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। ইহা খুবই সুখের বিষয়। এইরূপে দেখা যায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে জাতিভেদের কড়াকড়ি একটু একটু করিয়া হ্রাস পাইতেছে।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে জাত্যভিমান নাই বটে, কিন্তু গ্রাম্য দলাদলি আছে। দেশীয় রাজ্যসমূহে কার্য্যোপলক্ষে গিয়া বাঙ্গালীরা খুব দলাদলির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জঘন্য দলাদলি দেখিয়া কবি নবীন সেন আমাকে লিখিয়াছিলেন—

'যেখানে বাঙ্গালী
সেখানে দুর্গাকালী,
সেখানে পাঁঠাবলি,
সেখানে দলাদলি।'

ইহা মিথ্যা নয়। এ অপবাদ বঙ্গদেশ হইতে দূর হউক।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

—

দীর্ঘতমা ঋষি দাসকন্যা উশীজের পুত্র নহেন।

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসী পত্রে সমাজসংস্কার প্রবন্ধ-লেখক দীর্ঘতমা ঋষিকে দাসকন্যা উশীজের পুত্র বলিয়া গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন। দীর্ঘতমা ঋষি উশীজের পুত্র নহেন। দেবগণের পুরোহিত বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর উতথ্য ঋষির পত্নী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির জন্ম। বলি রাজার দাসী উশীজের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কাক্ষীবান ঋষির জন্ম হয় (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায় ৯—৪১ শ্লোক)। এজন্য কাক্ষীবান ঋষি ঔশীজ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। সমাজসংস্কার প্রবন্ধ-লেখকের ভ্রমের ফলে পত্নীস্থানীয়া উশীজ দীর্ঘতমা ঋষির জননীস্থানীয়া হইয়াছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

—

জাতিভেদ সমস্যা ও আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত জাতিভেদ সমস্যা প্রবন্ধের একস্থানে লেখক বলিয়াছেন "প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য ও গৌরবর্ণ আর্য্যজাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান নিষিদ্ধ ছিল।" প্রাচীন ভারতে আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল না, পরন্তু প্রচলিত ছিল, মহাভারতের বন পর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ের ৩১।৩২ শ্লোকেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত মজুমদার মহাশয় গত আষাঢ় মাসের প্রবাসী পত্রে আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহের যে কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার সকলগুলি আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ নয়। এবং যযাতিও অনার্য্য ছিলেন না।

মজুমদার মহাশয় আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহের দৃষ্টান্তস্থলে অর্জ্জুনের সহিত উলূপীর বিবাহের উল্লেখ করিয়া উলূপীকে বিধবা এবং ইরাবানের জননী বলিয়াছেন। এ বিবাহ আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ নয়। অর্জ্জুন বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উলূপী বিধবা ছিলেন না এবং ইরাবানের জননীও নহেন।

নাগবংশের আদি জনক মহর্ষি কশ্যপ ঋষি এবং জননী দক্ষ প্রজাপতির কন্যা কদ্রু। জনক জননী দুইই বিশুদ্ধ আর্য্য (মহাভারত আদিপর্ব্বে ১৬ অধ্যায় ৫—৮ শ্লোক)। অনার্য্যের যজ্ঞানুষ্ঠান নাই কাজেই অনার্য্যের গৃহে গার্হপত্যাগ্নিও (প্রাত্যহিক নৈমিত্তিক যজ্ঞাগ্নি) কখনও থাকে না। অর্জ্জুন উলূপীর পিতা নাগরাজ কৌরব্যের ভবনে উপনীত হইয়া গার্হপত্যাগ্নি প্রাপ্ত হইয়া সেই অগ্নিতে প্রাত্যহিক যজ্ঞ করিয়াছিলেন (মহাভারত আদিপর্ব্ব ২১৪ অধ্যায় ১৩—১৬ শ্লোক)।

উলূপী আপন পরিচয় দিবার সময়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "আমি নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই অর্থাৎ আমি কুমারী, আমি অনন্যপূর্ব্বা অর্থাৎ কাহারও সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবও হয় নাই" (মহাভারত আদি পর্ব্ব ২১৪ অধ্যায় ১৮—২০ শ্লোক)। উলূপীর সন্তান থাকা মহাভারতের কোথাও দেখা যায় না।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ৯০ অধ্যায়ের ৭—২১ এবং ৭৫—৭৯ শ্লোকে ইরাবানের যে জন্মবৃত্তান্ত রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় নাগরাজ ঐরাবতের পুত্র সুপর্ণকে গরুড় বিনষ্ট করিলে নাগরাজ ঐরাবত বিধবা পুত্রবধূকে অর্জ্জুনকে দান করেন এবং অর্জ্জুন সুপর্ণের বিধবা পত্নীকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন। এই বিবাহের ফলেই অর্জ্জুনের ঔরসে সুপর্ণের বিধবা পত্নীর গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। সুপর্ণের বিধবাপত্নীই ইরাবানের জননী।

উলূপীর পিতা কৌরব ও নাগরাজ ঐরাবতের কনিষ্ঠ সহোদর (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৩৫ অধ্যায়)। অতএব নাগরাজ ঐরাবত উলূপীর জ্যেষ্ঠ তাত, সুতরাং সুপর্ণ উলূপীর জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা ছিলেন। সুপর্ণের বিধবা পত্নীর গর্ভে ইরাবানের জন্ম, কাজেই উলূপী সুপর্ণের

সুবাদে ইরাবানের পিতৃস্বসা এবং অর্জ্জুনের সুবাদে বিমাতা বটেন। প্রচলিত বাঙ্গলা অভিধানগুলিতে ইরাবানকে উলূপীর পুত্র বলিয়া আভিধানিক মহাশয়েরা যে ভ্রম করিয়াছেন মজুমদার মহাশয়ও সেই ভ্রমের হাত এড়াইতে পারেন নাই দেখিতেছি।

মৎস্যগন্ধা দাশরাজের পালিতা কন্যা মাত্র; এই কন্যার জনক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ চেদিদেশাধিপতি বসুরাজ। ইনি উপরিচর নামেও পরিচিত ছিলেন। এবং জনৈক অপ্সরা মৎস্যগন্ধার জননী (মহাভারত আদি পর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়। দাশরাজও ভীষ্মদেবকে বলিয়াছিলেন "তোমাদের সদৃশ গুণবান্ প্রধান পুরুষই সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধার) জনক।" "মৎস্যগন্ধার জনক আমাকে ইহাও অনেকবার বলিয়াছেন যে "শান্তনু রাজাই এই কন্যাকে বিবাহ করিবার যোগ্যপাত্র।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০০ অধ্যায় ৭৯।৮০ শ্লোক)। যে মৎস্যগন্ধার জনকজননী দুইই আর্য্য, স্বনামধন্য দাশরাজ সেই কন্যার পালন করিয়াছিলেন বলিয়া মৎস্যগন্ধাকে অনার্য্য বলা সুসঙ্গত মনে হয় না।

মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন "যযাতি, পুরু, তুর্ব্বশু, এবং যদু ঋগ্বেদে অনার্য্য বলিয়া উল্লিখিত আছে।" কিন্তু কোন্ মণ্ডলের কোন্ সূক্তের কোন ঋক্ একথা আছে তাহা বলেন নাই। মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মহাভারতে কিন্তু ইঁহাদিগকে অনার্য্য বলেন নাই, বরং শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়াই ইঁহাদিগের মহত্ব ও গৌরবই ঘোষণা করিয়াছেন। যদুর জন্মের বহু পূর্ব্বে বেদের জন্ম এবং যদুর অনেক পরে যদুবংশে মহাভারতের কৃষ্ণের জন্ম, সুতরাং বেদে মহাভারতের কৃষ্ণের নাম কখনও থাকিতে পারে না। অতএব বেদের অনার্য্য কৃষ্ণকে মহাভারতের কৃষ্ণ বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও ভ্রম। পুরু পৈত্রিক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত আর্য্যের ন্যায় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহার পরবর্ত্তী বংশই মহাভারতের নায়ক। মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া ইঁহাদিগের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তবে যদুকে বেদে অনার্য্য বলিবার কি হেতু থাকিতে পারে?

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

কষ্টিপাথর

বিলাতযাত্রীর পত্র।

১

পাড়ি দেওয়া গেছে। প্রথম কিছুদিন লাগে নিজের সঙ্গে নিজের যানবাহনের খাপ খাইয়ে নিতে। বিষ্ণু যখন প্রথম গরুড়ের পিঠে চেপেছিলেন, নিশ্চয়ই তখন আরাম পান নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না: কারণ, একে আমরা মর্ত্ত্য মানুষ, তাতে আমরা কলিদেবতার কলবাহনকে ধার করে' নিয়েচি। গরুড়ের পাখার সঙ্গে অনন্ত আকাশের কগড়া নেই—কিন্তু আমাদের এই কলের জাহাজের সঙ্গে জলের দেবতার পদে পদে বিরোধ। ঠেলা-ঠেলি মারামারি করে' তাকে চলতে হয়, চব্বিশ ঘণ্টা হাঁসফাঁস করে' মরে, তার সেই উদ্বেগ আমাদের সর্ব্ব শরীরকে উতলা করে' তোলে। যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এর গতি, সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই বাহনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকাতে আমাদের এত দুঃখ। জাপানিদের জুজুৎসু ব্যায়ামের কায়দা হচ্চে এই যে, বাধাকে আপনার অনুকূল করে' তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকেই কৌশলে আপনার স্বপক্ষীয় করে' নেওয়া, শত্রুর অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্র করা। পাখীর পাখা বাতাসেরই গতিকে নিজের শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার আকাশ-বিহারকে সুখময় সৌন্দর্য্যময় করতে পারে। মানুষের যন্ত্র প্রকৃতির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ সন্ধি করতে পারে নি; এই যন্ত্রে সে যতটা শক্তি ব্যবহার করে, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি অপচয় করে। যন্ত্র কেবলি বলচে আমি জোর করে' বাধা কাটিয়ে যাব। যন্ত্রের এই ঔদ্ধত্যে সমস্ত পৃথিবী তাপিত। প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের অসামঞ্জস্য যন্ত্রকে এত কুৎসিত করে' তুলেচে। বাণিজ্যলক্ষ্মী যখন থেকে বাষ্পবাহনকে অবলম্বন করেচেন তখন থেকে তাঁর শ্রী নেই। তখন থেকে বিশ্বলক্ষ্মীর সঙ্গে বাণিজ্যলক্ষ্মীর মুখ দেখা বন্ধ। যন্ত্রের জবরদস্তি যে-সব জঞ্জালকে ক্রমাগত জন্ম দিতে থাকে, সেই তার আপন সন্তান, সেই অটল জঞ্জালই তার সর্ব্বনাশ করে। আধুনিক কালের পলিটিক্স্ সেই যন্ত্র—বিশেষত বিদেশী রাজ্য-শাসনে। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলবার শক্তি এর নেই, উগ্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা কেবলি বাধা ভেদ করে' চলবার জন্যে এর উদ্যম। এই জন্যে এই পলিটিক্স দৃপ্ত, কিন্তু শ্রীহীন। শ্রী হচ্চে সকল শক্তির চেয়ে বড় শক্তি; চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের গুণে যখন লীলাময় সহজতা জন্মে, তখন দেখা দেয় শ্রী;—শক্তি তখনি সুন্দরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়—বিরোধের জবরদস্ত অপচয় থেকে তখন শক্তি বেঁচে যায়। এই নিষ্ঠুর অপচয়ের হিসাব এ দিন নিকাশ হবে। বোধ হচ্চে যেন সেই হিসাব তলব হয়েচে। পলিটিয়ের জঞ্জাল জমে উঠেচে; মিথ্যায় কপটতায় নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে দেবতার পথ-চলা বন্ধ। তাই ত পশ্চিম গগনে ধূমকেতুর মত দেবলোকের কাঁটা দেখা দিয়েচে, সমস্ত ধরণী কেঁপে উঠ্‌ল।

জাহাজ ত চলচে সমুদ্রের উপর দিয়ে—এদিকে আমাদের মনও চলেচে কালসমুদ্রে। বাইরে যেখানে সমস্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত, মন সেখানে আপন চিন্তার পথে বাধা পায় না। কিন্তু অপরিচিত মানুষের মত আমাদের মনের পক্ষে এমন বাধা আর কিছুই নেই। অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিচয়ের অভাব, সেখানে বাধা অতি সামান্য—কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষ অপরিচয়ের বর্ম্ম পরে' থাকে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে। এই জিনিষটা কেবল অভাব নয়, ফাঁক নয়, একটা কঠোর জিনিষ,—এ অদৃশ্যভাবে ঠেলা দেয়;—বিশেষত যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী, এবং স্বজাতি-স্বীয় ইংরেজ। মনে হয় যেন জাহাজের আকাশটাও শূন্য নয়—সে যেন কুমুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভরা। আমি স্বভাবত অবকাশ-বিহারী জীব, আমি চিরদিন ফাঁকায় মানুষ হয়েচি—আমার চারিদিকের আকাশ যখন ঠেলাঠেলিতে ভরে যায়, তার মধ্যে যখন প্রকৃতির শান্তি বা মানুষের নিমন্ত্রণ থাকে না, তখন আমার সমস্ত প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি আমার সেই শান্তিনিকেতনে, সেই উদার প্রান্তরের প্রান্তে ফিরে যাবার কোনো পথ থাকত, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি চলে যেতুম। কিন্তু পূর্ব্বে বলেছি আমি কলিযুগের ধার-করা বাহনে চলেচি, এ আমার ইচ্ছাকে মানবে না। সেইজন্যই দেবতার প্রতি ঈর্ষা হয়—আলাদিনের প্রদীপের স্বপ্ন দেখি।

কিসের জন্যে যাচ্চি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে নয়, সে আমি জানি; আর-কিসের জন্যে, সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা কথা মনে আসে সেটি হচ্চে এই;—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েচে তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাঁদের দেখতে পাওয়া সহজ। শুধু চেখে দেখতে

পাওয়া নয়;—আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন, সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। একথা মনে করা ভুল—তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্ব্বমানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায় তখন একথা বুঝতে হবে সেই দুঃখের মূলে সর্ব্বমানবের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্‌সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এদুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না। আমরাও সুদীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বহন করচি তার কারণটাকে সঙ্কীর্ণ ও আকস্মিক করে' দেখচি বলেই মনে ভাবচি মটেগু ডক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্ম্মান্তিক ক্ষতগুলির আরোগ্য ঘটবে।

২

আলোয়ারের মহারাজা আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন। এঁকে দেখে বড় খুসি হয়েচি। এঁর বেশভূষা আদবকায়দা সমস্তই দেশী ধরনের। পশ্চিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করবার সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে—আপনার ভাষা, আপনার বেশ, এমন কি, আপনার স্বভাবকে গোপন করে' তবেই যেন গৌরব বোধ করে। ইংরেজ আপনার কায়দাকেই সম্মান করে, তার সঙ্গে অল্পমাত্র পার্থক্যকেও অবজ্ঞা এবং উপহাস করে' থাকে। সেই কারণে যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজ, এবং যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরেজি, সেখানে নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে-নেবার জন্যে ইংরেজি ধরণধারণের সুবিধে আছে, তাতে অন্তত বাইরের দিকে একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের দিকে? এই ইচ্ছাকৃত দাসত্বের লজ্জা বহন করি কি করে?

এ সম্বন্ধে একটা তর্ক কিছুকাল পূর্ব্বে মাঝে মাঝে শোনা যেত। সে হচ্চে এই যে, বাঙালীর বেশভূষা ধুতিচাদর। কিন্তু ধুতিচাদরে পৃথিবী-পরিভ্রমণ চলে না। একথা সত্য যে, বাঙালী সুদীর্ঘকাল লোক-সভার আড়ালে ছিল,—আপনার গ্রামে আপনার চণ্ডীমণ্ডপেই তার দিন কেটেচে। এইজন্যে বাঙালী স্ত্রীলোক এবং পুরুষের চিরপ্রচলিত বেশভূষা পৃথিবীর জনসভার পক্ষে অত্যন্ত বেশি আটপহুরে। শুধু তাই নয়, বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার যোগ্য আমাদের কোনো আদবকায়দা নেই। এইজন্যে বাঙালী স্বভাবত উদ্ধত না হলেও বিনয়প্রকাশে সে অনভ্যস্ত, এমন কি, তাতে সে লজ্জা বোধ করে। এসমস্তই মানি, তবু কিছুতেই মানিনে যে আগাগোড়া ইংরেজ সাজলেই সমস্যা মেটে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলিয়ে নেওয়াই হচ্চে প্রাণের লক্ষণ। বাহিরের পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাও জড়ত্ব, আর সেই পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে স্বীকার করাও জড়ত্ব। অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি এবং সৃজনী-শক্তির সাহায্যে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' নেওয়াই হচ্চে যথার্থ আত্মরক্ষা। পূর্ব্বাপর আমাদের কোনো একটা জিনিষের অভাব যদি থাকে, তবে সেটাতে আমাদের দারিদ্র্য প্রকাশ পেতে পারে, তবু তাতে তেমন বেশি লজ্জা নেই; কিন্তু কোনোকালেই সে অভাব আমাদের নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে মেটাবার ভরসা যদি না থাকে তবে সেই চির অক্ষমতায় অগৌরবই দুঃসহ। একদিন আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি সংকীর্ণ ছিল, কারণ সে ভাষা কেবল ঘরের ভাষা গ্রামের ভাষা ছিল, এইজন্যে সে ভাষা বিদ্যার ভাষা ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত তারা অবজ্ঞা করে' বলেছিল বাংলা চিরকাল প্রাকৃতসাধারণের ভাষা হয়ে থাক্ আর নির্বিচারে ইংরেজি ভাষাকেই বিশিষ্টসাধারণে গ্রহণ করুক। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে, সেই অবজ্ঞা বাংলা ভাষা স্বীকার করে নি। বাংলা ভাষা বিদ্যার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠল। কেমন করে হল? আপনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে' নয়; নিজের মহলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে' আধুনিক কালের বিদ্যা ও ভাবকে দ্বারের বাহির থেকে বিদায় না করে' দিয়ে, তাদের সকলকে আতিথ্যদান করবার উপযুক্ত আয়োজন করে'—অর্থাৎ নিজের প্রাণশক্তির বেগেই বিশ্ববিদ্যা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করে। বীণায় সুর বাঁধবার সময় বেসুর অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সুর বাঁধবার ওস্তাদটি বেঁচে আছে, সেইটেই মস্ত আশার কথা। তেমনি আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের সময় আমাদের ব্যবহারে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নানা অদ্ভুত বিকৃতি দেখা দেবেই, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সজীব ওস্তাদের কাজ চলচে, সেই ওস্তাদ সমস্ত বিকৃতিকে ক্রমশই প্রকৃতির অনুগত করে' নেবেন। অতএব এইসকল উপদ্রবকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই, কেননা এ হল প্রাণের উপদ্রব। ভয়ের কারণ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জড়তা। সেই জড়তা পরের ধনে যতই গর্ব্ব করুক, তবুও তা জড়তা। যতক্ষণ নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে সৃজন করচে ততক্ষণ অন্যের তৈরি জিনিষ সেই সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে, —সেই-রকম গ্রহণ করাকে ভিক্ষা করা ধার করা বলে না। তাকেই বলে অর্জ্জন করা। সমস্ত মহৎ এবং প্রাণবান সভ্যতা বাহির থেকে সেই-রকম অর্জ্জন করে এবং করেচে। প্রাচীনকালে ভারতও তাই করেচে, যদি না করত তবে লজ্জা বোধ করতেম। শক্তিস্বাতন্ত্র্য অভ্যাবশ্যক জিনিষ নয়—অর্থাৎ প্রাণপণে পরের পন্থা বাঁচিয়ে চলাই ওরিজিন্যালিটি নয়—উপকরণ ঘরের হোক্ আর বাইরের হোক্ সমস্তই নিজের প্রকৃতিসঙ্গত করে' নেবার শক্তিকেই বলে শক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বাহিরের জিনিষ নির্বিচারে নকল করাও যেমন দীনতা, বাহিরের জিনিষ নির্বিচারে বর্জ্জন করাও তেমনি দীনতা। দুইয়েতেই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, আজ্‌কের দিনে বিশ্বের সঙ্গে বাংলা দেশের যে সম্বন্ধস্থাপনের কাজ চলচে তার প্রত্যেক অঙ্গেই আমাদের নিজের পূর্ণ জাগ্রত সৃজনীশক্তির পরিচয় থাকা চাই। এই সৃজনের মানেই হচ্চে বাহ্য উপকরণকে নিজের আন্তরিক নিয়মের অনুগত করা, অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাই এই জাহাজে যখন কোনো বাঙালী-সাহেবকে সগর্ব্বে পদচারণ করতে দেখি, তখন সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করি।—আবার যদি দেখতুম কোনো বাঙালী খালি গায়ে কাঁধের উপর একখানি চাদর ঝুলিয়ে এবং ফিন্‌ফিনে ধুতি পরে' অবিমিশ্র স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যে ডেকের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সমুচ্চস্বরে হাই তুলচেন, তাহলেও সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করতুম।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ)

—

শিল্পে সাময়িক প্রভাব।

সব দেশে দেখা যায় যে কবিরা কখন কখন তাঁদের দেশের সাময়িক জীবনের চিত্র এঁকে থাকেন, কিন্তু চিত্রকর বা ভাস্কর তাঁর সমকালের জীবনের সঠিক চিত্র প্রায়ই আঁকেন না। শিল্পীরা চান

তাঁদের শিল্পকলার রূপরেখার সাহায্যে চিরন্তন ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে। অস্বাভাবিক বা অস্থায়ী অর্থাৎ যেগুলি চিরন্তন নয় একপ বেশভূষা, ও আসবাবপত্রের স্থূলতা দ্বারা শিল্পকলাকে তাঁরা কলঙ্কিত করতে চান না। ইউরোপের ও ভারতের প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ভাবপ্রধান চিত্রে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা তাই হাল-ফ্যাসানের কোট-প্যাণ্টের ইস্ত্রীকরা হাঁটের কাপড়পরা নব্যজীবনের চিত্র না এঁকে প্রাচীন রোমীয় টোগা-পরিহিত বা একেবারে নগ্ন মূর্ত্তিই গড়ে থাকেন। তার কারণ হচ্চে যে আধুনিক অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ভাব দেখাতে গেলে ছবিতে চিরন্তন ভাব দেখানো যেতে পারে না।

চিত্রকরের বেশীর ভাগ নৈসর্গিক ছবি এঁকে থাকেন। কেন না তাঁরা জানেন যে মানুষের জীবনের চেয়ে এগুলি একই ভাবে অবস্থান কাল থেকে রয়ে গেছে।

ইউরোপীয় শিল্পীরা যেমন আধুনিক কালের মনুষ্যজীবনের সঠিক ছবি আঁকা যেতে পারে না বুঝেছেন, আমাদের দেশের শিল্পীরাও যদি ঠিক তাই বুঝে থাকেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমাদের দেশের আধুনিক সভ্যজীবনের চিত্র আঁকতে গেলে ছবিগুলো এত বেশী উদ্ভট রকমের হয়ে পড়ে যে তাকে ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আধুনিক কালের বিবাহে টোপর ও বেনারসী ধুতি-চাদরের পরিবর্ত্তে যাত্রার দলের জরিজড়োয়ার কিম্ভূতকিমাকার 'বরের পোষাক ভাড়া' করে পরার রেওয়াজ হয়েছে। এমেটিলিন গ্যাস জ্বালিয়ে কেবল সহরে কেন ঘোরতর প্রাচীন হিন্দুপল্লীতেও মোটরগাড়ীতে বর গুভযাত্রা করচেন। সব দেশে সভাসমিতিতেই মানুষের ভদ্রবেশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।

যদি কোন চিত্রকর আধুনিক কালের বাঙলার সভ্যতার সঠিক চিত্র আঁকতে যান, তাহলে যে কি বিভ্রাট হয়, একবার ভেবে দেখুন যে-সব বিলাতি ফ্যাশানের টেবিল চেয়ার আসবাবপত্র কুৎসিত বলে লোকে বর্জ্জন করেচে, আমাদের দেশের সভ্যসমাজের ঘরে ঘরে সেগুলি বিরাজ করচে বীণার জায়গায় হারমোনিয়াম, গায়কের স্থানে গ্রামোফোন আসর জমকে বসে আছে। এসব ছাড়া বিলাতী ফ্যাসানে চুল ছাঁটা, চশ্মা চোখে দেওয়া, চুরুট মুখে রাখা, বিলাতি ধরণের বাড়ীতে বাস করা প্রভৃতি অনেক ফ্যাসাদ আছে। হাল-ফ্যাশানের মেয়েদের জ্যাকেট-সেমিজের বাহারও কোনকালে কোন চিত্রকরের কাছেই চিত্রের বিষয় হতে পারে না। এগুলির কোনটাও বাঙলাদেশের চিরন্তন ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব এইগুলিতেই কি শিল্পীরা চিরন্তনের ছাপ দেবেন? এবং শিল্পীরা কি এইগুলিকেই পাকা করে ভবিষ্যতের জন্যে শিল্পকলায় গেঁথে রেখে যাবেন? এই জন্যেই আধুনিক হলেও আমাদের দেশের আধুনিক যুগের চিত্রকরেরা এগুলিকে চিত্রে স্থান দিতে পারেন না; তাই কাল্পনিক জগতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়।

অবশ্য আধুনিক জীবনের চিত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশের থিয়েটারের ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে, প্রবন্ধলেখকের "বিধবা বধূ ও সধবা শাশুড়ী" "বিধবাসক্ত" "রুগ্নী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রে, গগনেন্দ্রনাথের "বিরূপবজ্র" ও "অদ্ভুতলোক" নামক দুটি ব্যঙ্গচিত্রের পুস্তকে এবং যতীন্দ্র, চঞ্চল, বীরেশ্বর প্রভৃতি নবীন শিল্পীদের আঁকা মাসিকপত্রিকাদির ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে বেশ কোটানো হয়েছে। কিন্তু চিত্রকলার জগতে এগুলির স্থান কতটুকু?

আধুনিক সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি শিক্ষিত সভ্যসমাজ, অপরটি অশিক্ষিত পল্লীসমাজ। এই পল্লীসমাজই আপনা-কৃত স্থায়ী ও চিরন্তনভাবে বর্ত্তমান। আধুনিক কালে এই সমাজে আবহমানকাল থেকে যে-সব আচার পূজাপদ্ধতি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ একভাবে চলে আসচে তার সম্বন্ধেই (ডাকা ছবোটা বাদে) ছবি আঁকা যেতে পারে। সেখানেই চিত্রটি ঠিক্ আমাদের সাময়িক ছবি না হয়ে চিরন্তন হয়েই ফুটে ওঠে।

আমাদের বাঙলাদেশের চিত্রকরেরা সেইজন্যেই প্রথমত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চিত্র এঁকেছেন। তার পরে আধুনিক কালের ছবি এঁকেছেন—কিন্তু সেগুলি আধুনিক কালের সভ্যসমাজের ছবি কোনোবারেই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতা" "শেষ বোঝা" "কলঙ্কের বোঝা"; নন্দলাল বসুর "ভগাই মাধাই" "কুমারী পূজা" "গোকুল ব্রত" "পৌষপার্ব্বণ"; লেখকের "প্রণাম" "সাঁঝ" "নতুন আলো" "নূপুর"; সুরেন্দ্রনাথ করের "প্রবধূ" "সাথী" "পথের ধারে"; গগনেন্দ্রনাথের পল্লীদৃশ্যাবলী ও "মন্দিরদ্বারে প্রতীক্ষা" "গ্রাম চিৎপুর রোড" প্রভৃতি আরো অনেক ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছবির প্রকাশ তার বাইরের আকার থেকে। তাই তাকে প্রথমে চোখে দেখতে হয়, তারপর তার ভাব মনের ভিতর সাড়া দেয়। কিন্তু কাব্যে কবির ভাব চোখ দিয়ে ধরা যায় না। সেটা পাঠকের বা শ্রোতার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়ভাবে একটা চিত্র এঁকে নিয়ে থাকে। পাঠক সে চিত্রের সঠিক কোন মূর্ত্তি দিতে পারেন না। এইজন্যেই ছবিতে যে-সব বস্তু চোখে পড়বামাত্রই মনকে পীড়া দেয় এমন জিনিষও কবির বর্ণনাতে পাঠকের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব এনে দিতে পারে। "চন্দ্রবদন" কথাটি কবির মুখে শুনলে একটি সুন্দর অবর্ণনীয় মুখশ্রীর কথাই আমাদের মনে আসে। কিন্তু ঠিক্ এই চন্দ্রবদন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ চাঁদের মত করে মুখ এঁকে কোন শিল্পী যশস্বী হতে পারেন না। 'যাঁহা যাঁহা তরল নিলোকন পড়ই, তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই"—এ ছত্রে কবি প্রেমিকের যে নীল স্নিগ্ধ চাউনির ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা তিনি কবি বলেই দিতে পেরেছেন। ছবিতে চোখটাকে নীলোৎপলের নীল রঙ দিয়ে পদ্মাকারে গড়লে কখনই এই ভাবটি ফুটতো না। তখন নীল পদ্মাকারে আঁকা চোখটা "সোনার পাথর-বাটির" মত অসম্ভবই ঠেকতো। বাক্যের একটি ইঙ্গিতে কবি যে ভাবটি ফোটাতে পারেন, রেখার টানেতে তা ঠিক সেই ভাবেই যে ফুটে উঠবে এরূপ ভাবা ভুল। কোন কবিকে যদি বর্ণনা দ্বারা কোন ছবি সঠিক ভাবে চোখে ধরে দিতে বলা হয়, তা হলে ভাষায় ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি যেরূপ অসুবিধায় পড়বেন, কোন চিত্রকরকে যদি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গো আকুল করিল মোর প্রাণ" ঠিক এই কথাগুলির ভাবটিকে চিত্রের মধ্যে দেখাতে আদেশ করা হয়, তাহলে তিনিও সেই-রকম অসুবিধায় পড়বেন। আবার একজন চিত্রকর ইচ্ছাক্রমে কোন নৈসর্গিক চিত্রে আকাশটাকে সবুজ এবং তৃণলতাকে প্রয়োজন-মত কালো আঁকতেও পারেন, কিন্তু কবিকে সেই নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনার দ্বারা দেখাতে বলুন আকাশটাকে আকাশের রঙে, ঘাসটাকে ঘাসের বর্ণে না বর্ণনা করতে পারবে না।

যখন কোন কবি আধুনিক কালের মাতৃত্বের ছবি কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখন তিনি মায়েরা জ্যাকেট বা সেমিজ পরে আছেন কি না বর্ণনা না করেও আধুনিক যুগের সভ্য-মাতার চিত্র আঁকতে পারেন। কিন্তু এখনকার কালের সভ্য-মায়ের চিত্র আঁকতে গেলে চিত্রময় ছবিতে হাল ফ্যাশানের জ্যাকেট বা লেসপেড়ে সাড়ী না আঁকলে চলে না। মায়ের চিত্র মায়ের অবয়ব না এঁকে ছবিতে দেখাতে পারা যায় না। কাজেই আধুনিক সভ্য সমাজের জ্যাকেট-পরা মা না এঁকে যেখানে দেশের ভিতর চিরস্থায়ী ভাব রক্ষা করা হয়ে আসচে, সেই অশিক্ষিত পল্লীসমাজের মাতৃমূর্ত্তিই শিল্পী আঁকবেন—সেটাকে এমনি

পারবে, আবার প্রাচীন যুগের বা ভবিষ্যতেরও বলা চল্‌বে। শিল্পীর উদ্দেশ্য চিরন্তন সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলা। কাজেই আধুনিক কালের জীবনযাত্রার ভিতর যা অস্থায়ী এবং অসুন্দর তিনি তা বাদ না দিয়ে থাক্‌তে পারেন না।

প্রাচীন কালের আঁকা যে-সকল ছবি আমরা এখন দেখ্‌তে পাই, সেগুলিও ঠিক তখনকার দিনেরই যে সঠিক ছবি তা বলা যায় না।

সব সময়ে সব দেশে শিল্পীরা ব্যক্তিগত ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যা রচনা করেন তাতে একটি চিরন্তনভাব মূর্ত্তি পায়। এতে যদি তাঁরা কোন ঐতিহাসিকতা রক্ষা করতে যান, তা হলে এক এক সময়ের শিল্পকলা এক একটা উদ্ভট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোন রসই থাকে না। সাময়িক ভাব বা ঘটনাকে ছবিতে জীবন্ত করে ধরে রাখ্‌তে গেলে ছবিটি সেই সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের সহায় হয় বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ভাব তাতে না ফোটারই কথা। সেখানে ছবিটি একটা সাময়িক রেকর্ড স্বরূপ হয়ে পড়ে। ফটোগ্রাফী আজকালকার দিনে চিত্রকলার ঐদিকের কাজ সহজেই সম্পন্ন করচে।

জাতীয়তা, ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়েও শিল্পীদের কেবল বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। তাতে খালি একটা সাম্প্রদায়িক শিল্পকলা গঠিত হতে পারে—খুব উঁচুদরের কিছু গড়ে উঠ্‌তে পারে না।

যেখানে অশিক্ষিত পল্লীসমাজের ভিতর চিরন্তন সরল ভাবটি ফুটে আছে, সেইখানেই শিল্পীরা চিরসুন্দরকে দেখ্‌তে পান, কিন্তু যেখানে বৈদ্যুতিক আলোক ও সোডা-বরফের রেওয়াজ সেই উচ্চশিক্ষিত সভ্যসমাজে তাঁরা কোনই মাধুর্য্য দেখ্‌তে পান না। শিল্পীরা আধুনিক চাষা কোল-সাঁওতাল আঁকতে কুণ্ঠিত নন; কিন্তু আধুনিক সভ্য ধনীর বা গৃহস্থের চিত্র এঁকে চিত্রকলাকে ব্যর্থ কর্‌তে চান না। সব দেশের চিত্রকরের চিত্রে তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে-সঙ্গেই দেশীয় বা প্রাদেশিক ভাব সহজেই আপ্‌না থেকেই ফুটে ওঠে, সেজন্যে বিশেষ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। দেশের বিশেষত্বটি দেশের আব্‌হাওয়ায় এবং অস্থিমজ্জাতেই রয়েচে, তার উৎকর্ষ বাইরের দিক থেকে না কর্‌লেও চলে। চিত্রের বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন দেশের চিত্রকরেরাই বুঝে নেবেন, তার জন্যে নতুন কিছু বল্‌বার নেই।

(শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

—

বঙ্গসাহিত্যে নারীসমস্যা।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবাহ, হিন্দু সমাজের 'সনাতন' গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আমাদের অনেক প্রাচীন আদর্শ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে,—এই অভিযোগ আজকাল অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে। আর এই আদর্শের কথা উঠে প্রধানতঃ সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান লইয়া। সনাতন-পন্থী বলিতেছেন, তোমরা এ করিতেছ কি? পশ্চিমের উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের দেবীপ্রতিমা নারীদের মধ্যে আনয়ন করিয়া সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছ। যাহারা এতদিন 'শান্তমুখে বিছাইয়া কোমল নির্ম্মল' স্নেহের অঞ্চলে আমাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিয়াছে তাহাদিগকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিদ্রোহভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছ? নারীজাতিকে লইয়া এতদিন কোন সমস্যা আমাদের সমাজকে চঞ্চল করে নাই। এখন তোমাদের কৃপায় তাহারও সূচনা হইয়াছে। সতী-সাবিত্রী-সীতার দেশে নারীর হৃদয়স্বর্গ হইতে দেবভাবসমূহ বিতাড়িত হইতেছে এবং তাহার স্থানে অসুরের তাণ্ডবনৃত্য সুরু হইয়াছে। এই জন্যই ত আজকাল বঙ্গরমণীর আত্মহত্যা একটা ভীষণ সংক্রামক রোগের আকার ধারণ করিয়াছে।

এই অভিযোগের মূলে যদি প্রকৃত সত্য থাকিত তাহা হইলে নব্য সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যমূলক ভাবধারা প্রতিরোধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মহত্যা-রোগের কারণ আধুনিক সাহিত্যের স্কন্ধে আরোপ করিলে চলিবে না। পুরুষের কোঁচায় আগুন না লাগিয়া মেয়েদের সাড়ীতে লাগে কেন—তাহার কারণ সাহিত্যে নয়, সমাজেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর সত্যই কি আমাদের কোন নারীসমস্যা নাই? যখন বাঙ্গলার বিবাহের জন্য স্বল্পবিত্ত গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়, যখন বালবিধবাদের দুঃখকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত এবং নানা কারণে এই সীতাসাবিত্রীর দেশেও পতিতা নারীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তখনও কি বলিব যে আমরা বেশ ছিলাম, এই সাহিত্যিকগুলাই যত নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে? ইঁহাদের অপরাধ এই যে সমাজের অত্যাচার ও অবিচারসমূহ সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, আর কেহ কেহ বা সত্য ও ন্যায়মূলক নূতন সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন।

তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সমস্যাটা যে একরূপ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। য়ুরোপে—বিশেষতঃ বিলাতে—বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহা নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য, সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইবার জন্য। কিন্তু এই সাম্য ও সমকক্ষতা রাজনীতিক্ষেত্রেই সাধিত হইয়াছে। য়ুরোপের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বার্ণার্ড-শ পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রচার করিতেছেন—'যতদিন না এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার—স্ত্রীজাতির এই পুরুষের অধীনতা,—দূরীভূত হইতেছে, ততদিন পারিবারিক-জীবন মহনীয় হওয়া ত দূরের কথা, কখনও অনুমোদনযোগ্যও হইবে না।' সামাজিক জীবনে ব্যাপার আরও গুরুতর, আরও জটিল। বিবাহ, ডাইভোর্স, অমূঢ়া জননী—এই-সব সমস্যা লইয়া ইংরেজ-সমাজ বিষম চঞ্চল। সতীত্ব ও নারীধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ সমাজের এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ত ভাসিয়া যাইতেছেই; আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, 'যতদিন নারী তাহার নারীত্বটুকু সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে না পারিতেছে, ততদিন না সে স্বামীপুত্র, সমাজ ধর্ম্ম, এক কথায় সমস্ত কর্ত্তব্য হইতে নিজেকে সরাইয়া লইতে পারিতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই। অতএব হে নারি, তুমি তোমার নারীত্ব ভুলিয়া যাও এবং কর্ত্তব্যের মুখে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনা হও।' আজ পাশ্চাত্যসমাজে নারী-মণ্ডলী এই অসাধ্যসাধন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং সেখানকার নারীসমস্যা যে ঘোরতররূপে জটিল তাহাতে আর সন্দেহ কি!

বড় জাতির এইসকল বড় বড় সমস্যা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যখন আমাদের নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রথমটা মনে হয় আমরা বেশ আছি, আমাদের গৃহে সুখ ও সমাজে শান্তি আছে, আমাদের রমণীরা সতীশিরোমণি এবং পাশ্চাত্য নারীদের কাহিনী শুনিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠে। কিন্তু যদি বহুকালের সংস্কারবশে আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পরক্ষণে আমাদের ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং বুঝিতে পারিব যে আমাদের এই স্বার্থপ্রণোদিত আত্মপ্রসাদের মূলে খুব বেশী সত্য নাই। আমাদের দেশেও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। সে সমস্যা অবশ্য জীবনের চাঞ্চল্যে ও স্বাধীনতার উদ্দামতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নহে, তাহাতে মৃত্যুর অসাড়তা ও বন্ধনের নির্জ্জীবতা দেদীপ্যমান, মৃতবৎ নারীসমাজ ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার বুকের

উপর শ্মশানকালীর তাণ্ডবনৃত্য হইতেছে। আর আমরা একদিকে স্ত্রীজাতির বন্দনা গাহিতেছি, অপর দিকে আবার এই আদর্শ-বধূ গৃহে আনিবার সময় তাহার দরিদ্র পিতার ভিটামাটি উৎসন্ন দিয়া আমরা ঐ শ্মশানকালীরই তুষ্টি সম্পাদন করিতেছি।

আমরা যতই কেন জোর গলায় প্রচার করি না যে, আমাদের ন্যায় নারীর সম্মান করিতে অন্য কোন জাতি জানে না, তথাপি উহা অর্দ্ধেক সত্য মাত্র। কারণ প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে নারীর যত অসম্মান হইয়াছে তত বোধহয় অন্য কোন দেশে হয় নাই। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীপূজা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্ত্রীজাতিকে স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত করিয়া এবং অন্যান্য নানারূপ হীনত্বব্যঞ্জক বিধি-ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট অপমানও করা হইয়াছে। আর প্রাচীন সাহিত্যে আমরা কি দেখি? রাজাদের পক্ষে বহুপত্নীত্ব ছিল সাধারণ নিয়ম। আর স্ত্রী যে স্বামীর সম্পত্তিতে গণ্য হইত তাহার প্রমাণ মহাভারতে রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন। তারপরে, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে যে-সব কথা নানা উদ্ভট শ্লোকে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচারিত তাহার উল্লেখ না হয় নাই করিলাম। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই নারীকে যখন নরকের দ্বার বা মূর্ত্তিমতী লালসারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে দেখিতে পাই, তখন তাহা ত উপেক্ষা করিতে পারি না। বৌদ্ধ জাতক ও অবদানগুলিতে নারীচরিত্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করা হইয়াছে। আর শঙ্করাচার্য্যের 'দ্বারং কিমেতন্নরকস্য?' নারী, গোঁসাই তুলসীদাসের 'ঢোল গবাঁর পশু শূদ্র নারী, যে সব তাড়নের অধিকারী' প্রভৃতি উক্তিসমূহ আমাদের নারী-সম্মানের জলন্ত উদাহরণ। পরিশেষে আমাদের স্ত্রীজাতিকে অবরোধের মধ্যে পুরিয়া তাহাদের প্রতি যে আদর ও বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছি, তাহারও তুলনা এক মুসলমান সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে না!

বঙ্গসমাজে নারীজাতির এই অত্যধিক হীনাবস্থা সর্ব্বপ্রথমে কবি মেঘচন্দ্রের লেখনীতে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কিরূপ পদার্থে পরিণত হইয়াছে তাহা যেমন তিনি দেখাইয়াছেন, অপরদিকে তেমনই আবার 'দুরাচার হিন্দুকুলজা' যে 'রমণী বধিছে পিশাচ হয়ে' তাহার চিত্রও উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। বিধবার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, আবার বঙ্গরমণীর উপাধি-প্রাপ্তিতে আনন্দে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে-সকল নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহাদের উপর পাশ্চাত্যপ্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই পড়িতেছিল। যে দেশে পাতিব্রত্য শিক্ষা দিবার জন্য লক্ষ্মীরার উপাখ্যান প্রচলিত, সেই দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লোকে দেখিল যে স্বামী অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে স্ত্রী তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। শুধু তাহাই নহে। স্বামীর ভালবাসা হারাইয়া ভ্রমর মৃত্যুমুখে পড়িল, সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিল, কুন্দনন্দিনী বিষপানে আত্মহত্যা করিল। যে দেশে স্ত্রীকে সকল অনাদর ও অত্যাচার সহ্য করিয়া 'পতিদেবতা' পরায়ণা হইয়া থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইহাই যেখানে সমাজের প্রথায় পরিণত হইয়াছিল, সেখানে নারীর উক্তরূপ আচরণ যে সমাজ-হিতৈষী পুরুষবর্গের বিশেষ অনুমোদনযোগ্য হয় নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশে যে নূতন ভাববন্যা আসিয়াছিল তাহাতে যখন হিন্দুসমাজের অনেক 'সনাতন' প্রথাই ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাহিত্যিক অত্যাচারটুকুও সমাজ সহিয়া গেল; এমন কি ক্রমে তাঁহার অঙ্কিত নারীচিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াও মানিয়া লইল।

কিন্তু সাহিত্যের কাজ এইখানেই শেষ হইল না। শুধু স্বামীর ভালবাসা পাইলেই যে নারীজীবনের পূর্ণ সার্থকতা হইল তাহা নহে। নারীরও যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সমাজ বা স্বামী তাহাকে যেরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে চায় সেইরূপে গঠিত হইয়া উঠাই যে তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন নয়, নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মোন্নতির প্রয়াসে যে সকলেরই সমান অধিকার, এই কথা প্রচার করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' গল্প ও উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাজ এ কথা শুনিবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, কখন নারীর যে একটা স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে স্বরূপ বিস্মৃত কথা হিন্দুসমাজ কখনও শুনে নাই। কাজেই সাহিত্যজগতে এই বিষয় লইয়া খুব একটা আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। ইহাতে অবশ্য কোন ফল হউক বা না হউক, নিদ্রিত সমাজের সুখনিদ্রায় যে অনেকটা ব্যাঘাত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এদিকে কিন্তু সাহিত্যে এই নূতন ভাবের স্রোত অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গও গুরুর কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং সনাতনপন্থী যে বিশেষ ভীত হইয়া পড়িবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু আমরা মনে করি ইহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। একটু উঁচু গলায় পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচারের ফলে স্বার্থপর বা উদাসীন সমাজের যদি একটুও চৈতন্য হয়, যদি পুরুষ আপনার নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কবির কথায় সায় দিয়া বলিতে পারেন—

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক্! ধিক্! অধম নাজালি!
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চুনকালী!

তাহা হইলে আমরা মঙ্গলের পথেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব। স্ত্রীজাতি-সংক্রান্ত সমস্ত সংস্কারের গোড়ার কথাটাই এই-সকল সাহিত্যিক আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যতদিন আমরা নারীজাতিকে প্রকৃত সম্মানের চোখে দেখিতে না শিখিব, ততদিন শুধু যে বঙ্গ-রমণীর উন্নতি অসম্ভব তাহা নহে, হিন্দুসমাজের মঙ্গল নাই।

(পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সাহিত্য ও সমাজ।

যে অনভিভাবনীয় শক্তি ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি আজকালের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখার ভিতর দিয়ে—বাংলাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে, তাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমাদের সকলের আছে কি না এতে যথেষ্ট সন্দেহ এসে পড়েছে।

সকল দেশের সাহিত্যেই এমন কতকগুলি উপন্যাস আছে, যা কে ইংরেজি ভাষায় Problem novels বলে। বাংলায় এর তর্জ্জমা করতে হলে একে 'সমস্যামূলক উপন্যাস' বলতে হয়ে। এই ধরণের উপন্যাসের সৃষ্টি অতি অল্পদিন হল আমাদের সাহিত্যে সুরু হয়েছে। সমাজের ভিতর থেকে যখন আঘাত একেবারে হঠাৎ আমাদের হৃদয়ের উপর এসে পড়ে, আর তার প্রতিক্রিয়ার মত আমাদের মনে যখন ফিরে আঘাত করবার জন্য চিরপুরাতন সংস্কারগুলি নিয়ে একটা বোঝাপড়া করতে চায়, তখনকার সেই দ্বন্দ্ব নিয়েই সমস্যামূলক উপন্যাসের প্রাণ গঠিত হয়েছে। জীবনের পথে চলতে চলতে যে সমস্যাগুলি আমাদের কাছে সামাজিক জীব হিসবে সত্য হয়ে উঠে, তার সমাধানই এ-প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এ-রকম লেখার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটা সবচেয়ে পাকাপাকি হয়ে পড়ে।

সমাজের সব-চাইতে বড় প্রশ্ন এই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ, দাম্পত্যপ্রেম। একেই ভিত্তি করে সমাজসৌধ দাঁড় হয়ে আছে। পাশ্চাত্য সমাজে এই সম্বন্ধটা নিয়ে নানা-প্রকার সমস্যা নানাপ্রকার প্রশ্ন জেগে উঠেছে। তাই আজ চারিদিকে আমাদের জীবনের সত্যকে আবৃত করে ফুলের পাপ্‌ড়ির মত যে সংস্কারগুলি বিকশিত হয়ে আছে, সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরাবরণ উজ্জ্বল সত্যকে গ্রহণ করবার শক্তির পরীক্ষা চলেছে।

যাঁরা কল্পনার রঙীন আলোকে জগৎটা দেখে থাকেন, তাঁরা জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যে আনন্দ পান সত্য—কিন্তু সাদা আলোক-ভরা আসল জগৎটার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় কখনও ঘটে না। পল্লীর ছায়া-শ্যামল, পাখীর ডাকে মুখরিত কুঞ্জবন, দীঘির কালো জল, আর মৃদু বায়ুস্পর্শে হিল্লোলিত শস্যভরা ক্ষেতগুলি, প্রচুর স্বাস্থ্যসম্পদ-যুক্ত সরলতা-মাখান পল্লীবাসীগণ আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছে বটে, কিন্তু কল্পনার এই মোহন চিত্রের সঙ্গে আসল পল্লী-গ্রামের বাস্তব চিত্রটার বৈষম্য কতটা বেশী তা আজকাল পল্লীগ্রামে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের বুঝতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না। পল্লীবাসীর সরল জীবনের ও চরিত্রের মধুর সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণে সুখ এনে দেয় বটে, কিন্তু "পল্লীসমাজের" নগ্ন-কদর্য্যতা বেদনার সঙ্গে করলেও তাকে মিথ্যা বলে উপেক্ষা করতে ত পারছি না। বরং বলব যে আমাদের এই যুগের পল্লীর চিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে অনেকটা শরৎবাবুর "পল্লীসমাজে", অন্ততঃ পল্লীবাসীর জীবনের দিক হতে।

আমরা বড়াই করে বলে থাকি যে আমাদের বাঙালীর জীবনে দাম্পত্যপ্রেমটা একটা তপস্যার সামগ্রী। নারীজাতির পক্ষ হতে এই দাম্পত্যসম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা হয়ে থাকলেও পুরুষের দিক দিয়ে একে যে কতটা অমর্য্যাদা করা হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। শুধু ভাবের ঘোরে বসে থাকলে ঘুম বা আবেশ আসে সত্য, আর তাতে কোরে পারমার্থিক তত্ত্ব জানা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু এটা জোর-গলায় বলতে পারি যে পার্থিব বস্তু জানবার পক্ষে এটা একেবারেই বাঞ্ছিত অবস্থা নয়। দেখতে পাওয়া যায় সমাজের নিম্নস্তরে বিধবা স্ত্রীলোকের আজীবন বৈধব্য-ব্রতপালন খুবই কম, তাদের মধ্যে ফিরে বিয়ে করবার নিয়ম প্রচলিত আছে। আর আমাদের দেশের বিপত্নীক পুরুষরা সমাজশাসকদের চোখে অলঙ্কার শাস্ত্রের কবির মত 'নিরঙ্কুশ'। বিপত্নীক পুরুষের দারান্তর গ্রহণ আমাদের সমাজে এতটা স্বাভাবিক ও সাধারণ হয়ে পড়েছে যে, আমরা এখনও ভাবতে শিখিনি,—১৯।২০ বছর এক স্ত্রীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে তার মৃত্যুর ২।৩ মাস হতে না হতেই তার স্মৃতিটা মুছে ফেলে সে জায়গায় অন্য একজনকে এনে বসান আর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তি করা কতটা গর্হিত। আমাদের সমাজে এ-প্রকার ঘটনা অহরহ ঘটছে। এখানে আমার বক্তব্য এই নয় যে বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে আজীবন বৈধব্যপালনই শ্রেয়স্কর কিম্বা বিপত্নীক পুরুষের পক্ষে পত্ন্যন্তর গ্রহণটা একটা অন্যায় ব্যাপার। আমি বলছি যে—যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম গড়ে উঠেছিল সেখানে কি স্বামীর পক্ষে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কিম্বা স্ত্রীর পক্ষে অপর স্বামী গ্রহণ সম্ভব হত? শুধু স্ত্রীর অপরিমেয় ভালবাসাতে দাম্পত্যপ্রেম হয় না; স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই দাম্পত্যপ্রেম। যদি আমাদের দেশে এ-রকম ব্যাপার নিয়ত ঘটে থাকে, তবে দাম্পত্যপ্রেম যে আমাদের দেশে ও সমাজে তপস্যার জিনিষ হয়ে উঠেছে তা কি করে বলব?

এই যে আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধটাকে সংস্কারহীন করে দেখবার একটা চেষ্টা চলেছে, যার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"তে আর শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"তে এই ভাবের একটা সুস্পষ্ট রেখাপাত দেখতে পাচ্ছি, একে পাশ্চাত্য সাহিত্যের "নকলবাজি" বলবার মত সাহস আমাদের একেবারেই নেই। আজ ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশবাসীর প্রাণে যে ভাবের প্রবাহ এসেছে, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির দিকে যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এই অনুসন্ধিৎসা, এই বিপুল আশা, সত্যকে আবরণহীন করে দেখবার চেষ্টা তারই অভিব্যক্তি বলে আমার মনে হয়। প্রতি জাতির সমাজে ও সাহিত্যে Time Spirit নামে একটা শক্তি কাজ করে থাকে। কোন বড় সাহিত্যিকই যুগধর্ম্মের প্রভাব হতে নিজকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে পারেন তাতে সন্দেহ। আগেকার দিনে যখন পৃথিবীর একজাতির সঙ্গে অপর জাতির, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের মেলামেশা এত সহজে ও এত গভীর ভাবে ঘটত না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের যুগধর্ম্ম প্রকাশ পেত। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইউরোপীয় সাহিত্যে ও সমাজে যে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল, তা কি আমাদের সেই-সময়কার সমাজে কিম্বা সাহিত্যে একটুও চঞ্চলতার হিল্লোল তুলতে পেরেছিল? বোধ হয় একটুও পারেনি। কিন্তু আজকাল যদি এই-রকম একটা ভয়ানক ব্যাপার কোন সভ্যদেশে ঘটে, তবে আমাদের গায়ে যে আঁচড়টি লাগবে না তা মনে করা প্রকাণ্ড ভুল। যতই সভ্যতার বিস্তার হচ্ছে, ততই সকল দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলেছে। কালিদাসের সময় কালিদাস যা লিখেছিলেন, তাঁর মেঘদূত, শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি এগুলি ছিল এক ভারতের সম্পত্তি; কিন্তু এই যুগের রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি সকল দেশের ও সকল জাতির। এই ভাবে সকল পৃথিবীটাই একটা বিশাল পরিবারে বা গৃহে পরিবর্ত্তিত হতে চলেছে। এজন্যই আমার মনে হয় যে, পশ্চিমের ইব্‌সেনীয় সাহিত্য আর আমাদের দেশের এই নূতন সাহিত্য একই-রকম চিন্তার বা যুগধর্ম্মের ফল।

সমাজ একটা প্রকাণ্ড শক্তি। যেখানে শক্তি আছে সেখানেই গতি আছে। যুগের পর যুগ চলেছে, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নানা-প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ আপনাকে প্রকাশ করছে। আজ যে, দেশের মধ্যে নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব হচ্ছে, তাকে প্রদীপ নিবাবার পূর্ব্বে মরণ-শিখা বলে ভুল করবার কোন কারণ নেই। এ সত্যই নবজাগরণ। অল্প কয়েক দিন হল বাঙালী ইউরোপীয় সমরলীলার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আজ সে 'হোমরুল' পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ বিবাহ প্রচার চেষ্টা, আরও কত-প্রকারের পরিবর্ত্তন আজ এদেশে সম্ভব হয়ে উঠেছে। একে কি জাগরণ ভিন্ন আর কিছু বলতে পারি? আমরা এখন বুঝতে পেরেছি, যে যুগ এখন এসেছে সে যুগের মত করে সমাজকে ও জাতিকে না গড়তে পারলে আমাদের রক্ষা পাওয়া দায় হয়ে উঠবে। তাই আজ পুরাতন সংস্কারগুলিকে জ্ঞানের ও বিচারের কষ্টিপাথরে পরখ করতে ইচ্ছা জেগেছে। তাই আজ পুরাতন আদর্শ-গুলিকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্য বাঙালী এত উৎসাহিত।

এ যুগের বাঙালীর সঙ্গে আগেকার যুগের বাঙালীর তুলনা করলে আমরা অনেকটা ব্যবধান দেখতে পাব। যাঁরা যে-কোন-প্রকার পরি-বর্ত্তনকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকেন, তাঁরা ভাববেন যে "এ কি নবজাগরণ, না অন্তিম চীৎকার?" এ যুগের আদর্শ সকল-প্রকার স্বাধীনতা লাভ—চিন্তার স্বাধীনতা, কর্ম্মের স্বাধীনতা। এ যুগটা আমাদের পক্ষে "An age of rationalistic iconoclasm"—এ ভাঙ্‌বার যুগ। যেদিন জ্ঞানের ও বিচারের মাপদণ্ডে পুরাতন আদর্শ-গুলি আমাদের জীবনের পক্ষে অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবে, সেদিন

তাকে সরিয়ে দিতে, ভেঙ্গে ফেলতে কোন কষ্টই বাঙালী অনুভব করবে না। কালে ও প্রকৃতির ধ্বংসাবশেষ হতে যে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি হবে এতে কোনই ভুল নেই। গতানুগতিক চিন্তার পথ ও যুক্তিহীন সংস্কার আর আমাদের প্রার্থিত নয়, আমরা চাই শুধু যুক্তির বাধাহীন সরল উদার প্রান্তর। এই যে স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের প্রাণ পরীক্ষা করবার ইচ্ছা জেগেছে, এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যদি বাঙালীর ঘরের সুখ শান্তি একটা মিথ্যাভিত্তির উপর দাঁড়ি হয়ে থাকে, সেই সুখশান্তির উপর আমি একটুও শ্রদ্ধাবান নই। এই মিথ্যাকে দূর করে দেবার জন্য যদি কয়েকটা দিনের মত কোন পরিবারে একটা অশান্তির দানব এসে উপস্থিত হয়—তাও আজ আমরা স্বীকার করব। আর যদি এতে যথার্থ সত্যই থাকে, তবে তার উজ্জ্বল জ্যোতি, যা এখন আমাদের চোখে পড়ছে না, তা উজ্জ্বলতর হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এ কি আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নয়?

আমাদের সমাজের এই ভাব থেকেই আমাদের সাহিত্যেও এই নূতন-রকমের একটা শক্তি, উদারতা, সহানুভূতি ফুটে উঠেছে।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখ্‌ছি

নিখিলেশ ও বিমলার দাম্পত্য-প্রেম নিয়েই এই "ঘরে বাইরে" রচিত হয়েছে। বিমলার একনিষ্ঠ ও একাগ্র প্রেমের উপর নিখিলেশের কেমন একটা নূতন ধরণের সন্দেহ জন্মাল। সে ভাবল—আমাদের বাঙালীর জীবনে আমাদের নিজকে দিয়ে স্ত্রীকে একেবারে ঢেকে রেখেছি, বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবার অবকাশ কোন দিনই দিইনি,—এই জন্যই তার একটা আত্মগত্য ও একাগ্রতা। যদি পুরুষের সঙ্গে মেশবার তাদের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তবে স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমের কতকটা পরীক্ষা হবে। নিখিলেশ সংযত ধীর পুরুষ; স্ত্রীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সাধারণ লোকের যেমন একটা আকুলতা বা মানসিক যাতনা জন্মে থাকে তার কিন্তু সে রকম হয়নি। বিমলার সন্দীপের প্রতি সাময়িক অনুরাগ সে নীরবে সহ্য করেছিল। সে ঠিক জানত যে বিমলা যদি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকে তবে সে সন্দীপের মোহপাশ হতে একদিন তার কাছে ছুটে আসবেই আসবে। বস্তুতঃ হয়েছিলও তাই। সন্দীপ যে শুধু কথার রৌদ্রে নিজের অন্তরের আশ্রয়কে ঢেকে রেখেছিল তা বিমলার বুঝতে বাকী রইল না। বইখানার শেষ হয়েছে নিখিলেশ ও বিমলার এই নূতন মিলনে। আজকার এই মিলন ঐকান্তিক বিশ্বাসের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। বিমলার জয়ে আজ নারীজাতির গৌরব আরও উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠেছে।

নারীজাতির এই জয়জয়কার ঘোষিত হয়ে থাকলেও এই বইখানাকে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশদান করতে এ দেশের নীতিজ্ঞদের অনেক আপত্তি উঠে থাকে। কি ভয়ানক ক্ষোভের বিষয়!

তারপর শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "চরিত্রহীন"। এক বিশিষ্ট কাষ্ট গ্রেড কলেজ লাইব্রেরীতে এই বইখানা আনা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ পুস্তকের মধ্যে এর স্থান হয়নি, ভয় পাছে ছেলেরা পড়ে ফেলে। "ঘরে বাইরের" স্থান অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে হয়নি, আর "চরিত্রহীন" নামের গুণেই বাংলার যুবকের অপাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

চরিত্রহীনকে ভাল লাগবার আমার পক্ষে একটা কারণ এই যে মানুষকে বিচার করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের সাহিত্যে অভিনব ও বিচিত্র। এই সাবিত্রীর চরিত্র,—সাবিত্রীর জীবনে যে সত্যটা ফুটে উঠেছে তাকে মেনে নেবার মত উদারতার আমাদের এখনও একান্ত অভাব আছে। অনেকেই বলে থাকেন, যে-নারী জীবনে একবারমাত্র সংযমহীনতার পরিচয় দিয়েছে, যে তার চিরদিনের ঘরের কোণটি ছেড়ে একেবারে কদর্য্য প্রকাশ্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছে, তার আবার ভাল হবার কি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, তার ভিতর আর কি নারীত্ব জেগে উঠতে পারে? তার দিকে আসবার ইচ্ছা থাকলেও তাকে জোর করে আমরা নরকে পাঠিয়ে দেবই দেব। কি ভয়ানক, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অনুশাসন এই সমাজ। কিন্তু কবির প্রাণ ও প্রতিভা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে এমন একখানা চিত্র—যার চরিত্রের নির্মল আভা তার প্রথম জীবনের এক মুহূর্ত্তের মিথ্যা কলঙ্কচিহ্ন কোথায় মিলিয়ে গেছে দেখতেই পাওয়া যায় না। তাকে উপেন-দা ঘৃণা করছিল, আমাদের হৃদয়ও তাকে শ্রদ্ধা করতে বোধহয় কোন দিনই সঙ্কোচ বোধ করবে না। কি বিশাল সহানুভূতি নিয়েই শরৎচন্দ্র এই সাবিত্রীকে সৃষ্টি করেছিলেন।

"শ্রীকান্তে" অভয়া আর রোহিণীর কথা। এ-রকম ব্যাপার কি আমাদের সামনে অহরহ ঘটে থাকে না, যখন স্বামী তার স্বামিত্বে অধিকার-বলেই স্ত্রীকে তার কর্ত্তব্যজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য এ-প্রকার পুরস্কার দিয়ে থাকেন? মদ্যাসক্ত স্বামী প্রথম-রাত্রিটা কুস্থানে কাটিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক—কলুষিত-চিত্তজাত অন্ধ সন্দেহের বশে স্ত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করে থাকে। মন্ত্রশক্তি আছে কি না তা নিয়ে তর্কবিতর্ক আমি করব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার সঙ্গে গোটাকতক বৈদিক মন্ত্রের বাক্যব্যয়সহ স্থাপন ও অনুধাবন করাটা কতটা নিরর্থক তা কাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না।

'অভয়া বলিল "শ্রীকান্তবাবু,—তিনি তার ধর্ম্মপত্নী নিয়ে সুখে থাকুন আমি নালিশ করছিনে, কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাতে একাকী ঘরের বার কোরে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইছি।"

"তিনিও আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তার প্রবৃত্তিকে তার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারলে না। অর্থহীন আবৃত্তি তার মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারি উপরে!.....একজন নির্দ্দয় মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে দিতে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এইজন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?'

আমাদের সমাজের যে ছবিটা একেবারে অনাবৃত করে আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়েছে, এটা কি নিছক কল্পনা? এই নিয়েই কি আমাদের গৌরব করতে হবে যে দাম্পত্য-প্রেম আমাদের তত্ত্বালোচনার সামগ্রী? এই ভাবেই আমাদের বাঙ্গালীর ঘর Doll's House হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা চাপা দিয়ে রাখবার জিনিষ নয়, মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত অকস্মাৎ জ্বলে উঠবেই।

এতদিন পর্য্যন্ত নারীজাতির শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে আমরা তাদের চিন্তার এবং কর্ম্মের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলাম। আজ শিক্ষার গুণে তারা তাদের ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব অবগত হয়েছে। সূর্য্যমুখীর মত স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দেওয়া আর আজকাল আমাদের নারীজাতির আদর্শ নয়। দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যে তাদের স্থান কোথায় তারা আজ শিক্ষার গুণে বুঝে ফেলেছে। তাই আজ তাদের self-assertion যেমন সমাজে,—তেমনি সাহিত্যে। যতই দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার চলতে থাকবে ততই এই স্ত্রীজাতি তাদের চিত্তের বিপুল রহস্য নিয়ে, তাদের চরিত্রের অচিন্তনীয় ক্ষমতা সহানুভূতি ও

প্রেম সঙ্গে করে আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের দ্বারে এসে দাঁড়াবে। এই ভাবেই সমাজের গতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে—সমাজের ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে আমাদের সাহিত্যে এক নবীন প্রভাতের অরুণলেখা জেগে উঠবে। আজ আমরা সে দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

(পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীজগন্মান দাশগুপ্ত।

মুখের যত্ন।

চিকিৎসকগণের মতে শতকরা পঁচাত্তর প্রকারের ব্যাধির জীবাণু মুখের ভিতর বাস করে, অথবা মুখের মধ্য দিয়া শরীরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং মুখ ও দাঁত খুব পরিষ্কার রাখা উচিত; এবং ছেলেমেয়েরাও যাতে মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখে সেদিকে অভিভাবকদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

স্বাস্থ্যসমাচার, আষাঢ়।

গঙ্গারাঢ় নগরের নাম ও অবস্থান।

বঙ্কিম-বাবুর অনুমান গঙ্গারাঢ় শব্দটা গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ এবং তাহা হইতে রাঢ় নামের উৎপত্তি। বিশ্বকোষে রাষ্ট্র বা লাট শব্দ হইতে রাঢ় উৎপন্ন, অথবা সাঁওতালি ভাষার রাঢ়ো শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। রাঢো মানে নদীগর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরিয়া জমী। হয়ত অপভ্রংশ রাঢ় সাঁওতালী ভাষার রাঢ়ো হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার সন্নিকটে গাঙ্গেড্ডা নামক পল্লীই বোধ হয় প্রাচীন গঙ্গারাঢ়। প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে জানা যায় যে রাঢ় দেশে চক্রতীর্থ নামে এক গ্রাম ভাগীরথীতীরে অবস্থিত ছিল। গাঙ্গেড্ডা গ্রামের কাছে চাকটা বা চক্রতীর্থ গ্রাম ভাগীরথীর কূলে বিদ্যমান আছে।

(মান্সী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ়) শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বিধবার একাদশী।

দেশ শাস্ত্রের মর্ম্ম জানে না, সেই জন্য বিধবার উপরে একাদশীতে ঘোর অত্যাচার প্রবর্ত্তিত।

আমি ত এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ত বিধবার একাদশীতে অনুকল্পবারক কোন ঋষিবচন বা গ্রন্থকারদিগের কোন সন্দর্ভ দেখিতে পাই নাই।

আমি একগলা গঙ্গাজলে নামিয়া বলিতে পারি, পরম কারুণিক ঋষিরা কখনই নিষ্ঠুর ছিলেন না। তাঁহারা অন্যের মত অশক্ত বিধবাকেও একাদশীতে অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছেন; সংগ্রহকারেরাও কোন স্থলে তাহার নিষেধ করেন নাই; প্রত্যুত সমর্থন করিয়াছেন। এজন্য আমি বিচার করিতে প্রস্তুত আছি।

একাদশীতত্ত্বে "উপবাসাচরণে গর্ভাদিপীড়া-সম্ভাবনায়াং নক্তং ভোজনং কুর্য্যাৎ"—উপবাসের আচরণে গর্ভাদি-পীড়ার সম্ভাবনা আছে, এজন্য রাত্রিতে ভোজন করিবে, রঘুনন্দনের সন্দর্ভ আছে। এই ভোজন করিবে কে—বিধবা; কারণ রঘুনন্দন "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী" এই পুলস্ত্য-বচনটি উদ্ধৃত করিয়া বচনস্থ "নারী" পদের অর্থে লিখিয়াছেন "বিধবা", কারণ, সধবার উপবাস নাই; বিষ্ণুবচনে সধবার উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে, একথাও রঘুনন্দন স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

"সায়মাদ্যন্তয়োর্ভক্তমেকং মধ্যগতো ধ্রুবং।
চতুর্ভক্ত-নিষেধোঽয়মুপবাসবিধিঃ স্মৃতঃ॥
একাদশীতত্ত্বধৃত বরাহ-পুরাণ।

উপবাসের পূর্ব্বদিবসে ও পরদিবসে রাত্রিতে এক-একবার ভক্ত ও মধ্যবর্ত্তী দিবসে দুই বেলা দুইবার এই চারিবার ভক্ত বর্জ্জনের নাম উপবাসবিধি। অমর-কোষের অন্নের পর্য্যায়ে ভক্ত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্মার্ত্তোদ্ধৃত মহাভারতের বচনে ও পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃত-ধৃত স্মৃতির বচনেও ভক্তবর্জ্জনের নামই উপবাস বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। একাদশীতে নিষেধক বচনগুলির মধ্যে অধিকাংশ বচনে "অন্ন" শব্দ আছে। "একাদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যো ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং দ্বিজো মনাক্।" "অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি।" "তদ্দিনে সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নাশ্রিতানি চ।" "একাদশ্যন্নকামস্তু।" ইত্যাদি ইত্যাদি। রঘুনন্দন, মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি, বাচস্পতি মিশ্র ও কমলাকর ভট্ট বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে স্পষ্টতঃ অন্ন শব্দ আছে। যেসকল বচনে অন্ন নাই, কিন্তু "ন ভুঞ্জীত" আছে বা সেইরূপ অন্য পদ আছে, সেই-সকল বচনেরও অন্নপদযুক্ত বচনগুলির সহিত একবাক্যতা করিয়া অন্নভোজনেরই নিষেধ বুঝিতে হইবে।

যদি একাদশীতে বিধবার অনুকল্প রহিত করিবার তাঁহাদিগের ইচ্ছা থাকিত, তবে কি বিধবার একাদশীতে অনুকল্প নাই একথা খুলিয়া বলিতে পারিতেন না? ঋষিরা ত বলেনই নাই; হেমাদ্রি, বিজ্ঞানেশ্বর, জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, রঘুনন্দন, এমন কি, কমলাকর পর্য্যন্ত খুলিয়া কিছু বলিলেন না কেন?

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পুত্রবধূকে গঙ্গাজল দিয়াছিলেন ও ভগবৎ-প্রসাদী দুগ্ধ, জল, ফল পান ভোজন করিতে বলিয়াছিলেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, পরিশেষে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় তিথিতত্ত্বের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি লিখিবার পক্ষেও একাদশীতে অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।
(ভারতবর্ষ, আষাঢ়)।

অন্তরের অন্তরালে

(চীনদেশের একটি প্রাচীন প্রবাদবাক্য হইতে)

কোন্ সুদূরে মেঘের পুরে
যে বিহঙ্গ সঞ্চরে,
তাহার 'পরেও পারো হে শর বর্ষিতে;
সাগর-জলে কোন্ অতলে
মৎস্য সুখে সন্তরে,
তারেও তুমি হান্‌তে পারো বঁড়শিতে।
কিন্তু যারে একেবারে
দিয়েছ ঠাঁই অন্তরে,
যেজন তোমার বাহুপাশেই নিত্য রয়,
তার হৃদয়ের পরিচয়ের
পেয়েছ কি অন্ত রে,
করেছ কি একটুও তার চিত্ত জয়?

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

দেশের কথা

বাংলার সকল জেলা হইতেই ঘরকন্নার প্রত্যেক জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার খবর আসিতেছে। অন্ন বস্ত্র জল স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা সমস্তেরই দেশে অভাব।

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমার এলাকাধীন মতলবগঞ্জ অঞ্চলের ২: জন লোকের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদন চাঁদপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়াছে। ঐ আবেদনে বলা হইয়াছে যে, দেওয়ানগীরকান্দি নামক গ্রামের মদন-মোহন নামক একব্যক্তি না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে। —ঢাকাপ্রকাশ।

দেশের লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, অথচ—

সরকারী হিসাবে প্রকাশ বিগত ১৯১৮-১৯ সালে বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। —বীরভূমবার্ত্তা।

ভারতবর্ষ হইতে গম রপ্তানী—ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব জন্য লোকের কষ্ট হইতেছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এতদিন বিদেশে গম ইত্যাদি রপ্তানী সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম করিয়াছিলেন। শুনা যায় এখন গভর্ণমেণ্ট ঐসকল নিয়ম উঠাইয়া দিয়াছেন এবং বিদেশে গম রপ্তানী জন্য পঞ্জাবে প্রভূত গম ক্রয় করিতেছেন। —চারুমিহির।

আমরা বিদেশকে খাদ্যশস্য জোগাই নিজেরা না খাইয়া; জীবনধারণের অপর সামগ্রীও বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে আমাদেরই কাঁচা মাল হইতে। এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী ও দোষী।

এদেশের জনসাধারণ এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে তাহারা একবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, নিজেদের চেষ্টা দ্বারা আর এইসকল বিরাট অভাব দূর হইতে পারে—এ বিশ্বাস তাহাদের নাই। দেশবাসীর এই উদ্যম-উৎসাহ-হীনতার প্রতি স্থির ভাবে দৃষ্টি করিলে মনে হয় এই বিরাট জাতি একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক অধিকার-হীনতা যে এতবড় একটা জাতিকে এমন ভাবে পঙ্গু করিতে পারে ইহা পূর্ব্বে কেহই চিন্তা করিতে পারেন নাই, আজিও অনেকেরই ভাবনার অতীত হইয়া রহিয়াছে। —যশোহর।

এই উদ্যমহীনতার ফলে আমাদের মুখের গ্রাসও পরে আহরণ করিয়া লইতেছে, এবং দেহে মনে পঙ্গু আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অনাহারে অভাবে মরিতেছি।

নারিকেলের ব্যবসা।—ক্রমে ক্রমে এদেশের সকল ব্যবসায়ই বিদেশীয়েরা হস্তগত করিতেছেন সম্প্রতি বরিশালে ওরিয়েণ্টাল প্রডাক্ট কোম্পানী নামে একটি নূতন কারবার কতিপয় ইয়ুরোপীয় মিলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই কোম্পানী ঐ অঞ্চলে নারিকেল ক্রয় করিয়া আমেরিকায় চালান দিবেন। মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে বহুকাল ধরিয়া ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় নারিকেল চালান হইতেছে। বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিলে এখন হইতে ঐরূপ নারিকেল চালান দিয়া লাভবান হইতে পারিতেন। আমাদিগকে ইহাতে উদাসীন দেখিয়া ইয়ুরোপীয়গণ যে সে কাজ হাতে লইবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এইরূপে নানা পথে যদি দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কেবল রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য চীৎকার করিয়া কি ফল হইবে? বিদেশে এই নারিকেল চালানের ব্যবসায়ের প্রসার হইলে যদি এদেশে অধিক পরিমাণে নারিকেল উৎপাদনের চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে দেশের দরিদ্রগণ একটি সুস্বাদু আহার্য্য সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইবে। অতএব যাহাতে অধিক পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হইতে পারে দেশবাসীদিগের তাহাতে মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

অভাবের তাড়নায় উদ্যম জন্মে; কিন্তু আমরা এমনি তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি, যে, সে উদ্যম পাপপথে ধাবিত হইতেছে।—

গত সপ্তাহে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে মোটমাট বত্রিশটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে হুগলীতে সাতটি, চব্বিশপরগণায় পাঁচটি, বর্দ্ধমানে তিনটি, বরিশাল, মেদিনীপুর, ও ফরিদপুরে দুইটি করিয়া এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ, যশোহর, নদীয়া, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় একটি করিয়া

—মোসলেম-হিতৈষী।

অনশন-অনাবরণ কুভক্ষ্য. কুপেয় হইতে ব্যাধি জন্মে।

সারা বঙ্গদেশে—

রোগের প্রাদুর্ভাব—মফঃস্বলের অনেক স্থান হইতেই নানাবিধ রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জ্বর রোগ কোন কোন স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। একে অন্নাভাবে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে লোক দিন কাটাইতেছে, তার উপর যদি রোগের আক্রমণ হয়, তবে অভাবে অপরিপুষ্ট জীর্ণ দেহ সেই ব্যাধির সহিত কয়দিন সংগ্রাম করিতে পারে? অনশন এসকলের মুখ্য কারণ না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে গৌণ কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। —ত্রিপুরা-হিতৈষী।

দেশের নানাবিধ অভাব প্রতিকারের চেষ্টা অতি সামান্যই হইতেছে। যাহা হইতেছে তার জন্য উদ্যোক্তারা প্রশংসাভাজন অবশ্যই।

অন্নদান।

আগরতলার মহারাজা বাহাদুর স্বীয় এলাকার মধ্যে প্রতি মণ চাউলের মূল্য ৫৲ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আগরতলার চাউল-ব্যবসায়ীরা চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়াছিল কিন্তু রাজসরকার হইতে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে। ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুর রাজার যোগ্য ব্যবস্থাই করিয়াছেন। আমরা এ নিমিত্ত মহারাজা বাহাদুরকে ও রাজমন্ত্রীদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি। —ঢাকাপ্রকাশ।

সরকারী কেরানীকুলের ভাতা—শুনা যাইতেছে যে, যাঁহারা গেজেটেড্ অফিসার নহেন, এইরূপ কেরানীগণের জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট শতকরা ৫৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ভাতা দিবার আদেশ দিয়াছেন। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

লোহাগড়া থানার অন্তঃপাতী চাচই গ্রামে অনেক নিঃস্ব চাষী পরিবার অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছিল। উক্ত গ্রামের জেবান সিকদার, জোনাবালি, মীর মোজাম সেখ, রহম সেখ প্রভৃতি কয়েকজন পরদুঃখ-কাতর প্রাণবান ব্যক্তি নিরন্ন প্রতিবেশীদের উপবাসী রাখিয়া নিজেরা আহার করিতে আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও এত অর্থ নাই যে নিরন্ন গ্রামবাসীর অকষ্ট মোচন করেন। শেষে তাঁহারা একমত হইয়া একযোগে স্থানীয় জনৈক প্রসিদ্ধ চাউল-

ব্যবসায়ীর নিকট হইতে খত প্রদানে ৩০০৲ টাকার ধান্য লইয়া গ্রামবাসীদের দাদন দিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন। যে-সমস্ত যুবক বর্ত্তমানে প্রাতে মধ্যাহ্নে তাস দাবার সময় নষ্ট করিতেছেন তাঁহারা কি এই বিপন্ন প্রতিবেশীদের দুঃখ মোচন কল্পে মহাপ্রাণ মুদলমানগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন না? —কল্যাণী।

জলদান।

সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর বৃষ্টি না হওয়ায় কঙ্করপ্রস্তরময় বাঁকুড়া জেলায় আশানুরূপ শস্য জন্মে না। যখন বৃষ্টির অভাবে ধান্য মরিয়া যায় সেই সময় যদি বাঁধ পুষ্করিণী হইতে জল সেচন হয় তাহা হইলেও ধান্য বাঁচিতে পারে। জলের অভাবে ধান্য মরিয়া যাইতেছে দেখিয়া এখন লোকে জলসরবরাহ সমবায় সমিতি গঠন করিতেছেন। উপস্থিত দুইটি সমিতি রেজিষ্টারী হইয়াছে।—বাঁকুড়া-দর্পণ।

কসের জল।—(১) কুমিল্লায় জলের কল স্থাপন, (২) ফরিদপুর সহরে জলের কলে ১,৭৬০০০৲ ব্যয় হইবে। ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ১৫০০০৲ দিবেন।—এডুকেশন গেজেট।

বরিশাল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, বলাইকাঠী গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন জন্য ঐ গ্রামের ৮৯ একর জমি গ্রহণ করিয়াছেন।—কাশীপুরনিবাসী।

অন্ন-পানের সংস্থানের পরই মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। বাঁচিবার জন্য অন্ন-পান দরকার; কিন্তু অসুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকায় কোনো লাভ নাই, সুখ নাই, আনন্দ ত নাইই। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চাই যেমন সুখাদ্য ও সুপেয়, তেমনি চাই সুচিকিৎসক ও চিকিৎসা-আলয়।

আই-এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর হইতেই দলে দলে বালকগণ মেডিক্যাল কলেজের দিকে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু শুনা যাইতেছে—কলেজে স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং বর্ম্মার ছাত্রগণের জন্য সিট রিজার্ভ রাখিবার পর ৩০টির বেশী বাঙালী ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতে পারিবে না। দেশে বিনা চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক শমন-সদনে প্রেরিত হয়, তথায় উপরোক্ত সংখ্যা নৈরাশ্যব্যঞ্জক নহে কি? গ্রামে না আছে শিক্ষা, না আছে স্বাস্থ্য, না আছে পানীয় জল, ফলে দিন দিন মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি; জনমানবহীন গ্রামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। —রঙ্গপুর-দর্পণ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ময়মনসিংহে একটি মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় এককালীন ৫০ সহস্র টাকা দিতে চাহিয়াছেন। শুধু গভর্ণমেণ্টের দিকে না তাকাইয়া দেশের কৃতী ও ধনীবৃন্দ যদি অনাথ-বাবুর ন্যায় জেলায় জেলায় মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে মনোযোগী হন তাহা হইলে অচিরে দেশ হইতে চিকিৎসকের অভাব দূর হইবে। অনাথবাবুর বদান্যতার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। —রঙ্গপুর-দর্পণ।

আমাদের এই হতভাগা দেশেই কেবল লোকে বিদ্যা শিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও সুযোগ পায় না। এর প্রতিকার করিবার জন্য ধনীদের দানে ও সাধারণের সম্মিলনে বহু সংখ্যক স্কুল কলেজ সকল-রকম বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত লোয়াদা একটি গণ্ড-গ্রাম। সহযোগিতা প্রণালীতে স্বাস্থ্য-সমিতি নামে একটি চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। লোয়াদা কতেবাড়নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দে মহাশয় চিকিৎসালয় স্থাপন কল্পে সভাস্থলে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। লোয়াদাবাসীগণের এই সদুদ্যোগ অতীব প্রশংসার্হ। —মেদিনীবান্ধব।

রাজসাহী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিয়ামতপুরে একটি ডাক্তারখানা স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছেন। —হিন্দুরঞ্জিকা।

দাতব্য চিকিৎসালয়—জেলা বোর্ড শীঘ্রই শালতড়ায় একটি দাতব্য ঔষধালয় খুলিবেন। —বাঁকুড়া-দর্পণ।

গোয়ালন্দের নাজহাল গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর মৌলবী বাদু হোসেন স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে ধনে মানে দেশের বরেণ্য, তাঁহারা রোগে শোকে জর্জ্জরিত দরিদ্র ভাইদের কথা মনে করিয়া খাঁ বাহাদুরের ন্যায় তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য চেষ্টা করিলে দেশের অভাব যে অনেকটা দূর হয় তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। —যশোহর।

অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার—রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম আর্ত্তের সেবা বিষয়ে দেশের মহদুপকার সাধন করিতেছেন। স্থানে স্থানে তাঁহাদের আশ্রম রহিয়াছে, সেবকগণ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আর্ত্তের সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। কাশীধামে একটি বৃহদায়তন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। ময়মনসিংহের জননায়ক শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ সম্প্রতি কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তত্রত্য আশ্রমে রোগীদিগের বাসের জন্য একটি ওয়ার্ড নির্ম্মাণকল্পে ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ওয়ার্ডটি তদীয় স্বর্গীয়া পত্নী রাধাসুন্দরীর নামানুসারে "রাধাসুন্দরী মেমোরিয়াল ওয়ার্ড" নামে অভিহিত হইবে। —ঢাকা-গেজেট।

দানের প্রতিশ্রুতি—ময়মনসিংহ-আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সেখানকার "রামকৃষ্ণ আশ্রমের" গৃহের জমি খরিদ করিবার জন্য ১১০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। —ঢাকাপ্রকাশ।

মানুষ সুস্থ শরীরে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিলেই তার মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় না; তার চাই জ্ঞানের অনুশীলন। এ সম্বন্ধেও আমাদের দীনতা বিষম। ছেলেরা ইচ্ছা সত্ত্বেও স্কুল কলেজে পড়িবার সুযোগ পায় না।

যশোহরে নূতন কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব।—যশোহরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। সমগ্র জিলার অনেকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্র প্রত্যেক বৎসর মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজসমূহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যশোহর সহরে একটি বড় কলেজ স্থাপিত হইলে এই অভাব অনেকাংশে দূর হইবে। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

নোয়াখালী জেলার শ্রেণী মহকুমায় একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহার হিন্দু এবং মুসলমানদের ২টি বোর্ডিং প্রতিষ্ঠার জন্য নোয়াখালী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।—যশোহর।

মৌলবীবাজার সবডিভিসনের অন্তর্গত মুন্সীবাজারে একটি হাইস্কুল স্থাপনের জন্য পরগণা ছত্রচিরি, চৈত্রযাটনিবাসী হাজিমাং দিলবর নামক এক ব্যক্তি এককালীন ২০০০৲ মৌলবীবাজারে পুষ্করিণী খননের জন্য ১০০০৲ এবং মসজিদ নির্ম্মাণের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়া স্বীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ধনী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইঁহার সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয়। —সুরমা।

সারোয়াতলা স্কুলের দ্বারোদ্‌ঘাটন—সারোয়াতলী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের নূতন পাকা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। প্রায় ৪০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। —জ্যোতিঃ।

মোহনপুর থানার এলাকায় কেশুরহাটের সন্নিকটে সাঁকোয়া গ্রামে সম্প্রতি একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে; গরীব ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে ও বিদেশী ছাত্রদিগকে আহারাদি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। —হিন্দুরঞ্জিকা।

জেলা বোর্ডের শিক্ষা বিভাগ—মধিমুখা বোর্ড মধ্যবাঙ্গলা স্কুলটিকে মধ্যইংরেজী স্কুলে পরিণত করিবার প্রস্তাব জেলাবোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। —বাঁকুড়াদর্পণ।

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন—বৈদ্যনাথ ধামে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য অগ্রদ্বীপের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয় নগদ দশ হাজার টাকা ও এক হাজার বিঘা জমি দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন একটি মহৎ পুণ্যের কার্য্য। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাঁহার দান চির-স্মরণীয় থাকিবে।

দান—স্যার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার পিতার নামে স্থাপিত পাবনা দুর্গাদাস দর্শন টোলের সাহায্যে ১২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং আরও ১২৫৲ টাকা সত্বর দিবেন বলিয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

বৃত্তি দান—ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসিক ১০৲ টাকা মূল্যের "ব্রজসুন্দর বৃত্তি" আপাততঃ এক বৎসরের জন্য একটি দরিদ্র ব্রাহ্ম বালক কি বালিকাকে কলেজে অধ্যয়ন জন্য প্রদান করিবেন। —ঢাকা-গেজেট।

সার আশুতোষ মুখার্জ্জি মেডাল—শ্রীযুক্ত কেশোরাম পোদ্দার মাড়োয়ারী বণিক বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা আয়ের কাগজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিতেছেন। ঐ টাকায় একটা স্বর্ণপদক বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মৌলিক গবেষণার জন্য পর পর বৎসরে প্রদত্ত হইবে। প্রত্যেক বৎসর ৩০শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রবন্ধ বা পুস্তক সিণ্ডিকেটের হস্তে দিতে হইবে। যখনই যেরূপেই হউক সৎকর্ম্ম প্রশংসনীয়। —এডুকেশন গেজেট।

কেবল ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সমাজের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না; মেয়েদেরও ছেলেদের সমান শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:—সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত সদিয়াচাঁদপুর গ্রামে সমাজসংস্কার সমিতির চেষ্টায় আট মাস হইল একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাহা ও বৈদ্য জাতীয় লোকের সংখ্যাই এখানে বেশী। এই উভয় জাতির মধ্যে বালিকাদের ৮।৯ বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়া যায়, কাজেই ছাত্রী-সংখ্যা আশানুরূপ হইতে পারিতেছে না। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নহে। ডিঃ বোর্ড হইতে কিছু সাহায্য পাইলে বিদ্যালয়টি স্থায়ীভাবে চলিতে পারে। —সুরমা।

দান।—বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামে যে বালিকাবিদ্যালয় আছে তাহার পাকা ইমারত নির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত মহাদেব চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় প্রায় ৪০০৲ চারি শত টাকা মূল্যের জমি দান করিয়াছেন। —এডুকেশন গেজেট।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যে কি-রকম অল্পবিস্তৃত তা ছেলেদের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যায়।—

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার—বাঙ্গালা দেশে এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্ব্বসুদ্ধ ৯৩টি বালিকা পাশ করিয়াছে।

প্রাইভেট—	১৭
ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়	১৩
ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়	১১
ডাইওসিসান কলেজিয়েট স্কুল	১১
ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা হাই	১০
বেথুন কলেজিয়েট স্কুল	৬
ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস	৩
ইউ, এফ, সি, হাই স্কুল কলিকাতা	৩
ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন	৪
চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীর হাই স্কুল	৪
ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হাই	৩
মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং	২

—মীহার

দশহাজার ছেলের সঙ্গে ৯৩টি মেয়ে পাশ করিয়াছে—তার মধ্যে ইংরেজ ফিরিঙ্গী মেয়েও আছে—এরই আবার প্রত্যেক কাগজে বলা হইয়াছে "স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার!" বাস্তবিক বিস্তার কি কম! হাজার জন শিক্ষিত ছেলের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী এক জন! ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশী হইলেও তাহা অপর দেশের তুলনায় যৎসামান্য।—

শিক্ষার তুলনা—১৮১২ খৃষ্টাব্দে জাপানে বিদ্যালয় গমনোপযোগী বালকগণের মধ্যে শতকরা ২৮ জন শিক্ষা পাইতেছিল, ১৯০০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯০এ উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের বিদ্যালয় গমনোপযোগী বালকগণের মধ্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৩ জন শিক্ষা লাভ করিতেছিল, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১০০ জনে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বালকগণের মধ্যে কেহই অশিক্ষিত নাই। রুশিয়ার ন্যায় অনুন্নত রাজ্যে শতকরা ১৫ জন শিক্ষিত। এখন একবার ভারতের অবস্থা দেখা যাউক। দেশীয় নৃপতিদের শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বড়োদা রাজ্যে শতকরা ৯, ত্রিবাঙ্কুরে ৬॥, কোচিনে ৪॥ এবং মহীশূরে ৩ জন শিক্ষার্থী—আর খাস বৃটিশ ভারতে শতকরা দুইজন মাত্র শিক্ষার্থী। —সুপ্রভাত।

যে দেশ শিক্ষায় সকলের নীচে পড়িয়া আছে, সে দেশের ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা সত্ত্বেও স্কুল কলেজে একটু হীন

পার না। যখন দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভের চেষ্টা করিয়াও কোথাও একটু স্থান না পাইয়া হতোদ্যম হইতেছে, তখন

গুজব, হুগলী কলেজ হইতে বি এ এবং বি এস সি ক্লাস উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বি এ এবং বি এস সি ক্লাস উঠাইয়া দিলে কলেজটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্টের এরূপ মতলব হইলে ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ হইবে। বাঙ্গলায় উচ্চ শিক্ষার স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্টের যদি এরূপ মতলব থাকে অচিরে পরিত্যাগ করিবেন। —বীরভূম-বাণী।

গভর্মেণ্ট কোথায় অধিক সংখ্যক কলেজ স্থাপন করিয়া দেশের সকল যুবকের শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দিবেন, না একটি কলেজ তুলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছেন। শিক্ষালাভে দেশের লোকের চোখ ফোটে; তাতে বিদেশী দেশভৃত্যদের ও তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর স্বার্থহানি হয়; এজন্য তাঁরা শিক্ষাবিস্তারকে সুনজরে দেখেন না। শিক্ষা লাভ দুর্মূল্য দুষ্কর করিয়াও তাঁদের তৃপ্তি হয় নাই, এখন দুর্লভ করিবারও চেষ্টা চলিতেছে। এর প্রতিকার করিতে হইবে দেশের লোকদের। বাংলার তুলনায় বাংলার বাহিরের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা অনেক ব্যাপক দেখা যায়।—

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বোম্বের ধনকুবেরগণ ৮ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা হস্তশিল্পের উন্নতিকল্পে দেওয়া হইবে এবং আড়াই লক্ষ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ হইবে। —বীরভূমবাণী।

পুত্রের স্মৃতিরক্ষা।—আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনকুবের লর্ড রথারমিয়ারের পুত্র ইউরোপের মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। লর্ড রথারমিয়ার এই মৃত পুত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার নামে এক অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই অধ্যাপক মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইতিবৃত্ত অধ্যাপনা করাইবেন। —টাকাপ্রকাশ।

আমাদের দেশের ধনী হইলে পুত্রের স্মৃতিরক্ষা করিতেন পোষ্যপুত্র লইয়া!

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষারও ব্যবস্থা বিস্তৃত রকমের হওয়া দরকার।

দুর্গাপুর কৃষিবিদ্যালয়।—দেশীয় বদান্য ব্যক্তিগণের ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আগামী জুলাই মাস হইতে চট্টগ্রাম দুর্গাপুর উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের সহিত কৃষিশিক্ষার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইবে। এই বিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা উপযুক্ত শিক্ষকগণের হাতে থাকিবে। সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে এবং হাতে-কলমে ক্ষেত্রের কার্য্যদ্বারা কৃষিবিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত চট্টগ্রামে সর্ব্বপ্রথম কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। —জ্যোতিঃ।

গবর্ণমেণ্ট স্কুলে স্কুলে টেলিগ্রাফি শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট সেই স্কুলে একজন শিক্ষক এবং যন্ত্রাদি বিনামূল্যে প্রদান করিবেন, ছাত্রদিগকে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা হিসাবে দুইবৎসর শিখিতে হইবে।—যশোহর।

রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মফঃস্বলে প্রাইমারী পাঠশালায় সুতাকাটা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তুলার চাষের বিস্তার করিতেছেন। —হিন্দুরঞ্জিকা।

যাদের বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয় নাই, অথবা অভাবের জন্য অল্প বয়সেই উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়, তাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজের ও গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

নৈশ বিদ্যালয়।—দত্তগলিস্থ চুঁচুড়া লিটারারী ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণের সমবেত চেষ্টার ফলে উক্ত সমিতি-গৃহে স্থানীয় শ্রমজীবীদিগের বিনামূল্যে শিক্ষা দিবার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত মঙ্গলবার হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা মোট ২২ জন। ধরামি, মাঝি, কলু, নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতি ৫ বছরের ছেলে হইতে ৩০ বৎসরের যুবা পর্য্যন্ত ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সমিতির সভ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা আশা করি স্থানীয় জনসমূহ এই সাধুসংকল্পে সভ্যগণকে সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিবেন। —চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

সৎকর্ম্মে দানের প্রতিশ্রুতি।—স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্য ভিক্ষা জন্য মুর্শিদাবাদ জাফরাগঞ্জের মহান্ত মহারাজের নিকট স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন ঘোষ যাওয়ায় মহান্ত মহারাজ ১০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। মহান্ত মহারাজ ইতিপূর্ব্বে রামপুরহাটের টাউনহল ফিমে ৫০০০৲ (?) টাকা দান করিয়াছেন। অবশ্য যিনি যাহা দান করিবেন তাহাই আমাদের সাদরে গ্রহণীয়। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে দেব-সেবা ও লোক-সেবার জন্য গচ্ছিত ধনের মালীক মহান্ত মহারাজ রামপুর-হাটের শ্রমজীবীগণের শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে আরও কিছু অধিক দান করিতে পারিলে তাঁহার নিকট গচ্ছিত অর্থের আরও সদ্ব্যবহার হইত এবং তাঁহার লোকবিশ্রুত সুনাম আরও অধিক উজ্জ্বল হইত। যাহা হউক তাঁহার প্রতিশ্রুতির জন্য তাঁহার ও বাচক মণিবাবুর নিকট আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। —রাঢ়দীপিকা।

শ্রমজীবী বিদ্যালয়।—কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ কল্পে বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুর ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য গৃহনির্ম্মাণ-সমিতি গভর্ণর বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। যাঁহারা টাকাকড়ি পাঠাইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৩২ নং হ্যারিসন রোডে জে নিয়োগীর নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

বিদ্যালয় ছাড়া জনশিক্ষার আর-এক উপায় স্বাধীন অপক্ষপাত সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি।

শ্রীহট্ট হইতে "জনশক্তি" নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। —রায়ত।

বিবিধ ক্ষেত্রে ভারতের নরনারীর মহত্ত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয়ও অপরের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করিতে পারিলেও লোকের উদ্যম ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। —

ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব।—গত ২২শে জুন চকদীঘির রাজা মণিলাল সিংহ-রায় জমিদার মহাশয়ের এক পাইককে একটা বিষাক্ত সর্প দংশন করে। স্থানীয় শ্রীযুক্ত অশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থান হইতে খানিকটা রক্ত চুষিয়া লইয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছেন। পাইকটি জাতিতে নমঃশূদ্র। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

সম্প্রতি কুমিল্লা জেলা-স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে যাহাদের ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এইরূপ দুইটি বলিষ্ঠ বালককে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্কুলের পক্ষে ইহা অনুকরণীয়।

—রঙ্গপুর দর্পণ।

মেয়ে-কবিরাজ।—কাশীর আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলনী কলেজ হইতে এবার তিনটি রমণী পরীক্ষায় পাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী হইয়াছেন। এই তিনটি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীই বাঙ্গালীর মেয়ে। —সম্মিলনী।

নূতন র‍্যাঙ্গলার।—পঞ্জাবের বি, ডি, পুরী নামক একজন ভারত-বাসী এবার র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। —বীরভূমবাসী।

নূতন এফ, সি, এস।—শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ গ্রেহাম কোম্পানীর রাসায়নিক। তিনি নাকি কি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। পুরস্কারস্বরূপ তিনি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। —বীরভূমবাসী।

সম্প্রতি জাপানে বন্দুক চালনায় জাপানী বীর-যুবকদিগকে পরাস্ত করিয়া মিঃ এস, সি, কর নামক এক বাঙ্গালী যুবক জয়মাল্য লাভ করিয়াছেন। মিঃ কর ১৫ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে এক সওদাগরী আফিসে টাইপিষ্ট নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। স্বীয় প্রতিভা এবং অধ্যবসায়-বলে তিনি এক্ষণে জাপানে মহাসম্মান লাভ করিয়াছেন।

—ঢাকা-গেজেট।

চিনির আবিষ্কার।—আমেরিকায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কয়াতের গুঁড়া হইতে চিনি বাহির করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আধ সের কয়াতের গুঁড়া হইতে ছয় ছটাক চিনি বাহির হইতে পারে, এবং তাহাতে দুই আনার অধিক ব্যয় পড়িবে না, এইরূপ নাকি তথাকার বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিনির যেমন দর হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার চিনির আবিষ্কার নহিলে কি চলে? নেকড়া হইতেও চিনি হইতেছে। কলিকাতা উল্টাডিঙ্গির একজন বাঙ্গালী নাকি এই প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন।

সন্তরণে অসাধারণ দক্ষতা।—শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বয়স ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গয়েশপুর নামক গ্রামে নিবাস। কিছু দিন হইল, প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে (এলাহাবাদে) রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ সন্তরণ-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ

কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ।—মিষ্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ভলান্টিয়ার রাইফেলস্‌এর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি ব্যাটালিয়নে কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি কাপ্তেনের পদে উন্নীত হইয়াছেন। এ সংবাদ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরবজনক সন্দেহ নাই।—রাঢ়দীপিকা।

ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও উদ্যম চেষ্টা সংস্কার প্রভৃতির সংবাদ অপর সমাজের লোকদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে।—

সম্প্রতি কণ্টাই রোড ষ্টেশনের নিকট বেদেরা বাজারে বিরাট নমঃশূদ্র সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় সমবেত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ একবাক্যে নমঃশূদ্র জাতিকে জলাচরণীয় ও অন্যান্য সামাজিক অধিকার প্রদানের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্গের অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত ও হৃদয়বান ব্রাহ্মণাদি সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ অচিরে সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেশের একটি মহাসমস্যার সমাধানে তৎপর হইলে সুখের বিষয় হইবে। —হিতৈষী।

আন্তর্গণিক বিবাহ।—গত ২৫শে বৈশাখ তাম্বুলি বণিক সমাজের অষ্টগ্রামী থাকের সহিত উক্ত সমাজের চৌদ্দগ্রামী থাকের শুভ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে। এই বিবাহে তাম্বুলি বণিকসমাজের উক্ত দুই থাক ভিন্ন উক্ত সমাজের বিয়াল্লিশগ্রামী, সপ্তগ্রামী ও ইন্দ্রাণী থাকের নেতৃবর্গ আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, এই-সব মহান আদর্শ আমাদের পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয় সমাজের বঙ্গজ, ওড্র ও রাঢ়ীয় প্রভৃতি থাকগুলিকে পরস্পর বৈবাহিক মিলনে শক্তিমান হইতে উদ্বোধিত করিবে।—প্রতিজ্ঞা।

পিতার প্রায়শ্চিত্তে পুত্রের প্রতিবাদ—লোকমান্য তিলক তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পাদদেশে তাঁহার নিজ সমুদ্রযাত্রা দোষ ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপার লইয়া বোম্বাই অঞ্চলে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে তিলকের পুত্র সেখানকার 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন,—আমি মুক্তকণ্ঠে ও স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিতেছি যে সমুদ্রযাত্রা করার জন্য লোকমান্য তিলক যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহা আমার মতবিরুদ্ধ।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ

হিন্দু সমাজের অনুদারতার জন্য কত নিপীড়িত নরনারী যে ভিন্নসমাজের আশ্রয় লইয়া হিন্দুসমাজকে দুর্ব্বল করিতেছে তার ইয়ত্তা নাই।

ইসলাম গ্রহণ—রংপুর জেলার লালমণিরহাট ষ্টেশনের অন্তর্গত পাঙ্গা পরগণায় মিয়েরবাড়ী গ্রামের ভোট জাতীয় ৭ জন পুরুষ ও ৯ জন স্ত্রীলোক এবং রাজবংশী জাতীয় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক মোট ১৮ জন হিন্দু স্ব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। —মাসলেহ-হিতৈষী।

চকমাকড়া গ্রামের জনৈক দাশকন্যা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। —মোসলেম-হিতৈষী।

জেলা মুর্শিদাবাদের অধীন থানা ডোমকলের অন্তর্গত বাজিতপুর নিবাসী জমিদার জগচ্চন্দ্র সান্যালের সুশিক্ষিতা কন্যা শ্রীমতী হৈমবতী দেবী গত ১৯১৭ সালের প্রারম্ভে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশস্থ হিন্দু জমিদারগণের হিংসা ও অত্যাচারে দেশের মধ্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। এতদ্দর্শনে নিকটস্থ 'শিবনগর' গ্রামের ধর্ম্মপ্রাণ মোছলমানগণ তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন এবং বাসের উপযুক্ত ঘর, কাপড় ও আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। আপাততঃ তাঁহার জন্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের নবদীক্ষিতা রমণী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের মোছলমানগণ তাঁহার যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। এক মোছলমান যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে বর্ত্তমানে তিনি সলিমননেছা নাম গ্রহণ করিয়াছেন। —মোছলেম।

যারা ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া কেহ নূতন ধর্ম্ম স্বীকার করে, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু

যারা সমাজের অনুদার সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থার তাড়নায় অন্য সমাজভুক্ত হয়, তাদের দ্বারা সমাজের হীনতা ও ত্রুটিই প্রমাণিত হয়। এর সংশোধন না করিলে সমাজে অকল্যাণ ঘটিতে থাকিবে পদে পদে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

প্রবন্ধমালা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন। ভালো পুরু এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। ২০২ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

কবি ও দার্শনিক ঋষির সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধের মালা বঙ্গবাণীর রত্নভূষণ। এই মালায় আটটি রত্ন গ্রথিত আছে—(১) মুখ্য এবং গৌণ, (২) কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক, (৩) সোনার কাটি, (৪) সোনায় সোহাগা, (৫) নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, স্থিতি এবং গতি, আর্য্যামি ও সাহেবিআনা, (৭) সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা, (৮) বাবুর গঙ্গাযাত্রা।

(১) মুখ্য এবং গৌণ প্রবন্ধে স্বজাতীয় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের মুখ্য এবং গৌণ সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাব—এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া স্বজাতীয় ভাবকে মুখ্যরূপে এবং বিজাতীয় ভাবকে গৌণরূপে রক্ষা করিতে হইবে।

(২) কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোকের মধ্যে ভাববৈষম্য দেখা যায়। একজন সত্য বা মঙ্গলের অনুশীলনে আপনাকে ভুলিয়া যান, ইনি বাস্তবিক-ভাবের লোক; আর একজন সত্যের আন্দোলন করিয়া থাকেন, মঙ্গলেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনাকে ভোলেন না,—ইনি কাল্পনিক-ভাবের লোক। কাল্পনিক ভাবের লোকেরা তিল প্রমাণ কার্য্যের তাল প্রমাণ নাম দিতে না পারিলে কোন-মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না। যাঁহারা বাস্তবিক-ভাবের লোক, তাঁহারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই কার্য্যটি বুঝিয়া তাহার নামটিও সেইরূপ দিয়া থাকেন। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে কাল্পনিকতা-পথের বিষম একটি সঙ্কটস্থানে পৌঁছিয়াছে। এর বুঝিতে হইবে—দেশকাল-পাত্র-বিবেচনা-শূন্য অনুকরণের আরএক নাম হনুকরণ।

(৩) সোনার কাটি, রূপার কাটি কাকে বলে আমরা সবাই জানি। যে কাটি ছোঁয়াইবা-মাত্র মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হয়, তাহার নাম সোনার কাটি। যে কাটি ছোঁয়াইবা-মাত্র জীবন্ত দেহ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার নাম রূপার কাটি। সমাজ-সম্মার্জক বক্তারা যখন বক্ত তাকাশে মুখ ব্যাদান করেন, তখন সেই মুখবিবরে তাঁর দুই জিহ্বা—রক্ষা-সামর্থক ও ধ্বংস-সামর্থক-দেখা যায়—তাহাই সোনার কাটি, রূপার কাটি। তেমনি আবার প্রত্যেক সংবাদপত্র-সম্পাদকের একটি লেখনী বা রসনা ন্যাস্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়া রাখিবার গুণ জানে—সেইটি রূপার কাটি, আর একটি লেখনী বা রসনা মৃতসঞ্জীবনী গুণ জানে—সেইটি সোনার কাটি। কোন্ উপায়ে দেশের দৈন্য দুর্গতি দূর হইতে পারে ও কি কি অন্যায় অসঙ্গত আচরণে আমরা দেশকে অধঃপতিত করিতেছি তাহাই সোনার কাটি, রূপার কাটি। এই সোনার কাটি রূপার কাটির মোদ্দা কথাটি এই—ইংরেজদের এই যে একটি—রসনাগত নয়—,—কিন্তু—অস্থিগত—মজ্জাগত——মর্ম্মগত স্বদেশানুরাগ, এটি যদি আমরা তাহাদের নিকট হইতে শিখিতাম—তবে আর আমাদের ভাবনা ছিল না। তাহা হইলে এতদিনে আমাদের জাতির শ্রী ফিরিয়া যাইত। কিন্তু তাহা আমরা শিক্ষা করিব না,—ইংরেজদের নিকট হইতে আমরা খঞ্জন পক্ষীর মতো কোর্ত্তার ল্যাজ নাচাইয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতা করিবার হাবভাব শিক্ষা করিব, এবং ডারউইন সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আগামী সংস্করণের নূতন এক অধ্যায়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিব।

(৪) সোনায় সোহাগা প্রবন্ধে লেখক বলিতে চাহিয়াছেন—সকল সমাজই ভাল মন্দে জড়িত। পুরাতনে ঠেস্ না দিলে নূতন এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। পুরাতনের ভিত্তিভূমির উপরই নূতনের মূলপত্তন করাই সংস্কারকদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বাঙ্গালীর উচিত যে যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে অল্পে বিদেশীয় শক্তিসামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়ানো; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করা।—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, এবং আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে। ইহাই হইবে—সোনায় সোহাগা।

(৫) নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন—পুরাতন বঙ্গ হইতেই নব্যবঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। হিন্দু নবদ্বীপ, মুসলমান মুর্শিদাবাদ এবং ইংরেজি কলিকাতা—এই তিন স্থানের তিন সভ্যতা-স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গমের তরঙ্গফেন ধীরে ধীরে জমিয়া নব্যবঙ্গ সংগঠিত হইয়াছে। নব্যবঙ্গের গতি হইয়াছে বিশ্ববিদ্যার দিকে। এই গতিবেগে স্থিতি টলিবার সম্ভাবনা; কিন্তু জাতীয় ভাবের ভিত্তিকে তিল খোঁটায় বাঁধিয়া দিলে আর টলিবার সম্ভাবনা নাই—প্রথম, স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি; দ্বিতীয়, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মনিয়মের সংস্থাপন; তৃতীয়, স্বাধীনতার আপনারই চিন্তাপ্রসূত সেই-সকল ধর্ম্মনিয়ম দ্বারা আপনাকে নিয়ত করা—এককথায় ধর্ম্ম-নিয়মানুসারে চলা। স্বাধীন চিন্তা বলিতে ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা নয়—দেশের স্বাধীন চিন্তা, দেশের স্বাধীন অবস্থায় দেশের মস্তক-স্বরূপ ব্যক্তিদিগের মন হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ সত্য এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তা বিনিঃসৃত হয়, কোনো বিদেশীয় জাতি-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাধিত না হইয়া যেরূপ চিন্তা বিনিঃসৃত হয়। স্বাধীন চিন্তা উস্কাইয়া দিবে জ্ঞান ও প্রেম। নব্যবঙ্গের উৎপত্তির মূল ব্রাহ্মসমাজ; গতির মূল ইংরেজী বিদ্যালয়।

(৬) আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা—দুই শ্রেণীর লোকের দুই (extremist) একটি মিষ্ট ঝোঁক। আর্য্যোচিত কার্য্য নাই অথচ বড়াই আছে, তাহাই আর্য্যামি; আর সাহেব না হইয়াও সাহেবী ধরণ বৃথা অনুকরণ সাহেবিআনা। আর্য্যামি রোগের গোড়ার সূত্রটা—"মোক্ষমূলর বলেছে আর্য্য, তাই মোরা সব ছেড়েছি কার্য্য!" যাঁহারা আর্য্য হইয়াছিলেন তাঁহারা দুই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন—সন্ততির নিয়ম (Law of Heredity) এবং সঙ্গতির নিয়ম (Law of Adaptation)। পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে নিজের সময়ের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া মহাজনেরা অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই আর্য্য নামের গৌরব—কৌলিক নিয়ম আঁকড়াইয়া থাকাতে নহে। আবার সাহেবদের দেখাদেখি কার্য্য করার নাম

সহেবিআনা। বাঙ্গালীরা যদি ইউরোপীয়দিগের ভাবভঙ্গীর অনুকরণ মাত্র না করিয়া তাঁদের সভ্যতার মূল ভাবটি সংগ্রহ করেন ও আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গড়িয়া লন, তবে তাঁহারা একটা জাতির মতো জাতি হইতে পারিবেন। এ সভ্যতার গাত্রে ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ একাধারে সম্মিলিত করিতে পারিলে ভারতের সমস্ত দুঃখদুর্দ্দিনের অবসান হইবে।

(৭) সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা—কবিরাজি মতে ত্রিগুণের সামঞ্জস্যের বিঘ্ন ঘটিলে ব্যাধি হয়। সমাজ শরীরেও সৃষ্টি গত স্থিতি ত্রিগুণের অসামঞ্জস্যে অস্বাস্থ্য ঘটে। এই তিনের সামঞ্জস্য সংঘটনই কবিরাজি চিকিৎসা। প্রথমে বিরেচক দ্বারা একালের ও এদেশের দোষ সমাজশরীর হইতে বাহির করিয়া এদেশের গুণের সহিত একালের গুণ সংযুক্ত করিলেই বঙ্গসমাজের সমস্ত আধিব্যাধা নির্ব্যাধা হইবে।

(৮) বাবুর গঙ্গাযাত্রা হইবার উপক্রম হইয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বাদেশিকতার ঝোঁকে। ইংরেজেরা বাবু হীন অর্থে ব্যবহার করে বলিয়া বাবু তুলিয়া নামে শ্রী যুক্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, তখন এর প্রতিবাদ করিয়া লেখক দেখান যে বাবু সম্মানাস্পদ শব্দ, অর্থ বাবা। বাবা অর্থবোধক শব্দে সকল দেশেই ভদ্রলোককে সম্বোধন করা হয়। ইংরেজী Sire—Sir=বাবা; Lord—hlaward—breadkeeper=অন্নদাতা পিতা; ফরাসী monseiur—my sire=বাবা; ইতালীয় Seignior—গুরুজনশ্রেষ্ঠ=বাবা; রোমের মোহান্ত Pope—papa=বাবা; আমাদের দেশী মোহান্ত সাধু সন্ন্যাসীরাও বাবা। সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদিগকে যেমন বাপ মা সম্ভাষণ করিয়া থাকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া আসিতেছে। অতএব বাবু ত্যাগ অকর্ত্তব্য।

বাবুর গঙ্গাযাত্রা ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি ৩০ হইতে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। এই গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক ব্যাধির ও ঔষধেরও উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রকোপ ও চিকিৎসার প্রয়োজন এখনও সমাজশরীরে বিলক্ষণ আছে। এই চিন্তাশীল ঋষি স্বদেশহিতৈষীর হিতবচন পাঠকেরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিয়া নিজেরা তাহা হইয়া উঠিতে পারিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও ব্যাধিমুক্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাসাহিত্যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ-পুস্তকের নিতান্তই অভাব। এই প্রবন্ধমালা হইতে সেই অভাব অনেকখানি পূরণ হইবে। লেখকের স্বদেশপ্রাণতা, দার্শনিক ঋষির যুক্তিধারা ও রসিক কবির রহস্যপ্রবণ হাস্যপ্রবাহ প্রত্যেক প্রবন্ধকে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ করিয়াছে—এই প্রবন্ধগুলির এই বিশেষ গুণ

কাব্যমালা—শ্রীরিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন। মোটা ভালো এন্টিক কাগজে উত্তম ছাপা, ১৬৭ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

প্রকাশক বলিয়া দিয়াছেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলি কবির মধ্যম বয়সের রচনা। যাঁর মধুবর্ষী লেখনী স্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, যে রূপক কাব্যের জুড়ি বঙ্গসাহিত্যে আর নাই, সেই কবিরই রচনা এই কাব্যমালা এবং সেই অদ্বিতীয় কাব্যের সহোদর এই কাব্যমালা। এই কাব্যমালা বঙ্গবাণীর কণ্ঠের উজ্জ্বল ভূষণ হইয়া থাকিবে। গ্রন্থকারের এইসব সরস কবিত্বমধুর রচনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, প্রকাশক সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করাতে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকেরা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইল। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের বিশেষত্ব তাঁর নিত্যনব নব ছন্দ ভাবানুযায়ী পদরচনা এবং সর্ব্বাঙ্গীন অথচ প্রচ্ছন্ন একটি কৌতুকরস। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যচর্চ্চা ছাড়িয়া তাঁর প্রতিভাকে দার্শনিকতত্ত্বচর্চ্চায় নিযুক্ত করিয়া ভালো করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন তার বিচার পরে হইবে; কিন্তু আমাদের ক্ষোভ হয় যে এখন স্বপ্নপ্রয়াণ কবির যত্ন থেকে আমরা বেশী কিছু পাইলাম না।

এই কাব্যমালাকে নবমালিকা বলা যাইতে পারে—এতে নটি কাব্যকুসুম গ্রথিত হইয়াছে—(১) যৌতুক না কৌতুক, (২) গুরু আক্রমণ কাব্য, (৩) মেঘদূত, (৪) সেরাপালি, (৫) অন্তিম বাসনা, (৬) বাসন্তী পদাবলী, (৭) তেতালার ছুপুর রাত্রি, (৮) বরাহনগরের উদ্যানে, (৯) পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

'যৌতুক না কৌতুক' এবং 'গুরু আক্রমণ কাব্য' যে কৌতুকরচনা তাহা নামেই মালুম। 'মেঘদূত' কবিতায় সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের ব্যাপার ও কবিত্ব আশ্চর্য্যরকম দক্ষতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। 'সেরাপালি' কবিতাও হাস্যরসপ্রধান। পরের তিনটি কবিতা বেশ ছোট। 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম' উপনিষদের গভীর ঋষীর প্রসন্ন ও মধুর অনুবাদ। দার্শনিক কবির রচনা উপনিষদ, অনুবাদ করিয়াছেন দার্শনিক কবি; এবং সেই জন্যই উপনিষদের তত্ত্ব ও কবিত্ব দুই অনুবাদে হুবহু বজায় আছে।

আমরা এই কাব্যমালা বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিতে আশা করি।

ভ্রান্তি-বিজয়—শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আনুল হুগলি, জেলা হাওড়া, ৪৮০ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

ইহা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচন। ইহাতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ সৃষ্টির কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবর প্রবর্ত্তন, কৌলীন্য ও মেল বন্ধনের ইতিহাস, অকুলীন সপ্তশতী গ্রহবিপ্র বর্ণহাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের ইতিহাস, ব্রাহ্মণসমাজে নবশাখ কায়স্থ মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির অবস্থা ও সম্পর্ক ও ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয় সমালোচনা করা হইয়াছে। যাঁরা সামাজিক ইতিহাসের তথ্য জানিতে উৎসুক তাঁরা এই বই পড়িলে অনেক বিষয় জানিতে ও ভাবিতে পারিবেন।

ত্রিরাত্রি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৪৩ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। পাঁচ সিকা।

কতকগুলি পত্রে নানাবিধ বিষয় ও ভাব আলোচনা করা হইয়াছে। রচনার ভাষা মিষ্ট ও স্বচ্ছ; লেখকের সংস্কারমুক্ত অনেকগুলি চিত্রের চিত্র এই চিঠিগুলি যৌবনের ভাবাবেশের রঙে রঙীন ও কিছু উদ্দাম। কবিতাগুলিতে ছন্দের ত্রুটি আছে। মোটের উপর রচনায় মধ্য হইতে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য বা বস্তু আহরণ করিতে পারা গেল না। এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে লেখক প্রণয়-ব্যাপারে সমস্ত অপেক্ষা হৃদয়কেই মান্য ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চান।

শিক্ষার একটা কথা—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা, কলিকাতা। চার আনা।

এই পুস্তিকায় শিক্ষার স্বরূপ উদ্দেশ্য প্রণালী ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া বলা হইয়াছে—"শিক্ষার স্বরূপ এক কথায় যেমন স্বারাজ্য, স্বারাজ্যের লক্ষণ এক কথায় তেমনই শক্তি।" এই বিষয়টি বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে—লেখকের চিন্তাশীলতা,

ভাবের ও যুক্তির স্বচ্ছতা ও ভাষার উপর অধিকার উপভোগ্য। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই ইহা পাঠ করিয়া দেখা উচিত, এর মধ্যে ভাবিবার অনেক খোরাক আছে।

বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী—প্রকাশক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১১৪।১ হরিশ মুখুজ্জে রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৯১ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

বইখানি প্রসিদ্ধ বারীন্দ্র ঘোষের লেখা; কাগজ ছাপা বাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট শোভন সুন্দর। এ ছাড়া প্রশংসার আর কিছু নাই। ছন্দে ভুল, গরমিল, অস্পষ্টতা, ভাবের জড়তা প্রায় সব কবিতাতেই আছে। বারীন্দ্র নারায়ণ পত্রে লিখিয়াছেন—"আমি কবি হইতে পারি।" এই ভ্রান্ত ধারণা তাঁর কেন হইল যে তাহা তাঁর রচনা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আর কিছু হইতে পারেন, কিন্তু কবি নন, ইহা নিশ্চয়। কৃষ্ণের বাঁশীর রূপক বেশ সুসঙ্গত হয় নাই।

প্রধীকর্ম্মকার বা কর্ম্মকার-ক্ষত্রিয়—প্রকাশক রায় বর্দ্ধণ, ৫।৩ জরিপ লেন, বিডন-স্কোয়ার, কলিকাতা। এক টাকা।

কর্ম্মার কর্ম্মকার বা কামার জাতি ক্ষত্রিয়, অস্ত্র গঠন তাদের ব্যবসায়, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে গুণকর্ম্মবিভাগে জাতিবিভাগ ও কর্ম্মকারদের পূর্ব্বাপর অবস্থার পরিচয় পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে এবং কামার যে দ্বিজ তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাস্তু। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, উন্নতপদবী অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা, আভিজাত্যগৌরব জাগ্রত হইতেছে ইহা সুলক্ষণ। প্রত্যেক জাতিই যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, জন্মগত ব্রাহ্মণেরা যে সকল সদ্‌গুণ একচেটিয়া করিয়া রাখেন নাই, প্রত্যেক জাতির লোকই যে স্ব স্ব গুণকর্ম্ম অনুসারে উচ্চ বা নীচ বলিয়া গণ্য হইবে এ বোধ দেশের লোকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিলে অনেক দুর্দ্দশা মোচন হইবে। আমরা জন্মহেতু শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির গুণহেতু শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব বিচার হয় দেখিতে চাই। কিন্তু কোনো জাতিকে-জাতিই সমষ্টি ভাবেই অপর কোনো জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ তাহা বিচারসহ নয়, সত্য নয়।

অন্ধের চক্ষুঃদান—শ্রীবলহরি দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বৃন্দাবন গৌরাঙ্গ সমাজ। বিনামূল্যে বিতরিত।

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব ও স্বরূপ কি, প্রকৃত বৈষ্ণব কে, বৈষ্ণবের ধর্ম্মসাধনপ্রণালী প্রভৃতি কিরূপ, এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে।

চয়ন—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—সেন রায় এণ্ড কোম্পানী, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, কলিকাতা। ১২৭ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। বারো আনা।

উপনিষৎ, বৌদ্ধ পুরাণ ও জাতক, জৈন শাস্ত্র, রামায়ণ, প্রভৃতি প্রাচীন দেশী পুস্তক হইতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপাখ্যান কতকগুলি এবং প্লেটো ডায়োজিনিস মহম্মদ তুলসীদাস তুকারাম হাফিজ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনের আখ্যায়িকা সহজ সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বালকবালিকাদের পাঠের উপযুক্ত।

মুন্সী-রাক্ষস।

জন্ম-অপরাধী—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা। প্রকাশক, কর-মজুমদার এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, কলিকাতা। ২২৯ পৃষ্ঠা, দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস। ভদ্রবংশীয় উচ্চশিক্ষিত যুবক বিনোদলালের হস্তে তার সুশীলা সাধ্বী পত্নী অপেরার অকারণে উঠিতে-বসিতে ইতরোচিত নিগ্রহ ভোগ এবং পরিণামে মৃত্যুর শোচনীয় করুণ কাহিনী। বিনোদলাল অসহায়া একটি বালিকাকে সমাজের একরোখা ব্যবস্থায় ষোল আনা নিজের কায়দার মধ্যে পাইয়া তাকে দিনের পর দিন দেহে এবং মনে নির্ম্মম লাঞ্ছনা ভোগাইয়া খুন করিল, কিন্তু মানবীয় আইনে এমনতর খুনের জন্য কোনোরকম শাস্তির ব্যবস্থা নাই। হৃদয়বানের চোখে আততায়ীর ছোরাও এর চেয়ে ক্ষমার্হ। সমাজে এরকম বর্ব্বরতার চিত্র খুব সুলভ বলিলে সমাজের প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করা হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র এই পঙ্গু পক্ষপাতগ্রস্ত সমাজেই এরূপ ব্যাপার ঘটা সম্ভব একথা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায়। বর্ণনার অনাড়ম্বর স্বাভাবিকতায় অপেরার দুঃখ মনকে স্পর্শ করে, বিশেষতঃ বইখানি লেখিকার হৃদয় দিয়া লেখা। কিন্তু আমাদের মনে হয় বিনোদলালের চরিত্রকে অদ্ভুত অস্বাভাবিক করিয়া লেখিকা নিজের উদ্দেশ্যকে কতকটা ব্যর্থ করিয়াছেন। যাহারা অপ্রকৃতিস্থ তাহাদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা ফলপ্রদ হইতে পারে, নভেল লেখা পণ্ডশ্রম হয়। তবে লেখিকা যদি বলেন, যে, এদেশের প্রায় সমস্ত পুরুষজাতটাই নারীদের সঙ্গে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অপ্রকৃতিস্থ, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার থাকিবে না। অপেরা না সহিতে পারিয়া জুড়াইবার জন্য যদি কেবল মরিত, সেটা যতবড় ট্রাজেডি হইত, সে যে সহিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টাতেই তিলতিল করিয়া মরিল এটা তার চেয়ে ঢের বড় ট্রাজেডি হইয়াছে। কিন্তু সহিয়া থাকা ছাড়া উপায় আর কি ছিল? সমাজের বিবেচনায় পাতিব্রত্য মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় জিনিষ। স্বামী দুর্দ্দান্ত পাপাচারী দানব হইলেও বিধিদত্ত স্বাভাবিক বিচারশক্তিকে বিকৃত করিয়া তাহাকে দেবতা মনে করিতে হইবে, পদে পদে নিজের অন্তরের দেবতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে ইহাই ধর্ম্ম। তবু যদি দেশের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় বা শিক্ষার সুযোগে নারীদের ভরণপোষণ ব্যাপারে আত্মপর হইবার সুবিধা থাকিত তবে হয় ত অপেরাকে মরিতে হইত না। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার সহজে হইবে না, শীঘ্র হইবে না; কিন্তু যত দিনেই হোক, যেমন করিয়াই হোক,—নারীদের দ্বারাই হইবে, তাঁহাদের নিজেদের শক্তিতে, নিজেদের সাধনায়। এদেশের পুরুষ-জাত সমাজে রাষ্ট্রে ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্যাধিগ্রস্ত, সে ব্যাধি দুশ্চিকিৎস। নারীরা যতদিন তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন, ততদিন কিছুই হইবে না, কপালে করাঘাত করিলে কপাল ফিরিবে না। সে হিসাবে লেখিকার মনে জন্ম-অপরাধীদের জন্য যে বেদনা জাগিয়াছে, এবং সাধারণ বাংলা উপন্যাসের বাঁধা কতগুলি পথ ছাড়িয়া তিনি যে নারী-জাতির অনেকদিনের সঞ্চিত কান্নাকে একটুখানি ভাষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার অন্তরের সজীবতা এবং সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের পুস্তক-প্রকাশকেরা দুএকজন বাদে সকলেই বইয়ের মলাটে তাঁদের হাস্‌কা রুচির পরিচয় চিরটা কাল নির্ব্বিঘ্নে দিয়া আসিতেছেন; নববধূর করতল-শোভার জন্যই সাহিত্য জিনিষটার সৃষ্টি নয়, এটা কিছুতেই তাঁদের বুঝানো যায় না। কিন্তু কোথায় কোন্ জিনিষটি মানায় সেই সহজ যাথাতথ্য জ্ঞানেরও তাঁহাদের অভাব ঘটিতেছে দেখিতেছি। অন্তত এই শোচনীয় ট্রাজেডিখানির মলাট এতটা চকচকে ঝকঝকে না হইলেও বোধ হয় নববধূ-সমাজে বিদ্রোহ হইত না। বইটির দেড়টাকা দাম সস্তা বলিয়া বোধ হইল। সন্ধানী-আলো

বিবিধ প্রসঙ্গ

মোটা কাপড়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্গের নগর ও পল্লী "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" গানে মুখরিত হইয়াছিল। সেই সময় যদি আমরা সত্য-সত্যই মোটা কাপড় পরিতে আরম্ভ করিতাম, যদি জোড়া-প্রতি দুচার আনা বেশী দাম দিয়া দেশী কাপড় পরিতে রাজী হইতাম, তাহা হইলে স্বদেশী কাপাসের দেশী সুতার দেশী কাপড় বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। কিন্তু তখন কতক লোক ভাবুকতার ধারা চালিত হইয়া কেবল গান করিল, যাহারা দেশী জিনিষের কারবার আরম্ভ করিল তাহাদের মধ্যে কতক লোকের অসাধুতার জন্য ও কতক লোকের ব্যবসাতে অনভিজ্ঞতার জন্য স্বদেশীর ক্ষতি হইল, বঙ্গের অধিকাংশ লোক অধিক দিন ধরিয়া দেশী কাপড়ের জন্য কিছু বেশী দাম দিতে রাজী হইল না, এবং অল্প লোকেই বুঝিল যে মিহি সুতার পাতলা কাপড় ছাড়িয়া মোটা সুতার মোটা কাপড় ব্যবহার না করিলে দেশী কাপাস দেশী সুতা ও দেশী কাপড়কে উৎসাহ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না। এইসব কারণে কাপড়ের ব্যবসাতে ও ব্যবহারে স্বদেশী নীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে-সব লোক জোড়া-প্রতি দুচার আনা বেশী দাম দিতে রাজী হন নাই, তাঁহারা এখন জোড়া-প্রতি তিন চার টাকা বেশী দাম দিয়া কাপড় পরিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন লজ্জাবোধ বা অনুতাপ হইতেছে কি না, জানি না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহারা ভ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন কি না, জানি না। যাঁহাদের বেশী দাম দিয়া কাপড় পরিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের কোন প্রকারে লজ্জা রক্ষা হইতেছে; কিন্তু দরিদ্রতর লোকদের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এবং দরিদ্রতমদিগের লজ্জারক্ষা হইতেছে না।

কিন্তু এখন স্বয়ং শুধু অনুতাপ করিয়া বা লজ্জা বোধ করিয়া, কিম্বা অপরকে দোষ দিয়া কোন লাভ নাই। প্রতিকার-চিন্তা ও প্রতিকার-চেষ্টা বিলম্বে হইলেও তাহা যে বৃথা ও ব্যর্থ হইবেই, এমন কোন কথা নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে স্বদেশীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া পুরাতন উৎসাহ নবীভূত হয়। "প্রবাসী"ও স্বদেশী মতের ও চেষ্টার সমর্থন বরাবরই করিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধী গুজরাতে ও অন্যত্র যে মোটা কাপড় ব্যবহারের সমর্থন করিতেছেন, তাহাও প্রবাসীতে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় যুক্তি সহকারে অনেক দিন হইল করিয়াছেন। তথাপি মোটা সুতার মোটা কাপড়ের সমর্থন কেন করি, তাহা আর-একবার সংক্ষেপে বলি। যে তুলায় মিহি সুতা হইতে পারে, এখন তাহা ভারতবর্ষে জন্মে না, অন্ততঃ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে না। আমরা বিদেশের কোন জিনিষই ব্যবহার করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়, তাহা রক্ষা করাও যায় না। উচিত নয় এই জন্য, যে, স্বদেশের মত বিদেশের লোকেরাও মানুষ এবং তাহাদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু স্বদেশে যাহা জন্মে এবং যাহা দ্বারা প্রয়োজন সাধন ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে, তাহা ফেলিয়া বিদেশী কিছু ব্যবহার করাও উচিত নহে। দেশে যে তুলা জন্মে এবং যাহার চাষ ইচ্ছা করিলেই আমরা সহজে বাড়াইতে পারি, তাহা হইতে যে মোটা সুতা হয়, তাহার কাপড় আমরা যদি ব্যবহার করি, তদ্দ্বারা তিন শ্রেণীর লোকের জীবন ধারণের সাহায্য হয়; যাহারা কাপাসের চাষ করে, সুতা প্রস্তুত করে, ও যাহারা কাপড় বুনে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু দান করিলে নিরন্ন লোকদের কিছু সাহায্য করা হয় বটে, কিন্তু এরূপ দান যাহারা গ্রহণ করে তাহাদের মনুষ্যত্ব হ্রাস পায়, যদিও তাহা সত্ত্বেও আমরা তাহাদের জীবন রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করি; কেন না, আজ যে ভিক্ষা গ্রহণ করিল পরে সে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। তথাপি যাহাতে মানুষকে ভিক্ষা দিতে না হয় এবং কেহ ভিক্ষা হইতে বাধ্য না হয়, দেশের অবস্থা এইরূপ করিবার দিকে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া তদ্রূপ চেষ্টা করাই বিধেয়। এইজন্য আমরা কেবল মাত্র দেশী তুলার দেশী সুতার দেশী কাপড়ের ব্যবহার সমর্থন করি। দেশী তুলার সুতা ব্যবহারের আর-এক সুবিধা এই যে ঐ সুতা, বহুমূলধনসাধ্য কারখানা স্থাপন না করিয়াও, গৃহে গৃহে চরখার দ্বারা

কাটা যাইতে পারে। এই হেতু চর্‌খার পুনঃ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

কথা উঠিতে পারে, যে, চর্‌খায় যে-সুতা কাটা হইবে তাহা দামে কলের সুতার সহিত টক্কর দিতে পারিবে কি না এখন চর্‌খার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে টক্কর দিতে পারিবে না। কিন্তু সব প্রদেশেই লক্ষ লক্ষ নারী আছেন যাঁহারা অবসর সময় সুতা কাটা অপেক্ষা অধিক অর্থকর কাজে যাপন করেন না। তাঁহারা সুতা কাটিয়া যদি কম দামও পান, তাহাতে কোন লোকসান নাই; যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। যাঁহারা নিজে নিজের জামা সেলাই করেন, তাঁহারা ভাবেন না, যে, তাঁহারা দর্‌জির সঙ্গে টক্কর দিতে পারেন কি না; যাঁহারা নানা-রকম উলের কাজ করেন, কাপড়ে ফুল তুলেন, তাঁহারাও বাজারে ঐসব কাজের কি দর, তাহার খবর লইয়া দাম কষিয়া কাজে প্রবৃত্ত হন না। উল বুনিবার সময় যেমন গল্প করাও চলে, চর্‌খায় সুতা কাটিবার সময়ও তাহা চলিতে পারে। যে-সব স্ত্রীলোক গরীব এবং যাঁহাদিগকে নিজের রোজ্‌গারের উপর সম্পূর্ণ বা অংশতঃ নির্ভর করিতে হয়, তাঁহারাও নিজের পরিবারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প উপার্জ্জন, কাপড়ের কলে, চা-বাগানে, বা অন্য কোন স্থানে চাকরী দ্বারা উপার্জ্জন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারেন। কারণ, বাটীতে বসিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অপমান ও নৈতিক বিপদ নাই, যাহা সমুদয় চাকরী-স্থানে আছে।

চর্‌খার এরূপ উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, যাঁহার দ্বারা একজন মানুষই এখনকার চেয়ে বেশী সুতা ঘরে বসিয়া কাটিতে পারিবে। সুতাকাটা ও অন্যান্য কুটীর-শিল্প কারখানার শিল্পের সঙ্গে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা, সমানে সমানে না হউক, কাছাকাছি প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, যখন মানুষের দৈহিক শক্তির পরিবর্ত্তে গ্রামে গ্রামে কুটীরে কুটীরে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার সম্ভব হইবে। ভবিষ্যতে যে ইহা হইবে, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু পরে যাহাই হউক, এখন দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের লোকদের যত কাপড়ের দরকার তত কাপড় দেশে প্রস্তুতও হয় না, বিদেশ হইতে আমদানীও হয় না দেশে আরও কাপড় উৎপন্ন করিতে হইবে; এবং তা দেশের তুলা হইতে কাটা মোটা সুতার হওয়া দরকার কেন, তাহা আগে বলিয়াছি। মোটা কাপড় যাঁহারা ক প্রস্তুত করিতে চান, করুন। কল যথেষ্ট নাই; স্থা করাও শক্ত, মূলধন সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়, কল বিদে হইতে পাইতেও বিলম্ব হইবে, এবং কল কিনিতে অনেক টাকা বিদেশে চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া, কলে মজুর হওয়া অপেক্ষা, সম্ভব হইলে, ঘরে বসিয়া স্বাধী উৎপাদক হওয়া সবদিক্ দিয়াই বাঞ্ছনীয়।

আজকাল কাপড়ের দাম যেরূপ বেশী, তাহাতে দেশী তাঁতি ঘরে বসিয়া মোটা কাপড় বুনিলে তাহাতে তাহার পোষাইতে পারে। এখন দরকার, আমাদের মোট কাপড় পরিতে প্রস্তুত হওয়া। এরূপ বলিলে, মনে করিলে বা কাজে করিলে চলিবে না, যে, মিহি সুতার কাপড় ন পাইলে মোটা কাপড় পরিব। প্রতিজ্ঞা করিতে হই যে, আমরা মোটা কাপড়ই পরিব। ধনী লোকদের এব সচ্ছল অবস্থার লোকদেরই সর্ব্বাগ্রে মোটা কাপড় ব্যবহার করা উচিত। কারণ, যদি এরূপ কাপড়ের দাম বেশী লাগে, তাহা হইলে তাঁহারা উহা সহজেই দিতে পারিবেন যদি মোটা কাপড় ব্যবহার দারিদ্র্যের চিহ্ন বলিয়া একট চলিত ধারণা থাকে এবং যদি সেই ধারণা বশতঃ বাস্তবিব গরীব যাঁহারা তাঁহারাও মিহি কাপড় ব্যবহার করিতে বাধ হন, তাহা হইলে এই ধারণা ঘুচাইয়া দেওয়া ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

মোটা কাপড় ব্যবহারের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে। উহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, ইহা মানিতেই হইবে। উহাতে মিহি কাপড় অপেক্ষা আচ্ছাদন ও লজ্জারক্ষা ভাল করিয়া হয়, ইহাও স্বীকার্য্য একটা আপত্তি এই, যে, উহা ভারী। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মোজা পায়জামা গেঞ্জি কামিজ চাপ্‌কান চোগা পরিলে, কিম্বা মোজা প্যাণ্টালুন গেঞ্জি কামিজ ওয়েষ্টকোট নেক্‌টাই কলার কোট পরিলে, তাঁহাদের পোষাকের ওজন যত হয়, মোটা ধুতি, মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী ও মোটা চাদরের ওজন তার চেয়ে বেশী হয় না। অন্ততঃ পক্ষে জোর

করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে, যে, মোটা কাপড়ের ভার পুরাতনতার বোঝা অপেক্ষা বেশী নহে। গ্রীষ্মাধিক্য বা ঘর্ম্মাধিক্যও শেষোক্ত পোষাকে বেশী হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মোটা কাপড় বড় খস্‌খসে। কিন্তু আশা করি, পমর্মী পাজামা চাপ্‌কান কোট জ্যাকেট র‍্যাপার প্রভৃতিতে যাঁহাদের গায়ে আঁচড় লাগে না, মোটা সুতার কাপড়ও তাঁহাদের গায়ে আঁচড় লাগিবে না। নারীদের গায়ে অলঙ্কারের আঁচড় যখন লাগে না, তখন মোটা কাপড়ের আঁচড়ও না লাগা সম্ভব। তাহার পর সৌন্দর্য্যের কথা। আমাদের চোখে ত মোটা কাপড় বেশ ভালই দেখায়। কটকে ও পুরীতে মোটা সুতার লাল মোটা পাড়ী ঢাকাই শান্তিপুরে মাদ্রাজী মিহি সাড়ী অপেক্ষা অনেক কম দামে পাওয়া যায়। উহা বাঙ্গালী মহিলারা পরিধান করিলে প্রশংসিত হয় ও উহার দাম কি খুব বেশী এরূপ জিজ্ঞাসাও হয়, জানি। সৌন্দর্য্য কি বাহিরের জিনিষ নয়; ভিতরে যে প্রাণ, ভাব, বা আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আধার। তা ছাড়া, বাহ্য সৌন্দর্য্য জীবনের চূড়ান্ত নিয়ামক নহে। নারীগণ অলঙ্কারের বোঝা যখন বহিতে পারেন, তখন মোটা সাড়ীর বোঝাও নিশ্চয়ই বহিতে পারিবেন। দেহ আচ্ছাদন ও লজ্জা রক্ষা মোটা কাপড়েই ভাল হয়, বিশেষতঃ তাঁহাদের যাঁহারা শেমিজ ও জামা ব্যবহার করেন না। যদি ফ্যাশনের কথা বলেন, তাহা হইলে বলি, উহার দ্বারা জাতীয় আদর্শ নিয়মিত হইতে পারে না। ফ্যাশন কখন কখন দুর্নীতিরও পরিপোষক হয়; অনেক সময় ফ্যাশন অপচয়কে প্রশ্রয় দেয়। উহার কারণ ও ভিত্তি অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, কেহ যদি ফ্যাশনের অনুরোধে কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকে, তবে তাহার মনুষ্যত্ব কম, ইহা না বলিয়া উপায় নাই।

পণ্ডিতা সরলা দেবী চৌধুরাণী স্বয়ং মোটা সুতার সাড়ী ও জামা ব্যবহার করিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া স্বদেশী-প্রীতিকে পুষ্ট করিতেছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

যাঁহারা দেশী তুলা হইতে কাটা দেশী সুতার মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে চান, তাঁহারা অনেকে না জানিতে পারেন, যে, এরূপ কাপড় কোথায় পাওয়া যায়। যে-সব দোকানে এইরূপ কাপড় বিক্রী হয়, আমরা সংবাদ পাইলে তাহাদের ঠিকানা পাঠকবর্গকে বিনামূল্যে জানাইতে রাজী আছি। কিন্তু আগে হইতেই জানাইয়া দিতেছি, যে, জিনিষ ঠিক্ দেশী হওয়া চাই। সম্পূর্ণ বা আংশিক বিদেশী মাল দেশী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলে তাহাও অচিরে জানা পড়িবে।

—

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের স্বাস্থ্য

গত মাসে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের স্বাস্থ্যের বিষয় লিখিয়াছিলাম। ১৯১৯ সালের জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কোন প্রদেশে জন্ম ও মৃত্যু কত হইয়াছিল, গেজেট অব্ ইণ্ডিয়াতে তাহার সংখ্যা যেরূপ ছাপা হইয়াছিল, তদনুসারে আমাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার পর অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের জন্মমৃত্যুর হিসাব গেজেটে ছাপা হইয়াছে। এই ছয় মাসের হিসাব নীচে দিতেছি।

১৯১৯ জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বরের জন্মমৃত্যুর হিসাব

প্রদেশ	জন্ম	মৃত্যু	জনসংখ্যার বৃদ্ধি(+) হ্রাস(—)।
দিল্লী	৫২৩০	৩৮৩০	+ ১৪০০
বাংলা	২০৫০৯৬	২৯৯৪০৬	— ৩৪৩১০
বিহার উড়িষ্যা	২২৪০০১	৩৫৪২৭৯	—১৩০২৭৮
আসাম	৩৫০০২	৭৬৭২৪	— ১৭২২
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৪০৩৫৭	৩৬০৩৫৩	— ৯৬৯৬
পঞ্জাব	১৬৯৮৪৮	১২০৫১৭	+ ৯৩৩১
উ-প সীমান্ত	১২২৩৪	১৫৪৭১	— ৩২৩৭
মধ্যপ্রদেশ	৯২৫৬৭	১৬৮৩৮৪	— ৫৮১৫
মাদ্রাজ	২২২২৭৭	২৫১৩৩৭	— ২৯০৬০
কুর্গ	৮৮৭	১৮২৯	— ৯৪২
বোম্বাই	১১৫৮০৭	১৫৯২২৫	— ৪০৪১৮
ব্রহ্মদেশ	৬৭০৭৫	৮২২৭১	— ১৫১৯৬

দিল্লী ও পঞ্জাব, এই দুটি প্রদেশ ছাড়া আর-সব প্রদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছিল। মৃত্যু অধিক হওয়া প্রযুক্ত বিহার-উড়িষ্যাতেই জনসংখ্যার হ্রাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। এই তিন মাসে ব্রিটিশভারতে ৪০২৯৪৫ জন মানুষ কমিয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী তিন মাসের হিসাব নীচে দেওয়া যাইতেছে।

১৯১৯ অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর মাসের জন্মমৃত্যুর হিসাব।

প্রদেশ	জন্ম	মৃত্যু	জনসংখ্যার বৃদ্ধি(+) হ্রাস(—)।
দিল্লী	৬৪৯৬	৫৪৭৫	+ ১০২১
বাংলা	৩৯২০০২	৪৫৯৬৯৭	— ৬৭৬৯৫
বিহার-উড়িষ্যা	২৮৫৩২০	৩৫১৯২২	— ৬৬৬০২
আসাম	৬১৭২৮	৬৮৪৬১	— ৬৭৩৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৬৭৩৭২২	৪৯১৭৬০	— ১৮০৩৮
পঞ্জাব	২৭১৩৮৭	১৬৭৬৬০	+১০৩৭২৭
উ-প সীমান্ত	১৯৪২৯	১৪৮৫৬	+ ৪৫৭৩
মধ্যপ্রদেশ	১৬০৯৬০	১৪৮২৬৩	+ ১২৬৯৭
মান্দ্রাজ	২৯৩৪৮০	২৬০৯৭৯	+ ৩২৫০১
কুর্গ	১০৩২	১২৯৫	— ২৬৩
বোম্বাই	১৬৩৩১২	১৩৮৬০৩	+ ২৪৭০৯
ব্রহ্মদেশ	৮৫০১৫	৭১২৭১	+ ১৩৭৪৪

এই তিন মাসে দেখা যাইতেছে, পাঁচটি প্রদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী আছে, আগেকার তিনমাসে যে দুটি প্রদেশে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা বেশী ছিল, তথায় জন্ম বেশী আছে, এবং আগে বাকী যে-পাঁচটি প্রদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী ছিল তথায় জন্মের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ইহাও লক্ষিত হইতেছে, যে, আগেকার তিনমাস ও পরবর্ত্তী তিনমাস উভয় ত্রিমাসেই যে পাঁচটি প্রদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হইয়াছিল, সেই পাঁচটি প্রদেশেও শেষ ত্রিমাসে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর আধিক্য পূর্ব্ব ত্রিমাস অপেক্ষা ন্যূন হইয়াছিল, অর্থাৎ এই পাঁচটি প্রদেশেও স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। তাহার অন্যতম কারণ শীতের আবির্ভাব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সমুদয় ব্রিটিশ ভারতে শেষ তিনমাসে মোট ৩৩৬৪১ জন মানুষ বাড়িয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের শেষ ছয় মাসের হিসাব একত্র করিলে দেখা যায় যে মোটের উপর ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ঐ অর্দ্ধ বৎসরে ৩৬৯৩০৪ জন কমিয়াছিল। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, উত্তর ভারতে, পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদ দিলে, আর-সব প্রদেশগুলি ছয় মাস বরাবর অস্বাস্থ্যকর ছিল। অর্থাৎ আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার-উড়িষ্যা, বাংলা ও আসাম ছয় মাসের মধ্যে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত বা পরিবারিক সুখদুঃখ লইয়া যাহার মন সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে না, দেশের ভালমন্দের চিন্তা মধ্যে মধ্যে তাহার মনকে অধিকার করে। তখন দেশের দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞানতা, দুর্নীতি, সামাজিক কুপ্রথা, ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা, অবিচার অত্যাচার—নানা বিষয় মনকে সংক্ষুব্ধ করে। ইহার মধ্যে প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ আছে। সকল দিকে উন্নতি না করিয়া কোন একটি বিষয়ে স্থায়ী উন্নতি করা যায় না। কিন্তু এক-একটি প্রশ্ন বা সমস্যাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধরিলেও, এবং চেষ্টা কেবল তাহাতেই নিয়োজিত করিলেও, কতকদূর অগ্রসর হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দেশে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ইহার দরিদ্রতা, অস্বাস্থ্যকরতা, ও অজ্ঞানতা কিছু হ্রাস করা যাইতে পারে। সেইজন্য যদিও সকল দিকেই উন্নতি করিবার সম্পূর্ণ আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকিবে তথাপি আমরা নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অবসর সুযোগ ও রুচি অনুসারে যে যে-দিকে যতটা পারি চেষ্টা করিতে থাকিব, এবং অন্যদিকে যাঁহারা কাজ করিতেছেন সম্মতি জ্ঞাপনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে থাকিব।

আমাদের সম্মুখে যতগুলি সমস্যা উপস্থিত, তাহার মধ্যে জীবনমরণের সমস্যার কথা না ভাবিয়া উপায় নাই। কেমন করিয়া অকালমৃত্যু কমান যায়, তাহার উপায় চিন্তা সকলকেই করিতে হইবে। মানুষ আগে বাঁচিয়া থাকিলে তবে ত তাহার উন্নতির কথা ভাবিব। বাংলা দেশে মানুষের অকালমৃত্যু হইতেছে রোগে, এবং অর্দ্ধাশনে ও অনাহারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অন্নসংস্থান উভয়ই আমাদিগকে করিতে হইবে।

—

বাংলার বড় শহরগুলির স্বাস্থ্য।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় বৎসরের দুটি সপ্তাহের খবর সরকারী গেজেট হইতে দিতেছি। ইণ্ডিয়া গেজেটে ২৮শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বাংলাদেশের ১২টি শহরের জন্মমৃত্যুর সংখ্যা পড়িলে দৃষ্ট হয় যে কেবলমাত্র ভাটপাড়ায় জন্ম ৮ ও মৃত্যু ৭ হইয়াছিল, আর সর্ব্বত্র জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী। যাহাদের

লোকসংখ্যা ত্রিশ হাজারের অধিক সেই-সব শহরের জন্মমৃত্যুর সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। ১২ টি শহরের মোট জন্মসংখ্যা ৩৬৬ এবং মোট মৃত্যুসংখ্যা ১২০০।

তাহার পর কলিকাতা গেজেটে ৫০০০০ ও তদূর্দ্ধ-সংখ্যক অধিবাসী যে-সব শহরের, ১৩ই হইতে ১৯শে জুন পর্য্যন্ত সপ্তাহের তাহাদের হিসাবে দেখি, কলিকাতা, হাওড়া, ঢাকা, মাণিকতলা, ও ভাটপাড়া, এই পাঁচটি শহরেরই জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী; মোট জন্মসংখ্যা ৩১২, মোট মৃত্যুসংখ্যা ৭৪৩। ইহার পর সপ্তাহে জন্ম হয় ৩৩১, মৃত্যু ৬৮৩। কেবল মাত্র ঢাকা শহরে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম একটি বেশী হয়।

ক্রমাগত মাসের পর মাস একই রকম কথা পড়িয়া আমাদের নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামেই মনুষ্যত্ব। এ বিষয়ে গুরুতর কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু গবর্ণমেণ্টের মুখ তাকাইয়া থাকিলে কি হইবে? প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে ও পাড়ায়, এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরগণ, মিউনিসিপাল কমিশনারগণ, এবং গ্রাম্য ইউনিয়নের সভ্যগণ সকলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিলে কিছু ফল নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

—

বালিকা ও নারীদের শিক্ষা।

বাংলা দেশে বালিকা ও নারীদের শিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। এইজন্য, ১৯১৮—১৯ সালে পাঠশালা, স্কুল ও কলেজে মোট ৮২১৫টি ছাত্রী বাড়িয়াছিল জানিয়া কিছু সুখ হয়। হিন্দু ছাত্রীদের সংখ্যা ১৬৩৫টি কমিয়াছিল, মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যা ৯৯৪৮টি বাড়িয়াছিল। হিন্দু বাঙালীদের পশ্চাৎদিকে গতি হইল কেন? নারীদের নিরক্ষরতাই সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া কি? বাঙালীদের গর্ব্ব করা যে তাঁহারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মধ্যে উন্নততম জাতি। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এখন করিব না, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় তাঁহারা উন্নততম নহেন। ১৯১৭—১৮ সালে কয়েকটি প্রদেশে ছাত্রীদের সংখ্যা কত ছিল, তাহা হইতে আমাদের অবস্থা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
মান্দ্রাজ	৪১৪০৫৪০৪	৩৫০৮০৩
ব্রহ্মদেশ	১২১১৫২১৭	১২৪৩০
বোম্বাই	১৯৬৭২৬৪২	১৪৮৬৮৭
বাংলা	৪৫৪৮৩০৭৭	৮৭১৯৫

এই চারিটি প্রদেশের মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী নহে। মান্দ্রাজের লোকসংখ্যা বাংলার চেয়ে কম হইলেও ছাত্রীর সংখ্যা সেখানে অনেক বেশী। মান্দ্রাজ স্ত্রীশিক্ষায় আমাদের চেয়ে অগ্রসর। বাংলার লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের সওয়া দুই গুণেরও বেশী, কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা বোম্বাইয়ের সওয়া দুই গুণ অপেক্ষা কম। অতএব আমরা স্ত্রীশিক্ষায় বোম্বাইয়ের নীচে। বঙ্গের লোকসংখ্যা ব্রহ্মদেশের প্রায় পৌনে চারিগুণ, কিন্তু বাঙালী ছাত্রীর সংখ্যা ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রীসংখ্যার তিনগুণেরও কম। সুতরাং আমরা নারী-শিক্ষায় ব্রহ্মদেশেরও পশ্চাতে পড়িয়া আছি। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং ব্রহ্মদেশে বঙ্গের মত নারীরা অবরুদ্ধা নহেন। নারীশিক্ষায় ঐ-সকল প্রদেশ বাংলা দেশ অপেক্ষা অগ্রসর হইবার ইহা একটি কারণ। যেখানে নারীরা অবাধে চলাফেরা করিতে পারে, তথায় তাহারা যত সহজে ও যত কম ব্যয়ে শিক্ষা পাইতে পারে, পর্দানশীন বালিকা ও নারীরা তত সহজে ও তত কম ব্যয়ে শিক্ষা পাইতে পারে না। অবরোধ প্রথার মূলে আছে, অতকগুলি পুরুষের দুর্বৃত্ততা, অনেক পুরুষের নারীর সম্মান রক্ষায় অসামর্থ্য ও কাপুরুষতা, সমাজের মধ্যে এই বিশ্বাসের প্রাবল্য যে নারী প্রলোভনের মধ্যে দৃঢ় থাকিতে অসমর্থ ও নারীর চরিত্র হীন, এবং স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ ঈর্ষ্যার ভাব। তা ছাড়া, নারীকে কলুষ ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহও ইহার মূলে আছে। কিন্তু বীরধর্ম্মীরা নিজ পৌরুষ দ্বারা এবং নারীকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া এই সৎ ইচ্ছা পূর্ণ করেন, নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া নহে। মোটের উপর বলিতে গেলে, যে সমাজে অবরোধ প্রথা আছে, তাহাকে আদর্শস্থানীয় বলা যায় না। যাহা হউক, চেষ্টা থাকিলে পর্দ্দা সত্ত্বেও যে নারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার প্রমাণ বঙ্গেই রহিয়াছে। বঙ্গে হিন্দুসমাজ অপেক্ষা মুসলমান

সমাজে পর্দা বেশী; অথচ এখানে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার অবনতি এবং মুসলমানদের মধ্যে উন্নতি হইতেছে।

বঙ্গের অনেক দিগ্‌গজ নারীশিক্ষার বিরোধী। তাঁহারা অন্য কোন দিকে গজ বটেন কি না জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে যে তাঁহারা হস্তীমূর্খ তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যে-জাতি নারীদিগকে নিরক্ষর রাখিয়াও উন্নত হইতে চায়, তাহাদের মত নির্ব্বোধ আর কে আছে?

—

হিন্দু বিধবার মিথ্যা কুৎসা রটনা।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য অক্সফোর্ড মিশনের এপিফ্যানী নামক একখানা কাগজ আছে। তাহাতে একজন মুসলমান লিখিয়াছে যে, তাহার অভিজ্ঞতা হইতে সে বলিতে পারে যে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু বিধবা অসতী। এই লোকটা যে কি রকম, তাহা তাহার "অভিজ্ঞতার" প্রকৃতি হইতেই বুঝা যায়। এই মিথ্যা অপবাদের উল্লেখ করিতেও আমাদের একান্ত অনিচ্ছা ছিল; কিন্তু ইহা যে মিথ্যা, এবং যে পত্রলেখক ইহা লিখিয়াছে এবং যে সম্পাদক ইহা ছাপিয়াছে তাহারা যে অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে, ইহা বলিবার জন্য আমাদিগকে ইহার উল্লেখ করিতে হইল। এই সম্পাদক ও পত্রলেখক এবং এপিফ্যানীর মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে হাবড়ায় মোকদ্দমাও হইয়াছে। মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের শাস্তি হওয়া উচিত।

সামাজিক পাপ কোন না কোন আকারে অল্পাধিক সব সমাজেই আছে। ইহা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু কেহ যদি তৎসম্বন্ধে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া কিছু বলিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। যে প্রকার দোষের কথা এপিফ্যানীর পত্রলেখক লিখিয়াছে, তাহাতে দোষী স্ত্রীলোকের সংখ্যা কোন দেশে কোন সমাজে কেহ গণনা করিতে পারে না; অথচ গণনা না করিয়া শতকরা কত জনের ঐ দোষ আছে, তাহা যদি কেহ বলে, তাহা হইলে সে যে মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান করিয়া অধিকাংশের সম্বন্ধেও এমন কথা বলা গর্হিত।

জেলে স্ত্রী-কয়েদী।

পুরুষ নারী কাহারও মিথ্যা অপবাদ রটনা অতিশয় গর্হিত কাজ। নারীর অপবাদ রটনা করা অধিকন্তু হেয় কাপুরুষতার কাজ, বিশেষতঃ বিধবা নারীদের।

আমাদের ইহাতে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হওয়া স্বভাবিক; কারণ বিধবা আত্মীয়া সকলেরই আছেন। কিন্তু অপবাদে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলে কিম্বা মিথ্যাবাদী নিন্দুককে দণ্ডিত করিলেই আমাদের সব কর্ত্তব্য করা হইবে না। অনেক বিধবার দুর্গতির কারণ দেশে ও সমাজে নিঃসন্দেহ যাহা রহিয়াছে, সেই-সকল কারণ নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা না করিলে আমরা কখনই নারীহিতৈষী ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি না। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া এই বর্ষাকালে জেলের রিপোর্ট বাহির হইবার পর, এই বিষয়ের প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? সম্প্রতি ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় জেলসকলের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, যে, ঐ বৎসর ২৯৫৯৮ জন অপরাধী জেলে গিয়াছিল তাহার মধ্যে ৭০৬ জন স্ত্রীলোক। তাহার পূর্ব্ব বৎসর মোট ২৮৬৯৮ জন জেলে গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৮১৬টি স্ত্রীলোক ছিল। সুতরাং ১৯১৯ সালে মোট কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে স্ত্রী-কয়েদীর সংখ্যা কমিয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। দেশে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, অথচ অপরাধিনীর সংখ্যা খুব কম। ইহা স্বাভাবিক এবং সন্তোষের বিষয়।

১৯১৯ সালের ৭০৬ জন স্ত্রী-কয়েদীর মধ্যে ৩৭২ জন হিন্দু, ১৯৩ জন মুসলমান, ৫ জন বৌদ্ধ ও জৈন, ১৪ খৃষ্টিয়ান, এবং ১২২ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫২·৩ জন মুসলমান এবং ৪৫·২ জন হিন্দু। বাংলা দেশের বাসিন্দা ২২৫০২০৪৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যেও মুসলমান নারীর সংখ্যা হিন্দুনারীর সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ৯৭ হাজার ১৬২; মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার ১৩। হিন্দু স্ত্রী-কয়েদীদের সংখ্যা কিন্তু মুসলমান স্ত্রী-কয়েদীদের অপেক্ষা অধিক। হিন্দুদের মধ্যে এত বেশী-

সংখ্যক স্ত্রীলোক কেন আইন ভঙ্গের জন্য জেলে গিয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা অনুমান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না যে হিন্দুরা স্বভাবতঃ মুসলমানদের চেয়ে অপরাধপ্রবণ। কারণ, দেখা যাইতেছে, ১৯১৯ সালে দণ্ডিত স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৫৫·৬৬ জন মুসলমান ও ৪০·৮৩ হিন্দু, কিন্তু বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫২·৩ জন মুসলমান ও ৪৫·২ জন হিন্দু। অতএব ১৯১৯ সালে বঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে বরং মুসলমানেরাই অধিক অপরাধপ্রবণতা দেখাইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়। ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালেও এইরূপ দেখা গিয়াছিল। অথচ দেখিতেছি ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯১৯ সালে মুসলমান নারীদের চেয়ে অধিকসংখ্যক হিন্দু নারী আইন ভঙ্গ করিয়াছিল। ইহার কারণ কি?

সর্ব্বশ্রেণীর এই ৭০৫ জন অপরাধিনীদের মধ্যে ৭ জন ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, ১৫৪ জনের বয়স ১৬ হইতে চল্লিশ, ১৩৩ জনের বয়স ৪০ হইতে ৬০ এবং ১২ জনের বয়স ষাটের উপর।

অপরাধিনীদের মধ্যে ২৭৫ জন সধবা, ১১ জন অবিবাহিতা, ২৫৪ জন বিধবা এবং ১৬৬ জন পতিত নারী। পতিতা নারীদের মধ্যে যে আইনভঙ্গ অপরাধ এত বেশী জনে করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু বিধবা অপরাধিনীদের সংখ্যা এত বেশী হইবার কারণ কি?

বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের যত স্ত্রীলোক বাস করে, তাহার মধ্যে সধবা অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম; হিন্দুদের মধ্যেও কম, মুসলমানদের মধ্যেও কম। যথা, ১৯১১ সালের সেন্সস্ অনুসারে,—

বঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা।

	মোট	হিন্দু	মুসলমান।
অবিবাহিত	৭৫,৬০,৮২৮	২৯,৫১,২৪০	৪৩,৬২,১২৩
সধবা	১,০৪,২৪,৩২২	৪৫,৫৪,৭১৮	৫৬,৩৪,৭০৯
বিধবা	৪৫,১৬,৯০২	২৫,৯১,২০৪	১৮,৩৭,১৮১

মোটের উপর বিধবাদের সংখ্যা সধবাদের অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যে সধবা ২৭৫ জন, বিধবা ২৫৪ জন। বিধবাদের মধ্যে আইনভঙ্গ অপরাধ এত বেশী কেন, তাহার কারণ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। পুরুষ বা স্ত্রীলোক কেহ সখ করিয়া জেলে যায় না। মানুষ অভাবে পড়িয়া, দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া, কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, দোষে পড়িয়া, কিম্বা লজ্জা ঢাকিবার নিমিত্ত আইনবিরুদ্ধ কাজ করে। আমাদের দেশে বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ, তাহাদিগকে সুশিক্ষা-প্রদান, প্রভৃতির যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত নাই; অন্য মানুষের মত বিধবাদেরও যে সর্ব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন ও বৃত্তি আছে, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক বিধানে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হয় না। এইসব কথা মনে রাখিলে বিধবাদের মধ্যে অপরাধের আধিক্যের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

সধবা ও বিধবা কয়েদীদের মধ্যে কত জন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই। তবে, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, বিধবা কয়েদীদের অধিকাংশ হিন্দু। কারণ, বঙ্গে মোট হিন্দু বিধবার সংখ্যা প্রায় ২৩ লক্ষ, মোট মুসলমান বিধবার সংখ্যা ১৮ লক্ষের উপর, এবং হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ না থাকায় নিরাশ্রয় ও নিষ্পাপ বিধবার সংখ্যা অধিক। স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যেও হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

বঙ্গের বাসিন্দা স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোটামুটি ১ কোটি ৯৭ হাজার হিন্দু, ১ কোটি ১৮ লক্ষ মুসলমান, এবং ৫৯৪৮১ জন খৃষ্টিয়ান। কিন্তু স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যে ৩১২ জন হিন্দু, ১৯৩ জন মুসলমান, এবং ১৪ জন খৃষ্টিয়ান সুতরাং দেখা যাইতেছে, খৃষ্টিয়ান নারীদের মধ্যে অপরাধিনীর সংখ্যা তাহাদের মোট সংখ্যার অনুপাতে ভয়ানক বেশী। ইহার কারণ কি? মোট অপরাধিনীদের মধ্যে ৬৯৫ জন নিরক্ষর, এবং ৯ জন লিখিতে পড়িতে পারে।

জেলের রিপোর্টে দেখা যায়, যে, ১৬৬ জন কয়েদী পতিতা নারী। ইহা অবিদিত নাই, যে, পতিতা নারীদের মধ্যে প্রলুব্ধা ও প্রতারিতা বালবিধবার সংখ্যা কম নহে। অতএব, বিধবাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ও তাহার উন্নতি-সাধন কত প্রয়োজন, স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যে পতিতা নারীদের সংখ্যাও তাহা বুঝাইয়া দিবে।

—

হিন্দুবিধবার বিবাহ।

শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। তজ্জন্য বৎসর বৎসর কোন কোন শহরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভা আহ্বান করা হইয়া থাকে। কিন্তু এত সভা করিয়াও দেশের লোকে বিধবাদের দুঃখ-মোচনের বিশেষ কোন চেষ্টা করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা বিদ্বান্ লোক দেশে অনেক জন্মিয়াছে। তিনি ব্রহি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারের অভাব নাই। তিনি স্কুলকলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহা অন্যেও করিয়াছে। তিনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন; অনেক ধনী সমস্ত জীবনে তাঁহা অপেক্ষা বেশী টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করিবার কারণ কি? কারণ, তাঁহার নানাদুর্লভগুণসমন্বিত মনুষ্যত্ব। দক্ষিণ ভারতে মানুষের নামের গোড়ায় তাহার বংশের জন্মস্থানের নাম বসান হয়; যেমন, তাঞ্জোর মাধব রাও, চিত্তুর শঙ্করন্ নায়ার, ইত্যাদি। গত বৎসর একটি বিদ্যাসাগরস্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল বলিয়াছিলেন, যে, এই রীতি অনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামের গোড়ায় তাঁহার জন্মগ্রামের নাম সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বীরসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিলে নামটি অন্বর্থ হয়। তাঁহাতে যেমন দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা, সাহস, অধ্যবসায় ও পুরুষকারের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, এরূপ আর কোন প্রসিদ্ধ বাঙালীতে দেখা যায় না। এবং এই-সকল গুণ, তাঁহার বিধবাবিবাহ চালাইবার চেষ্টায় যেমন প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার আর-কোন কাজে সেরূপ প্রকাশ পায় নাই। অথচ অধিকাংশ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় তাঁহার এই চেষ্টার উল্লেখ মাত্রও হয় না, কিম্বা শুধু উল্লেখই হয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা ঠিকই যে এইসব সভায় বিধবাবিবাহ সমর্থিত হয় না। কারণ, সমর্থন করিব অথচ কাজে কিছু করিব না, এরূপ ভণ্ডামি অপেক্ষা উহার উল্লেখ না করাই ভাল।

হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় এরূপ কোন যুক্তি নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা খণ্ডন করেন নাই। তাহার পর আরও অন্তরকমের অনেক কুতর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, বঙ্গে বিধবাবিবাহ চলিতেছে না; গুজরাত, পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, অন্ধ্র, প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অধিক চলিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বাংলা দেশে কুতার্কিক, ভণ্ড, দেশাচারের দাস বেশী; ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা কম। "আমাদের বিধবারা দেবী" বলিয়াই বাঙালী নিশ্চিন্ত। বিধবাদের মধ্যে অতি পবিত্রস্বভাবা পরিহিতপরায়ণা অনেকে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক, যে, অন্য অনেকে প্রতিকূল অবস্থা, প্রলোভন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হওয়ায় দেবীত্ব লাভ করিতে পারেন না, অধিকন্তু পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন, এবং অন্যান্য শ্রেণীর নারী অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইহা মনে রাখা দরকার, যে যে-দেশে পুরুষসমাজে পাশব ও পৈশাচিক ভাবের প্রবলতা দৃষ্ট হয়, এবং ন্যায়নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়, তথায় নারীসমাজে দেবীত্ব সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না।

আমাদের মন্তব্য পড়িয়া কেহ কেহ হয়ত পাশ্চাত্য সমাজের নানা পাপ ও কুপ্রথা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ খারাপ প্রমাণ হইলেই আমাদের সমাজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ হইবে, ইহা মনে করা মূর্খতা। আমাদের দেশের দোষ দেখাইলেই পাশ্চাত্য সমাজের প্রশংসা করা হইল, ইহা মনে করাও তদ্রূপ মূর্খতা। পাশ্চাত্য সমাজ ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহা এখন আমাদের বিচার্য্য নহে। আমাদের আলোচ্য এই যে আমরা কিরূপে ভাল হইতে পারি।

—

নারীর শিক্ষার জন্য দান।

বোম্বাইয়ের বণিক্ সার্ বিঠলদাস দামোদর ঠাকর্‌সী মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে পুণায় অবস্থিত আছে। পরে উহার পীঠস্থান বোম্বাই হইবে। অবশ্য পুণাতেও মহিলা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজ থাকিবে। এই ১৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ বার্ষিক ৫২৫০০ টাকা আপাততঃ মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় পাইবেন। মূলধন ১৫ লক্ষ বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের তহবিলে জমা হইবার তিনটি সর্ত্ত দাতা করিয়াছেন; (১) যখন এই বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত অনুমোদিত হইবে; কিম্বা (২) যখন বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্য স্থায়ী আয় দীর্ঘকালের জন্য নিশ্চয় বার্ষিক ৫০০০০ টাকা হইবে; কিম্বা (৩) যখন উহা তাঁহার দানের সমান অন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনরূপ সর্ত্তটি আমরা পছন্দ করি না। গবর্ণমেণ্টের যাহার উপর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, এরূপ শিক্ষালয়কে গবর্ণমেণ্ট কখন ভাল বলিয়া স্বীকার বা অনুমোদন করেন না, করিতে পারেন না। এই কর্ত্তৃত্ব ইষ্টকর নহে বলিয়া, ইংলণ্ডের মত যে-দেশে জনসাধারণই প্রকৃত রাজা, সেখানেও এই মত মনীষীদের অবলম্বিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীন থাকাই ভাল, গবর্ণমেণ্টের অধীনতা ভাল নয়। সুতরাং ভারতের মত পরাধীন দেশে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব যে মন্দ হইবে, তাহা নিশ্চিত। আমরা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেও, অর্থাৎ আমাদেরই নির্ব্বাচিত কতকগুলি লোকের সমষ্টি গবর্ণমেণ্ট-নামে অভিহিত হইলেও, গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃত্ব শিক্ষালয়ের পক্ষে ইষ্টের কারণ হইবে না। যাহা হউক, মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় যদি সরকারী কর্ত্তৃত্ব পছন্দ না করেন, তাহা হইলে উহার কর্ত্তৃপক্ষ অন্য দুটির কোন একটি সর্ত্ত পালন করিলেই তহবিলে ১৫ লক্ষ টাকা পাইবেন। তাহা যতদিন না পাইতেছেন, ততদিন আয়ের সাড়ে বায়ান্ন হাজার টাকা ত বৎসর বৎসর পাইতে থাকিবেন; সুতরাং কাজের ক্ষতি হইবে না।

সার্ বিঠলদাস ঠাকর্সীর দান পাইবার আগে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ১৭৪৬৬১৵১১ ছিল, এবং অনুমিত বার্ষিক আয় ১৮০০০ টাকা ছিল।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠান নাই, এবং ঠাকর্সী মহোদয়ের মত স্ত্রীশিক্ষার জন্য দানও কেহ করেন নাই। তিনি তাঁহার ভক্তিমতী ধর্ম্মশীলা মাতা স্বর্গীয়া শ্রীমতী নাথীবাঈর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই দান করিয়াছেন। তদনুসারে অতঃপর মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় নাথীবাঈ মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত হইবে। ভক্তিমতী ধর্ম্মশীলা মাতার ধনবান্ পুত্র বাংলা দেশেও আছেন। নারীর যাহাতে কল্যাণ হয়, এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে বহুলক্ষ টাকা দান করিয়া তাঁহারাও মাতৃ-ভক্তির পরিচয় দিতে পারেন।

সার্ বিঠলদাসের ইহাই প্রথম ও একমাত্র দান নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি পাঁচলক্ষ টাকার একটি ফণ্ড স্থাপন করেন, যাহা হইতে একশত জন গরীব ছাত্র সাহায্য পাইতেছে। এই সাহায্য ঋণস্বরূপ দেওয়া হয়। ছাত্রেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা-সমাপনান্তে উপার্জ্জনক্ষম হইলে সুবিধামত কিস্তিবন্দী করিয়া ঋণশোধ করে। বঙ্গে এই প্রকার ফণ্ডের আবশ্যকতা আমরা অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বুঝাইয়া আসিতেছি। বঙ্গের ধনীরা এদিকে দৃষ্টি দিলে দেশের কল্যাণ হইবে। বনিতা-বিশ্রাম নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে; তাহাতে নারীদিগকে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মশিক্ষা, এবং তা ছাড়া লৌকিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সার্ বিঠলদাস ভাটিয়া-জাতীয়। বনিতা-বিশ্রামে ১৬টি ভাটিয়া জাতির ছাত্রীর শিক্ষার ও ভরণপোষণের জন্য তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে জননীর নামে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। দানে তিনি উদারমতাবলম্বী। এইজন্য সমাজসংস্কারকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পুণাস্থিত সেবা-সদনেও তিনি ৩৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। সেবা-সদনে নারীদিগকে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত, শুশ্রূষা, সেলাই, প্রভৃতি এরূপ নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে তাঁহারা উপার্জ্জনক্ষম হন। এই টাকা হইতে পুণার পটবর্দ্ধন ওাড়া নামক অট্টালিকা সেবা-সদনের ছাত্রীনিবাস, লাইব্রেরী ও সভ গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইবার নিমিত্ত ক্রীত হইয়াছে, এই গৃহও দাতার পুণ্যবতী মাতা শ্রীমতী নাথীবাঈর নামে অভিহিত হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য ৫০০০০ টাকা ব্যয়ে, গ্রাম-অঞ্চলে সমবায়-ঋণদান সমিতির সভ্যগণের সন্তানদের জন্য প্রায় ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাইবার ভার লইয়াছেন। উদ্দেশ্য, সমবায়-প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব-সম্পাদন। তাঁহার সমুদয় দানই তাঁহার পূতশীলা মাতার প্রতি ভক্তিপ্রসূত। মাতৃভক্তি অবিকৃতচিত্ত ভারতীয়দিগের চরিত্রের একটি লক্ষণ। এই ভক্তি মাতৃভক্ত সমুদয় ভারতীয়কে নারীর কল্যাণে নিযুক্ত করিলে ইহা সার্থক হয়।

বঙ্গে ইউরোপীয় প্রতিনিধির সংখ্যা এবং কোন কোন বাঙ্গালী মাননীয়ের ব্যবহার।

আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, যে, বঙ্গের ১৯১০-সংখ্যক ইউরোপীয় নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮ জন প্রতিনিধি পাইবে। অর্থাৎ তাহারা প্রায় প্রতি ১১০০ জনে একজন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। ইউরোপীয়দের গুরুত্ব তাহাদের নিজের এবং তাহাদের জা'ত-ভাইয়ের সমষ্টি গবর্ণমেণ্টের চোখে কত বেশী তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যায়, ইউরোপীয় বণিকসমিতি-গুলির প্রতিনিধি-সংখ্যা হইতে। ইণ্ডিয়ান জুট্ মিল্‌স্ এসোসিয়েশুনের সভ্যসংখ্যা ৪৬ জন (See C. W. E. Cotton's "Handbook of Commercial Information for India", page 27)। তাঁহারা ২ জন প্রতিনিধি পাইবেন; অর্থাৎ প্রতি ২৩ জন ইউরোপীয় ১ জন প্রতিনিধি পাইবেন। বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সভ্যসংখ্যা ২০০র উপর ("The membership now exceeds 200."—page 30 of "Handbook of Commercial Information for India")। এই চেম্বার পাইবেন ৬ জন প্রতিনিধি, অর্থাৎ প্রতি ৩৪ জন বণিকের এক এক জন প্রতিনিধি। ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশুনের সভ্যসংখ্যা ১৯১৮র শেষে ১০২ ছিল (ঐ ইংরেজী বহির ২৮ পৃষ্ঠা)। উহা একজন প্রতিনিধি পাইবে। ক্যালক্যাটা ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশুনের সভ্যসংখ্যা ৮৩। ইহা ২ জন প্রতিনিধি পাইবে। এক-একজন ইউরোপীয়ের পূর্ব্বোক্ত একাধিক সমিতির সভ্য হইবার পক্ষে বাধা নাই। কেহ একাধিক সমিতির সভ্য হইলে তাঁহার নির্ব্বাচন-ক্ষমতাও বাড়িবে। বঙ্গের এক এক জেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। জেলাগুলি প্রতিনিধি পাইবে ২।১ জন করিয়া। অর্থাৎ দেশী লক্ষ লক্ষ লোক কয়েকজন ইউরোপীয়ের সমান!

ইউরোপীয়দিগকে এত বেশী প্রতিনিধি দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের কাগজে ও ভারতীয়দের অনেক সমিতির পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ইউরোপীয়দিগকে অত্যধিকসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটির সপক্ষে এক ভোট কম ও বিপক্ষে এক ভোট বেশী হওয়ায় উহা গৃহীত হয় নাই। সমুদয় বাঙ্গালী সভ্য উপস্থিত থাকিয়া ভোট দিলে এরূপ হইত না। কোন কোন সভ্য সেদিন সভায় যান নাই, কেহ কেহ বা গিয়া ভোটের সময়ের পূর্ব্বে চলিয়া আসেন। ইহাঁরা কেন যান নাই, বা গিয়াও ভোটের সময়ের আগে কেন চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা জানিবার সর্ব্বসাধারণের অধিকার আছে। কেন না, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের কাজ তাঁহাদের বাড়ীর কাজ নহে, যে স্বেচ্ছায় করা বা না-করা যাইতে পারে; দেশের কল্যাণ করিবার জন্য তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এবং সেই হেতু তাঁহাদের ব্যবস্থাপকসভাসম্পৃক্ত প্রত্যেক কাজ ও অ-কাজের জন্য তাঁহারা দেশের কাছে দায়ী। তাঁহাদের কাহারো কাহারো পক্ষ হইতে অসুস্থতার ওজুহাত অন্য লোকে করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং কিছু বলিলে কি তাঁহাদের মানের লাঘব হইত? তাহা হইলে ভোটদাতাদের ভোট প্রার্থনা করিতে তাঁহাদের মানের লাঘব হয় না কেন? যাহা হউক, ইহাতেও সন্দেহ যাইতেছে না। কারণ (১) তাঁহারা স্বয়ং কিছু বলেন নাই, (২) তাঁহারা পীড়ার জন্য সভার দিনে ও ভোটের সময় বাড়ীতে শয্যাশায়ী ছিলেন, কিম্বা বাড়ীর বাহিরে অন্য কাজ করিতেছিলেন, তাহা জানা দরকার। তাঁহাদের ৩।৪ জনের সম্বন্ধে কাগজে এরূপ চিঠি বাহির হইয়াছে, যে, তাঁহারা বাড়ীর বাহিরে অন্য কাজ করিতেছিলেন। সত্য যাহাই হউক, দেশহিতৈষী মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, যাঁহারা ইউরোপীয়দিগকে, গবর্ণমেণ্টকে বা কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে ন্যায্য কাজ করিয়া অসন্তুষ্ট করিতে ভয় পান, তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যরূপে যাওয়া অনুচিত।

—

অ-সহযোগিতা।

আমরা অনেকে যৌবনকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না। অনেকের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে এবং ৫৫ বৎসর বয়স

পার হইয়া যাওয়ায় এখন আর প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সম্ভাবনাও নাই। যাহারা সর্‌কারী চাকরীর মোটা মাহিনা ও আমরণ পেন্‌শুনের মায়া কাটাইয়াছে, তাহারা অর্থাগমশূন্য সর্‌কারী খেতাব যে চাহিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। খিলাফৎ সম্পর্কে, ও পঞ্জাবের অত্যাচারের সমুচিত প্রতিকার না হওয়ায়, এবং নূতন ভারত-শাসন আইন ভারতীয়দিগকে কার্য্যকরী ক্ষমতা না দেওয়ায়, কথা উঠিয়াছে, যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা উচিত নহে। কেহ কেহ উক্ত একটি কারণে, কেহ দুটি, কেহ বা সবগুলিরই জন্য অ-সহযোগিতা সমর্থন করেন। অ-সহযোগিতা প্রচেষ্টার প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধী লিখিয়াছেন, যে, তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত যদি ১লা আগষ্টের পূর্ব্বে ভারতীয় মুসলমানদের মত অনুসারে পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কাজগুলি প্রথমতঃ করিতে হইবে :—

(১) সমুদয় সর্‌কারী খেতাব ও উপাধি এবং সম্মানভূতিক অবৈতনিক কার্য্য ত্যাগ।

(২) গবর্ণমেণ্টকে ঋণ না দেওয়া।

(৩) উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টারদের আইন ব্যবসা ত্যাগ ও সালিসী দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি।

(৪) পিতা-মাতাদের গবর্ণমেণ্ট-শিক্ষালয়ে সন্তানদের প্রেরণ না-করা।

(৫) নূতন ব্যবস্থাপক সভাসকলে প্রতিনিধি না হওয়া ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন না করা।

(৬) সর্‌কারী সম্মিলন দর্‌বার আদি (Government parties and such other functions) বর্জ্জন।

(৭) মেসোপটেমিয়াতে কোন সৈনিক বা অসৈনিক কার্য্য গ্রহণ না করা, কিম্বা যে-সব তুরস্কসাম্রাজ্যভুক্ত দেশ পূর্ব্বতন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মিত্রশক্তিরা শাসন করিতেছেন, তাহাতে সিপাহির কাজ করিতে না যাওয়া।

(৮) উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির সম্বন্ধে স্বদেশী নীতি অবলম্বন ও প্রচার।

এই আটদফা কাজ ও বর্জ্জনের উদ্দেশ্য কি ও তাহা সফল হইবে কি না, দেখা যাক্। একটি উদ্দেশ্য, জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা। অ-সহযোগিতা নীতি অবলম্বনের যে তিনটি কারণের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দলভেদে মতভেদ কম, কিম্বা নাই বলিলেও চলে। যে গভর্ণমেণ্টের অধীনে, প্রশ্রয়ে বা হুকুমে এরূপ অত্যাচার ও জাতীয় অপমান হয়, তাহার সহিত ও তাহার প্রধান কর্ম্মচারীদের সহিত সম্পর্ক যত কম রাখা যায়, আমাদের পরাধীনতার লজ্জা ও অপমান তত কম হয়। অতএব আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য কেহ যদি কিছু করিয়া বা না-করিয়া তজ্জাত ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহাতে অপর কাহারো আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তালিকার প্রথম, ষষ্ঠ ও অষ্টম দফা সম্বন্ধে জাতীয় আত্ম-সম্মানরক্ষণপ্রয়াসী কাহারো আপত্তি হইতে পারে না। দ্বিতীয় দফাতেও হওয়া উচিত নয়, কারণ, যাঁহারা শুধু টাকাই চেনেন, তাঁহারাও জানেন, যে, আজকাল সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক যৌথ কারবার শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা অপেক্ষা বেশী লাভ দিয়া থাকে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ৫ টাকা সুদের জন্য ঋণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আইন ব্যবসা যাঁহারা করেন, তাঁহারা দেওয়ানী মোকদ্দমাগুলিও ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন কি না, তাঁহারাই বুঝিয়া দেখুন। দেওয়ানী মোকদ্দমা সমুদয় সালিসীদ্বারা নিষ্পত্তি হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গল, পক্ষদের পক্ষেও ভাল। যাহাতে কোন বেসর্‌কারী লোক ফরিয়াদী, এরূপ ফৌজ্‌দারী মোকদ্দমাও আপোসে মিটাইয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়। অন্যবিধ মিথ্যা ফৌজ্‌দারী অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য আমাদের বিবেচনায় ব্যবহারাজীবের সাহায্য দর্‌কার। গান্ধী মহাশয় এ বিষয়ে কি বলেন? জবরদস্ত হাকিমদের দ্বারা রাজনৈতিক কারণে কখন কখন ব্যক্তিবিশেষদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মপক্ষসমর্থনের চেষ্টা না করিয়া জরিমানা দিতে, জেলে যাইতে, নির্ব্বাসিত হইতে, বা প্রাণ দিতে রাজি হন, যেমন শ্রীযুক্ত গান্ধী অভিযুক্ত হইলে রাজী হইবেন, তাহা হইলে এরূপ মোকদ্দমাতেও আইনব্যবসায়ীর সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যাঁহারা ততটা দৃঢ়চিত্ত নহেন, তাঁহাদের সাহায্য পাওয়ার দর্‌কার আছে

কি না, ও থাকিলে সে সাহায্য কোন্ শ্রেণীর লোক দিবে, বিবেচ্য।

চতুর্থ দফায়, গবর্ণমেণ্ট স্কুল বলিতে অ-সহযোগিতা কমিটি কি বুঝেন, জানি না। যে-কোন বিদ্যালয় বা কলেজ হইতে ছাত্রেরা গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত পরীক্ষা দেয়, তাহাই কতকগুলি সরকারী নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ। সে-হিসাবে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ছেলে না পাঠাইয়া সরকার-অনুমোদিত অন্য কোন বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইবার কোন কারণ নাই। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী স্বাধীন বিদ্যালয় কয়েকটি মাত্র আছে। বালক বালিকা-দিগকে বাড়ীতে শিক্ষা দিবার মত বিদ্যা, অবসর বা সামর্থ্য ও ধন অল্প লোকেরই আছে। অতএব ছাত্রছাত্রীরা কোথায় শিক্ষা পাইবে, তাহার সামান্য মাত্র ব্যবস্থাও না করিয়া, তদ্বিষয়ে কোন পরামর্শ বা ইঙ্গিত মাত্রও না দিয়া, এই ৪র্থ দফার অনুরোধটি করা, অসঙ্গত হইয়াছে মনে করি। পঞ্চম দফা সম্বন্ধে বক্তব্য পরে জানাইতেছি। সপ্তম দফায় আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। আমাদের বিশ্বাস তুরস্কের প্রতি অবিচার হইয়াছে; তদ্ভিন্ন কোনও দেশেরই স্বাধীনতা হরণ কার্য্যে, বা নূতন নাম দিয়া পরাধীনতা পুনঃস্থাপন কার্য্যে, কাহারও সাহায্য করা উচিত নহে। যদি মেসোপটেমিয়া বা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত অন্য কোন অতুর্ক দেশকে বাস্তবিকই স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। কিন্তু এক জাতির (অর্থাৎ তুর্কদের) অধীনতার পরিবর্ত্তে অন্য কোন জাতির (অর্থাৎ কোথাও ইংরেজের, কোথাও ফরাসীর) অধীনতা ঐসব দেশের লোকদের কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া কখনও ন্যায়সঙ্গত নহে। এবং বিদেশীয় এবম্বিধ প্রভুত্ব কোথাও বজায় রাখিবার জন্য কাহারো কোন সৈনিক বা অসৈনিক কাজ লওয়া উচিত নয়। ইংরেজ ও ফরাসী বলিতেছেন বটে যে তাঁহারা মেসোপটেমিয়া ও সীরিয়ার ম্যাণ্ডেটরী (mandatory) অর্থাৎ জাতি-সংঘের (League of Nations-এর) আদেশপালক হইবেন, প্রভু হইবেন না। কিন্তু তাঁহারাই ত এখন বস্তুতঃ জাতিসংঘ। তাঁহাদের প্রভুত্বে বাধা কে দিবে? তাঁহাদের দেশের সংবাদপত্রেই ত প্রমাণ দেওয়া হইতেছে যে তাঁহারা মানবহিতৈষী রূপে ঐসব দেশের ভার চাহিতেছেন না, ঐসব দেশের ভূগর্ভস্থ তৈল প্রাপ্তির প্রবল বাস নাই তাঁহাদিগকে চালাইতেছে।

জাতীয় আত্ম-সম্মান রক্ষা ছাড়া, অ-সহযোগিতা প্রচে-ষ্টার আর-একটি উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ আছে—এই প্রচেষ্টা দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে অসুবিধায় ফেলিয়া তাহাকে আমাদের ইচ্ছানুরূপ নীতি অবলম্বন করিতে ও কাজ করিতে প্রবৃত্ত করা। প্রথম দফা অনুযায়ী কাজ সমুদয় উপাধিধারী করিলেও গবর্ণমেণ্টকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য, পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্ট, প্রভৃতির কাজ যদি সকলে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা হইবে বটে; কারণ, যে সব কাজ এখন বিনা পয়সায় হয় তজ্জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে, ও ট্যাক্স্ বাড়াইতে বা নূতন ট্যাক্স্ বসাইতে হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে অপ্রিয়ও হইতে হইবে। কিন্তু বেশীসংখ্যক লোক যে সদ্য সদ্য অবৈতনিক কাজ ছাড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তথাপি অ-সহযোগিতার সমুদয় উপায় দেশের লোকের জানা থাকা এবং তাহা যে অবস্থা-বিশেষে অবলম্বনীয় হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন ভাল। গবর্ণমেণ্ট ঋণ না পাইলেও গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা হয়; কিন্তু ঋণ দিবার মত ধন ও ইচ্ছা যাহাদের আছে, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও দেশহিতৈষিতা তাহাদের মধ্যে সে পরিমাণে দেখা যায় না। এই জন্য দ্বিতীয় দফা অনুসারে কাজ হইবার সম্ভাবনা কম। তৃতীয় দফা অনুসারে, অন্ততঃ দেওয়ানী মোকদ্দমাগুলির সালিসী নিষ্পত্তি হইলে গবর্ণমেণ্টের আয় কমিবে; কারণ সরকারী বিচার-বিভাগ কেবল সুবিচারের জন্য চালান হয় না, আয়ের জন্যও বটে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, যে, উকীলমোক্তার-ব্যারিষ্টারদের দেশহিতৈষণা এত প্রবল নহে যে তাঁহারা নিজেদের ব্যবসার ক্ষতি করিবেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ছাত্রেরা না পড়িলে সেগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে। মোটের উপর তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু অন্য স্কুল যখন যথেষ্ট নাই, তখন ছেলেরা সরকারী

বা সরকারের অনুমোদিত স্কুলেই যাইবে। নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যদি একজন ভারতবাসীও প্রতিনিধিরূপে না যান, তাহা হইলে, দেশের লোকের মনের ভাব জানিয়া, ইংরেজ রাজপুরুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির যে-সব উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা তাঁহারা পারিবেন না। সুতরাং অ-সহযোগিতার এই দফাটি দ্বারাও গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এখনই ত দেখা যাইতেছে, যে, "নরমপন্থীরা" দলকে দল ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়ার পক্ষে, এবং অনেক "গরমপন্থী"ও পক্ষে। সুতরাং প্রতিনিধির কাজ করিবার লোক যথেষ্ট মিলিবে, ও গবর্ণমেণ্টের কোন অসুবিধা হইবে না। ষষ্ঠ দফা অনুসারে কাজ হইলে গবর্ণমেণ্টের কোন অসুবিধা নাই। সপ্তম দফা অনুসারে কাজ হইলে সরকারের অসুবিধা আছে। অষ্টম দফা অনুসারে কাজ হইলে ইংরেজ কারখানাওয়ালা ও বণিকদের মধ্যে প্রথমে সাড়া পড়িবে, এবং তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ পড়িবে। এইটিই আমাদিগকে কিছু করিতে বলিতেছে, অন্য প্রায় সব দফাগুলি না-করিতে বলিতেছে। ক্রিয়াত্মক যাহা, তাহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করি,—তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা হোক বা না হোক, গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ পড়ুক বা না-পড়ুক।

যে-কোন দেশেই ব্যবস্থাপক সভায় যাঁহারা প্রতিনিধি হন, তাঁহারা দেশের সেরা লোক, বা শ্রেষ্ঠ লোক, বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী লোক নহেন। কচিৎ ২।১ জন জগন্মান্য প্রতিভাশালী লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ব্যবস্থাপক সভার কাজ সাধারণতঃ তাঁহারাই করিয়া থাকেন, যাঁহারা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু করিতে পারেন না। এটা আমাদের একটা মনগড়া কথা নয়। ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখুন। কাব্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, যান্ত্রিক উদ্ভাবনে, চারুশিল্পে, যে-সব লোক ইংলণ্ডের নাম মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছিলেন বা হইলেও খুব উচ্চ স্থান পাইয়াছিলেন? রাজনীতিজ্ঞতার কাজ সৃজনীশক্তিশালিনী প্রতিভা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় মানসিক শক্তির কাজ। এইজন্য কাহাকেও মন্ত্রীপদের বা প্রতিনিধিপদের উপযুক্ত বলিলে, ইহা বলা হয় না, যে, উচ্চতম রকমের প্রতিভা বা মানসিক শক্তি তাঁহার আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেকী সত্যই লিখিয়াছেন:—

"Statesmanship is not like poetry, or some of the other forms of higher literature, which can only be brought to perfection by men endowed with extraordinary mental gifts. The art of management, whether applied to public business or to assemblies, lies strictly within the limits of education, and what is required is much less transcendental abilities than early practice, tact, courage, good temper, courtesy, and industry.

"In the immense majority of cases the function of statesmen is not creative, and its excellence lies much more in execution than in conception. In politics possible combinations are usually few, and the course that should be pursued is sufficiently obvious. It is the management of details, the necessity of surmounting difficulties, that chiefly taxes the abilities of statesmen, and those things can to a very large degree be acquired by practice."

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে দেশের সেরা বা শ্রেষ্ঠ লোকের ভাবিবার দরকার নাই, যে, তাঁহারা প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন কি না। যাঁহাদের এইরূপ কাজে রুচি আছে এবং যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া নানা কিয়ে খবর রাখিতে পারেন, যাঁহারা উপস্থিত-বক্তা ও সুতার্কিক, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, যাইবেন কি না। ব্যবস্থাপক সভায় প্রধানতঃ হয় তথ্য-জিজ্ঞাসা নূতন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন, নূতন ট্যাক্স্ বসান বা পুরাতন ট্যাক্স্ হ্রাস বৃদ্ধি, আয়ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাব, এবং অভাব অভিযোগ, সম্বন্ধে প্রস্তাব ও আলোচনা। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা সব-রকম আইন মানিতে ও সব রকম ট্যাক্স্ দিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা, কিম্বা, রুচি ও ক্ষমতা থাকিলে, স্বয়ং প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়া উচিত। কারণ, যে-আইন মানিব, তাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপক সভায় মত প্রকাশও করিব না, আমাদের যে-টাকাটা ট্যাক্স দ্বারা আদায় হইয়া গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক ব্যয়িত হইবে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলিব না, কেবল টাকাটা দিয়াই যাইব, ইহা সুযুক্তি নহে। অ-সহযোগিতা কথাটার মধ্যে কোন জাদুমন্ত্র নাই। উহার মধ্যে সুসংগতি চাই। যদি অ-সহযোগিতা করিতেই হয়, তাহা হইলে তাহার চরম এবং শ্রেষ্ঠ উপায়, অন্তত কোন একটা ট্যাক্স্ না-দেওয়া। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া তাহা আদায় করুন তাহাতে আপত্তি নাই, যেমন আমেদাবাদে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল ও ডাক্তার কানুগার নিকট হইতে জরিমানা আদায় হইয়াছে। খুব খারাপ আইনও মানিব, এবং ট্যাক্সও চাহিলেই দিব, অথচ তার সম্বন্ধে যে দুটা কথা বলিবার অধিকার আছে, তাহাও মন খুলিয়া বলিব না বা বলাইব না, ইহা সুবুদ্ধি নহে। বলিতে পারেন যে, কৌন্সিলের বাহিরেও ত বলা যায়। কিন্তু নূতন ভারতশাসন আইন অনুসারে কৌন্সিল-গৃহগুলিতে মৌখিক মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, যে-স্বাধীনতা ব্রিটিশভারতের আর কোথাও নাই। অতএব যদি সমালোচনা করিতেই হয়, ত যেখানে খুব মন খুলিয়া যে-কেহ করিতে পারেন, সে জায়গাটা বাদ যায় কেন? অবশ্য খুব বেপরোয়া লোক সর্ব্বত্রই হক্

কথা বলিতে পারেন; কিন্তু তিনিই বা নিরাপদ জায়গাটা বর্জ্জন কেন করেন? তাছাড়া সবাই ত আর পুণ্যাত্মায় নির্ভীক নয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কৌন্সিলে উক্ত অতি কঠোর সত্যও নিরাপদে সংবাদপত্রসমূহে নির্বিঘ্নে উদ্ধৃত ও সর্ব্বত্র বক্তৃতায় পুনরুক্ত হইতে পারিবে। ইহা কম সুবিধা নহে। আমরা বলি, যদি কৌন্সিলগুলিকে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ আইন অমান্য করা এবং অন্যায় ট্যাক্স্ না-দেওয়াও উচিত। নতুবা সুসঙ্গত বা সুবুদ্ধির কাজ হয় না।

এই দরিদ্র দেশে ছোট বড় সম্মানিত ঘৃণ্য সব-রকম কাজের জন্য লোক পাওয়া যায়। কিন্তু একজন গরীব লোকও যদি ট্যাক্স্ না দেয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের টনক নড়ে ও খুব হৈ চৈ পড়ে; কেন না, একজনের দেয় ট্যাক্স অন্য কাহারো কাছ হইতে আদায় হইতে পারে না, তাহারই নিকট হইতে ক্রোক আদি দ্বারা আদায় করিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, মাননীয় অমুক-চন্দ্র-অমুক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব ছাড়িয়া দিলে কিম্বা অন্য কেহ কোন কাজ বা চাকরী ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদের স্থান পূরণের লোক সরকার অনেক পাইবেন। কিন্তু হরিচরণ মণ্ডল খাজনা না দিলে তাহা কোন "মাননীয়" দিবেন না, তাহা হরিচরণের নিকট হইতেই আদায় করিতে হইবে। এইজন্য অ-সহযোগিতার চূড়ান্ত উপায়টি উল্লেখযোগ্য, এবং অ-সহযোগিতা করিতে হইলে উহা অবলম্বনীয়। ইহাতে যে-ক্ষতি ও কষ্টের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্য যিনি প্রস্তুত তিনিই ইহা অবলম্বন করিবেন, যেমন গুজরাতের কাইরা জেলার রায়তরা করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে যে তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্যতম মন্ত্রী মিঃ চার্চিল বলেন,—

"British rule had never stood on the basis of physical force alone. It would be fatal to the British Empire to try to make it do so. The British way of doing things always implied close and effectual co-operation with the people of the country. That policy had nowhere been more successful than in India."

মিঃ চার্চিল বলিতেছেন, যে, "ব্রিটিশরাজত্ব কখনও শুধু জড় বা দৈহিক শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরূপ ভিত্তির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দাঁড় করাইতে গেলে উহা তাহার পক্ষে সাংঘাতিক হইবে। কাজ করিবার ব্রিটিশ রীতির মধ্যে, দেশের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও কার্য্যকর সহযোগিতা সর্ব্বদা উহ্য থাকে। এই নীতি ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত গান্ধী অ-সহযোগিতার প্রথম অবস্থায় যে আটদফা কাজ বা বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা লোকে করিলে প্রমাণ হইবে, যে, এখন লোকে, তুরস্কের প্রতি অবিচারক বা পঞ্জাবে অত্যাচারের (মুখে না হইলেও) কার্য্যতঃ অপ্রতিকারক গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে নারাজ। তাহা হইলে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার ও তথাকার লোকদের এবং জগতের সভ্য জাতিদের ভুল ভাঙ্গিবে; তাহারা সবাই বুঝিবে, ইংলণ্ড ভারতীয়দের বিশ্বাসভাজন নহে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তি সম্পূর্ণ না হউক প্রধানতঃ জড় ও দৈহিক শক্তির উপর স্থাপিত। এইরূপ ফল সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ফলে যদি সহজে ট্যাক্স্ আদায় না হওয়ায় ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করিতে হয়। খরচের টাকা ব্যতীত সাম্রাজ্য চলে না। সেই টাকা যদি লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে না চায়, যদি উহা বলপূর্ব্বক আদায় করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সহযোগিতার ভিত্তি ভাঙ্গিয়াছে।

যে-কোন রকমের অ-সহযোগিতা যে-কোন ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে করিতে পারেন। কিন্তু দেশকে কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলিবার আগে বুঝিতে পারা চাই, যে, যথেষ্টসংখ্যক লোক সেই উপায় অবলম্বনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও দুঃখ সহিতে প্রস্তুত কি না। নতুবা কতকগুলি লোকের ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও দুঃখ সহাই হয়, কাজ উদ্ধার হয় না। তবে, যদি কেহ বলেন, প্রত্যেক অসিদ্ধি সিদ্ধির সোপানের এক-একটা ধাপ, তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু শুধু ধাপ বানাইবার জন্য লোককে দুঃখের পথে চালিত করা কি উচিত? নেতারা বুঝিয়া দেখুন। দেশ কতটা প্রস্তুত, কতটা সহিতে ও ত্যাগ করিতে সমর্থ, আমাদের তদ্বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নাই।

উপসংহারে কিন্তু বলিয়া রাখি, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়া হোক্, আন্দোলন করিয়া হোক্, গবর্ণমেণ্টকে অসুবিধায় ফেলিয়া হোক্ কিম্বা ব্রিটিশ জাতির ও সভ্য জগতের চোখ্ খুলিয়া দিয়াই হোক্, যা-কিছু আমরা চাই সবই পরপ্রত্যাশা। ইংরেজ বণিকদের ক্ষতি হইলে তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া আমাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে পারে, আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন করিয়াছে, কিম্বা আমাদিগকে অল্পস্বল্প কিছু অধিকারও দিতে পারে; কিন্তু সে-কথা মোটেই না ভাবিয়া যদি আমরা স্বদেশী নীতির অনুসরণ করি, তবে সেইটিই হইতেছে স্বাবলম্বন। শিক্ষাক্ষেত্রে, শুধু গবর্ণমেণ্টের স্কুল ছাড়িতে না বলিয়া, নিজেদের উদ্ভাবিত শিক্ষাপ্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খুলিয়া যদি তাহা দাঁড় করাইতে পারি, তাহাও হইবে স্বাবলম্বন। স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্। পরবশ যাহা কিছু তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ যাহা কিছু তাহা সুখ।

—

ক্রোক দ্বারা জরিমানা আদায়।

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্জাবে যেমন লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়াছিল, আহমেদাবাদেও কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট আহমেদাবাদ-বাসীদের জরিমানা করেন; কাহাকেও কাহাকেও অব্যাহতি দেন। যাহারা ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স্ দেয় তাহাদের নিকট হইতে ঐ ট্যাক্‌সের একতৃতীয়াংশ পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়। বল্লভভাই পটেল নামক তথাকার একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং ডাক্তার কানুগা নামক স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তারকেও জরিমানা দিতে আদেশ করা হয়। তাঁহারা নিজে ত কোন উপদ্রব করেনই নাই, বরং, নিজেদের বিপদ সম্ভাবনা সত্ত্বেও দাঙ্গা হাঙ্গামা থামাইতে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা জরিমানা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহারা কোন দোষ করেন নাই; সে-অবস্থায় জরিমানা দিলে তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ মানিয়া লইতে হয় যে দোষ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষকে কোন-প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিতেও তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। এই হেতু তাঁহারা কোন-প্রকার আন্দোলন না করিয়া, কেবল কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে তাঁহারা জরিমানা দিতে অনিচ্ছুক। ফল ক্রোকের পরোয়ানা বাহির হইল। ডাক্তার কানুগার খুব পসার। টাকা সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকে। তাঁহার অর্থাগার ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায় হইল। পটেল মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত টাকা ফেরে না। অতএব সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহার বৈঠকখানার একখানা সোফা ক্রোক করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া উহা বিক্রী করিয়া টাকা আদায় করিল। শ্রীযুক্ত পটেল ও ডাক্তার কানুগা আত্মসম্মানবোধ ও ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

—

দুর্ভিক্ষ।

যখন বাংলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই টাকায় ৪।৫ সের চাল, তখন দুর্ভিক্ষ কোথায় হইয়াছে না বলিয়া কোথায় হয় নাই তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। মানুষ না খাইয়া বা খুব কম খাইয়া কতদিন দেহে প্রাণটাকে রাখিতে পারে, তাহারই যেন একটা পরীক্ষা দেশময় হইতেছে। কিন্তু এ বাঁচাকে কি বাঁচা বলে? কোন্ কোন্ জেলায় অনকষ্ট অধিকতর হইয়াছে ও কোথায় কোথায় মানুষ অন্নাভাবে মরিয়াছে, তাহার খবর আমরা "দেশের কথা"য় সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকি। তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কোন কোন জেলায় নিরন্ন লোকদিগের সাহায্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। উদ্যোগী মহাশয়েরা সকল কাগজে আবেদন-পত্র পাঠাইলে ভাল হয়। দু-একটা ইংরেজী কাগজে এক আধ বার আবেদন ছাপিয়া দিলেই কাজ হইবে, মনে করা ভ্রম। অন্নকষ্টের, দুর্ভিক্ষের, অনাহারে মৃত্যুর ও আত্মহত্যার খবর এখন লোকের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এখন বিশেষ চেষ্টা ব্যতীত সাহায্য মিলিবে না। বাংলাদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার, বিশেষতঃ পুরী ও কটক জেলার, অবস্থা আরও খারাপ।

পুরাতন হইয়া গেলেও একটা কথা আবার বলি দুর্ভিক্ষের সময় দু মুঠা চাল দিলেই অন্নসমস্যার সমাধান হইবে না। দেশে খাদ্যশস্য আদি আরো বেশী জন্মাইয়া দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য তাহার যথেষ্ট অংশ বি-প্রকাশে দেশের মধ্যে রাখা যায়, এবং দরিদ্রতম ব্যক্তিও আত্মসম্মান না হারাইয়া তাহার যথেষ্ট অংশ কেমন করিয়া অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

—

পার্লেমেণ্টে পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে বিতর্ক।

পঞ্জাবের লোকদের উপর অত্যাচার, নিরপরাধ শত শত লোকের প্রাণবধ, তদপেক্ষা অধিক লোককে ক্ষতবিক্ষত করা, বিস্তর লোককে অকারণ বেত্রাঘাত, নিরপরাধ লোকের উপর আকাশ হইতে বোমা ও গোলাগুলি নিক্ষেপ, বালকবালিকা স্ত্রীপুরুষের উপর নানাপ্রকার নিষ্ঠুর ও ঘোরতর অপমানজনক ব্যবহার,—ইহাদের জন্য শেষ শাস্তি হইল কি, না, ডায়ারের চাকরী গেল। সে পদচ্যুত হইল, না তাহাকে ইস্তফা দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এখনও ঠিক্ বলা যায় না। উঁচু উঁচু কথা, ন্যায়সঙ্গত কথা, কড়া কড়া কথা, মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন বটে, মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন বটে যে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করেন না যে ডায়ার ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আস্কুইথ এবং পার্লেমেণ্টের কোন কোন সভ্য ভাল কথা বলিয়াছেন বটে (এবং ইহাও মন্দের ভাল), শ্রমজীবীসভ্যদের কেহ কেহ সমুদয় গবর্ণমেণ্টকে দায়ী বলিয়াছেন, শুধু ডায়ারের উপর সব দোষ চাপাইয়া পঞ্জাবগবর্ণমেণ্টকে অব্যাহতি দেওয়া অন্যায় বলিয়াছেন, ভারতবাসীদের যে অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার করা হয় নাই বলিয়াছেন এবং যে-নিগ্রহনীতির ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে তাহা নির্মূল না-করার প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শত শত মানুষ খুনের, সমস্ত জাতিটাকে কৃমির মত মনে করিয়া তাহাদের অপমানের এই কি শাস্তি? উত্তেজনার বশে কিম্বা যে-কারণ বা অকারণেই হউক ভারতীয় যে-সব লোক ঘোরতর কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাদের ফাঁসী, চিরনির্ব্বাসন আদি দণ্ড হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে-সব ইংরেজ তদপেক্ষা অনেক বেশী খুন, অত্যাচার, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিল, তাহাদের মধ্যে

একমাত্র ডায়ারকে শুধু কাজে ইস্তফা দিতে হইল! বাকী অত্যাচারীগুলার কি হইল? নাটের গুরু ওডায়ার উচ্চ প্রশংসার করতালির মধ্যে রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর লইল। যে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বোলট আইন সংপৃক্ত বিতর্কের সময় সম্ভাবিত উপদ্রব দমনে "জবরদস্ত হাকিম"দিগকে অভয় দিয়া তাহাদের জুলুমবাজীকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার দুর্ব্বলচিত্ততায় ওডায়ারই যেন প্রভু ও তিনি তাহার আজ্ঞাকারী এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, সেই বড়লাটের অবিমিশ্র প্রশংসা ভিন্ন ত আর কিছুই শোনা গেল না। পার্লেমেণ্টে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াইয়াছে যেন, আসল আসামী মণ্টেগু সাহেব। অপরাধ কি, না, তিনি অমৃতসরের সব ব্যাপার জানিয়াও বলিয়াছিলেন, জানি নাই। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহাতে কি প্রমাণ হইল যে খুনী ডায়ার ও তাহার মুরুব্বি ওডায়ার দেবতা?

ডায়ারের সমর্থক পার্লেমেণ্টের কোন কোন সভ্য চীৎকার করে, যে, মণ্টেগু সাহেবের ইস্তফা দেওয়া উচিত। আমরাও তাঁহাকে দোষী মনে করি, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। তাঁহার দোষ এই যে তিনি শীঘ্র ও যথাসময়ে এত বড় একটা অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত জানিতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; তাঁহার দোষ এই যে তিনি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের ধিক্কারজনক অত্যুক্তিপূর্ণ প্রশংসা করিয়াছেন, ওডায়ারের মৃদু সমালোচনার পর অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, ডায়ারের কর্ত্তব্যবুদ্ধি (!) বলিয়া একটা জিনিষ আছে মানিয়া লইয়া তাহার নাম মাত্র শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তাঁহাকে ইস্তফা দিতে হয়, তাহা হইলে ডায়ার ও আরও কয়েকজন খুনীকে ফাঁসী দিতে হয়, ওডায়ারকে আমরণ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, এবং লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে বরখাস্ত করিয়া ভবিষ্যতে সর্ব্ববিধ রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত রাখিতে হয়।

আষাঢ়ের প্রবাসীতে "ভারতে ফরাসীর অকৃতকার্য্যতা ও ইংরেজের কৃতিত্বের একটি কারণ" শীর্ষক নিবন্ধিকায় আমরা যে মন্তব্য করিয়াছিলাম, পার্লেমেণ্টে পঞ্জাব সম্বন্ধীয় বিতর্ক তাহার সমর্থন করিতেছে।

ভারতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক আন্দোলক "ব্রিটিশ ন্যায়পরতা" নামক একটি অসাধারণ জিনিষের দোহাই বহুকাল হইতে দিয়া আসিতেছেন। আমরা কোন কালেই বিশ্বাস করি নাই, যে, এই ন্যায়পরতাটি অন্য জাতিদের ন্যায়পরতা হইতে পৃথক্ রকমের একটি কোন বস্তু। যাঁহারা সেরূপ মনে করেন, এখন তাঁহাদের ভ্রম ভাঙ্গিবে কি? যদি এখনও না ভাঙ্গে তাহা হইলে তাঁহারা দেখাইবেন কি, যে, সাম্রাজ্যরক্ষার ওজুহাতে উচ্চপদস্থ ইংরেজ, অখৃষ্টিয়ান অশ্বেত লোকদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়া, কবে কোথায় সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে? অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্তও দেখান্। ইংরেজরা, আতঙ্কজনক হৃদয়হীন জুলুমবাজী ও অত্যাচারের নাম দিয়াছেন Prussianism প্রসিয়ানত্ব; কিন্তু তাঁহারা জার্মেনদের কৃত এমন কোন অত্যাচারের নাম করিতে পারেন কি যাহার সমতুল্য কিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও কোথাও হয় নাই?

অত্যাচরিত পরাধীন জাতি নিজের সংহত শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া সুবিচার ও প্রতিকারের জন্য প্রভু-জাতির মুখাপেক্ষী হইলে কখন সিদ্ধি লাভ হয় না।

আষাঢ়ের চিত্রপরিচয়

"কুহু"।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবিপ্রসিদ্ধি আছে যে কোকিলের কুহু রব শুনলে বিরহী-বিরহিণীদের প্রিয়জনকে মনে পড়ে। সেই ভাবটি অবলম্বন কোরে এই ছবিটি আঁকা। বনে বাসন্তী রং লেগেছে, ফুলে ফুলে শাখায় শাখায় বসন্তের মহোৎসবের সিংহাসন পাতা; সেই বনপথের যাত্রিণী তরুণী পত্রপুঞ্জের আড়াল থেকে কুহুধ্বনি শুনে চম্‌কে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে —কিন্তু তখনো তার অঙ্গে গতির হিল্লোল লেগে আছে, ঘাগ্‌রায় ওড়ুনায় চলার ছন্দ তখনো স্থগিত হয়ে যায়নি, অথচ তার মন যে একটি ভাবনায় আটকে থেমে গেছে তার আভাস তার মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে।

শ্রাবণের চিত্রপরিচয়

"দুর্দ্দিন"।

গৃহহীনা অন্নহীনা বস্ত্রহীনা নারী ছেঁড়া কাপড়ে কোলের ছেলেটিকে ঢেকে দুর্দ্দিনের সকল উপদ্রব নিজের মাথা পেতে সহ্য কর্‌ছেন; মা নিজে নিরাহারে থেকেও ছেলের খাদ্য নিজের বুকে সঞ্চয় করে রেখেছেন এই দারুণ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব।—এ যেন আমাদেরই মাতৃভূমির ছবি।

চারু।

সংশোধনী

২১৫ পৃষ্ঠা, ২ কলম, ১৯ লাইনের ১ম কথা "মানবের" বদলে "মানের" হইবে।

৩৬২ পৃষ্ঠায় ২ কলম, ১০ লাইনের "বিলাত" কথাটির জায়গায় "আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স্" পড়িতে হইবে।

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে ২৮৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষ ছত্রে "বীরভূমবাসী"র জায়গায় হইবে "বীরভূমবাণী"।

"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"

প্রাচীন চিত্র হইতে—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৭

৫ম সংখ্যা

মায়াবাদ

নব্য অদ্বৈত বৈদান্তিকগণের মধ্যে মায়াবাদ একটি বিশেষ মত। কিন্তু এই মত লইয়া অনেক মতভেদ। বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ এই মতের ঘোরতর বিরোধী। পদ্মপুরাণকারও একসময়ে বলিয়াছিলেন "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ"—মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র এবং ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। এ মত সত্যসত্যই অবৈদিক কি না, অদ্য তাহাই আলোচনা করা যাইবে।

মায়াবাদের অর্থ।

মায়াবাদিগণের মত এই :—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে জগৎ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত রহিয়াছে, এ জগৎ বাস্তবিক এ-প্রকার নহে। প্রকৃত পক্ষে এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন। আছেন একমাত্র অদ্বিতীয় অন্তরবাহ্য-ভেদ-রহিত আত্মা। এই ভেদরহিত আত্মাকেই এই ভেদযুক্ত বহুত্বপূর্ণ জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, শুক্তিকাতে যেমন রজত, মরীচিকায় যেমন জল, শূন্যে যেমন গন্ধর্ব্বপুর, স্থাণুতে যেমন পুরুষ, শুভ্র স্ফটিকে যেমন লোহিত্যাদি, তিমির-দৃষ্টির যেমন বহুচন্দ্রদর্শন,—আত্মাতেও তেমনি জগৎ ভ্রম। রজ্জু ও সর্প একবস্তু নহে, রজ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি হয় না, সর্প রজ্জুর পরিণাম নহে, কিন্তু রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। তেমনি আত্মা ও জগৎ একবস্তু নহে, আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই, জগৎ আত্মার পরিণতি নহে। রহিয়াছে একমাত্র আত্মা; কিন্তু ভ্রান্ত মানব আত্মাকে আত্মা বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না; আত্মাকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছে। এই যে ভ্রান্তিমূলক কল্পিত অনাত্ম বস্তু, ইহাকেই লোকে জগৎ নাম দিয়াছে। ভ্রান্ত মানবই মনে করে, জগৎ বলিয়া একটি বস্তু আছে। কিন্তু জ্ঞানবান্ পুরুষ ও ব্রহ্মের নিকটে এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন।

ইহাই মায়াবাদের মূলতত্ত্ব।

আরম্ভ কোথায়?

এখন প্রশ্ন—এ মতের আরম্ভ কোথায়? প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা মনে করেন, বৈদিক যুগেই ইহার আরম্ভ। আবার এমন পণ্ডিতও দুই-একজন আছেন, যাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য্যই মায়াবাদের জন্মদাতা, তিনিই বেদান্তদর্শনে এই মত প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন; এতদুভয়ের কোন মতকেই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হইতেছে না। এ জগৎকে যে-প্রকার দেখিতেছি, ইহা এই-প্রকারই কি না, এবিষয়ে ঋগ্বেদের ঋষিগণের প্রাণে কোন চিন্তাই উত্থিত হয় নাই। এ জগতের বাস্তব সত্ত্ব আছে, ইহাই ঋগ্বেদের মৌলিক ভাব। উপনিষৎ রচনার পূর্ব্বেই মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং জ্ঞাতসারেই কেহ কেহ এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ঐ সময়ের সাহিত্যে জগতের মায়াময়ত্ব বিষয়ে যে দুই একটি

উক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে মায়াবাদ বলা যায় না। উপনিষদেই ইহার ভিত্তি। কোন উপনিষদে জ্ঞাতসারে, কোন উপনিষদে বা অজ্ঞাতসারে মায়াবাদের মূলতত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকে মায়াবাদের প্রথম প্রচারক বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। ছান্দোগ্য, কঠ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদে যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার পরিণাম মায়াবাদ। মৈত্রী, শ্বেতাশ্বতর এবং নৃসিংহতাপনীয় ও অপরাপর আধুনিক উপনিষদে এই মত পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকাতে গৌড়পাদ এই মতকে দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদের আলোচনায় অনেকে গৌড়পাদকে বিচারের মধ্যেই আনেন না; ইহার কারণ অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে। যাঁহারা ইহার কারিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, যে, ইহার মতের সহিত শঙ্করের মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য। কারিকা-কারের নাম না জানিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শঙ্করকেই গ্রন্থকার বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও অধিক নহে। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ এবং গোবিন্দের শিষ্য শঙ্কর। গুরুর পাদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার মুখেই যে শঙ্কর গৌড়পাদের, ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তিনি গৌড়পাদের মতকেই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া নিজের মত করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শঙ্কর মায়াবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই শেষ ব্যাখ্যা। তাঁহার পরে এই মায়াবাদ-বিষয়ে কেহ কিছু নূতন বলিয়াছেন কি না সন্দেহ।

উপনিষদে মায়াবাদ উৎপত্তির কারণ।

মায়াবাদ-বিষয়ে উপনিষদের মত কি এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক। মায়াবাদের কেন উৎপত্তি হইল তাহা জানিতে হইলে উপনিষদের আত্মতত্ত্ব প্রথমে জানা আবশ্যক। এ-বিষয়ে প্রামাণিক উপনিষদ্‌সমূহের মূল মত এই :—

একটি মাত্র বস্তুই আছে এবং এই বস্তুটি আত্মা। আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই। সাধারণ মানব মনে করে,—যত মানব, তত আত্মা; এবং পরমাত্মা এক। জীবাত্মা বহু। কিন্তু উপনিষৎ বলেন আত্মা বহু নহে; আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। জীবাত্মা এক, পরমাত্মা অন্য—এ মত উপনিষদ্‌বিরোধী। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদুভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা এবং যাহা পরমাত্মা, তাহাই জীবাত্মা। সাধারণ লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু উপনিষৎ বলেন—'আত্মা'। আত্মার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব সমুদয় উপনিষদের সাধারণ মত।

আমরা যাহাকে জগৎ বলি, আত্মাই তাহার মূলাধার, আত্মাই তাহার প্রতিষ্ঠা। অন্য ভাষায় সংক্ষেপে বলি "আত্মাই ব্রহ্ম"।

ইহার পরই মতভেদ। এই মতভেদ আত্মার ভেদ লইয়া। ভেদ তিন প্রকার—(১) স্বজাতীয়, (২) বিজাতীয়, (৩) স্বগত। এক জাতীয় বহু বস্তু থাকিলে যে ভেদ, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ—যেমন রাম-শ্যামে ভেদ। গরু-ঘোড়াতে যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। বৃক্ষ এক, কিন্তু এই বৃক্ষে পত্র পুষ্প শাখাদি অনেক আছে। বৃক্ষে যে এই ভেদ—ইহাই স্বগত ভেদ। আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ নাই, বিজাতীয় ভেদ নাই—সমুদয় উপনিষদেরই এই মত। মতভেদ স্বগত-ভেদ লইয়া। এক শ্রেণীর ঋষি স্বীকার করিতেন—ব্রহ্মে স্বগতভেদ আছে। ইঁহাদিগের মতে ব্রহ্ম বিশ্বরূপ ও বিচিত্র-ক্ষমতা-শালী; তিনি বাস্তবিকই স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা। বলা বাহুল্য যে ইঁহারা মনে করিতেন এ জগৎ প্রকৃত পক্ষেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আর-শ্রেণীর ঋষি ছিলেন, যাঁহারা ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ স্বীকার করিতেন না। শক্ত্যাদি স্বীকার করিলেই ভেদ স্বীকার করা হইল; সুতরাং তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মে স্রষ্টৃত্বাদি আরোপ করা যায় না। সুতরাং এই যে নানাত্বপূর্ণ জগৎ, ইহা ব্রহ্মের সৃষ্টি হইতে পারে না। এ জগৎ ব্রহ্মের অভ্যন্তরে নহে, কারণ তিনি স্বগত-ভেদ-রহিত। এ জগৎ ব্রহ্মের বাহিরেও নহে, কারণ তিনি স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত। সুতরাং বলিতেই হইবে এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন। এইরূপেই মায়াবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক উপনিষদে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

(ক) বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

অনেকে মনে করেন বৃহদারণ্যক উপনিষদই প্রাচীনতম উপনিষৎ। এবং এ-প্রকার মনে করিবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। এই উপনিষদের প্রধান বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য। ইঁহার ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বৈদিক সাহিত্যে আর দ্বিতীয় আছেন কি না সন্দেহ। এই যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদই মায়াবাদের ভিত্তি। তিনি মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম-বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন :—

সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব এবং বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব (বৃহঃ ৪।৫।১৩)—অর্থাৎ যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তর-রহিত, বাহ্য-রহিত, এবং একমাত্র রসঘন, তেমনি অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা অন্তররহিত, বাহ্যরহিত এবং একমাত্র প্রজ্ঞানঘন।

এই উপনিষদের অন্য একস্থলে (২।৫।১৯) বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম অনন্তরম্, অবাহ্যম্। ব্রহ্মের অন্তরে কিছু নাই, বাহিরে কিছু নাই; তিনি অন্তর-বাহ্য ভেদ-রহিত অর্থাৎ তিনি স্বগত- স্বজাতীয়- এবং বিজাতীয়-ভেদ-রহিত। অপর এক স্থলে (৪।৩।৩২) বলা হইয়াছে :—

সলিলঃ একঃ দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ ভবতি; এষঃ ব্রহ্মলোকঃ। অর্থাৎ (আত্মরূপ) সলিল এক, দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত; ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক।

ব্রহ্ম স্বগত-ভেদ-বিহীন—এই কথা বুঝাইবার জন্যই সম্ভবতঃ আত্মাকে 'সলিল' বলা হইয়াছে।

অন্যত্র আছে :—

মন দ্বারাই দর্শন করিতে হইবে যে, ইঁহাতে নানা কিছু নাই (ন ইহ নানা অস্তি কিঞ্চন)। তাঁহাতে যেন নানা রহিয়াছে, যে এইরূপ দেখে (যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি) সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (৪।৪।১৯)।

ঋষি প্রথমে বলিলেন—ব্রহ্মে 'নানা' নাই। ইহা বলিয়াই তিনি নিবৃত্ত হইলেন না, ইহার পর বলিলেন—"যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি"। লোকে ব্রহ্মে নানাত্ব দেখে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—এই 'নানা' প্রকৃতপক্ষে 'নানা' নহে; ইহা যেন নানা। এই নানাত্ব দর্শন ভ্রমাত্মক—ইহা বুঝাইবার জন্যই 'নানা'কে 'নানা' না বলিয়া বলিলেন 'নানা ইব' —যেন নানা।

ইহার পরের মন্ত্র (৪।৪।২০) এই :—"এই অপ্রমেয় ধ্রুব আত্মাকে একই রূপে (একধা) দর্শন করিবে এই আত্মা বিরজঃ, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, মহান্ এবং অজ।"

এখানেও বলা হইল আত্মাকে একই রূপে (একধা) দেখিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মে নানা নাই। যেখানে পরিবর্ত্তন, সেই স্থলেই ভেদ; তিনি ভেদরহিত, অপরিবর্ত্তনীয়—ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইল তিনি 'ধ্রুব'। তিনি আকাশের ন্যায়—ইহা বলিলেই বুঝায় তিনি ভেদরহিত; এখানে বলা হইল—তিনি আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে সুষুপ্তি অবস্থাই আত্মার স্ব-রূপ; এ অবস্থায় জগৎ অস্তিত্ববিহীন এবং ইহাই ব্রহ্মাবস্থা। যাজ্ঞবল্ক্য এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (৪।৩।২১—৩২)—

"ইহাই ইঁহার কামনা-রহিত পাপ-রহিত অভয়রূপ। যেমন লোকে প্রিয়তমা স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তঃ হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানে না, তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না, ইহাই ইঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও ও শোকাতীত রূপ। এই অবস্থায় পিতা অপিতা হয়েন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, এবং বেদ অবেদ হয়েন। এই অবস্থায় স্তেন অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ এবং তাপস অতাপস হয়। পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপও ইহার অনুগমন করে না, তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে মুক্ত হয়েন। এই অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না, দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না (দর্শন করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই দ্রষ্টা এবং) দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (দর্শন করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন। এই অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না। (আঘ্রাণ করেন, তাহার কারণ এই

যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই ঘ্রাতা এবং) ঘ্রাতার ঘ্রাণ কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (আঘ্রাণ করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন করেন না, রসাস্বাদন করিয়াও রসাস্বাদন করেন না। (রসাস্বাদন করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই রসয়িতা এবং) রসয়িতার রসাস্বাদন কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (রসাস্বাদন করেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আস্বাদন করিবেন। এই অবস্থায় তিনি বলেন না, বলিয়াও বলেন না। (তিনি বলেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই বক্তা এবং আত্মার) বক্তৃত্ব কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি বলেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি বলিবেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন না। (তিনি শ্রবণ করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই শ্রোতা এবং শ্রোতার) শ্রুতি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি শ্রবণ করেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি মনন করেন না, মনন করিয়াও মনন করেন না। (তিনি মনন করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই মনন-কর্ত্তা এবং মন্তার) মনন কখন বিনষ্ট হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (মনন করেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন। এই অবস্থায় তিনি স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করেন না। (স্পর্শ করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই স্প্রষ্টা এবং) স্প্রষ্টার স্পর্শ কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি স্পর্শ করেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা অবিভক্ত এমন কিছু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি জানেন না, জানিয়াও জানেন না। (তিনি জানেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই জ্ঞাতা এবং) জ্ঞাতার জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি জানেন না, কারণ) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা অবিভক্ত এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি জানিবেন।

যে স্থলে মনে হয় যেন অন্যবস্তু রহিয়াছে (যত্র বৈ অন্যৎ ইব স্যাৎ), সেই স্থলে এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে বলে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ করে এবং এক অপরকে জানে। (৪।৩।৩১)। (আত্মরূপ) সলিলই এক, দ্রষ্টা, এবং অদ্বৈত। (যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিলেন) হে সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে জনককে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাই পরমা গতি ইহাই পরমা সম্পৎ। ইহাই পরম লোক এবং ইহাই পরমানন্দ। (৪।৩।৩২)।

এখানে বলা হইল সুষুপ্তির অবস্থাই আত্মার স্ব-রূপ, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক। এই আত্মতত্ত্ব হইতে বুঝা যাইতেছে এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই। যখন আত্মা স্ব রূপ প্রাপ্ত হয় তখন এমন কোন বস্তু থাকে না যাহাকে দর্শনাদি করা যাইতে পারে। ৩১তম মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'যত্র বৈ অন্যৎ ইব স্যাৎ"—"যে স্থলে মনে হয় যেন অন্য বস্তু রহিয়াছে"। এই স্থলে "ইব" শব্দের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। যাহা নাই কিন্তু ভ্রম হইতেছে তাহা আছে—এইরূপ স্থলেই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হয়। অন্য বস্তু নাই অথচ মনে হইতেছে ইহা আছে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য এই স্থলে "ইব" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

এই প্রকার দৃষ্টান্ত আরও আছে। এই ব্রাহ্মণেরই প্রথমাংশে (৪।৩।৭) বলা হইয়াছে—

তিনি এক থাকিয়া জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এই উভয় লোকে বিচরণ করেন—তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন (ধ্যায়তি ইব, লেলায়তি ইব)।

এখানেও 'ইব' শব্দের ব্যবহার দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য বুঝাইতেছেন যে আমরা ভ্রম-বশতঃই মনে করি আত্মা কার্য্যাদি করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহারও সিদ্ধান্ত এই। আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে এক স্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

"মৃত্যুর পরে তাহার সংজ্ঞা থাকে না। অরে! আমি তাই বলিতেছি—যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন 'ভগবন্! আপনি গভীর মোহের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমি মোহজনক কিছু বলি নাই। এই আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন। যে স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে (যত্র দ্বৈতম্ ইব ভবতি), সেই স্থলে এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জ্ঞাত হয়। কিন্তু ইহার নিকট যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে? কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা সমুদয় জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়)।" বৃহঃ ৪।৫।১৩-১৫; ২।৪ ১৪ দ্রষ্টব্য।

এখানেও আছে 'যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি'="যে স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে"। দ্বিতীয় বস্তু নাই অথচ ভ্রম হইতেছে দ্বিতীয় বস্তু আছে, এই ভাব বুঝাইবার জন্যই এখানে "ইব" ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে দ্বৈত ভ্রমাত্মক এবং জ্ঞানীর নিকট দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু অদ্বৈতবাদ নানা শ্রেণীর। এক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী আছেন যাঁহারা বলেন জগতের প্রকৃত সত্তা আছে এবং এইসঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলেন যে এ জগৎ ব্রহ্মই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এই শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম অন্তর-বাহ্য-ভেদ-রহিত। তিনি প্রথমে মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ দিলেন যে 'অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ' (৪।৫।১৩)। তাহার পরে যত্র দ্বৈতম্ ইব ভবতি' ইত্যাদি বচন দ্বারা বুঝাইলেন যে দ্বৈত ভ্রমাত্মক। তাহার পরে বলিলেন, এ অবস্থায় এমন কিছু নাই যাহা দর্শনাদি করা যায়। সে অদ্বৈতবাদে দর্শনাদি সম্ভব নহে, সে অদ্বৈতবাদে জগৎ অস্তিত্ববিহীন। জগৎ যদি ব্রহ্মের বাহিরে থাকিত, তাহা হইলেও ইহাকে দর্শনাদি করা সম্ভব হইত; আর যদি অভ্যন্তরে থাকিত, তাহা হইলেও ইহা দর্শনাদির বিষয় হইত। দর্শনাদি যখন সম্ভব নহে, তখন বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানীর নিকটে এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন—ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মত।

(খ) ছান্দোগ্য উপনিষদে।

ছান্দোগ্য উপনিষদও একখানা প্রাচীন উপনিষৎ। এই উপনিষদে কি-প্রকার অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, এই উপনিষদের মত পরিণামবাদ, কেহ বলেন বিবর্ত্তবাদ। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

আরুণি এক সময়ে স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"শ্বেতকেতো, তুমি কি (আচার্য্যকে) সেই উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অবোধ্য বিষয় বোধগম্য হয় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়?" শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে উপদেশ কি প্রকার?" পিতা বলিলেন, "হে সোম্য! যেমন একটি মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, নাম মাত্র, কিন্তু মৃত্তিকাই সত্য বস্তু; হে সোম্য! যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ড জানিলেই সমুদয় সুবর্ণময় বস্তু জানা যায়, বিকার নামমূলক, নাম মাত্র, কিন্তু সুবর্ণই সত্যবস্তু; হে সোম্য! যেমন একটি নখ-নিকৃন্তন (অর্থাৎ নরুন) জানিলেই সমুদয় লৌহময় বস্তু জানা যায়, বিকার শব্দাত্মক, নাম মাত্র, লৌহই সত্য; তেমনি হে সোম্য! সেই উপদেশ এই-প্রকার।" ৬।১।২—৬।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া উপরি-উক্ত অংশ ব্যাখ্যা করা যাউক। সুবর্ণপিণ্ড এবং সুবর্ণময়বস্তু একই; সুবর্ণপিণ্ডই মূলবস্তু, এই মূলবস্তু হইতেই কুণ্ডল বলয়াদি নির্ম্মিত হয়। কুণ্ডল বলয়াদি সুবর্ণেরই বিকার, কিন্তু ইহা সুবর্ণই। ভাষায় বলিতে হয় এইটা কুণ্ডল, এইটা বলয়; কিন্তু ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে কুণ্ডল বলয়াদি এক সুবর্ণই থাকিয়া যায়—সুতরাং সুবর্ণই সত্যপদার্থ। এক সুবর্ণপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই কুণ্ডল বলয়াদি সমুদয় সুবর্ণময় বস্তুর জ্ঞান হয়।

এইরূপ এমন এক বস্তু আছে, যাহার জ্ঞান হইলে সমুদয় বস্তুর জ্ঞান হয়। এই বস্তুটি "আত্মা"। এই আত্মার জ্ঞান হইলেই সমুদয় বস্তুর জ্ঞান হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত অংশের অর্থ।

এখন প্রশ্ন—ইহা পরিণামবাদ; না বিবর্ত্তবাদ? উভয় অর্থেই ইহাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাঁহারা পরিণাম অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বলেন সুবর্ণই পরিণত হইয়া কুণ্ডলাদি রূপ ধারণ করে। সুবর্ণের যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি কুণ্ডলাদিরও অস্তিত্ব আছে। তবে সুবর্ণই মূলবস্তু এবং কুণ্ডলাদি ইহার বিকার। সুবর্ণপিণ্ড এবং সুবর্ণকুণ্ডল যখন একই বস্তু, তখন সুবর্ণপিণ্ডের জ্ঞান হইতেই সুবর্ণকুণ্ডলের জ্ঞান হইবে।

বিবর্ত্তবাদী বলেন, "উক্ত দৃষ্টান্তসমূহ পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত নহে। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, ইহাই পরিণামবাদ। দুগ্ধ যদি দুগ্ধই থাকে, সুবর্ণ যদি সুবর্ণই থাকে—তাহা হইলে আর পরিণামবাদ হইল না। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিবর্ত্তবাদই। বিবর্ত্তবাদে বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়। আর দুগ্ধের জ্ঞান হইতে দধির জ্ঞান হয় না। যদি একের জ্ঞান হইতে অপরের জ্ঞান হয়, বুঝিতে হইবে উভয়ই এক বস্তু। সুবর্ণপিণ্ডের জ্ঞান হইতে সুবর্ণ কুণ্ডলের জ্ঞান হয়, তেমনি আত্মার জ্ঞান হইতে আত্মময় বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে; আত্মার জ্ঞান হইতে অনাত্ম-বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। সুবর্ণপিণ্ড এবং সুবর্ণ-কুণ্ডল একপ্রকৃতিসম্পন্ন, কিন্তু কে বলিতে পারে আত্মা এবং এই জগৎ একপ্রকৃতিসম্পন্ন? জগৎ আত্মা নহে, জগৎ অনাত্মা। আত্মা এবং অনাত্মা একপ্রকৃতিসম্পন্ন নহে। উভয়ে যখন একপ্রকৃতিসম্পন্ন নহে, তখন একের জ্ঞান হইতে অপরের জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব এবং এস্থলে সুবর্ণাদির দৃষ্টান্তেরই বা সার্থকতা কোথায়? এই সমুদয় যুক্তি দেখাইয়া বিবর্ত্তবাদী বলেন—প্রকৃত পক্ষে জগৎ জগৎ নহে, ইহা আত্মাই; যেস্থলে তোমরা জগৎ দেখিতেছ, সে স্থলে প্রকৃত পক্ষে আত্মাই রহিয়াছেন। অজ্ঞানতা-বশতই তোমরা আত্মাকে জগৎ বলিয়া মনে করিতেছ। জ্ঞান হউক, দেখিবে যাহাকে তোমরা জগৎ বলিয়া কল্পনা করিতেছিলে, তাহা জগৎ নহে, তাহা অনাত্মবস্তু নহে, তাহা আত্মাই। জ্ঞান হইলেই জগতের জগত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং সেই স্থলে আত্মত্বই প্রকাশিত হয়। বিবর্ত্তবাদী বলেন—এপ্রকার ব্যাখ্যা না করিলে সুবর্ণপিণ্ড এবং সুবর্ণকুণ্ডলের একত্বের ন্যায় আত্মা ও জগতের একত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না।

আমাদের বক্তব্য এই—দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া কোন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা নিরাপদ নহে। দৃষ্টান্তের অনেক দিক্। কোন্ দিকে ইহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা সব সময়ে নির্ণয় করা যায় না। যিনি চন্দ্রমুখী, তাঁহার মুখ অবশ্যই চন্দ্রের ন্যায় গোলাকার কিংবা চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কবিশিষ্ট নহে। উপনিষদের দৃষ্টান্ত-বিষয়েও ইহাই বক্তব্য। এই-সমুদয় দৃষ্টান্তকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ-সমুদয় দ্বারা জগতের মায়াময়ত্ব প্রমাণ করা যায় কি না সন্দেহের বিষয়। বরং ইহাই সত্য যে ঋষির মতের গতি পরিণামবাদের দিকে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দিবার পরে তিনি যে ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না যে তিনি জগতের প্রকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু এই উপনিষদে আত্মার বিষয়ে এমন তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহার পরিণাম মায়াবাদ। সুষুপ্তি বিষয়ে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে কোন মতভেদ নাই। উভয় উপনিষদের মতেই সুষুপ্তির অবস্থাই আত্মার স্বরূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়েই উদ্দালক আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"হে সোম্য! আমার নিকট সুষুপ্তিতত্ত্ব অবগত হও। যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, তখন সে সৎস্বরূপের সহিত মিলিত হয়, স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয় (৬।৮।১)।"

অপর একস্থলে (৮।৩।২) আছে :—

"ক্ষেত্রে হিরণ্যনিধি নিহিত থাকিলেও যেমন অক্ষেত্রজ্ঞ ইহার উপরে উপরে বিচরণ করিয়াও সেই নিধি লাভ করিতে পারে না, তেমনি সমুদয় প্রাণী অহরহ (সুষুপ্তিকালে) সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও লাভ করিতে পারে না।"

এখানে বলা হইতেছে যে সুষুপ্তিকালে প্রাণীসমূহ প্রতিদিনই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ ইহারা ইহা বুঝিতে পারে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই দুইটি মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে সুষুপ্তির অবস্থা আত্মার স্বরূপ, ব্রহ্মাবস্থা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সুষুপ্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এখানেও সেই সিদ্ধান্তই করিতে হইবে। অর্থাৎ আত্মা যখন স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয় তখন এই জগৎ বর্ত্তমান থাকে না। আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকট এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন।

এই উপনিষদে 'ভূমা'-বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। "ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে" (ছাঃ ৭।২৩।১) এই উপদেশ দিয়া ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (৭।২৪।১) সনৎকুমার নারদকে ভূমা-বিষয়ে এই-প্রকার বলিলেন :—

"যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শ্রবণ করা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শ্রবণ করা যায়, তাহাই অল্প। যাহা ভূম তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প তাহাই মর্ত্ত্য।"

ইহার পরে বলা হইয়াছে—"তিনিই (অর্থাৎ ভূমাই) অধোভাগে, তিনিই উপরিভাগে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে এবং তিনিই এই সমুদয়।"

ইহার পরে বলা হইল—"আমিই অধোভাগে, আমিই উপরিভাগে, আমিই পশ্চাতে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে এবং আমিই এই সমুদয়।"

ইহার পরে আছে—"আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উপরিভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে এবং আত্মাই এই সমুদয়।"

ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (৭।২৬।১) বলা হইয়াছে—আত্মা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়

সনৎকুমারের 'ভূমা' এবং যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মা একই। ভূমাতেও দ্বিতীয় বস্তু নাই (৭।২৩।১), যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মাও অন্তর-বাহ্য-ভেদ-রহিত। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সনৎকুমার ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সিদ্ধান্ত করিলেন—এই জগৎ ভ্রমাত্মক। কিন্তু সনৎকুমার বলিলেন—এই আত্মা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়। সনৎকুমারের জগৎকে ভ্রমাত্মক বলা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু শঙ্কর উভয়ের জগৎকেই মায়াময় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—উভয়ের মতের পরিণামই মায়াবাদ;—যাজ্ঞবল্ক্য এই মতের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সনৎকুমার ছিলেন অর্দ্ধপথে।

(গ) কঠোপনিষদে।

কঠোপনিষদের কোন কোন স্থলে এমন কথা বলা হইয়াছিল, যাহার পরিণাম মায়াবাদ। এক স্থলে আছে—নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্—যাহা দেখিতেছ, তাহা বল (২।১৪)।"

যম বলিয়াছিলেন—ইনি ব্রহ্ম বা আত্মা।

আত্মার প্রকৃতি বিষয়ে যম এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন :—

"বিপশ্চিতের (অর্থাৎ আত্মার) জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই; ইঁহা হইতেও কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না (২।১৮)।"

নচিকেতার প্রশ্ন এবং যমের উত্তর হইতে বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্ম কারণ নহেন, তিনি কারণ হইতে পৃথক্। ১৮শ মন্ত্রে বলা হইতেছে ব্রহ্ম হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।

আমরা যাহাকে জগৎ বলি, তাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ব্রহ্ম ইহার কারণ নহেন। সুতরা অদ্বৈতবাদীকে বলিতেই হইবে যে এই জগৎ অস্তিত্ববিহীন।

এই উপনিষদে আরও দুইটি মন্ত্র আছে :—

যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। তিনি যেন নানা, যে এইরূপ দেখে (যে ইহ নানা ইব পশ্যতি) সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে (৪।১০)।"

ইহার পরের মন্ত্র (৪।১১) বৃহদারণ্যক হইতে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহীত হইয়াছে—

"মন দ্বারাই ইঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইঁহাতে নানা কিছু নাই। তিনি যেন নানা, ইহা যে দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।" (পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃঃ ৪।৪।১৯ দ্রষ্টব্য)।

এই দুই মন্ত্রেও দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম ভেদরহিত এবং এই যে নানাত্ব দেখিতেছি ইহা ভ্রমাত্মক।

(ঘ) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। নানা স্থল হইতে ইহাতে নানা মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে নানা বিরোধী মতেরও সমাবেশ দেখা যায়। মায়াবাদ ভিন্ন এ-সমুদয়ের সামঞ্জস্য হয় না এবং ইহাতে মায়াবাদও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এক স্থলে (৩।১) আছে :—"যে অদ্বিতীয় মায়াবী (জালবান্) নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা চালনা করেন—নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা লোকসমূহকে চালনা করেন, যিনি উৎপত্তিতে ও স্থিতিতে এক, তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

অপর এক অধ্যায়ে এই দুইটি মন্ত্র আছে :—ছন্দ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভব্য ইত্যাদি যে-সমুদয়ের কথা বেদ বলেন—সে-সমুদয়ই ইহা হইতে। মায়ী এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন; এই বিশ্বে অন্য (অর্থাৎ জীবাত্মা) মায়া দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে (৪।৯)। প্রকৃতিকেই মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে। যে-সমুদয় তাঁহার অবয়বভূত, সেই-সমুদয় দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত (৪।১০)।

অপর একটি স্থলে আছে :—উর্ণনাভের ন্যায় যে অদ্বিতীয় দেবতা প্রধান হইতে, উৎপন্ন অর্থাৎ মায়া হইতে উৎপন্ন তন্তু দ্বারা (প্রধানজৈঃ তন্তুভিঃ) স্বভাবতঃ আপনাকে আচ্ছাদিত করেন, তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার বিধান করুন (৬।১০)।

আর একটি মন্ত্র এই :—প্রধানই (অর্থাৎ প্রকৃতি—মায়া) ক্ষর এবং হরই অক্ষর। সেই অদ্বিতীয় দেবতা, ক্ষর এবং জীবকে নিয়মিত করেন। তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের অভিধ্যান দ্বারা, ব্রহ্মযোগ দ্বারা, এবং ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব করিলে মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয় (ভূয়ঃ চ অন্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ) (১।১০)।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি মন্ত্রে মায়াতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋষি এই উপনিষদে সাংখ্য- ও বেদান্ত-মতের সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এই উপনিষদে বলা হইতেছে ব্রহ্ম প্রকৃতির নিয়ন্তা, সুতরাং প্রকৃতি স্বাধীন নহে। এই প্রকৃতির আর-দুইটি নাম—প্রধান এবং মায়া। আমরা যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহা পরমাত্মাই; জীবাত্মা মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন (৪।৯)। ব্রহ্মকে মায়ী এবং জালবান্ বলা হইয়াছে। উর্ণনাভের ন্যায় ব্রহ্ম আপনাকে মায়া দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন (৩।১)। এই আচ্ছাদন ভেদ করিবার উপায় ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মযোগ এবং ব্রহ্মভাব। এই উপায়েই পুনর্ব্বার বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে (১।১০)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—এই উপনিষদে মায়াবাদই সমর্থিত হইয়াছে।

এই উপনিষদের অন্যান্য মত আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে।

এই উপনিষদের মতে ব্রহ্ম অকর্ত্তা (১।৯), তাঁহার কার্য্য নাই (৬।৮), তিনি অক্রতু (সঙ্কল্পরহিত বা কর্ম্মরহিত, ৩।২০); অথচ তিনি স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা (১।১০, ১২; ৩।১, ২, ১৯, ১৭; ৪।১, ৩, ৪, ৯, ১১, ১২; ৫।১, ৩, ৪, ৫, ৭, ১৩, ১৪; ৬।৪, ৮—১৮ ইত্যাদি)। তিনি অজ (২।১৫; ৪।২১) অথচ তিনি উৎপন্ন হয়েন (২।১৬; ৩।১, ৪।৩; ৪।১২)। তিনি নির্গুণ (৬।১১) অথচ গুণান্বিত (৫।৭; ৬।১)। তিনি অরূপ (৩।১০) অথচ তিনি বিশ্বরূপ বা অনেকরূপ (১।৯; ৫।৭, ১৩)।

পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়ই এক এবং উভয়ই অজ (১।৯), অথচ আত্মা সংসারে জন্মগ্রহণ করিতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মাই, অথচ পরমাত্মা ঈশ ও সর্ব্বজ্ঞ এবং জীবাত্মা অনীশ এবং অবিদ্যাগ্রস্ত (৪।৭, ৯)।

এ-সমুদয়ের মীমাংসা কোথায়? উপনিষৎকারই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। মায়াপ্রভাবেই অকর্ত্তাকে কর্ত্তা, অজকে জায়মান, নির্গুণকে গুণান্বিত, ঈশকে অনীশ বলিয়া মনে হইতেছে।

এই উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে যে-প্রকার ভাব ও ভাষার প্রয়োগ আছে, তাহাতেও মনে হয়, ঋষির মনে সংসারে মায়াময়ত্ব-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। একটি স্থলে আছে :—

এই দেবতা এই ক্ষেত্রে এক-একটি জালকে বহুধা বিস্তৃত করিয়া আবার প্রত্যাহার করেন (৫।৪)।

'জাল' এবং 'জাল বিস্তার করা' গভীর অর্থপূর্ণ। শঙ্করানন্দ বলেন—জাল = মহেন্দ্রজাল।

দুই স্থলে (৪।১৪ ; ৫।১৩) এই সংসারকে 'কলিল' বলা হইয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ এই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন—তমঃ, শ্লেষ্মা, অবিদ্যাগহন, ইত্যাদি।

এ-সমুদয় হইতেও মনে হয় মায়াবাদই ঋষির মত।

আর জ্ঞানীর নিকট যে এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহা এই উপনিষদে স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে। এক স্থলে আছে :—

যখন জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন দিবাও নাই, রাত্রিও নাই, সৎও নাই, অসৎও নাই, তখন কেবল শিবস্বরূপই প্রকাশিত থাকেন (৪।১৮)।

এ অদ্বৈতবাদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম অন্তর-বাহ্য-ভেদ-রহিত একরকম ব্রহ্ম। এই অদ্বৈতবাদে 'সৎ' এবং 'অসৎ' কোন কিছুরই স্থান নাই।

অপরাপর আধুনিক উপনিষদেও মায়াতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রাচীন মতেরই প্রতিধ্বনি।

অদ্যকার আলোচনা শেষ হইল। এই আলোচনায় আমরা বুঝিলাম :—

(১) যাজ্ঞবল্ক্যই মায়াবাদের প্রধান প্রচারক। তাঁহার ব্রহ্মবাদের পরিণাম মায়াবাদ এবং তিনি স্পষ্ট ভাবেও বলিয়াছেন যে এই জগৎ ভ্রমাত্মক।

(২) ছান্দোগ্য ও কঠোপনিষদের কোন কোন স্থলে ব্রহ্ম-বিষয়ে এমন কথা বলা হইয়াছিল, যাহার পরিণাম মায়াবাদ।

(৩) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্ট ভাবেই মায়াবাদ গৃহীত হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বিয়ের ফুল

পণপ্রথার হল কর্ষণে, মেয়ের বাপের অশ্রুধারে,
মেয়েরই বাপের মুখের রক্তে, বুকের পাঁজর-চূর্ণ সারে
হয়েছে যে জমি সুজলা সুফলা, ধরণীতে যাহা চির অতুল,
সেই উর্ব্বর জমির উপর ফোটে গো মোদের বিয়ের ফুল!

"বনফুল"।

আলোর আড়াল

(৪)

ওঁর চোখ ক্রমেই ভালোর দিকেই এগোতে লাগ্‌ল। আর-একবার কল্‌কাতায় যাবার সময় এসে পড়্‌ল। মেদিনী-মোহনকে আর বড় এদিকে দেখা যেত না, যখন জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হচ্ছে, তখন তিনি এসে বল্‌লেন, "আমারও এবার যেতে লোভ হচ্চে, অনেককাল কোথাও বেরইনি, কল্‌কাতায় গেলে রীতিমত আমোদ করা যেত।"

আমার স্বামী বল্‌লেন, "চল না, বেশ ত, তুমি থাক্‌লে আমারও সুবিধে।"

ভাই বল্‌লেন, "তবে মিনিট দশ অপেক্ষা কর্‌তে, আমি চট্‌ করে গোটা কয়েক কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিই।"

তাই হল, তাঁর ভাই এমন আমোদ করার সুযোগ ছাড়্‌লেন না। সারা পথ তাঁর আনন্দের চোটে গানের বান ডাক্‌তে লাগ্‌ল। আমরা কল্‌কাতায় পৌঁছলুম।

মানুষে নিজের বুকের ক্ষতকে নিজে খোঁচ মার্‌তে সহজে চায় না। কিন্তু সে দিনটা যদি বাদ দিই, তা হলে এ গল্পের যে একেবারে খেই হারিয়ে যাবে, কিছু যে বোঝা যাবে না। তাই লিখ্‌ছি।

কল্‌কাতায় এসে আবার ডাক্তার দেখানো হল। তিনি খুব আশা দিলেন। নতুন ওষুধ আনা হল, সামান্য একটু অস্ত্রও হল, দুতিন দিন ব্যাণ্ডেজ করা রইল, তারপর খোলা হবে। সকাল থেকে ওঁর ঘরে যাইনি, নর্স্‌ একজন ছিল, সেই সব ওঁর কর্‌ত। অন্য সময় হলে হয়ত নর্সের হাতে ছাড়্‌তে রাজী হতুম না, কিন্তু এখন মনে হয় "অন্য কেন?"

মেদিনীমোহন এসে একবার বল্‌লেন, "বৌদি দাদার ঘরে যাবে না? আমাদের সকলকেই তিনি আগে দেখেছেন, তুমি একেবারে নতুন জিনিষ।"

কোনোদিন ওর কথায় আমি যে ব্যথা পাই তা ওকে আজো জান্‌তে দিইনি। আজ চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়্‌ল, গলা কেঁপে গেল, বল্‌লুম, "ঠাকুরপো, কবে আমি তোমার কি অপকার করেছি জানি না, কিন্তু শত্রুকেও মানুষ এমন যন্ত্রণা দেয় না।"

আমার দেওরের কেমন এক হাস্‌বার ভঙ্গী ছিল, দেখ্‌লেই মনে হত এ নেকড়ে বাঘের হাসি, সেই হাসি হেসে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

নর্স্ এসে বলে গেল, "বাবুর চোখ খোলা হয়েছে, বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছেন। আপনাকে এখুনি যেতে বল্‌লেন।"

আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, বিশ্বভুবনে এমন কি কেউ নেই যে আমায় এখন বাঁচাতে পারে? আমাকে যে নিজে হেঁটে গিয়ে নিজের মৃত্যুশেল বুক পেতে নিতে হবে। শুধু কি তাই? আমি হাস্‌তে হাস্‌তে মর্‌তুম, যদি তাতে আমার স্বামীকে সব আঘাত থেকে আড়াল করা যেত। কিন্তু এ যে এমন আগুন যে কারু নিস্তার নেই।

আবার ডাক এল। চল্‌লুম, উপায় নেই, ফাঁসীর আসামীও ত হেঁটে নিজের বধমঞ্চে ওঠে। ঘরের দরজার কাছে এসে দেখ্‌লুম্ উনি পাশ ফিরে বসে আছেন। আজ আমার পাষাণ দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, কালো চোখে আজ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। আমাকে দেখ্‌বার আগে আমি একবার তাঁকে প্রাণভরে দেখে নিলুম। এই রকম করে যদি চিরজীবন দেখ্‌তে পার্‌তুম্!

কিন্তু উনি তখুনি ফিরে বস্‌লেন। ফির্‌তেই আমার দিকে ওঁর চোখ পড়্‌ল। মাগো, সে কি আমি ওঁর চোখে দেখ্‌লুম্! ইংরিজি গল্পে পড়েছিলুম্ গর্গনের চোখ যার দিকে তাকাত, সেই তখুনি জমে পাথর হয়ে যেত; আমার স্বামীর চোখের দৃষ্টিও যেন আমাকে পাথর করে দিল, হৃৎপিণ্ডটাও একটা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল।

শুন্‌লুম্ নর্সকে উনি ধম্‌কে বল্‌ছেন, "তোমাকে না আমার স্ত্রীকে ডাক্‌তে বলেছিলুম।"

সে একটু রেগেই বল্‌লে, "তাঁকেই ত ডেকেছি, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?"

আমার স্বামী তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে ডাক্‌লেন, "মেদিনী!"

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না, পা থরথর করে কাঁপ্‌ছিল, কোনোরকমে রেলিং ধরে ধরে একতলায় নেমে গেলুম্। রান্নাঘরের পাশে একটা খালি ঘর ছিল, তারি মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম্।

হিন্দুর মেয়ে আমি, চিরকাল শুনে আস্‌ছি, আত্মঘাতীর অনন্ত নরক ভোগ কর্‌তে হয়। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল নরকের আগুনও আমার এ জ্বালার কাছে হার মেনে যাবে। হয়ত হাতের কাছে কিছু পেলে আমার অমন মহাপাপ কর্‌তেও আট্‌কাত না। কিন্তু সে ঘরটা একেবারে খালি, কেউ কখনো তাতে বাস করেনি, কাজেই তাতে কিছুই ছিল না। মেঝেটা স্যাঁৎসেতে, কাদায় চট্‌চট্ কর্‌ছে। তারি উপরেই গড়িয়ে পড়্‌লুম। এখন ভাল করে মনে পড়ে না সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সেদিন আমি কেমন করে কাটিয়েছিলুম্; বিকারের রোগীর স্মৃতিপটের মাঝখানটা যেমন ঝাপ্‌সা, কুয়াসায় ঢাকা হয়ে যায়, আমারও যেন তাই হয়েছে। সেই যে মানুষটা অসহ্য যন্ত্রণায় আঁধার ঘরে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সে যে বাস্তবিক আমি নয়, তাই হয়ত তার কথা আমার মনে পড়ে না।

দরজায় অনেকবার ঠেলা পড়্‌ল, আমি সাড়াও দিলুম না। সন্ধ্যার সময় হটাৎ মহাশব্দে জীর্ণ দরজাটার হুড়্‌কো মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে হুড়মুড় [redacted] পাঁচ-ছজন লোক এসে পড়্‌ল। তাদের সবার আগে আমার দেওর মেদিনীমোহন।

আমাকে শুলজ্যান্ত বসে থাক্‌তে দেখে সবাই বোধ হয় বেশ অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সর্‌কার আর চাকর দুজন অত্যন্ত হতভম্ব মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমার দেওর খুব যেন রেগে বল্‌লেন, "আচ্ছা মানুষ যাহোক, তোমার লজ্জা করে না? সারাদিন দরজা ঠেলাঠেলি কর্‌ছি, তা সাড়াই নেই। আমি ত ভেবেছিলুম এতক্ষণে কেরসিন-নায়িকাদের দলবৃদ্ধি করে বসে আছ, কাজেই ঘটা করে দরজা ভেঙে ঢুক্‌তে হল।"

আমি একটা কথারও উত্তর দিলুম না। আমার দেওর আবার বল্‌লেন, "এখন ওঠ, উঠে স্নানাহার কর। কিছু তোমার ভাবনা নেই, জমিদার-বাড়ীতে কুৎসিত বৌ ঢের আসে, তাই বলে তাদের কেউ তাড়িয়ে দেয় না, খেতে-পর্‌তে সবাই দেয়।" খাওয়া-পরার ভাবনায় যেন তখন আমার ঘুম হচ্ছিল না।

স্বামীর কথা আমিও কিছু বল্‌লুম্ না, দেওরও কিছু বল্‌লেন না। তিনি ঘর ছেড়ে বেরতেই আমিও বেরিয়ে

এলুম্। চাকর-বাকরে ঘর ভর্ত্তি, তাদের সাম্নে আর কি কর্‌ব? জমিদারের মান বাঁচিয়ে চল্‌বার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লুম্। সেই সকালের পর স্বামী আর আমায় একবারও ডাকেননি, অন্তত আমি শুনিনি।

রাত যখন ঘনিয়ে এল, তখন আস্তে আস্তে দোতলায় উঠ্‌লুম্। তখনো পরণে চাকাই শাড়ী, গায়ে সোনার গয়না। সব খুলে রাখ্‌লুম্; বাপের বাড়ীর থেকে আস্‌বার সময় যা কাপড়-চোপড় এনেছিলুম, তারি দুএকটা কল-কাতায়ও এসে পড়েছিল। তাই পরে, আঁচল থেকে চাবি খুলে ড্রেসিং-টেব্‌লের উপর রেখে, স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলুম্।

কোথায় যাব, কি কর্‌ব কিছু জানতুম্ না, কেবল মনে এই জাগ্‌ছিল যে স্বামীর চোখের অমন দৃষ্টি আর দ্বিতীয়বার দেখ্‌ব না। আর সব আমার সইবে।

কি করে তারপর কি হল, সব লিখ্‌তে গেলে সে যে সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে যায়। গঙ্গার ঘাটে রাতদুপুরে বসে সারারাত ভেবেছিলুম আর-দুসিঁড়ি নাম্‌লেই ত সব ভাব্‌না চুকে যায়। কিন্তু সেই দুসিঁড়ি আর নামা হল না। কি যে একটা অভিমান নিয়েই জন্মেছিলুম্, কেউ আমায় দেখ্‌তে পারে না, আমি মর্‌লে কারু কিছু এসে যায় না, তাই আমি জোর করেই বেঁচে থাক্‌ব। আমার গুণের ঠাকুরপো, তুমি আমায় কেরসিনের নায়িকারূপে দেখ্‌বার আশায় নেকড়ের মত দাঁত বার করে যতই হাস, আমি মর্‌ব না গো মর্‌ব না। হয়ত বা তোমার অমন সুন্দর মুখ চিতার আগুনে ছাই হয়ে যাবার পরও আমি নিজের কুরূপ নিয়ে অমর হয়ে থাক্‌ব। আর তুমি, যাকে আমার সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়েছিলুম, আমার পাষাণের ঠাকুর, তোমার আনন্দ হবে বলে যে নিজেকে সারাক্ষণ ধূপের মত পুড়িয়েছি, তোমার কথা আর ভাব্‌ব না, তাহলে আমার রাগ অভিমান কিছুই যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। যতক্ষণ সুগন্ধ ছিল, তোমার সেবায় লেগেছি, এখন পোড়াছাইকে তুমিও ভুলেছ, সেও ভুলুক।

ঘাট থেকে আমায় এক ধার্ম্মিক পুরুষ উঠিয়ে নিয়ে যান। তাঁকে এ জন্মে ভুল্‌ব না। কুৎসিত দেহকে দেখে সবাই অবজ্ঞা করেছে, কিন্তু ইনি ভিতরের ব্যথাকাতর প্রাণটাকে আমার দেখেছিলেন, তাই ত তাঁর আশ্রয় পেয়ে অমন নিশ্চিন্ত মনে নিলুম। তিনি বুঝেছিলেন আমার দশা, না বল্‌তেই বুঝেছিলেন, আমার কাহিনী বুঝি আমার মুখের উপর ছবির মত ফুটে উঠেছিল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বল্‌লেন, "মা, ঈশ্বরের দেওয়া প্রাণ মানুষের উপর রাগ করে নষ্ট কোরো না। তুমি আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে আনন্দের পথ দেখিয়ে দেব।" কিছু দ্বিধা না করে পরিপূর্ণ নির্ভরের সঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে এসে উঠ্‌লুম।

তাঁর স্ত্রী আমাকে আদর করে নিলেন। বাড়ীতে কেবল স্বামী স্ত্রী দুটি মানুষ, ছেলেপিলে কিছু নেই। আমার ভালই হয়েছিল, নীরবতার মধ্যে ডুবে থেকে নিজের মনের ক্ষতকে সারিয়ে তুল্‌বার সময় পেয়েছিলুম্।

এঁরা কেউ একটিবারও আমাকে আমার জীবনের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেননি। মানুষকে আশ্রয় দেওয়া এমন লোকেরই সাজে। আর যারা দেওয়ার ছলে নিজেদের কৌতূহলের খোঁচা দিয়ে ক্রমাগতই আহতের ক্ষত বাড়িয়ে তোলে, বিধাতাকে নমস্কার করি যে তেমন কোনো সুহৃদের হাতে তিনি আমায় ফেলেননি। বাড়ীর গিন্নির কাজে ইচ্ছে করে সাহায্য কর্‌তুম, তিনি হাসিমুখে সে সাহায্য নিতেন, আদরের ছলে গোলমাল করে নিবারণ কর্‌তে গিয়ে একদিনও আমাকে লজ্জা দেননি। আমি যে কেমন মানুষ, কোথা থেকে এসেছি, কিছুই তাঁরা জান্‌তেন না, অথচ কি বিশ্বাস করেই তাঁরা আমাকে রেখেছিলেন, কোথাও আমার বাধা ছিল না।

আমি বেশ প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠ্‌বার পর, বাড়ীর কর্ত্তা আমায় বল্‌লেন, "তুমি যদি কাজ কর্‌তে চাও ত জুটিয়ে দিতে পারি। তুমি লেখাপড়া জান যখন, তখন মেয়েদের স্কুলে তোমার ভাল কাজই হবে।"

লেখাপড়া শিখেছিলুম যখন তখন একদিনও কি ভেবেছিলুম যে তারি উপর আমাকে নির্ভর কর্‌তে হবে? থাক, ও আমার তোলা থাক, স্বামীর দেওয়া অলঙ্কার, ও বেচে আর খাব না। আর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে আসিনি, এইটেই আমি বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখি।

বল্‌লুম, "পড়ানোর কাজ নেবার আমার ইচ্ছে নেই।

আমি অন্ধদের সেবাশুশ্রূষার কাজ খুব ভাল জানি, অন্ধদের কোনো আশ্রমে আমায় যেমন হয় একটি কাজ আপনি জুটিয়ে দিন।"

তাই হল। এক অন্ধ-আশ্রমে শুশ্রূষাকারিণী হয়ে এলুম্। এখানে চোখে দেখার বালাই নেই, নিজের কুরূপকে নিজে বেশ ভুলে রইলুম।

আশ্রমটি সহরের বাইরে, অনেকখানি খোলা জমির মধ্যে। মনে হত আবার যেন আমার পল্লীমায়ের কোলে ফিরে এসেছি, সেই-রকম গাছপালা, তেম্‌নি পুকুর, তেম্‌নি পাখীর ডাক। কাছের গাঁয়ের বৌরা তেম্‌নি বিকেলবেলা গাছের ছায়ায় ছায়ায় কলসী নিয়ে জল আন্‌তে আসে, তেম্‌নি তাদের গল্পের সুর কানে এসে পৌঁছয়। ছাদের উপর উঠে তাকালে তেম্‌নি দেখা যায় ধানের ক্ষেত, আমবাগান, মেঠো রাস্তার উপর দিয়ে গরুরগাড়ীর নিশ্চিন্ত মন্থর গমন। মনে হত আমি যেন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠ্‌লুম্ আবার আমার বালিকাজীবনের মধ্যে। শ্বশুরবাড়ী, স্বামী, সেখানকার সুখদুঃখনিবিড় দিন, সবই যেন স্বপ্নপরীর সঙ্গে শূন্যে মিশে গেছে। কিন্তু স্বপ্ন কি বুকের মধ্যে এমন গভীর দাগ কখনো রেখে যায়? তবু ভুলে থাক্‌তেই চাইতুম্।

আশ্রমের অধিবাসী অনেকগুলিই ছোট ছেলে মেয়ে, তারা আমার খালি বুককে আস্তে আস্তে ভরে তুল্‌ছিল। গত জীবনের সব মুছে ফেল্‌তে চাইতুম্, কোনোদিন একটা খবরের কাগজের দিকেও তাকাইনি, পাছে চেনা নাম আবার চোখে পড়ে চোখ ঝাপ্‌সা করে দেয়। তাই এদের নিয়ে সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত করে রাখ্‌তুম, যাতে ভাব্‌বারও সময় না পাই।

কতদিন এম্‌নি করে কেটে গেল। বুকের ক্ষত শুকিয়ে গেল, জ্বালা জুড়িয়ে গেল। এমন কি মেদিনীমোহনকেও দেখ্‌লে হয়ত হাসিমুখে কাছে ডাক্‌তে পারতুম্।

এমন সময় একদিন আশ্রমের যিনি কর্ত্রী, তিনি আমায় ডেকে বল্‌লেন, "দোতলার বড় ঘরটা খালি করে দিতে হবে। নতুন একজন রুগী আস্‌ছে, তার ভারও রইল তোমার উপরে, দেখ যেন যত্নটত্ন হয়। তারা বড়লোক, অনেক টাকা দেবে, একটু বেশী সুবিধাতে রাখ্‌তে চায়।"

সব ঠিক করলুম্। নতুন মানুষ এসে পৌঁছলেন্। গাড়ী থেকে যখন তাঁকে নামানো হচ্ছে তখন তাকিয়ে দেখ্‌লুম। এ যে আমার সেই চিরনূতন, চিরপুরাতন। তাঁর ফিরে-পাওয়া আলো আবার নিভে গেল?

কর্ত্রী আমায় তাড়া দিয়ে বল্‌লেন্, "হাঁ করে দেখ্‌ছ কি? ঘরে নিয়ে যাও, বন্দোবস্ত সব করে দাও।"

যেন মূর্চ্ছা থেকে জেগে উঠ্‌লুম। নীরবে পথ দেখিয়ে তাঁর সঙ্গের লোককে নির্দ্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেলুম। ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে সে বিদায় নিল। এ লোক নতুন, একে আমি কখনো দেখিনি। তবু অন্য একজন পরিচারিকাকে দিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করালুম, "কতদিন হল এঁর এ-রকম হয়েছে?" সে বল্‌লে, "অনেক দিন। মাঝে একবার ভাল হয়েছিল, পরে ভুল ওষুধ চোখে দিয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।"

ইচ্ছা করছিল নিজের গলা টিপে নিজেকে মেরে ফেলি। কেন ফেলে এসেছিলুম, রাক্ষসের হাতে অসহায় করে? ঘৃণার দৃষ্টি সইতে পারিনি, তাই অমন চোখের দৃষ্টি চির-দিনের মত গেল। কিন্তু না, আর ফেলে যাব না, প্রায়শ্চিত্ত যতটুকু পারি করে যাব।

সন্ধ্যার সময় ওঁর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লুম। ওঁকে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার হাতখানা নিজের দুই হাতে চেপে ধরে উনি ডাক্‌লেন, "মলিন!"

আমার হাত থেকে পেয়ালাটা ঠন্ করে পড়ে গেল, ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে, চোখের জল সাম্‌লে কোনো রকমে বল্‌লুম, "কি করে চিন্‌লে?"

উনি বল্‌লেন, "এক-বছর যেমন করে চিন্‌তুম, তোমার পায়ের শব্দও যে আমার চেনা, তুমি আমার হাতে খাবার দিচ্ছ, এত কাছে, তবু চিন্‌ব না? আমি চোখের দেখায় তোমায় চিনিনি, কিন্তু অন্ধের দৃষ্টিতে কখনো তোমায় ভুল কর্‌ব না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। তারপর বল্‌লুম, "আমাকে ক্ষমা করেছ?"

উনি হাস্‌লেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন, "করেছি। বেশ করেছিলে চলে এসেছিলে, তোমায় হারিয়ে তবে তোমার আসল মূল্য বুঝ্‌তে পার্‌লুম্। তুমি যে আমার চোখের দৃষ্টির চেয়ে বেশী ছিলে! দৃষ্টি আমাকে ত কোনো

সান্ত্বনা দিল না। দরকার নেই, আঁধারে আমাদের মিলন হয়েছিল, আলো আমাদের সইবে না। তুমিই থাক, আঁধারের মধ্যে চিরকাল আমার কাছে অক্ষয়সৌন্দর্য্যের প্রতিমা হয়ে; তোমাকে যে দৃষ্টি অপমান করেছিল সে আর ফিরবে না।"

এইখানেই থেকে গেলুম। কিন্তু ওগো, চিরকাল আমার ফুলের সঙ্গে কাঁটা গাঁথা রইল। তিনি আমার জন্যে চোখ দিলেন, আর আমি তাঁর সেই ব্যথার মধ্যে আমার হারা আনন্দকে ফিরে পেলুম। এ যে সাপের মাথার মণি। হিয়ে গা জ্বলে গেল, কিন্তু মণির আলোয় সে দুঃখকেও যে না ভুল পারলুম না।

শ্রীসীতা দেবী।

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম

আকাঙ্ক্ষারে ছোট করি' নিশিদিন যারা
সামর্থ্যেরে করে নত— ক্ষুদ্র হয়ে তারা
রহিল পশ্চাতে পড়ি; হৃদয়-বীণায়
বিচিত্র সঙ্গীত তার বাজে হায় হায়
কত সুরে নিশিদিন; জীবনের ঋণ
পলে পলে বাড়ে তার নির্ম্মম কঠিন।
আর যারা বাসনারে করিল না ভয়,
কঠোর দুঃখের মাঝে তবু গাহে জয়
দৃপ্ত উচ্চ কণ্ঠে তারা—মৃত্যুর আঘাত
হাসি মুখে বরি' নিয়া পুনঃ অকস্মাৎ
দ্বিগুণ উৎসাহে উঠে শির উচ্চে তুলি
নাহি ভাবে মুহূর্ত্তেকে দীনতার বুলি—
বাসনা সামর্থ্য দুয়ে কঠিন সংগ্রাম
কে করিবে অধিকার মানুষের প্রাণ?

(২)

লক্ষ কোটী বাসনারে নাহি করি' ভয়
সামর্থ্যেরে যদি তারা করে পরাজয়
লাজ যেন পাই প্রভু; মানুষের প্রাণ
আকাঙ্ক্ষার মাঝ দিয়া করে অভিযান
আত্মশক্তি উদ্বোধিতে; রহে যারা পড়ি,
সকল উদ্যম ছাড়ি আরামেরে বরি,
অমৃতের নামে যারা প্রাণপণ বলে
আপনাকে নাহি দেয় মৃত্যুর কবলে
পল তরে নাহি করি' বিদ্রোহ ঘোষণা,
সত্য তার হবে কহ কোন্ আরাধন?
মৃত্যুর পরশে তার খিন্ন হয়ে ওঠে
যত কিছু আয়োজন; কণ্ঠে নাহি ফোটে
জীবনের গৌরবের আনন্দের গান
ঊর্দ্ধ অধে শুধু তার চির অকল্যাণ।

(৩)

মৃত্যুরে করিয়া বড় যাহাদের আঁখি
দেখিল এ জগতেরে, অকল্যাণে ঢাকি
গেল তার জীবনের এপার ওপার;
আর যারা ভরি' ছিল জগৎ সংসার
জীবনেরে করি বড়, মরণেও তারা
মঙ্গল-পরশ পেল; জীবনের যারা
ত্রাসহীন পাশহীন ছুটায়ে দুর্ব্বার
ওই তারা চলে পথে, আনন্দ-ঝঙ্কার
বাজি ওঠে তাহাদের প্রতি পায় পায়
আকাশের বক্ষ তারা কাড়িবারে চায়।
কণ্ঠে কণ্ঠে আজি হোক্ বিদ্রোহ ঘোষণা
পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদে—মৃত্যু-আরাধন
নাহি চাই, নাহি চাই হে জীবন-স্বামী,
সহজ সত্যেরে মোর কর ঊর্দ্ধগামী।

(৪)

আমার আমিত্ব সে যে তোমার আদেশ,
তার মাঝে যদি থাকে কোন শঙ্কাক্লেশ
লাজে যেন মরি প্রভু! উচ্চে তোলা শির
যদি কভু হয় নত, যদি অশ্রুনীর
ফোটে চোখে দীনতার, যদি বাহু দুটি
ক্ষুদ্রতার আরামেতে রহে সদা লুটি
ধূলিপরে অসহায়, যদি স্কন্ধে তুলি'
বহি নিত্য অপমান-ভরা ভিক্ষা-ঝুলি,
অবজ্ঞায় যদি কেহ যায় পদে দলি,
অপমানে যদি বক্ষ নাহি ওঠে টলি—
তোমার আসন তবে দগ্ধ হবে আজি
মর্ম্মতলে; আশীর্ব্বাদ আনন্দের বাণী
স্তব্ধ হবে চিরতরে জীবন-বীণার,
বিড়ম্বনা হবে মোর এপার ওপার।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসক

ভারতীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চৌরী মুখু এখন বিলাত-প্রবাসী হইয়া গিয়াছেন। যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করার দক্ষতায় তিনি বিলাতে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সুদক্ষ চিকিৎসায় বিলাতের অনেক যক্ষ্মারোগী সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিলাতের সমার্‌সেট্‌শায়ার প্রদেশে ওয়েল্‌স্‌ নগরে তিনি তাঁর চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। ওয়েল্‌স্‌ নগর লণ্ডন হইতে প্রায় চার ঘণ্টার পথ। একটি সুন্দর প্রশস্ত উপত্যকার উপর ইহা দাঁড়াইয়া আছে,—চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়। লণ্ডন হইতে যে প্রধান রেলপথ আছে, তাহা দিয়াই এখানে আসা যায়। রেলপথটি বড় বড় বীচ-গাছের একটি বনের পাশ দিয়া, ঝাউ (পাইন)ও অন্যান্য শ্যামল গাছের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এমনি মনোরম মুক্ত ও নির্জ্জন জায়গায় ডাক্তার মুখুর চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসাগারটির অবস্থানই রোগীদের পক্ষে আনন্দদায়ক।

কোন রোগী এখানে আসিয়া পৌঁছিলেই তাকে প্রথমে অভ্যর্থনা-ঘরে লইয়া যাওয়া হয় এবং একজন প্রধান সেবিকা তাকে চা খাইতে দিয়া যায়। তারপর সেখানকার ম্যানেজারের সহিত তাকে দেখা করিতে হয়। এবং পরে সেখানকার প্রধান চিকিৎসক চৌরী মুখুর কাছে তাকে লইয়া যাওয়া হয়; তিনি রোগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া রোগীর থাকিবার ঘর বা শয্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

রোগীদের থাকিবার ঘরগুলি আধুনিকভাবে তৈরী। প্রত্যেক ঘরের পিছনে ও সাম্‌নে একটি করিয়া বারাণ্ডা, দরজা দক্ষিণ দিকে। দরজার সাম্‌নে যতদূর চোখ যায় বরাবর দেবদারু-গাছের সারি। ঘরের ভিতর একটি খাট, মুখ ধুইবার পাত্র ও খাবার রাখিবার জন্য টানা-দেওয়া একটি ছোট টেবিল, একটি বই-রাখিবার জায়গা ও একখানি চেয়ার। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো এবং ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা আছে এবং গরম জলের বাষ্পযন্ত্রে ঘরগুলি গরম। ঘরের দেয়ালে রোগীদের পরিচর্য্যার নানা বিধি-ব্যবস্থার তালিকা, দৈনিক খাদ্য-তালিকা এবং শরীরের উত্তাপতালিকা ঝোলানো থাকে।

ডাক্তার মুখু স্বয়ং এই ঘরগুলির পরিকল্পনা করেন। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী ও দরজা জানালা এমনভাবে বসানো, যে, ঘরের কোন অংশে বদ্ধ বায়ু দাঁড়াইতে পারে না, সব জায়গাতেই মুক্ত হাওয়া যাওয়া-আসা করিতেছে।

চিকিৎসাগারে ভর্ত্তি হওয়ার প্রথম সপ্তাহটা রোগীদের বিশ্রাম করিতে হয়। রোজ বিকালে তার দেহের উত্তাপ যদি বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে তার বিশ্রামের কাল আরো বাড়াইয়া দেওয়া হয়। রোগী একটু স্থির হইলে তার দৈহিক ব্যায়াম করা আরম্ভ হয়। একটু একটু করিয়া রোগীকে বেড়াইতে হয়,—প্রথমে পাঁচ মিনিট, পরে দশ মিনিট, এবং ক্রমে ক্রমে এক ঘণ্টা। সকালে বেড়াইতে হয় সওয়া এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা। শরীরের উত্তাপ ও ফুস্‌ফুসের ভাল মন্দ অবস্থার অনুপাতে রোগীর ভ্রমণ বাড়ানো ও কমানো হয়।

ঝড়জলের দিনে বা যেদিন বরফ পড়ে সেদিনে রোগীদের ব্যায়াম করিবার জন্য ঝাউগাছের বাগানে পাঠানো হয়, সেখানে খানিকটা জায়গা ঝড়বৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তার তলায় রোগীরা ব্যায়াম করে। চিকিৎসাগারের এই ব্যবস্থাটি উল্লেখযোগ্য। জায়গাটিতে কোন ব্যস্ততা, কোন গোলমাল নাই, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। গাছের মধ্য দিয়া যে বায়ুর হিল্লোল ছুটিয়া আসে, তাতে রোগীদের শিরা-উপশিরায় পরিতৃপ্তি আনিয়া দেয়, চারিদিককার উন্মুক্ত প্রকৃতি ও ঝাউগাছের সুগন্ধ রোগীর ক্লিষ্ট বক্ষে শীতল হস্ত বুলাইয়া দিয়া যায়।

রোগী একটু একটু করিয়া আরোগ্য হইতে থাকিলে ভ্রমণ ছাড়া তাকে জোরে জোরে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করিতে ও গান গাহিতে শিখিতে হয়, কাঠ কাটিতে হয়, কাঠ চিরিতে হয়, র‍্যাঁদা দিয়া কাঠ পরিষ্কার করিতে হয়, বাগানে গাছপালার পরিচর্য্যা করিতে হয়, এবং এইরূপ অন্যান্য বিবিধ অল্পপরিশ্রমের কাজ করিতে হয়। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী কাজ গুরু ও লঘু হয়। এ-সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য—রোগীর শরীরে বলসঞ্চয় করা, ফুস্‌ফুস্‌ বিস্তৃত করানো এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি করা। এইরূপে

রোগীর পুষ্টি সাধিত হয় ও ফুস্‌ফুস্ ক্রমে ক্রমে রোগমুক্ত হইতে থাকে।

এই-সব ব্যায়ামের মাঝে মাঝে বিশ্রামের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।—তার মধ্যে প্রধান—দুপুরের আহারের আগে ও রাত্রের আহারের আগে বিশ্রাম। রোগীদের খাদ্যের উপর ডাক্তারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তাঁর মতে রোগীদের তিনবার খাবার দেওয়া উচিত, তার বেশী অন্তর। রোগীদের বেশী খাওয়ানোর তিনি পক্ষপাতী নন। জার্ম্মানীতে রোগীকে অতিরিক্ত পুষ্টি দিবার যে ব্যবস্থা আছে, ডাক্তার মুখুর মতে তাহা অকর্ত্তব্য। কেননা, ইহাতে ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব, পেটের বিশৃঙ্খলা বা অপর কিছু অহিত ঘটিতে পারে। রোগীরা যাতে টাট্‌কা তাজা খাবার পায়, ডাক্তার মুখুর সেদিকেও তীব্র দৃষ্টি। রোগীরা তাজা মাংস, সেখানকার বাগান হইতে আহৃত তাজা তরকারী, ও টাট্‌কা দুধ খাইতে পায়। বাসি দুধ, ফোটানো দুধ বা ডাক্তারী প্রণালীতে তৈরী দুধ, বা বাসি খাবার, টিনে-করা খাবার, জমানো বা মিশ্রিত খাবার—তাঁর মতে যক্ষ্মারোগীদের দেওয়া উচিত নয়। এ-সব খাদ্যে যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধিই হইতে থাকে এবং রোগীর শরীর-পুষ্টির জন্য যে-সব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তার ব্যাঘাত ঘটে।

চিকিৎসাগারে বেলা ৯টা, ১॥ টা ও সন্ধ্যা ৭ টায় তিনবার রোগীদের খাবার দেওয়া হয়। রোগীরা একে একে ঠিক সময়ে খাইবার দালানে হাজির হইতে থাকে। ডাক্তার মুখু এমনি শৃঙ্খলাপ্রিয়, যে, কোন রোগীর আসিতে এক মিনিট দেরী হইলে তাকে জরিমানা-স্বরূপ দাতব্য-ভাণ্ডারে এক পেনি (এক আনি) জমা দিতে হয়।

ডাক্তারের প্রতিষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিয়া এবার স্বয়ং চৌরী মুখুর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। চৌরী মুখুই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা, এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। সকল দিকেই তাঁর সযত্ন দৃষ্টি। তাঁর সহকর্ম্মী আছেন—একজন অধ্যক্ষ, একজন প্রধান সেবিকা এবং কতকগুলি শুশ্রূষা-কারিণী। তবে ডাক্তার মুখু স্বয়ং সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁর চরিত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চরিত্রের সমস্ত ভালো গুণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

৫৫ বৎসর পূর্ব্বে মদ্রাজ প্রদেশে ডাক্তার মুখুর জন্ম হয়। তাঁর পিতা মাতা উভয়েই খৃষ্টিয়ান ছিলেন। মুখু বিলাতে আসিয়া কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখানে উপাধি গ্রহণ করিয়া লণ্ডনসহরের প্রান্তদেশে কিছুদিন চিকিৎসা-কার্য্য করেন। তারপর ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তারীর উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় চিকিৎসারীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতীয় চিকিৎসা-রীতির তিনি যতই আলোচনা করেন ততই তিনি দেখিয়া বিস্মিত হন যে ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মানুষের প্রকৃতির গুপ্ততম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁরা বিবিধ রোগের হেতু অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া রোগ নিবারণের এমন কতকগুলি বিশদ প্রণালী আবিষ্কার করেন যাহা আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা অবধি যুক্তিযুক্ত ও বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

সভ্যতার প্রভাবে যে-সমস্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, ডাক্তার মুখুর মতে, যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ তাদের মধ্যে একটি। দুই রকমে ইহার উৎপত্তি;—প্রথম, সভ্যতার নানা ব্যতিব্যস্ততায় মানুষকে অধিক খাটিতে হয় ও অধিক জাগরণ করিতে হয়; তা ছাড়া অতিশয় উত্তপ্ত ঘরে কাজ করা, অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের উত্তেজনা, অতিরিক্ত কাজের জন্য ক্লান্তি এবং নানা স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া যাওয়া প্রভৃতিতে মনের প্রকৃতিগত স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, কাজের খাতিরে সহরের মধ্যে বোঝাই-করা গাড়ীর মত অনেক মানুষকে একত্র বাস করিতে হয়, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা নীচের তলায় ও আবর্জ্জনাময় বস্তিতে জীবন কাটায়, সেখানে মুক্ত হাওয়া বা আলোকের দেখা পাওয়া ভার, তার উপর এই-সব লোকে যা খাদ্য খাইতে পায় তাতে শরীর পুষ্টির কোনই সাহায্য হয় না। বিশেষতঃ গরীবেরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে, পুষ্টিকর খাদ্য পায় না ও আর্থিক দুরবস্থায় জীবনযাপন করে। সভ্যতার এইসব অনিবার্য্য কারণে মানুষের প্রকৃতির সহজ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, দূষিত খাদ্যের

বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মা রোগ হওয়ার মূলে এইসব কারণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান।

ক্ষয়রোগের বীজ বাহির হইতে আসিয়া কিরূপে এই রোগ বৃদ্ধি করে সে-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অনেক মতামত। রোগের জীবাণুতত্ত্ববিদ ক্ষয়কাশের বীজ আছে এ-কথা স্বীকার করেন। ডাক্তার মুথু বলেন অনেক স্থলে ক্ষয়কাশ ফুস্‌ফুসে জন্মায় এবং ডাক্তাররা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও কোন বীজ দেখিতে পাইবেন না। ডাক্তাররা নাকি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিতেছেন যে যক্ষ্মারোগের জীবাণুর পাশেই দেখা যায় ভুক্ত দ্রব্যের বিকৃত পরিপুষ্টি, তারপরেই মানসিক বিকৃতি। অপর কথায় এই দাঁড়ায় যে যাকে যক্ষ্মা আক্রমণ করে তার শরীর রোগ গ্রহণের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই অনুকূল হইয়া থাকে। লোকের ভিতরটা সুস্থ ও সবল থাকিলে প্রবলতম জীবাণুও আক্রমণে সফল হয় না। অভিজ্ঞতা হইতে মুথু এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে এই রোগ অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর জন্য যত শীঘ্র উৎপন্ন হয়, জীবাণুর আক্রমণে তত হয় না।

বিলাতের ল্যান্‌সেট নামের একটি পত্রিকায় ডাক্তার মুথু সম্প্রতি লেখেন যে যক্ষ্মার জীবাণু ব্যতীতও যক্ষ্মারোগী পাওয়া গিয়াছে, যেমন জীবাণু ছাড়াও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার রোগী পাওয়া যায়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাঁর চিকিৎসাগারে যে-সব রোগী আসিয়াছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের ফুস্‌ফুসে জীবাণু দেখা যায় না। আবার এমন লোকও তিনি দেখিয়াছেন যাদের শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জীবাণু দেখা গিয়াছে অথচ যাদের মধ্যে যক্ষ্মার অন্য কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। আবার পেটি ও মেণ্ডেনহল নামে দু'জন ডাক্তার হেন্‌রি ফিপ্‌স্ ইন্‌স্টিটিউটে দুজন টাইফয়েড রোগীর রক্তে যক্ষ্মার বীজ দেখিতে পান।

আমার সহিত এ-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাক্তার মুথু বলেন যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থাটি জীবাণুর বাসা বাঁধিবার অবস্থা। সে সময় রোগীর দেহের উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি বা ৯৯·৬ ডিগ্রির উপরে উঠে না। ফুস্‌ফুসের এক দিক বা দুই দিক অল্প একটু জায়গায় রোগাক্রান্ত হয়। তখন রোগীর ক্ষুধা বেশ থাকে, ঘুমও বেশ হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কাশি হয়। মুথুর মতে রোগীর এই অবস্থার তিনটি ভাগ করা যাইতে পারে :—

প্রথম, রোগী একটু খিটখিটে হয়, অনিদ্রায় ভোগে এবং দুর্ব্বল বোধ করে। স্ত্রী-রোগীরা এ-সময়ে রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা রোগীর শরীরে বিশেষ কিছু দেখা যায় না, কেবল শিরার অবস্থা বিকৃত বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—এ সময়ে বিকালে দেহের উত্তাপ বাড়িতে থাকে, রোগী উত্তেজনা বোধ করে ও অন্যান্য লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে থাকে।

তৃতীয়—এ-সময়ে দেহের উত্তাপ বিকালে ১০০ ডিগ্রি উঠিতে থাকে, কাশি বাড়ে ও পরীক্ষায় দেখা যায় যে ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত। এই অবস্থার শেষ ভাগে ও দ্বিতীয় অবস্থার প্রথম ভাগে রোগীর লক্ষণ সমান থাকে। ইহার পর জীবাণু দেখা যায়। ডাক্তার মুথু তৃতীয় ভাগকে ফুস্‌ফুসের শোষের অবস্থা বলেন। টাইফয়েড রোগীর মত দেহের উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রি হইতে ১০২ ডিগ্রির মধ্যে বাড়ে।

কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডাক্তার মুথু এই রোগের আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং এ-সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুবই মূল্যবান্। তাঁর মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলি এই :—

প্রথম—প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য, ছেলেবেলায় মার দুধ খাইতে না-পাওয়া বা কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট হওয়া, শৈশবে বা যৌবনে বা জীবনের অন্য অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা খাদ্য পরিপাক করিবার অক্ষমতা—এই সমস্ত যক্ষ্মা-রোগের মূল কারণ। এ-সমস্ত ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে। সেগুলি—অস্বাস্থ্যকর স্থান, যেমন বস্তি বা আলো-বায়ু-হীন নীচের তলায় বাস, নেশা করার অভ্যাস, অতিরিক্ত আমোদপ্রমোদের উত্তেজনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়—যে রোগীর দৌর্ব্বল্য যত বেশী তার উপর যক্ষ্মার আক্রমণ তত প্রবল।

তৃতীয়—রোগীর শরীরের আভ্যন্তর যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া রোগ প্রহণক্ষম না হইলে জীবাণুতে রোগ সৃষ্টি করিতে পারে না।

চতুর্থ—জীবাণু অপেক্ষা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক নানা অবস্থার প্রভাবে এই রোগ জন্মে।

ডাক্তার চৌরি মুখু;
মেণ্ডিপ হিল্‌স্ স্বাস্থ্যাগারের ইনি প্রধান পরিচালক।

পঞ্চম—যক্ষ্মা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যাতে না বিশেষ অবনতি ঘটে তার দিকে দৃষ্টি রাখা খুব প্রয়োজন। কেন না, এই-সকল অবস্থার অবনতিতে আভ্যন্তরীণ অবস্থা দুর্ব্বল হয় এবং জীবাণুও আক্রমণের সুযোগ পায়।

যক্ষ্মার চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার মুখু কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দেশ করেন :—

প্রথম—রোগের প্রথম আক্রমণেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়—প্রচুরভাবে মুক্ত হাওয়া গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুস্ বিস্তৃত করা উচিত।

তৃতীয়—সম্পূর্ণ নির্জ্জন জায়গায় থাকা উচিত।

চতুর্থ—যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত, কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়।

পঞ্চম—অতিরিক্ত উত্তেজনায় মত্ত হওয়া বা অতিরিক্ত শ্রম করা উচিত নয়।

এক কথায় বলিতে গেলে মন্দ গৃহে বাস, উত্তেজনা এবং ক্লান্তির জন্য প্রকৃতির উপর যে অত্যাচার করা হয় সেই অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রোগীকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই ডাক্তার মুখুর মত। রোগীকে নানা ঔষধের বশীভূত করিতে তিনি চাহেন না; অত্যন্ত প্রয়োজন হইলে দুই-একবার ঔষধ ব্যবহার করেন মাত্র। তিনি রোগীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকৃতির পক্ষে এরূপভাবে অনুকূল করিয়া গড়িতে চান যাহাতে প্রকৃতি স্বয়ং সহজেই রোগীর গ্লানি দূর করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য ঔষধের বদলে তিনি রোগীকে মুক্ত হওয়ায় থাকিতে, মন ও শরীর সুস্থ রাখিবার মত কাজ করিতে এবং ব্যায়াম করিতে, মাঝে মাঝে শোধক গ্যাস গ্রহণ করিতে এবং নাক ও মুখ ঢাকা দিবার মত একটি ছোট মুখোস ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ করেন। রোগীর কাছে ডাক্তারের ব্যবহার দৃঢ় হওয়া

ডাক্তার মুখুর স্বাস্থ্যাগারে মুখে ঢাক্‌না-দেওয়া একটি যক্ষ্মারোগী; ঢাক্‌নার ভিতর ঔষধ-মাখানো কাপড় আছে।

উচিত। রোগীর মনে যাহাতে বিশ্বাস ও আনন্দ জন্মায় ডাক্তারের সেরূপ চেষ্টা করা উচিত। এক কথায়—ডাক্তারদের কেবল রোগীর রোগের দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, তার মনের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যিনি আজ ৩৫ বৎসর ধরিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতে ছয় হাজার মাইল দূরে এবং লণ্ডন সহর হইতে দূরে বিলাতের গ্রাম্য প্রদেশে জীবন কাটাইতেছেন, তাঁর মুখে

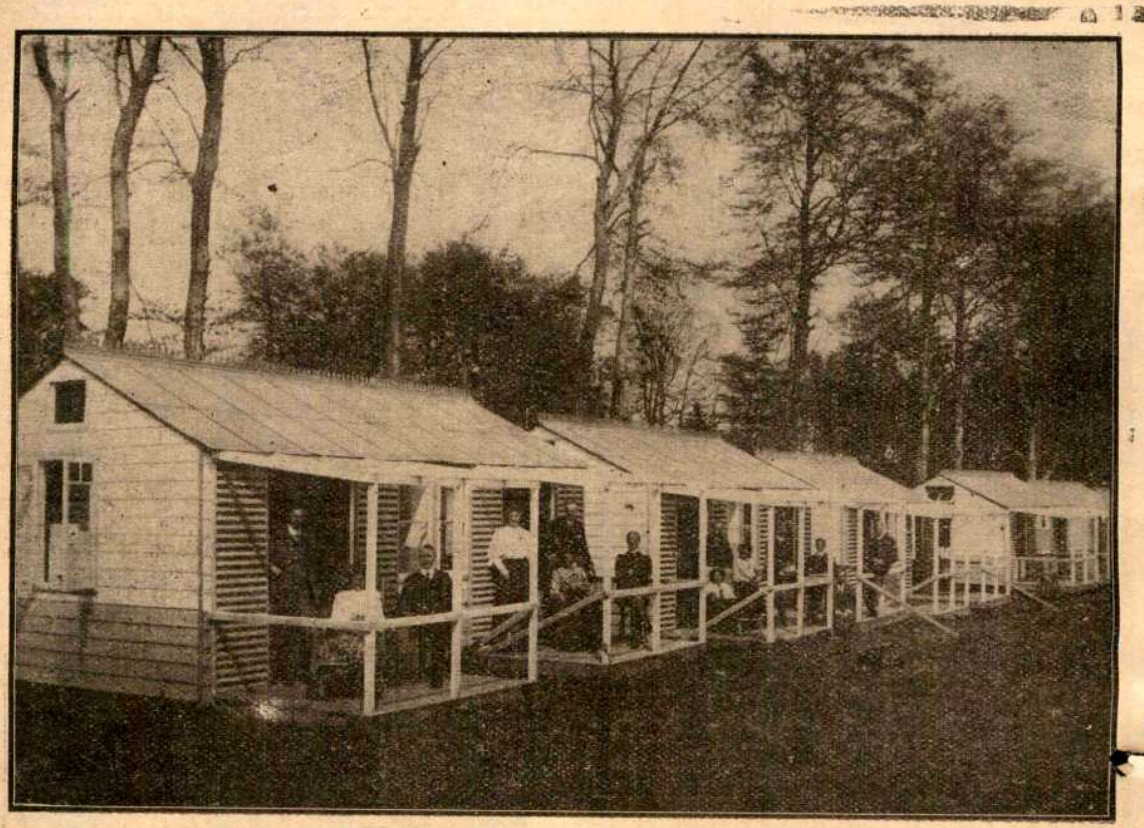

ডাক্তার মুথুর স্বাস্থ্যাগারে যক্ষ্মারোগীদের বাসগৃহ।

ভারতীয় লোকদের শক্তি ও সাধনার উপর তাঁর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন—ভারতীয়েরা যদি তাদের জাতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করিয়া চলে, তারা যদি তাদের জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, কলা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করে ও কেবল মাত্র পশ্চিমের অনুকরণ না করে এবং ভারতীয় আদর্শে ও প্রণালীতে যদি ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে প্রাচীন যুগের মত তারা আবার জগতের শীর্ষস্থানে উঠিতে পারে। যদি ভারতবর্ষ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সে কেবল আত্মিক অবনতিতে ডুবিবে না, তার শারীরিক অবনতিও যথেষ্ট হইবে। দিনরাত্রি কলকারখানার কোলাহল ও ধোঁয়া, বিপর্য্যস্ত মন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও উত্তেজনায় অবসন্ন শিরাসমূহ এবং ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত গৃহে বাস—এই-সমস্ত যদি পশ্চিমের মত ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগ বাড়িয়াই চলিবে। ইউরোপের অসংখ্য কলকারখানার আবির্ভাবে নূতন নূতন রোগেরও আবির্ভাব হইতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় দূরদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে সেখানকার লোকদের বাঁচিতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-নীতিও বদ্‌লাইতেই হইবে, এমন কি পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ডাক্তার মুথু বলেন—পশ্চিম যে পোষাক আজ শরীরের পক্ষে প্রতিকূল ভাবিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে বিষাক্ত অথচ চাকচিক্যময় পোষাকের স্পর্শে শরীর ও আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে, ভারতবর্ষ সেই পোষাক পরিতে আজ লালায়িত। ভারতবর্ষ তার সেই চিরদিনের ব্যাপক, শান্তিময় ও ধ্যানময় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুক। যে ভারতীয়েরা বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়াও এবং কলকারখানার দাস না হইয়াও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ

অনায়াসে তৈরী করিতে পারিয়াছিল এবং এখনও পারে, তারা কি আজ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাষ্প ও বিদ্যুতের আমদানি করিবে এবং তাদের অতীত ও পশ্চিমের নূতন অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া জনতা-বহুল অস্বাস্থ্যকর সহরসমূহ কলকারখানায় পরিপূর্ণ করিবে, না, প্রকৃতির অরণ্যানীর বুকের উপর আদর্শ ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবে ?

ডাক্তার মুথুর স্বাস্থ্যাগারের কাছে ঝাউবনের মাঝখানের রাস্তা।

ডাক্তার মুথু বলেন—যে-সমস্ত কারণে যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগ একে একে ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে আজ ভারতবর্ষকে চেতন হইয়া সেসমস্ত দূর করিতে হইবে। কিছুদিন আগে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অনুকরণের বহু বহু কুফল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও ভয় প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সব জায়গায় পুরুষ নারী ও ছেলেমেয়েরা বাষ্পে-বোঝাই-করা ও সূর্য্যের অগ্নিময় উত্তাপে উত্তপ্ত

স্ত্রী-রোগীরা কাঠ কাটিয়া ব্যায়াম করিতেছেন।

ঘরে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতেছে, অন্ধকার গহ্বরের মত জন-বহুল ঘরে জীবন কাটাইতেছে এবং খাইতেছে অস্বাস্থ্যকর আধপেটা কিছু কুখাদ্য। স্বাস্থ্য-রক্ষার মোটা-মুটি নিয়মও তারা মানিয়া চলে না। এইরূপে নানা রোগের বীজ চারিদিকে জন্মিয়া চলিতেছে এবং লোকের শরীর-শক্তি তাদের প্রতিরোধ করিতে একেবারে অক্ষম। এই জন্যই যক্ষ্মা জাতীয় রোগ ভারতীয়দের আক্রমণ করিতেছে। ডাক্তার মুথুর হিসাবে যক্ষ্মা রোগে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর নয় দশ লক্ষ লোক মারা পড়িতেছে। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ভারতীয় অন্যান্য সহরে লোকসংখ্যার অনুপাতে গ্রেট ব্রিটেনের বারমিংহাম, গ্লাসগো ও অন্যান্য সহরের অপেক্ষা অধিক লোক মরিতেছে। ভারতবর্ষে আবার পুরুষ অপেক্ষা যক্ষ্মারোগে নারীর মৃত্যু অধিক। আবার পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকরাই অধিক মরিতেছে। সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে একটা মহাদেশের মত এত বড় দেশ ভারতবর্ষে এই ভীষণ যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য মোটে চারটি বা পাঁচটি চিকিৎসাগার আছে। এই রোগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ সম্বন্ধে চেতন হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা চেষ্টা করিয়া ও রাজসরকারকে জাগাইয়া তুলিয়া প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

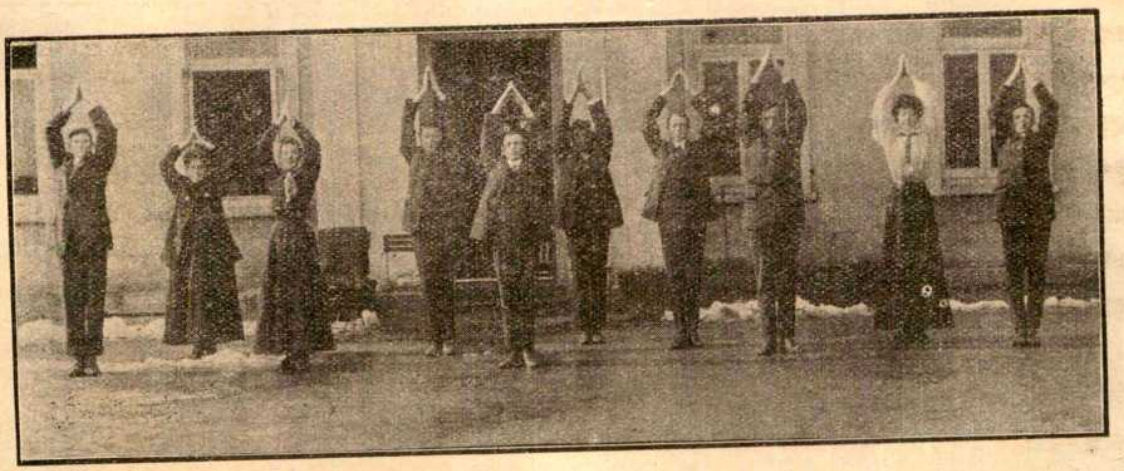

হাত তুলিয়া ও নামাইয়া যক্ষ্মারোগীরা ফুস্‌ফুস্‌কে সবল ও কার্য্যকর করিতেছেন।

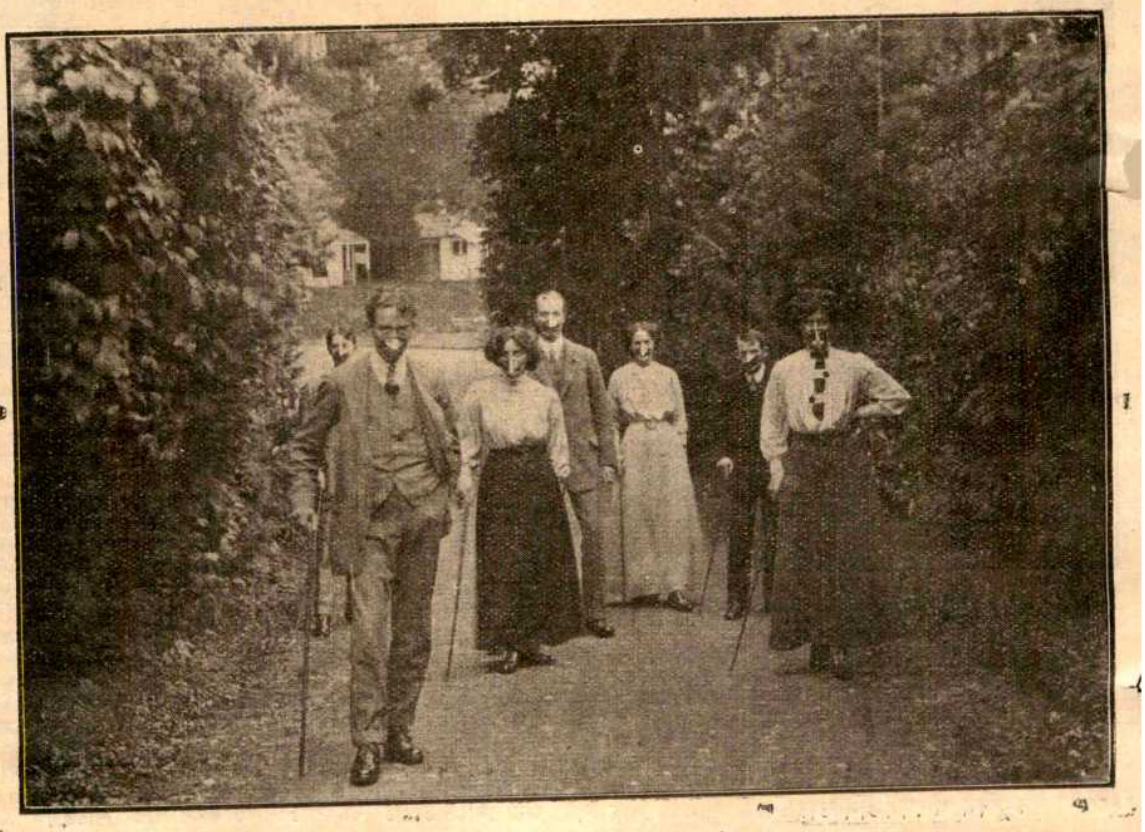

ঢাক্‌না মুখে দিয়া যক্ষ্মারোগীরা বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

ডাক্তার মুথুর ইচ্ছা—ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য তিনি প্রচুর চেষ্টা করেন এবং যাতে এই বিলাতি রোগের অনুকূল কারণসকল দূর করা যায় তারও বিস্তৃত ভাবে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষে একটি যক্ষ্মা-নিবারণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া উচিত, তার শাখা থাকিবে নানা প্রদেশে নানা সহরে। ইহাদের কাজ হইবে যক্ষ্মা-

রোগের কারণ, উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে সাধারণকে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় হাসপাতাল থাকিবে, তাহাতে রোগীদের আত্মীয়রা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইবে, কেন না তাহা হইলে তারা রোগীদের ইচ্ছা ও রুচিমত খাদ্য তৈরী করিয়া দিতে পারিবে। নগরের বাহিরে জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করিতে হইবে, সেখানে রোগী তার পরিবারবর্গ লইয়া কাজ করিতে থাকিবে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার রোগ সারাইতে থাকিবে।

ডাক্তার মুখুর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবেচনা ও বিজ্ঞ চিকিৎসার কথা লিখিতে লিখিতে স্বতঃই দুঃখ হয় যে ভারতের এমন একটি যোগ্য সন্তান আজ ভারত হইতে কত দূরে বিদেশে তাঁর প্রকৃষ্ট কাজ করিয়া চলিয়াছেন। ভারতবর্ষই ত তাঁর কাজের উপযুক্ত স্থান। বিদেশীয়দের স্বাস্থ্য, আশা ও আনন্দ দান করার অপেক্ষা স্বজাতীয়দের এই ভীষণ রোগ হইতে রক্ষা করা ও নৈরাশ্য ও ধ্বংসের কবল হইতে মুক্ত করা কি তাঁর কাজ নহে? এরূপ একটি সন্তানের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বিদেশের কাজে নিযুক্ত থাকিতে দেখা ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই ক্ষতির কথা।

সন্ত নিহাল সিংহ।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি

বাঙ্গালা দেশে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বিশেষ দুষ্প্রাপ্য। এই-সকল মূর্ত্তির অর্দ্ধেক পুরুষাকৃতি, অপরার্দ্ধ (বামার্দ্ধ) নারীর আকার। আমার যতদূর জানা আছে, বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত দুইখানি মাত্র মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের একখানি অবিসংবাদিত অর্দ্ধনারীশ্বর, অন্যখানির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সেন বংশের রাজারা বিখ্যাত শৈব ছিলেন। বল্লাল সেনের কাটোয়া (সীতাহাটি) তাম্রশাসন অর্দ্ধনারীশ্বরের বন্দনা দিয়া আরব্ধ। এই শ্লোকটির রচনা বড়ই সুন্দর, নৃত্যপরায়ণ অর্দ্ধনারীশ্বরের বন্দনায় প্রযুক্ত; মেঘগম্ভীর শব্দতরঙ্গে দেবদেবেশের সন্ধ্যা-তাণ্ডব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।

অর্দ্ধ নারীশ্বর—(যোগনিদ্রা বা মহামায়া।)
কাগজিপাড়ায় আবিষ্কৃত।

সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্নিধান বিলসন্নান্দি-নিনাদোর্ম্মিভিঃ
নির্ম্মর্য্যাদঃ রসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধেন্দু ভীমোদ্ভটে
নাট্যারম্ভরয়ে জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ॥

বল্লাল সেনের কাটোয়া তাম্রশাসন, ১ম শ্লোক।

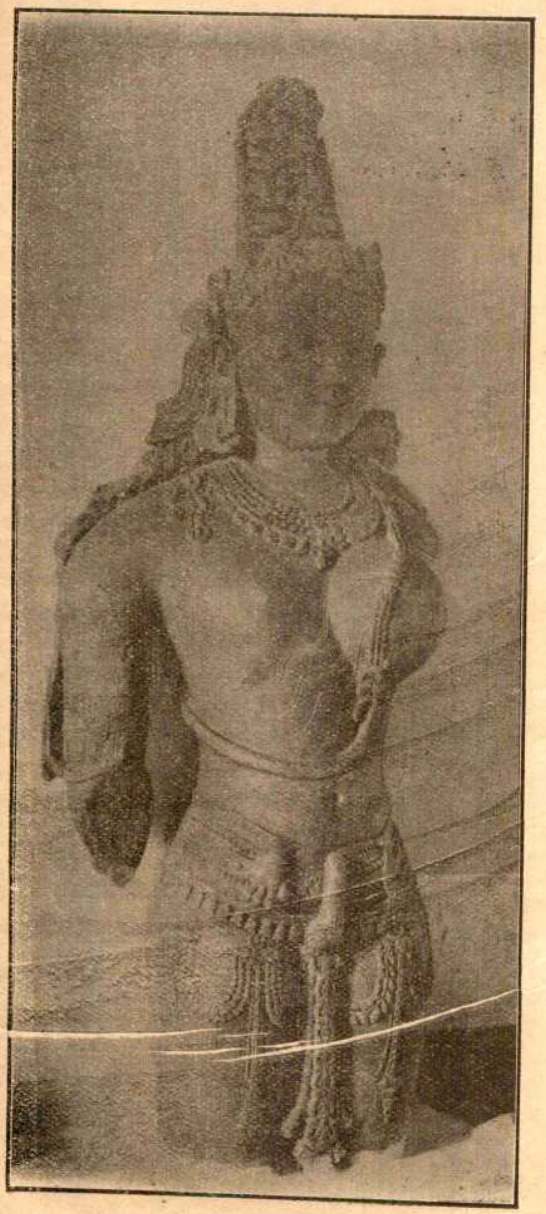

অর্দ্ধনারীশ্বর।

বল্লাল-বন্দিত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশে ভবিষ্যতে আরও পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বরের যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, দুইটিই বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত। যে মূর্ত্তিখানি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি কি না সন্দেহ আছে, তাহার বিষয়ই আগে আলোচনা করিতেছি। এই মূর্ত্তিখানির জুড়ি বাঙ্গালা দেশে আর বাহির হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। ইহাকে বর্ত্তমানে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল, কিন্তু অর্দ্ধনারীশ্বরের পরিচিত মূর্ত্তিসমূহের সহিত এই মূর্ত্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। বিক্রমপুরে সেনরাজদের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় ২৫ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে। এই ধ্বংসাবশেষের কেন্দ্রস্থানীয় গ্রামটিই রামপাল বলিয়া পরিচিত। এই রামপালেই বিস্তৃত পরিখায় ঘেরা বল্লালবাড়ী, বিখ্যাত গজারী বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড তিনটি দীর্ঘিকা বিদ্যমান। এই প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন গ্রাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। নিজ রামপালের উত্তর-পশ্চিমস্থ অংশ কাগজীপাড়া নামে পরিচিত। এই কাগজীপাড়া গ্রামে এক নালা হইতে মাটি তুলিতে ১০।১২ বৎসর আগে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে নিকটস্থ এক গ্রামে শ্মশানের উপরে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে।

মূর্ত্তিটি প্রায় চারি ফুট উচ্চ। মূর্ত্তির নিম্নাংশ শিবলিঙ্গের আকৃতি; লিঙ্গের গৌরীপট্ট সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, কিন্তু লিঙ্গাংশ মাত্র আধেকখানি দেখান হইয়াছে। এই অর্দ্ধাংশ লিঙ্গ যেন ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব এক দেবীমূর্ত্তির কটিদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা, ধ্যানস্তিমিতলোচনা, ঊর্দ্ধ দক্ষিণ ও বাম হস্তে যথাক্রমে জপমালা ও পুস্তক,—দীক্ষা ও শিক্ষা—বৈরাগ্য ও জ্ঞান! ললিত ভঙ্গীতে পীনোন্নত স্তনযুগলের নিম্নে বাম হাতের উপর দক্ষিণ হাত ধ্যানমুদ্রায় বিন্যস্ত। সমগ্র মূর্ত্তিতে একটি অপূর্ব্ব কমনীয়তা, অপূর্ব্ব স্নেহোচ্ছল ধ্যানতন্ময় মাতৃভাব মাখান। একবার দেখিলে বহুক্ষণ চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। এই মূর্ত্তিখানির মনগলান ভাবৈশ্বর্য্যের আভাস, পাঠক চিত্রেও কথঞ্চিৎ পাইবেন বলিয়া আশা করি। মূর্ত্তিখানি যে প্রতিভাবান কলাকুশল শিল্পীর রচনা সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য, ইহাও অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়। বস্তুতঃ এইরূপ মাতৃমূর্ত্তি দৈবাৎই চক্ষে পড়ে। হেভেল সাহেবের "ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য" নামক পুস্তকে চিত্রিত যবদ্বীপ হইতে প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্ত্তির পর

ঝুলন।
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অলীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।"
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অলীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

এমন মাতৃমূর্ত্তি আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

মূর্ত্তিখানি নিশ্চয়ই প্রকৃতি-পুরুষের যুক্ত মূর্ত্তি, এবং প্রকৃতি-পুরুষের একাঙ্গ ভাবই অর্দ্ধনারীশ্বরের মূর্ত্তির মূল সূত্র। এইজন্যই এই মূর্ত্তিকে অর্দ্ধনারীশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; অবশ্য যদি এই মূর্ত্তি অর্দ্ধনারীশ্বর হয় তবে শিল্পী অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনায় বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অর্দ্ধনারীশ্বরের প্রচলিত ধ্যানের সহিত এই মূর্ত্তির মিল নাই, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তির ধ্যান আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। যদি কেহ এই সুন্দর মূর্ত্তিখানির ধ্যান অবগত থাকেন বা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন তবে আমাকে দয়া করিয়া জানাইলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি যেটুকু খুঁজিয়া পাইয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কালিকাপুরাণের ৭৬তম অধ্যায়ে (৮৮-৯৩ শ্লোক, বঙ্গবাসী সংস্করণ) এক দেবীমূর্ত্তির বর্ণনা পাই। ইনি লিঙ্গমূর্ত্তি ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন। শিবের উপদেশ অনুসারে বেতাল ও ভৈরব নামে দুই ভ্রাতা দেবী মহামায়ার নিকট হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্তির আশায় শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। অবশেষে দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া ভক্ত-যুগলের নিকট আবির্ভূত হইলেন। দেবীর আবির্ভাব নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

"তাহারা ধ্যানস্থ হইয়া মন্ত্র জপ এবং মনে মনে জগন্ময়ী দেবীর পূজা করিতেছে, এমন সময় মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। লিঙ্গ হইতে দেবী নির্গতা হইলে ঐ লিঙ্গ ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক, এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল। বেতাল ও ভৈরব তখন এই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। সেই দেবীমূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পীনোন্নতপয়োধরা, বরদাভয়হস্তা, সিদ্ধসূত্র- ও অসিধারিণী, রক্তপদ্মসদৃশা আভাযুক্ত এবং শ্বেতবর্ণ-প্রেতাসন-সংস্থিত।"

এই মহামায়া-মূর্ত্তিকে 'জগৎপ্রসবিনী' বলা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মূর্ত্তির সঙ্গে এই কলিকাপুরাণের মহামায়া-মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দুই দেবীর হাতে যাহা যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের এক সিদ্ধসূত্র বা জপমালা ভিন্ন অন্যগুলিতে মিল নাই। তবে একটি কথা এখানে বিবেচ্য। এই কালিকা-পুরাণেরই ৪৭৪ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা-ভৈরবী দেবীর বর্ণনা আছে। তাহাতে দেখা যায় দেবী চতুর্ভুজা, শ্বেতপ্রেতাসনস্থিতা এবং তাঁহার দক্ষিণ দুই হস্তে জপমালা ও পুস্তক। আবার ৪৮০ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে ত্রিপুরা-ভৈরবী এবং অপর সমস্ত ভৈরবী, তথা জগজ্জননী যোগনিদ্রা ও মহামায়া অভেদাত্মিকা। এই-সমস্ত আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান মূর্ত্তিখানিকে জগজ্জননী যোগনিদ্রা বা মহামায়ার মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বিশেষ অসঙ্গত হইবে মনে হয় না।

যে মূর্ত্তিখানায় অর্দ্ধনারীশ্বরত্বে কোন সন্দেহই নাই—সেখানাও বিক্রমপুরেই পাওয়া গিয়াছিল। রামপালের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পুরাপাড়া নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে একটি বেশ বড় দেউল আছে। এই দেউলগুলি প্রাচীন দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ উচ্চ ভূমি। বিক্রমপুরের প্রত্যেক পুরাণা গ্রামে এইরূপ এক বা ততোধিক দেউল বর্ত্তমান এবং প্রাচীন মূর্ত্তি ইত্যাদি ইহাদের আশপাশ হইতেই বাহির হয়। পুরাপাড়ায় দেউলের সংলগ্ন পূর্ব্ব প্রান্তে এক 'গর' বা ডোবা অদ্যাপিও তামকুণ্ড বলিয়া পরিচিত। এই তামকুণ্ড হইতে মাটি উঠাইতে এই মূর্ত্তিখানা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই মূর্ত্তিখানি সংগ্রহ করিয়া রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় উপহার দিয়াছেন।

মূর্ত্তিখানি যথাশাস্ত্র অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষ-আকৃতি, বামার্দ্ধ স্ত্রীদেহের মত। মূর্ত্তিটির একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সুগোল মূর্ত্তি,—বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত অধিকাংশ মূর্ত্তির মত চেপ্টা শিলাপট্টে কেবল মাত্র সম্মুখার্দ্ধ উৎকীর্ণ নহে। চিত্রদৃষ্টেই বুঝা যাইবে যে এই মূর্ত্তিখানিও শ্রেষ্ঠশিল্পীর হাতের রচনা। দুর্ভাগ্যক্রমে মূর্ত্তিখানার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—দুই হাত ছিল, তাহাদের একখানা বাহুমূলে ভগ্ন, আর একখানার কনুই পর্য্যন্ত আছে; নিম্নাংশে মূর্ত্তিখানা হাঁটুর নিকট ভগ্ন, বাকী অংশ পাওয়াই যায় নাই, মুখের স্থানে স্থানেও আঁচড় লাগিয়াছে। কিন্তু এই-সকল অঙ্গহানিসত্ত্বেও

মূর্ত্তিখানা যে বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সে সম্বন্ধে আশা করি মতভেদ হইবে না। স্ত্রী- ও পুরুষ-দেহার্দ্ধের বৈচিত্র্য অতি দক্ষতাসহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয়ার্দ্ধের মুখের ভাব, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন ইত্যাদির তুলনা করিলে শিল্পীর দক্ষতা বুঝা যাইবে।

পুরাপাড়া দেউল এবং দুই মাইল পশ্চিমস্থ বলই বা রাণীহাটি দেউল বল্লাল সেন ও তাঁহার এক রাণীর সহিত জনপ্রবাদে সংশ্লিষ্ট। রাণীহাটি দেউল হইতে প্রাপ্ত নটরাজ শিবের মূর্ত্তি, প্রবাসী ১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণের (বঙ্গবাসী) ৮৯৮ পৃষ্ঠায়, ২৬০তম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তি অবিকল মিলিয়া যায়। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির উৎপত্তির কাহিনী কালিকা-পুরাণের ৪৫তম অধ্যায়ে এবং অন্যান্য পুরাণে ও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যাইবে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

প্রাবৃটপূর্ণিমার গান

চন্দ্রলেখা ছড়িয়ে গেল
বর্ষারাতে—
ঢাল্‌চে শীতল চন্দনরস
জ্যোৎস্নাতে!
কাছে দূরে অশথ-শিরে
জ্বল্‌চে ও কি লক্ষ হীরে?—
লিখ্‌চে লিপি দিগ্বলয়ের
স্বর্ণপাতে!
সজল উজল মধুর এমন
স্বপ্নছবি
রেখায় রেখায় নকল করি'
আঁক্‌না কবি।
দুখের গাঙ্গে সুখের আলো,
যে-সুরে গায় সবার-ভালো
সে-সুরটি আজ ধর্‌না মৃদুল
ছন্দ সাথে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

পঞ্চশস্য

ঢ্যাঙা আর বেঁটে হওয়ার কারণ—

মানুষ সাধারণত মাঝারি আকারের সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা হয়। শিখ, পাঠান, রুশ, স্কচ হাইল্যাণ্ডার প্রভৃতি কোনো কোনো জাতের লোক একটু বেশী ঢ্যাঙা হয়—ছয় ফুট হইতে সাড়ে ছয় ফুট পর্য্যন্ত। বাঙালী জাতটা একটু বেঁটে—সাড়ে-পাঁচ ফুট যেঁসিয়াই বেশীর ভাগ, আবার ছয় ফুট ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এমন লোকও বাঙালীর ভিতর বিস্তর। জাপানী জাতটা আরও বেঁটে। আফ্রিকার বামন বাসুবরা মাত্র তিন ফুট। সকল জাতের লোকের মধ্যেই বামন ও অতিদীর্ঘাকার লোকও দেখা যায়। মানুষ যে বাড়িয়া বাড়িয়া হাতীর মতন অতিকায় বা তালগাছের মতন লম্বা কেন হয় না, এবং কুদে নেংটি ইঁদুরের মতন পুচ্‌কেই বা কেন হয় না; কেনই বা একই জাতের লোকের মধ্যে অতিকায়, বামন ও মাঝারি লোক জন্মে;—এই-সকলের কারণ বিজ্ঞান ঠাহর করিয়া বলিতেছে এ সবই পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের খেলা।

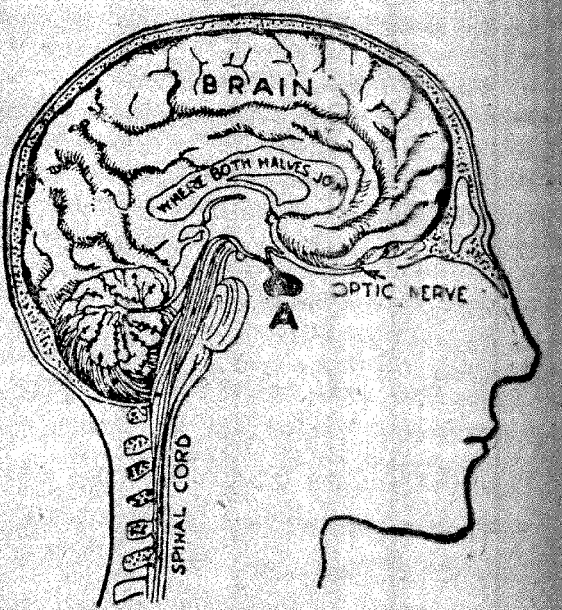

বেঁটে বা ঢ্যাঙা করার কর্ত্তা পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড। ছবিতে A চিহ্নিত।

মানুষের দেহের সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি পাওয়া বা বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া নির্ভর করে তার পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের উপর। এই গ্ল্যাণ্ড চোখের ঠিক পিছনে, মস্তিষ্কের ঠিক নীচে, শিরদাঁড়ার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া মাথার ভিতরে বাসা করিয়া থাকে। এ একটা মাংসগ্রন্থি, যাকে চলিত কথায় বিচি বলে; এর আকার আর রং টাঁশা কুলের বা চেরী-ফলের মতন গোলালো গোলাপী। এই গ্ল্যাণ্ডটি যার দেহে যতদিন তৎপরতার সঙ্গে নিজের কাজ হাসিল করে, সে ততদিন বাড়িতে থাকে; পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড যেই কাজ বন্ধ করে, মানুষের বাড়ও অমনি সঙ্গেসঙ্গে বন্ধ হয়। যার গ্ল্যাণ্ড বেশীদিন কাজ চালায় সে বাড়িয়াই চলে—যেমন জর্জ অগার নামক অতিকায়, যে ঝাড়া ৮ ফুট লম্বা; আবার যার গ্ল্যাণ্ডের কাজ হয় না সে আর বাড়ে না, যেমন মিষ্টার ও মিসেস টম থাম্‌

(বুড়ো আংলা), যারা আজীবন দুবছরের খোকাখুকীর মতন ছোটই থাকিয়া গিয়াছিল।

ঢ্যাঙা বা বেঁটে হওয়া পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডেরই কারচুপী যে, তার প্রমাণ অতিকায় ও বামনদের শরীরে ঐ গ্ল্যাণ্ডটি বিকৃত হইয়া থাকিতে দেখা যায়।

এই গ্ল্যাণ্ডের বিকৃতি ঘটিলে কেবল সমগ্র শরীরই যে বেশী বাড়ে বা কম বাড়ে তা নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অবয়বও বেমানান হইয়া বাড়ে কমে। হাত দুলো, পা খাটো; আজানুলম্বিত বাহু বা সারসের মতন ঠ্যাং; হাঁড়ি মুখ বা ছুঁচকে মুখ; প্রভৃতি সমস্ত আতিশয্য বা অপুষ্টতার জন্য দায়ী ঐ পিটুইটারী। যদি জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ গ্ল্যাণ্ডকে ঠিক-মত চালনা করিতে পারা যায়, তবে জগৎসংসার মদনমোহন ও রতিনিন্দিতা নরনারীতে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

ঐ গ্ল্যাণ্ড হইতে একরূপ রস ক্ষরণ হয়; সেই রস রক্তে মিশিয়া কয়েক-মিনিটে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া যায়, এবং দেহের টিশু বা তন্তুগুলিকে পুষ্ট করিতে থাকে। এরই প্রভাবে দেহের কোষ স্ববিভক্ত হইবার শক্তি পায় এবং খাদ্যরস আত্মসাৎ করিয়া যথোপযুক্ত প্রকারে বাড়িতে পারে। যে শরীরে পিটুইটারী রস বেশী ক্ষরণ হয় তাহা বেশী বাড়িয়া ওঠে।

যদি কোনো লোকের পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড অসুস্থ অক্ষম হয়, তবে শূকর হরিণ প্রভৃতি জন্তুর শরীরের ঐ গ্ল্যাণ্ড-নির্য্যাস মনুষ্যশরীরে নিষেক করিলে কার্য্য করিয়া থাকে।

এই পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের খেয়াল-খুসীতেই সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবী অতিকায় জন্তুর বাসভূমি হইয়াছিল; এখনো হাতীর গোটা শরীরটা ঐজন্যই অত বড় হয়, জিরাফের গলাটা অত লম্বা হয়, বানরের আজানুলম্বিত বাহু হয়, নেংটে ইঁদুর অত ছোট হয়, জেব্রার গায়ে ডোরা কাটে, উটের পিঠে কুঁজ হয়, হিপোপটেমাসের মুখখানা অত প্রকাণ্ড বড় হয়। কোনো লোকের মাথা গোল আর কারো মাথা লম্বা; নরওয়ের লোকের পা সারসের মতন, আর জাপানীদের পা ধনুকের মতন;—এ-সবেরও জন্য দায়ী ঐ পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড। চাঁপার কলির মতন আঙুল আর চাঁপা-কলার মতন আঙুল হওয়াও নির্ভর করে ঐ গ্ল্যাণ্ডের উপর।

কেউ কেউ বলেন কুম্ভকর্ণের চেলা হইলে নাকি ঢ্যাঙা হওয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা ঠিক হইয়াছে—এক রাত্রির নিদ্রার পর প্রভাতে প্রত্যেক লোক এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ লম্বা হয়, আবার দিনের বেলা খাটো হইয়া পড়ে। বহুকাল রোগে শয্যাগত থাকিলেও রোগী মাথায় লম্বা হইয়া ওঠে। যে যত বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে সে তত ঢ্যাঙা হইতে সুযোগ পায়। কারণ খাড়া হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে মাথার ভারে দেহের বৃদ্ধি চাপে বসিয়া খাটো হইয়া যায়; শুইয়া থাকিলে বাড় অবাধে হইতে থাকে। এইজন্য ছেলেদের খুব ঘুমানো দরকার—ছেলে বেলায় বেশী ঘুমাইলে বা শুইয়া থাকিলে সে লোক বেশ ঢ্যাঙা হয়। এইজন্যই বোধ হয় কুম্ভকর্ণ অতবড় অতিকায় হইয়াছিল! মানুষ ঘুমাইলে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড সজাগ হইয়া ওঠে?

—

বেঁড়ে মাছ—

স্থলচর জীবের পা না থাকিলে যে দশা হয়, জলচরের ল্যাজ না থাকিলে সেই অবস্থা হয়। নৌকার যেমন দাঁড় ও হাল, মাছের তেমনি পাখ্না ও ল্যাজ্। ল্যাজ না থাকিলে তাদের চলাও মুস্কিল,

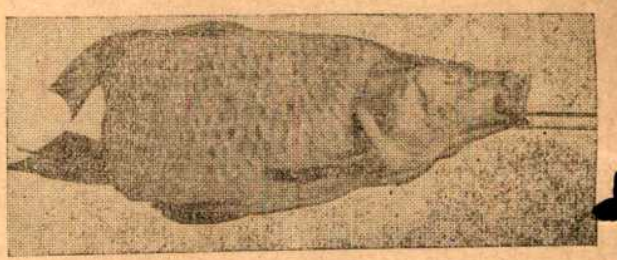

বেঁড়ে মাছ।

ঘোরাফেরাও মুস্কিল। একটা জন্মবেঁড়ে কই-মাছ ধরা পড়িয়াছে। সে যে কেমন করিয়া এতকাল জলে ছিল এই ভাবনায় অস্থির হইয়াছে ডাঙার মানুষ—বিশেষ করিয়া জীববৈজ্ঞানিকরা।

—

কলের বীণা-বাদিনী মূর্ত্তি—

আমেরিকার সান-ফ্রান্সিস্কোর বাসিন্দা ডাক্তার নিক্সন একটি কলের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, সেটি বীণায় চৌষট্টি রাগিণী আলাপ করিতে পারে। তার মাথায় বুকে সর্ব্বাঙ্গে হাজারো চাকা কল কব্জা আছে। এইটি তৈরি করিতে বারো বৎসর লাগিয়াছে। ডাক্তার নিক্সন বলেন—এক কথা কওয়া ছাড়া আর সব কাজই এ মানুষের মতন করিতে পারিবে। দেখা যাক।

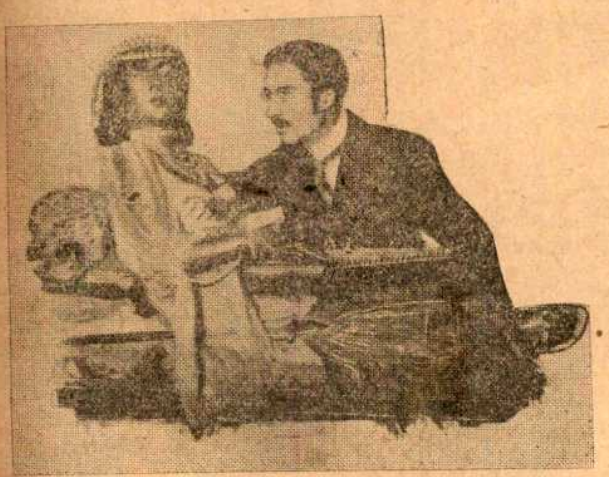

কলের বীণাবাদিনী ও তার নির্ম্মাতা।

—

কোমর-ঘড়ী—

আগে ঘড়ী থাকিত ট্যাঁকে বা পকেটে; পরে বাহির হইয়া জাহির হইল হাতে। এখন পৌঁছিয়াছে কোমরবন্ধে। মেয়েদের মতন গলায় হার ও হাতে বালা পরিতে বা পটি বাঁধিতে অনেক পুরুষ লজ্জা বোধ করে, তাই হাতঘড়ী পকেট-ঘড়ী থাকিতেও কোমর-ঘড়ীর প্রচলন হইতেছে। চলিবার সময় হাত দোলে; তার ফলে হাতঘড়ী জলদ চলে; কিন্তু কোমরে থাকিলে এই উপদ্রব আর ঘটিবে না।

—

হাতে লেখা বাইবেল—

ইংলণ্ডের রাজা রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া নামজাদা বারো হাজার নরনারী বাইবেলের একএকটি নির্দ্দিষ্ট অংশ হাতে লিখিতে সুরু করিয়াছেন। এইসব হস্তলিপি একখানি বড় খাতায় পর্য্যায়ক্রমে আঁটিয়া রাখা হইবে। এই বাইবেল হইবে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম—৫ ফুট উঁচু, ৩ ফুট চওড়া, ৬ ফুট লম্বা! ১৭৫ খানি মোটা বোর্ডের উপর হাতে লেখা পদগুলি আঁটা হইবে। টোয়াইন সুতায় গাঁথিয়া মরোক্কো চামড়ায় বই বাঁধা হইতেছে—বারোটা গোটা রামছাগলের চামড়া লাগিয়াছে এই বই বাঁধিতে। বই সম্পূর্ণ হইলে ইহা দেশভ্রমণে বাহির হইবে।

কয়ালী।

—

মানুষের ঘোড়া রোগ—

আমাদের দেশে পোয়াতি বা গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সাবধানে রাখিবার অনেক নিয়ম আছে। গর্ভবতীর খাইবার, শুইবার বা অন্য কোন কিছুর দোষ হইলে তার জাত সন্তান কোন-না-কোন দোষ পাইয়া থাকে বা কোন অঙ্গে বিকৃত হয়। আমেরিকায় সম্প্রতি এইরূপ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। সেখানে জিনেট হোগান্ নামে একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে একটা পাগ্‌লা বদ্‌মাইস ঘোড়া কামড়াইয়া দেয়। ঘোড়াটা যখন কামড়ায় স্ত্রীলোকটি তখন ছয়মাস গর্ভবতী। চার মাস পরে তাঁর একটি মেয়ে জন্মায়। আশ্চর্য্যের বিষয়

মানুষের ঘোড়া রোগ।
জানেৎ নামের একটি মেয়ের মাকে তার গর্ভাবস্থায় ঘোড়ায় কামড়াইয়াছিল, তার ফলে মেয়েটিতে ঘোড়ার স্বভাব সংক্রামিত হইয়াছে।

ক্ষুধার সময় জানেত্ মাথাটাকে উপর নীচ করিয়া ঝাড়িতে থাকে, যেমন ঘোড়ারা করে।

ঘোড়ারা বিশ্রামের সময় যে রকম করিয়া পায়ের উপর পা রাখিয়া দাঁড়ায়, জানেত্রেরও সেই রকম করা স্বভাব।

জানেত্ ঘোড়ার মতন ট্যারা চোখে চায়।

ঘোড়া ঘাড় লম্বা করিবার সময় যে-রকম করিয়া মাথা চাড়া দেয় এবং হেঁট কোঁচকায় মেয়েটি ঠিক সেই রকম করে।

মেয়েটি ঘোড়ার মত অনেক হাবভাব দেখায় ও অঙ্গ চালনা করে। মেয়েটির বয়স এখন চার বৎসর। ক্ষুধা পাইলে সে ঘোড়ার মত মাথা নাড়িতে ও ঝাঁকিতে থাকে; ঘোড়া যেমন বিশ্রামের সময় একটির উপর আর-একটি পা রাখিয়া ট্যারা করিয়া দাঁড়ায় মেয়েটিও মাঝে মাঝে সেইরূপ করিয়া দাঁড়ায়; আবার ঘোড়া যেমন মাঝে মাঝে চোখ ঘোরায় ও বাঁকা চোখে দেখে, মেয়েটিও সেই-রকম করিয়া চোখ ঘোরায় ও বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে। মেয়েটি আবার কালা ও বোবা। ইহা লইয়া আমেরিকার বৈজ্ঞানিক মহলে খুব আন্দোলন জাগিয়াছে। গর্ভিনীর কি দোষে বা কি আকস্মিক বিপদে সন্তান কিরূপ দোষযুক্ত বা বিকৃত হয় তার অনুসন্ধানে তাঁরা ব্যস্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মঘটকারী শ্রমজীবীদের মুখপাত্রদের সঙ্গে প্রধান পুলিশ-কর্ম্মচারী মাহর সাক্ষাৎ, এবং তাদের অভিযোগ শ্রবণ।
মাহর কবরের উপর উৎকীর্ণ চিত্র হইতে।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মঘট—

কাজ কমানো, কাজের সময় কমানো ও মাহিনা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের যখন-তখন ধর্ম্মঘটে আজকাল ইউরোপ ও ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত। কাজের আড্ডা বা কলকারখানা থাকিলেই এরূপ ধর্ম্মঘটও থাকিবে, কেননা নিজেদের অসুবিধা দূর ও অবস্থা উন্নত করিবার জন্য শ্রমিকরা আন্দোলন করিবেই। কিন্তু ধর্ম্মঘট যে আজকালকার একটা হুজুগে জিনিষ তা নয়। তিন হাজার বছর আগেও যে ধর্ম্মঘটের অস্তিত্ব ছিল তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মিশর দেশে প্রাচীন কালে ধর্ম্মঘটের প্রচলন ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের যত্নে মিশরের এল্ আমার্ণা সহরের অনেক জায়গা খোঁড়া হইয়াছে। তার ফলে যে-সব প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে তাতে দলবদ্ধ শ্রমিকদের ও তাদের নেতাদের অনেক মূর্ত্তি আছে। এইসব ছবি হইতে কেবল যে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের কথাই জানা যায় তা নয়। সেই ধর্ম্মঘট এক সময়ে এরূপ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল যে জগতের ধর্ম্মঘটের ইতিহাসে তাহা একটি খুব স্মরণযোগ্য ঘটনা। সে ধর্ম্মঘটে মজুরদের যিনি নেতা ছিলেন তাঁর নাম ছিল মাহ্। মাহর জীবনের ইতিহাস বেশ বিস্ময়পূর্ণ। তিনি ছিলেন আমার্ণা সহরের একজন তেজস্বী রাজকর্ম্মচারী। শ্রমিকরা মাহিনা বাড়াইবার ও কাজের সময় কমাইবার জন্য যখন আন্দোলন আরম্ভ করে মাহ্ তখন তাদের পক্ষেই ছিলেন না। ক্রমে যখন সহরের সব কলকারখানা বন্ধ হইয়া আসিল এবং শ্রমিকরা উত্তেজিত হইয়া দলে দলে রাজার

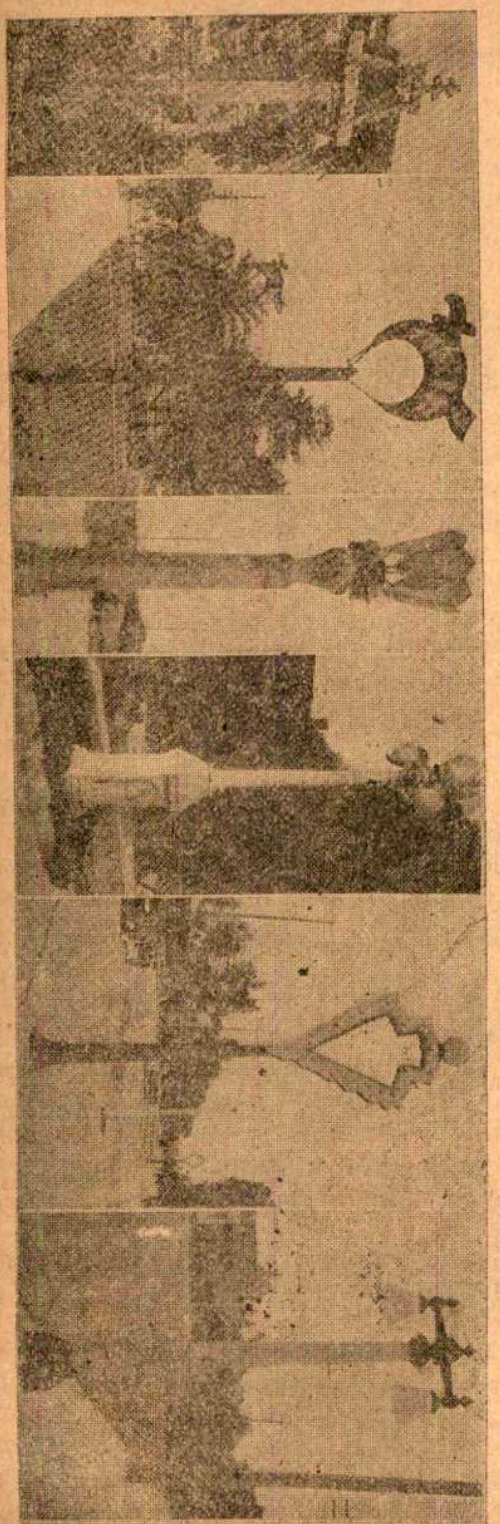

কাছে অভিযোগ জানাইতে আসিল, তখন সকলে ভাবিল মাহু এইবার সৈন্য সামন্ত লইয়া বুঝি শ্রমিকদের দফা রফা করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত দলবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতিরোধ করা ত দূরের কথা মাহু তাদের কোন কথাই বলিলেন না। অবশেষে দেখা গেল হঠাৎ মাহু নামিয়া আসিয়া একেবারে শ্রমিকদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাদের অভিযোগ সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং একেবারে তাদের সমব্যথী নেতা হইয়া পড়িলেন! তারপর সেইসব শ্রমিকদের লইয়া তিনি রাজার কাছে হাজির হইলেন ও এমন তেজস্বী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাদের কষ্ট ও অসুবিধার কথা জানাইলেন যে, রাজা তার প্রতিকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মাহু অত্যাচারপিষ্ট মজুরদের অবস্থা উন্নত করিতে পারিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। মজুররাও তাঁকে তাদের একান্ত আপনার করিয়া লইল। ন্যায় কাজে সিদ্ধিলাভ করিয়া মাহু এরূপ গর্ব্বিত হন যে তিনি তাঁর কবরের চারিদিককার পাথরে সেই ধর্ম্মঘটের কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া যান। তাঁর চালিত ধর্ম্মঘট নাকি জগতের ইতিহাসে প্রথম ধর্ম্মঘট। প্রাচীন মিশরে পুরোহিত প্রভৃতিদের অত্যাচারে সাধারণ লোকে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য অত্যাচারাবনত লোকদের পোষণ করার জন্য মাহু মিশরে যথেষ্ট আদরণীয় হইয়া উঠেন। প্রস্তরলিপিগুলিতে মাহুর শ্রমিকদের অভিযোগ শোনার অনেক রকম ছবি আছে। যে মাহু রাজার ভৃত্য হইয়া দেশের শান্তিরক্ষক বা পুলিশের নেতা ছিলেন, তিনিই অত্যাচারপীড়িত সাধারণের নেতা হন। সেই মাহুর পাশে আমাদের দেশের পুলিশ!

—

রাস্তার আলোর থাম—

উন্নতিশীল জাতিরা আপনাদের বাস করিবার গৃহ গ্রাম নগর ও দেশকে কত শৃঙ্খলায় ও সুনিয়মে রাখে। তাদের এইসব শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম যথেষ্ট বুদ্ধি ও চিন্তার পরিচয় দেয়। আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে রাস্তায় যে আলোর থাম আছে তাদের মাথার আলো প্রতি সহরে বিভিন্ন রকমের। কোন সহরে থামের মাথার আলো একটি দাণ্ডার উপর দুদিকে দুটি ঘণ্টার মত ঝুলিতেছে; কোন সহরে আবার থামের মাথায় লাঙলের ফাল বা তীরের ফলার মত আলো সাজানো রহিয়াছে। এই রকমে বিভিন্ন সহরে আলোর আকার বিভিন্ন হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ আছে। যে সহরে যে-রকম ঐতিহাসিক বা কিম্বদন্তীমূলক ঘটনা ঘটিয়াছে সেই অনুযায়ী সে সহরের আলোর আকার দেওয়া হইয়াছে। প্যাল বার্নাডিনো সহরের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব—সেখানে এক প্রকাণ্ড পাথর আছে, তার মাথাটা তীরের মত। অতএব সেখানকার আলোর থামের মাথাটা তীরের ফলার মত। স্যান গ্যাব্রিয়েল সহরে স্যান গ্যাব্রিয়েল ধর্ম্ম-মন্দির আছে। তাই সেখানে আলোর মূর্ত্তি একটি ক্রশের মত, ধর্ম্মের পরিচায়ক। এই রকমে আলাদা আলাদা সহরে আলোর আকার আলাদা। এ বড় সুন্দর শৃঙ্খলার পরিচয়। আমেরিকার যে যে সহরে এইরূপ আলো স্থাপিত হইয়াছে তাদের কতকগুলির নাম এই—লস্ এঞ্জেলেস্, রিভারসাইড, স্যান বার্নাডিনো, সিল বিচ, আলহাম্ব্রা ও স্যান গ্যাব্রিয়েল।

প্যারী।

—

চিরস্থায়ী গালের লাল—

প্রথমপ্রণয়কুণ্ঠিতার আনত কমলমুখটির লজ্জারুণ রক্তিমা দেখিতে কেমন লাগে? ওটুকুকে অব্যয় চিরস্থায়ী করিয়া ধরিয়া রাখিতে যাঁদের

গালে লালের উল্‌কি।

সাধ যায় না, সকলের মতে তাঁরা সুরসিক না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুব বেশী নন। বিজ্ঞান রমণীর গালের লালকে অপরিবর্ত্ত কায়েম করিবার কায়দা আবিষ্কার করিয়াছে।—বিলাতের রমণীসমাজে তাহা লইয়া বেশ একটু আলোড়নের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গালের উপরটাকে লাল আল্‌তায় ডোবানো তুলিতে সাবধানে আঁকিয়া লইয়া তার উপর বৈদ্যুতিক সূঁচ চালাইয়া এই রংকে পাৎলা একপরত চামড়ার ভিতরে পৌঁছাইয়া দিয়া মানুষ খোদার উপর এই খোদ্‌কারী করিতেছে। ব্যাপারটা খুব বেশী কিছু নয়—সাবেক দিনের উল্কি-পরানোর আধুনিক পরিণতি। উল্কি পরার সেই অসহ কষ্ট এতে নাই, পায়ে ঝিঁঝি ধরার মতো সামান্য একটু অনুভূতি, তাও প্রতি গণ্ডে আধঘণ্টা করিয়া মাত্র একটি ঘণ্টা সহ্য করিয়া থাকা। সে যাহা হোক, আমাদের দেশের মেয়েরা এ সংবাদে খুসী না হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইব। তার কারণ, প্রথমত, মেকি যা-কিছু তাহাই অবজ্ঞেয়। তাছাড়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষ বদ্‌লাইবে, প্রতি মুহূর্ত্তে পুরাণো মূর্ত্তিটিকে তার আর মনে ধরিবে না, তার সম্বন্ধে ভগবানের এই ব্যবস্থার চেয়ে শুভ আর কিছু আমাদের জানা নাই। তরুণীর লজ্জারাঙা মুখখানি দেখিতে ভালো বটে, কিন্তু—"দিবস তিল-আধ রাখবি যৌবন", তারুণ্য ত চিরকাল বসিয়া থাকিবে না; বৃদ্ধার বিশীর্ণ গণ্ডে এই রক্তরাগ দর্পী কালের কতবড় নির্ম্মম পরিহাসের মতো ঠেকিবে। ধরা যাক্ বিজ্ঞান খুসি-মতো মুখের স্বাভাবিক বর্ণকে ফিরাইয়া দিতেও পারিবে। তবু, পৃথিবীর সমস্ত তরুণীদের মুখে কখনো ভয়ের বিবর্ণতা, ব্যথার পাণ্ডুরতা, কোপের সিঁদুররাগ, ভ্রূকুটির কালো দেখিতে পাওয়া যাইবে না, সর্ব্বত্র প্রাণহীন একঘেয়ে লালের আধিপত্য চলিবে, সেটাকে আমরা সহিতে পারিব না।—কবি এবং আর্টিষ্টের পক্ষে সেটা ত মহা দুর্দ্দিন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

—

জাপানীদের আর্য্যামির ঝোঁক—

একজন জাপানীকে যে একশত জন হিন্দু-ইউরোপীয়ের মধ্য হইতে অনায়াসে বাছিয়া বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তার কারণ তার উঁচু চোয়ালের হাড় বা খাঁদা নাকটি তত নয়, যত তার মিট্‌মিটে টানা তেরছা চোখদুটি। আর্য্যদের মধ্যেও চ্যাপ্টা-নাকওয়ালা লোক অগুন্‌তি দেখিতে পাওয়া যায়; উঁচু চোয়ালও যে মোটেই মেলে না তা নয়; কিন্তু সারাক্ষণ ঘুমে জড়াইয়া আসা মতন ঢলুঢলু চোখের ভাব আর তাদের নাকের কাছ হইতে সোজাসুজি কানের দিকে চলিয়া না গিয়া বাঁকিয়া কপালের দিকে ঠেলিয়া ওঠার রকমটা নিতান্তই মোঙ্গল পীতজাতিদের একচেটে সম্পত্তি।

দুনিয়ার সঙ্গে কারবারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চোখদুটার বিশেষ একটু ভঙ্গির জন্য সর্ব্বত্র এশিয়াবাসী বলিয়া ধরা পড়িয়া যাওয়ার অসুবিধা জাপানকে খুব বেশী করিয়াই ভুগিতে হইয়াছে। সেইজন্য অন্যজাতিদের সঙ্গে জাপানীদের এই আকৃতিগত বৈষম্য কোনও উপায়ে দূর করিয়া দিয়া চেহারায় তাদের আর্য্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেদেশে বৈজ্ঞানিকেরা কিছুদিন হইতে করিতেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সুফল ফলিয়াছে। জনকতক ইউরোপীয়, এবং চীনা পুরুষ, দশজন জাপানী পুরুষ আর পাঁচজন স্ত্রীলোক লইয়া ডাঃ কুদো যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন তার ফলে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন প্রবাসীর পাঠকদের জন্য আমরা তুলিয়া দিতেছি।

জাতিতে জাতিতে চেহারার যে পার্থক্য তার সঙ্গে মানুষের মুখের অতকগুলি মাংসপেশীর যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে সেটা একটুও নূতন খবর নয়। এই মাংসপেশী কাঁধ হইতে ঘাড় বাহিয়া বরাবর উঠিয়া সমস্ত মুখমণ্ডল ছাইয়া চিবুকে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

চোখের চারিদিকে যে মোটা শক্ত মাংসপেশী জড়াইয়া থাকিয়া চোখের পাতার নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, ভালো নামের অভাবে তাকে আমরা মণ্ডল-বেড় অক্ষিপেশী (orbicular oculis) বলিতে পারি। সমস্ত পীতজাতির লোকদের বেলায় এই পেশী অপেক্ষাকৃত একটু অধিক পরিণত। চোখের কোন্‌দিকে উহা কতটুকু চওড়া তার অনুপাতই হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মুখের আকৃতিবৈচিত্র্যের গোড়া। পীতজাতিদের বেলা এই পেশী চোখের বাইরের দিকে সবচেয়ে বেশী চওড়া, উপরে হইতে নীচে বেশী চওড়া। কাফ্রিদের বেলাতে চোখের উপর-পাতার পেশী নীচের পাতার পেশীর চেয়ে মোটা এবং তার জোরও অনেক বেশী। হিন্দু-ইউরোপীয়দের বেলায় এই পেশী চোখের চারিদিকেই সমান পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পীতজাতিদের চোখের নীচের পাতাটাই নড়াচড়ার কাজ বেশী করিয়া করে, নিগ্রোদের উপর-পাতাটা কেজো হয় বেশী, আর্য্যদের চোখের দুটা পাতাই কাজেরই হোক আর অকাজেরই হোক একই-রকমের হইয়া থাকে। কোনো একজন জাপানীর চোখে অস্ত্র করিয়া এই মণ্ডলবেড় অক্ষিপেশীর প্রশস্ততার অনুপাতটাকে সব দিকে সমান করিয়া দিতে পারিলেই তাকে স্বচ্ছন্দে ইউরোপীয় বলিয়া চালাইয়া দিতে পারা যাইবে। ডাক্তার কুদোর মতে আর্য্য জাতীয়দের চোখের সঙ্গে বানরের চোখের যে-রকম আশ্চর্য্য মিল এমন পীত কাফ্রি প্রভৃতি কোনো জাতিরই নয়।—এর মানে অন্-আর্য্যেরা আর্য্যদের চেয়ে বয়সে বড়। কথা হইতেছে তাঁদের বয়ঃক্রম তাঁদের

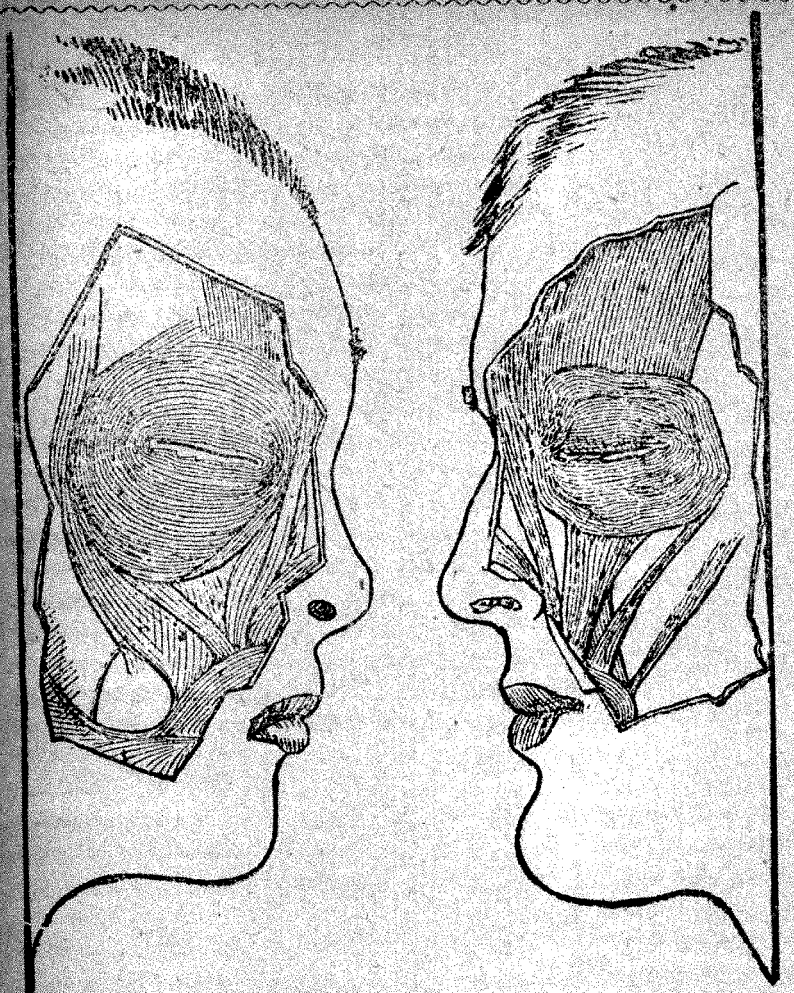

মোঙ্গল জাতীয় লোকের অক্ষিপেশী। আর্য্যজাতীয় লোকের অক্ষিপেশী।

উন্নত করিয়াছে, না অধোগতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে? ইহার জবাবে কুদো কি বলিবেন তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

—

মেঘ-সমুদ্রের সব্‌মেরিন—

মানুষ মনে করিয়াছে সম্মুখে পশ্চাতে উপরে ও নীচে কোনো দিকে কোন বাধা রাখিবে না। পাখীর মতো বাতাসে পাখা মেলিয়াই সে তৃপ্ত নহে, তার মন বায়ুমণ্ডলেরও সীমানা ছাড়াইয়া সুদূরের নক্ষত্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ এই বাতাসের ঘেরটার মধ্যেই খুব উঁচুর স্তরগুলিতে সে ভাসিয়া বেড়াইবে ভাবিতেছে। আমরা নিজেদেরকে প্রাচীন পরিপক্ক বিজ্ঞ বলিয়া গর্ব্ব করি। কিন্তু মাটি মায়ের বুক ঘেঁসিয়া পড়িয়া থাকিতে মন উঠিতেছে না এই কমবয়সী কাঁচা দুরন্তদেরই আগে দেখিতেছি।

আব্‌হাওয়ার নিরীখ্ লইবার ছোট ছোট বেলুন উড়াইয়া জানিতে পারা গেছে যে মাটির উপরে কয়েক মাইল উঁচুতে, যেখানটা বায়ুমণ্ডলের একেবারে শেষসীমা—কিন্তু তারও ওপরের দাহ্য বায়ব-মণ্ডলের যেখানে আরম্ভ হয় নাই এমনই একটা মাঝামাঝি জায়গায় অবিরাম বায়ুপ্রবাহ পশ্চিম হইতে পূবে ভীষণবেগে বহিয়া চলিয়াছে। একবার সেইখানে গিয়া পড়িতে পারিলে সেই বাতাসের স্রোতকে কাজে খাটাইয়া মানুষ খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে ঘণ্টায় কয়েকশত মাইল ছুটিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থ হইবে। সেই অজানার রাজ্যের সমস্ত রহস্য নবীন মানুষের কৌতূহলকে নাড়া দিয়া সজাগ করিতেছে, তার মনকে ডাক দিতেছে। সেখানে কত রকমের স্তর, কত রহস্যভরা বাষ্পান্তরাল, তারা মানুষের এত কাছে অথচ মানুষ তাদের সম্বন্ধে কিছু জানে না। এমনি সাংসারিক হিসাবে লাভ এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এই দুইদিক্ হইতেই ডাক আসিতেছে, কিন্তু সকলের পিছনে কেবল যে উঠিবার এবং পড়িবার অকারণ উদ্দীপনা সেটাও একটা বড় কথা।

ইহারই মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে; মেজর আর্ ডব্লিউ শ্রোডার ৩৬০০০ ফুট উঁচু পর্য্যন্ত উঠিয়াও কেবল অক্সিজেনের পুঁজি ফুরাইয়া যাওয়াতে তড়িঘড়ি নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। এত দ্রুত তাঁহাকে নামিতে হইয়াছিল যে আরেকটু হইলেই গুঁড়াইয়া গিয়াছিলেন আর কি। এবার তিনি যে নূতন কল তৈয়ার করিতেছেন তাতে করিয়া ৫০,০০০ ফুট উঁচু পর্য্যন্ত বাতাস ঠেলিয়া ওঠা সম্ভব হইবে। লুই ব্রেগুয়ে নামক একজন ফরাসিস্ উড়োকলের কারিকর এমন একটি কল তৈরির কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছেন যার সাহায্যে একলক্ষ ফুট বা প্রায় উনিশ মাইল উঁচুতে ওঠাও কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহাও খুব অল্পদিনের মধ্যেই নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে। এই উড়োকলগুলোর নির্ম্মাণের বিশেষত্ব হইবে এইটুকু যে এগুলোতে একএকটি করিয়া ফাঁক-বোজানো ঘরে চাপবাঁধা হাওয়া, অক্সিজেন এবং উত্তাপের বন্দোবস্ত থাকিবে; উহাতে আব্‌হাওয়ার নানারকম থামখেয়ালীর মধ্যে সেইঘরে বসিয়া নিরুপদ্রবে কল চালানোর সুবিধা হইবে। দাঁড়গুলোর ঘুরিবার গতিবেগকে বাতাসের ঘনতার সঙ্গে মিলাইয়া নিয়মিত করিয়া এই কলের সাহায্যে মেঘমুলুকের ওপারে পাড়ি জমাইতে পারা যাইবে।

স. চ.

—

পোষা গরিলা—

গরিলার ন্যায় হিংস্রপ্রকৃতির জন্তু যে কখনও গৃহপালিত পশুর ন্যায় পোষ মানিতে পারে সে কথা বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। একজন ইংরেজ মহিলার একটি শিশু-গরিলা আছে। তার নাম "জন"। সে বালকবালিকাদের যেমন ভালবাসে, বালকবালিকাগণও তাহাকে তেমনি ভালবাসে। "জন" তাহারপু কর্ত্রীর জুতার ফিতা লিয়া দেয়

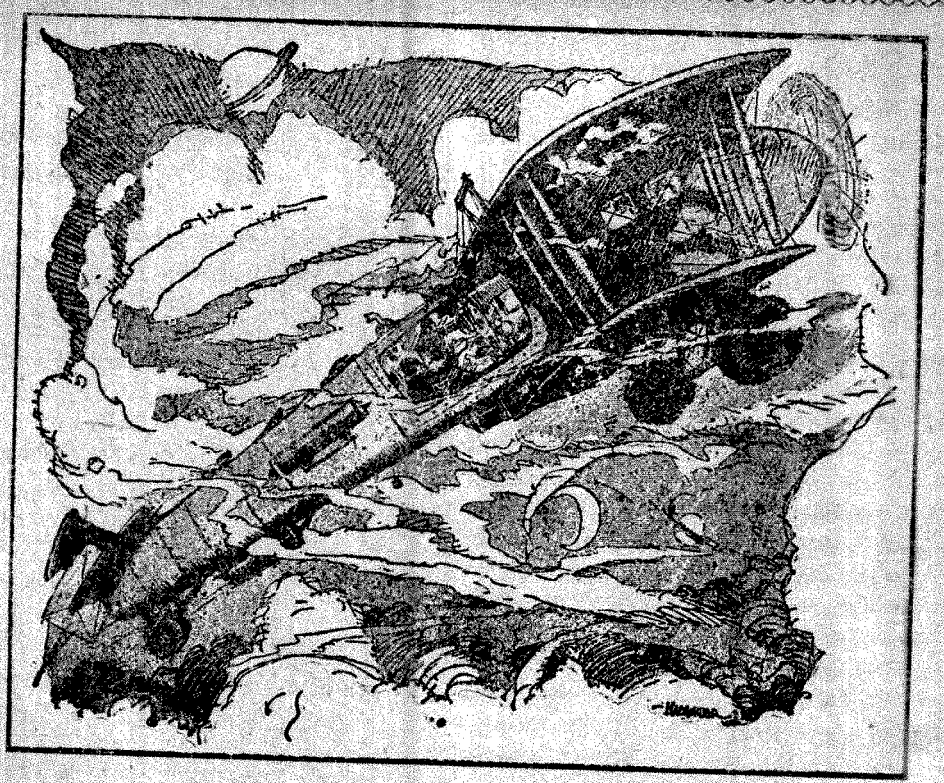

মেঘসমুদ্রের সব্‌মেরিন্।

সে ভদ্রলোকের মত আচার-ব্যবহার শিখিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র গরিলা এইরূপ পোষ মানিয়াছে।

—

চারা রোপণ করিবার কল—

আমেরিকায় বেলেডনার চারা রোপণ করিবার একপ্রকার কল তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতে এক মিনিটে ৬০টি করিয়া চারা রোপণ করা যাইতেছে। ইহাতে পরিশ্রমেরও লাঘব হয় ও অল্প লোকেরও দরকার হয়। আমাদের দেশে যদি ঐরূপ কল কপি প্রভৃতির চারা লাগাইবার জন্য ব্যবহার করা হয় তবে দেশের কত উন্নতি হয়। (Journal of Heredity, Jan. 1919)

—

দীর্ঘায়ু—

কলোরেডো ষ্টেটে ডেনভার সহরে জোসেফাইন প্রেস্টন নামে একটি শিশুবালিকা আছে। তাহার মাতা জীবিতা, তাহার পিতামহী ও মাতামহী জীবিতা। জোসেফাইনের পিতার পিতামহী ও মাতামহী জীবিতা আছেন। এরূপ কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন ? (Journal of Heredity, March, 1919)

—

মুরগী—

আমেরিকায় মুরগীর ডিম পাড়ার প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে ওয়াশিংটনের ট্যাকার্ড সাহেবের মুরগী প্রথম প্রাইজ পায়। সেই মুরগী ৩৬৫ দিনে ৩১১টা ডিম পাড়িয়াছিল। (Journal of Heredity, Oct, 1919)

—

যমজপ্রসবিনী ও ৪১টি সন্তানের জননী—

আমেরিকায় মিসেস ডব্লিউ জি সি নামে একজন মহিলা আছেন, তিনি তিনবার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ঐ রমণীর মাতার ও মাতামহীর উভয়েরই একবার যমজ, একবার তিনটি সন্তান একসঙ্গে, আর একবার চারিটি সন্তান একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়। এই রমণীটি প্রথমবার মিঃ এমকে বিবাহ করিলে তাঁহাদের দুইটি (যমজ) সন্তান হয়। প্রথম স্বামী বিবাহের ১৪ মাস পরেই মারা যান। দুই বৎসর পরে তিনি মিঃ টি আর-কে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর তাঁহাদের প্রথমে দুইটি (যমজ) কন্যা হয়; তাহার পর তিনটি সন্তান একসঙ্গে হয়। এই তিনটি সন্তানই কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে মারা যায়। ইহার দুই বছর পরে আবার দুই (যমজ) সন্তান হয়, পরের বছরে আবার দুই (যমজ) সন্তান হয়। এই সময়ে রমণীটির দ্বিতীয় স্বামী মারা যান। এইবার তিনি মিঃ ডব্লিউ জি সিকে বিবাহ করেন। এবারও তাঁহার প্রথমে দুই (যমজ) সন্তান হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে একসঙ্গে তিনটি (১+২), তিনটি, দুইটি, চারিটি, দুইটি, তিনটি, চারিটি, চারিটি, তিনটি সন্তান হয়। ঐ রমণীটি তিনবার বিবাহ করিয়া ১৫ বার প্রসব করেন। এই পনের বারে ৪১টি সন্তান হয়। দুইটি তিনটি, চারিটি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া মাতার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার ১৫ বার প্রসবের মধ্যে একবারও কেবল একটি সন্তান হয় নাই, প্রত্যেকবারই দুইটি, তিনটি কিংবা চারিটি করিয়া সন্তান হইয়াছে। তাঁহার তিন স্বামীর পূর্ব্বপুরুষে কখনও যে কাহারও যমজ সন্তান হইয়াছিল এরূপ সংবাদ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। (Journal of Heredity, Nov. 1979. Davenport : A Strain Producing Multiple Births.)

শ্রীসুষমা সিংহ।

—

জ্যামিতির রেখা ও বিন্দু আঁকা কি অসম্ভব ?—

আমরা সেই বাল্যকাল হইতেই পড়িয়া আসিতেছি, "জ্যামিতিক বিন্দুর অবস্থান আছে, কিন্তু আয়তন নাই। জ্যামিতিক রেখার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নাই।" আর শিক্ষকরাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দিতেন যে এরূপ বিন্দু ও রেখা আঁকা যায় না। কারণ, আমরা যতই ক্ষুদ্র বিন্দু আঁকি না কেন, তার কিছু-না-কিছু আয়তন আছে ; আর রেখা যতই সরু হোক্ না কেন তার কিছু-না-কিছু প্রস্থ আছেই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে জ্যামিতিক বিন্দু ও রেখা আঁকা কি অসম্ভব ?—কখনই না।

মিঃ রেণ্ডেস জ্যামিতিক বিন্দু ও রেখা আঁকিবার এক সহজ উপায় "English Mechanics"এ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে,—আচ্ছা, আমি যদি এই কাগজখানার ঠিক্ অর্দ্ধাংশ নীল রঙে রঞ্জিত করি, তবে নীল ও সাদা রঙের সন্ধি-রেখার প্রস্থ কি ?—কিছুই না। আর যদি একখানা কাগজের চতুর্থাংশ নীল, চতুর্থাংশ সবুজ, আর চতুর্থাংশ পীত বর্ণে রঞ্জিত করি, তবে যে বিন্দুতে নীল, সবুজ, পীত ও সাদা রঙ্ মিলিত হইয়াছে, তার আয়তন কি ?—কিছুই না। সুতরাং এই উপায়ে অতি সহজে জ্যামিতিক রেখা ও বিন্দু আঁকা যাইতে পারে।

ক।

চিরন্তনী

(৯)

দিন কাটিতে লাগিল। অবিনাশের আসা-যাওয়া দ্রুততালে চলিতে লাগিল, করুণার লুকোচুরি কিন্তু সেইসঙ্গে কমিয়া যাইতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যায় আসিলে করুণা ইতিমধ্যে অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় অবিনাশ অনেক দিন কাজ কামাই করিয়া ইস্কুলের গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গেই মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত। ঘরের জিনিসপত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া থাকিত, অবিনাশের চোখে সে-সব পড়িতে দিতে করুণার লজ্জা হইত, কাজের ভিড়ে অতিথির মর্য্যাদা রাখিয়া কথা বলিবার অবসর পাইত না বলিয়া করুণা সঙ্কুচিত হইত, অবিনাশের চোখে তাদের এইসব অস্বচ্ছন্দতার ভাব যে ধরা পড়িত না তা নয়, কিন্তু সে দেখিয়াও দেখিত না। "কাজকর্ম্ম সেরে নাও, আমি বস্‌ছি" বলিয়া সে পাহারার মত সেইখানে শক্ত হইয়া বসিয়া পড়িত। কাজের শেষে অবিনাশের ইচ্ছামত কোনো দিন হাওয়া খাইতে, কোনো দিন বা বায়োস্কোপ দেখিতে যাইতে হইত। করুণার অনবসর-জীবনে সন্ধ্যাটুকুই ছিল অবসর। কিন্তু সেই অবসরটা নিত্য একজনকে এমন করিয়া গ্রাস করিয়া লইতে সে সহজে দিতে পারিতেছিল না। অবিনাশ জোর করিয়া যেটা গ্রাস করিয়া লইতেছিল, লোকের চোখে যে সেটা অবিনাশের অধিকার বলিয়া দাঁড়াইতেছিল এটা করুণা বেশ বুঝিত ; কিন্তু সেই অধিকার স্বীকার করাটাতেই ছিল তাহার আপত্তি।

ছুটির দিনে সকালে দুপুরে করুণা অবিনাশের অধিকার অস্বীকার করার পতাকার মত কোনো-রকমে সব বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী ঘুরিয়া আসিত, তাহারা ঠাট্টার ইঙ্গিত করিলে নিজেও তাহার সঙ্গে এমন ভাবে যোগ দিত যে সত্যের আভাসটুকুও তাহার আঘাতে উড়িয়া যাইত। করুণাকে যোগ দিতে দেখিয়া সঙ্গিনীরা ঘা দিবার স্থান খুঁজিয়া পাইত না। অগত্যা মুখে তাদের থামিতে হইত, কিন্তু মন আরো কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

শতদলের কোণের ঘরে করুণার যে একটি শান্ত স্নিগ্ধ নীড় বাঁধিয়া উঠিতেছিল, ক্রুদ্ধ ঝড়ের মত অবিনাশ যখন-তখন তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহার সমস্ত আরাম সমস্ত সৌন্দর্য্য লণ্ডভণ্ড করিয়া দিত। দুটি সখীর যে প্রণয় গোপন ছায়ায় মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছিল, ছায়াঢাকা স্মৃতি-পটই ছিল যাহার মূল সূত্র, অবিনাশের রুদ্র তেজে তা ম্লান হইয়া যাইত। শতদলের ঘরে দুই সখীর আলাপের মধুর গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে যে নিশ্চিন্ত আরাম, যে শান্ত সুখ আর স্নিগ্ধ প্রীতির আভাস পাওয়া যাইত, অবিনাশের তা কিছুতেই সহ্য হইত না। নিতান্ত অসময়ে শতদলের ঈর্ষ্যায় পীড়িত অবিনাশ কতদিন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে না হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোণের ঘরটায় ঘুরিয়া যাইত, যেদিন দেখিত শতদল একলা বসিয়া তাহার গতজীবনের স্বপ্নটা জাগাইয়া তুলিবার নানা ক্ষুদ্র চেষ্টা করিতেছে, সেদিন সে খুসী হইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত, যেদিন দেখিত শতদল ঘরে নাই সেদিন তাহাকে কল্পনায় করুণার ভাড়াটে বাড়ীর পায়রার খোপে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিত, আর যেদিন

দেখিত দুই সখী হাসি-অশ্রুর বিনিময়ে মগ্ন সেদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাদের শান্ত আলাপকে চকিত করিয়া একটা কিছু অশোভন পরিণামে শতদলের চোখে জল আনিয়া আর করুণার মনে ঘা দিয়া শেষে সবকিছুর উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইত। নিজের উপরও তাহার রাগ হইত, কেন সে মূর্খের মত অকারণে ঝড় তুলিয়া যাহাকে খুসী করিতে চায় তাহাকেই অখুসী করিয়া আসে? কিন্তু উপায় যে ছিল না, অবিনাশের আগ্রহকে উপেক্ষা করিয়া করুণা অন্য কারুর সঙ্গে নিশ্চিন্ত সুখ উপভোগ করিতেছে দেখিলেই, জলদ হইলেও মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যেমন মুহূর্ত্তে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠে, অবিনাশের সমস্ত আগ্রহ তেমনি আগুন হইয়া উঠিত, সে আগুনে সে দুজনকেই ঝল্‌সাইতে চাহিত; কিন্তু রাগের বোঝা নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিবার পর ব্যর্থ অনুতাপ জাগিয়া উঠিত।

দোতলার যে মিমেণ্টের বারাণ্ডার টবের বাগান করুণা স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহার অনেক সরঞ্জামের দরকার ছিল, কিন্তু কিনিয়া আনিবার মত পয়সা ছিল না। অবিনাশ সে-সব ক্রটি মার্জ্জনা করিতে পারিত না, যখন-তখনই সে বলিত, "টবে গাছ বসিয়েছ কেন, গোলাপ-গাছের টব ছোট কেন, কলমের গাছ ভাল, তাই আন্‌লেই ত পার"—ইত্যাদি. করুণা প্রথম প্রথম সত্য কথা ঢাকিবার চেষ্টায় "যেমন ঘর, তেমনি বাগান; দেড়হাত বাগানের পিছনে অত খাটে কে," এই-সব নানা বাজে কথায় অবিনাশের প্রশ্ন চাপা দিত। কিন্তু মানুষের মনের কোন্ সূক্ষ্ম তারে কখন কেন ঘা লাগে অবিনাশ তা বড় বুঝিত না। অনেক বিষয়েই তাহার মন ভোঁতা ছিল। তাই সে করুণার বলিবার অনিচ্ছাটা ধরিতে না পারিয়া আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া অন্য আকারে সেই একই প্রশ্ন করিত। করুণা একদিন বলিয়া বসিল, "দেখ্‌তেই ত পান, আমার কি অত টাকা আছে যে সখের খরচ করব?"

পরদিনই অবিনাশ গোটাদশ নানা রকমের ছোট বড় বিলাতি টব, নূতন নূতন গাছের চারা কলম লোক দিয়া করুণার বাড়ী পাঠাইয়া দিল। পরের বাড়ীর চাকরের কাছে করুণা কোনো উচ্চবাচ্য করিবে কি বলিয়া? সেগুলো বিরক্ত মনেই রাখিতে হইল। অবিনাশ আসিলে একবার-গ্রহণ-করা জিনিস ফিরাইয়া দিতে পারিল না. অথচ জিনিস রাখিয়া দাতাকে তিরস্কার করাও ভদ্রতাসঙ্গত মনে হয় না। অল্প স্বল্প অসন্তোষ দেখানোর উপর দিয়াই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে হইল। কিন্তু অবিনাশ একবার পথ খোলা পাইয়া যখন-তখন নানা উপহার পাঠাইতে আরম্ভ করিল। আশে-পাশের লোকের দৃষ্টি কৌতূহলে ঈর্ষ্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। অবিনাশের উপহারের গন্ধ পাইলেই শৈলজা ছুটিয়া আসিয়া বলিত, "দেখি, দেখি, করুণার মনোমোহন আজ কি দিয়ে মন ভোলালেন?"

সুধার মা, বীণার মাসি মনে মনে জলিয়া মুখে একগাল হাসি হাসিয়া করুণার পিঠে হাত দিয়া বলিতেন, "আহা কি, আমাদের করুণা-মা আমাদের মত গরীব ঘ-মাসিকে ফেলে রাজার ঘরে রাণী হতে চল্‌লেন।"

করুণা অস্বীকার করিত, আপত্তি জানাইত, কিন্তু সে-গুলোর বিরুদ্ধে এত প্রমাণ থাকিতে সে-সব অপত্তি তেমন জোর পাইত না। অগত্যা তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত; নিজের মনের সমস্ত গোপন কথা বাহিরের দশের কাছে খুলিয়া ধরিতে মানুষের স্বাভাবিক সঙ্কোচই আছে, কাজেই অবিনাশের আগ্রহ আর নিজের মনের দ্বিধার কথা পরকে খুলিয়া বলা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; তা ছাড়া সাধারণ দশজন, অন্য মানুষের মনের হাজার-রকম ছোট বড় দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করিয়া দেখেও না, দেখাইলেও বোঝে না। তাহারা চায় এক কথার উত্তর 'হাঁ' কি 'না'। কাজেই মিথ্যার শরণে কষ্ট পাইলেও করুণা অহরিথ্য যখন তখন বলিতে বাধ্য হইত। সে বলিত, 'অবিনাশ-বাবু দাদা-মশায়ের অনেককালের বন্ধু, দাদামশায় কোন্‌কালে ওঁর কি উপকার করেছিলেন, তা উনি আজও ভোলেন নি। উনি যখন বিলেত যান, তখন আমি শৈলজার কোলের চেয়েও ছোট, আমার ভাল করে মনেই পড়ে না। তাই জন্যে এখন মিশ্‌তে সঙ্কোচ হলেও উনি আমাদের পুরানো বন্ধু; পরের মত ব্যবহার ওঁর সঙ্গে করা চলে না" টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া এই-সব কথা সে সকলকে শুনাইত, একটা কথার বেশী একবারে বলিতে মুখে বাধিত, কান লাল হইয়া উঠিত, কিন্তু তবু বলিতে হইত। মনকে প্রবোধ দিত এই বলিয়া যে কথাগুলো সবই সত্য। কিন্তু দিলে কি হয়,

কথাগুলার আড়ালে অব্যক্ত আর-একটা যে কথা থাকিত সেটা কি একেবারে খাঁটি সত্য? ওইখানেই করুণার খট্‌কা লাগিত।

প্রথম করুণাকে দেখিয়াই অবিনাশের মন তাহার জন্য একটা স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল। করুণা তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ঠেকিল, তাহার উপর সে সহজে অবিনাশকে আমল দিতেও চাহিতেছিল না, সেইজন্যই করুণাকে জয় করিবার আগ্রহটা অবিনাশের বাড়িয়া উঠিতেছিল। অল্প বয়স হইতেই নানা কারণে তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল যে তাহার আশেপাশের মানুষগুলো তাহার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় কেবল লাভের আশায়। লোভীকে সে সহ্য করিতে পারিত না, কারণ তাহার নিজের অজ্ঞাতে তাহার মনটা প্রেমের জন্য বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ সকলকে দূরে ঠেলিয়া ফেলাতে সেই প্রেমকেও তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে হইয়াছিল।

তাহার পরিচিত লোভের লোলুপ মূর্ত্তিটাকে করুণার মধ্যে খুঁজিয়া না পাওয়াতে অবিনাশের উৎসুক মনটা আরও ঝুঁকিয়া পড়িল, অথচ যে অমূল্য জিনিসটাকে সে চাহিতেছিল, লোভের সাহায্যেই সে সেটাকে তাড়াতাড়ি কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতদিন পরে তাহার ঈপ্সিতের মূর্ত্তি একজনের মধ্যে দেখিয়া সেটাকে না পাইবার ভয়ে, আর, কোনোরকমে ধরিয়া ফেলিবার আগ্রহে, অজ্ঞের মধ্যে যেটাকে সে ঘৃণা করিত নিজে সেই উপায়টাই আশুফলপ্রদ বলিয়া বরণ করিয়া লইল।

অবিনাশের একটা বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল জয়ের। অল্প বয়সে যখন সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, অনেক দুঃখ সহিয়া যখন সে তাহার শিশু ভাইটিকে বড় করিয়া তুলিতেছিল, তখন তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল ওই জয়ের আনন্দ। সে যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, এইটা সকলকে দেখাইতে পারিয়া তাহার অহঙ্কার তৃপ্ত হইয়াছিল, তাহার দুঃখ সার্থক হইয়াছিল। ছাত্র অবস্থায় জয়গর্ব্বই তাকে সৌভাগ্য-ভূষিত করিয়াছিল, কর্ম্মক্ষেত্রেও জয়ের আশাতেই অক্লান্ত পরিশ্রম আর অতন্দ্র মনোযোগের সাহায্যে সে ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করিয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মীকে যে উপায়ে পাইয়াছিল, গৃহলক্ষ্মীকেও সেই উপায়েই ঘরে আনিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু ভাগ্যগুণে যেখানে সে গিয়া পড়িল সেই মুরলা-বিজলীর মেলায় তাহার মনের মতন জিনিস মিলিল না।

অবিনাশ চাহিয়াছিল অম্বা-অম্বালিকার স্বয়ম্বর-সভায় ভীষ্মের মত পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে ঘৃণাভরে চাহিয়া সে জয়শ্রীর সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রী হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীও ত উপযুক্ত হওয়া চাই। যাহাকে হার মানাইয়া কৃতিত্ব নাই তাহাকে হার মানাইতে কে চায়? কিন্তু যে গণ্ডীর মধ্যে অবিনাশ গিয়া পড়িয়াছিল সেখানে অকৃতীরাই যাচক; প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে তারাই। যাহাদের ধন মান মর্য্যাদা নাই তাহারাই যাচিয়া ফিরে, তাহাদের পিছনে ফেলিয়া সুন্দরীদের বরমাল্য লুটিয়া লওয়া কিছু শক্ত নয়। কিন্তু যাহারা কৃতী তাহারা সাধনা করিতে চায় না, সাধনার ধন হইতে চায়, কাজেই বরমাল্য অনেক সময় সাধিয়া তাহাদের গলায় পড়ে। অবিনাশ তাই নূতন রকম জয়ের পথ খুঁজিয়া বাহির করিল; সে মৌমাছির মত উড়িয়া উড়িয়া অনেক ঘুরিল, কিন্তু কোথাও ধরা দিল না। শেষকালে যেখানে আপনি ধরা পড়িল, সেখানে জয়লাভের উপায়ও সহজ দেখিল। যেখানে মাল্য তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল, সেখান হইতে সরিয়া সে সকলকে দেখাইয়া করুণাকে সকল ঐশ্বর্য্যশালিনীর উপরে তুলিয়া ধরিতে চাহিল। বৈরাগ্যের গর্ব্বে মানুষ যেমন অনেক সময় সব ছাড়িয়া তাহার বৈরাগ্যটাই হীরার মুকুটের মত মাথায় তুলিয়া দেখাইয়া বেড়ায়, আর ভোগীকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে, অবিনাশ চাহিতেছিল তেমনি করিয়া ভাগ্যবতীদের অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলিয়া ভাগ্যহীনাকে জয়-পতাকার মত সমস্ত দৃষ্টির কেন্দ্র করিয়া তুলিতে।

ছুটির দিনে করুণা যে ছুটিটুকু পাইত ক্রমে তাহাও দুর্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল। ছুট পড়িলেই অবিনাশের নিমন্ত্রণের ঘটা পড়িয়া যাইত। সে নিমন্ত্রণ নিরালায় নয়। হীরা-জহরতে সাজিয়া সুন্দরীর দল যেখানে আসর জমকাইতেন, হ্যাট কোট বুটে কালো অঙ্গ সাজাইয়া যেখানে বাঙালী-সাহেবেরা বিলাতী সাহেবদের মত হাঁটিবার চলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন, যেখানে বিদেশী ঐশ্বর্য্যের হাওয়া পিয়ানোয়, গানে, আহারে বিহারে

দাসজাতির মন অনুক্ষণ লুব্ধ করিত, সেই-সব আড়ম্বরের মধ্যে অবিনাশ করুণাকে সুবিধা পাইলেই টানিয়া লইয়া যাইত। এই-সব মোহ কাটাইয়া উঠা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। করুণা ভাবিয়া দেখিলে যে এসব খুব পছন্দ করিত তা নয়, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের মেলার মধ্যের এত উচ্চ আসন সে অনায়াসে ঠেলিয়া আসিতে পারিত না। মোহ তাহার মনকে জড়াইয়া ধরিত। তাহার বঞ্চিত ভাইবোনগুলি হঠাৎ-পাওয়া এই-সব অযাচিত আনন্দে অধীর হইয়া উঠিত, বৃদ্ধ তারিণীকান্তের ছেঁড়া দর্শনের বইও দুঃখের সংসারে হাসি দেখিবার আশায় হাসিয়া উঠিত। আপাতদৃষ্টিতে যাহার মূল্য খুব বেশী, তাহার কাছেও নিজের মূল্য কম নয় দেখিয়া করুণার মনও একটু গর্ব্ব অনুভব করিত।

শীতের দিনে নিজের জীর্ণ ছেঁড়া শালখানি লইয়া বাহিরের হাওয়ার তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে অজ্ঞ করুণা ষ্টীমার পার্টি, গার্ডেন পার্টিতে ঘুরিতে যাইত। দলের অন্যান্য নিমন্ত্রিতাদের [illegible] দোশালার অভাব ছিল না, কিন্তু শীতকে স্বীকার করা [illegible]র লক্ষণ বলিয়া শীতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আয়োজন করিতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করিতেন। হাতকাটা কিংখাবের জামার উপর চৌকো রুমালের মত ছোট শাল-খানি গায়ে দিয়া মুরলা হস্ত যখন শীতে কাঁপিত, ভারী জোড়া শাল গায়ে দিয়া নিষ্ঠুরের মত হাসিয়া অবিনাশ তখন মেয়েদের গায়ের রক্তের জোর সম্বন্ধে ডাক্তারী শাস্ত্রে কিছু বলে কি না তাহারই আলোচনা করিত আর শীতের বাতাসে ঢাকাই মস্‌লিনের পোষাকে বিজলীকে কেমন সুন্দর দেখায় সেই সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ছবি আঁকিত। অবিনাশের এই-সব বিদ্রূপ করুণার ভাল না লাগিলেও শুনিতে হইত; কিন্তু শুধু শোনার উপর দিয়াই ব্যাপারটা যাইত না; মুরলা-বিজলীকে ঠাট্টা করিয়াই অবিনাশ কতদিন করুণার শীতার্ত্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের চোখের সাম্‌নে নিজের গায়ের শাল খুলিয়া তাহার গায়ে চাপাইয়া দিত।

যে কারণে অন্যকে সে উপহাস করিল সেই একই কারণ ধরিয়া করুণার উপর আকর্ষণ দেখানোতে করুণা সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিত। অবিনাশ অতগুলা হিংসাদীপ্ত ও ক্রূরবিদ্রূপমাখা চক্ষুর সাম্‌নে যে তাহার মত নগণ্যকে নিজের গায়ের দামী শালখানা যেন সকলকে দেখাইয়া অসঙ্কোচে আগাইয়া দিল, তাহাতে করুণার মনে জয়ের একটা গর্ব্ব ক্ষণিকের জন্য জাগিয়া উঠিলেও, লোক-চক্ষে তাহার এ লৌকিক সম্মানটা ধরা পড়িবার সুযোগটা করিয়া দিতে একটু ব্যথা লাগিলেও সে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহার ভয় হইত বুঝিবা ওই গ্রহণ করার সঙ্গে আরও অনেকখানি গ্রহণকরাকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নিজেকে বিচার করিয়া না দেখিয়া কোনো কাজ করিতে হাত তাহার কোনো দিনই উঠিত না। মনের ওই খুঁটকাটুকুই তাহাকে দ্রুত কোনো দিকে অগ্রসর হইতে দিত না, ভাল মন্দ সব প্রলোভন হইতে ঠেকাইয়া রাখিত।

জীবজগতে যে যত নীচের স্তরে থাকে তাহার মনে সুখ-দুঃখ, শোক-আনন্দ, সংগ্রাম-দ্বন্দ্বের কারণ আর হীন ততই পরিষ্কার, তাহার আদর্শও বোধ হয় ততই কাটা-ছাঁটা নিরেট একটা চাপের মত। যে যত উপরে উঠে তাহার জীবন তত জটিল হইয়া পড়ে, সুখে দুঃখে শোকে আনন্দে তত জট পাকাইয়া যায়, কোন্ বেদনার সঙ্গে কোন্ আনন্দ যে জড়াইয়া থাকে, তা সে নিজেই টের পায় না। যে মানুষের মন যত জাগ্রত, যাহার চিন্তা যত অন্তর্মুখীন, তাহার সুখদুঃখ-ভালমন্দ-বোধ ততই প্রতি আঘাতে নিক্তির কাঁটার মত এদিক হইতে ওদিকে দুলিতে থাকে, একটা মোটামুটি বোঝাপড়া করা তাহার পক্ষে তত শক্ত। যে একটা ঘটনায় সাধারণ মানুষ কেবল নিছক সুখ কি দুঃখ দেখিবে, নির্ম্মল দর্পণের মত এই-সব মার্জ্জিত মানুষের মন সেখানে এক নিমেষের মধ্যেই অসংখ্য সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভ, শোক ও আনন্দের ছায়া দেখিবে। মৃত্যু তাহাদের কাছে বিপুল একটা অন্ধকার মাত্র নয়, জন্ম কেবল আশার আলো নয়। কাজেই এই-সব মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চিরকালব্যাপী, আর অতি জটিল। এই-রকম মানুষ কোনো-একটা জিনিসকে তাহার বর্ত্তমানরূপেই কেবল দেখে না, সকল-রকম সুদূরের সম্ভাবনার ছায়া যেন তাহার সঙ্গে-সঙ্গে পঙ্গপালের ঝাঁকের মত উড়িয়া আসে, সব ছায়ার সংখ্যা গোনে কাহার সাধ্য।

কর্ম্মবহুল হইলেও করুণার জীবনযাত্রা ছিল শান্ত

বৈচিত্র্য উন্মাদনা উত্তেজনা তাহাতে ছিল না। তাই জীবনের কোনো একটা নূতন পরিবর্ত্তনকে সে সহজে গ্রহণ করিতে পারিত না, তাহার অন্তর্মুখীন মন আগে মনের কোণে নিরালায় বসিয়া সেটা পরখ করিয়া দেখিতে চাহিত। কিন্তু সেই নিরালার আড়াল ভাঙিয়া দিয়া হঠাৎ ঝড়ের মত অবিনাশ তাহার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখের সাম্‌নে ঐশ্বর্য্যের জ্বলন্ত রূপ আনিয়া ধরিল, মনের সাম্‌নে উন্মত্ত নদীর বানের মত দুকূলভরা একটানা প্রেমের গান আর প্রণয়-নিবেদনের ছবি ফুটাইয়া তুলিল। একটি শান্ত ছন্দে করুণার জীবনগান যে এতদিন চলিতেছিল, আজ তাহার রূপ বদলাইয়া গেল। ভাবিবার অবসর ঘুচিয়া গেল, অথচ না ভাবিয়া স্রোতে গা ছাড়িয়া দিতে সে পারিতেছিল না।

বিয়োগ বিচ্ছেদ মানুষকে প্রিয়জনের মূল্য বুঝায়, বিরহ-ক্রন্দনের মাত্রা তাহার প্রেমের মূল্য বুঝাইয়া দেয়, অভাব অর্থের মর্য্যাদা বলিয়া দেয়। কিন্তু যাহার ঘরে মৃত্যুর ছায়া কোনো দিন পড়ে নাই, সে বুঝিতে পারে না মরণ তাহাকে কেমন করিয়া কাঁদাইবে। যাহার ভাণ্ডারে মণিমুক্তা গড়াগড়ি যায়, সে বুঝিবে কি করিয়া যে ধনে তার আসক্তি আছে কি না? ক্ষুধা জাগাইয়া দিয়া যে সরিয়া যায়, তাহাকে যে চাই তাহা ত আমার ক্ষুধাই বলিয়া দেয়; কিন্তু ক্ষুধা জাগিবার পূর্ব্ব হইতেই আহারপাত্র মুখের কাছে ধরিয়া রাখিলে, সে জাগিবে কি না ভাবিয়া দেখিবারও সুযোগ হয় না।

তাহার জীবনে অবিনাশের স্থান আছে কি না, দূরে সরিয়া গিয়া অবিনাশ সে কথা করুণাকে একবারও ভাবিয়া দেখিতে দিতেছিল না। গায়ের জোরে যে ঠাঁই সে দখল করিয়া রাখিয়াছিল, সে ঠাঁই তাহার অভাবে শূন্য পড়িয়া থাকিবে কি না সে কথা ভাবিয়া দেখিতে অবিনাশের দরকার হয় নাই, কিন্তু করুণার ছিল। প্রেমে যে ভিখারীর প্রতীক্ষা আছে তা তাহার ছিল না; যাহা সে চায়, তাহা নিজেই কাড়িয়া লইতে পারে, এই ছিল তাহার স্পর্দ্ধা ও বিশ্বাস; তাই সে কাড়িয়াই লইতেছিল। করুণা চাহিতেছিল ঠেকাইতে। সে যেন বলিতে চাহিতেছিল, "কতখানি তোমার বিবার আছে, দাঁড়াও দেখিয়া দি।" কিন্তু দাঁড়াইবার অবসর অবিনাশের ছিল না, তাই করুণা দেখিয়া লইবার সময় পাইতেছিল না।

একটুখানি অবসর মিলিয়া গেল। সাহারাণপুরের কোনো এক ধনবানের ঘরে চিকিৎসকরূপে অবিনাশের ডাক পড়িল। দিন কয়েকের জন্য তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। মাসখানেক ধরিয়া যে-রকম ভীড়ে তাহার দিনরাত্রিগুলা ঠাসা হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে একটুখানি ফাঁক পাইয়া করুণা যেন গা মেলিয়া বসিল। ঘরে বাহিরে নিজের বলিতে একটু সময় না পাইয়া সে উপরওয়ালার কাজের আর অবিনাশের প্রণয়-নিবেদনের চাপে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

(১০)

ইস্কুলের ছাত্রীদের একবোঝা খাতা দেখা শেষ করিয়া করুণা সবে উঠিয়াছে। সেদিন রবিবার। সবাই দিনটাকে নিঃশেষে উপভোগ করিবার আয়োজনে ব্যস্ত। কেবল পাশের বাড়ীর পরীক্ষার্থী ছাত্রটি একটানা পাঁচঘণ্টা পড়িয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, আপনার অজ্ঞাতেই গুনগুন করি[illegible] গাহিয়া উঠিতেছিল—"এস, এস, বসন্ত ধরাতলে

"ভাঙ, ভাঙ বন্ধনশৃঙ্খল; আন, আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা।"

একটা ফিরিওয়ালা, "কাপড়া চাই বাবা, কাপড়া-ওয়ালা," করিয়া একই গলিতে শতবার হাঁকিয়া বেড়াইতে-ছিল। অনেকদিন শতদলের সঙ্গে তেমন ভাল করিয়া দেখা হয় নাই বলিয়া করুণা আজ তাহার কাছে যাইবে ঠিক করিয়াছিল। আজ তাহাকে নিভৃতে পাওয়াও যাইবে, আর আজ যে সে শতদলের নাম করিয়া অবিনাশের বাড়ী যাইতেছে একথা বলিবারও কাহারও কারণ মিলিবে না, বিশেষতঃ অবিনাশের জেরায় পড়িয়া সে-বাড়ীতে যাওয়ার নানা সত্যমিথ্যা কারণ দেখাইতে হইবে না।

মানুষের মনে যখন যে কথাটা বড় হইয়া উঠে তাহার কথাবার্ত্তায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার সুর ধরা পড়ে। বিশেষতঃ কথা যদি এমন বন্ধুর সঙ্গে হয় যেখানে নিজেকে গোপন করিবার জন্য মনের কড়া পাহারার দরকার নাই, তাহা হইলে ত মনের কথা ধরা দিবেই।

শতদল ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে একখানা কাঁথা সেলাই

করিতেছিল। পেন্‌সিল দিয়া তাহার গায়ে ছবি আঁকিয়া দূরে ধরিয়া কেমন দেখায় দেখিতেছিল, একবার লালসুতায় কোঁড় তুলিয়া অপছন্দ হওয়াতে খুলিয়া কালো সুতা পরাইতেছিল। কাজের মধ্যে তাহার কোনো ব্যস্ততার বৈচিত্র্য পাওয়া শক্ত; দেখিলে মনে হয় যেন ওই একখানা কাঁথার ভাবনা ছাড়া তাহার আর কোনো ভাবনা নেই।

করুণা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "তোমায় দেখ্‌লে হিংসে হয় ভাই। দিব্যি যেমন একখানা কাঁথা নিয়ে আপন মনে সেলাই কর্‌ছ, যেন কোনো ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই।"

শতদল কাঁথাখানা ফেলিয়া দিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ষাট, ষাট, আমায় হিংসে কর্‌তে গেলে কেন ভাই তুমি! আমার মত নির্ভাবনা যেন শত্রুও না হয়। আমি যে সব ভাব্‌নার মূল খেয়ে বসে আছি ভাই; ভাব্‌ব কিসের কথা?"

করুণা বলিল, "ওটাও একদিক দিয়ে ভাল। আমার যা হবার তা হয়ে গেছে, এর চেয়ে ভালমন্দ আর কিছু নেই,—যদি মানুষে জান্‌ত, তা হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ত, হাতের কাছে যা পেত তাই নিয়ে দিন কাটিয়ে দিত।"

শতদল বলিল, "না ভাই, সে-রকম কপাল তোমার হয়নি, হয়ে কাজও নেই; কিন্তু যাদের হয়েছে তারা জানে জীবনে আর ভালও নেই মন্দও নেই, এইখানেই শেষ জানার পর সেই জীবনটাকে টেনে বেড়ানো কত শক্ত। আমি একদিন সেই সব-শেষের কিনারায় এসে পড়েছিলাম, তখন যদি আমার ওই মুখচোরা ছোটমামাটি না থাক্‌ত তবে হয় ত আর পথ দেখ্‌তে পেতাম না, হয় ত ওইখানেই ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মর্‌তাম্।"

শতদলের নিশ্চিন্ত মুখের শান্ত হাসি ছাপাইয়া অশ্রু-উৎস দেখা দিল। করুণা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "সত্যি ভাই, আমিই ভুল বুঝেছিলাম। সব ভাবনা, সব সংগ্রামই সুন্দর হয়ে ওঠে বটে, যখন জানি যে পথ চিনে বেঁচে বেরোতে পার্‌লে পথের শেষে আনন্দ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যদি দুটো পথ সাম্‌নে পড়ে, দুটো পথই দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের নলের মত সমান সুন্দর দেখায়, তবে কি করে মনের মধ্যের নলটিকে বাইরে চিনে নেবে? তার চেয়ে ওসব আপদ বালাই না থাকাই যেন ভাল মনে হয়।"

শতদল বলিল, "এবার শক্ত কথা বলেছ বটে ভাই, আমি ওদিকে নিশ্চিন্ত কি না, কোনো দিন অমন ভাবনা ভাব্‌তে হয় নি, আর হবার আশাও নেই, কাজেই উত্তর দিতে পার্‌ছি না। আজ থাক্‌ত আমার ছোট মামা....."

করুণা হাসিয়া শতদলকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "আচ্ছা জ্বালা যাহোক! বেশ তোমার এক নতুন কথা। ছোটমামাকে টেনে আনা স্বভাব। অমন ত্রিকালজ্ঞ মানুষ পেলে যে আমি বেঁচে যেতাম। তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী কথার উত্তর দর্‌কার।"

শতদল বলিল, "এইবার এলে তোমার দেরে বেঁধে দিয়ে আস্‌ব। যত পার বকিয়ে নিও।"

করুণা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "থাক্, আর বাজে কথা বক্‌তে হবে না। আচ্ছা বল দেখি, তোমার চোখের সাম্‌নে যদি কেউ আলাদিনের ঐশ্বর্য্য এনে ধরে, আর বলে এটা তোমার নেবার অধিকার থাকে ত তুলে নাও, তবে তুমি কি কর?"

শতদল অনায়াসে বলিল, "কি আর করি? ভেবে দেখি আমার কোনো দাবী আছে কি না। কতগুলো টাকা পাওয়া আর না-পাওয়াতে কিছু এসে যায় না, যে, তার জন্যে অকূলপাথার দেখ্‌ব।"

করুণা যাহা বলিতে চাহিয়াছিল, শতদল তাহা ধরিতে পারিয়াছে কি না বোঝা গেল না। কাজেই সে অধৈর্য্য হইয়া কথার আবরণ প্রায় খুলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "অভাব যে কি জিনিস তা যে জানে না, তার পক্ষে অমন বলা খুব সোজা। কিন্তু ভাব দেখি একবার, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাড় কালী করেও পেটের অন্ন জোটে না, কিন্তু তার উপর আরো কতকগুলো অসমর্থ মানুষ তোমার ওই জীর্ণ পুঁজিটার আশাতেই প্রাণ ধরে আছে। একবার হাল ছেড়ে বসে পড়্‌লে টেনে তোল্‌বার একটা মানুষ নেই, কিন্তু জড়িয়ে ধরে ডুবে মর্‌তে আরো অনেক আছে। চির-জীবনটা পড়ে আছে, কিন্তু কোথাও একটু হাসির আলো দেখা যায় না। অবিশ্রাম অন্ধকার বর্ষার জলের মত কোল চারিদিক থেকে দুঃখ ঝরে পড়্‌ছে; এমন সময় যদি কেউ আলো করে রত্নের ভার নিয়ে এসে কেউ দাঁড়ায় তার আলোয় সব কুয়াসা কেটে যাবে, মাথা রাখ্‌বার আশ্রয়

আর মুখে দেবার ভাতের নিত্য নূতন ভাবনা ঘুচে যাবে, এই পৃথিবীর কটামাত্র দিন আর কেবল গায়ের রক্ত জল করতেই কেটে যাবে না, কিন্তু জীবনটাকে উপভোগ করে নিতে পারবে, তবে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা হয় না? কিন্তু ঠিক সেইসঙ্গে যদি কানে এসে কেউ বলে 'নেবার অধিকার না থাকলে হাত দিও না, হরণের চেয়ে মরণ ভাল' আর তারপর সে ঐশ্বর্য্যের পসরার সরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসে, আর ফিরে আসার আশাও থাকে না, তখন কি করতে ইচ্ছে হয়?"

শতদল বলিল, "মাপ কর ভাই, আমি ওদিক থেকে ভেবে দেখিনি। অভাব কি তা আমি জানি, কিন্তু সে অভাব কোনোদিন ঘোচ্‌বার নয়। যে অভাব ঘোচ্‌বার আশা আছে, সে অভাব মোচনের আশা নিজের হাতে কেউ ভেঙে ফেলতে চায় না নিশ্চয়।"

করুণা নিজের মনের দ্বন্দ্বের কথা এমন করিয়া বলিয়া ফেলিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ছি, ছি, কি করিয়া সে এমন মূর্খের মত এ-সব কথা কিনা শেষে এই বাড়ীতেই বসিয়া বলিয়া ফেলিল? কি করিয়া কথা ঘুরাইবে সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু শতদলের কথার উত্তর না দিলে যে নিজের দীনতা স্বীকার আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। করুণা বলিল, "তুমি কথাটা বুঝ্‌ছিলে না, তাই খুলে বললাম; জানই ত পৃথিবীতে তুমি আমি ছাড়া দুঃখী মানুষ অনেক আছে, আর তাদের জীবনে প্রলোভনও নিশ্চয় আসে। নইলে তারা মানুষ হয়ে উঠ্‌বে কিসের ঘা খেয়ে?"

অভাবের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া এতদিন পরে ঐশ্বর্য্যের যে স্বাদ করুণা পাইয়াছিল, তাহাতে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক, শ্রান্ত মনের একটুখানি জুড়াইবার ঠাঁই আছে ইহা সে বুঝিয়াছিল। জীবন-উষায় জাগিয়াই দারিদ্র্যের নিপীড়নে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় পথে বিশ্রাম রূপে একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিলে কাহার না লোভ হয়? কিন্তু জগতে শুধু লইবার অধিকার ত কোনো মানুষের নাই। তাই করুণার শুচি মন প্রবঞ্চনা করিবার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল।

যদিও সে বুঝিয়াছিল তাহার পার্থিব সৌভাগ্য কেবল তাহার হাতের একটু আকর্ষণে ছিঁড়িয়া পড়িবার অপেক্ষায় আছে, তবু সেই একটু আকর্ষণকে ঠেকাইয়া রাখিতেই তাহার সমস্ত মনকে সে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। কিন্তু বঞ্চিত সে, একেবারে আশা ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারিতেছিল না, অপরের দাবীর ভয়ে কাঁপিয়াও উঠিতেছিল।

অবিনাশ যে করুণার মন-হরণের পালাটা দশের চোখের উপরেই করিতে বেশী উদ্‌গ্রীব ছিল, তাহাতে করুণার সঙ্কোচ হইলেও একটা মুক্তির আনন্দও ছিল। বাড়ীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নির্জ্জনে অবিনাশের সঙ্গে দেখা হইবার তাহার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। আর বাহিরে থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত কোনো রকমে দুই-চারিটা লোকের মধ্যে নিজকে টানিয়া আনিবার সুযোগ অবিনাশই নিজের অজ্ঞাতে জোগাইয়াছে। করুণা অবিনাশকে নিভৃতে পাইবার সুযোগ অনেক পাইয়াছিল; কিন্তু কখনও ব্যবহার করে নাই, অবিনাশ খুঁজিয়াও নিজের দোষে পায় নাই।

পাছে অবিনাশের সঙ্গে নিভৃতে মুখোমুখি দেখা হইলে সে সেই শেষ প্রশ্ন করিয়া বসে যাহার উত্তরে 'হাঁ' [illegible] 'না' ছাড়া বলিবার কিছু নাই, পাছে সোজা 'না' বলিয়া তাহার দুঃখ-শেষের উপায় আর একজনের হৃদয়ভরা আগ্রহ ভুল করিয়া ফিরাইয়া দিতে হয়, তাই সে সময় হাতে রাখিবার ইচ্ছায় অবিনাশকে এড়াইয়া চলিত, তাহার আগ্রহপূর্ণ কথার উত্তরে কেবল ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিত। তাহার অন্তরতম শুচিতা কেবলি ভয় পাইতেছিল বুঝি বা ভাগ্য পরিবর্ত্তনের লোভে পড়িয়া কেনা-বেচার মামলাকে সে জীবনে বরণ করিয়া লইতেছে।

সে জানিত তাহার মত দরিদ্রের ভাগ্য দুইবার প্রসন্ন হয় না। তাই এই একটি সুযোগকে সে হেলায় হারাইয়া সমস্ত সুখের আশাকে বলি দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না কিসে তাহাকে টানিতেছে, প্রণয় না প্রলোভন।

কোনো ধনী বা ধনীর সন্তান যে তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিবে না, একথা করুণা জানিত। কিন্তু তবু নিজেকে পরীক্ষা করিবার জন্য সে তাহার পরিচিত যত ধনী যুবক আছে, সকলকে এক-একবার প্রার্থী রূপে কল্পনায় আনিয়া দাঁড় করাইত। রাণীর মত সগর্ব্বে মাথা

হেলাইয়া সে সকলকে ফিরাইয়া দিত। তবে এই একটি মানুষের বেলাই বা তাহার ইতস্ততঃ কেন? সে নিশ্চিত আসিয়াছে, এটা যে একটা মস্ত কারণ তা' করুণা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিত না। তা'ছাড়া জীবনে যে গান আর-কাহারও কাছে শোনে নাই, যে ধরা দিবার ইচ্ছা আর-কাহারও মধ্যে দেখে নাই, এইখানে তাহা প্রথম পাইল। সে গানে তাহার প্রাণ ঠিক বীণার তারের মত সাড়া দিয়া বাজিয়া উঠিতে না পারিলেও, নিষ্ঠুরের মত তাহাকে থামাইয়া দেওয়া কি যায়? যে দাতা হইয়াও প্রার্থী, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। তাই করুণা ভাবিতেছিল, এইসব দ্বিধা আর মায়া কি প্রেমের পূর্ব্বসূচনা?

কথার সুর ফিরাইয়া করুণা অন্য গল্প পাড়িল। কিন্তু যাহার সঙ্গে গল্প সে যাহা জানে তাহাই ত বলিবে। শতদলের গল্পের স্রোত তাহার চিরপরিচিত পথে চলিল। সেই সলজ্জ নম্র, ধীমান, বিবেচক, কোমল সুন্দর পুরুষের ছবিখানিই নানা রূপে ফুটিয়া উঠিল। ঘণ্টা দুই গল্প করিবার পর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেই শৈলজা তেতালার ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া করুণার গায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "দ্যাখ্, শরীরের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। তখনই আমি বলেছিলাম না, যা' কর তা' কর বড়লোকের টাকা দেখে কেউ বিয়ে কোরো না। এখন দেখ্‌লে ত ননীর কপাল কি হল? বড়লোক বিয়ে কি আমরাই কর্‌তে পার্‌তাম না? করিনি, টাকার অত সখ নেই।"

কবে যে শৈলজা কাহাকে বড়লোক সম্বন্ধে সাবধান করিয়াছিল করুণার মনে পড়িল না। ননীর বৌভাতে ঘটার নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া শৈলজা মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিল, "সবই কপালের লিখন!" এইটুকুই ত মনে পড়ে, আর মনে পড়ে বড়লোক হইয়া করুণা যেন তাহার বাল্যসখীকে না ভুলিয়া যায় এই অনুরোধ। কিন্তু থাক সে কথা! ননীর আবার কি হইল?

শৈলজা বলিল, "শুন্‌লিনি সে কথা? ওই বুড়ো দয়ারামের সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ এসেছিল। বেঁচেছি বাবা! হ্যাঁ শোন্ আসল কথাটা রেঙ্গুন গিয়েছিল না ওরা? সেখানে বুড়ো কি চলান না চলিয়েছে! কেমন বড়লোকের মহিমা! আর ননীকে মেরে কুটে ত হাড় জ্বালা সার করেছিল। তার উপর দিবারাত্রি চোখের উপর ওই রকম কাণ্ড। যাক্, এখন অগাধ টাকা চোখ বুজে ময়েছে। আর ননীও তার শোধ তুল্‌ছে। স্বামীর কাছে সব শিক্ষাই ত হয়েছিল। যেই না চোখ বোজা, কাজে লাগাতে কতক্ষণ?"

শৈলজা হিংস্র আনন্দের সঙ্গে ননীর চরম দুর্গতি আর অবনতির বর্ণনা করিতে লাগিল; শৈশবসঙ্গিনীর উপর মায়া করিয়া তাহার গায়ে পঙ্ক ছিটাইতে এতটুকু দ্বিধা করিল না। করুণা কেবল চুপ করিয়া শুনিল। গল্প শেষ করিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া শৈলজা "দেখিস্ ভাই সাবধান!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু করুণার মুখে অত সহজে হাসি ফুটিল না। ননীর কথায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। এই বাড়ীরই একতালা ঘরে দুঃখে কষ্টে শৈশব কৈশোর কাটাইয়াছিল ননী। একটি বই দুটি শোয়া জড়াজড় যাহার বক্সে কখনো একসঙ্গে দেখা যাইত না, বিবাহের আগে যাহার গায়ে কেহ সোনারূপার আঁচড় পড়িতে দেখে নাই, স্কুলে গানের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া যে লাটসাহেবের হাতের দান সোনার পদক পরিয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল, সকল ক্রিয়াকর্ম্মে নিমন্ত্রণে যেখানে যাউক সেইখানেই যে তাহার ওই একমাত্র আভরণটি পরিয়া গর্ব্বে ঘাড় দুলাইয়া যাইত, যেন অমন বহুমূল্য অলঙ্কার আর কাহারও নাই, সেই বালিকা ননীর ছবি করুণার চোখে আজও ভাসিতেছিল। সেই বালিকা ননী শিবরাত্রির উপবাস করিয়া মায়ের কথা-মত শিবের মত বর প্রার্থনা করিত, সে দিন তাহার প্রার্থনায় এতটুকু কপটতা ছিল না; সাবিত্রীর মত সতী হইতে সে চাহিয়াছিল এবং সেটা যে তাহার পক্ষে এতটুকুও কঠিন সঙ্কল্প এমন কথা কোনোদিন মনে করে নাই। সেই যে অল্পে তুষ্ট দরিদ্রের ঘরের মেয়ে, যে একসঙ্গে একশত টাকাও কোনোদিন দেখে নাই এবং তাহার জন্য যাহার এতটুকুও দুঃখ ছিল না, সেই মেয়েটি মায়ের লোভের তাল সাম্‌লাইতে গিয়া অশ্রুসজল চোখে বুকভরা কান্না লইয়া একদিন ওই অর্থসার দয়ারামকে

বরণ করিয়াছিল। আজ সেই ননী তাহার দুঃখের শোধ এমনি করিয়া নিজকে ছারখার করিয়া দিয়া লইতেছে। যে-সব কথা এখনি শুনিল তাহা আবার ভাবিতে করুণার মনে বিছুটির ছড়ের মত জ্বালা বোধ হইতেছিল। সে ভাবিয়া পাইল না, যে ননী কোন্ ইংরেজ মহিলার দুই বিবাহের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিয়াছিল, "ও-মাগো- কি যে বলিস ভাই, এও কি কখনও হয়?" যে বলিয়াছিল, "এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল!" সেই নিতান্ত সাদাসিধা সরলা বালিকা কি করিয়া একটা সহরের বুকের উপর এমন করিয়া বেড়াইতেছে? ধনীর অর্থ সেই দুর্ভাগিনীকে অসংখ্য প্রলোভনের মুখে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার মনে বহু কামনা, বাসনা, ক্ষুধা জাগাইয়া দিয়াছে, কিন্তু যাহাতে মন তৃপ্ত হইতে পারে সেই প্রাণ-পূর্ণ-করা ভালবাসা ছিল না। এ যেন উন্মত্ত আগুন জ্বালিয়া ঝড় তুলিয়া সরিয়া যাওয়া। ভাল করিবার কিছু নাই, তাই দহন করিয়াই অতৃপ্তির ক্ষুধা মিটাইতেছে।

করুণার মনে শৈলজার ইঙ্গিতটা জাগিয়া উঠিল। ননীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুযুক্তিপূর্ণ মন, শিক্ষিত মস্তিষ্ক কোনো দিনই ছিল না, তাই সে যে আগুন জ্বালিয়াছে তাহা প্রকাশ্য ভাবে অমন ঘরে বাহিরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু করুণা নিজে? সে যদি লোভে পড়িয়া অমনি আগুন জ্বালে তবে লোকের চোখে হয়ত তাহা অমন করিয়া ধরা পড়িবে না, শিক্ষিত বুদ্ধির জোরে সে ছাই-চাপা আগুনের মত ভিতরে ভিতরে পুড়িয়া মরিবে, কিন্তু অপরাধ কি তাহাতে কম হইবে? ছি, ছি, নিজের সম্বন্ধে অমন কথা ভাবিতেও করুণার সমস্ত দেহমন অশুচি বোধ হইতেছিল।

অরুণা এতক্ষণ পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। শৈলজা-করুণার গলার স্বরে সে জাগিয়া উঠিয়া চোখমুখ রগ্‌ড়াইয়া একখানা ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া খানিক পরে বাহিরে আসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি শতদলদি'র বাড়ী চলে গিয়েছিলে, এদিকে ডাকে তোমার নামে কি যেন এসেছে দেখ্‌বে চল। নিশ্চয় অবিনাশ-বাবু পাঠিয়েছেন, আমি বলে দিচ্ছি।"

করুণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অবিনাশের হাতের লেখা বুকে করিয়া ছোট একটি রেজিষ্ট্রি প্যাকেট। অমনি তাহার মনটা নরম হইয়া উঠিল। কাছে থাকিলে যাহাতে সে পীড়া বোধ করিত, দূরে বলিয়া আজ তাহাতে সে প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মনে হইল,—কেন তাহার এত ভাবনা চিন্তা? সে ত অপরের প্রেমে মুগ্ধা নয়। তবে যে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে সে পারিবে না কেন? বাঙালীর মেয়ে ত চিরকালই অজানাকে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে, আপনার জন হইলে সেও তেমনি করিয়া আপন করিয়া লইবে। না হয় তাহার সব কথা সব কাজ মনের মত নাই হইল! যাহাদের সঙ্গে আজন্ম কাটাইতেছে তাহারাই কি সব বিষয়ে তাহার মনের মত?

(ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(১)

নাটক ও উপন্যাসে প্রভেদ কি কি?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

(২)

বঙ্গভাষায় কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কি কি পুস্তক পাওয়া যায় এবং কি কি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মোদক, ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

(৩)

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলে হৈমন্তিক ধানের জমিতে এক-প্রকার জলজ-উদ্ভিদ জন্মিয়া রোপিত-ধান্যগাছকে জীর্ণশীর্ণ করিয়া ফেলে; এজন্য ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই জলজ উদ্ভিদের নাম "গেঁছুয়া", ইহার আকৃতি পুকুরের খাঁজির (শৈবাল) মত ইহা ৩ ইঞ্চি হইতে ১২।১৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ইহার গন্ধ মৎস্যের আঁইশের গন্ধের ন্যায়। যাহাতে গেঁছুয়া না জন্মে তাহার কোন একটি বৈজ্ঞানিক উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিলে উপকৃত হইব।

শ্রীজগন্নাথ দাস।

(৪)

জিরা ও গোলমরিচের চাষ সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন অভিজ্ঞতা থাকে, তবে প্রবাসীতে লিখিলে উপকৃত হইব।

ভজনানন্দ হালদার।

(৫)

ক। পেঁপে গাছে পুং পুষ্প হইলে গাছটিকে কাটিয়া ফেলা হয় কেন? ইহা হইতে কি অনিষ্টকর কার্য্য সম্ভবে? যদি ঐরূপ হয় তবে তাহার প্রতীকার কি?

খ। নক্ষত্রকে স্থানভ্রষ্ট হইতে দেখিলে রামনাম করে কেন? করিলে কি ফল হয়? ইহা হইতে কি কোন অশুভলক্ষণ ঘটে? ইহ শুধু কুসংস্কার কি না?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(৬)

ক। মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের স্কুলের পরলোকগত হেড মাষ্টার লিট্‌ল (Little) সাহেব "অন্ধকূপ" হত্যা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে কি না এবং কোথায় পাওয়া যায় ?

খ। ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন দিবসে মেঘগর্জ্জন হইলে উপনয়ন পণ্ড হয়, অথচ, কালবৈশাখীতে হয় না ; ইহার শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

(৭)

ক। ভারতবর্ষের কোনো স্থানে জিওলজিক্যাল সার্ভে শিক্ষালয় আছে কি না? অন্যান্য দেশে এরূপ শিক্ষা কোথায় ভাল পাওয়া যায় ?

খ। ভারতবর্ষে Nautical Institute আছে কি না ?

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৮)

ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলে একরূপ সাদা সুতার ন্যায় পদার্থ প্রায় পাঁচ-সাত হাত উপর দিয়া বায়ুর গতির সহিত উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। এরূপ সুতার ন্যায় অন্য কোন জেলায় দৃষ্ট হয় কি না জানি না। মাঠে গাছের উপর এই সুতা জড়াইয়া থাকিতে দেখি। ইহা কোন্ জাতীয় সুতা এবং কোথ হইতে আসে, কেহ সন্ধান জানেন কি ? এই অঞ্চলের লোকে "বুড়ীর সুতা" বলিতে অনায়াসে এ জিনিষটা চিনিয়া ফেলে। অন্য কোন দি ইহার ভিন্ন নাম আছে ? কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাঠাইতে পারি।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

(৯)

বাংলা ভাষায় প্রেততত্ত্ব বিষয়ক কি কি ভাল পুস্তক আছে? এ বিষয়ে ইংরেজী ভাল পুস্তকেরও নাম জানিতে চাই।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সোমজ্জায়।

(১০)

ক। ইংরেজ সরকার "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি"কে কত টাকা দিয়া ভারতবর্ষ ক্রয় করেন? ঐ টাকা কি ইংরেজকোষ হইতে দেওয়া হইয়াছে ? না, ভারতবর্ষের নামে খরচ লেখা হইয়াছে ?

খ। বর্ত্তমানে (ভারতবর্ষের) সরকারি ঋণ কত ? ইহার কত টাকা ইংলণ্ডীয় মহাজনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে ? ঐ ঋণের জন্য বার্ষিক কত টাকা সুদ দিতে হয় ?

গ। (ভারতবর্ষের) Secretary of State ও Under-Secretary of Stateএর বার্ষিক বেতন কত ? ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর (Prime Minister) বেতন কত ? ভারতবর্ষের বড়লাটের (Viceroy) বেতন ইহা অপেক্ষা কত বেশী ?

ঘ। ভারতবর্ষকে বার্ষিক কত টাকা "হোম" চার্জ্জ স্বরূপ বিলাতে পাঠাইতে হয় ? এই "সেলামী" দিবার কারণ কি ? উপনিবেশ-সমূহকেও কি এই "আক্কেল-সেলামী" দিতে হয় ?

ঙ। ভারতবর্ষকে কতগুলি [ফিরিঙ্গী সমেত] শ্বেতাঙ্গ পোষণ করিতে হয় ? ইহাদের জন্য বার্ষিক কতটাকা খরচ হয় ?

চ। ভারতবর্ষে কয়টি [ক] কৃষিব্যাঙ্ক আছে ? তাহার মধ্যে কয়টি সরকারী ? [খ] কৃষিকলেজ আছে ? [গ] দেশীয় ব্যাঙ্ক কতগুলি আছে ? তাহাদের মূলধন কত ? [ঘ] কয়টি বিদেশীয় ব্যাঙ্ক আছে ? তাহাদের মূলধন কত ?

শ্রীজ্যোতিঃকুমার ধর।

(১১)

ক। অন্নদামঙ্গলে আছে :—

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ধর্ম্মীমানে নরেন্দ্র,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যার যশে হয়ে অভিমানী॥"

সিন্ধুমুখে এবং রাহুমুখে শশীকে ঝাঁপ দিতে দেখা যায় ; কিন্তু অগ্নিমুখে শশী কখন ঝাঁপ দিয়া থাকে ?

খ। হৃদয় আমার, অইসব ধনিগণ,
যাঁরা উচ্চ পদবীর, ওঁদের মধ্যেতে
প্রেমাকাঙ্ক্ষী সহৃদয় আছে কি এমন
মম মত পারে মর্ম্ম প্রেমের বুঝিতে ?
যাখানে তাহারা তব হীরকের জ্যোতি
আমি যাহা তুচ্ছ তব স্ফুর তুলনে।
যাখানে তাহারা তব কেশে মাখা মেখে
তব কেশ কাছে তুচ্ছ আমার নয়নে।
কথা কহে তারা তব ধন-যৌবনের,
ভাল বংশে জন্মকথা বলে গো তোমার ;
আমি কিন্তু ভাব নাহি বুঝি তাহাদের,
তব হৃদ হস্ত বই নাহি ভাবি আর
তথাপি হতাম আমি যদি ধনবান্
আমিও হতাম মূর্খ তাদের মতন—
মন হতে ধনে যারা করয়ে সম্মান,
চক্ষু হতে মূল্যবান দেখয়ে রতন।

এই কবিতাপংক্তিগুলি কোন্ পুস্তকে আছে ?

(১২)

ক। হীরা বিষাক্ত কি না, বিশেষতঃ যে হীরা সাপে সংগ্রহ করে ? বিজ্ঞানের মত কি ?

খ। ভারতের রাজপুত ও মুসলমান ইতিহাসে মহিলাগণের "জহর খাইয়া" (চুষিয়া) প্রাণত্যাগের কথা আছে ইহা সত্য কি ? অন্য দেশে এইরূপ কথা আছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মল্লিক

(১৩)

সন্ধ্যা-আকাশে একটি নক্ষত্র দেখিলে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকে অমঙ্গল মনে করিয়া সাতবার নারদের নাম করে কেন ? ইহার পৌরাণিকত্ব কি ?

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

মীমাংসা

বৈশাখ মাসের জিজ্ঞাসার উত্তর—

মাথায় ঘোল ঢালা দণ্ডরীতির উল্লেখ বৌদ্ধ [illegible] গ্রন্থে আছে।

প্রাচীনকালে যখন বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন দেবরাজ শক্র। ব্রহ্মদত্ত অতিশয় দৌরাত্ম্যশীল ছিলেন, এবং জরাজীর্ণ হস্তী দেখিলে বন্ধন করিতেন ও পুরাতন শকট দেখিলে ভগ্ন করাইতেন। এতদ্ব্যতীত, বৃদ্ধ স্ত্রীলোকগণকে তিনি আহ্বান করিয়া উদরে প্রহার করাইতেন ও বৃদ্ধ পুরুষ দেখিলে তাহাদিগকে ভূমিতে ফেলিয়া দিতেন। রাজ্যের লোকেরা ইহাতে অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাহাদের পিতামহকে নগরের বাহিরে

পাঠাইয়া দিল ও পিতৃপূজন ধর্ম মাতৃপূজন ধর্ম একেবারে লোপ পাইল। ব্যাপার দেখিয়া শক্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন। রাজাকে শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি স্বয়ং বৃদ্ধরূপ ধারণ করিলেন ও বহু পুরাতন শকটে আরোহণ করিয়া কোনো উৎসব-দিবসে রাজার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। ঐ শকটে তিনি দুই পাত্র তক্র (ঘোল) স্থাপন করিয়াছিলেন। শকট নিকটবর্তী হইলে রাজা তাঁর লোক জনদের উহা ভাঙিয়া ফেলিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা বলিল "প্রভো! আমরা ত কোথায়ও শকট দেখিতে পাইতেছি না।" [শক্রের প্রভাবে রাজা ব্যতীত আর কেউ তাঁকে দেখিতে পাইতেছিল না।] তখন রাজা স্বয়ং শকটের দিকে ধাবিত হইলেন। শক্রও এক ভাণ্ড ঘোল তাঁহার মস্তকে ছুঁড়িয়া মারিলেন ও তক্রপূর্ণ দ্বিতীয় ভাণ্ডটিও রাজার মস্তকে ভগ্ন করিলেন। রাজা ইহাতে লজ্জিত হইয়া বিরত হইলেন। অনন্তর শক্র স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বজ্রহস্তে রাজাকে বলিলেন, "ওহে অধার্ম্মিক রাজন্, তুমি কি কখন বৃদ্ধ হইবে না? তোমার শরীরে কি জরা প্রভাব বিস্তার করিবে না? তবে কি কারণে ক্রীড়াশীল হইয়া বৃদ্ধদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছ? তোমার অত্যাচারে মানুষেরা পিতামাতাকে সেবা করিতে পারিতেছে না। অতএব যদি এই কাজ হইতে বিরত না হও তবে বজ্র দিয়া তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব।" পরে, তিনি পিতৃমাতৃ-সেবার ফল বর্ণন করিয়া নিজের স্থানে চলিয়া গেলেন। সেই অবধি রাজা ব্রহ্মদত্ত এইরূপ কর্ম আর করেন নাই।

অরুণ দত্ত।

আষাঢ় মাসের জিজ্ঞাসার উত্তর—

দুর্গেশনন্দিনী।

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক কি না ও তার ঘটনাস্থল গড়মান্দারণ, কি বিমলীগড়-বিরণকিতাদি জানিতে চাহিয়াছেন। তার উত্তরে আমি তাঁকে গত ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় লিখিত "দুর্গেশনন্দিনী-নিকেতন" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাতে স্পষ্টই দেখানো হইয়াছে যে দুর্গেশনন্দিনীর ব্যাপার গড়মান্দারণেই ঘটিয়াছিল।

শ্রীএককড়ি কুণ্ডু।

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ :—

১। দুর্গেশনন্দিনী (The Chieftain's Daughter)। ২। ইন্দিরা (Indira and other stories)। ৩। বিষবৃক্ষ (The Poison Tree)। ৪। কপালকুণ্ডলা—দেবনাথ ঘোষ। ৫। কৃষ্ণকান্তের উইল—শ্রীদক্ষিণাচরণ রায়।

শেক্সপীয়রের গ্রন্থের বাঙ্গলা তর্জ্জমা।—

১। ম্যাকবেথ (নাটক)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

২। (ক) রোমিও জুলিয়েত (নাটক)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (খ) রোমিও জুলিয়েত "বসন্তকুমারী" (নাটক) নামে—রাধামাধব কর।

৩। Tempest বা বাঙ্গলা 'নলিনী বসন্ত' (নাটক)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। ওথেলো (নাটক)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

উপাখ্যান মাত্র বাংলায় বর্ণিত হইয়াছে—

১। ভ্রান্তিবিলাস (Comedy of Errors)—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২। সেক্সপীয়ার—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

৩। মার্চ্চাণ্ট অফ্ ভেনিস—ম্যাক্‌মিলন কোম্পানী।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে শ্রীগৃহস্থ জানিতে চাহিয়াছেন যে "চাউল ও ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে এমন কোনও শস্য আছে কি না।" আমার একটি শস্যের কথা জানা আছে, তাহার নাম 'মাড়ুয়া'; বিহার এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশে ইহা উৎপন্ন হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের প্রথমে যখন খুব বৃষ্টি হয় সেই সময় মাড়ুয়ার গাছ রোপণ করা হয়। দুই তিন মাসের মধ্যেই অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্রেই ইহার ছোট ছোট গাছে খোলো খোলো ফল হয়, তাহাই মাড়ুয়া। ফলগুলি পাকিলে কাটিয়া লয়, গাছ কাটে না। 'মাড়ুয়া' ছোট ভুট্টার (জনেরার) চেয়ে কিছু ছোট, এবং ইহার গা কিছু খস্‌খসে। বাংলা দেশে যেমন কুটি খড় বা কলাই গরুকে দিয়া মাড়াইয়া লওয়া হয়, এই মাড়ুয়া তেমনি বলদ দিয়া মাড়াইয়া খোসা ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। মাড়ুয়া হইতে রুটি ও সাতু হয়। পশ্চিমের পল্লীবাসী গৃহস্থেরা বছরের পাঁচছয় মাস ভাত-রুটির পরিবর্ত্তে মাড়ুয়ার রুটি ও সাতু খাইয়া থাকে। সেইজন্যই আমরা হিন্দুস্থানীদের 'মেড়ুয়া' বা 'মেড়ো' বলিয়া থাকি। অতএব ধান ও আটার বদলে 'মাড়ুয়া' পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রীউমা দেবী।

এই মাসের জিজ্ঞাসার উত্তর—

২ নং প্রশ্নের উত্তর

বঙ্গভাষায় কৃষিবিষয়ক পুস্তক অনেক আছে। গুরুদাস-লাইব্রেরী ও চৈতন্যলাইব্রেরীর ক্যাটালগ দেখিলে অনেক নাম পাওয়া যাইবে। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় চিঠি লিখিলেও অনেক কৃষিপুস্তক পাইবেন। কৃষি-সম্বন্ধীয় কৃষক মাসিকপত্রে অনেক কৃষিবিষয়ক পুস্তকের বিজ্ঞাপন থাকে। স্থানাভাবে তালিকা দেওয়া গেল না।

কৃষি সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকা—

(১) কৃষক (ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান, ১৬২ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।
(২) ভূমিলক্ষ্মী (সিউড়ী, বীরভূম)।
(৩) কৃষিকথা (ফরিদপুর)।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। পেঁপে-গাছে পুংপুষ্প সম্বন্ধে আলোচনা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ ইত্যাদি মাসের প্রবাসীতে দ্রষ্টব্য।

খ। উল্কাপাত দেখিলে অমঙ্গল হয় বলিয়া লোকের কুসংস্কার আছে। রাম নামে সকল অমঙ্গল দূর হয়—

দুঃস্বপ্নদর্শনে চৈব গ্রহপীড়াসু জৈমিনে।
ঔৎপাতিক ভয়ে চৈব বহ্নি-রোগ-ভয়ে তথা
রামনাম স্মরন্ মর্ত্ত্যো নাস্তভং লভতে ক্বচিৎ॥
রামনাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভনিবারণম্॥
পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১৪ অধ্যায় ১১১—১১৩।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

এক তারা দেখিলে ঝগড়া হয় বলিয়া কুসংস্কার আছে। নারদ কলহের ঘটক। তাঁর নাম করিয়া বিয়ে বিবক্ষয় করা হয়।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

বুড়ির সুতা সব দেশেই ওড়ে। ইহা লইয়া বহুদিন পূর্ব্বে সাধনা মাসিকপত্রে অনেক আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে উহা মাকড়সার জাল।

(১১ক)

সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে
শশী ঝাঁপ দেয় দুখে—

পদটির অন্বয় বোধ হয় এইরূপ হইবে—সিন্ধু অগ্নিমুখে এবং শশী রাহুমুখে দুখে ঝাঁপ দেয়। সিন্ধু বাড়বানলে পীড়িত হয় এবং শশী রাহুগ্রাসে পীড়িত হয়—এই অর্থ হওয়া সম্ভব।

(১২)

হীরা ঠিক বিষাক্ত নয়। হীরা কঠিনতম বস্তু; সেজন্য হীরকচূর্ণ খাইলে পেটের অন্ত্রে বিদ্ধ হইয়া অন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। লর্ড নর্থব্রুক যখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন, তখন বড়োদার মহারাজা মল্হর রাও গায়কওয়াড় বড়োদার রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে হীরকচূর্ণ খাওয়াইয়াছেন বলিয়া ১৮৭৪ সালে অভিযুক্ত হন।

ফার্সীতে জহর মানে বিষ; জওহর মানে রত্ন মণি। দুটি শব্দের বানান ও উচ্চারণ ভিন্ন হইলেও বাংলায় এক রকমেই লেখা ও উচ্চারণ হয়—জহর। এই ভুল হইতে জহর (বিষ) খাইয়া মরা মানে জহর (মণি) চুষিয়া মরা ধারণা প্রচলিত হইয়াছে। আগে যখন মানসম্ভ্রম সদাই যায়-যায় অবস্থায় থাকিত, তখন মানী লোকেরা আংটিতে কৌটা করিয়া বিষ সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন; এবং দরকার হইলে আংটি চুষিয়া মরিতেন—বিষের প্রভাবে, মণিত্বের বিষক্রিয়ায় নহে। অন্য দেশের ইতিহাসেও আংটিতে বিষ রাখার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(আষাঢ় মাসের জিজ্ঞাসার উত্তর)

মূল ফরাসী হইতে বাংলায় অনুবাদ হইয়াছে মোপাসাঁ প্রভৃতির গল্প। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পীয়ার লোটির "L' Inde ... ins Anglais" ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ নামে অনুবাদ করিয়া বই প্রকাশ করিয়াছেন। De la Mazelliereএর বই, Senartএর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বই, প্রভৃতি আরো অনেক অনুবাদ তিনি প্রবাসীতে ১৩১৮ ও ১৩২৩ সালে করিয়াছেন। তাঁর 'ভারতবর্ষ' নামক বইও ফরাসী পর্য্যটকের বইএর তর্জ্জমা। জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুর ফরাসীপ্রসূন এবং ডাঃ সতীশচন্দ্র বাগচীর 'ফরাসী গল্প' মূল ফরাসীর অনুবাদ। প্রস্পার মেরিমে রচিত উপন্যাস 'কলোঁবা' 'আগুনের ফুল্‌কি' নামে অনুবাদ হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনেক বাংলা তর্জ্জমা হইয়াছে, সেগুলি ধর্ত্তব্য নহে।

ফরাসীতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি অনুবাদ হইয়াছে। একেবারে বাংলা হইতে কোনো বই ফরাসী হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব বইই ইংরেজীতে অনুবাদ হইয়া গেল বা হইতেছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধারণতঃ

পত্নী হন প্রিয়তমা গহনার বেলা,
গাঁজার প্রসাদ-ক্ষণে ভক্ত হয় চেলা,
প্রাণাধিক হয় বন্ধু চাটুকার হলে,
ছেলে হয় পিতৃভক্ত বিবাহের কালে।

"অফুল"

পুস্তক-পরিচয়

পথ ও পাথেয়—শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রণীত। নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা। ১৩৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ের তক্তায় (লিম্প্) বাঁধা। এক টাকা।

মুসলমান সমাজের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন-কাহিনী ও ধর্ম্মানুরাগের ভিতর দিয়া মানবহৃদয়ের বহু উচ্চবৃত্তির ও সৎকার্য্যের পরিচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার উপদেশ দেওয়া হইলেও এই গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রচনার ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা হইলেও নিতান্ত দুঃসহ ও দুর্ব্বোধ নহে। আরো সহজ ভাষায় লিখিলে ছোট ছেলেমেয়েদের সুখপাঠ্য বই হইত। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে; ইচ্ছা করিলেই ইহা সহজ ও সরস করিতে পারিতেন। হিন্দুমুসলমান ছেলে-মেয়েদের ইহা পড়া উচিত। হিন্দুর যদি প্রতিবাসী মুসলমানদের ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান ইতিকথা পুরাণকাহিনী না জানে ও মুসলমানেরা যদি হিন্দুর ইতিহাসের ধারার সঙ্গে পরিচয় না রাখে তবে প্রতিবাসী হইলেও সম্পূর্ণ মিলন হইতে পারে না। এইজন্য ছেলেমেয়েদের ছোট বয়স হইতেই উভয় সম্প্রদায়ের মোটামুটি আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া অভিভাবকদের উচিত। মুসলমান সাহিত্যিকেরা এই সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যেসব বই লিখিতেছেন তাহা সর্ব্বত্র পরিচিত ও পঠিত হইবার দাবী রাখে এবং সে দাবী ন্যায্য দাবী।

শান্তিধারা—শ্রীমোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত। নূর লাইব্রেরী, ১০ সায়েন্স লেন, কলিকাতা। ডঃ রুঃ ১৬ পেজি ৯৫ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। আট আনা।

এই পুস্তকে ইস্‌লামের স্বরূপ, ইস্‌লামের ধারা, ঈমানীন, আজান, উপাসনা, নামাজ কি, তাহাই সন্দর্ভ লিখিয়া বুঝানো হইয়াছে। রচনার ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত-বহুল, উচ্ছ্বাসপূর্ণ, ফেনিল। এতে ভাবের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, যুক্তিধারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, বক্তব্য স্পষ্ট হয় নাই। তথাপি ইহা হিন্দু-মুসলমানের পাঠ করা উচিত—মুসলমানদের ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রকৃত স্বরূপ ও অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

মুন্সী-রক্ষস।

দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায় ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ—শ্রীবাণেশ্বর সিংহ প্রণীত ও শ্রীহট্ট জজ আদালতের উকিল শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য মোট তিন আনা।

অন্নবস্ত্র সংকট দেশব্যাপী হইয়াছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দিন দুর্ম্মূল্যতা উচ্চনীচ সকলকেই বিপন্ন করিয়াছে। দুর্ভাগা বাঁকুড়ার কথা দূরে থাকুক, শস্যশ্যামলা বাখরগঞ্জেও অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। এ হেন জাতীয় সংকটের সময় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে ও তাহার প্রতিষেধ চিন্তনে মনোযোগী হইয়াছেন। চুটকী-প্রাবিত মাসিক সাহিত্যেও এই প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "বাঁকুড়ার পত্রে" বঙ্গবাসীকে যেমন অনেক সদুপদেশ শুনাইয়াছেন, আশার কথাও তেমন বলিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন ও আবার ব্যাধিপ্রতিকারের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তিনখানি পুস্তিকাও এই উদ্দেশ্যে লিখিত।

প্রথম ভাগে কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গে ধান ও পাটের চাষই অধিক হয়। একবার জলপ্লাবন অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি হইলে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত দুর্দ্দশার সীমা থাকে না।

সেইজন্য গ্রন্থকার প্রস্তাব করিতেছেন যে রবিশস্য উৎপাদনে সকলে মনোযোগী হউন। গম, যব, খেসারী, মসুরী, ছোলা, মটর, সোনামুগ প্রভৃতি রবিশস্যের চাষ বেশ লাভজনক। এখন বাঙ্গালায় ১২৪,০০০ একরে গম ও ৯৭,১০০ একরে যবের চাষ হয়। অথচ এই শস্যের উপযোগী জমিরও বঙ্গে অভাব নাই। গম প্রচুর পরিমাণে বিদেশে পাঠানো যাইতে পারে। সুতরাং কেবল ধান ও পাটের উপর নির্ভর না করিয়া এই রবিশস্য উৎপাদনের চেষ্টা করিলে, দুর্ভিক্ষ অজন্মায় একেবারে অসহায় হইয়া পড়িতে হয় না। দেশের কৃষক-সম্প্রদায় গ্রন্থকারের এই ভাবন কাজে লাগাইয়া দেখুন।

দ্বিতীয় ভাগে গোরক্ষার কথা আলোচিত হইয়াছে। কৃষিকর্ম্মে গো-বল অত্যাবশ্যক। গোজাতির দুর্দ্দশার সীমা নাই। হৃষ্টপুষ্ট গাভী—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। গো-মড়ক ও গাভীরসপ্তানীতে উৎকৃষ্ট জাতির গাভী বা বলদ দেশে আর নাই—যাহা কিছু আছে উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাহারা বলহীন। লেখক ভাল ভাল বলদের আমদানী করিতে বলিতেছেন, Grass Farm খুলিতে বলিতেছেন।

তৃতীয় ভাগে নানা কথার মধ্যে লেখক বলিয়াছেন যে কোথাও কোথাও কৃষি-জমির আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া বেশী সার দিলে, বেশী যত্ন হইলে কম জমিতে বেশী ফসল হইবে। মোটের উপর লাভ থাকিবে প্রচুর।

পুস্তিকা তিনখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না। লেখক নিজে কৃষিকর্ম্মে অভিজ্ঞ—তাঁহার অভিজ্ঞতার নিদর্শন এই পুস্তিকায় নানা স্থানে রহিয়াছে।

ভাষার তেমন বাঁধুনী নাই—ব্যাকরণাশুদ্ধিও স্থানে স্থানে লক্ষিত হইল।

"বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ ও তাহা নিবারণের উপায়"—শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত ও বঙ্গীয় সমবায় মণ্ডলী গঠন সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য সমবায়-তত্ত্ব প্রচার। কৃষক ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া স্বল্প মূল্যে মহাজনকে ধান্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর অধিক মূল্যে চাউল কিনিতে পারে না—অনাহারে মরে। সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে মহাজনের গ্রাস হইতে কৃষক মুক্ত হইবে ও নানা প্রকারে কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

পুস্তিকাখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। আশা করি বাঁকুড়াবাসী এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নিখুঁত—শ্রীতারাপদ সান্যাল, এম-এ প্রণীত। হেরম্ব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ১৫৯-এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধাই, দাম এক টাকা।

একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। উপন্যাস না বলিয়া এটিকে একটি বড় গল্প বলা চলে। গল্পের প্লটটি একেবারে মামুলি, একেবারে বৈচিত্র্যহীন। নায়ক রমেশ গুণবান ছেলে হইয়াও হঠাৎ কিজন্য মার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল তাহা ভাল করিয়া বোঝানো হয় নাই। আর রমেশ মার প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা দেখাইবার আগেই মার মন কেমন করিয়া রমেশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল তাহাও জানা যায় না। মাতা-পুত্রের মধ্যে বিভেদের কারণ যে কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিলাম না। এই বিভেদটুকু ছাড়া আর কোথাও একটুকু বৈচিত্র্যের আভাস নাই। নায়িকা লীলা ত একেবারে নিছক বা 'নিখুঁত' ভাল। দুর্ভাগ্যের বিষয়—ধূলিময় ধরায় কিন্তু সকলেই 'সখুঁত'! গল্পটি একটি মোটামুটি ঘটনা মাত্র,—যেন জড়ভরতের মত ভালমানুষ, মনে কোন ঔৎসুক্যই জাগায় না। মাঝে মাঝে গ্রন্থকার ভারতবর্ষীয় আদর্শ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাও সব সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় নাই।

অগ্নি-সংস্কার—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বইখানিতে দুটি বড় গল্প আছে,—অগ্নি-সংস্কার ও পাগল। অগ্নি-সংস্কার গল্পটি বিলাত-ফেরত উদ্‌ভ্রান্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি সুন্দর চিত্র। বিলাত-ফের্ত্তারা যখন দেশে আসিয়া বাস করেন তখন তাঁদের অবস্থা ঠিক ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে,—তাঁরা না বিলিতি, না বাঙালী। এই সমাজের ছেলেমেয়েরাও অদ্ভুত জীব হইয়া উঠে। বিলাতের চালচলন, আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া তারা বিলাতি হইতে চায়, কিন্তু মনটা তাদের যে এ-দেশের তারা তা ভুলিয়া যায়। পদে পদে কথায় ও কাজে তারা একটা বৈষম্য বহন করিয়া চলে। এই ইঙ্গ-বঙ্গদের উচিত তাদের দেশী মনটাকে দেশীয় পথে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া। খাঁটি সাহেব হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা আমাদের মনটা দেশী, সাহেব হওয়ার পক্ষে তার প্রকৃতির আনুকূল্য নাই। এইসব কথা গ্রন্থকার খুব নিপুণতার সহিত বুঝাইয়াছেন। তাঁর অঙ্কিত ইলার চরিত্রে তিনি যে দেশীয় সংস্কার দিয়াছেন তাতে ইলাকে আমাদের ঘরের মেয়ে করিয়া লইতে মোটেই বাধে না। গল্পটি পড়িলে বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়।

পাগল গল্পটি আরো চমৎকার। গল্পটি স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর ও বেগবান। কোথাও অস্বাভাবিকত্বের এতটুকু ছায়া নাই; পড়িতে পড়িতে ক্রমেই ঔৎসুক্য বাড়িয়া উঠে। একটি স্বাধীন-চেতা নারীর একনিষ্ঠ শক্তির গুণে তার পাগল স্বামীর জীবন কী সুন্দর ভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তেজস্বিনী সত্যপরায়ণা নারায়ণীর চরিত্রে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। দৃপ্তা নারীর চরিত্র মনের উপর ছোপ রাখিয়া যায়। তবে নারায়ণী আর-একটু কম উগ্র হইলে ভাল হইত। গল্পটি বড় বাঙালী-ঘরের একটি নিখুঁত ছবি। গ্রন্থকারের ভাষায় কোথাও দৈন্য নাই। চরিত্র ফুটাইবার এবং সরল ও স্বাভাবিক ভাবে গল্প লিখিবার কল-কৌশল নরেশ-বাবুর সম্পূর্ণ আয়ত্ত। বইখানিতে যথেষ্ট শক্তি ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প-সাহিত্যে ইহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধানো সুন্দর। পাগল গল্পটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে, আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে।

পথ—আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খান লোহানী প্রণীত। প্রকাশক সেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রস্ আলী, কোহিনুর লাইব্রেরী, ৫৩।১ সি, ইলিয়ট্ রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

একখানি উপন্যাস। শেষের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন নামে একটি গল্প আছে। গল্পের প্লট মামুলি ধরণের—অস্বাভাবিকতায় পূর্ণ। বইটির দুই এক পরিচ্ছেদ কোন-রকমে পড়িয়া আর পড়িতে ইচ্ছা করে না। শেষ ভাগে ব্রজ, শশীমোহন, হেমনলিনী, ভূপেন-বাবু, সন্ন্যাসী ও আলাউদ্দিন সাহেবের দক্ষিণেশ্বরে অদ্ভুত ভাবে মিলন ঘটিয়াছে। তবে লেখক মুসলমান হইয়াও আমাদের হিন্দু-ঘরের অনেক খুঁটিনাটির সংবাদ রাখেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

প্রত্যাবর্ত্তন গল্পটি একেবারেই অস্বাভাবিক। আমজাদ আলী ছিলেন আদর্শ প্রেমিক। তাঁর পত্নী শরিফন্ মাতার অসুখে পিত্রালয় যাওয়ায় দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি চরিত্রহীনতার চরম সীমায় পৌঁছি-

লেন। ইহা স্বাভাবিক হয় নাই এবং একজন আদর্শ প্রেমিক স্বামীর পক্ষে সঙ্গতও নয়।

লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে, ভাষাও সরল। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আপনার লেখার ত্রুটিগুলি সংশোধন করিবেন। বইখানির ছাপা ও বাঁধানো সুন্দর

মনীষা—শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত, এম-এ, আই-সি-এস, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যোদয় প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

একখানি সামাজিক নাটক। বইখানিতে বিশেষ নূতনত্ব নাই। অমরের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু অপর চরিত্রগুলি তেমন স্পষ্ট হয় নাই। মনীষা, লীলা ও মন্নী বোসের চরিত্র মন্দ লাগে না। মনীষার কথাবার্ত্তায় স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকত্ব আছে যাহা পৌরাণিক নাটকেই সাজে, তবে লেখক মনীষার প্রথম জীবন পৌরাণিক ভাবেই গড়িয়াছেন। মোটের উপর বইখানি মন্দ নহে, মাঝামাঝি।

বাংলায় লেখা বইর গোড়ায় শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত লেখা শোভন হয় নাই; নামটা পুরাপুরি বাংলায় লিখিতে দোষ কি?

গৌরী বা ব্রাহ্মণের দুর্গোৎসব—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত। প্রকাশক শ্রীহীরালাল ঘোষ, এ-এম, আই-এম-ই (লণ্ডন), দার্জ্জিলিং। মূল্য ৸৹ বারো আনা।

একখানি নাটক।—নিতান্ত মামুলি একটি কাহিনী নাটকটির আখ্যানবস্তু। কোন চরিত্র ফুটাইতেই লেখক শক্তির পরিচয় দেন নাই। নাটকের প্রধান গুণ বৈচিত্র্যময় নানা ঘটনার সংযোগে এবং [illegible]চিত্র্যের মধ্য দিয়া মানুষের নানা অনুভূতিকে আলোড়িত ও সজাগ [illegible]রা তোলা। আলোচ্য নাটকখানি সে গুণ হইতে বঞ্চিত। থিয়েটার অপেক্ষা যাত্রার আসরে বইখানি জমিতে পারে। এই নব-যুগের দিনে এমন মামুলি বইর আদর হওয়া অসম্ভব। বইখানির বাঁধানো ও ছাপা ভাল।

—সত্যানন্দ।

ঘরের আলো—লেখক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক যোগেন্দ্র পারলিশিং হাউস, সালকিয়া, হাওড়া। ১৬৮ পৃষ্ঠা। দাম ১।০ পাঁচ সিকা।

ছোট এবং বড় সাতটি গল্প লইয়া এই বইখানি। কাঁচা হাতের লেখা, বড় জোর চলনসই বলা যাইতে পারে। লেখক কোনো জিনিষকেই মন দিয়া অনুভব করিয়া লেখেন নাই। কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, জলডুবি, চোরা, আধাকাটা, টুঁটিটেপা প্রভৃতি রাজ্যের যত রকমের মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া গল্পগুলিকে প্রাণস্পর্শী করিবার চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু একটি গল্পও মনকে ছুঁইয়া যায় না। জায়গায় জায়গায় গুরুগম্ভীর চাল একটু কমাইয়া চলিলে ভাষাটার সম্বন্ধে বড় কিছু বলিবার থাকিত না; সে ক্ষেত্রেও লেখকের অসাবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধ রামাশরবাবু পুত্রবধূ রাজলক্ষ্মীকে বলিতেছেন, "আচ্ছা, দেখে নিও বৌমা! এই পরকেশ বৃদ্ধ তার স্বেচ্ছাচারী পুত্রের এইবার কিরূপ কঠোর শাস্তি বিধান করে। জগৎপালিনী মা অন্নপূর্ণার শ্রেষ্ঠ দান এই তণ্ডুলকণা স্পর্শ করে আমিও শপথ করছি, যে দুর্বৃত্ত আমার অজ্ঞাতসারে আমার গৃহলক্ষ্মীকে নিরাভরণা করেছে, তার আর আমার বাড়ীতে স্থান নেই! তোমার দুরাদৃষ্ট স্বামীমুখে তুমি বঞ্চিতা হ'লে।" [illegible]টিলে কাহারো কাহারো মুখ হইতে খোট্টাই ভাষা, কাহারো বা ফিরিঙ্গি বুলি নির্গত হইতে শোনা যায়, কিন্তু "তাপস দুর্ব্বাসার মতো কোপাবিষ্ট" হইয়াও কেউ যে এমন অমরকোষ আবৃত্তি করিতে গিয়া পাণিনির শ্রাদ্ধ করিতে পারে তাহা জানা ছিল না।

সন্ধানী-আলো।

কৃষি-প্রবন্ধ।—শ্রীবাণেশ্বর সিংহ প্রণীত। গ্রাম রাটীশাল (জেলা শ্রীহট্ট) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার-ভূমিকায় বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।"—বাস্তবিকই ইহাতে সার মাটি, বীজ, জল সেচন ও ফলমূল প্রভৃতির চাষবাস সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা আছে। আজকাল অনেকেরই কৃষিকার্য্যের দিকে আগ্রহ দেখা যাইতেছে ও কেহ কেহ নিজ হাতে শাক-সব্জী, ফল-মূল ইত্যাদির চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এইরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হয়। বস্তুতঃ আমাদের কৃষি-সাহিত্য নাই বলিলেই চলে। কৃষি বিষয়ে পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। তবে সেগুলি সহজ সরল ঘরোয়া ভাষায় হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান পুস্তকের ভাষা স্থানে স্থানে খুবই শক্ত। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার পুস্তকের ভাষা আরও সহজ করিবার চেষ্টা করিবেন। পুস্তকের মূল্যও সাধারণের [illegible] কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভৈষজ্যমণিমালিকা।—প্রথম খণ্ড। ভিষগাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত প্রণীত। ৵৹ × ১২০ পৃঃ। মূল্য ৸৹। কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত প্রণীত।

গ্রন্থখানিতে কতিপয় ব্যাধির আয়ুর্ব্বেদোক্ত পাচন ও মুষ্টিযোগের মূল সংস্কৃত ও ছড়ার আকারে অনুবাদ লিখিত হইয়াছে। বাজারে দেশের যেমন 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্র দুরাস্তাং, অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকও ব্যাধি বিশেষ কঠিন না হইলে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন না। ব্যাধির প্রথম অবস্থায় একটু সাবধান থাকিয়া সামান্য পাচনাদি ব্যবহারেই অনেক সময় আরোগ্য হইতে দেখা যায়। সুপ্রতিষ্ঠিতনামা স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয় কেবল পাচন দ্বারাই চিকিৎসা করিতেন। এরূপ অবস্থায় আজকাল এরূপ গ্রন্থে দরিদ্র দেশের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থখানি নির্ভুল নহে। অনুবাদের ত্রুটিতে ঔষধাদির অনিষ্ট হইতে পারে শঙ্কায় কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। পাচন শীতল হইলে তাহাতে মধু দিতে হয় তাহা উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। উষ্ণ দ্রব্যে মধু দিয়া খাইলে শরীরে বিষক্রিয়া হইতে পারে। যদিও প্রক্ষেপ্য দ্রব্য কাথ্য হইতে সিকি দিতে হয়, কিন্তু পিপুল অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য দ্রব্য, তাহার আধতোলা প্রক্ষেপের বিধান (৭, ১২, পৃঃ প্রভৃতি) ঠিক হয় নাই। দুই তোলা পাচনের জিনিষের যে কাথ হয় তাহা পূর্ণ মাত্রা, তাহাকে দুইবারে খাইবার ব্যবস্থা (৫, ৯, ১৩, ৩৬ পৃঃ প্রভৃতি) আয়ুর্ব্বেদসম্মত নহে। এতদ্ব্যতীত ২৯ পৃঃ ১নং যোগ ৩৮ পৃঃ ১নং যোগ, ৪৭ পৃঃ ৪নং যোগ, ৬০ পৃঃ ২নং যোগ, ৭৮ পৃঃ ১১নং যোগ, ৮০ পৃঃ ৪নং যোগ, ৮১ পৃঃ ৬নং যোগ, ৮২ পৃঃ ৮নং যোগ, ১০২ পৃঃ ১নং যোগ, ১১২ পৃঃ ২নং যোগ প্রভৃতির অনুবাদ এতই বিকৃত হইয়াছে যে তাহা দ্বারা গ্রন্থকারের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডপ্রায় হইয়াছে।

আশা করি গ্রন্থকার গ্রন্থখানি পুনর্ব্বার আদ্যোপান্ত নিজে [illegible] অন্যকে দেখাইয়া একখানা শুদ্ধিপত্র এতৎসহই প্রকাশ করিবেন এবং ভাবী অন্যান্য খণ্ডগুলি [illegible] জন বিদ্বৎসমীপে আলোচনা করিয়া নির্ভুল মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

শেষ ও আরম্ভ

শ্মশানে রোজ যাই আসি। শ্মশান ভালবাসি বলিয়া রোজ সেথায় যাই না, আমার বড় ভালবাসার প্রিয় কোনো জনকে চিরতরে এখানে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছি—তাই নিত্য সেই বিসর্জ্জনের স্থানের মোহ আমায় এমনি করিয়া হেথায় টানিয়া আনে।

কখনো গঙ্গার বাঁধা ঘাটের সানের উপর, কখনো বা শ্মশানের সম্মুখের বসিবার ঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া নিত্য একই জিনিসের অভিনয় দেখিতাম। খট্টা কাঁধে করিয়া 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ, আদরের দেহ অগ্নিসাৎ করিবার আয়োজন উদ্যোগ, ডোমেদের চিতা সজ্জা—ধূ ধূ আগুনের লেলিহান লীলা—বাস্ সব শেষ!

এমনি বসিয়া বসিয়া সে দিন জীবলীলার শেষ অভিনয়ের যবনিকা পতন দেখিতেছি। রাত্রি বোধ হয় বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, বেশ স্বপ্নের মত একটু আরাম বোধ হইতেছিল।

কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না,—শ্মশানের দিকেও না, লোকজনের দিকেও না, চিতার দিকেও না,—নূতন মৃত-দেহ চিতায় ভস্ম হইতে আসিতেছে সে দিকেও না। কিছুই ভাবিতেছিলাম না—শূন্য মনে শুধু অবসাদ—শুধু স্বপ্ন।

কানে গেল "দেখ দেখ কেমন সুন্দর ফুলের মত মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে—যেন ঘুমুচ্ছে!"

'ফুলের মত মেয়েটি'—তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—স্বপ্নের মোহে উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—শরীরটাকে একটু সজাগ করিয়া লইলাম।

একদৃষ্টে মেয়েটির পানে চাহিয়া ছিলাম, চোখের পলক পড়িতেছিল না, মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম,—মাথা-ভরা কালো কেশের গুচ্ছ—তার মাঝে ফুটফুটে মুখখানি—চোখ দুটি মুদিত—মুখভাব শান্ত; যেন কত নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছে। চিত্রকর শত জনমের সাধনায় স্বপ্নে যেন এ মূর্ত্তির পরিকল্পনা পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

তার পায়ের দিকে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া, একবার মাথার দিকে—এ-পাশে ও-পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিয়া যেন আর আশা মিটিতেছিল না, তৃপ্তি হইতেছিল না। আধ-বিকশিত ফুলের মত মধুর এই ছবিখানি আজ কোন্ বাপ-মার ভরা বুক শূন্য করিয়া কোথায় চিরতরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। দু'দণ্ড দেখিয়া যাহাকে ছাড়িয়া দিতে আমার মত নিঃসম্পর্কের এত ব্যথা বোধ হইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইহার আপন জন কি করিয়া পারিল!

দেখিতে দেখিতে চিতা সাজানো হইয়া গেল। মেয়েটির গায়ে একটি সিল্কের জামা ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলিয়া সেই ফুলের মত কমনীয় দেহখানি চিতায় উঠাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। পাশের একটি ভদ্রলোক মেয়েটির বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "এখনো বেশ গরম আছে—না না এ মরেনি—মরতে পারে না—ঘুমুচ্ছে; ডাক্তার-বাবু একবার দেখুন না।"

আর-একটি ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া বক্ষ ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। যে ভদ্রলোক ডাক্তারকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি তখনও মেয়েটির বক্ষে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছিলেন—তাঁর সন্দেহ তখনও মেটে নাই।

জামার নীচে বুকের পাশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছিল মশায়?"

'নিউমোনিয়া।'

ঠাণ্ডা লাগার এত ভয়, ঠাণ্ডা লাগিয়াই হয়তো এ হইয়াছে—আজ মুক্ত গগনতলে অবিশ্রাম ঠাণ্ডা ভোগ কর ওগো ম্লান কুসুমকলি!

দেহ জলে ধৌত করিয়া কাঠের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল,—শুষ্ক কঠোর কাষ্ঠখণ্ড অমন ফুলের দেহ বক্ষে করিয়া আজ জ্বলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জন্ম সার্থক করিয়া গেল! এই কাষ্ঠ যখন জীবন্ত ছিল, তখন তার বুকে জীবন্ত ফুল হাসিয়াছিল; আজ সেও মৃত, তার বুকে যে ফুল ফুটিল তারও জীবনলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে।

আমি আর চাহিতে পারিতেছিলাম না,—পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখি একজন ভীমাকৃতি ডোম সিল্কের জামাটা হাতে তুলিয়া ধরিয়া ডাকিতেছে—"রে লাখিয়া—লাখিয়া—এ জামা তেরা আচ্ছা হবে, বহুৎ মানাবে।"

'লাখিয়া' ডাক শুনিয়া একটি তেম্‌নি চেহারার কালো মেয়ে দৌড়াইয়া আসিয়া জামাটি হাসিমুখে তার বাবার হাত হইতে তুলিয়া লইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিয়ের ফুল

(৮)

সুমতির ঘরে আনন্দ-বাবু ও সেবা খাইতে বসিয়াছেন, পাচক ব্রাহ্মণ এঁদের ভাত দিয়া হীরকের ভাত লইয়া তাকে খাওয়াইয়া দিতে গেল; সে-ই রোজ হীরককে খাওয়াইয়া দ্যায়। বামুন-ঠাকুর ভাত মাখিয়া হীরককে খাওয়াইয়া দিতে দিতে এক গ্রাসের কয়েকটি ভাত হীরকের গায়ে পড়িয়া গেল। হীরক অমনি ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—তুমি কি কাণা, দেখ্‌তে পাও না? গায়ে কত ভাত ফেল্‌লে দেখ দেখি, নিয়ে যাও তোমার ভাত, আমি আর খেতে চাইনে। কত দিনে যে তোমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব তা জানিনে।

বামুন বেচারা ভয়ে থতমত খাইয়া মিনতি করিয়া বলিল—আর দুটি খান বাবু, কিছুই যে খাওয়া হল না.. ...

হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—আমি আর খাব না বলছি.....

বামুন আবার মিনতি করিয়া বলিল—আমি এবার সাবধান হয়ে খাইয়ে দেবো বাবু।

হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার কথা তুমি শুন্‌বে কি না বলো। আমি খাব না, কিছুতেই খাব না...

সুমতির ঘর হইতে হীরকের চীৎকার শোনা যাইতেছিল। সেবা খাইতে খাইতে হাত গুটাইয়া কান খাড়া করিয়া একবার হীরকের চীৎকার শুনিল, তারপর আনন্দ-বাবুকে বলিল—দাদামশায়, আপনি অনুমতি করুন, আমি উঠি।

আনন্দ-বাবু দেখিলেন সেবার পাতে মাখা ভাত পড়িয়া আছে, তা ফেলিয়াই সে উঠিতে চাহিতেছে। এতে তিনি বুঝিলেন যে সেবা হীরককে দেখিতে যাইবার জন্যই নিজের খাওয়া ফেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। সেবার হীরককে যত্ন করিবার আগ্রহ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দ-বাবু প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—হ্যাঁ ভাই, তুমি ওঠ।

অনুমতি পাইবা মাত্র সেবা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আনন্দ-বাবু প্রফুল্ল মুখ ফিরাইয়া সুমতির মুখের দিকে চাহিলেন, সুমতির মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেবা চটপট হাতমুখ ধুইয়া হীরকের ঘরে গিয়া ঢুকিল। তখন বামুন-ঠাকুর ভাতের থালা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জোগাড় করিতেছে; এবং লোকনাথ হীরকের গা হইতে ভাত খুঁটিয়া তুলিয়া ধোয়াইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সেবা ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

হীরক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—দেখুন না, গায়ে বিছানায় ঝোল-মাখা ভাত ছড়িয়ে কি কাণ্ড করেছে

সেবা বলিল—শুয়ে খেতে গেলে একটু ত পড়বেই বুকের ওপর একটা তোয়ালে ঢাকা দিয়ে নিলে, তাতেই পড়ে, গায়ে বিছানায় লাগে না। লোকনাথ দাদা একখানা ফর্‌সা শুক্‌নো তোয়ালে এনে দাও, আর একখানা বড় চাম্‌চে দাও। নিজের হাতে খাওয়া যায়, কিন্তু পরের হাতে খেতে ঘেন্না করে, হাতে ময়লা-টয়লাও থাকে।

হীরক হাসিয়া বলিল—হ্যাঁঃ, এইসব আনাড়িতেই ত চাম্‌চে কোরে খাওয়াতে পারবে! হাতে কোরেই খাওয়াতে পারে না।

সেবা কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমার ছোঁয়া ত খাবেন না, নইলে আমি খাইয়ে দিতে পারতুম।

হীরক হিন্দুঘরের ছেলে; আবাল্যের সংস্কারের বশেই এখন পর্য্যন্ত স্বজাতি বলিয়া পরিচিত লোকের ছোঁয়া ছাড়া অপর কোনো জাতির লোকের ছোঁয়া ভাত-তরকারী খায় নাই। এই সংস্কার অতিক্রম করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই বা তেমন কোনো অবস্থাতেও সে এতদিন পড়ে নাই, তাই সে এতদিন এ বিষয়ে কিছু ভাবেও নাই। আজ সেবার কথা শুনিয়া তার মন এ সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিল: একে সেবা মেয়েমানুষ, তায় তরুণী, তায় সদ্যপরিচিতা অভ্যাগত অতিথি, তাকে কোনো আচরণে নিজের চেয়ে হীন ও ছোট বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করিতে হীরকের সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হইল, তার কোমল অন্তর ব্যথা বোধ করিল। তাই বহুদিনের সংস্কার অতিক্রমের চেষ্টা ও অপরের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠতা গোপনের প্রয়াসে একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনার ছোঁয় আমি খাব না কে বল্‌লে? আপনি বরং খাইয়ে দিয়ে দেখুন

সেবা হীরকের এই নিমন্ত্রণে উৎফুল্ল হইয়া চাপা খুসীর

হাসিতে উজ্জ্বল মুখে হীরকের মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লোকনাথ ফর্‌সা তোয়ালে ও একটা বড় রূপোর চাম্‌চে আনিয়া হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে সেবার দিকে সেই-সব আগাইয়া ধরিল। সেবা শিক্ষিতার নিপুণ হাতে হীরককে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে হীরকের মনে হইতেছিল—রমা কিন্তু এই কাজটি এমন করিয়া করিতে পারিত না।

খাওয়া হইলে সেবা হীরকের মুখ ধোয়াইয়া দিল। হীরক হাসিয়া বলিল—আজ আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম। আপনি এখন খেয়ে একটু বিশ্রাম করুনগে। আমি আর চেঁচিয়ে আপনার বিশ্রামের বিঘ্ন করব না।

সেবা নীরব হাসিতে হীরকের ভদ্রতায় সন্তোষ জানাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেবা যখন আবার সুমতির ঘরে গিয়া ঢুকিল তখন তার মুখে মনের খুসীর আভা আসিয়া পড়িয়াছে; সে যে আজ একদিনেই হীরকের কিছু অসুবিধাও দূর করিয়া তাকে কিছুও প্রীত করিতে পারিয়াছে এই কৃতকার্য্যতার কৃতার্থতা তার মনকে আনন্দ-দোলায় দোল দিতেছিল, এবং তার মুখে তারই আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সেবাকে উজ্জ্বল মুখে ঘরে আসিতে দেখিয়াই সুমতিরও মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেবা ঘরে ঢুকিতেই তিনি হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন—এস মা, একবার আমার কাছে এস।

সেবা বুঝিতে পারিল—ছেলের আরামে মার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে; যে তাঁর ছেলেকে একটু সুখী করিতে পারিয়াছে, তাকে তিনি অন্তরের আনন্দ জানাইতে চাহিতেছেন। পাছে তিনি কিছু বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া সেবা সুমতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুমতি তার হাত স্নেহভরে ধরিয়া শুধু বলিলেন—তুমি একবার আমার কোলের কাছে বোসো।

সেবা কুণ্ঠিত হাসিমুখে সুমতির বিছানায় বসিল। সুমতি ডাকিলেন—কামিনী, বামুন-ঠাকুর ভাত আন্‌ছে কি না দ্যাখ্।

সুমতি যে সেবার হীরককে যত্ন করার কথা কিছু বলিলেন না, এতে সেবা আরাম বোধ করিল। সে এবার সহজভাবে বলিল—আবার ভাত কেন মা। আমি ঐ ভাতই খেতাম।

সুমতি সেবার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন—না মা, ও উচ্ছিষ্ট ভাত কি খায়? অনেকক্ষণ থালা পোড়ে রয়েছে।

সেবা সুমতির স্নেহের স্পর্শে অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিল। কামিনী ঘরের এঁটো পরিষ্কার করিতে লাগিল।

সেবার খাওয়া হইলে সুমতি বলিলেন—যাও মা, এখন একটু গড়াওগে।

সেবা সুমতির ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু শুইয়া বিশ্রাম করিতে নয়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে যত আল্‌মারী দেরাজ বাক্‌স তোরঙ্গ ছিল, সেবা লোকনাথ ও কামিনীকে সঙ্গে লইয়া চাবি চিনিয়া চিনিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল, কার মধ্যে কি কি জিনিস আছে; সেইসব জিনিস দেখিতে দেখিতে যেগুলি পীড়িতদের কাজে লাগিবে বলিয়া সেবার মনে হইতেছিল, সেইগুলি সে বাহির করিয়া রাখিতে লাগিল।

সমস্ত দেখা হইয়া গেলে সেবা লোকনাথ ও কামিনীকে বলিল—তোমরা এখন খেতে যাও। মা আর বাবুকে আমি দেখ্‌ব।

লোকনাথ ও কামিনী চলিয়া গেল। সেবা আস্তে আস্তে বাগানে নামিয়া গেল। বাগানে পা দিয়াই সেবার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—এই বাগান এখন উপভোগ করিবে একা সে। সেবা ডালপালা-সুদ্ধ ফুল তুলিতে তুলিতে একবার সমস্ত বাগান বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিল যখন, তখন তার দুই হাত এক পাঁজা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেবা নিজের ঘরে গিয়া নিজের বাক্স খুলিয়া দুটি বড় সুন্দর জাপানী ফুলদানী বাহির করিল; এই ফুলদানী দুটি বাঁশের কাঁপা চোঙা, তার গায়ে জাপানী কারিগরের নিপুণ হাতের বিচিত্র নক্সা ও ছবি খোদা ও আঁকা আছে। সেবা এই ফুলদানী দুটি একবার প্রাইজ পাইয়াছিল। এতদিন ত এগুলি কোনো কাজে লাগে নাই। আজ এদুটিকে বাহির করিয়া হাতে তুলিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তার নক্সা ছবি কারুকার্য্য দেখিতে লাগিল—ফুল রাখিবার উপযুক্ত পাত্র বটে। দেখিতে দেখিতে

পুরাতন জিনিসের সঙ্গে নূতন পরিচয়ে সেবার মুখ মুগ্ধ মনের আনন্দে ফুলগুলির মতনই সুন্দর হইয়া উঠিল। সে তোড়া দুটিতে জল ভরিয়া তাতে ফুলগুলিকে সাজাইয়া রাখিল। তারপর দু হাতে দুটি ফুলদানী লইয়া সুমতির ঘরে হাসিমুখে গিয়া ঢুকিল।

সেবার দুই হাতের ফুলের তোড়ার মাঝখানে আর-একটি ফুলের তোড়ার মতন তার হাসি-হাসি মুখ ও আনন্দ-উজ্জ্বল চোখদুটি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সুমতি ডাকিলেন—এস গো ফুলরাণী, এই মরণচ্ছন্ন বাড়ীকে তুমি আবার প্রাণের ফুলকে সুন্দর আনন্দিত কোরে তুলছ।

সেবা লজ্জিত মুখে একটি ফুলদানী সুমতির পায়ের কাছে একটা তেপায়া টুলের উপর রাখিতে গেল। তাহা দেখিয়া সুমতি বলিলেন—এই ফুল হীরুর ঘরে দাওগে, সে ফুলের পাগল।

সেবা নত হইয়া ফুলদানী রাখিতেছিল, সেই অবস্থায় হাসিয়া মুখ কাত করিয়া সুমতির দিকে চাহিয়া বলিল—[illegible] আপনার ঘরে থাক, একটা ওঘরে দিয়ে আস্‌ছি।

সুমতি বিষণ্ণ হাসিতে দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন—আমার ঘরে আর ফুল কি হবে? তুমি ও-দুটোই হীরুকে দাওগে।

সেবা লজ্জিত হাসিমুখে দুটি ফুলদানী হাতে তুলিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—দুটোই ওঘরে দেবো তা হলে?

সুমতি ঘাড় কাত করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হীরুর খাটের দুপাশে দুটো সাজিয়ে দাওগে।

সেবা ফুলদানী দুটি হাতে করিয়া হীরকের ঘরে গিয়া ঢুকিল, তখন লজ্জায় তার মুখ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সেবাকে ফুল লইয়া আসিতে দেখিয়া হীরকের দৃষ্টিও অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া তাকে অভ্যর্থনা করিল। সেবা হীরকের খাটের দুপাশে দুটি উঁচু টুলের উপর ফুলদানী দুটি নামাইয়া রাখিতে গেল। হীরক চোখ ঘুরাইয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ! কী সুন্দর ফুলদানী দুটি! আপনি আমার চোখের সাম্‌নে একটু তুলে ধরুন অনুগ্রহ কোরে, আমি একবার ভালো কোরে দেখি।

সেবা খুসী মনে হাসিমুখে ফুলদানী তুলিয়া হীরকের চোখের সাম্‌নে ধরিল এবং ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া বাঁশের চোঙার গায়ে কারুকার্য্য দেখাইতে লাগিল। হীরক আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ! খুব সুন্দর! এ দুটি আপনার, না?

সেবা বলিল—হ্যাঁ, আমি একবার প্রাইজ পেয়েছিলাম।

হীরক উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—আপনি কেমন কোরে জান্‌লেন যে আমি ফুল ভালোবাসি? মা বলেছেন বুঝি?

সেবা বলিল—ফুল নিয়ে আস্‌ছিলাম যখন তখন মার কাছে শুন্‌লাম আপনি ফুল ভালোবাসেন। আমি নিজে ফুল খুব বেশী ভালোবাসি, তাই মনে হলো ফুল দেখ্‌লে আপনিও খুসী হবেন হয়ত।

হীরকের চোখ মুখ কৃতজ্ঞ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—আপনিও বুঝি ফুল খুব ভালো-বাসেন? এখানকার বাগান মালী সব আপনি নিজের মনে তোরে সব ফুল আপনি নেবেন। এই-রকম ফুলদানীতেই ফুল মানায়। এ ফুলদানী আপনার ঘরে সাজিয়ে রাখ্‌লেন না কেন?

সেবা সে প্রশ্নের উত্তর কেবল হাসিয়া দিয়া ফুলদানী দুটি টুলের উপর রাখিয়া দিল। তারপর বলিল—চারটে বাজে, আপনার খাবার সময় হয়েছে। আমি আপনার খাবার নিয়ে শিগ্‌গির আস্‌ছি।

হীরক বলিল—আপনি কেন কষ্ট কর্‌বেন? লোকটা নিয়ে আস্‌বে এখনি।

সেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল—আমি এখনি আস্‌ছি।

সেবা চলিয়া গেলে হীরক অনুভব করিল সেবা কাছে থাকিলে সে আনন্দ অনুভব করে, তার অদর্শনে মনে অভাব বোধ হয়। এক বেলার যত্নেই সেবা তার অতীব আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে। সে একলা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে, চাকরদাসী ভিন্ন আর কেউ তার সঙ্গী নাই, কারো সঙ্গে একটা মনের কথা বলিবার উপায় ছিল না; এখন এমন একজন লোক তার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে যে তার আত্মীয়ের মতন কেবল যত্নই করিবে না, যার সঙ্গে বন্ধুর মতন বিশ্বসংসারের অনেক বিষয়েরই আলোচনা করিয়া বিশ্বসংসার হইতে বিচ্যুত থাকার অভাব ও দুঃখ

লাঘব করিতে পারিবে। এই বন্দীদশার সহচরী হইয়া সেবা তার পরলোক-যাত্রার অপেক্ষার দুঃখটা ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে, কিন্তু শীঘ্র যে তার মৃত্যু হইবে এ সম্বন্ধে হীরকের কোনো সন্দেহ ছিল না; রমাকে ছাড়িয়া সে যে এখনো বাঁচিয়া আছে, সে কেবল তার মার জন্য, মা গেলেই সেও সঙ্গে-সঙ্গে যাইবে নিশ্চয়।

হীরকের চিন্তায় বাধা দিয়া সেবা ঘরে আসিয়া ঢুকিল—তার মুখে হাসি, সর্ব্ব অবয়বে তৎপর নিপুণতার চঞ্চলতা, আর তার দুই হাতে বাটি গেলাস রেকাবি। সেবা হীরকের খাটের পাশে আসিয়া হাতের সামগ্রী টুল তেপায়া টেবিলের উপর নামাইয়া নামাইয়া রাখিতে লাগিল। সেই-সব জিনিসের মধ্যে ফিডিংকাপ দেখিয়া হীরক বলিল—ফিডিং-কাপ পেয়েছেন যে দেখ্‌ছি।

সেবা ফিডিংকাপে বেদানার রস ঢালিয়া হীরকের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—হ্যাঁ, খুঁজে বার কোরে সাবান দিয়ে ধুয়ে এনেছি। এটুকু খেয়ে ফেলুন।

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—ওতে কি?

সেবা বলিল—বেদানা আর আনারসের রস কোরে এনেছি।

হীরক বলিল—এসব আমাকে এতদিন চিবিয়ে খেতে হত আর ছিব্‌ড়ে ফেল্‌তে গাময় পড়্‌ত।

সেবা হীরকের কথার মধ্য হইতে তার খুসী ও কৃতজ্ঞতার আভাস পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া শুধু হাসিল। হীরক ফলের রস পান করিতে লাগিল। বাটির মুখনলে চুমুক দিয়াই তার হঠাৎ মনে হইল এই বাটিটা পাওয়াতে তার খাওয়ার সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু এটা না পাওয়া গেলে সেবা তাকে বাহুবেষ্টনে তুলিয়া খাওয়াইত। এর কোন্‌টাতে যে তার তৃপ্তি বেশী হইত তাহা আর না ভাবিয়াই হীরক বলিল—বাটিটা ভাগ্যিস পেলেন, নইলে আপনাকে বার বার আমায় টেনে তুলে খাওয়াতে হত। আপনার তাতে কষ্ট হত।

সেবা হাসিয়া বলিল—আমার কষ্টের চেয়ে আপনার কষ্ট হত বেশী, আপনি অসুস্থ।

হীরক চুপ করিয়া রহিল, সেবার এই কথায় তার মন সায় দিল না।

সেবা হীরককে খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে একটু অনুযোগের স্বরে বলিল—আপনি ডাক্তার দেখান না, ওষুধ খান না কেন?

হীরক হঠাৎ উষ্ণ হইয়া উঠিয়া বলিল—ডাক্তারের নাম আমার কাছে করবেন না। ওরাই ত আমার সর্ব্বনাশ করেছে। রমাকে যদি না বাঁচাতে পার্‌ল তবে আমায় বাঁচাল কেন এইরকম বেঁচে মোরে থাক্‌বার জন্যে? যত শিগ্‌গির আমি মর্‌তে পারি.....

হীরকের কথা তখনো শেষ হয় নাই, কামিনী ঝি ছুটিয়া আসিয়া সেবাকে বলিল—দিদিমণি, দিদিমণি, মার মূর্চ্ছা হয়েছে, শিগ্‌গির আসুন।

সেবা কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইতে যাইতে লোকনাথকে বলিয়া গেল—লোকনাথ-দাদা, শিগ্‌গির ডাক্তার-বাবুকে ডাক্‌তে বলো।

(৯)

অনেক চেষ্টার পর সুমতির জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মৃত্যু ক্রমশই আসন্ন হইতেছে। একটু কথা বলিতে পারিয়াই তিনি চোখের ইসারায় অস্ফুট স্বরে সেবাকে কাছে ডাকিলেন। সেবা তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি মা?

সুমতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরুর কাছে কে আছে?

সেবা বলিল—লোকনাথ-দাদা আছে।

—তুমিই তার কাছে-কাছে থেকো মা, তুমিই তাকে দেখো।

—আমি ত তাঁর কাছেই ছিলাম। আপনার মূর্চ্ছা হতে.....

—আমার জন্যে তোমায় কিচ্ছু কষ্ট করতে হবে না, আমার ত সময় ফুরিয়ে এল বোলে। আমি হীরুকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি—তুমি তাকে সুস্থ কোরে তুলো।

—আমি প্রাণপণে তাঁর যত্ন করব। তিনি নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠ্‌বেন। তাঁর চেহারায় রোগের ত কোনো চিহ্ন নেই; তাঁর অসুখ মনের।

সুমতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সেই অসুখ সারাবারও ভার তোমাকেই নিতে হবে। আমার তোমার অভাবেই তার মন ভেঙে পড়েছে। সেই অভাব তোমাকে পূরণ করতে হবে। আমার হীরুকে তুমি বিয়ে করো। তা হলে তুমি তাকে নিজের জেনে যত্ন করবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব।

সেবা সুমতির এই অবস্মাৎ প্রস্তাবে অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ কথার যে কি উত্তর দিবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। হীরক সুন্দর সুপুরুষ ধনী, কিন্তু পক্ষাঘাতে শয্যাগত; তাকে বিবাহ করিলে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যে তার অধিকার জন্মিবে, কিন্তু জীবনটা হয়ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। হীরক যদি ভালো নাই হয়? যদি সে বেশীদিন নাই বাঁচে? তবে সেবার কি অবস্থা হইবে?

সেবাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, যেন তার মনের কথা টের পাইয়া সুমতি বলিলেন—হঠাৎ এই প্রস্তাবে মত দেওয়া কঠিন বোধ হবে জানি। কিন্তু আমার ত আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। খুব খারাপ দিকটাই মেনে নিয়েই তুমি ভেবে দ্যাখো—হীরু যদি শিগ্‌গির মরাই যায়, কি বহুকাল শয্যাগতই থাকে, তাহলেও এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমার হবে। এই অর্থের বিনিময়েই তোমার সামর্থ্য আমি কিন্‌তে চাচ্ছি—এখন শুধু এইটেই ভেবে নাও। তুমি মনে করো যে তুমি মাইনে নিয়ে হাসপাতালের রোগীরই পরিচর্য্যা করছ। কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে এই মনে হচ্ছে—তোমার ভালোবাসা পেলে হীরু ভালো হয়ে উঠবে। মা-ছোড় অসহায়কে দয়া কোরে যত্ন করতে করতে তাকে হয়ত তুমিও ভালোবাসতে পারবে। ঐ লোহার সিন্দুকটা খোলো ত মা। ওর ভেতর একটা হাতবাক্স আছে, সেইটে বার কোরে আনো।

সেবা উঠিয়া গিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল; এবং সুমতির নির্দ্দেশ-মতো তাহা খুলিয়া তাঁর সাম্‌নে রাখিল।

সুমতি বলিলেন—ওর মধ্যে একটা মেডেল-গাঁথা হার আছে, বার করো ত মা।

সেবা সেই হারগাছি বাহির করিল; সেই হারছড়া দুইহাতে ছড়াইয়া ধরিয়া তাতে মেডেলের সারি দেখিয়া সেবার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুমতি বলিলেন—ঐ অতগুলো মেডেল তোমার হীরুর পৌরুষের উপার্জ্জন। এই লোক কি এই রোগ কাটিয়ে ভালো হয়ে উঠ্‌তে পারবে না? তুমিই ত বললে মা, তার রোগ দেহে নয়, মনে। সেই মন চিকিৎসার ভার নাও তুমি, তার সহধর্ম্মিণীর অভাব পূরণ কোরে

সেবা চুপ করিয়া হারগাছির দিকে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল।

আনন্দ-বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সুমতি কথা কহিয়া ক্লান্ত হইয়া চুপ করিলেন এবং সেবা চুপ করিয়া আছে দেখিয়া আনন্দ-বাবু সেবাকে বলিলেন—এতে এত ভাব্‌নার কি আছে ভাই? তুমি মত দাও এই বিয়েতে—হীরক বড় ভালো ছেলে, সকল বিষয়ে সে তোমার যোগ্য হবে। তা না হলে আমি কখনো তোমায় এখানে আন্‌তাম না।

সেবা আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া আনন্দ-বাবু ও সুমতির মুখের দিকে শুধু চাহিল, কিছু বলিতে পারিল না। তার মনের মধ্যে তখন দ্বিধার দ্বন্দ্বের দোলা হাঁ ও নার মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল; একবার তার ইচ্ছা হইতেছিল স্বীকার করিতে, আর-একবার তার ভয় হইতেছিল—হীরক যদি ভালো না হয়, হীরক যদি মারা যায়, তবে?

সেবাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আনন্দ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তবে আমি হীরককে বল্‌তে যাচ্ছি।

সেবা বারণ করিতে যাইতেছিল। সুমতি এতক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; সেবার মুখে আপত্তির আভাস ফুটিয়া উঠিতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি অস্বীকার কোরো না মা। আমার মর্‌বার সময় আমায় এই ভিক্ষাটি দয়া কোরে দাও। তুমি আমাকে মা বোলে স্বীকার করেছ, মার অন্তিম ভিক্ষা পূর্ণ করো।

সেবা পাছে অস্বীকার করে এই ভয়ে ও উত্তেজনা এবং অনেক কথা বলায় ক্লান্তিতে সুমতির আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, তিনি মূর্চ্ছাচ্ছন্ন স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বলো মা বলো, আমি তোমার মুখ থেকে স্বীকার শুনে মরি।

সেবা তাড়াতাড়ি ষ্ট্রীক্‌নিন ও ডিজিট্যালিস ট্যাব্‌লেট্ জলে গুলিতে গুলিতে ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না মা, আপনারা যা বল্‌বেন আমি তাই কর্‌ব।

সুমতির আবল্য-আচ্ছন্ন মুখে সন্তোষের আভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবিষ্ট-চেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন, মনের আনন্দ তাঁকে সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা হইতে রক্ষা করিল।

আনন্দ-বাবু সেবাকে বলিলেন—তুমি এঁকে ছাখো, আমি তাহলে হীরকের কাছে যাই।

সেবা ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইল।

আনন্দ-বাবু হীরকের ঘরে গিয়া ঢুকিতেই হীরক উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—জ্যাঠামশায়, মা, কেমন আছেন? আপনি ঠিক কোরে বলুন। এদের জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেবল বলে—ভালো আছেন, ভালো আছেন।

আনন্দ-বাবু হীরকের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়্‌ছে। হার্টের অবস্থা বড়ই খারাপ। কখন্ কি হয় বলা যায় না।

হীরক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মাও আমাকে ফেলে চোলে যাবে? আমিই একলা এই অবস্থায় পোড়ে থাক্‌ব?

আনন্দ-বাবু হীরকের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—সেই ভাব্‌নাতেই ত তাঁর অবস্থা আরো শিগ্‌গির শিগ্‌গির খারাপ হয়ে পড়্‌ছে। একজন কারো ওপর তোমার ভার দিতে পার্‌লে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

হীরক বলিল—আপনারা ত এইখানেই থাক্‌বেন। মাকে কি বলেন নি?

আনন্দ-বাবু বলিলেন—বলেছি। কিন্তু আমরা ত বুড়ো হয়েছি, আমাদের ভরসা আর কদিনের?

হীরক কান্নার মধ্যেও হাসিয়া বলিল—আপনারা সবাই যাবেন আর আমিই থাক্‌ব? যত ভরসা কি এই পঙ্কাঘাতে পঙ্গু আমার?

আনন্দ-বাবু সান্ত্বনা-ভরা স্বরে বলিলেন—তুমি বলিষ্ঠ যুবা, তুমি ইচ্ছে কর্‌লেই ত এ অসুখ ঝেড়ে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে পারো।

হীরক ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যেন সে বাস্তবিকই ভালো হইয়া উঠিতেছে এই ভয়ে জোর বলিয়া উঠিল—না না আমি ভালো হব না, আমি ভালো হতে চাইনে।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—তা'হলে ত তোমাকে দেখ্‌বার শোন্‌বার একটা লোকের আরো দর্‌কার। সেই কথাই ত তোমার মা আমাকে বল্‌তে পাঠিয়েছেন।

হীরক উৎসুক কৌতূহলে দৃষ্টি ভরিয়া আনন্দ-বাবুর মুখের দিকে চাহিল। আনন্দ-বাবু বলিতে লাগিলেন—এমন একজন লোক তোমার দর্‌কার যার একসঙ্গে তিনটি গুণ আছে—প্রথম, সে অল্পবয়সী হবে; দ্বিতীয়, সে মেয়ে হবে; তৃতীয়, সে আপনার ভেবে প্রাণের টানে তোমার যত্ন কর্‌বে। এমন লোক সেবা। সেবা তোমার ভার নিলে তোমার মা নিশ্চিন্ত হতে পারেন বল্‌ছেন।

হীরক উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেবা কি এতে কিছু আপত্তি কর্‌ছেন?

আনন্দ-বাবু বলিলেন—না, সেবা স্বীকার করেছে।

হীরক উৎফুল্ল হইয়া বলিল—তবে আর মার ভাবনা কিসের? সেবা একদিনেই ত আমাদের আপনার কোরে নিয়েছেন।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—কিন্তু সেবা অবিবাহিতা, তার বিয়ে না হলে ত তার তোমার কাছে থাকা সঙ্গত হবে না।

হীরক বলিল—তা তিনি বিয়ে করুন না; তাঁর যাকে ইচ্ছে হয় বিয়ে করুন; তাঁদের যাতে কিছুর অভাব না হয় তার ব্যবস্থা আমি কোরে দেবো।

আনন্দ-বাবু বলিলেন—সেবার, তোমার মার, আর আমার ইচ্ছে যে তুমিই সেবাকে বিয়ে করো—তা'হলে আর.....

হীরক ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জ্যাঠামশায়! আপনারা কি পাগল হয়েছেন! বিয়ে কর্‌বার মতন অবস্থাই আমার বটে! রমা মরেছে এখনো দশদিন পেরোয়নি, আমি মর্‌তে বসেছি, মা মর-মর, বিয়ে কর্‌বারই সময় ত এই! সেবা ত কচি খুকি নয় যে তাকে যে সৎপাত্রে সম্প্রদান কর্‌বেন তাকেই পতিদেবতা বোলে পুজো কর্‌বে, আর মন যদি বিদ্রোহী হয়ও তখনো অদৃষ্ট বোলে সান্ত্বনা খুঁজ্‌বে?.....

আনন্দ-বাবু বলিলেন—সেবা তোমাকে বিয়ে কর্‌তে স্বীকার করেছে।

হীরক বলিয়া উঠিল—কিসের লোভে? আমি মোরে গেলে আমার জমিদারী তার হবে বোলে? তা আমি দেতে দেবো না। কালই আমি সমস্ত সম্পত্তি রমার নামে মেয়ে-স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে দান করব।

আনন্দ-বাবু কোমল স্বরে বলিলেন—তোমরা এই-রকম ভাব্‌বে বোলেই সেবা এখানে আস্‌তে চায়নি; তোমার মার আগ্রহে আমার কথাতেই সে এসেছে। তুমি যদি তোমার সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষার জন্যে দান করো, তাতে আমরাও যেমন খুসী হব, সেবাও তেম্‌নি খুসী হবে। মেয়েদের শিক্ষা পাওয়া যে কত দর্‌কার তা তার চেয়ে আর কেউ বেশী নিজে ভুগে বোঝেনি।

আনন্দ-বাবুর কথায় সেবার উপর হীরকের বিরাগ অনেকখানি কমিয়া আসিল। তবু সে তীব্র বিরক্তির স্বরে বলিল—না না, অক্ষম আমাকে নিয়ে আপনাদের এরকম ছেলেখেলা আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আমার জন্যে কারো ভাব্‌তে হবে না, কারো আমার ভার নিতে হবে না; এই ঘরে আমাকে একলা পোড়ে থাক্‌তে দিন, আমাকে আপনা হতে মর্‌তে দিন, আপনারা আমাকে মার্‌বেন না।

হীরক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। এই কয়দিন সে অনড় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল, আজ বিরক্তির উত্তেজনায় তার ঘাড় ফিরাইবার ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ের পেশী ও স্নায়ুর কার্য্যশক্তি ফিরিয়া আসিল। বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হীরকের মন তার শক্তির এই প্রত্যাবর্ত্তন অনুভব করিল না, কিন্তু আনন্দ-বাবুর চক্ষু ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি এই অবস্থায় হীরকে তার অধিক উত্তেজিত করা উচিত নয় মনে করিয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আনন্দ-বাবুকে প্রফুল্ল মুখে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুমতির মুখও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং সেবার মুখ লজ্জায় বিকশিত হইয়া অবনত হইয়া পড়িল, তাঁরা দুজনেই মনে করিলেন আনন্দ-বাবু হীরকের স্বীকার পাইয়া আসিয়াছেন। আনন্দ-বাবু নিকটে আসিলে সুমতি বলিলেন—তবে পুরুত-ঠাকুরকে খবর পাঠিয়ে দেন, আজ রাতই দু হাত এক করা দেখে আমি সুখে মরি।

আনন্দ-বাবু প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন—হীরক বিয়ে কর্‌তে রাজি হচ্ছে না যে কিছুতেই।

সুমতির মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; এবং সেবার মুখ প্রত্যাখ্যানে লজ্জায় কালো হইয়া গেল। সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে আপনি অমন খুসী হয়ে ফিরে এলেন যে

আনন্দ-বাবু আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিলেন—হীরক আজ নিজে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে শীগ্‌গির ভালো হয়ে উঠ্‌বে।

আনন্দে সুমতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেবাও লজ্জা ভুলিয়া হাসি-হাসি মুখ তুলিয়া আনন্দ-বাবু ও সুমতির আনন্দে যোগ দিল।

এমন সময় লোকনাথ ধুনার ধোঁয়া লইয়া ঘরে আসিল এবং ধুনুচি রাখিয়া সেবাকে বলিল—খোকা-বাবুর খাবার সময় হয়েছে।

সেবা অনেকক্ষণ হীরকের কোনো খোঁজ লয় নাই বসিয়া তার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তার বিবাহের প্রস্তাব হওয়াতেই তার হীরকের কাছে যাইতে অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল; এখন ত হীরক তাকে প্রত্যাখ্যান করাতে তার লজ্জার অবধি ছিল না, কর্ত্তব্যের আহ্বানেও সে লজ্জার সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছিল না। লোকনাথ আসিয়া যখন ডাকিল, তখন তার অত্যন্ত কঠিন বিপদ বোধ হইল। সে মুখ রাঙা করিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল—যাওয়া ও না-যাওয়া দুই তার পক্ষে তখন সমান কঠিন। সুমতি তার কুণ্ঠিত সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন—যাও মা, তুমি হীরুকে খাইয়ে দিয়ে এস।

সুমতির আদেশে বাধ্য হইয়া সেবা সঙ্কোচ-স্খলিত মন্থর গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু হীরকের ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইতে তার যেন মাথা কাটা যাইতেছিল। সে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বারান্দার পাশে একটা বাতাবী-নেবুর গাছ ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং কোথায় একটা শিউলি-গাছ আজ হইতেই ফুলের ডাকে বাতাসকে একেবারে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকারে ঘন গন্ধের মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া সেবা লজ্জাসঙ্কোচ সব ভুলিয়া গেল—সে হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া

পাতাসুদ্ধ নেবুফুল তুলিয়া তুলিয়া কোঁচড় ভরিতে লাগিল। নিজের হাতে ফুল তুলিতে পারার আনন্দে তার মুখখানিও ফুলের মতন প্রফুল্ল ও অন্তর মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। ফুল পাড়িতে-পাড়িতেই তার মনে হইল বিকাল-বেলা সুমতি বলিয়াছিলেন—হীরু ফুলের পাগল, ফুল তাকেই দাওগে। সেবা হাতে কোঁচড়ে ফুল লইয়া হীরকের ঘরে যাইতে গিয়া দরজার কাছে আবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তার আবার মনে হইল—এই তরুণ অপরিচিত সুন্দর যুবার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং সে তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এমন সময় হীরকের কথা তার কানে গেল—আ! কোথা থেকে নেবুফুলের চমৎকার গন্ধ আস্‌ছে!

লোকনাথ বলিল—ঐ বারান্দার ধারের গাছটায় খুব ফুল হয়েছে। তুলে আন্‌ব?

হীরক কোনো জবাব দিল না, তার মনে পড়িল সেবাকে; সে বিকাল-বেলা না চাহিতে কত ফুল আনিয়া তাকে উপহার দিয়া গেছে, আর এখন এই বুড়াটার কাছে চাহিলে তবে ফুল মিলিবে, নয়ত নয়; সে যে ফুল ভালোবাসে এবং ফুলের গন্ধ পাইয়া যে সে নিজের আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিল, কেবল সেইটুকুর দরদে না-চাহিতেও দিতে পারার মতন লোক কেউ নাই? হীরক অভিমানে বিরক্ত হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—আমি খেতে-টেতে পাব? আজ সকাল থেকে বাড়ী-সুদ্ধ লোকের তোদের কোন্ ভূতে পেয়েছে?

হীরকের ভিরস্কারে আকৃষ্ট হইয়া সেবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরের মধ্যে পা দিতেই বড় আলোর উজ্জ্বল দীপ্তি সুবর্ণ-প্রলেপের মতন আসিয়া সেবার মুখে পড়িল, আর সেই শোভার আভা প্রতিফলিত হইয়া হীরকের চোখে পড়িতেই হীরক চমকিত হইয়া তার দিকে ফিরিয়া চাহিল—তখন সেবার মুখে বিবাহ-বিমুখ পুরুষের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার লজ্জা, হীরকের খাবার বিলম্বে নিজের কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য কুণ্ঠা ও ব্যগ্রতা, ফুল পাওয়ার আনন্দের তৃপ্তির সঙ্গে হীরকের প্রশংসিত ফুল তাকে আনিয়া দিতে পারার উৎসুক আগ্রহ, এবং সমস্তর উপর প্রলেপের মতন হীরক যদি তাকে বিবাহ-প্রস্তাব হওয়ার জন্য কিছু বলে তার ভয়ের সঙ্কোচ তাকে অপরূপ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। হীরক যাকে উদ্দেশ করিয়া এখনি ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, সে তখনি-তখনি একেবারে দেববালার রূপ ধরিয়া তার দৃষ্টিকে মুগ্ধ সার্থক অতৃপ্ত করিয়া আবির্ভূত হইল! হীরক ত সুন্দরী ঢের-ঢের দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অপরিসীম শ্রী ও অনুপম লাবণ্য ত কোনো রমণীর মধ্যে দেখে নাই—এ ত শুধু রমণী নয়, এ যে রমণীয়! হীরক অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টি প্রশংসায় ভরিয়া সেবার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হীরকের চোখে আনন্দ ও মুখে সন্তোষ দেখিয়া সেবার সঙ্কোচ কুণ্ঠা ভয় দূর হইয়া গেল, তারও মুখ আবার এক অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল, যেন চন্দ্র-সহোদরা শ্রীদেবী বৈকুণ্ঠে প্রথম পদার্পণ করিলেন। সেবা হাসিয়া বলিল—আপনার জন্যে ফুল পাড়্‌তে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গেল। লোকনাথ-দাদা, বামুন-ঠাকুরকে খাবার দিয়ে যেতে বলো।

লোকনাথ হীরকের উপচিত আনন্দে সুখী হইয়া প্রসন্ন মনে প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল, এবং সেবা নেবুফুলগুলি হীরকের বিছানার ধারে ধারে সাজাইয়া রাখিতে ব্যাপৃত হইল। না চাহিতে পাওয়ার সুখের আতিশয্যে হীরক কোনো কথা বলিতে পারিতেছিল না। পরের ইচ্ছা খুঁজিয়া পূরণ করে এমন মমতাময়ী মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া হীরকের এখন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; সেবা না-জানি কত আঘাত পাইয়াছে। তবু সে সেই বেদনা গোপন করিয়া আঘাতকারীকেই সেবা করিতে আসিয়াছে হাসিমুখে,—এর কৃতজ্ঞতায় হীরকের মন সেবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া উঠিল। বামুন-ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, সেবা হীরককে খাওয়াইয়া আঁচাইয়া দিল, লোকনাথ উচ্ছিষ্ট খাবারের থালা লইয়া চলিয়া গেল—এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলিতে পারিল না। সেবাই নীরবতার সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি এখুনি ঘুমুবেন?

হীরক বলিল—ঘুম ত আমার হয় না। চোখ মেলে পোড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সেই ভোরবেলা একটু ঘুম আসে।

সেবা বলিল—আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি দেখুন।

হীরক হর্ষবিষাদে হাসিয়া বলিল—কেন আপনি পণ্ডশ্রম করবেন? আমার ঘুম আসবে না।

সেবা বলিল—আমি মাসাজ্ করতে জানি। মসাজ্ কোরে দিলে নার্ভস্ সুদ্ধ হয়, আর তাতে আপনি ঘুম আসে। আমি অনেক ইন্‌সমনিয়া পেশেণ্টকে এই-রকম কোরে ঘুম পাড়িয়েছি।

সেবার যত্ন করিবার আগ্রহ ও চেষ্টা দেখিয়া হীরক মুগ্ধ হৃদয়ে নম্রস্বরে বলিল—আপনি আমাদের জন্যে এত করছেন, আমাদের কোনো সাধ্য নেই যে আপনার কাছে কোনো রকমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমি যদি কখনো আপনার প্রতি কোনো রূঢ় ব্যবহার কোরে ফেলি, তাহলে আমার রূডনেস্ আপনি ক্ষমা করবেন। তাতে আপনাকে আমি অসম্মান করছি এ কিছুতেই আপনি বিশ্বাস করবেন না।

সেবা ক্ষিপ্রগতিতে হীরকের গায়ে হস্তচালনা করিয়া দ্রুতকম্পনে তার অঙ্গের পেশী স্নায়ু সংবাহন করিতে করিতে বলিল—আমি জানি যে আপনি ভদ্রলোক, আপনি কোনো অফেন্স মিন্ করতে পারেন না। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না—আপনি মনটাকে ডেক্যাণ্ট করতে চেষ্টা করুন ত—এখুনি ঘুম আসবে।

সেবার হস্ত-সঞ্চালনে হীরকের অঙ্গে-অঙ্গে যে দ্রুত কম্পন চলিতেছিল তারই একটা অনির্ব্বচনীয় কৌতুকে ও আনন্দে হীরকের চেতনা আস্তে আস্তে আরামে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

হীরককে ঘুমাইয়া পড়িতে দেখিয়া সেবার মুখ কৃত-কার্য্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে হাসিমুখে হীরকের ঘর হইতে বাহির হইয়া সুমতির কাছে যাইতেই তিনি তার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা, হীরু কি করছে?

সুমতি সেবাকে বৌমা বলিয়া সম্বোধন করাতে সেবার মুখে আনন্দের উপর লজ্জার আভা আসিয়া পড়িল, যেন নানান-রঙা ফানুসের ভিতর হইতে আলোর আভা ঝরিয়া পড়িতেছে। সেবা নিজের সফলতার উৎফুল্ল আনন্দকে লজ্জার অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া, কোমল স্বরের মৃদুতার অন্তরালে নিজের কৃতকার্য্যতার সংবাদ দিবার আগ্রহ সরাইয়া রাখিয়া বলিল—ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম মা।

সুমতির মুখ আনন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সেবার মুখে হাত বুলাইয়া আনিয়া হাত চুম্বন করিলেন। সুমতি স্নেহকোমল-স্বরে বলিলেন—সমস্ত দিন খাটছ যা, এখন খেয়ে গিয়ে শোওগে।

সেবা সমস্তদিনের পরিশ্রমে যথার্থই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

(১০)

রাত তখন বারোটা! কামিনী ঝি আসিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত স্বরে সেবাকে ডাকিল—বৌদিদি, বৌদিদি, শিগ্‌গির ওঠো— মার আবার মূর্চ্ছা হয়েছিল; তোমায় ডাকছেন।

সেবা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তারপর চোখ রগ্‌ড়াইয়া গভীর নিদ্রার জড়তা দূর করিতে করিতে কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেবাকে সুমতি ডাকিয়াছিলেন বৌমা বলিয়া, এবং এখন কামিনীও বৌদিদি বলিয়া ডাকিল; তাতে সেবা বুঝিল যে হীরক তাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলেও, সুমতি তাকে বধূ বলিয়াই সকলের কাছে পরিচিত করিয়াছেন; এতে সেবা লজ্জার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেখেলার কৌতুকও অনুভব করিল। সেবা সুমতির কাছে যাইতেই তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—আমার আর বেশী দেরী নেই; পুরুত এসেছে; তোমাদের দু'হাত এক হওয়া দেখে আমি যাব।

গভীর ঘুম হইতে আচম্‌কা জাগিয়া আসিয়া সুমতির এই কথা সেবার স্বপ্নের ঘোরের মতন বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে হীরকের চীৎকার শোনা গেল—না, না, না—আপনাদের আমি কতবার বলব যে অসময় আমাকে নিয়ে আপনারা ছেলেখেলা করবেন না।

সুমতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—কামিনী, লোকনাথকে ডাক্, আমাকে চারজনে ধরাধরি করে আমায় হীরুর ঘরে নিয়ে চলুক।

ডাক্তার ইহা শুনিয়া ভয় পাইয়া বলিল—এ অবস্থায় নাড়া-চাড়া করলে যে বড় খারাপ হবে।

সুমতি ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিলেন—খারাপ মানে ত মৃত্যু। সে ত পলে পলে এগিয়ে এসে বুক চেপে বস্‌ছে টের পাচ্ছি। আমি ওঘরে যাব। মর্‌বার আগে একবার হীরুকে দেখে মর্‌ব।

সুমতির অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। ডাক্তার আর বাধা দিল না। লোকনাথ ও আরও চার-পাঁচজন চাকর সুমতিকে বিছানার তোষক বালিশ সুদ্ধ তুলিয়া একটা হাল্কা নেয়ারের খাটে শোয়াইল এবং সেই খাট বহিয়া লইয়া হীরকের ঘরে চলিল।

সুমতিকে চাকরেরা বহিয়া আনিতেছে দূর হইতে দেখিয়াই হীরক কাতর আবেগে ডাকিয়া উঠিল—মা!

সেই স্বর শুনিয়া সুমতি স্নেহার্দ্র ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন—বাবা আমার!

সুমতির খাট একেবারে হীরকের খাটের গাঁ ঘেঁসিয়া রাখা হইল। হীরক মাকে চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—এ কান্নার মধ্যে মিশিয়া ছিল মা ও ছেলে শয্যাগত হইয়া পড়ার পর প্রথম সাক্ষাতের আনন্দ, মার ও নিজের অবস্থার জন্য দুঃখ, মার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা, প্রিয় পুত্রবধূর মৃত্যুতে শোকাতুর মার কাছে পত্নীবিয়োগবিধুর পুত্রের শোক, মার অসঙ্গত ও অশোভন আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ ও অভিমান, এই অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর-একজন প্রায়-অপরিচিতার সঙ্গে যোগ করিয়া দিবার চেষ্টার জন্য বিরক্তি।

সুমতি অবশ হাত তুলিবার চেষ্টা করিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না; সেবা হাত ধরিয়া তুলিয়া হীরকের মাথায় রাখিয়া দিল। সুমতি ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন—বাবা হীরু!

আনন্দ-বাবু হীরককে বিবাহের অনুরোধ করিতে আগেই আসিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ডাকিলেন—হীরক, তোমার মা ডাক্‌ছেন, শুন্‌ছ।

হীরক কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—মা?

সুমতি বলিতে লাগিলেন—তুমি ত আমার কথার অবাধ্য কখনো হওনি বাবা। আমার এই শেষ অনুরোধটি রাখো। তুমি সেবাকে বিয়ে করো, আমি দেখে মরি, আজকের রাত পোয়ানো আমি আর দেখ্‌ব না।

হীরক কোনো উত্তর না দিয়া শিশুর মতন কেবলি কাঁদিতে লাগিল। সে মার আদেশ কখনো অবহেলা ত করে নাই; এখন সেই মার আদেশ রাখা বা অবহেলা করা দুই তার কাছে সমান কঠিন বোধ হইতেছিল।

হীরককে নিরুত্তর দেখিয়া সুমতি আনন্দ বাবুকে বলিলেন—বড়ঠাকুর, পুরুতঠাকুরকে ডেকে কন্যা সম্প্রদান করুন, আর দেরী কর্‌লে আমি দেখ্‌তে পাব না।

পুরুত নীচেই অপেক্ষা করিতেছিল। সে আসিয়াই মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। আনন্দ-বাবু যখন সেবার হাত তুলিয়া হীরকের হাতে রাখিয়া মন্ত্র পড়িতেছিলেন—সবস্ত্রাচ্ছাদিতালঙ্কৃতাং প্রজাপতি-দেবতাকাং অর্চ্চিতাং এনাং কন্যাং তুভ্যম্ অহং সম্প্রদদানি—তখন আনন্দের আন্দোলনে সুমতির বুকের মধ্যে একবার ধকধক করিয়া উঠিল, এবং তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

ইহা দেখিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দবাবু মন্ত্রপড়া তুলিয়া চঞ্চল হইয়া সুমতির মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হীরক ব্যাকুল হইয়া 'মা মা মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হীরকের নিস্পন্দ নড়নশক্তিহীন হাতের উপর হাত রাখিয়া সেবা পাংশুমুখে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার মনে হইতেছিল এ কী ভীষণ ভয়ঙ্কর তার বিবাহ! প্রত্যক্ষ মৃত্যুকে সাক্ষী করিয়া এই বিবাহ!

কিন্তু কোথায় রহিল পুরোহিতের মন্ত্র পড়ানো, কোথায় গেল আনন্দ-বাবুর কন্যা সম্প্রদান,—সমস্ত লোক তখন সুমতিকে লইয়াই ব্যস্ত। হীরক যেন কাঁদিয়াই নিজের প্রাণটাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। সেবারও চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সে হীরকের হাত হইতে নিজের হাত তুলিয়া লইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্ব্বদমন

আদি-সম্রাট সর্ব্বদমন
পুরাণেতে যাঁরে ভরত বলে,
যাঁর নামে সারা ভারতবর্ষ
আজো পরিচিত ভূমণ্ডলে,
শৈশব কালে খেলা ছিল যাঁর
সিংহের দাঁত গণিয়া দ্যাখা,
প্রতিভায় বলে আর্য্য-দ্রবিড়
নিবিড় ক'রে যে বাঁধিল একা,
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কাবেরী
অভিষেক-বারি দিল যে ভূপে,
হিমালয় হ'তে মলয়-নিলয়
অঙ্কিত যাঁর যজ্ঞযূপে,
দীর্ঘতমার প্রাণের স্বপন
সত্য ক'রিল যে মহামনা,
তাঁর ছেলে হ'ল কুল-কজ্জল!
হায়! বিধাতার বিড়ম্বনা!
আর্য্য-শবর সবার ভরণে
লভিলেন যিনি ভরত নাম,
তাঁর ছেলে হ'ল প্রকৃতি-রুক্ষ,
পীড়নে দক্ষ, পালনে বাম!
সসাগরা নব-খণ্ড মেদিনী
পদতলে; তবু রাজা ও রাণী
অসুখে কাটান্ দিবস-যামিনী
রাজ্য ভীতি বিফল মানি।
স্তিমিত প্রদীপে তৈল টোপায়
মণি-ময়ূরের চঞ্চু দিয়া,
স্খলিত-বচন সর্ব্বদমন
মহিষীরে কন্ ক্ষুব্ধ-হিয়া।
"বড় সাধ ক'রে পুত্রের রাণী
নাম রেখেছিলে ভুবন-মণি,
নিখিল প্রজার মর্ম্ম কুড়ায়ে
আজ সে ভুবন-মর্ম্ম গণি।
অন্ধ-আতুরে কশাঘাত করে
শৈশব হতে এমনি রীতি,
দুষ্টতার চেয়ে রূঢ়তা প্রবল,
যুবরাজ হ'য়ে পীড়িছে ক্ষিতি।
কোথা হ'তে ক্রূর এল এ অসুর
তোমার গর্ভে, হায়, মহিষী,
চণ্ডাল-পনা সব কাজে ওর,
আসে অভিযোগ দিবস-নিশি।
নিখিল প্রজার ওঠে হাহাকার—
কত আর শুনি কত বা হেরি,
শুধু কলঙ্ক কেবল পঙ্ক
ওরে ঘিরে যেন হয়েছে ঢেরি।
বেতালের মতো চিত্ত উহার
নিষ্ঠুরতায় নৃত্য করে,
ক্ষত্রিয় হ'য়ে খড়্গ হানে ও
ক্ষমা-ভিখারীর কণ্ঠ পরে।
বিধাতার ও যে করে অপমান,
রাজার বাড়ায় পাপের বোঝা,
শত্রুপুরীর কূপে বিষ দিয়ে
জয়ের রাস্তা করে ও সোজা!
তলোয়ার চেয়ে খুনীর ছোরায়
আস্থা উহার দেখি জেয়াদা,
এ যে অকার্য্য, এ যে অনার্য্য,
এ যে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা।
নাম নিতে চায় অতি সস্তায়
যুদ্ধ না ক'রে হত্যা ক'রে,
পিতা আমি ক্ষমা অনেক করেছি,
রাজা আমি দিব শাস্তি ওরে।
রক্ষা-বেতন করিয়া গ্রহণ
সাজা দিতে কত করিব দেরী?—
দেশের ইচ্ছা দশের ইচ্ছা
ইচ্ছা সে জগদীশ্বরেরি।
মহিষী! সে মূঢ়ে এনেছি প্রাসাদে,
নিকটে নজর-বন্দী আছে;
পীযূষ পিয়েছে যার কাছে, আজ
বিষ পিবে সেই তাহারি কাছে।

স্থির হও,...ওকি ?...দৃঢ় কর মন,...
ছেলে সে আমারো,...তাখো আমারে,...
গুপ্তহত্যা করিতে না কহি,
বিষ ব'লে বিষ পিয়াবে তারে।
কুৎসিত এই অঙ্গের ব্রণ —
মমতা কোরো না অস্ত্রাঘাতে ;
কুশ্রী করেছে সুনাম মোদের,
কুশ্রী করেছে মানুষ-জাতে।
সেই সন্তান শতদিকে যেই
ত্রি-কুলের খ্যাতি বাড়ায়ে তোলে,
নিন্দা-পঙ্কে ডোবায় যে নাম
তারে মানিবে কে পুত্র ব'লে ?
দ্বিজাতি ক্ষত্র ; দ্বিতীয় জন্ম
লভে সে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক'রে ;
বীরে ও খুনীতে ভেদ যে মানে না
ঠাঁই নাই তার দুনিয়া-ভোরে।
ঘৃণ্য সে জন কর্কশা-মন
কৃপায় কৃপণ কৃপাণ-পাণি—
কৃপা ক'রে তার দণ্ডের ভার
তোমার হস্তে দিতেছি, রাণী !
দয়া করিয়াছি তোমার পুত্রে—
বধ্য-মঞ্চে যাব না নিয়ে ;
যে হাতে খেয়েছে প্রথম অন্ন
শেষ খাওয়া খাবে তাতেই, প্রিয়ে !
ক্ষমা করিব না—মিনতি কোরোনা—
ক্ষমার সীমার গেছে বাহিরে,
ক্ষমা যদি করি, সকল পুণ্য
এ রাহু করিবে গ্রাস অচিরে।
জীবনের ধারা ম্লান করে যারা
তাদেরি লাগিয়া দণ্ড ধরি,
ভয় করি মানুষত্ব-লোপের,
বংশ-লোপের ভয় না করি।
ন্যায়-মর্য্যাদা রাখিব অটুট,
বিচার করিব সুদৃঢ় মনে,
রাজ্য দূষিত হইতে না দিব
রাজার দেহের দুষ্ট ব্রণে।

প্রাণের উৎসে দিয়ে যে গরল
অনেক প্রাণের করিল হানি
ভুল ক'রে তারে দিয়েছ পীযূষ
সে ভুল ঘুচাও গরল দানি'।"
সহসা উঠিয়া সর্ব্বদমন,
ধবলিম রুদ্রাক্ষ হেন—
শঙ্খে তুলিল সঙ্কেত-সুর ;
রাণী নির্ব্বাক্, প্রতিমা যেন।
ইঙ্গিতে এল অভাগা পুত্র
ভুবন-মনুষ্য, প্রহরী সাথে ;
ইঙ্গিতে এল বিষের পাত্র—
মা দিবে যে বিষ ছেলের হাতে।
বিষের পাত্র হাতে নিয়ে রাণী
বারেক চাহিল স্বামীর পানে ;
নিশ্চল রাজা নিয়তির মত
অমোঘ নিদেশ নীরবে দানে।
"পান কর, বাছা, কর্ম্মের ফল"
বিকৃত কণ্ঠে কহিল রাণী,
জননীর দান নিল যুবরাজ
অবিকৃত মুখে যুক্তপাণি।
বারেক হানিল বজ্র চাহনি,
বারেক বাঁকিল অধর ভুরু,
তার পর মুখ মৃত্যু-পাংশু—
মরণের আগে মরণ সুরু ;
অধরের পুটে নিল কালকূট,
রাণী দেখে সব ধোঁয়ায় মেখে—
বিদ্যুৎ-ছুরি চেতনার ডুরি
কাটিল সহসা বজ্র হেসে।
গরলের কাজ করিল গরল
বিচারক পিতা দেখিল চোখে,
মহিষীর আর সংজ্ঞা হ'ল না
টুটেছে জীবন চণ্ড শোকে।
সে দিন হইতে কেহ কোনোদিন
হাসি দেখে নাই রাজার মুখে ;

সংসার-সাধ হ'য়ে গেল বাদ,
আত্ম-প্রসাদ রহিল বুকে।
*　　*　　*　　*
গেছে কত যুগ কত দুখ সুখ
নাই সে সর্ব্বদমন রাজা,
লুপ্ত বংশ, নামে আছে তবু
ন্যায়-ধরমের স্বর্গে তাজা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দেশের কথা

এতদিনে সরকারের ঘুম ভাঙিল। অন্নাভাবে জনকষ্টে ও রোগের পেষণে বাংলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন সহস্র সহস্র লোক কেবল নিষ্ফল আর্ত্তনাদ করিয়াই মরিতেছে! কে তাদের দেখে? যাদের দেখিবার মত অর্থ-সামর্থ্য আছে তাদের প্রবৃত্তি নাই, হৃদয় নাই। আর বাকী আমরা নিষ্কর্ম্মা ও উদাসীন। যাঁরা আমাদের অর্থ লইয়া বসিয়া আছেন তাঁদের কাছে জোর করিয়া চাহিবার মত শক্তিও আমাদের নাই। তাঁরা আমাদের দুঃখকষ্টের কথা ত অল্পই ভাবেন। যাহা হউক কৃপণের কৃপার মত তাঁদের এই সামান্য কাজেও একটু আশার কথা আছে।—

অনুসন্ধান সমিতি।—এদেশের দুর্ম্মূল্যের কারণ অনুসন্ধান জন্য সেদিন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়াছেন। আগামী ২৭শে জুলাই এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে।

—ঢাকা-প্রকাশ।

কিন্তু নিরাশ হইবার কারণ ত দেশের চারিদিকে। অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে লোকে অসৎ পথ অবলম্বন করিতেছে। পেটের দায়ে মানুষ কি না করে?

গতসপ্তাহে বাঙ্গালা প্রদেশে ৩২ টি ডাকাতী হইয়াছে। চাউল ও অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতীও বৃদ্ধি হইতেছে। এ ডাকাতীর কারণ কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

—যশোহর।

জেলে অপরাধীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রায় সর্ব্বত্র যেরূপ অন্নবস্ত্রের অভাব হইয়াছে এবং জীবন ধারণ যেরূপ ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি প্রভৃতি ধন সম্বন্ধীয় অপরাধ বেশী হওয়া সম্ভাবনার অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয় না।—সাঁওতাল-পরগণা।

আর যারা অসৎ পথ ঘৃণা করে তারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।—

অন্নবস্ত্রের অভাবের দরুণ বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে এ সহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল ভিক্ষুকের মধ্যে এমন লোকও অনেক আছে যাহারা পল্লীগ্রামে উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া, পুত্র পরিজন সহ সহরে আসিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।—হিন্দুস্থান।

কিন্তু যারা দস্যুতা করিতে পারে না আর ভিক্ষা গ্রহণ করিতেও লজ্জা বোধ করে তাদের দুঃখের অবধি নাই।

দলে দলে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারী হেতমপুরে আসিতেছে। স্ত্রী-পুত্র লইয়া অন্নাভাবে পথে দাঁড়াইতেছে এবং একে একে সকলকে যমের কবলে তুলিয়া দিয়া পরে নিজেও সেই পথ অনুসরণ করিতেছে। আমাদের দেশে এরূপ লোকের সংখ্যা যেন দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। হেতমপুরে যাহারা আসিতেছে রাজা বাহাদুর তাহাদের সুচিকিৎসা ও সুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছেন। যাহারা সুস্থ ও সবল হইতেছে তাহাদিগকে যথাযোগ্য কর্ম্ম দিতেছেন। তথাপি গত ২০শে বৈশাখ তারিখে প্রাতে একটি শিশু এবং অপরাহ্ণে তাহার মাতা এবং ২১শে তারিখে একটি বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই শস্যশ্যামলা পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া বোধ হয় এমন কোন জন্তু নাই যে সামর্থ্য থাকিতেও জঠরজ্বালায় তিল তিল করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে।

—বীরভূম-বাণী।

অন্নকষ্টে পাটপাতা—এই অন্নকষ্টের দিনে বিক্রমপুরের গরীব লোকেরা সামান্য ভাতের সঙ্গে পাটপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া আহার করে। অন্নাপেক্ষা পাটপাতার পরিমাণ বেশী থাকে।

—কার্ত্তিপুর-নিবাসী।

কেবল ইহাই নহে।—নোয়াখালী জেলার নানা স্থানেও নাকি দুর্ভিক্ষের আক্রোশ পড়িয়াছে। অনেকেরই দুই বেলা আহার জুটিতেছে না। উপবাস—অর্দ্ধাহার করিয়া অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কাল কাটাইতেছে। রাজগঞ্জ থানার এলেকার একটি পল্লীতে একটি মুসলমান-মহিলা খাইতে না পাইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে। কি ভীষণ কথা! আরও শুনুন—ঢাকার নয়নমাটী গ্রামের কৃষ্ণচরণ দাস অন্নকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ডুবিয়া জ্বালা নিবারণ করিয়াছে। এতদপেক্ষা দেশের দুর্গতি, প্রজার দুর্গতি আর কি হইতে পারে?—মোসলেম-হিতৈষী।

অনাহারে মৃত্যু ও আত্মহত্যা।—২১শে আষাঢ়ের "নোয়াখালী সম্মিলনী"তে প্রকাশ, নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত হেরাজ অঞ্চলীর ৭।৮ বৎসর বয়স্কা কন্যা খারেবেরেস্থা অন্নাভাবে মারা গিয়াছে। রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী জানাইয়াছেন পুরো আরও একটি লোক ঐরূপ অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে।

ঢাকা মাণিকগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহম্মদ আবদুল্লাহ এজলাসে তালু খাঁ বিবি নাম্নী একটি রমণী আত্মহত্যা-চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তালু খাঁ বিবি বলিয়াছে, তাহার তিনটি সন্তান। আমার সম্মুখে তারা না খাইয়া মারা যাইবে এই শোক আর দেখিবার ভয়েই আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাকে একবৎসরের সুব্যবহারে থাকিবার জন্য ৫০ টাকার মুচলিকা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ৪টি লোকের পেটের জ্বালা নিবারণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা প্রকাশ নাই। পরন্তু যে লোক তিনটি ছেলেকে অনাহারে মরিতে দেখিবার ভয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল সে কিরূপে মুচলিকা সংগ্রহ করিল তাহাও প্রকাশ নাই।

২৩শে আষাঢ়ের "বীরভূমবাণী"তে প্রকাশ, একটি বাঙ্গালী হাওড়ার পুল হইতে নদীতে লাফাইয়া পড়ে। হোড়মিলার কোম্পানীর এক ষ্টিমার লোকটিকে তৎক্ষণাৎ তোলে। লোকটি বলিয়াছে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন উপায় না পাইয়া সে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল।

—সুরাজ।

পল্লীগ্রামের অবস্থা।—এখন পর্য্যন্তও বীরভূম জেলার অনেক স্থানে চাষের উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয় নাই। আজকাল ভাবী ফসলের অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া গৃহস্থগণ তাহাদের কৃষাণদিগকে কোনরূপ অর্থ বা অগ্রিম ধান্যাদি প্রদান করিতে দ্বিধা করিতেছেন। অনেকে অতি কষ্টে পুত্রকন্যা লইয়া একবেলা খাইয়া কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অনেকেরই পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, তাহাও অন্যের সকলের নাই। কেহ কেহ চট্ ও পুরাতন কন্থা পরিধান করিয়াও কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। এইসকল গরীব নিরন্ন লোকদিগের অবস্থা গ্রামে যাইয়া দেখে এমন লোক এ জেলায় কেহ নাই বলিলেও চলে।—বীরভূম-বার্ত্তা।

বিক্রমপুরের প্রায় পনর আনা লোকের ঘরেই বিষম অন্নক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। কত লোক যে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কেবল যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই উপবাস করিতেছে এমন নহে, অনেক ভদ্রঘরেও এখন অন্নবস্ত্রের বিষম অভাব। যে সকল লোক কোনদিন সম্মানহানির আশঙ্কায় ভদ্রলোকের দ্বারেও কিছুর জন্য প্রার্থনা করে নাই, পেটের দায়ে এখন তাহাদের সে সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে মজুরী করিয়া সংসার প্রতিপালন করিত, কাজের অভাবে তাহারাও আজ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু ভিক্ষাও এখন মিলে না।

—ঢাকা-প্রকাশ।

এই রাক্ষসী অভাব সঙ্গে আনিয়াছে অসংখ্য করাল ব্যাধি। আমাদের বাঁচা আর ঠিক বাঁচা নহে, একটা ভীষণ ভার বহন করা মাত্র।

বাংলার স্বাস্থ্য।—১৯১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর যে তিন মাস শেষ হয় তাহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্ম মৃত্যু রোগের তালিকা এই জুনের গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ায় বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে বাংলা দেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী।—হিন্দু-রঞ্জিকা।

ক্ষয়রোগের বৃদ্ধি।—কলিকাতা মুনিসিপালিটী প্রকাশ করিয়াছেন যে অল্পবিত্ত ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে দিন দিন ক্ষয়রোগের আধিক্য দৃষ্ট হইতেছে। হইবারই কথা। অন্নবস্ত্রের অভাবই এই রোগের মূল কারণ। দরিদ্র ভদ্রসন্তানগণের এতদুভয়ের অভাব ঘুচিবার উপায় নাই। তাহাদের আয় অতি সামান্য ও সীমাবদ্ধ। তদুপরি অন্ন বস্ত্র দুইই অগ্নিমূল্য। কাজেই হতভাগ্যদিগকে নীরবে অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন যাপন করিয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতেছে।—আনন্দ-পত্রিকা।

দেশের স্বাস্থ্য:—স্বাস্থ্য-সমস্যাই আজ আমাদের প্রধান সমস্যা। অনাহারে অর্দ্ধাহারে আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতেছে। সামান্য একটু ব্যাধির আক্রমণ হইতেও যে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি এমন শক্তিও আমাদের লোপ পাইয়া যাইতেছে। ১৯১৯ সালের জুলাই হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৬ মাসের জন্ম-মৃত্যুর যে হিসাব গবর্ণমেণ্ট বাহির করিয়াছেন তাহা দেখিলেই দেশের স্বাস্থ্য কত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে বুঝিতে পারিবেন। ১৯১৯ সালেই জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে বাঙ্গালার জন্মসংখ্যা ২০৫০৯৬ এবং মৃত্যুসংখ্যা ২৯৯৪০৩০; উক্ত সনের অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাসে জন্মসংখ্যা ৩৯২০০২ এবং মৃত্যুসংখ্যা ৪৫৯৬৯৭। আলোচ্য ছয় মাসে বাঙ্গলায় ৫,৯৭,০৯৮ জনের জন্ম হইয়াছে এবং ঐ সময়ে ৭,৫৯,১০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং উক্ত ছয় মাসে সমগ্র বাঙ্গালায় ১,৬২,৩০৫ জন লোক কমিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় অধিকার দেশের লোক না পাইলে দেশের দারিদ্র্য রোগ অজ্ঞানতা কোন দিনই দূর হইবে না এবং এগুলি দূর করিতে না পারিলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিও কোন দিনই সাধিত হইবে না।—সুরাজ।

রোগের সঙ্গে আবার বন্যা। কটক সহর জলে ডুবিয়াছে, আর—

তমলুকে বন্যায় প্রজার ঘর দুয়ার ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

—খুলনা।

সামর্থ্য থাকিতেও যাঁরা দেশের এই বিরাট অভাব অল্প পরিমাণেও দূর করিতে চান না, তাঁরা হৃদয়হীন। আপনার সংস্থানের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়াও যদি পরকে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারি ত তাহাও মঙ্গলের কারণ। পাৎলা মিহি কাপড় না কিনিয়া দুই চারি আনা পয়সা বাঁচাইয়া অভুক্ত প্রতিবাসীকে তাহা দিতে পারিলে কেবল প্রতিবাসীরই উপকার করা হয় না, আপনার হৃদয়কেও যে উন্নত করা হয়, তাহা সকলেরই বোঝা উচিত। দান মানেই আত্মোন্নয়ন। এই দুর্দ্দিনে যাঁরা দাতা তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র—

নোয়াখালী জেলা বোর্ড নিজ জিলার অন্নকষ্ট নিবারণ-কল্পে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; বরিশাল জিলা-বোর্ড বাখরগঞ্জের অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে, বিনা লাভে বা অল্প লাভে চাউল বিক্রয়ের সঙ্কল্প করিয়া সারে পাঁচ হাজার মন রেঙ্গুন চাউল আনাইয়াছেন।—ঢাকা-প্রকাশ।

বিহার গবর্ণমেণ্ট পুরী জেলা বোর্ডের হস্তে ৫০ সহস্র টাকা ন্যস্ত করিয়াছেন, উক্ত টাকা দ্বারা বিনা লাভে খরিদ দরে পুরীর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ধান চাউল বিক্রয় করা যাইবে। উদ্দেশ্য মহৎ।

—হিন্দু-রঞ্জিকা।

অন্নসত্র।—আমরা শুনিতে পাইলাম অত্রত্য শঙ্কর মঠের সন্ন্যাসী-গণ একটি অন্নসত্র খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে সুখের বিষয় হইবে। বরিশালের অবস্থা যেমন হইয়াছে তাহাতে এখন সন্ন্যাসী-কর্ম্মীর একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিলাঞ্চলের দুঃস্থ নরনারীর দৃশ্য প্রাণবন্ত লোকের হৃদয়বিদারক।

—বরিশাল-হিতৈষী।

দরিদ্র ভোজন।—গত ১৩ই আষাঢ় সাহাজাদপুর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের দশ আনা কাচারীতে পুণ্যাহ উপলক্ষে দুই হাজারের অধিক লোককে পেট ভরিয়া দধি চিঁড়া খাওয়ান হইয়াছে।—সুরাজ।

চাঁদপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়।—চাঁদপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিজ গ্রামে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা উমাচরণ বসু মহাশয়ের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা কল্পে জেলা

বোর্ডে ৬০০০ ছয় হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শ্রীপুর ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যেরূপ চিকিৎসকের ও চিকিৎসার অভাব তাহাতে চাঁদপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে ঐ সকল স্থানের অধিবাসীগণের মহদুপকার সাধিত হইবে। এইরূপ সাধু সংকল্পের দান আজকাল বিরল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শরৎ-বাবুর সংসঙ্কল্পের সাফল্য কামনা করি। আশা করি জেলাবোর্ড শরৎবাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া চাঁদপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করতঃ এই-প্রকার দানে উৎসাহ প্রদান এবং চাঁদপুর ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীগণের অভাব মোচন করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।—আনন্দ-পত্রিকা।

পুঠিয়া পাঁচআনীর রাণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবী মহাশয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় দৌহিত্রের বিবাহ গত ২৮শে ও ২৯শে আষাঢ় তারিখে পুঠিয়া রাজধানীতে সম্পন্ন হইয়াছে। রাণী মহোদয়া এই উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের যথাসাধ্য বিদায় দিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান বহু সহস্র দুঃখী কাঙ্গালীদের প্রত্যেককে ।৹ আনা করিয়া ভিক্ষা এবং প্রায় দুইজনের ভোজনোপযোগী আহার্য্য দিয়া বিদায় করিয়াছেন। রাণী মহোদয়ার দানশীলতার সংবাদ পহিয়া কাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় বর্ষাকালে বিশেষতঃ উপযুক্ত সুব্যবস্থার সহিত দুঃখী কাঙ্গালীদের বসাইয়া খাওয়াইতে পারিবেন না আশঙ্কায় অতিরিক্ত আহার্য্য দিয়া দুঃখী কাঙ্গালীদের বিদায় করিয়াছেন। বিবাহ সময়ে গান বাজনা আমোদ উৎসব হইবে এই বিবেচনায় নিমন্ত্রিত বহুসংখ্যক প্রজাবৃন্দকে ১৲ টাকা করিয়া খোরাকী দিয়াছেন।—হিন্দুরঞ্জিকা।

দেশের চারিদিকে অভাব, চারিদিকে দুঃখ, চারিদিকে অসুবিধা। ভারতবর্ষ নিজে খাইতে পায় না। আর যে খাইতে পাইল কি না সরকার তার বিশেষ খোঁজ রাখেন না। তাই এখনও এইসব দুঃখের কথা শুনিতে হয় :—

কাঁচা মাল।—গত বৎসর ভারতবাসী ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল জাপানে পাঠাইয়াছে। আর উক্ত দেশ হইতে আমদানী করিয়াছে ৩৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার জিনিষ। কবে ভারত শিল্পের উন্নতি করিয়া কাঁচা মালের পরিবর্ত্তে আপনাদের শিল্পজাত পণ্য বিদেশে পাঠাইতে পারিবে!—হিন্দু-রঞ্জিকা।

গরু চালান। সম্প্রতি চাইবাসা নামক একখানি জাহাজে ভারতবর্ষ হইতে ২৭৫টি গরু ইংলণ্ডের গ্লিমাউথ বন্দরে চালান গিয়াছে। এই গরুগুলি পুনরায় তথা হইতে ব্রাজিলে চালান দেওয়া হইবে। একে ত ভারতবর্ষে গরুর অভাবে চাষের কাজ ভালরূপ হয় না, তাহার উপর আবার বিদেশে গরু চালান হইলে আমাদের দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। ইহা রহিত করা আবশ্যক।—প্রতিকার।

দুঃখের দিনে কিছু যে হইতেছে ইহাই আশার কথা।—

গম রপ্তানী বন্ধ।—আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, সরকার এদেশে গম ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দিবেন না। এ সম্বন্ধে সিমলা হইতে একটা সরকারি ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। গম রপ্তানী হইবে যে জনরব উঠিয়াছিল সরকার বলিতেছেন সে গুজবের মূলে কোন ভিত্তি নাই।—বোম্বেলেম হিতৈষী।

আশার কথা।—বিলাতী সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ যে বিলাতে চিনির দর কমিয়াছে। আমেরিকার বহু চিনির কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইতেছে এবং নূতন চিনির কারখানা খুলিয়াছে। সত্বরই আমেরিকার চিনি এদেশে আমদানী হইবে। সুতরাং চিনির দর কমিতে পারে।—হিন্দুরঞ্জিকা।

খাল খনন।—গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার উত্তরে গঙ্গা হইতে পূর্ব্বদিকে খুলনা জেলার অন্তর্গত কুলটি নদী পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড খাল খনন করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। এই খালের দৈর্ঘ্য ২২। মাইল এবং ইহার পরিসর ২৫০ ফুট হইতে ৪০০ ফুটের মধ্যে হইবে ইহা খনন করিতে ৩০০০০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে স্থির করা হইয়াছে। এই খাল প্রস্তুত হইলে কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল ইত্যাদি স্থানে যাতায়াতে নৌকা-পথের দূরত্ব অনেক কমিয়া যাইবে। কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরের নিকটে এই খালের সংশ্রবে একটি নৌকা জাহাজ ইত্যাদি রাখিবার বিস্তৃত ঘাট প্রস্তুত করা হইবে।

—এডুকেশন গেজেট।

দৈন্য, দুঃখ, পীড়ন, সমস্ত কঠোরতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র অস্ত্র—শিক্ষা। বাংলার কয়টি সহরে কয়েক হাজার শিক্ষিত লোক আছেন মাত্র। আর সহরের বাহিরে এক মাইল দূর হইতেই জড়তা ও তার অবশ্যম্ভাবী সঙ্গী কুসংস্কারের বিপুল রাজ্য সমাজের ছোট বড়, উচ্চ নীচ সকলেরই চাই শিক্ষা। শিক্ষা পাইলে তবে লোক আপনার অবস্থা বুঝিবে, সমাজের অবস্থা বুঝিবে ও দেশের অবস্থা বুঝিবে ঘৃণার অবজ্ঞার দূরে রাখিবার আর কেহ নাই। যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা নিজেদের পল্লীতে অবকাশ-মত সামর্থ্য-মত শিক্ষার বিস্তার করুন। অভাবের জন্য হাহাকার করিলে আর চলিবে না, বা কেবল বক্তৃতা দিয়া রেজলিউশন্ জাহির করিলেও চলিবে না। এখন চাই অজ্ঞতাকে দূর করা, যে অজ্ঞতা আমাদের দেশব্যাপী দুঃখের মূলীভূত কারণ।

বর্ত্তমান বর্ষে নমঃশূদ্র সমাজে ৮৩ জনেরও অধিক ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৫ জনেরও অধিক আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মাহিষ্য সমাজের বহুসংখ্যক ছাত্র উভয় পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। যোগী সমাজের ৮১ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন এবং ২৫ জন ছাত্র আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সমাজের জনসংখ্যা প্রায় ৫। লক্ষ অর্থাৎ পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয় সমাজের জনসংখ্যার সমান।

—প্রতিভা।

যশোহর মধুসূদন কলেজ।—যশোহরে "মাইকেল মধুসূদন কলেজ" প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানীর আইনানুসারে কলেজ এসোসিয়েশন রেজেষ্টারী করিবার উদ্যোগ হইতেছে এবং জমি সংগ্রহের জন্য একটি সবকমিটি গঠিত হইয়াছে।—আনন্দ-পত্রিকা।

এ বৎসর সমগ্র নদীয়া জেলার মোট ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মোট ৩১৯ জন ছাত্র পাস হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৫৫ টি, দ্বিতীয় বিভাগে ১৫০টি এবং তৃতীয় বিভাগে ১৪ জন। বিদ্যালয় হইতে মোট ৪০৪ জন ছাত্র পরীক্ষায় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৮৫ জন ছাত্র ফেল হইয়াছে, বাকি সমুদয় ছাত্র পাস হইয়াছে।

গত বৎসরও ঐ ২৮টি বিদ্যালয় হইতে ৪০৯ জন ছাত্র পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৫৬ জন ছাত্র পাস করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট ১৫৩ জন ফেল হইয়াছিল। সুতরাং এ বৎসর পাশের পরিমাণ অনেক বিদ্যালয় অপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।—বঙ্গরত্ন।

শিক্ষা সম্বন্ধে যত সংবাদই আমরা জোগাড় করি না কেন, দেশে শিক্ষা এখনও মোটেই বিস্তৃত হয় নাই। ভারতের রাজসরকার জন-প্রতি শিক্ষার জন্য এক আনা করিয়া ব্যয় করিতেছেন, আর যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা মনোযোগের সহিত অর্থ-রক্ষা করিতেছেন। দুই চারি জায়গায় দুই চারি জন লোক মাত্র দেশের অজ্ঞতার কুফল বুঝিতেছেন। তাই তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত অজ্ঞতা দূর করিতে সাহায্য করিতেছেন। তাঁরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র।

সৎকার্য্যে দান।—শ্রীহট্ট-মৌলবীবাজার সবডিভিসনের অন্তর্গত মুন্সীবাজারে একটি হাইস্কুল স্থাপনের জন্য পরগণা ছয়চিরি, চৈত্রমাট-নিবাসী হাজিমাং দিলবর নামক এক ব্যক্তি এককালীন ২০০০৲, মৌলবীবাজারে পুষ্করিণী খননের জন্য ১০০০৲ এবং মসজিদ নির্ম্মাণের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়া স্বীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

—ঢাকা-গেজেট।

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি যে, সেরপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় সেরপুর অঞ্চলের উপকারার্থ একলক্ষ টাকা দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। উমেশ-বাবু নিজে নিতান্ত সহজভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণের উপকারার্থ তিনি উহা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ইহা তাঁহার মহৎ ও উদার হৃদয়ের পরিচায়ক।

—চারুমিহির।

পুস্তকাগার স্থাপন—ময়মনসিংহ নগরে সাধারণের ব্যবহার জন্য কোনও লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার নাই। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলার সদর ষ্টেসনেই সাধারণের জন্য লাইব্রেরী স্থাপিত আছে। আমরা "চারুমিহির"-মুখে শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ ব্রেক ময়মনসিংহের এই অভাব দূর করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং সত্বরেই যাহাতে ময়মনসিংহ নগরে একটি সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপিত হয় তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—ঢাকা-গেজেট।

বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন।—আমরা শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ডেবরা থানার অধীন পলাশী গ্রামের সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শান্তভূষণ নন্দীর যত্নে এবং উৎসাহে উক্ত পলাশী গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র নন্দী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ইহা নন্দী মহাশয়ের স্বদেশপ্রেমিকতার পরিচায়ক। ঐ বিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রগণের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রস্তুত করা হইয়াছে। দাতব্য ঔষধালয়ে একজন সুবিজ্ঞ এবং স্বদেশী চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রায় ৩০।৩৫ জন রোগী বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া উপকার পাইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শ্রীমান শান্তভূষণ দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুন।

—মেদিনী-বান্ধব।

দান—ইড়পালা-নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন রুদ্র মহাশয়ের অন্যতম কৃতী পুত্র শ্রীযুত শশিভূষণ রুদ্র মহাশয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে একজন এম, বি ডাক্তার নিয়োগের জন্য ২২ হাজার টাকা দান করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি কৃষ্ণমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসনে সাড়ে চৌত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা ইহাঁর এই সৎদানের জন্য ইঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।—মেদিনী-বান্ধব।

যাঁরা আবার শিক্ষা পাইতেছেন, দুই তিনটা পাশ করিয়া তাঁরা গতানুগতিকভাবে হয় উকিল হইতেছেন, নয় এক অফিস হইতে আর-এক অফিসে চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিতেছেন; যাহোক একটা জুটিয়া গেলেই বাঁচেন। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যে কোন স্বাধীন পথ আছে বা ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন স্বাধীন পথ করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা তাঁদের মনেই আসে না। বিদেশীরা আমাদের দেশে বসিয়া আমাদেরই ঘর হইতে টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা মাঝে মাঝে হায় হায় করি; কিন্তু সে টাকা ঘরে রাখিবার মত কোনো উত্তমপূর্ণ কাজে আমরা হাত দিই না। কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনে কাগজ উৎপন্ন করিবার জন্য এণ্ড্রু ইউল কোম্পানী, বার্নস্ কোম্পানী আসিয়া বাংলার নানা জায়গার বাঁশ এক-চেটিয়া করিয়া লইল; আর আমরা এমন উদাসীন যে, অর্থাগমের এমন সুলভ সহজ পথটাও ধরিতে পারিলাম না। দেশের উৎপন্ন জিনিষ একটু বুদ্ধির সহিত গুছাইয়া তাহা অর্থাগমের উপায় করিতে পারিতেছি না। এইসব সামান্য সামান্য বিষয়ে ঔদাসীন্যের জন্য অর্থাগমের কোনো উপায়ই আমাদের মাথায় জাগে না।

বাঙ্গালীগণের অনেকেরই ব্যবসাবুদ্ধি নাই। অনেক দোকানে দর করিতে করিতে ক্রেতাকে হয়রান হইতে হয়। আজকাল "এক দরের" অনেক দোকান হইয়াছে বটে, কিন্তু দেখা যায় খরিদদার রাখিবার জন্য তাঁহারাও সময় সময় দুই দরে জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফলে দোকানদারের প্রতি ক্রেতার বিশ্বাস বিচলিত হয়, তদুপরি পছন্দমত জিনিষের জন্য ক্রেতাগণ দুই চারিটি জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করিলে দোকানের কর্ম্মচারীগণ রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হন। ফলে ক্রেতা এবং তাহার বন্ধুগণ উক্ত দোকানের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে না, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কে অপমানিত হইতে যাইবে? ইহার জন্য অনেক দোকানদারকে অকালে তল্পী-তল্পা গুটাইতে হয়।

শুধু দোকানদারীতে আর চলিতেছে না। এখন বহির্বাণিজ্যের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া

পাট জন্মাইল কৃষক, কিন্তু লাভের ভাগী হইল আর দশ জন। কিন্তু যদি দেশে এমন কোন সমিতি থাকে যে তাহারা বিদেশে দেশজাত জিনিষ পাঠাইয়া ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে কত সুবিধা হয় বলুন দেখি। শত শত যুবকগণকে ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার নানা স্থানে গমন করিয়া ভারতজাত জিনিষ বিক্রয়ের আড্ডা স্থাপন করিতে হইবে। এবং তৎ তৎ স্থানের জিনিষগুলি এদেশে পাঠাইতে হইবে। মোটের উপর আমদানী রপ্তানীর ভার আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তদুপরি শিল্পের উন্নতির বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর শত শত যুবক ইউরোপ আমেরিকায় গমন করিয়া নানা শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া আসিয়া চাকুরীর জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাদের ঘরের আনাচে-কানাচে কত সব জিনিষ পচিতেছে; তাহা কাজে লাগাইলে দেশের অর্থ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু আমাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শ্বেতাঙ্গগণ বাঙ্গালার অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া দেশের জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করিতেছে, আর আমরা তাহাদের অধীনে ২০৲। ২৫৲ টাকার চাকুরীর উমেদারীর জন্য কুকুরের মত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছি। এমন নির্লজ্জ জাত বোধ হয় আর দুনিয়ায় নাই।

—রঙ্গপুর-দর্পণ।

পরমুখাপেক্ষী বাঙালী যাতে স্বাবলম্বী ও আত্মপোষী হইয়া উঠে তার পথ পুঁথি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙালী যুবককে জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি উপায়ের সংবাদ আছে—

কাপড় বোনা—বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের বয়ন-বিভাগের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত এন্ এন্ পিলাই মহাশয় গত ১৩ই জুন হইতে এখানকার তাঁতি-পাড়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট বয়নশ্রেণীতে উন্নত প্রণালীর ঠক্‌ঠকি তাঁতে ডসরের থান বুনিবার কার্য্যপ্রণালী এবং তাঁহার আবিষ্কৃত একটি যন্ত্রবিশেষের দ্বারা কেটে হইতে সুতা বাহির করিবার সহজ উপায় দেখাইয়া দিতেছেন।—বীরভূম-বাণী।

বয়ন বিদ্যালয়—বিগত শনিবার অপরাহ্ণ কালে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে সি দে কর্ত্তৃক বেগমগঞ্জ বয়ন বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।—নোয়াখালি সম্মিলনী।

ব্যবসা-বিমুখ বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা যে,—

জার্ম্মানীর হাম্‌বার্গে ডাক্তার জে, সি, দাস গুপ্ত এণ্ড কোং নামে একটি রাসায়নিক কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—যশোহর।

সাধু প্রস্তাব—আমরা শুনিতেছি যে যশোহর জেলায় আর্টস্‌কলেজ খুলিবার প্রস্তাব শুনিয়া জয়পুর-নিবাসী আর সি ধর, এন্ কে ঘোষ, এইচ জি ব্যানার্জী যুবকগণ কলেজের পরিবর্ত্তে টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। প্রস্তাবটি বিদ্যোজ্জ্বল যুবকগণের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া আমাদের মনে হয়।—কল্যাণী।

ধানভানা ও তৈলের কল।—এখানে শীঘ্রই ধান ভানা ও তৈলের একটি কল প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ের উন্নতিরই সূচনা করে, নির্জ্জীব বাঙালীর উদ্যমশীলতার পরিচয় প্রদান করে।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে যশোহরের অনেক প্রসিদ্ধ পল্লীতে অনেক শিক্ষিত সন্তান ব্যবসায় ও বাণিজ্যবিশেষে মনোযোগী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি পল্লীতেই যৌথ-কারবার-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে এবং আর-কয়েকটি পল্লীতে সত্বরই স্থাপিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি।—কল্যাণী।

কিন্তু বাংলায় যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাহাতে—

আমরা দেশবাসী জনসাধারণকে অনুরোধ করি—দেশে তুলা উৎপাদন ও চরকা তাঁতের প্রচলনের জন্য সকলে সমবেত ও ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করুন। চা-এর চাষের পরিবর্ত্তে দেশে যাহাতে তুলার চাষ বৃদ্ধি পায়, এখন বিশেষভাবে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। গৃহলক্ষ্মীরা চরকা ও তাঁতে মনোনিবেশ করিয়া যাহাতে পরিবারের দুঃখ-দৈন্য আর বৃদ্ধি করিতে পারেন সেই চেষ্টা করুন। ইহাতে রাজা-রাজড়ি রাজা বাদসা হইতে না পারিলেও আত্মনির্ভরতার বলে সমগ্র জাতিটা যে প্রকৃত উন্নতির পথে অন্ততঃ একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—সুরমা।

প্রত্যেক বাঙালীর ছেলেরই দেশে কিছু-না কিছু জায়গা জমি আছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কৃষি সম্বন্ধে যদি কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করেন তাহা হইলেও তাঁরা স্বকীয় অধ্যবসায়ে জীবিকা উপার্জ্জনে খানিকটা সক্ষম হন এবং দেশের কৃষককুলকেও উন্নত করিতে পারেন।

কৃষি-শিক্ষা।—চট্টগ্রাম জেলার দুর্গাপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম কারণ যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের ন্যায় কৃষি-প্রধান স্থানে কৃষি-শিক্ষা যে একান্ত আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র; কেননা, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সামান্য বেতনের চাকরী করা অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে কৃষি-শিক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। এই দুর্গাপুর বিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা ও কৃষিবিষয় ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে কৃষি-ক্ষেত্রের জন্য প্রায় বিশ বিঘা জমি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ বিদ্যালয় দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইলে আমাদের দেশে কৃষির বিশেষ উন্নতি হইবে। অন্যান্য দেশে কতরকম বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা কৃষিবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতিবিধান করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে অন্যান্য অনেক বিষয়েই বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু কৃষিবিদ্যার ন্যায় প্রয়োজনীয় বিদ্যার প্রতি কেহই লক্ষ্যপাত করেন না, ইহাই অনুতাপের বিষয়।—প্রতিকার।

আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিয়াছি যে যদি আমাদের দেশের ন্যায় কৃষি-বিজ্ঞান-জ্ঞানহীন জনসাধারণের দ্বারা কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হয় তাহা হইলে সরকারকে বহুতর কৃষিতত্ত্ববিৎ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে যে তাহারা যেন ১০।১৫ খানি গ্রাম লইয়া এক-একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতঃ কৃষকদের ক্ষেত্রে—মাঠে হাতে-কলমে কাজ করিয়া ও করাইয়া সফলতার চেষ্টা করেন। তাহা হইলে যদি অল্পদিন মধ্যেই এদেশে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। নচেৎ বীজ বিতরণ করিয়া অথবা মৌখিক উপদেশ প্রদান করতঃ কৃষিতত্ত্ববিৎ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিলে কোন কালেও এদেশে কৃষির উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

—রঙ্গপুর-দর্পণ।

মফস্বলে দুই-চারিজন শিক্ষিত বাঙালী কৃষির দিকে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। কৃষককুল দেশের একমাত্র ভরসা। তাদের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সাধু প্রস্তাব ও আবেদনটির প্রতি আমরা দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

কৃষক সমবায়।—আমাদের দেশের কৃষকগণ মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া রাত্রিতে না ঘুমাইয়া প্রচণ্ড শীতে প্রখর রৌদ্রে মাঠে পড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে শস্য উৎপাদন করতঃ আমাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি জন্য তাহাদের শস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা যে কি বিপদে পড়ে সেদিকে আমরা একেবারেই দৃষ্টি করি না। যদি কাহারও লক্ষ্য পড়ে তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও মজলিসে মৌখিক হা-হুতাশেই পরিসমাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে অনেক মনীষীর প্রাণ দরিদ্রের দুঃখে কাঁদিয়াছে। নানাদিক হইতে নানারূপ চেষ্টাও হইতেছে। তাঁহাদের কর্ম্ম আলোচনা ও আন্দোলনে বুঝিয়াছি যে, রাজা, মহারাজা, ধনী ও মহাজনের হৃদয়ের অন্তস্থলে যে অশান্তি আগ্নেয়গিরির মত মৃদু মৃদু জ্বলিয়া ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও অতৃপ্তি আনিতেছে, তাহা কেবল ঐ দলিত প্রপীড়িত ঘৃণিত মূর্খ—জগতের জীবনরক্ষাকারী কৃষকগণের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার কারণগুলি নিরাকরণ করিতে না পারার ফল। তাহা নিরাকরণ করিতে না পারিলে কোনক্রমেই জগতের মঙ্গল সাধন হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের সুখে, দুঃখে, হাসিমুখে ভাগীদার হইয়া তাহাদের আঁধারে দীপ জ্বালিতে হইবে; তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদের নিজের অবস্থা বুঝিবার জ্ঞান দিতে হইবে। তাহাদিগকে আঁধারে ফেলিয়া রাখিলে মূর্খ করিয়া রাখিলে জগতের আন্তরিক অশান্তি কখনই নিবারিত হইবে না। তজ্জন্য আমার ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক-প্রসূত "কৃষক সমবায়" স্থাপনের জন্য সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। যদি প্রত্যেক গ্রামে সম্ভব-মত ২।৩টি করিয়া "কৃষক সমবায়" স্থাপন করা যায় তবে অংশীদারগণ ও কৃষকগণ উভয়েই লাভবান হইয়া সুখে বাস করিতে পারিবেন এবং শান্তিও আসিবে; আমরা ইহার বিস্তৃত নিয়মাবলী ও প্রয়োজনীয় ফরমাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত করিতেছি। দেড় আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাইবেন। ইতি—

শ্রীঅরূপচন্দ্র রায়, ঝিনাইদহ, যশোহর।

এইরূপে কৃষির সংস্কারকার্য্যে ও স্বাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদিগকে উৎসাহের সহিত নামিতে হইবে। আগে আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, তারপর মানসিক যোগ্যতা লাভের জন্য পরিশ্রম ও আন্দোলন। পেটে না খাইলে মনে উচ্চ চিন্তা আসিবে কোথা হইতে? যে-সব যুবক স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে চান তাঁদের কাছে একটা আনন্দ-সংবাদ আছে—

প্রশংসার কাজ।—"সময়" পত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে যি কে দাস কোম্পানী বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ও ব্যয়নিষ্ঠ যুবকদিগকে মাসিক ১০৲ টাকা দিয়া ব্যবসা শিক্ষা দিবেন। কাজকর্ম্ম ভাল করিতে পারিলে বেতন ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। আর যোগ্যতা জন্মিলে বিনা মূলধনে লাভের অংশও পাইবেন। তবে তাঁহারা কত জনকে লইবেন, তাহা কিছু বলেন নাই। ঠিকানা ৪নং উইলিয়মস্ সেন কলিকাতা। এই একটা কাজের মত কাজ হইতেছে। আমরা অনুষ্ঠাতাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

—বীরভূমবাসী।

আমাদের মধ্যে শিক্ষা যে একেবারে ব্যর্থ হইতেছে না, দেশের লোক যে কিছু পরিমাণে পরহিতাকাঙ্ক্ষী ও সেবাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা এইসব কাজেই প্রকাশ পাইতেছে—

দরিদ্র ভাণ্ডার—মুজাফ্ফরপুর পরগণার ঈশ্বরপুর গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবক বিপন্ন ও দরিদ্র ব্যক্তিদের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে কিছুদিন হইল একটি "দরিদ্র ভাণ্ডার" সংস্থাপন করিয়াছেন। মুষ্টিভিক্ষাই এই ভাণ্ডারের জীবন। আমরা অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিলাম যে, যুবকেরা মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের দ্বারাই এ দুঃসময়ে গরীবদের অনেক উপকার করিতেছেন। এ ছাড়া তাঁহারা কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়া নিঃসম্বল রোগীদের চিকিৎসা করাইতেছেন এবং পথ্যাদির জন্য অর্থ সাহায্যও করিতেছেন। আধি ব্যাধি, অভাব অনাটন প্রভৃতিতে দুঃস্থ ও অজ্ঞ পল্লীবাসীরা জর্জ্জরিত। পল্লীবাসী আর্ত্ত দরিদ্রদের হিতসাধনকল্পে বালকদের এই উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকদের দ্বারা স্থানে স্থানে যদি এরূপ দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে দেশের দীন দরিদ্র ব্যক্তিদের অনেক উপকারের আশা করা যায়।—নীহার।

সমবায়ের প্রসার।—পূর্ব্ববঙ্গে সমবায়ের প্রসার হইতেছে। গত ছয় মাসে প্রায় তিনশত নূতন সমবায় সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এই শ্রেণীর সমবায় সমিতির মধ্যে চট্টগ্রামের সমবায় ভাণ্ডার ও মেথরদের যৌথ ব্যাঙ্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের সমবায় ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ অপেক্ষাকৃত সস্তায় চাউল ও কেরোসিন তৈল বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিতেছেন। চট্টগ্রামের মেথর যৌথ ব্যবসায় বঙ্গদেশে সম্যক নূতন অনুষ্ঠান। মেথরগণ সাধারণতঃ বেতন পাওয়ার দুই এক দিনের মধ্যে তাহা ব্যয় করিয়া কাবুলিদের কবলগ্রস্ত হয়। ইহাদের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থ সাহায্যে মেথরগণ ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া অস্ত্র চালান করিতেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম কলেজেও একটি সমবায় ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। পরিচালকগণের ভ্রমবশতঃ পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক জিলায় অনেক সমবায় সমিতি বন্ধ হইয়াছে। চট্টগ্রামে তেমন হয় নাই।

—জ্যোতিঃ।

শুভসংবাদ—যশোহর ও খুলনা জেলার এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় তথাকার স্কুলে স্কুলে কো-অপারেটীভ ষ্টোর স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ষ্টোর হইতে সুলভ মূল্যে চাউল বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষপত্র সরবরাহের এবং নামমাত্র সুদে ঋণ দিবার ব্যবস্থা হইবে। এডিসনাল ইনস্পেক্টর মহাশয় তাহার অধীনস্থ স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে দরিদ্র শিক্ষককুলের সহায়তাকল্পে এইরূপ উদ্যম প্রকৃত প্রশংসনীয়।

—কল্যাণী।

কিন্তু সামান্য কয়েকটি সৎকাজের অনুষ্ঠান দেখিয়াই আমরা যেন না বুঝি যে আমরা খুব উন্নত। আমাদের চরিত্র এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। বড় কাজ করিবার মত সাহস উদ্যম ও সাধুতার আমাদের মধ্যে অভাব। নির্ভীকতা, অন্যায়-অসহিষ্ণুতা ও সত্যনিষ্ঠা আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। কেবল ইংরেজকে দুঃখের কথা জানাইয়া আমাদের আর কোন লাভ নাই। আমাদের ভাগ্য আমাদের নিজেদেরই গড়িতে হইবে, আমাদের প্রতি অন্যায়কে আমাদের নিজেদের শক্তির দ্বারাই দমন করিতে হইবে। কোন বিষয়ে আমাদের আর পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। চাই চরিত্রবল, চাই আত্মার শক্তি।

আমাদের মধ্যে যে কত ত্রুটি আছে তার ইয়ত্তা নাই। ট্রামে উঠিয়া অশিক্ষিত কণ্ডাক্টারগুলোর সঙ্গে ছয় পয়সার জায়গায় চার পয়সা ও পাঁচ পয়সার জায়গায় তিন পয়সা রফা করিয়া নির্লজ্জ ভাবে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরাই বাঙালীর ঘরের ভদ্র সন্তান, অফিসের হোম্‌রা-চোম্‌রা বড় বাবু! যার কাছ থেকে একটু স্বার্থ পূরণের আশা আছে তার নানা অন্যায়কে আমরা অনায়াসে হজম করিয়া ফেলি। দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, নিজেদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা হয় যখন এইসব ঘটনা নিজেদের চোখের সাম্‌নে ঘটিতে দেখি।

পরের পীড়ন হইতে ও নিজেদের কু-আচরণ হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় চরিত্র-বল; রাজনীতি নয়। নীচতা ও ক্ষুদ্রতা দলিত করিয়া শক্তি ও সত্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য বাঙালীকে সাধনা করিতে হইবে। আত্ম-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজেদের প্রতিকার আমরা নিজেরাই করিব।

সুচরিত্রের লক্ষণ—জাতির সকল লোকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে আবদ্ধ থাকিবে। যারা তথাকথিত হেয় তাদের দূরে রাখিলে আর চলিবে না। আমাদের সমাজের এমন অনেক জাতিকে আমরা দূরে রাখিয়াছি যাদের কাছে আনিয়া সংবদ্ধ ভাবে কাজ করিলে আমরা সমাজের ও দেশের অধিকতর হিতকর কাজ করিতে পারি। যে মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত আমরা এতদিন পাশাপাশি বাস করিতেছি দেশের কাজে তাঁরাও যে আমাদের সহযাত্রী, ইহা যেন না ভুলি। চরিত্রবল, ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বন্ধন আমাদের মধ্যে এত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আফগানের আমীরের ঔদার্য্য আমাদের মনে ঔদার্য্য উদ্বুদ্ধ করুক—

আফগান আমীর ও হিন্দু।—আফগান আমীর আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে হিন্দু প্রজাগণ তাহাদের ইচ্ছামত দেশে বাস করিতে পারিবে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইবে না, তাহারা স্বেচ্ছামত আফগান রাজ্যে আসিতে এবং আফগানিস্থান হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে। সরকারী বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে ইহাদিগকে নিযুক্তও করা হইবে। হিন্দুদিগের প্রতি আমীরের এরূপ সদয় ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। —বীরভূম-বার্ত্তা।

বিগত যুদ্ধে আর্থিক অভাবে প্রপীড়িত হইতেও আমাদের অনেক যুবকের মনে যে সাহস ও শক্তির প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা আমাদের কম লাভ নয়। যে-কোনো বিভাগে বাঙালীর কৃতিত্বের কথা শুনিয়া মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে:—

মেসোপটেমিয়ায় উপাধি লাভ।—চট্টগ্রাম সহরের অনুরবর্ত্তী দলি পুকটুলী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ধনঞ্জয় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত সুবোধ রমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় দক্ষতার সহিত মেসোপটেমিয়া এক্সপিডিসনারি ফোর্সে কাজ করার দরুণ শ্রীশ্রীযুক্ত ভারতসম্রাট বাহাদুর জন্মদিন উপলক্ষে "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মেসোপটেমিয়াতে এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। —জ্যোতি ও প্রতিকার।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২০ জন ছাত্র এবার ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭ জন বাঙালী। —বীরভূমবাসী।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কষ্টিপাথর

বিলাতযাত্রীর পত্র।

৩

জাহাজে বড় বেশি ভিড়। ডাঙার হাটে বাজারে যে ভিড় হয় সে চলতি ভিড়—নদীতে জোয়ারে জলের মত—কিন্তু এই ভিড় বদ্ধ ভিড়। আমরা যেন কোন্ এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েছি কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েছে বাম হাতের মুঠোয় তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। ঐ দিককার রেলের দিক চেয়ে দেখলে মনে হয় যেন ঐ অংশে জাহাজের হাঁপ নিয়ে ব্যাপার, যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস নিয়ে উঠ্‌তে পারছে না। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে কারুকারী যুগ। রেলগাড়ি বল, ষ্টীমার বল, হোটেল বল, ইস্কুল বল আর পাগ্‌লা গারদ বল, সমস্তই পিণ্ডাকারে প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত

বেশি সঙ্কুচিত হতে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখনকার সভ্যতা বলচে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয়, সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এই-রকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সাম্রাজ্যে কি সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এই অন্যায় এবং দুঃখকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই মানুষ নানা উক্তিতে অনুষ্ঠানে ও শাসনে রাষ্ট্রপূজা ও সমাজপূজাকে একটা ধর্ম্ম করে তুলেচে। সেই ধর্ম্ম যারা মানচে এবং দুঃখ সহ্য করচে মানুষ তাদেরই সাধু সম্বোধন করে পুরস্কৃত করচে; যারা মানচে না তাদের বলচে বিদ্রোহী, তাদের দিচ্ছে নির্ব্বাসন কিম্বা প্রাণদণ্ড। এমনি করে প্রভূত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয় এমন একদিন আসচে যখন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না; যখন ব্যষ্টি আপন পুরা মূল্য দাবী করবে। আজ কর্ম্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করচে; তাতে লুব্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ত্রুটি করচে না, এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও দোহাই দিচ্ছে; বলচে, তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে নেশনের ক্ষতি হবে, অন্য নেশন বাণিজ্যবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কর্ম্মিক সে দোহাই আজ মানতে চাচ্চে না; বলচে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেব না, আমার যা পুরা মূল্য তা আমাকে দিতেই হবে। য়ুরোপে রাষ্ট্রধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলির মানুষকে যূপকাষ্ঠে টেনে নিয়ে আসে; এই ধর্ম্মের দোহাই শুনে কর্ম্মিকেরা ধনদেবতার রথযাত্রায় রথ টানতে টানতে তার চাকার তলায় পড়ে পড়ে মরে, সৈনিকেরা শক্তিদেবতার কণ্ঠহার রচনার জন্যে আপন ছিন্নমুণ্ড উৎসর্গ করে' পুণ্যলাভ হল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে এসেচি;—শূদ্রকে বলে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও, কেননা সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ, অতএব এই তোমার ধর্ম্ম; নারীকে বলে এসেচি কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও, তাহলেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টিদেবতা সর্ব্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচতে দিবে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠচে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠবে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনই টিকতে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েচি, কিন্তু এমন কত বলিরক্তলোলুপ ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচি করে আজ অন্তর্দ্ধান করেচে।

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ করে বেদনা দিচ্চে, তার কারণ বলি। আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্পকিছু মন্থরগমনে চলচে বলে যাত্রীরা দুঃখ বোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের সেই হতভাগ্য "ষ্টোকার" দল (Stoker) নূতন ব্রতী, তারা পুরাদমে কাজ করতে পেরে উঠচে না। শোনা গেছে বেঘাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্ম্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনো-ক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরীর প্রলোভন দিয়ে ষ্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন ষ্টোকার হাতায় করলা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি ও অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সাম্নে পড়ে মরে গেল। কিন্তু জাহাজ ধর্ম্মঘটের আগেই ঘাটে পৌঁচেছিল। খনি-কারদের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, ষ্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছয় না—এই জন্যে এদের সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করা অনাবশ্যক;—সভ্যতার মধ্যে যে একটা সমষ্টিগত ধন ও প্রয়োজন আছে তারই কথাটা এদের সকল দুঃখের উপর মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। সবই মানি, কিন্তু এও মানতে হবে যে, যত সুবিধা যত সুখই হোক্ না, তাকে সভ্যতা বল আর যাই বল না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষরা আপাতত মরে, কিন্তু পরে তারাই বলিদাতাকে মারে। এই কথা নিশ্চয় জেনো, গ্রীস্ রোম ইজিপ্ট তার বলিদের হাতেই মরেচে। আর ভারতবর্ষও তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরচে। ইতিহাসে এ নিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হতে পারে না—আমাদের শাস্ত্রে বলে ধর্ম্ম হত হয়েই নিহত করে—কিন্তু সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠুর সমষ্টি-দেবতার ধর্ম্ম নয়, সেই ধর্ম্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম্ম।

১৯ মে ১৯২০।

৪

এডেন পার হয়ে লোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেচি। এদিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করচি। নানা নামের নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্চে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করচে। এই ঠাণ্ডা-গরমেই মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেচে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর এক দিক থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরস্পর আহত প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক উনপঞ্চাশ পবনের রুদ্র নৃত্য রচনা করে চলেচে, সেও এই ঠাণ্ডাগরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডা-গরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটবে না। আমরা গরম দেশের লোক এক ভাবে চিন্তা করব কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাবে। আমাদের জিনিষ ওদের হাটে এবং ওদের জিনিষ আমাদের হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে—এ কোনোদিনই ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেননা জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতায় ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে থাকবে। জাহাজে করে পৃথিবীর একভাগ থেকে আরেক ভাগে চলবার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ায় উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তিবৈচিত্র্য, সে কথাটা ভারতসমুদ্র থেকে মধ্যধরণী সাগরের দিকে আসবার সময় নিজের সমস্ত শরীরমন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার এ কথা শুনে তোমরা হয় ত বলবে, "তবে কি তুমি বলতে চাও বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে উঠতে পারিনে?" এ কথার উত্তর হচ্ছে—নিশ্চেষ্ট হতে হবে এমন কথা বলা চলবে না, কিন্তু চেষ্টাকে নিরূপায় দেওয়া চাই। বাহ্যপ্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েচে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু-পরিমাণে বদলও করতে পারে,

কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার জো নেই। তা হলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্ছে এই, যেটা পাওয়া গেছে সেটাকেই পূর্ণ-উদ্যমে সফল করে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্র্যকে দোহন করে নিতে পারে, কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন-অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পরমার্থ বলে লুব্ধভাবে কামনা করা শক্তি-হীনের কাজ। উপনিষদে বলেছেন, যিনি এক তিনি "বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি তাঁর বহুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থ দান করেছেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; নিজের শক্তির দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যে-জাতি উদ্ঘাটিত করতে পেরেছে সেই জাতিই সার্থক হয়েছে। কারণ যে-জাতি নিজের অর্থ পেয়েছে, বিনিময়ের দ্বারা পরের অর্থকেও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্ঘাটিত করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা করে' চুরি করে' পরের অর্থ কামনা করে, কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হতে পারে না; কেন না, এই পথে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে অভাব যায়, পেটও ভরে না। ইতি ২৪শে মে, ১৯২০।

৫

দুই মহাদেশের মাঝখান দিয়ে চলেছি—বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরব। দুই তীরেই জনহীন তৃণহীন ধূসরবর্ণ পাহাড় যেন দুই ঈর্ষাপরায়ণ দৈত্যভ্রাতার মত পরস্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করচে, আর যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তারা উভয়েই জন্ম নিয়েচে সেই সমুদ্র যেন দিতি-মাতার দুই ভ্রূনোন্মুখ ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে অশ্রুপরিপূর্ণ অনুনয়ের দ্বারা দুই পক্ষকে তফাৎ করে রেখেচে।

বামের তীর শব্দহীন নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই। কিন্তু এই দুই তীরের ভূয়ঙ্গমঞ্চে মানব-ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেচে আমি মনে মনে তারই কথা চিন্তা করে দেখ্‌চি। ইজিপ্টে যে মানব-সভ্যতা বিকাশ পেয়েছিল সে বহুদিনের এবং সে বহুসম্পদশালী। তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আর আরবে যে জাগরণ হঠাৎ দেখা দিয়েছিল তার কত উদ্যম, কত উদ্যোগ, কত শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিত্তের এই দুই উদ্বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ইজিপ্ট আপনার বিপুল আয়োজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর আরব আপন দুর্দমনীয় বেগে দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ ছিল দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে। নীলনদীর জলধারায় পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শস্যে পরিপূর্ণ, অভাবের কঠিন তাড়নায় সেখানকার মানুষকে নিরন্তর আঘাত করেনি। স্তন্যরসহীন আরব-মরুভূমির সন্তানেরা নিজে অস্থির হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির করেছিল।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যেমন দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঋষি ছিলেন, তেমনি ইজিপ্ট এবং আরব দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দেশ। পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে' বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বশিষ্ঠ বাস করেন, আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বশিষ্ঠ ধেনু পালন করেন আর বিশ্বামিত্র ধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের হাতে অস্ত্র দেন। বশিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী গৃহের পুরোহিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বনপথের নেতা।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বশিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই দুই ঋষি কি কোনোদিন প্রেমে মিল্‌বেন? আর যদি না মিল্‌তে পারেন তা হলে পৃথিবীতে কি কোনো কালে বিরোধের অবসান হবে? যদি এমন আশা করা যে দুয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন সেই দিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা জগতে বশিষ্ঠও অমর, বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিবৃবে না। এশিয়া এবং য়ুরোপ যদি কোনোদিন সত্যে মিল্‌তে পারে তা হলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে—নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা নিয়তই কলুষিত হবে।

২৪শে মে, ১৯২০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান।

আমার বোঝা এতই করি ভারী,
তোমার ভার যে বইতে নাহি পারি;
আমারি নাম সকল গায়ে লিখা,
হয়নি পরা তব নামের টীকা;
তাই তো আমায় দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।
আমার ঘরে আমিই শুধু থাকি,
তোমার ঘরে লও আমারে ডাকি—
বাঁচিয়ে রাখি যা কিছু মোর আছে—
তার ভাবনায় প্রাণ ত নাহি বাঁচে,
সব যেন মোর তোমার কাছে হারি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(মোস্‌লেম ভারত, আষাঢ়)।

কুষ্ঠরোগ

ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার; বাংলা দেশে ১৭৪৮৫;—ইহার মধ্যে পুরুষ ১৩২৪১, স্ত্রীলোক ৪২৪০। কোন্ জেলায় বা কোন্ বিভাগে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কত নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল (১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট)—

বিভাগ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
বর্দ্ধমান	৫৮৩৯	২৩৯১	৮২৩
প্রেসিডেন্সী	১৭১৭	৪৯২	২২০
রাজসাহী	২৪৭৯	৬৩৯	৩১১
ঢাকা	২৩২৬	৪৮৫	২৮১১
চট্টগ্রাম	৫১০	১৪৯	৬৫৯
জেলা			
বাঁকুড়া	১৭৬৪	৮৮১	২৬৪৫
বর্দ্ধমান	১৫৩৭	৬১৫	২১৫
মেদিনীপুর	১১৩২	৪০৯	১২৪
বীরভূম	১১১৪	৪১৪	১৫২৮
হুগলী	২০০	৫৫	২৫৫
হাওড়া	৪৪	১৭	১০৫

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
মুর্শিদাবাদ	৩১১	১৬৯	৭৮০
নদিয়া	৪০৯	১১৫	৫২৪
২৪ পরগণা	১৯৮	৫৮	২৫৬
কলিকাতা	১৯৬	৭৫	২৭১
যশোহর	২০১	৪৫	২৪৬
খুলনা	১০২	৩০	১৩২
রংপুর	৯১৬	১৮৯	১১০৫
দিনাজপুর	৩৭৬	১০৬	৪৮২
জলপাইগুড়ি	৪৩৬	১২০	৫৫৬
মালদহ	২৭৬	৭৮	৩৫৪
পাবনা	২০৯	৫৭	২৬৬
বগুড়া	১৫১	২৮	১৭৯
দারজিলিং	৬৪	১৭	৮১
ময়মনসিংহে	১৫৬৬	২৮৩	১৮৪৯
ঢাকা	৪৯৫	১৩৩	৬২৮
ফরিদপুর	১৭২	৩৮	২১০
বাখরগঞ্জ	৯৩	৩১	১২৪
ত্রিপুরা	৩২৪	৯৫	৪১৯
চট্টগ্রাম	৮৮	২৭	১১৫
পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম	৬৩	২০	৮৩
নোয়াখালী	৩৫	৭	৪২
দেশীয় রাজ্য			
কোচবিহার	৩১১	৬৯	৩৮০
ত্রিপুরা	৬৩	১৫	৭৮
সিকিম	৭	১৭	২৪

গত সন ১৩২৫ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ভাস সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সে সময়ে এ জেলায় ৪৬০০ জন কুষ্ঠরোগী ছিল। ১৯১১ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে শতকরা ৭৫জন হিসাবে এ জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।—

"গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা দান পাইত তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুষ্ঠরোগী; ইহা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে; এবং আমি রিলিফ অফিসারদিগকে গ্রাম অনুসারে কুষ্ঠরোগীদিগের গণনা করিতে আদেশ দিই। এই গণনার ফল এতৎসংলগ্ন হিসাবে দেখান হইল। যাঁহারা মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেছিলেন যে এই জেলায় কুষ্ঠ রোগ এমন কোন বিপদ নহে যাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে তাঁহারা এই গণনার ফল দেখিয়া বিশেষ ত্রস্ত হইবেন।

ইং ১৯১১ সনে এই জেলাতে প্রায় ২৬০০ জন কুষ্ঠরোগী ছিল। উহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা ৪৬০০ জনের উপর অর্থাৎ এই নয় বৎসরে শতকরা ৭৫ জন হিসাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা সত্যই ভয়াবহ ব্যাপার। লোকগণনার তত্ত্বাবধায়ক বা সেন্সস সুপারিটেণ্ডেণ্টের মত অনুসরণ করিয়া এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লোকদিগের অবস্থার উন্নতি এইরূপ বলা যাইতে পারে না। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে এই নয় বৎসরের ভিতর ইং ১৯১৫-১৬ সনে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত সকল জিনিষের দাম এত বেশী চড়িয়া গিয়াছে যে অধিকাংশ লোকেরা জীবনযাত্রার পরিমাপ কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। সে যাহা হউক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এই বাঙ্গলা দেশের এই রোগের কেন্দ্রস্থান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখন আরও স্মরণ করা যায় যে বঙ্গদেশের সকল জেলার মধ্যে বাঁকুড়া জেলা হইতেই অধিক লোক বিদেশে যায় এবং বাঁকুড়া-জাত লোকের মধ্যে শতকরা ১৫ জন লোক এই জেলার বাহিরে বাস করে। ইহা আরও বুঝিতে পারা যাইবে যে এই অবস্থা সমস্ত বঙ্গদেশেরই বিপজ্জনক।"—জে ভাস, কলেক্টর ও বাঁকুড়া জেলা কৃষি সমিতির সভাপতি, কর্ত্তৃক লিখিত এবং বাঁকুড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কুষ্ঠব্যাধি সমস্যা ও তাহার বৃদ্ধি" নামক পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

সমগ্র বাংলা দেশে যত কুষ্ঠরোগী আছে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বর্দ্ধমান বিভাগের অধিবাসী। মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা ২৮ লক্ষ ২১ হাজার। বীরভূম জেলার লোকসংখ্যা ৯৩৫ হাজার। কিন্তু এই দুই জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় সমান। বর্দ্ধমান বিভাগে বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান এই চারি জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রেসিডেন্সি বিভাগে (লোকসংখ্যা ৯৪৪৫৩২১) যত কুষ্ঠরোগী আছে, বাঁকুড়া জেলায় (লোক সংখ্যা ১১৩৪৬৭০) কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ। ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের দেড়গুণ, চট্টগ্রাম বিভাগের সাতগুণ কুষ্ঠরোগী বাঁকুড়া জেলায় আছে। একমাত্র বাঁকুড়া জেলায় যত কুষ্ঠরোগী তাহার মাত্র দেড়গুণ ঢাকা রাজসাহী ও চট্টগ্রাম এই তিন বিভাগে আছে।

হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, খুলনা, রাজসাহী, দার্জ্জিলিং, বগুড়া, পাবনা, মালদহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, যশোহর, ত্রিপুরা, দিনাজপুর, নদীয়া এই ১৯টি জেলায় কুষ্ঠরোগী ৪২৪৩ এবং কুচবিহার রাজ্যে ৩৮০, মোট ৪৬২৩ জন, অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার কুষ্ঠরোগীর সমান।

কুষ্ঠরোগ গরীবের ঘরে আবদ্ধ নহে; উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, সকলেরই আছে। বাঁকুড়া জেলায় কয়েক জন জমীদার এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বাঁকুড়া আদালতের জনৈক উকিল এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ওকালতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারের সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

ভাস সাহেবের গণনাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ধারণা—এ জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা দশহাজার হইবে। কারণ অনেকেই এই রোগ গোপন করে।

যাহাদের রোগ নূতন বা সামান্য কোথাও দেখা দিয়াছে, তাহারা কোন-মতে ইহা প্রকাশ করে না। এরূপ গুপ্ত রোগীর সংখ্যাও অনেক, ইহাদিগকে গণনার ভিতর ধরা হয় না।

ব্রাহ্মণ হইতে বাউরী ভূমিজ সকল জাতির মধ্যেই এই রোগ আছে। বাঁকুড়া জেলায় উপদংশরোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহারা গ্রাম্য হাতুড়িয়া কবিরাজের নিকট চিকিৎসা করায়। কাঁচা পারা খাইলেই সদ্য সদ্য এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পরে পারা সংশোধনের জন্য আবার ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় দেখা গিয়াছে অনেক স্থলেই পারা সংশোধন হয় না। এজন্য কয়েক বৎসর পরেই দেহে পারা ফুটিয়া বাহির হয়।

আমাদের দেশে জাতি বিচার যত বাড়াবাড়ি, রোগের বিচার তত নহে। কুষ্ঠরোগীর উচ্ছিষ্ট তাহার স্ত্রী পুত্র বন্ধু অম্লান বদনে আহার করে। ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত-ব্রাহ্মণের স্পর্শকরা জল পান করিবেন, কিন্তু তিনি একজন বলিষ্ঠ সুস্থকায় বাউরির ছোঁয়া জল পান করিবেন না, করিলে তাঁহার জাতি যাইবে। ধন্য রে জাতিবিচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

গ্রামের লোকেরা যে জলাশয়ে স্নান করে, কুষ্ঠরোগীও সেই জলাশয়ে জলশৌচ ও স্নান করে, কাপড় কাচে,—এ বিষয়ে কোন নিষেধ নাই। এ জেলায় পানীয় জলের জন্য পৃথক জলাশয় নাই। গ্রামে যে জলাশয়টি বড়, সকলেই সেইটিতে স্নান করে এবং সেইটির জল ব্যবহার করে। কুষ্ঠ-রোগীও এই পুষ্করিণীতে স্নান করে। কুষ্ঠরোগী স্বহস্তে পয়সা লইয়া ময়রার দোকানে খাবার কিনিতে যায়; ময়রা সেই পয়সা লইয়া বাক্সে ফেলিয়া দেয়; মুদীর দোকানেও সেইরূপ। কুষ্ঠরোগী দর্জ্জির কাজ করিতেছে, জুতাসেলাই করিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, তরকারী বিক্রয় করিতেছে, গাড়ী চালাইতেছে, তাস খেলিতেছে, ধোপার কাজ করিতেছে; কোথাও কোন নিষেধ বা বাধা নাই। কুষ্ঠ-রোগী যে হুকায় তামাক খায়, তাহার জাতভায়েরাও সেই হুকায় ধূমপান করিতেছে। স্বজাতীয়ের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছে। যাহাদের হাতপায়ের আঙুল খসিয়া গিয়াছে, রস বাহির হইতেছে, সমস্ত দেহ কুষ্ঠরোগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতভায়দের সহিত মেলামিশা করে না।

বাঁকুড়া জেলার পল্লীগ্রামের সংখ্যা ৪৬৩৪ ডাল-সাহেবের গণনায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৪৩০০। ইহাতে প্রতি গ্রামে একজন কুষ্ঠরোগী দেখা যাইতেছে। দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সব জাতির চেয়ে বেশী।

বাউরি, রাজপুত, ভূমিজ, চামার, বাগ্‌দি, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, বৈষ্ণব—এই কয় জাতির মধ্যে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশী।

বাঁকুড়া সহরের উপকণ্ঠে খৃষ্টান মিশনরীদের তত্ত্বাবধানে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। অনেকে ধর্ম্ম যাইবার ভয়ে সেই আশ্রমে আসিতে চায় না। সন ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বিষ্ণুপুরে আসিয়া-ছিলেন। বিষ্ণুপুরবাসী সেখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। মেদিনীপুর বর্দ্ধমান ও বীরভূম এই তিনটি জেলার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু এই তিন জেলায় কুষ্ঠাশ্রম নাই। বাঁকুড়া-সম্মিলনী বাঁকুড়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের চেষ্টায় আছেন।

বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন একান্ত আবশ্যক। ৪।৫ হাজার বিঘা জমির আবশ্যক। এই উপনিবেশে একটি হাঁসপাতাল ও দোকান রাখিতে হইবে। এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, কুষ্ঠ-রোগীদের এই উপনিবেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে না হয়। শাকশব্জীর আবাদ এই উপনিবেশেই হইবে।

এক হাজার কুষ্ঠরোগী থাকিতে পারে এরূপ একটি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এককালীন ৫ লক্ষ এবং বার্ষিক ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার আবশ্যক।

এ কাজটি অবহেলা করিলে চলিবে না। যাহাদের ভিতরে দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে তাঁহারা অবিলম্বে এ কাজে প্রবৃত্ত হউন।

যে-সকল কুষ্ঠরোগীদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল তাহারা যদি নিজ ব্যয়ে এখানে পৃথক ভাবে থাকিতে চায় তবে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠ আইন জারি থাকিলেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন প্রতিবিধান করা হয় না, কুষ্ঠরোগীরাও এ বিষয় অবগত নহে।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে ধনী ও শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলা দেশে ধনীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। সভ্য দেশে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইতেছে, বাংলা দেশে উহা বৃদ্ধি পাইতেছে। সভ্য দেশসমূহে যাহা ঘটিতেছে, বাংলা দেশে ঠিক উহার বিপরীত হইতেছে। আমাদের জাতীয় শক্তি যে ভাবে ক্ষয় পাইতেছে তাহার তুলনায় পুষ্টি আদৌ হইতেছে না।

উদ্ভিদ-চাষের পক্ষে বাংলার মাটী যত উর্ব্বর অন্য অন্য ফসলের পক্ষে তত উর্ব্বর নহে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাংলার সকল ফসলের আবাদ করিতে হইবে। পরোপকারী স্বার্থত্যাগী লোক বাংলায় খুব কম জন্মিতেছে। কাজেই বাংলার দুঃখ বাড়িতেছে। সোনার বাংলায় দুর্ভিক্ষ স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে! চাষী সাবধান!

শ্রীরামানুজ কর।

একটি তামিল কবিতা

(কাক্কই পাড়িনিয়র)

প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে পুত্র তাহার যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে—
শুন্‌লে যখন বর্ষীয়সী, জীর্ণশরীর উঠ্‌ল হ'য়ে খাড়া;
ক্রোধে-আগুন ক'র্‌লে শপথ—
"স্তন দুটোরে ফেল্‌ব আমার কেড়ে'
সত্য যদি হয় এ খবর—স্তন্য দিয়ে পুষ্‌লে ভীরু যারা
সেই দুটোরে ফেল্‌ব কেটে।" খড়্গ হাতে কঠিন শপথ ক'রে
বেরিয়ে প'ল ঝড়ের মতন, চল্‌ল ধেয়ে রণক্ষেত্র পানে,
যুদ্ধে যার গেছে মারা দেখ্‌লে তাদের চোখের কাছে ধ'রে।
নয় রে সে নয়।
তবে ভীরু পালিয়েছে ঠিক, নাই সে কোনোখানে।
আচম্বিতে চম্‌কে গেল, থম্‌কে গেল হঠাৎ বর্ষীয়সী;—
দু-ঠাঁই হ'য়ে প'ড়ে এ কে?—
বীরের গতি পেয়েছে তার ছেলে!
অহঙ্কারে অশ্রুভরে মায়ের হৃদয় উঠ্‌ল রে উচ্ছ্বসি;—
পুত্রজন্মে যে আনন্দ তাহার অধিক আনন্দ আজ পেলে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

কৌন্সিলের সভ্যরা কি দেশের সেরা?

গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে ৪০৯ পৃষ্ঠায় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমর্থনার্থে নিম্নে চিন্তাশীল লেখক H. G. Wellsএর মত উদ্ধৃত করিলাম। Wells তাঁহার "An Englishman Looks at the World" নামক পুস্তকে "The Disease of Parliaments" নামক প্রসঙ্গে ২৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে:—

"When one speaks of congressmen or members of Parliament, one thinks, to be plain about it, of intellectual riff-raff. When one hears of a pre-eminent man in the English-speaking community, even though that pre-eminence may be in political or social science, one is struck by a sense of incongruity if he happens to be also in the Legislature. When Lord Haldane disengages the Gifford lectures or Lord Morley writes a "Life of Gladstone" or ex-President Roosevelt is delivered of a magazine article, there is the same sort of excessive admiration as when a Royal Princess does a water-colour sketch or a dog walks on its hind legs."

পুনরায় ২৫৪ পৃষ্ঠায় তিনি ঐ সুরেই লিখিয়াছেন:—

"In no sense are these bodies (পার্লিয়ামেণ্ট ইত্যাদি) really representative of the thought and purpose of the nation; the conception of its science, the fresh initiatives of its philosophy and literature, the forces that make the future through invention and experiment, exploration and trial and industrial development, have no voice, or only an accidental and feeble voice, there." ইত্যাদি ইত্যাদি।

স।

সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীবিনোদবিহারী রায় এ সম্বন্ধে বলেছেন—"গ্রহণের সময় দেহে এক অদৃষ্ট বিষ লিপ্ত হয়।" কেন হয় তা বলেন নি। যদি সূর্য্য দুএক ঘণ্টা ঢাকা থাকার জন্যই তা হয়, তবে তাঁর এ প্রস্তাব অসঙ্গত। কারণ সূর্য্যদেব ত দিনে বার ঘণ্টা করে পৃথিবীর আড়ালে থাকেন। চন্দ্রের আড়ালে থাকেন বলেই সূর্য্য-গ্রহণ হয় এই ত বৈজ্ঞানিক কারণ। আবার শুনেছি চাঁদ পৃথিবীরই মত; তবে চাঁদে ঢাকা আর পৃথিবীতে ঢাকা দুটোর প্রভেদ কোথায় তা ত বুঝি না। হয়ত বিনোদ-বাবু বল্‌বেন পৃথিবী ঢাকা পড়্‌বার সময় ধীরে ধীরে সূর্য্যের তেজ কমে যায় এবং গ্রহণের সময় হঠাৎ ঢাকা পড়ে তাই রোগের বীজ আসে। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে মেঘও ত হটাৎ প্রায়ই সূর্য্যকে আড়াল করে। তারপর তিনি হাঁড়িকে শোষক বলেছেন, কিন্তু মানুষের দেহ তার চেয়ে ঢের বেশী শোষক। আর এক কথা, সূর্য্যগ্রহণে যেন এইরূপ একটা হ'ল? কিন্তু চন্দ্রগ্রহণে কেন হাঁড়ি ফেলা হয় বিনোদ-বাবু তা বলেন নি।

শ্রীশীতলাচরণ সেন।

সূর্য্য-গ্রহণে হাঁড়ি ফেলা।

গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় সূর্য্য-গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত কুসংস্কারের পোষকতা করিয়াছেন। অবশ্য সূর্য্য-রশ্মির ব্যাধিবীজনাশক গুণ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। কিন্তু লেখকের মতানুসারে গ্রহণের সময় সূর্য্যরশ্মি সম্পূর্ণ পড়িতে পায় না বলিয়া তাহার তৎকালীন ব্যাধিবীজ-ধ্বংসের শক্তি যদি লুপ্ত হয় এবং সেই ফাঁকে উক্ত ব্যাধিবীজসমূহ অপ্রত্যক্ষভাবে মানব-দেহে ও ভাতের হাঁড়িতে প্রবেশ করে, তবে, মেঘাচ্ছন্ন দিবসে কিম্বা নিশা কালেও ঐ-প্রকার দুষ্ট বীজাণু মানবদেহে সঞ্চারিত নিশ্চয়ই হইবে—ভাতের হাঁড়িও কলুষিত করিবে। কারণ, উল্লিখিত সময়েও সূর্য্যরশ্মি সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে পড়িতে পায় না। একপ ক্ষেত্রে ঘড়ি ধরিয়া ভাতের হাঁড়ি ফেলিবার ব্যবস্থা নাই কেন?

আর যদি পূর্ব্বতন ঋষিগণ সূর্য্যরশ্মির অভাবজনিত ব্যাধিবীজ সংক্রমণের ভয়েই স্নান ও হাঁড়ি ফেলার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তবে চন্দ্রগ্রহণের সময়েও সেই একবিধ ব্যবস্থার অর্থ কি? চন্দ্রকিরণের ত শুধু উজ্জ্বলতাই আছে, সূর্য্যরশ্মির মত তাহার ব্যাধিবিনাশক শক্তি নাই, তাহা সূর্য্যালোকের প্রতিবিম্ব মাত্র।

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়।

এ-বিষয়ে আর কোনো আলোচনা প্রবাসীতে প্রকাশ করা হইবে না।—প্রবাসীর সম্পাদক

নখের সখ।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসীর' পঞ্চশস্য বিভাগে একজন চীনে-ম্যানের সুদীর্ঘ নখের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত 'স্বাধীনতার ইতিহাস' পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় একজন শ্যামদেশীয় বড়লোকের হাতের নখের চিত্র দিয়া লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রমজীবীরা কাজকর্ম্মের জন্য বাধ্য হইয়া নখ কাটিয়া থাকে। কিন্তু বড়মানুষেরা সহসা কাটে না। নখ যত বড় হইবে, ততই বড়মানুষের চিহ্ন প্রকাশ পাইবে,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং নখ বৃদ্ধির জন্য সে দেশের লোকে নখের উপর শূকরের চর্ব্বি প্রভৃতি ঘর্ষণ করিয়া থাকে; এবং পাছে নখ ভাঙ্গিয়া যায়—সেই আশঙ্কায় নখের জন্য রূপায় বা সোনার আবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া লয়।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র সান্যাল।

জাতিভেদ সমস্যা ও আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ।

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব মহাশয় তাহার কোন কোন অংশের ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত যে-সকল কথায় আর্য্য-অনার্য্যের কোন সংস্রব নাই, সে-সকল কথার উত্তর দিয়া আমি প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না। যে-সকল কথার সহিত আর্য্য-অনার্য্যের সম্পর্ক আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

মহাভারত গ্রন্থখানিকে দেব মহাশয় যে চক্ষে দেখিতেছেন, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া যেরূপ ভাষায় ইহার প্রমাণাদি ও গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, এবং যেরূপ ভাবে ইহা হইতে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতেছেন, ঠিক সেরূপ চক্ষে দেখিতে বা সেরূপ ভাবে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিতে আমি অক্ষম। মহাভারত একখানি কাব্যগ্রন্থ; ইতিহাস নহে। তবে কাব্যগ্রন্থ হইতে কেন প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, ইহার কারণ এই যে, সে সময়ে আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে কাব্যগ্রন্থে তাহা লিখিত হইতে পারিত না। সমগ্র মহাভারত এক সময়ে বা এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি ও তস্য পুত্র, পরাশর ঋষির নাম লিখিত আছে। উহাতে পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত অন্য কোথাও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতির উল্লেখ নাই; এবং ইদানীং অনেকেই উক্ত সূক্তটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। সুতরাং ঋগ্বেদের সময়ে যে আর্য্য অনার্য্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। কিন্তু মহাভারতের সময়ে জাতিভেদ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এরূপ একটি সামাজিক প্রথা দুই এক পুরুষে প্রবর্ত্তিত ও বদ্ধমূল হইতে পারে না। সুতরাং পরাশরের পুত্র বেদব্যাস মহাভারত বা তাহার কোন অংশ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ রহিয়াছে। মহাভারতের দীর্ঘকাল পরে রচিত পুরাণাদিও ব্যাসের নামে চলিতেছে।

এখন, দেব-মহাশয়ের লিখিত প্রমাণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যউক। তিনি লিখিয়াছেন, নাগবংশের আদিমাতা কশ্যপ ঋষি এবং জননী দক্ষপ্রজাপতির কন্যা কদ্রু; সুতরাং তাহারা নিশ্চয় আর্য্য। আমার মতে প্রজাপতি হইতে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও প্রাণি-গণের সৃষ্টি, ইহা একটি রূপক বা কল্পনা মাত্র। এ-সকল বিষয়কে সত্য মনে করিলে বড়ই গোলে পড়িতে হয়। কদ্রুর সন্তানগণ মহাভারতে নাগ অর্থাৎ বিষধর সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা বিনতার গর্ভে গরুড়-পক্ষীর জন্ম, এবং দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে আকাশের প্রকাণ্ড সূর্য্যের উৎপত্তি; সুতরাং ইহারাও বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান! যদিও প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে চন্দ্র ও সূর্য্য নামক মনুষ্যের, এবং সর্প বৃক্ষ ঋক্ষ পক্ষী প্রভৃতি উপাধিধারী যজ্ঞের অনধিকারী মানবের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতে কদ্রুর সন্তানগণকে প্রকৃতই সর্প, গরুড়কে প্রকৃতই পক্ষী এবং অরুণও সূর্য্যকেই আদিত্যের বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ, কাশ্যপের মহাদ্যুতি' প্রভৃতি শব্দ সূর্য্যের বিশেষণ। তক্ষক-তনয় তক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের দংশন ও তাহার প্রতিশোধ-চেষ্টায় জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ-বৃত্তান্তও মহাভারতেই আছে, এবং তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই-সকল কাল্পনিক বৃত্তান্তকে সত্য মনে করিয়া প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা কতদূর সঙ্গত, দেব-মহাশয় তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন কি? ইরাবানের জননীকে মানব মনে করিলে যজ্ঞের অনধিকারী সর্প বা নাগ বংশকে অনার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? নাগবংশ যে কখন বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছে, দেবমহাশয় এরূপ প্রমাণ দিতে পারিবেন কি?

আমি মৎস্যগন্ধাকে দাশরাজের পালিত কন্যাই বলিয়াছি। দেব-মহাশয় বলেন, আমিও বলি, চেদীরাজের দুহিতা বলিয়া ইঁহার উল্লেখও মহাভারতে আছে; কিন্তু উহা নিতান্তই কাল্পনিক। মৎস্যগন্ধার জন্ম-বিষয়ক কাল্পনিক আখ্যায়িকাটি এই বৈজ্ঞানিক যুগে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা কতদূর সঙ্গত, দেব-মহাশয় একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। জন্মেজয়ের প্রশ্নে বৈশম্পায়নের উত্তর ছলে এই আখ্যায়িকাটি মূল গ্রন্থে যোজিত; দেখিলেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে সমাজে আর্য্য-অনার্য্যের বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়েই এই গল্পটি রচিত ও মূল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এখন, যযাতি যদু ও কৃষ্ণের কথা। দেব-মহাশয় বলেন, যদুর জন্মের বহু পূর্ব্বে বেদের জন্ম, যদুর বংশে কৃষ্ণের জন্ম; সুতরাং বেদে যদু ও মহাভারতের কৃষ্ণের কথা থাকিতে পারে না। এবং মহাভারতে ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; সুতরাং বেদে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিবার কি হেতু থাকিতে পারে?—ইত্যাদি। বেদে

সহিত মহাভারতের অনৈক্য থাকা দেব-মহাশয় স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে, বৈদিক ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়-রাজা বলিয়া উল্লেখ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের সহস্র-সহস্র-বৎসরব্যাপী তপস্যা ও তৎপরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ইত্যাদি বহু কাল্পনিক বিবরণ রামায়ণে ও মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য এগুলি পাঠ করিবার সময়ে সহজেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এখন, প্রমাণের কথা—যদু ও তুর্ব্বসু যে অনার্য্য ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে ৬২ তম সূক্তে ১০ম ঋকে আছে। ইঁহারা যে ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও ঐ ঋকে এবং ৪।৩০।১৭ ঋকে আছে। যযাতির উল্লেখ ১০।৬৩।১ ঋকে আছে। মহাভারতকার ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়া, পরে কৌশলক্রমে, যযাতির শাপে যদুবংশীয়গণ রাজ্যপ্রাপ্ত হন নাই, ইত্যাদি অনেক কাল্পনিক কথা লিখিয়াছেন।

দেব-মহাশয় বলেন, "বেদের অনার্য্য কৃষ্ণকে মহাভারতের নায়ক বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও ভ্রম। আমি বলি, বেদের ঋষি বশিষ্ঠ যদি রামায়ণে দশরথ রাজার পুরোহিত ও মন্ত্রী হইতে পারেন, বিশ্বামিত্র যদি রামলক্ষ্মণকে রাক্ষস-বধার্থ তপোবনে লইয়া যাইতে পারেন, বেদের ঋষি পরাশরের পুত্র ব্যাস যদি মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ব্যবস্থা দিতে পারেন, তবে বেদের অনার্য্য কৃষ্ণ কেন মহাভারতের নায়ক হইতে পারিবেন না? কল্পনাবলে সবই হইতে পারে ও হইয়াছে; বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে পরের রচিত গ্রন্থে টানিয়া আনা হইয়াছে। আমি ইহাই বলিয়াছি যে, কেহ কেহ মনে করেন, বেদের অনার্য্য কৃষ্ণ কালক্রমে মহাভারতের নায়করূপে বর্ণিত ও আরো পরে অবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন। ইহা একটি অনুমান মাত্র, এবং এই অনুমানে কোন অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। বাল্মীকি-রামায়ণে কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত অন্য কোথাও রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই; বরং ইহার বিপরীত কথাই উক্ত গ্রন্থের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে পরশুরামের উল্লেখ আছে; কিন্তু তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উক্ত গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ নাই। তৎকালে বীরপূজার প্রচলন ছিল। রাম ও পরশুরাম বীরপুরুষ বলিয়া কালক্রমে অবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অনার্য্য কৃষ্ণের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটিতে পারে। মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণের আবির্ভাব; ইহার পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে মহাভারত রচনার সময়ে কৃষ্ণ সর্ব্বসাধারণের পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। মহাভারতের নানাস্থানে কৃষ্ণের চক্র এবং পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের উল্লেখ আছে। পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চজন নামক অসুরকে বধ করিয়া কৃষ্ণ এই চক্র ও শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার উল্লেখ বাল্মীকি-রামায়ণেও আছে। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গে ২৭।২৮ সংখ্যক শ্লোকে বানরগণকে সীতার অন্বেষণার্থ পশ্চিম দিকে প্রেরণ সময়ে সুগ্রীব বলিতেছেন—

চতুর্ভাগে সমুদ্রস্য চক্রবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
তত্র চক্র-সহস্রারং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্।
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ॥

এখানে পঞ্চজন অসুর ও শঙ্খচক্রের উল্লেখ থাকায় পুরুষোত্তম শব্দে কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। এবং ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে রামায়ণ রচনার সময়েও কৃষ্ণের এই শঙ্খচক্রের উপাখ্যান লোকে জানা ছিল; এবং রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণে যেরূপ বিশ্বাস করে, সেইরূপ বিশ্বাস করিত। রামায়ণ গ্রন্থ মহাভারতের বহুপূর্ব্বে রচিত। সুতরাং বেদের কৃষ্ণ যে কল্পনা-বলে এইরূপে নানা সময়ে নানা ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। আর্য্যেরা গৌরবর্ণ ছিলেন; মহাভারতের কৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ; ইহাতেও সেই অনুমান দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

এ-সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে না
—প্রবাসীর সম্পাদক।

জাতিভেদ-সমস্যা।

শ্রীযুক্ত শীতলাচরণ সেন মহাশয় আমার লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া যদি বুঝিয়া থাকেন যে, আমি পূজ্যপাদ ডাক্তার রায়ের "জাতিভেদ-সমস্যার" সমালোচনা করিয়াছি তবে তিনি নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে মানুষ মাত্রেরই ভুল হইতে পারে এবং ডাক্তার রায়েরও এ ক্ষেত্রে (তাঁতি, জোলা বা গাড়োয়ানের ঘরে খেতে কয় জন বড় লোক হবার সুযোগ পেয়েছে) ভুল হইয়া থাকিবে। সেই কারণ আমি লিখিয়াছিলাম যে তন্তুবায় জাতির মধ্যেও বড় লোক আছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বড় লোকের তুলনায় বেশী কি কম তাহা কি প্রকারে জানিব? বড় লোকের কি সেন্সস লওয়া হইয়াছে? তুলনামূলক গণনা না হইলে কি করিয়া জানিব যে তাঁহারা "কতটুকু"? "বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতির এক হাজার লোকের মধ্যে কয়জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে তাহার গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, বৈদ্যগণের মধ্যে ৫৩২ জন, সুবর্ণবণিকের মধ্যে ৪৫১ জন, ব্রাহ্মণের মধ্যে ৩৯৯ এবং কায়স্থের মধ্যে ৩৪৬ জন।" (ডাক্তার রায়ের "সমাজ-সংস্কার সমস্যা" ১২ ও ১৩ পৃঃ) ব্রাহ্মণকে ত সর্ব্ব উচ্চ জাতি বলিয়া ধরা হয়। তবে তাঁরা বৈদ্যগণের পশ্চাতে পড়িলেন কেন? আর সুবর্ণবণিক জাতিকে ত "উচ্চ জাতি" বলিয়া ধরা হয় না; তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অপেক্ষা শিক্ষায় অধিক অগ্রসর হইলেন, ইহারই বা কারণ কি?

শীতলা-বাবু আরও লিখিয়াছেন—"সত্যবাবু কতকগুলি লোকের নাম করিয়াছেন যাঁরা নিম্নজাতি হইতে বড় লোক হইয়াছেন।" আমি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও ডাক্তার রসিকলাল দত্ত ইত্যাদি কয়েক জন তন্তুবায়ের এবং তিলি সমাজের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু শীতলা-বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কোন্ সাহসে তন্তুবায় ও তিলি জাতিকে "নিম্নজাতি" বলিয়া উল্লেখ করিলেন? কোন শিক্ষিত তন্তুবায় এবং তিলি নিজেদের "নিম্ন জাতি" মনে করে না বা প্রকৃত পক্ষে উক্ত দুইজাতি "নিম্নজাতি" নহে। আমার বিশ্বাস কোন জাতিই "নিম্নজাতি" নহে। "আর তিনি যে বড়লোকদের নাম করিয়াছেন তাঁরা ভদ্রজাতির কাছে যে কতটা তটস্থ হইয়া যান তাহা বোধ হয় পাল মহাশয় জানেন না।" শীতলা-বাবুর উপরোক্ত লেখার উপর বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি যে-সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিও শীতলা-বাবুর "ভদ্রজাতির" কাছে কিছুমাত্র তটস্থ হইয়া যান না। তটস্থ হইবার কোন কারণ দেখি না। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে কায়স্থ বা বৈদ্যজাতি তন্তুবায় বা তিলি জাতির কোন লোকের সহিত এক সারিতে বসিয়া খায় না বলিয়া তন্তুবায় বা তিলিজাতি "নিম্নজাতি" হইবে কেন? আর যদি কায়স্থ, বৈদ্য অথবা ব্রাহ্মণ তন্তুবায় বা তিলিজাতির লোকগণকে লইয়া এক সারিতে বসিয়া খাইত তাহা হইলেই কি উক্ত জাতিদ্বয় "উচ্চজাতি" হইত? তন্তুবায় বা তিলি জাতি নব-শাক জাতির মধ্যে। শীতলা-বাবুর জানা উচিত ছিল

নশাক জাতি জলচল, তাহারা "নিম্ন জাতি" নহে, তাহারা "ভদ্রজাতি"। যে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শীতলাবাবুর "ভদ্র জাতির" বাটীতে পূজাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই তন্তুবায় বা তিলি জাতির বাটীতে পূজা করিয়া থাকেন। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের জাতি যায় না বা পতিত হন না।

শীতলাবাবু আরও লিখিয়াছেন—"সত্যবাবু আমেরিকার নিগ্রো কালোর ভেদের সহিত আমাদের অন্তর্জাতিভেদের তুলনা করিয়াছেন। তাঁর বুঝা উচিত ছিল যে ভারতের এই জাতিভেদ দুইটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে নহে, একটি মহাজাতির নিজের অংশের মধ্যে। সুতরাং তাঁর তুলনা অচ্ছের মত হইয়াছে।" উক্ত কথার উত্তরে লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইতিহাস কি ইহাই প্রমাণ দেয় না যে, "জাতিভেদ" বিভিন্ন জাতি লইয়া? শীতলাবাবুর "মহাজাতি"ও বিভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমি আমার পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে, আমি জাতিভেদের পোষকও নহি, সমর্থকও নহি, এবং সেই কথা এখনও বলিতেছি। বর্ত্তমানকালের "জাতিভেদ" কোন-মতে থাকা উচিত নহে মনে করি। ডাক্তার রায় যে যোগ্য ব্যক্তি তাহা আমি কেন শত শত লোক স্বীকার করিবেন।

শ্রীসত্যচরণ পাল।

এ-সম্বন্ধে আলোচনা এইখানেই স্থগিত হইল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

"গৈবি আওয়াজ।"

প্রবাসীতে "বরিশাল গান্" লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "বরিশাল গানের কোন বাংলা নাম নাই" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার বাড়ী বরিশাল জেলায়। আমি জানি শিক্ষিত লোকেরা যেমন "বরিশাল গান্", ছাড়া অন্য নাম জানেন না, অশিক্ষিত লোকেরাও তেমন "বরিশাল গান্" এই নামটিই জানে না। আমি ছেলেবেলা হইতেই ইহার "গৈবী আওয়াজ" নাম শুনিয়া আসিতেছি। আমার মনে পড়ে আমার মার মুখেই আমি এই নাম প্রথম শুনিয়াছি। "গৈবী আওয়াজ" বা গায়েবী আওয়াজ, ইহার অর্থ এই—যে আওয়াজের মূল নির্দ্দেশ করা যায় না, যেমন 'গায়েবী' দ্রব্যাস্তের লেখক যে বুঝা যায় না। দেশের লোকের ধারণা—আওয়াজটি 'গৈবী,' সুতরাং দৈবী—ইহার পার্থিব কোন কারণ নাই।

প্রবাদ আছে পর্ত্তুগীজদিগের একখানি যুদ্ধজাহাজ যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া মেঘনায় ডুবিয়া যায়। তাহা সময়ে সময়ে শনি ও মঙ্গলবারের রাত্রিতে ভাসিয়া উঠে ও এই দেবাংশী জাহাজ হইতে কামানের আওয়াজ হয়। এই শব্দটি হইতেই এই নদীর নাম 'মেঘনাদ' এবং তাহার সঙ্কোচে 'মেঘনা' হইয়াছে। এই শব্দ বরিশাল জেলা ও মেঘনার তীরবর্ত্তী স্থান হইতে যত স্পষ্ট শুনিয়াছি কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে তত স্পষ্ট নয়। ইহা বরিশালের দক্ষিণ দিক হইতে ও কুমিল্লার নৈঋত কোণ হইতে শুনা যায়। বর্ষাকালেই ইহা অধিক পরিমাণে শ্রুত হয়। এ অঞ্চলের লোকের ধারণা এই যে ইহা বৃষ্টি-বাদলের পূর্ব্বলক্ষণ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু।

"মোটা কাপড়"।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে "মোটা কাপড়" পাঠ করিলাম। আমাদের গ্রামে ও সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বহু জোলা ও তাঁতী বাস করে। তাহারা এক্ষণে মুসলমানের পরিধানোপযোগী লুঙ্গি ও শাড়ীই প্রস্তুত করে। স্বদেশীর প্রথম হুজুগের সময় তাহারা হিন্দুভদ্রলোকের পরিধান জন্য ৪০নং সুতার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বয়কটের বিলোপ এবং সুতার অনাটনের সহিত তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশী-সুতা পাইলে ইহাদিগকে দিয়া ঐ সুতার বস্ত্র বয়ন করাইয়া লইতে পারা যাইত।

কেহ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ইহাদিগকে—

(১) দেশী-সুতা সংগ্রহের—

(২) এক্ষণে যে লুঙ্গি প্রস্তুত হইতেছে তাহা কাটতির—

(৩) হিন্দুর পরিধানোপযোগী বস্ত্র বয়নের জন্য ৪০ নং সুতা সরবরাহের—

ব্যবস্থা কিংবা এতদ্বিষয়ে উপদেশ দিলে বিশেষ বাধিত হই। ইহারা ফরমাসের মত সুতা পাইলে ছিটও বুনিয়া দিতে পারে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়,
সহকারী প্রধান শিক্ষক, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, পাং, ফরিদপুর।

"মোটা-কাপড়"।

দেশে যে পরিমাণ সুতা উৎপন্ন হয়, দেশের তাঁতিরা (যাহারা সংখ্যায় অতি কম) তাহার অল্প পরিমাণ কিনিয়া রাখে, অবশিষ্ট সুতা দেশের অন্য লোকের কোন কাজে লাগে না বলিয়া বিদেশে চালান হয়। দেশের অন্যান্য লোকেরা সুতা কাটিয়া কাপড় বুনিতে জানিলে এই সুতা কখনও বিদেশে চালান দিতে হইত না। শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবাসীতে স্ত্রীলোকদের সুতা কাটিবার কথা লিখা হইয়াছে। তাঁহারা সুতা কাটিয়া সেই সুতা দ্বারা কি করিবেন? তাহা দেশের তাঁতিদের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন। তাহারাও সংখ্যায় নিতান্ত কম, আর তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা দেশের কাপড়ের অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অসভ্য পাহাড়িয়া জাতিরা ও কায়বাজার, আরাকান ও রেঙ্গুনের মঘ জাতিরা 'লুঙ্গি' নামক একপ্রকার অতিসুন্দর কাপড় নিজেরাই তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই এই কাপড় বুনে। তাহারা কখনও এই পরিবার কাপড় ক্রয় করে না। পাহাড়িয়া জাতি ও মঘ জাতিদের স্ত্রীলোকদের মত আমাদের অঞ্চলের প্রত্যেক পরিবারে নারীরা যদি কাপড় বুনিতে জানিতেন, তাহা হইলে এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। দেশে, অন্ততপক্ষে যে-সকল স্ত্রীলোকদের শিখিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা যাহাতে কাপড় বুনন শিক্ষা করিতে পারেন, প্রত্যেক জেলায় জেলায় এই-রকম মহিলা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হওয়া উচিত। গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্নস্থানে শিল্পবিদ্যালয়ে গিয়া বস্ত্র-বয়ন কার্য্য শিক্ষা করা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই অবস্থায় নিজগ্রামে থাকিয়াই স্ত্রীলোকেরা কি করিয়া বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে পারে অভিজ্ঞ-ব্যক্তিরা তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন।

শ্রীরাজচন্দ্র সেন।

দেশী-কাপড়-বিক্রেতাদের ঠিকানা।

আমাদের গ্রামে শতাধিক ঘর তাঁতির বাস। এখানে মোটা ধুতি, শাড়ী, গামছা, বিছানার ও গায়ের চাদর তৈয়ার হয়। বোম্বাই মিলের সুতায় এই কাপড় প্রস্তুত হয়।

আমাকে পত্র লিখিলে আমি এই-সকল কাপড় সরবরাহ করিতে

রাজি আছি। স্বদেশী শিল্প-ব্যবসায়ীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিলে অনেকেই উপকৃত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীরামানুজ কর,
পল্লী-হিতসাধন মণ্ডলী; কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা; বাঁকুড়া।

বই ছাপা আবিষ্কার।

আষাঢ়ের প্রবাসীতে "পাঁচশত বৎসরের পুরাতন টাইপ" ও শ্রাবণের প্রবাসীতে "বইছাপা আবিষ্কার" পড়িয়া আমার বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

বই-ছাপা আবিষ্কারের বাহাদুরী লইয়া প্রায় ২০।২৫টি দেশের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছিল। তবে ইহা প্রায় ঠিক হইয়াছিল যে, এ বাহাদুরী জর্ম্মানীতে মেয়েন্স (Mayence)এর ও হলণ্ডে হারলম্ (Haarlam.)এর প্রাপ্য। জর্ম্মানীর জন গটেনবর্গ (John Gutenberg) ও হলণ্ডের লরেন্স কষ্টর (Lorence Coster)ই প্রথম পৃথক পৃথক টাইপে বই ছাপান বলিয়া জানা ছিল। ইহাদের মধ্যে গটেনবর্গের নামই বেশী শুনা যায়। ইনি প্রায় ১৪৫০ খৃঃ অব্দে পৃথক পৃথক টাইপে বই ছাপান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কিছু-কম পাঁচশত বৎসর আগে জর্ম্মানী ও হল্যাণ্ডে প্রথম পৃথক পৃথক টাইপে বই ছাপা হয়। যদি কোরিয়াতে পাঁচশত বৎসর আগে বইছাপা হইত, তাহা হইলে জর্ম্মানী হলণ্ড ও কোরিয়ার মধ্যে এই সম্মান লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িবার কথা। কোরিয়াতে প্রথম বই-ছাপার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না কি?

শ্রীঅক্ষয়নাথ ঘোষ।

সলজ্জ দৃষ্টি

বাতাস লেগে ফুলটি কাঁপে—
পাতার তলের ফুলটি,
ভক্তি-কারার কবাট খুলে
হাস্‌চে মোতির দুলটি;
জাগ্‌চে জোয়ার-জলের থেকে
মগ্ন নদীর কূলটি!

দৃষ্টি, সলাজ দৃষ্টি তোমার,
ঘোম্‌টা-পরা দৃষ্টি,
কেমন কোরে জানাই তোমায়
কেমন লাগে মিষ্টি;
ধূপের ধোঁয়ার আব্‌ছায়াতে
জ্বল্‌চে দেউল-দীপটি!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

ছন্দ-হিন্দোল

মেঘ্‌লা থম্‌থম্, সূর্য্য-ইন্দু—
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু!
হেম্-কদম্বে তূণ-স্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রু-বিন্দু!
মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন!
দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।
গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস!
লাগ্‌ছে গায়,—কার গৈরী নিশ্বাস!
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ!
ভাস্‌ছে বিল্ খাল্ ভাস্‌ছে বিল্‌কুল্
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাস্‌ছে জুঁইফুল!
ধান্য শীষ্ তার কর্‌ছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যার জাগ্‌ছে জুল্‌জুল্!
বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র-কম্বু,
কাঁপ্‌ছে অম্বর, কাঁপ্‌ছে অম্বু;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
"ওম্ স্বয়ম্ভু!" "ওম্ স্বয়ম্ভু!"
ঝর্‌ছে ঝর্ঝর্, ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্,
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক "বম্ ববম্ বম্"!
'বম্-ববম্-বম্' শব্দ গম্ভীর!
বৃত্তে ছম্‌ছম্ স্তব্ধ জম্বীর!
মেঘ্-মৃদঙ্গে প্রাণ্-সারঙ্গে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন-হাম্বীর!
সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ-কল্লোল!
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল!
মূর্চ্ছে বীণ্ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদিকালের কথা

ধর্ম্মবিশ্বাস।

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে যে-সমস্ত দেবতা-বাচক শব্দ পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। গ্রীক, লিথুয়েনীয় ও প্রাচীন শ্লাভ ভাষায় এই দেবতাবাচক শব্দের অর্থ প্রথমে 'বাতাস' (breath) এবং পরে 'আত্মা' (soul) ছিল। প্রাচীন ভারতীয়, লাতিন এবং আইরিশ প্রভৃতি ভাষাতে এই জাতীয় শব্দের মূল অর্থ 'অন্তরীক্ষ' সম্বন্ধীয় (heavenly) ছিল। অবশ্য গ্রীক এবং লিথুয়েনীয় ভাষাতেও অনুরূপ অর্থযুক্ত শব্দও পাওয়া যায়। ভাষার সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, দৃশ্যমান আকাশই দেবতারূপে পূজিত হইত; তারপর যে-সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি আকাশে প্রকাশমান হইত, সেইগুলি দেবতারূপে পূজা পাইতে লাগিল—যেমন, ইন্দ্র, সূর্য্য, ঊষা, বজ্র, বায়ু, ইত্যাদি। ইহারাই অন্তরীক্ষের দেবতা ছিল।

এই দুই শ্রেণীর শব্দ হইতে বুঝা যায় কিরূপে দুই-প্রকার পূজার প্রচলন হইয়াছিল—(১) আত্মার অর্থাৎ মৃত-ব্যক্তির পূজা, (২) অন্তরীক্ষের শক্তিসমূহের পূজা। অবশ্য অদৃষ্টের আরাধনাও ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা একে একে এই তিনটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মৃতের পূজা।

ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ইতিহাসের যতদূর পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা মৃত-ব্যক্তিকে নানারূপ আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজা করিত। ইহা হইতে আমরা তাহাদের মরণের পরবর্ত্তী জীবনের ধারণা সম্বন্ধে আশ্চর্য্যরকম আভাস পাই। এই বিষয়ে ভালরকম ধারণা করিতে গেলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে—

(১) বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে কিরূপে মৃতদেহের সৎকার করা হইত।

(২) সৎকারকালে মৃতের প্রতি কিরূপ যত্ন লওয়া হইত, বিশেষত কি কি উপহার সঙ্গে দেওয়া হইত।

(৩) সৎকারের পর তাহাদিগকে কি ভাবে পূজা দেওয়া হইত।

(৪) পরলোক সম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ ধারণা ছিল এবং সেই ধারণা ক্রমে ক্রমে কি ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

(১) সমাধিস্থ করা বা দাহ করা।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের সকল দেশেই এই দুই রীতির মধ্যে জয়লাভের জন্য দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বের কোনটি প্রাচীন তাহা বিচার করা যাইবে।

প্রথমে, ভারতে কি ছিল, দেখা যাক। বেদের সময় আমরা দেখিতে পাই দাহকরণ একমাত্র নিয়মিত প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। অনুষ্ঠানবিধির গ্রন্থসমূহে (ritual texts—গৃহ্যসূত্র) কেবল এই প্রথারই উল্লেখ আছে। কিন্তু দাহ না করিয়া সমাধিস্থ করার প্রমাণও ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১০. ১৫. ১৪) পুণ্যাত্মা স্বর্গস্থ পূর্বপুরুষ-গণকে দুইশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—যাঁহারা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন এবং যাঁহারা হন নাই। অথর্ববেদেও (১৮.২.৩৪) পিতৃপুরুষগণকে অগ্নির নিকট আনীত, দগ্ধ, এবং সমাহিত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

ইরাণীয় ভ্রাতৃগণের আধুনিক উল্লেখ-সমূহে প্রাচীনতর অবস্থার কথা পাওয়া যায়। হেরোডোটস্ (Herocotus) মনে করেন যে, সিথীয় (Scythians) রাজগণের মধ্যে মৃত-দেহ সমাধিস্থ করাই একমাত্র রীতি ছিল। এই সিথীয়গণকে ইরাণীয়দিগের এক পূর্বপরিত্যক্ত শাখা বলিয়া ধরা হয়। প্রাচীন পারসীক রাজগণের সমাধি হইতে দেখা যায় যে তাঁহাদের দেহও দগ্ধ না করিয়া কবর দেওয়া হইত। হেরোডোটস্ সব পারসীকগণ সম্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছেন এবং মোমের ভিতর মৃতদেহ সংরক্ষণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অবেস্তা হইতে জানা যায় যে, দাহপ্রথা জরথুশ্ত্র-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহিরে প্রচলিত ছিল। জরথুশ্ত্রের ধর্মাবলম্বীগণ সমাধিস্থ করিবার পূর্বে পশুপক্ষীর দ্বারা মৃত-দেহ ভক্ষণ করাইতেন। পূর্বোক্ত দাহপ্রথা ও এই প্রথা—উভয়ই বাহির হইতে আমদানী হইয়াছিল।

শেষের প্রথাটি বেলুচিস্তানের অরাইটি (Oreitae) নামক স্থানের পার্বত্য বন্যজাতিসমূহের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ইউরোপীয় শাখার মধ্যেও আমরা দাহ ও সমাধিপ্রথা দেখিতে পাই। হামারের সময় দাহপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সমাধিস্থ করাই প্রাচীনতর রীতি ছিল এবং আদি গ্রীসদেশে এই প্রথাই রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

রোমীয়গণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। খননের দ্বারা যে-সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় প্রাচীন লাতিন দেশে সমাধির পর দাহপ্রথা প্রচলিত হয়।

অথৃষ্টানপ্রশীয় এবং লিথুয়েনীয়দিগের মধ্যেও উভয়-প্রথাই পরিলক্ষিত হয়।

স্লাভজাতির সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দাহপ্রথার সমর্থন হয়।

কেল্ট এবং টিউটনদিগের মধ্যে সমাধিস্থ করাই প্রাচীনতম পদ্ধতি ছিল, যদিও ইতিহাস হইতে কেবলমাত্র দাহপ্রথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের ইতিহাস হইতে যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে দাহপ্রথা অপেক্ষা সমাধিপ্রথা পুরাতন —এই কথাই খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ভাষার সাক্ষ্য হইতেও ইহা সমর্থিত হয়।

যদি দাহপ্রথাই সমাধিপ্রথার পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে সৎকার সম্বন্ধীয় ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দগুলির আদি-অর্থ হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইত; যেমন 'সৎকার করা' এই কার্য্যটি বুঝাইতে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইত, তাহার মূল অর্থ "পোড়ানো" গোচের এইরূপ একটা কিছু হইত।

কিন্তু ব্যাপার মোটেই তাহা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শব্দার্থ আলোচনা করিলে প্রাচীন প্রুশীয়, লিথুয়েনীয়, গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন স্লাভ, প্রাচীন উচ্চ জার্মান প্রভৃতি ভাষাতে "পুঁতিয়া ফেলা" এই অর্থসূচক ধাতুর ব্যবহারই পাওয়া যায়।

এই-সকল প্রমাণ হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ইন্দো-ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের আদি-দেশে এবং পরে যে-সকল দেশে বসতি করিয়া ছিলেন, সেখানে উপযুক্ত সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়ামৃতদেহ না পোড়াইয়া প্রোথিত করিতেন। ডাঃ শ্রাডার (Schrader) বলেন যে এই প্রথার মূলে ছিল—মৃতদেহ সংরক্ষণের ইচ্ছা। শত্রু এবং বন্যজন্তুর হাত হইতে মৃতদেহকে রক্ষা করা ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং ইহার মূলে এই বিশ্বাস থাকিতে পারে যে, মৃতের আত্মা দেহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং দেহের অস্তিত্বের সহিত ইহা সম্বদ্ধ। কিম্বা ইহাও হইতে পারে, যতদিন সম্ভব মৃতদেহ রক্ষা করিয়া মৃতব্যক্তির মঙ্গল সাধন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের জীবিত অন্যান্য সকলের মঙ্গল করা—কারণ তাহাদের ভূতের ভয় ছিল এবং সেজন্য মৃতের আত্মাকে সমাধির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখিতে চাহিত। কিম্বা এই সমস্ত কারণই একসঙ্গে বর্ত্তমান ছিল।

দাহপ্রথা কিন্তু সমাধিপ্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও দাহপ্রথা কিরূপে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল, এমন কি খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। সমাধিপ্রথার ভিতর মৃতদেহ সংরক্ষণের চেষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর দাহপ্রথাতে মৃতদেহ একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়। মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণরূপে না বদ্‌লাইলে এরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়।

আরউইন রোড (Erwin Rhode) বলেন—দাহের দ্বারা দেহ হইতে আত্মাকে যথাশীঘ্র সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান ছিল। এই উদ্দেশ্যের সহিত ভালবাসা ও স্বার্থ উভয়ই জড়িত। কারণ, যতদিন শরীর আছে, ততদিন আত্মা তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে; ইহাতে আত্মা নিজেও শান্তি পাইবে না, আবার অন্যান্য জীবিতগণকেও শান্তি দিবে না এবং নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিবে।

আদিম সভ্যতার অবস্থায় দাহপ্রথার মূলে এই বিশ্বাস ছিল যে, শরীর পোড়ানোর পর আত্মার সম্মুখে পরলোকের স্বর্গদ্বার খোলা হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, দাহপ্রথা প্রথমে ইন্দো-ইউরোপীয় কোনও

জাতির মধ্য হইতে উদ্ভূত হয় এবং পরে তরঙ্গের মত বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করে, কিম্বা ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির গণ্ডীর বাহিরে জন্মলাভ করে। হয় তো বাবিলনের আদিম সুমেরু জাতির মধ্যেই ইহার উৎপত্তি হইতে পারে; কারণ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সুরঘুল ও এল হিব্বা (Surghul and El Hibba) নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দগ্ধ শবের অবশেষপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ সমাধিস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

স্বদেশ-প্রীতি

(স্কট)

এই দুনিয়ায় এমন অপদার্থ কি কেউ আছে,—
"আমার স্বদেশ" বল্‌তে যাহার হৃদয় নাহি নাচে!
দূর প্রবাসে বিজন-বাসে কাটিয়ে বছর মাস,—
দেশের পানে ফির্‌তে যাহার হয় নাকো উল্লাস,—
এমন অসাড় এমন অসার সত্যি কি কেউ হয়?—
লোক-মহলে মানুষ বলে দ্যায় সে পরিচয়?—
দ্যায় যদি, যাও, রাখো চিনে, শব সে জীবন্তেই;
তার সমাচার চারণ-গানে কবির গাথায় নেই।
যতই থেতাব থাকুক না তার, যতই থাকুক ধন,—
হোক্ না কেন রূঢ় আভিজাত্যে অতুলন,—
ক্ষমতা তার যতই থাকুক, যতই থাকুক মান,—
দুর্ভাগা সে, মানুষ-পোকা, ক্ষুদ্র তাহার প্রাণ।
চিত্ত সদাই ঘুর্‌ছে তাহার আপ্‌নাকে ঘিরে,
যশের ঘরে শূন্য, জীবন মগন তিমিরে।
মর্‌বে যখন জ্যান্তে মরা, সকল অন্ধকার,
যে ধূলোতে জন্মেছিল তাই হবে তার সার;
কাঁদ্‌বে না কেউ তাহার তরে, কর্‌বে না কেউ নাম,
গাইবে না যশ শ্রদ্ধা-ভরে শ্রবণ-অভিরাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মরমী কবি

বাংলা সাহিত্যের জনৈক সমঝদার ইংরেজী Mystic শব্দটির তর্জ্জমা করিয়াছেন 'মরমী'। যিনি বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মে প্রবিষ্ট, "who has penetratec into the sacred mystery of the universe," তিনিই হইতেছেন মরমী।

গ্রীক্ ভাষার Muein কথা হইতে মিষ্টিক শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ নয়ন মুদ্রিত করা—ভাব, দৃষ্টিকে অন্তরের মহালক্ষ্যের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া। কথাটা আমাদের উপনিষদের "আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" কথারই প্রতিধ্বনি। প্লটিনাস (Plotinus) ইহাকে বলিয়াছেন, The flight of the alone to alone — একের দিকে একের অভিসার। খুব মোটামুটি কথায় অন্য-একজন বলিতেছেন—"A mystic is best defined as one who has intimate spiritual experience of the divine being"—মরমিয়া তিনি, পরমাত্মার সম্বন্ধে যাঁর ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সকল কথার শেষ অর্থ একই স্থানে যাইয়া পৌঁছয়। সকল কথারই মূলে আমরা দেখিতেছি—আত্মার মাঝে কেন্দ্রীভূত চিত্তের সুগভীর প্রশান্তি; বিশ্বের অন্তরের সহিত মানবাত্মার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের নিবিড় উপলব্ধি। আমাদের 'উপনিষদ' শব্দটির যে ব্যাখ্যা তাহাও এই ভাবেরই দ্যোতক, উপনিষদো রহস্যে সমীপসদনে; উপনীয়তমাত্মানং ব্রহ্মরূপধরং যতঃ। এই সৃষ্টির অন্তরালে অবাঙ্‌মনসাগোচর যে এক অনন্ত অমৃতের সত্তা নিত্যকার গুপ্তে সৌন্দর্য্যানন্দের নির্ঝর উৎসারিত করিতেছে, মরমী কবি সেই অখণ্ড বিশালতায় আত্ম-সত্তাকে মিলাইয়া মিলাইয়া অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার উপলব্ধিকে জাগাইয়া তুলেন। মুখ্য ভাবে মিষ্টিক বা মরমী কথাটির ইহাই অর্থ। এই শ্রেষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতে গেলে মিষ্টিককে বলা যায় "যোগী"। অনন্ত আত্মার সহিত যোগ-সাধনই যোগী এবং মিষ্টিকের চরম সার্থকতা। এই যোগ-সাধন-প্রভাবে কবি ত্রিকালদর্শিতা লাভ করেন, ইহাই উপনিষদের ব্যাখ্যা।

সুতরাং মরমী কবি যে কেবল রসোদ্ভাবন বা সৌন্দর্য্য

সৃষ্টিই করিতেছেন এমন নয়—তাঁহার চেষ্টার মূলে শ্রেষ্ঠতরের জীবন-গঠন, ধর্ম্ম-সাধনও চলিতেছে।

মানুষের মধ্যে যে আছে একটা বিচিত্রতার দিক্, একটা তরঙ্গের দিক্, যাহা জীবনকে জগতকে রঙ্গাইয়া, লীলায়িত করিয়া দেখে, তাহা বহু সাধনায় এই মিষ্টিক ভাবের রসে পৌঁছিয়াই সার্থকতা লাভ করে। ইহাতেই ভাবুকতার চরমোৎকর্ষ। ইহাতেই আত্মবোধ সত্য হয়, জীবনের সকল আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়।

শত লিপ্ততার ভিতরও একটা নির্লিপ্ততা বাহিরের আড়ম্বরকে মিষ্টিকের কাছে খাটো করিয়া তুলে। অন্তরের মানুষটি এমনি নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁহার প্রতি-মুহূর্ত্তের আত্মবোধকে চেতনাকে আঁকড়াইয়া ধরে যে, বাহিরের জীবনযাপনের মাঝের মানুষটি দ্বন্দ্ব-কলহ তুচ্ছতার বোঝা লইয়া সেখানে বড়-একটা ঠাঁই পায় না। দেহ যেখানে অন্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতে যায় সেখানে মরমীর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। দেহের সম্পর্কে অতিমাত্রায় জড়াইয়াই মানুষ ধূলায়-ধূলায় অন্ধ হইয়া খাঁটি নিজত্বকে খোয়াইয়া বসে—প্রকৃত মানুষকে ভুলিয়া যায়। মরমী এই ভুল হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছেন। বাহিরের সাথে, দেহের সঙ্গে তাঁহার যে সম্পর্ক, তাহা অন্তরের লক্ষ্যের আনন্দের হিসাবেই ফুটিয়া উঠে।

মিষ্টিক চাহেন কেবলই মুক্তি—"অকূল-পাড়ির আনন্দ-গান" গাহিয়া চলিবার মত মুক্তি—অনন্তাভিমুখী গতির অবাধ স্বাধীনতা। অনন্তের ভিতর আপনাকে মুক্ত করিয়া রাখিতে পারাতেই মিষ্টিক আত্মার ধর্ম্মকে সত্য করিয়া দেখেন। অনন্ত অতৃপ্তির তৃপ্তিতে মিষ্টিকের প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইতেছে—ভূমৈব সুখম্। বিশ্বকে মরমী যতই পাইতে যান, ধরিতে যান, তাঁহার পাওয়া কখনো পূর্ণ হয় না। শুধু মিষ্টিকেরই নয়, পর্য্যাপ্ত ভোগের মধ্য হইতে বিশ্ব-মানবের অন্তরও ক্ষণে ক্ষণে এই না-পাওয়াকে উপলব্ধি করে, হৃদয়ে হৃদয়ে এই অগস্ত্য-তৃষার ক্রিয়া চলিতে থাকে। এমার্সন বলেন, We are adapted to infinity. We are hard to please, and love nothing which ends. অর্থাৎ অনন্তের ধাতে তৈরী বলিয়া, অনন্তে মিলাইয়া গঠিত বলিয়া, যেখানে অন্ত, যেখানে শেষ, সেখানে আমরা তৃপ্ত নই। সেখানে ত আমরা মানুষের জগৎকে দেখিতে পাই না, সে পাওয়া যে অনির্দ্দিষ্টমুখ মানব-প্রাণের পাওয়া নয়।

অনন্তের পানে ছুটিয়া চলা মানুষের স্বভাব। শৈশব হইতে সকল কাজে সে যেমন চাহিয়া আসিতেছে, এ যে সবখানি পাওয়ার সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অনন্তের একটি কণা মানুষ, অনন্তেরই স্রোতের একটি লীলা মানুষ অন্তহীনতার মধ্যে আপনার সম্পূর্ণতাকে পাইতে যাইয়া অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। এই অতৃপ্তি বুকে রাখার বেদনাতেই তাহার আনন্দ, অতৃপ্তির মরণেই তাহার জীবন।

"ভূমৈব সুখং" মরমীর অন্তরে যখন একান্ত সত্য হইয়া উঠে, মিষ্টিক যখন ম্যাথু আর্ণল্ডের কথায় bedazzled with the Infinite, অনন্তের জ্যোতিতে ছন্নদৃষ্টি, তখন নয়ন উন্মীলন করিতেই তিনি দেখেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" বিশ্বের সকল রূপ আনন্দরূপমমৃতং-এর রূপ হইয়া দেখা দেয়। প্রতি ধূলি-কণা পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া উঠে—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। তাঁহার

"চারিদিকে গান বেজে ওঠে
চারিদিকে প্রাণ নাচে ছোটে।"

আদি-অন্তহীন যুগ-যুগান্তের যে মহাসঙ্গীত শ্রুতির অগোচরে বিশ্বের মর্ম্মস্থল পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহার "সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে," দিকে দিকে কেবলই "সুরের সুরধুনী" বহিয়া যায়, সুরের ঝরণা ঝরিতে থাকে। এক প্রাণ-গঙ্গা মহাকাশে ব্যোমে সমুদ্রে শৈলে তৃণ-পুষ্প-পল্লবে সমুদায়কে সঞ্জীবিত করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠে। মরমী সেই সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় প্রাণ-তরঙ্গে নিঃশেষে নিজত্বকে বিলাইয়া কি অসীম মাধুর্য্য উপভোগ করেন।—

"ডুবে যাই, মিবে যাই,
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।"

এইরূপ আত্মভোলা নিমগ্নতা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যেও আমরা লক্ষ্য করিতে পাই। বিশেষ করিয়া "Tint

ern Abbey" ও "Prelude"এ এই "holy calm", এই পবিত্র প্রশান্তি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আপনাকে 'ভাঙ্‌বারই আনন্দে' ডুবাইয়া দেওয়া, এই যে নিজত্বকে দিয়া সমুদয়কে ভরিয়া দেওয়া, এ্যামিয়েলের কথিত এই যে "Divine moments, hours of ecstasy, when thought flies from world to world, penetrates the great enigma, breathes with a respiration large, tranquil, and profound like that of the ocean, and hovers serene and boundless like the blue heaven'—ভাগবত ক্ষণ, আনন্দোদ্বেল মুহূর্ত্ত—মনন ও চিন্তার লোক হইতে লোকান্তরে উধাও হইয়া ছোটা; জগতের বিরাট রহস্যের যবনিকার অন্তরালে উঁকি মারা; সাগরের আন্দোলনের ন্যায় প্রবল অথচ প্রশান্ত, গভীর অথচ সহজ জীবন যাপন করা; এবং নীলিম আকাশের ন্যায় অসীম বিস্তারে শান্ত হইয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া ধরা—ইহাই প্রকৃতপক্ষে আত্মার জাগ্রতাবস্থা। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়র্থের কথায়, এই স্তরে উঠিয়া মানুষ become a living soul এবং see into the life of things অর্থাৎ মানুষ জীবন্ত আত্মা হইয়া উঠে, আর বস্তুর স্বরূপকে যথার্থ করিয়া দেখিতে পায়।

অনন্ত সত্তার সহিত এমন একাত্ম-সংযোগ, তুরীয় স্তরের এমন দৃষ্টি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অনেক কাব্য-স্রষ্টার মাঝেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক কবির চিন্তার ধারা (Aesthetics, Romanticism) সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের আনন্দের সোপান ছাড়াইয়া উঠিলেও পূর্ণানন্দের সেই সুদূর সৌধ-শীর্ষে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই যেখানে ইঁহারা আপনাদিগকে নিমগ্ন রাখিয়াছেন। ইঁহাদের কাব্য কেবল কবিত্বের নকল আড়ম্বর নয়—ইহার ভিতর দিয়া বিশ্বের প্রাণের সহিত একটা নিবিড় যোগ আমরা লক্ষ্য করি।

মিষ্টিক-হৃদয়ের অনন্তের উৎসবের মধ্য দিয়া যে ভাষা উৎসারিত হয় তাহাতে থাকে প্রাণের সেই উৎসবেরই মত অফুরান বৈচিত্র্য, অনির্ব্বচনীয় বর্ণরাজির সমাবেশ—অনন্ত-মুগ্ধ আত্মার নিছক রূপ। সমুদায়টুকু লইয়া উহার উপভোগ করিতে হয়। এই ভাষা হয় বাণী, মন্ত্র। ভাব-ব্যঞ্জনায় মরমীর কোনোরূপ আত্মকর্তৃত্ব বা ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। ম্যাথু আর্‌নল্‌ডের কথায় এই সৃষ্টি—the part of the Muse, the inspiration, the God, the not ourselves—দেবী বীণাপাণি সরস্বতীর আবির্ভাব, দৈবী প্রেরণা, ব্রহ্ম, আমাদের অতীত ও অতিরিক্ত আর-কিছু! জীবন-দেবতা কবির হাল কাড়িয়া লন। কবি তাঁর মাঝিগিরির অধীনে ভাসিয়া চলেন। অন্তর্নিহিত এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"অন্তর-মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত-স্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।"

ফুলের (unconscious unfolding) অচেতন বিকাশের রীতিতে পাপ্‌ড়ির পর পাপ্‌ড়ি করিয়া কবির প্রাণ বিকশিত হইয়া পড়ে। এই স্বতঃ-উৎসারিত বাণী সকল তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়া দেয়। সন্ধ্যার চরণ-স্পর্শে জোনাকীর উৎসবের মত কবির কবিতার সৌন্দর্য্য-স্পর্শে আমাদের মনের মাঝে অনন্ত সুরের সাড়া পড়িয়া যায়। কবিকে অনুসরণ করিতে যাওয়া "is like chasing a butterfly," যেন প্রজাপতি ধরিবার প্রয়াস। কখনো বা একটা নিবিড় শান্তি প্রাণের উপর পক্ষ বিস্তার করিয়া পাঠককে রুদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু নিত্যকার মলিনতা হইতে একটু মুক্ত হইতে না পারিলে উপভোগ সম্ভব হয় না। বিশ্বের মর্ম্মনিহিত সেই গুহাহিত সত্য সচরাচর ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়। Only finer nerve and keener touch can follow,—কেবল সূক্ষ্ম স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ অনুভব ইহার অনুসরণ করিতে পারে; বায়ুর মৃদু স্পর্শে চীনের এ্যায়োলিয়ান হার্প—বায়বীয় বীণা যেমন বাজিয়া উঠে, যাঁহার হৃদয়-বীণা তেমনি ভাবে সঞ্চিত, একমাত্র তিনিই এই আনন্দের পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত গান্ধির চিঠি।

শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি মহাশয়ের নিম্নমুদ্রিত পত্রখানি বহু দৈনিক ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছে। তিনি ইহা বড়লাটকে লিখিয়াছেন।

Sir,—It is not without a pang that I return the Kaiser-i-Hind gold medal granted to me by your predecessor for my humanitarian work in South Africa, the Zulu War medal granted in South Africa for my war services as the officer in charge of Indian Volunteer Service Corps in 1906, and the Boer War medal for my services as Assistant Superintendent of the Indian Volunteer Stretcher Bearer Corps during the Boer War of 1899-1900. I venture to return these medals in pursuance of the scheme of Non-Co-operation inaugurated to-day in connection with the Khilafat movement. Valuable as these honours have been to me, I cannot wear them with an easy conscience, so long as my Musalman countrymen have to labour under the wrong done to their religious sentiments. Events that have happened during the past month have confirmed me in the opinion that the Imperial Government have acted in the Khilafat matter in an unscrupulous, immoral and unjust manner and have been moving from wrong to wrong in order to defend their immorality. I can retain neither respect nor affection for such a Government. The attitude of the Imperial and Your Excellency's Governments on the Punjab question has given me an additional cause for grave dissatisfaction. I had the honour, as Your Excellency is aware, as one of the Congress Commissioners, to investigate the causes of disorder in the Punjab during April, 1919. And it is my deliberate conviction that Sir Michael O'Dwyer was totally unfit to hold the office of the Lieutenant-Governor of the Punjab, that his policy was primarily responsible for infuriating the mob at Amritsar. No doubt the mob excesses were unpardonable. The incendiarism, the murder of five innocent Englishmen, and the cowardly assault on Miss Sherwood were most deplorable and uncalled-for; but the punitive measures taken by General Dyer, Col. Frank Johnson, Col. O'Brien, Mr. Bosworth Smith, Rai Shri Rama Sud, Mr. Malik Khan and other officers were out of all proportion to the crimes of the people, and amounted to wanton cruelty and inhumanity, almost unparalleled in modern times. Your Excellency's light-hearted treatment of the official crimes, your exoneration of Sir Michael O'Dwyer, Mr. Montagu's despatch and, above all, the shameful ignorance of the Punjab events and the callous disregard of the feelings of Indians betrayed by the House of Lords have filled me with gravest misgivings regarding the future of the Empire, have estranged me completely from the present Government, and have disabled me from tendering, as I have hitherto whole-heartedly tendered, my loyal co-operation. In my humble opinion, the ordinary method of agitating by way of petitions, deputations and the like is no remedy for moving to repentance a Government so hopelessly indifferent to the welfare of its charge as the Government of India have proved to be. In European countries, condonation of such grievous wrongs as the Khilafat and the Punjab would have resulted in bloody revolution by the people. They would have resisted at all cost national emasculation such as the said wrongs imply, but half of India is too weak to offer violent resistance and the other half is unwilling to do so. I have, therefore, ventured to suggest the remedy of non-co-operation which enables those who wish to dissociate themselves from the Government and which, if it is unattended by violence and undertaken in an ordered manner must compel them to retrace their steps and undo the wrong committed. But whilst I pursue the policy of Non-Co-operation in so far as I can carry the people with me, I shall not lose hope that you will yet see your way to do justice. I therefore respectfully ask Your Excellency to summon a Conference of recognised leaders of the people, and, in consultation with them, find a way that would placate the Musalmans and do reparation to the unhappy Punjab.

I remain, Sir,
Your faithful servant,
(Signed) M. K. GANDHI.

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নানা কার্য্য সম্বন্ধে অগণিত লোকে যাহা মনে করিতেছে, গান্ধি মহাশয় নির্ভয়ে তাহা বড়লাটকে জানাইয়া গবর্ণমেণ্টের ও ভারতবর্ষের লোকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পদক প্রভৃতি ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-সব দেশ স্বাধীন এবং যেখানকার কাজ প্রজাতন্ত্র প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়, সেখানেও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন উপাধি বা অন্য প্রকার বক্‌শিশ্ লওয়া উচিত নয়; বিদেশীর অধীন প্রজাদের ত কোনমতেই লওয়া উচিত নয়। লইলে গৃহীতার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদার ও স্বাতন্ত্র্যের কিছু হ্রাস হইবেই। এই মর্য্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপাধি ও বক্‌শিশ্ প্রভৃতি ত্যাগ করা ভিন্ন উপায় থাকে না। অতএব, বিদেশীর অধীন লোকদের এমন ভাবে চলা কর্ত্তব্য যাহাতে বক্‌শিশ্ লাভের ইচ্ছা মনে না আসে, এবং, সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলেও, এমন কোন কাজ এমন কোন রকমে করা উচিত নহে যাহাতে বক্‌শিশ্ পাইবার সম্ভাবনা ঘটে। কিন্তু খুব সতর্কতা ও চেষ্টা সত্ত্বেও যদি দুর্ভাগ্যক্রমে উপাধি বা অন্যবিধ বক্‌শিশ্ লাভের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে তাহা কোনমতেই লওয়া উচিত নয়। লইয়া ফেলিলে প্রথম সুযোগেই তাহা বর্জ্জন করা শ্রেয়। ভারতীয় লোক যিনি যত বড়ই হউন, সত্য কথা এই, যে, কোন-প্রকার বক্‌শিশ্ যাঁহারা বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে লইয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যবহারে দেশভক্তদের মন কম-বেশী ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ নিশ্চয়ই হইয়াছে।

গান্ধি মহাশয়ের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, যাহারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের বিরোধী সৈন্যদলকে সাহায্য করা তাঁহার মত লোকের উচিত হয় নাই। তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহা করেন নাই, ভারতীয়দের সুবিধার জন্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু স্বজাতির সুবিধার জন্যও অন্য জাতির স্বাধীনতার পরিপন্থী হওয়া গর্হিত কাজ। অসহযোগিতা প্রচেষ্টার তিনি নেতা। তাঁহার কমিটি বলিতেছেন, যে, মেসোপটেমিয়ায় আরব ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কোন ভারতীয় সিপাহীকে প্রেরণ করা উচিত নয়, এবং কোন ভারতীয়েরও এরূপ সিপাহীর পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। বিলাত-প্রবাসী অনেক ভারতীয়ের লণ্ডনে একটি সভা হয়। তাহাতে এই প্রস্তাব ধার্য্য হয়, যে, মেসোপটেমিয়ায় আরবদের স্বাধীনতা-লাভ-প্রচেষ্টা বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় সৈন্যবল প্রয়োগ করা অনুচিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভায় এই মর্ম্মে চিঠি লেখেন, যে, ভারতবর্ষের লোকদের নিজের স্বাধীনতা নাই; অন্য জাতির স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য পরাধীন ভারতীয়দিগকে ভাড়াটিয়া সৈন্য রূপে যুদ্ধ করিতে লাগাইয়া দেওয়া অনুচিত। ইংরেজরা জুলু ও বুয়রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কারণ যাহাই দেখাইয়া থাকুন না কেন, এবং জুলু ও বুয়রদের দোষ যাহাই থাকুক না (এরূপ দোষ কোন্ জাতিরই বা নাই ?), তাহারা স্বাধীন ছিল। বুয়রেরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য; জুলুরা যুদ্ধ করে পরাধীনতার বেদনা অনুভব করিয়া। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হয়, শ্রীযুক্ত গান্ধির মত স্বাধীনতালিপ্সু লোকের সেই যুদ্ধে কোন প্রকারে সহায় হওয়া আমাদের ভাল লাগে নাই, যদিও তিনি ব্যক্তিগত পুরস্কার লাভের জন্য ইহা করেন নাই। তিনি সাহায্য করিয়া যে বক্‌শিশ্ পাইয়াছিলেন, তাহা ফেরত দিয়া সামান্য প্রায়শ্চিত্ত এতদিনে করিলেন। গান্ধি মহাশয় বড়লাটসাহেবকে দেশের নেতাদের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন তিনি তাহা করিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার মত সুবুদ্ধি ও সৎসাহস তাঁহার হইবে কি ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতির নিয়োগ।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া সেনেট কিছু দিন হইল কমিটিতে কতকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য করেন। তাহার দুটি এই :—

"8. That it is not desirable that Selection Boards for appointments to University professorships and Readerships should be created by statute, either in England or in India.

"9. That it is desirable that appointments to University Professorships, etc, should be made by the University itself with the help of the Academic Council and the Faculties concerned, and when the chair is attached to a particular college, with the help of that college."

আমরা এই দুটি প্রস্তাবের অনুমোদন করি। কারণ, পদপ্রার্থীদের যোগ্যতার বিচার করিয়া যোগ্যতম লোককে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ও ন্যায়পরতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকা উচিত। বিশেষতঃ নির্ব্বাচক-সমিতি বিলাতে থাকিলে দেশী যোগ্য লোকেরা কখনও নিজ নিজ শক্তির অনুরূপ কার্য্যক্ষেত্র পাইবেন না।

যে নীতি অনুসারে কাজ হওয়া উচিত, তাহা বলিলাম। বিলাতে অধ্যাপক-নির্ব্বাচক সমিতি থাকিলে তাহার দ্বারা অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ নিযুক্ত হইবে; এবং এ পর্য্যন্ত বিলাতে নিযুক্ত অনেক ইংরেজ অধ্যাপক যে যোগ্যতা হিসাবে হীন, তাহা অনেক বার বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-নিয়োগ যে-ভাবে হয়, তাহাও নিন্দনীয়। তাহারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

কোন বিষয়ের অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখা দরকার যে সেই বিষয়ে আরো অধ্যাপকের দরকার আছে কি না এবং তাঁহার বেতন দিবার টাকা আছে কি না। যদি থাকে, তাহা হইলে, কিরূপ যোগ্যতা চাই, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পদপ্রার্থীদের আবেদন পাইবার নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। তাহার পর সমুদয় আবেদনগুলি বিবেচনা করিয়া নিয়োগ-কমিটির সকলের বা অধিকাংশের মত যোগ্যতম ব্যক্তির নিয়োগ হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ

এ ভাবে অধ্যাপক নিয়োগ হয় না। নূতন অধ্যাপকের আবশ্যকতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের সঙ্গতি বিবেচিত হয় না; বিজ্ঞাপনও ক্বচিৎ দেওয়া হয়। এবং বিজ্ঞাপন দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহাকে চাকরী দিতে চা[illegible] তাহারই চাকরী হয়। বিজ্ঞাপন যে-সব ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না, তাহার ত কথাই নাই। নিয়োগকর্ত্তা-কমিটির অধিবেশনের বহু কাল পূর্ব্বে আশু-বাবু যাহাদিগকে মৌখিক-নিয়োগ-অঙ্গীকার দিয়া রাখেন, তাহাদেরই চাকরী হয়। তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গত ১২ই জুন, এম্-এ পড়াইবার ব্যবস্থা করিবার যে কৌন্সিল আছে, তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির এক অধিবেশন হয়। তাহাতে নৃতত্ত্ব পড়াইবার নূতন ব্যবস্থার কথা উঠে। সে বিষয়ে কি করিতে হইবে, তাহা আগে হইতেই কৌন্সিলের সভাপতি স্বয়ং আশুবাবু এক নোটে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ নোট অনুসারে, আগে হইতে যাঁহাদের উপর অন্য কোন কোন বিষয় অধ্যাপনার ভার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন লোককে নৃতত্ত্ব পড়াইবারও ভার দেওয়া হইল। এই পাঁচজনের মধ্যে আমরা বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ ও অনন্তকৃষ্ণ আইয়ারের নৃতত্ত্ব-বিষয়ক লেখার সহিত পরিচিত। অন্য দুজন এ বিষয়ে কি করিয়াছেন, জানি না, তাহা সম্ভবতঃ আমাদের অজ্ঞতা। সভাপতির নোটের কোন আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া কোথাও কিছু লেখা নাই;—যল্লিখিতং দৃষ্টমাত্রেন তন্মার্জ্জনীয়ম্। সংস্কৃতটার দোষ কেহ ধরিবেন না। নোটটির শেষে পাঁচজন অধ্যাপকের নিয়োগের সূচনার পর এই কৌতূহলোদ্দীপক শব্দ কয়টি আছে, "but they cannot cover the whole field," "তাঁহারা নৃতত্ত্বের বহু-বিস্তৃত সমুদয় বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না।" অর্থাৎ আরো লোক চাই। তাহার পরই অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসুর পোষকতায় ধার্য্য হইল যে ঐ পাঁচজন ও অধিকন্তু অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি নৃতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন, এবং প্রথমোক্ত পাঁচজনের (অতিরিক্ত) দক্ষিণা কাহারও ৫০৲, কাহারও ১০০৲, অনাথ-বাবুর বেতন ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ স্থিরীকৃত হইল। নৃতত্ত্বের আলোচ্য সব বিষয় পাঁচজন অধ্যাপককে পড়াইতে পারিবেন না, ইহা লিখিয়াই আশু-বাবু থামিয়া গিয়াছিলেন; বাকী কর্ত্তব্য তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী লোকেরা করিল। ইহা নিক্তির ওজনে আগে হইতে স্থির হইয়া ছিল যে ঠিক আর-একজন মাত্র অধ্যাপক হইলেই নৃতত্ত্বের অধ্যাপনা পূর্ণাঙ্গ হইবে, এবং সেই ব্যক্তিটি অনাথ বাবু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (১) আশুবাবু সব বিষয়েই এমন সবজান্তা কেমন করিয়া হইলেন যে নৃতত্ত্বেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তিনি রাখেন? (২) নৃতত্ত্বের ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কয়জন আছে? (৩) পাঁচজন অধ্যাপক দ্বারা তাহাদের অধ্যাপনা হইতে পারিত কি না? (৪) তাঁহাদের এবং তদতিরিক্ত আরও একজনের বেতন দিবার মত অর্থের প্রাচুর্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে কি না? (৫) নূতন পদটির জন্য লোক চাহিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কি না? (৬) উক্ত পাঁচ জন অধ্যাপক যাহা জানেন না তাহা অনাথবাবু জানেন ও পড়াইতে পারেন, তাহা কখন্ কি প্রকারে নির্ণীত হইল? (৭) এই অনাথ-বাবুটি কে এবং তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ জ্ঞানবান্ ও তদ্বিষয়ে গবেষণা [illegible] কি কি নূতন বহি বা পাশ্চাত্য দেশের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নৃতত্ত্ব-বিষয়িণী পত্রিকা-সকলে কি কি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? এই-সব প্রশ্নের উত্তর, বিশেষতঃ শেষ প্রশ্ন দুটির উত্তর, আমরা ১২ই জুনের কৌন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের নিকট পাইতে পারি কি? আমরা অবগত হইলাম, অনাথ-বাবু আশুবাবুর জামাতা, সম্প্রতি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারীতে এম্-বি পাস্ করিয়াছেন। ডাক্তারীতে এম্-বি পাস্ করিবামাত্র নৃতত্ত্বের এম্-এ ক্লাস পড়াইবার মত যোগ্যতা জন্মে, এ কথা ত কখনও শুনি নাই। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাক্তারী কোন পরীক্ষায় নৃতত্ত্ব একটিও পরীক্ষার বিষয় নহে। ইউরোপের প্রতিষ্ঠাশালী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে তাঁহারাই কোন বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন যাঁহারা সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান্ এবং তাহাতে নূতন চিন্তা-ও-গবেষণা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য জানিতে চাই, অনাথ-বাবু অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা কখন্ লাভ করিলেন, এবং নৃতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানের এবং তাহাতে গবেষণা-শক্তির কি পরিচয় দিয়াছেন? অবশ্য কেহ বলিতে পারেন, যে,

তিনি যে ঠিক্ খণ্ডর নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার নেতৃত্বে পারদর্শিতা প্রমাণিত হইতেছে; কিন্তু সেটা তামাসার কথা, আমরা নেতৃত্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কথাই বলিতেছি। যাহা হউক, আমরা যে যে খবর দিলাম, যে-যে প্রশ্ন করিলাম, তাহাতে কোন ভুল থাকিলে জ্ঞানী পাঠকগণ জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মে নিয়োগের প্রণালীর আরও কিছু নমুনা দিতেছি। কৌন্সিলের পূর্ব্বোক্ত ১২ই জুনের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে ছাপা আছে—

Read a memo from the Controller of Examinations reporting that in anticipation of the sanction of the Executive Committee, the following gentlemen had been appointed by the President as external examiners in Ancient Indian History and Culture for the M.A. Examination, 1920 :—

The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I.
Mr. Abinashchandra Das, M.A.
,, Rajmohan Sen, M.A.
Babu Jogeshchandra Ray, M.A.
Lala Chote Lall.

RESOLVED—

That the appointments be confirmed.

ইহা একমাত্র নমুনা নহে। আবার দেখুন—

Read a memo. from the Controller of Examinations, reporting that in anticipation of the sanction of the Executive Committee, the President had appointed the following Board of Examiners in Indian Vernaculars for the M.A. Examination, 1920 :—

The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I.
Rai Saheb Dineschandra Sen, B.A.
Mr. Abhaykumar Guha, M.A.
,, Basantaranjan Ray.
Pandit Rajendranath Vidyabhushan,
Mr. Charuchandra Banerjee, B.A.
,, Praphul achandra Ghosh, M.A.
,, Brajamohan Thakur, M.A.
,, Gangapati Singh, B.A.
,, Satyanath Borah, B.L.
,, Ambikanath Borah, M.A.
,, B. C. Majumdar, B.L.
The Hon'ble Mr. Madhusudan Das, C.I.E., M.A.
Dr. Benimadhab Barua, M.A., D.Litt.
Mr. Sailendranath Mitra, M.A.
,, Muralydhar Banerjee, M.A.
,, Basantakumar Chatterjee, M.A.

RESOLVED—

That the action taken be confirmed.

কথায় বলে বার বার তিন বার। সেইজন্য ঐ কার্য্যবিবরণ হইতে তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিতেছি।

Read a note by the Controller of Examinations reporting that the President had constituted a Board of Examiners in Experimental Psychology for the next M.A. and M.Sc. Examinations consisting of the University Lecturers in the subject as Internal Examiners and of Mr. S.C. Mahalanobis as External Examiner.

RESOLVED—

That the action taken be approved.

এই তিনটি দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটিতেই দেখা যাইতেছে যে সভাপতি আশুবাবু, পরে কৌন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মঞ্জুরী পাইবার পূর্ব্বানুভূতি-বলে (in anticipation of the sanction of the Executive Committee) (১) বাহ্য পরীক্ষক নিযুক্ত করেন, (২) পরীক্ষক বোর্ড নিযুক্ত করেন, এবং ইহাও জানা কথা যে অধ্যাপক-নিয়োগও তিনি এই প্রকারে করেন। তাহা হইলে কৌন্সিল ও উহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যগণ আছেন কিসের জন্য? তাঁহাদের কি স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিত্ব এবং সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা ও সম্মান-বোধ নাই? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাজার হাজার ছেলেকে সার্টিফিকেট ও উপাধি দেন, ইহা একটা কীর্ত্তি কি না জানি না; কিন্তু বুদ্ধিমান বিদ্বান লোকদিগকে ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জনে সম্মত করা এবং তাঁহাদেরও তাহাতে সম্মত হওয়া যে একটা অতীব আশ্চর্য্য কীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর আরও একটা দৃষ্টান্তের কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম। তাহাও বলিয়া দেওয়া দরকার। সীণ্ডিকেটের ২৩শে জুলাইয়ের কার্য্যবিবরণে আছে—

8. Read the following report of the Committee appointed by the Syndicate for nominating a candidate for appointment as Medical Adviser to inspect and report upon the sanitary condition of Hostels (Collegiate and Non-Collegiate) and Messes (attached and unattached) in Calcutta and to advise students resident therein upon sanitary matters generally, and to do propaganda work among the students :—

To

THE REGISTRAR,
CALCUTTA UNIVERSITY.

SIR,

We, the following Members of the Committee appointed by the Syndicate for nominating a candidate for appointment as Medical Adviser, beg to recommend Dr. Anathnath Chatterjee, M.B., B.S. for the post.

We have the honour to be,
SIR,
Your most obedient servant,

SENATE HOUSE : } NILRATAN SIRCAR.
Calcutta, the 19th July, 1920. } U. BRAHMACHARI

RESOLVED—

That the report be atopted and that the appointment be made as recommended by the Committee and that the salary be fixed at Rs. 200 per mensem as previously sanctioned.

On the motion of the Hon'ble the Vice-Chancellor it was further resolved—

(1) That the Registrar be authorised to procure a four-seated Ford-car with standard equipment and extra wheel, etc., (to be the property of, and to be maintained by, the University) and to place it at the disposal of the Medical Adviser.

(2) That a car allowance of Rs. 125 a month be paid to be officer.

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ঐ পূর্ব্বোক্ত অনাথ-বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পাইবেন, বেতন মাসিক ২০০ টাকা, মোটর-কার রাখিবার মাসিক খরচ ১২৫, এবং ব্যবহারের জন্য একখানি চারিজনের বসিবার মত ফোর্ড মোটর-কার (সমুদায় সরঞ্জামাদি ও অতিরিক্ত চাকা সমেত)। সীণ্ডিকেট এই কার্য্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবার জন্য, ডাঃ নীলরতন সরকার ও উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই দুজন সভ্যের এক কমিটি নিয়োগ করেন। তাঁহারা অনাথ-বাবুকে সুপারিস করেন। কাগজে পত্রে ইহা দেখিতে বেশ। কিন্তু একই যুবক ধাঁধাঁ করিয়া দুটা চাকরী ও মোটর-কার আদি পাইয়া যাওয়ায়, আমরা জানিতে চাই, আরো পদপ্রার্থী ছিল কি না, এবং তন্মধ্যে অভিজ্ঞতর ও যোগ্যতর ডাক্তার ছিলেন কি না। অনাথ-বাবু অযোগ্য লোক, বলিতেছি না; যে-কোন এম্-বি কিম্বা এল্-এম্-এস্ যোগ্য। কিন্তু যোগ্যতমের নিয়োগ হওয়া চাই। পদপ্রার্থীদের পূরা তালিকা কার্য্যবিবরণে দেওয়া হয় নাই কেন? হয় ত এই পদের জন্য আবেদন চাহিয়া বিজ্ঞাপনই দেওয়া হয় নাই। তাহা ত আরো খারাপ। জ্ঞাতব্য এই, যে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাক্ বা না থাক্, আরো পদপ্রার্থী ছিল কি না; থাকিলে তাহাদের তালিকা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয় কাহারো পারিবারিক সম্পত্তি নহে, যে, ইহার কর্ম্মচারী নিয়োগ গোপনে পরস্পরের-পিঠ-চুলকান-নীতি অনুসারে সম্পন্ন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেস্-আদির ইন্‌স্পেক্টরেরাও ত অনাথ-বাবুর মত ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাজ করেন। তাঁহাদের জন্য উৎকৃষ্ট মোটর-কার ও মাসিক ১২৫ টাকা মোটর-ব্যয়ের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন কি?

এই-সকল দৃষ্টান্ত হইতে, আশা করি, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ যেমন ইংলণ্ড হইতে তথাকার নির্ব্বাচক সমিতি দ্বারা হওয়া উচিত নহে, তেমনি বর্ত্তমান গর্হিত মনুষ্যত্ব-বিনাশক রীতিতেও হওয়া অকর্ত্তব্য। একজন মানুষের অবাধ প্রভুত্ব জিনিষটাই ভাল নয়। তাহা যদি স্বজন-পোষণে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে আরো অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

—

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-বর্জ্জন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজখানা বহুকাল হইতে ভারতবর্ষের শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেও ইহা বর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু কাজে বিশেষ কিছু হয় নাই। সম্প্রতি স্বর্গীয় লোকমান্য টিলকের মিথ্যা অপযশ ঘোষণা করায় আবার কাগজখানা ছাড়িয়া দিবার কথা উঠিয়াছে। ছাড়িয়া দেওয়া মানে উহা পড়িবার জন্য ক্রয় না করা, এবং উহাতে বিজ্ঞাপন না দেওয়া। পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতা এই উভয় শ্রেণীর দেশী লোককে স্থায়ীভাবে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ছাড়াইতে হইলে উহার সমতুল্য দেশী কাগজ জোগাইতে হইবে; অর্থাৎ যে যে সুবিধা পাওয়ায় দেশী লোকে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান লয় বা তাহাতে বিজ্ঞাপন দেয়, সেই সব সুবিধা কোন কোন দেশী কাগজেও থাকা চাই। গালাগালি খাইবার জন্য কেহ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কেনে না। কেহ ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধীয় টাট্‌কা খবরের জন্য, কেহ চলিত ঘটনাসমূহের টাট্‌কা খবরের জন্য, কেহ ছবির জন্য, কেহ বিদেশী কাগজ হইতে নির্ব্বাচিত ও পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধাদির জন্য, কেহ বা ভাল ছাপা ও কাগজের জন্য ঐ দৈনিকখানা লয়। বিজ্ঞাপন-দাতাদের মধ্যে যাহাদের ক্রেতা প্রধানতঃ ইংরেজ ফিরিঙ্গী, তাহাদের প্রয়োজন কোন দেশী কাগজ দ্বারা সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু যাহাদের ক্রেতা বেশীর ভাগ দেশী লোক, তাহাদের বিজ্ঞাপন বহুগ্রাহকবিশিষ্ট সুমুদ্রিত দেশী কাগজে বাহির হইলে তাহাদের কাজ চলিতে পারে। অন্য উন্নতি যাহাই করিতে চান, ছাপা ও কাগজ আগে ভাল করা দরকার। তাহা করিবার মত আয় অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলীর আছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই টাকা খরচ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ভাল ও অধিকসংখ্যক সম্পাদকীয় কর্ম্মচারী এবং বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সংবাদসংগ্রাহক,

ভাল ভাল বিদেশী কাগজ ও তাহা হইতে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিবার লোক, ছবির ও ব্লকের দাম,—এ সবই টাকার ব্যাপার। শুধু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ছাড় ও আমাদের কাগজ কিনিয়া পড় ও আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও বলিলেই ত হইবে ; টাকা খরচ করিয়া দেশী কাগজগুলির উন্নতি করিতে হইবে। নতুবা ভুয়া ও বার্থ চীৎকার দ্বারা বিফল প্রয়াসের অপমান মাথায় ডাকিয়া আনার প্রয়োজন কি ? ইংরেজদের এম্পায়ার কাগজখানা মাড়োয়ারী বণিক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বীর্লা কিনিয়াছেন। ইহাঁর ধনশালিতা, বুদ্ধিমত্তা, দেশভক্তি ও দানশীলতার প্রশংসা শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে এম্পায়ার অতঃপর একখানা ভাল দেশী কাগজ হইবে। কিন্তু উহা এখন নিউ এম্পায়ার নামে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রেসে ছাপা হইতেছে ও দেশী লোকদের কাগজগুলিকে ইণ্ডিয়ান পেপার্স্ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। শুনিতেছি যে কোন ইংরেজ উহার নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন বা হইয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, উহা ইংরেজ পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের খুসি করিয়া প্রধানতঃ পয়সা রোজ্‌গারের উপায় হইবে।

—

দেশী কাগজের ইংরেজ সম্পাদক।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল, যে, বোম্বাইয়ের টাটাদের এক কোম্পানীর যে দৈনিক কাগজ হইবে, তাহারও সম্পাদক ইংরেজ হইবে। আমরা উচ্চ উচ্চ প্রায় সমস্ত রাজকার্য্যে ইংরেজ নিযুক্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দোষ দি ; কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরাও বহু মূলধন লইয়া কাগজ প্রতিষ্ঠিত করিলেই প্রায় ইংরেজ সম্পাদক চান এবং পাইলে রাখেন। কিন্তু বিচক্ষণ ও দক্ষ সম্পাদক কি দেশী লোকে হইতে পারে না ? নিশ্চয় পারে। বেশী বেতনের সম্পাদকতাগুলি ইংরেজকে দিলে, দেশী লোকের যোগ্যতা জন্মিবার ও প্রমাণিত হইবার সুযোগ কি প্রকারে মিলিবে ?

ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার প্রাক্‌কালে দেশী স্বাধীন রাজারা ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী সেনাপতি রাখিয়া যুদ্ধ করিত। তদ্দ্বারা কি ঐ রাজাদের রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছিল ? ভাড়াটিয়া বিদেশী সেনাপতিরাই কি অনেক রাজ্য নষ্ট হইবার কারণ হয় নাই ? ভাড়াটিয়া ইংরেজ সম্পাদক দ্বারা আমাদের জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে, মনে করার মত ভুল আর নাই। যে নিজের যুদ্ধ তাহা হাউয়ারের যুদ্ধই হউক বা কাগজকলমের যুদ্ধই হউক, নিজে করিতে না পারে, তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। একথা সত্য, যে, গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ সম্পাদকের যতটা কড়া কথা সহ্য করেন, দেশী সম্পাদকের ততটা কড়া কথা সহ্য করেন না। সেইজন্য এবং ইংরেজরা স্বাধীন জাতির লোক বলিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে অভ্যস্ত থাকায়, ইংরেজ সম্পাদক সাহস করিয়া এমন অনেক কথা বলিতে পারেন, যাহা সাধারণতঃ দেশী সম্পাদকেরা বলেন না। কিন্তু অভীষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে দেশী লোকদিগকেই অধিকতর সাহসী হইতে হইবে ও সত্য কথা বলিতে হইবে, তাহাতে বিপদ্ যাহাই হউক ; যেমন শ্রীযুক্ত গান্ধি বলিতেছেন। নতুবা নিজে যাহা বলিতে পারি না তাহা ভাড়াটিয়া অন্য লোকের দ্বারা বলাইবার রীতি যতটা ঘৃণ্য লাগাইয়া বিরাগভাজন ব্যক্তিকে অপমান বা আঘাত করিবার মত কাপুরুষতা।

ভাড়াটিয়া লোকদের ভারতপ্রেম কতটা আন্তরিক তাহা বুঝা কঠিন। হর্নিম্যান সাহেব যখন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে কাজ করিতেন, তখনও ত ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের নীতি ভারতীয়দের অনুকূল ছিল না। ফ্রেজার ব্লেয়ার সাহেবকে ভারতবন্ধু বলিয়া অনেকে জানেন। তিনি স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার ভক্ত ছিলেন বলিয়াও অনেকে জানেন কিন্তু তিনি ত এখন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের একজন সম্পাদকীয় কর্ম্মচারী ; অথচ সে কাগজখানা ভারতবাসীদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞায় কাহারো চেয়ে কম নয়।

—

ভারতে গবেষণার আরম্ভ।

সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে একটিনি করিতে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হওয়ায়, যে-জাতি চাকুরীকে উচ্চ সম্মান মনে করে তাহার অন্তর্ভূত বহুলোক আন্তরিক বা কৃত্রিম উল্লাসে এবং অনেকে তাঁহার অনুগ্রহলাভের আশায় তাঁহাকে ভোজ দেয় ও নানাপ্রকারে অভিনন্দিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটও তাহা করেন। সেনেটের অভিনন্দনের উত্তরে আশুবাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার এক

স্থানে বলেন, যে সময়ে দেশে কেহ গবেষণার কথা জানিত না, আমি তখন গবেষণা আরম্ভ করি। তাঁহার এই উক্তি "নব্যভারতে"র একটি প্রবন্ধে সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচক পদ্মনাথ-বাবু দেখাইয়াছেন যে আশুবাবুর জন্মের বহুপূর্ব্বে গবেষণার জন্যই এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপিত হয়, এবং এসিয়াটিক রিসার্চেজ্ নামক গ্রন্থাবলীতে বহু গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বহু গবেষকদের নামও পদ্মনাথ-বাবু করিয়াছেন। গবেষণা নানা রকমের। ব্যাপক অর্থে ইহা প্রযুক্ত হইলে, বঙ্গের বাহিরে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী প্রভৃতির গবেষণার উল্লেখ করা যায়; বঙ্গেও উদয়চাঁদ দত্ত, কানাইলাল দে প্রভৃতির নাম করা যায়। তবে যদি আশুবাবু গণিতবিষয়ক গবেষণাকেই লক্ষ্য করিয়া আধুনিক ভারতে নিজেকে পথপ্রদর্শক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাও তাঁহার ভুল। কারণ, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়, যে, তাঁহার বহুপূর্ব্বে দিল্লীর অধ্যাপক রামচন্দ্র Maxima and Minima সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং তাহার উল্লেখ ইংরেজী উচ্চগণিতের কোন কোন বহিতে আছে। ইহাও বোধ হয় তিনি জানেন যে সেকালের হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র রাধানাথ শিকদার গণিতবিষয়ক গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় জানেন না যে দেহ্‌রাদুন-মসুরীর সার্ভে আফিসের অন্যতম কম্পিউটার স্বর্গীয় বাবু কালীমোহন ঘোষ গণিতে অনেক নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন। ইহাও আশুবাবুর গবেষণার আগেকার কথা। ইহার উল্লেখ অমিতকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামক পুস্তকের ৫৮৮ পৃষ্ঠায় আছে। যথা, কালীমোহনবাবু লিখিতেছেন—

"লর্ড রিপন আমাদের আপিসে গিয়া আমার সহিত কথা কহিয়াছেন ও আমার প্রশংসা হইয়াছে শুনিয়া মহর্ষির কত আনন্দ। তিনি বলিলেন, গণিতে তোমার নবাবিষ্কৃত সিদ্ধান্তসকল তোমার নামে মুদ্রিত হয় নাই, তাহার প্রতিকারের জন্য কেন আন্দোলন করিতেছ না। আমি বিনীত ভাবে অবনত মস্তকে উত্তর দিলাম, এক ভগবানেরই সকল সত্য; সম্মানপ্রয়াসী হইলে শান্তির আশা ছাড়িতে হয় এবং ভবিষ্যতে সত্যানন্দ ছাড়িয়া মন সর্ব্বদা সম্মানের জন্য লালায়িত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। (বলিয়া তখনই বুঝিতে পারিলাম মহর্ষির কাছে এইরূপ কথা কহা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।)। শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন, তুমি কালীমোহন মনে করিয়া আমি বলি নাই। আমাদের জাতির সম্মানের প্রতি কেন চাহিব না?"

—

ভারতবর্ষে হাঁসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয়।

ভারতবর্ষে গ্রাম্য অঞ্চলে এখন যত হাঁসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে, তাহার ৪০ গুণ অধিক হইলে তবে প্রয়োজনের অনুরূপ হয়। বাংলাদেশে কলিকাতায় প্রতি ২৩০০ জন মানুষের জন্য একজন করিয়া এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন এবং প্রতি ১৭০০ জন মানুষের জন্য একজন করিয়া সব্ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন আছে। কলিকাতার বাহিরে প্রতি ১৮১০০০ জন মানুষের জন্য একজন করিয়া এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন এবং প্রতি ৪৮০০০ মানুষের জন্য একজন করিয়া সব্ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে অধিকাংশ পীড়িত লোকদের চিকিৎসা কিরূপ হয়।

—

লর্ডসিংহের গবর্ণর হইবার সংবাদ।

কতকগুলি দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে যে ইহা নিশ্চিত যে লর্ডসিংহ শীঘ্রই বিহার-ওড়িশা প্রদেশের গবর্ণর হইয়া দেশে আসিবেন। বিহারীদিগকে তিনি সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিহারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বাঙালীর প্রতি পক্ষপাত করিবার কোনই কারণ নাই। অথচ বিহার-ওড়িশায় ইংরেজ লাটের পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের আমলে কোন কাজে বাঙালীর নিয়োগ হইলেই বিহারীদের কাগজগুলিতে খুব প্রতিবাদ হইতে থাকে। বিহার গবর্ণমেণ্ট বিহারপ্রবাসী বাঙালীকে কিম্বা বিহারের অন্তর্গত মানভূমাদি বাঙালীর অধ্যুষিত জেলার বাঙালীকেই নিযুক্ত করেন। তথাপি গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতী বলা হয়। ইংরেজ লাটের আমলেই যখন এইরূপ হয়, তখন বাঙালী লাটের আমলে যে পক্ষপাত দোষের আরোপ আরো হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যদি লর্ড সিংহ আসিয়াই হুকুম করেন যে তাঁহার শাসিত প্রদেশে সব বাঙালী সরকারী চাকুরিয়ার চাকরী যাইবে এবং নূতন করিয়া আর কোন বাঙালী সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবে না, তাহা হইলে তিনি বিহারীদের কাছে খুব বাহবা পাইতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই মুসলমানদিগকে এবং কোথাও কোথাও অন্য কোন কোন শ্রেণীর লোকদিগকে নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের বা গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মনোনয়ন দ্বারা প্রতিনিধি-পাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে বিহারের বাঙালীদিগকে নিজেদের একজন প্রতিনিধি পাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। তাহাতে বাঙালীরা বলেন যে, যখন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়াই হইল, তখন বিহারবাসী মুসলমান ও অন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে যতজন প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে বাঙালীদিগকেও কতকটা সেই অনুপাতে দেওয়া হউক, এবং গবর্ণমেণ্ট-মনোনয়নের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকেই নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক। এইরূপ দাবী করায় বিহারের "প্রদেশভক্ত" অত্যগ্রসর দলের মুখপত্র সার্চ্‌লাইট ধমক দিয়া বলেন, ওসব হবে-টবে না, তোমরা যদি ওরূপ চেঁচাও তা হলে তোমাদিগকে বিহারের সীমা পার হয়ে যেতে হবে। এইজন্য আমাদের কৌতূহল ছিল যে লর্ড সিংহের বিহারের লাট হইবার গুজবে সার্চ্‌লাইট কি বলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, বীরপুঙ্গব সার্চ্‌লাইট বলিবেন, "দূর হও, বাঙালী লর্ড।" কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখিতেছি ঐ কাগজে লেখা হইয়াছে—

If the report materialises and Lord Sinha comes as our next Governor, Behar will have the honour of having the first Indian Governor in India. Needless to say the fact will be welcomed by all.

—

"ভারতের পক্ষ হইতে" তুরস্কের সহিত সন্ধিতে স্বাক্ষর।

রয়টার পারিস হইতে খবর দিয়াছেন যে ১০ই আগষ্ট কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে চারিজন লোক তুরস্কের সহিত সন্ধিতে দস্তখত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে দস্তখতকারীর নাম সার্ আর্থার হার্জেল। ভারতবর্ষের সমুদয় রাজনৈতিক দলের লোক তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্তগুলির প্রতিবাদ এখনও করিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কেহ দস্তখত করিয়াছে বলা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা; স্বাক্ষরকারীকে ভারতবর্ষ কোন ক্ষমতা দেন নাই। ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কেহ দস্তখত করিলে তাহাকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি মনে করি না।

—

ভারত-সভা ও অসহযোগিতা-প্রচেষ্টা।

ভারত-সভা সম্প্রতি এক অধিবেশনে অসহযোগিতা-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা যায় না বলিয়াছেন, এবং ইহাকে দেশের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের বিরোধী বলিয়াছেন। অসহযোগিতা-প্রচেষ্টার নেতারা যাহা বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন, সকলগুলিতে আমাদের মত নাই, এবং যেগুলিতে মত আছে তাহার সুসাধ্যতম কাজগুলিও দেশের বেশী লোকে করিবেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য ইহা আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান-শূন্যতা, ভীরুতা ও স্বার্থপরতার ফল। তাহা হইতেও ফলে যাহা ঘটিবে তাহা বলা দরকার। কিন্তু কার্য্যতঃ যাহাই ঘটুক, অসহযোগিতা নীতিকে আমরা ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত এবং জাতীয় আত্মসম্মানের পরিচায়ক মনে করি, ভারত সভা এখন যাহাই বলুক, ইতিপূর্ব্বে তাহা অসহযোগিতা কথাটা ব্যবহৃত না হইলেও সুরেন্দ্র-বাবু অন্য এক জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পর্কে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দলের একাধিক মান্যগণ্য লোক কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনারের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্য আমাদের মনে হয়, ভারত-সভার নেতা সুরেন্দ্র-বাবুর বলা উচিত, তিনি অসহযোগিতা নীতিটারই বিরোধী, না, কোন কোন প্রকারের অসহযোগিতার বিরোধী। যদি তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা অসহযোগিতা জিনিষটারই বিরোধী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বীকার করা উচিত যে তাঁহারা পূর্ব্বে ঐ নীতির অনুযায়ী যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক করেন নাই এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের বিরুদ্ধ (opposed to the best interest of the country) কাজ করিয়াছিলেন। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, যে, কোন প্রকার প্রচেষ্টার ভিত্তিভূত নীতিকেই অনিষ্টকর বলা এক কথা, এবং ঐ নীতি অনুসারে

কাজ করা কঠিন বলা ভিন্ন কথা। ঐ নীতি অনুসারে কাজ করিবার জন্য দেশ এখনও প্রস্তুত নহে বলাও ভিন্ন কথা। আমরা অবস্থা-বিশেষে গবর্ণমেণ্টের-সহিত-অসহযোগিতা নীতি অবলম্বনের সমর্থন করি; উহার অসুবিধা ও বিপদ সহ্য করিতে যাঁহারা প্রস্তুত তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে উহা অবলম্বন করিলে তাঁহাদের কাজের প্রশংসাও করিব; কিন্তু দেশব্যাপী অসহযোগিতা প্রচেষ্টার অনুকূল শিক্ষা এখনও আমাদের হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কিন্তু আমাদের ভ্রম হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি।

যাঁহারা অসহযোগিতার নিন্দা করেন, তাঁহারা আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু উপায়ের কথা বলিতে পারেন কি? তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন কি, যে, শুধু আবেদন নিবেদন প্রতিবাদে বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে?

—

নিজামের রাজ্যে গোবলি নিষেধ।

হায়দরাবাদের নিজাম্ এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, যদিও গোরু ও উট বধ করা মুসলমান ধর্ম্মে বৈধ বলিয়া স্বীকৃত তথাপি বর্ত্তমান সময়ে দেশের সর্ব্ববিধ সম্পত্তির অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইছজ্জোহা পর্ব্বে তাঁহার রাজ্যে ঐ দুইটি পশু বলিদান নিষিদ্ধ হইল, এবং ভবিষ্যতে কেবল ছাগল ও ভেড়া ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। কৃষির জন্য, গোযানের জন্য, এবং দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যের জন্য দেশে যত গোরু থাকা দরকার, তত নাই। এইজন্য নিজামের আদেশ কল্যাণকর বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

—

বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য দান।

দীঘাপতিয়ার কুমার বসন্তকুমার রায় রাজসাহী কলেজে উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কৃষিশিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইলে রাজসাহী কলেজে ঐ টাকার সাহায্যে যাহাতে কৃষি শিখাইবার ক্লাস খোলা যাইতে পারে, এখন হইতে তদুপযোগী বন্দোবস্ত করান তাঁহার উদ্দেশ্য। তিন বৎসরের জন্য মাসিক ৩৫ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়া রাজসাহী কলেজের একজন বিজ্ঞান-গ্রাজুয়েটকে কোন উচ্চ কৃষিশিক্ষালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ অন্যতর উদ্দেশ্য। দাতার উদ্দেশ্য সাধু এবং দান প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশে দুরকম কাজের জন্য বড় দানের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না—(১) স্ত্রীশিক্ষার জন্য দান, (২) সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান।

—

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও একতা।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা আগেকার চেয়ে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিতে এখনও সময় লাগিবে। মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি ত ছাড়িতে রাজী নহেনই; অধিকন্তু তাঁহারা জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী ও গ্রাম্য ইউনিয়ন-সকলেও তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চান। এ বিষয়ে মাণিকগঞ্জে বঙ্গের গবর্ণর তথাকার মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা জেলাবোর্ড প্রভৃতিতে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চাওয়ায় লাট সাহেব বলেন, যে, যদিও তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে, তথাপি তাঁহার মতে এখন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন সুবুদ্ধিসম্মত হইবে না, কেন না এখন হিন্দুমুসলমানের সহযোগিতার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশিত হইতেছে; এখন এমন কোন প্রথার প্রবর্ত্তন ঠিক্ হইবে না যাহাতে বোধ হইতে পারে যে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য আছে; বরং মুসলমানদের প্রতিনিধি জেলাবোর্ড আদি কোন সভায় কম হইলে গবর্ণমেণ্ট মনোনয়ন দ্বারা অভাব পূরণ করিবেন।

আশা করি, মুসলমানগণ লাট সাহেবের কথার মধ্যে (অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত) প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু উপভোগ করিতে পারিবেন।

—

অশোকের সাম্রাজ্যে খনিজ-উত্তোলন বিভাগ।

চীনদেশের গ্রন্থাদি হইতে প্রাচীনভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে যে-সব চীন পর্য্যটক আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, যে, সম্রাট্ অশোকের সময় (অর্থাৎ এখন হইতে

প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে) ভূগর্ভ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য একটি রাজকীয় বিভাগ ছিল। তাহার অধীনে খনিজ উত্তোলনের এঞ্জিনীয়ার, খনি-পরিদর্শক, খনিজ-দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (laboratories), ইত্যাদি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পোর্ত্তুগীজ জেসুইট-পাদ্রীগণ চীনদের প্রাচীনকালে দেশ-ভ্রমণের বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে, চীন দেশের হাংকাউ নগরের পুস্তকালয়ে রক্ষিত চীনগ্রন্থে অশোকের সাম্রাজ্যের খনিজ-উত্তোলন বিভাগের বিবরণ আছে, এবং খনিজ-উত্তোলনকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে অশোক তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে যে-সব আদেশ ও উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল, তাহার এক খণ্ড (সম্ভবতঃ চীনভাষায় অনুবাদে) আছে। সম্প্রতি গবেষণার দ্বারা এই বহির একখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মৈসুর গবর্ণমেণ্টের প্রাচীনলিপি-উদ্ধারকেরা (epigraphists) এখন তাহার অনুবাদে নিযুক্ত আছেন। ওড়িশার পুরী নগর একটি বন্দর বলিয়া উল্লিখিত আছে, যেখানে চীনদেশের বণিকেরা পুরীর নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহের খনি হইতে উত্তোলিত সোনার সহিত চীনের রূপার বিনিময় করিত। বিনিময়ের হার ছিল একগুণ সোনার জন্য বারগুণ রূপা।

—

মণ্টেগু সাহেবের বড়লাট হইবার কথা।

রয়টার তারে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিলাতপ্রবাসী বহু ভারতীয় ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন করিয়াছেন, যে, যেন মণ্টেগু সাহেবকে ভারতবর্ষের বড়লাট করিয়া পাঠান হয়। মণ্টেগু সাহেব রৌলট আইনের খস্‌ড়া নিশ্চয়ই আগে দেখিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও উহাকে আইনে পরিণত করিবার জন্য বড়লাটের সভায় উপস্থিত করিতে অনুমতি দিয়া তিনি গর্হিত কাজ করিয়াছিলেন। রৌলট আইনই গত বৎসরের সব অনর্থের মূল। উহার খস্‌ড়ায় মত না দিলে কোন অনিষ্ট হইত না। পঞ্জাবের ব্যাপারে তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র খবর লইয়া ন্যায়ানুগত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন নাই। হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর তদ্বিষয়ে তিনি বড়লাটকে যে চিঠি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে লিখিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। তাহাতে ভারতশাসন-নীতির উচ্চ আদর্শ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় দুরাত্মা অপরাধী কর্ম্মচারীদের দণ্ড সামান্যই হইয়াছে। বস্তুতঃ নাম উল্লেখ করিয়া কেবল ডায়ারকেই তিরস্কার করা হইয়াছে। তাহার নিজের সন্দেহ কিন্তু আবার তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে! অন্য যে-সব দুরাত্মা ভারতীয়দের জাতীয় আত্মসম্মান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কৃমির সমান বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের নাম ধরিয়া কোন ভিরস্কার করা হয় নাই। দুরাত্মাদের সর্দ্দার ওডায়ারের সামান্যমাত্র ত্রুটির উল্লেখ করিয়া অতিউচ্চ প্রশংসা দ্বারা তাহাকে আকাশে তোলা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের কোন ত্রুটি মন্ত্রীরা দেখিতে পান নাই। তাঁহার এরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে যেন তাঁহার মত উৎকৃষ্ট বড়লাট ভারতে কেহ কখন আসেন নাই। যাহা হউক, মণ্টেগু সাহেবের দোষত্রুটির একটা সম্পূর্ণ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং আমরা ইহাও জানি যে, সব দোষ তাঁহার নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় এমন সব লোক আছে, যাহারা ঠিক্ নিজের মত অনুসারে কাজ করিতে পাইলে পঞ্জাবের দুরাত্মা সমরকারী অপরাধীদের ভিরস্কারের পরিবর্ত্তে পুরস্কার হইত মণ্টেগু সাহেবের চিঠিখানা একটা রফার ফল, ইহাও বুঝিতে পারি। ইহাও অনুমান হয়, যে, ভারতশাসনবিষয়ক নূতন আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরোধী দলের লোকেরা যাহাতে বেশী বাধা উপস্থিত না করে, তাহার জন্য মণ্টেগু অনেকটা তাহাদের মন রাখিয়া চলিয়াছেন। তাহা হইতেও, তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণাই হয়, যে, তিনি ভারতহিতৈষী হইলেও তাঁহার স্বভাবে চাতুরীর পরিমাণ বেশী থাকায় তিনি সাহস করিয়া ন্যায় ও সত্যের পক্ষ সমর্থন করিতে অনেক সময়ই পারেন না। যিনি ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশে থাকিয়াও তাহা পারেন না, তিনি এদেশে আসিয়া এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া ঐ দলের বাধা সত্ত্বেও সাহসপূর্ব্বক ভারতবর্ষের মঙ্গল করিতে পারিবেন, ইহা আমাদের মনে হয় না। মানুষকে বাগাইয়া কৌশলে কাজ উদ্ধার করা রাজনীতিবিদের একটা গুণ বটে। কিন্তু এমন সময় আসে যখন চাতুরী

কৌশল চালাকী অপেক্ষা নির্ভীক ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠারই অধিক প্রয়োজন হয়। মণ্টেগু সাহেবের কোন কোন বক্তৃতায় শেষোক্ত গুণগুলির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন কাজে এ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তিনি বড়লাট হইয়া আসিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে, এরূপ মনে হয় না। তবে ইহা আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করি, যে, আমরা যত বিলাতী রাজনীতিজ্ঞ ও রাজপুরুষের বিষয় জানি, তাঁহাদের সকলের মধ্যে মণ্টেগুর বড়লাট হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

রাজনৈতিক কোন বিষয়ে আবেদনকারীদের অগ্রণীরূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যে, হয় রয়টারের সংবাদে কিছু ভুল আছে, কিম্বা কোন গুরুতর কারণে ইহা ঘটিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, বিশেষ কোন মানুষকে চাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে একটি এই, যে, সেই মানুষটির ভবিষ্যৎ নীতি ও কার্য্যের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতার যেন কিছু হ্রাস হয়; এবং বিরোধীরা এরূপ সমালোচনার উত্তরে বলিবার সুযোগ পায়, "কেন, তোমরাই ত ইহাকে চাহিয়াছিলে?" অবশ্য আবেদনটি ঠিক্ কি কারণে, কি কি অবস্থায়, এবং কি বলিয়া কি ভাষায় করা হইয়াছে, তাহাতে কি চাওয়া হইয়াছে, না জানিয়া বেশী কিছু বলা যায় না। যাহা বলিলাম, ইহাতেও ভুল থাকিতে পারে। হইতে পারে, যে, মণ্টেগুর শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায়, এবং ভারতশত্রু কাহারও বড়লাট হইবার সম্ভাবনা ঘটায় এই আবেদন করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে হইয়াছিল।

—

লোকমান্য টিলকের তিরোভাব।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলকের তিরোভাবে ভারতবর্ষ এরূপ একজন দেশভক্ত, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, নিঃস্বার্থ, পবিত্রচরিত্র, সাহসী ও বিচক্ষণ নেতা হারাইলেন, সর্ব্ববিষয়ে দেশে যাঁহার তুলনা আগেও ছিল না, এখনও নাই। বংশগৌরব, পদগৌরব, অর্থগৌরব মহাত্মা টিলকের নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল না; নিজের চরিত্র ও কৃতিত্বের দ্বারাই তিনি নেতা হইয়াছিলেন।

তিনি জীবনে কেবল গবর্ণমেণ্ট নামে অভিহিত ইংরেজ আম্‌লাতন্ত্রের সমালোচনা ও বিরোধিতা করিয়াছিলেন, অন্য সৎকাজ কিছু করেন নাই, এমন নয়। কলেজের লেখাপড়া শেষ করিয়াই, টাকা রোজ্‌গারের চেষ্টা না করিয়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্র লোকশিক্ষকের ব্রত গ্রহণ করেন। গ্রাসাচ্ছাদনাদির সামান্য ব্যয় লইয়া যে ফার্গুসন কলেজে যে দাক্ষিণাত্য শিক্ষণসমিতির সুপণ্ডিত সভ্যেরা কাজ করেন, লোকমান্য টিলক তাহার অন্যতম সংস্থাপক। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় নানা প্রকারে দরিদ্রের সেবা করিয়াছেন, প্লেগের সময় সমুদয় বিপদ তুচ্ছ করিয়া পীড়িতদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ও হিন্দু প্লেগ হাঁসপাতাল খুলিয়া এই দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত লোকদের সেবা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সাহস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে ও দেশের লোকদের চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরো অনেক সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম জড়িত। এইরূপ সব কাজের জন্য অনেকে গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি পদক প্রভৃতি বক্‌শিশ পাইয়া থাকেন। বক্‌শিশ পাইবার অভিলাষ ত টিলকের ছিলই না। এরূপ অভিলাষ আরও অনেক কর্ম্মীর না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের দুরদৃষ্টবশতঃ নানা উপাধি তাঁহাদের স্কন্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু টিলকের জীবন, চরিত্র, সমুদয় কাজ করিবার রীতি এরূপ ছিল যে উপাধিপদকাদি লাভের দুর্ভাগ্য তাঁহার কখন ঘটে নাই। টিলক নিজের প্রতি বা নিজের জাতির প্রতি, স্বদেশে বা বিদেশে, ইংরেজ আম্‌লাতন্ত্রকে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টকে খুসি করিয়া, কোন প্রকার কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই। ইহা তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। ইহা গান্ধির মত নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক পুরুষের জীবন সম্বন্ধেও বলা যায় না। ইংরেজ রাজপুরুষেরা স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য নরম গরম দুরকম নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কখন বা তাঁহারা অনুগ্রহ করেন, কখন নিগ্রহ করেন। অনুগ্রহে যাহাদিগকে কাবু করিতে তাঁহারা পারেন না, যাহারা অনুগ্রহ চায় না বা লয় না, যাহারা পৌরুষসম্পন্ন, নির্ভীক, ত্যাগী এবং আম্‌লাতন্ত্রের অনুষ্ঠিত বা প্রস্তাবিত ভারতের অনিষ্টকর কাজে সাক্ষাৎভাবে বাধা দিতে ও

তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করে, তাহাদের নেতাদের নিগ্রহের ব্যবস্থা হয়। টিলকের দুর্দ্ধর্ষ পৌরুষের ও একাগ্র দেশহিতৈষিতার জন্য তাঁহার প্রতি নিগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে তাঁহার যেমন নিগ্রহ হইয়াছে, যত বার ও যত দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার কারাবাস হইয়াছে, বহুবার মোকদ্দমায় তাঁহার যেরূপ অর্থনাশ হইয়াছে, আর কোনও ভারতীয় নেতার তাহা হয় নাই। তাঁহার অপেক্ষা অল্পনিগ্রহে অন্য অনেকে নরম হইয়াছেন, নুইয়াছেন, কার্য্যগত রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়াছেন; কিন্তু টিলক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত খাড়া ছিলেন, নিজের সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে যান নাই, কার্য্যগত রাজনীতি-চর্চ্চা ও রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়েন নাই। তাঁহার নানা নিগ্রহে তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়াছিল, আয়ুর হ্রাস হইয়াছিল, মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু তাঁহার আত্মা অজেয় ও অজিত ছিল। ধন্য তাঁহার দৃঢ়তা!

ভারতীয় জননায়কদের প্রভাব সাধারণতঃ শিক্ষিত লোকদের উপরই বেশী দেখা যায়। টিলক মহারাজ ও গান্ধি মহাশয় ইহার ব্যতিক্রমস্থল। ইঁহাদের মধ্যে তুলনা করিব না। এখন কেবল লোকমান্য টিলকের কথাই বলি। মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর অধিকাংশ লোকের উপর তাঁহার প্রভাবের কারণ কি? অনেকে বলিবেন, তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন বলিয়া তাঁহার এত প্রভাব। হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার প্রভাবের অন্যতম কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিলাত যাওয়াতেও তাঁহার প্রভাব কমে নাই। গোঁড়া হিন্দু নেতা আরো আছেন; তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব টিলকের প্রভাবের নিকটও যায় না। জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাবের আরো কতকগুলি কারণ আছে।

তাঁহার পরিচ্ছদ চালচলন সাদাসিধা, বিলাসশূন্য, দেশীয় ধরণের ছিল। টিলক প্রধানতঃ নিজ মাতৃভাষা মরাঠীতে বক্তৃতা করিতেন বলিয়া সহজে মহারাষ্ট্রীয়দের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ ও সঙ্গ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সহজলভ্য ছিল, এবং তিনি দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকদের সহিতও এমন ভাবে মিশিতেন ও কথা বলিতেন যেন তিনি তাহাদেরই একজন।

তিনি ওকালতী পাস করিয়াছিলেন, খুব মনস্বী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইচ্ছা করিলে বড় উকীল হইতে ও হাইকোর্টের জজ হইতে পারিতেন, মানসম্ভ্রম ধনদৌলত তাঁহার খুব হইত; কিন্তু তিনি সে পথে যান নাই। টাকা রোজগার যে তিনি করেন নাই, তাহা নহে। লক্ষ লক্ষ টাকা আয় তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু তিনি ব্যয়ও করিয়াছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। মোকদ্দমাতেই ব্যয় হইয়াছে বহু লক্ষ টাকা। যে মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি বিলাত যান, তাহাতে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই মোকদ্দমার সাক্ষাৎ লক্ষ্য ছিল, নিজের চরিত্রকে হত্যার উত্তেজনা অপবাদ হইতে মুক্ত করা; কিন্তু বাস্তবিক ইহার চরম লক্ষ্য ছিল, যাহাতে মিথ্যাবাদী কোন ইংরেজ লেখক আমাদের জাতির বা নেতাদের চরিত্রে অবাধে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা। এই উদ্দেশ্যে বিলাতে মোকদ্দমা করা অন্য অনেক লোকের মত আমাদেরও ভাল লাগে নাই; কারণ, আমাদের ধারণা ছিল ইংরেজ জুরী ও জজেরা এসব স্থলে সুবিচার করিবে না। কিন্তু যাহারা টিলককে ইংরেজবিদ্বেষী মনে করে, তাহাদের ভাবা উচিত যে টিলকের যদি ইংরেজের সর্ব্বোচ্চ আদালতের ন্যায়বুদ্ধির উপর আস্থা না থাকিত তাহা হইলে তিনি গোঁড়া হিন্দু হইয়া বৃদ্ধবয়সে সমুদ্রযাত্রা করিতেন না এবং মোকদ্দমায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন না। সর্ব্বসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাবের ইহা এক জলন্ত দৃষ্টান্ত যে, তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মহারাষ্ট্রের লোকেরা অল্পদিনের মধ্যেই এই তিনলক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়াছিল। আরো দুইএকবার মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয়। আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য করিতে হইলেও, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য সভায় স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ ও গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিবার অধিকার বজায় রাখিবার বা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ইহার সহিত জড়িত ছিল। ১৯০৮ সালে যখন রাজদ্রোহ অপরাধে তাঁহার বিচার হয় তখন তিনি স্বয়ং নিজের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার আশ্চর্য্য মনস্বিতা, আইনজ্ঞান ও মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ছয় বৎসর কারাগারে বাস করিয়াও তিনি দমিয়া যান নাই।

বঙ্গীদশায় গীতারহস্য নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। কিছু দিন হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বাংলা অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মনস্বিতা, অজেয় পৌরুষ ও মানসিক দৃঢ়তা সর্ব্বসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাবের অন্যতম কারণ।

আর এক কারণ, তাঁহার অকলঙ্ক সাধু জীবন ও চরিত্র। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ছোট বড় সব নেতার সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারিলে বড় আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় হইত, এবং এতদিনে দেশের চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইত। কবি বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ের দাস যে-বা বার মাস, স্বদেশ-উদ্ধার তার কার্য্য নয়।" টিলক ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন না বলিয়া তিনি দেশের কল্যাণকল্পে দেহমন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন।

টিলকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক মতের সহিত, কার্য্যপ্রণালীর সহিত, কার্য্যনীতির সহিত তাঁহার বিরুদ্ধদলের লোকেরা সায় দিতে পারিতেন না, আমরাও সব সময়ে সায় দিতে পারিতাম না; কিন্তু তাঁহার প্রধান বিরোধীরাও স্বীকার করিতেছেন যে তিনি ভুলভ্রান্তি যাহাই করুন, যে-নীতি ও যে-পথই অবলম্বন করিয়া থাকুন, মাতৃভূমির সেবাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু করেন নাই। তাঁহার প্রভাবের ইহাও একটি কারণ।

মহারাষ্ট্রে তাঁহার অতুলনীয় প্রভাবের আর-একটি কারণ, শিবাজী-উৎসবের প্রবর্ত্তন ও তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বাজাত্যের উন্মেষণ। জাতীয় পূর্ব্বগৌরবের কথা মানুষের বড় প্রিয় জিনিষ। ইহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এবং ইহার জন্য নানা নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া টিলক মহারাষ্ট্রে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়সিংহাসনে আরূঢ় হন। শিবাজী উৎসব প্রবর্ত্তন যে তাঁহার রাজনিগ্রহের একটি মূল কারণ, তাহা সমসাময়িক ইতিহাসজ্ঞ ও টিলকচরিতজ্ঞ সকলেই জানেন।

মহৎ ব্যক্তিদের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া লাভবান্ হইতে হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকটি মত গ্রহণ ও অনুসরণ এবং প্রত্যেকটি কার্য্যের অনুকরণ করিবার তত্ত্ব যে আবশ্যক নাই তাহা নয়, বরং তাহা করিলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিরই সম্ভাবনা অধিক। কোন মানুষেরই সব মত ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন কাজে দোষত্রুটি থাকে। তদ্ভিন্ন, একদেশে একসময়ে এক প্রকার অবস্থায় যাহা সঙ্গত ও সুফলপ্রদ, দেশ কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহা সঙ্গত ও সুফলপ্রদ না হইতে পারে। ইহাও বিবেচ্য, যে, সব মানুষের শক্তি এক রকমের ও পরিমাণে সমান নয়। মহৎ লোকে যে কাজে হাত দিয়া শেষ রক্ষা করিতে পারেন, অন্যেরা তাহা না পারিতে পারে। মহৎ লোকদের মধ্যে কবি, বক্তা, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি আছেন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনপথের পথিক হইতে পারি না। মহৎ লোকদের কোন মতই লইতে হইবে না, তাঁহাদের কাজের মত কোন কাজই করিতে হইবে না, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, মহৎ জীবনের আলোচনা কালে মহৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যের প্রতি, তাঁহারা যে মূলমন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত তাহার প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাঁহাদের সুরে আমাদের জীবনের সুর বাঁধিতে হইবে। মাতৃভূমির সেবা, মাতৃভূমিকে গৌরবমণ্ডিত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা, টিলকের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই মন্ত্রের সাধনে তিনি সর্ব্বস্ব পণ, প্রাণ পণ করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস এই দেশভক্তি ও দেশসেবার মূলে ছিল। শেষ রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া তিনি রাজনীতি অপেক্ষা চিরন্তনী ধর্ম্মকথার আলোচনাতেই আনন্দ পাইতেন। গীতার তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক তাঁহার শেষ উচ্চারিত কথা। ভগবান্ বলিতেছেন, "যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি তখনই ধরাধামে অবতীর্ণ হই।" ধর্ম্মমত কি ভাষায় কি আকারে কোন্ দেশে প্রকাশ পায়, তাহার বিচার না করিয়া, গীতার এই শ্লোকের মধ্যে নিহিত এই সত্যে আমাদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, যে, অধর্ম্মের অতিবৃদ্ধিতে এবং অতি দুর্দ্দিনেও মুহ্যমান হইলে চলিবে না, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই নিকটে আছেন ও প্রস্তুত আছেন, তিনি জগৎকে অধর্ম্মের হাতে ছাড়িয়া দেন নাই, সব সুচেষ্টার সহায় তিনি। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই লোকমান্য টিলক

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক।

M. RAY & SONS, CALCUTTA.

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

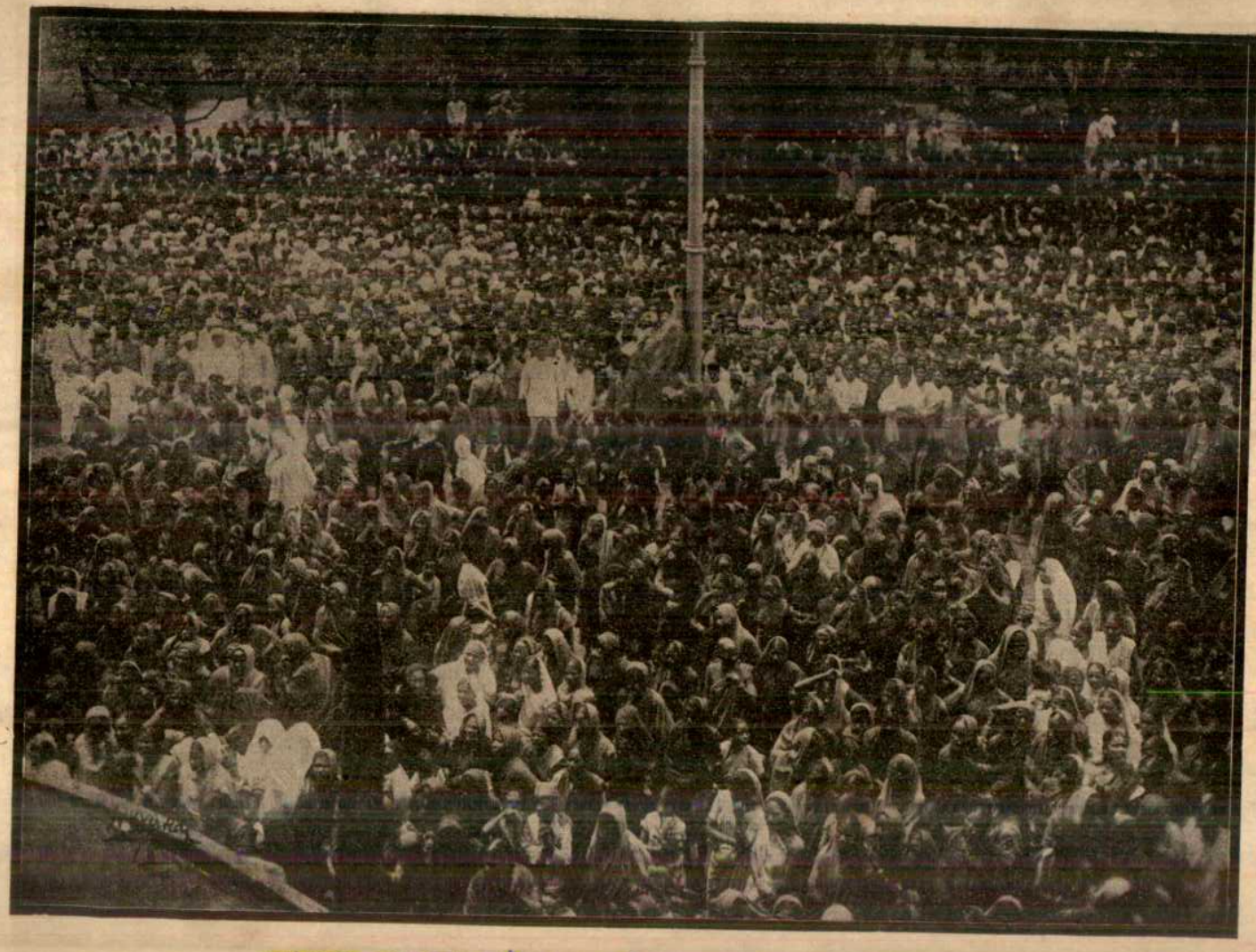

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন।

W. RAY & SONS, CALCUTTA

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের দেহ।

U. RAY & SONS, CALCUTTA

বীরের মত দৃঢ়তার ও সাহসের সহিত সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বাস আমাদের হউক।

—

টিলক ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, ইহা অনেকে জানেন। গোখলে ও টিলক উভয়েরই লক্ষ্য দেশহিত থাকিলেও পথ কতকটা ভিন্ন ছিল। পথ যে ভিন্ন হইবে, টিলকের কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই তাহা সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু পথের ভিন্নতা বশতঃও মহামতি রাণাডে যে টিলকের দেশসেবায় আত্মনিয়োগ অনুমোদন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা টিলকের বিরোধীদলের অন্যতম নেতা সার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকারের একটি প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। চন্দাবরকার ও টিলক সমবয়স্ক, ছয়মাস উভয়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে সহপাঠী ছিলেন, এবং এক বৎসরেই বি-এ পাস্ করেন। দাক্ষিণাত্য-শিক্ষণ-সমিতি (Deccan Education Society) এবং ইংরেজী "মাহ্‌রাট্টা" ও মরাঠী "কেশরী" নামক কাগজ দুটি টিলক ও তাঁহার বন্ধুদের দ্বারা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, কেহ কেহ সন্দেহ করেন, যে, টিলক ও তাঁহার মত দুএকজন যে সমিতি ও খবরের কাগজ দুটির সহিত সংসৃষ্ট, তাহা হয় ত সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবে এবং সমাজসংস্কারকদের বিরুদ্ধ আচরণ করিবে। ইহা ১৮৭৯ সালের কথা। রাণাডে পরমতসহিষ্ণু ও উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এবম্বিধ সন্দেহের কথা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ, এ পর্য্যন্ত সেই সব শ্রেণীর লোক হইতেই দেশের কাজ করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে যাহারা সরকারী চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং কিছু অবসর করিয়া লইয়া দেশের কাজ করে। কিন্তু এই যুবকগুলির মত যাহাই হউক, তাহারা দেশের সেবার জন্য সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আমাদের জাতীয় জীবনের দ্বিতীয় যুগ আসিয়াছে। এখন অণুবীক্ষণের সাহায্যে ইহাদের দোষত্রুটির বিচার না করিয়া ইহাদিগকে উৎসাহ দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—

লোকমান্য টিলকের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া।

টিলক শেষ রোগশয্যায় বোম্বাইয়ের "সর্দ্দার গৃহ" নামক পান্থশালায় যখন শায়িত, তখন সর্ব্বদাই সেই অট্টালিকার সম্মুখে লোকারণ্য দৃষ্ট হইত। সকলেই তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্য উৎসুক। মৃত্যুর পর, অবিরাম বৃষ্টি সত্ত্বেও রাজপথে এরূপ জনতা হইয়াছিল, যে, সর্ব্বজনপূজিত দাদাভাই নৌরোজির অন্ত্যেষ্টিকালীন জনতাও তাহার তুলনায় পরাস্ত হয়। টিলক সমাজসংস্কারক দলের লোক ছিলেন না। ঐ দলের প্রসিদ্ধ মুখপত্র ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার লিখিয়াছেন,—"The largest funeral procession witnessed in Bombay in recent years was that of Mr. Dadabhai Naoroji. Mr. Tilak's totally eclipsed it." অর্দ্ধেক বোম্বাই সহর রাস্তায় বাহির হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, জনতার মধ্যে নারীর সংখ্যা। ছবিতে দেখুন নারীরা জনতার সম্মুখভাগে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের ভীড়ই বা কত! মহারাষ্ট্রে অবরোধ প্রথা নাই। তাই জাতীয় জীবনের শোকে হর্ষে সর্ব্ব কার্য্যে নারীরা পুরুষের সহিত যোগ দিতে পারেন। এইজন্য সার্ব্বজনিক ব্যাপারে বোম্বাই অগ্রসর হইতেছে, বাংলা পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

টিলকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার শববাহীদের মধ্যে মুসলমান ও ছিলেন।

—

দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন।

দুর্ভিক্ষ নাম দেওয়া হউক বা না হউক, দীর্ঘকাল ধরিয়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য খুব বেশী আছে। পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের সময় তবু খাদ্য ভিন্ন অন্যান্য জিনিষ সচরাচর যে মূল্যে পাওয়া যায় তাহাতেই পাওয়া যাইত। কিন্তু গত কয়েক বৎসর সব জিনিষেরই দাম খুব বেশী হইয়াছে, অথচ লোকের আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই। এই মহার্ঘতার দিনে আবার বাংলা, ছোটনাগপুর ও ওড়িশার নানা স্থানে বন্যা ও জলপ্লাবনে হাজার হাজার লোক গৃহশূন্য ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনপীড়িত লোকদের কষ্টের কথা

ভাবিলে হৃদয়ে বল থাকে না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এ অবস্থায় নিরাশ মনে বসিয়া না থাকিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের স্থায়ী প্রতীকার-চেষ্টার কথা অনেকবার লিখিয়াছি। বন্যারও প্রতীকার মানুষের বুদ্ধির ও ক্ষমতার অতীত নহে। বন্যায় যাহাতে লোকের ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য আমেরিকার ওহিও রাষ্ট্রে কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আগষ্ট মাসের মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান্ হইতে সংকলিত হইয়াছে।

—

দুই রকমের "ভিক্ষুক"।

ভারতীয় রাজনৈতিক পরিভাষায় যাঁহারা চরমপন্থী বা গরমপন্থী নামে পরিচিত, তাঁহারা নরমপন্থী মধ্যপন্থী বা ধীরপন্থীদিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভিক্ষোপজীবী মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাও যে অনেক সময় প্রকারান্তরে ভিক্ষাই করেন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। এইজন্য আমরা ১লা আগষ্ট প্রকাশিত মডার্ন্ রিভিউ কাগজে লিখিয়াছিলাম—

What is understood by constitutional agitation in India consists in passing resolutions on the duty of Government, making prayers, submitting petitions, protesting against oppression and injustice, &c. This kind of agitation has been called political mendicancy. There is another method, that of bringing pressure to bear on Government by civil disobedience, non-payment of taxes non-co-operation of other kinds, &c., which amount to giving trouble to Government in a non-criminal and non-violent manner, in order that Government may do things in the way we desire. This method, too, when pursued by a dependent people, is really a method of mendicancy, a form of seeking the help of others; it is not self-help. There are two kinds of beggars: those who supplicate and excite our pity and get help in that way, and those who annoy us by their vociferousness, etc., and are helped by those who wish to get rid of the annoyance. Men who do something positive and earn something for themselves form a class different from the two kinds of beggars described above.

বস্তুতঃ নিজে কোন কাজ করাই হইতেছে স্বাবলম্বন; প্রার্থনা দ্বারাই হউক কিম্বা কোন প্রকারে চাপ দিয়াই হউক ঐ কাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা করান স্বাবলম্বন নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমরা যদি সমগ্র দেশের সকল বালকবালিকার শিক্ষা চাই, তাহা হইলে, যদি তাহার প্রণালী আমরা উদ্ভাবন করি, পাঠ্যপুস্তক আমরা লিখি বা নির্ব্বাচন করি এবং বিদ্যালয়গুলিও আমরা স্থাপন করি ও চালাই, তাহা হইলে তাহা হইবে স্বাবলম্বন। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যদি ঐ-সব কাজ করাইতে চাই, তা যে উপায়েই হউক, তাহা স্বাবলম্বন হইবে না। আপত্তি উঠিবে, এরূপ ত কোন দেশে হয় না, হয় নাই; ট্যাক্স আমরা দিব, তাহার উপর আবার চাঁদা দিয়া মাথা ঘামাইয়া পরিশ্রম করিয়া সমগ্র দেশের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিব? উত্তরে বলি, যদি ট্যাক্স দিতে না চান, দিবেন না ও না-দেওয়ার দুঃখ মাথা পাতিয়া লইবেন; কিন্তু দেশের প্রতি কর্ত্তব্য যদি স্বাবলম্বন দ্বারা করিতে চান, তাহা হইলে পথ কেবল একটি। এমনটি অন্য কোন দেশে হয় নাই বা হয় না, যদি বলেন, তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করি, বিদেশ হইতে কতকগুলি লোক যাত্রীর মত কিছু দিন আসিয়া প্রভুত্ব করিয়া ও টাকা রোজ্‌গার করিয়া চলিয়া যায়, শাসিত দেশে বংশানুক্রমে ঘর বাঁধে না, এমনটিই ভারতবর্ষের বা অন্য কোন দেশের পূর্ব্বতন যুগে কবে ঘটিয়াছে? সব অবস্থাগুলি ঠিক্ মিলিয়া গেলে তবে ইতিহাসের নজীর খাটে। ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইংলণ্ডের কন্‌ষ্টিটিউশ্যন্যাল এজিটেশ্যনকে ভারতীয়রা অবলম্বন করিলে তাহা কেমন করিয়া স্বাবলম্বন নামে অভিহিত হইবে? বিদেশী লোকদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে যখন দেশী লোকদের গঠিত ও কর্ত্তৃত্বাধীন গবর্ণমেণ্ট হইবে, তখন আমরা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে-কাজ করাইব, তাহা স্বাবলম্বন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

কোন অবস্থাতেই স্বাবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় অবলম্বনীয় কি না, তাহার ব্যবস্থা দিতে আমরা অক্ষম।

আমাদের স্বার্থপরতা এবং সার্ব্বজনিক বিষয়সকলে ঔদাসীন্য ও আলস্য যতদূর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা পরাধীন হইয়াছি, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ এবং সার্ব্বজনিক বিষয়-সকলে আমাদের আগ্রহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা সেইরূপ মাত্রায় বাড়িলে তবে আমরা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইব। স্বাধীন দেশের লোকে যেখানে শুধু ট্যাক্স দেয়, আমাদিগকে সেখানে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত ব্যয়ও করিতে হইবে। নতুবা অতীতের জাতীয় অপরাধের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে?

স্বাবলম্বন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত।

প্রবাসীর একজন মফস্বলবাসী হিতৈষী লেখক গত ৯ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন, তাহা আমাদের ব্যবহারার্থ পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

"এখানে এসে অবধি জনসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। চিঠিপত্র লেখা শক্ত হয়েচে। এখানে এসে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমরা মাংসাশী মানুষের হাতে। এরা প্রচণ্ড, * * *। পাঞ্জাবে এরা যে-বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, মনে করেছিলুম সেটা আকস্মিক, এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখ্‌তে পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত তাদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্ত্তিকে এরা কেউ কেউ "splendid brutality" বলে প্রশংসা করেছে। এই উপলক্ষ্যে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝ্‌বার সময় এসেচে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা। আমাদের এতকাল মনে এই দুরাশা ছিল যে,—এরা দেবে আমরা পাব, এদের সঙ্গে আমাদের এই দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ। কিন্তু দেবার শক্তি এদের নেই, সেই আমাদের সৌভাগ্য—কারণ দানের দ্বারা দুর্ব্বলকে যত নষ্ট করা যায় এমন বঞ্চনার দ্বারা নয়। আমাদের যদি পৌরুষ থাকৃত, বল থাকৃত, তাহলে দান গ্রহণের দ্বারা আমরা ক্ষুদ্র হতুম না। সকল বড় জাতই অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে; কিন্তু সেই গ্রহণ করা খাজনা গ্রহণ করার মত—কেননা যার আছে সেই পাবে এই নিয়ম—রাজাই পাবে, ভিক্ষুক পাবে না। অতএব এদের কাছে হাতপাতার চেয়ে আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। আমাদের দেশের 'মডারেট' যাঁরা তাঁরা হাত জোড় ক'রে ভিক্ষা করেন, আর যাঁরা 'একষ্ট্রীমিষ্ট' তাঁরা চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করেন, এইমাত্র তফাৎ। একদল মনিবের পাতের সাম্‌নে ল্যাজ নাড়েন, আর একদল ঘেউ ঘেউ করেন;—একদল মনে করেন তাঁরা ভারি সেয়ানা, আর একদল মনে করেন তাঁরা ভারি তেজস্বী; কিন্তু মনিবের উচ্ছিষ্ট এবং লাথি দুই দলের পিঠে সমান ভাবেই পড়ে—অথচ সেই উচ্ছিষ্টের ভাগ সম্বন্ধে দুই দলের কলহের আর অন্ত নেই। ওদিকে দেশের কাজ পড়ে আছে, সেদিকে মন দেবার সময় নেই। অতএব উচ্ছিষ্টের চেয়ে এই লাথিই আমাদের পক্ষে যথার্থ সৌভাগ্য।　　বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রাজনৈতিকদের কাজের গৌরব।

গতমাসের প্রবাসীতে সমাজে রাজনৈতিকদের স্থান যে সর্ব্বোচ্চ নহে, সে বিষয়ে কিছু লেখা হইয়াছিল। এ মাসে একজন পত্রপ্রেরক এ বিষয়ে ইংরেজলেখক ওয়েল্‌সের মত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এই আলোচনা ভাল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। তাই আমাদের মত একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। কেহ যদি বলে, গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে সুরকী ভাঙিবার লোকের কাজের চেয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজের গৌরব বেশী, তাহা হইলে ইহা বলা হয় না যে সুরকী ভাঙিবার লোকেরা অকেজো ও অনাবশ্যক। সেইরূপ রাজনৈতিকদিগকে লোকসমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান না দিলেই ইহা বলা হয় না যে, তাহারা জাতির কোন আবশ্যক কাজই করে না।

ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, সাধারণ রাজনৈতিক বলিতে আমরা ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, ম্যাট্‌সিনির মত লোক বুঝি না। তাঁহারা উচ্চতর স্তরের লোক।

শাসনযন্ত্র ও শাসক মানুষ।

রয়টারের তারের খবরে দেখিলাম, যে, বিলাতের অব্‌জার্ভার কাগজের একজন প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে অশান্তি ও তাহা নিবারণের উপায় প্রভৃতির কথা পাড়িয়া তাঁহার মত জানিতে চান। প্রতিনিধি যাহা জানিতে পারেন অব্‌জার্ভারে তাহা বাহির হইয়াছে। রয়টার তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত চুম্বক পাঠাইয়াছেন। তাহা পড়িয়া কোন সমালোচনা করা চলে না। তবে তাহা হইতে যাহা বুঝা

যায়, তৎসম্বন্ধে দুএক কথা বলিতেছি। চুম্বক হইতে মনে হয় যেন রবি-বাবুর মত এইরূপ যে শাসনযন্ত্রের এবং শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোন ফল হইবে না; রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইবার লোকগুলি যদি এমন হয় যে তাহাদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংস্পর্শ থাকিতে পারে এবং ভারতীয়দের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে অশান্তি দূর হইবে। অব্‌জার্ভারে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে রবি-বাবুর মতে মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষের বড়লাট হইলে অশান্তি প্রশমিত হইবে। এই-সব মতের আলোচনা করিতেছি, কিন্তু তাহা রবি-বাবুর মত কি না বলিতে পারি না।

ইহা ঠিক্ কথা যে, শাসনযন্ত্র ও শাসনপ্রণালী যেমনই হউক, শাসক ভাল হইলে কতকটা সুফল হইবেই; ইহাও সত্য যে, শাসনপ্রণালী ভাল হইলেও কাজের ভার যাহাদের হাতে তাহারা মন্দ লোক হইলে শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষ সত্ত্বেও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না, বরং কুফল হইবে। অন্য দিকে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, শাসনযন্ত্র মন্দ হইলে খুব ভাল শাসন-কর্ত্তারও সদিচ্ছা ও সাধু উদ্দেশ্যে বাধা পড়ে; এবং শাসনপ্রণালী ভাল হইলে, (অর্থাৎ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা বাধা পায়, এরূপ নানা ব্যবস্থা তন্মধ্যে থাকিলে) মন্দ লোকেও ইচ্ছানুরূপ মন্দ করিতে পারে না। ভাল শাসনযন্ত্র ভাল লোকের সদিচ্ছার সহায় হয়, এবং মন্দ লোকের অসদিচ্ছা ফলবতী হওয়ায় বাধা দেয়; ভাল শাসনযন্ত্রের এই উপকারিতা ও প্রয়োজন আছে।

কারখানার যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারের যন্ত্র যেমন জড়পদার্থ লইয়া নির্ম্মিত, শাসনযন্ত্র তাহা নহে। বস্তুতঃ শাসনযন্ত্র কথাটির প্রয়োগই রূপকের মত। উহা কতকগুলি নিয়মানুসারে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বহু মানবের সমষ্টি। তাহারা যে যাহাকে যে ভাবে আদেশ করিয়া বা মানিয়া যে প্রকারে কাজ করিবে, তাহা শাসনপ্রণালী। রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই যে, দেশের অধিবাসীরা স্বয়ং অনেক কাজ করিবে, এবং বাকী কাজ নিজেদের মধ্য হইতে নিজেদের দ্বারা নির্ব্বাচিত লোকদের দ্বারা নিজেদের প্রণীত বা অনুমোদিত নিয়ম দ্বারা করাইবে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনি, আত্মকর্তৃত্ব ও আত্মপরিচালন-ক্ষমতাতেই মানব-জীবনের সাফল্য। এই জন্য, শাসনযন্ত্র যদি বিদেশীর সমষ্টি বা বিদেশী দ্বারা চালিত দেশী লোকদের সমষ্টি হয়, যদি তাহারা সবাই দক্ষ ও সৎলোক হয়, এবং যদি তাহাদের শাসনে দেশের লোকদের গ্রাসাচ্ছাদন চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষাদি বিষয়ে কোন অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলেও জাতীয় সন্তোষ জন্মিতে পারে না। কারণ নিজের কাজ নিজে করিবার ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতি-নিহিত; সে ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে তাহার জন্মই বৃথা। সুস্থপ্রকৃতির শিশু নিজে চলিতে গিয়া বার বার আছাড় খায়, তবু ক্রমাগত অন্যের হাত ধরিয়া চলিতে বা অন্যের কোলে থাকিতে চায় না।

ভাল শাসনপ্রণালীর ও শাসনযন্ত্রের আবশ্যক আরও এই জন্য যে, রামচন্দ্রের পর পুরুষানুক্রমে সিংহাসনে রামচন্দ্র রাজত্ব করেন না, মন্দ রাজার সংখ্যা মোটের উপর ভাল রাজার চেয়ে বেশী। এই হেতু শাসকের সাধুতার উপরই যদি সুশাসন নির্ভর করে, তাহা হইলে কোন কোন রাজার আমলে সুখ হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের আমলে না হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের মত শাসনপ্রণালীতে কিম্বা আমেরিকার মত শাসনপ্রণালীতে রাজা বা দেশপতির প্রকৃতির উপর দেশের সুখ দুঃখ বহুপরিমাণে নির্ভর করে না। শাসনপ্রণালী ভাল হইলে দেশের অবস্থা অপকর্ষের দিকে বেশী নীচে যাইতে পারে না; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী দেশের অবস্থাকে গড়ে অনেকটা ভালই রাখে।

শাসনকর্ত্তাকে রাজা, সম্রাট্, সুল্‌তান, নবাব, বাদ্‌শাহ, আদি যে নামই দেওয়া হউক, তিনি বাস্তবিক ভাল ও জনসাধারণের মঙ্গলকামী হইলে তাঁহার সদিচ্ছা ভাল শাসনযন্ত্রের ও শাসনপ্রণালীর আকার ধারণ করিবে, অর্থাৎ গণতন্ত্রই তাঁহার মনঃপূত হইবে; কেন না গণতন্ত্রে ব্যতীত জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব নাই, এবং জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ব্যতীত জাতীয় চরম কল্যাণ নাই; সুতরাং যিনি জাতির চরম-কল্যাণকামী শাসনকর্ত্তা হইবেন, তিনি জাতিকে গণতন্ত্র পাইতে উৎসুক করিবেন ও তাহারা গণতন্ত্র অর্জ্জন করিলে জানিবেন যে তাঁহার কল্যাণকামনা পূর্ণ হইয়াছে।

মণ্টেগু সাহেবের বড়লাট হওয়া সম্বন্ধে আমাদের মত কতকটা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তিনি বড়লাট হইয়া যদি তাঁহার ভারতসম্বন্ধীয় কোন কোন বক্তৃতায় প্রকাশিত আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে অশান্তি দূর হইতে পারে, এবং ভারতীয়গণ নিরুপদ্রবে গণতন্ত্র অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে পারে।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গিরীশ।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে।

C. DAY & SONS, CALCUTTA.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

এখন ও তখন

আজ আমরা একটা মহাযুগসন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি। য়ুরোপীয় মহাসমরের পর শান্তি স্থাপিত হ'য়ে জগতে একটা নবযুগ আস্‌ছে—অনেকেই সেই আশায় উৎফুল্ল হয়েছেন। আমরাও যে আশান্বিত হ'য়ে এই পরিবর্ত্তনের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি না এমন নয়। কিন্তু শুধু চেয়ে দেখায় লাভ কোথায় যদি এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে আমরা নবযুগকে বরণ ক'রে নিতে না পারি? তাই আজ বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে হবে এই সামঞ্জস্যস্থাপনের পথে আমাদের বাধা কি; বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে আমাদের জীবন যে-পথে চালিত হয়েছে তা এখন এই নূতন উষাপ্রকাশের অনুকূল অথবা প্রতিকূল।

আপনারা স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল" নামক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পাঠ ক'রে থাক্‌বেন। সে প্রবন্ধে তিনি নানাদিক থেকে সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা ক'রে দেখিয়েছেন। সেকালে ইংরেজী শিক্ষা করবার কি অদ্ভুত চেষ্টা দেখুন;—কখন কবিতা, কখন বা গানের আকারে ইংরেজী শব্দের বাংলা অর্থ বসিয়ে তখন ছাত্রদের মুখস্থ করান হ'ত; যথা—

পম্‌কিন্ লাউকুমড়া, কোকোম্বর শশা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লৌমেন্ চাষা॥

বসুমহাশয়ের "সেকাল ও একাল" থেকে আর-একটা বড় মজার কথা উদ্ধৃত কর্‌ছি।—একবার রথের দিন এক সরকার আফিস্ কামাই করে। পরদিন সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কাল আসনি কেন?" সরকার ভেবে আকুল! রথের ব্যাপার বুঝিয়ে দেয় কি ক'রে? তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো "চার্চ্চ" (church)। কিন্তু রথ চার্চ্চের মত হ'লেও ইটের তৈরী নয়। তাই সে পরক্ষণেই বল্‌লে "wooden church" অর্থাৎ কাঠের গির্জ্জা। ক্রমে আরও ব্যাখ্যা, নচেৎ মনের কথা মনেই থেকে যায়! তাই—"Three stories high," "God Almighty (জগন্নাথদেব) sit upon," "Lorg long rope," "Thousands men catch" "Pull, pull," "Run away, run away," "হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।" দেখুন তবে, সেকালের ইংরেজীনবীশ রথের ব্যাখ্যানটা বুঝিয়ে দিতে বাকী রাখ্‌লেন! কিন্তু এই 'সেকাল' ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগেকার কাল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপনের পর যে কাল এল সেই হচ্ছে বসু-মহাশয়ের 'একাল'। কিন্তু তাঁদের একাল আজ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমাদের কাছে পুরাকাল হ'য়ে গেছে। গত অর্দ্ধশতাব্দীকাল আমাদের দেশে এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ বল্‌লেই চলে। এ-যুগে ভাবে চিন্তায় ধর্ম্মে কর্ম্মে নূতন আদর্শের পরিকল্পনায় দেশে নানাদিকে নূতন স্রোত

প্রবাহিত হয়েছে, এ-যুগে সামাজিক রাজনৈতিক আর্থিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় অনেকপ্রকার ব্যাপারে দেশ বিবিধ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছে। আজ তাই "পঞ্চাশবৎসরে রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি"র কথা না ব'লে আমাদের জাতীয় উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে মাত্র দু'এক কথার আলোচনা করছি। ব্যবসায়ী একবৎসর অন্তর হিসাব-নিকাশ ক'রে নূতন খাতা করেন। জাতির জীবনের হিসাব-নিকাশ এত সহজ ব্যাপার না হ'লেও ৫০ বৎসর পরে আজ আমরা সকলেই একবার সেই উদ্দেশ্যে চেষ্টিত হ'য়ে আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।

পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে। বড় কথা ছেড়ে প্রথমে এই একটা সাধারণ কথা ধরা যাক। এই ধরুন মহানগরী কলিকাতার অবস্থা। তখন কলিকাতার রাস্তার দুধারে বড়-বড় পগার ছিল, সাঁকোর উপর দিয়ে তা পার হ'তে হ'ত। ধাক্কাধাক্কিতে গাড়ি কোচোয়ান্ কখন কখন সব একসঙ্গে পগারস্থ হ'ত—ঘোড়া টেনে তোলা যেত না। আর সে পয়ঃপ্রণালীতে যে জলধারা প্রবাহিত হ'ত তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে আজকালকার কলিকাতাবাসীকে অস্থির হ'য়ে উঠতে হবে। পিতার কাছে শুনেছি—ম্যাথর তখন গঙ্গায় ময়লা ঢালত! কথা শুনে হয়ত এখন অনেক "সুকেশিনী সীমন্তিনী" প্রাতঃস্নানের নামে চম্‌কে উঠবেন। কলের জল তখন সেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে, সহরে মহা আন্দোলন প'ড়ে গেল। নলের মুখে stop cock চামড়া দেওয়া আছে, তাই গোঁড়া হিন্দুর দল কলের জল ব্যবহার করবেন না ব'লে মহা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন। যা হোক্ কালধর্ম্মে বাদ বিচার এমন বদ্‌লে গেল যে আজ তাঁরাই আবার কলের জল বন্ধ হ'লে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন, রাগে ফুলে ওঠেন। সেকালে দুচারটা ইংরেজী বুলি জেনে আমলারা বড়-বড় কাজ চালিয়ে দিতেন; যে যতগুলি ইংরেজী বাক্য মনে রাখতে পারত তার বিদ্যার দৌড় তত বেশী ধরা হ'ত। কিন্তু একালে এম-এ-পাশকরা যুবককে চাকরীর বাজারে কি বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় তা সকলেই জানেন।

আমরা যে আজ সামাজিক ও আর্থিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ঘূর্ণীর মধ্যে পাক খাচ্ছি, তার সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে এই যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের মত আর আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নই; আজ এই বাষ্প-ও-তড়িৎশক্তির যুগে, এই রেল টেলিগ্রাফ ও জাহাজ প্রচলনের দিনে, নানাজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে আমরা আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছি। এ ঘাত-প্রতিঘাত এখন চলতেই থাকবে, এর বিরাম নেই। আমরা বেশ শান্তিতে ছিলাম। দেশের মাটিতে সোনা ফলত, আনন্দ ও প্রাচুর্য্যে দিনগুলো বেশ-সুখে-স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতো। কিন্তু আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই কয়েকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতি বুদ্ধি কৌশল রাজনীতি কূটনীতি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে আপনাদের চলন্ত ও ছুটন্ত জীবনের বিপুল চাঞ্চল্য এবং অদ্ভুত সঙ্ঘশক্তির উদ্দাম গতিবেগ নিয়ে অতি নির্ম্মমভাবে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমরা এখন ত্রাহি ত্রাহি ক'রে সাম্‌লাবার পথ খুঁজছি। এই সাম্‌লাবার চেষ্টায় আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ও বিকাশ। সমাজদেহের এক অঙ্গের পরিচালনা হ'লে মাত্র সেই অঙ্গেরই সৌষ্ঠব সাধিত হবে; অপরগুলি পঙ্গুত্বে নেমে গিয়ে অসাড় ও অচল হ'য়ে থাকবে। এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের দিনে যদি আমাদের চেষ্টা ও উৎসাহ তদনুরূপ ভয়ঙ্কর না হয়, যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ-প্রাণ অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে এই মহাসমস্যার মীমাংসায় নিয়োজিত না হয়, তবে পরাজয়ই আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত এবং এ-পরাজয়ের অর্থ জাতির মৃত্যু। পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বুদ্ধি কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে, জীবনসংগ্রামে তারাই টিকে যায়; আর নূতন-নূতন ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যারা অক্ষম হয়, কালে তাদেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। ভূস্তর খুঁড়ে এমন অনেক অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাদের বংশধর পৃথিবীতে এখন আর নেই। জীবন-সংগ্রামে টিকতে না পেরে এদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হ'তে মুছে গিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এমন কতকগুলি আদিম জাতি ছিল যারা প্রবল য়ুরোপীয় জাতির আঘাতে ও আওতায় দুর্ব্বল হ'য়ে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামও আমাদের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর কথা;

এর ফলাফলের উপর আমাদের মরণ বাঁচন নির্ভর করছে। সুতরাং আমাদের এখন এমন কর্ণধার চাই যাঁরা সমাজ শিক্ষা রাজনীতি অর্থনীতি স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পাকা হাতে হাল ধ'রে আমাদের সামাল ক'রে নিয়ে যেতে পারবেন। জাতি সকলদিকেই আগুয়ান হ'য়ে চলবে—এই তাঁদের মূলমন্ত্র হবে।

একটা লোকহাসানো কথা আছে—

লঙ্কার রাবণ ম'লো।
অহল্যা শোকে ডুবিল॥

কিন্তু এই হাসির কথা আজ পরম সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যে একটা মহা আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়েছে, সব জাতিই তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তাই য়ুরোপে অন্নাভাব হওয়ায় ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে টান ধরেছে। তাই য়ুরোপে যুদ্ধ হ'ল আর ভারতবাসী মারা গেল—সত্য কথা হ'য়ে গেছে। ভাত-কাপড়ের টানাটানি এমন আর কোনো-কালে হয়েছিল কি? Nature abhors vacuum—একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিরাজ্যে কোথাও একটু ফাঁক থাকবার জো নেই। বায়ুমণ্ডলের কোথাও যদি একটু বায়ু কোনো উপায়ে নিষ্কাশিত করে দেওয়া যায়, তবে তখনি অপরস্থানের বায়ু এসে তার স্থান পূরণ করে। মানবসমাজ সম্বন্ধেও আজ সেই নিয়ম খাটছে; একের অভাব অন্য পূরণ করছে। কিন্তু এই পূরণের কাজ যে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি, যাকে নিজের ঘরের ভাত বাধ্য হ'য়ে অথবা বুদ্ধির দোষে অপরের মুখে তুলে দিতে হচ্ছে, দুর্দ্দশা আজ তারই। সমস্ত পৃথিবীতে আজ ঘটনা-চক্র এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘূর্ণ্যমান যে এর ভিতরে অবস্থান ক'রে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে বিগত এক শত বৎসরে আমরা যে-সব কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে রীতিমত আয়াস স্বীকার করিনি, আজ তা এক বৎসরে সেরে নিতে হবে—নইলে রক্ষা নেই। মাঞ্চেষ্টার আগে ৪০।৫০ কোটি টাকার কাপড় উৎপন্ন ক'রে এ দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিত; আজ সেখানে মাত্র ১০।১২ কোটি টাকার কাপড় তৈরী হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশের কতটুকুই বা বোম্বাই পূরণ করতে পারছে? ধাক্কা সাম্‌লাতে হ'লে আমাদের এখন একদিনের নোটিশে অনেক কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

স্বদেশে বিদেশে এখন শোনা যায় যে—আমাদের একটা জাতীয় জাগরণ হয়েছে। এটা খুব বড় কথা—খুব লম্বা চওড়া কথা! কিন্তু জাগ্রত জাতিমাত্রেই যে সুবিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আপন-আপন শক্তি নিয়োজিত করছে, আমাদের সে কর্ম্মক্ষেত্র কোথায়? আমরা কি জাগরণের উপযুক্ত কাজ করতে প্রস্তুত আছি—আমরা কি নিজের পায়ে ভর দিয়ে সংসারপথে নির্ভয়ে চ'লে যাবার উদ্যোগ করেছি? অথবা এ জাগরণের পর শুধু কুম্ভকর্ণের দুর্দ্দশা—আমাদের জন্য গোপনে অপেক্ষা করছে এ পৃথিবীতে একবারে বেহুঁস হ'য়ে আমরা অনেক দিন কাটিয়ে দিয়েছি বেহুঁসের এ ঘুমভাঙ্গা কি সত্য ঘটনা? এ জাগরণে সত্য আছে—আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কোথায় কতটুকু জেগেছে, বিপুল এ জনসঙ্ঘ কোথায় কি পরিমাণে সাড়া দিয়েছে তা বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে শুধু—জেগেছি, জেগেছি, ব'লে চীৎকার করে আত্মপ্রতারণা করলে চলবে না। সক্রেটিস্ বলেছেন—কোনো বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করতে হ'লে—passion, prejudice, sloth এই তিনটি বর্জ্জন ক'রে অনুসন্ধান আরম্ভ করতে হয়। মনের যে দিকে বিশেষ ঝোঁক, আমাদের চিন্তাপ্রণালী যদি বিচার বিবেচনা না ক'রে সেই ঝোঁকের মুখে প্রবাহিত হয়, যদি আমরা আলস্য ও অন্ধসংস্কার বর্জ্জন ক'রে আমাদের আলোচনার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত না করি, তবে সকল বিষয়ের অন্তরের সত্যটুকু আমাদের কাছে চিরকাল গোপন থাকবে, আমরা কখনই তা উদ্ঘাটন ক'রে দেখতে সমর্থ হব না। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাল মন্দ যা কিছু সবই সাবধানে বিশ্লেষণ ক'রে পরিবর্ত্তিত ঘটনা-পরম্পরার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করতে হবে এবং ভবিষ্যতের গতি নির্দ্দেশ এই-সকল বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ—সব দেশে মানুষমাত্রেই আবহমান কাল প্রচলিত প্রথার দাস। সমাজমাত্রই স্থিতিশীল, কিন্তু আমাদের conservatismএ বিশেষত্ব আছে; পূর্ব্বপুরুষগণ যা ক'রে গিয়েছেন বর্ত্তমানে লোকে তাই মেনে চলতে ইচ্ছা করে, তা থেকে একচুল তফাৎ যেতে সাধারণতঃ তার ভরসা হয় না। অমর কয়েক

বৎসর ধরে ঠিক এক ভাবেই চলেছিলাম। বিগত কয়েক শতাব্দী ধ'রে আমাদের চিন্তা ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। তারপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তার চিন্তা ও কর্ম্মের সকল-রকম উপকরণ নিয়ে এসে সকল দিক থেকে আমাদের ধাক্কা দিলে। সে ধাক্কায় আমরা সাড়া দিলাম, আমাদের ঘুম ভাঙ্‌তে আরম্ভ হ'ল। চোখ চেয়ে দেখ্‌লাম সারা জগৎ জুড়ে বিবিধ ঘটনাপুঞ্জ আশ্চর্য্য গতিতে ছুটে চলেছে এবং তার ফলে সব দেশের মানুষের চিন্তায় কর্ম্মে ও সমাজে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে। এই-সকল আন্দোলনের তরঙ্গ একে একে আমাদের সমাজের উপর এসে পড়্‌ছে। এখন আমাদের সাম্‌লাতে হবে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই-সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন কর্‌তে হবে। আদালতের মত এরা নোটিশ দিয়ে আসে না—হটাৎ এসে পড়ে। তাই এখন আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব স্থির ক'রে নিতে হবে পুরাতনের কোন্‌টা আমরা বর্জ্জন কর্‌ব এবং নূতন থেকে কি কি অর্জ্জন ক'রে নেবো।

হিন্দুর মত খেতে শুতে উঠ্‌তে বস্‌তে জন্মাতে মর্‌তে এমন বাঁধাবাঁধির মধ্যে আর কোনো জাত আছে কি না জানি না। জন্ম হ'তে আরম্ভ ক'রে জাতক্রিয়াদি সংস্কার ইত্যাদি ধ'রে মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও কেবল শাস্ত্রের দোহাই। এ কাজ কর, ও কাজ কর, এটা মনু বল্‌ছেন, ওটা যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন, এগুলি পরাশর বা বৃহস্পতি আদেশ কর্‌ছেন; এখন বারবেলা, তখন কালবেলা; আজ বাহিরে গেলে সর্ব্বনাশ! কারণ ঐ রাক্ষসী তারা দুটী অশ্লেষা আর মঘা; ওই হাঁচি টিক্‌টিকি, গিরগিটি! চলা ফেরা, ওঠা বসায়, একি দারুণ বিড়ম্বনা! কিন্তু এত আগ্‌লেও আমরা সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌ছি কৈ? যমালয়ের দ্বার একেবারে খুলে গেছে, আর যমদূতগুলা নানা রোগের মূর্ত্তি ধ'রে এসে আমাদের টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসে যে-সব বিদেশীরা এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে সিন্দুক ভ'রে টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তাদের ওঠা বসা যাওয়া আসায় বারবেলা ও তিথিনক্ষত্রের কোনো শাসন নেই, তারা প্রত্যেক ব্যবহারেই স্ব-অধীন, তাই সর্ব্বত্র তারা স্বাধীন। নানা-প্রকার অদ্ভুত লোকাচারের চাপে আমরা পঙ্গু হ'য়ে আছি, অথচ বার বার তাদেরই মেনে চল্‌ছি। কিন্তু সেই সাগরপারের লোকেরা কেমন মুক্ত ও স্বচ্ছন্দগতি, অবাধ ও আত্মনির্ভর!

ভগবান বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের মানুষ ক'রে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; সুতরাং এ-সব কথা একবার আমাদের নিজে ভেবে দেখা উচিত। দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সমাজদেহের আধখানা ত অসাড় ও গতি-হীন হ'য়ে প'ড়ে আছে। আবার পুরুষদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, লোক-সংখ্যার অনুপাতে তারা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি জীবনযাত্রাকালে কোথাও জীবনের পরিচয় না দিয়ে সর্ব্ববিষয়ে পুরাতনের চাবুক খেয়ে পথ চলেন, তবে সে পথ তাঁদের মরণ পর্য্যন্তই পৌঁছে দেবে। কিন্তু মর্‌তে ত আমরা চাই না। তাই সমাজ ধর্ম্ম নীতি—সকল বিষয়েই যে-সব অন্ধসংস্কার বহু যুগ ধ'রে আমাদের হাড়ে হাড়ে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, তাদের উপ্‌ড়ে ফেলে প্রাচীনের মধ্যে যেখানে প্রাণ ছিল তার পরিচয় লাভ কর্‌তে হবে এবং সেই প্রাণের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচিত্র রূপে বিবিধ রসে ও অভিনব গন্ধে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। জীবন-বাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন যুগের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা কর্‌বার ভার যাদের উপর, কি দুঃসাহসে বুক বেঁধে, কোন্ দুরাশায় মুগ্ধ হয়ে, কোন্ সে দুর্গম পথে তাদের ছুট্‌তে হবে, হে তরুণের দল, সে কথা যদি একবার শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে চিন্তা ক'রে দেখ, তবেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে সে নূতন পথে পথিকের পাথেয় হচ্ছে অন্তর ও বাহিরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। বিশ্বাসের হোমানল অন্তরে জ্বেলে প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্বচ্ছন্দ আহুতি দানে যিনি বাহিরকে উজ্জ্বল প্রকাশমান ক'রে নিতে পার্‌বেন, তিনিই সে পথের যাত্রী। যারা কপটাচারী, যাদের মন মুখ এক নয়, সে পুণ্যপথে চলা ত দূরের কথা, তার সন্ধানই তারা পাবে না।

অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার ব্যবহার বিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি যা-কিছু সবই ভাল—এরূপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনের

খুব ঝোঁক, কোন-প্রকার সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনও আমলই দেবেন না। আমাদের দেশে জ্ঞাতসারেই হোক্ অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক্ অনেকেই মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে আমরা আর্য্যঋষিদের সন্তান; অতএব অন্য কোনো জাতির চিন্তা বা কর্ম্মপ্রণালী থেকে গ্রহণ করবার মত আমাদের কিছুই নেই,—আমরা সব-জান্তা, আমাদের সমাজ সকলদিকে পূর্ণবিকশিত হয়েছে। এইরূপ সংস্কার অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে আমরা এমন কূপমণ্ডুক হয়ে পড়েছি এবং আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি এমন বিলুপ্ত হয়েছে, যে, সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম যে কি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় আমাদের না থাকলেও, আমরা উঁচু গলায় সেই সনাতন ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়ে দেশের অনেক অকর্ম্ম কুকর্ম্ম কুরীতি ও কুপ্রথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু মানুষের রাজ্য হতে বিবেক ও বিচারশক্তিকে তাদের সিংহাসন চ্যুত নামিয়ে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিলে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনুষ্যত্বকে কি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত করা হয় না? অন্ধ গর্ব্বকে উচ্চ আসন দিলে শ্রেষ্ঠ গৌরব কি ধূলি-বিলুণ্ঠিত হয় না? য়ুরোপের ধর্ম্মরাজ্যে "ধর্ম্মগুরু পোপে"র অহঙ্কার যখন আকাশ স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা করছিল, ধর্ম্মের নামে যখন মানব-মনের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতি অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন য়ুরোপ হয়েছিল মূর্চ্ছিত। তারপর যখন মার্টিন লুথার পোপের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দিলেন তখন তাঁর অদ্ভুত মনীষার সোনার কাঠি স্পর্শে মূর্চ্ছিত য়ুরোপ চক্ষুরুন্মীলন করল, বিশাল বিশ্ব তার কাছে নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হ'ল; হৃদয়ে সে নূতনের আনন্দ-নৃত্য অনুভব করল। তাই বলি, পৃথিবীতে বাঁচতে হলে আমাদেরও বিবেক ও বিচারশক্তিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে চিরাগত অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্য কোনো পথে শ্রেয়ের সন্ধান মিলবে না।

এখন দেশের হাওয়া ক্রমে ফিরছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন কেশব সেন বিলাত গিয়েছেন; দেশের শিক্ষিত মহলে তখন একেশ্বরবাদের আলোচনা চলছে। রাজনীতিকদল তখন ছিল না, বল্‌লেই চলে। সে সময় ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল মুন্সেফি বা ডেপুটিগিরি। কিন্তু এখন আমাদের আশা অনেক বেড়ে গেছে, এখন আমরা "রিফর্ম্ম" পাচ্ছি। কয়েক বৎসর আগে গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় (Imperial Executive Council) একজন ভারত-বর্ষীয় সভ্য গ্রহণ করা হবে এরূপ স্থির হয়। লর্ড মর্লি তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে এই ঘটনাকে A breach in bureaucracy ব'লে উল্লেখ করেছেন। এখন ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় ভারতবর্ষীয় সভ্যের সংখ্যা একের স্থলে তিন হয়েছে। ব্যবস্থাপক সভায়ও সভ্যের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। যোগ্য ভারতবাসী এই-সকল সভায় সভ্য হবেন এবং ক্রমে তাঁরা "মিনিষ্টারে"র পদে উন্নীত হতে পারবেন এমন আশা থাকবে। আমাদের শাসন-ব্যাপারে কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের ভার বিশেষ ভাবে তাঁদেরই উপর এসে পড়বে (Transferred subjects)। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁদের কার্য্যের প্রসার যথেষ্টই হবে। আমাদেরই একজন লর্ড সিংহ আমাদেরই এক প্রদেশের গভর্ণর হয়ে আসছেন। এই রিফর্ম্ম ব্যাপারের ভাল-মন্দ বিচার আমি করছি না। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমি কেউ নই; আমি বৈজ্ঞানিক মাত্র। আমার কথা শুধু এই যে নানাদিকে দেশে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে; জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থার সমযোপ-যোগী পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এখন আমাদের সমানে পা ফেলে চলতে হবে এবং তার জন্যে নানাদিকে আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে—এই আমার প্রধান বক্তব্য।

দেশে নূতন যুগ আসছে। তাই আমাদের নূতন আয়োজনে অভিনব শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে বাস্তবিক। দেশে আমাদের একটা সাংঘাতিক দোষ এই যে আমরা সহজে ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চাই;—রীতিমত একটানা পরিশ্রম ক'রে কার্য্য সম্পাদন করতে হলে

আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে দেশের সহস্র কাজ আজ অসম্পন্ন অবস্থায় প'ড়ে আছে। এখন শুধু "চালাকির দ্বারা" এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবার কোনো আশা আছে কি? সফলতার ত কোনো বাঁধা পথ নেই। "আলালের ঘরের দুলালে"র ঠগচাচার মত "ও মুই তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে কেল্লা ফতে করব" ভাবলে কেল্লা ফতে হওয়া ত দূরের কথা, কর্ম্মের পথে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হবে না;—সম্ভব যা হবে সে শুধু কথার ফাঁকা আওয়াজ—যা আমাদের দুনিয়ার সাম্‌নে ঘাড় আরও হেঁট ক'রে দেবে মাত্র, মিঞা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বেঁধে লড়াই করবার সাধে যে অবস্থা হয়েছিল। এখন চাই কাজ;—চীৎকার বা চালাকিতে আর চল্‌বে না; মুখে ছিপি এঁটে কথা বন্ধ ক'রে স্থিরচিত্তে কাজের জন্যে দম্ নিতে হবে। "Everything great was achieved in solemn silence"—লোকচক্ষুর অন্তরালে স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে প্রকৃত মহৎকার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। আমরা বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। কিন্তু ভাবের মধ্যে গভীরতা নেই ব'লে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তা কলেজস্কোয়ারের গলাবাজীতেই নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল;—শিল্পোদ্ধারকল্পে একটাও আসল কাজের রীতিমত প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ১৮ লক্ষ টাকা নিয়ে "বঙ্গলক্ষ্মী" কি করেছে? কিন্তু এদিকে যুদ্ধের সুযোগে বোম্বাই কলওয়ালারা শতকরা দু তিন শ' টাকা লাভ দেখিয়েছেন। নাগপুরে "এম্‌প্রেস মিল" টাটার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। কিন্তু বিএ-এম্‌এ পাশ করে যাঁরা চীৎকার করেন,—তা বাঙ্গালীই হন আর মাদ্রাজী বা মারাঠাই হন—তাঁদের ঐ ৪০৲ ৫০৲ টাকার চাকরীই সম্বল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে অবসাদের কারণ নেই। কতকগুলি বিষয়ে আমরা যে কিছুপথ অগ্রসর হ'তে পেরেছি এইটেই নিঃসন্দেহ আশার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমরা যত কটাক্ষই করি না কেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বিদ্যা-শিক্ষার ফলে দেশে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হচ্ছে; ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ে স্বাধীন গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে সম্মানলাভ করা শুধু মুখস্থ বিদ্যার কর্ম্ম নয়—এ কথা অবশ্য অজ্ঞ কারও অবিদিত নেই। স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ক্রমে এমন সব তত্ত্ব বাহির হচ্ছে যা আমরা সগৌরবে অন্যদেশের সুমুখে দাখিল করতে পারি। নানা ঘটনাপরম্পরার সমবায়ে দেশে জাতীয় ভাব পুষ্টিলাভ করছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি ক্রমে ফুটে উঠ্‌ছে। পঞ্জাবের দুর্দ্দিনে ভারতের সকল স্থান থেকে ১৮।২০ হাজার সুশিক্ষিত লোক অমৃতসরে সমবেত হয়ে তাঁদের বেদনায় আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের দুঃখকে আপন দুঃখ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছেন। তোমরা ও আমরা আজ সেই একই ভারতমাতার সন্তান—এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে জাতীয় জীবন বিকাশলাভ করছে। আবার দুর্ভিক্ষ-বন্যা- ও ঝঞ্ঝাপীড়িত হতভাগ্য দেশবাসীকে নানা ভাবে সাহায্য করে সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা দেশের যুবকগণের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে। মহা সংক্রামক রোগ বা মহা বি[illegible] উপস্থিত হলে যখন সবাই আর্ত্তকে ফেলে পালায়, তখন এমন লোকও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যারা হাসিমুখে অকাতরে তাদের সেবা শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুল্‌ছে। প্লেগরোগ, বর্দ্ধমানে বন্যা ও পূর্ব্ববঙ্গে ঝড় তার প্রধান সাক্ষী। এই সেবাব্রত দেশে একটা খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। তাই আজ মনে হয় আমরা ধীরে ধীরে খাঁটি ও আসলের আদর করতে শিখ্‌ছি; অনেক চিন্তা ও ভাব বিপর্য্যয়ের পর, অনেক বিক্ষিপ্ত কর্ম্মচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী বিফলতার পর আজ দেশের সাধনা ক্রমে অন্তর্ম্মুখী হচ্ছে এবং দেশের চিন্তাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ সকলই আশার কথা।

এই সূত্রে মান্দ্রাজে "অব্রাহ্মণদের আন্দোলনের" কথা মনে পড়্‌ছে। ব্রাহ্মণই অব্রাহ্মণকে বরাবর ঘৃণা ক'রে এসেছেন। তাই রিফর্ম্ বিল পাশ হবার সময় থেকে অব্রাহ্মণ খুব সাবধানে আছেন।—পাছে এই সামান্য রাজনৈতিক সুবিধার সবটুকু ব্রাহ্মণ একচেটে ক'রে ফেলেন। কুপ্রথা হজম ক'রে আস্‌তে আস্‌তে আমাদের সমাজে এতটা নৈতিক অবনতি হয়েছে যে সামাজিক কুরীতির পরিবর্জ্জন সম্বন্ধে বুদ্ধির সায় (Intellectual

assent) থাক্‌লেও অন্তরের সাহসে আর কুলায় না "পারিয়া অস্পৃশ্য"—একথা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা শতবার অস্বীকার কর্‌লেও কার্য্যতঃ আচরণে আমরা একথা শতবার স্বীকারই করেছি। তাই অন্যের কাছ থেকে আপনাদের রাজনৈতিক অধিকার ভিক্ষা কর্‌লেও আপন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জনসাধারণকে আমরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। বিদেশীর নিকট আমরা যে অধিকার ভিক্ষা করি, ঠিক সেইরকম স্বদেশীর জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়ে তার উপর অত্যাচার কর্‌তে কুণ্ঠিত হই না। যাহোক, এই রিফর্‌ম্‌সূত্রে সকল শ্রেণীর লোককে ক্রমে মিল্‌তেই হবে। Creation of Electorate হচ্ছে রিফর্‌মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সকল স্থানের লোকেরই আপন-আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌বে। কাজেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাহিয্য নমঃশূদ্র সকল জাতির প্রতিনিধিকেই এখন ব্যবস্থাপক সভায় পাশাপাশি বস্‌তে হবে। এখন আর জাত ছুত বাছ্‌লে চল্‌বে না। আমরা এক দেশ-মাতার সন্তান সবাই এক—আজ পর্য্যন্ত যাদের অবজ্ঞা ক'রে এসেছি তাদের কোলে টেনে নিতে হবে; যাঁরা এতদিন দূরে স'রে ছিলেন তাঁদের জোর ক'রে বাধা সঙ্কোচ ঠেলে এগিয়ে আস্‌তে হবে। তার পরিণামে যদি সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য কর্‌তে হয় সেও ভাল। এমার্সন বলেছেন - "Heroism consists not only in facing cannon ball but also in facing social ostracism —কামানের গোলার মুখে দাঁড়ানোই কেবল বীরত্ব নয়, সমাজে একঘরে হওয়ার ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোও সমান বীরত্ব।"

বাঙ্গালীর সুখ্যাতি গোখ্‌লে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"What Bengal thinks today India thinks to-morrow"—বাঙ্‌লা আজ যা চিন্তা করে, সারা ভারতবর্ষ কাল সেই চিন্তা করে। বাঙ্গালীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়! কিন্তু লাট-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্র দেশের কাছে বাঙ্‌লা হার মেনেছে। গোখ্‌লে ঐ সভার সভ্য ছিলেন; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বর্ত্তমানে সভ্য আছেন এঁরা ধনী নন, কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম্মক্ষম। বাঙ্‌লা থেকে উপস্থিত যে-সকল প্রতিনিধি লাট-সভায় গিয়েছেন তাঁদের ধন আছে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে কোনো গুরুতর ব্যাপারের রীতিমত আলোচনা কর্‌বার শক্তি তাঁদের কম। বাঙ্‌লায় রাজারাজড়া না হ'লে মেম্বর হয় না; কিন্তু মাদ্রাজে ত নয়। বাঙ্‌লা এইখানে পশ্চাতে।

বাঙ্‌লায় এক অন্নসমস্যাই মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্‌লায় স্বাস্থ্যহানি উৎসাহহীনতা কর্ম্মবিমুখতা—এ-সকলের মূলে ঐ অন্নসমস্যা। পেট ভ'রে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে না পেলে বাঙ্গালী ক্রমে কাজের বাহির হ'য়ে পড়্‌বে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। তাই বলি, আজ আমাদের কড়া ও ঝাঁজালো বক্তৃতা ছেড়ে কাজের হাতেখড়ি হওয়া চাই। আর কথা নয়—এখন শুধু কাজ। কিন্তু যে কাজ সম্পাদন কর্‌তে পার্‌লে বাঙ্‌লার মহা সমস্যার মীমাংসা হবে, সে কাজের প্রেরণা বাহির থেকে এলে কোনমতে স্থায়ী হবে না। সে প্রেরণা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হ'তে আসা চাই। বাঙ্গালীর আত্মার জাগরণ চাই। আত্মিক শক্তির বলেই বাঙ্গালী তার জীবন-পথের সকল বাধাগুলি ঠেলে দিয়ে জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হ'তে পার্‌বে। তাই আজ আমাদের আত্মার মধ্যে শক্তির কেন্দ্র খুঁজে বার কর্‌তে হবে—সে কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে সেইখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পার্‌লে জীবনসংগ্রামে জয়লাভ হবেই হবে। *

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

অন্ন-সমস্যা

মোদকের হাতে রাঁধা রসে ভরপুর—
মেঠায়ের বেলা কারো সহেনা সবুর!
ভাত খেলে, বামুনের নাহি রহে জাত;
ভাতে আর মেঠায়েতে কতটা তফাৎ!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

* শ্রীমান রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, আমার মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ যথাযথ লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাহায্য করিয়াছেন।

নরবলি

নরবলির বহুল প্রচলন।

নরবলির প্রথা বহুকাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। বোধ হয় এরূপ কোনো সমাজ নাই যাহার কাব্যে পুরাণে বা কাহিনীতে কোনো-প্রকার নরবলির উল্লেখ একেবারেই পাওয়া যায় না। তুলনামূলক গবেষণার ফলে ইহাও একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে নিতান্ত বর্ব্বর সমাজ অপেক্ষা অর্দ্ধসভ্য সমাজেই ইহার প্রচলন সমধিক। দেবতার বা মৃতব্যক্তির আত্মার প্রীত্যর্থে নরবলি আধুনিক সভ্য সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। মানব-সমাজে নরবলির উৎপত্তি ও তাহার বহুল প্রচলনের কারণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমষ্টির হিতার্থে ও ব্যষ্টির হিতার্থে নরবলি।

সাধারণতঃ দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যে নরবলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যথা—

(১) সমাজের মঙ্গলার্থে, বা অকস্মাৎ কোনো প্রকার জাতীয় বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার আশায়।

(২) কোনোরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

নরমাংসভুক দেবতা।

প্রথমতঃ—"নরবলি দেবতার প্রীতিকর" এই বিশ্বাসের বশেই অধিকাংশ নরবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফিজি-দ্বীপপুঞ্জের আদিমনিবাসীগণের বিশ্বাস যে দেবতা নরমাংস ও নররক্তে তুষ্ট হইয়া থাকেন। নরমাংসভুক অসভ্যের মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট (anthropomorphic) দেবতার নরমাংস-লোলুপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এখনও সকল সমাজেই দেবতাকে মানুষ "আত্মবৎ সেবা" দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকে।

নিহত ব্যক্তি দেব-সেবক।

মেক্সিকোদেশের অসভ্য অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে যাহাকে দেবতার সমক্ষে বলি দেওয়া হয় সে পরলোকে দেবতার সেবক হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত তাহাদের ধারণা এই যে যে জাতি যত অধিক-সংখ্যক এইরূপ দেবসেবক পরলোকে পাঠাইতে পারে, অলসপ্রকৃতি দেবগণ সেই জাতির উপর তত অধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মধ্য আমেরিকার যুকাটান (Yucatan) প্রদেশের অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে যাহাকে বলিস্বরূপ প্রদান করা হয় তাহার পূত আত্মা পরলোকে গমন করিয়া দেবগণের নিকট সেই জাতির যাবতীয় অভাব অভিযোগ নিবেদন করিয়া থাকে। ইহা অনেকটা পরলোক-রূপ দেবরাজ্যে রাষ্ট্রদূত ambassador প্রেরণের ন্যায়।

জাতীয় বিপৎকালে নরবলি। সমষ্টির পরিবর্ত্তে ব্যষ্টি।

দ্বিতীয়তঃ—আর এক উদ্দেশ্যে বহু সমাজে নরবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। সমাজের বা জাতির কোনো আসন্ন অমঙ্গল আশঙ্কায় এই-প্রকার নরবলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেশ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত বা পরিবেষ্টিত হইলে, দেশে মারীভয় দুর্ভিক্ষ অজন্মা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি জলপ্লাবন ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি লোকক্ষয়কর দারুণ বিপত্তি ঘটিবার উপক্রম হইলে, দেবতার প্রীত্যর্থে বা ক্রোধ প্রশমনার্থে নরবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহা অনেকটা আমাদের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অনুরূপ। যখন বেশ বোঝা যাইতেছে যে দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন, ও অনেকগুলি প্রাণীর জীবনসংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, তখন তাঁহার প্রীত্যর্থে বহুপ্রাণীর পরিবর্ত্তে একটি বা কয়েকটি মানুষ বলি স্বরূপ প্রদান করিয়া তৃপ্ত করা ছাড়া অপর কি উপায় থাকিতে পারে? দেবতাও সম্ভবতঃ "A bird in the hand is worth two in the bush" এই নীতির অনুসরণ করিয়া ইহাতেই সন্তোষ লাভ করেন। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে "পরিবর্ত্তনীতি" (Principle of Substitution) এই আখ্যা দিয়াছেন। এই নীতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত সভ্যসমাজেও বিরল নহে। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত "দেবতার গ্রাস" কবিতায় কতিপয় নৌকারোহী গঙ্গাসাগর-যাত্রীর প্রাণরক্ষাকল্পে সাগরবক্ষে একজনের জীবনোৎসর্গ অতি করুণ রসে বর্ণিত হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট যে মানবজাতির মঙ্গলার্থে ক্রুশে আত্মবলি দিয়াছিলেন তাহাও এইরূপ মহামানবের হিতার্থে স্বেচ্ছায় একজনের আত্মত্যাগ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার নরবলিই সমাজের বা জাতির মঙ্গলার্থে আচরিত হইয়া থাকে। দেশ বা সমাজের মঙ্গল কামনায় অপরাধীর প্রাণদণ্ড, ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক-

গণের আত্মোৎসর্গরূপ আধুনিক সভ্যসমাজে প্রচলিত প্রথাদ্বয় 'পরিবর্ত্ত-নীতি'রই উদাহরণ। নরহন্তা মনুষ্য-সমাজের পরম শত্রু। এই শত্রুর অত্যাচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রাণদণ্ডরূপ শাস্তির প্রচলন হইয়াছে। সমাজের উপর সাধারণতঃ এইরূপ দণ্ডের নৈতিক ফল কি তাহা বিচার করিবার স্থল এ নয়।

ব্যক্তিগত মঙ্গলকামনায় নরবলি।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ট্যাহিটি (Tahiti) দ্বীপপুঞ্জের বলপতি সমাজপতি বা দেশনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কোনোপ্রকার সাংঘাতিক পীড়া হইলে দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এবং কোনো উচ্চপদস্থ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির প্রতি যদি দেবতা রুষ্ট হইয়া তাহার প্রাণগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই মূল্যবান জীবনের পরিবর্ত্তে অপর কোনো নগণ্য ব্যক্তির (ক্রীতদাস ইত্যাদির) প্রাণ দেবতাকে উৎসর্গ করিলে তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আমাদের দেশেও স্ত্রীলোকেরা স্বামীর বা পুত্রের দুঃসাধ্য পীড়া হইলে কালিকা-দেবীকে স্বীয় বক্ষশোণিত সহ পূজা দিবার মানসিক করিয়া থাকেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এ-সকল স্থলেও পূর্ব্বোক্ত 'পরিবর্ত্ত-নীতি' বা Principle of substitution বর্ত্তমান রহিয়াছে। বন্ধ্যাত্ব নিবারণের নিমিত্ত শিশুসন্তান বলিদান প্রথা বহুসমাজে প্রচলিত ছিল বা এখনও আছে। অপর কোনো ব্যক্তির শিশুসন্তানকে দেবসমীপে বলিদান করিলে অপুত্রবতীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে,—এ বিশ্বাসের মূল কি তাহা ভাল বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ এই যে, যে শিশুকে বলিদান করা হয়, সেই অনতিবিলম্বে বন্ধ্যা রমণীর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এ প্রথা এখনও পঞ্জাবপ্রদেশে কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত আছে, ও যথাসম্ভব গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে আপনার প্রথম সন্তানকে বলিদান করার প্রথা প্রচলিত হয়। বঙ্গদেশেও বন্ধ্যা রমণী প্রথম সন্তানকে দেবতাকে অর্পণ করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন, ও পরিশোধে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিতেন। এ প্রথা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে। সেদিন একটি স্ত্রীলোক মানত করিয়া তার প্রথম সন্তানকে কুম্ভীর-দেবতাকে বলিস্বরূপ দিয়া পুলিশের হাতে ধৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে।

বর্ম্মী ও দস্যুদিগের নরবলি।

অভিপ্রায়সিদ্ধি হইবার মানসে আমাদের দেশের দস্যুগণ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কালিকাদেবীর সমক্ষে নরবলি প্রদান করিত। বোধ হয়, দলে যাহারা নূতন প্রবেশ করিয়াছে তাহারা যাহাতে নররক্তে হস্ত রঞ্জিত করিতে সঙ্কুচিত না হয় সে জন্য নরবলি বা হত্যা যে দেবীর প্রীতিকর এই বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদের তৎকার্য্যে প্রণোদিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। ঠগীসম্প্রদায়েও নরহত্যা দেবীর প্রীতিকর এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল।

পূর্ত্তকার্য্যে নরবলি।

বৃহৎ অট্টালিকা বা প্রাসাদ নির্ম্মাণকালে তাহার ভিত্তি-স্থাপনের সময় নরবলি দানের প্রথা মধ্যযুগে ইউরোপেও প্রচলিত ছিল। জর্ম্মানদেশের ব্রেমেন নগরীর চতুঃসীমা-বেষ্টিত প্রাচীরের একাংশ খনন করিয়া তাহার ভিত্তিনিম্নে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। শ্যাম দেশেও এই প্রথার সবিশেষ প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী যুগে জীবিত মনুষ্যকে প্রোথিত না করিয়া মনুষ্যাকার পুত্তলিকা বা প্রতিমূর্ত্তি ভিত্তিনিম্নে প্রোথিত করা হইত। বর্ত্তমান সময়ে হাই-কোর্ট, টাউন হল, প্রভৃতি সরকারী সৌধসমূহের ভিত্তিস্থাপন কালে ভিত্তিনিম্নে যে (সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কিত) মুদ্রা দি প্রোথিত করা হয়, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রথার কোনো-রূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বিবেচ্য। অট্টালিকার নিম্নে জীবন্ত মনুষ্যকে প্রোথিত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই ব্যক্তির প্রেতাত্মা নিজের পরিত্যক্ত দেহ ছাড়িয়া কখনও অন্যত্র গমন করিবে না, ও অশরীরীরূপে সে সেই প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমাদের দেশেও ধনসম্পত্তির উপর এইরূপ "যক্" দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে বড় বড় নদীর উপর পুল বাঁধা দুঃসাধ্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস; আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় তাহা সুসাধ্য প্রমাণিত হইলে অজ্ঞ লোকে রটায় যে নরবলি দিয়া নদী-দেবতাকে তুষ্ট করা হইয়াছে। হাবড়ার পুল, হুগলির পুল, সায়া পুল প্রভৃতি নির্ম্মাণের সময় এইরূপ

রব উঠিয়াছিল। খুব সম্প্রতি খড়্গপুরে ছেলে বলি দেওয়ার হুজুকে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গেছে।

মৃতব্যক্তির উদ্দেশে নরবলি।

এ পর্য্যন্ত যত নরবলি প্রচলিত দেখা গেল তাহার সকলগুলিই দেবোদ্দেশে প্রদত্ত। অপর একপ্রকার নরবলি আছে যাহা পরলোকগত মানবের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পলিনেশীয়া, ও আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে মৃতব্যক্তির সৎকারকালে তাহার পত্নী, দাসী ও ক্রীতদাসদিগকে বলি দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। পাছে পরলোকে লোকাভাব বশতঃ মৃতব্যক্তিকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়, সেই আশঙ্কায় তাহার প্রিয়পরিজনকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সহমরণে গমন করিতেই হইত। জাপানে সম্রাটদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রিয় সভাসদ ও অমাত্যগণ অনেকেই স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেন। জাপানের সম্রাটের মৃত্যু হইলে সেনাপতি নোগী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার উৎপত্তির মূলেও এই বিশ্বাস ছিল।

নরবলির অপ্রচলন ও নরবলির রূপান্তর।

সভ্যতার বিস্তারের সহিত নরবলি ক্রমশঃ মানবসমাজে বিরল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেক সভ্যসমাজেই পূর্ব্বকালে প্রচলিত নরবলির চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার যুগে, দেবতারা যে নরবলিতে তৃপ্তিলাভ করেন ইহা কেহ বিশ্বাস করে না। নরবলি এখন ভক্তিরসের পরিবর্ত্তে বীভৎস রসেরই উদ্রেক করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিশ্বমানবের সাম্য ও মৈত্রী ভাব আধুনিক যুগে অনেকটা বিকাশ লাভ করিয়াছে। দয়া ও সহানুভূতি নরবলি প্রচলনের প্রধান অন্তরায়। সকল প্রাণীরই জীবিত থাকিবার অধিকার আছে ও তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা পাপ—ইহা আধুনিক সমাজে একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও বৈদিক যুগেই নরবলির পরিবর্ত্তে পশুবলি প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" প্রচারিত হইলে পর সকল-প্রকার বলিই নিষিদ্ধ হইয়া যায়। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে বলির প্রচলন হইলেও তাহাকে প্রতিক্রিয়ার যুগ (reactionary period) বলা যাইতে পারে। সমাজের উপর তাহার প্রভাব বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। নরবলি বর্ব্বর সমাজে মানুষের মনে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, নৈতিক উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আর তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই।

বর্ত্তমান কালে যে-সকল সমাজে নরবলি একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে, সেই-সকল সমাজের কতকগুলি আধুনিক আচার-ব্যবহারের মধ্যেও উক্ত অতীত প্রথার (নরবলির) চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বহুসমাজে নরবলির পরিবর্ত্তে কুশ, গোধূমচূর্ণ (ময়দা) বা মৃত্তিকানির্ম্মিত নরাকৃতি পুত্তলিকা দেবতাকে উৎসর্গ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কোনো কোনো সমাজে নরহত্যা না করিয়া দেবতাকে নররক্তে তুষ্ট করিবার চেষ্টা দেখা যায়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকেরা এইরূপে রক্ষাকালীর নিকট মানত করিয়া বুকের রক্ত দিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাকে 'পূর্ণের পরিবর্ত্তে আংশিকদান' (substitution of part for the whole) বলা যাইতে পারে। দেবতারাও বোধ হয় 'Half a loaf is better than no bread' এই উক্তি অনুসরণ করিয়া সমগ্র মনুষ্যদেহের পরিবর্ত্তে কয়েক ফোঁটা রক্তেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হন। টঙ্গা (Tonga) দ্বীপে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। ইহাও নরবলির রূপান্তর। ম্যারিনার সাহেব লিখিয়াছেন যে সে দেশে অতি অল্প লোকেরই কনিষ্ঠ অঙ্গুলি সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ও ইহুদি সমাজে প্রচলিত সুন্নত-প্রথার (circumcission) মূলেও এই ধারণা বর্ত্তমান। কিম্বদন্তী এইরূপ যে প্রয়াগাদি তীর্থক্ষেত্রে আধুনিক মস্তক-মুণ্ডন প্রথা পূর্ব্বের মস্তকদানরূপ লুপ্তপ্রথার চিহ্ন মাত্র। ক্রমে দেবতার সন্তোষসাধনের জন্য লোকে ঐরূপ স্বল্পপরিমাণ-ত্যাগস্বীকারেও সম্মত না হওয়ায় শেষে পশুবলি ও তৎপরে নারিকেল ইক্ষু ও কুমড়া বলির প্রচলন হইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

চিরন্তনী

(১১)

তারিণীকান্ত শীতের হাওয়া সাম্‌লাইতে না পারিয়া এবার শয্যা লইলেন। ছোট সংসারখানিকে ভয়ের একটা শিহরণ চঞ্চল করিয়া তুলিল। বয়স ত হইয়াছে, এইবার যদি ছুটি হয়? তবে যে জীর্ণ ঘরের দুর্ব্বল আশ্রয়টুকুও ঘুচিয়া যাইবে। চারিটি প্রাণীর মধ্যে কেহ কাহারও কাছে কথা তুলিত না বটে, কিন্তু একে অন্যের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিত কিসের চিন্তায় ছোটবড় সকলের মুখ ম্লান। রাত্রে বিছানায় শুইয়া অরুণা করুণাকে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিত যেন এখনি তাহার ওই দিদিটিকেও কোনো অদৃশ্য নিষ্ঠুর হস্ত টানিয়া লইবে। তারিণীকান্তের রোগশয্যার পাশে পরিচর্য্যা করিতে বসিলে তিনি যখন-তখন করুণার চোখের দিকে চোখ তুলিয়া হাত দুখানা চাপিয়া ধরিতেন। মুখে কথা না বলিলেও মনের কথা ধরা পড়িয়া যাইত। বাঙালীর ঘরের এতটুকু মেয়ে জীর্ণ অবলম্বনটুকুও হারাইয়া কি করিয়া দুইটি গ্রহ লইয়া সংসারে দাঁড়াইবে ভাবিতে ভাবিতে রোগশয্যা ছাড়িয়া বৃদ্ধের খাড়া হইয়া উঠিতে ইচ্ছা করিত। কিন্তু সামর্থ্য আর ছিল না। রণুও তাহার খেলা ফেলিয়া দিনে দশবার ঘরে আসিয়া প্রশ্ন করিত, "দাদা-মশায় একটু ভাল আছেন, না?" করুণার স্বল্প অবসরও কাজে কর্ম্মে আর ভাবনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন কামাই করিলে চলে না। মাসিক ত্রিশ টাকার যে শৃঙ্খল তাহার শরীরটাকে রোজ বাঁধিয়া লইয়া যাইত, মন তাহাতে কিছুতেই ধরা পড়িতে চাহিত না বলিয়া শরীর-মনের এই অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বে দুই ক্লান্ত হইয়া পড়িত। ক্লাশে পড়াইতে বসিয়া মনে হইত অরুণা হয়ত দাদামশায়ের ঔষধ দিতে ভুলিয়া শৈলজার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, হয়ত রুদ্ধকণ্ঠ বৃদ্ধের চোখের ইসারার অর্থ ভুল বুঝিতেছে, হয়ত বা নিশ্বাসের কষ্ট দেখিয়া ভয় পাইয়া আরো লেপ-কম্বলে চাপাচুপি দিয়া রোগীকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে; রণুর না জানি ডাক্তারকে কি বলিতে কি বলিয়া আসিতেছে। করুণার মনে হইত সে ছাড়া আর সকলেরই যেন বুদ্ধি-বিবেচনায় গোলমাল পাকাইয়া গিয়াছে। ঠিক কখন কোথায় কি রকম করিতে বলিতে হইবে তাহা একমাত্র যে জানে তাহাকেই কিনা একপাল নির্ব্বুদ্ধি মেয়েকে অকারণ বকিয়া মরিতে হইতেছে, আর এত বড় একটা কাজ যত শিশু আর অবিবেচক লোকের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইতে বসিতেছে। অবহেলায় ও ভুলে একটা প্রাণ গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু এই বোকা মেয়েগুলার সঙ্গে আজ না বকিয়া দুদিন পরে বকিলেও ক্ষতি বৃদ্ধি সমানই হইবে। ক্লাশের ছাত্রীরা এতদিন করুণারই মুখে তাহাদের অনেক প্রশংসা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়াছে; কিন্তু আজ ক'দিন যাহা-কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যায়, যাহা-কিছু বাহাদুরি দেখাইতে যায়, সব-তাতেই শাসনে, ভয়, সাতটা জন্ম লাভ করিলেও তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির একচুলও উন্নতি হইবে না, সুতরাং লেখাপড়ার চেষ্টা না করিয়া করুণাকে হাড় জুড়াইবার অবসর দেওয়াই তাহাদের উচিত। অবসর দেওয়া মেয়েদের হাতে ছিল না, কাজেই তাহারা করুণার আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া মনে মনে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া অকূলপাথারে ভুবিয়া মরিত; যাহাদের হাতে অবসর দিবার ক্ষমতা ছিল, তাহারা জানিত রোগ শোক জন্ম মৃত্যু বিবাহ আর মানুষের ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি জগতে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং সে বিষয়ে বেশী মাথা না ঘামানোই ভাল।

বাড়ীতে নিত্য ভাত পুড়িতে লাগিল, দুধ উথ্‌লাইয়া পড়িতে লাগিল, মাছ বিড়ালের উদরপোষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তারিণীকান্ত বিছানায় পড়িয়া সংসারিক অপচয়ের খবর শুনিতেন, ভাইবোনদের পরস্পরকে দোষী করিয়া দুঃখ নিবারণের চেষ্টা শুনিতেন, কিন্তু কোনো প্রতিকারই করিতে পারিতেন না।

সেদিন সকাল হইতেই মেঘলা করিয়াছিল, শীত বসন্ত বর্ষা সবাই যেন সেদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের পক্ষে সেটা বড়ই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপরে আকাশ-জোড়া কালো মেঘ, সূর্য্যদেবের দর্শনমাত্র নাই, নীচে দখিনা বাতাস যেন তুষার ছড়াইতেছে, বৃষ্টি পড়ি পড়ি করিয়া একবার থামিতেছে, একবার ঝরিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন মুখ অন্ধকার করিয়া কালো চাদর গায়ে মুড়ি দিয়া জড়োসড়ো

হইয়া বসিয়া শীতে কাঁপিতেছে। তারিণীকান্তের অবস্থা সেদিন বড়ই সঙ্কটাপন্ন। করুণা ত্রিশ টাকার ভাবনাটা দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া দশদিনের মধ্যেই আজ আবার কামাই করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে। ইস্কুলের গাড়ী কখন চলিয়া গিয়াছে, তাহার আসা-যাওয়ার শব্দটুকু মাত্র কানে শুনিয়া শৈলজা সুধাকে খবর দিতেছিল, "ধন্যি মেয়ে যাহোক বাপু, বুড়োটার যে অত অসুখ তবু একটু ভাবনা চিন্তা নেই, দিব্যি পাটভাঙ্গা শাড়ী জামা পরে দিনের পর দিন হট্‌হটিয়ে মাষ্টারি করতে যাওয়া হচ্ছে। টাকাই চিনেছে। আমি হলে বাপু প্রাণ ধরে বেরতে পারতাম না।"

সুধা বলিল, "আজ কিন্তু যায়নি মনে হল। খোকাটা ত ডেকে বল্‌লে আজ যাবে না।"

শৈলজা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ও, তা হবে! কিন্তু আজ না হয় একদিন কি ভাগ্যি বুড়োর কপাল ফিরেছে; রোজই ত দেখি সাত-তাড়াতাড়ি আগে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ছে। টাকার জন্যেই অত ভাবনা তাই বা কি করে বলি? আজ বাদে কাল ত ত্রিশ টাকা দিয়ে আয়া খান্‌সামাই রাখ্‌বে।"

সুধা বলিল, "তা রাখ্‌তে পারে, তাই বলে বিয়ে না হতেই ত আর তার টাকায় চাল ডাল কিন্‌তে পারে না।"

শৈলজা পরাজিত হইয়াও বলিল, "চাল ডাল না কিনুক, কি যে কিন্‌ছে না-কিন্‌ছে তা ত আমাদের জান্‌তে বাকি নেই। ভগবান আমাদের চোখ দিয়েছেন। ঢাক্‌ঢাক্-গুড়্‌গুড়্ কি আর আমরা বুঝি না। করে নিক্, করে নিক্; কটা রং আছে, তার জোরে জগৎ ভুলে যায়। দরকার কি বাপু আমাব পরের ঘরের কথায়। গরীব আছি, সাতজন্মও যদি গরীব থাকি তবুও ও-সব ঘোম্‌টার আড়ালে খেম্‌টা নাচ আমার দ্বারা হবে না।"

সুধা বলিল, "অত করে বোলো না, এখন ত নাচ্‌লেও কিছু মিল্‌বে না।"

শৈলজা জ্বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যদি সেই ধাতেরই মেয়ে হতাম, তবে আজ আর ত্রিসন্ধ্যে হাঁড়ি ঠেল্‌তাম না। যাই বাপু, আমার এখন অনেক কাজ আছে, তোর সঙ্গে বাজে বক্‌তে পারি না। শিশিরের বিয়েতে সকাল-সকাল যেতে হবে, ঘরকন্নার একটা ব্যবস্থা করিগে।"

শৈলজা ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল তেতলার সিঁড়িতে বসিয়া করুণা চোখের জল মুছিতেছে, শৈলজাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া নীচে নামিয়া গেল। শৈলজা একটু থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া নিজের ঘরে ঢুকিল, এবং বাক্‌স খুলিয়া মেঝেতে স্তূপ করিয়া কাপড় সাজাইতে লাগিল।

দিনটা সুবিধার ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া ভাড়াটে গাড়ীও দর চড়াইয়াছিল। কাজেই বিয়ে-বাড়ীতে যাইবার সময় পাছে গাড়ী না জোটে এবং জুটিলেও যদি অসম্ভব রকম ভাড়া চাহিয়া বসে, এই ভয়ে বাড়ীর কুচোকাচা ও স্ত্রীজাতীয়া যেখানে যে ছিলেন সকলেই সকাল-সকাল একখানা গাড়ী ডাকাইয়া ভাল করিয়া জানালা দরজা বন্ধ করিয়া গুড়ের হাঁড়ির মত কোনো রকমে ঠাসাঠাসি করিয়া সেইখানাতে চড়িয়া বসিয়া যাত্রা করিলেন। পুরুষের দলও নিতান্ত সকাল-সকাল না হইলেও একটু আগেভাগেই হাঁটিয়া পাড়ি দিলেন। বলা ত যায় না, কখন হঠাৎ মাথার উপর দেবতার কৃপাবারি বর্ষিয়া পড়িবে, এমন দিনে সন্ধ্যা-বেলা সে স্নানটা বিশেষ আরাম সম্ভবত দিবে না।

করুণা তারিণীকান্তের মাথার কাছে বসিয়া ভাবিতেছিল, এই বর্ত্তমানটা অতীতে ডুবিয়া যাইতে আর কতক্ষণ? এই যে সব খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত্তগুলি অতীত ভবিষ্যতে ছড়াইয়া থাকিলেও তার ছোট সংসারটুকুর সূত্র আশ্রয় করিয়া তার কাছে একটানা বর্ত্তমানরূপে দাঁড়াইয়া আছে, আর কটা দিন পরে জানি না সে সূত্র ছিঁড়িয়া পড়িবে, তাহাদের সুখ-দুঃখের এই সংসারের শেষে একটা দাঁড়ি পড়িয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া কেবল মনে বিভীষিকা জাগাইবে। এর পর তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে, কি করিবে, এই সব ভাবনা করুণাকে কেবলই ভয় দেখাইতেছিল। ভাবনাগুলা মনের উপর যত চাপিয়া বসিতে চাহিতেছিল, ততই তাহার মন অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল ওই ভাবনাগুলার কাঁধে চড়িয়াই যেন অমঙ্গল সংসারে আসিয়া ঢুকিবে, ওগুলাকে তাড়াইতে পারিলেই যেন তাহার সকল আশঙ্কার কারণ ঘুচিয়া যাইবে। চোখের সাম্‌নে যাহা সে দেখিতেছিল, তাহাই যে মনে এত দোলা দিতেছিল, ইহা জানিয়াও সে

মনের বিক্ষোভটাকেই কারণ ভাবিয়া চোখের দেখাটাকে চোখ বুজিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

তারিণীকান্ত এতক্ষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, হঠাৎ চোখ মেলিয়া হাত বাড়াইয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। করুণার ভাবনা ছুটিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি তারিণীকান্তের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারিণীকান্ত অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হাতখানা তুলিয়া তাহার গায়ে মাথায় বুলাইয়া বলিলেন, "নাঃ থাক্, দিদি, তুই বড় ছেলেমানুষ, বড় অসহায়।" কথাটা বলিয়াই বৃদ্ধ আবার মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

দাদা-মহাশয় কি যে বলিতে চান কিছুই না বুঝিয়া করুণা বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণীকান্ত কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আবার মুখ ফিরাইয়া করুণার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "দিদি, ডাক্তার কি বলে? একেবারে কি হাল ছেড়ে দিয়েছে?"

ডাক্তার যে হাল ছাড়ে নাই তাহা নয়। তবে মাস কয়েক কি বৎসর খানেক যে না টিঁকিতে পারেন এমন কথাও বলে নাই। এই সঙ্কটটা কাটিবে কি না, না দেখিয়া বলা শক্ত। করুণা কি বলিবে বুঝিতে পারিল না। দাদা-মহাশয়, যে কারণেই হোক, সংসারের মায়া যে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, এই কথাটাই তাহার মনে হইতেছিল। সংসার মানুষকে একদিন ছাড়িতেই হয়, কিন্তু সেই শেষ দিনটাকে মানুষ চিরকালই দূরে রাখিতে চায় একথা করুণা জানিত, তাহার দাদামহাশয়ও যে নিতান্ত মোহান্ধ এমন বিশ্বাসও করুণার ছিল না। তাই সে বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার মনের সকল কথা কেবল চোখের জলে গলিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তারিণীকান্তকে কোনো তত্ত্বকথা শুনাইবার সাধ্য তাহার ছিল না। করুণাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তারিণীকান্ত আবার ব্যস্ত হইয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিলেন, "বুড়ো বয়সে মরবার ভয় যে হাস্যকর তা কি আর আমি বুঝি না? তবু শেষ কাজ ত মানুষের আছে, শেষ কথাটা লুকিয়ে রাখা ভাল নয়।"

করুণার গলার স্বর বাহির হইতেছিল না, তবু সে বলিল, "ডাক্তার ঠিক কিছু বলেননি। এই ধাক্কাটা সাম্‌লে উঠ্‌লে তবে বলা যায়।"

তারিণীকান্তের মুখেও হাসি দেখা দিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সাম্‌লে উঠ্‌লে ত সবাই বল্‌তে পারে কিন্তু ন সাম্‌লালে ত শোন্‌বার কেউ থাক্‌বে না।"

এত কথা বলিতে যে তারিণীকান্তের কষ্ট হইতেছিল, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই করুণা বুঝিয়াছিল সে তাঁহার মুখের খুব কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "দাদামশায়, তোমার কি কাজ আছে বল না, আমি এখনি ক'র দিচ্ছি।"

তারিণীকান্ত অনেকক্ষণ ভাবিলেন, করুণার গায় সস্নেহে অনেকবার হাত বুলাইলেন, যেন সেই স্পর্শেই তিনি তাহার সকল বোঝা সকল দুঃখ মুছিয়া তুলিয়া লইতে চাহিতেছিলেন। ভূমিকা করিয়া বলিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না, কিন্তু একেবারে আসল কথাটাও তিনি পাড়িতে পারিতেছিলেন না। মনে মনে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন, "দিদি, যাবার সময় আর কিছু ত দিতে পারলাম না, শেষে এই বিষম দানের বোঝা তোর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বুড়ো বয়সে কিছু রেখে যাব মনে করে যা ছিল সব দিয়ে দুহাজার টাকা ঋণ সঞ্চয় করেছি। কিন্তু ভয় পাস্‌নে দিদি, আইনে এ ঋণ আমারই ঋণ, তোদের তার জন্যে কেউ ছুঁতে পারবে না। তবে পরের এতগুলো টাকা নষ্ট করে শেষ সময়ে শান্তি পাচ্ছি না, তাই না বলে থাক্‌তে পারলাম না। যদি কোনোদিন তোর সুদিন আসে, তবে একথা ভুলিস্ না, কিন্তু মনে রাখিস এ ঋণ তোকে স্পর্শ করতে পারে না।"

তারিণীকান্ত মাথার বালিশের তলায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। করুণা হাত দিয়া চাবিটা বাহির করিয়া কাঠের ছোট হাতবাক্সটা খুলিয়া আনিয়া ধরিল। তারিণীকান্ত দেখাইয়া দিলে কাগজপত্র বাহির করিয়া দেখিল দার্শনিক তারিণীকান্ত লুকাইয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া ধনী হইবার আশায় দুই হাজার টাকার ঋণজালে জড়াইয়াছেন। করুণা কাগজগুলা হাতে করিয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল হতাশায় বিষাদে আর চিন্তায় তাঁহার রোগক্লিষ্ট মুখে এমন একটা অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সেদিকে

চাহিয়া থাকা শক্ত। করুণার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল টপ্‌টপ্‌ করিয়া বিছানার উপর পড়িল। কাগজের তাড়া দিয়া কোনো রকমে চোখদুটা আড়াল করিয়া সে বলিল, "দাদা-মশায়, আমি তোমার ধার শোধ করে দেব। তোমার ধার আমি এখনি আমার করে নিচ্ছি। নিজের ধার হলে ত আমি ফেল্‌তে পারব না। তোমার ভয় কি? মনে কর না আমি তোমার নাত্‌নী নয় নাতি। ছেলে হলে কি তুমি তাকে এ ভার দিতে এত ভয় পেতে?"

দাদামহাশয় ম্লানহাসি হাসিলেন। ভাবিলেন ভয় পাইতেন না বটে, কিন্তু করুণা ত ছেলে হইয়া জন্মায় নাই। সে যে মেয়ে, তাহাকে যে তিনি নিতান্তই বাঙালীর ঘরের মেয়ের মত আপনা-আপনি মানুষ হইতে দিয়াছেন। ছেলের মত মানুষ করিয়া তুলিতে যাহাকে চেষ্টা করেন নাই, যাহার ভবিষ্যৎ নিতান্তই ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার ঘাড়ে ছেলের বোঝা কি করিয়া চাপাইয়া যাইবেন? নিজে যাহাকে দিবার বেলায় ছেলের পাওনা দিবার কথা কোনো দিন ভাবেনও নাই, আজ সে ছেলের ভার লইতে চাহিতেছে বলিয়াই তাহাকে দেওয়া চলে না। তারিণীকান্ত বলিলেন, "না, না, ওসব কিছু কোরো না। কচি মেয়ে না বুঝে অত বড় বোঝা ঝোঁকের মাথায় তুলে নিও না।"

করুণার জেদ চাপিয়াছিল। সে বলিল, "কেন? কচি মেয়ে কি মানুষ নয়? মেয়েকে অবিশ্বাস কর কেন? আমি যে ভার নিচ্ছি, তা আমি প্রাণ থাক্‌তে ফেল্‌ব না। তোমায় এর জন্যে কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

কিন্তু হবে না বলিলেই ত ভাবনা চলিয়া যায় না। করুণাকে কথাটা বলিয়া গোলমাল আরো বাড়িয়া গেল। দাদামহাশয়ের ঋণী হইয়া মরার দুঃখের উপর এই অবোধ মেয়ের দুঃসাহসের ভাবনা চাপিয়া দুঃখ আরোই বাড়িয়া উঠিল। মন আরোই অস্থির হইয়া উঠিলেও মুখে কথা কাটাকাটি করিবার শক্তি ছিল না। কাজেই তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। পাশের ঘরে অরুণা বই হাতে করিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া টুলের উপর বসিয়া ঘুমাইতেছিল। করুণা ছুটিয়া সে ঘরে গিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া তুলিয়া বলিল, "তুই একবার দাদামশায়ের কাছে যা্‌স্‌ ত, আমি একটু আস্‌ছি। একটু কাজ আছে, হয়ত দেরি হতে পারে।"

তারিণীকান্ত কি একটা বলিতে গেলেন, একবার হাতটা বাড়াইলেন, কিন্তু করুণা সেদিকে না তাকাইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

(১২)

করুণা দাদামহাশয়ের হাত বাড়ানো দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু যেন কিছু দেখে নাই এমন ভাবেই সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধের সেই হতাশ বিষণ্ণদৃষ্টি, মৃত্যুপথযাত্রীর অসমাপ্ত কাজটুকু শেষ করিয়া যাইবার সেই ব্যর্থ চেষ্টা ঘরের ভিতর করুণার মনে যে করুণার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহারই বলে সে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তারিণীর কোনো কথায় কি কাজে করুণার সংকল্প পাছে টুটিয়া যায়, তাই সে আর ফিরিয়া না তাকাইয়া মনের উত্তেজনাটা টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে কোনো রকমে একটা কিছু করিয়া ফেলিবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

সিঁড়ির সাম্‌নেই ঘরে ঢুকিবার পথে সরু খালির মত খানিকটা খোলা ছাদটায় আসিয়া পড়িতেই নিঃশব্দে এক ঝাপটা বৃষ্টির চূর্ণকণা তাহার মাথায় গায়ে ঝরিয়া পড়িল, তুষার-শীতল বাতাস তাহার উত্তেজিত দেহ-মনের উপর যেন একটা বরফের প্রলেপ দিয়া দিল, তারাহীন অন্ধকার আকাশ তাহার কালো মেঘগুলা দিয়া যেন করুণার দৃষ্টি-পথটুকুও ঢাকিয়া দাঁড়াইল। করুণা আশেপাশে চাহিয়া দেখিল ঘরে ঘরে তালাবন্ধ, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইতে গিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত পুরানো সিঁড়ির কোলে জমা ঠাণ্ডা কন্‌কনে খানিকটা জলের উপর ছোঁড়া চটটা সুদ্ধ ঝপ্‌ করিয়া পড়িল। আলোটার কথা মনে হইতে দেখিল সিঁড়ির গায়ের কুলুঙ্গির কেরোসিনের ডিবেটা ঝুর্‌ঝুরে বৃষ্টি আর ঝাপ্‌টা বাতাসের অবিশ্রাম আশীর্ব্বাদে কখন নিভিয়া গিয়াছে। মনের যে তাপটুকু মাত্র সম্বল করিয়া দরিদ্রের অসহায় মেয়েটি অসাধ্য সাধন করিবার ঝোঁকে আর কিছু না ভাবিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, প্রকৃতি যেন শতহস্তে নিঃসম্বলের সেই শেষ সম্বলটুকুও কাড়িয়া লইলেন। আড়ষ্ট

হইয়া দাঁড়াইয়া করুণা কিছু একটা ভাবিয়া ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ভাবনাও যেন আসিতে বিমুখ। করুণা ভাবিল, যদি এমন হইত যে এইদণ্ডে দুই হাজার টাকা না দিলে আমার মাথার উপর বজ্র ভাঙিয়া পড়িত, তবে কি করিতাম? মনকে এ বিভীষিকা দেখাইয়াও সে মনের কাছে কোনো সাড়া পাইল না। উদ্যত বজ্রের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাইয়া মন বলিল, জানি না, আমার যে কিছুই নাই। করুণা মনকে হাজার রকমে নাড়া দিতে চেষ্টা করিল, তবু পারিল না। শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জমিয়া যাইতেছিল, গলার কাছে কাপড়টা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া সে আরো সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল, বিলিতি সোনার চুলের মত সরু একটা চেনহার একটি পদকে তাহার পিতামাতার দুইগুচ্ছ চুল লইয়া তাহার বুকের উপর দুলিতেছিল। সেইটার উপর হাত পড়িতেই করুণার মনে হইল, এই ত সোনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল তাহার এই অমূল্য-নিধির মূল্য সংসারের বাজারে বিশ টাকাও হইবে না। করুণার ইচ্ছা করিতেছিল ছুটিয়া ঘরে গিয়া চোখ মুখ চাপা দিয়া শুইয়া পড়ে, নিবিড় অন্ধকারে যেটুকু আলো তাহার সংগ্রামকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, সেটুকুও অতল অন্ধকার তাহার সমস্ত সুখদুঃখের চেতনাকে ডুবাইয়া দিক। কিন্তু তাহা ত হইল না। কিছু করিতেই হইবে। তারিণী-কান্তের কথা মনে হইল, মনে হইল এ ঋণ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। তবে কেন? কেন মিথ্যা এত ভাবনা চিন্তা? কিন্তু সে যে কথা দিয়াছে, সে যে শেষ বিদায়ের দিনে তাহার দাদামশায়কে ঋণমুক্তির শান্তি দিতে চায়। হয়ত আর দেরী নাই, হয়ত ভাবিবার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কি লাভ?

করুণা নিজের বাড়ীর জনপ্রাণী কাহাকেও দেখিতে পাইল না, অত টাকা দিবার সাধ্যও এ বাড়ীর কোনো মানুষের ছিল না। অন্ধকারেই সে সিঁড়ি দিয়া নামিল। কোথায় যাইবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু মনে হইল পা বাড়াইলেই পথ মিলিবে মনে হইল জলে ডুবিয়া মরিবার সময় মানুষের বোধ হয় এমনি একটা অসহায় নিশ্চিন্ত ভাব আসে, এমনি করিয়া সে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, যা হবার হোক, শেষ ত হইবে এক সময়। করুণা বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। কোথায় যাইবে? জীবনে ত কোনো দিন সে এমন দুর্যোগের রাত্রে পথে পা দেয় নাই। দিনের আলোতেই বা সে ক-দিন একলা হাঁটিয়াছে?

চোখ তুলিয়া চাহিতেই করুণা দেখিল—অবিনাশের বাড়ীর দুতলার বৈদ্যুতিক আলো ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোকচক্রের মত উজ্জ্বল হইয়া আছে। এত অন্ধকারের ভিতর লালবাড়ীর সবুজ খড়খড়ির ভিতরকার আলোটা যেন করুণাকেই পথ দেখাইয়া হাসিয়া ডাকিতেছিল। অবিনাশের কথা করুণার মনে যে পড়ে নাই তাহা নহে, তবে সে জানিত অবিনাশ বিদেশে। সেই জানাটা ত তাহার একটা সান্ত্বনাও ছিল যে আজ অন্তত অগত্যির গতিরূপে শেষকালে অবিনাশকেই তাহার আশ্রয় করিতে হইবে না। কিন্তু আলোটার কাছে ছাড়া আর ত কোথাও যাইবার কথা তাহার মনে পড়িল না পড়িলেও আর বেশী দূর যাইতে পা উঠিল না। মনে হইল যদি একবার ওই বাড়ীতে, শতদল আছে, আর কিছু না হোক একটা মানুষের কাছে মনের কথা বলাতেও যে অনেক সাহস, অনেক সম্বল, অনেক উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

বৃষ্টি তখনও মিহি ময়দার গুঁড়ার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। করুণার কাপড়-চোপড় চুলে মুক্তামালার মত ছোট ছোট জলকণার মালা তাহাকে চারিধার দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। করুণা কোনো দিকে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া অবিনাশের বাড়ীর সামনের বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল। নীচের ঘরে অসময়ে আলো জ্বলে না, কিন্তু আজ জ্বলিতেছিল। করুণার শাদা কাপড় জামা, শাল থেকে জলের মালার উপর আলো প্রতিফলিত হইয়া ঘরে গিয়া পড়িল। করুণা দুই সিঁড়ি উঠিতে না উঠিতে শুনিল, অবিনাশ বিস্মিত হইয়া তীব্র মধুর সুরে ডাকিতেছে, "করুণা!"

করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "একি! করুণা, রাত্রে এই ঝড়ে বৃষ্টিতে যে—"

করুণা থতমত খাইয়া বলিল, "আমার কাজ আছে।"

আরো কাছে আসিয়া করুণার শালখানা ভিজে

"ইস্! সব ভিজে গেছে। নিউমোনিয়া হবে ত?"

পা পিছাইয়া আর-এক সিঁড়ি উঠিয়া বলিল, "না, আমার কিছু হবে না, আপনি ছেড়ে দিন।"

অবিনাশ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ নাকি? এস এই ঘরে, ওটা ফেলে দিয়ে এই কম্বলটা জড়িয়ে বোসো।"

অবিনাশের হুকুম ঠেলিয়া ফেলিবার মত শক্তি আজ করুণার ছিল না। আজ তাহাকে সবকিছুই অন্যে করাইয়া লইলে নিজের ভাবনা চিন্তা নিশ্চিন্ত মনে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়াই যেন সে বাঁচিত। সে আবার সিঁড়ি দুইটা নামিয়া ঘরে ঢুকিয়া অবিনাশের কথামত ঠিকঠাক হইয়া বসিল ঘরের উজ্জ্বল আলো, ঝক্‌ঝকে চেহারা আর অবিনাশের উগ্র বিস্ময় আর আনন্দ যেন করুণার শরীর মনের হিমের বাঁধনগুলা খুলিয়া দিল। সে আবার তাড়াতাড়ি খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, "শতদল কোথায়? আমি তার কাছে যাই।"

অবিনাশ ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, আমি কি তোমায় খেয়ে ফেল্‌ছি নাকি? এই দুর্যোগের রাত্রে তোমার কি এমন কাজ আছে যা শতদলের মত একটা জড়পুঁটুলি করতে পারে, আর আমি কি এমনই শ্মশানের মড়া যে আমি তা করতে পারি না?"

এই কর্কশ উপমাটা করুণার মনে চকিতের মধ্যে তারিণীকান্তের মৃত্যুপাণ্ডুর মুখখানা জাগাইয়া তুলিল। স্নায়ুগুলার উপর জোর এইসব দ্বন্দ্বে তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছিল, সে চোখের জল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। করুণার চোখে জল দেখিয়া অবিনাশের রুক্ষ মেজাজ নরম হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া করুণার হাতখানা ধরিয়া বলিল, "কি হয়েছে, কাঁদ্‌ছ কেন? ঝড়ে বৃষ্টিতে এইমাত্র বিদেশ থেকে এসে আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে; আসল কথাটা ভুলে যা-তা বক্‌ছি। কারুর অসুখ করেছে? চল, এখনি আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

করুণা হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "দাদামশায় বোধ হয় আর বেশীদিন—কিন্তু তাঁর জন্যে এখন যাবার দরকার নেই।"

অবিনাশ বলিল, "অসুখ করেছে ত? ডাক্তার ত অসুখের সময় গিয়েই থাকে। তুমি আবার কি নূতন শাস্ত্র বের করেছ?"

করুণা দাদামহাশয়ের নাম করিয়াই থামিয়া গিয়াছিল। নামটা করার পর তাহার মনে হইল, যাহাকে ঋণমুক্ত করিতে চায় তাহাকেই আবার জড়ায় কেন? ঋণ যদি তারিণীকান্তেরই থাকে তবে যাহার কাছে আছে তাহার কাছে থাকার চেয়ে অন্যের কাছে থাকায় বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। তাই খানিকক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "আমি সে জন্যে আসিনি; আমার অন্য কাজ আছে।"

অবিনাশ আরো বিস্মিত হইয়া বলিল, "আজ তোমার হয়েছে কি? কি কাজ বলে ফেল না। আমি হয়ত একটু-আধটু সাহায্য করে উঠ্‌তেও পারি।"

করুণা চকিতের মধ্যে ভাবিয়া দেখিল, সত্য বলিতে গেলে অবিনাশ ছাড়া তাহার একাজে আর কেহই সহজে সাহায্য করিবে না। করিলেও তেমন লোক খুঁজিয়া পাইতে অনেক দেরী। সে ব্যাধতাড়িতা হরিণীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার মত নিজেকে আর অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার সময় না দিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল, "আমার দু হাজার টাকার দরকার"

অবিনাশ বলিল, "দু হাজার টাকা! রাত দুপুরে কি হবে! আর আমি থাকতে শতদলকেই বা তুমি এত বড় মহাজন ঠিক করলে কেন? তা যাক্, অত টাকা দিয়ে তুমি করবে কি?"

করুণার মুখের কথাটা সে ঠিক যেমন ভাবে বলিতে চাহিয়াছিল তেমন ভাবে না বাহির হইয়া কেমন যেন উল্টা-পাল্টা হইয়া গেল। সে বলিল, "আমি ধার চাইছি দরকার আছে বলে। আমায় এতদিন দেখেও কি বিশ্বাস করে দু হাজার টাকা আমার হাতে দিতে পারেন না?"

অবিনাশের রুক্ষ চেহারায় ভাবের উচ্ছ্বাসটা অত্যন্ত বেমানান দেখাইলেও সে করুণার মুখের উপর ব্যাকুল দুই চোখ তুলিয়া বলিল, "তুমি যদি চাইতে তা হলে একদিন দেখেই তোমায় আমার সব কিছু দিয়ে দিতে পারতাম।"

অবিনাশের কথার অর্থ বুঝিতে করুণার দেরী হইল না। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই এত পরিষ্কার

কথাটারও অর্থ ঘুরাইয়া দিবার জন্ত সে দক্ষ সড়কিবাজের মত সজাগ হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনার বিশ্বাসকে ধন্যবাদ আপনি যে একদিনেই মানুষকে অতখানি চিনে ফেলেন তা জান্‌তাম না! তবে আমার মত কাঙাল গরীবের আপাততঃ অত টাকার দরকার নেই। আমার সাধ্যে অত ঋণ শোধ এ জন্মে সম্ভব নয়।"

করুণা এই কয়টা কথা বলিতেই লাল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এত চেষ্টার ফলের উত্তরটাও মোটেই খাড়া তলোয়ারের মত অবিনাশের কথার মুখ ফিরাইতে পারিবে না বুঝিয়া সে আরোই বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। অবিনাশ এখনি আবার কি বলিয়া বসিবে এই ভয়ে করুণা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকেই ধীরে ধীরে পা বাড়াইতে লাগিল। অবিনাশ তাড়াতাড়ি সাম্‌নে আসিয়া দরজার চৌকাঠের উপরেই দাঁড়াইয়া বলিল, "আঃ, যাবার জন্তে এত ব্যস্ত কেন? টাকা চাইতে এসেও কৃপা করে দুণ্ড দাঁড়াতে পার না? তবু ত মহাজন সর্ব্বস্ব খত লিখে দিতে ব্যস্ত! করুণার অভাজনের উপরেও করুণা হওয়া উচিত।"

মহাজনের এত উৎসাহ আর আগ্রহ দেখিয়া এবং তাহার কথায় নিজের যথাযথ অবস্থাটা বুঝিয়া করুণা কি যে উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে আসিয়াছে ভিক্ষা করিতে, দাতার কাছে মাথা আজ নত করিবারই তাহার কথা। অবিনাশ করুণাকে নির্ব্বাক দেখিয়া কি ভাবিল জানি না, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া টেবিলের কাছে গিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিয়া বলিল, "চেক, না নগদ?"

করুণা বলিল, "নগদ।"

অবিনাশ একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, "ঘাড় টাকা ত একসঙ্গে নেই। বিদেশ থেকে ঘুরে এলাম, তাই তবু হাতে হাজার দেড়েক রয়েছে। আচ্ছা, বাকিটা কাল পাঠিয়ে দেব এখন।"

করুণা হাত বাড়াইয়া নোটের তাড়াটা লইয়া বলিল, "পাঠাতে হবে না, আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যে সব টাকাগুলো আজ ছিল না। কিন্তু কিসের জন্তে তোমার টাকার এত দরকার সেটুকু জান্‌বার অধিকারও কি দাতার নেই।"

ধার করিতেই করুণা আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার এমন কিছু সম্পত্তি ছিল না যাহা দেখিয়া আর কোনও মানুষ শুধু মুখের কথায় দুই হাজার টাকা তাহাকে দিয়া দিত। সুতরাং করুণা কথায় ও কাজে সেটাকে ঋণ বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিনাশের দাতা নামটায় এবং তাহার দাবীটায় খুব জোরের সঙ্গে আপত্তি করিতে সে পারিল না। করুণা বলিল, "সেটা এখন বল্‌তে পারব না, তবে এইটুকু জান্‌বেন যে এর সঙ্গে আমার বাড়ীর লোকের কি বাইরের কারুর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কেবলমাত্র আমার কাজ। এর জন্তে যা কিছু বলা দরকার তা কেবল আমাকেই বল্‌বেন।"

অবিনাশ করুণার চোখের দিকে তাকাইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "আর কারুর জন্তে আমি অত ব্যস্ত নই।"

করুণা তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া যেন কথাটা শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে বলিল, "কোথায় কি সই করতে হবে বলে দিন। আমি আর দেরী করতে পারব না।"

অবিনাশ বলিল, "তোমায় টাকা দিয়ে কি আমি আদালতে আদায় করতে যাব নাকি যে সই রাখতে হবে? করুণা, তুমি যে এইটুকুও বোঝ না, এ আমার বিশ্বাস হয় না।"

কাগজ-পত্রের হাঙ্গাম করিয়া ব্যাপারটাকে বেশী প্রকাণ্ড করিতে হইবে না মনে করিয়া করুণা একটু আরাম বোধ করিতেছিল, কিন্তু কোনো কিছু বন্ধনে নিজেকে না বাঁধিয়া অবিনাশের কাছে শুধু-হাতে অতগুলি টাকা লইয়া যাইতে তাহার কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল। অবিনাশ তাহার কে, যে, অমন বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার টাকা লইয়া সে চলিয়া যাইবে? অবিনাশ তাহাকে যা বুঝাইতে চায়, সেইটা যদি সত্যই সে না বুঝিত তবে হয়ত না এমন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু সে বুঝিয়া-সুঝিয়া অম্লান বদনে যায় কি করিয়া? করুণা কি বন্ধক দিবে ভাবিল। ভাবিয়া দেখিল ওই পদকটুকু ছাড়া তাহার তেমন কিছু নাই। জিনিষটা সামান্ত হইলেও তাহার কাছে সেটার যে দাম তাহাতে বন্ধক দেওয়া এক হিসাবে চলে বটে। করুণা চট্ করিয়া গলায় হাত দিয়া সরু হারটা খুলিয়া বলিল, "আপনি আমার বিশ্বাস করে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি অমনি নিতে চাই না। আমি যা বন্ধক রেখে

যাচ্ছি, তার মূল্য আমার কাছে সব দলিলের চেয়ে বড়। এই নিন এই সোনাটুকুর মধ্যে আমার মা-বাবার শেষচিহ্ন দুই গোছা চুল আছে। এর চেয়ে ঋণশোধের বড় প্রতিশ্রুতি কেউ দিতে পারে না বোধ হয়।"

হারটা অবিনাশের টেবিলের উপর রাখিয়াই করুণা বাহির হইয়া পড়িল। ছোট অলঙ্কারটুকু তুলিয়া ধরিয়া অবিনাশ দেখিল একগাছি সোনার চুলের মতই সরু একটি হার। অলঙ্কারের চেহারা দেখিয়া তাহার হাসি পাইল। করুণার কাছে তাহার যা দাম অবিনাশের মনোরাজ্যে সে-সবের কোনো ঝঞ্ঝাট কোনো কালেই ছিল না। সে হারটা হাতে করিয়া কি ভাবিল। তারপর উঠিয়া দেখিল করুণা ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার আসল কথাটার দিকে একবার হেলাভরেও না চাহিয়া করুণা এমন নিশ্চিন্তভাব দেখাইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া রাগে অবিনাশের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "করুণা, দুহাজার টাকা কি এই একগাছি সোনার চুল আর দুগাছি মানুষের চুলে বাঁধা যায়? তুমি রোজ ইস্কুলের অতগুলো মেয়েকে যে বিদ্যে গেলাতে যাও, কোন্ জিনিষের কত দাম তা তুমি নিশ্চয় বোঝ। যতই ছেলেমানুষি দেখাও, ছেলেমানুষ যে তুমি নও এ কথা নিশ্চয় তোমায় বলে দিতে হবে না।"

করুণা এবারে কথাটা সত্যই বোঝে নাই। সে তাহার অমূল্য অলঙ্কারটির তুচ্ছ সাংসারিক মূল্যের কথা স্মরণ করিয়া অবিনাশের এই কঠোর আঘাতে অপমানে লাল হইয়া উঠিল। অবিনাশ কি তাহার মৃত পিতামাতার স্মৃতিকেও এমন করিয়া অপমান করিতে চায়? করুণার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। গায়ের জোরে কথাগুলাকে যেন টানিয়া বাহির করিয়া সে বলিল, "আপনি কি বলতে চান, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। হারটার দাম যে দুহাজার টাকা নয় তা ত আমি জানিই। কিন্তু ওই স্মৃতিচিহ্নটুকু যতদিন বন্ধক থাকবে ততদিন আমার ঋণ আমি এক নিমেষের জন্যেও ভুলতে পারব না,—মনে করেই ওটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। তবে আপনার দয়ার ঋণ আমি আজন্ম চেষ্টা করলেও শোধ দিতে পারব না নিশ্চয়, সেই জন্যে তার কথা না তোলাই ভাল।"

অবিনাশ প্রায় মুখ ভেংচাইয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "কে তোমাকে অত বক্তৃতা করতে অনুরোধ করছে?" তারপর হঠাৎ আরো সরিয়া আসিয়া করুণার হাত দুখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "করুণা, সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ জানি, কিন্তু তাই বলে কি চিরকালই তুমি আমার সঙ্গে কথার মার-পেঁচ খেলবে? এখনও কি যথেষ্ট হয়নি? ওসব আর আমার ভাল লাগে না। পৃথিবীতে সব জিনিষেরই দাম আছে, কারণ আছে, এ কথা তুমি জান। তবে এই যে আমি মাসের পর মাস কাজকর্ম্ম ফেলে একটা হাংলা কুকুরের মত তোমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই যে তোমার সাম্‌নে লাখ্‌পতির মেয়েদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছি, বাঁদরনাচের বাঁদরের মত তোমার কথায় উঠ্‌ছি বস্‌ছি; একি তোমার ওই পেতলের সুতোটা বন্ধক রাখ্‌বার জন্যে, না তোমার বক্তৃতা শোন্‌বার জন্যে, না তোমার নিরাকার কৃতজ্ঞতার গঙ্গায় হাবুডুবু খাবার জন্যে? কাব্যগ্রন্থের বাছা বাছা কথা আমি জানি না বটে, কিন্তু আমার এতদিনের এত ত্যাগ এত কষ্ট স্বীকারেরও ত একটা দাম আছে!"

করুণার শীতে আড়ষ্ট শরীর যেন জমিয়া পাথর হইয়া যাইতেছিল। অবিনাশের শক্ত মুঠার মধ্যে হাতদুখানা তাহার বরফ হইয়া গিয়াছিল। নোটের তাড়াগুলা যে কখন্ খসিয়া হাত ছাড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছিল তাহা সে টেরই পায় নাই। অনেকদিন হইতেই সে এসব কথার ঝড় আশঙ্কা করিয়াছিল, কিন্তু আজ যে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে সে পড়িয়াছে, তাহার উপরে দ্বিতীয় চোটটা সাম্‌লান তাহার পক্ষে শক্ত। কি ভাবিবে, কি উত্তর দিবে, সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকার নিষ্ঠুর মূর্ত্তি তাহার হিমশীতল কঠিন স্পর্শে করুণার ভাবনা চিন্তা সব একটা বিরাট জড়স্তূপ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর এই মৃত্যুই যেন তাহাকে দুই নৌকায় একসঙ্গে পা দেওয়াইতেছে। করুণার মুখে কথা নাই দেখিয়া অবিনাশ তাহার হাতে একটা ঝাঁকুড়ানি দিয়া বলিল, "করুণা, এখনও কি ভান করবে? কথার উত্তর দাও। রাত অনেক হয়েছে।"

করুণার চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। সে এক

ঝট্‌কায় হাত দুখানা ছাড়াইয়া বলিল, "অবিনাশ-বাবু, আমার দাদামশায় এতক্ষণ আছেন কি নেই জানি না, আমার কি এখন কথা বল্‌বার সময়?" করুণা হুহুন্ করিয়া বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভিতর দিয়া ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

অবিনাশ আজ ব্যস্ত হইয়া ছাতা কি আলো দিতে গেল না। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া আবার হাতের সেই হারটার দিকে তাকাইল। পদকটায় করুণার নাম লেখা ছিল। অবিনাশ বলিল, "কৃষ্ণের অভাবে তুলসী-পাতায় কৃষ্ণনাম লিখে কাজ চলে। আপাততঃ করুণার অভাবে এই সোনার অক্ষর কটাই রইল।" করুণাকে শুনাইবার জন্য বলা হইলেও কথাগুলা করুণা শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না। অন্ধকারে যখন আর কিছু দেখা যাইতেছিল না তখন মুখ ফিরাইয়া মাটিতে সজোরে দুইবার পা ঠুকিয়া ইংরেজিতে কি একটা অকথ্য কথা বলিয়া অবিনাশ ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল নোটগুলা মার্ব্বেলের মেঝের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। নিতান্ত ভালোমানুষের মত সে নোট কয়খানা গুনিয়া কুড়াইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশান্তা দেবী।

বৈদিক সমিতিতে নারীর স্থান

বৈদিক যুগে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-জাতির কি প্রকার অধিকার ছিল, অদ্য সেই বিষয়ে দুই-একটি কথা বলা যাইবে।

অথর্ব্ববেদে এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়:—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী
যথাসো বশিনী;
ত্বম্ বিদথমাবদাসি। ১৪।১।২০

বিবাহের পর কন্যা স্বামীগৃহে যাইতেছে। সেই সময়ে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে:—

"গৃহে গমন কর, গৃহপত্নী হও। ক্ষমতাশালিনী হইয়া সমিতিতে বলিবে অর্থাৎ নিজ মতামত প্রকাশ করিবে।"

ইহার পরের মন্ত্রে আছে:—

জির্বি বিদথম্ আবদাসি। ১৪।১।২১

অর্থাৎ "বৃদ্ধবয়সে সমিতিতে নিজ মত প্রকাশ করিবে।"

"বিদথ" শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' 'উপদেশ' 'আদেশ' 'সভা' 'সমিতি' 'যুদ্ধ' ইত্যাদি। কেহ-কেহ বলিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে 'বিদথম্ আবদাসি' অংশের অর্থ "উপদেশ দিবে" বা 'জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিবে'। আমাদিগের মনে হয় এস্থলে 'বিদথ' শব্দের অর্থ 'সভা' বা 'সমিতি'। ঐ অথর্ব্ববেদেরই একস্থলে আছে:—

'বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ। ১৮।৩।২৪

'বিদথ' শব্দের সপ্তমীতে 'বিদথে'। এস্থলে 'বিদথে' শব্দের অর্থ যে 'সভায়' বা 'সমিতিতে' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'বদেম বিদথে'='সভায় বলিব'। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় (১৪।১।২০,২১) এই মন্ত্রেরই অনুরূপ। এই তিনটি স্থলেই একই বিশেষ্য পদ (বিদথ) এবং একই ক্রিয়া ('বদ্' ধাতু)। সুতরাং 'বদেম বিদথে' অংশের যে-প্রকার অর্থ, 'বিদথম্ আবদাসি' অংশেরও সেই-প্রকার অর্থ করিতে হইবে। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ জানেন সংস্কৃতে বহুস্থলে দ্বিতীয়া এবং সপ্তমী বিভক্তির অর্থ একই প্রকার। সুতরাং আমাদিগের সিদ্ধান্ত:—

বিদথম্ আ বদাসি=সমিতিতে নিজমত প্রকাশ করিবে।

ঋগ্বেদেরও একস্থলে আছে—'সম্ হোত্রম্ স্ম পুরা নারী সমনম্ বা অবগচ্ছতি' (১০।৮৬।১০)=পুরাকালে নারীগণ সাধারণ যজ্ঞস্থলে এবং সমিতিতে গমন করিতেন (সমনং =সমিতিং, সায়ণ)।

ঋগ্বেদে বলা হইতেছে নারীগণ সভায় গমন করিতেন; অথর্ব্ববেদে বলা হইতেছে নারীগণ সভায় মতামত প্রকাশ করিতেন। প্রাচীনকালে লোকে সভায় উপস্থিত হইয়া রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতেন এবং নারীগণকেও মতামত প্রকাশ করিতে হইত। অর্থাৎ নারীগণও জনসমিতির সভ্য ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে সভ্যসমাজে কয়জন নারী কংগ্রেস বা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য? কার্য্যতঃ একজন—Nancy Astor। বৈদিক ভারতে ছিলেন বহু Nancy. সে বহু সহস্র বৎসরের কথা।

মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

রাক্ষসের দেশ

রাক্ষসের দেশ! আমাদেরই বাড়ীর একেবারে গা-লাগাও! —এই সভ্যতার যুগে রাক্ষস!—শুনিয়া অনেকে হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু বিশেষ ভয়ের কারণ নাই; কেননা সভ্যতার প্রভাব হইতে রাক্ষসেরাও বাদ পড়ে নাই এবং সংসর্গদোষে তাদের নরমাংসে অরুচি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই রাক্ষসেরা আগেকার রাক্ষসদেরই নাতিপুতি। এই নাতিপুতিদের এখন ততটা ঝাঁজ্ না থাকিলেও তাঁরা খুব শান্ত নন। এঁরা এখন যেখানে বাস করেন সে দেশের নাম বস্তার।

ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশে বস্তার একটি করদ রাজ্য। প্রায় তেরো হাজার বর্গ-মাইল জুড়িয়া বস্তাররাজ্য অবস্থিত। ইহার উত্তরে কাঁকরের করদ রাজ্য, দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রদেশ, পূর্ব্বে জয়পুর রাজ্য এবং পশ্চিমে নিজামের রাজ্যের মাঝখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে পুণ্যতোয়া গোদাবরী। এই গোদাবরীর তীরে বনবাসের সময় রাম লক্ষ্মণ ও সীতা কতদিন বাস করিয়াছিলেন। মধুসূদনের সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন,

"পঞ্চবটীবনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে।....."

কবি ভবভূতি তাঁর উত্তররামচরিত নাটকে দণ্ডকারণ্য পঞ্চবটী জনস্থান ও বালী-সুগ্রীবের দেশের সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। এ-সমস্ত জায়গাই বস্তার রাজ্যে অবস্থিত ছিল —এইরূপ কিম্বদন্তী। বস্তারেই রাক্ষসরাজ খর-দূষণের রাজধানী ধূমগৃহ্ম্ এবং বালীর রাজধানী রম্ভা-পর্ব্বত অবস্থিত। গোদাবরীর তীরে এই ধূমগৃহ্ম্ হইতে রাক্ষসী শূর্পনখা রামের কাছে প্রেম-নিবেদন করিতে আসিয়াছিল এবং লক্ষ্মণ তার নাক কাটিয়া অভিলোভের চূড়ান্ত পুরস্কার দিয়াছিলেন। এইখানেই রাম বালীকে বধ করিয়া তাঁর রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষেক করেন, বালীর স্ত্রী তারা সুগ্রীবকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুতে তার ছোট ভাইকে বিবাহ করার রীতি বস্তারের অসভ্য জাতিদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। রম্ভা বা রুক্ষা পর্ব্বতকে কেবল বালীর দেশ বলিয়া পরিচয় দিলেই চলিবে না। অনেকে হয় ত জানেন না, যে, রুক্ষা পর্ব্বতে নানা রকমের ফল জন্মায়। এখানে বনে বড় বড় ও বেশ সুমিষ্ট কমলালেবু জন্মিয়া থাকে। যাঁরা বলেন পাশ্চাত্য দেশ হইতে কমলালেবুর আম্‌দানি প্রথম, তাঁরা একথা শুনিয়া বোধহয় আশ্চর্য্য হইবেন। দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটীতে যে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর বাস ছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি, তা তাঁরা খাইতেন কি, যদি না এখানে নানা রকম ফল জন্মিত? তা ছাড়া এখানে যে-সব অসভ্য জাতি বাস করে তারা আজ পর্য্যন্ত চাষ-বাস করিতে জানে না। তারাও এইসব বন্য ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। আর একটি কিম্বদন্তী আছে যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় বস্তারের নিভৃত পাহাড়ের মধ্যে নাকি লুকাইয়া ছিলেন। গোদাবরীর তীরে পূজারী কাঙ্কর বলিয়া একটি গ্রাম আছে, তারই কাছে একটি পাহাড়ে এখনও নাকি পাণ্ডবদের পদচিহ্ন আছে। এইখানে অনেকে তীর্থ করিতে যায়।

ইহাই বস্তার—রামের বনবাসের দেশ। ইহার শাল ও সেগুনগাছের বনে পূর্ব্বকালে রাজারা মৃগয়া করিতে আসিতেন এবং এখনও ইহা শীকারের স্থান। বন্য মহিষ, বন-গাই, বারশিঙ্গা হরিণ প্রভৃতি শীকারের জন্তু এখানে প্রচুর। জায়গাটি অত্যন্ত মনোরম। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বসন্তের সময় এখানে শীকার করিতে যাইয়া এখানকার গাছপালার কমনীয় নবীন শোভায় এবং আমের মুকুল ও নানা জাতীয় গাছ ও লতার ফুলের সৌরভে ভারাক্রান্ত বায়ুর ব্যজনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। মনে হয় এ কি ইন্দ্রের নন্দন কানন! এখানে আবার অসংখ্য পাখীর বাস। চারিদিক হইতে তাদের বিচিত্র কলরবে চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়। এখানকার পাখীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বস্তার ময়না, ভীমরাজ, সোনাপাখী, নানা রকমের নীল পায়রা, হরিয়াল প্রভৃতি। এইসব দেখিয়া বস্তারকে মধ্য-প্রদেশের কাশ্মীর বলা যাইতে পারে। বস্তাররাজের হুকুমে বস্তারের বনে শীকারীরা বছরে একটি মহিষ ও একটি বন-গাই শীকার করিতে পারে।

বস্তারের রাজধানী জগ্‌দলপুর। ইহা বি এন রেলওয়ে ষ্টেশন রায়পুর হইতে ১৮৪ মাইল দূরে। জগ্‌দলপুর যাইবার পথ মাঝে মাঝে নানা প্রাকৃতিক সুরম্য দৃশ্যে পূর্ণ। রাইপুর

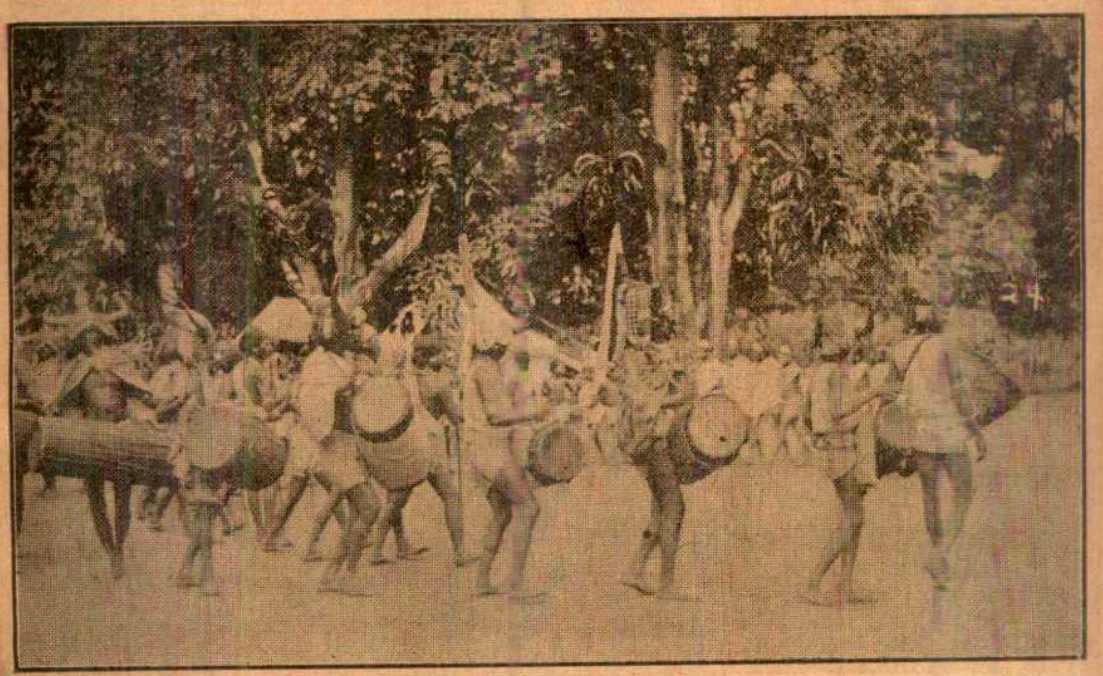

মাদিয়া পুরুষদের নৃত্য—মাথায় লম্বা লম্বা বন-গাইর শিং।

হইতে ধুমতারি, এবং ধুমতারি হইতে কঙ্কর হইয়া জগ্‌দল্‌-পুর যাইতে হয়। বস্তারের কাছে তেলিনঘাট নামক পাহাড় আছে; সেই পাহাড়ের মাথায় কেশকাল শহর। এই শহর হইতে পাহাড়ের চারিদিককার দৃশ্য ছবির মত। ইহার উপর এক দেবতার মন্দির আছে, তিনি নাকি রাজ্যের মড়ক ও মহামারী তাড়াইয়া দেন। এই মন্দিরে রূপা ও অন্যান্য ধাতুর জিনিষপত্র মহামারীমুক্ত লোকেরা উপহার দিয়া যায়। কেশকাল সমুদ্রবক্ষ হইতে প্রায় দুই হাজার ফুট উপরে। তারপরেই তেলিনঘাট পাহাড়ের উচ্চ খাড়াই ভূমিতে আরোহণ করিলে বস্তারের উত্তর-ভাগের অপেক্ষাকৃত শীতল জায়গায় পৌঁছান যায়। বস্তারের বনে জঙ্গলে শীকার করিবার মত একরকম ছোট হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখিতে প্রায় বন্য খরগোশের মত, পিঠে শাদা শাদা ছোট ছোট দাগ। মাকড়ি নামক স্থানে একটি বড় বটগাছ আছে; অসভ্য মুরিয়া জাতি এই গাছটির পূজা করে। মাকড় মানে বানর, তাহা হইতে স্থানের নাম হইয়াছে মাকড়ি। কোন রাজারাজড়া বা হোম্‌রাচোম্‌রা লোক বন্য প্রদেশে আসিলে অসভ্য জাতিরা তাঁদের যাইবার পথ দড়ি দিয়া বন্ধ করিয়া তার নীচে একটি ছোট গাল্‌চা পাতিয়া রাখে। যখনি কোন রাজারাজড়া আসিয়া পড়েন, এখানে পথ বন্ধ দেখিয়া তাঁরা দাঁড়াইতে বাধ্য হন। এবং কিছু বক্‌শিশ দিলে তাঁর পথ ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও পথে কোন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রথাকে অসভ্য জাতিরা বাট্‌-ছেক্‌না বলে।

বস্তারের অসভ্য জাতিরা পাকা শিকারী। এদের প্রায় সকলেই সর্ব্বভুক এবং গোমাংস এদের প্রিয় খাদ্য। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রচুর তালের তাড়ি ও মহুয়া ফুলের মদ খাওয়া আর তার সঙ্গে সঙ্গে নাচের ধুম। পূজা ও উৎসবের সময় গরু বলি দেওয়ার প্রথা এদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। এখানকার রাজা হিন্দু হইলেও এই গোহত্যা ব্যাপারে হাত দেন না।

বস্তারের রাজপরিবার দাক্ষিণাত্যের ওয়ারাঙ্গাল প্রদেশের রাজাদের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। তাঁদের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে দেবী দন্তেশ্বরী বস্তারের প্রথম রাজা অন্নমদেবকে পথ দেখাইয়া আগে

মাদিয়া স্ত্রীলোক।

আগে চলিতে বলিয়া নিজে পিছনে পিছনে যাইবেন প্রতিজ্ঞা করেন। খানিক দূর যাইয়া অন্নমদেব পিছনে তাকাইয়া দেখেন দেবী আসিতেছেন কি না। ইহাতে দেবী দাঁড়াইয়া গিয়া এক পাথরের মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যান। অন্নমদেব তখন সেইখানে দেবীর এক মন্দির গড়াইয়া দেন। তাঁর বংশধরেরা আজ অবধি এই দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। রাজারা এই বস্তার রাজ্য দেবীর সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, এবং যিনি রাজা হন তিনিই দেবীর প্রধান পুরোহিত হইয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও রাজধানী জগ্‌দল্‌পুর শহরে যে-সব অসভ্য জাতি হিন্দু হইয়াছে তাদের মধ্যেও গোহত্যা প্রচলিত আছে এবং বস্তার আজ অবধি রাক্ষসের দেশ হইয়া রহিয়াছে। আদিম অসভ্য অধিবাসীদের বিবাহ বা মৃত্যুর সময় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ইহারা যাদু ও ভৌতিক বিদ্যায় বিশ্বাস করে। বস্তু গণ্ডজাতি এ বিষয়ে নাকি সিদ্ধহস্ত। এখানে নাকি লোকে শীকারলব্ধ জিনিষের উপর মন্ত্র পড়িয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। এই-সব জাতির ধর্ম্ম খুব সাদাসিধা। পূজার মন্দির বা মূর্ত্তি ইহাদের কিছুই নাই; পূজার উপকরণ—গরু, শূকর, ছাগল ও মুরগীর রক্ত ও মাংস। আর এই-সব পূজা হয় মহামারীর সময় দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্য। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রধান—মাদিয়া, মুরিয়া, ভাত্রা, গাদ্‌বা, তেলঙ্গা এবং পূর্জ্জা। হাল্‌বা জাতি হিন্দু, ইহারা গোমাংস খায় না। ছোট ছোট যেসব জাতি আছে তাদের নাম—কোস্তা, ইহারা রেশমের জিনিষ তৈরী করে; এবং ঘাসিয়া, ইহারা সহিসের কাজ করে। ঘাসিয়াদের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ইহারা বাঘ, চিতাবাঘ ও ভালুকের মাংস খায়, কিন্তু গোমাংস খায় না। গাদ্‌বাজাতি আবার বাঁদর খায়, তবে লালমুখ বাঁদর তাঁরা খান না।

মাদিয়া জাতি সম্ভবত ভারতবর্ষের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম। আমাদের রামায়ণ প্রভৃতিতে যাদের রাক্ষস বলিয়া উল্লেখ আছে ইহারা তাদেরই বংশধর। ইহাদের ভাষার নাম মাদি। জয়পুরের সীমান্ত প্রদেশে যে তেলেগু ভাষা কথিত হয় তাহা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। অভুজ্‌মাদ পাহাড়ের উপর মাদিয়াদের দেশ

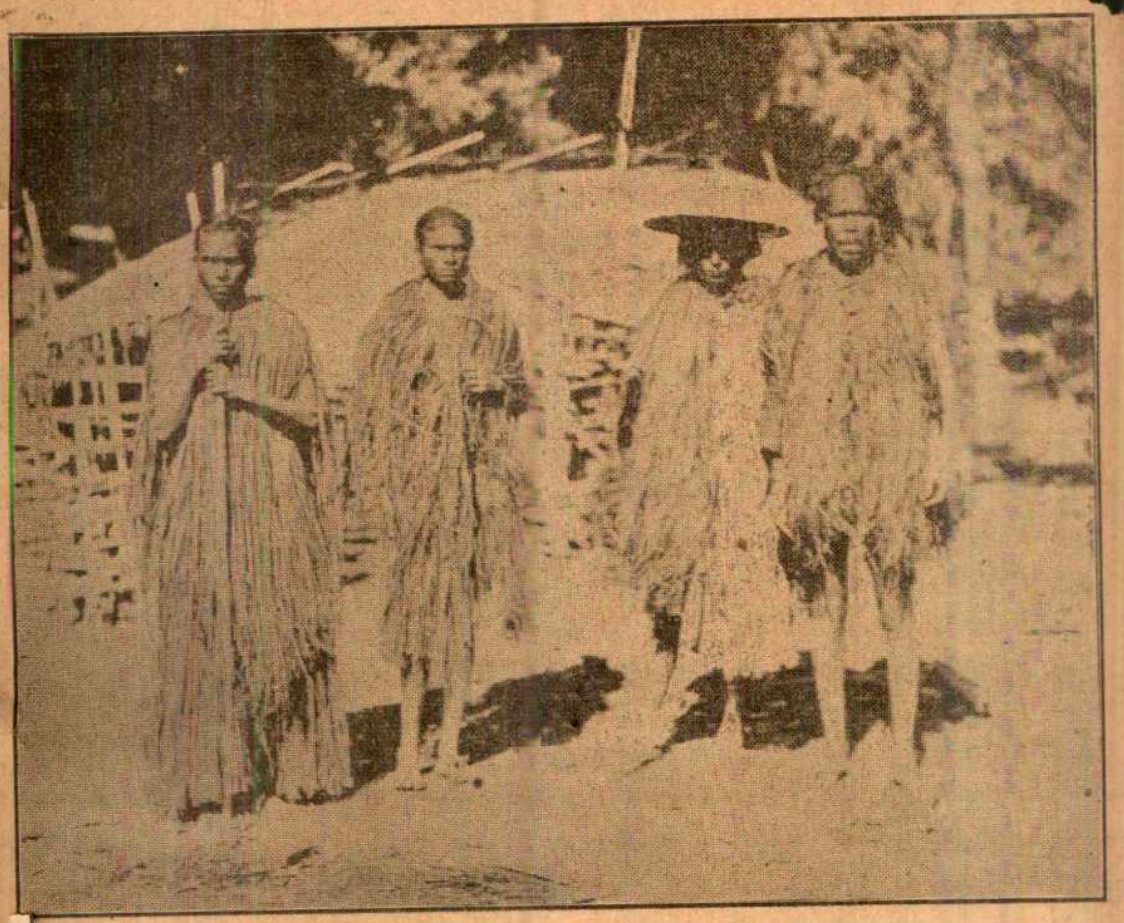

মাদিয়ারা স্বদেশী ওয়াটারপ্রুফ পরিয়াছে।

মাদিয়ান। ইহারা চাষবাসের কাজ জানে না, কাজেই চাষের জন্য গরু বা লাঙ্গল কিছুই তাদের নাই। তারা কতকগুলি পাহাড়ে শস্যের চাষ করে, তাদের নাম ধাং, কস্‌রা ও বাজ্‌রা। এই শস্য দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য নাচ্‌না শস্যের মত। মাদিয়ারা ইহা জলে ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া খায় এবং তখন ইহাকে "পেজ্‌" বলে। ভাতকে এরা বলে চাউর পেজ অর্থাৎ চাউল সিদ্ধ। কোন কোন গাছের ফল ও কোন কোন গাছের পাতা ইহারা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। শল্‌ফি ও সেণ্ডা নামে একরকম গাছ আছে; দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা সেই গাছের রস শুকাইয়া চাপ্‌ড়া করিয়া খায় ও গাছের মধ্যকার সার গুঁড়া করিয়া তার ময়দার রুটি করিয়া খায়। মাদিয়ারা তালের তাড়ি ও মহুয়ার মদ ভালবাসে। মহুয়া ফল ইহারা খায় ও পশুরাও খাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ মরিলে মৃত ব্যক্তির ভাগিনেয় ঢোল পিটাইয়া আত্মীয়স্বজনকে মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া দিয়া থাকে। আত্মীয়রা না আসা পর্য্যন্ত দুই তিন দিন মড়া ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। তারপর আত্মীয়রা আসিলে একটি গরু মারিয়া তার লেজ কাটিয়া লইয়া মৃত ব্যক্তির হাতে দেওয়া হয় এবং তার সৎকার করা হয়। সৎকারের পর আত্মীয়রা সকলে মিলিয়া গরুটির মাংস খায়, অজস্র মদ খায় ও কয়েকদিন ধরিয়া নাচিতে থাকে। মাদিয়া মেয়ে ও পুরুষ সকলেই নাচিতে খুব পটু। তাদের নাচের আবার অনেক বৈচিত্র্য আছে। পুরুষ নর্ত্তকদের নাচিবার সময় বনগাইএর শিং মাথায় পরিতে হয়। মৃত্যুর কিছু দিন পরে শ্রাদ্ধের জন্য আর-একটি উৎসব হয়। একে তারা গাট্‌পাক্‌না বলে।

হাতে অনেক গরু মারা ও খাওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার জন্য পথের ধারে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি পাথর পুঁতিয়া রাখা হয়। অবিবাহিত লোক মরিলে তার স্মৃতি রাখা হয় না। মাদিয়ারা পুড়াইয়া মৃতের সৎকার করে, কেবল পোড়ায় না মৃত শিশুদের ও বসন্তরোগীদের। দূরতম ও নিভৃত পার্ব্বত্য দেশে মাদিয়া স্ত্রীলোকেরা কোন বস্ত্র ব্যবহার করে না, কেবল কোমরে একটু ন্যাকড়া পরে মাত্র। বর্ষাকালে মাদিয়ারা গলা হইতে পা অবধি এক-রকম দড়ির জামা ব্যবহার করে। মাদিয়া স্ত্রীলোকদের কেবল কাঁধে হাত দেওয়া অন্যায় ও অসম্মানজনক কাজ। মাদিয়ারা সরল ও ভক্তিমান জাতি। তাদের মধ্যে একটা কুপ্রথা আছে। কেহ সম্পত্তি কাড়িয়া লইলে বা কেহ স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিলে ইহারা তাদের হত্যা করে। কিন্তু বিষ খাওয়াইয়া বা অন্য কোন গোপন উপায়ে শত্রুকে মারা হয় না। যে অপমানিত সে কুকুরির মত গাগ্‌রা নামের এক অস্ত্র লইয়া গিয়া অপমান-কারীকে হত্যা করে এবং ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশোধের কথা সকলকে জানায়। প্রথাটি মন্দ হইলেও ইহাতে তাদের সারল্যের ও বীরত্বের পরিচয় আছে। মাদিয়াদের মধ্যে চুরি বা ডাকাতি নাই। ইহারা সত্যবাদী, সৎ ও পবিত্রস্বভাব লোক।

মুরিয়া জাতি গোমাংস খাইয়া থাকে। তারা গণ্ড্ বা বস্তারের মূল নিবাসী—এইরূপ প্রবাদ। ইহারা আপনা-দিগকে মাদিয়াদের অপেক্ষা উচ্চ মনে করে। ইহারা দাহি প্রথায় ধানের চাষ করে। বনের বড় বড় জায়গায় আগুন লাগাইয়া জায়গা পরিষ্কার হইয়া গেলে ইহারা সেখানে চাষ করে। ইহাদের দাহিপ্রথা হইতেছে এই ;—বন হইতে নানা

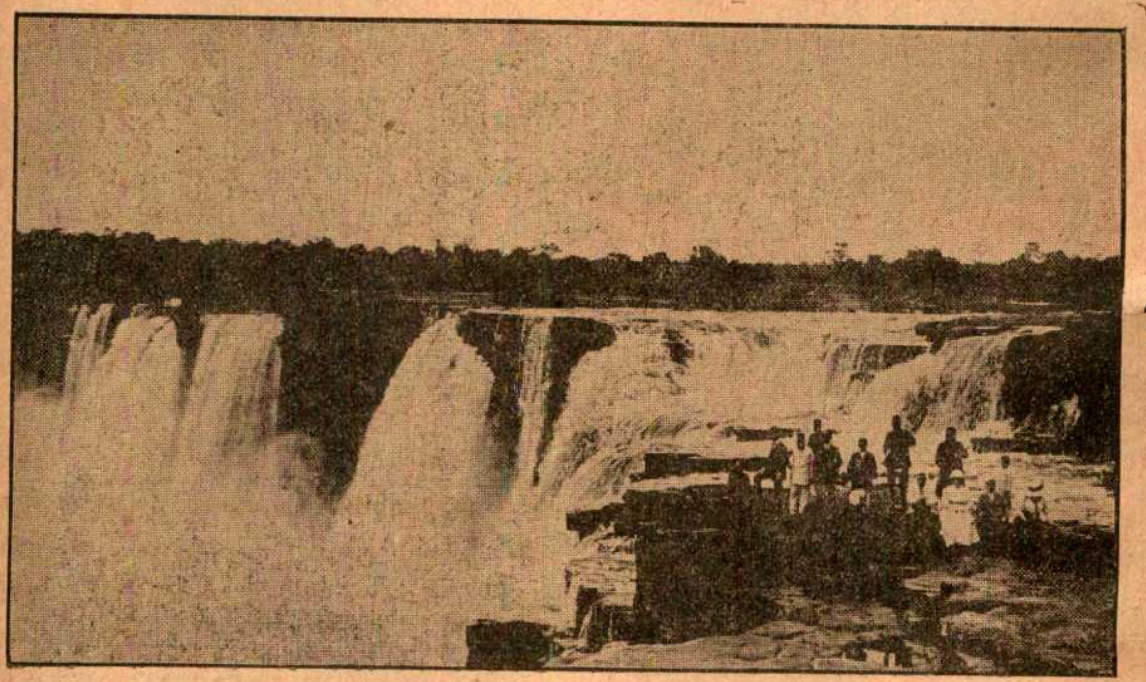

চিত্রকূট জলপ্রপাত।

গাছপালা কাটিয়া আনিয়া চাষের জমির উপর ফেলিয়া ইহারা তাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। এইসব গাছের ভস্ম জমিতে সারের কাজ করে। ইহাদের বিবাহের প্রথা বেশ সুন্দর। বিবাহের বয়স ও ইচ্ছা হইলে একজন যুবক একজন যুবতীকে মনোনীত করিয়া লয়। তারপর তারা দুজনে গ্রাম হইতে কিছু দূরে ঘোটুল ঘর নামে একটি কুঁড়েতে গিয়া কিছুদিন বাস করে। এই ঘর তাদের ঘটকালি করে বলিয়া সেই ঘরের নাম ঘোটুল ঘর—যা বিবাহ ঘটায়। রোজ বিকালে তারা দুজনে নাচে ও গান গায়। কিছুদিন

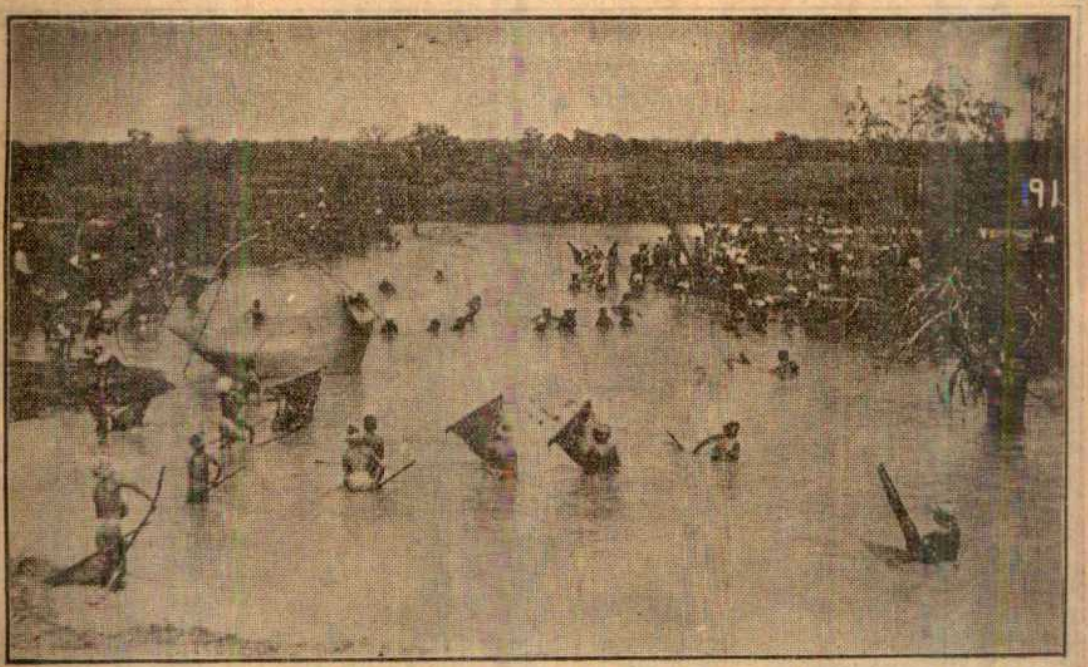

ইন্দ্রবতী নদীতে জলেদের মাছ ধরা।

এইরূপে কাটিলে দুজনে দুজনকে মনোনীত করিলে যুবক যুবতীকে একটি চিরুণি দেয় ও যুবতী তাহা দিয়া যুবকের চুল আঁচড়াইয়া দেয়। ইহা অনেকটা কোর্টশিপের মত। তখন তারা দুজনে ঘোটুল ঘরে রাত্রিযাপন করে ও পরে বিবাহের অন্যান্য ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই ঘোটুল ঘরে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের আসিতে দেওয়া হয় না। শ্রাদ্ধের সময় মাদিয়াদের মত মুরিয়ারাও গোমাংস আহার করে ও মদ খায়। কোন মুরিয়া পরিবারের প্রধান কোন ব্যক্তি মারা গেলে তিন বৎসর পরে 'ঢোল মারনা' বলিয়া এক উৎসব হয়। বাড়ীর লোকের ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থাৎ যত অতিথি খাওয়াইবার ইচ্ছা হয় তত না আসা পর্য্যন্ত এক দুই বা তিন সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ীতে ঢোল বাজানো হইতে থাকে। অভ্যাগতদের গোমাংস খাওয়ান হয়, এবং কয়েক দিন ধরিয়া নাচগান চলিতে থাকে।

এবার মুরিয়াদের ধর্ম্মের কথা। ইহাদের গ্রামের কাছে মাতাগুড়ি নামে দেবতা আছেন। ইঁহার কাছে ইহারা মাঝে-মাঝে শূকর, মুর্গি এবং ছাগল বলি দেয়। পূজার সময় নাচ ও মদ্যপান পূজার একটি অঙ্গ। আমাদের জলের দেবতা যেমন বরুণদেব, ইহাদের তেমনি জলের দেবতা ধীমদেব। অনাবৃষ্টির সময় ইহার পূজা হয়। ইঁহার মন্দির জঙ্গলের ভিতর। একটি চৌকা জায়গায় চারিদিকে চারিটি খোঁটা পোঁতা হয়। মাঝখানে আর-একটি খোঁটা পোঁতা হয়, এইটিই দেবতার মূর্ত্তি। এই মন্দিরের মাথার উপরে কোন ঢাকা নাই। ঢাকা না দিয়া এই ইঙ্গিত করা হয় যে বৃষ্টি প্রচুরভাবে ঢালিতে দেবতার কোন বাধা নাই এবং তাতে লোকেরও কোন আপত্তি নাই। এই দেবতার কাছেও পশু বলি দেওয়া হয়। কাঠের কাজ করিতে মুরিয়ারা খুব পটু। তারা পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারে। ইহাদের বন-গাই শীকার করা এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহারা বনে যাইয়া কয়েক জনে বন-গাইকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি দল বন-গাইর সাম্‌নে থাকে, অপরটি থাকে পিছনে। পিছনের দলটি বন-গাইকে তাড়া দিতে আরম্ভ করে। সে বেচারী ছুটিয়া সাম্‌নের দলকে আক্রমণ করিতে আসে। সাম্‌নের দল প্রাণপণ বেগে দৌড়াইতে থাকে, এবং পিছনের দল গাইটিকে তীর মারে ও চীৎকার করিতে

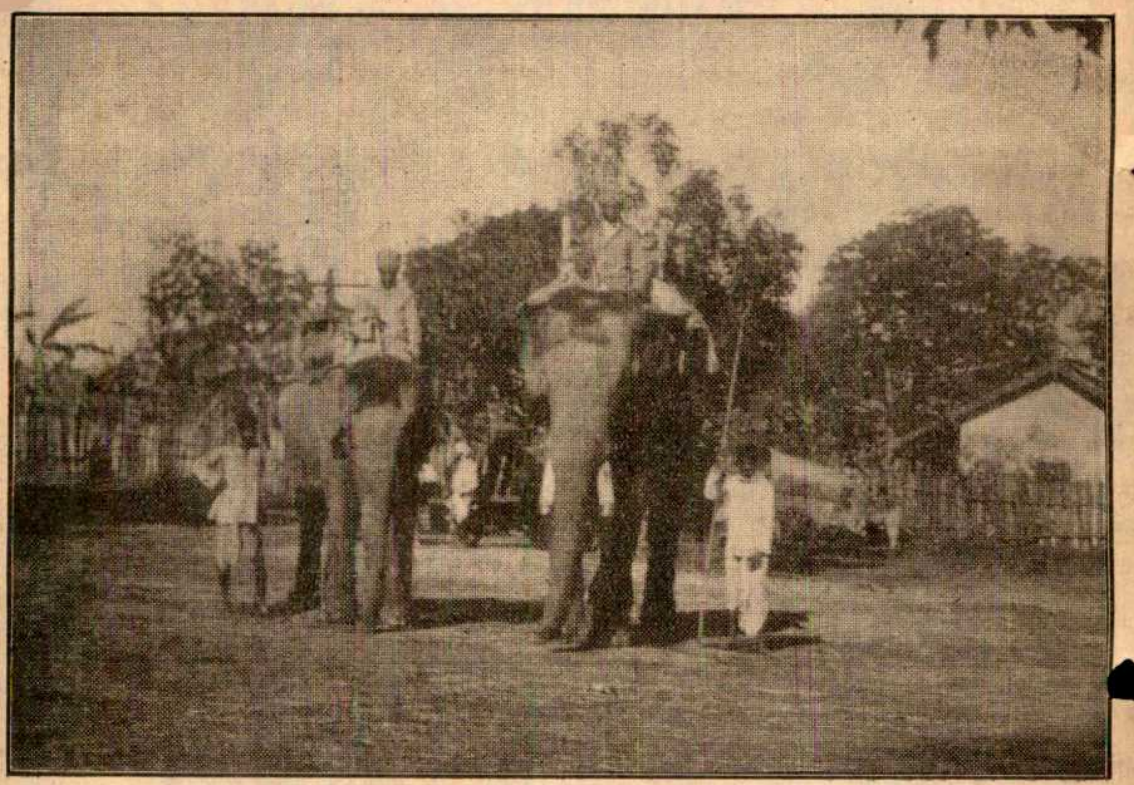

গোপালপ্রসাদ ও চঞ্চলপেয়ারী।

করিতে তাড়া করে। গাইটি তখন বিভ্রান্ত হইয়া পিছনের দলের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাদের আক্রমণ করিতে যায়। এখন আবার সামনের দলটি ফিরিয়া আসিয়া গাইটির পিছন হইতে চীৎকার করিতে করিতে ও তীর ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাড়া করে। গাই যদি খুব কাছে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে শীকারীরা গাছে উঠিয়া পড়ে। এই রকমে দুই দিক হইতে তাড়া খাইয়া খাইয়া বন-গাই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাকে সহজেই শীকার করা হয়। মুরিয়া জাতিদের বিশ্বাস যে, বন-গাই গাছে লাফাইয়া উঠিয়াও শীকারীদের আক্রমণ করিতে পারে। এমন কি সে মুখ দিয়া ফেনা ছুঁড়িয়া ও অনবরত ফোঁস ফোঁস করিয়া গাছ আঁচড়াইতে থাকে। তার ক্রমাগত এই রকম করার ফলে গাছের উপরস্থিত শীকারীর শরীর ভয়ে ও উত্তেজনায় কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং সে পড়িয়া গেলে বন-গাই শিং দিয়া তাকে চিরিয়া ফেলে।

বস্তারের তেলেঙ্গা জাতিরা গোমাংস খায় না, বরং তারা গরুকে সম্মান করে এবং চাষের কাজে লাগাইয়া থাকে। জমি হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, ইহারা মনে করে তাহা ধরণীমাতা ও গোমাতার দান। ইহারা সামান্য কৌপীন মাত্র পরিধান করে, এবং চুট্টা নামে প্রায় এক ফুট লম্বা একরূপ বন্য পাতার চুরুট খাইয়া থাকে।

চৈত্রমাসে এই অসভ্য জাতিদের স্ত্রীলোকেরা চৈৎ-পরব করে। তাহাতে ইহারা স্নান করিয়া বেশভূষা করিয়া খোঁপায় ময়ূরের পালক লাগাইয়া সকালে ও বিকালে নাচ গান করে। এই সময়ে সকলে দলবদ্ধ হইয়া নানা গ্রাম পার হইয়া শীকার করিতে বাহির হয়। পথে যেখানে বা যে গ্রামে রাত্রি হইয়া পড়ে সকলকে সেইখানেই রাত্রি কাটাইতে হয়। ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অনেক পশু শীকার করিয়া ইহারা বাড়ী ফেরে। এই শীকারকে ইহারা জুর পারুধ বলে।

কবি বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরী পুস্তকে এইসব অসভ্য জাতিদের ও তাদের শীকারের সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। এরাই কাদম্বরীতে উল্লিখিত শবর জাতি। বাণভট্ট শুকপক্ষীর মুখ দিয়া এই শবর জাতির সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"শবর...অবলোকন করিয়া মনে করিলাম, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত। জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য মাংস আহার, ধনু বন কুক্কুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই।" (কাদম্বরী পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন কৃত বাংলা অনুবাদ)

যাঁরা মারাঠী ভাষা জানেন বস্তারের অসভ্য জাতিদের ভাষা তাঁরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। হাল্‌বি ভাষা যাঁরা সকলেই বুঝিতে পারে। আবার মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে হাল্‌বি ভাষার খুব অল্পই প্রাদেশিক বিভিন্নতা আছে। হাল্‌বা জাতি দেখিতে অনেকটা মহারাষ্ট্রীয়দের মত। যাঁরা বলেন প্রকৃত মহারাষ্ট্র কেবল দাক্ষিণাত্যে আবদ্ধ নহে, ইহা সমস্ত মধ্যপ্রদেশে বিস্তৃত, হাল্‌বি ভাষাই তাঁদের ধারণা দৃঢ় করিবে। লাড়িয়া, উড়িয়া ও ছত্তিশগড়ী জাতিরা মারাঠীদের সহিত এত নিকট-সম্বন্ধযুক্ত যে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ইহাদের ভাষা আলোচনার সামগ্রী।

পূর্ব্বে বস্তার শহরই বস্তাররাজ্যের রাজধানী ছিল। নাগপুরের ভোঁস্‌লা রাজা বস্তার আক্রমণ করিলে সেখানকার রাজা জগ্‌দলপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জগ্‌দলপুরে বন্য হিংস্র পশুর অভাব নাই। ইন্দ্রবতী নদীর উপর চিত্রকোট গ্রামে ৯৬ ফুট এক বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। ইহা কখনও শুকায় না। ইন্দ্রবতী নদীতে জেলেদের মাছধরা দেখিতে বড় চমৎকার।

কন্দিগমে একটি ডাক বাংলা ও একটি ছোট বাজার আছে। এখানে কাঠিয়াবাড়ের লোকেরা চাল-ডালের ব্যবসা করে। কাঠিয়াবাড়ীরা ব্যবসায়ে, ছুতোরের কাজে, মিস্ত্রীর কাজে ও কন্‌ট্রাক্‌টারিতে খুব দক্ষ। এইজন্য মধ্যপ্রদেশে ইহাদের খুব আদর।

রামচন্দ্রের বনবাসের সময় পঞ্চবটী ও [illegible] রাক্ষসের অভাব ছিল না। মাদিয়া, মুরিয়া প্রভৃতি জাতি সেই-সব রাক্ষসদেরই বংশধর। অতএব বস্তারকে অনায়াসেই রাক্ষসের দেশ বলা চলে। এই রাক্ষসের দেশ বস্তারে আমি একবার শীকার করিতে গিয়াছিলাম।

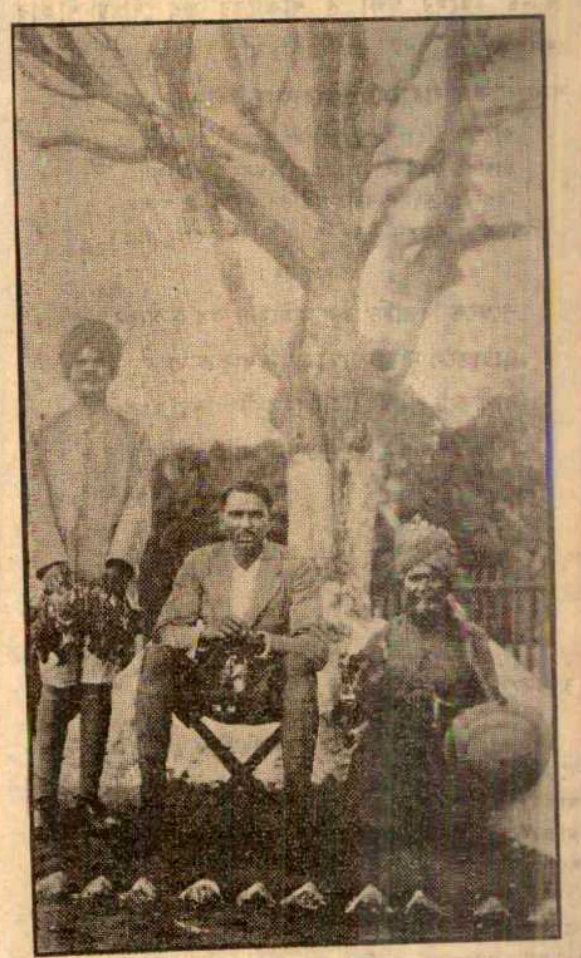

রাজাবাহাদুর শ্রীজওয়াহির সিংহজী তাঁর ডান দিকে শ্রীযুক্ত চৈতন সিংহ।

বন-গাই ছাড়া, ছোট হরিণ প্রভৃতি শীকার করিবার অন্যান্য জন্তুও বস্তারের বনে জঙ্গলে আছে। মাকৃড়ি বনে আমি কেবলমাত্র একটি মহিষ ও একটি বন-গাই শীকার করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। বিদেশের শিকারীদের ইহার অধিক কিছু মারিতে দেওয়া হয় না। এই মাকৃড়ি বনটি শরণগড়ের রাজা বাহাদুর শ্রীজওয়াহির সিংহজীর

জন্য রক্ষিত। শীকার করিবার অনুমতি পাইবার সময় আমরা দুইটি ভাল শিকারী হস্তী পাইয়াছিলাম। তাদের নাম ছিল—গোপালপ্রসাদ এবং চঞ্চলপেয়ারী। আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রীযুক্ত চৈতন সিংহ। ইনি সেখানকার সার্কল্ ইন্‌স্‌পেক্‌টার। বস্তারের সুন্দর বনজঙ্গল, বিভিন্ন রকমের পক্ষী ও শীকারের জন্তু দেখিয়া শীকার শেষ করিয়া যখন ফিরিতেছিলাম তখন কালিদাসের শকুন্তলার ভাষায় বনজঙ্গলের কাছ হইতে বিদায় লইলাম—

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্ মুহুস্ তাড়িতং
ছায়াবন্ধ-কদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থনম্ অভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধৈঃ ক্রিয়তাং বরাহপতিভির্ মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
বিশ্রামং লভতাম্ ইদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধম্ অস্মদ্ ধনুঃ॥

(অনুবাদ)

শৃঙ্গেতে বিতাড়ি' জল মহিষেরা করুক্ গাহন,
ছায়াতলে মৃগকুল রোমন্থনে থাকুক্ মগন,
বাপীতটে শূকরেরা মুস্তামূল উপাড়িয়া খাক্,
মোদের শিথিল ধনু মুক্তবন্ধ আজি শান্তি পাক্।

রণজিতরাও পণ্ডিত।

পঞ্চশস্য

ঝড়-বজ্রের জন্মকথা—

এতদিন মানুষ নীচু হইতেই আকাশের দিকে তাকাইয়া মেঘের ও ঝড়ের কাণ্ডকারখানা দেখিত। এখন উড়ো জাহাজে উঠিয়া মানুষ আকাশের ঘরের কথা জানিতে ছুটিয়াছে। তাকে বাধা দিবে কে? আজ যে তাকে বাধা দিতেছে, কাল হয়ত মানুষ তাকে দলিয়া ফেলিয়া আপনার পথ মুক্ত করিবে। উড়ো জাহাজের সৃষ্টি বেশী দিন হইল হয় নাই। ইহারই মধ্যে তাতে উঠিয়া মানুষ মেঘের ছোটাছুটি ও ঝড়ের মাতামাতি দেখিয়া তার কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতির সমস্ত লীলাকেই মানুষ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের দেশে কাল-বৈশাখীর দিন আকাশে মেঘের ঘোরতর বজ্রপূর্ণ আস্ফালন ও তার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের উন্মত্ত নৃত্য অনেকেই দেখিয়াছেন। নীচে পৃথিবীর বুকে যখন জলের নর্ত্তন চলিতেছে, উপরে আকাশে তখন আর-এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়া চলিয়াছে।

গ্রীষ্মের দিনে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইবার আগে মেঘ কি করিয়া ও কেমন করিয়া জমিতে থাকে তাহা একজন বৈজ্ঞানিক উড়ো জাহাজে উঠিয়া প্রায় ২৬৬৬ হাত উঁচু হইতে লক্ষ্য করেন। প্রথমে ঝড়ের মাথার উপর বাষ্পের কালো কালো রাশি ঠেলিয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং আকাশের বুকে কয়েক মাইল জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে। ঘূর্ণী বায়ু মাঝে মাঝে দৌড়াইয়া আসিয়া সেই-সব বাষ্প-রাশিকে ফুটন্ত জলে ভাত ফোটার মত উপরে ও নীচে আলোড়িত করিতে থাকে। এই যে ভীষণ আলোড়ন আরম্ভ হইল ইহার গোড়ার কারণ কিন্তু খুব সামান্যই। কয়েক ঘণ্টা আগে আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল। সহসা কোথা হইতে কয়েকটি কালো দাগ মাত্র আকাশে দেখা গেল। যদি এই দাগগুলি শীঘ্রই আকাশের গায়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, ঝড়-বৃষ্টি একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইবে।

মেঘের শীঘ্র শীঘ্র আকার ধরিয়া বড় হইয়া উঠার অর্থ—পৃথিবীর উপরে উত্তাপের অসমতা। এই-রকম কারণ উপস্থিত হইলেই গ্রীষ্মকালে বজ্র ও বৃষ্টির সম্ভাবনা। একঘণ্টা কিম্বা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় যদি এই কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে মেঘ-বিন্দুগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া একটি আর-একটির ঘাড়ে চাপিয়া একেবারে আকাশ ছাইয়া ফেলে। মেঘের নীচেকার লোকদের কাছে আকাশ তখন ভীতিকর; কিন্তু মেঘের উপরে উড়ো জাহাজে যাঁরা, বিক্ষিপ্ত বাষ্প তাঁদেরও মাঝে মাঝে জোরে ধাক্কা দিতে থাকে। পৃথিবী হইতে উন্মুক্ত বায়ু ছুটিয়া আসিয়া মেঘপুঞ্জকে উদ্বেলিত করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো বাষ্প জমিয়া জমিয়া মেঘ হইতে থাকে। এই বিপুল বাষ্পরাশি কোন কোন সময়ে আকাশে তিন চার মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত হয়। পাহাড়ের চূড়ার মত তার মাঝে মাঝে উঁচু মেঘ উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির মধ্যে যেমন আগুনের কারখানা, এইসব মেঘগিরিও তেমনি বজ্রের আড়ত। ইহাদের বজ্রশৃঙ্গও বলা চলে। বিদ্যুৎ, অফুরন্ত বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি—সমস্তই ইঁহাদের কাজ। একটি মেঘগিরি বা বজ্রশৃঙ্গকে পৃথিবী হইতে চার মাইল উপরে দে[illegible] গিয়াছিল।

বজ্রের শক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য রকমের। একটি বড় মেঘের ভিতর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত শক্তি জমিয়া উঠে যে তত শক্তি খরচ হয় মিশরের পিরামিড তৈরী করিতে ব্যয়িত হয় নাই। এক মেঘ হইতে আর-এক মেঘে বিদ্যুতের যে জ্বলন্ত রেখা পড়ে তাহা সময়ে সময়ে কুড়ি মাইল লম্বা হয়। বজ্র-শৃঙ্গটি যত বড় হইতে থাকে ততই সেখানে বাষ্প জমিতে থাকে ও তাহা হইতে প্রচুর বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ হয়। মেঘটির উপর দিকটা তখন ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে থাকে। খুব প্রচণ্ড ঝড়ের সময় যখন বজ্রশৃঙ্গটি অত্যন্ত উঁচুতে উঠে তখন তাহা হইতে যে বৃষ্টি-বিন্দু পড়িতে থাকে তারা মাঝ পথে জমিয়া বরফের টুক্‌রা শিল হইয়া যায়। এইসব বজ্র-ভরা মেঘ হইতে দুই-রকম বায়ু-বেগ ছুটিয়া বাহির হয়,—একটি গরম, ইহা উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে; অপরটি ঠাণ্ডা, ইহা জল-ধারার সঙ্গে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে। ইহাই পৃথিবীর উপর বজ্রের আক্রমণকে দ্বিধা করিয়া দেয়। এই বজ্র কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া গুড়্-গুড়্ করিয়া ডাকিতে থাকে যতক্ষণ না বিদ্যুৎ একটা মেঘের মাথা হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিম্বা এক মেঘ হইতে আর-এক মেঘে বা মেঘ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবী অবধি যে-সব বিদ্যুতের রেখা আসে, তারা এক মাইলের বেশী প্রায়ই লম্বা হয় না, কেননা বজ্রভরা মেঘগুলি পৃথিবী হইতে ইহার চেয়ে বেশী উঁচুতে থাকে না।

এক কথায় বলিতে গেলে ঝড়-বজ্রের তিনটি অবস্থা, যেমন ছবির তিনটি ভাগে মেঘের তিনটি বিভিন্ন আকার দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে কালো বিন্দুর মত বাষ্প, তারপর সেগুলির ছোট-ছোট মেঘের আকার ধরিয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়া এবং শেষে উঁচু দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া তাদের মেঘ-গিরি বা বজ্র-শৃঙ্গ তৈরী করা।

—

ঝড় বজ্রের আয়োজন।

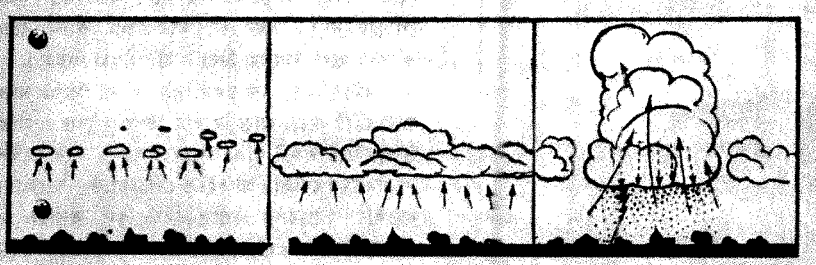

শুভ্রপাত।　　সঞ্চয়।　　বিস্ফার।

জীব-জন্তুর বুদ্ধিকৌশল—

পোকামাকড়রা নিজেদের বাসা বাঁধিবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করে বা কোন কৃত্রিম অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে কি না, সে বিষয়ে জার্ম্মানীর একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অনেক অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন। মানুষ যখন প্রথমে একেবারে অসভ্য ছিল, অস্ত্রের ব্যবহার জানিত না, নগ্ন ও বনবাসী ছিল, তাকেও তখন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমে পাথর হইতে এবং পরে লৌহ হইতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করিতে হয়। প্রাণীজগতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার সম্ভাবনা নাই বটে কিন্তু প্রাণীরা নিজেদের বুদ্ধি খরচ করিয়া হাত পা ও মুখের সহায্যে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের নানা কৌশল অবলম্বন করে।

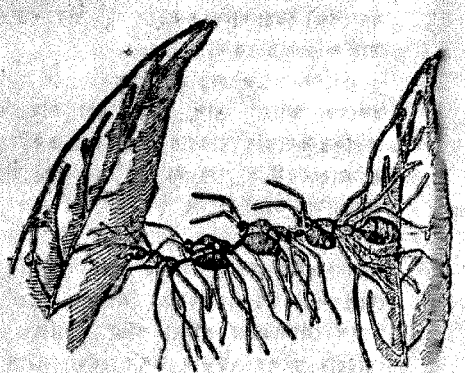

পিঁপ্‌ড়ের বাসার জন্য পাতা জোড়ার কৌশল।

এ-সম্বন্ধে এক রকম পিঁপ্‌ড়ের বুদ্ধি-কৌশল খুব বিস্ময়কর। পাশ্চাত্য দেশে এই পিঁপ্‌ড়ের নাম Oecophylla Smaragdina. আমাদের দেশে অশোক ফুলের গাছে, আম গাছে ও কাঁঠাল গাছে যে এক-রকম লম্বা লম্বা পিঁপ্‌ড়ে কতকগুলি পাতা এক জায়গায় করিয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে, ইহারা বোধহয় সেই পিঁপ্‌ড়ের মত। পাতা জুড়িয়া বাসা বাঁধিবার সময় ইহারা যে বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাহা বাস্তবিকই দেখিবার ও বুঝিবার জিনিস। একবার একজন অনুসন্ধিৎসু এইরূপ পাতায়-মোড়া একটি বাসা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেখেন—কতকগুলি পিঁপ্‌ড়ে একটি পাতার ধারে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে ছিন্ন পত্রের ধারটি শুঁড় কিম্বা সামনের পা দিয়া ধরিবার জন্য। তারপর সেই ছেঁড়া পাতাটি ধরিয়া মুখ দিয়া কামড়াইয়া এক পা এক পা করিয়া পিছাইতে লাগিল। এইরূপে দূরের পাতাটি ক্রমে ক্রমে কাছে আনিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে তত বুদ্ধির [illegible] নয়। ইহার চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় যখন ইহারা বাসা তৈরী করিবার সময় খুব দূরের একখানা পাতা কাছে টানিয়া আনে। এই সময়ে তারা একটির পিঠে আর-একটি চাপিয়া পরস্পরকে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং একটি শিকল তৈরী করে এবং সর্ব্বপ্রথমে যে পিঁপ্‌ড়েটি থাকে সে-ই দূরের পাতাটিকে ধরিয়া ফেলে। তারপর পোড়ার পিঁপ্‌ড়েটি ক্রমে ক্রমে পিছাইতে থাকে। এইরূপে পাতাটি টানিয়া অপর পাতার কাছে আনে। কিন্তু পাতাটি কাছে আনিলেই ত কাজ মিটিল না। দুটি পাতার ধার জুড়িয়া না ফেলিলে বাসা ত মজবুত হইবে না। মদ্দা পিঁপ্‌ড়েরা পাতাগুলি টানিয়া টানিয়া কাছে আনে, কিন্তু তারা পাতা পরস্পর জুড়িতে পারে না। সে-কাজ করে মাদি পিঁপ্‌ড়েরা তাদের ছানাদের সাহায্যে। বাহির হইতে মদ্দারা পাতা কামড়াইয়া টানিয়া যখন ধরিয়া থাকে, তখন মাদি পিঁপ্‌ড়েরা মুড়ির মত তাদের অপুষ্ট ছানাদের মুখে করিয়া লইয়া ছিন্ন স্থানে আসিয়া হাজির হয়। তারা মুখের শুঁড় দিয়া ছানাদের দেহের মাঝখানটা কামড়াইয়া থাকে। শুঁড় দিয়া তারা ছানাদের বেশ একটু জোরে টিপিয়া ধরে, এবং তাতে ছানাদের মুখ দিয়া লালা বাহির হইতে থাকে। মাদিরা তখন একটা পাতার ধার হইতে আর-একটা পাতার ধারে অনবরত দ্রুতভাবে যাওয়া আসা করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছানাদের মুখ একটা পাতার ধারে চাপিয়া ধরিয়া একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়ায় আবার আর-একটি পাতার ধারে ছানার মুখ চাপিয়া ধরিয়া আর-একটু দাঁড়ায়। এই-রকমে পাতায় পাতায় রেশমের মত সুতার জাল দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। তাঁতিদের তাঁতের মাকু যেমন একবার তাঁতের এক মুখে আসিয়া সুতা লাগাইয়া আর-এক মুখে গিয়া সুতা লাগায়, এই পিঁপ্‌ড়েরা তেম্‌নি তাদের ছানাগুলিকে মাকুর মত ব্যবহার করে।

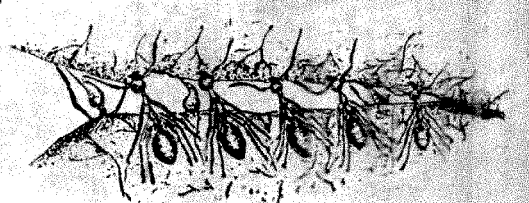

পিঁপ্‌ড়ের ছেঁড়া বাসা জোড়া।

ইহা ছাড়াও জন্তুদের আরো অনেক বুদ্ধি-কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যাম দেশে এক জাতীয় মাছ আছে, তারা তীরের কাছে আসিয়া কীটপতঙ্গের উপর মুখ দিয়া পিচ্‌কারীর মত জল ছুঁড়িয়া ফেলে ও তাহাতে কীটপতঙ্গেরা অভিভূত হইয়া পড়িলে তাদের ধরিয়া খায়। চিড়িয়াখানায় দেখা গিয়াছে রুপী (টাকা) বানরদের অন্য খাদ্য খাইতে দিলে ছোট ছেলেদের মত তারা পাথর দিয়া তাহা ভাঙিয়া খায়। জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকটি একটা শিম্পাঞ্জীর কথা বলিয়াছেন, তাহা বড় সুন্দর। সে লম্বা কঞ্চি দিয়া গাছ হইতে কলা পাড়িয়া খাইত। একদিন তার কঞ্চিটি কাড়িয়া লওয়া হয় ও তার হাতে

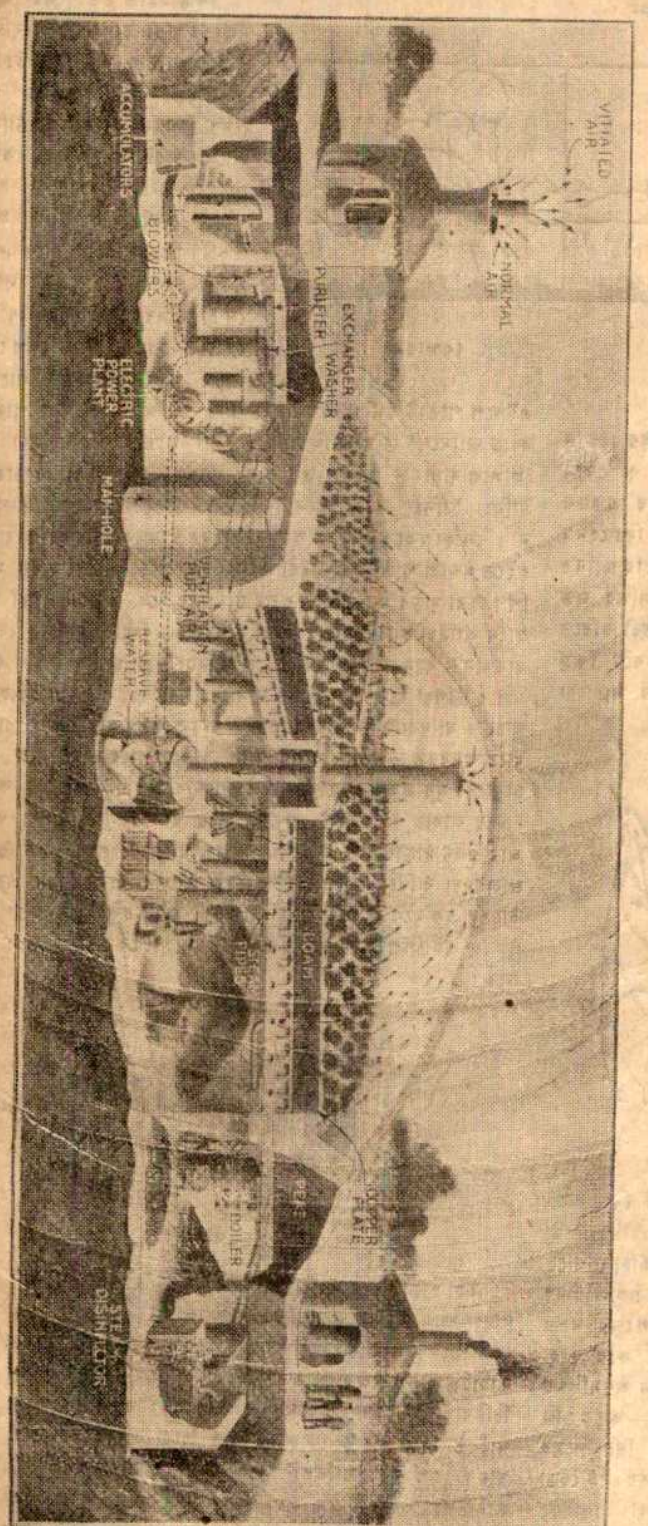

চাষের কাজে খামখেয়ালি—প্রকৃতির সাহায্য-নিরপেক্ষ খাদ্যের প্রস্তুতি।

একটি ফাঁপা বেত দেওয়া হয়। শিল্পাঞ্জীটি বেত দিয়া কলা পাড়িতে গিয়া দেখিল বেতটি কলায় পৌঁছায় না। তখন সে আর-একটি কঞ্চি বেতের ফাঁপার মধ্যে গলাইয়া দিয়া কলা পাড়িয়া খাইল।

নিউগিনিতে এক রকম বড় কালো পাখী আছে, তারা ঠোঁট দিয়া আস্ত বাদাম ভাঙিয়া খায়। প্রথমে তারা ঠোঁটে একটি পাতা জড়াইয়া লয়। তার উদ্দেশ্য —বাদামের খোলার গা হইতে ঠোঁট যাতে পিছ্‌লাইয়া না যায়। তারপর করাত দিয়া কাঠ কাটার মত খোসার উপরে ঠোঁট ঘসিতে থাকে। এইরূপে খোসা ভাঙিয়া যায় ও তারা বাদাম খায়।

আমাদের দেশে কাঠঠোক্‌রার বাসা করাও তার বুদ্ধির পরিচয়। নারিকেল বা অশথ গাছে লম্বা ঠোঁট ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাদের বাসা করা দেখিতে বড় চমৎকার।

প্যারী।

—

চাষের কারখানা—

রোদ জল বাতাসের কোনও তোয়াক্কা না রাখিয়াই কেবলমাত্র যন্ত্রবিজ্ঞানের সহায়তায় চাষবাস করিয়া যথারীতি ফসল ফলাইতে পারা যায় কি না সম্প্রতি উদ্যোগী শ্বেতকায় মানুষ সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে সাফল্য লাভ করিলে কৃষককে আর প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না, তার শত্রুতাকেও গ্রাহ্য করিতে হইবে না।

চাষের কাজে প্রকৃতির আনুকূল্য মোটামুটি পাঁচ রকমের; আলো, তাপ, জল, হাওয়া আর বিদ্যুৎ। প্রকৃতির কষাকষি ব্যবস্থায় মানুষ এর একটিকে পায় ত আর-একটিকে পায় না। উত্তর সাইবেরিয়াতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো, তার সঙ্গে জলের জোগান্‌ও অফুরন্ত, ফলে সেখানে রাই বুনিয়া পঁয়তাল্লিশ দিনে কাটিয়া মরাই বোঝাই করা যায়; কিন্তু সে দেশে শীতঋতুর একাধিপত্য, আলোর সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ জোগাইবার সুবিধা করিতে পারিলে সাইবেরিয়ার জলের মরুভূমি ভূস্বর্গ হইয়া উঠিতে বেশী দিন লাগিত না। কাফ্রিমুলুক আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি গরম দেশে রোদ জল দুইই পর্য্যাপ্ত, কিন্তু উদয়াস্তের মধ্যেকার সময়টা এ-সব দেশে সাইবেরিয়ার প্রায় অর্দ্ধেক বলিয়া, এরা দিনের আলোয় দরিদ্র। শীতের দেশ ইউরোপের কোনো কোনো সহরের আশপাশের কৃষিক্ষেত্রে কাচের চাক্‌নার নীচে, জমীতে দেওয়া সারের পচনোদ্গমের তাপকে ধরিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা কিছুদিন হইতেই হইতেছে। শুনিতে যেমনই শোনাক,—মানুষের মতো মাটিও নিঃশ্বাস নেয় ফেলে। উপর হইতে ঘনীভূত বাতাসের চাপ বেশী হইলে মাটি তার খানিকটা শুষিয়া লয়; গরমে হাল্‌কা হইয়া নীচেকার বাতাস উপরে উঠিয়া গিয়া যে 'ভ্যাকুয়াম্' বা বস্তুহীন ফাঁকার সৃষ্টি হয় তার বুক ভরাইবার জন্য শোষিত বাতাস আবার বাইরে

বাহির হইয়া আসে। যে মাটিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের এই কাজ ব্যাহত হইয়াছে, মানুষের মতোই—ফসলের সম্পর্কে সে মাটি মৃত। কিন্তু ডিনামাইট বা অন্য কোনো রকম বিস্ফোরকের সাহায্যে এমনতর মাটিকেও যদি ভাঙিয়া ওলটপালট এবং ঝুরোঝুরো করিয়া লওয়া যায়, তবে প্রচুর সার-দেওয়া শক্ত কঠিন মাটির চেয়ে সেই-রকমের মাটিতেই ফসলের ফলন হয় বেশী, অনেক পরীক্ষার পর আমেরিকায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই-রকম করিয়া কলের কারসাজিতে প্রকৃতির আর-পাঁচরকম আনুকূল্যকেও নিজেদের খুসী এবং সুবিধা অনুযায়ী যখন-তখন জুটাইয়া পাইবার ব্যবস্থা মানুষ করিতেছে।

স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতির আনুকূল্যকে পাইবার পথে মস্ত একটা বিপদও আছে। অগুনতি আগাছার বীজ বাতাসের সঙ্গে অহরহ ভাসিয়া বেড়ায়, মাটির বুকে নিহিত থাকে; প্রকৃতি ফলশস্য তরি-তরকারীর সঙ্গে সমান আদরে তাদের লালন করে। বেশ সুবৃষ্টি হইয়া গেলে চারাগাছগুলি লক্‌লকে সতেজ হইয়া উঠে, পত্রপল্লবে বাগান ছাইয়া যায়;—ঠিক সেইসঙ্গে তাল রাখিয়া যত রাজ্যের আগাছারাও যে মাথা চাড়া দিয়া সতেজ হইয়া উঠে এই হইতেছে মুস্কিল। ঠিক যেন কোনো বন্ধুর ছেলেমেয়েদের জন্য নানারকম উপহার লইয়া গিয়া দেখা গেল, তাদের খুড়্‌তুত, মামাত, পিসতুত একঝাঁক ভাইবোন্‌কে ছাড়িয়া তাদের হাতে একটি-কিছু দেওয়ার উপায় নাই। নিজের প্রয়োজনের দিকটাকে রাখিয়া অপ্রয়োজনের দিকটাকে নিবৃত্ত করিবার ব্যবস্থাতে মানুষকে কম দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। মাটিকে সতর্ক হইয়া শোধণ করিয়া লইতে হইয়াছে, বাইরের ভীষাণু-উদ্ভিজ্জাণু-ভরা বাতাসের সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিয়া বিজ্ঞানের ছাড়পত্র-দেওয়া সৎ বাতাসকে মাত্র তার কাছে আসিতে দেওয়া হইয়াছে। এমনি করিয়া বৎসরের পর বৎসর অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, কুজ্ঝটিকা-প্রবাহ, দিবারাত্রের অপ্রাচুর্য্য, পোকা, মাকড়, পতঙ্গ, পঙ্গপাল, আগাছা, পরগাছা, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, খরগোশ, পাখী প্রভৃতির সঙ্গে পায়ে-পায়ে যুঝিয়া তবে মানুষ তার চাষবাসের কারখানাটিকে নিখুঁত কর্ম্মোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে।

সূর্য্যের উত্তাপ যাহাতে ছড়াইয়া গিয়া অপচয় না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বাগানটিকে কাটিয়া নীচু করিয়া তৈরি করা হইয়াছে; আর সেই কাটা জমীর চার পাড় ঘিরিয়া 'পিট' বা শুক্‌নো চাঁচা ঘাস-পাতার চাপ্‌ড়ার তল্‌তলে আল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারও চারিদিকে কংক্রিটের ভিত্তি গাঁথিয়া সমস্তটার উপর মস্ত বড় বাটির মতো একখানা কাচের ঢাক্‌না উপুড় করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কংক্রিটের ভিত্তি মাটির নীচে অনেকদূর অবধি চলিয়া গেছে, সেখানে মাটির তলার ঘরে জমানো কংক্রিটের মেজে; দেয়াল এবং মেজের কোনো দিক্ দিয়া চুয়াইয়া এতটুকু আর্দ্রতা ঢুকিবার উপায় নাই। সেখানটা শোধিত মাটি, ফসল, নানা যন্ত্রপাতি স্তূপাকার করিয়া জমাইয়া রাখিবার ভাঁড়ার ঘর। ভাঁড়ার ঘরের বারোটি স্তম্ভের মাথার গরম বাষ্পের সেঁক দিবার নলের ব্যবস্থা সহ পুরু ছাত। ছাতের উপর ঝাঁঝরা ঝামার স্তর, তার খানিকটা অবধি সব সময়ই জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। এই ঝামার পাটাতনের উপর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শোধিত মাটি সমান করিয়া বিছানো থাকে। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি সোজ লম্বা চোঙ, তার আগার দিকটা সব উপরের কাচের ঢাকনাটার প্রায় গায় গায় লাগা, গোড়ার দিকটা একটা মুখ-ঢাকা কুয়োর সঙ্গে জোড়া। বাইরের খোলা বাতাসকে পাখা-পাখার টানে শোধনাগারের মধ্য দিয়া বহাইয়া আগাছার বীজ ধূলা পোক-মাকড় প্রভৃতি ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তারপর জলের মধ্য দিয়া ধুইয়া আনিয়া খানিকটা উত্তাপ সংযোগ করিয়া দিলেই সে বাতাসকে নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যবহার করিতে কোনো বাধা থাকে না। এই বাতাস নীচতলার ভাঁড়ার-ঘর হইয়া ছোট ছোট নলের মধ্যে দিয়া বহিয়া জলে ভিজানো ঝামার স্তরের নীচেকার কাঁকাটুকুতে আসিয়া পৌঁছায়। এখান হইতে জলের সংস্পর্শে প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা লইয়া সেই বাতাস অহোরাত্র মাটি ঠেলিয়া উঠিতে থাকে বলিয়া সেই ঝুরো মাটি কখনো ডেলা পাকাইয়া বা শক্ত হইয়া চাপিয়া বসিয়া যাইতে পারে না;—তাছাড়া দরকার অনুযায়ী জল এবং বাতাসের জোগান্ ত চলেই। ব্যবহার-করা বাতাস মাঝখানকার চোঙ বাহিয়া নামিয়া ভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায়। এই ভাবে জল বাতাস আর তাপ জোগানো হয়। দরকার হইলে সূর্য্যের আলোর বদলে বিদ্যুতের আলোয় কাজ চলে। কাকাতুয়ার দাঁড়ের মতো একটা দাঁড় ক্ষেতের উপরে বড়ির কাঁটার মতো আলগোচে গোল হইয়া ঘোরে, তার উপর বসিলেই ক্ষেতের সব কাজকর্ম্ম করিতে পারা যায়, সুতরাং জমির অনেকটা জায়গা চলাফেরার জন্য অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয় না। ফসলের বা'ড়ের অনুযায়ী এই দাঁড়টিকে ওঠানো নামানো চলে।

স. চ.

—

নোবেল্ পুরস্কার এবং নাটকীয় প্রতিভা—

সাহিত্যের জন্য এবারকার নোবেল্ পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত জাসিন্তো বেনাভেতে নামক একজন স্পানিয়ার্ড। স্পেন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া ইঁহার খ্যাতি। ইনি রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাটকের জোগান্‌দার। এ ধরণের নাট্যকারদের নোবেল্ পুরস্কার পাওয়া বেশী না ঘটিয়া থাকিলেও এ-পর্য্যন্ত যতজন পুরস্কৃত হইয়াছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের সাহিত্যিক খাতির জন্য নাটক রচনার কাছে কিছু না কিছু ঋণী।

নোবেল্ পুরস্কারের অনুষ্ঠানটির সুরু ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে। সুলি-প্রুধোম্ প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নাটকীয় প্রতিভা প্রথম সম্মানিত হয়,—নরোয়ের নাট্যকার বিজর্ন্‌-ষ্টিয়ার্ন্ বিয়র্ন্‌সন্ সেবার পুরস্কৃত হন্। পরবৎসর ফ্রেডেরিক মিস্তাল আর জোজে একেগারে এই দুইজন পুরস্কারটিকে ভাগাভাগি করিয়া পান। ইঁহাদের মধ্যে জোজে একেগারে স্পেনদেশীয় একজন বিখ্যাত নাট্যকার, আধুনিক লেখকদের মধ্যে এক বেনাভেতে ছাড়া আর খুব অল্প লোকই তাঁর মতো এমন অজস্র নাটক লিখিতে পারিয়াছেন; তাঁর Great Galeoto নামক নাটকটি আজকালকার দিনের সব-সেরা নাটকগুলির সঙ্গে নাম করিবার যোগ্য, নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। ১৯০৫ সালে স্বনামখ্যাত রুষ সাহিত্যিক হেন্‌রীক্ সিঙ্কিবিজ্ পুরস্কৃত হন্, তাঁর লেখা Quo Vadis 'ক্ গচ্ছসি' নাটকটির খ্যাতি বিশ্ব-জোড়া। বাঙালীদের মধ্যে অনেকে বায়োস্কোপের ছবিতে ইহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তার পর ১৯১১ সালে বেল্‌জিয়মের নাট্যকার মরিস্ মেটারলিঙ্ককে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। ইঁহার লেখা নাটকগুলিকে যুগান্তর-কারী বলা চলে। ইঁহার 'নীল পাখী', 'পিলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা', এবং ছোট ছোট আরও কতকগুলি বইয়ের বাংলাতেও অনুবাদ হইয়াছে। পরের বৎসর পুরস্কার পান জার্ম্মান নাট্যকার জেরহার্ট হাউপ্ট্‌মান্; তাঁর লেখা অন্যূন পঞ্চশখানি নাটকের মধ্যে 'তাঁতি দল' এবং "মগ্ন ঘণ্টা" এই দুটি নামজাদা নাটক এবং আরও অনেকগুলি

জাসিঁতো বেনাভাঁতে। স্পেনের নাটক রচয়িতা।
এ বৎসরের নোবেল প্রাইজ জয়ী।

নাটক নানা ভাষায় অনুবাদিত্যত হইয়াছেই—নানা দেশের রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছে। ১৯১০ সালে আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ পুরস্কৃত হন্। তাঁর লেখা 'চিত্রা' 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেরা মুগ্ধ হইয়া দেখিয়াছে। ১৯১৪ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল্ পুরস্কার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। পর বৎসর প্রতিভাশালী ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ নির্ব্বাচিত হন্। যদিও ঔপন্যাসিক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি, তবু তিনিও পাঁচ-ছয়টি নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর তিনজনকে মাত্র পুরস্কৃত করা হইয়াছে, তার মধ্যে এবারকারের পুরস্কার পাইয়াছেন বেনাভাঁতে।

স, চ,

—

খাওয়ার সময় খুসি থাকো—

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, মানসিক অশান্তি উপদ্রব যে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটায় বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। আমাদের মনে যখন কোনো গুরুতর কষ্ট ভয় বা ক্রোধের তোলাপাড়া চলিতে থাকে তখন পাচকরস-নিঃসারক পাকগ্রন্থিগুলির চুয়ানোর কাজ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া আমাদের তখনকার খাওয়া যথারীতি জীর্ণ হইতে পারে না। খাওয়ার সময় মনটাকে পাঁচ-রকম কথাবার্ত্তায় গল্পে গুজবে, রং-তামাসায় প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে বর্দ্ধিত পরিমাণে পাচক-রস ক্ষরিত হইয়া জঠরাগ্নিকে জোরালো করিয়া তোলে, আর পাকযন্ত্রকে যে-সমস্ত স্নায়ু নিয়মিত করে তাহারা উত্তেজিত হওয়াতে পাকাশয়ের শক্তি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কোনো জিনিষেরই চূড়ান্ত কিছু ভালো নয়। উল্লাসের বাড়াবাড়ি হইলে উল্টা ফল ফলিতে পারে। মনে করুন আপনার একটি দূরাগত পুরাতন বন্ধুকে লইয়া খাইতে বসিয়াছেন। বোম্বাই মেল্ হইতে হাওড়া ষ্টেশনে নামিবার সময় কেমন করিয়া তিনি একজন সহযাত্রীর একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ নিজের কুলির হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা চলিতেছে। তিনি নিজের ব্যাগটি বোম্বাইয়ের হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহা জানিতেন না, তাই এটিকে হুবহু সেই-রকম দেখিতে পাইয়া তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল এটা তাঁরই। অবশেষে সহযাত্রী ব্যাগটা খুলিয়া তার ভিতরকার জিনিষগুলি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন, "বেশ, আপনি যখন এত করে বল্‌ছেন এ ব্যাগটা আপনার, তখন সম্ভবতঃ আমারই ভুল হয়ে থাক্‌বে, কিন্তু এ কাপড়-চোপড়গুলি যে আপনার নয় আশা করি তা আপনি স্বীকার কর্‌বেন। এগুলি আমি নিচ্চি।"—তখন তাঁর ভুল ভাঙিল। বলিবার ভঙ্গিতে গল্পটি মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি তখন মোটেই টের পান নাই যে আপনার মস্তিষ্কের কোষগুলোতে আনন্দের কি পুলক-কম্পন লাগিয়া গিয়াছে; অদম্য হাসির ইচ্ছা আপনার মুখের এবং গলার স্নায়ুগুলিতে সঞ্চারিত হইয়া সেগুলিকে কি-রকম চঞ্চল নিরলস করিয়া তুলিয়াছে। এই চাঞ্চল্যকে আপনি ধারণ করিতে পারিলেন না, যে Pneumo-Gastric Nerves শ্বাস- ও পাকযন্ত্রের মাঝখানে থাকিয়া স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী, ফুসফুস, পাকাশয়, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির কাজকে নিয়মিত করে, তাদের স্বাস্থ্য দেয় স্ফূর্ত্তি দেয়, তার মধ্যে সে কম্পন-তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়িল। এই শ্বাস-পাক-নিয়ামক-স্নায়ুযুগলের যে-সমস্ত ডালপালা পাকরসনিঃসারক গ্রন্থিগুলোকে ঠিক রাখে, ক্রমে সেগুলিও উত্তেজিত হইল, প্রচুর পাকরস ক্ষরিত হইতে থাকিল। পাকস্থলীর যে অবিরাম সঙ্কুচন এবং প্রসারণে খাদ্য-বস্তু জীর্ণ হয় তাহাও এই স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারাই নিয়মিত হয় বলিয়া তাদেরও গতিতাল দ্রুততর হইয়া গেল। এত গোলযোগের মধ্যে হৃৎপিণ্ড হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সে তার সাধ্যমতো রক্তস্রোত পাকস্থলীতে বহাইয়া দিতে লাগিল। অস্থিরতার ছোঁয়াচ যকৃতে গিয়া লাগিলে তাহা হইতে পিত্তরস নিঃসৃত হইতে থাকিল। এক কথায় শরীরের যেখানে যত রসনিঃসারক গ্রন্থির অস্তিত্ব আছে তাদের সকলের মধ্যে এমনই করিয়া মহা ব্যস্ততার একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আপনি ততক্ষণ হয়ত খাওয়া সমাধা করিয়া মশলা চিবাইতে চিবাইতে তাকিয়া হেলান দিয়া ঠিক দুপুরের পরিপূর্ণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন।

ইউরোপীয়দের পুষ্পপল্লবে সাজানো শুভ্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত টেবিলে আহার করার নিয়ম কেবলই যে সুন্দর মনোরম তাহা নয়, পরিপাকের কাজের উপরে তার শুভ প্রভাব খুব বেশী।—আমাদের মধ্যে কারো বা খাবার অসার জলীয়, কারো কারো ঘৃতপক্ক 'গুরুপাক'; কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই সেই আদিম মানুষের ধরণে যখন যেখানে সুবিধা পাত পড়িয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা করিয়া থাকি, কেউ কেউ নিজে গরজী হইয়া প্রাণী-বিশেষের দুর্গন্ধ দেহাবর্জ্জনায় আহার-স্থানের পবিত্রতাকে বাড়াইয়া তুলিতেও চেষ্টা করি। এ-সমস্ত কেবলই যে অস্বাস্থ্যকর তাহা নহে, সুরুচির অভাব দ্যোতকও বটে।

ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই আমাদের দেশের মায়েরা স্তন্য দিয়া তাদের থামাইতে চান্। এরকম করা ভুল। কান্না থামিয়া ছেলে শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে খাবার না দেওয়াই উচিত। দিলে সে খাবার জীর্ণ না হওয়ারই বারো আনা সম্ভাবনা।

স, চ,

ডাইনে,—দুপুরের আহারের পর বেলা বারোটা হইতে রাত্রি সাতটায় আবার আহারের সময় পর্য্যন্ত প্রতি আধঘণ্টা পরপর পাকস্থলীর অবস্থার ছবি।
বাঁয়,—মজাদার হাসির গল্প কেমন করিয়া সমস্ত দেহযন্ত্রগুলির উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া পরিপাকের কাজে সহায়তা করে তাহা দেখানো হইয়াছে। ইংরেজি ১ ও ২ চিহ্নিত স্থানে (চুলে ঢাকা আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না) যথাক্রমে খাস-পাক-নিয়ামক স্নায়ুসূত্রের উৎপত্তি এবং উন্নততর মস্তিষ্ক-কোষগুলির জায়গা। মস্তিষ্ক গল্পের উত্তেজনাকে বুঝিয়া গ্রহণ করিয়া প্রতিবেশী খাস পাক-নিয়ামক স্নায়ুতে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। তারপর গালের ৩ চিহ্নিত স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া প্রচুর লালা রস নিঃসারণ করিতে থাকে। সেখান হইতে উত্তেজনা ৪ চিহ্নিত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া পৌঁছায়। হৃৎপিণ্ড স্বভাবতই চঞ্চল, উত্তেজনার মুখে সে পাকস্থলীতে ঝলকে ঝলকে রক্ত ঢালিতে থাকে। ৫ চিহ্নিত স্থান পাক-স্থলী, খাস-পাক-নিয়ামক স্নায়ুর জোর বাড়িলে এর সঙ্কুচন-প্রসারণের কাজও সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে। ৬ এর জায়গায় শ্বেতসার এবং চর্ব্বিজাতীয় জিনিস জীর্ণ হয়। সেখান হইতে উত্তেজনার ছোঁয়াচ সবশেষে ৭ এর চিহ্ন দেওয়া কিডনী বা মূত্রকোষগুলিতে আসিয়া লাগে।

ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহজ উপায়—

এতদ্দেশে বালিময় ও শুষ্কস্থানে—যথা পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে—'নাগফণা' নামে শিজের মত অনেক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সব গাছের ছাই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে হাজার-করা প্রায় ৭ ভাগ পোটাসিয়ামযুক্ত সার পদার্থ আছে। এক টন (= ২৭ মন) ছাই হইতে প্রায় ৮ সের সার পাওয়া যায়। এই সার শস্যক্ষেতের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী, অথচ সংগ্রহের ব্যয়ও খুব কম।

—

সাবান ব্যবহারে ময়লা দূর হয় কেন—

অনেকের মতে আধুনিক জগতে "সাবান ব্যবহারের পরিমাণ নির্দ্দেশক" অর্থাৎ যে দেশের লোক যত সভ্য তাহারা তত বেশী সাবান ব্যবহার করে। কিন্তু সাবান ব্যবহারে ময়লা দূর হয় কেন তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

প্রধানতঃ ক্ষার-জাতীয় পদার্থের সহিত তৈল-জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণ দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবান জলে গুলিলে সাবানের ক্ষার-জাতীয় উপাদান হইতে তৈল-জাতীয় উপাদান পৃথক হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোনস্থানে তৈল-জাতীয় পদার্থ বর্ত্তমান না থাকিলে ঐ স্থানে ময়লা আটকায় না। যে তৈল-জাতীয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকা হেতু ময়লা জমিয়া থাকে তাহা সাবানের ঐ দ্রবীভূত ক্ষার-জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাতে গলিয়া যায় বলিয়া ময়লা অতি সহজেই জলের সাহায্যে দূরীভূত হয়। সাবানের দ্রবীভূত তৈল-জাতীয় পদার্থ অবশিষ্ট ক্ষার-পদার্থের অনিষ্টকারিতা দূর করিয়া দেয় বলিয়া গাত্রচাহুক্ত পদার্থ পরিষ্কৃত জিনিষের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় অল্প মূল্যের সাবানে উপরোক্ত ক্ষার-জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া উহা অনিষ্টকারক হয়।

—

খাঁটি দুধ চিনিবার সহজ উপায়—

আজকাল দুধ যেরূপ দুর্ম্মূল্য তাহাতে অনেক সময় বেশী দাম দিয়াও জল-দেওয়া দুধ কিনিয়া ঠকিতে হয়। কিন্তু খাঁটি দুধ চিনিবার নাকি একটি সহজ উপায় আছে। সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত একটি লম্বা লোহার সূঁচ যদি খাঁটি দুধে ডুবাইয়া তুলিয়া নেওয়া হয় তবে খাঁটি দুধের ফোঁটা সূঁচের গায়ে লাগিয়া থাকে কিন্তু জল-দেওয়া দুধের ফোঁটার চিহ্নও থাকে না—সূঁচের গা হইতে জল-দেওয়া দুধের সমস্ত ফোঁটা গড়াইয়া পড়িয়া যায়।

"পিয়েমন্তি"

দুখের সুখ

জীবনের শত দ্বন্দ্বে তীব্র তাড়নায়
থেকে থেকে পিষ্ট প্রাণ কাঁদে যেন হায়;—
দুখের গভীর গর্ভে দুঃখাতীত সুখ
পবিত্র আনন্দে মোর ভরি' দেয় বুক।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কষ্টিপাথর

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

সার্ জেম্‌স্ ময়ার নামক কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার দীর্ঘ জীবন লাভের অনুকূল নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

(১) প্রত্যহ আট ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে।

(২) দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিবে।

(৩) শয়নাগারের অন্ততঃ দুই একটি জানালা সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিবে।

(৪) গৃহের সম্মুখে একটি পর্দা ঝুলাইয়া রাখিবে।

(৫) গৃহের দেওয়াল হইতে কিছু দূরে শয়ন করিবে।

(৬) প্রাতে শীতল জলে স্নান না করিয়া শরীরের উত্তাপের সম পরিমাণ উষ্ণ জলে স্নান করিবে।

(৭) প্রাতঃকালে জলযোগের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিবে।

(৮) পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে দুগ্ধ পান প্রশস্ত।

(৯) আহারের কালে চর্ব্বিময় পদার্থ আহার করিবে।

(১০) মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত থাকিবে।

(১১) খোলা মাঠে ব্যায়াম করিবে।

(১২) শয়নগৃহে কোন গৃহপালিত জন্তু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে দিবে না।

(১৩) সম্ভব হইলে সহরের বহির্ভাগে পল্লীগ্রামে বাস করিবে।

(১৪) পানীয় জল ও পয়ঃ-প্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

(১৫) সর্ব্বদা এক-প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে না।

(১৬) মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে।

(১৭) সর্ব্বপ্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে।

(১৮) মেজাজ সর্ব্বদা শীতল রাখিবে।

(১৯) অল্প পরিমাণে সুসিদ্ধ মাংস মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করিবে।

(২০) ভ্রমণ খুব ভাল ব্যায়াম, কিন্তু দুই মাইলের কম বেড়াইলে বিশেষ ফল হয় না।

(স্বাস্থ্যসমাচার, ভাদ্র) শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

দুগ্ধে রশুন-গন্ধ।

সময় সময় গরুর দুগ্ধে রশুনের গন্ধ পাওয়া যায়। এমন কি তাহা হইতে যদি দধি কিংবা ছানা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলেও খাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যদি খাওয়া যায় তবে সমস্ত দিন উদ্গার উঠে ও সময় সময় বমন হয়।

দুগ্ধে ঐরূপ দুর্গন্ধ—রশুনের মত গন্ধ হইবার কারণ কি? গরু চরিবার সময় আগাছা কুগাছা খায়। সময় সময় একরূপ বুনো গাছের পাতা তাহারা খাইয়া থাকে,—সেইজন্য দুর্গন্ধ হয়। যেদিন গরু ঐরূপ বুনো গাছ না খাইবে, সে দিন দুগ্ধে গন্ধ থাকিবে না। যদি ঐরূপ দুর্গন্ধযুক্ত দুধে কাঁচা অবস্থায় দুই একটি পান ছাড়িয়া দিয়া জাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুধের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পরিবর্ত্তে পানের কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া যায়। জানি না পানের কি এমন শক্তি আছে, যাহাতে দুধে ঐরূপ ক্রিয়া করে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(স্বাস্থ্যসমাচার, ভাদ্র) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীহারা

(ইংরেজী হইতে)

বিগত যুদ্ধের সময় সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ না করিয়া হাওয়ার্ড মেণ্টন্ যে কেন শিকার করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বোধ হয় একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। আমি তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, কাজেই কাজটা আমারই করা উচিত। সে যাহা করিয়াছিল তাহা ভাল কি মন্দ তাহার বিচার আমি করিব না, কেবল কি কারণে সে অমন কাজ করিল তাহা মানুষকে আমি জানাইয়া দিতে চাই। বিচারের ভার আপনারা লইবেন।

হাওয়ার্ড মেণ্টনের সহিত কন্‌স্টান্সের বিবাহের কথা যেদিন প্রথম জানা গেল, সেদিন তাহার বন্ধু-মহলে এক বিস্ময়ের বন্যা আসিয়া পড়িল। বিস্ময়ের কারণ দুই-রকম ছিল—প্রথমতঃ হাওয়ার্ড যে কখনো বিবাহ করিবে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বিতীয়তঃ বিবাহ যদিবা করিল তাহা আবার কন্‌স্টান্সের মত মেয়েকে। হাওয়ার্ডের জীবনযাত্রার প্রণালী যে-প্রকার, তাহাতে তাহার ঘরণী হওয়া কোনো মেয়ের পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না।

হাওয়ার্ড একজন অতি সুদক্ষ এবং অতি প্রসিদ্ধ শিকারী। সভ্যজগতে তাহার আবির্ভাবগুলা ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি ক্ষণিক। ক্লাবের ঘরে বসিয়া হয়ত তুমি আজ দেখিলে হাওয়ার্ডের বিশাল দেহখানা হঠাৎ আসিয়া ঘরে ঢুকিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলে বৎসর খানেক সে জাম্বেজি বা ওরিনোকোর তীরে কাটাইয়া আসিয়াছে। পরদিন সকালের কাগজেই দেখিতে পাইবে "প্রসিদ্ধ শিকারী হাওয়ার্ড মেণ্টন অদ্যকার জাহাজে যাত্রা করিলেন, তাঁহার গম্যস্থান হিমালয় পর্ব্বত।"

কিন্তু হাওয়ার্ড বিবাহ করিল যাহাকে তাহার খ্যাতি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকমের। লঘুচিত্ত প্রজাপতির মত রঙীন পাখ্‌না মেলিয়া যে তরুণীর দল সমাজের বক্ষে উড়িয়া বেড়ায়, সে তাহাদেরই একজন বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু লোকে সন্দেহ করিত যে মেয়েটির বুদ্ধিও বেশ আছে এবং সে নাকি শিল্প কলা বিজ্ঞান সকলেরি খবর কিছু কিছু রাখে। আমি জানিতাম ওয়াশিংটনের ক্লেন্‌ডেনিন্ মিউজিয়মের প্রাণীতত্ত্ব-

বিভাগের সমাচারদর্পণটিতে তাহার অনেকগুলি লেখা আছে, কাজেই হাওয়ার্ডের সঙ্গে তাহার বিবাহটা আমাকে ততটা অবাক করিতে পারে নাই। আমি জানিতাম স্বামী স্ত্রী দুজনে এক রসের রসিক, কেবল একজন তাহার পরিচয় দেয় বন্দুকের গুলিতে, আর একজন কলমের খোঁচায়।

তাহাদের বিবাহের দু তিন দিন পরে হাওয়ার্ডের সঙ্গে আমার দেখা। তাহার কথায় বুঝিলাম বিবাহটা নাস্তর পক্ষে 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'ই হইয়াছে। শুনিলাম, কন্‌স্টান্স্ নাকি কিছু কাল যাবৎ লুকাইয়া লুকাইয়া বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করিতেছিল, এখন নাকি তাহার হাত একেবারে দুরস্ত হইয়া গিয়াছে; পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তগুলির অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ জীবনলীলা দেখিবার সখও তাহার খুব। এতখ নি শুনিয়াও কিন্তু কদিন পরে খবরের কাগজে যে খবরটা পাওয়া গেল, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎ অবাক্ না হইয়া থাকিতে পারি নাই। পড়িলাম, মিষ্টার ও মিসেস্ মেল্টন আবার প্রাচ্য ভূ-বিভাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। বোর্ণিও দ্বীপে, সারায়াকে তাঁহারা শিকার করিতে চলিয়াছেন, এই দুগাটি নাকি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য, এবং ওয়াশিংটনের ক্লেন্‌ডেলিন্ মিউজিয়মওয়ালারাই তাঁহাদের এ যাত্রার মুরুব্বী।

বরকনের মধুচন্দ্র যাপনের ধারাটা অভিনব বটে। মেল্টন আমাকে এসব কথা কিছুই বলে নাই, কিন্তু তাহার কিছুকাল পরে সব কথাই সে আমায় বলিয়াছিল, জগতে বোধ হয় আর কেহই সে কথা শোনে নাই। এই ব্যাপারটা ঠিক যুদ্ধ বাধিবার এক বৎসর আগের ঘটনা।

(২)

যুদ্ধটা তখন বেশ রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছে। সকাল বেলা ক্লাবে বসিয়া আছি, এমন সময় অকস্মাৎ হাওয়ার্ড মেল্টন আসিয়া উপস্থিত। চেহারা যেন প্রেতমূর্ত্তির মত, শালের কোঁড়ার মত দেহ দুইয়া পড়িয়াছে, মুখ শুখাইয়া লম্বা হইয়া গিয়াছে, গায়ের মুখের রঙ্ রোদপোড়া কিন্তু তাহাতে একটু যেন হলুদের ছোপ লাগানো। টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিয়া সে সোজা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর চট্ করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেনথ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

পাশের একটা ছোট ঘরে গিয়া বসিলাম। হাওয়ার্ড তাহার কোটরগত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর আমার দিকে ঝুঁকিয়া বলিয়া উঠিল, "কন্‌স্টান্স্ মারা গেছে।"

আমি বিস্ময়ে আতঙ্কে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "সে কি?"

হাওয়ার্ড আবার বলিল, "হ্যাঁ, সে গেছে।"

আমি একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলাম, "কি বলছ হে, কি হয়েছে?"

হাওয়ার্ড যেন নিজের মনেই বলিয়া চলিল, 'মারা গেছে, তাকে মেরে ফেলেছে, সে শিকার করতে গিয়েছিল, তাকে মেরে ফেলেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে মেরে ফেলেছে, কোথায়, কি শিকার করতে গিয়েছিল সে?"

হাওয়ার্ডের মাথাটা তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, আমার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমন ভাবে সে বলিয়া যাইতে লাগিল, "১৫ই এপ্রিল, সারায়াকে। একজোড়া ছিল, একটা বড়, একটা ছোট; বড়টাই তাকে মেরেছে; আমি ছোটটার গায়ের চাম্‌ড়া আর হাড়গোড়-গুলো কাল মিউজিয়মের কর্ত্তার হাতে দিয়ে এসেছি, আর বড়টার একটা দাঁত নিয়ে এসেছি। সেটাতে এখনো রাগ লেগে আছে, ঠিক মর্চ্চে পড়ার মত।" সে নিজের চোখের উপর হাত চাপিয়া ধরিয়া চেয়ারের মধ্যে যেন ঝুলিয়া পড়িল। আমি তাহার কথার আবথানাও না বুঝিয়া তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলাম।

হঠাৎ উঠিয়া-পড়িয়া সে ঘরের ভিতর অস্থির ভাবে বারদুই পায়চারি করিয়া আসিল। তাহার গর্ত্তে-ঢোকা চোখ যেন আগুনের ফুল্‌কির মত জ্বলিতে লাগিল। আমার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আমি শোধ নিয়েছি, আঃ এমন শোধ কেউ কখনও নেয়নি। এইটে পড়, সব বুঝতে পারবে।" কোটের পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া সে আমার হাতে গুঁজিয়া দিল।

আমি কাগজের তাড়া খুলিয়া দেখিলাম, উপরেই লেখা—"ওয়াশিংটনের ক্লেন্‌ডেলিন্ মিউজিয়ম, জীবজন্তু বিভাগ হইতে।'

তারপর একটি জীবের বর্ণনা। উহা হস্তীবংশীয়, কিন্তু সেকালের ম্যাস্‌টোডনের জ্ঞাতি। পৃথিবীর কোন্ এক অতীতযুগের সাক্ষী হইয়া এইরূপ একজোড়া প্রাণী নাকি এখনও সারায়াকের ভিতরের জঙ্গলে বাস করিতেছে। আমি ব্যগ্রভাবে পড়িয়া চলিলাম, বর্ণনাটির তলায় মিউজিয়মের অধ্যক্ষের নাম স্বাক্ষরিত, কাজেই অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

এই জীবদুটির খবর নাকি প্রথমে সারায়াকের দেশী শিকারীরা মিউজিয়মের সংবাদদাতাদিগকে দিয়াছিল। ইহা লইয়া দিনকতক ভূতত্ত্ববিভাগ এবং প্রাণীতত্ত্ববিভাগে খুব আলোচনা চলে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে যে-সকল জীবের খবর জানা যায়, তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো জীব যে এখনো দু'একটি বাঁচিয়া আছে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। হস্তীর এই পূর্ব্বপুরুষটির নাম প্যালিথেরিয়ম্, জীববিজ্ঞানে যে ম্যাস্‌টোডনের খবর পাওয়া যায়, এ তাহারই জ্ঞাতি। ইহার দাঁত অতি দীর্ঘ, আকারে আয়তনে সাধারণ হস্তীর তিন-চারগুণ হইবে। প্রত্যেক জীবজাতির অবসানের কালে জাতিটি অবশেষে প্রায়ই দুইটিমাত্র প্রাণীতে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু ইহাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা থাকে না, কাজেই ইহাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সেই জীবজাতি ধরাতল হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। সারায়াকের এই প্যালিথেরিয়ম-যুগল তাহাদের বংশের শেষ প্রাণী। ঐ দেশীয় লোকেদের বিশ্বাস যে ঐ জীব দুটি বহুকাল হইতে ঐ একই স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদের কোনো সন্ততি নাই।

দেশী শিকারীদিগের কথার সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য এখানের প্রাণীতত্ত্ববিভাগ মিঃ হাওয়ার্ড মেণ্টনকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি অতি দক্ষ শিকারী এবং গত দশবৎসর পৃথিবীর সকল অংশে শিকার করিয়া কাটাইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রাণীদ্বয়কে বধ করিয়া তাহাদের কঙ্কাল এই মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার তিনি লইয়াছেন। আমাদের পাঠকেরা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে মিঃ মেণ্টনের নববিবাহিতা পত্নীও তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছেন।

কাগজখানিতে যে তারিখ দেখিলাম তাহা হাওয়ার্ডের বিবাহেরই সমসাময়িক। আমি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, "তা সেগুলোকে মেরে নিয়ে এসেছ ত?"

হাওয়ার্ড বলিল, "হস্তিনীটার চামড়াখানা এবং কঙ্কালটা নিখুঁৎ অবস্থায় এনেছি, আর হাতীটার কেবল একটা দাঁত এনেছি।"

আমি বলিলাম, "কেন, শুধু দাঁত কেন? সেটাকে রেখে এলে কেন?"

হাওয়ার্ড হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তার হাসি যেন আমার কানে আর্ত্তনাদের মত আসিয়া বাজিল। সে বলিল, "সেটাকে রেখে এসেছি, বেঁচে থাকুক, বেঁচে থাকুক, একশ কি হাজার বছর ধরে, বংশের শেষ সে।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন গরম হাওয়ার ঝাপ্‌টা বাহির হয়, তার কথাও যেন সেই-রকম করিয়া তাহার মনের প্রচণ্ড উত্তাপকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এই না বল্‌লে যে হাতীটাই কন্‌স্টান্স্‌কে—"

হাওয়ার্ড বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই।"

আমি বলিলাম, "তবে সেটাকেই তুমি ছেড়ে এলে কেন?"

হাওয়ার্ডের মুখে একটা পৈশাচিক আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল, বিকৃত বিবর্ণ মুখে সে বলিল, "মার্‌ব কেন? মার্‌লে যে তার উপর দয়া করা হত।"

আমি বলিলাম, "দয়া কি রকম?"

"দয়াই ত। আমি তখন ছিলাম না যখন এই ব্যাপারটা ঘট্‌ল। কন্‌স্টান্স দেশী শিকারীদের নিয়ে রেজাং নদীর তীরে তাঁবু গেড়ে রইল, আমি কাজে গেলাম। ফিরে এসে শুন্‌লাম যে প্যালিথেরিয়ম্ দুটোর সে হটাৎ সন্ধান পায়। দেশী শিকারীদের নিয়ে সে তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে গিয়ে গিয়ে মাইল পনেরো দূরে একটা ডোবার ধারে তাদের দেখা পায়। তার এমন সাহস ছিল, সে দুটোকেই শিকার কর্‌বার চেষ্টা করে—কিন্তু পার্‌ল না।" সে আবার দুই হাতে নিজের চোখ চাপিয়া ধরিল, তাহার মানসনেত্রে যে ভীষণ দৃশ্য সে দেখিতেছিল, তাহা হইতে যেন সে নিজেকে আড়াল করিতে চাহিতেছিল। কান্না যেন তাহার বুক ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে, তাহা চাপিয়া রাখিল। একটু পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"হাতীটাই তাকে মেরেছিল। শিকারীরা আমায় সে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তিনজন দেশী শিকারীও মারা যায়। উঃ! তাদের মানুষ বলে চিন্‌বার আর কিছু ছিল না।" পকেট হইতে তামাকের পাইপ্‌ বাহির করিয়া সে তাহাতে ঘন ঘন টান দিতে লাগিল। সমস্ত ঘর দেখিতে দেখিতে ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিলে হাওয়ার্ড আবার সুরু করিল—"সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনে আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল। আমি তাকে মারবই, যে আমার সঙ্গিনীকে মেরেছে। তাঁবু উঠিয়ে ফেল্‌লাম, সেই-দিকে চল্‌লাম যেখানে আমার জীবনের একমাত্র আলোর শিখা পাশবিক ফুৎকারে নিভে গিয়েছে।

"পায়ের দাগ এতবড়, যে, ভুল করা যায় না; তাই ধরে চল্‌তে চল্‌তে একেবারে জঙ্গলের বুকের মধ্যে গিয়ে পড়্‌লাম। সেই ডোবার ধারে এলাম, শিকারীরা আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিল। সেখানকার মাটিকে যেন রোলার দিয়ে পিটিয়ে সমান করে দিয়েছে।

"দুদিন পরে আমি সে দুটোর দেখা পেলাম। জায়গাটা প্রকাণ্ড গাছের সার দিয়ে ঘেরা, ছোট ছোট ঝোপে ভর্ত্তি। সব চেয়ে উঁচু গাছটার তলায় হাতীটা দাঁড়িয়ে আছে, শুঁড় দিয়ে তার সঙ্গিনীর বিশাল দেহ জড়িয়ে ধরে, যেমন মানুষে হাত দিয়ে নিজের প্রিয়াকে জড়িয়ে ধরে ঠিক তেমনি।

"দৃশ্যটা দেখে রাগে আমার মাথা ঘুরে উঠ্‌ল, প্রতিহিংসা ছাড়া তখন আমার জগতে আর কিছু ছিল না। বন্দুক তুলে ধরে আমি হাতীটার দিকে তাক্ করতে লাগ্‌লাম। তার প্রকাণ্ড কুলোর মত কানের নীচে যে জায়গাটা, সেখানে মারতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

"ঘোড়াটা টিপ্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় আমার সঙ্গের একটা শিকারী আমার কাঁধের উপর আঙুল দিয়ে টোকা মার্‌ল। আমি বুঝ্‌লাম সে কি বল্‌তে চায়। এই-রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐ অতিকায়টাকে শিকার করতে গেলে তাকে মারার চেয়ে দলসুদ্ধ আমাদেরই মারা যাবার সম্ভাবনা বেশী। কাজে-কাজেই আস্তে আস্তে খুব সাবধানে আমরা সেখান থেকে সরে পড়্‌লাম। একবার আমাদের দেখ্‌তে পেলে কি গন্ধ পেলে আর রক্ষা থাকত না।

"পরদিন সকালে আবার সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। ভাল করে চারিদিক পরীক্ষা করে বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে এখানটা তাদের একটা আড্ডা, সন্ধ্যার সময় রোজই বোধ হয় তারা এখানে এসে বিশ্রাম করে; অনেকখানি জায়গা একেবারে পিটিয়ে সমান করা।

"কি করতে হবে তা চটপট ঠিক করে নেওয়া গেল। গাছগুলোর গায়ে আইভি লতা একেবারে ছেয়ে রয়েছে, শিকারীরা সেইগুলো বেয়ে গাছে উঠে পড়্‌ল। আমি এমন একটা জায়গা বেছে নিলাম যেখান থেকে তলাটা—বিশেষ করে যেখানে হাতি দুটো আগের দিন দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটা—বেশ ভাল করে দেখা যায়। আমি একজন শিকারীকে নিয়ে সেই জায়গার সত্তর ফুট আন্দাজ উঁচে একটা গাছের ডালে বসে রইলাম।

"আমি যা ভেবেছিলাম দেখ্‌লাম ঠিক তাই হল। বনের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আস্‌তে না আস্‌তে চারিদিকে গাছপালা ভাঙ্গা শব্দ আরম্ভ হল, বুঝ্‌লাম দুটোতে মিলে এগিয়ে আস্‌ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল; ঠিক তেমনি করে আমাদের তলায় এসে দাঁড়াল। হাতীটা শুঁড় দিয়ে তার সাথীকে আলিঙ্গন করে রইল; প্রকাণ্ড মহাকায় এই জন্তুদুটো, এক অতীত যুগের শেষ স্মৃতিচিহ্ন; নিজেদের জাতির, বংশের শেষ সৃষ্টি।

"কিন্তু মন তখন আমার প্রতিহিংসায় ভরা, বেশীক্ষণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিন্তা করবার মত অবস্থা ছিল না। বন্দুক তুলে হাতীটার প্রকাণ্ড কপালের মাঝখানটাতে লক্ষ্য করলাম। আঙ্গুলটা প্রায় ঘোড়ার উপর পড়েছে, এমন সময় আমার মাথায় চট করে আর-একটা চিন্তা এসে ঢুকল।

"হতভাগা খুনে জানোয়ারটাকে মেরে আমি তার উপকার করতে যাব কেন? তার শাস্তি অমলে ঠিক হয় যদি আমি তাকে না মেরে তার সঙ্গিনীকে মারি। আমি তার কাছে যা পেয়েছি, ঠিক তাই তাকে ফিরিয়ে দেব।" মেল্টন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার শোকটা যে তখনও একেবারে নূতন, সঙ্গীহারা হবার আগের ক্ষণ অবধি যে আমি কিছুই জানিনি, হটাৎ শেল এসে বুকে লাগল। আমার সমস্ত মন প্রতিহিংসার জন্য তৃষিত হয়ে ছিল, এমন প্রতিহিংসা নেবো বা কেউ কখনো নেয়নি। খুনেটাকে মারব না কিন্তু যন্ত্রণায়

সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকবে। ঐ যে সে শুঁড় দিয়ে নিজের সঙ্গিনীকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও ছাড়া ওর নিজের জাতের জীব ত পৃথিবীতে আর একটাও নেই; হস্তিনীটাকে মেরে ফেল্‌লে ওকে আমরণ একলা কাটাতে হবে, আর সে ত কম দিন নয়, অমন অতিকায় জীব অল্পদিনে মরে না।

"না, আমি হাতীটাকে মারছি না, আমি তার প্রিয়াকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেব; সে যেমন আমাকে সঙ্গীহারা করেছে, আমিও তাকে তাই করব। তারপর সে একলা বনে বনে ঘুরে বেড়াবে, পঞ্চাশ বছর ধরে কি এক'শ বছর হয়ত বা দু'শ বছর ধরে, সঙ্গিহীন একেবারে একলা। একলা বল্‌তে কি বোঝায় তা কি জান কেনেথ? জান না বোধ হয়, তোমায় ত পেয়ে হারাতে হয়নি।

"মনে মনে এই ফন্দি ঠিক করবামাত্র আমার সমস্ত মন যেন আরামে ভরে গেল। বুকের ভিতরের ক্ষতের জ্বালা যেন দূর হয়ে গেল। বন্দুক তুলে হস্তিনীর মাথার খুলির পিছনে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিলাম। তার পাহাড়ের মত শরীর দুলে উঠ্‌ল, পরের মুহূর্ত্তেই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়্‌ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার আর-সব শেষ হয়ে গেল, পড়ে রইল কেবল প্রকাণ্ড একটা মাংসের স্তূপ।

"হাতীটার কাণ্ড দেখে আমার মুখ হাসিতে ভরে গেল। আমার শিকারীরা বলে—সে হাসি দেখে নাকি তাদের ভয়ে বুক কাঁপ্‌ছিল।

"হাতীটা প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝ্‌তেই পারেনি যে ব্যাপারটা কি হল। হয়ত বা ভাব্‌ল যে, তার সঙ্গিনী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, না হয় হটাৎ বসে পড়্‌ল। ছোট ছোট চোখে মিট্‌মিট্‌ করে সে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা তুলে বারুদের গন্ধটা শুঁকতে লাগ্‌ল। তার থামের মত মোটা মোটা পা খুব জোরে জোরে মাটিতে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে সে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। হটাৎ তার দৃষ্টি পড়্‌ল তার ভূলুণ্ঠিতা সঙ্গিনীর দিকে, তার গলার ভিতর কি-রকম ঘড়ঘড় আওয়াজ হতে লাগ্‌ল, নীচু হয়ে সে শুঁড় দিয়ে সঙ্গিনীর দেহ থাবড়াতে লাগ্‌ল, যেন আদর করে তাকে মাটি থেকে তুল্‌তে চায়। কিন্তু তার যে উঠ্‌বার পালা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

"হাতীটা আবার চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌ল, তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কিছুতেই যেন ব্যাপারটাকে আয়ত্ত করতে পারছিল না। ভয়ানক একটা শব্দ হল, তার পরেই তার সাথী গড়িয়ে পড়্‌ল, এর মানে কি? খানিক পরে তার স্থূল বুদ্ধিতে বোধ হয় একটা ভীতিজনক কিছুর আভাস এসে পৌছল, সে ভয়ানক একটা চীৎকার করে উঠ্‌ল, হাঁটুগেড়ে সেই বিরাট মাংসস্তূপের কাছে বসে পড়ে তার উপর নিজের শুঁড় দিয়ে সেটাকে থাবড়াতে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘড়্‌ঘড়ে বুক-ফাটা কান্নার সুর।

"আবার হটাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, লাল চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখে শুঁড় তুলে ভীষণ আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল, তার চোটে গাছের পাতাগুলো সুদ্ধ থরথর করে কেঁপে উঠ্‌ল।

"সে প্রচণ্ড বেগে লাফ দিতে দিতে একবার এদিকে যেতে লাগ্‌ল, একবার ওদিকে; যা কিছু তার সাম্‌নে ছিল সব ভেঙ্গে চুরে থেঁৎলে শেষ করে ফেল্‌ল। তার তাণ্ডব নৃত্যে পায়ের তলার মাটি ভূমিকম্পের মত টল্‌তে লাগ্‌ল। ঠিক যেন সচল পাহাড়ের ক্রুদ্ধ নাচ।

"তখন আর তাকে মার্‌বার আমার এক ফোঁটাও ইচ্ছে ছিল না। বুঝ্‌লাম প্রতিহিংসা পুরোপুরি নিয়েছি। তাকে এই একলা থাকার শাস্তি পেতে হবে দু-একদিনের জন্য নয়, যুগযুগান্তর ধরে, হয়ত বা শতাব্দী ধরে। নিজের যন্ত্রণার মাপকাটি দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম তার যন্ত্রণা কতখানি হবে। তার সঙ্গিনী চলে গেল, পৃথিবীতে আর এমন কেউ রইল না যে তার সে-স্থান নিতে পারে।

"হটাৎ হাতীটা একটা মস্ত গাছের শুঁড়িতে এসে এক ঢুঁ মার্‌ল। এমন জোরে মেরেছিল যে তার একটা দাঁত ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। গাছটা আগা গোড়া কেঁপে উঠ্‌ল; তার একটা ডাল থেকে একজন শিকারী ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে গেল। লোহার থামের মত পায়ের তলায় এক মিনিটেই তার জীবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। নিজের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির একটা খোরাক পাবার পর সে ব্যগ্র হয়ে চারিদিকে ফিরে ফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল আর কোথাও কেউ আছে কি না। আমি যে গাছটায় ছিলাম সে দিকেও ফির্‌ল, জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে মাথা দুলিয়ে এধার ওধার তাকাতে লাগ্‌ল, যেন এক জোড়া কামারের হাপর চল্‌ছে। আমরা যদি আর-একটু নীচে থাকতাম, তা হলে সে

আমাদের মাথা তুলেই দেখ্‌তে পেত, আর ছোট ছেলে যেমন করে পিঁপ্‌ড়ে টিপে মারে তেমনি করেই মেরে ফেল্‌ত।

"কিন্তু বুদ্ধি তার নিতান্তই কম, সে উপর দিকে তাকালও না; ঘাড় তার বুদ্ধির মতনই খাটো, উপর দিকে দেখ্‌বারও জো তার ছিল না; আবার এধার ওধার লক্ষ দিয়ে শুঁতো মেরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

"খানিক পরে মৃত হস্তিনীর কাছে ফিরে এসে তার সমস্ত দেহে শুঁড় বুলিয়ে দিতে দিতে সে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। সে যে কান্না, মানুষের ভাষায় নয় বটে, কিন্তু তার বিরাট বুক ফেটে যে শোকের আর্ত্তনাদ বেরচ্ছিল তার মানে আমি পরিষ্কার বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। এতক্ষণে যেন সে নিজের অবস্থা ভাল করে বুঝ্‌তে পার্‌ল।

"শেষে সে উঠে দাঁড়াল, আকাশের দিকে শুঁড় তুলে একবার আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল, যেন অতীত যুগে যে বিধাতা তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর দরবারে নিজের ভাষাহীন আবেদন জানাতে চাইল। তারপর হুড়মুড় করে ঝোপঝাপগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল, অনেকক্ষণ অবধি তার প্রাণ্ড গতির শব্দ আমাদের কানে এসে এসে শেষে থেমে গেল।"

আমি বলিলাম, "কি ভীষণ প্রতিশোধ!"

মেল্টন বলিল, "হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় শোধ আর কেউ দিতে পারে না। কিন্তু আমার প্রতিহিংসা এখন যেন ভূতের মত আমাকে পেয়ে বসেছে, আমি তার সেই বুকফাটা ভীষণ আর্ত্তনাদ কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছি না। পাহাড়-কাটা নো সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ট্রেন যায় যখন, তখন তার শব্দ শুনেছ,—ঠিক সেই-রকম। শব্দটা বড় ভীষণ, কঠিন আবরণ ভেদ করে সবটা বাইরে আসে না বলে আরও ভীষণ। এ যেন রুদ্ধমুখ আগ্নেয়-গিরির আর্ত্তনাদ। আমি তার পর আর তাকে দেখিনি, এখনও তাকে বহু কাল বাঁচ্‌তে হবে। কিন্তু যখনই আমি সুড়ঙ্গের ভিতর ট্রেন যাবার শব্দ শুনি, তখনি আমার কানে সেই সঙ্গীহারা অতিকায়ের মর্ম্ম-ভেদী চীৎকার এসে বাজে। সে আমি ভুল্‌তে পারি না।"

(৩)

ইটালি ছাড়া সব কজন ইউরোপীয় শক্তিই যখন যুদ্ধের আসরে নামিয়া পড়িল এবং জর্ম্মানরা যখন একেবারে পারী নগরের সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল, তখন আমি আশা করিলাম মেল্টন নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগ দিবে। আশা পূর্ণ হইতেও দেরি হইল না। টেলিফোনে তাহার নিমন্ত্রণ পাইলাম, আমার বাড়ীর কিছু দূরে একটি 'রেস্তরাঁতে' সে আমাকে জলযোগ করিতে আহ্বান করিতেছে। জায়গাটার আর সবই ভাল, কেবল রেলাইনের বড়ই কাছে। হাওয়ার্ড এতেন জায়গায় সাহিয়া যাইতেছে মনে করিয়া একটু অবাক হইয়া গেলাম। তবে হাওয়ার্ডের কাজ প্রায় সবই অদ্ভুত।

কফি পান শেষ করিয়া দুজনে দুটা চুরুট ধরাইলাম। সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "কেনেথ, আমি ঠিক করছি এবার যুদ্ধে ঢুকে পড়্‌ব।"

আমি বলিলাম, "ভালই ত, আনন্দের বিষয়। স্বাস্থ্য-হিসাবে নেহাৎ অক্ষম না হলে আমিও ঢুকে পড়্‌তাম, কোনো বাধা মান্‌তাম না।"

হাওয়ার্ড বলিল, "বাধা ত আমারও আছে, তবুও..."

আমি তাহার অসুরের মত দেহের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমার আবার বাধা? চিরজন্মই ত ঐ কর্ম্মে কাটিয়েছ, সংসারেও এমন কোনো বন্ধন নেই।"

মেল্টন বলিল, "সেই কথাই ত হচ্ছে। আচ্ছা, আমি এই জায়গাটায় বেচে এসে বসেছি বলে তোমার আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে না?"

আমি বলিলাম, "লাগ্‌ছে ত এবং ট্রেন যাওয়ার শব্দে তুমি যে থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছ সেটাও ত দেখ্‌ছি।"

মেল্টন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চুরুট টানিতে লাগিল, তারপর বলিল, "জান কেনেথ, অনেক সময় রাত্রে চম্‌কে আমি জেগে উঠি, মনে হয় আমার কানে সেই পণ্ডটার ক্ষুণ্ণার আর্ত্তনাদ এসে পৌঁছুচ্ছে। আমার ডাক্তার বন্ধু, ও-সব খেয়াল।

ঠিক এই সময় একটা ট্রেন চারিদিক কাঁপাইয়া আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার শব্দ যতক্ষণ না মিলাইয়া গেল ততক্ষণ মেল্টন দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল, তারপর আমায় বলিতে আরম্ভ করিল, "যুদ্ধে ঢুক্‌বার আগে আমার আর-একটা কাজ করে যেতে হবে। সারাহাকে গিয়ে সেটাকে মেরে তার যন্ত্রণার অবসান করে দিয়ে আস্‌ব।"

আমি বলিলাম, "এখন ত যুদ্ধে যাও, পরে ফিরে এসে না হয় সারায়াকে যাবে।"

মেণ্টন বলিল, "যুদ্ধের থেকে না ফির্‌তেও ত পারি। এমন কি, আমি এক-রকম নিশ্চিতই জানি যে একবার গেলে আমি আর ফির্‌ব না।"

আর-একটা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। মেণ্টনের সমস্ত শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল, "দেখ্‌ছ, এই অবস্থা আমার তখন থেকে চলেছে। আমার ডাক্তার বলে, এ-সব বাতিক। এ বাতিকের অবসান না ঘট্‌লে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

আবার খানিকক্ষণ নীরবে ধূমপান চলিল। মেণ্টন উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া একটু পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "কেনেথ, আমি মনে করি ন্যায়পরতার খাতিরেই আমার সারায়াকে যাওয়া উচিত। এই যুদ্ধটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে অন্যায়কে আর নিষ্ঠুরতাকে চির-নির্ব্বাসন দেবার জন্যে। আমি কি করে এই যুদ্ধে যোগ দেব, যদি আমি নিজের নিষ্ঠুরতম অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত না করে যাই? আমি প্রতিহিংসা নিয়েছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখিনি যে সেই পশুটা তার পক্ষে কোনো অন্যায়ই করেনি। তার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির বশে সে আমার স্ত্রীকে মেরেছিল। আমি তাই তার সঙ্গিনীকে হত্যা করে শোধ নিলাম। উপর থেকে দেখ্‌লে মনে হয় ন্যায়বিচারই করেছিলাম, না? কিন্তু না, এর ভিতর ন্যায়-বিচার কোথাও নেই। কন্‌স্টান্স্ মারা গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মানুষ জাতটা বেঁচে আছে, এ যে কত বড় সান্ত্বনা তা কি বুঝ্‌তে পারছ? এখন কল্পনাও কর্‌তে পারি না বটে, কিন্তু হয়ত এমন দিন আস্‌বে যখন অন্য কোনো নারীকে আবার আমি আমার জীবনসঙ্গিনী বলে কাছে টেনে আন্‌ব; যে সুখ আমার এখন বিদায় নিয়েছে, তা হয়ত আবার ফিরে আস্‌বে, অন্ততঃ আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাক্‌ব।

"কিন্তু সেই হতভাগ্য পশুকে আমি কি ভয়ানক শাস্তি দিয়েছি, এত বড় ভীষণ শাস্তি পাবার উপযুক্ত পাপ সে করেনি, আমার অধিকার ছিল না তাকে এমন যন্ত্রণা দেবার। সঙ্গিনী হারিয়ে বেঁচে থাকার যে যাতনা তা ভগবান আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ অতিকায় জীবটা তার সঙ্গিনীকে ঠিক তেমনিই ভালবাস্‌ত, আমি আমার স্ত্রীকে যেমন ভালবাস্‌তাম। তা আমি তাদের দেখেই বুঝেছিলাম, যখন হাতীটা শুঁড় দিয়ে হস্তিনীকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর নিজের মৃত সঙ্গিনীর গায়ে মাথা রেখে তার সে আর্ত্তনাদ, সে দৃশ্য আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না, সে শব্দ এখনও আমার কানে বাজ্‌ছে। না, আমি জাহাজ ঠিক করেছি, সারায়াকে গিয়ে আমি তার যন্ত্রণার অবসান করে আস্‌ব। আমার চেয়ে সে যে ঢের বেশী বোঝা বইছে, তার জাতের আর-একটা প্রাণীও ত পৃথিবীতে বাকি নেই, সে যে একলা, কি ভয়ানক একলা। কেনেথ, কল্পনা কর্‌তে পার, পৃথিবীর সব মানুষ মরে গেছে, কেবল তুমি বেঁচে আছ?"

মেণ্টন উঠিয়া পড়িল এবং বিল শোধ করিয়া দিয়া, আমার কাছে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪)

বহুকাল আর তাহার খোঁজ খবর পাই নাই। যুদ্ধ তখনও চলিতেছে, এমন সময় একদিন খবরের কাগজের এক কোণে এই খবরটা দেখিতে পাইলাম।

"ব্রিটীশ নর্থ বোর্ণিওর শাসনবিভাগ জ্ঞাত হইয়াছেন যে সারায়াকের জঙ্গলে প্রসিদ্ধ শিকারী হাওয়ার্ড মেণ্টনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তিনি এখানে হস্তী জাতীয় এক অতিকায় পশুকে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহের পার্শ্বেই তাঁহার শিকারটির বিরাট দেহখানা পাওয়া গিয়াছে, গুলি তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া গিয়াছে।

"মিঃ মেণ্টনের সহিত যে-সকল দেশী শিকারী গিয়াছিল, তাহারা সকলেই খুব সম্ভব বিপদকালে তাঁহাকে একাকী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। মিঃ মেণ্টনের বাড়্‌তি বন্দুক প্রভৃতি তাহাদের হাতেই ছিল, এইজন্য তিনি বোধ হয় নিরস্ত্র অবস্থায় ঐ অতিকায়ের আক্রমণে নিহত হন। এ বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে।"

কাগজখানা রাখিয়া দিলাম। যাক, দুজনেরই যন্ত্রণার অবসান ঘটিল। পরস্পরের যাতনার কারণ যাহারা ছিল, তাহারাই যাতনার সমাপনও করিয়া দিল।

শ্রীসীতা দেবী।

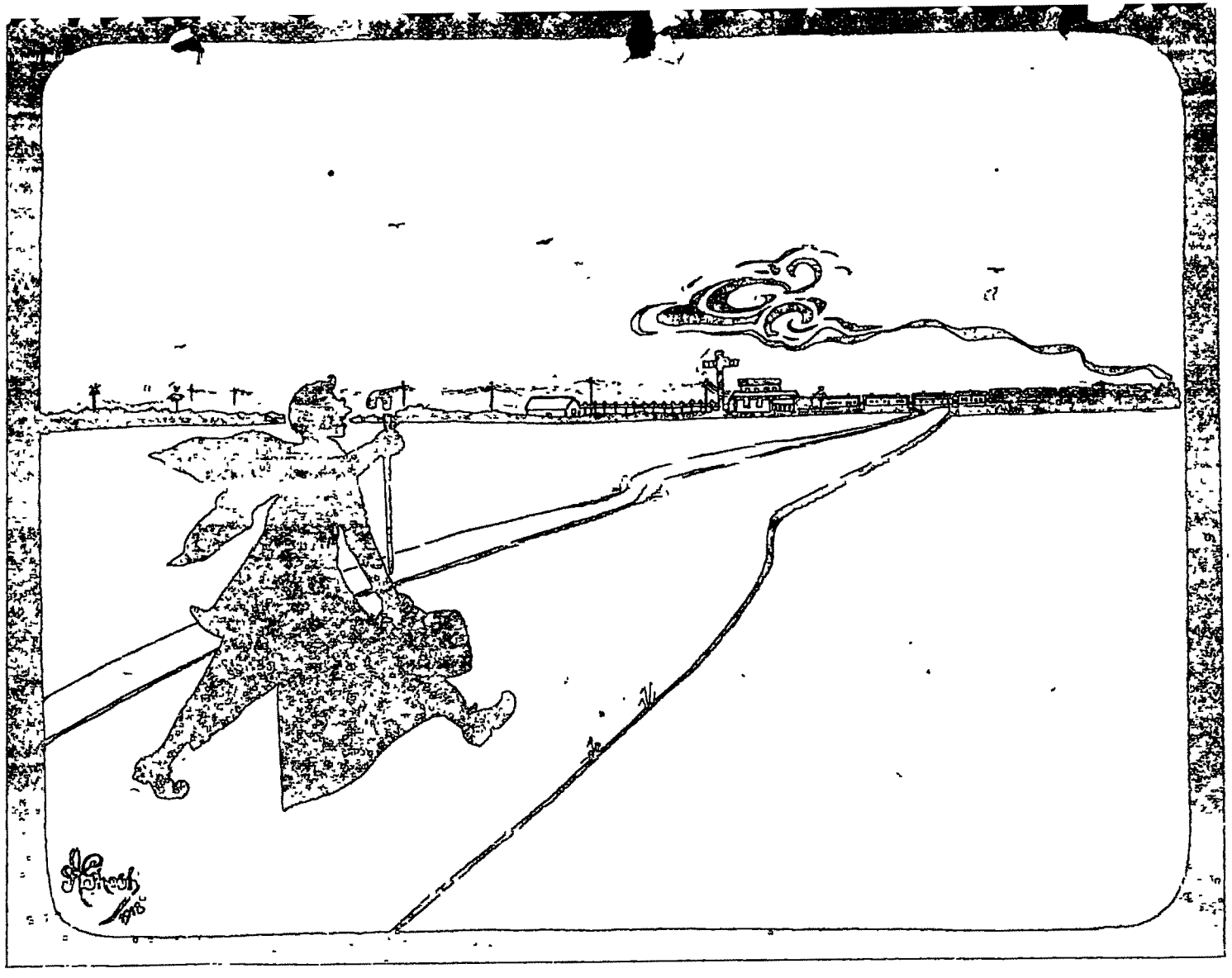

ঐ ৸৹।

[চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে।]

শিব-ঠাকুরের ঠিকুজি

দেবতা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে দেবতাদের ইতিহাস জড়িত। কালে কালে ও দেশে দেশে মানব-কল্পনা পুঞ্জিত হইয়া প্রবাল-দ্বীপের ন্যায় এক এক দেবতাকে গড়িয়া তোলে। যিনি দেবতাদিগের মধ্যে মহাদেব, যিনি রুদ্র অথচ শিব, যিনি গৃহী অথচ সন্ন্যাসী, যিনি ত্রিলোকপতি অথচ ত্যাগী দরিদ্র, সেই মহেশ্বর দেবতা বহু কালের বহু দেশের বহু সমাজ-স্তরের দেবকল্পনার সমষ্টি।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বা সমসাময়িক বহু সভ্য দেশ ভারতবর্ষের বাহিরে ছিল—ঈজিপ্ট বা মিশ্রদেশ, বাবিলন বা বাবরুষ, ক্যাল্‌ডিয়া, সীরিয়া, গ্রীস, রোম ইত্যাদি। এই-সব দেশের চিন্তা-ধারার পরস্পর যোগ অতি প্রাচীন কালেই যে ঘটিয়াছিল তার বহু পরিচয়ের মধ্যে শিব-শক্তি পূজার ইতিহাস একটি প্রধান প্রমাণ। সমস্ত প্রাচীন জনপদে সভ্যতা অনেক বিষয়ে পরস্পরের নিকট ঋণী।

বৈদিক ঋষিরা ছিলেন বিশ্বদেবাঃ অর্থাৎ বিশ্বদেববাদী বা সর্ব্বেশ্বরবাদী; তাঁরা জানিতেন জগতের যত কিছু ঘটনা সমস্তই ঐশী প্রকাশ। একই বহু ও বহুই এক—এই বোধ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার শক্তিপ্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করিতে থাকে। আদিতে বেদে একই পরমেশ্বরের প্রকাশকে ত্রিমূর্ত্তিতে কল্পনা করা হয়—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র বা বরুণ, এবং সূর্য্য বা সবিতা বা বিষ্ণু। এই ত্রিদেব বা ত্রিমূর্ত্তি একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশের নামান্তর মাত্র ছিলেন (বেদপ্রবেশিকা, ২১৭ পৃষ্ঠা; উপাসক-সম্প্রদায়, অনুক্রমণিকা)। মানুষের জ্ঞানের দ্বার একাদশ বলিয়া মানুষের নিকট দেবশক্তির প্রকাশের রূপ হইল ১১। এই ১১ কে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা কল্পনা করিয়া হইল ৩৩। বিশ্বদেব-নিবিদ্ (ঋক ও যজুসের মধ্যবর্ত্তী রচনা) দেবতার সংখ্যা ৩৩, ৩০৩, ৩০৩৩ বলিয়া একের বহুরূপের কল্পনা করিল। তাহা হইতে পৌরাণিক দেবতার সংখ্যা হইল ৩৩ কোটি। তিন সংখ্যাটার প্রতি লোকের কেমন একটা মোহ আছে—এই রাশিটিকে মানুষ রহস্যাবৃত মন্ত্রাত্মক বলিয়া মনে করে। তাই হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন, ক্রিশ্চানদের ত্রিনিটি দেবস্বরূপের প্রকাশক; তার পর ত্রিলোক, ত্রিতাপ, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিকাল, ত্রয়ী বিদ্যা, ত্রিক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিদশ, ত্রিকুল, ত্রিগণ, ত্র্যম্বক, ত্রিদণ্ডী, ত্র্যহস্পর্শ, ত্রিদোষ, ত্রিধারা, ত্রিপিষ্টপ, ত্রিপুট, ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুর, ত্রিবলি, ত্রিবৃৎ, ত্রিবেণী, ত্রিশূল, ত্রিসন্ধ্যা, ত্র্যক্ষর ইত্যাদি অনেক কিছুতেই ত্রিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বদেবনিবিদ্ ৩০০৩ দেবতা কল্পনা করিলেও পুরাণ রচনার আগে পর্য্যন্ত ৩৩ দেবতার বেশী স্বীকৃত হন নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে ৩৩ দেবতারই উল্লেখ পাওয়া যায়—

"ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ" (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১।১৩)।

বৈদিক প্রাথমিক ত্রিদেবতা অগ্নি, বায়ু বা বরুণ বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য বা সবিতা বা বিষ্ণু; ইঁহাদের মধ্যে শিবের সন্ধান আমরা পাই না। দ্বিতীয় স্তরের ১১ দেবতার নামের মধ্যেও শিবের পরবর্ত্তী হাজার নামের সঙ্গে মিলে এমন একটি নামও নাই। এই দ্বিতীয় স্তরের ১১ দেবতার মধ্যে এক দেবতা মরুৎ; ইনিই শিব সৃষ্টির বীজ।

এই মরুৎ বৈদিক দেবসমাজে প্রবেশলাভ করেন বহির্ভারত হইতে আসিয়া। ব্যাবিলনে এক বায়ু-দেবতা পূজিত হইতেন, তাঁর নাম ছিল মেরোডাক। বেদে এই মেরোডাক প্রবেশ করিয়া প্রথমে হন মার্ডীক—

"কস্তে দেবঃ অধি আসীৎ মার্ডীক যৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য। অর্থত্যা শুনঃ অগ্রণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্।" ৪ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত।

'এই মার্ডীক দেবতা কে যিনি তোমার (ইন্দ্রের) পিতাকে বধ করিয়াছেন? (ইন্দ্র বলিলেন) ব্রাত্য লোকেরা কুকুরের অন্ন পাক করিল, কিন্তু দেবতাদের মধ্যে মর্ডিত বলিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না।' এই মার্ডীক বা মর্ডিত প্রথমে ইন্দ্রবিরোধী ছিলেন দেখা যাইতেছে, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে তিনি ব্রাত্য বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরও অপরিজ্ঞাত আগন্তু দেবতা ছিলেন। এই মার্ডীক বা মর্ডিত পরে হইয়া পড়েন মরুৎ ও মাতরিশ্বা। মরুৎ যখন দেবমাতা অদিতির গর্ভে ভ্রূণ হইয়া বৈদিক দেব-

সমাজে জন্মলাভের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে বধ করিবার জন্য দুইবার বজ্রপ্রহার করিয়া তিন-সাতে উনপঞ্চাশ খণ্ড করেন; বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বৈরিতা সত্ত্বেও মরুৎ বৈদিক দেবসমাজে জন্মলাভ করিয়া স্থায়ী দেবপদবী কায়েমী করিয়া লইলেন। মেরোডাকের অন্য এক নাম ছিল বেল-মেরোডাক। বেদে নবাগত মরুৎগিকে বীলু বলা হইয়াছে—বীলুচিদারুজত্নুভিঃ গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।

বেদের তৃতীয় স্তরে দেবতাদের সংখ্যা যখন ৩৩ হইল, তার মধ্যে এক দেবতা আসিলেন রুদ্র। এই রুদ্র হইলেন মরুৎগণের পিতা—অতো পিতর্ মরুতাম্—মণ্ডল ২, সূক্ত ৩৩। এজন্য রুদ্রের অপর নাম হইল মীঢ় বা মূলয়কু বা মৃড়;—রুদ্রের এই নাম মরুৎ বা মাতরিশ্বা বা মর্ডিত বা মার্ডীক বা মেরোডাক শব্দেরই রূপান্তর। মরুৎগণ রুদ্রের পুত্র হইয়া নাম পাইল রুদ্রীয়। রুদ্র সর্ব্বদা মরুৎগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেন, এজন্য রুদ্র হইলেন গণপতি, গণেশ।

মরুৎ বায়ু-দেবতা রুদ্রও ঋগ্বেদে বিদ্যুৎ বা ঝড় মাত্র। যাস্ক নিরুক্তে রুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—রুদ্রো রৌতীতি সতঃ রোরূয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা। —নিরুক্ত, ১০-১,২।—যে শব্দ করিতে করিতে গলিয়া যায় সেই রুদ্র। অর্থাৎ মেঘ এই রুদ্র বজ্রধর।—মেঘই বজ্রধর।

আবার "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"—নিরুক্ত, ১০-৭। এইজন্য তিনি "শিখ-ধূম-কপর্দিলঃ।" এইখানে আমরা শিবের জটার বীজ দেখিতে পাইতেছি। এইজন্য ঋগ্বেদে রুদ্রকে কপর্দী বলা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে রুদ্র ও অগ্নি একই দেবতা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি মন্ত্র রুদ্রের উদ্দেশে রচিত দেখা যায়, যদিও রুদ্র নামের উল্লেখ আছে ৭৫ বার।

"অগ্নি বিষ্টকৃৎ রুদ্র দেবতার মূর্ত্তি। এই রুদ্র দেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইঁহার বাণকে সকলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইঁহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না। উগ্র ভীম কপর্দী প্রভৃতি বিশেষণে ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইবেন। ইঁহাকে খুসী রাখিবার জন্য তখন তখন শঙ্কর বলা হইত। ফলে, বেদপন্থীদের অন্যান্য দেবতাদের সহিত ইঁহার পার্থক্য ছিল। ইনি একবার দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িয়াছিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া ইঁহাকে পশুগণের আধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি ইনি পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্ব্বে ইনি যজ্ঞের ভাগ পাইতেন না; জোর করিয়া যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি বিষ্টকৃৎ যাগের প্রচলন। বিষ্টকৃৎ যাগে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা যজ্ঞদেবই অগ্নি বিষ্টকৃৎ মূর্ত্তিতে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-ঘটিত পৌরাণিক উপাখ্যান আপনাদের মনে আসিবে।"

—যজ্ঞকথা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বেদে এক দেবতা ছিলেন পূষা; তিনিও ছিলেন কপর্দী। বৈদিক দেবতাদের পৃষ্ঠপোষক পুরোহিত ঋষি যখন যজ্ঞ করেন, তখন তিনি রুদ্র বা শিবকে অবৈদিক দেবতা জানিয়া যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেন নাই। রুদ্র যখন বাহুবলে বৈদিক দেব-সমাজে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন তখন তিনি বৈদিক দেবতা পূষার দন্ত ভগ করিয়া তাঁকে যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত করেন এবং কপর্দী পূষার জটা আকর্ষণ করেন। পরবর্ত্তী কালে পূষার দাঁতের সন্ধান পাওয়া যায় না; পূষার জটার সন্ধান পাওয়া যায় শিবের মাথায়।

বেদের অগ্নির বা অগ্নিশিখার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল—শিব, শর্ব্ব বা সর্ব্ব, কুমার, কালী, করালী ইত্যাদি। শিব ও শর্ব্ব রুদ্রের নামান্তর হইয়াই রহিল; কিন্তু কুমার নাম হইল অগ্নির ও শিবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের, এবং কালী করালী হইলেন রুদ্র বা শিবের পত্নী।

ঋগ্বেদের রুদ্র দেবতার মাথায় মুকুট, কণ্ঠে অলঙ্কার, গলায় নিষ্কমালা। তিনি ধনুর্ব্বাণ প্রয়োগে পটু এবং স্বহস্তে রোগ-নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করিতে দক্ষ। রুদ্র বনে পর্ব্বতে বিচরণকারী ভূত এবং তিনি জ্বর ও রোগ দিয়া লোককে পীড়িত করেন। ঋক্ সূত্রে শিব ও শঙ্কর শব্দ আছে, কিন্তু তাহা বিশেষণ মাত্র, তখনো বাচ্যের নাম হইয়া দাঁড়ায় নাই। তিনি ত্র্যম্বক—অর্থাৎ ত্রৈমাতুর, অর্থাৎ তিন মাতার সন্তান—স্বর্গ মর্ত্ত অন্তরীক্ষ তাঁর স্থান বা মাতৃক্রোড়। ইহাই তাঁর পরবর্ত্তী কালে ত্রিনেত্র হইবার বীজ। হিমালয়ের উত্তরে মুজবান নামক পর্ব্বতে রুদ্রদেবতার বাস ছিল।

যজুর্ব্বেদে রুদ্র ও অগ্নি এক। তিনি গিরিশ অর্থাৎ গিরিবাসী এবং উমা হৈমবতী তাঁর গৃহিণী হইয়াছেন। রুদ্র শুক্লযজুর বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র ও উমা স্বামী স্ত্রী নহেন, তাঁরা ভাই বোন। শুক্লযজুর মধ্যে ঈশান ও মহাদেব নাম পাওয়া যায়।

এই ঈশান বৈদিক দেবসমাজে বাহির হইতে আগত

দেবতা। ঈজিপ্টের প্রধান দুই দেবতা ছিলেন ইসিস ও অসিরিস; অসিরিস ইসিসের ভাই, কখনো বা পুত্র, কখনো বা পতি। ব্যাবিলনের ইশ্‌তর ও তম্মুজ নামক দেব-দেবীর সম্পর্কও এইরূপ ত্রিবিধ; এবং ব্যাবিলনের তিয়ামৎ ও মেরোডাকের সম্পর্কও এইরূপ ত্রিবিধ। এই ইসিস ও অসিরিস এবং ইশ্‌তর ও মেরোডাক ভারতবর্ষের দেবসমাজে প্রবেশ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করেন ঈশ ঈশ্বর ঈশান ও ঈশানী। তাই ঈশান ও ঈশানী সম্পর্কে প্রথমে ভাইবোন, পরে পুত্র ও মাতা, ও আরো পরে স্বামী স্ত্রী হইয়াছেন দেখিতে পাই।

বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র চর্ম্মবাস বা কৃত্তিবাস, নীলগ্রীব বা শিতিকণ্ঠ। ইহা অগ্নিরই রূপক—অগ্নি ও অঙ্গার হল্‌দে-কালো কোঁটা-কাটা ব্যাঘ্রচর্ম্মের মতন, এবং অগ্নির মধ্যে কৃষ্ণ আভা যেন নীলকণ্ঠ।

যজুর্ব্বেদে রুদ্র হইয়াছেন দেবভিষক্, অধিবক্তা ও অহিশত্রু—

"অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীংশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভয়ন্ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরা সুব।—যজুর্ব্বেদ, ১৬।৫।

প্রাচীন সকল দেশের ধর্ম্মেই দেখা যায় অহি নামক এক দৈত্য দেববিরোধী; বৃত্রাসুরের অপর নাম অহি; ক্রিশ্চানদের শয়তান সর্পমূর্ত্তি; ঈজিপ্টে ব্যাবিলনে ইসিস ও ইশ্‌তার সর্পশত্রু। ঈজিপ্টে সূর্য্য দেবতার নাম ছিল রা; একদিন এক সাপ তাঁকে কাম্‌ড়ায়; রা দেবতা শেখেৎ নামক এক দেবীর সাহায্যে সেই সর্পকে শাস্তি দেন, তখন আর তাঁর বিষের যন্ত্রণা রহিল না। এই রা ও রুদ্র এবং শেখেৎ ও শক্তি ক্রমে অভিন্ন হইয়া উঠেন। এই সর্প পরে সকল দেশের দেবতাদের ভূষণ হইয়া পড়ে।

যজুর্ব্বেদে রুদ্র একদিকে রোগচিকিৎসক, আবার অপর দিকে তিনিই রোগ-উৎপাদক—যে অন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্ (যজু, ১৬।৬২)।—তিনি "সাপ হয়ে কাম্‌ড়ান ও রোজা হয়ে ঝাড়ান।"

যজুর্ব্বেদে রুদ্র অসংখ্য—অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্ (যজু ৩৬।৫৪)।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা রুদ্রের স্ত্রী; সেইজন্য রুদ্রের নাম হইয়াছে উমাপতি।

শতরুদ্রীয় নামক গ্রন্থে রুদ্র হইয়াছেন গিরিশ, গিরিত্র; তাঁর দেহবর্ণ লোহিত, কণ্ঠ নীল—কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর বিদ্যুৎস্ফূরণ অথবা সূর্য্যদেবতার লোহিতাঙ্গে কৃষ্ণচিহ্ন। ঈজিপ্টের রা সূর্য্যদেবতা, পরে রুদ্রে পরিবর্ত্তিত হন। অথবা রুদ্র অগ্নি—লোহিত শিখার অভ্যন্তরে অঙ্গারের কালিমা-কলঙ্ক। এইজন্য রুদ্রের নাম নীললোহিত।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ বলেন, যে দেবতা ঈশান ও মহাদেব নামে দেবসমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনিই পরে শিব হন; রুদ্রের সমস্ত গুণ পরে শিবে অরোপিত হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিকে মহাদেব বলা হইয়াছে; মহাদেব শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা অগ্নির অষ্ট নামের মধ্যে এক নাম। শতপথ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ বলেন—রুদ্র সর্ব্বলোকের ব্রাত্যদিগের রক্ষক। আমরা আগে দেখিয়াছি যে মার্ডীক ছিলেন ব্রাত্য বা পতিতদিগের দেবতা। পরবর্ত্তী কালেও শূদ্র চণ্ডাল ব্যাধ শবর ভিল্ল প্রভৃতি ব্রাত্য জাতিরা শিবপূজার অধিকারী যে হইতে পারিয়াছিল তার কারণ আমরা এখানে পাই।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বৃহস্পতি রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে বৃষ বা বৃষভ বলা হইয়াছে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য। এই বৃষ পরবর্ত্তী কালে রুদ্রের বাহন হয়। গৃহ্যসূত্র রুদ্র তোষণের জন্য শূলগব যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন; এই যজ্ঞে আস্ত ষাঁড়কে শূলে বিদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া আহুতি দেওয়া হয়—ষাঁড়ের শিক-কাবাব! ইহা হইতে পৌরাণিক শিবের অস্ত্র শূল ও বাহন বৃষ কল্পনা করিবার সাহায্য হয়।

সীরিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসী হেট্টাইটদিগের (১৪০০ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দ) এক দেবদম্পতি ছিলেন—দেব ছিলেন বৃষরূপী ও দেবী ছিলেন সিংহী। পরে বৃষারোহী দেব ও সিংহবাহিনী দেবী পরিকল্পিত হন। বৃষারোহী দেব ছিলেন বজ্রপাণি ত্রিশূলহস্ত এবং মুষলধর; ত্রিশূল বিদ্যুৎ-শিখার ও মুষল বজ্রাঘাতের চিহ্ন। এই দেবতা-দম্পতি আমাদের শিবদুর্গা পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন মনে হয়। (The Syrian Goddess—Prof. Herbert A. Strong). ঈজিপ্টের অসিরিস—যিনি পরে গিরিশ ঈশ হন—বৃষমূর্ত্তি ছিলেন।

বৃষভবাহন ও সিংহবাহিনী দেব-দেবীর মূর্ত্তি—
প্রাচীন সীরিয়ার মুদ্রায়।

শুক্লযজুর ষোড়শ ভাগের নাম তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। তার মধ্যে রুদ্র পূজার উল্লেখ আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা রুদ্রকে শিবরূপে প্রথম দেখিতে পাই। তিনি একদিকে রুদ্র—ভয়ানক, আবার অপর দিকে শিব—মঙ্গলস্বরূপ; তিনি দেবতাদিগের প্রভব ও উদ্ভব, বিশ্বাধিপ, মহর্ষি; তিনি গিরিশন্ত ও গিরিত্র (তৃতীয় অধ্যায়, ৪,৫,৬ শ্লোক)। তিনি ইষুহস্ত। এখানে আমরা প্রলয়ান্তক রুদ্রের পিনাক বা অজগব ধনুর পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তনের প্রথম দ্বার; সেইজন্য আমরা এখানে পরমেশ্বর মহাদেবের রুদ্র ও শিব ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—ঈশান "যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি" (৪।১১)। ইহাই পরবর্ত্তী কালে যুক্তলিঙ্গ পূজার প্রবর্ত্তনের প্রথম ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। জাত প্রাণী মাত্রেই ভূত ও পশু; তাদের যিনি পতি তিনি ভূতনাথ ও পশুপতি সহজেই পরবর্ত্তী কালে হইতে পারিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বহু রুদ্র এক হইয়া উঠিয়াছেন—একো রুদ্রো, ন দ্বিতীয়ায়।—৩।২।

অথর্ব্ব বেদে রুদ্র ও মহাদেব একই পরম-দেবতা—সোঽর্য্যমা, স বরুণঃ, স রুদ্রঃ, স মহাদেবঃ।—অথর্ব্ব, ১৩।৪।৪।১২। অথর্ব্ব-শিরোপনিষদে আত্মাকে রূপকচ্ছলে শিব ও বিষ্ণু বলা হইয়াছে, কিন্তু এ শিব কেবল বিশেষণ, বিশেষ দেবতার নাম নহে। অথর্ব্ব বেদের ভব ও শর্ব্ব দেবতা পরে শিবের নামান্তর হইলেও ঐ দুই দেবতার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য অথর্ব্ব বেদের মধ্যে নাই।

কৈবল্য উপনিষদে ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র উমাপতি শিব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিবপত্নীর নাম হইয়াছে উমা ও পার্ব্বতী। নারায়ণোপনিষদে মহাদেব ও উমা নাম আছে।

কৈবল্যোপনিষদে ভগবান মহাদেব স্বয়ং আশ্বলায়নকে নিজ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতেছেন। অথর্ব্ব-শিরোপনিষদেও এইরূপ।

সূত্রপিটকে শিব শঙ্কর নাম আছে।

নির্ঘণ্ট (৩।১৬) রুদ্রকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছে—তিনি অন্ন ও কৃষির দেবতা। রুদ্রের নামাবলীর মধ্যে ক্ষেত্রপতি, বনপতি, অরণ্যপতি, স্থপতি, ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। তস্করাণাং পতিঃ, স্তায়ূনাং পতিঃ, প্রতরণঃ (প্রতারক) প্রভৃতি নামও আছে। এইজন্য আমরা পরবর্ত্তী কালে দেখিতে পাই শিবপার্ব্বতী অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত এবং শিব কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত (শিবায়ন)। এইজন্য পরবর্ত্তী কালের শিব ও কালী "এবং নানা-ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ" (ভবিষ্যোত্তরীয়-বচন তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত দুর্গাপূজাপ্রসঙ্গে)।

জেন্দ আবেস্তায় বৃহস্পতি বিষ্ণু ইন্দ্র অসুর বৃত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবদানবের উল্লেখ আছে, কিন্তু রুদ্রের কোনো উল্লেখ নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রুদ্র পরবর্ত্তী কালে আগন্তু দেবতা।

ইহার পর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ। এই যুগে শিবের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া আরো স্পষ্ট ও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবহির্ভাগের দেবকল্পনা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য আর্য্য পরিকল্পনার সঙ্গে অন্-আর্য্য ও নিম্নস্তরের স্থানীয় জাতি-সকলের দেবস্বরূপের সংমিশ্রণ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্বে স্কন্দ উপাখ্যানে স্পষ্ট দেখা যায় যে প্রথমে অগ্নিরই নাম ছিল রুদ্র—"রুদ্রমগ্নিং দ্বিজা প্রাহুঃ, রুদ্রসূনুস্ ততস্ত্বয়ং (স্কন্দঃ)।"—'দ্বিজগণ অগ্নিকেই রুদ্র বলিতেন; অগ্নিপুত্র স্কন্দ সেইজন্য রুদ্রপুত্র।' রুদ্র যখন পরে শিবের কোঠায়

নাম হইয়া গেল, তখন কাজেকাজেই কার্ত্তিকেয় শিবপুত্র হইয়া পড়িলেন এবং অগ্নিপুত্রকে শিবপুত্র করিবার জন্য শিব ও অগ্নিকে মিলাইয়া এক উপাখ্যান রচনা করা আবশ্যক হইয়াছিল।

বৈদিক ত্রিদেবতা ক্রমশ পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া হন—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। বৈদিক অগ্নি হইলেন ব্রহ্মা; বৈদিক সূর্য্য ও বিষ্ণু নামে পরিচিত ছিলেনই; শিব আবির্ভূত হইলেন দেশ-বিদেশের বহু দেবতার সমষ্টি রূপে—অগ্নিরূপী রুদ্র, বজ্রপাণি ইন্দ্র, মরুৎ, মেরোডাক, অসিরিস, রা, প্রভৃতির সমন্বয় হইলেন শিব। ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাই পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান দেবতা ছিলেন। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাই সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা এবং তিনিই নারায়ণ, তিনিই পুরুষ।

"ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মনু-সংহিতায় শিব ও বিষ্ণুর নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের রচনা ও সঙ্কলনের সময়ে তাঁহারা এরূপকার মত উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ শাস্ত্রে কেবল অঙ্গবিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

মনসোন্নং, দিশঃ শ্রোত্রে, ক্রান্তে বিষ্ণুং, বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং, মিত্রমুৎসর্গে, প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥'
মনুসংহিতা, ১২।১২১।

যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা সঙ্কলনের সময়ে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা মাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও তন্ত্রে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাৎপর পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।" (হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়)।

মহাভারতের মধ্যে বৈদিক রুদ্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবু এখনো রুদ্র ও মহাদেব সম্পূর্ণ এক অভিন্ন দেবতা হইয়া উঠেন নাই। বেদে রুদ্রের স্ত্রীর নাম রোদসী; মহাভারতে রুদ্রের পত্নী রুদ্রাণী (উদ্যোগপর্ব্ব); কিন্তু মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতী বা উমা;—তখনো গৌরী অম্বিকা বা উমার সঙ্গে রুদ্রাণী একাত্মতা লাভ করেন নাই। শান্তিপর্ব্বের ২৮২ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে; ঐ যজ্ঞে শিব বাদে সকল দেবতারই নিমন্ত্রণ হওয়াতে পার্ব্বতী ক্ষুণ্ণ হইয়া শিবকে তাঁর অনিমন্ত্রণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব বলিলেন—পূর্ব্বকাল হইতে দেবতারা যে বিধান করিয়াছেন, তাতে কোনো যজ্ঞেই তাঁর ভাগ কল্পিত হয় নাই—

যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ।২৬
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ॥২৭

এই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে পাই। দক্ষমহিষী প্রসূতি শিবকে বলিতেছেন—

বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর, পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ॥

স্বামীর অনিমন্ত্রণে দেবীর দুঃখ দেখিয়া মহাদেব আত্মমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞভাগ আদায় করিতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ শিবকে বলিলেন—"সন্তি নো বহবঃ রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ, তুমি তাদের মধ্যে কোন্ জন?" যজ্ঞভাগ না পাইয়া শিব যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন; তখন ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন এখন হইতে শিবকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হইবে। এখানে যজ্ঞবধ আছে, কিন্তু দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ নাই; পার্ব্বতী আছেন, কিন্তু তিনি দাক্ষায়ণি নহেন, এবং যজ্ঞে তিনি দেহত্যাগও করেন নাই। বৈদিক রুদ্রও প্রথমে যজ্ঞভাগী ছিলেন না, মহাদেবকেও যজ্ঞভাগের জন্য জোর করিয়া স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। শিব যে বাহির হইতে ভারতীয় দেবসমাজে আগন্তু দেবতা, তাহা পুরাণেও স্বীকৃত দেখা যায়। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই শঙ্কর নামক আগন্তু আমাদের অপেক্ষা কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ?"—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২৫ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

মহাভারতের শিব আদিতে সাধারণ মনুষ্যাকৃতিই ছিলেন এক মাথা, দুই চোখ। একদিন উমা কৌতুক করিয়া শিবের পিছন হইতে তাঁর চোখ দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরেন; শিবের চক্ষু আবৃত হওয়াতে সৃষ্টি অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইল; তখন দেবতাদের অনুরোধে শিব ললাটে তৃতীয় নেত্র প্রকাশ করিলেন। সেই তৃতীয় নেত্রের তেজে পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি দগ্ধ হইতে লাগিল। (অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪০)। পরবর্ত্তী কালের মদন-ভস্মের মূল তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতেজ প্রথম ছিল অগ্নিরূপী রুদ্রের মধ্যে এবং দ্বিতীয়তঃ পাওয়া গেল এই তৃতীয় নেত্রের তেজে।

মহাদেবের নীলকণ্ঠ হওয়ার কারণ দেববিরোধের ফলে পরে অন্যরূপ হইয়া পড়ে।—একদিন শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের সময় নারায়ণ মহাদেবের গলা

টিপিয়া ধরেন, তাতে মহাদেবের গলায় কালশিরা পড়িয়া যায়—

ততঃ এনং সমুদ্ভূতং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা।
নারায়ণঃ স বিশ্বাত্মা, তেনাস্য শিতিকণ্ঠতা॥
শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৪।৮৩,৮৭।

একদিন বৈদিক দেবতা ইন্দ্র শিবকে বজ্রাঘাত করেন, সেই আঘাতে শিবের কণ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়—

ইন্দ্রেণ চ পুরা বজ্রং ক্ষিপ্তং শ্রীকাঙ্ক্ষিণা মম।
দগ্ধ্বা কণ্ঠং তু তদ্ ঘাতং, তেন শ্রীকণ্ঠতা মম।
—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪১ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ইন্দ্র মার্ডীক-বিরোধী মরুৎ-বিরোধী ছিলেন। দেববিরোধে শিবের পরাজয়ের এই অপমান পরবর্ত্তী কালে সমুদ্রমন্থনের বিষ দিয়া ঢাকা হয়।

বেদে সোম জলের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন; সোম একদিকে চন্দ্র, অপর দিকে অমৃত। পুরাণে সমুদ্রমন্থন করিয়া চন্দ্র ও অমৃত দেবতারা লাভ করেন. চন্দ্র পাইয়াছিলেন শিব, এবং অমৃতের বদলে পাইয়াছিলেন বিষ। কিন্তু সেই বিষও বিদেশের আমদানী, ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা সাপের কামড়ের বিষ লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া শিবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

মহাদেব একদিন তিলোত্তমাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হন; তিলোত্তমা মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, শিবের ইচ্ছা হইতেছিল তিনি তাঁর চতুর্দ্দিকে ভ্রমমানা তিলোত্তমাকে মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন; অন্য দেবতারা উপস্থিত থাকাতে শিব লজ্জায় মুখ ফিরাইতে না পারিয়া চারিদিকে চার মুখ উদ্গত করেন। সেইজন্য শিব চতুর্ম্মুখ। মহাভারতের চতুর্ম্মুখ শিব পৌরাণিক যুগে দেববিরোধের সময় শ্রেষ্ঠত্ব-গর্ব্বী ব্রহ্মার পঞ্চমুণ্ডের একটি মুণ্ড নখে করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া নিজে হন পঞ্চমুখ ও ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ করিয়া নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেন (কাশীখণ্ড)।

মহাভারতের মধ্যে শিববিষয়ক বহু উপাখ্যান রচিত হইয়াছে—কিরাত-অর্জ্জুন-সংবাদ, পাণ্ডবদের দ্বাররক্ষা, অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি। এইসব উপাখ্যানে শিব ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, এমন কি ভক্তসেবক। মহাভারতের শিব হিমালয়বাসী, পিনাকী, বৃষভবাহন, ভূতনাথ তাঁর পত্নীর বহু নাম—উমা পার্ব্বতী দুর্গা কালী করালী ইত্যাদি। কালী করালী নাম উপনিষদে অগ্নিশিখার নাম ছিল, তাদেরই অগ্নিরূপী রুদ্রের পত্নী করা হয়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে শিবলিঙ্গ পূজারও সূত্রপাত দেখা যায়।

রামায়ণেও মহাদেবের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও পরিণত দেখা যায়।

পৌরাণিক যুগে ত শিব রীতিমত গৃহস্থ বহু পুত্রের ভর্ত্তা, পুত্র-কন্যার জনক এবং মাদকসেবী সকল পুরাণেই শিবের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যপ্রচারক পুরাণগুলিতে শিবকে একটু নিকৃষ্ট পর্যায়ে দেখা হইয়াছে। শৈব পুরাণ মহাদেবকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা বলিয়াছে; আবার ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব পুরাণ নিজের-নিজের দেবতাকেই শিবের সৃজনকর্ত্তা করিয়াছে (লিঙ্গপুরাণ, ২৭ অধ্যায়; ভাগবত ২ স্কন্ধ ৬ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ; ইত্যাদি)। দেবীমাহাত্ম্য প্রতিপাদক মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে শিবপত্নী ভগবতীকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের জননী বলা হইয়াছে।

যিনি আদিজননী তিনিই পরে পত্নী—এই পরিকল্পনা প্রাচীন সকল দেশের পুরাণেই দেখা যায়। ঈজিপ্টের ইসিস ছিলেন অসিরিসের জননী ভগিনী পত্নী ব্যাবিলনের ইশ্‌তর ও তম্মুজ এবং তিয়াবৎ ও মেরোডকের সম্পর্কও এইরূপ ত্রিবিধ; ক্রিশ্চানদের কুমারী মা মেরী ঈশ্বরের পত্নীও বটেন, মাতাও বটেন।—পিতা-ঈশ্বর হইয়াছিলেন পুত্র-ঈশ্বর।

হরিবংশ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইলেও সেখানে শিবের মর্য্যাদা খুব বেশী। বাসুদেব বদরিকাশ্রমে গিয়া শিবের তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন দেখিতে পাই।

ভিন্ন-ভিন্ন পুরাণে শিব ও তাঁর পরিবারবর্গের অবস্থা বিভিন্ন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শিব-হাটক-(সুরা)-রস পান করেন; শিব অনুচরদের প্রিয় পানীয় তাড়ী সিদ্ধি এবং তন্ত্রে গাঁজায় উঠিয়াছে (প্রাণতোষিনী তন্ত্র); শিব শ্মশানবাসী। বামন পুরাণের শিব দরিদ্র; গণেশ ও কার্ত্তিকের পিতা। নারদীয় ধর্ম্ম ও কূর্ম্ম পুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিবের বহু।—যদিও তাঁরা শিবজননী ও শিবপত্নী শক্তিই হন। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে শিবপার্ব্বতী দ্যূতাসক্ত—কার্ত্তিক যানে দ্যূতপ্রতিপদে পার্ব্বতী শিবকে পরাস্ত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বাজির ধন

শোধ করিতে বাধ্য করেন। এবং ভিক্ষায় প্রস্থিত শিবের বিচ্ছেদ অসহ্য হওয়াতে পার্ব্বতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করেন।

পৌরাণিক যুগে শিবমাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর আমরা শিবমূর্ত্তির ও শিববিভূতির নানাবিধ পরিচয় পাই।—তিনি পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, জটিল, জটায় গঙ্গা, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, অস্থিমাল, অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষবাহন; তিনি পঞ্চবিদ্যার প্রবর্ত্তক, গঙ্গা উৎপাদনের কারণ; তাঁর মর্ত্তনিবাস কাশী পৃথিবীবহির্ভূত, তাঁর ত্রিশূলের উপর অবস্থিত; তিনি দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী, দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়ার কারণ, তিনি মদনভস্মকারী; তিনি পশুপতি, কৃত্তিবাস, ফণীভূষণ; তিনি লিঙ্গমূর্ত্তি; তিনি শূলপাণি ভূতনাথ। এই-সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যে দেশ-বিদেশের বহু সমাজস্তরের ধর্ম্মবিশ্বাস ও পুরাণকথা পুনঃ পুনঃ প্রক্ষেপের দ্বারা পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(১৪)

রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত আর্য্যকীর্ত্তির মধ্যে 'রাজসিংহের রাজধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধে এক স্থলে রহিয়াছে :—

"এই হিন্দুস্থানের রাজা, রায় ও সামন্তগণের ইরাণ, তুরাণ, শান ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তঋতু-জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও জলপথ-যাত্রিগণের সর্ব্বাঙ্গীন উপকার সাধনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি, এ বিষয়ে বোধ হয় আপনার কোন সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি। আওরঙ্গজেবের নিকট রাজসিংহের পত্র।—আর্য্যকীর্ত্তি, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৩৪ পৃষ্ঠা, শেষের প্যারা।

উপরে উক্ত অংশের মধ্যে শান ও সপ্তঋতু-জনপদ এ দুটির বর্ত্তমান ভৌগোলিক নাম কি ও অবস্থান কোথায়?

ঝিনাইদহ পোঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
(যশোহর)

(১৫)

ধান্যের জমিতে যে 'সেওলা' জন্মিয়া থাকে, তাহাতে ধান্যের অতিমাত্রায় ক্ষতি করিয়া থাকে। উহা বাদল এবং তৎসঙ্গে বাদ্‌লা হাওয়া দিলেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার পরে বাতাস না হইয়া প্রখর রৌদ্র হইলে উহা জন্মাইতে দেখা যায় না। ঐ সেওলা উৎপত্তির সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না, এবং উহা বিনষ্ট করিবার উপায় কি?

কাইগ্রাম—বর্দ্ধমান। শ্রীঅশোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(১৬)

Botany (উদ্ভিদবিজ্ঞান) সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ কি?—

(১) Protoplasm. (২) Nucleus. (৩) Cell. (৪) Plastids.

শ্রীবসাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। হ, রহমান ও শ্রীসুধেন্দুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী।

(১৭)

আমার কলা বাগানের কলা-গাছে এক-রকম পোকা লাগিয়াছে। ইহাকে এতদ্‌ অঞ্চলে "ভিঙ্গার" লাগা বলে। ইহাতে গাছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইয়া তাহা হইতে এক-প্রকার রস নির্গত হইতে থাকে; পরে ক্রমে গাছ নিস্তেজ হইয়া যায়। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কি উপায়ে এই পোকার আক্রমণ হইতে গাছ রক্ষা করা যায় এবং কি দোষেই বা এই পোকা কলাগাছে লাগে?

ইসবপুর (বগুড়া) শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী।

(১৮)

দেশী সুতার কাপড় বুনিতে হইলে আজকাল যে উন্নত প্রণালীর হ্যাণ্ডলুম উঠিয়াছে তাহা কোথায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমান মূল্য কত—এই কয়েকটি কথার কেহ উত্তর দিলে বাধিত হইব।

শ্রীকালীপদ দে।

মীমাংসা

(১)

নাটক ও নভেলের প্রভেদটা কি তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখা দরকার, চোখে দেখিয়া নাটক বুঝি, আর ঘরে বসিয়া নভেল পড়ি। সংসারের নাট্যলীলা প্রত্যহই আমরা চোখে দেখিয়া কানে শুনিয়া প্রত্যক্ষ অনুসরণ করি। নাটক তাহারই প্রতিরূপ কিন্তু সংসার-রঙ্গভূমি দেশে কালে পাত্রে অতি বিস্তীর্ণ, সেখানে নাট্যের ঐক্যসূত্র নানা জটিলতা ও বহুলতার ভিতর দিয়া স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারি না। তাই সাহিত্য-নাটকে একটি ঘটনা-পর্য্যায়কে বিবিক্ত করিয়া লইয়া তাহারই নিবিড় বিকাশের মধ্য দিয়া রসের পরিণতিকে অবিচ্ছেদে দেখাইতে হয়। নভেলে নানাবর্ণনা, চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বাহুল্য ঘটনাবলীর সমাবেশ চলে—যাহা চোখে দেখা যায় না তাহার আলোচনা থাকে অর্থাৎ গ্রন্থকার গাইডের মত সঙ্গে থাকিয়া যাহা অগোচর, যাহা অতীত, যাহা অনুমানমাত্র সমস্তই ব্যাখ্যাত ও বিবৃত করিয়া চলেন। নাটকে তাহার জো নাই। ঘটনার পর ঘটনা আপন প্রত্যক্ষতার দ্বারাই বিনা ব্যাখ্যায় আপন অপ্রত্যক্ষকেও অনুভবগম্য করিয়া চলে। এইজন্য নাটকের ঘটনা-সংস্থানে ওতাদি থাকা চাই। একটার পাশে আর-একটাকে রাখিয়া নিষ্কৃতি নাই; একটার সঙ্গে আর-একটাকে একেবারে প্রাণগতবন্ধনে এমন বাঁধিয়া দিতে হইবে যে সমস্ত নাটকের ঘটনা অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সজীব দেহরূপে আপন আত্মাকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এই কথাটি মনে রাখা চাই—নাটক দৃশ্যকাব্য; যাহা দেখা যায় সেই উপকরণ লইয়াই যাহা দেখা যায় না সেই ভাবরসকে নাটকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে; অতএব তাহা স্বভাবতই অন্যজাতীয় সাহিত্যের পথে চলে না, তাহার নিজেরই স্বতন্ত্র পথ আছে। এসব কথা বেশি করিয়া বলিবার সময় নাই, অল্প করিয়া বলাও সহজ নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বলিতে গেলে সমগ্র মনস্তত্ত্বজীবনের একটি সুপরিস্ফুট ইতিহাসই সাহিত্য। সাহিত্যের দর্পণে আমরা দেখিতে পাই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অমলিন ছায়াসম্পাত। তার নাটক ও উপন্যাস সাহিত্যেরই সবল অঙ্গ বলিয়া 'জীবন'কে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। মানব-জীবন বা লোক-প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ইহাদের জন্ম, ইহাতেই পুষ্টি, আর ইহাই প্রাণ। তবে প্রণালী বিভিন্ন।

জীবনের দুইটি দিক। একটা কর্ম্মময়, আর একটি মনোময়। এখন, এই কর্ম্মপ্রধান বা ঘটনাবলম্বী জীবনের যে অংশটি, নাটকের রক্তমাংস তাহাতেই গঠিত হইয়া উঠে। তাই ঘটনাসঙ্কুল লোকচরিত্রই নাটককে বরণ করিয়া লইতে হয় তাহার স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনধারণের জন্য। এক কথায়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'action', সেই act on বা কার্য্যই নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। নাটকের সীমা সেইজন্যই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। কারণ, মানবের যে দিকটা অসীম, সে হইল তাহার মনের দিকটা। এই মনোরাজ্যে নাটককে পঙ্গু হইয়া চলিতে হয়। মনের কতটুকু অংশই বা নাটকে প্রকাশিত হইতে পারে! কিন্তু অপরিসীম উন্মুক্ত অবাধ এই রাজ্যে বিচরণ করে উপন্যাস। কার্য্য ও কল্পন উভয়ই উপন্যাসকারের হাতের পুতুল। বিবৃত্ত ঘটনাগুলির বস্তুবসত্তা নাটক দান করে বলিয়া আমরা যেন চর্ম্মের চক্ষেই দেখিতে পাই বহুযুগের পুরাতন ঘটনাও সত্যই আমাদের সম্মুখে ঘটিতেছে; চরিত্রগুলির কথা আমাদের কানে যেন গিয়া বাজিতেছে। ঘটনাসমূহের অধিকপ্রকাশ নাটকেই আমরা দেখি। কিন্তু উপন্যাসের ধারা অন্য প্রকার। মনোরাজ্যের সম্রাট তাঁহার সুনিপুণ ভাষাচাতুর্য্যে আমাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইতেছেন। বস্তুত বাহিরের জগতে যাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় কল্পনার সাহায্যে তাহাই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনও অনায়াসেই তাহা গ্রহণ করিয়া লয়। সেই সময়ের জন্য আমরা মনোজগতে থাকিয়া মনশ্চক্ষে সমুদয় দেখি; হাসি, কাঁদি, আশ্চর্য্য হই, সমবেদন প্রকাশ করি। অদৃশ্য মনলোকের সমস্ত স্থানগুলিই আমরা দেখিতে পাই এই কল্পনার চক্ষে। উপন্যাসকার স্বীয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মানব-মনের রন্ধ্রগুলি পরিষ্কার করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরেন, আর ইহার রহস্যময় কার্য্যগুলি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপরই প্রকৃত উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা।

নাটককে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, বাঙ্গালীর ন্যায়; এবং উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনয়োপযোগী উপকরণের উপর তাহার সার্থকতা নির্ভর করে। কখন কখন বা ইহাদের অভাবে নাটকের প্রাণধারণেই বিষম সংশয় জন্মে। এ দিকে উপন্যাস নিজের স্বচ্ছন্দগতিতে যথায় তথায় আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। জীবনের গভীর গভীর তত্ত্বগুলি লোকচরিত্রের সহিত জীবন্ত হইয়া উপন্যাসে কখনো বা মীমাংসিত হয়, কখনো বা মীমাংসার অপেক্ষায় আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া থাকে। যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, এমন বাস্তব-জগৎ লইয়া চলিতে হয় বলিয়া নাটককে এই জটিল প্রশ্নগুলি এড়াইয়া চলিতে হয়। কারণ, তেমন চরিত্র ত বাস্তব জগতে আপনা-আপনি গড়িয়া উঠে না তাহাকে নাটক গড়িতে গেলেও নাটক না হইয়া উহার হাস্যোদ্দীপক প্রতিকৃতিই হইয়া পড়ে। সুতরাং দার্শনিকদিগের বহুদিবসের অভিজ্ঞতাসম্ভূত প্রশ্নগুলিই হউক, আর ইতিহাসের প্রাচীন সমস্যাগুলিই হউক, উপন্যাসই তাহার উপযুক্ত আলোচনা করিতে পারে।

উপন্যাসকার ও নাট্যকার উভয়েই কবি। উভয়েই লোকশিক্ষা ও আনন্দ দান করেন। চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা এবং অবস্থার সংঘাত দ্বারা কবি তাঁহার সৃষ্টিতে একটি দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের চিত্র অঙ্কিত করেন। এই দ্বন্দ্ব থাকে সত্য-অসত্য পাপ-পুণ্য বা সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে। নিজে সুকৌশলে অন্তরালে থাকিয়া বর্ণনাচ্ছলে যেন কবি সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেন, অথবা সত্যকে গ্রহণের একটি অদম্য স্পৃহা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে জাগাইয়া তোলেন। এবং নিজেকে ধরা না দিয়া আড়ালে থাকিয়া কবি যতদূর আমাদের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন তাঁহার সৃষ্টির সার্থকতা ও কৃতকর্ম্মতাও তাহারই উপর নির্ভর করে।

বর্ত্তমানযুগে এই বিশ্বজাগরণের দিনে নিখিল বিশ্বের প্রাণে নব নব সমস্যা আঘাত করিতেছে। এই বিশ্বের স্পন্দন আমরা দেখিতে পাইতেছি সমাজে বিজ্ঞানে রাষ্ট্রে ও দর্শনে। মানবমনের এই চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে বর্ত্তমানের উপন্যাসে, এ দেশের ও বিদেশের। পদু নাটক এই বিরাট চাঞ্চল্য বহন করিতে ও নিজের যথা স্থান লইতে অক্ষম বলিয়া নূতন নূতন সমস্যার বাহন হইয়াছে উপন্যাস। হয়ার নীতিবেত্তার উচ্চচীৎকার অপেক্ষা একখানি উপযুক্ত উপন্যাস বহুগুণ ফলপ্রসূ। এই যুগ উপন্যাসেরই যুগ।

শ্রীঅনন্তকুমার সাব্যাল

Hudson প্রণীত An Introduction to the Study of Literature নামক পুস্তকে নাটক ও উপন্যাসের প্রভেদ বিশদ করিয়া দেখানো হইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। নিম্নলিখিত উপন্যাস কয়েকখানিরও ইংরেজী অনুবাদ আছে।

১। চন্দ্রশেখর Chandrasekhar, by Raja Manmathanath Ray Choudhury of Santosh

২। আনন্দমঠ (The Abbey of Bliss, by Dr. Nareshchandra Sen, D. L.)

৩। যুগলাঙ্গুরীয় (The Two Rings, by Rakhalchandra Banerjee—বঙ্কিম বাবুর জামাতা).

শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেন।

(১০)

ভাদ্রের বেতালের বৈঠকের ১০ (গ) জিজ্ঞাসার উত্তর—

"ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন নাই, তিনি খাজাঞ্চিখানার প্রধান লর্ডরূপে বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড পান। ইহা বর্ত্তমান বিনিময় হারে ৬২৫০০৲ টাকার বেশী নয়। ভারতবর্ষের বড় লাটের (Viceroy) বেতন বার্ষিক ২৫০৮০০৲ টাকা। ইহা ছাড়া তাঁহা এবং বাস করিবার জন্য প্রাসাদ পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ষ্টেট-সেক্রেটারী ও অন্যান্য সব ষ্টেট কর্ম্মচারীও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড পান।"—"প্রবাসী" ফাল্গুন ১৩২৬, পৃঃ ৬৭৬।

শ্রীরাইমোহন সেনমজুমদার।

৺নীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "রূপসেন" নাম দিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের "ওথেলো" নাটক অনুবাদ করেন।

ভগ্ন-কঙ্কণ

ওড়িয় বই। প্রণেতা মহারাজা শ্রী সব্ বীরমিত্রোদয় সিংহদেব, কে-সি-আই-ই ; এম্-আর্-এ-এস্ (লণ্ডন), ধর্ম্মনিধি। ফিউডেটরি চীফ্, সোনপুর ষ্টেট্।

ওড়িষ্যায় অনেকগুলি 'ফিউডেটরি ষ্টেট' আছে। দেশী ভাষায় 'ষ্টেট'কে রাজ্য বলে, এবং 'চীফ' রাজা নামে খ্যাত। সোনপুর একটি রাজ্য। ইহার রাজা, মহারাজা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। উপাধিগুলি দেখিলেই তাঁহার পদ ও বিদ্যা-গৌরব বুঝিতে পারা যাইবে। 'ভগ্নকঙ্কণ' গ্রন্থখানি তাহাঁরই রচিত।

ইহা হইতে ওড়িয়া সাহিত্যের সৌভাগ্য অনুমিত হইবে। রাজপ্রসাদ ব্যতীত কাব্য ও কলার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং রাজা স্বয়ং সে সে বিষয়ে রসিক না হইলে তাঁহার প্রসাদও স্থায়ী হয় না। অনেক বৎসর হইল, কটকে 'উৎকল সাহিত্য সমাজ' স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সমাজে বড় কিছু করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি সমাজের গৃহ হয় নাই। দুই বৎসর হইল, গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে সমাপ্ত হইতে পারে নাই। শুনিয়াছিলাম, সে অর্থও অধিক নহে, চৌদ্দ পনর হাজার টাকা মাত্র। যাহা হউক, কয়েকজন রাজা কিছু কিছু অর্থ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সোনপুরের মহারাজা অবশ্য আছেন ইনিই ওড়িয়া সাহিত্য-প্রকাশের নিমিত্ত কলিকাতা বিদ্যাসাগর-মহাপীঠে অর্থ দান করিয়াছেন। স্বয়ং সাহিত্য-সেবী বলিয়াই এইরূপ দানে অগ্রসর হইয়াছেন।

রাজকুল সাহিত্য চর্চা করিলে সমাজে অপর এক শুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ধনে-মানে-প্রভুত্বে-গৌরবে রাজার আসন সর্ব্বত্র উচ্চে। এই হেতু রাজা-প্রজার মিলন দুঃসাধ্য। কিন্তু তিনি যখন সাহিত্যের সেবা করেন, তখন তাঁহাকে প্রজার আসনে বসিতে হয়। কারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে রাজার স্বতন্ত্র আসন নাই, রাজার কৃতি ও প্রজার কৃতি এক মানদণ্ডে মাপা হয়। ইহা রাজার পক্ষে যেমন, প্রজার পক্ষেও তেমন হিতকর। একটা ক্ষেত্র পাওয়া যায়, সেখানে মানব-চিত্তের মিলন সম্ভাবিত হয়। ইহার অসদ্ভাবে রাজ্য থাকিতেও রাজা একাকী জীবন যাপন করেন। কারণ দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও রাজকার্য্য ব্যতীত আরও কিছু চাই।

ওড়িষ্যার রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ কবি-যশ-প্রার্থী হইয়াছেন। কেহ গীত রচনা করিতেছেন, কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। বামণ্ডার অকালে স্বর্গগত রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব 'বৃষ্টি-বিজ্ঞান' লিখিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল। দেখিতেছি, সোনপুরের মহারাজা দেশের ইতিকথা দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস-প্রকাশে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি 'ভগ্নকঙ্কণে'র ভবতরণিকায় লিখিয়াছেন, (বাঙ্গালা বিভক্তি দিয়া তাঁহার ভাষা উদ্ধার করিতেছি),—"উৎকলের পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্য-সভ্যতা বিস্তারের প্রথম যুগের ইতিহাস স্মরণ না করিলে, এই কথা-গ্রন্থে বিবৃত ঘটনা-সমূহের স্বাভাবিকতা উপলব্ধ হইবে না। যে সময়ে জৈন সাধুগণ এই প্রদেশে আসিয়া অনার্য জাতীয় লোকদিগের অন্তঃকরণে কোমলতা বিধান করিয়াছিলেন, সে দিনের ইতিহাস আজ বিলুপ্তপ্রায়। কোন নিভৃত পর্ব্বত-গুহা অথবা পরিত্যক্ত জীর্ণমন্দির, সে দিনের ক্ষীণ সাক্ষী। অনার্য-প্লুত প্রদেশে আর্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্‌যোগ, কেবল কতকগুলি ভগ্নস্তূপ হইতে অনুমিত হয়। অতীতযুগের জৈনগণের সাধনা ও বিস্তৃত রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রলীলা যে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার উপরে এই যুগের সফলতা ও কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যজাতির সেই প্রাথমিক সাধনার দুই একটা ঘটনা, এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার আখ্যান বস্তু। গোদাবরী হইতে মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ যে মহারণ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহার কোন কোন উন্মুক্ত খণ্ডে, সাগরান্তরিত ক্ষুদ্র দ্বীপ-প্রায়, কতক রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই লুপ্ত রাজ্যসমূহের ইতিহাসের ভগ্নাংশ এই আখ্যায়িকায় বিবৃত।"

ইহার পর পাঠকের মনে দুইটি আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক স্থান কোথায়, ভিত্তি কি। লেখকমহোদয় অবতরণিকায় আকাঙ্ক্ষাদ্বয় জগাইয়া গ্রন্থে বিস্তৃত হইয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে রাম-গড়, বিষ্ণু-গড়, অজয়-গড়, এই তিন গড়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্থান নির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্বকালে বহু স্থানে বহু গড় ছিল, এখন অধিকাংশ, গ্রামে পরিণত হইয়াছে; কেবল 'গড়' এই নাম, এবং কদাচিৎ প্রাকারের অবশেষ ও পরিখার চিহ্ন দেখিয়া অতীত রাজ্য অনুমান করিতে হয়। আখ্যায়িকার মধ্যে দুইটি বিবরের নাম আছে, একটি লা-ন্দা-জো-র্, অপরটি রা-আ-জো-র্। * লা-ন্দা ও রা-আ সাঁওতালী নাম মনে হয়। লা-ন্দা=আনন্দ, রা-আ=রুত (ক্রন্দনে)। কিন্তু এই দুই "কবিত্বময়" নামও পাঠকের অজ্ঞাত হইতে পারে। আখ্যায়িকার ভিত্তি কিম্বদন্তি কি না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

---

* লেখকমহাশয়ের অনুমানে, সংস্কৃত ঝর হইতে জো-র শব্দের উৎপত্তি। নতুবা জোর নাম পাইয়া নির্ঝর অনুমান করিতেন না। ওড়িয়া জো-র, জো-ড়, জো-ড়ি বাঙ্গালাতেও আছে। দক্ষিণরাঢ়ে জোল, মান-ভূমে জো-ড়, বাঁকুড়ায় শো-ল। তুল্যার্থে জো-লী, জো-ডী; বা জু-লী, জু-ড়ী। অর্থ, দুই উচ্চভূমির মধ্যবর্তী নিম্নভূমি, প্রায়ই দীর্ঘ জলপথ। দুই পাশে পর্ব্বত থাকিলে যেমন মাঝে উপত্যকা, এবং উপত্যকায় নদী থাকে; দুই পাশে ডাঙ্গা (তুঙ্গ ভূমি) থাকিলে মাঝে জো-ল। বর্ষাকালে জোলে জল প্রবাহিত হয়; পাশের উচ্চভূমি বিস্তীর্ণ হইলে ঝরও উৎপন্ন হয়। যাবতীয় নদীর উৎপত্তি জোলে বলা যাইতে পারে। মেদিনীপুরের পশ্চিমসীমায় তারা-জুলী নামক এক ছোট সরু নদী আছে। তারা নামক জুলীতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় এই নাম। এইরূপ, কটকের কাঠ-জোড়ী নদী, হয়ত কাঠের-বনের জোড়ী হইতে। কিন্তু তা বলিয়া ঝর থাকা জোলের লক্ষণ নহে। ভগ্নকঙ্কণের জোর্, বোধ হয় প্রথমে জোল মাত্র, পরে নির্ঝর দেখিয়া জোলের নামে নির্ঝরের নাম হইয়াছে। আমার বোধ হয় সংস্কৃত চুল্লি শব্দ হইতে জুলী, জো-ল, জো-ড়, জো-র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। চুল্লির দীর্ঘ খাত সাদৃশ্যে জুলী। বাঁকুড়ার শো-ল (বাস্তবিক সো-ল) শব্দ দ্রষ্টব্য। এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে শ ষ স-কার, পূর্ব্ববঙ্গের কোমল হ-কার, যেন ছ স। সো-ল শুনিতে প্রায় ছো-ল। উদাহরণ দি-ই। মেদিনীপুরের নাড়া-জোল, পশ্চিম বর্দ্ধমানে সিয়াড় সোল (শো-ল লেখা হয় না; লেখা হয় সো-ল), দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রথমটির অর্থ, যে জোলে নাড়া (ও• নড়া) জন্মিত। দ্বিতীয়টির অর্থ, যে জোলে সিয়াড়ী লতা জন্মিত। এখানে নির্ঝর অর্থ হইতে পারে না। বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতে ঝ-র শব্দ চলিত আছে। ওড়িষ্যার কেন্দু-ঝর্ বা কেণ্ড-ঝর্ প্রসিদ্ধ রাজ্য। কেন্দু বৃক্ষ নাম হইতে ঝরের নাম, পরে রাজ্যের নাম হইয়া থাকিবে। বাং ঝো-ড় (সং ঝ-র হইতে), জলে প্রবাহজাত নালী। ভূমি সমতল, মধ্যে জলনালী।

ভগ্নকঙ্কণের এবস্থানে পাদটীকায় ও• ম-লি-ক, বাং ম-ল্লি-ক পদবীর ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মহারাজার নিকট জো-র শব্দ বিচার উপস্থিত করিলাম।

সম্বলপুরের দক্ষিণে সোনপুর রাজ্য। এই রাজ্যে বনের অভাব নাই, পাহাড়ের নাই, বোধ হয় জোরের নাই, শবরাদি অনার্য্য জাতিরও নাই। সম্বলপুর হইতে মহানদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া সোনপুর রাজ্যকে বিভক্ত করিয়াছে, অতএব মনোহারিণী কাহিনী রচনার প্রাকৃতিক উপকরণ যথেষ্ট আছে। হয় ত ভগ্নকঙ্কণের স্থান সোনপুরে। কিন্তু জনশ্রুতি অদ্ভুত হইলেও প্রায়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রাম্য কবি ইহাতে রস অনুভব করিতে পারিলেও শ্রোতার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। যিনি কবি, তিনি কঙ্কাল-সার জনশ্রুতি আলম্বনে জীবন্তমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

ভগ্নকঙ্কণ ক্ষুদ্র পুস্তক, মাত্র ৪৭ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের নামের উৎপত্তি লিখিতেছি। অজয়-গড়ের এক পাপিষ্ঠ সেনাপতি আর্য্যরাজবংশের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ হত্যা করিয়া নিজে রাজদণ্ড "গ্রহণ" [? ধারণ] করিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে এক জ্যোতিষ উক্ত সেনাপতির পিতার নিকট এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিল যে, রাজগৃহের লক্ষ্মী-পেটিকার ভিতরে যে কঙ্কণ আছে, কেহ তাহার অংশ ভাঙ্গিয়া লইতে পারিলে রাজগৃহের উচ্ছেদ হইবে, এবং যে সেই ভগ্নাংশ আনিয়া অপর অংশের সহিত জুড়িতে পারিবে, সে নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন লাভ করিবে। উক্ত সেনাপতি একথা শুনিয়াছিল, এবং একদিন তাহাকে লক্ষ্মী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সে নিজের হস্তে ভগ্নকঙ্কণ রাখিতে পারিল না। অজয়গড়ের সিংহাসন যাহার প্রাপ্য, সে দৈববশে তাহারই হাতে গিয়া পড়িল।

কাহিনীর মধ্যে জৈন সাধু ও ভিক্ষুণী আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অতিথির মতন আসিয়া ছায়ার মতন চলিয়া গিয়াছেন। নায়ক-নায়িকাও আসিয়াছেন, কিন্তু দুই দুই জন। নায়ক দুই সহোদর রাজকুমার। নায়িকাও দুই সহোদরা রাজকন্যা। কিন্তু একজন শবর-পালিতা, অপর জন রাণী হইয়াও অজ্ঞাতকুলশীলা। পরে অবশ্য সব জানা পড়িয়াছে। ইহাদের চরিতবর্ণনা স্বল্প; কিন্তু তাহাতেও উপন্যাসের ভঙ্গি আসিয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, কাহিনী গল্প নয়, উপন্যাস নয়, ইতিহাস নয়। ইহার ভাষা প্রযত্ন-কৃত হইলে চমৎকারিত্ব লুপ্ত হয়। বিশেষতঃ ভাষায় স্বচ্ছন্দগতি প্রসাদগুণ না থাকিলে কাহিনী ম্লান হইয়া পড়ে, ইংরেজী রিপোর্টের অনুবাদ মনে হয়।

প্রাচীন কাব্য ছাড়িয়া দিলে, নবীন ওড়িয়াসাহিত্য, বিশেষতঃ পদ্য-সাহিত্য এখনও শিশু। এই শিশুকে পুষ্ট করিতে কাহিনী-রচনার প্রয়োজন আছে। ওড়িষ্যায় "নিভৃত পর্ব্বতগুহা পরিত্যক্ত জীর্ণমন্দির" ও প্রাচীন গড়ের উগ্নাবশেষের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সোনপুরের মহারাজা যে পথ ধরিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। এই হেতু আশা করি, তিনি ওড়িয় সাহিত্য ও ওড়িষ্যার * ইতিহাস সমৃদ্ধ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* বাঙ্গালায় উ-ড়িয়া ও উ-ড়িষ্যা বানান চলিত বটে, কিন্তু একটু পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। উ স্থানে ও, এই পরিবর্তন। ইহার সার্থকতাও আছে। প্রাচীন ও-ড্র হইতে ও-ড়; ও-ড়্ × ইয়া = ও-ড়ি-য়া। অতএব এই নাম শুদ্ধ। প্রাচীন ওড্র-বিষয়া হইতে ওড়্ × ইষয়া = ওড়িষ্যা = ওড়িষ্যা। ওড়িয়াতে লেখা হয় ও-ড়ি-শা। ওড়িয়ার মুখে শ-কার বাঙ্গালা ষ্য (ষিয়) তুল্য। এই কারণে ওং ও-ড়ি-শা শুনিতে বা ওড়িষ্যা (ইংরেজী Orissa)। পরে ই থাকিলে বাঙ্গালা উচ্চারণ নিয়মে পূর্ব অ-কার ঈষৎ ও-কার, এবং পূর্ব ও-কার ঈষৎ উ-কার হইয়া যায়। এই হেতু বাঙ্গালায় উ-ড়ি-য়া ও উ-ড়ি-ষ্যা লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই উচ্চারণ ও বানান অশুদ্ধ।

হেক্টর

টিরেটাবাজার থেকে যেদিন তাকে প্রথম বাড়ী নিয়ে আসি সেইদিনই রাত্রিতে আমার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোতে সে বায়না ধরেছিল।

তার ছোট-ছোট লোমশ পা-দুখানি তুলে সাফিয়ে আমার খাটের উপর উঠে পড়তে সে যে কি প্রাণান্ত চেষ্টাটাই করেছিল সারা রাত ধরে; কিন্তু তবুও সে তো বড্ডই ছোট।

আমি সখ করে তার নাম রাখ্‌লাম হেক্টর। নামটা ঠিক খাপ খেল কি না দেখ্‌বার আমার দরকারও ছিল না। সুবিধাও ছিল না, কেননা হেক্টর-চরিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। তাছাড়া কুকুরের প্রভুভক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা গেছে, কিন্তু তার চরিত্র বলে একটা কোনো পদার্থ আছে বলে বড় একটা শোনা যায়নি।

কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ্‌লাম, আমার হেক্টরের প্রভুভক্তির কোনো পরিচয় ভালো করে পাওয়া যাবার বহু আগ থেকেই তার চরিত্রের একটা দিক বেশ স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়্‌তে লাগ্‌ল—সেটা তার বাবুয়ানা। মাংস রান্নায় নুন কম হলে আমার নিরাপত্তিতে চল্‌ত, তার চল্‌ত না। স্নানের পর আরাম-কুর্সিটার উপরে উঠে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছিল তার স্বভাব, আরাম করবার জন্যে নয়, ধূলোবালির থেকে নিজেকে বাঁচাতে। তার লীলায় আমি যেদিন আদর করে রূপো-বাঁধানো বক্‌লেশটা পরিয়ে দিলাম সেদিন সোহাগে আটখানা হয়ে আমার মুখ চেটে দেবার চেষ্টাতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পাড়ার কুকুরগুলির দাঁতকে তার তত ভয় ছিল না, তাদের নোংরা চেহারাটাকে যত। যেয়ো কুকুর চোখে পড়্‌লে চোঁচা দৌড় মেরে সে-তল্লাট ছেড়ে সে পালিয়ে যেত। অবার ফিটফাট বাবু কুকুর, যতই বড় আর ভয়ঙ্কর হোক না, তার সঙ্গ লাভ করতে সে দুবার ভেবেও দেখ্‌ত না।

কলেজ থেকে ফিরে বাড়ী ঢুক্‌তেই দেখ্‌তে পেত যে আমার সাড়া পেয়ে সে ল্যাজ উঁচু করে সিঁড়ির ঘর-উপরকার ধাপটিতে সাম্‌নের পাদুটি নামিয়ে অপেক্ষা করে আছে, আর নাম্‌তে তার ভরসা হচ্চে না। আমি

ডানহাতের বইগুলোকে বাঁহাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার গলায় হাত বুলিয়ে দিতাম, কিন্তু টেনে তাকে বুকে না তোলা পর্য্যন্ত সে তৃপ্ত হত না, ব্যাকুল হয়ে ক্রমাগত লাফালাফি করতে থাকত।

এমনি করে আমার কোলেপিঠে, বিছানায় বালিশে, দুধে, বিস্কিটে, মাংসে একটু-একটু করে সে বড় হতে লাগল। তার রেশমের মতো কোমল চকচকে লোমগুলি লম্বা হতে হতে তার দুপাশ দিয়ে মাটি ঝেঁটিয়ে চলতে লাগল। এত বড়টি হয়েও আমার কোলে উঠ্‌বার জন্যে তার আগ্রহ দেখে আমার কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া-খাপ্‌ছাড়া লাগত, কিন্তু তাকে বিমুখ করা আমার সাধ্য ছিল না। কাজেই কোলেকোলে কোল-মাণিক হয়েই সে বেড়ে উঠ্‌ল।

বাড়ী থেকে আমার যে টাকা আসত তাতে আমার খাওয়াপরা কায়ক্লেশে চলত; এই নূতন উপসর্গ জোটাতে খরচের ছোটখাট ডালপালা অনেকগুলো ছেঁটে ফেলতে হলো। নিজের কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু কুকুরের কোনো-দিকে এতটুকু আরামের অভাব সহ্য করতে পারি না। একটা কুকুর—তার কাছে আমার দারিদ্র্য ধরা পড়ে যাবে, এটা কেমন বরদাস্ত হত না। একটা ছোট স্প্যানিয়েলের খোরাক যে না জোগাতে পারে, নিজের খোরাক তার মুখে রুচবেই বা কি বলে?.....

সে নিশ্চয় মনে করত আমার কাছথেকে সে যা-কিছু পাচ্ছে তার দরুণ উচিত দাম আমাকে সে দিয়ে চলেছে, আমার ঘরের আস্‌বাবপত্রের শোভা বাড়িয়ে, তার কোমল লোমশ গায়ে হাত বুলোবার অধিকার দিয়ে, লাফিয়ে আমার কোচার কাপড় আঁচড় মেরে ছিঁড়ে ফেলে, আমার কাছে এসে দেহটিকে ডাইনেবাঁয়ে বাঁকিয়ে ল্যাজের দোলানিতে। নিজের সম্বন্ধে তার ভারি একটা গর্ব্বের ভাব বরাবর দেখ্‌তাম।

বেশ সুখে আমাদের দিন কাটছিল। এর মধ্যে আমার লেকচার সারা হয়ে যাওয়াতে বাড়ী যাবার ডাক এল। জিনিষপত্র মুটের মাথায় দিয়ে, হেক্টরকে বগলদাবায় করে শেয়ালদায় এসে গাড়ী চাপ্‌লাম। হেক্টর আমার সঙ্গে আসতে পেল না, ঘোরতর আপত্তি জানাতে-জানাতে তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট গাড়ীর দিকে সে চলে গেল।

রাণাঘাটে নেমে তার জান্‌লায় এসে দেখি এই নির্ব্বাসনকে দৈবনিগ্রহের মতো মনে করে এককোণে একপাশে জড়সড় হয়ে জান্‌লার তারের জালের ওপর কসে নাক চেপে সে বসে আছে; ঐ করে গাড়ীর ভেতরটাকে যতটুকু সম্ভব সে ভুল্‌তে চেষ্টা করছে। আমাকে দেখেও সে নড়্‌ল না। তারের জালের ওপর নাকটাকে আরো একটুখানি চেপে, জান্‌লার কাছে আরো একটুখানি ঘেঁসে বস্‌ল।

পথে আয়েক জায়গায় রোলোয়ের লোকেরা তাকে কি একটা দরকারে নীচে নামিয়ে নিয়ে এল। আমার গাড়ীর সুমুখ দিয়ে তার যাবার সম্ভাবনা দেখেই আমি দরজার হাতল ঘুরিয়ে চট করে নেমে পড়্‌লাম।—আমি যে গদিমোড়া গাড়ীতে দিব্যি আরাম করে চলেছি তাকে একটা দুর্গন্ধ আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যে নির্ব্বাসিত করে, এটা তাকে জান্‌তে দিতে কেমন প্রবৃত্তি হলো না।...

রেল থেকে নেমেই দেখা গেল মুস্কিল। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী সাড়ে চার ক্রোশ; আমাকে নেবার জন্যে হাতী অপেক্ষা করছে, কিন্তু হেক্টরের জন্যে কোনো রকমের যানবাহনের ব্যবস্থা করতে ত বাবাকে লেখা হয়নি। হাতী কিছুতেই একটা কুকুরকে পিঠে করতে রাজি হবে না। মাহুত বল্‌লে,—ওকে নাবিয়ে দিয়ে এসে আপনি হাতীতে চড়ুন না বাবু। কুকুর কখনো পথ হারাবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আস্‌বে।

আমি এ কথার কোনো জবাবই দিলাম না, একটু কেবল হাস্‌লাম। হেক্টর আমার বুকের সঙ্গে আরো একটুখানি লগ্ন হয়ে আমার চিবুক চাটবার জন্যে জিবটাকে পাঁয়তারা করতে লাগল।...

হাতীটার নাম রঙ্গলাল। সে আমাদের বিলম্বে অধীর হয়ে শুঁড়টাকে উপরে উৎক্ষিপ্ত করতে করতে দুল্‌তে দুল্‌তে একপাক ঘুরে এল। অনেক ভেবে একটা উপায় ঠিক করলাম। আমার গায়ের শালখানা দিয়ে হেক্টরকে বেশ করে মুড়ি দিলাম। তাকে নিয়ে এ আবার আমার একটা নূতন তামাসা হচ্চে মনে করে সে আপত্তি না করে ঠাণ্ডা হয়ে রইল।

রঙ্গলালের বুদ্ধি যতটা সূক্ষ্ম, চোখের দৃষ্টিও যে সেই

পরিমাণ তীক্ষ্ণ তা বলতে পারি না। শাল-মুড়ি-মেওয়া হেক্টরকে পুঁটুলি মনে করে সে দিব্যি নিরাপত্তিতে ঘাড় নত করে আমাকে তার পৃষ্ঠে গ্রহণ করলে। নিরুদ্বেগে আমাদের যাত্রা সুরু হলো।

কিন্তু উদ্বেগ জমা হয়ে ছিল। শালের ভাঁজের বাইরে যে একটা বিপদ কিছু আছে হেক্টর সম্ভবতঃ সেটা আঁচ করতে পেরে মরার মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু দুপুরের রোদ ভেতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গরম শালের মুড়ির মধ্যে সে হাঁপিয়ে উঠে ছটফট করতে লাগল। আমি নতই তার পিঠ চাপড়াই, শালের মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকি, কিছুতেই কিছু হয় না। ভারি বিপদে পড়া গেল। মানে মানে আর ক্রোশ এগিয়ে যেতে পারলে ভালো রাস্তায় পড়ে তাকে কোলে করে হেঁটেই না হয় বাকী রাস্তাটা মেরে দেব ভাবচি, হঠাৎ শালে ঢাকা মাথাটা উঁচু করে সে ডেকে উঠল, ঘেউ!

হাতীটা একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাইত, এখন করা যায় কি! মাহুত বললে,—বাবু, রঙ্গুকে ত আপনি ছেলেবেলা থেকে জানেন। ও একবার গোঁ ধরলে ওকে এক পা নড়ানো কারু সাধ্য হবে না। আমি বলি কি, ওকে আপনি নীচেয় নামিয়ে দিন। কুকুরের জাত, ও ঠিক আসবে।

রঙ্গু তার প্রকাণ্ড মাথাটাকে যে-একটুখানি পারলে ডাইনে বাঁয় ফিরিয়ে, লাল চোখ-দুটোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার আশপাশটাকে তন্ন তন্ন করে দেখে নিলে। উপর-টাকে দেখবার তার শক্তিও ছিল না, আর হেক্টরের যে আর-সব জায়গা ছেড়ে কোনোও রকমে একেবারে তার পিঠের উপর অধিষ্ঠান করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে এটা সে ভাবতেই পারলে না। কাজেই একটুক্ষণ ইতস্তত করে সে আবার আগের মতো চলতে আরম্ভ করলে।

হেক্টর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল কিন্তু থাকা কি যায়! আমি নিজে রোদে ভুগে ছাতাটা দিয়ে তাকে ছায়া করে রইলাম, তবু সে উস্‌খুস্ করতে লাগল। মাহুত বললে,—বাবু, ওকে নিয়ে আজ বিপদেই পড়তে হবে দেখচি। হাতী যদি ক্ষেপে যায় তাহলে কি আর রক্ষা থাকবে?

হেক্টরের আচম্‌কা ঘেউ ঘেউ শুনে আরো বহুক্ষণ ধরে রঙ্গলালের চলার গতিতে তাল কেটে গেল। কিন্তু নিজের কাছে বোকা বনে যাওয়া ছাড়া তার আর বাহ্যিক রকমের কোনও ভাবান্তর দেখতে পাওয়া গেল না। অবশেষে ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবার মোটেই যে কোনো দরকার আছে সেটা একদম ভুলে গিয়ে সে লক্ষ্মীটি হয়ে পথ চলতে লাগল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমাদের বাহিরবাড়ীর আঙিনায় হাতী গিয়ে দাঁড়াতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা যে যেখানে ছিল চেঁচামেচি করে ছুটে এসে তার চারদিক ঘিরে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। আমি হেক্টরকে তার কারাভোগ থেকে মুক্ত করে দেবার উদ্‌যোগ করতেই সে আমার হাত থেকে যন্ত্রকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল, তারপর একছুটে একেবারে রঙ্গলালের সুমুখে গিয়ে সামনের দুটো পাকে মাটিতে পেতে পেছন-টাকে উঁচু করে বললে,—ঘেউ ঘেউ।

রঙ্গলালের আমাদের প্রতারণা বুঝতে আর বাকী রইল না। ভারি অপ্রতিভ আর ক্রুদ্ধ হয়ে শুঁড় উঁচিয়ে হেক্টরকে ধাওয়া করে সে উঠানের চারধারটা একবার ঘুরে এল। আমি নেমে পড়ে বদ্‌মায়েস কুকুরটাকে বাহু-পাশে বন্দী করে ফেললাম।

এই ঘটনায় রঙ্গলাল হেক্টরের উপর খড়্গহস্ত হয়ে রইল। তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবার আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা রইল না।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আমাকে পেয়ে যতটা খুসি হলো হেক্টরকে পেয়ে খুসি হলো তার চেয়ে বেশী। আহার আর নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া কোল-মালিক কোলে বোলে লোফালুফি হয়ে ফিরতে লাগলেন। কোনোরকম করে তাদের হাত থেকে একটুখানি ছাড়ান পেলেই গা গুটিয়ে ছুট দিয়ে একেবারে আমার কোলের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল তার খেলা।

সকালবেলা বাধ্য হয়ে তাকে একবার বার হতে হত। রঙ্গলাল সুবিধা পেলেই তখন তাকে এমন তাড়া করত যে ভয়ের আঁৎকানিতে গলা শুকিয়ে গিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারত না। কত যে গুটি গুটি পা টিপে

টিপে সে যেত আর চোরের মতো পালিয়ে আস্‌ত, তবু এরকম উৎপাত প্রায় রোজই ঘট্‌তে লাগ্‌ল।

শেষটা একদিন রঙ্গলাল তাকে হাতের কাছে পেয়ে ঠেঙিয়ে তার একটা পা'কে একেবারে গুঁড়ো করে দিলে। হেক্টরের কাৎরানি শুনে মনে হলো যেন মানুষের ছেলে কাৎরাচ্ছে। কোলে করে তাকে নিয়ে এসে গুঁড়ানো পা'টাতে জলপটি দিয়ে বাতাস কর্‌তে থাক্‌লাম। সম্ভবত সারা শরীরে ব্যথা হওয়ার দরুণ সে তার গায় হাত বুলোতে দিতে চাইলে না।

পরের দিন বেদনায় সে বেঁহুস। রঙ্গলালকে নিয়েই জেলার সহর থেকে বস্তি আন্‌তে লোক গেল। আমি না খেয়ে ন. দেয়ে তার শিয়রের কাছে পাহারা রইলাম। সারাটা দিনের মধ্যে একটিবার সে চোখ খুল্‌ল না। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খেলার নূতন উপকরণ জুটিয়ে নিয়ে তফাৎ হলো। আমি আর হেক্টর একলা। ভাব্‌ছিলাম, একজন মানুষের সঙ্গে একটা পশুর এতখানি আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মানো সম্ভব; কিন্তু একটা মানুষ জাত আর-একটা মানুষ জাতের সঙ্গে কখনো মিল্‌তে পার্‌বে না, একজন কবি এমন কথাও বলেছেন!

ডাক্তার এসে দেখে বল্‌লে, পা'টাকে অস্ত্র করে ফেলে দিতে হবে, তা না হলে শরীরে পচন ধরে যেতে পারে। রাজি হত্তে হলো। পা যখন কাট্‌ল, আমি চোখ ঢেকে রইলাম। ওর কাতর আর্ত্তনাদে বাড়ীর মেয়েরা চোখের জল রাখ্‌তে পারেনি।

অস্ত্র করার সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকটা সুস্থ হয়ে হেক্টর একটু একটু করে খাওয়া-দাওয়া সুরু করেছিল। যখনি তার কাছে যেতাম, দেখ্‌তাম, ছিন্ন পা'খানির ক্ষতমুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে সে বসে আছে। আমি তার ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ বদ্‌লে বেঁধে দিতাম, কার্বলিক এ্যাসিডের জলে ধুয়ে, আইওডোফর্ম্‌ লাগিয়ে। তখন বাধ্য হয়ে রুমাল দিয়ে নাকটাকে জড়াতে হতো। সে তার কাটা পা'টাকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বেদনা ভুলে আরেক পায় থাবা মেরে মেরে আমার নাকের রুমালটাকে সরাবার চেষ্টা কর্‌ত। আমি মুখ সরিয়ে নিতাম, সে অশ্রুসজল চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাক্‌ত।

এরপর নাকে রুমাল বেঁধে যতবার আমি তার কাছে যাই, সে কান্না জুড়ে দেয়। সে কি কান্না, একটা জমাট অশ্রুর প্রাচীরকে নিয়ে প্রাণান্ত-কর ঠেলাঠেলি। মাঝে মাঝে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষত পা'টার দিকে কামড় নিয়ে গিয়ে গিয়ে নিজের অঙ্গ-হানির ক্ষোভ সে ভুল্‌তে চেষ্টা করে।

ঘা কিছুতেই শুকায় না। শরীরের মাংস পচে ওঠাতে তার কাছে যায় কার সাধ্যি। আবার ডাক্তার আন্‌তে লোক গেল। ডাক্তার যখন এল তখন ভোর-বেলা। হেক্টরকে দেখাতে নিয়ে যাব, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। বাড়ীর আনাচ-কানাচ পথ ঘাট মাঠ গাছতলা পাঁশগাদা কোথাও সে নেই!...

দিন-চারপাঁচ পর একজন জেলে এসে খবর দিলে, নদীর এ পাড়ের পুরানো যে ভাঙা বাঁধা ঘাটটায় জন-মানুষের গতিবিধি নেই, তারই শান-খসে-যাওয়া অন্ধকার একটা ঝুকরের মধ্যে হেক্টরকে পায়ের ওপর মাথা রেখে সে পড়ে থাক্‌তে দেখে এসেছে। ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লাম। গিয়ে দেখি তার শরীরটা আছে, সে নেই।...

ক্ষত দেহটাকে আমরা সইতে পারিনি বলে সেটাকে লুকিয়ে চুরি করে এনে এখানে সে ফেলে রেখে গেছে,—দেহটাকে বুকে তুলে নিয়ে তার জন্যে অশ্রুজলে ভিজে বাড়ী ফির্‌লাম।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

মল্লিকুমারী

[ইনি মথুরার রাজকন্যা; মতান্তরে মিথিলার। মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শীতলনাথ, শান্তিনাথ, ঋষভদেব প্রভৃতির ন্যায় ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে মাত্র-তীর্থঙ্কর এই একজন মাত্র। মল্লিকুমারীর আবির্ভাব-কাল বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্বে।]

সকল প্রাণীতে সমান দৃষ্টি,—
কারো প্রতি মোর বৈর নাহি;
অজানিতে যদি ঘটে অপরাধ
কীটেরও নিকটে ক্ষমা যে চাহি।
ছেড়েছি হরিষ-বিষাদের বিষ,
ছেড়েছি সকল উৎসুকতা,
রতি-অরতির ঘুচেছে দ্বন্দ্ব,
মোহের বন্ধ ছিন্ন-লতা।

অশোকের তলে একাকী বিরলে
করি' তপস্যা পদ্মাসনে,
গেছে দীনভাব, ভীরুর স্বভাব,
সকল শোচনা গেছে তা' সনে।
বিমল শ্রদ্ধা-নীরে নিরমল
চিতে অহিংসা নিয়েছি ব্রত,
সায়-হ'য়ে আসে কলুষ-কষায়
নিশি-শেষে দুঃস্বপ্ন মত।
শুক্ল-ধ্যানের সাগর-বেলায়
আছি দাঁড়াইয়া শান্ত-আঁখি,
তবু মনে হয়—এখনো সময়
হয় নি, কি যেন রয়েছে বাকী।
হে অশোক! মোর তপের সাক্ষী,
তুমি জানো মোর সকল কথা,
স্তব্ধ রুক্ষ! তোমার তলায়
সিক্ত-শিলার পাই বারতা।
নিদাঘে দহিয়া, বাদল সহিয়া
জীর্ণ করেছি দেহের দ্রোহ,
গুণ-স্থানের দ্বাদশ সোপানে;
তবু নয় উপশান্ত মোহ!
তবু সংশয়, তবু মনে হয়
মৈত্রী এ মোর সর্ব্বভূতে
এ শুধু নারীর মাতৃ-হিয়ার
মমতা,—দূরে না যায় কিছুতে।
বর্জ্জন যারে করেছি কঠোরে,
সে এসেছে চুপে ছদ্মবেশে,—
স্নেহ-ঘন মোহ-বন্ধন-জালে
জড়ায়ে আমায় বাঁধিতে শেষে!
অগাধের মীন, পথের পিপীলি'
হ'য়ে ওঠে ক্রমে পুত্রসম;
অশোক! অশোক! ফুটাও আলোক,
ভাবনার গ্লানি নাশ এ মম।
খেলাঘরে ছিল পুতুল যাহারা
সব স্নেহ মোর দখল ক'রে
মিনতি করিল মা হ'তে তাহারা
একদা নিশীথে স্বপ্নঘোরে।
মূরতি ধরিয়া আমারে সাধিল
আমার হিয়ার মাতৃস্নেহ;
আমি কহিলাম, "বাছা রে অ-নাথ!
তোদের যোগ্য নাই যে গেহ।
কঠিন এ ধরা কঙ্কর-ভরা,
নবনীর চেয়ে কোমল তোরা
ঘুমাইয়া থাক্ এ হৃদি-কমলে
পরিমল-বন স্বপন-ভোরা।
ফিরাইয়া চোখ ফুলাইয়া ঠোঁট
মিলাইয়া গেল মূর্ত্তিময়া,
মমতার ক্ষীর-সায়রের জলে
লীলা-কুতূহলী লুকাল কায়।
কেঁপে গেল বুক, মমতার দুখ্
স্বপনের পাওয়া হারিয়ে ফেলে
হাহাকারে যেন জাগাল আমায়
আঁখিজলে আঁখি-কবাট ঠেলে।
স্বপ্ন-শিশুর স্নেহে অজানিতে
নেমেছিল যেই পীযূষ-ধারা,
অজানিতে গেল ফিরে সে আবার,
সারা দেহ-মনে হ'ল সে হারা!
না পেয়ে আধার অমৃতের ধার
শিরে উপশিরে মিলাল চুপে,
আজ মনে হয় হ'ল সে উদয়
হৃদয়ে বিশ্ব-মৈত্রী-রূপে!
ঘুম পাড়াইয়া বারে ঘুমন্তে
রেখেছিনু হৃদি-পদ্মপুটে,
মনে হয় সেই জলে মহীতলে
শত রূপে আজ উঠেছে ফুটে!
তৃণে অঙ্কুরে সেই তৃষাতুর—
থাকে পথ চেয়ে, মনেতে মানি,
নিত্য তাদের তৃষ্ণা মিটাই
কলসে কলসে সলিল আনি।
পাখী হ'য়ে আসে করিয়া কাকলি
যেন জানেনাক' আমায় বিনে;
পিপীলিকা হ'য়ে ফেরে পায় পায়,
চিনি দিব আমি রেখেছে চিনে।

মীন হ'য়ে চায় অনিমেষ-আঁখি
আমারি হাতের অন্ন লাগি',
অতলের ডেরা ছেড়ে আসে এরা
যেন রে আমারি মমতা মাগি।
মনে হয় এই চির-কুমারীর
মানস-পুত্র ইহারা সবে,
বিশ্বের প্রাণ করে আহ্বান
মোরে নিশিদিন, নীরব রবে!
মুখ চেয়ে থাকে, মা বলিয়া ডাকে,
ভুলে ভুলে যাই আমি কুমারী।
এ কি অনুরাগ-বন্ধন? হায়!
এ কি অপরূপ বুঝিতে নারি।
অঞ্জলি যার অন্নের থালি,
তরুতল যার হয়েছে গেহ,
এ কি মাতৃতা-তৃষ্ণা তাহার,
এ কি ব্রতঘাতী ছদ্ম স্নেহ!
অশোক! অশোক! খুলে দাও চোখ,
তুমি যে আমার তপের তরু,
তোমার ছায়ায় পাব আমি পাব
কেবলী-জ্ঞানের পরম চরু।
* * *
একি দেখি ছবি! সাক্ষী-বিটপী
অকালে ফুটায় কুসুমপাঁতি,—
কি বলিতে চায়?—কলুষ-কষায়
লাগেনি?—মলিন হয়নি ভাতি?
তাই এ পুলক? ফুলের স্তবক
অকালে অশোক তাই ফুটালে?
দীর্ঘ-বেলার দুখ অবসান,
তপী তরু মোর ভ্রম ছুটালে।
মিছে সংশয়,—বন্ধন নয়,
নিখিল জীবেতে এই মমতা,
নিখিল জিনের প্রস দ ঘোষিছে
পুষ্প-তরুর প্রসন্নতা।
মিছে এ দ্বন্দ্ব কপট-বন্ধ
রচে নাই বাধা হৃদয়ে ঢুকে,
ফলের কামনা নাই এককণা,
নিদান-শল্য নাই এ বুকে।
সকল প্রাণীর হিতে এ শরীর
ব্রতধীর হ'য়ে নিয়োজে যেবা,
তার মমতায় নাইক কষায়,
মমতা তাহার মহতী সেবা।
জয়! জয়! জয়! নাই সংশয়,
টুটেছে সকল ভুল টুটেছে,
আমার তপের সাক্ষী-পাদপে
অকালে প্রসাদ-ফুল ফুটেছে!
জ্ঞান-আবরণ হ'ল রে মোচন,
মোহনীয় কিছু নাইক প্রাণে,
শুক্ল-ধেয়ানে সাঁতারিয়া চলি
অযোগ-কেবলী গুণস্থানে।
দেহ-কর্পূর যায় কোন্ দূর,
মনে অনন্ত-বলের লীলা,
জ্ঞান অনন্ত, অফুরান্ সুখ,
নাগালে আমার সিদ্ধশিলা।
মমতার পথে মোক্ষ আমার,
সাধনা আমার ত্রিকাল ভরি',
বিত্ত আমার চির-চারিত্র,
হৃদয়ে ললাটে রত্ন ধরি।
প্রসূতি না হ'য়ে শত সন্তান
পেয়েছি, হৃদয়ে নিয়েছি টানি;
প্রসবের ব্যথা যে খুসী সে নিক,
পালনের ব্যথা আমারি জানি।
যুগলিক-যুগে হয়নি জনম,
যুগল-সাধনা আমার নহে,
সেই সাধনার সার যে মমতা
মনে ভায়, মোর রক্তে বহে।
নিখিল প্রাণীর পাপ্‌ড়ি মিলায়ে
মমতার কোলে দিয়েছি মম,
নিখিল প্রাণের চন্দ্রমল্লী
এ হৃদয়ে ভায় চন্দ্র সম!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিয়ের ফুল

(১১)

হীরক ও সেবার অর্দ্ধসমাপ্ত বিবাহ অসমাপ্তই রহিয়া গেল; যাঁর জেদে এই বিবাহ হইতেছিল সেই সুমতির মৃত্যুতে সব উদ্‌যোগ স্থগিত হইয়া গেল। এখন বাড়ীর কর্ত্তার মধ্যে ত আনন্দ-বাবু; তিনি হীরকের মনের অবস্থা দেখিয়া হীরককে আর কোনো কথাই বলিতে পারেন না। সেবা নিজের বিবাহের কথা ত নিজে কিছু বলিতে পারে না; এক-একবার তার মনে হইতেছিল বটে যে বিবাহের সম্পর্ক যখন হীরকের সঙ্গে তার হইলই তখন অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হইয়া গেলেই ভালো হইত, কিন্তু সে নিজের বিবাহের কথা কেমন করিয়া কাহাকে বলিবে? অধিকন্তু সুমতির মৃত্যুতে সেবার মনেও অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল; মাত্র একটি দিনে সেবা যে স্নেহের আস্বাদ সুমতির ব্যবহারে পাইয়াছিল, আবাল্য-মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত সেবার চিত্ত তাতেই মুগ্ধ হইয়া তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে ভালোবাসায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত লাভ অকস্মাৎ হারাইয়া সেবার মন বড়ই কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজের মন দিয়া বুঝিতে পারিতেছিল হীরকের মনে কি কষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হীরকের সঙ্গে তার যে বিবাহের একটা সম্পর্ক তার মা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তার অনুষ্ঠানটা যে সম্পূর্ণ হয় নাই ইহা সেবা হীরককে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে সুমতির মৃতদেহ যখন সৎকার করিতে লইয়া যাওয়া হইল, তখন প্রশ্ন উঠিল—তাঁর মুখ-অগ্নি করিবে কে? হীরক অশ্রুপ্লাবিত চোখের কাতর দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেবা কি এখানে আছে?

আনন্দ বাবু বলিলেন—হাঁ, সেবা আছে।

সেবা হীরকের খাটের মাথার দিকে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল; সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হীরকের দৃষ্টির সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া কান্নাভাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি বল্‌ছেন আমাকে?

হীরক দেখিল সেবার চক্ষে জল, মুখ শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন, স্বরে তার ব্যথার কোমল কাঁপন; তার মার জন্য এই নবাগতারও দুঃখ অনুভব করিয়া হীরকের মন সেবার প্রতি কৃতজ্ঞ ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল; সে কোমল কাতর স্বরে সেবাকে বলিল—আমার ত নড়বার শক্তি নেই; তুমি কি আমার হয়ে মাকে বিদায় দিতে আস্‌তে পার্‌বে?

হীরকের কথা শুনিয়া সেবার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; হীরক যে তাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে—এ বিষয়ে সেবার আর কোনো সন্দেহ রহিল না;—হীরক তাকে তুমি বলিয়া কথা কহিল এবং হীরকের প্রতিনিধি হইবার অধিকার দিল। সেবা আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি বলিল—পার্‌ব।

হীরক আর কিছু বলিল না। সেবা ও আনন্দ বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শাশুড়ীর সৎকার করিয়া সেবা যখন বাড়ীতে ফিরিল তখন বেলা প্রায় একটা। সেবা ক্লান্ত শুষ্ক ম্লান মুখে বাড়ীতে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি আগে হীরকের কাছে আসিল। তাকে ফিরিতে দেখিয়াই হীরক ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মার সব শেষ হয়ে গেল?

সেবারও দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে নীরবে আসিয়া হীরকের মুখের কাছে দাঁড়াইল। সেবাকে আসিতে দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে লোকনাথও সেইখানে আসিল। সেবা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল—লোকনাথ-দাদা, খাওয়ানো হয়েছে?

লোকনাথ চোখ মুছিয়া বলিল—না। আপনি ফিরে না এলে খাবেন না বল্‌লেন।

সেবা ব্যস্ত হইয়া বলিল—বেলা যে অনেক হয়েছে, খাবার নিয়ে এস।

হীরক স্নেহসিক্ত স্বরে বলিল—আমার জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি আগে খাওগে, তার পর আমায় খাইও। রোদে হেঁটে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে; তুমি অসুখ কোরে পড়্‌লে তোমাকেই বা কে দেখ্‌বে আমাকেই বা কে দেখ্‌বে—এখন ত আর আমাদের মা নেই?

হীরকের অশ্রু আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হীরকের স্নেহের স্পর্শে সেবার মন পুলকিত হইয়া উঠিয়া-

ছিল। পারিবারিক জীবনের মধুর রসাস্বাদ যেটুকু সে এখানে আসিয়া পাইল তাই তার আবাল্য-স্নেহবঞ্চিত জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা বলিয়া অভিনব ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছিল। সেবা তোয়ালে দিয়া হীরকের মুখ চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—আপনি একটু খেয়ে নিন, তার পর আমি যাচ্ছি। লোকনাথ-দাদা, বামুন-ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বলো।

লোকনাথ চলিয়া যাইতেছিল। হীরক বলিল—এখন ত বামুনের রান্না খেতে নেই; এ কদিন অন্য কিছু খেয়েই কাটিয়ে দেবো।

সেবা বলিল—আমি হবিষ্যি রেঁধে দেবো।

হীরক সন্তুষ্ট হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, তোমার অত কষ্ট কর্‌তে হবে না।

সেবা বলিল—আমারও ত অন্যের হাতে খেতে নেই, আমার নিজের জন্যে রাঁধ্‌তে হবে ত।

খ্রীষ্টান মিশনারী মেমের কাছে মানুষ ও খ্রীষ্টানী স্কুলের মাষ্টারনী সেবা হিন্দুয়ানীর এইসব আচার নিজে পালনীয় না মনে করিলেও হীরকের তুষ্টির জন্য পালন করিতে প্রস্তুত হইল। এবং তার এই সহজ আচরণে হীরক ভুলিয়া গেল যে সেবা তাকে খাওয়াইবার জন্যই নিজে রাঁধিতে স্বীকার করিতেছে। হীরক খুব খুসী হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। লোকনাথ হীরকের খাবার আনিতে গেল।

সেবা হীরককে জল-খাবার খাওয়াইয়া তাড়াতাড়ি রাঁধিতে গেল। হবিষ্য রাঁধিয়া লইয়া সেবা নিজে থালায় ভাত বাড়িয়া ব্যস্ত ভাবে যখন ঘরে আসিল তখন বেলা একেবারে গড়াইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন অনাহারে ও শোকে সেবার মুখ ত শুকাইয়াই গিয়াছিল, তার উপর আগুন-আঁচ লাগিয়া তাত-পাওয়া ফুলটির মতন দেখাইতেছিল। সেবা ব্যস্ত দ্রুত পদে হীরকের কাছে যাইতে যাইতে মমতা-ব্যগ্র স্বরে বলিল—আজকে আপনার বড্ড অনিয়ম হয়ে গেল। বেলা একেবারে গড়িয়ে গেছে।

হীরক প্রতিক্ষণে সেবার যত্ন করিবার সহজ আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল; যেন মা তার অসহায় শিশু সন্তানকে যত্ন করিতেছে। হীরক রমার মধ্যে কেবল মধুময়ী প্রণয়িনী পত্নীরই সন্ধান পাইয়া পুলকিত ও তৃপ্ত ছিল; কিন্তু সেবার মধ্যে সে পাইতেছিল একাধারে মাতার মমতা, বন্ধুর সহমর্ম্মিতা, এবং দাসীর সেবাপরায়ণতা; হীরকের তখন মনে হইল ইন্দুমতী সম্বন্ধে অজের ধারণার কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু সে অনুভব করিতে চাহিতেছিলও না, পারিতেছিলও না, সেবার সঙ্গে প্রণয়িনী পত্নীর সম্পর্ক। সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না, সেবা বেচারী আজীবন বিধবা থাকিয়া কষ্টই যে পাইবে তাহা কিসের জন্য? এই দারুণ দুঃখ স্বীকার করিতেছে সে বিনিময়ে কি পাইয়া? কিছু সম্পত্তি? বস্তু ও বিষয় কি মনের অভাব ভরাইতে পারে? আবাল্য দারিদ্র্যে পীড়িতা চিত্তবৃত্তির ব্যাপারে অনভিজ্ঞা সেবা ধনের লোভেই নিজকে এত সহজে ও সস্তায় বিকাইয়া দিয়াছে যে তাতে কোনো সন্দেহ নাই; কিন্তু হীরকের মৃত্যুর পর সে যখন জীবনখাতার পাতে লাভ-লোকসানের অঙ্ক মিলাইয়া দেখিতে পাইবে যে সে কি ঠকাই ঠকিয়া গেছে, তখন সে নিজেকে ত দুষিবেই, প্রতারক প্রবঞ্চক বলিয়া আরো অনেককেই দুষিতে তার ইচ্ছা হইবে। এইসব কথা মনে হইতেই হীরক সেবার উপর কেমন একটু অনুকম্পামিশ্র করুণা ও মায়া অনুভব করিতে লাগিল, তার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতন একটু কৌতুকরসও গোপন হইয়া ছিল বোধ হয়। এইজন্য সেবার কথায় হীরক কোনো কথা বলিতে পারিল না; সেবা তাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল ও সে নীরবে খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে হীরক সেবাকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি জলটল কিছু খেয়েছ?

সেবা ম্লান মুখে বলিল—খেয়েদেয়ে কি হবিষ্যি রাঁধ্‌তে আছে?

হীরক সেবার যত পরিচয় পাইতেছিল তত তার বিস্ময় বোধ হইতেছিল। হীরক বিস্ময়ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ছিলে কোয়েটায়, মানুষ হয়েছ মেমের কাছে; এত সব আচার-অনুষ্ঠানের খবর তুমি কোথায় পেলে?

সেবা বলিল—আমি চোখ মেলে চল্‌তে চেষ্টা করি আর আমার দেশের মধ্যেও থাক্‌তে চেষ্টা করি; তাই আমি এসব জান্‌তে পেরেছি।

হীরক বলিল—সন্ধ্যে হয়ে এল। তুমি আর দেরী কোরো না; খেয়ে নাওগে। আমায় ত তুমি খাইয়ে গেলে; কিন্তু তোমার খাওয়া হল কি না তা দেখবার শক্তি আমার নেই; তুমি নিজে নিজের যত্ন কোরো।

হীরকের স্বরে একটা হতাশ অসহায় অবস্থার ব্যথা ও সেবার প্রতি মমতার সুর বাজিয়া সেবার মন স্পর্শ করিল। সেবা বলিল—আপনি উঠে আসুন না। আপনি ইচ্ছে করলেই ত উঠতে পারেন। আপনার ত ইচ্ছা-অসুখ।

হীরক একটু বিরক্ত একটু ব্যথিত হইয়া বলিল—ভীষ্মের মতন যদি আমার ইচ্ছামৃত্যু হত তাহলে আমি একদিনও ইচ্ছা-অসুখে বিছানায় পোড়ে থাকতাম না; তোমাকেও কষ্ট দিতাম না।

এই কথা শুনিয়া সেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। হীরকের মনে হইল যেন সে লক্ষ্য করিল সেবার মুখে বিরস বিরক্তি। হীরককে সেবা সুস্থ হইয়া উঠিতে দেখিতে চায়, সে তার মৃত্যুর কথা শুনিতেও চায় না, এতে হীরক মনে মনে খুসী হইল, যদিও তার মন তখনই বলিয়া লইল—সে নিজে ত ভালো হইতে চায়ও না, ভালো হইবেও না। কিন্তু এই শ্যামলা ধরিত্রীর কোলে এতকাল থাকিয়া একদিন যখন সে চলিয়া যাইবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, তখন যে অন্তত একজনও তার অভাবে বিলাপ করিবে না,—এই সম্ভাবনা যে বড় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়; এখন এমন একজন লোক হয়ত থাকিবে যার মনের মধ্যে সে একটু ব্যথা একটু অভাববোধ রাখিয়া যাইতে পারিবে। মানুষ একেবারে লুপ্তস্মৃতি হইয়া মুছিয়া যাইতে চায় না; তাই তার বংশরক্ষার আগ্রহ, তাই উত্তরাধিকারী না থাকিলে সে পোষ্যপুত্র লয় অথবা সম্পত্তি দান করিয়া নিজের স্মৃতি স্থায়ী করিবার কামনা করে; কোথাও সে বাঁচিয়া রহিবে এই আশাতেই সে মরিতে পারে, মরা তার সহজ হয়। হীরক মনে করিল এইবার তারও মরা সহজ ও সুখকর হইবে।

(১২)

রমার মৃত্যুর আজ দশাহ। সেবা ভোরবেলা উঠিয়া বাগানে গিয়া নিজের হাতে নানাবিধ ফুল তুলিয়া আনিল। তারপর স্নান করিয়া সে হীরকের ঘরে নিঃশব্দে যখন আসিল, দেখিল হীরক তখনও ঘুমাইতেছে। হীরকের ঘরের দেয়ালে রমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল; সেবা সেটি সন্তর্পণে নামাইয়া আনিয়া হীরকের খাটের কাছে একখানি চেয়ারের উপর চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়া খাড়া করিয়া রাখিল এবং ফুলের ঝুড়িটি আনিয়া ফুল দিয়া সেই ফটোখানিকে সাজাইতে লাগিল।

বহু ফুলের পুঞ্জিত ঘন গন্ধে হীরকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চোখ মেলিয়াই দেখিল শরতের উষার অপূর্ব্ব লাবণ্যে বাহিরের আকাশ মনোরম শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসে নেবু শিউলী আরো কি-জানি কোন্ ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে; দোয়েল বুলবুল শিসের ঝঙ্কারে যেন আকাশবীণার তারে তারে মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে। হীরক খোলা জানলার দিকে চোখ মেলিয়া আকাশের গায়ে শাদা মেঘের ভেলার দোলা দেখিতে লাগিল; তার মনে হইতেছিল অত ফুলের গন্ধ বুঝি শরতের নিশ্বাস থেকেই আসিতেছে। কিন্তু তখনি তার মনে হইল এই ঘন গন্ধ ফুলের নয়, এ যেন তার একেবারে বুকের ভিতরকার নিশ্বাস থেকেই সে পাইতেছে।

সেই দিক হইতে চোখ ফিরাইতেই হীরকের চোখ পড়িল সেবার উপর; সে রমার ছবির সামনে হাঁটু গাড়িয়া উঁচু হইয়া বসিয়াছে এবং ঝুড়ি হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল তুলিয়া তুলিয়া রমার ছবিকে ভূষিত করিতেছে। হীরকের মন রমার জন্য দুঃখে ও সেবার অচরণে আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সে কাতর মুগ্ধ দৃষ্টিতে রমার ছবি ও সেবার উপাসিকার মতন পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তার চোখ দিয়া দুঃখ-আনন্দের অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে যে জাগিয়াছে এ কথা সে সেবাকে জানাইল না; সেবা ছবি-সাজাইতেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, সেও হীরকের জাগরণ লক্ষ্য করিল না। সযত্নে ছবির পুষ্পপ্রসাধন শেষ করিয়া সেবা উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল হীরক জাগিয়াছে; তার চক্ষে অশ্রুমাখা মুগ্ধদৃষ্টি শিশিরভেজা উষার আলোকের মতন সেবাকে ও রমার ছবিকে দেখিতেছে। সেবা হীরকের সঙ্গে কথা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তার চোখে জল দেখিয়া আর কোন

কথা সরিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হীরকই কথা বলিল—এ কী সেবা?

সেবা ব্যথিত স্বরে বলিল—আজ দিদির শ্রাদ্ধের দিন, পুরুতঠাকুর বল্‌ছিলেন—অশৌচের মধ্যে অশৌচ হয়েছে, শেষ অশৌচান্ত না হলে কোনো শ্রাদ্ধই হতে পার্‌বে না। আজকের দিনে কোনো রকম শ্রদ্ধা দেখানো হবে না, এ আমার ঠিক মনে হল না।

হীরকের শোকে ও সুখে চোখের জল হু হু করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; তার মনে হইল সেবার উদার চিত্তের মহত্ত্ব। রমা এখন তার সতীন; রমাকে হীরক ভালোবাসে বলিয়াই সে সেবাকে বিবাহ করিতে চায় নাই; রমাকে না ভুলিলে হীরকের অন্তরে সেবার স্থান হইবে না; অথচ সেই সেবা নিজে হাতে রমার ছবি ফুলে সাজাইয়া তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে এবং হীরকের মনের ও চোখের সাম্‌নে রমাকে উজ্জ্বল স্পষ্ট করিয়া ধরিতেছে! হীরক মুগ্ধ স্বরে বলিল—রমা বেঁচে থাক্‌তে যদি তুমি আস্‌তে সেবা—তা হলে আমরা তিনজনেই সুখী হতাম।

সেবা বলিল—তিনি বেঁচে থাক্‌লে ত আমার আসারই কোনো দর্‌কার হত না; কাজেই আমার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

সেবার এই কথায় হীরকের মন ভার হইয়া উঠিল; রমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগ্রহ সেবার যে কেন হইল না—এই অন্যায় আচরণে সেবার উপর হীরক মনে মনে বিরক্ত হইল; হীরক চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। সেবা মনে করিল হীরক বোধ হয় রমার কথা মনে করিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে হীরকের আহারের আয়োজন করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেবার এই কথার আঘাত হীরক কয়েক দিন ভুলিতে পারিল না। সে গম্ভীর হইয়াই সেবার সেবা গ্রহণ করিতে লাগিল; সেবা তাকে খাওয়ায়, বই কাগজ পড়িয়া শোনায়, রাত্রে ঘুমাইয়া না পড়া পর্য্যন্ত তার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দ্যায়; কিন্তু হীরক তার সঙ্গে প্রায়ই কিছুই কথা বলে না, সে খায় নীরবে, পড়া শোনে নীরবে, সেবা খানিক পড়িয়া যখন জিজ্ঞাসা করে—আর পড়ব কি?—হীরক তখনই বলে—থাক্; সে ঘুম আসিবার আগেই চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার ভান করে; সেবা চলিয়া গেলে তার মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠে, তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সেবা হীরকের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু এর কারণ যে সে নিজে তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই; সে মনে করিতেছিল—মা ও পত্নীর শোকেই হীরক এমন দুঃখিত হইয়া আছে। কেবল যখন সেবা ডালপালা সুদ্ধ এক পাঁজা ফুল বুকের উপর কাঁধের কাছে ফেলিয়া তার ঘরে আসে তখন সেই ফুলের পাশে একটি বড় ফুলের মতন প্রফুল্ল সেবার মুখখানি দেখিয়া হীরক মুখে না হাসিতে চেষ্টা করিলেও তার চোখ দুটি যে হাসিয়া উঠে তাহা সেবা বেশ বুঝিতে পারে।

এমনি করিয়া সুমতির শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেবা ভোর বেলা উঠিয়া পুরোহিতের নির্দ্দেশ-মতো সমস্ত আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইল। এক একবার সে কাজ করিতেছে আর নিঃশব্দ লঘুপদে আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে হীরকের ঘুম ভাঙিয়াছে কি না। একবার সে ঘরে আসিয়া দেখিল হীরক জাগিয়াছে। সেবা বলিল—আজ মার শ্রাদ্ধ। আমি পুরুত-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরে ম্যানেজার-বাবুকে দিয়ে সব জোগাড় করেছি। এই ঘরের মেজেতে শ্রাদ্ধের জায়গা কর্‌ব কি?

হীরক বলিল—তাই করো। নইলে আমি ত দেখ্‌তে পাব না।

সেবা চাকরদাসীদের সঙ্গে নিজেও খাটিয়া সত্বর ঘর পরিষ্কার ও শ্রাদ্ধের সমস্ত বস্তু আনিয়া সাজাইয়া ফেলিল। হীরক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল—সেবা এই কদিনে নিজের ইচ্ছা ও উদ্‌যোগে বড়লোকের শ্রাদ্ধের কোনো উপকরণেরই অভাব রাখে নাই; রূপার ষোড়শ, ভালো খাট বিছানা, জুতা ছাতা, কাপড় গরদ ইত্যাদি সমস্তই সে ম্যানেজারকে দিয়া আনাইয়াছে। সেবার এই কর্ম্মকুশলতা ও আপন উদ্‌যোগে কর্ম্ম করিবার শক্তি দেখিয়া হীরক খুসী হইয়া উঠিল। হীরক অশ্রুগলিত নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেবাকে অভিনন্দন করিয়া বলিল—তোমার এত গুণ সেবা, মা যদি কিছুদিন বেঁচে থেকে দেখে যেতেন।

সেবার চোখেও জল ঝরিতে লাগিল; সে বলিল—আমি মা পেয়েই মাকে হারালাম; আমি ভালো কোরে মার সেবা কর্‌বারও অবসর পেলাম না। আমি একদিনেই তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা জীবনে ত কখনো পাইনি, পরে পাব কি না জানি না।

হীরক মাকে অত্যন্ত বেশী ভালোবাসিত; সেবা সেই মার প্রশংসা এমন উচ্ছ্বসিত হইয়া করিল শুনিয়া হীরকের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হীরক আনন্দের আলোকে অশ্রুপূর্ণ চোখ উজ্জ্বল করিয়া সেবাকে বলিল—আমার ত সাধ্য নেই যে মার শ্রাদ্ধ করি; তুমিই আমাদের মার শ্রাদ্ধ করো—মা স্বর্গ থেকে দেখে সুখী হবেন।

হীরকের এই কথায় সেবাও খুসী হইয়া উঠিল; হীরক যে তাকে আত্মীয় মনে করিতেছে ইহা তার কাছে অপ্রত্যাশিত লাভ বলিয়া মনে হইল।

সুমতির শ্রাদ্ধ হীরকের সাম্‌নে বসিয়া সেবাই করিল। তারপর নিমন্ত্রিত গ্রামের লোকদের আহারের তদারক করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল, তখনো সেবার খাইবার অবসর হইল না। সকল ব্যস্ততার মধ্যে সেবা একএকবার ছুটিয়া আসিয়া হীরককে দেখিয়া যাইতেছিল; সে যেন কল্যাণী কর্ম্মকুশলতা, সমস্ত বাড়ী যেন তার অস্তিত্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কোথাও এতটুকু ফাঁক সে পড়িয়া থাকিতে দিতেছিল না।

হীরকের ম্যানেজার সেবার ব্যবস্থায় আনন্দিত হইয়া আনন্দ-বাবুকে বলিল—আমাদের বৌমা এক আশ্চর্য্য মেয়ে!

আনন্দ-বাবু সেবার প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—শিক্ষাতেই মানুষকে পটু করে; শিক্ষার সঙ্গে যদি প্রাণ থাকে তা হলে সোনায় সোহাগা হয়। সেবার সে দুটিই আছে।

সেবা রাত্রে হীরককে যখন খাওয়াইতে আসিল তখন হীরক তাকে জিজ্ঞাসা করিল—সমস্ত দিন ত চর্কীর মতন ঘুরছ দেখ্‌ছি, তুমি নিজে কিছু খেয়েছ?

সেবা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—খাব এখন, আগে সব লোকের খাওয়া হয়ে যাক।

হীরক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি এখনো কিছুই খাওনি? এত লোককে নিমন্ত্রণ কর্‌লে কে?

সেবা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আমি। মার শ্রাদ্ধে সমারোহ হবে না এ আমার ভালো লাগেনি। তিনি যে দেশের সকলের মা ছিলেন।

হীরক উত্তরোত্তর সেবার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যেন আকৃষ্ট হইতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—এখনো কি লোক খেতে বাকী আছে?

সেবা বলিল—হ্যাঁ, আর অল্পই বাকী আছে। নিমন্ত্রিতদের সব খাওয়ানো হয়ে গেছে; কেবল রবাহূত গরিব যারা অন্য গ্রাম থেকে এসেছে, তাদের খাওয়ালেই হয়।

হীরক বলিল—তা তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা ম্যানেজার-বাবুকে বলো কাউকে দিয়ে করাবেন; না হয় ওদের নগদ পয়সা দিয়ে বিদেয় কোরে দিতে বলো তুমি আর খেটো না উপোষ কোরে।

সেবা বলিল—আহা, ওরা গরিব। ওদেরকেই ত আমার বেশী কোরে দেখা উচিত—দুঃখ যে কি তা ত আমি জানি।

সেবার এই কথার পর হীরক আর তাকে নিষেধ করিতে পারিল না। সে বলিল—আচ্ছা, তবে আর দেরী কোরো না, তুমি যাও; ওদের খাইয়ে তুমি নিজে খেয়ে এসে আমায় খাইয়ে দিয়ো। তোমার খাওয়া না হলে আমি কিছুতেই খাব না।

সেবা হীরকের একগুঁয়ে জেদ চিনিয়া লইয়াছিল; সে হীরককে খাইবার অনুরোধ না করিয়া বলিল—কিন্তু আপনার খেতে রাত্তির হয়ে যাবে যে।

হীরক বলিল—তা হোক, তা না হলে ত তুমি তাড়াতাড়ি কর্‌বে না।

হীরকের এই মমতার পরিচয় সেবার মন স্পর্শ করিল; সেবা ঘর হইতে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আমি শিগ্‌গিরই আস্‌ছি।

সেবা কিন্তু কিছুতেই শীঘ্র ফিরিতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত লোককে খাওয়াইয়া, বাড়ীর চাকর দাসীদের খাইতে বসাইয়া সে যখন তাড়াতাড়ি একটু কিছু খাইয়া লইতে বসিল তখন বাজিল দশটা। সেবা তাড়াতাড়ি হাতের খাবার ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং হাতমুখ ধুইয়া

কাপড়েই হাত মুছিতে মুছিতে হীরকের ঘরে দৌড়িয়া আসিল। ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতেই সেবা ব্যস্ত স্বরে বলিল—বড় রাত হয়ে গেল।

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—তুমি খেয়েছ?

সেবা হীরকের আহারের আয়োজন করিতে করিতে বলিল—হাঁ এই খেয়েই আস্‌ছি।

হীরক সেবার যত্ন করিবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—আমাদের দুঃখ দেখে তুমি এসে কি দুঃখটাই ভোগ কর্‌ছ?

হীরকের কুণ্ঠা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সেবা বলিল—আমি ত ঠিক আপনাদের দুঃখ দেখে আসিনি; এখানে এলে ভালো বাগানের মধ্যে থাক্‌তে পাব আর অনেক ফুল পাব শুনে কেবল সেই আকর্ষণেই আমি এসেছিলাম। আমার জীবনের প্রধান বাসনা পূর্ণ হয়েছে এখানে এসে; সেই পরম আনন্দের বদলে আপনাকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা ত আমি কর্ত্তব্যবোধে কর্‌তে বাধ্য।

সেবার কথা শুনিয়া হীরক গম্ভীর হইয়া উঠিল। সেবা যে কেবল বাগান ও ফুলের লোভেই এখানে আসিয়াছে, তাকে সেবা কর্ত্তব্যবোধে বাধ্য হইয়া যত্ন করে, প্রাণের টানে নয়, ইহাতে হীরকের মন অভিমানে ভরিয়া উঠিল; অপরিচিত লোক যে মমতার আগ্রহ বোধ করিতে পারে না, ইহা ভুলিয়া হীরক ক্ষুণ্ণ হইল। হীরক বলিল—থাক্, আর আমি খাব না।

সেবা ব্যস্ত হইয়া বলিল—কিছুই যে খেলেন না? অসময় হওয়াতে খিদে পোড়ে গেছে। আর-একটু খান।

হীরক গম্ভীর হইয়া থাকিয়াই বলিল—আর খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।

সেবা তখন অগত্যা হীরককে খাওয়াইতে নিবৃত্ত হইল এবং তার মুখ ধুইয়া মুছিয়া দিল। সেবা হীরকের বিছানার পাশে চেয়ারে বসিয়া বলিল—আজকে কি পড়্‌ব?

হীরক বলিল—আজ আর কিছু পড়্‌তে হবে না; আমার ঘুম পেয়েছে।

সেবা বলিল—আচ্ছা, আপনি ঘুমুন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

হীরকের তখন সেবার উপর অভিমানে রসায় অভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তার কেবলি কান্না আসিতেছিল। সে সেবাকে শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য কষ্টে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল এবং একটু পরেই সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া সেবাকে জানাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে সে ঘুমাইয়াছে। সেবা হীরকের ছলনায় ভুলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, সমস্ত দিনের শ্রমশিথিল দেহ তখন বিশ্রামের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, ঘুমে তার দুচোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। সেবা ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে স্থির করিয়া জানিয়া লইয়াই হীরকের কান্না লক্‌গেট-খোলা-পাওয়া বন্যা-স্রোতের মতন তার দুই চোখের পাতা ঠেলিয়া তার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া গড়াইয়া পড়িল।

সেবা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল এবং বিছানায় গা মেলিতে না মেলিতে গাঢ় ঘুমে অচেতন হইয়া গেল।

লোকনাথ খাইয়া আসিয়া যখন হীরকের ঘরের দরজার কাছে বাহিরের দালানে নিজের বিছানা পাতিতেছিল, তখন হীরকের ব্যাকুল কান্নার শব্দ তারে কানে গেল। সে চকিত হইয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল; হাতের বিছানা হাতে ধরিয়াই, সে যেমন নুইয়া দাঁড়াইয়া বিছানা পাতিতেছিল তেমনি অবস্থাতেই নিশ্চল হইয়া গিয়া একবার কান পাতিয়া শুনিল; তারপর হাতের বিছানা ফেলিয়া দিয়া একবার উঁকি মারিয়া ঘরের মধ্যে দেখিল; তারপর আস্তে আস্তে গিয়া কামিনী-ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কামিনী, বৌমা কি ঘুমিয়েছেন?

কামিনী জাঁতিতে সুপারি কুচাইয়া পানে দিতে দিতে বলিল—বৌমা ত এই গিয়ে শুলেন, বোধ হয় এখনো ঘুমোননি। কেন?

লোকনাথ বলিল—খোকা-বাবু বড় কাঁদ্‌ছে। বৌমা কাছে গেলে শিগ্‌গির চুপ কর্‌ত।

কামিনী পানের খিলি করিয়া আল্‌গোছে টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল, এবং হাতের উল্টা পিঠ দিয়া খিলিটাকে মুখবিবরে ঠেলিয়া দিয়া ভরা মুখের ভারী স্বরে বলিল—আচ্ছা, আমি বৌমাকে বল্‌ছি।

কামিনী সেবার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বৌমা বড্ড ঘুমুচ্ছে; ডেকে সাড়া পেলাম না।

লোকনাথ মুখ বিষণ্ণ করিয়া নীরবে সেখান হইতে চলিয়া

গেল। হীরকের ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল হীরক তখনও কাঁদিতেছে। তখন লোকনাথ আবার কামিনীর কাছে ফিরিয়া আসিল। কামিনী তখন ভাঁড়ার-ঘর বন্ধ করিয়া সেবার ঘরে শুইতে যাইতেছিল। লোকনাথ বলিল—কামিনী, বৌমাকে জাগাও, খোকাবাবু এখনো কাঁদ্‌ছে।

কামিনী লোকনাথের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল লোকনাথের চোখে জল চকচক করিতেছে। কামিনী আর কিছু না বলিয়া সেবাকে জাগাইতে চলিয়া গেল।

যৌবন বয়সের ঘুম স্বভাবতই গাঢ়; তার উপর সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর অনেক রাত্রে শুইয়া সেবা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কামিনী অনেক ডাকা-ডাকি করিয়া সেবার পায়ে হাত দিয়া নাড়া দেওয়াতে সেবার ঘুম ভাঙিয়া গেল; সে নিদ্রাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কামিনী?

কামিনী বলিল—বুড়ো খান্‌সামা বল্‌তে এসেছে যে বাবু বড় কাঁদ্‌ছে।

সেবার মন প্রথমেই বলিয়া উঠিল—আঃ জ্বালালে। তারপর নিজের নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তির চেয়েও হীরকের অসহায় শোকার্ত্ত অবস্থার সহানুভূতি সেবার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল—লোকনাথ-দাদাকে বলোগে আমি যাচ্ছি।

সেবা তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া একটা জামা টানিয়া গায়ে দিতে দিতে হীরকের কাছে গেল। ঘরে পায়ের শব্দ শুনিয়া হীরক অশ্রুজলের ভিতর দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল সেবা হনহন করিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিতেছে। সেবার কাছে তার গোপন কান্না ধরা পড়িয়া যাওয়াতে লজ্জিত হইয়া হীরক চুপ করিল। হীরক মনে করিল সেবা হয়ত এখনি তাকে তার ছেলেমানুষীর জন্য তিরস্কার করিবে। কিন্তু সেবা একটিও অনুযোগের কথা না বলিয়া তোয়ালে তুলিয়া হীরকের চোখ মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। হীরক চুপ করিয়াছে দেখিয়া সেবা হীরকের পাশে বিছানায় বসিয়া কোমল স্বরে বলিল—ঘুম আস্‌ছে না? তা হলে আমি কিছু পড়ি, শুন্‌তে শুন্‌তে আপনার ঘুম আস্‌বে।

সেবার এই অসাময়িক প্রস্তাব হীরকের মোটেই মনঃপূত হইল না; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল বলিয়া প্রকাশ করিল না। সেবা হীরকের খাটের পাশের শেল্‌ফ্‌ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া একটি স্থান পড়িতে লাগিল—

"কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে, ভক্ত হবে,
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত?
আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি;
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ!
শূন্য পড়ে আছে দেহ, নাই কেহ নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ
সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধার,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ,—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে?"

সেবার মিষ্ট স্বরের উৎকৃষ্ট আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে হীরকের দৃষ্টি সন্তোষে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল; সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—সেবা, এমনি কবিতা আরো পড়ো, আরো পড়ো।

সেবা আবার পড়িতে লাগিল—

"হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর!
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদলদলে।"

সেবার পড়ায় বাধা দিয়া হীরক বলিয়া উঠিল—সেবা, তুমি গান গাইতে পারো?

সেবা এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের সঙ্কোচের লজ্জা দমন করিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল—পারি।

হীরক বলিল—তবে তুমি গান গাও, আমি শুনি,—খুব দুঃখের গান, খুব শোকের গান, যা জানো গাও তুমি।

সেবা উঠিয়া গিয়া হারমোনিয়মের সাম্‌নে বসিয়া মিষ্ট সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল—

"সকলি ফুরাল স্বপন-প্রায়
কোথা সে লুকাল কোথা সে হায়!
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান, পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
ও সব হেরি শূন্যময়, কোথা সে হায়!"

[redacted]র কণ্ঠস্বর যেন মর্ত্ত্যমানুষের নয়, যেন অশরীরী দিব্য সঙ্গীত লোকলোকান্তর হইতে ভাসিয়া বহিয়া আসিতেছে। হীরক বিস্ময়ে প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া নীরবে শুনিতে লাগিল; সেবা গানের পর গান গাহিয়া চলিতে লাগিল। এই মিষ্ট মধুর সুরের সঙ্গীতে যে মাদকতা ছিল তাতে অভিভূত আচ্ছন্ন হইয়া হীরক কখন যে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সেবা টের পায় নাই। অনেকক্ষণ গান করিয়া ক্লান্ত অবসন্ন সেবা যখন একবার দম লইবার জন্য থামিয়া হীরকের দিকে দেখিল তখন সেবার সন্দেহ হইল হীরক বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে আস্তে সন্তর্পণে টুল হইতে উঠিয়া আসিয়া হীরকের বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিল হীরক বাস্তবিকই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হীরকের ঘুম একটু পাকিয়া গাঢ় হইলে যাইবে স্থির করিয়া হীরকের বিছানার এক পাশে বসিয়া সেবা হীরকের মাথায় লঘু স্পর্শে আঙুল বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু ক্লান্তিতে অবসন্ন সেবা একটু পরেই ঘুমে ঢুলিতে লাগিল, তারও চেতনা আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এক সময় হঠাৎ বহু পক্ষীর কাকলিঝঙ্কারে চমৎকৃত হইয়া সেবার ঘুম যখন ভাঙিয়া গেল তখন সে তাড়াতাড়ি চোখ চাহিয়া দেখিল—ঘরের মধ্যে উষার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, হীরক জাগিয়া তার দিকে তাকাইয়া আছে, এবং সে কখন্ হীরকেরই পাশে হীরকের বিছানায় ঘুমের ঘোরে শুইয়া পড়িয়াছিল, এখনও সে হীরকের পাশেই শুইয়া আছে। সেবা লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া হীরকের খাট হইতে নামিয়া পড়িল। হীরকের দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটিয়া আছে দেখিয়া সেবা আরো সঙ্কুচিত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কোনো কথাই সে বলিতে পারিল না, হীরকও কথা বলিয়া তার সঙ্কোচ ও লজ্জা লঘু করিয়া দিল না। সেবা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল দরজার কাছে লোকনাথ আনন্দিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সেবা তাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, লোকনাথ প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা, খোকা-বাবুর ঘুম ভেঙেছে?

সেবা অকস্মাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; সে মুখ না ফিরাইয়াই চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—হ্যাঁ।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিবার কিছু নাই

(একটি ইংরেজি কবিতা অবলম্বনে)

হাজারে হাজারে মরিছে মানুষ,
নিয়ত দেখিতে পাই,
কত, অন্নের তরে কাঁদে কচি ছেলে;
করিবার কিছু নাই!
কাঁদে বিধবারা ফিরিবে না যারা
তাহাদের পথ চাই',
মরি, বুকে নিয়ে অপোগণ্ড অনাথ;
করিবার কিছু নাই!
যুদ্ধের নামে ক্ষিপ্তের মতো
ভাইকে মারিছে ভাই,
হায়, শেল দিয়ে কত মায়ের হিয়ায়;
করিবার কিছু নাই!
শুষ্ক রসনা রোগের দহনে,
রোগী করে আইঢাই,
তার জলটুকু মুখে দিতে নাই কেহ;
করিবার কিছু নাই!
দেবতার দান প্রাণের আরাম
প্রণয়ে ডালিয়া ছাই,
পাপ- পণ নিয়ে চলে মানুষ বিক্রি;
করিবার কিছু নাই!
সোহাগের ধনে লোহার ডাণ্ডশ্
মেরে ব'সে থামকাই
ট'লে মাতাল চলেছে হত্যার পথে;
করিবার কিছু নাই!
মেকী মহাজন ধনী হ'ল, জেলে
লাল বাতি একজাই,
ভুয়ো শেয়ার কিনিয়া গরীবেরা মরে;
করিবার কিছু নাই!
নাস্তিকতায় ছেয়ে যায় ধরা
না হেরে' শরণ-ঠাঁই,
হায়, হায়রে সে আঁধার-ঘেরা চারিধার;
করিবার কিছু নাই!

করিবার নাই ? সত্য কি মোরা
এত দুর্ব্বল ভাই ?
কারো স্নেহভরে হাত চাপিয়া ধরিতে
মূলে আকুলতা নাই ?
অভাব, অশ্রু, অজ্ঞতা আর
অন্ধতা দুনিয়ায়
চির- হাহাকার-রবে ডাকিছে যে, হায়,
এতটুকু নাই সাড় ?
করিবার নাই ? মিছে কথা ভাই,
ও কথা মানে না মন,
দেখে সর্ব্বনাশের পাশ যে কাটায়
সেইজন অভাজন।
'করিবার নাই'—বলিতে সাহস
হবে বিধাতার পায় ?
মোর করিবার কিছু ছিল না, ঠাকুর,
সুবিপুল দুনিয়ায় ? !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেশের কথা

মাঝে আমরা শুনিলাম দেশের অন্নবস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য সরকার এক সমিতি গঠন করিয়াছেন ও শীঘ্রই তার অধিবেশন হইবে,—

কিন্তু এসত্ত্বেও কমিটি কি কি কারণ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন ও উহার নিবারণের নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা কমিটি অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। এদিকে অভাবের তাড়নায় স্থানে স্থানে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দেশের অবস্থা ক্রমশঃই যেরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে আর কালবিলম্ব সহে না। তাই অন্যান্য কমিশন বা কমিটির ন্যায় দীর্ঘসূত্রতা এ ক্ষেত্রে শোভা পাইবে না। যত শীঘ্র হয় এ সম্বন্ধে একটা প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

অন্নকষ্টের সংবাদ চারিদিক হইতেই আসিতেছে—

গত ৫ই আগষ্টের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশ হাওড়া জেলার মাতবী শাকতাইলের অংর দলুই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যাদ্বারা সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ করিয়াছে। যাহাতে অধর দলুইয়ের বিধবা পত্নী যাবজ্জীবন মাসিক ৬৲ টাকা হারে পাইতে পারে হাওড়ার সব্জজ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সোনার বাঙ্গালার এই ত দশা।—যশোহর।

অন্নকষ্টের পরিণাম—অমৃতবাজার পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা পত্রে প্রকাশ বিক্রমপুরের অন্তর্গত অপরকাটির গ্রামে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক না খাইতে পাইয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় প্রতিবারে এইসব অভাবের কথা লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়। দেশের অবস্থা কি ভীষণ দেখুন—

১৯১৮ অব্দে অনাহারে মৃত্যু।—এসিয়ান রিভিউ পত্রে প্রচারিত হয় যে ১৯১৮ অব্দে ৩ কোটি ২০ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে অনাহারে মরে। এই অসম্ভব কথার প্রতিবাদ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ কথার প্রমাণ কি? ডাইরেক্টর অব্ ইনফর্ম্মেশন জানাইয়াছেন যে ১৯১৮ অব্দে সমগ্র ভারতে একজনও অনাহারে মরে নাই। অবশ্য অনাহারে মরিয়াছে বলিয়া সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট (প্রশংসাপত্র?) ব্যতীত অনাহারে মরা সাব্যস্ত হয় না। তবে যদি কোন বৎসরে বিশেষ ভাবে শস্যহানি হয় এবং সেই বৎসর যদি মোট মৃত্যুসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা হইলে "স্বল্পাহার বা অনাহার প্রসূত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি" বলিয়া একটা অনুমান করা হয়ত খুবই অসঙ্গত হয় না। ১৯১৮ অব্দে ভারতের নানাস্থানে শস্যোৎপত্তি কম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর হারও গড় খানা প্রত্যেক সহস্রে ৩২ দাঁড়াইয়াছিল।—অর্থে মৃত্যু হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯১০ অব্দে মৃত্যুসংখ্যা হয় ৮৫ লক্ষ। ১৯১৮ অব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপের কথা সকলেরই মনে আছে।—এডুকেশন গেজেট।

না খাইতে পাইয়া ও তজ্জনিত ব্যাধিপীড়িত হইয়া মৃত-ভাগ্য দেশের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে এমন কোন জেলা নাই যেখানে অভাবের আর্ত্তনাদ নাই। লোকে খাইতে পায় না, পরিবার কাপড় জোগাড় করিতে পারে না। এমন দুঃখের দিনে বাংলা দেশের কোথাও নূতন ট্যাক্স আদায়ের জুলুম সম্পূর্ণরূপে গর্হিত ও অন্যায়।

টেক্স বৃদ্ধি।—বর্ত্তমান পূর্ত্তস্থলী অঞ্চলে রাস্তাঘাট সংস্কার ও ম্যালেরিয়া নিবারণ জন্য চৌকীদারী ট্যাক্স এক টাকার স্থলে তিন টাকা ধার্য্য হইবে বলিয়া গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে ট্যাক্স আছে তাহা আদায় দেওয়াই ত অনেক প্রজার পক্ষে কষ্টকর। অতিরিক্ত ট্যাক্স দিবে কোথা হইতে?—বীরভূমবাসী।

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া অভাবের বিস্তৃত রাজ্য। প্রত্যেক প্রদেশে অল্পবেতনভোগী লোকদের কষ্টের সীমা নাই, তাই আজ আমাদের সম্মুখে ধর্ম্মঘটের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস।—

ধর্ম্মঘট।—গত পূর্ব্ব শনিবার কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট রেলের ৫০।৬০ জন ফায়ারম্যান ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া এক আবেদন করিয়া কোনরূপ উত্তর না পাওয়ায় উহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। পোর্টট্রাষ্ট রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ধর্ম্মঘটকারীদের দুই টাকা হারে ও প্রতি

[redacted] একটাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এবং অন্যান্য নানারূপ সুবিধা বিধান করিয়া দিবারও ভরসা দেওয়ায় ধর্ম্মঘটকারীরা পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

মান্দ্রাজ সরকারী ছাপাখানার প্রায় পাঁচ শত কম্পজিটর ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। মান্দ্রাজ ইউনিভারসিটির কতকগুলি কাজ এই পি সি কে প্রেসে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐ প্রেসের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বেই ধর্ম্মঘট করায় সেই কাজগুলি সরকারী ছাপাখানায় আনা হয়। সরকারী প্রেসের লোকেরা কাজ করিতে অস্বীকৃত হয় এবং ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয়। কর্ত্তৃপক্ষের কথায় ধর্ম্মঘটকারীরা কাজে লাগে নাই। প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ধর্ম্মঘটকারীদের ২৫ জন নেতাকে বরখাস্ত করিয়াছেন।

আসাম ডিব্রুগড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ডিব্রুগড় সদিয়া রেলওয়ের লোকো বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আসাম বেঙ্গল রেলযোগে কোনরূপে ডাক আসিতেছে না।

কয়েক দিন গত হইল বোম্বাইয়ের টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া প্রেসের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

কয়েক দিন গত হইল দিল্লীর সরকারী ছাপাখানার প্রায় তিন শত পীস্ কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। পীস্ কর্ম্মচারীরা স্থায়ী কর্ম্মচারীদের মত বেতন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সুবিধার দাবী করিতেছে।

কলিকাতা সরকারী ছাপাখানার বহু কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। গত পূর্ব্ব বুধবারে কলিকাতা গেজেট একবারেই প্রকাশিত হয় নাই।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে প্রেসের দুইশত কম্পোজিটার ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। বেতন বৃদ্ধির দাবীই এই ধর্ম্মঘটের কারণ।

—এডুকেশন-গেজেট।

ভারতবর্ষের "ভার" যাঁরা লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁরা আমাদের দেশজাত অন্ন আমাদের ঘরের সকল লোকে খাইতে পাইল কি না না দেখিয়া তাহা বিদেশে পাঠাইবার হুকুম দেন কোন্ হিসাবে? তাঁদের ঔদাসীন্য বা স্বার্থপরতা যে আমাদের পক্ষে মারাত্মক!—

চাউল রপ্তানী—গত অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা কিছু কম চাউল জন্মায় নাই। কিন্তু সরকার বাহাদুর ঐ সময় চাউল বিদেশে রপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়ায় এ বৎসর ৮৲৯ টাকার নীচে দর আর নামে নাই। তাহার উপর বড় বড় সাহেব সওদাগরদিগের সুবিধার জন্য গত ৩।৪ঠা জুন গামবাতা নামে একখানি জাহাজে চাউল রপ্তানী করিবার আদেশ দেন। সেই একখানি জাহাজেই পাঁচ ছয় হাজার টন চাউল বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। সাধারণে জানে চাউল বিদেশে যাইতেছে না। এই চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়ায় সরকার বাহাদুরের প্রভূত লাভ হইয়াছে। এই চাউলের উপর বেশী ট্যাক্স আদায় করিয়াছেন।

আবার শোনা যায়, এই মাসে কেবল মাত্র শা ওয়ালেস কোম্পানীকে পাঁচ ছয় শত টন চাউল রপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও অনেক বড় কোম্পানী আছে; আর কাহাকেও না দিয়া কেবল মাত্র শা ওয়ালেস কোম্পানীকে রপ্তানী করিতে দিবার অর্থ কি বোঝা যায় না। এমন যদি কথা হয় যে তাহারা যাহা প্রথমে পাঠাইতে চাহিয়াছিল তাহা সব পাঠান হয় নাই তাহা হইলে যতটুকু বাকী ছিল ততটুকুই পাঠাইতে দিতে পারেন, তাহার বেশী দেওয়া উচিত নয়। ওল্ড হার্ড টেবিল চাউল পাঠানোর কথা, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি দেখিয়াছেন যে সেগুলি সব গতবারের ওল্ড হার্ড টেবিল চাউল? জুলাই মাস হইলেই নূতন চাউলকে ওল্ড হার্ড বলে, এ চাউল গত বৎসরের ওল্ড হার্ড হওয়া প্রয়োজন। সাধারণে এখনও জানেন, বাঙ্গালা দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হয় না। কিন্তু মগরা-হাট হইতে এখনও চাউল রপ্তানী হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্য কি এতৎসম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়া গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব অবগত হইবেন?—সঞ্জীবনী।

চাউল রপ্তানী।—গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিলাতে ১৩,৭২,০০০ মণ এবং তাহার পরে ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে ৮১৫,০০০ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এসিয়া এবং আফ্রিকার নানাস্থানেও ভারত হইতে বহুল পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে।—এডুকেশন-গেজেট।

চাউলের ব্যবসায়ে জাপানী—জাপানীরা বর্ম্মার চাউলের ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে বলিয়া কয়েকমাস ধরিয়া গুজব রটিয়াছিল। এখন দেখিতেছি সত্য-সত্যই জাপানীরা বর্ম্মা চাউলের ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ তাহারা জোসেফ হীপ এণ্ড সন্স কোম্পানীর চাউলের কল খরিদ করিয়াছে, তৎসঙ্গে কিছু জমিও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতে যেরূপ ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বর্ম্মা চাউলের ব্যবসা বিদেশীর হস্তগত হওয়া ভারতবাসীর বিশেষ আশঙ্কার কথা। চাউলের দর অদূর ভবিষ্যতে সুবিধা হইবার কোনই লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। বিদেশী কোম্পানী কখনই ভারতবাসীর দুঃখ কষ্ট দেখিয়া চাউলের দর কমাইবে না, অপিচ তাহারা চীন, জাপান, প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট চাউল সরবরাহ করিতে থাকিবে। ঐ-সমস্ত প্রদেশে চাউলের মূল্য স্বভাবতঃই ভারতের মূল্যের অপেক্ষা অনেক অধিক।—আনন্দলহরী।

অন্ন নাই, অন্ন কই—বলিয়া অনবরত লোককে জানাইয়াই বা আমাদের বিশেষ লাভ কি? কেবল চাউলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। চাউলের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কোন্ সস্তা শস্য উৎপন্ন করা যায় কি না তাহা আমাদিগকে এখন বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে।—

শোগাম খাদ্য।—চাউল ভারতের প্রধান খাদ্য, কিন্তু চাউলের যেরূপ দর হইয়াছে তাহাতে দরিদ্রগণ উহা ক্রয় করিতে পারিতেছে না। জীবন ধারণ করা তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। সম্প্রতি সিংহলে "শোগাম" নামক একপ্রকার শস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাকার কুলী মজুরগণ এবং দরিদ্রগণ চাউলের পরিবর্ত্তে শোগাম খাইয়া থাকে। উহা শুষ্ক স্থানে অধিক পরিমাণে জন্মে। সুতরাং উহা আমাদের দেশের পাহাড় অঞ্চলের শুষ্ক স্থানে জন্মে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।—প্রতিকার।

অভাবের মধ্যে এইটুকু একটু সুসংবাদ :—

পিয়নদিগের বেতন বৃদ্ধি।—ডাক পিয়ন ও ডাকবিভাগের স্বল্প-বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব আলোচনার্থ যে কমিটি বসিয়াছিল তাহার রিপোর্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট কমিটির অধিকাংশ মন্তব্য অনুমোদন করিয়াছেন।

১৯১৯ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে পিয়নগণ বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইবে। কেরাণীগণের বেতনও বর্দ্ধিত হইবে। ডাকবিভাগের কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি হইলে, উক্ত বিভাগে বার্ষিক এককোটী টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।—এডুকেশন-গেজেট।

কিন্তু ইহাতে আর দেশব্যাপী অভাবের কি প্রতীকার হইবে? অন্নাভাবের সঙ্গে বন্যার প্রকোপ। দেশ জর্জ্জরিত।—

প্রবল বন্যার প্রভাবে তমলুকের প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রশস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়াছে; ফলে, ১০৫ খানি গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে এবং ৩৫ বর্গ মাইল স্থানের ধান্যক্ষেত্র ভাসিয়া গিয়াছে। সাত হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হওয়াতে ৩৫ হাজার লোক গৃহবাস্তুহীন হইয়াছে। বাঙ্গালার পোড়া অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে কে বলিবে?

—ঢাকাপ্রকাশ।

উড়িষ্যায় ভীষণ জলপ্লাবন।—কটকের সংবাদে প্রকাশ—জমসেদপুর, খোরকাই এবং সুবর্ণরেখা নদীর জল ফুলিয়া উঠিয়া যুগসালাইজি, টাউন রাণীকুবার এবং খুস্তানদীর কুলিবস্তিগুলি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক পল্লীগ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে, এবং বন্যা সাকৃচির রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। খোরকাই নদীতে চারিটি শবদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

জয়পুর মহকুমার প্রায় সকল নদীর জলই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এবং জল ক্রমেই বাড়িতেছে। বৈতরণী নদীর দক্ষিণদিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অন্য সকল বাঁধও ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।

বালেশ্বর জিলায় সুবর্ণরেখা নদীতেও বান ডাকিয়াছিল; কিন্তু তিন দিন পরে জল অনেক কমিয়া যায়। গতপূর্ব্ব বুধবার রাত্রে পুনর্ব্বার বান ডাকিবার ফলে জেলাসোর, বার্ত্তা, নপা বালিলাল এবং ভেগারী থানার এলাকাধীন অনেকগুলি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্ এখনও জলের নীচে। নেপোর নিকটবর্ত্তী সেতুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু পারবুদি ছাড়া আর কোন বাঁধ ভঙ্গে নাই। সমস্ত ফসলই নষ্ট হইয়াছে। ধান ক্ষেতের উপর বুকজল দাঁড়াইয়াছে, কাজেই ধানগাছগুলি সব জলের নীচে পড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পড়িয়াছে। জলমগ্ন স্থানসমূহে চাউলের দর টাকায় সাড়ে তিন সের মাত্র।—ঢাকাপ্রকাশ।

ইহার উপর রোগের প্রভাবে দেশ দিন দিন জনহীন হইতেছে।—

দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে ভারতবাসীর মৃত্যু।—পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ সোয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে কত ভারতবাসীর মৃত্যু হইয়াছে? ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত হিসাব দাখিল করিয়াছেন—

ওলাউঠায়	৫,৬০,৮০২
বসন্তে	৯৩,০৭৬
প্লেগে	১,১১৩৪,৪৪১
জ্বরে	৪৪০,৭৫২
আমাশয় ও উদরাময়ে	২,৭৬,৬৪৮

জাপানের রাজধানী টোকিয়ো হইতে "এসিয়ন রিভিউ" নামক একখানি কাগজ বাহির হয়। উহাতে নিম্নরূপ টিপ্পনী বাহির হইয়াছে—"দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কোনও বিবরণ দেওয়া হয় নাই কেন? যাঁহারা ভারতবর্ষের সংবাদ রাখিতে চান, তাঁহারা সকলেই এই প্রশ্ন করিতেছেন।"

জাপানী সহযোগীর এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, দুর্ভিক্ষের জন্য মৃত্যু প্রকাশ করিলে গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হন, এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিম্ন কর্ম্মচারীরা যতদূর সম্ভব উহা গোপন করেন, এবং অনাহারের জন্য রোগ হইয়া মৃত্যু হইলে সেই রোগকেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া ঘোষণা করেন।—সময়।

শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র।—সমগ্র ভারতে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করিয়া শিশু মায়ের কোল শূন্য করিয়া মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হয়। ১৯১৭ সালে সমগ্র ভারতে ১৯২৯৯১ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কি ভয়াবহ দৃশ্য! শিশু মৃত্যুর প্রতিকার না করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়।—সম্মিলনী।

রোগের প্রতীকার করিতে আমরাও বিমুখ এবং উদাসীন। উপরে শিশুমৃত্যুর যে ভীষণ চিত্র দেখিলাম তার জন্য অভাব কতকটা দায়ী এবং আমাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিশেষভাবে দায়ী। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে অন্ধকারময়, বাতাসহীন, স্যাঁতসেঁতে ঘরে আঁতুড় করা, আর আঁতুড়কে অপবিত্র বলিয়া সাধ্যমত দূরে রাখা—ইহাই ত শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। অন্যান্য রোগেরও প্রতীকারে আমরা যত্নবান নই, হাহাকার করিতে আমরা খুব দক্ষ। প্রতীকারের জন্য যাঁরা যা বলেন আমাদের শোনা উচিত এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দূর করিবার জন্য সবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক।—বঙ্গের সেনেটারী কমিশনর ডাক্তার সি, এ, বেণ্টলি সাহেব জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির চেয়ারম্যানদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে কারবলিক এসিড ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের উত্তম প্রতিষেধক। আমেরিকার মাইনস্ বোর্ড অব হেল্‌থের চিফ সেনেটারী অফিসার হিসাব দিয়াছেন যে ঐ দেশের খনির ৮৬৮ জন লোকে এই তৈল রীতিমত ব্যবহার করিয়াছিল। ফলে ইহাদের ভিতর ১৯ জন মাত্র এই রোগে আক্রান্ত হইয়া হয় ১২২ জন লোক এই তৈল ব্যবহার করিতে অসম্মত হইয়াছিল, ইহাদের ভিতর দেড় শত লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহাদের কথা নিশ্চিতই উড়াইয়া দিবার নহে, প্রয়োজন-স্থলে সকলেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।—বঙ্গবাসী।

বাগেরহাট হাই স্কুলে এণ্টি ম্যালেরিয়াল লিগ নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ছাত্রগণের মধ্য হইতে যাহাতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।—সাধারণ।

তারপর বাজারের ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈলে যে-সব নানা রকম ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে সে-সবের সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন ও প্রতিরোধী হইতে হইবে।

সরিষার তৈলে বিষাক্ত ভেজাল।—কলিকাতা কর্পোরেশন সকলকে সতর্ক হইবার জন্য জানাইতেছেন যে,—কলিকাতার বাজারে যে সরিষার পাকড়ার তৈল মিশ্রিত সরিষার তৈল বিক্রয় হইতেছে। পাকড়ার তৈলে প্রুসিক এসিড নামক এক প্রকার ঘোর অনিষ্টকর বিষাক্ত পদার্থ আছে। উহা ভক্ষণে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঐ তৈল অতি অল্প মাত্রায় মিশ্রিত থাকিলেও উহা মানুষের খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

...রণ যেন বিশেষ সতর্কতার সহিত তৈল ক্রয় করেন। কলিকাতা হগ সাহেবের বাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল পাওয়া যায়।" কিন্তু এই সঙ্গে আমর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, যে ভেজালের উপদ্রবে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া লোকের স্বাস্থ্য ও জীবন দিনে দিনে ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে, সেই ভেজাল নিবারণের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করার আবশ্যকতা গবর্ণমেণ্ট কি কোন কালেও উপলব্ধি করিবেন না? কেবল শাসন সংস্কার আইন এবং ভারত-রক্ষা আইন প্রণয়ন করিলেই কি গবর্ণমেণ্টের সব কর্ত্তব্য শেষ হইবে?—মোসলেম-হিতৈষী।

দেশের কথা মানে এইসব কষ্টের কথা। ইহার লাঘব করিবার জন্য দেশের অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আজ যত্নবান।—

বন্যাপীড়িত তমলুকবাসিগণের সাহায্যার্থ রায় শেঠ সুখলাল কর্ণানী বাহাদুর একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—রায়ত।

দান।—উড়িষ্যার বন্যা-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ দ্বারবঙ্গের মহারাজ নিহার উড়িষ্যার ছোট লাটের হস্তে দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।—বীরভূমবার্ত্তা।

সাহায্য দান।—বরিশাল জেলার অন্নকষ্টপ্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্যার্থ স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অর্থ দান করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। নোয়াখালীর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড তথায় অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের এবিষয় প্রণিধান করা একান্তই উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।—কাশীপুর-নিবাসী।

সদনুষ্ঠান।—কলিকাতার বাবু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার, বাবু তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র বিপন্ন তমলুকবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা হইতে ২ গাঁইট মিলের কাপড় ও নগদ এক হাজার টাকা লইয়া তমলুক যাত্রা করিয়াছিলেন।—বীরভূমবাসী।

আমাদের বালক ছাত্রদিগকে যে এইসব অভাব বিচলিত করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়।—

ছাত্রগণের সদনুষ্ঠান।—রাণী ভবানী স্কুল সংশ্লিষ্ট দরিদ্র-ভাণ্ডার মেদিনীপুরের প্লাবন-পীড়িতগণের সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে ৫০৲ টাকা ও মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

প্লাবনে চাঁদা।—চন্দ্রহার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মেদিনীপুর প্লাবন-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা চাঁদা তুলিয়া তথাকার রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটরী সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন।—বরিশালহিতৈষী।

অভাব মোচনের জন্য যাঁরা অনুষ্ঠান প্রভৃতির উদ্যোক্তা তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র—

দরিদ্র ভাণ্ডার।—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, বহরমপুরের সদর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আব্দুল আজি একটি দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাণ্ডারের আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও অনেক গরীবদুঃখী এখানে সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছে। এই মহৎ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আমরা মৌলবী সাহেবকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।—প্রতিকার।

নড়াইল দরিদ্র-ভাণ্ডার ও সেবা-সমিতি নামে আজ ২ বৎসর হইল নড়াইলের কুড়িগ্রামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সমিতির সভ্যগণ স্থানীয় রাস্তাঘাট ও পুল স্বহস্তে নির্ম্মাণ এবং ব্যক্তি-বিশেষের বাড়ীর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার সমস্তই দরিদ্রনারায়ণগণের সেবায় ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেক দুরারোগ্য রোগী ইহাঁদের সেবায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে এবং করিতেছে, অনেক দুঃস্থ পরিবার ইহাঁদের সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। আমরা এই সমিতির সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।—যশোহর।

কিন্তু সাহায্য করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া সাময়িক অভাব দূর করা যাইতে পারে। দেশের লোকে যাতে প্রতিকূল অবস্থা দলিয়া আত্মপোষী হইতে পার তার উপায় চাই। তার উপায় শিক্ষা। সেইজন্য শিক্ষার জন্য যে উন্নতির ও দানের সংবাদ আমরা পাই তাহাই সবচেয়ে বড় সংবাদ এবং তাহাই স্থায়ী প্রতিকার।—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয় উচ্চবিজ্ঞান এবং কৃষিশিক্ষার উন্নতির জন্য রাজসাহী কলেজে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার দ্বারা রাজসাহী কলেজে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি-বিভাগে উপাধি প্রদানের বন্দোবস্ত করিবেন তখন রাজসাহী কলেজে কৃষি শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এবং উক্ত টাকার দ্বারা প্রতিবৎসর রাজসাহী কলেজ হইতে উত্তীর্ণ একজন বি-এসসি উপাধিধারী যুবককে তিন বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫ টাকা বৃত্তি দিয়া কোন এক কৃষি কলেজে পাঠান হইবে। রাজকুমারের এ বদান্যতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।"

—যশোহর।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দান—বোম্বাই নগরের ধনীগণ সম্প্রতি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ লক্ষের বেশী টাকা দান করিয়াছেন। বোম্বাই নগরের ধনীগণ চিরদিন সৎকার্য্যে যথেষ্ট দান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশেও কাশিমবাজারের স্যার মহারাজা বাহাদুর, লালগোলার রাজা বাহাদুর, সার তারকনাথ পালিত, ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির দান বাঙ্গালা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। সম্প্রতি বিহারের দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজার দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মহাত্মাগণ দেশের যাহা করিতেছেন অন্যান্য ধনীগণের তাহা অনুকরণীয়। কিন্তু তাহা কয়জন ধনী করিয়া থাকেন?

—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, যে স্বনাম-ধন্য পুরুষ জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় ফণ্ডে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন সেই গৌরীপুরের জমিদার মাননীয় শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে" ৪০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। যদি ব্রজেন বাবুর মত দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ দরিদ্র ভাইদের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন তাহা হইলে দেশের অবস্থা যে অনেকটা পরিবর্ত্তন হয় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

—যশোহর।

সার রাসবিহারীর দান।—সার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা ইউনিভারসিটির সাহায্যকল্পে পুনরায় আর এক কিস্তি দান করিয়াছেন। দানের পরিমাণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ঐ টাকা বিবিধ ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। সার প্রফুল্লচন্দ্রকে

৫ মাসের জন্য ব্যবহারিক শিল্প বিষয়ে বিলাতে কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া তদ্বিষয়ে চর্চ্চা করিবার জন্য ঐ অর্থব্যয়ে বিলাত পাঠান হইতেছে। সার রাসবিহারীর মত দানবীর বঙ্গদেশে বিরল।

—সারথি।

পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইতে যাইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ।—যশোহর।

দান।—কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ে বাবু বালকিষন দাস চাম্পা পাল দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—এডুকেশন-গেজেট।

কলিকাতা আহিরীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল মিত্র মহাশয় ২২২ নং লোয়ার সারকুলার রোডে অবস্থিত কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে ৩৷৷০ টাকা হারের ৫০০৲ শত টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। উহার সুদ হইতে শিল্পকার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর ছাত্রদিগকে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদি পারিতোষিক দেওয়া হইবে। এ কে, সাহা, প্রধান শিক্ষক, কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়। সৎকার্য্যে দান।—ময়মনসিংহের স্বনামখ্যাত উকীল বাবু অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় তথায় একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এককালীন ৫০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শুনা যায় প্রয়োজন হইলে তিনি লক্ষ টাকা দিতেও প্রস্তুত আছেন। দাতার কল্যাণ হউক।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

এক লক্ষ টাকা দান।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সেরপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় সেরপুর অঞ্চলের উপকারার্থ একলক্ষ টাকা দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। উমেশ-বাবু নিজে সহজভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন সাধারণের উপকারার্থে তিনি উহা দান করিতে প্রস্তুত আছেন ইহা তাঁহার মহৎ ও উদার হৃদয়ের পরিচায়ক। আমরা আশা করি, উমেশ বাবুর এই রাজোচিত অর্থানুকূল্য দ্বারা সেরপুর-বাসীর কোনও বড় অভাব দূর হইবে।—বঙ্গরত্ন।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর নিয়মের সংবাদ আছে। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় ইহা গ্রহণ করিবেন কি?

সম্প্রতি কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এক নিয়ম করিয়াছেন যে অতঃপর কোন ছাত্র যে যে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইবে তাহার পরবর্ত্তী বৎসর তাহাকে শুধু উক্ত বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হইবে, তবে তাহাকে শতকরা ৪০ নম্বর রাখিতে হইবে। এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ম চলিতে পারে না কি?—যশোহর।

আমাদের এখন চাই কার্য্যকরী শিক্ষা। ভাবপ্রবণতার দিন গিয়াছে। যে শিক্ষা বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিবে তাহাই এখন শিক্ষা। কৃষি, বয়ন, শিল্প—এই-সব বিষয়ে এখন বিশেষ মনোযোগের দরকার।—

শিল্প ও বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা:—প্রায় ৬ মাস যাবত "স্থল ইণ্ডষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থল গ্রামে স্থাপিত হইয়া উদ্দেশ্যরূপে পরি-চালিত হইতেছে। পল্লীতে শিল্প ও ব্যবসার উন্নতি করা এই ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সম্প্রতি পাবনা জেলা বোর্ডের স্থানীয় সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেশচন্দ্র পাবড়াশী মহাশয়ের যত্নে এখানে একটি অবৈতনিক বয়নবিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। দুইজন সুদক্ষ শিক্ষক [illegible] শিক্ষা দিতেছেন।—সুরাজ, পাবনা।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা।—চট্টগ্রাম জেলার দুর্গা পুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে একটি কৃষি শ্রেণী খোলা হইয়াছে, ইহাতে উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন, কৃষি-বিজ্ঞান, রেশম-কীট পালন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। স্কুল-সংশ্লিষ্ট যত্র সময়ে উদ্ভিদ ও রসায়ণ শাস্ত্র পড়াইবার জন্য যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যোগ্যতাশালী সুশিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী কৃষি-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা বিধান করিয়া অতি সুকার্য্য করা হইয়াছে। বহুব্যয়সাধ্য, পরিণামে নৈরাশ্য-উৎপাদক সাধারণ শিক্ষা দ্বারা আজকাল কেবল দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হইতেছে; সাধারণ শিক্ষার সহিত অর্থোপার্জ্জন যাহাতে হয় এরূপ শিক্ষার সংযোগ এখন অতি আবশ্যক হইয়াছে।—সম্মিলনী।

এই-সব অনুষ্ঠান প্রকৃত শিক্ষার পথ:—

শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতি।—কলিকাতা শিল্প বিজ্ঞান সমিতি এ বৎসর ৫০জন ছাত্র শিল্প শিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইবে।

—সারথি।

যারা অশিক্ষিত তাদের কথা ছাড়িয়া দি, যাঁরা শিক্ষিত তাঁরাও বোঝেন না, যে, আমাদের মেয়েদের শিক্ষিত করার প্রয়োজন। মেয়েরা অজ্ঞ অশিক্ষিত থাকিলে—দেশের উন্নতির কথা ছাড়িয়া দি—নিজেদের গৃহের যে কত অবনতি ঘটে তাহা বুঝানোও দুর্ভাগ্যের কথা। স্ত্রী-শিক্ষায় সবচেয়ে পিছাইয়া আছে বাংলা দেশ। সেইজন্য ক্রমে ক্রমে বাংলা দেশ সব কাজেই অন্যান্য প্রদেশের পিছনে পড়িতেছে। আমাদের ছেলেদের শিক্ষার যেমন দরকার, মেয়েদেরও তেমনি দরকার। অন্য সব প্রদেশের স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আয়োজন ও অনুষ্ঠানের সংবাদ আমাদিগকে স্ত্রী-শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুক।—

বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রীনিবাস—শেঠ মুসরাজ খাটাউ, শেঠ ত্রিকমল দাস এবং তুলসী দাস গোবর্দ্ধন দাস খাটাউ বনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি ছাত্রীনিবাস বা বালিকা-হোষ্টেল নির্ম্মাণের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই হোষ্টেলের নাম হইবে "খাটাউ মাকাঞ্জি হোষ্টেল"। এই হোষ্টেল দুয়ে নির্ম্মিত হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদের পরিচালনাধীন থাকিবে। এই দান করিয়া খাটাউ ভ্রাতৃবর্গ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মহিলাগণের ডাক্তারী শিক্ষায় সুবিধার জন্য চল্লিশটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়াছেন।—রঙ্গরস।

শিক্ষায় কার্য্যকরী উপায় সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। ব্যবসা-শিক্ষায় বাংলা দেশ অনেক পিছাইয়া। এ বিষয়ে বাঙালী অগ্রণী। এ দিকে খবর রহিয়াছে—

বঙ্গের বাণিজ্য।—যুদ্ধাবসানে বঙ্গদেশের বাণিজ্যের উন্নতি

[redacted]-২০ সনে বঙ্গে সমুদ্র-পথে ৯০২৯ কোটি টাকার বাণিজ্য [redacted] আমদানী এবং ১৪০৭৮ কোটি টাকার রপ্তানি হইয়াছে।

—সম্মিলনী।

কিন্তু বাংলা দেশের বাণিজ্য দেশীয় বাণিজ্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। বাংলার বা ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য বলিয়া সরকার যাহা উল্লেখ করেন তার পরিচালন করেন বিদেশীরা, আয় গ্রহণ করেন-তাঁরাই, এবং এ বিষয়ে রাজসরকার তাঁদেরই রীতিমত সাহায্য করেন। ইহাই ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য। মূলে ইহা বিদেশী, নামে দেশী। যাহা হউক স্বাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদিগকে অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই নামিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপায় নাই।

কাগজের কল।—শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে কাগজের নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভারতে প্রতি বৎসর ২২৪০০০০ মণ কাগজ ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসরই কাগজের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে যে কয়টি কাগজের কল আছে তাহাতে মাত্র ৭২০০০০ মণ কাগজ প্রস্তুত হয়। সুতরাং ভারতের কাগজের কল ভারতের কাগজের অভাব পূরণ করিতে অসমর্থ। মান্দ্রাজে ১০ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি। ভারতে যে কয়েকটি কাগজের কল আছে তাহার সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি করিলে, ভারতবর্ষ কাগজের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া পারিবে। শিক্ষাবিস্তারকামী ব্যক্তিগণের এই দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক।—সম্মিলনী।

প্রায় প্রত্যহই একটা না একটা 'লিমিটেড' কোম্পানী গঠিত হইয়া রেজেষ্টারী হইতেছে। জাহাজ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া শূকর পালনের কোম্পানি পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু একটাও নূতন কাগজের কল এদেশে হইল না। ইহার কারণ কি? কাগজের দর দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে কাগজের কল স্থাপিত হইলে কোম্পানির বিশেষ লাভ হইবার আশা আছে; তথাপি কেহই এই বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন না কেন?—জাগরণ।

ইটের ব্যবসা।—মুর্শিদাবাদ হইতে এবার কলিকাতায় প্রচুর ইট যাইতেছে। জলও যথেষ্ট দিয়া কলিকাতার বাটী নির্ম্মাণের ঠিকাদারগণ লইয়া যাইতেছেন। যে-সমস্ত ইট ১২ টাকা ১৪ টাকা হাজার বিক্রয় হইত, তাহাই এখন ২৫ টাকা ৩০ টাকা হাজার বিক্রয় হইতেছে। ইট-ব্যবসায়ীগণের এবার যথেষ্ট লাভ হইবে। এতদিন বাঙ্গালীরাই ইট খরিদ বিক্রয় করিতেছিলেন। এইবার মাড়য়ারী প্রবেশ করিয়াছেন। কতক দিন হইল একজন মাড়য়ারী ইট খরিদ করিতে আসিয়াছেন। উচ্চ দরে খরিদ করিতে তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালীর ক্ষমতা কুলাইবে না। সব কাজেই মাড়য়ারী-হাত প্রসারিত হইয়াছে, অন্তে আর কিছু করিতে পারিবে না।—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী।

আমাদের কৃষির অবলম্বন গোরু পর্য্যন্ত বিদেশে পাঠাইতে ও অবাধে হত্যা করিতে দিতে গভর্মেণ্ট মোটেই কুণ্ঠিত নন। এসব সংবাদে আমরা ক্রমেই গভর্মেণ্টের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছি।—

গো-হত্যা।—ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রাটোনা নামক স্থানে ব্যবসার জন্য গোহত্যা চালাইবার নিমিত্ত ডেবেনপোর্ট এণ্ড কোং নামক এক ইংরেজ কোম্পানিকে ৮৪৩ বিঘা ভূমি নামমাত্র খাজানায় পত্তন করিয়াছেন। শুনা যায়, রাজকীয় সাহায্যে নাকি এই কোম্পানী এই ব্যবসা পরিচালনা করিবেন। এই কারখানায় নাকি প্রতিদিন ২৫০০ গরু ও অন্যান্য পশু হত্যা হইবে। দেশের হিন্দুমুসলমানগণ এক বাক্যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অটলভাবে রহিয়াছেন। আমরা গভর্ণমেণ্টের এই-সকল কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক হইয়াছি।—চারুমিহির।

ভারত হইতে গো-রপ্তানী।—কেবল শস্য নহে, গরুও ভারত হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯০১ অব্দে তিন লক্ষ কুড়ি গরু রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১২ অব্দে রপ্তানীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬ হাজার হইয়া উঠে। এই কৃষিপ্রধান দেশ হইতে এরূপভাবে গো-রপ্তানী হইলে কিরূপে কৃষিকার্য্য চলিবে?—বীরভূমবাসী।

দেশব্যাপী প্রতিবাদের ফলে গভর্মেণ্ট গো হত্যার ব্যবস্থা রদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লোকমতের জয় অনিবার্য্য!

সরকারের এই আচরণের পার্শ্বে দেশী রাজা-প্রজার চেষ্টা, সদাশয়তা ও মহানুভবতা হৃদয়ে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করে।—

নিজাম রাজ্যে গো-হত্যা।—হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মুসলমান সমাজের মুকুটমণি। তিনি সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, ঈদ বকরিদ উপলক্ষে বা অন্য কারণে তাঁহার রাজ্য মধ্যে গোহত্যা হইতে পারিবে না। তৎপরিবর্ত্তে ছাগ ও মেষ হত্যা করিতে হইবে। নিজাম বাহাদুরের এই কার্য্যে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা আশা করি, ভারতের সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

—চারুমিহির।

গো-হত্যা বন্ধ।—মধ্যপ্রদেশের সাগর মিউনিসিপ্যালিটি গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য মিউনিসিপ্যালিটির যে ছয় হাজার টাকা লোকসান হইবে উক্ত সহরের শ্রীযুক্ত এস, ডি, মিশ্র এবং কে, আর, খন্দেকার নাকি তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন বলিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য আমরা উক্ত মহাজনদ্বয়কে প্রশংসা করিতেছি।—বীরভূমবার্ত্তা।

নানা দুঃখ, কষ্ট, অন্যায়, নির্য্যাতনের মধ্যে বাঙালীর বুদ্ধিমত্তা ও উন্নতির যা দুএকটি সংবাদ পাওয়া যায় তাহা আমাদের পরম লাভ, গৌরবের বিষয়।—

মানসিক অঙ্কে বীর।—"ফরিদপুর হিতৈষিণী" বলেন, গত ১লা শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় অত্রত্য টাউন থিয়েটার হলে ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু মানসিক অঙ্ক শাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাটীগণিতের ২৪।২৫টি ঘরযুক্ত অঙ্কের ঘনফলের শুদ্ধ ফল তিনি মানসিক শক্তিবলে বাহির করিয়াছেন। অত্রত্য রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মিত্র এবং স্থানীয় বারের সুপ্রসিদ্ধ সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মৈত্র, বি-এল, মানসিক অঙ্কশাস্ত্রে এই মহা শক্তিমান ব্যক্তিকে অতিশয় কঠিন রকমের ভগ্নাংশের সরলতা সম্পাদন এবং বড় বড়

পৌনঃপুনিক দশমিকযুক্ত Reduction of Fraction কষিতে দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় অতি গোলমালের মধ্যে এই অঙ্কশাস্ত্রের বীর নিজ অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করতঃ শুদ্ধ ফল প্রদান করিয়া উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মিঃ সি, জি, ষ্টিভেন্স, আই-সি-এস, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" এবং ডেলি নিউজ পত্রিকা ইহাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়ে সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইনি বিলাত যাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সাহায্য করা আমরা দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক মনে করি।

—সম্মিলনী।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় নামক এক বাঙ্গালী যুবক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া ডি-ও উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। আমরা ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের গৌরবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।—আনন্দ পত্রিকা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

দু-ফোঁটা অশ্রু

কোন্ মুকুতার মালা হ'তে খসা
মোতি তুই,
কোন্ কাননের অঞ্চল-ঝরা
তাজা যূঁই ?
কোন্ রবি—তা'র স্বেদের বিন্দু,
দু-কণা জ্যোৎস্না—কোন্ সে ইন্দু,
কোন্ স্বাতী হ'তে গ'লে-পড়া সুধা
ফোঁটা দুই ?

২

কী দিব তুলনা, অশ্রু রে ! তোর
তুলা তুই,
শচীর শ্রবণ-বিচ্যুত দুটি
দুল তুই !
কোন্ শরতের নিশীথ-নীহার,
দু-ফোঁটা বেদনা ব্যথিত কাহার,
আঁখি-পুটে কোন্ দেবতা-পূজার
ফুল তুই ?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

পুস্তক-পরিচয়

খেয়াল—শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

চারিটি ছোট গল্প লইয়া একখানি বই খুলিয়াই চোখে পড়ে গ্রন্থকারের ফটো। বাঙালী সাহিত্যিক বাঙালীর বেশে ফটো তোলানো বোধ হয় লজ্জার বিষয় মনে করেন। তাই তিনি সাহেব সাজিয়া ফটো তুলাইয়াছেন! প্রসিদ্ধ লেখকদের দেখিবার ইচ্ছা তাঁদের গ্রন্থপাঠকদের হইয়া থাকে; এজন্য পাঠকদের অনুরোধে প্রকাশকেরা প্রসিদ্ধ লেখকদের ছবি ছাপিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু এই লেখক প্রসিদ্ধি পাইবার আগেই প্রসিদ্ধ হইতে চাহিতেছেন দেখিতেছি।

"লেখকের নিবেদন" হইতে আরম্ভ করিয়া গল্পগুলির শেষ পর্য্যন্ত লেখকের একটি বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে, সেটি তাঁর বাচালতা। এই বাচালতার সঙ্গে মিশিয়াছে অবান্তর তাঁর বাহ্য প্রচারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কোন এক বন্ধু তাঁকে অসাধারণ মনে করেন; সেই বন্ধুর প্রশংসাপত্রটা বইয়ের গোড়ায় জুড়িয়া দিয়া তিনি পরোক্ষভাবে আপনার জয়ঢাক আপনি বাজাইয়াছেন। ইহাতে পাঠকদের মনে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে কিরূপ ধারণা জন্মায় তাহা বোধ করিবার শক্তিও বর্ত্তমান গ্রন্থকারের নাই!

তারপর গল্পগুলির কথা। চারিটি গল্পের মধ্যে কোন্‌টাকে ঠিক গল্প বলা চলে না; কেননা, ছোট গল্পের প্রকৃতি ইহাতে নাই। প্লট বলিতে যাহা বুঝায়, কোন গল্পেই তাহা জমে নাই। কেবল কতকগুলি অসঙ্গত উচ্ছ্বাস ও অপরূপ রসিকতা এক জায়গায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ভাষায় যথেষ্ট ভুল আছে। "কর্চ্ছিলাম" "ভাব্‌ছিলাম" লিখিতে লিখিতে "করিতেছিলাম" "ভাবিতেছিলাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লেখক নবীন; কিন্তু তিনি পরিশ্রমের সাধনার দ্বারা উন্নত হইতে চান এমন বোধ হইল না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বইখানির ছাপা ও বাঁধানো ভাল।

হরিদাস (ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক)—শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদেবীপ্রসন্ন পাইন, ১০।৩ নং বালাখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

একখানি নাটক। চৈতন্য-পারিষদ 'যবন' হরিদাসের গল্পটিই এই নাটকের আখ্যানবস্তু। গ্রন্থকার গল্পটিতে এত অধিক রং চাড়িয়াছেন যে, তাহা এক অসম্ভব আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি হরিদাসকে প্রহ্লাদের দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। নানা অস্বাভাবিক কাণ্ড হরিদাসের চোখের সাম্নে ঘটাইয়া লেখক হরিদাসের কৃষ্ণ-প্রেমের মহিমা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখায় সঙ্গতি নাই, স্বাভাবিকত্ব নাই। কোন চরিত্র অতিরঞ্জিত, কোন চরিত্র বা অস্পষ্ট আঁকা হইয়াছে।

নাটকটি কি ছন্দে লেখা তাহা আমরা বহুচিন্তা করিয়াও ঠাহর পাইলাম না। 'মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, গিরিশ ঘোষের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের অসম ছন্দ—এদের কোনটিরই গা ঘেঁসিয়াও যায় নাই। খানিকটা গদ্য লিখিয়া তার আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিয়া তারপর তার গোটা-কতক কথা নীচে ও উপরে চারাইয়া দিলে যাহা হয়, ইনি বোধ হয় লেখকের ছন্দ ঠিক তাই। এমন অনিপুণ ছন্দের একটা নমুনা তুলিয়া না দিয়া আমরা পারিলাম না :—

"এ-সকল সেই কুটিল
কালার ছল, সবই তাঁর খেলা।
নহে বল কেনই-বা ঘটিবে এরূপ?
হের সত্য যুগে,
ছিল পূর্ণ সত্য বিরাজিত,
তাহে ভাল জমিল না খেলা;
পুনঃ ত্রেতাযুগে রামরূপে খেলিলেন
কত খেলা। তাহাতেও তৃপ্ত
নাহি হ'য়ে দ্বাপরে নূতন
ভাবে খেলিলেন হরি।"

এ ছন্দ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কি একটা অভিনব প্রবর্ত্তন নাকি?

প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)—শ্রীসরসীবালা বসু প্রণীত। গিরিডি, বরগণ্ডা হইতে গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দামের উল্লেখ নাই।

একখানি উপন্যাস। কিন্তু এটিকে উপন্যাস না বলিয়া একটি বড় গল্প বলা চলে। গল্পটির প্লটে নূতনত্ব আছে। রাজদ্রোহিতা ও দেশহিতৈষণার জন্য কারারুদ্ধ একটি যুবকের কাহিনী বইটির আখ্যান-বস্তু। দুই বৎসর জেল খাটিয়া স্বাধীনমনা শিক্ষিত যুবক রতিকান্তের বাড়ী ফেরার পর দেশ সুদ্ধ লোকের তার উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরক্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং সবচেয়ে পুলিশের অবিশ্রান্ত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পাহারা ও তার প্রত্যেক পদক্ষেপ ও প্রত্যেক কাজের হিসাব নিকাশ লওয়া প্রভৃতি বিরক্তিকর ও ঘৃণ্য ব্যবহারে নায়কের জীবনের প্রতি ধিক্কার এবং মৃত্যুগ্রহণ,—ইহাই মোটামুটি গল্পটি। লেখিকা সরল এবং সুবোধ্য ভাষায় গল্পটি বিবৃত করিয়াছেন। পুলিশের সুতীব্র দৃষ্টিতে বাংলার অনেক বীর যুবক এইরূপে নির্যাতিত ও হত হইয়াছেন। গল্পটিতে কয়েকটি স্ত্রী-চরিত্র আছে। তবে সেগুলি ও রতিকান্তের চরিত্র একটু আবছায়া রকমের হইয়া গিয়াছে;—এদের আরো স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া আঁকা উচিত ছিল। মোটের উপর বইটি মন্দ নহে।

মহিমা দেবী—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। কমলিনী সাহিত্য-মন্দির, ১১৪, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

একখানি উপন্যাস। উপন্যাসটির ভিত্তি আছে ইতিহাসের উপর। আলাউদ্দিনের দেবগিরি আক্রমণ ও তাঁর হাতে মুলতানের রাজকুমারদ্বয় পূর্ণেন্দু ও শুভ্রেন্দু সিংহের লাঞ্ছনাভোগ ও মৃত্যু,—ইহাই মোটামুটি উপাখ্যান। চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক, কিন্তু ঐতিহাসিক বলিয়া তারা ত মনুষ্যাতীত কিছু নহে। শুভ্রেন্দু সিংহের যখন-তখন দার্শনিকত্বের প্রলাপ মোটেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। লেখিকা নায়িকা মহিমা দেবীর ঘাড়ে দেবীত্ব, মহত্ত্ব, বীরত্ব, সেবাপরায়ণত্ব প্রভৃতি নানা "ত্ব" চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মহিমা দেবী এত গুরুভার সহিতে পারেন নাই। তিনি ঠিক মানুষ হন নাই, একটা অস্বাভাবিক অমানুষ হইয়াছেন। স্বামীকে তিনি যুদ্ধে পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিদায়ের সময় স্বামী তাঁকে একটু অনুরাগ দেখাইতে আসিলে তিনি দশ হাত পিছাইয়া আসিয়া বীরত্বের এবং ধর্ম্মতত্ত্বের বড় বড় কথা বলিয়া উপদেশ দিয়া স্বামীকে সোহাগ-ভাবের হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। ইহা একেবারে অস্বাভাবিক। তারপর, আলাউদ্দীনের সময়ও আজকালকার আদর্শে বালিকা-বিদ্যালয় ও সেবাশ্রম খুলিয়া রাজপুত রমণীরা জনহিতকর কাজ করিতেন কি না তাহা আমরা জানি না। আর যিনি নায়িকা, যাঁর নামে বইর নাম, তাঁকে আমরা বইর শেষ ভাগে খুঁজে পাই।

বইখানিতে ধর্ম্মতত্ত্বের ছড়াছড়ি কিছু অধিক মাত্রায় হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে শৈলবালা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পুরুষ-চরিত্রগুলিতেও সব জায়গায় সঙ্গতি নাই।

বইর গোড়াতে সাহেবী-পোষাক-পরা দুইজন প্রকাশকের ফটো দেওয়া হইয়াছে। এমন প্রকাশকদের মনে রাখা উচিত, যে, তাঁদের ফটো বইর গৌরব বৃদ্ধি মোটেই করে না এবং তাহা দেখিবার জন্য পাঠকরা মোটেই উদ্‌গ্রীব হইয়া নাই।

তুলি—শ্রীপ্রমোদ চৌধুরী প্রণীত। দাম আট আনা।

একখানি পদ্যের বই। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ও ভাবের অনুকরণের প্রয়াস আছে। বইটির ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

বালিকার পদ্য-শিক্ষা—শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—"সারস্বত ভবন" ১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন আনা।

পদ্যের বই। মামুলি ছন্দে কতকগুলি মামুলি ভাবের নাড়াচাড়া মাত্র। বালিকাদের শিক্ষণীয় যে কি আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এমন "সেকেলে" বই আজকাল অচল।

প্রজাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবাদল-চন্দ্র মজুমদার, ২৩ শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

একখানি উপন্যাস। গল্পটির প্লটে নূতনত্ব না থাকিলেও গল্পটির বিবৃতি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। নায়ক অসিতকুমারের সমস্ত মতামতে আমরা সায় দিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধ মত সম্বন্ধে। তবে নায়কের চরিত্র ফুটিয়াছে বেশ। বিলাতী ও এ-দেশের সমাজের ভাল ভাবগুলি আহরণ করিয়া তিনি নিজের চরিত্র গঠিত করিতে চান। নায়িকা অরুণা মন্দ আঁকা হয় নাই। গৌরী, পিসিমা প্রভৃতির চরিত্রও গ্রন্থকারের সমান মনোযোগ ও বিচার লাভ করিয়াছে। অতিরঞ্জনা বা অস্বাভাবিকত্ব বইটিতে নাই।

বইটির ছাপা ও বাঁধন দুই-ই ভাল।

—সত্যানন্দ।

মিষ্টি সরবৎ—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৭২ পৃষ্ঠা। দাম দেড় টাকা।

একটি উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান পরিবারে শালা এবং ভগিনীপতি উভয়েই সস্ত্রীক একত্র বাস করিতেছেন, সুতরাং এক্ষেত্রে যেমনটি অনিবার্য্য, একটি অনাবিল হাস্যরসের ধারা বইটির আগাগোড়া কলরোল তুলিয়া বহিয়া গিয়াছে। বইখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। কিন্তু প্লটের দিক্ দিয়া গল্পটি তেমন জমে নাই বলিয়া বইটিকে শেষ করিবার দিকে তেমন ঝোঁক থাকে না, যেটুকু পড়া যায় বেশ রুচি-কর লাগে। হাস্য-রস জিনিষটা হাল্কা বলিয়াই খুব ওস্তাদী হাতে তাকে রাশ মানানো দরকার, সতর্কতার সঙ্গে যথাযোগ্য ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়া তাকে চালানো প্রয়োজন, নয়ত পদে পদে তার হাতছাড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আলোচ্য বইটিতে ঘটনা-সমাবেশের একটু শৈথিল্য আছে বলিয়া বোধ হইল। যেটুকু আছে, তাহা সুন্দর স্বাভাবিক এবং তাতে ওস্তাদী হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনার আতিশয্য নাই বলিলেই হয়। দাম্পত্য-জীবনের কলহ-মান-অভিমান-স্নেহ-সোহাগ-ভরা মিষ্টি সরবতে যাঁরা অভ্যস্ত, এ বইখানি তাঁহাদের পানসে লাগিবে কি না সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা বিপদ ডাকিয়া আনিতে চাই না,—তবে 'ও রসে' যাঁরা বঞ্চিত তাঁদের কাছে মিষ্টি সরবৎ খুব মিষ্টিই লাগিবে।

সন্ধ্যামী আলো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতির নিয়োগ

[ভাদ্রের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতির নিয়োগ সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কৌন্সিলের জনৈক সভ্য তাহার একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। উহার সমস্তটি অপরিবর্ত্তিত আকারে ছাপিয়া তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব। উহা দীর্ঘ বলিয়া উহার এক-একটি অংশ ছাপিয়া তাহার পরে পরে আমার বক্তব্য বলিব।

এই প্রতিবাদটি হস্তগত হইবার কয়েকদিন পরে আর-একটি প্রতিবাদ হস্তগত হয়। উহা আমি পাঠ করিবার পূর্ব্বেই লেখক দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে উহা ছাপা হইবে কি না। উত্তরে আমি যাহা বলি, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, "আমি উহা এখনও পড়ি নাই; প্রথম প্রাপ্ত প্রতিবাদটির অতিরিক্ত কোন যুক্তি উহাতে থাকিলে তাহা ছাপিব ও তাহার উত্তর দিব।" তাহাতে প্রতিবাদকারী তাঁহার লেখাটি অন্য কাগজে দিবার জন্য ফেরত লইয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসীর সম্পাদক।]

সমালোচকের কথা।

গত ভাদ্রমাসের "প্রবাসীতে" প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাডুয়েট বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষতঃ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনিয়াছেন এবং পোষ্টগ্রাডুয়েট কাউন্সিলের সভ্যগণের নিকট তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি এক্‌জিকিউটিভ কমিটির কথাই ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু কাউন্সিলের সভ্যরা যখন এক্‌জিকিউটিভ কমিটির কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছেন, তখন ঐ কার্য্যের দায়িত্বও তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। আমি কাউন্সিলের সভ্য। সুতরাং রামানন্দ-বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। রামানন্দ-বাবুর সহিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় তাবৎ ব্যাপারে একমত হইতে না পারিলেও, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চিন্তা করেন বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দেশের সাধারণ লোক যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদই রাখে না, রাখিতে চাহে না, এবং চেষ্টাও করে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গতবৎসর যাহারা কি বৃদ্ধি সম্বন্ধে আন্দোলনকালে বাগ্মিতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা সাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন,—বোধ হয় অজ্ঞতা বশতঃ। সংবাদপত্রে পড়িলাম তাঁহাদেরই কেহ কেহ এবার নিজেদের কলেজে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বমতের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন। থাক সে অবান্তর কথা।

আমার কথা।

সমালোচক মহাশয় অবান্তর কথা যাহা বলিয়াছেন, আমি সাধারণতঃ তাহার জবাব দিব না। এক্ষেত্রে তাহার আবশ্যক নাই, এবং স্থানাভাবও বটে। "দেশের সাধারণ লোক যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদই রাখে না, রাখিতে চাহে না, এবং চেষ্টাও করে না।" ইহা সকল স্থলে সত্য নহে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট্‌গুলি ক্রয় করিতে, কিম্বা, সরকারী অনেক সাময়িক পত্র ও বহির মত, সম্পাদকরূপে বিনামূল্যে পাইতে, ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লেখেন, যে, মিনিটগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে, সেনেটের সভ্যদের জন্য। অর্থাৎ উহা আমাকে দেওয়া হইবে না। প্রকৃত কথা কিন্তু এই, যে, সেনেটার ছাড়া অন্য কোন কোন লোকেও মিনিট পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট প্রভৃতি সরকারী গেজেট আদির মত যদি সম্পাদকদিগকে দেওয়া হইত কিম্বা কিনিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলেই দেশের লোককে দোষ দেওয়া সঙ্গত হইত। যখন দেখা যাইতেছে, যে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানিতে চায়, তাহারও জানিবার উপায় নাই, কিম্বা উপায় অতি সঙ্কীর্ণ, তখন দেশের লোককে দোষ দেওয়া সঙ্গত নহে। "অজ্ঞতাবশতঃ" যদি কেহ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও আংশিক ভাবে দায়ী।

সমালোচকের কথা।

রামানন্দ বাবুর প্রথম অভিযোগ "আগে হইতে যাঁহাদের উপর অন্য কোন কোন বিষয় অধ্যাপনার ভার ছিল তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন লোককে নৃতত্ত্ব পড়াইবারও ভার দেওয়া হইল। এই পাঁচজনের মধ্যে আমরা (রামানন্দ-বাবু), বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ ও অনন্তকৃষ্ণ আইয়ারের নৃতত্ত্ব বিষয়ক লেখার সহিত পরিচিত। অন্য দুজন এ বিষয়ে কি করিয়াছেন, জানি না, তাহা সম্ভবতঃ আমাদের অজ্ঞতা।·· এবং পাঁচজনের (অতিরিক্ত) দক্ষিণা কাহারও ৫০৲, কাহারও ১০০৲!"

বাকী দুইজনের নাম রায় বাহাদুর বালকৃষ্ণ আত্মারাম গুপ্তে ও পঞ্চানন মিত্র এম. এ., পি. আর. এস্। গুপ্তে

মহাশয় বহুদিন এথ্‌নোগ্রাফিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সহকারী ডিরেক্টর ও স্যার হার্ব্বার্ট রিজলীর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। স্যার হার্ব্বার্ট ও বিলাতের খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া যে-সকল চিঠি লিখিয়াছেন তাহার কতগুলি আমি দেখিয়াছি। স্যার আশুতোষ যে দেখেন নাই কেমন করিয়া বলিব? কলিকাতা যাদুঘরে যে-সকল করোটী আছে গুপ্তে-মহাশয়ই সরকারের আদেশে তাহার পরিমাপ গ্রহণ করেন এবং তৎসম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন তাহা সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশ্য তাহাতে গুপ্তে-মহাশয়ের নাম নাই। এক সময়ে তিনি নৃতত্ত্ববিষয়িণী পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সকল প্রবন্ধ তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত হয় নাই। রামানন্দ, বাবু বোধ হয় জানেন যে সরকারী ভৃত্যদিগের রচনা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নামে মুদ্রিত হওয়া মোটেই অসাধারণ ঘটনা নয় ভারত-বাসীদিগের মধ্যে তিনিই লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটির প্রথম সভ্য। বোধ হয় ইহাতেই তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে রামানন্দ-বাবু নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। পঞ্চানন মিত্র তরুণ বাঙ্গালী যুবক। রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌত্র। দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় ইণ্ডিয়ান এণ্টি-কোয়ারীতে, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, ও হইতেছে। কয়েকজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত তাহা পাঠ করিয়া প্রশংসাসূচক পত্রও লিখিয়াছেন এবং ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ তাঁহার নূতন পুস্তকে পঞ্চাননের প্রবন্ধের সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা স্বীকার করি রমাপ্রসাদ চন্দ অথবা অনন্ত-কৃষ্ণ আইয়ারের ন্যায় পঞ্চানন মিত্র এখনও খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে তাঁহার কার্য্যের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না তাহা, আশা করি, রামানন্দ-বাবুও স্বীকার করিবেন।

আমার কথা।

গুপ্তে এবং মিত্র মহাশয়দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার কিছু না-জানা আমার অজ্ঞতাপ্রসূত হইতে পারে, তাহা আমি নিজেই লিখিয়াছিলাম। বাস্তবিকই যে উহা আমার অজ্ঞতাজাত, তাহা বুঝিয়া লজ্জিত ও আহ্লাদিত হইয়াছি। দেশে যত বেশী জ্ঞানী লোকের অস্তিত্বের সংবাদ জানা পড়ে, ততই আনন্দ হয়, এবং তাহাতে দেশের লোকদের আশা, উৎসাহ, এবং জাতীয়গৌরববোধ বৃদ্ধি পায়। সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের বংশে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্রের মত যুবকের আবির্ভাব অতীব আহ্লাদের বিষয়।

ভাদ্রের প্রবাসী বাহির হইবার পরেই গুপ্তে ও মিত্র মহাশয়দিগের কৃতিত্বের কোন কোন প্রমাণ আমার দৃষ্টি-গোচর হয়। তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই সেপ্টেম্বরের মডার্ন্ রিভিউ কাগজে লিখিব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ কাগজ বাহির হইবার আগেই এই প্রতিবাদটি হস্তগত হওয়ায় তাহা করি নাই। কেননা, তাহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারিত, যে, আমি উক্ত অধ্যাপকদিগের কৃতিত্বের এই বিষয় প্রতিবাদটি হইতেই জানিয়াছি, অথচ তাহা গোপন রাখিয়া নিজের ভ্রম সারিয়া লইতেছি।

সমালোচকের কথা।

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষকবর্গের মধ্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় তবে তাঁহাদিগকে অল্প কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়া নূতন একটি বিষয়ের অধ্যাপনার ভার দেওয়া কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গুরুতর অন্যায়? আর পরিশ্রমের অনুপাতে এই-সকল শিক্ষক যে পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা কি খুব বেশী হইয়াছে?

আমার কথা।

এই প্যারাগ্রাফটিতে সমালোচক মহাশয় আমার মন্তব্যের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই,—হইতে পারে যে তাহা তাঁহার দোষ নয়, আমারই লেখার অস্পষ্টতা বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছে। আমার অভিপ্রায় ছিল এই:—বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের জানা অন্য কোন বিষয়ের অধ্যাপনার ভার দেওয়া মোটেই অন্যায় নহে। তাঁহাদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহা "খুব বেশী" ত হয়ই নাই, কম হইয়াছে, অনাথ-বাবুর বেতনের তুলনায় অন্যায় রকমে কম হইয়াছে। তাহার কারণ আমি দেখাইতেছি।

নৃতত্ত্বের এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার কোর্সে কিছু মিল থাকিলেও অধ্যাপনা স্বতন্ত্র হইবে ধরিয়া লইতেছি। যাঁহারা দুটি কাজ করিবেন, তাঁহারা দুটির জন্যই পুরা পরিশ্রম করিবেন। একটিতে বা দুটিতেই ফাঁকি দিবেন, নিশ্চয়ই এরূপ সম্ভাবনা অনুমান করিয়া বেতনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইহা যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নূতন কাজটির জন্য "অল্প কিছু অতি-রিক্ত পারিশ্রমিক" না দিয়া পুরা বেতন কেন দেওয়া হইল না? ইহার নানা কারণ থাকিতে পারে। একটি কারণ হইতে পারে টাকার টানাটানি। কিন্তু সমালোচক পরে বলিয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা আছে। অতএব অন্য কারণের অন্বেষণ আবশ্যক। অনুমান হয়, যে, অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকট "অল্প কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের" প্রস্তাব করাতে তাঁহারা ত্যাগস্বীকার

করিয়া কিম্বা কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাতেই রাজী হইয়াছেন। তাহা হইলে, এই প্রশ্ন উঠে, যে, আশু-বাবুর জামাতা অনাথ-বাবু যে দুটি কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন—(১) শিক্ষকের কাজ এবং (২) স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শদাতার কাজ—তাহার মধ্যে কোন একটির জন্য "অল্প কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক" লইতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল কি না? যদি অনুরোধ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে তিনি ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী হন নাই। যদি অনুরোধ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, ত্যাগস্বীকারটা অন্য লোকদের জন্য, অনাথ-বাবুর জন্য নহে। অবশ্য ইহা আমাদের মত নহে; যেরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, তাহার কথাই বলিতেছি।

অনাথ-বাবু কি পড়াইবেন, জানি না। সমালোচক মহাশয় পরে বলিয়াছেন, তিনি শবব্যবচ্ছেদ শিখাইবেন। তাহা মানিয়া লইলাম। ১৮ই আগষ্টের কলিকাতা গেজেটের ১সী খণ্ডের ৮০৯ পৃষ্ঠায় দেখিলাম যে নৃতত্ত্বে এম্ এ পরীক্ষার্থীদিগকে জানান হইতেছে যে—

"Candidates shall be expected to possess a general knowledge of such subsidiary subjects an Archæology, Human Anatomy, Geography, Psychology, Geology, Zoology, Physiology, Statistics with special reference to Biometrics, in so far as such acquaintance is necessary for the proper understanding of Anthropology, but they shall not be required to pass a special examination in the subsidiary subjects."

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, human anatomy এবং physiology, নৃতত্ত্ব কোর্সের এই দুটি subsidiary বা অপ্রধান বিদ্যা অনাথ-বাবুর জানা আছে। কিন্তু এই দুটি বিদ্যায় ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে না; খাস্ নৃতত্ত্ব বুঝিবার জন্য এগুলির যতটুকু জ্ঞান দরকার, তাহারা ততটুকু জানিলেই চলিবে। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ, যে, অপ্রধান ও অপরীক্ষিতব্য বিদ্যা শিখাইবার জন্য অনাথবাবু পাইবেন মাসিক ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ বেতন, এবং অন্য চারিজন প্রধান ও পরীক্ষিতব্য বিদ্যা পড়াইবার জন্য কেহ মাসিক ৫০৲ কেহ মাসিক ১০০৲ বেতন পাইবেন। (অনন্তকৃষ্ণ আইয়ারের বেতন কত জানি না।) ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, অনাথ-বাবু অধ্যাপনায় অনভিজ্ঞ এবং অন্য পাঁচজন অধ্যাপনায় অভিজ্ঞ। বিজ্ঞাপন দিলে Anatomy শিখাইবার জন্যও যে অনাথ-বাবু অপেক্ষা ঐ বিষয়ে অধিক কৃতী লোক পাওয়া যাইত না, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আমাদের বিবেচনায় অপ্রধান ও অপরীক্ষিতব্য বিদ্যারূপে human anatomy শিখাইবার জন্য একজন demonstrator রাখিলেই যথেষ্ট হইত, ২৫০—৩০০৲ বেতনের লোকের কোন প্রয়োজন ছিল না। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রেরা ঐ ঐ বিদ্যা অন্যতম প্রধান ও পরীক্ষিতব্য বিদ্যারূপে শিখে। তথাপি দেখিতেছি, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের anatomyর অধ্যাপক (এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট) মাসিক ২০০৲ বেতন পান, সহকারী অধ্যাপক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-ডি) মাসিক একশত দশ টাকা বেতন পান, এবং তিন জন ডিমন্‌ষ্ট্রেটর (প্রত্যেকেই এম্-বি) ১০০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পান। অবশ্য ইহাঁরা সকলেই চিকিৎসা-ব্যবসা করেন। অনাথ-বাবুও যে করিবেন না, তাহা কোথাও লেখা নাই। অতএব, মনে হইতেছে, অনাথ-বাবুকে বেশী বেতনে, এবং নৃতত্ত্বের অন্য চারিজন অধ্যাপককে কম বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গুপ্তে মহাশয় জুলজিক্যাল সোসাইটীর ফেলো। অতএব তিনি জুলজী জানেন। সুতরাং তাঁহার human anatomy অন্ততঃ এতটুকু জানা থাকিবার সম্ভাবনা, যদ্দ্বারা নৃতত্ত্বের ছাত্রদিগকে তাহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ঐ বিষয়ে তিনি দিতে পারেন। আমি এরূপ শুনিয়াছিও যে তিনি উক্ত বিষয় জানেন। তাহা সত্য হইলে, সমালোচকের মতে যে উদ্দেশ্যে অনাথবাবুকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা গুপ্তে মহাশয়ের দ্বারা সাধিত হইতে পারিত কি না, বিবেচ্য।

সমালোচকের কথা।

রামানন্দ-বাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ, স্যার আশুতোষই সভাপতিস্বরূপ নৃতত্ত্বের অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে একটি নোট লিখিয়াছিলেন, এবং নোটের শেষে লিখিয়াছেন—but they (ঐ পাঁচজন অধ্যাপক) cannot cover the whole field; এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসুর পোষকতায় অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি নৃতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এতৎ সম্বন্ধে রামানন্দ-বাবু সাতটি প্রশ্ন করিয়াছেন। "(১) আশু-বাবু সব বিষয়েই এমন সব-জান্তা কেমন করিয়া হইলেন যে নৃতত্ত্বেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তিনি রাখেন? (২) নৃতত্ত্বের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়জন আছে? (৩) পাঁচজন অধ্যাপক দ্বারা তাহাদের অধ্যাপনা হইতে পারিত কি না? (৪) তাহাদের এবং তদতিরিক্ত আরও একজনের বেতন দিবার মত অর্থের প্রাচুর্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে কি না? (৫) নূতন পদটির জন্য লোক চাহিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কি না? (৬) উক্ত পাঁচজন অধ্যাপক যাহা জানেন না তাহা অনাথ-বাবু জানেন ও পড়াইতে পারেন, তাহা কখন্ কি প্রকারে নির্ণীত হইল? (৭) এই অনাথ-বাবুটি কে? এবং তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ

জ্ঞানবান্ ও তৎবিষয়ে গবেষণা দ্বারা কি কি নূতন বহি বা পাশ্চাত্যদেশে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নৃতত্ত্ববিষয়িণী পত্রিকাসকলে কি কি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন?" এই প্রশ্নগুলির উত্তর একে একে দিতেছি।

(১) আশু-বাবু সব-জান্তা নহেন, এবং সে গৌরব বা অগৌরব তিনি কখনও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দাবী করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কাউন্সিল ও বিভিন্ন বোর্ডের সভাপতি হিসাবে তিনি অনেক বিষয়ে অনেক নোট লিখেন, এই-সকল নোট লিখিবার কালে তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ-সকল বিষয়ের অধ্যাপনার কিরূপ ব্যবস্থা আছে তাহার খোঁজ লয়েন এবং এখানকার অধ্যাপকগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। Ancient Indian History and Cultureএর সম্পর্কে কোন নূতন শাখা খুলিবার কালে অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের এবং দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পরামর্শ ত তিনি অহরহই লইতেছেন। সুতরাং নৃতত্ত্ব বিষয়ে যে তিনি রমাপ্রসাদ চন্দের পরামর্শে চালিত হন নাই তাহাই বা রামানন্দ-বাবু কেমন করিয়া জানিলেন?

আমার কথা।

নৃতত্ত্ববিষয়ক নোটটি যে আশুবাবু অধ্যাপক ভাণ্ডারকর এবং রমাপ্রসাদ-বাবুর সহিত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা ভাদ্রের প্রবাসী বাহির হইবার পরই আমার দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা আমি সেপ্টেম্বরের মডার্ন রিভিউ কাগজে লিখিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই প্রতিবাদটি হস্তগত হওয়ায় তাহা করি নাই। এ-বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অজ্ঞতাবশতঃ কোন অন্যায় ব্যবহার আমি করিয়া থাকিলে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আশু-বাবু সবজান্তা বলিয়া দাবী কখনও করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কার্য্য দেখিয়া এরূপ পরিহাস করা চলিতে পারে। তিনি, বিদ্যাবত্তাসাপেক্ষ নিম্নলিখিত ফ্যাকাল্টি বোর্ড প্রভৃতির সভাপতি বলিয়া ১৯১৯ সালের সীণ্ডিকেটের রিপোর্টে দেখিতেছি:—

১। Faculty of Arts.
২। Faculty of Law.
৩। Board of Studies in English.
৪। Board of Studies in Sanskrit.
৫। Board of Studies in Sanskritic Languages.
৬। Board of Studies in Mathematics.
৭। Board of Studies in Law.
৮। Comparative Theology Lecturer Committee.
৯। Arabic and Persian Staff in Colleges Committee.
১০। Council of Post-graduate Teaching in Arts.
১১। Council of Post-graduate Teaching in Science.
১২। Board of Higher Studies in English.
১৩। ,, ,, Sanskrit.
১৪। ,, ,, Vernaculars.
১৫। ,, ,, Pali.
১৬। ,, ,, Arabic and Persian.
১৭। ,, ,, Comparative Philology.
১৮। ,, Mental and Moral Philosophy.
১৯। ,, ,, Experimental Psychology.
২০। ,, ,, History.
২১। ,, ,, Economics.
২২। ,, ,, Pure Mathematics.
২৩। ,, ,, Applied Mathematics
২৪। ,, ,, Physics.

এ-ছাড়া তিনি আরও অনেক কমিটির সভাপতি বা সভ্য। এইসব বিবেচনা করিলে তাঁহার শ্রমশক্তির ও পল্লবগ্রাহিতার ক্ষমতার খুব প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয়, কিন্তু সব-জান্তা বলিয়া পরিহাসটাও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি আরও অনেকের পরামর্শ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "অহরহই লইতেছেন।" ইহা ভাল কথা। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে, বহুবিষয়ে পরমন্তিষ্কোপজীবী ও পল্লবগ্রাহী হইয়া মুরুব্বির স্থান গ্রহণ না করিয়া আশু-বাবু যে-কয়টি বিষয়ে বাস্তবিক পণ্ডিত তাহাতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিলে অন্যান্য-বিষয়ে-পণ্ডিত লোকদের প্রতি সুবিচার হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মিষ্ঠতা কার্য্যক্ষেত্র পাইয়া বিকাশলাভ করে ও বৃদ্ধি পায়, এবং তদ্দ্বারা দেশ উপকৃত হয়। পণ্ডিত ও কর্ম্মী লোক দেশে যত বাড়ে ততই মঙ্গল। একজনের উপর বেশী নির্ভর করিলে তাঁহারও প্রকৃত মঙ্গল হয় না, দেশেরও হয় না; একের অভাবে সব আঁধার, এরূপ অবস্থা কখন ঘটিবার সম্ভাবনা হয় না। যিনি যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিদ্যাপীঠে তাঁহারই সে-বিষয়ের মুরুব্বি হওয়া স্বাভাবিক ও সুশোভন। অধিকাংশবিষয়ে পল্লবগ্রাহীর মুরুব্বিয়ানা স্বাভাবিক ও সুশোভন নহে।

সমালোচকের কথা।

তার পর নৃতত্ত্ব ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হইলে শব ব্যবচ্ছেদ করা দরকার, ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা, অপর পাঁচজন কেহই ডাক্তার নহেন, সুতরাং শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন না, এরূপ ক্ষেত্রে যে কেন—they cannot cover the whole field তাহা বুঝিতে বেশী কষ্ট হইবার কারণ ত দেখিতে পাই না।

আমার কথা।

Anatomy না জানিলে, শবব্যবচ্ছেদ না করিলে, Physical Anthropology শিক্ষা করা যায় না, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু Cultural Anthropology ও

Social Anthropology শিক্ষা করা যায়। এবং গুপ্তে মহাশয় দ্বারা যে হয়ত anatomyর শিক্ষাদান প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারিত, তাহা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছি। তাহা ঠিক্ হউক বা না হউক, ইহাও সত্য, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় megalomania-গ্রস্ত না হইয়া আপাততঃ শুধু cultural ও social anthropology শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেই চলিত। কারণ, আমি শুনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষ (dissection-room) নাই, এবং শব পাইবারও কোন বন্দোবস্ত নাই। যদি আমার ভুল হয়, তাহা হইলে ঐ কক্ষ কোন্ রাস্তার কোন্ নম্বর বাড়ীতে অবস্থিত এবং শব কোথা হইতে কি উপায়ে সংগৃহীত হয়, আমাকে জানাইলে প্রবাসীতে ছাপিব। ইহা সম্ভব যে কক্ষের ও শব সংগ্রহের বন্দোবস্ত পরে হইবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অধ্যাপক নিয়োগও সেই সময়ে হইতে পারিত; আগে হইতে একটি অপ্রধান ও অপরীক্ষিতব্য বিদ্যার জন্য এত বেশী বেতন দিয়া শিক্ষক রাখিবার আবশ্যক ছিল না।

শুধু cultural ও sccial anthropology যে শিক্ষা করা ও শিখান যায় এবং তাহা যে অকেজো নয়, তাহার এক প্রমাণ, পাঁচজন ভারতীয় বিদ্বান্ উহাই শিখিয়া অধ্যাপক হইয়াছেন; দ্বিতীয় প্রমাণ, এই, যে, আমেরিকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু cultural ও social anthropology শিখান হয়। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে anthropologyর কোর্সে general anthropology, archaeology and ethnology of Europe, primitive arts and industries, primitive religions, American linguistics, American ethnology and archaeology, peoples of the Pacific, social morphology, ethnology of Australia, ethics of primitive peoples, এবং primitive magic শিখান হয়। আমেরিকার এই বিশ্ববিদ্যালয় খুব বড়। রাস্তা ছাড়া, যতটা জমীর উপর ইহার নানাবিধ অট্টালিকা দণ্ডায়মান আছে, তাহারই বিস্তৃতি ৩৪৭ বিঘা। অট্টালিকার সংখ্যা ১০৩।

সমালোচকের কথা।

(২) খাস নৃতত্ত্বের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মোট বারজন আছে, এতদ্ব্যতীত ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সম্পর্কেও নৃতত্ত্ব একটি পঠিতব্য বিষয়, এই সকল শাখায় কত ছাত্র আছে ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় বার জনের কম হইবে না, কিন্তু কোন বিষয়েরই অধ্যাপক-সংখ্যা ছাত্র-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, ঐ বিষয়ের বিভিন্ন শাখার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। রামানন্দ বাবুর জন্য নহে তবে তাঁহার কোন কোন পাঠকের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। মনে করুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শ্রেণীতে মাত্র একজন ছাত্র ভর্ত্তি হইল; তাহাকে পড়িতে হইবে (১) ইংলণ্ডের ইতিহাস (২) প্রাচীনযুগের ইতিহাস (৩) প্রাচীন এসিরিয়া বেবিলনিয়া প্রভৃতি দেশের লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস (৪) ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র-মূলক ইতিহাস (৫) অন্তর্জাতিক বিধান এবং ইস্‌লামের ইতিহাস, মারাঠা, শিখ, রাজপুতদিগের ইতিহাস প্রভৃতি। সুতরাং ঐ একটি ছাত্রের জন্যও অন্ততঃ সাতটি অধ্যাপক রাখিতে হইবে। নৃতত্ত্বে যদি বারটি না হইয়া পঞ্চাশটি ছাত্রও হইত, তাহা হইলেও ঐ ছয়জন অধ্যাপকই তাহাদের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতেন। (৩) কিন্তু বারটি ছাত্রের অধ্যাপনাও ঐ পাঁচজন অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারিত না।

আমার কথা।

অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্যও যে অধিকসংখ্যক অধ্যাপকের প্রয়োজন কেন হইতে পারে, সমালোচক মহাশয় দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিদ্যার যতগুলি শাখা, তাহা শিখাইবার জন্য ততগুলি অধ্যাপক চাই-ই, ইহা না হইতেও পারে; কেননা, একজন অধ্যাপকের পক্ষে একাধিক শাখা জান ও শিখান অসম্ভব নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ত কোন কোন অধ্যাপক একাধিক বিদ্যার শিক্ষক। কোন বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী হইলে উহার শ্রেণীকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, এবং তখন অধ্যাপক বেশী দরকার হয়। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য কিন্তু প্রধানতঃ অন্যরূপ ছিল। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়েও সকল বিদ্যা শিখান হয় না। অনেক স্থলে আর্থিক সচ্ছলতা এবং বাস্তবিক বা সম্ভাবিত ছাত্রসংখ্যা বিবেচনা করিয়া নূতন নূতন বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়; এখানেও তাহা করিলে ভাল হয়। আমার মনে হয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যেরূপ (তাহার বিষয় পরে বলিতেছি) তাহাতে নূতন নূতন বিষয়ের দিকে ধাবিত না হইয়া, বিজ্ঞান কলেজের কোন কোন ক্লাসের মত পূর্ব্বেই যে সকল ক্লাস খোলা হইয়া আছে, তাহার অধ্যাপনা-আদির বন্দোবস্ত ভাল করিলে সুবিবেচনার কাজ হইত। শুনিয়াছি, বিজ্ঞান কলেজের সরঞ্জাম এখনও চলনসই রকমও হয় নাই। অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য নূতন ক্লাস খুলিয়া ব্যয় বৃদ্ধি সুযুক্তি বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

সমালোচক মহাশয়কে একটি কথা ভাবিয়া দেখিতে

বলি। ১৮ই আগষ্টের কলিকাতা গেজেটে নৃতত্ত্বের পরীক্ষার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে human anatomy ছাড়া geography, psychology, geology, zoology, physiology, এবং statistics with special reference to biometrics ও অপ্রধান-রূপে (as subsidiary subjects) শিখিতে হইবে বলিয়া লেখা হইয়াছে। যে ছয়জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি "the whole field cover" করিতে পারেন? যদি পারেন, তাহা হইলে ইহার কোন্ বিষয়ে কে পণ্ডিত, জানাইলে ভাল হইত। যদি না পারেন, তাহা হইলে whole field cover করিবার ওজুহাতে কেবলমাত্র অনাথবাবুকে নিযুক্ত করিবার কারণ কি? তিনি যাহা শিখাইবেন, তাহার জন্য dissection-room আদি নাই শুনিয়াছি, অথচ তিনি নিযুক্ত হইয়া গেলেন; অথচ আর যে-সব অপ্রধান বিদ্যা ঐরূপ কক্ষ আদি ব্যতিরেকেও শিখান যায়, তজ্জন্য শিক্ষক নিয়োগ হইল না, ইহার কারণ প্রদর্শিত হওয়া উচিত। ছয়জন অধ্যাপক উক্ত যে-যে অপ্রধান বিষয় শিখাইতে পারিবেন না, তাহার প্রত্যেকটি শিখাইবার লোক কলিকাতায় পাওয়া যায়। অল্প টাকাতেই পাওয়া যায়। তাঁহাদের নিয়োগ না হইয়া কেবল একজন ডাক্তারের নিয়োগই কেন হইল? উত্তরে বলা হইতে পারে, ক্রমশঃ সব হইবে। আমারও ত কথা তাই। আমিও বলি, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করুন। যেমন human anatomy না জানিলে physical anthropology শিখা যায় না, তেমনি geologyর একটি শাখা palaeontology না জানিলেও physical anthropologyর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। ইহা কলিকাতা গেজেটের বিজ্ঞাপনেও স্বীকৃত হইয়াছে; যথা— "Physical anthropology shall be studied from the zoological, palaeontological, physiologial, psychological and ethnological point of view." এই সমস্ত point of view হইতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আপাততঃ physical বাদ দিয়া শুধু cultural and social নৃতত্ত্ব শিখাইলেই হইত।

উপরে "ছয়জন" শিক্ষকের উল্লেখ করিয়াছি। ঐ অংশ লিখিত হইবার পর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, এম্-এর নিয়োগ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ইহাঁর নৃতত্ত্ব-বিষয়ক কোন কোন প্রবন্ধ আমি ইংরেজী কাগজে দেখিয়াছি। ইনি geology, palaeontology, psychology, ইত্যাদি কোন কোন বিদ্যা জানেন কি না, কিম্বা তাহা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

সমালোচকের কথা।

(৪) তাঁহাদের [নৃতত্ত্বের অধ্যাপকদের] সকলেরই বেতন বিশ্ববিদ্যালয় দিতেছেন, সুতরাং সে ক্ষমতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে যে অর্থের প্রাচুর্য্য নাই সে অপরাধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কারণেই হউক সর্‌কারী সাহায্য প্রয়োজন মত পাইতেছে না, এবং দেশের লোকের অর্থাভাব অথবা বদান্যতার অভাববশতঃই হউক তাহাদের নিকট হইতেও বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট অর্থ পান নাই। স্যার রাসবিহারী এবং স্যার তারকনাথ ব্যতীত আরও ধনী বাংলাদেশে আছেন, তাঁহাদের কাহারো নাম করিতে চাহি না; কিন্তু দুইজন ব্যবহারাজীব অনেক দান করিয়াছেন বলিয়াই অপরের কর্ত্তব্য নিঃশেষিত হইয়াছে মনে করিতে পারি না। যতদিন ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত না হইবে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের প্রাচুর্য্য থাকিবে না ইহা জানা কথা।

আমার কথা।

কোন প্রকারে বেতন দিতে পারিলেই অর্থের যথেষ্টতা আছে, ইহা স্বীকার্য্য নহে। কাহার দোষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের যথেষ্টতা বা প্রাচুর্য্য নাই, তাহার আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; আছে কিম্বা নাই, তাহাই বিবেচ্য। আমার ধারণা, নাই; প্রকৃত কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই জানেন। সেনেট হাউসের অভ্যন্তরে খাতায় যাহাই লেখা থাক্, বাহিরে রটিয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ঘাটতি (deficit) খুব বেশী; এবং সেই কারণে অনেক পরীক্ষক আগে আগে যত শীঘ্র পারিশ্রমিক পাইতেন, ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে তত শীঘ্র পান নাই। ১৯১৯ সালের সীণ্ডিকেটের রিপোর্টে দেখিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে—যদিও তাহাও অডিট করা এবং অডিটরের স্বাক্ষরযুক্ত নহে—কিন্তু সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব নাই। এই হিসাব chartered accountants দ্বারা অডিট্ ও স্বাক্ষর করাইয়া ছাপিলে তবে লোকের বিশ্বাস হইবে যে সেনেট হাউসের আর্থিক অবস্থা গোপনীয় রকমের নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যে ভাল নহে, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারি, কিন্তু কেবল একটি করিব। ১৯১৯ সালের ৫ই জুলাই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দিগকে লইয়া যে কন্‌ফারেন্স হয়, তাহাতে বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয় বলেন, "our financial condition is not at all good."

সমালোচকের কথা।

(৫) নূতন পদটির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইশ্রেণীর শিক্ষক আছেন—১.অধ্যাপক Professor, ২. লেক্‌চারার বা সাধারণ শিক্ষক। অধ্যাপকের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বহুশ্রুত লোকই এই সকল পদের জন্য বাছিয়া লইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু বহুশ্রুত লোকই যে কাজের লোক হইবে এমন কোন কথা নাই। অধ্যাপক মনোহর লাল এবং অধ্যাপক হ্যামিল্টনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবার কথা নাই। এবং ইহাও নিশ্চিত যে নিয়োগের পূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত স্যর আশুতোষের পরিচয় ছিল না। কিন্তু ঐ দুইজন অধ্যাপকের নিকট যে কাজ পাওয়া যায় নাই তাহা সকলেই জানেন। ডাক্তার কুলিস, ডাক্তার ষ্টিফেন, ডাক্তার তারাপুরওয়ালা এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রভৃতি স্যর আশুতোষের জানাশুনা যে-সকল লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট কাজ পাওয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা পণ্ডিত ভারতবর্ষে বড় বেশী নাই। এবং বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়েও তরুণ কৃতী ছাত্রেরাই বহি রচনা করিয়া বা গবেষণা দ্বারা খ্যাতিলাভের পূর্ব্বেই সাধারণ শিক্ষক বা fellow নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এ দেশের কাগজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককেই অধ্যাপক বলা হয় কেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানেন না এবং তাহার জন্য তাঁহারা দায়ীও নহেন। কিন্তু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদের প্রতি বড়ই অবিচার করা হয়। তাঁহারা fellowর কাজ করেন; fellowদিগের বৃত্তি এখানকার lecturerদের বেতন হইতে কিছু কম হইতে পারে,কিন্তু তাঁহাদের মোট আয় এখানকার শিক্ষকের মোট আয় অপেক্ষা কম নহে, কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবার জন্য তাঁহারা ছাত্রগণের নিকট হইতে স্বতন্ত্র পারিতোষিক পাইয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ lecturerএর পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেন না, জানাশুনা তরুণ কৃতী ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করেন। কথা থাকে যে ইঁহারা অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক গবেষণাও করিবেন। এই নীতির ফল যে খারাপ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। অনেক তরুণ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে গবেষণা করিয়াই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার, গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, বেণীমাধব বড়ুয়া, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জ্জি, সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। অপর অধ্যাপকেরাও যে অলসভাবে বসিয়া নাই তাহার প্রমাণ রামানন্দ-বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিভাগের পত্রিকা দুইখানিতে পাইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নীতির ফল মন্দ হয় নাই। রামানন্দ বাবু যে ভাবে যোগ্যতমের নির্ব্বাচন করিতে বলিয়াছেন, তাহার ফল যে এতদপেক্ষা ভাল হইত তাহা মনে করিবার কোন বলবত্তর কারণ নাই। কারণ, উপরিলিখিত শিক্ষকেরা সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, অথচ যাঁহারা ইঁহাদের উপর হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলে ইঁহাদের ন্যায় অধ্যয়নানুরাগ এবং গবেষণার পরিচয় দিতে পারেন নাই। নাম করা সঙ্গত নহে। বিজ্ঞাপন দিয়া লোক লইতে হইলে কেবল পরীক্ষার ফলের উপরই নির্ভর করিতে হয়। অথচ নিত্য চক্ষুর সাম্‌নে দেখিতেছি বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী এবং সেই হিসাবে খ্যাতনামা, মোটা মাহিনার সরকারী এবং বেসরকারী কলেজের অনেক অধ্যাপক অধ্যাপনায় অথবা গবেষণায় যশস্বী হইতে পারেন নাই। পণ্ডিতের সংখ্যা যে এদেশে বেশী নাই, তাহা রামানন্দ-বাবু ভাল করিয়াই জানেন এবং স্যর আশুতোষ সেই অভাব বিশেষ ভাবে পূরণ করিবার চেষ্টাই করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের প্রাচুর্য্যও নাই। তাই তিনি যাহাদের সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না বিজ্ঞাপন দিয়া, এমন-সকল ভাল ছাত্রকে যদি ডাকিয়া আনিতে না চাহেন তবে তাঁহাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় কি?

আমার কথা।

সমালোচক স্বীকার করিতেছেন যে "নূতন পদটির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই"। তাহার পর কোন্ শ্রেণীর শিক্ষাদাতা কিরূপে নিযুক্ত হন, তিনি তাহা বলিয়াছেন। আশু-বাবুর জানাশুনা লোকেরা ভাল অধ্যাপক হইয়াছেন, যাহারা নিয়োগের পূর্ব্বে তাঁহার অজানা ছিল এমন দুজন ভাল অধ্যাপক হন নাই, তাহাও বলিয়াছেন। এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যে, যাঁহারা ভাল অধ্যাপক হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই বা অধিকাংশই আশুবাবুর জানাশুনা ছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহার অজানা ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই বা অধিকাংশ অধ্যাপনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা কি সমালোচক বিশেষ করিয়া সংবাদ লইয়া লিখিতেছেন? না, অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছেন? কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে এত বড় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়।

"খ্যাতনামা পণ্ডিত ভারতবর্ষে বড় বেশী নাই" ইহা সত্য; কিন্তু যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও সকলের সেবা পাইবার চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় করেন নাই, তাহার দৃষ্টান্ত

দেওয়া কঠিন নহে। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল, নৃতত্ত্বে সুপণ্ডিত এবং গবেষণা দ্বারা এ বিষয়ে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি এই জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। নৃতত্ত্বে সুপণ্ডিত সার্ এড্‌ওয়ার্ড গেটের মতে,

"The Rai Bahadur knows far more of the subject than anyone else in the province, and, if I may say so, than any one else in India .He is not only extremely well read in the literature of the subject, which he has studied for years past, but has a very intimate personal knowledge of many Chota-Nagpur tribes, and his admirable monographs on the Mundas and Oraons are among the best works of the kind that I know."

এই মত গেট সাহেব ৫ই জানুয়ারী পাটনায় একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন। তাহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। শরৎবাবু স্বদেশের ও বিদেশের অনেক বিদ্বৎসভার পত্রিকায় অনেক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। হ্যাডন, রিভ্‌ওয়ে, ফ্রেজার, প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ, এবং টাইম্‌স্, স্পেক্টেটর প্রভৃতি বিলাতী কাগজ তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। Encyclopaedia of Religion and Ethicsএ তাঁহার গবেষণা প্রশংসিত ও উল্লিখিত, এবং উহার ওরাওঁ ও মুণ্ডাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে। শরৎবাবু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে "রীডার" রূপে বক্তৃতা দিয়াছেন। কলিকাতা এখনও তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এখানে তাঁহার নৃতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা বা অধ্যাপনার কোন ব্যবস্থা ত হয়ই নাই, এমন কি তাঁহার বহুপ্রশংসিত উৎকৃষ্ট বহিগুলিও নৃতত্ত্বের কোর্সের অন্তর্ভূত হয় নাই। ইহার কারণ,বোধ হয় তিনি আশু-বাবুর "জানাশুনা" লোক নন। বিজ্ঞাপন দিলে হয় ত তাঁহাকে পাওয়া যাইত। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ কৃতী ছাত্রেরা ফেলো নিযুক্ত হন বটে, কিন্তু নিয়োগকর্ত্তা ঐ ছাত্রদের কলেজের শিক্ষাদাতারাই; কারণ তাঁহারাই ছাত্রদের প্রতিভা ও কৃতিত্বের কথা ভাল করিয়া জানেন। এখানে তরুণ ছাত্রদিগকে নির্ব্বাচন করেন আশু-বাবু, যিনি তাঁহাদিগকে একদিনও পড়ান নাই। এই প্রভেদটা সমালোচক মনে রাখেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "জানাশুনা তরুণ কৃতী ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করেন", কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি, কাহার জানাশুনা? সমালোচক আগেই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন "স্যার আশুতোষের জানাশুনা"। তাঁহার "জানাশুনা"র মানে এবং বিলাতের ফেলো-নির্ব্বাচক অধ্যাপকদের জানাশুনার মানে এক নহে।

"অনেক তরুণ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে গবেষণা করিয়াই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন," সত্য কথা; কিন্তু ইহা আমাকে শুনাইবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমি নূতন পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রণালীর এই প্রশংসার কথা বহুপূর্ব্বে আমার দুখানা কাগজে একাধিক বার লিখিয়াছি। কিন্তু শুধু কৃতীদের নাম করিলেই ভুল ধারণা জন্মান হয়। অকৃতীদেরও তালিকা পাইলে তবে ঠিক্ ধারণা হয়। আশুবাবুর নির্ব্বাচিত তরুণ শিক্ষকদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত গবেষণাতে, এবং অধ্যাপনায়, কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা স্থির করিবার মত উপকরণ আমার নিকট নাই; সমালোচক মহাশয়ের নিকট ছিল বা আছে কিনা জানি না। বিজ্ঞানে এবং আর্টসে যাঁহারা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা দেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৯১৩ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত কে কি প্রবন্ধ, ছাত্রপাঠ্য পুস্তক, এবং ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের টীকাটিপ্পনীযুক্ত সংস্করণ, রচনা ও প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে। সমুদয় ছাত্রপাঠ্য পুস্তক গবেষণা নহে, কোন-কোনটি বটে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। টীকাটিপ্পনীও সাধারণতঃ গবেষণা নহে। এ সব বাদ দিলে দেখা যায়, যে মোট ৪৫জন প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে নানা বাংলা মাসিক পত্রের প্রবন্ধও আছে, যাহার অধিকাংশ গবেষণা-নামের যোগ্য নহে। যাহা হউক, ঐ সকল প্রবন্ধ যখন পড়ি নাই, তখন কোনটিকে বাদ দিব না। (১৯১৭ সালের ক্যালেণ্ডার অনুসারে) মোট শিক্ষক ১৬৬জনের মধ্যে, ৪৫জন এইরূপ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। এই ৪৫ এর মধ্যে ১১জন প্রেসিডেন্সী কলেজের এবং ৩ জন সংস্কৃত কলেজের লোক। বাকী থাকেন ৩১। তন্মধ্যে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও আছেন। তিনি আশু-বাবুর চেয়ে বয়সে বড় এবং বিজ্ঞান কলেজে নিযুক্ত হইবার আগেই গবেষণা দ্বারা কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। গণেশ-প্রসাদও আছেন, তিনিও তরুণবয়স্ক নহেন। আরও অনেকে আছেন যাঁহারা তরুণও নহেন, এবং যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, আশু বাবুর নির্ব্বাচনের গুণ এবং উৎকর্ষ কতটা। আমি তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব না। এই তো গেল গবেষণার কথা। অধ্যাপনায় কৃতিত্ব কাহাদের হইয়াছে, তাহা আমার জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু আমি আশু-বাবুরই নির্ব্বাচিত ফাঁকি-দার বা অকৃতী কোন কোন অধ্যাপকের অখ্যাতির বিষয় শুনিয়াছি। তাহা সত্য হইতে পারে, নাও হইতে পারে।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, "বর্ত্তমান নীতির ফল মন্দ হয় নাই," ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না, অস্বীকার করিতেও পারি না। "রামানন্দ-বাবু যে ভাবে যোগ্যতমের

নির্ব্বাচন করিতে বলিয়াছেন, তাহার ফল যে এতদপেক্ষা ভাল হইত তাহা মনে করিবার কোন বলবত্তর কারণ নাই।" তাহার ফল যে এতদপেক্ষা মন্দ হইত, তাহা মনে করিবারই বা কি কারণ আছে? অধ্যাপকদের চরিত্রের, ছাত্রদের চরিত্রের, ও দেশবাসীদের চরিত্রের উপর প্রভাব, আমার সমর্থিত নীতির ফল স্বরূপ, যে এখন অপেক্ষা ভাল হইত, আমার ইহাই বিশ্বাস। ব্যক্তি-বিশেষের নেকনজর (তা ভাল বা মন্দ, যে কারণেই হউক) যাঁহাদের পদপ্রাপ্তির কারণ, তাঁহারা আপনা-দিগকে অনুগৃহীত বলিয়া মনে মনে অনুভব করিবেনই, এবং তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীনচিত্ততার হানি হইবেই। এই-প্রকার অনুগৃহীত লোকদের চেয়ে, আমার সমর্থিত প্রকাশ্য উপায়ে নির্ব্বাচিত লোকদের অধিকতর স্বাধীনচিত্ত হইবার সম্ভাবনা, এবং তদ্রূপ লোকদের প্রতি ছাত্রদের ও দেশবাসীদের অধিকতর শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা। শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্যতা বৃদ্ধির দ্বারা, শ্রদ্ধার যোগ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা, এবং বহু শ্রদ্ধেয় লোককে শ্রদ্ধা করিয়া, জাতি বড় হয়। আমি বলিতেছি না, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অশ্রদ্ধেয়; তাঁহাদের মধ্যে অনেক শ্রদ্ধেয় লোককে আমি জানি, আমার অজানাও অনেক শ্রদ্ধেয় লোক আছেন। কিন্তু ইহা আমি বলিতেছি, যে, তাঁহারা আমার সমর্থিত উপায়ে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইত, তাঁহারাও অধিকতর তেজস্বী হইতেন, এবং ছাত্রেরা ও দেশবাসীরা আরো শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপকৃত হইত। আমার মন্তব্য ব্যক্তিবিশেষের বা প্রত্যেকের প্রতি প্রযোজ্য, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন; মোটের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়। এসব কথা লিখিতে আমার ক্লেশ বোধ হইতেছে। কিন্তু নিরুপায় হইয়া লিখিলাম।

যখন সিভিলিয়ানরা হেলীবেরী কলেজে শিক্ষা পাইয়া মনোনীত হইয়া এদেশে চাকরী করিতে আসিতেন, তখনও কর্ম্মিষ্ঠ, কার্য্যক্ষম সিভিলিয়ান অনেকে হইতেন। তথাপি, প্রতিযোগিতা-প্রথা কেন প্রবর্ত্তিত হইল, সমালোচক মহাশয়কে ভাবিয়া দেখিতে বলি। প্রতিযোগিতা দ্বারা ডেপুটী নিয়োগ যখন হইত না তখন, এবং প্রতিযোগিতা-প্রথা রদ হইবার পর এখনও, ভাল ডেপুটী দেখা যাইত ও যায়; তথাপি দেশের লোকেরা প্রতিযোগিতা চায় কেন? আমি প্রতিযোগিতা দ্বারা অধ্যাপক নিয়োগ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু প্রকাশ্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছি। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দিলে অন্ততঃ এমন অনেক যোগ্য লোক দরখাস্ত করিতে পারেন, যাঁহারা কাহারও দরবার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এবিষয়ে আমি আরও বিশদভাবে অনেক কথা লিখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া নিরস্ত হইলাম।

"বিজ্ঞাপন দিয়া লোক লইলে কেবল পরীক্ষার ফলের উপরই নির্ভর করিতে হয়।" "কেবল" নহে, কতকটা তাহা বটে; কিন্তু আবেদনকারীদের শিক্ষাদাতাদিগের মত লইয়া এবং তাঁহাদের লিখিত পুস্তক প্রবন্ধাদি থাকিলে তাহাও বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইতে পারে। কর্ম্মপ্রার্থীদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহাও বিবেচিত হইতে পারে। আশু-বাবুও ত নিযুক্ত ব্যক্তিদের কখন শিক্ষা দেন নাই, অভিভাবকরূপেও তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন ছাড়া কাহারও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নাই। সুতরাং নিয়োগের পূর্ব্বে তিনিই বা, পরীক্ষার ফল, কাহারও কাহারও পরীক্ষার কাগজ, পুস্তক প্রবন্ধাদি, শিক্ষাদাতাদের মত, ইত্যাদি ছাড়া, তাঁহাদের "সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন," এমন কি জানিয়া থাকেন? "যাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন," সকল বা অধিকাংশস্থলে এরূপ লোককেই যদি তিনি নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, আমার পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকা অনুসারে, পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অধিকাংশই কোন গবেষণা বা স্বাধীন চিন্তা করিবার সামর্থ্য দেখাইতে পারেন নাই কেন? অধ্যাপনা সম্বন্ধে অবহেলার বা অকৃতিত্বের অভিযোগ যাঁহাদের বিরুদ্ধে শুনা যায়, তাহা না হয় অমূলক বা প্রমাণশূন্যই মনে করিলাম। হইতে পারে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের তালিকা সঙ্কলিত হইবার পর অধিকাংশ শিক্ষক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ আমার হস্তগত হয় নাই।

সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন, নব-নিযুক্ত তরুণ শিক্ষকদের সঙ্গে "কথা থাকে যে ইঁহারা অধ্যাপনার সঙ্গে-সঙ্গে মৌলিক গবেষণাও করিবেন।" জিজ্ঞাসা করি, অনাথ বাবু কি বিদ্যাবিশেষের অনুশীলনে ও গবেষণায় একাগ্রচিত্ত একনিষ্ঠ এই জাতীয় তরুণ শিক্ষক? তিনি শবব্যবচ্ছেদ শিখাইবেন, সহযোগীদের কাছে নৃতত্ত্ব ক খ হইতে শিখিবেন, মেডিক্যাল-এডভাইসারী করিবেন, চিকিৎসা-ব্যবসাও সম্ভবতঃ করিবেন এবং তাহাতে up-to-date বা ওয়াকিব-হাল থাকিতে চেষ্টা করিবেন। "মৌলিক গবেষণা" কখন্ করিবেন?

সমালোচকের কথা।

(৬) অনাথ-বাবু ডাক্তার, শবব্যবচ্ছেদ তিনি করিয়াছেন। এই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া তাঁহাকে পাশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং অপর পাঁচজন যাহা জানেন না তাহা যে তিনি জানেন তাহা স্থির করা এমন কি কঠিন ব্যাপার তাহা

বুঝিতে পারিলাম না। হয় তো তিনি নৃতত্ত্বের সকল বিষয়ে পণ্ডিত নহেন। কিন্তু সে-সকল বিষয়ে অধ্যাপনাও তিনি করেন না। তিনি ঐ-সকল বিষয়ে তাঁহার সহযোগিগণের নিকট শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, সমস্ত বিষয়ে তৈয়ারী পণ্ডিত শিক্ষক এখনও এদেশে সুলভ হয় নাই। তাই শিখিতে ইচ্ছুক তরুণদিগকেই নিযুক্ত করিতে হয়। রামানন্দ-বাবু কি শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে শিখ্ ও রাজপুত ইতিহাস অধ্যাপনার ভারও এইরূপ দুইজন শিখিতে ইচ্ছুক, ইতিহাসে প্রথম বিভাগে এম্-এ পাশ বুদ্ধিমান যুবকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে? ইঁহাদের কার্য্যের বিচার দুই বৎসর পরে করিলে বোধ হয় তখন তাঁহারা অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না। বলা বাহুল্য এই দুইটি যুবক স্যর আশুতোষের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়।

আমার কথা।

শবব্যবচ্ছেদের জন্য অনাথ-বাবুর নিয়োগের আলোচনা আগে করিয়াছি।

"হয় তো তিনি নৃতত্ত্বের সকল বিষয়ে পণ্ডিত নহেন।" এই "হয় তো" এবং "সকল" কথা দুটিতে আমার আপত্তি জানাইতেছি। সমালোচক বলুন না, খাস্ নৃতত্ত্ব (anthropology proper) বিদ্যার কোন্ বিষয়টি অনাথ-বাবু জানেন এবং সেই জ্ঞানের প্রমাণ কি?

"সহযোগিগণের নিকট শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক" হওয়াটা এক্ষেত্রে প্রকারান্তরে শিক্ষক হইবার যোগ্যতা রূপে উল্লিখিত হইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। যৌবনকালে অনেকে অনেক কিছু শিখিতে ইচ্ছুক থাকেন, কিন্তু সেই ইচ্ছার বলে তত্তৎ বিষয়ের অধ্যাপকতা কোথাও কেহ পান না! অতঃপর সমালোচক বলিতেছেন যে দুজন ইতিহাসের এম্-এ শিখ্ ও রাজপুত ইতিহাস অধ্যাপনার ভার পাইয়াছেন। ইহাতে ত বিস্ময়ের কারণ কিছু দেখিতেছি না। ইঁহারা অন্য অনেক দেশের ও জাতির ইতিহাস জানেন, ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্যে ইতিহাস রচনার প্রণালীও কতকটা জানেন; তাঁহাদিগকে ইতিহাসের এক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অন্য ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু একজন রাসায়নিককে যদি এইকারণে কাব্য ও অলঙ্কার পড়াইতে নিযুক্ত করা যায় যে, তাঁহার কাব্য ও অলঙ্কার শিখিবার ইচ্ছা আছে, তাহা হইলে বিস্ময়কর হয় বটে। অনাথ-বাবুর নিয়োগ এবং ঐতিহাসিক গ্রাজুয়েট দুটির নিয়োগ মোটেই একজাতীয় নহে।

সমালোচকের কথা।

(৭) সপ্তম প্রশ্নের উত্তর কতকটা রামানন্দ-বাবু নিজেই দিয়াছেন এবং কতকটা অপরাপর প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে দিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই হইবে যে 'আশু-বাবুর জামাতা' হওয়া খুব গুরুতর অপরাধ নহে এবং যোগ্যতা থাকিলে ঐ অপরাধের জন্যই কাহাকেও কোন পদ না দেওয়া সঙ্গত নহে।

আমার কথা।

"আশু-বাবুর জামাতা হওয়া" নিশ্চয়ই অপরাধ নহে; আবেদনকারী অন্যদের চেয়ে যোগ্যতা থাকিলে তাঁহার কাজ পাওয়াতেও বাধা নাই। কিন্তু জামাতা হওয়া একটা additional qualification নহে; সমালোচক তাহাও স্মরণ রাখিবেন। ইহাও স্মরণ রাখিবার যোগ্য, যে, যদি কেহ সার্ব্বজনিক (public) কোন কাজ বা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যতঃ বা নামতঃ কর্ত্তৃপক্ষ হন, এবং যদি তিনি like Caesar's wife above suspicion হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়দিগের স্ব ইচ্ছায় ইহাই মনে করা উচিত যে, তাঁহারা কর্ত্তার সম্পর্কীয় বলিয়াই disqualified। ইহাই উচ্চতম আদর্শ। কিন্তু যদি এই আত্মীয়দিগকে ঐ প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিয়োগ-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং তাঁহাদের অধিকতর যোগ্যতার প্রমাণ অন্যদের অপেক্ষা সন্তোষজনক হওয়া চাই।

সমালোচকের কথা।

রামানন্দ-বাবুর তৃতীয় অভিযোগ যে স্বভাবতঃই আশু-বাবু, পরে কাউন্সিলের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির মঞ্জুরী পাইবার পূর্ব্বানুভূতি বলে (১) বাহ্যপরীক্ষক নিযুক্ত করেন, (২) পরীক্ষক-বোর্ড নিযুক্ত করেন এবং ইহাও জানা কথা যে অধ্যাপক নিয়োগও তিনি এই প্রকারে করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে যাঁহারা যে-বিষয়ের শিক্ষক, তাঁহারা সেই বিষয়ের পরীক্ষক হইবেন এবং বাহির হইতে অপর কয়েকজনকে পরীক্ষক করা হইবে। ইচ্ছা করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি এবং কাউন্সিল স্যর আশুতোষের নিয়োগ নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে এরূপ ভাবে যে কমিটির নির্দ্ধারণের অপেক্ষা না করিয়া দুই একটি কার্য্য না করিলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না তাহা সকলেই জানেন। কার্য্যকরী সমিতি এবং কাউন্সিলের সভ্যগণ স্যর আশুতোষের নির্ব্বাচিত বাহ্য পরীক্ষকগণকে অযোগ্য বিবেচনা করেন নাই (অপর পরীক্ষকেরা আইনের বলেই পরীক্ষক হইবার দাবী করিতে পারেন) বলিয়াই কি তাঁহারা স্বতন্ত্রব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা ও সম্মানবোধ বিসর্জ্জন দিয়াছেন মনে করিতে হইবে?

অধ্যাপকনিয়োগের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন বিষয়ের অধ্যাপক প্রথম সেই বিষয়ের বোর্ড দ্বারা নির্ব্বাচিত

হন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও কাউন্সিল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে সিনেটে পাঠান হয়, সিনেটের অনুমোদন পাইলেও পাকা হয় না, কারণ তখনও ভারত-গভর্ণমেণ্ট ঐ নিয়োগ নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

আমার কথা।

সমালোচক মহাশয় অবশ্যই লেফাফা-দুরুস্ত্ কথাটার সহিত পরিচিত আছেন। পরীক্ষক অধ্যাপক আদি নিয়োগের প্রণালীও লেফাফা-দুরুস্ত্ হইতে পারে, অর্থাৎ কাগজে কলমে কিছু ধরিবার যো থাকে না। "ধরি মাছ না ছুঁই পানী" প্রবাদবাক্যও সমালোচক মহাশয়ের নিশ্চয় জানা আছে। সমালোচকের মতে অধ্যাপক নির্ব্বাচন প্রথমতঃ বোর্ডগুলি করেন। কিন্তু ১৯১৯এর সীণ্ডিকেটের রিপোর্টে দেখিলাম, আঠারটি বোর্ডের মধ্যে ১৩টির সভাপতি আশু-বাবু (আর্ট্‌সের সব বোর্ডগুলিরই সভাপতি তিনি, বিজ্ঞানের ৭টি বোর্ডের মধ্যে দুটির সভাপতি তিনি)। তাহার পর, সমালোচকের উল্লিখিত দুটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি আশু-বাবু; তাঁহার উল্লিখিত কৌন্সিল দুটিরও সভাপতি তিনি।—অথবা এত খুঁটিনাটির বিচারে প্রয়োজন কি? সমালোচক ত নিজেই আগে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে শিক্ষাদাতাদের নিয়োগ আশু-বাবুই কার্য্যতঃ করেন, এবং ইহা আমরাও জানি। সমালোচক পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন,

"তাই তিনি ['আশু-বাবু'] যাহাদের সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, বিজ্ঞাপন দিয়া এমন সকল ভাল ছাত্রকে যদি ডাকিয়া আনিতে না চাহেন, তবে তাঁহাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় কি?" "...প্রভৃতি স্যার আশুতোষের জানাশুনা যে-সকল লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট কাজ পাওয়া গিয়াছে।"

সমালোচক বলেন "সময়ে সময়ে" কমিটির নির্দ্ধারণের অপেক্ষা না করিয়া আশু-বাবু দুই একটি কার্য্য না করিলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি "সময়ে সময়ে" ইহা করেন, না, ইহাই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতিতে দাঁড়াইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় মিনিট্-আদি পাইলে আমি তাহা দেখাইতে পারিতাম। কেবলমাত্র যে একটি দিনের কার্য্যবিবরণ আমার হাতে পড়িয়াছিল তাহাতে নির্ব্বাহিত এইরূপ তিনটি কাজের মধ্যে তিনটিই আশু-বাবু in anticipation করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেখাইয়াছি।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের নাকচ করার কথা না তুলিলেই ভাল হইত। কারণ, রাজনৈতিক কারণ না থাকিলে তাঁহারা detailsএ হস্তক্ষেপ করা উচিত মনে করেন না।

সমালোচকের কথা।

ডাক্তার নিয়োগের প্রশ্নের উত্তর সিনেটের ও সিণ্ডিকেটের লোকেরা দিবেন। তবে ঐ নির্ব্বাচন করিবার যোগ্যতা যে স্যর নীলরতন সরকার ও ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। রামানন্দ-বাবুর ভাষাতেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে, তিনি কি সব-জান্তা যে মেডিক্যাল এড্‌ভাইসারের নির্ব্বাচনেও স্যর নীলরতন এবং ডাক্তার ব্রহ্মচারীর মত অপেক্ষা তাঁহার মতের মূল্য অধিক হইবে? স্যর নীলরতনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি এমন কি ক্রটী আবিষ্কার করিয়াছেন যে তিনি স্যর আশুতোষের হস্তের ক্রীড়নক মাত্র এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া রামানন্দ-বাবু তাঁহাকে অপমান করিতে সাহস করেন?

আমার কথা।

মেডিক্যাল এড্‌ভাইসারের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কি না, সমালোচক বলেন নাই।

ডাক্তার নির্ব্বাচন করিবার যোগ্যতা নীলরতন-বাবুর আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি নাই, ও করি না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নির্ব্বাচন ঠিক না হইতে পারে। কেবলমাত্র যোগ্যতার অভাবেই যে মানুষের কাজে খুঁত থাকে তাহা নয়। বিশেষজ্ঞেরা অভ্রান্ত নহেন। তাঁদেরও ভুল হয়। অযোগ্যতা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রাশয়তা, প্রভৃতি না থাকিলেও ভ্রম হইতে পারে।

মেডিক্যাল এড্‌ভাইসার নির্ব্বাচনে আমার মতের মূল্য যশস্বী ও সুদক্ষ ডাক্তারের মতের মূল্য অপেক্ষা বেশী, ইহা আমি মনে করি না। কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাচন যে ঠিক্ হইবেই ইহাও মনে করি না। কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞদের মত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় না; বিশেষতঃ যেখানে expert knowledgeএর প্রয়োজন হয় না। আমরা কোনকালে যুদ্ধ দেখি নাই, করি নাই; অথচ বড় বড় সেনাপতির strategyর সমালোচনা করি। আমরা কেহ শেক্‌স্পীয়রের মত কবি নহি, অথচ তাঁহার সমালোচনা করি; বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের মত রাজনীতিজ্ঞ নহি, অথচ তাঁহাদের কাজের সমালোচনা করি;—নূতন বড়লাট নিযুক্ত হইলে সেই নির্ব্বাচনের নিন্দা প্রশংসা হইবে; বেণ্ট্‌লী সাহেবকে স্বাস্থ্য কমিশনারের পদ হইতে অপসৃত করিবার গুজবের বিরুদ্ধে অনেক কাগজে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাঁহাকে অপসৃত করিতে হইলে বাংলা গভর্ণমেণ্ট চিকিৎসা-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীর পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন, কিন্তু কাগজের সম্পাদকেরা কেহ চিকিৎসক নহেন।

গৃহস্থদের বাড়ীতে পীড়া হইলে তাহারা সচরাচর নিজনিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারেই ডাক্তার ডাকিয়া থাকে, এই

ডাক্তার নির্ব্বাচনের জন্য তাহারা সচরাচর সব্-জান্তা হওয়া আবশ্যক মনে করে না। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এবং অন্য অনেক ছোট বড় মিউনিসিপালিটীর কমিশনরেরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন; এই নির্ব্বাচনে যে সর্ব্বস্থলে ডাক্তারদের মতই বজায় থাকে তাহা নয়, এবং কমিশনরদেরও অধিকাংশ বা সকলে ডাক্তার নহেন। এই-রকম নির্ব্বাচনে চিকিৎসা-বিদ্যার expert knowledge একান্ত আবশ্যক নহে। চিকিৎসা-বিষয়ে আমি নীলরতন-বাবুর কেন, ক্যাম্বেল স্কুলের নূতনতম পাস্-করা ছাত্রের চেয়েও অনভিজ্ঞ। কিন্তু তা বলিয়া, মেডিক্যাল এড্ভাইসারের পদের জন্য দরখাস্ত-কারীদের তালিকা দেখিতে চাহিবার এবং নির্ব্বাচন ঠিক্ হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার আমার নাই, ইহা বিনয় ও দীনতার খাতিরেও আমি স্বীকার করি না। নীলরতন-বাবুর বা অন্য কাহারও অপমান করা আমার অভিপ্রেত নহে; কাহারও সমালোচনা করিলেই তাঁহার অপমান করা হয় না। কিন্তু আমাকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক অপ্রিয় কার্য্য করিতে হয়, এবং ভুলও আমার অনেক হয়। তথাপি আমি ইহা স্বীকার করি না, যে, আমি কাহাকেও অপমানিত করিবার বা কাহারও উপর ঝাল ঝাড়িবার উদ্দেশ্যে কলম চালাইয়া থাকি।

১৯১৯ সালের সীণ্ডিকেটের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে এবং ঐ সালের ৫ই জুলাইয়ের প্রিন্সিপ্যালদের কন্‌ফারেন্সে ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতা হইতে জানিতে পারা যায়, যে, স্বাস্থ্যপরামর্শদাতার নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবার জন্য ১৯১৯ সালের জুন মাসে নীলরতন-বাবু, আশু-বাবু ও উপেন্দ্র-বাবু —এই তিন সভ্যকে লইয়া এক কমিটি নিযুক্ত হয়। লক্ষ্য করুন, যে, আশু-বাবুও এই কমিটিতে ছিলেন; ইহা সকলে জানেন না। তাঁহাদের কাজ ছিল, "to consider and report on the applications submitted by the candidates for the post"; ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, ঐ পদের জন্য আবেদন পাইবার নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দিবার এবং বহু প্রার্থী থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং পদপ্রার্থীদের তালিকা দেখিতে কৌতূহল প্রকাশে আমার কি অন্যায় হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। অনাথ-বাবু যে অযোগ্য ইহা তো বলি নাই, বলিয়াছি, "যে-কোন এম-বি কিম্বা এল্-এম্-এস্ যোগ্য। কিন্তু যোগ্যতমের নিয়োগ হওয়া চাই"। জানি, যোগ্যতম স্থির করা কঠিন; কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার চেষ্টাও হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার অধিকার সাধারণের আছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর খাদ্য-ইন্‌স্পেক্টরেরা ১৫০৲ হইতে ২০০৲ এবং স্বাস্থ্যইন্‌স্পেক্টরেরা (ক) ১৫০৲ হইতে ২৫০৲ ও (খ) ১৫০৲ হইতে ২০০৲ বেতন পান; কেহ ভ্রমণ-ব্যয়, যান-ব্যয়, বা যান পান না। ইহাঁরাও ডাক্তার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেসের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সুধানাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল্ মাত্র ৫০ টাকা ভ্রমণ-ব্যয় পান, ১২৫৲ ভাতা ও মোটরকার পান নাই; যদিও ইনিও অনাথ-বাবুর মত সম্ভ্রান্ত লোক, কারণ ইনি আশু-বাবুর ভায়েরা-ভাইয়ের জামাতা। এই-সমস্ত বিবেচনা করিলে অনাথ-বাবুকে মোটর-কার ও ১২৫৲ করিয়া ভাতা দেওয়ার সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নও, আশা করি, অন্যায় মনে হইবে না।

অনাথ-বাবুকে নৃতত্ত্বের অন্যতম শিক্ষক নিয়োগের জন্য নীলরতন-বাবু দায়ী নহেন। কিন্তু তিনি যে-কাজের জন্য আংশিকভাবে দায়ী আমরা তাহার খুঁত ধরিতেছি বলিয়া, যে-কোন সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা-কিছু লিখিতেছে বা লিখিবে কিম্বা তাঁহার বিরুদ্ধে লোকমুখে যে-কোন গুজব রটিবে, তাহাই আমাদের অভিপ্রেত বা তাহাতেই আমাদের সায় আছে, ইহা সত্য নহে। শুনিলাম, এইরূপ একটা কথা রটিয়াছে যে তিনি ভাইস্‌চ্যান্সেলার হইয়া নিজের জামাতার বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আরও শুনিলাম (কারণ আমি নিজে দেখি নাই), কোন কাগজে এইরূপ ভাবের কথা লেখা হইয়াছে, যে, তিনি পুনর্নিয়োগদ্বারা নিজের জামাতা দেবেন্দ্রমোহন বসুর চাকরী বজায় রাখিবার জন্য আশু-বাবুর জামাতার চাকরী প্রাপ্তির সাহায্য করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। আমি শুধু আমার এই মত প্রকাশ করিলেই লোকে তাহা সত্য বলিয়া না মানিতে পারে। এই জন্য, কারণও বলি। দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৯১৪ সালে সাত বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তিনি নীলরতন-বাবুর জামাতা হন নাই। তিনি অতি যোগ্য লোক। তাঁহার নিয়োগের সময় আমরা ১৯২০ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীতে (পৃঃ ৫৫৩) লিখিয়াছিলাম—

"শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বী-এস্‌সী পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে ও রসায়নে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পান, তৎপরে গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত গবেষণা-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কেম্ব্রিজ গিয়া তত্রত্য বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরীতে অধ্যাপক সার্ জে, জে, টমসনের অধীনে গবেষণা করেন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বী-এস্‌সী পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বৎসর কেবল আর-একজন ছাত্র ঐ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা পাইয়া দেবেন্দ্রমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে জার্ম্মনীতে ছয় বৎসর বিজ্ঞান অনুশীলন করেন এবং গবেষণার দ্বারা বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পীএইচ্-ডী উপাধি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এখন তাঁহার যোগ্যতা পদপ্রাপ্তির সময়ের যোগ্যতা অপেক্ষা বাড়ে নাই, কমিয়াছে, ইহা বাতুলে মনে

করিতে পাবে, অন্যে নহে। জার্মেনী হইতে ফিরিবার পর তিনি নীলরতন-বাবুর জামাতা হইয়াছেন। তিনি যে-সময়ে প্রথম চাকরী পান, সেই সময়ে ডাঃ এস্, সী, আগরকরও ৭ বৎসরের জন্য উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আগামী ১৯২১ সালে উভয়েরই চাকরীর প্রথম মিয়াদ শেষ হইবে। উভয়কেই সীণ্ডিকেট একই দিনে আরও ৭ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে সুপারিস্ করিয়াছেন। ডাঃ আগরকর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রভাবশালী লোকের জামাতা নহেন, কিন্তু তাঁহার পুনর্নিয়োগ হইল; অথচ দেবেন্দ্রমোহনের সুযোগ্যতা সত্ত্বেও, যোগ্যতাবৃদ্ধি সত্ত্বেও, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে তাঁহার চাকরী বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় কাজ করিতে হইবে, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে প্রতিভাশালী সুযোগ্য যুবক ছয় বৎসর পূর্ব্বে নিজের যোগ্যতার দ্বারা অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হন, তাঁহাকে, যোগ্যতাবৃদ্ধির পর, পুনর্নিয়োগ দ্বারা ঐ কাজটি রাখিবার জন্য শ্বশুরের প্রভাবের উপর নির্ভর করিতে হইবে, এরূপ কথা যে কতদূর অযৌক্তিক, তাহা বুঝাইতে অধিকতর চেষ্টা করিয়া পাঠকদের বুদ্ধির অবমাননা করিব না।

নীলরতন-বাবু কাহারও হাতের ক্রীড়নক ইহা আমি বলি নাই; এরূপ ইঙ্গিত করাও আমার অভিপ্রেত ছিল না; যদিও ইহা স্বীকার করি, যে, অনেক সময় লেখকের অনভিপ্রেত ইঙ্গিতও তাঁহার লেখা হইতে বাহির করা যায়। কিন্তু একজন আর-একজনকে হাতিয়ার (tool) বা ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করিয়াছে বলিলেও সব স্থলে শেষোক্ত ব্যক্তির অপমান করা হয় না। কেবল ইহাই বলা হয় যে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত চতুর, কৌশলী বা খেলোয়াড় নহেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মিসেস্ বেসাণ্ট লিখিয়াছিলেন, লোকমান্য টিলক মহাত্মা গান্ধীকে ও তাঁহাকে (মিসেস্ বেসাণ্টকে) হাতিয়ার (tool) বা ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ বলার অভিপ্রায় ছিল, লোকমান্য টিলককে ধূর্ত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা, মহাত্মা গান্ধীকে বা নিজেকে অপমান করা নহে।

নীলরতনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাসভায় যাইতে ইচ্ছুক। শুনিতেছি, প্রবাসীর লেখা তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। তজ্জন্য, আমার মতের মূল্য যাহাই হউক, পরিষ্কার ভাষায় আমার বলা দরকার যে আমি, আর যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইতে চান, তাঁহাদিগকে নীলরতন-বাবু অপেক্ষা ঐ কাজের যোগ্য মনে করি না। তিনি তাঁহার কন্‌ভোকেশ্যনের দুটি অভিভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সে-বিষয়ে আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে আমার মন্তব্য লিখিয়াছি।

সমালোচকের কথা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর আশুতোষের যে অপ্রতিহত প্রভাব আছে তাহার কারণ তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন; তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম মৌলিক গবেষণা না করিতে পারেন, কিন্তু মৌলিক-গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কার্য্যের অঙ্গ হিসাবে প্রবর্ত্তন তিনিই এদেশে প্রথম করিয়াছেন; সেই আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিকট ঋণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি কি এবং কতটুকু করিয়াছেন তাহার বিচার আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যে তাঁহার বুদ্ধি, যোগ্যতার এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের লোকদিগেরও যথেষ্ট আস্থা আছে তাহার প্রমাণ রামানন্দ-বাবুই সংগ্রহ করিয়া "বেতালের বৈঠকে" ছাপিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরাও তাঁহার প্রতি ঐরূপই আস্থাবান, তাঁহারা মনে করেন যে ভারতসরকারের বিষদৃষ্টি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ রক্ষা এবং কর্ত্তব্য পালন একমাত্র তাঁহার নেতৃত্বেই সম্ভব। সুতরাং তাঁহারা অণুবীক্ষণ লইয়া স্যর আশুতোষের দোষ ত্রুটী অনুসন্ধানই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভ্যগণ স্যর আশুতোষের সহিত একমত হইতে না পারাই ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধের একমাত্র অপরিহার্য্য লক্ষণ বলিয়া মনে করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে স্যর আশুতোষের সহযোগিতা করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। যখন স্যর আশুতোষ তাঁহাদের আস্থা হারাইবেন অথবা তদপেক্ষা কোন যোগ্যতর ব্যক্তির নেতৃত্ব সুলভ হইবে, তখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে, সিণ্ডিকেটে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলে তাঁহার কোন প্রভাব থাকিবে না। এখন আমাদিগকে এইটুকু মনে করিয়া চলিতে হইবে যে ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র এই একজন ভারতবাসীকেই ভারতসরকার একটু ভয় করিয়া চলেন। স্যর আশুতোষের শত্রুরাও বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না যে আইনজ্ঞানে তেজবাহাদুর সাপ্রু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন।

আমার কথা।

আশু-বাবুর সপক্ষে সমালোচক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্ত ঠিক্ কি না, তাহার বিচার এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমি কেবল ইহাই বলা আবশ্যক মনে করি, যে, আশু-বাবুর শক্তি ও গুণ যাহা আছে, ভাল কাজ যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা আমি অনেকবার করিয়াছি; তাঁহার উপর অপরের অন্যায় আক্রমণের জবাবও আমি

সুযুক্তি সহকারে কয়েকবার দিয়াছি। আমিও তাঁহার "দোষ ত্রুটি অনুসন্ধানই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা" করি না। কিন্তু তাঁহার যত গুণই থাক্, আমার বিবেচনায়, তাঁহার সার্ব্বজনিক কাজে ('public acts') যে-সব দোষ খালি চোখে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ ব্যতিরেকেও, ধরা পড়ে, তাহার সমালোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি তাহা করিতে চেষ্টা করি। সমালোচনা না থাকিলে অতি মহৎ লোকেরও দোষ ত্রুটি ঘটে ও অসংশোধিত থাকিয়া যায়। তাহাতে শুধু তাঁহাদের ক্ষতি কিম্বা তাঁহাদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় না; সমস্ত জাতির ক্ষতি হয়। কারণ মান্যগণ্য লোকদের আদর্শে জাতীয় চরিত্র কতকটা গঠিত হয়।

কাহারো অশেষ গুণ থাকিলেও তাঁহার ত্রুটির নিন্দা হওয়া স্বাভাবিক। মেকলে বলিয়াছেন, "...justice knows nothing of set-off. The greatest desert cannot be pleaded in answer to a charge of the slightest transgression." (*Essay on Clive.*)

সমালোচকের কথা।

রামানন্দ-বাবুকে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। অনাথ-বাবু যেই হউন তাঁহার নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন একস্থলে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, অপর স্থলে স্যর নীলরতন, সেই নিয়োগ সেনেটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে। সেনেটের সকল সভ্যই যে স্যর আশুতোষের "একান্ত বাধ্য ভৃত্য" নহেন তাহা কি রামানন্দ-বাবুর জানা নাই? তবে তিনি বিশেষ করিয়া স্যর আশুতোষের উপরেই ঝাল ঝাড়িতেছেন কেন? তাঁহার পুত্র বা জামাতার যদি যোগ্যতা থাকে তবে কি তাহার জন্য স্যর আশুতোষ দায়ী হইবেন। অপরের পুত্রকন্যার যোগ্যতা সম্বন্ধে ত এরূপ প্রশ্ন ওঠে না। এই ত সেদিন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পাইলেন, তাঁহার বেলায় ত রামানন্দ-বাবু 'যোগ্যতমে'র প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই!

রামানন্দ-বাবুর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি স্যর আশুতোষের ইচ্ছামতই নিযুক্ত হয়। তাঁহার সুলেখিকা কন্যাদ্বয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্ত্রী ও পরীক্ষয়িত্রী। তাঁহাদের যোগ্যতায় কাহারো সন্দেহ নাই। কিন্তু রামানন্দ-বাবুর প্রস্তাবিত 'যোগ্যতমের বাছাই' হিসাবে যদি কেহ এই নিয়োগের বিচার করেন তবে হয় তো তাহাতেও ত্রুটী বাহির হইতে পারে, কারণ অপক্ষপাত বিচারে বাংলা সাহিত্যে কোন্ লেখিকার আসন কত উচ্চে তাহা ত এখনও স্থির হয় নাই। সুতরাং বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা কে তাহা জানা যায় নাই। আসলে রামানন্দ-বাবুও জানেন যে সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতমের নিয়োগ সম্ভব নহে। তাই তিনি তাঁহার কন্যাদের নিয়োগের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। অন্যায় বুঝিলে তিনি যে আপত্তি করিতেনই তাহা বিশ্বাস করিবার মত তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি আস্থা আমাদের আছে। আরও একটি কথা। শুনিতে পাইলাম কিছুদিন হইল রামানন্দ-বাবুর পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকুরীর উমেদার ছিলেন। সত্য কি না জানি না। পিতা যে প্রথা, যে নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন, পুত্র প্রকারান্তরে সেই নীতি ও প্রথার সাহায্যে সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিলে উভয়ের মতের মধ্যে খুবই অসামঞ্জস্য আছে মনে করিতে হইবে। পিতা-পুত্রে রাজনীতি, সমাজনীতি বা ঐ-প্রকারের অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকা অসঙ্গত নহে সত্য, কিন্তু এ অবস্থায় অন্যের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া নিজের আত্মীয় সম্বন্ধে নীরব থাকিলে অন্যলোকের মনে স্বভাবতঃ সন্দেহের উদয় হইতে পারে।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের জনৈক সভ্য।

আমার কথা।

সমালোচক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সেনেটের সকল সভ্যই যে স্যার আশুতোষের 'একান্ত বাধ্য ভৃত্য' নহেন, তাহা কি রামানন্দ-বাবুর জানা নাই?" এই প্রশ্নটাতেই ভুল রহিয়াছে। সেনেটের "সকল" সভ্য উহার কাজে প্রায় যোগ দেন না, ইংরেজ সভ্য (যাঁরা সংখ্যায় প্রায় অর্দ্ধেক) অধিকাংশই উদাসীন (যে-কারণেই হউক)। দেশী সভ্যদের মধ্যে যাঁরা উদাসীন নহেন, তাঁহাদের অধিকাংশ আশু-বাবুর দলভুক্ত (তা যে কারণেই হউক), এইরূপ আমার ধারণা। এই অধিকাংশের কেহ কেহ বা "সর্ব্ব-প্রকারে স্যার আশুতোষের সহযোগিতা করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা" করিতে পারেন, এবং কেহ কেহ বা তাঁহার "একান্ত বাধ্য ভৃত্য"ও হইতে পারেন। ফল একই—অর্থাৎ মোটের উপর প্রায় সব বিষয়ে তাঁহার মতের জয়।

"তবে তিনি বিশেষ করিয়া স্যর আশুতোষের উপরেই ঝাল ঝাড়িতেছেন কেন?" সমালোচক ত নিজেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি নীলরতন-বাবুর অপমান করিয়াছি, এবং অন্য অনেককেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছি। সুতরাং ইহা ত স্বীকৃতই হইয়াছে যে কেবল আশু-বাবুই আমা দ্বারা সমালোচিত হন নাই। "ঝাল ঝাড়া" কথাটিতেও আমি আপত্তি করিতেছি। আমি আমার নিজের বা কোন আত্মীয়ের চাকরী লাভের বা পরীক্ষক হইবার আশায় কখনও তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হই

নাই, সুতরাং বিফলমনোরথও হই নাই। তাঁহার উপর আমার কোন রাগ নাই। আমি ঝাল ঝাড়ি না, সমালোচনা করি। আমার ভাষা কখন কখন তীব্র হয়, সেটা আমার খুব দোষ। ভাষার তীব্রতা পরিহার করিতে চেষ্টা করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য আশু-বাবুর সমালোচনা বেশী হয় এই জন্য, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কর্তৃত্ব, প্রভাব ও কর্ম্মিষ্ঠতা সকলের চেয়ে বেশী। সেই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল-মন্দের জন্য দায়ী তিনি সকলের চেয়ে বেশী। ইহা তাঁহার গৌরবের বিষয়। ঝড় বড় গাছেই বেশী লাগে।

আশু-বাবু তাঁহার পুত্র বা জামাতার যোগ্যতার জন্য "দায়ী" নহেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত বলিয়া, পুত্র ও জামাতার তথায় নিয়োগ যদি একান্ত অনিবার্য্যই হয়, তাহা হইলে লোকহিতার্থ উহার প্রণালী সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়া এবং নিযুক্তদের বিশেষ যোগ্যতা সন্তোষজনক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কারণ, আশু-বাবুর মত বড় কর্ম্মীর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিলে দেশের অমঙ্গল। রামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবী "অযোগ্যা" ছিলেন না; কিন্তু লোকে দশ কথা বলে বলিয়া লোকহিতার্থ উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাকেও তিনি নির্ব্বাসিতা করেন (এখন ইহার ন্যায্যতার বিচার করিতেছি না)। আমার মতে, দেশের বড় বড় কর্ম্মীদের রামচন্দ্রের আদর্শ ও মনোগত অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া, অধ্যাপনা, চিকিৎসা, সব-রকম কাজেরই অন্য বিস্তর ক্ষেত্র আছে। আশু-বাবুর জামাতা পুত্র আদি যদি ত্যাগ স্বীকার করিয়াও অন্যত্র কাজ করেন, তাহাতে তাঁহাদের ও দেশের মঙ্গল হইবে। কাহারো প্রভাবের সাহায্য না লইয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানতেই ত মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহাদের নিয়োগ-প্রণালী ও যোগ্যতার প্রমাণ খুব প্রকাশ্য, নিখুঁত ও সন্তোষজনক হওয়া দরকার। অন্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হইয়াছে, এই সন্দেহে তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি হয় আশু-বাবুর পুত্র বা জামাতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব হইয়াছে এই (সত্য বা মিথ্যা) গুজবে। কারণ, তাঁহার ইহাই আশা করা উচিত, যে, লোকে তাঁহার বিচার খুব উচ্চ আদর্শ অনুসারে কড়া ভাবে করিবে। কেননা, সাধারণ লোকের ব্যবহারে যাহা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, মান্যগণ্য লোকের ব্যবহারে তাহা মার্জ্জনীয় নহে।

"অপরের পুত্রকন্যার যোগ্যতার সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন উঠে না" এই জন্য, যে, হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই "অপর"দের স্থান মোটেই নাই, কিম্বা থাকিলে তাহা আশু-বাবুর মত নহে। তিনিই যে কার্য্যতঃ প্রভু ও নিয়োগকর্ত্তা; সুতরাং নিয়োজিতেরা তাঁহার আত্মীয় হইলে কথা উঠে।

"এই ত সেদিন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পাইলেন, তাঁহার বেলায় ত রামানন্দ-বাবু 'যোগ্যতমে'র প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই!" তাহার কারণ এ বিষয়ের আমি এখনও কিছুই জানি না। পূর্ব্বে সমালোচক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "রামানন্দ-বাবু কি সব-জান্তা?" এখানে কিন্তু তিনি ধরিয়া লইতেছেন যে আমি সব-জান্তা, এবং জানিয়া-শুনিয়াও ব্রজেন্দ্র-বাবুর পুত্রের নিয়োগের সমালোচনা করি নাই। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-বিবরণের কাগজ ক্বচিৎ অকস্মাৎ একআধটা আমার হাতে পড়ে। নিয়মিতরূপে উহা পাইবার দরখাস্ত সেনেট হাউসে করিয়াছিলাম, পাই নাই। যাহার খবর আমি সমালোচক মহাশয়ের প্রতিবাদে প্রথম পড়িলাম, সেই কার্য্যের সমালোচনা কেমন করিয়া পূর্ব্বেই আমি করিয়া চুকিব? বলা বাহুল্য, কাহারও অনুগ্রহ-বশতঃ ব্রজেন্দ্র-বাবুর পুত্রের নিয়োগ হইয়া থাকিলে তাহা ঠিক হয় নাই।

অতঃপর সমালোচক আমার কন্যাদের প্রশ্নকর্ত্রী ও পরিক্ষয়িত্রী হইবার কথা তুলিয়াছেন। ঐ ঐ কাজ করিয়া একজন ষোল টাকা এবং আর-একজন সাড়ে বার টাকা পাইয়াছে, ইহা সত্য কথা। তবে, ইহার জন্য আমাদের কাহাকেও কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হয় নাই। আমার কন্যাদের কথা তুলিয়া সমালোচক কতকগুলি false issues raise করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের কোথাও এরূপ নিয়ম নাই, যে পরীক্ষা করিবার জন্য বা প্রশ্ন করিবার জন্য কোথাও বা পুরুষ কোথাও বা নারী নিযুক্ত হইবেন; উভয় জাতির লোকই সমভাবে নিযুক্ত হইতে পারেন। তাহার পর, এরূপ নিয়মও কোথাও নাই, যে, প্রশ্নকর্ত্তা বা পরীক্ষকের লেখক বা লেখিকা হওয়া দরকার; এরূপ নিয়মও নাই, যে, ঐ কার্য্যে কোন মহিলা নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা হইতে হইবে। আর যে-সব পুরুষ বা মহিলা ঐরূপ কাজে নিযুক্ত হইয়া থাকেন ও হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকা কি না, এ চিন্তাও ত কখনও কাহারও মাথায় আসে নাই। বস্তুতঃ এম্-এর প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষকদের মধ্যে পর্য্যন্ত এমন অনেক লোকের নাম সহজেই করা যায়, যাঁহারা বাংলা ইংরেজী কোন বহিই লেখেন নাই; অন্য পরীক্ষার পুরুষ ও মহিলা পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্ত্তাদের মধ্যেও পারা যায়। অতএব, অন্যান্য পুরুষ-নারীদিগকে তাঁহাদের যেরূপ যোগ্যতা দেখিয়া পরীক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, আমার কন্যাদের তাহা

আছে কিনা, সমালোচকের তাহার বিচার করিবার অধিকার ছিল ও আছে। আর যে-সব প্রশ্ন তিনি তুলিয়াছেন, তাহা এ-প্রসঙ্গে irrelevant এবং নিতান্তই বাজে কথা।

বাস্তবিক কোন্ কাজের জন্য যোগ্যতম যে কে, তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু, তাহা হইলেও সার্ব্বজনিক ব্যাপারে (public affairsএ) আমরা যোগ্যতম লোক নির্ব্বাচন করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য; অর্থাৎ আবেদনকারী বা available লোকদের মধ্যে যোগ্যতম লোক বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য।

সমালোচকের চিন্তায় বোধ হয় আরও একটু গোলযোগ ঘটিয়াছে। একটি কাজের জন্য একজন মাত্র লোককে নিয়োগ করিতে হইলে, অর্থাৎ যেমন anatomy শিখাইবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে, যোগ্যতম ব্যক্তির (অর্থাৎ the one person among the applicants who is the fittest তাঁহার) কথা উঠে; কিন্তু কোন কাজের জন্য বহু ব্যক্তির নিয়োগ আবশ্যক হইলে সকলেই ঐ অর্থে যোগ্যতম হইতে পারে না। তখন average fitness অর্থাৎ গড় যোগ্যতার কথা উঠে, the lowest level of fitness বা যোগ্যতার নিম্নতম সীমার কথা উঠে। পরীক্ষা করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হন বহু ব্যক্তি। ইহাঁদের প্রত্যেকেই "যোগ্যতম" হইতে পারেন না। যে-বৎসর যতগুলি লোক available থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক এক পরীক্ষার এক একটা বিষয়ে যোগ্যতম কতকগুলি লোক থাকিতে পারেন; অপর যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা "যোগ্য" হইলেই হইল। "সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতমের নিয়োগ সম্ভব নহে" এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ আমি আমার "কন্যাদের নিয়োগের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন" করি নাই, ইহা ঠিক নয়। আপত্তি করার কথা আমার মনেই আসে নাই, এই কারণে, যে, আমার ধারণা এই যে আমার কন্যাদের যোগ্যতা পূর্ব্বকথিত "গড় যোগ্যতা" বা "যোগ্যতার নিম্নতম সীমার" নীচে নহে। এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে অপত্যস্নেহের অন্ধতা বশতঃ আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। সেইজন্য, এই ধারণার কারণ কিছু বলিলে, আশা করি, সমালোচক মহাশয় ও পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। আমি সাতিশয় সঙ্কোচ ও অনিচ্ছার সহিত এই-সব কথা লিখিতেছি। আমার কন্যারা একজন with distinction এবং অন্য জন with honours বি-এ পাস্ করিয়াছে। সংস্কৃত তাহাদের দ্বিতীয় ভাষা ছিল। যোগ্য সমালোচকদের দ্বারা তাহাদের গল্প ও উপন্যাসের ত্রুটি প্রদর্শন অপেক্ষা প্রশংসা বেশী হইয়াছে সাহিত্য, ভারতী, প্রতিভা, মানঞ্চ, বামাবোধিনী, প্রভৃতি কাগজে। বিলাতের প্রসিদ্ধতম খবরের কাগজ টাইম্‌সে দুইবার তাহাদের লেখার দোষপ্রদর্শন অপেক্ষা প্রশংসা অধিক হইয়াছে। কেম্ব্রিজের একজন ইংরেজ অধ্যাপক একটি বহি সম্বন্ধে আমাকে চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, উহা "extraordinarily well written"; আর একজন ইংরেজ অধ্যাপক একটি গল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "an excellent story"। রবিবাবুর গল্প ছাড়া অন্যান্য ভাল গল্পের ও উপন্যাসের অনুবাদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া একজন ইংরেজ অধ্যাপককে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার এক কন্যার একটি বহি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ছোট ছোট গল্পের সমষ্টিও ঐ প্রেস ছাপিবেন। তজ্জন্যও প্রথমেই আমার ঐ কন্যার একটি গল্প নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়ের চিঠিগুলি হইতে কোন কোন বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। এই অধ্যাপক মহাশয় রবিবাবুর বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব নহেন, ইনি অন্য লোক।—

"I think Rabi Babu's stories are wonderful; the best must be as good as any short stories ever written." "Your daughters could make a very attractive volume, one which should find English readers..... —is a very powerful and pathetic story, quite by itself for perfection of technique, a story you would not surpass except by the half-dozen best of Rabi Babu's and only just surpass then, by virtue of a slight touch of maturity which should soon come to the author of this story also."

এই তিন জন ইংরেজ অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ না করায় তাঁহাদের নাম করিলাম না; কিন্তু সমালোচক মহাশয় দেখিতে চাহিলে চিঠিগুলি তাঁহাকে দেখাইতে পারি।

ইংরেজী সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে কোন কোন চিঠি বা লেখা সম্বন্ধে এই বলিয়া পরিহাস করা হয় যে, its sting lies in its tail। সমালোচক মহাশয়ের প্রতিবাদটি সম্বন্ধেও ইহা বলা চলে। কিন্তু সুখের বিষয় হুলটি আমার পুত্রকে বা আমাকে বিদ্ধ করিবে না। আমার পুত্র সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে তিনি আর যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহার পণ্ডশ্রম হইয়াছে। আমার পুত্রসম্বন্ধে এই অগৌরবের কথা তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছেন জানি না। ইহার উৎপত্তি যেরূপে হইয়াছে অনুমান হয়, তাহা না বলিলে লোকের মনে একটা খট্‌কা থাকিয়া যাইতে পারে। এই কারণে তাহা বলিতেছি। আমার পুত্র-কন্যাদের কোন কৃতিত্ব থাকিলে তাহার কথা আমি নিজের কাগজ দুটিতে বলি না, কন্যাদের বহিগুলির সমালোচনাও আমার কাগজে করিতে দিই নাই—কি জানি যদি কথা উঠে যে আমি অপত্যস্নেহবশতঃ অত্যুক্তি করিতেছি বা করাইতেছি। কিন্তু এক্ষণে যখন আমার পুত্রের অগৌরবকর একটা

বিবিধ প্রসঙ্গ

লালা লাজপৎ রায়।

লালা লাজপৎ রায়ের স্বদেশভক্তি ও স্বদেশহিতৈষণা যে মৌখিক নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সংস্কারক হইলেই মানুষ কোন না কোন দলের লোকদের

লালা লাজপৎ রায়।

বিরাগভাজন হয়। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারকেরা কেহ বা ভারতীয়দের জন্য বড় চাকরীগুলির ভাগ চান, কেহ বা তদুপরি অল্পস্বল্প স্বায়ত্তশাসন পাইলেই খুসি; কেহ কানাডার মত স্বরাজ্য চান, কেহ বা পূরা স্বাধীনতা না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন না। এই-সমস্ত দলের লোকেরাই ভারতপ্রবাসী ইংরেজ আম্‌লাদের ও ইংরেজ বণিক্‌দের এবং তাঁহাদের স্বদেশী আত্মীয়বন্ধুদের অল্প বা অধিক পরিমাণে অপ্রিয়। এখন লোকের মন কানাডার মত স্বরাজ্য কিম্বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দিকেই ঝুঁকিয়াছে দেখিয়া ইংরেজরা প্রথমোক্ত দুদল ভারতীয় রাজনৈতিকদের পিঠ চাপ্‌ড়াইতেছেন; কারণ তাঁহারা মন্দের ভাল। যাহা হউক, লালা লাজপৎ রায় ইংরেজদের অপ্রিয়; কারণ তিনি কানাডার মত স্বরাজ্য চান। তাঁহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। একবার তিনি বিনাবিচারে বিনাপ্রমাণে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আর একবার স্বইচ্ছায় বিদেশযাত্রা করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় ছয় সাত বৎসর আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিতে পারেন নাই। তিনি কেবল রাজনৈতিক সংস্কারক নহেন। তিনি আর্য্যসমাজের লোক বলিয়া ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের জন্যও প্রভূত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। এইহেতু তিনি "সনাতনপন্থী"দের বিরাগভাজন। আমরা জানি, তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক অনেক মত এখন আর্য্যসমাজের দুইদলের লোকদের মত হইতেই ভিন্ন; তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তিনি আর্য্য-সমাজীদেরও অপ্রিয় হইবেন। যে-মানুষ স্বাধীন

চিন্তা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় স্বদেশী বিদেশী বহুলোকের বিরাগভাজন হইতে সাহসী হন, এবং নির্ব্বাসন ও সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করেন, তাঁহার দেশহিতৈষণা খাঁটি। লালাজী ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ওকালতীতে পসার এবং আয়ও বেশ হয়। কিন্তু তাঁহার নৈতিক আদর্শ ও জীবনের আদর্শের সহিত ওকালতী ব্যবসার সামঞ্জস্য না হওয়ায় তিনি উহা ত্যাগ করেন। যখন ওকালতী করিতেন, তখন বিলাসবিহীন সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে ব্যয় বাদে যত টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহার সমস্তই বহুবৎসর পূর্ব্বেই দান করিয়া ফেলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, লাহোরে যাঁহারা "দয়ানন্দ এংলোবেদিক কলেজ" স্থাপন করেন, লাজপৎ রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহার জন্য তিনি মানসিক শক্তি, সময় ও ধন বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় টাকা সংগ্রহ করিয়া, সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া, অনাথা-লয় খুলিয়া, তিনি বহুসংখ্যক লোকের প্রাণরক্ষা করেন, এবং অনেক পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষা হইতে রক্ষা করেন। পঞ্জাবে ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরি-চালন, এবং নানাবিধ স্বদেশী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসা প্রবর্ত্তনের জন্যও তিনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। এই প্রকারে তাঁহার "তন্, মন, ধন", দেহ মন ও অর্থ, স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে।

তিনি নানা স্বাধীন দেশে বহু বৎসর যাপন করিয়াছেন। আমেরিকার রাজা নাই; যিনি দেশপতি নির্ব্বাচিত হন, তিনি দেশের লোকদেরই সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি ও সেবক। তথাকার লোকেরা তাহাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতাতেও সন্তুষ্ট নহে। এই আমেরিকাতেই অন্য বিদেশ অপেক্ষা লালাজী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় যাপন করিয়াছেন। তা ছাড়া ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল ছিলেন, জাপানেও দীর্ঘকাল ছিলেন। সর্ব্বত্র লোকেরা বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে ও অধিকতর মাত্রায় স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই-সকল দেশে থাকিয়াও কিন্তু লালা লাজপৎ রায় ভুলিয়া যান নাই, যে, আমাদের শেষ লক্ষ্য যাহাই হউক, ভারতবর্ষে এখনই ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, আয়র্ল্যাণ্ডের মত স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা চালান যায় না। তিনি বিপ্লববাদী হইয়া যান নাই। অতি কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য এবার কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহাকে উহার সভাপতি নির্ব্বাচন করা ঠিকই হইয়াছিল। অবশ্য, তাঁহার কাজে যে কোন খুঁতই হয় নাই, এমন বলিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, তিনি মডারেটদলের অনেককে আলোচ্য-বিষয়নির্ব্বাচন কমিটির (subjects committeeর) সভ্য করিয়া লইলে ভাল হইত; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সংশোধিত প্রস্তাব ঐ কমিটিতে উপস্থিত করিবার সুযোগ দেওয়া এবং তাঁহাকে কংগ্রেসে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়াও উচিত ছিল। সহযোগিতাবর্জ্জন সম্বন্ধে গান্ধী মহাশয়ের মূল প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সংশোধন সম্বন্ধে ভোট লইবার রীতিটাও ঠিক হয় নাই। যাঁহারা মূল ও সংশোধিত উভয় প্রস্তাবেরই বিরোধী তাঁহাদের ভোট নির্দ্ধারণের ভাল করিয়া কোন চেষ্টা হয় নাই। তথাপি মোটের উপর তাঁহার এই প্রশংসা করিতেই হইবে, যে, তিনি ধীর ও নিরপেক্ষ ভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই চেষ্টা খুব বেশী পরিমাণে সফল হইয়াছে।

—

আমেরিকাকে ইউরোপের আহ্বান।

পরিহাসের ভাষায় ইংরেজদের সমষ্টিগত নাম যেমন জন্ বুল্, আমেরিকান্‌দের নাম তেমনি আঙ্কল্ স্যাম্ বা সাম্ চাচা। একটা প্রকাণ্ড কটাহ উননে চড়াইয়া তাহাতে নানা দ্রব্য সিদ্ধ করিলে, কতক্ষণ পরে দেখা যায় যে জিনিষ-গুলির স্বাভাবিক চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়া আর-একরকম হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের অবস্থা অনেকটা ঐরূপ। যুদ্ধের আগে তাহার যে চেহারা ছিল, এখন সে চেহারা নাই। কত সাম্রাজ্য ও রাজ্য গিয়াছে, তাহাদের জায়গায় নানা গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। অনেক পরাধীন জাতি স্বাধীন হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর মত যে-সব রাষ্ট্র এখনও বাহিরের আকৃতিতে অপরিবর্ত্তিত আছে, তাহাদের ভিতরেও খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, সামাজিক বিপ্লব চলিতেছে, শ্রমজীবীরা মাথা তুলিয়া প্রভু হইতে চাহিতেছে, ধর্ম্মঘটের উপর ধর্ম্মঘট চলিতেছে। যুদ্ধও ইউরোপের নানা স্থানে চলিতেছে।

আমেরিকাকে আহ্বান।
"চলে এস সামু চাচা!"

ইউরোপের রাজনৈতিক ঝগ্‌ড়া-গণ্ডগোলে আমেরিকা যোগ দিতে অনিচ্ছুক। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা এখন আগুনে চড়ান কড়ার ফুটন্ত জলে নিক্ষিপ্ত নানা আনাজের মত। কিন্তু ইউরোপ তবু আমেরিকাকে বলিতেছে, "সামু চাচা, আমরা কড়ায় সিদ্ধ হচ্চি বটে; কিন্তু তার জল যে কি খাসা, তা আর কি বল্‌ব! চলে এসো না চাচা, আমাদের কড়ায়!" আমেরিকার নিউ হেভ্‌ন্ সহরের জার্ন্যাল্-কুরিয়ার কাগজে মরিস্ নামক একজন বিদ্রূপরসিক চিত্রকর এ বিষয়ে যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি আমরা দিলাম। ইংরেজ ফরাসী ও ইতালিয়ান্ বলিতেছেন বটে, খাসা জল; কিন্তু তাঁহাদের মুখের চেহারা বলিয়া দিতেছে কথাটা মিথ্যা।

—

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী প্রকাশিত হইবার তারিখ।

আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী ২৩শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর প্রকাশিত হইয়া ২৫শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর ডাকে চালান হইবে। পূজার ছুটিতে অনেক গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন। তাঁহারা যদি ডাকঘরে তাঁহাদের কার্ত্তিক সংখ্যার কাগজ যথাস্থানে পুনঃপ্রেরণের ব্যবস্থা করেন ত ভাল হয়। যাঁহারা তাহা সুবিধাজনক মনে করেন না, তাঁহারা আমাদিগকে নিজ নিজ গ্রাহক নম্বর সহ পরিবর্ত্তিত ঠিকানা ২০শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবরের মধ্যে জানাইলে বাধিত হইব।

—

ডাকবিভাগের নিয়ম পরিবর্ত্তনে ব্যয়বৃদ্ধি।

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ডাক বিভাগের এই নিয়ম হইয়াছে যে, ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ প্যাকেট ও পার্শেল রেজিষ্টরী করিয়া পাঠাইতে হইবে। এইজন্য এখন যাঁহারা প্রবাসীর গ্রাহক হইতেছেন, তাঁহারা ভ্যালুপেয়েব্‌লে কাগজ লইলে, আগেকার চারিটাকা এক আনার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে চারি টাকা তিন আনা দিতে হইতেছে। আমাদের আফিসে লোক পাঠাইয়া টাকা জমা দিলে চারি টাকায় হয়; মনি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে চারি টাকা এক আনায় হয়।

যাঁহারা আমাদের প্রকাশিত বহি আমাদের কার্য্যালয় হইতে ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ ডাকে গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেও প্রত্যেক প্যাকেটে আগেকার চেয়ে দুই আনা বেশী দিতে হইতেছে, ইহাও ক্রেতাগণ স্মরণ রাখিবেন।

এখানে ইহা জানানও অনাবশ্যক হইবে না, যে, প্রবাসী-কার্য্যালয়ের নিজের প্রকাশিত বহি ব্যতীত অন্য বহি এখানে বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় না, কিম্বা বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়াও পাঠান হয় না।

—

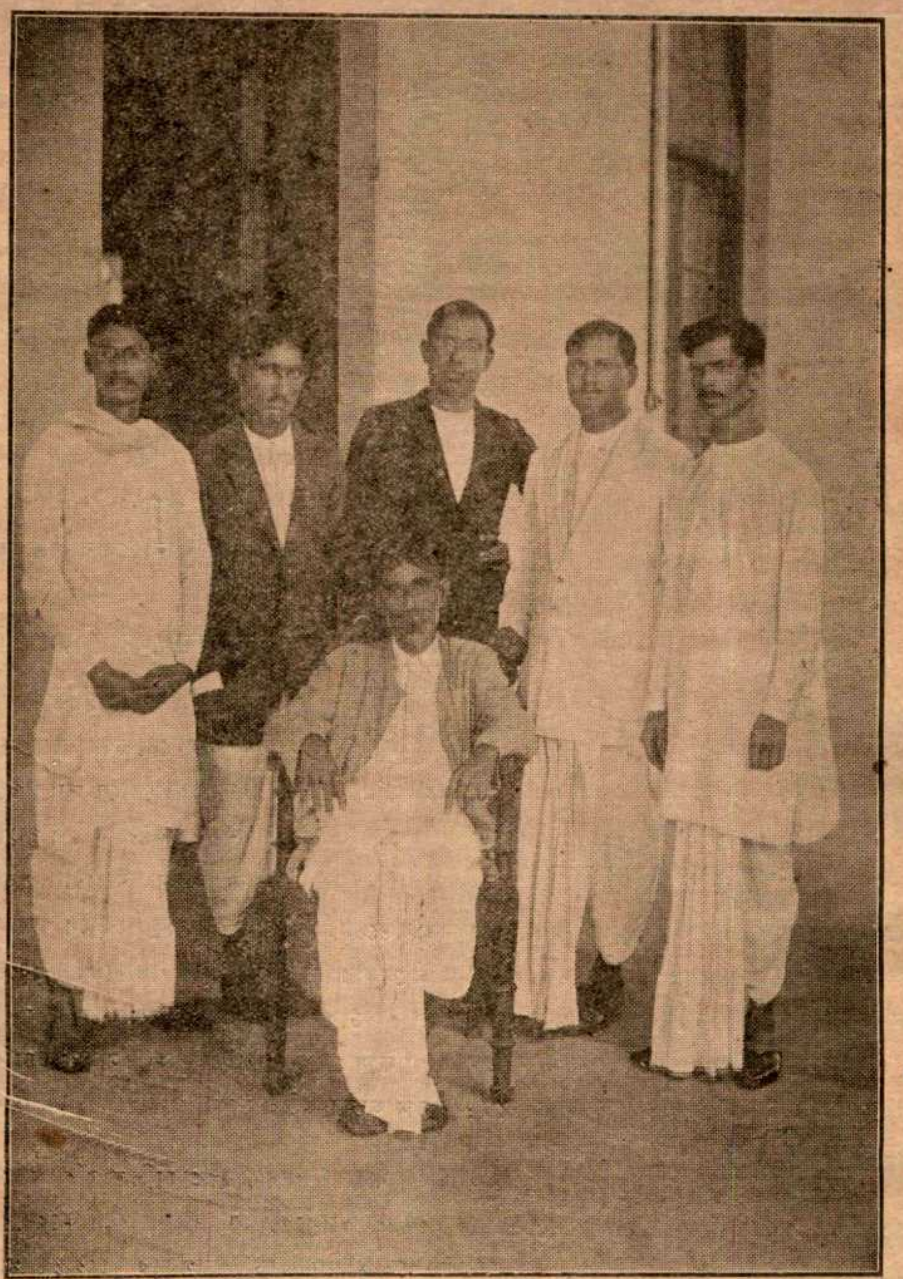

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁর গবেষণাকারী ছাত্রবৃন্দ। (গত ২০শে আগষ্ট তারিখে তাঁর ইংলণ্ড যাত্রাকালে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।) বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া—(১) শ্রীযুক্ত লীলানন্দ গুপ্ত, এম-এস-সি, (২) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস-সি, (৩) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, এম-এস-সি, (৪) শ্রীযুক্ত কালীকুমার কুমার, এম-এস-সি, (৫) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—(১) ইনি অজৈব রসায়ন (ইন্‌অর্‌গানিক কেমিষ্ট্রি) সম্বন্ধে কয়েকটি সন্দর্ভরচয়িতা। (২) ইনি ১৯১৯ সালে সুবর্ণপদক লাভ করেন; জৈব রসায়ন (অর্‌গ্যানিক কেমিষ্ট্রি সম্বন্ধে কয়েকটি সন্দর্ভরচয়িতা। (৩) ইনি ১৯১৭ সালে সুবর্ণপদক লাভ করেন; জৈব রসায়ন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান সন্দর্ভরচয়িতা। (৪) ইনি ভৌতিক রসায়নের (ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি) ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন। (৫) ইনি বিশ্লেষণ-বিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শী; ১৯১৪ সাল হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারী।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিলাতযাত্রা।

আমাদের দেশে কাঁচা মাল—উদ্ভিজ্জ, খনিজ, প্রাণিজ—অসংখ্য প্রকারের পাওয়া যায়। তাহা হইতে মানুষের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে তদুপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া জানা দরকার। এই-সমুদয় প্রক্রিয়াতেই সাধারণতঃ কোন-না-কোন প্রকারে রসায়নের জ্ঞান আবশ্যক হয়। কেবলমাত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্যই শত শত কারখানা ইউরোপে, আমেরিকায় ও জাপানে আছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ও আয়তন হিসাবে এখানে রাসায়নিক কারখানা অতি অল্পসংখ্যক আছে। যাহা আছে, তাহার কোনটিই বড় নহে। রাসায়নিক কারখানা চালাইতে হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে রসায়নের জ্ঞান যতটুকু ও যে-ভাবে দেওয়া হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। ব্যবহারিক রসায়ন (applied chemistry) জানা চাই, এবং তা ছাড়া কারখানা চালাইবার মত কার্য্যগত জ্ঞানও চাই। এই উভয়বিধ জ্ঞান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আছে। কিন্তু মহাযুদ্ধের পাঁচ বৎসরে কারখানার রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতিতে বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। তৎসমুদয় দেখিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কয়েক মাসের জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন। কেন না, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় দানের সাহায্যে অচিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক রসায়ন শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং তদ্বিষয়ে আচার্য্য রায় মহাশয় প্রধান পরামর্শ-দাতা হইবেন, এবং সম্ভবতঃ পরিচালক বা অধ্যক্ষও তিনি হইবেন। তাঁহার বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার বর্ত্তমান গবেষক শিষ্য-গণ তাঁহার যে ছবি তুলাইয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি।

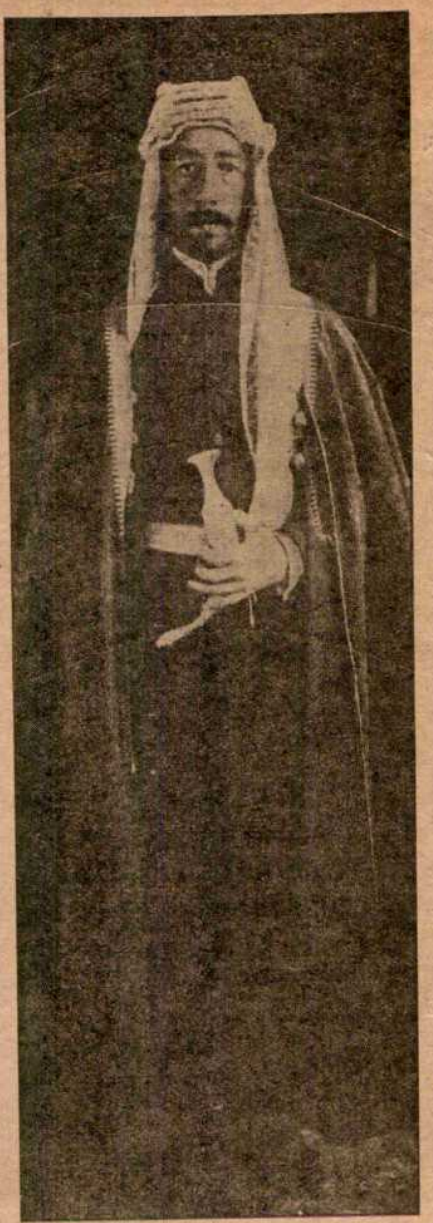

আমীর ফয়সল—সীরিয়ার রাজা।

—

সীরিয়ার রাজা ফয়সল্।

মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ এই চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছিলেন, যে, তাঁহারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র স্বাধীনতা, এবং আরো কত-কিছু স্থাপন করিবেন, এবং যে-জাতি স্ব-ইচ্ছায় যেরূপ শাসন-প্রণালী চাহিবে, তাহাকে তদ্রূপ শাসন-প্রণালী অনুসারে তাহার স্বদেশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া হইবে (যাহার নাম তাঁহারা দিয়াছিলেন self-determination বা স্বভাগ্যনির্ব্বাচন)। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হইবার পর ইউরোপের শক্তিশালী জাতিরা কেবল নিজেদের ধনবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধিতেই মন দিতেছেন, দুর্ব্বল জাতিদের স্বভাগ্য-নির্ব্বাচন একটা বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার এক দৃষ্টান্ত সীরিয়ায় দেখা যায়। সীরিয়ার লোকদের প্রতিনিধি স্বরূপ একটি কংগ্রেস্ নির্ব্বাচিত হয়। সেই কংগ্রেসের দ্বারা আরবদেশের হেজাজ রাজ্যের রাজা হুসেনের পুত্র আমীর ফয়সল্ সীরিয়ার রাজা নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চক্রান্ত ও শত্রুতায় তাঁহাকে সীরিয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

—

মহিলা-বিদ্যাপীঠ।

মহারাষ্ট্রের রাজধানী পুণা শহরে অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কর্বে যে মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসী মহাশয়ের দান-শীলতায় তাহার কার্য্যকারিতা যে-রূপে বৃদ্ধি পাইবে, প্রবাসীতে পূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হইয়া এ পর্য্যন্ত চারিটি মহিলা উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাদের ছবি এখানে দিতেছি। তাঁহাদের নাম শ্রীমতী কমলা বাঈ দেশপাণ্ডে, শ্রীমতী বারু বাঈ শেবডে, সৌভাগ্যবতী রেবতী বাঈ কর্বে, কুমারী গঙ্গু বাঈ ওক।

মহিলা-বিদ্যা-পীঠের চার জন গ্রাজুয়েট মহিলা।
বসিয়া—শ্রীমতী কমলা বাঈ দেশপাণ্ডে, ও শ্রীমতী বারু বাঈ শেবডে।
দাঁড়াইয়া—সৌভাগ্যবতী রেবতী বাঈ কর্বে, ও কুমারী গঙ্গু বাঈ ওক।
এঁরা চারজনে জি-এ অর্থাৎ গ্রাজুয়েট অফ্ আর্ট্স্ উপাধি পাইয়াছেন।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিবার জন্য কলিকাতার কর্ম্মীগণ সময় অল্পই পাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা যতটা সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার বিষয়। প্রতিনিধির সংখ্যা ও দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। প্রতিনিধি, প্রায় ৫৯০০; এত বেশী আগে কখনও হয় নাই। দর্শক ও, প্রায় ৯০০০; এত বেশী পূর্ব্বে কখন হয় নাই। প্রতিনিধির সংখ্যা গত কয়েক বৎসর হইতে খুব বাড়িয়া চলায় কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনের চিন্তা অনেকেরই মাথায় আসিয়াছে। আমরাও কিছু বলিতেছি।

এত বেশী প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া সুশৃঙ্খলা ও সুবিবেচনার সহিত ধীরভাবে কাজ চালান দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। উৎসাহের প্রয়োজন পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ধীরতা ও সুবিবেচনার প্রয়োজন আগেকার চেয়েও বেশী হইয়াছে। এইজন্য এখন বিবেচ্য, যে, দর্শক বাদ দিয়া কেবল প্রতিনিধিদিগকে লইয়া কাজ

করা উচিত কি না। আমাদের মনে হয়, তাহাই উচিত।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও এখন কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়ম হওয়ার প্রয়োজন। আগে আগে কংগ্রেসের প্রতিবাদ ও প্রস্তাবগুলি প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে করা হইত; এখন প্রধানতঃ দেশের লোকদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে, এবং তাহাতে দেশের লোককে অনেক স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইতেছে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও বিবেকবিরুদ্ধ না হইলে, দেশের প্রতিনিধিদের অধিকাংশ যাহা স্থির করেন, দেশহিতৈষীদিগের তাহা করা উচিত। এইজন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, যে, কংগ্রেসের কোনও অধিবেশনে যত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা কোন্ জায়গায় কাহার দ্বারা কি প্রকারে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের সমষ্টিকে সব প্রদেশেরপ্রতিনিধি বলা যায় কি না। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে-প্রদেশে ও শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তথাকার খুব বেশী লোক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। কখন কখন এই অভিযোগও শুনা যায়, যে, দলবিশেষের লোকেরা বা তাঁহাদের নেতারা নিজেদের মতের জয় সুনিশ্চিত করিবার জন্য স্বদলভুক্ত বিস্তর প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেসে উপস্থিত হন। এবারেও এই অভিযোগ শুনা গিয়াছে। দলবিশেষের লোক খুব বেশী পরিমাণে নির্ব্বাচিত হইলে, বিশেষ কোন প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইলেও এই সন্দেহ থাকে, যে, বাস্তবিক উহা দেশের প্রকৃত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মত কি না। এই সব কারণে, আমাদের মতে, এখন এইরূপ একটা নিয়ম করিলে ভাল হয়, যে, সব প্রদেশেই, প্রত্যেক জেলার ও শহরের প্রতি একলক্ষ লোকের একজন বা দুজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। এরূপ নিয়ম না করিলে, যাঁহাদের উৎসাহ বেশী বা দলাদলির ভাব প্রবল, বা অধিবেশনস্থান নিকটে, তাঁহারা খুব দলে-পুরু হইয়া উপস্থিত হইতে পারেন, এবং নিজেদের মতকেই দেশের মত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। একথা কেবল এবারকার বিশেষ অধিবেশনের পক্ষেই সত্য, এরূপ বলিতেছি না; কংগ্রেসের জন্ম অবধি বরাবর এই অবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এত দিন দেশকে জাগাইবার জন্য ও উৎসাহ জন্মাইবার জন্য, যেখান হইতে যত বেশী প্রতিনিধি বা দর্শক আসুন, তাহাতে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। এখনও যে দেশ ঠিক্ জাগিয়াছে, বা দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের স্থায়ী উৎসাহ জন্মিয়াছে, আমাদের ধারণা এরূপ নহে। কিন্তু এখন আমরা যতটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে প্রদেশ, জেলা ও শহর ধরিয়া প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া বিশ্বাস করি। এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার পর যে-সব জায়গা হইতে প্রতিনিধি আসিবেন না, বা কম আসিবেন, তাঁহাদের আর কোন ন্যায্য অভিযোগ করিবার কারণ থাকিবে না, যে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর অন্য জায়গার দলে-পুরু প্রতিনিধিদের চীৎকারে শ্রুত হয় নাই; যাঁহারা প্রতিনিধি পাঠাইবেন না, দোষ তাঁহাদেরই হইবে।

—

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে "অধিকাংশের মত।"

গণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত কোন কোন দেশের মূল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এরূপ নিয়ম আছে, যে, যাহা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিকে স্পর্শ করে এরূপ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপকসভার সমগ্র সভ্যসংখ্যার অধিকাংশের তাহাতে মত হওয়া চাই। অর্থাৎ যদি মোট সভ্যসংখ্যা ৪০০ হয়, তাহা হইলে ন্যূনকল্পে ২০১ জনের ঐরূপ পরিবর্ত্তনে মত হইলে তবে উহা মূল রাষ্ট্রীয় আইনের অঙ্গীভূত হইবে। যদি ব্যবস্থাপক সভার কোন অধিবেশনে ৩০০ জন সভ্য উপস্থিত থাকেন, এবং তন্মধ্যে ১৯৯ কিম্বা ২০০ জনও ঐ পরিবর্ত্তনের অনুকূলে মত দেন, তাহা হইলেও পরিবর্ত্তন হইবে না;—এ যুক্তি খাটিবে না, যে, অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যদের অধিকাংশ পরিবর্ত্তন চান। যদি কোন অধিবেশনে ৪০০ জনই উপস্থিত থাকেন, এবং তাহার মধ্যে ৫০ জন কোন পক্ষেই মত না দেন, এবং ১৯৯ জন পরিবর্ত্তনের পক্ষে ও ৫১ জন বিপক্ষে মত দেন, তাহা হইলেও পরিবর্ত্তন হইবে না। পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্ততঃ ২০১ জনের উহার অনুকূলে মত হওয়া দরকার।

এতদিন কংগ্রেস্ যে-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে-

ছিলেন, সহযোগিতা-বর্জ্জন তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি ঘটাইয়াছে; ইহা একটি আমূল পরিবর্ত্তন। কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধির মত যাহাই হউক, সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে সহযোগিতা করিতে পারেন, কিম্বা উহা বর্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা কংগ্রেসের দলভুক্ত থাকিতে চান, তাঁহাদিগকে উহার মত অনুসারে চলিতে হইবে। এই হেতু সহযোগিতা-বর্জ্জনের মত একটি মৌলিক পরিবর্ত্তন দেশের অধিকাংশ প্রতিনিধির অনুমোদিত কি না, তাহার আলোচনা অনাবশ্যক নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেক জেলার যে সম্ভবতঃ একজনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না, এবং কোন কোন স্থানের শত শত প্রতিনিধি ছিলেন, একথা না হয় নাই ধরিলাম। কিন্তু প্রায় ৫৯০০ প্রতিনিধির মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ তিন-হাজারের উপর যে ভোটই দেন নাই, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। যাঁহারা সপক্ষে ও বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমষ্টি মোট প্রতিনিধি সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও কম। মোটামুটি ১৯০০ প্রতিনিধি সহযোগিতা-বর্জ্জনের সপক্ষে মত দিয়াছেন। কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, নূতন পথে যাইতে হইলে, যে নিঃসন্দেহ মতভূয়িষ্ঠতার (absolute majority) প্রয়োজন, এস্থলে তাহা হয় নাই। যাঁহারা কোন দিকেই ভোট দেন নাই, তাঁহাদিগকে উদাসীন বলুন, অকেজো বলুন, কিম্বা আর যাহাই বলুন, তাঁহারা গান্ধী মহাশয়ের প্রস্তাবিত প্রকারের সহযোগিতা-বর্জ্জনের সপক্ষে, ইহা বলিবার জো নাই।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, সহযোগিতা-বর্জ্জনের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, কংগ্রেসের দোহাই দিয়া যাঁহারা সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; কেন না অধিকাংশ প্রতিনিধি কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই।

গবর্ণমেণ্টেরও যেন এ ভ্রম না জন্মে যে, দেশের রাজনৈতিক চিন্তাশীল অধিকাংশ লোক সহযোগিতা করিতে চায়। প্রকৃত অবস্থা এই, যে, অধিকাংশ লোক গবর্ণমেণ্টকে ও ব্রিটিশজাতিকে অবিশ্বাস করে, এবং অসহযোগিতাই চায়; অসহযোগিতা কি প্রকারের হইবে, তাহা লইয়াই মতভেদ।

অসহযোগিতা বা সহযোগিতা-বর্জ্জন।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতেছিলেন বা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারা সহযোগিতা-বর্জ্জন শব্দ ব্যবহার করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ট্যাক্স্ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রকারেই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছিলেন না, তাঁহারা আর বর্জ্জন কি করিবেন? তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইলে, ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এখনও তত-দূর অগ্রসর হইতে বলিতেছে না। অতএব, অসহযোগিতা কথাটাই তাঁহাদের ব্যবহার্য্য। যদি একটি লোকসমষ্টির উদ্দেশ্যের সহিত অন্য এক বা একাধিক সমষ্টির উদ্দেশ্য অভিন্ন হয়, এবং এই-সকল সমষ্টির অন্তর্ভূত ব্যক্তিরা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবেত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাকে সহযোগিতা বলে। চিন্তাক্ষেত্রে ও কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহারা ভারতীয় জনসমষ্টির নেতা, তাঁহারা ভারতীয়দের জন্য এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, ভারতীয় জনসমষ্টির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এক হইবে, ভারতীয়েরা জ্ঞানে ও সৎচেষ্টায় উন্নত ও এক হইবে। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় কিংবা বিলাতের ইংরেজেরা মুখে যাহাই বলুন, কাজে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শে তাঁহাদের সায় নাই। পঞ্জাবের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টের, বিলাতের মন্ত্রীসভার, এবং পার্লেমেণ্টের উভয়-কক্ষের মন্তব্য ও কার্য্য দেখিয়া এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ভারতের ইংরেজ ফিরিঙ্গীদিগকে সশস্ত্র করিয়া রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিবার জন্য এবং ভারতীয় কতকগুলি লোককে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট রকমের যুদ্ধশিক্ষা আদি দিবার জন্য যে দুটি আলাদা আইন হইতেছে, তাহাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়, এবং বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষকে সৈন্যবল দ্বারা অধীন এবং ধনদোহনের কামধেনু করিয়া রাখাই ইংরেজদের প্রকৃত অভিপ্রায়। ইংরেজদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ঐ বিশ্বাস সম্প্রতি দৃঢ়তম হইয়াছে, বড় লাট সাহেব মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্জাববিষয়ক প্রস্তাবটির আলোচনা ব্যবস্থাপক সভায় হইতে না দেওয়ায়। শাস্ত্রী মহাশয় কেবল এইটুকু চাহিয়াছিলেন, যে, পঞ্জাবে যে-সব রাজভৃত্য অপকার্য্য ও অত্যাচার করিয়াছে,

[redacted]দের উপযুক্ত শাস্তি হউক, এবং এরূপ কোন লোককে তীয় রাজকোষ হইতে কোন পেন্‌সন আদি দেওয়া উচিত।

যাহাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যের মিল নাই, তাহাদের সহিত যোগিতা একটা অর্থহীন কথা। তবে, যদি কেহ, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বক্তৃতার স্বাধীনতা (freedom of) থাকিবে বলিয়া, তথায় স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা যাইতে চান, কিম্বা ছোটখাট ব্যাপারে দেশের হয়ত করিতে পারিবেন ভাবিয়া ব্যবস্থাপক সভায় তে চান, এবং এরূপ কাজ ছাড়া দেশের অধিকতর ্যাণকর কার্য্যে শক্তি নিয়োগ করিবার যোগ্যতা হার না থাকে, তাহা হইলে তিনি কৌন্সিলের মেম্বর তে পারেন। আমাদের মনে হয়, কৌন্সিলের কাজে সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহার মত ফল কিছুই ওয়া যায় না; ভবিষ্যতেও পাইবার সম্ভাবনা কম। পাল কৃষ্ণ গোখলের মত ত্যাগী মনস্বী পুরুষ জীবনের ষ্ঠ অংশ কৌন্সিলের কাজে দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রম্বার গবর্ণমেণ্টের যে-সব অপকৃষ্ট নীতির সমালোচনা ও তিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার একটুও পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? আমাদের বিবেচনায় কৌন্সিলে না গিয়া অন্য উপায়ে শের সেবা করিতে চেষ্টা করাই উচিত। শুধু সমালোচনা রিবার এবং বাধা দিবার জন্য মানুষের এতটা সময় ও ক্তি প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে।

গান্ধী মহাশয়ের অসহযোগিতা প্রস্তাবের ৮টি দফা াছে। ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ-দফায় আমাদের আপত্তি াকিবার কথা নহে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপাধি-াদি বখ্‌শিশ পাইবার মত কোন কাজ করি নাই, করিতে চ্ছাও নাই; মিউনিসিপালিটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির সভ্য াহ, হইতেও চাই না; গবর্ণমেণ্টের দরবারী নহি, হইতে াই না; ভারতবর্ষীয় সরকারী বা সরকারের অনুমোদিত ুল-কলেজের সাহায্য লইবার আমাদের প্রয়োজন নাই; আইনব্যবসায়ী নহি, এবং জুরর ও সাক্ষীরূপে ভিন্ন কখন আদালতে যাই নাই, যাইতে ইচ্ছাও করি না; নিজের বা পরিবারভুক্ত কাহারো মেসোপটেমিয়ায় কোন চাকরী লইয়া যাইবার ইচ্ছা ও সম্ভাবনা নাই; এবং স্বদেশীজিনিষ কিনিতে ও চালাইতে খুব ইচ্ছুক ও যথাসম্ভব বিদেশী জিনিষ ব্যবহার ত্যাগেও আপত্তি কিন্তু যত বেশী সময়ই পাওয়া যাক্ না এবং যত ধীরে ধী এই কাজ করা যাক্ না, সমুদয় বিদেশী জিনিষের ব্য ত্যাগ কখনও সম্ভব হইবে না, এবং এইরূপ মনের হওয়া ও এইরূপ চেষ্টা করাও অনুচিত। কারণ, বি জাতি বা ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের বিরোধী, ইহা সত্য এবং এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ আত্মার পক্ষে কল্যাণক নহে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস ফল হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে বর্জ্জনের উপর জোর দিলে ফল হয় না, পুলিসের উপদ্রব ডাকিয়া আনা হয়, এবং কে বর্জ্জন করিলেই বর্জ্জিত বিদেশী জিনিষের জায়গায় দে জিনিষ স্বতঃই জন্মগ্রহণ করে না। সেইজন্য স্বদেশী জি উৎপাদন ও প্রচলনের খুব চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, এবং আ তজ্জন্য যথাসাধ্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করি প্রস্তুত আছি।

ভিন্ন ভিন্ন দফা অনুসারে কাজ হইলে গবর্ণমেণ্ট পরিমাণে কাবু হইবেন বা হইবেন না, আমরা পূর্ব্বে একব তাহার আলোচনা শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে (৪০৬-৪১০ পৃ করিয়াছি; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর আমা ধারণা এই, যে, গান্ধী মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে কা হইলেও গবর্ণমেণ্ট কাবু হইবেন না, বিশেষতঃ আটটি দ "ক্রমশঃ" কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হওয়া প্রস্তাবের সমর্থনকারীরা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও একপ্রকার সংগ্রামই করিতেছে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে বিপক্ষকে প্রস্তুত হইবার য যথেষ্ট সময় দিতে নাই। ভারতীয়েরা যদি যথাসম্ভব স একযোগে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতেন, সিবিল ও সৈনি চাকরী চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন এবং পরিত্যক্ত প জন্য অন্য লোক না জুটিত, তাহা হইলে অতি শীঘ্র গব মেণ্টকে দেশের লোকদের মত অনুসারে কাজ করিতে হ কিন্তু ভারতীয়দের স্বাধীনতাপ্রিয়তা, জাতীয় ঐক্যবো এবং দেশের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ এবং ক্ষতি দুঃখ সহিবার ইচ্ছা ও শক্তি এখনও এতটা হয় নাই, ে

করিবে, ট্যাক্স না দেওয়া এবং চাকরী ত্যাগ করা সম্ভব হইবে। তাহাদের নিকট, যন্ত্রবল ও পৈশুবল সম্পূর্ণরূপে পরাভূতের অধিগম্য। এ অবস্থায় উক্ত দুটি কাজ করিতে গেলে হয়ত অনেক জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাও দেশ প্রস্তুত নহে। কিন্তু ভবিষ্যতে হয় ত এইরূপ আত্মবলিদান দ্বারাই ভারতীয়দিগকে স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান অর্জ্জন করিতে হইবে।

গান্ধী মহাশয় এক বৎসরে স্বরাজ্য পাইবার আশা রাখেন তাঁহা অপেক্ষাও উৎসাহী ও আশাশীল কেহ বা ছয় মাসে, কেহ বা ছয় দিনে পাইবার আশা করেন। তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইতেছি, যে, কোন জাতি মাত্র যুদ্ধ করিয়াও এক বৎসরে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই। ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা সম্পত্তি, সামান্য রকমের সৌখীন সহযোগিতা বর্জ্জন করিলে ইংরেজ ছাড়িয়া দিবে, ইহা দুরাশামাত্র।

গান্ধী মহাশয়ের প্রস্তাবে এমন কোন কোন অংশ আছে, যাহা আমরা বিশেষ বুদ্ধির সহিত, কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত সম্বন্ধিত করিতে চাই না। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী, বিদ্যালয় সবই আমাদের দ্বারা উদ্ভাবিত হওয়া উচিত। আমাদের সব স্কুল কলেজ আমাদেরই দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। আমরা স্বরাজ্য পাইলে তাহা হইতে পারে, নতুবা সম্পূর্ণ রূপে তাহা হইবে না। কিন্তু যদি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের অপরাধী সরকারী কর্ম্মচারীদের সমুচিত দণ্ড দেন, এবং বিলাতে সহজে জামিন না হয়, তাহা হইলেও জাতীয় বিদ্যার আদর্শ উপলব্ধি, জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবন ও জাতীয় শিক্ষার সমগ্র আয়োজন কার্য্যতঃ করিবার চেষ্টা, কোনটি করিতেই আমরা নিরস্ত হইব না; হওয়া উচিত হইবে না। সুতরাং যাহা সর্ব্বাবস্থাতেই আমাদের কর্ত্তব্য, তাহাকে সামরিক একটা উত্তেজনা ও প্রয়োজনজাত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা অনুচিত। শিক্ষার আদর্শ ও ক্রম নির্ণয় করিয়া শিক্ষা দিতে হইলে, ধীরতা ও সাত্ত্বিকতা আবশ্যক। উত্তেজনাপূর্ণ অস্থিরচিত্ত বা বাহ্যিক কোন প্রচেষ্টার সহিত তাহাকে জড়িত করিলে এই ধীরতা ও সাত্ত্বিকতা ভ্রষ্ট পাইবে। ইংরেজের অঙ্গচ্ছেদকালীন আস্ফালনের সময় হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, যে, "জাতীয় বিদ্যালয়"-গুলিতে ছাত্রেরা উৎপাতিত হইয়া আসিতেছে। নিজে ভাবিয়া বুঝিয়া কোন একটা আদর্শের জন্য যদি কেহ নিজেকে এমন অবস্থায় ফেলেন যাহাতে দুঃখ সহিতে হয়, তাহা হইলে সেই দুঃখ আত্মার পক্ষে কল্যাণকর, এবং তিনি নিগৃহীত ব্যক্তি হয়ং মাথা পাতিয়া লইতেছেন বলিয়া, তাঁহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু "জাতীয় বিদ্যালয়" করিব আমরা একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনবোধে, এবং উৎপীড়িত হইবে বালকেরা, এ সব কথা ভাল নহে। সশস্ত্র যুদ্ধেও ত শত্রুপক্ষের বালকবালিকাদি কোন দুঃখ না দিবার নিয়ম আছে—যদিও অনেক জাতিও সে বিষয় পালন করেন না।

এই-সকল কারণে আমরা বলি, স্বরাজ্য লাভের পূর্ব্বেও আমরা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে পারি। তাহাকে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত করিব না—আমরা তাহা করিব একটি নিত্য কর্ত্তব্যরূপে, কর্ত্তব্য বলিয়া সহে।

স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া তাহার সুব্যবস্থা ও তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিস্তর সময় লাগে, এক আধ বৎসরের কাজও নহে।

খিলাফৎ এবং পঞ্জাব সম্বন্ধে ব্রিটিশজাতি যদি কোন ন্যায়সিদ্ধ কাজ, তাহা হইলেও, মোকদ্দমাবাজীতে প্রভূত অর্থনাশ এবং মানুষে মানুষে সদ্ভাব নষ্ট হয়। সুতরাং এই চেষ্টা কোন সাময়িক প্রয়োজনের সহিত জড়াইতে আমি অনিচ্ছুক। বাস্তবিক সাসিসী খান, বিবাদ নিষ্পত্তিও চূড়ান্ত আদর্শ নহে। শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা প্রাণে ন্যায়নিষ্ঠা মানবকে আগাইয়া এমন অবস্থা দাঁড় করানই আদর্শ, যাহাতে বিষ কমিয়া যায়, বিবাদের প্রবৃত্তিই হ্রাস পায়। তাহা হইলে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমাই কমিয়া যাইবে।

ইংরেজের প্রভুত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিন, অর্থ ফৌজদারী মোকদ্দমায়, তত আত্মপক্ষসমর্থন করিতে হইবে। তজ্জন্য আইনজীবী নিযুক্ত করিতে হইবে, নতুবা মামলা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে, আইন ব্যবসা কতজন যে ত্যাগ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করেন, উকীলেরা পরোক্ষভাবে। কর্ম্মচারীদিগকে ছাড়াইবার মত ক্ষমতা বা প্রভাব কংগ্রেসের নাই। উকীলদিগকে ব্যবসা ত্যাগ করাইতে কংগ্রেস কিছু সমর্থ হইলে, তাহাতে চাকরীর উমেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, গবর্ণমেণ্টের কাজ অচল হইবে না। সেজন্য আমরা আইন প্রচলিত থাকিবার কালে আসামীদের পক্ষে সক্ষম উকীল ব্যারিষ্টার সমর্থন করিব। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের কাজ অচল না হইয়া বরং অবস্থাটা হাকিমের সুবিধাই হইয়াছে; ইহা প্রণিধানযোগ্য।

বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বসাধারণ আমরা গ্রহণ করা অনুচিত। প্রথমতঃ, সব বিদেশী জাতির সঙ্গে আমাদের বিরোধ নয়, ইংরেজ ও তাহাদের ঔপনিবেশিকদের সঙ্গেই বিরোধ। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ব্যাপার [illegible]

তাহাতে ও নিরাশাবাদী হইতে হয়। সেজন্য দুঃখিত ভারতীয়। কংগ্রেসের বিলাতী কমিটি প্রতিষ্ঠাটি না হওয়ায় বিদেশে নির্বিঘ্নে মুদ্রণযন্ত্রে বিদেশী কাগজে যাইতে। এদেশের কথা দূরে থাকু, খাঁটী বহরমপুর [illegible] ইতিহাস বিদেশী কাগজে রিকোয়িজিশন সহযোগে চিঠিতে ও খবরের কাগজে যে টিকিট স্থাপক মা। দুবেশ লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি, speech করে। কেরোসিনের লণ্ঠন করিতে [illegible] আলো জ্বালা সব বিদেশী: আর [illegible] প্রয়োজন নাই। অতএব প্রতিজ্ঞা সভ্য হিত [illegible] সর্ব্বব্যাপী বিদেশীবর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা না যাইবিদেশ বিশেষ রকমের তিনিষের তালিকা প্রস্তুত করা উচিত, এইগুলি বর্জ্জন করা, এবং তাহার তালিকা তিনিষ গ্রহণ করা। আমরা [illegible] বেশী হয় [illegible] আন্দোলন ই বার পূর্ব্বে হইলে এপ্রাহাবাদে ১৮৯৫ খৃঃ আমরা চিনী সুতী ও গন্ধী কাগজ ব্যবহার পারিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের ইচ্ছার অভাব [illegible] হইলে চেষ্টার কাটা হতায় হাতের [illegible] কাপড় কেহ দিতে পারেন কি না, প্রবাসীতে [illegible] লিখিয়াছিলাম, এবং বিনা মূল্যে তাহার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সদুত্তর [illegible]

[illegible] করা কোন কাজই হয় না, বলিয়া কিন্তু বিদেশের প্রতি আমাদের অপমানকারী [illegible] সঙ্গে সম্বন্ধের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক [illegible] করিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহাদের প্রাণে [illegible] করিয়াছে, তাঁহারাই কিন্তু [illegible] পারিবেন বলে নহে। তাঁহারা সরকারী কোন [illegible] পদবী গ্রহণ করিবেন না, চাকরী করিবেন না, [illegible] বিচারার্থী [illegible] হইয়া পার্লামেণ্টে যাইবেন, কি [illegible] সমুদয় বিদেশীরা এদেশ পরিত্যাগ করিবে, এমন [illegible] যাইতে চেষ্টা করিবেন, না পাইলে, [illegible] করিয়া নতুবা সপ্তাহ বিদেশে কিনিবেন, [illegible] ইত্যাদি।

[illegible] ভবিষ্যতে সময় পাইলে ইহাদেরও [illegible] আছে। বাঙ্গলা দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের [illegible] খুব জোর, তখন কেহ কেহ পাশ্চাত্য [illegible] বিমুখ হইয়াছিলেন। এরূপ বিমুখ [illegible] কাল, দুঃখের কারণ নিজের নহিবার [illegible] হইতে যে কোন সদুপায় দ্বারা হউক, আহরণ [illegible] হয়। দেশ যদি কষ্টসহিষ্ণু হইয়া চরিতার্থ [illegible] নিজের মধ্যে, তাহা হইলে সুখসম্ভোগের জন্য, কিম্বা এই প্রকার কোন নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে [illegible] বিদেশে যান, তাঁহাকে দোষ দিতে [illegible] কেহ সরকারী চাকরী পাইবার জন্য কিম্বা [illegible] গবর্ণমেণ্টের "সহযোগিতা" করিবার জন্য বিদেশে সন্তানদিগকে বিদেশে পাঠান, "সহযোগিতা"-বর্জ্জন তাঁহারও সমালোচনা করিতে পারেন; কিন্তু বিশেষ বিদেশে ভ্রমণ, বিদেশে শিক্ষা লাভ করিলেই [illegible] যায় না। আমরা অনেকে ত দেশে [illegible] কারী-নবিসেফেরদের মত ব্যবহার করি, এবং [illegible] ইংরেজীতে লেখা বহি ও আমরা পড়িয়া থাকি। বিদেশে সেলেই দোষের বিষয় হয় না।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর অভিভাষণ বক্তব্য খুব বিশদ হইয়াছিল। ইংরেজদের ভারতে [illegible] ও স্থিতির এখন উদ্দেশ্য তিনি সাহস ও [illegible] সহিত বলিয়াছেন। রিটিশজাতি ও গবর্ণমেণ্টকে কলঙ্কিত যে এখন অধিকার করে, তাহা তিনি [illegible] বলিয়াছেন। সহযোগিতা-বর্জ্জনের তাঁহার সমর্থন কিন্তু কি প্রকারে সহযোগিতাবর্জ্জন ফলিত করিতে [illegible] সিদ্ধ হয়, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, বন্দুকের ব্যাপারে [illegible] অব্যাহত ও অপ্রতিহত থাকে, তাহা তিনি নির্দ্দেশ [illegible] পারেন নাই; বলা কঠিন। নির্দ্দেশ করিতে [illegible] কাজ করা কঠিনতর। লণ্ডনের সেণ্ট পলের [illegible] Dr. Willam Ralph Inge এর Outspoken [illegible] হইতে যে বাক্যগুলি তিনি উদ্ধৃত করেন, তাহা [illegible] নহে বলিয়া নীচে মুদ্রিত করিতেছি। [illegible] লিখিতেছেন—

"It was not till the accession of George [illegible] the increase in our numbers became [illegible] until then would have thought of [illegible] Englishman as the embodiment of the [illegible] race. Misers, in the sixteenth century, [illegible] countrymen 'as lazy as Spaniards'; most [illegible] were struck by our fondness for solid food [illegible] drink. The industrial revolution came [illegible] suddenly, it changed the whole face [illegible] and the apparent character of the people. [illegible] future our descendants may look back upon the [illegible] in which we are living as a strange [illegible] disturbed the normal habits of our race.

"The first impetus was given by [illegible] Bengal, which after the victories of Clive [illegible] the country in a broad stream for [illegible] This ill-gotten wealth played [illegible] fating English industries and [illegible] extorted from France, did for [illegible]

ইংরেজের চোখে যে বাঙালীর সুচিন্তিত মতের স্থিতির উপর নির্ভর করিত, ইহা বাঙালী ও ইংরেজ উভয়েরই জানিবার কথা।

ঐ বক্তৃতায় প্রফেসর বলিয়াছেন—

"A nation may be so much weakened in physique by underfeeding as to be impotent from a military point of view in spite of great numbers, this is the case in India and China. Deficient nourishment also diminishes the day's work.

"If European and American capital goes to China and provides proper food for the workmen, we may have an early opportunity of discovering whether the supporters of the League of Nations have any real conscientious objection to violence and bloodshed or whether human nature, the fiercest of all beasts of prey, is not likely to abandon the weapons which have made him the lord and the bully of the planet. He has no other superiority to the races which he arrogantly despises. Under a regime of peace the Asiatic would probably be his master."

ইহার নিম্নমুদ্রিত প্রথম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, এবং দ্বিতীয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

Why not grant India the same kind of Dependence to deal with her own affairs as you have done in Egypt? Have a commercial treaty with India in the same way as you are having with Egypt to safeguard all your vested commercial interests and leave us to ourselves to find out our own salvation.

সভাপতির বক্তৃতা।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় সভাপতি যাহা বলিতেন তাহা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত হইত। পক্ষান্তরে বক্তৃতাগুলি যে সাধু মাইকেল ওডায়ার তাহা বুঝাইবার জন্যই ছিল; লাদাস্তী তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই বক্তৃতা শান্তি না দিয়া প্রশংসা করা যে গবর্ণমেণ্টের মনে কিরূপ অনুতাপ আনিয়াছে, তাহা এই বক্তৃতা পড়িলে খুব ভাল করিয়া বুঝা যায়। তাঁহার সহযোগিতা-তত্ত্বের বিশ্লেষণ সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

Co-operation with Government is of two kinds; one enforcible by law and therefore compulsory, for example, the payment of taxes or service in the army under conscription; the other is voluntary, for example, accepting Government service or joining the Councils, and so on. In the case of the former a refusal is punishable. As for the latter, there we have to distinguish between the co-operation which is obviously for the country's benefit and that which is not so. Co-operation determined solely or mainly by economic considerations can only be refused if we can find economic alternatives. Co-operation inspired by considerations of honour and dignity can be easily refused if the mentality of the people regarding honour and dignity can be changed. Last, but not the least, is the same class you may consider co-operation which gives you opportunities of serving our country by attaching shreds of power and privilege from the state

Co-operation or refusal of co-operation, in short, is governed by (a) its [illegible] by law or voluntary nature, (b) economic [illegible] and (c) [illegible] of attack [illegible]

Co-operation [illegible] is decided on which you call the [illegible] basis of which you are going to give effect to the [illegible] on an enhanced different footing from the obviously [illegible] operation [illegible] is inspired by economic [illegible] stands on a different footing from the one [illegible] solely on [illegible] based on considerations of honour and dignity. Once again you must [illegible] by refusal of co-operation proceeds [illegible] desire [illegible] immediate [illegible] [illegible] ment or from the motive of [illegible] the people [illegible] their [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] ভাই, [illegible] ভাই, [illegible] ভাই, [

[illegible] মানে সেদিন বুঝিলাম—আফ্রিকে মানুষ বলিয়া গণ্য করে না, কতদূর পাশবিকতা সেই ব্যাপার। কে যেন আমার কানে কানে বলিল, 'এ তোমাদেরই কৃত কর্ম্ম। পাপী। তোমরা নিজেদের দোষেই তোমাদের বহুসহস্র ভাইবোনদিগকে অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছ, তারই প্রতিফল স্বরূপ ইহারা তোমাদিগকে ঘৃণায় কেউ স্পর্শ করে না। এ তোমাদের ন্যায্য কর্ম্মভোগ।' আমার মনের মধ্যে সমাতিক ঢেউ হইতে লিল, মহাত্মা গান্ধির বন্দে এসংবে অনেকবার কথা হইত। তিনি বলিতেন, ভারতীয়দিগকে ঘর-ভেড়ার মত বোঁয়াড়ে পুরিয়া রাখিবার এই যে অপমানজনক চেষ্টা ইউরোপীয়রা করিতেছে, passive resistance বা নির্বিরোধ অসহযোগের দ্বারা আমরা তাহাদিগকে ব্যর্থ, বার্থ করিয়া দিতে হইবে।

এতদিন পরে আবার লর্ড মিলনারের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি আবার ইউরোপীয়গণ হইতে তফাৎ হইয়া থাকিবার হুকুম হইয়াছে; তাহারা নিজেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাড়া ভিন্ন যেখানে সেখানে বাড়ী তৈরী করিতে অথবা ভাড়া লইতে পাইবে না। এইরকম আদেশ জারির যে কি অর্থ তাহা আপনাদিগকে ঠিকঠিক বুঝাইবার আমার উপায় নাই, তবে এখানে আমি সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে, সত্যসত্যই যদি ভারতীয়দের প্রতি এইরূপ আচরণ করা হয়, তবে আমাদের আত্মসম্মানের চূড়ান্ত অভাব সূচিত হইবে এবং ভদ্রসমাজে আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না।—সুতরাং, লর্ড মিলনারের অভিপ্রায় যাহাই হোক,—আমাদের মানসম্মানকে আমরা কোনমতেই ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে দিব না। শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত ভারতবাসীকে এখন জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে যে আমাদের আত্মজ্ঞান এবং আত্মসম্মানের জাগ্রতি হওয়ার যোগাড় হইয়াছে, হায় মানিলে অথবা [illegible] করিলে আর চলিবে না।

আমার আপন যেমন হইয়াছে, সত্বর এবং পরীক্ষা-পীড়ের [illegible] যেমন করিয়া চুক্তিপত্রে সহি করাইয়া লইয়া [illegible] পঁচিশ বা ষাট বৎসরের পুরাতন দেশান্তর উচ্ছেদ [illegible] রহিত হইয়াছে, ঠিক তেমন সহায়তাই আপনাদের কাছে আমি আবার চাহিতে আসিয়াছি। আমাদের সজাতীয় ভাইবোনেরা ফীজী এবং আফ্রিকাতে যে নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, সত্বরে তাহা অনুন্ এবং প্রতিকারের উপায় করুন।—এই আমার প্রার্থনা।

[illegible]

[illegible] ভারতবাসীরা, যেখানেই [illegible] হিমগিরিকে তাদের মনে হইত বিভূতি-[illegible] তপস্যার মতন, হিমালয়ের গিরিতটের [illegible] জাল, তার মধ্যে গঙ্গা পথহারা হইয়া [illegible] লাদের উপর চন্দ্র দেখিয়া মনে হইত যেন চন্দ্রের [illegible] হিমগিরিকে, পঞ্চদশতে বীজ দেবের সঙ্গায় হইতে নীলকণ্ঠ [illegible] ; হিমালয়ের গায়ে বিদ্যুৎমুক্তা [illegible] আর ও ত্রিশূলধারি ত্রিশূল। এই শিব আমার কাছে [illegible] আবার অগ্নি, মৌক্তিক অগ্নিমূর্ত্তি শিব শিলাখণ্ডটিতে, [illegible] ভূমিজ, নীলকণ্ঠ, জ্যোতির্ময় লাভ করেন।

শিবের এই হিমালয় ও অগ্নির রূপকে একত্র মিলাইয়া দিল্লী, এই চিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাই এই শিবের একাধারে পতি বিশ্বেশ্বর ও শিব—তিন মূর্ত্তির কথা এক মহাধ্যানে।

দেশবাসী দেহে ও মনে সুস্থ সবল সুন্দর হোক। দূর হোক সকল চিত্তবিক্ষোভ। গৃহে গৃহে বিরাজ করুক পরিপূর্ণ সাফল্য, অম্লান আনন্দ এবং অসীম শান্তি।

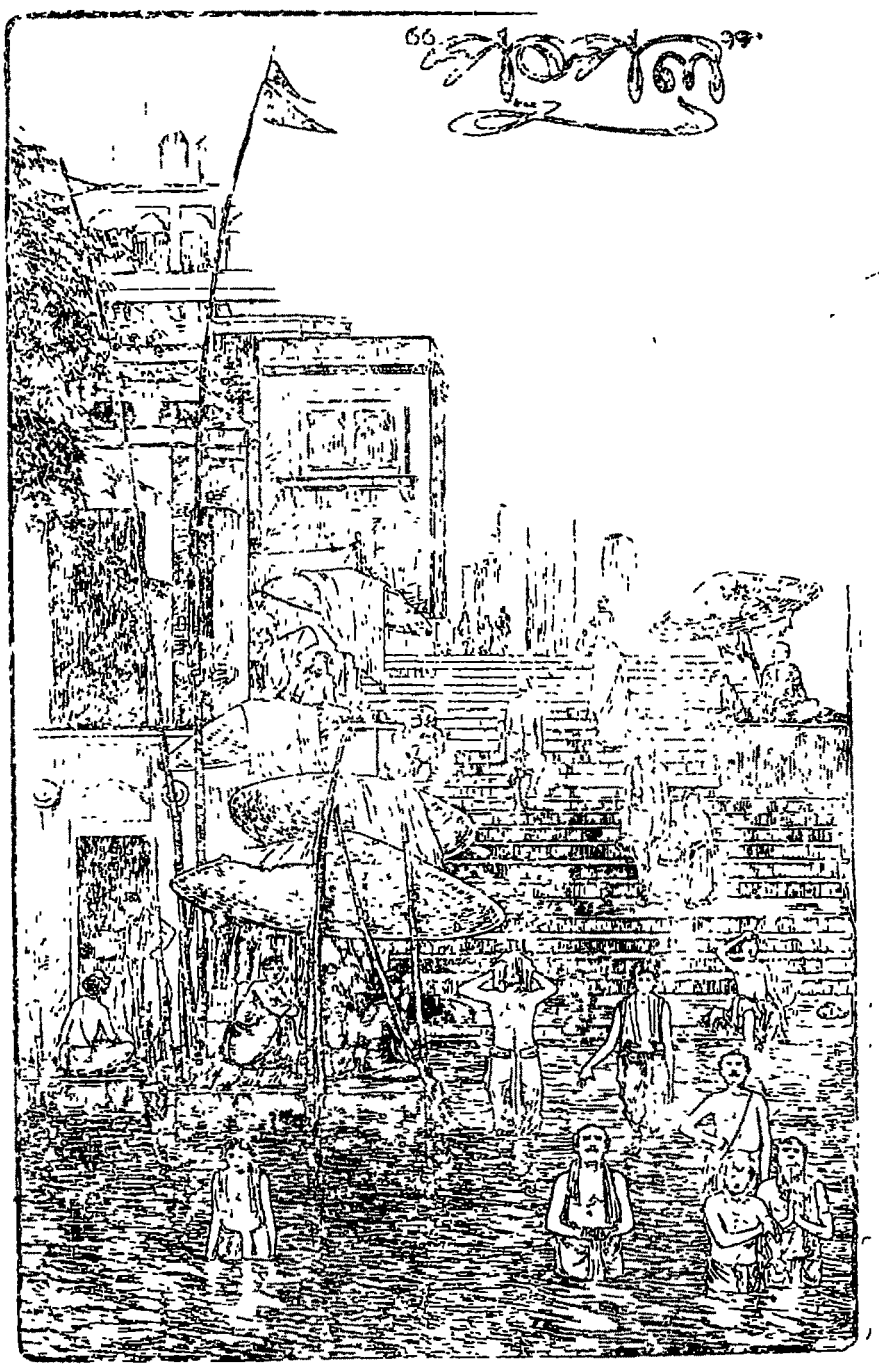

স্নানে স্নিগ্ধ সন্তোষ

ক্লোবাল ফোর অরে· ... ১
সংপ্রপল · ... ১

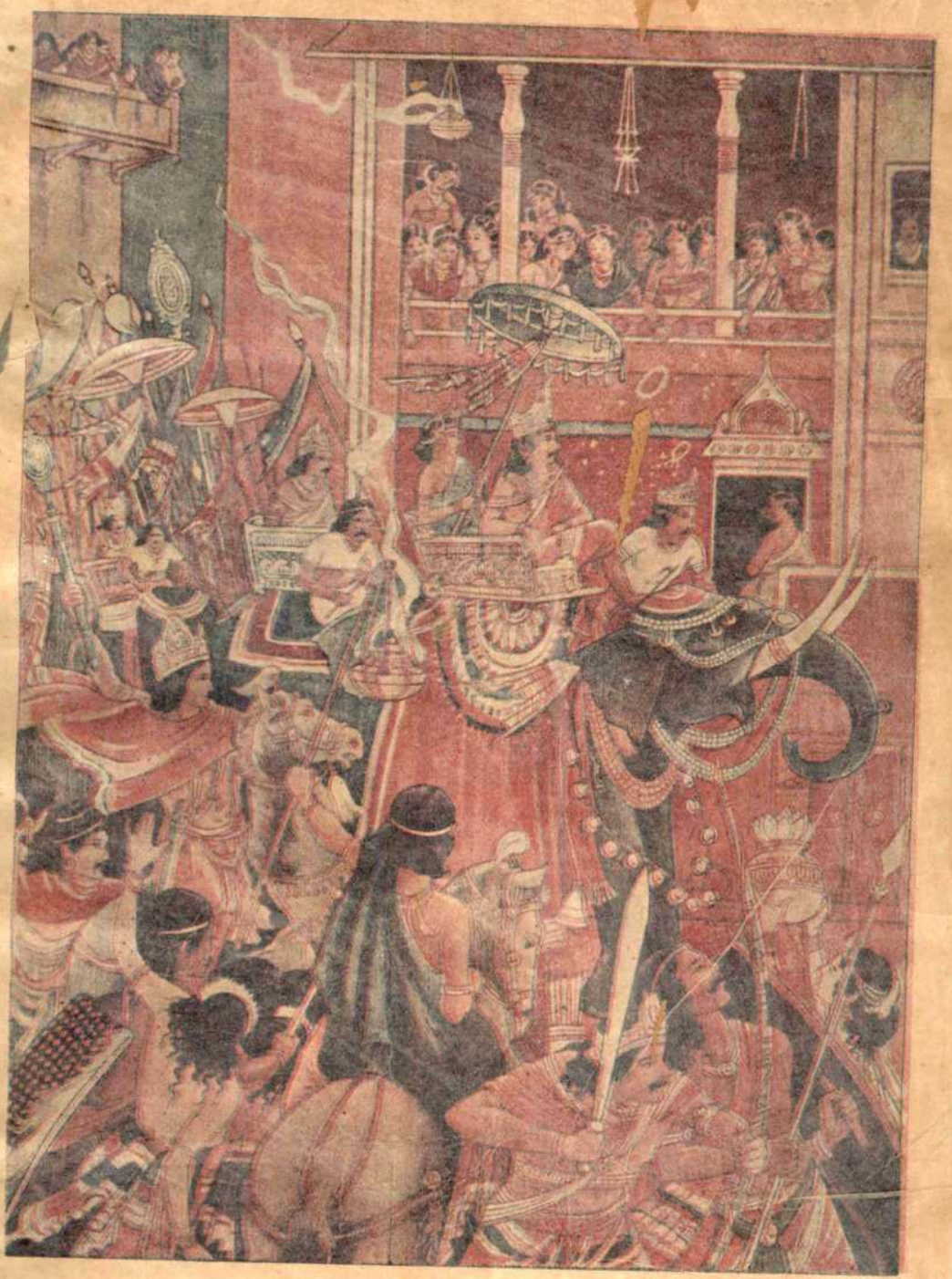

'অগুরু'র বিজয়-যাত্রা

আরম্ভ সুদূর অতীতে—আজও চলিতেছে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা

পার্ল পাউডার

(Borated Talcum)

চিক্কণ মুক্তাপরাগ

সর্ব্ববয়সে সর্ব্বঋতুতে সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার্য্য। অতিরিক্ত ঘর্ম্মস্রাব প্রশমিত করে, কিন্তু লোমকূপ রুদ্ধ করে না। দুর্গন্ধ নাশ করে, ত্বক্ মসৃণ ও স্নিগ্ধ করে। স্নানের পর জামা পরিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ গায়ে মাখিয়া দেখিবেন, কিরূপ তৃপ্তিদায়ক। জুতা পরিবার পূর্ব্বে পায়ের আঙুলের ফাঁকে লাগাইলে ঘর্ষণজনিত অস্বস্তি দূর হয়।

.....৵১০ আনা.....

কার্ব্বলিক টুথ-পাউডার

সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন। প্রত্যহ ব্যবহা
দন্তের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে।
কৌটা ৵১০ এক মাস চলে। ১২ কৌটা
এক বৎসর চলে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল